প্রচ্ছদ —



২৩শ বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা

বৈশাখ—১৩৪৫

প্রবর্তক



প্রেমযোগ

জীবন যে সাধন—প্রেমের সাধন। প্রেমে—ঈশ্বর-যুক্তি। ঈশ্বর-যুক্তি যে পায়, তার সবের সঙ্গে যুক্তি। কিছুতে তার বিরক্তি নাই। সন্তোষ তার স্বভাব। এক বিন্দু প্রেম মানুষকে যে আনন্দ দেয়, তার তুলনা পৃথিবীতে নাই।

আত্মার উন্নতি—প্রেমে ও সেবায়। নিজেকে ঘিরে' প্রেম নয়। ইহা শ্রীভগবানেরই মাধুরী। প্রাণ দিয়ে প্রেম মিলে। প্রেম-লাভে নব-জন্ম।

প্রেমের ভাষা নাই, শুধু ভাব—ভাগবত ভাব। পায় যে, মজে সে। কথা, আলাপ তার সঙ্কেত দেয় মাত্র।

চক্ষু স্থির, কর্ণ বধির, শ্বাস রুদ্ধ, রসনা স্তব্ধ—আলিঙ্গন-স্পর্শে তনু-মন তলিয়ে যায়। ধরা আর ছাড়া—ধরায় সমাধি, ছাড়ায় জীবন। ধরার যুগে ছাড়ার কথা বিরহ—ছাড়ার যুগে ধরার আবার অভিমান—সোহাগের সীমা নাই। রহস্য বটে—কিন্তু জাগ্রত সত্য।

পর যে আপন হয়, স্বার্থে নয়—প্রেমে। প্রেমের উপর মায়া—মধু আর মধু। যেখানে প্রেম নাই, সেখানে মায়া বন্ধন—পরম ভোগ নয়। ভোগ আর আসক্তি—এই দুই নিয়ে সৃষ্টি। সৃষ্টি ছাড়ে যে, সে এই দুই ছাড়ে। সৃষ্টিধর এই দুই নিয়ে বিদ্যমান। মমতার বন্ধনেই বিশ্ব তার আপন।

প্রেমাভিষিক্ত হও। রক্ত-মাংস, জীবন-যৌবন—সেবার রসায়নে অভিষিক্ত কর। ঘ্রাণে সৌরভ, স্পর্শে সুখ, অধরে অমৃত, চরণে নতি ও গতি, বাক্যে বেদ, হস্তে সেবার অর্ঘ্য—এই সর্ব্বোত্তম সাধনে সিদ্ধ হও। পরম গতি তোমার অবধারিত।

প্রেম আর শক্তি—ভগবান আর ভগবতী। সাধন—প্রেমের, শক্তির। সাধনে যে রস, সিদ্ধ জীবনে তাহাই ঘনীভূত হয়। ইক্ষু-রসই সিতামিশ্রি হয়। প্রকৃতির পরিবর্ত্তন। বহুজন্মের তপস্যায় অমৃতের আস্বাদ মিলে। সেই মানুষই চিরসাথী লীলার। প্রেম-নিষ্ঠ অগ্নিপ্রাণই ঈশ্বরমহিমার জয় দেয় জীবনে।

জাগরণের দীক্ষা

মানুষ চায় ঐহিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। একদিন ইহার বিপরীত চিন্তা ভারতে দেখা গিয়াছিল। আজও তাহার প্রভাব অল্প নহে। জাগতিক জীবন নশ্বর বলিয়া অপ্রাকৃত লক্ষ্যে ভারতের যে অভিযান, কথায় কাহিনীতে শাস্ত্রে পুরাণে তাহা পরিলক্ষিত হয়, সে নেশা আজও ভাঙ্গে নাই। সংসার-তাড়নায় স্বপ্নভঙ্গ হয় প্রতি নিমিষে, কিন্তু আবার ঝিমাইয়া পড়ি অতীতের সম্মোহনে। চলিয়াছি দুই নৌকায় পা রাখিয়া। সর্ব্বদাই সর্ব্বনাশের আশঙ্কায় চিত্ত উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল। না পাই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, না মিলে স্বপ্নলোকের আলো ও আনন্দ। এমন করিয়া বাঁচা যায় না। তাই মরণ প্রতি পদে।

এত বড় দেশ, এত বড় জাতি ক্ষয়িষ্ণু, মুমূর্ষু এই কারণে। সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালীর দুর্দ্দিন অধিক মনে হয়। বাঁচার প্রয়োজন যদি তুচ্ছ হয়, মায়া হয়, নশ্বর হয়, তবুও বাঁচার আকূতি কেন? রাজ্যলিপ্সা, ধনলিপ্সা, যশোলিপ্সা, কর্ম্মলিপ্সায় হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ঐহিক জীবন-ক্ষেত্রে মহাকলরব শুনা যায়। অপ্রাকৃত জীবনসাধনায় ব্রতীও এই প্রাকৃত জীবনক্ষেত্রে বাঁচার যে সঙ্কীর্ণ সম্পদ্‌টুকু, তাহার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। মৃত্তিকা ও জললেপনেই মৃণ্ময় গৃহের রচনা ও রক্ষা দুইই হয়। তেমনি অন্নরসে এ দেহের সৃষ্টি ও পুষ্টি—এই প্রত্যক্ষ সত্য অস্বীকার করিয়া, দেহাতীতের স্বপ্ন একরূপ মোহ বলিতে ক্ষতি কি? অর্ব্বাচীন ভারতের এই সমস্যা—ইহার সমাধান কোথায়?

এই সমস্যা উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইলেও, তাহা অবাধ নহে—একদিন স্তব্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। বিশ্বের নব-জাগ্রত জাতিসমূহের প্রগতিও দীর্ঘ দিন চলে না। ইতিহাস ইহা প্রমাণ করিবে চিরদিন। এক শ্রেণীর লোক আজ এই সমস্যার সমাধানে।

প্রায় সকল দেশের ও জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা জীবনের তাগিদেই গড়িয়া উঠে। ভারত কিন্তু জীবনের তাগিদ বড় করিয়া ধরে নাই। এই হেতু তাহার সভ্যতা ও কৃষ্টি ভিন্ন ভাবে ভিন্ন প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের অর্ব্বাচীন শিক্ষা-সভ্যতার প্লাবনে ভারতের যে ক্ষেত্রে শিকড় উপাড়িয়া গিয়াছে, জীবনের তাগিদ সেইখানে বড় হইয়া উঠে এবং এই সুযোগে ভারতের কিয়দংশ অতীতের সংস্কৃতি হইতে শনৈঃ শনৈঃ মুক্তির পথে। কিন্তু দৃঢ় ও বিস্তৃত ভূমি ভারতে রহিয়া যায়, যাহা সম্ভবতঃ টলিবার নহে। এই ক্ষেত্রই বর্ত্তমান যুগ-প্রগতির বিঘ্ন ও কণ্টকস্বরূপ। এই ভারতই আজ বর্ত্তমানের জয়-রব শুনিয়াও উদাসীন, নিশ্চেষ্ট। ভারতের বিশাল ক্ষেত্রের এই যে স্থবিরত্ব, ইহা ঘুচিবে কেমন করিয়া—এই সমস্যার কথাও অনেকের মনে উদিত হয়।

ভারত একদিন চাহিয়াছিল নিষ্কলঙ্ক রাষ্ট্র, অসপত্ন সাম্রাজ্য। তাহা লব্ধ হয় নাই, এমন নহে। ক্ষাত্রশক্তির অভ্যুদয়—ভারতের রাজ্যবিস্তারের অপূর্ব্ব ইতিহাস। কিন্তু ভারতের স্বপ্নলোকে যে ধর্ম্মপ্রভাব চিরযুগ বর্ত্তমান, তাহাতে সে শক্তিও পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। যে অহঙ্কার ও মমতার উপর জীবনবিস্তারের উদ্যম, তাহা বিসর্জ্জন দিতে উহা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ভারতের ক্ষাত্রশক্তিও বেদোপনিষদের ঋক্ রচনা করিয়া পরমের সঙ্কেতপতাকা আকাশে উড়াইয়াছিল। বল, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য ভারত রক্ষা করে নাই। ঐহিক জীবনের দাসত্বে অন্তর কলঙ্করেখায় সমাচ্ছন্ন হয় নাই, বরং উদাত্ত কণ্ঠে সে হাঁকিয়াছে—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"।

ভারত দেখিয়াছিল—রাজৈশ্বর্য্যের বৃদ্ধি ও রক্ষার দায়ে কাম-ক্রোধাদি অবিদ্যার ক্রীড়াই প্রকাশ পায়। রাজ্য-পালনে, যজ্ঞানুষ্ঠানে তাহার উপশম হয় না। ভোগে পুণ্য-ক্ষয় হয়, আয়ুঃক্ষয় হয়। বিবেক জাগে না। অন্ধতাই বাড়ে। রাজ্যরক্ষার নামে জনসাধারণ অতিষ্ঠ ও উৎপীড়ক হয়। বাসনার ধূলি উড়ে—বিশ্বে অন্ধকার বাড়ে। মোহ পুষ্ট হইয়া ভ্রমের মাত্রাবৃদ্ধিই করে। সুস্থ অন্তঃকরণ মিলে না। কাজেই ভারত মুখ ফিরাইয়াছে দেহ হইতে মনে, মন হইতে আত্মায়। জগৎ হইতে তাহার এই

বিচ্ছিন্নতা বাহিরকে শ্রীহীন করিয়াছে। এই সর্ব্বহারা জাতি অন্তরে শান্তি পাইয়াছে কিনা কে বলিবে?

যারা আজ দেশের পর দেশ জয় করিয়া চলে—তাহাদেরও এই অভিযান বিশ্বের শান্তি ও আনন্দ লক্ষ্যে রাখিয়া। ভারত দেহের উপরে মন, মনের উপরে আত্মার কল্পলোকে ধাবিত হইয়া, উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছিল—ইহাই অমৃত, ইহাই আনন্দের সোপান। কথা বস্তু নহে। কর্ম্মে রক্ত উত্তপ্ত হয়। মনে আশা জাগে। বস্তু না পাইলেও, জনসাধারণ এই পথই আজি শ্রেয়ঃ করিয়াছে। তাই দেখি—রাষ্ট্র আজ মানবের লক্ষ্য। অধ্যাত্মচেতনার অভিমুখে ভারতের যাত্রা, কিন্তু প্রবাহের ন্যায় অপ্রকাশ্য হইলেও, তাহার অভাবনীয় প্রভাব বর্ত্তমান যুগগতির স্বাচ্ছন্দ্য ও বেগ নষ্ট করে, রুদ্ধ করে। ভারত শুধুই যদি ইহবিমুখ হইত, তাহার সঙ্কট ছিল না—দুই নৌকায় পা দিয়া চলায় বিপদ্ বাড়িয়াছে। অমূর্ত্তের, অনির্দ্দিষ্টের পথেও ঐহিকের আশ্রয় অপরিত্যজ্য, সমস্যার অন্ত নাই তাই।

একটা বিষয় আজ লক্ষ্যে পড়ে। পৃথিবীজয়ে যে বাহির হইয়াছিল অতীতে বীর পদে—পরে ভগ্ন মনে, ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে অজানার, অমূর্ত্তের অভিমুখে চলিতে চলিতে সেও যেন আজ পড়িয়াছে দোটানায়। চুম্বকের আকর্ষণে লৌহের মত ভারতের প্রাণশক্তি আত্মানন্দের অভিমুখে একদিন ধাবিত হইয়াছিল, তাহা যেন ফিরিতে চাহে সৃজনের অভিমুখে—বিশ্বজয়ী প্রাণ লইয়া। অনাত্ম বলিয়া যাহা একদিন পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা আজ অমূর্ত্তের ক্ষেত্র হইতেই নবজন্ম লইয়া ফিরে। তাই ভারতের অধ্যাত্মসন্তানগণের কণ্ঠে বিশ্বমূর্ত্তি আরাধ্যেরই রূপপ্রকাশ বলিয়া ঘোষণা উঠে। বিষয়ান্তরে স্পৃহাশূন্য হইয়া স্বরূপ-মাত্রের জ্ঞানভূমিতে সমাধির আকৃতি উত্তর-কালে ভাগবত স্বরূপ ও রূপের অভেদ সাক্ষাৎকারের বিজ্ঞানে পরিণত হয়। জগতের এক জাতি চলিয়াছে ধনরত্ন-রাজ্য-লুণ্ঠনের প্রয়াসে ঊর্দ্ধশ্বাসে, তাহাদের গতি রুদ্ধ প্রতি পদে। আর আজ যাহারা ফিরিতেছে ঊর্দ্ধলোক হইতে বিশ্বরূপে, তাহাদের গতি অবাধ, অপ্রতিহত। প্রচলিত প্রগতির ছন্দে তাহাদের চরণ ছন্দিত নহে বলিয়া লোকের কটু দৃষ্টিও এদিকে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না—ইহাও এক অপূর্ব্ব রহস্য!

যাহা আমার নয়, তাহা আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা অত্যাচার। কিন্তু যাহা আমার, তাহা অধিকার না করার অক্ষমতা বা ঔদাসীন্য মহাপাপ। এই বিশ্ব আত্মা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখার পথে যে সৎ ও অমূর্ত্তের চেতনাস্পর্শ, তাহাতেই বিশ্বরূপের স্বরূপ-প্রকাশ হয়। এই চেতনার আলোয় আমার স্বভাব, স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম ফুটিয়া উঠে—এইখানেই আমার অপ্রতিহত ব্যাপ্তি। তাহার গতি বর্ণনার নহে।

তাই মনে হয়—যে মন বন্ধন-গ্রন্থি হইয়া বিশ্বকে বাঁধিতে চাহিয়াছিল সেদিন, তার সবই বন্ধন-দশায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রজাপালনের নামে উৎপীড়ন, পোষণের নামে শাসনের দৃঢ়তাই বড় হইয়াছিল। আজ সেই মনই মুক্তির সন্ধান পাইয়া, ত্যাগের নিশান উড়াইয়া অবতরণ করে জগতে—তাই আজ শাসন নহে, পালনের প্রাণ জাগে। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ পুষ্টির আশ্রয়। স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষে ও ঈশ্বরনিষ্ঠা লইয়া এক নবজাতিরই অভ্যুদয় আজ লক্ষ্য করিতেছি।

এই জাতির অভ্যুত্থান-সূচনা আজিও অলক্ষিত, কিন্তু ইহা শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। এই ক্ষেত্রেও একটা দ্বন্দ্ব-সৃষ্টি হয়—সকাম ও নিষ্কাম চিত্তের সংঘর্ষে। সকাম ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসাদি, সকাম স্বাধ্যায়, শৌচাদি লোক-কল্যাণের হেতু, কিন্তু উহা মানবাত্মাকে মুক্তি দেয় না। তাই বিচার্য্য—ভারতের দৈবী সম্পৎ সুস্পষ্ট হইলেও, ইহার ব্যবহার-তারতম্যে ফলভেদ হইতে পারে। কিন্তু ভারতের বিধাতা যে অপার্থিব বিধানে বিশ্বজাতিকে নূতন রূপ, নূতন জন্ম দিতে চাহেন, তাহার প্রক্রিয়াও আজ নিঃসন্দেহভাবেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই জন্য যে সমস্যার আবর্ত্তে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি নাকাল হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা নিছক কল্পনা। নূতন জাতির অভ্যুত্থানে ও নূতন কর্ম্মের অভিব্যক্তিতেই সমস্যার সমাধান হইবে—চিন্তায় নয়—যুক্তি তর্কে নয়।

ভারত আপনাকে অনুশীলন করিতে গিয়া পাইয়াছে জীবনের দুইটী পথ। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসাদি সহায়ে সকাম সংসার-জীবন, আর এইগুলি বিশুদ্ধ চিত্তে, সুস্থ অন্তঃকরণে

ঈশ্বরপ্রসাদরূপে প্রকৃতিগত করিয়া যোগজীবন। সকাম দৈবী গুণ ও কর্ম্মের অভিব্যক্তি—শিক্ষায়। ভারত ইহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই—অতএব এইরূপ শক্তি-প্রকাশ যুগ পরিলক্ষিত হয়। আর নিষ্কাম গুণ ও কর্ম্মের প্রকাশ যোগে। ঈশ্বরযুক্ত মহামানবসমষ্টির নিষ্কাম গুণ ও কর্ম্মের প্রকাশ আজ আসন্ন। মানবের সুখ ও কল্যাণের উপর মুক্তির যে আনন্দ, তাহা যোগ-জীবনেই সম্ভব হইবে।

ভারতের ধর্ম্ম-সমস্যা মানব-প্রচেষ্টায় সমাহিত হয় নাই—তাহা কালহরণের সুবিধা মাত্র দেয়, মীমাংসা যোগপ্রকাশে। ভারতের প্রকৃতিগত স্বরূপগত যে গতি, তাহা লোকবুদ্ধির তির্য্যক্ চিন্তায়, তর্কযুক্তির সীমায় বাধা পায় না। সে যাহাকে অনাত্ম বলিয়া, নশ্বর বলিয়া একদিন পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাকেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানে দিব্যত্বে পরিণত করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক করিতে চাহে। ভারতের ধর্ম্ম-সমস্যা মীমাংসার মূর্ত্তি লইয়া জীবনে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার উপর যে কথা, সে কেবল বদ্ধ মনের কুসংস্কার। কুমতি মোহ আনে। ধর্ম্মকে সে প্রেত মনে করিয়া, মুদিত চক্ষে মন্ত্র জপিতে থাকে।

অতএব ভারতের অভ্যুত্থান-যুগে নিষ্কাম চিত্ত ব্রহ্ম-যুক্তির এক বিরাট্ সংহতি একযোগে ব্রহ্ম-ভাবনার সহিত কর্ম্ম সংযুক্ত করিয়া, বিশ্বে যদি ব্রহ্ম-কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার ক্ষেত্রে, সমাজ-ক্ষেত্রে, অর্থ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে, তাহা ধর্ম্মের ব্যভিচার নহে। তাহা ভারতের কল্পস্বপ্ন সিদ্ধ করারই সিদ্ধ সূচনা পর্ব্ব। আমরা নব বর্ষে নবোত্থিত এক অভিনব জাতির জীবন-বেদ-রচনার আজ ভূমিকা করিয়া রাখিলাম—"প্রবর্ত্তকে"র পাঠকপাঠিকাকে যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে ইহা অনুধাবন করিতে বলিব। ভারতের অভ্যুত্থান আসন্ন।

জীবন-বিজ্ঞান

যাহা ঈশ্বর-কাম, তাহাই সৃষ্টি-বীর্য্য; আর সৃজনের মধ্যে যে আনন্দ তাহাই প্রেমের পারিজাত ফুটাইয়া তুলে। ঈশ্বরের অবতরণ কামে—জীবের মুক্তি প্রেমে। তাই কাম-বীজে জগৎ। তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া প্রেমে পরিণত করাই জীবন-বিজ্ঞান। বাঙালী জীবনবাদী—তাই কাম-বীজ ও কাম গায়ত্রীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্ত্রের ঋষি মন্ত্র রচনা করিয়াছেন—"ভোগঃ যোগায়তে।"

বশিষ্ঠের কামধেনুর ন্যায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই পৃথিবী কামতনু স্বয়ং শ্রীভগবানের। ভারত তাহার মর্ম্ম। এই ক্ষেত্রেই চতুর্ব্যূহ নারায়ণের জাগ্রত অনুভূতি মানবজীবনকে সফল করে।

:: চিন্তা=বীথি ::

পরিবর্ত্তনের যুগ। কাল-চক্র ক্ষিপ্র আবর্ত্তনে মানুষের মনে, চরিত্রে ও জীবনে সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে। জাতির সমষ্টি মানুষের ভাগ্য লইয়াও আজ প্রকৃতির এই দ্রুত প্রক্রিয়া চলিয়াছে। কত নবীন জাতির উত্থান, কত প্রাচীন জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিমিষে নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে। শক্তি-সাধনার যুগ, শক্তিমানেরই আজ জয়। শক্তিহীন জাতি প্রবলের অভিযানে পীড়িত, বিধ্বস্ত। আবিসিনীয়া গিয়াছে, চীন গতপ্রায়, স্পেন রক্তাক্ত, বিপর্য্যস্ত, অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণীর কুক্ষিগত হইয়া স্বাতন্ত্র্যবিলয়ে বাধ্য হইয়াছে—পক্ষান্তরে, উপেক্ষিত ইতালী জাপান আজ উন্নত, দিগ্বিজয়ে মদোদ্ধত; লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত জার্ম্মাণী আজ স্বয়ং ইউরোপের বিভীষিকাকেন্দ্র—সোভিয়েট রুষিয়া আত্ম-গৃহমার্জ্জনা করিতে করিতে তর্জ্জনরত, বৃটন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্র-পরিস্থিতি নীতি-হীন অথবা নীতি-বিমূঢ় অবস্থাই উভয়ত্র পরিলক্ষিত হয়—যুক্ত-মহারাষ্ট্র আপনার সীমায় থাকিয়া সকল পরিবর্ত্তন সজাগ নেত্রে পর্য্যবেক্ষণরত। এই সমস্ত শক্তি-ব্যূহের মধ্যে ভারতের ন্যায় জাতি বৃটনের ভাগ্য-সূত্রে জড়িত থাকিয়াও আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ যোগ্যতার প্রভাব অনুভব করিতেছে ও করাইতেছে—এইটুকু আশার কথা। ভারতের রাষ্ট্র-বীর্য্য কংগ্রেসেই বিগ্রহান্বিত। কংগ্রেসের রাষ্ট্রসাধনায় ভারতের আশা, ভরসা, স্বপ্ন অনেকখানি প্রতিফলিত। তাই কংগ্রেস, তথা মহাত্মা গান্ধীপরিচালিত শক্তিময়ী রাষ্ট্রমণ্ডলীই ধীরে ধীরে শাসনক্ষেত্রে ভারতের পরিবর্ত্তন-সূত্র হস্তগত করিয়া মুক্তির দিকে অগ্রগামী। জাতীয়তার সাধনায় কংগ্রেসের স্থান আজ অতি বরণীয়।

*　　　　*　　　　*

কংগ্রেসের শক্তি ও চিন্তাধারা সারা দেশকে দ্রুত সংক্রামিত করিতেছে। একত্রিশ লক্ষ সভ্যসংখ্যা, অর্থাৎ সমগ্র ভোটাধিকারপ্রাপ্তের প্রায় এক দশমাংশ জনবল এবং একাদশটি স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত প্রদেশের মধ্যে সাতটীর শাসনভার ও অন্যগুলিতে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান প্রভাব লইয়া এই বিরাট্ সংহতি যে বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় দল বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। শাসনাধিকার পাওয়ায় এই সংহতিবল সমধিক প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছে। কংগ্রেসের এই সংহতি-শক্তির মূলে আছে যে অসাধারণ মহানেতা ও তাঁহার অলোক-সামান্য নীতি ও নেতৃত্বে আস্থাবান্, উৎসর্গীকৃত প্রাণ, প্রতিভাশালী ও কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ নেতৃ-সমষ্টি, ইঁহাদের সম্মিলিত চরিত্র-বল ও কর্ম্মশক্তিরও তুলনা নাই। এই অবস্থায় কংগ্রেসের শক্তি যে দিন দিন দুর্জ্জয় ও সর্ব্ব বাধা অতিক্রম করিয়া ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে জাতীয়তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইবে, ইহা আমরা অনায়াসেই আশা করিতে পারি। ঘোরতর সংগ্রামের পর আজ জয়ের পথে কংগ্রেস--এই জয়-যুগে বহু সহযাত্রী তাহার সহিত মিলিবে—রাজনৈতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলগুলি এই সুযোগে তাহার সহিত সংযুক্ত হইলে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধিতে জাতিরই শক্তি-বৃদ্ধি ঘটিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব এই সন্ধিক্ষণে, সারা ভারতের রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে পরস্পর সহযোগে একটী অখণ্ড রাষ্ট্রশক্তিরচনায় প্রবুদ্ধ দেখিলে আমরা বিস্মিত হইব না।

*　　　　*　　　　*

কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত যে সমাজ-তন্ত্রী চিন্তাধারা, তাহার সহিত কংগ্রেসের মৌলিক চিন্তাধারার আদর্শভেদ ও কর্ম্ম-ভেদ আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা-সাধনে উভয়ের সহযোগ অসম্ভব বা অসাধ্য নহে। এই বামপন্থী দলকে এখনও দীর্ঘদিন কংগ্রেসের ছত্রতলে থাকিয়াই আত্মসংহতিকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। সেই শক্তি-সঞ্চয়ের যুগে, তাহার বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রণালী কংগ্রেসের সহিত বিরোধিতা না করিয়া যাহাতে সামঞ্জস্য-পরায়ণ হইয়া চলে, সেই দিকে উভয় সংহতির নেতৃবৃন্দেরই যে আগ্রহ ও জাগ্রত দৃষ্টি আছে, তাহার পরিচয় কংগ্রেসের গত অধিবেশনে আমরা পাইয়াছি। অতএব সমাজতান্ত্রিক দল ও ভাবধারা বর্ত্তমানে কংগ্রেসের নিজস্ব শক্তি-সাধনার

অনুকূল ও পরিপোষক রহিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই যুক্তি উভয়েরই শক্তিবৃদ্ধির কারণ হইবে। বৃটিশ ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে প্রাচীন উদারনৈতিক দল ও মোস্‌লেম লীগ ব্যতীত কংগ্রেসের আর তৃতীয় অসরকারী প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেই চলে। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ লোক-মত প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে কংগ্রেসেরই অনুকূলে, তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। খাস বৃটিশ ভারতের বাহিরে ভারতের রাজন্যবৃন্দ কংগ্রেসের ন্যায় গণতন্ত্র সংহতির সহিত যে আদর্শগত ঐক্যানুভব করে না, তাহা সুনিশ্চিত; কিন্তু ফেডারেশনের মহারাষ্ট্র-চক্র সম্ভব করিয়া তুলিতে হইলে, বিভিন্ন আদর্শ ও সংস্থিতির সামঞ্জস্যবিধানের যে প্রয়োজন হইবে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেস আজ অন্যান্য হেতুর মধ্যে এই দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত আদর্শগত ব্যবধান কারণেও ফেডারেশনের দান বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু ফেডারেশনগ্রহণের অন্যান্য বাধাগুলি যদি কোনও সুযোগ বিদূরিত বা রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলেও দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত আদর্শগত বিরোধের সমাধানে একটা সাময়িক সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়াই উপনীত হইতে হইবে। দেশীয় রাজ্যে প্রজাশক্তি বা গণতন্ত্রের জয় একদিনে সম্ভব নহে, ইহা না বলিলেও চলে। বৃটিশ ভারতে, খাস ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে প্রজাশক্তির শিক্ষা ও জাগরণ ঐতিহাসিক কারণেই দেশীয় রাজ্যাপেক্ষা খরবেগে অগ্রসর হইয়াছে এবং নবীন শাসন-বিধির প্রবর্ত্তন সেই ঐতিহাসিক কারণেই দেশীয় রাজ্যের আগে খাস ইংরাজ-শাসিত ভারতে সম্ভব হইতেছে, ইহা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

* * *

রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে এইরূপে কংগ্রেসের জাজ্বল্যমান স্থিতি ও গতির কথা আমরা মোটামুটি অনুধাবন করিতে পারি। এই রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও সাধনা—কংগ্রেসেরই একমাত্র বিশেষত্ব, তাহা অবশ্য বলি না; কিন্তু কংগ্রেস এই চিন্তাকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছে, ভাবকে ত্যাগের সাধনায় মহিমান্বিত, কঠোর সংগ্রামে ও আত্মদানে তাহাকে ক্রমশঃ সর্ব্বত্র জয়শ্রীমণ্ডিত করিতে পারিতেছে। যে সংহতি তিল তিল রক্তদানে এতাদৃশ প্রভাব অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার আশা, তাহার স্বপ্ন সম্পূর্ণ সফল করিতে হইলে ভারতের শাসন-কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাও তাহার অজানা নাই—একের তপোলব্ধ ধন অন্যের গ্রহণে অধিকার নাই, সহজে পারেও না। কংগ্রেসকে বর্জ্জননীতির মধ্য দিয়া তাই পরিশেষে রাজ্য-শাসন-নীতি বরণ করিয়া লইতেই হইয়াছে। এখনও ফেডারেশনের ক্ষেত্রে এই বর্জ্জনের কষ্টিপাথরে অর্জ্জনের মূল্য যাচাই করিয়া লইয়া শাসনাধিকার না পাইলে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কি উপায় আছে! বিরোধের জন্য বিরোধ নহে; ভারতের রাষ্ট্র-বুদ্ধি অভিজ্ঞতায় তীক্ষ্ণ ও সমৃদ্ধ হইয়া এই সংগঠনী প্রতিভায় ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করিতেছে, ইহা আশার কথা, আনন্দের কথা। ভারত ধীরে ধীরে রাষ্ট্রজগতে আপনার একটা স্থান ও শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহাই রাষ্ট্র-সাধনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য-সিদ্ধির অভিমুখে অর্দ্ধপথ আগাইয়া কংগ্রেসের বিমুখ হইলে চলিবে না। ঋজু বা তির্য্যক্ যে কোন গতিভঙ্গী আশ্রয় করিয়া স্বাধিকার-প্রাপ্তির সাধনাই কংগ্রেসের চির কাম্য।

* * *

এই রাষ্ট্র-সাধনাই কিন্তু জাতীয় সাধনার সবখানি নহে। রাষ্ট্র-সাধনা আজ ব্যাপক, কাল তাহার অনুকূলে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ রাষ্ট্রীয় ভাঙন ও গড়ন ক্রিয়া অতি খরস্রোতে চলিয়াছে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু জাতির কৃষ্টি, জাতির আদর্শ, সভ্যতা, ভাব-বৈশিষ্ট্য ব্যতীত জাতীয় রাষ্ট্রের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। জাতীয় রাষ্ট্র বলিতে সেই রাষ্ট্রই বুঝায়, যাহা জাতির আত্মার অধীন—জাতি আপনার সৃজনীশক্তি দিয়া যাহা গড়িয়াছে। এই আপনাকে দিয়া আপনার অভিব্যক্তিই জাতি-সাধনার মর্ম্ম। রাষ্ট্রে তাহার গতি, কিন্তু কৃষ্টিই তাহার আলো ও প্রাণ। কৃষ্টির আলো হারাইলে, আমরা অন্ধকারে পা বাড়াইয়া গতিহীন হইতে পারি, পথ-ভ্রষ্ট বা লক্ষ্যচ্যুত হওয়াও অসম্ভব নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, আমরা আত্মপ্রাণ না চিনিলে, মুক্তির নামে অভিনব দাসখতেই আত্মবিক্রয় করিব না, কে বলিল? ইংরাজের স্বায়ত্ত-

শাসনের দান ইংরাজ জাতির প্রতিভা-প্রসূত—যাহা ইংরাজের পক্ষে অমৃত, তাহা আমাদের পক্ষেও অমৃত স্বরূপ অথবা গরল, এ বিচার করিবে কে? এইখানেই কৃষ্টি, অনুশীলনের কথা—আত্মপরিচয়ের সাধ্য-সাধনা আর অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রসাধনা সাম্রাজ্যশক্তির উপাসনা। ইহা বাহিরের, একদিকের সাধনা। অন্যদিকে আছে—স্বারাজ্যশক্তির আরাধনা, অন্তরের মধ্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, আত্মসৃষ্টির মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্যে আপূর্য্যমান আত্ম-প্রতিষ্ঠা। পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে এই অন্তর ও বাহির—স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্য উভয় লোকে পরিপূর্ণ আত্মজয় ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাই বুঝায়। ভারতের ঋষি এই পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কল্প-স্বপ্ন অন্তরে দেখিয়াছিলেন—জাতিজীবনে সেই স্বপ্নের বিগ্রহরচনার অব্যর্থ বীজবপনও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনসাধনার অপ্রাকৃত মহাবীর্য্য আজও কাল-স্রোতে বিলীন হয় নাই—ইতিহাসের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের মধ্য দিয়া, আজও নানা যুগাঙ্ক অতিক্রম করিয়া, তাহা অভ্যুদয়ের পথেই ছুটিয়াছে। বর্ত্তমান রাষ্ট্র-সাধনা এই পূর্ণাঙ্গ জীবন-সাধনার মৌলিক সূত্র এখনও ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারে নাই—তপস্যার বীর্য্য পাইয়াছে, কিন্তু জাতীয়াত্মা হইতে উৎসরিত উৎসর্গের যে পূর্ণ-মূর্ত্তি, তাহা এখনও পায় নাই। বাহির হইতে অন্তরে রাষ্ট্র-সাধনা চলিয়াছে—অন্তর হইতে বাহিরে কৃষ্টির প্রবল উচ্ছ্বাস তাহাকে উচ্ছ্বসিত, প্লাবিত করিয়া এখনও দেয় নাই। এই অন্তঃশক্তির উন্মোচনেই আত্মার জাগরণ। জাতীয় সাধনার সেই অন্তরঙ্গ দিক্ যুগ-প্রবাহে ভাসিয়া আমরা পাইব না। ইহার জন্য চাই জাতির অন্তরে অবগাহন করিয়া কৃষ্টির আলোকে আত্মশক্তির উদ্ধার—আত্মারই রূপায়ন।

* * *

বাহিরে দৃষ্টি রাখিয়া, বহিঃশক্তির সহিত সংগ্রাম—বর্ত্তমান রাষ্ট্র-সাধনা। এখানে পদে পদে পরেচ্ছার সহিত আত্মেচ্ছার সংঘর্ষে—স্বাধিকারার্জ্জন। ভারতেরই সাম্রাজ্যশক্তি আজ ঐতিহাসিক ঘটনা চক্রে ইংরাজের করায়ত্ত। এই শক্তি আমরা ছিনাইয়া লইতে চাহি। এ আকূতি আমাদেরই অন্তরের—আত্মারই। কিন্তু শক্তি পরহস্তগত—তাই পদে পদে বিরোধ করিবার শক্তি অর্জ্জন করা। শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি, বুদ্ধির বিরুদ্ধে বুদ্ধি—এইরূপে রাজ-নীতিক কূট চক্র চলিয়াছে। বিশ্বময় এই রাজনীতির কূটচক্রই পাক খাইতেছে। এখানে হিংসা অহিংসা বড় কথা নহে—প্রবলের বিরুদ্ধে সাধ্য ও সুযোগ-মত হিংস, অহিংস বল-প্রয়োগে প্রতিপক্ষকে হারাইয়া আপনার ইচ্ছা বাধামুক্ত করিতে হইবে—নতুবা পরাজয়ে, সামঞ্জস্য অথবা আত্ম-বিলয়ই শেষ পরিণতি। অন্য পক্ষে, আপনার আনন্দে আপনাকে পাইয়া, তাহাকেই জীবনে বিগ্রহান্বিত করা। যাহা ভিতরে প্রাপ্ত, তাহাকেই বাহিরে প্রকট করা—ইহাই সৃষ্টি-নীতি। রাজনীতিক জাতীয়তা (Political Nationalism) বনাম এই সৃজন-নীতিক জাতীয়তার (Constructive Nationalism) উপপত্তি আমরা বাঙালী জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করিতেছি। রাজা রামমোহন রায় বাঙালায় এই রাজনীতিক জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। সেই যুগবীর্য্যের আজ শতাব্দী বর্ষ-ভোগ পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু রাজা রামমোহনেরও যুগ যুগ পূর্ব্বে বাঙালীর সৃজন-নীতিক জাতীয়তার পরিপূর্ণ দীক্ষা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাহারই শেষ দুই যুগ-চিহ্ন! মধ্যের এই সংঘর্ষের প্রয়োজন হইয়াছিল—তুলনায়, অভিজ্ঞতায় আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়তারই জন্য। আজ রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় বাঙালী চায়—আপনারই জীবন-দীক্ষার পূর্ণতা-সাধনে সৃজন-বীর্য্যের উন্মেষ—আত্মা দিয়াই আত্মসৃষ্টির গঠন। বিরোধ সংঘর্ষ দূরে থাক, প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া-নীতিরও ইহা অতীত। হিংসা অহিংসার দ্বন্দ্ব এখানে নাই। আত্মার জাগরণে, আত্মশক্তির সৃষ্টি ও কর্ম্ম। ইহাই সিদ্ধ কর্ম্ম। দেশ, কাল, পাত্র—এই কর্ম্মের ধৃতিগুণে শত বাধা ও বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াও স্বতঃ অনুগামী। আত্মগুণেরই আংশিক ক্ষণ-প্রভাচ্ছটা আমরা বাহিরে দেখিতেছি। পরিপূর্ণ আত্মগুণের অনুশীলনে আমরা নব মন, নব সমষ্টি গড়িয়া তুলিতে পারিব—এই অভিনব সমষ্টির অভিযাত্রায় যে শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি, সমাজ ও রাষ্ট্র অনিবার্য্য বিধানে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহাই ভারতের সত্য জাতি-মূর্ত্তি।

কাগজের খবর

(গল্প)

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

সচিত্র সংবাদ সংবাদপত্রের মারফৎ ঘোষিত হইল :

"হরিবল্লভপুরের বিখ্যাত ধনী শ্যামধন আচার্য্য মহাশয় বিগত ১১ই চৈত্র তারিখে তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবন ২৬।ক নং রামরাম আগরওয়ালা ষ্ট্রীটে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল।" সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের উপরিউদ্ধৃত অংশ একেবারে অকাট্য সত্য।

কিন্তু সংবাদদাতা উৎসাহের এবং কৃতজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া আরও লিখিয়াছেন :

"শ্যামধনবাবু চক্ষুষ্মান্ এবং সদ্ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ছিলেন—ইংরাজিতে যাহাকে বলে self-made man. স্বকীয় চেষ্টায় সামান্য একটি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি ক্রমোন্নতির চরম সীমায় তুলিয়াছিলেন অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং সাধুতার দ্বারা এবং দূরদর্শিতাবশতঃ। তিনি লক্ষাধিক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবন তিনি ঈশ্বরারাধনায় এবং দান-ধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি এমনই মিষ্টভাষী ছিলেন যে, যাহাকে তিনি অনুগ্রহ করিতেন—তাহার অনুগ্রহলাভের লজ্জা তিনি আপন বিনয়ে দূর করিয়া দিতেন। কত দুঃস্থ ব্যক্তি তাঁহার গোপনদানে সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সদাচরণ তাঁহার পরিজনবর্গের আদর্শ এবং তাঁহার দেশের লোকের নিত্য অনুকরণীয় ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার আত্মার পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দান করুন।"

'তাঁহার তাঁহার' করিয়া, অর্থাৎ সেই গুণময়ের দিকে সর্ব্বনামের ইঙ্গিত করিয়া আরও ছিল কি না, এবং দেশলক্ষ্মী কার্য্যালয়ে তাহা ছাঁটিয়া কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল কি না—জানি না; সংবাদটি কত শত লোকের চোখে পড়িল, আর দেশের অপূরণীয় ক্ষতির দুঃখ তাহাদের কিরূপ অভিভূত করিল, তাহাও জানিবার উপায় নাই—

কিন্তু সংবাদপ্রেরকের সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ বহিতে লাগিল...

তিনি সংবাদ এবং তৎসঙ্গে ফটো এবং তৎসঙ্গে ফটোর ব্লক করিবার খরচ পাঠাইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কাগজ আসিবামাত্র টানিয়া লইলেন এমন ব্যগ্রতাসহকারে, যেন তিনি উপোসী ছিলেন, অন্নের গ্রাস পাইয়া গেছেন! পিতৃকৌলীন্য উপলব্ধি করিয়া এবং পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভরে আর চক্ষু নির্ণিমেষ করিয়া তিনি শোকসংবাদটি একবার নয়, দুইবার নয়, বারংবার পাঠ করিলেন নিজেকে ধন্য মনে হইল। বিখ্যাত লোকের পুত্র তিনি, ধনী লোকের, সৎ লোকের, পরোপকারী লোকের—একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ হইয়াছিল তাঁর পিতার—আর দেশের লোক সবাই তাহা জ্ঞাত হইয়াছে! সুনীতিবাবুর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ বহিবে না কেন?

বলা নিশ্চয়ই বাহুল্য যে, সংবাদপ্রেরক আর কেহই নন, মৃত শ্যামধনেরই পুত্র সুনীতিবাবু। কাজটা তিনি খুব গোপনেই করিয়াছেন—গোপন কথাটা জানে কেবল মনোরম; মনোরম তাঁর প্রায়ই-ধন্না-দিয়া-পড়িয়া-থাকা সেক্রেটারী।

সুতরাং তিনি মনোরমকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠাইলেন; মনোরম ছুটিয়া আসিল...

সুনীতিবাবু বলিলেন, বেরিয়েছে। দেখ।

মনোরম দেখিল—দেখিয়া আগে সে লাফাইল, তারপর কাঁদ কাঁদ হইয়া গেল, তারপর সুনীতিবাবুর চোখের দিকে তাকাইয়া ম্লানভাবে একটু হাসিল; তারপরই সে প্রফুল্ল

হইয়া উঠিল, এবং তারপর সে সোরগোল সুরু করিয়া দিল—বলিল, ডেকে' আনি সবাইকে।

সুনীতিবাবু বলিলেন, এখনই ?

—হ্যাঁ। যা' তা' ব্যাপার ত' নয়! প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার স্বর্গারোহণে আমাদের ঘটনার উপযোগী কিছু করতেই হবে। আপনি এখনই বল্‌ছেন কি! এই মুহূর্ত্তেই। আমি চল্‌লাম বলিয়া তৎক্ষণাৎ একটা সমারোহ সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে মনোরম লোক জুটাইতে দৌড়াইল।

ডাক্‌-হাঁক্‌ করিয়া, টানাটানি করিয়া, তোষামোদ করিয়া, মনোরম অসংখ্য লোককে আধ ঘণ্টার মধ্যেই সুনীতিবাবুর বৈঠকখানায় আনিয়া জড়ো করিল—"আসুন খবর শুনে' যান্‌।"...

সংবাদটি সকলেই কেবল শ্রবণ করিল না, পাঠও করিল—সংবাদের মাথার ছবিটাও সকলেই দেখিল... ছবির যিনি মূল তাঁর বিস্তর গুণগান করিল—কণ্ঠ গদগদ হইয়া গেল, এবং দীর্ঘনিঃশ্বাসও দু'চারিটি না পড়িল—এমন নয়; পতন দেখাই গেল।

কাজের কথা সুরু করিলেন বৈকুণ্ঠ—তাঁর আঙুলে ঘা হওয়ায় পটি জড়ানো ছিল—সেই আঙুলটা তুলিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন,—একটি শোক-সভা করা উচিত।

অন্নদাপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব সমর্থন করিল; কিন্তু উচিত শব্দটা তেমন অনিবার্য্য জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয় নাই বলিয়া সে চোখ পাকাইয়া বৈকুণ্ঠের দিকে তাকাইল; বলিল,—উচিত বলে' উচিত! অমন লোকের মৃত্যুতে এখানে শোক-সভা হ'তে হবে। আমার মতে, একটা স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করলেও অতিরিক্ত হয় না, উচিতই হয়।

অন্নদার কথার তেজ দেখিয়া মনে হইল, এ ব্যাপারে সে নিরীহ উক্তি চায় না।

ইহাতে আপত্তি করিবার লোক, অর্থাৎ হৃদয়হীন বা দুঃসাহসী কেহ সেখানে ছিল না।

মনোরম বলিল, আমার বাইরের উঠোনেই সভাটা হোক্‌, কালই হোক্‌। সভা সাজাবার ভার আমি নিলাম।

বিস্তর পরিশ্রম বরণ করিয়া মনোরমের দেশপ্রিয়তা আজ সার্থক হইল। একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়া গেল—

গোপালপুরের মত অযোগ্য স্থানেও যোগ্য ব্যক্তি অনেক আছেন—তাঁহারা কেহ কেহ যথারীতি সম্পাদক প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হইলেন—অসম্মত কাহাকেও দেখা গেল না।

শ্যামধনের সুযোগ্য পুত্র সুনীতিবাবু দেশস্থ লোকের এই আগ্রহ এবং গুণগ্রাহিতায় সন্তোষ প্রকাশ না করিয়া পারিলেন না—শোক-পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখা গেল।

মনোরম বলিল, তা' হ'লে "দেশলক্ষ্মী"র সহকারী সম্পাদক প্রিয়বাবুকে টেলিগ্রাম করে' দিই? তিনি সভাপতিত্ব করবেন।

বিশিষ্ট অপরিচিত লোক সভাপতিত্ব না করিলে, সভার গুরুত্ব খর্ব্ব হয়।

সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল: দাও, দাও।

সুনীতিবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, দাও।...এই নাও তার খরচা।

খরচা লইয়া মনোরম 'তার' করিতে চলিয়া গেল।

"দেশলক্ষ্মী"র সহকারী সম্পাদক প্রিয়বাবুর সভাপতিত্বে এবং সৌষ্ঠবে পরিপূর্ণ হইয়া শোকসভা সুসম্পন্ন হইল। সভাপতি খানিক অনুমান, খানিক প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন...বক্তাগণ মৃত মহাত্মার পটের দিকে তাকাইয়া, মৃত মহাত্মার উদ্দেশে বাক্য-পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন—স্মৃতির প্রতি অভাবনীয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন—আত্মার সদ্গতি কল্যাণ কামনা করিলেন পুনঃ পুনঃ—শোককে প্রেমে মণ্ডিত করিয়া স্বর্গের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন...স্বর্গ মর্ত্ত্য সুরঞ্জিত আর একীভূত হইয়া সেই শোকসভায় ব্যঞ্জনা লাভ করিল... এবং একটি যুবক সুকণ্ঠে একটি গান গাহিল—তাহাতে ক্রন্দনের ভিতর দিয়া দেশের মনোভাবের সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট, নিবিড় এবং গুরুচ্চারিত বিবরণ পাওয়া গেল, এবং তাহা এমনই মর্ম্মস্পর্শী হইল যে, বেগার খাটিয়ে সভাপতি ছাড়া আর সকলেই চোখ মুছিলেন।

অসাধারণ ব্যক্তির মহাপ্রয়াণে এই সভা নিদারুণ মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছে: মনোরমের এই প্রস্তাব গৃহীত হইল; আরও স্থির হইল: শ্যামধন-লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া মৃত মহাপুরুষের পুণ্য স্মৃতি অবিনশ্বর করা হইবে···

মনোরম নিজে যাচিয়া পুস্তকসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিল।

সভাপতি মহাশয় তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, মৃত মহাত্মার কর্ম্মমহিমা আর শুভ প্রেরণা এই সমুদয় যুবকের ভিতর দিয়াই ক্রিয়াশীল হইয়াছে, এবং সেই ক্রিয়াশীলতা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইবে।

শুনিয়া মনোরম বিনয়ে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

শ্যামধন আচার্য্যের স্মৃতি অমর করিবার আয়োজন অবাধে চলিতে থাকুক্—মনোরম সে-কাজের কর্ত্তা হইয়াছে; কিন্তু শ্যামধনের চরিত্রের আর কার্য্যকলাপের যে ব্যাখ্যা এবং স্বীকৃতি বক্তৃতায় ব্যক্ত এবং ব্যক্তিত্বের যে ব্যাখ্যা কলরোলে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে—তাহা কতকটা কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাতঃকালের মত, তাহাতে সমগ্রতা কিছু পাওয়া যায় নাই—চোখে পড়ে নাই। বক্তৃতা প্রভৃতির ভিতর ইহা একবিন্দুও পাওয়া গেল না যে, শ্যামধন মনে মনে সুখী ছিলেন, কি দুঃখী ছিলেন;—কোনকালে কৃত কোন কর্ম্মের জন্য তাঁর প্রাণে অনুতাপ ছিল, কি ছিল না। টাকা যে ভোগ করিয়া গেছে, টাকার আলোর ভিতর দিয়া তার দিকে তাকাইতে যাইয়া চোখে ধাঁধা লাগিয়া সে-সব কেহ দেখিতে পায় না—দেখিবার চেষ্টাও কেহ করে না, বৃথা হইবে মনে করিয়া।

সুনীতিবাবু টাকা না দিলে কতদূর কি হইত বলা যায় না, কিন্তু তিনিই ব্যয়বরাদ্দের অধিকাংশ দিতে সম্মত হওয়ায় শ্যামধন-স্মৃতি পাঠাগারের জন্য গৃহনির্ম্মাণ সুরু হইয়া গেল।

শ্যামধনের স্মৃতিচিহ্ন লইয়া এই আলোড়ন অসাধারণ বটে; কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাকেও অসামান্য না বলিলে চলে না। শ্যামধনের জীবনের সেই ঘটনাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহারই প্রতিবেশী পার্ব্বতীচরণ।

মধ্যবিত্ত অবস্থা বলিতে আজকাল মানুষের যে অবস্থাটা বুঝাইতেছে, তাহা শোচনীয়। ধুতি-পিরাণ পরিহিত লোক, লেখাপড়া কম, কি বেশী শিক্ষা করিবার সুযোগ হইয়াছে, শাকান্নের উপর ক্বচিৎ কখনও মাছের টুকরা জোটে—এঁরাই মধ্যবিত্ত লোক বলিয়া পরিচিত হইয়া আছেন। কিন্তু ইহার নীচের স্তরেও মধ্যবিত্ত লোক আছেন—লজ্জাকর দারিদ্র্যের উপর পোষাকী বহিরাবরণের মত কেবল ঐ শব্দটার অভ্যন্তরে তাঁহারা নিরন্ন দুর্গতির চরম অবস্থায় পৌঁছিয়া দিনাতিপাত করেন।

কিন্তু একদিন এমন ছিল, যখন মধ্যবিত্ত লোক বলিতে এমন লোককে বুঝাইত, যাহার গৃহে অপর্য্যাপ্ত অন্ন সত্যই ছিল—এবং উদ্বৃত্ত অন্ন তাঁরা বিতরণ করিতেন......এমন লোককেও লোকে মধ্যবিত্তই বলিত—যার খাইয়া পরিয়া দু'দশ টাকা অপব্যয় করিয়া, অতিথিসৎকার, তীর্থ ও মুক্তহস্তে দান করিয়া এবং জমিদারের খাজনা মিটাইয়া দিয়াও ঢের টাকা বাঁচিত।

শ্যামধনের পিতা এবং পার্ব্বতীচরণের পিতা ছিলেন এমনিধারা মধ্যবিত্ত লোক এবং উভয়ে বন্ধু ছিলেন।......কিন্তু ক্রমশঃ অবস্থা দাঁড়াইল ভারী খারাপ। শ্যামধন আর পার্ব্বতীচরণের মধ্যবিত্ত বিশেষণাদি ঘুচিল না, কিন্তু আর সব ঘুচিয়া তাঁরা ঋণে এবং অভাবে জর্জ্জর হইয়া গেলেন।

পার্ব্বতীচরণের অবস্থাই হইল আরও খারাপ, দিন চলে না মত, এবং গ্রাম ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন তিনিই আগে—তিনিই পথ দেখাইলেন। সম্পত্তি কিছু নীলামে পড়িয়া হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল, কিছু তিনি বিক্রয় করিলেন, এবং ভূমি-সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যবস্থা যা' আছে, তাহাই করিয়া দিয়া সেই টাকা লইয়া পার্ব্বতীচরণ আসিয়া বাসা করিলেন গোপালপুরে। গোপালপুর ক্ষুদ্র স্থান এবং সহর জায়গা।

মানুষের দুঃখ ঢের, তার ভাবনাও অনেক। পার্ব্বতীচরণেরও তা-ই—তাঁর দুঃখ ঢের, ভাবনাও অনেক।

পার্ব্বতীচরণ কেবল অন্নাভাবের তাড়নায় পল্লীভবন ত্যাগ করিলেন না—ত্যাগ করিবার কারণ আরও অনেক ছিল। মানুষ প্রকাশ্যভাবে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব

পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে চায়, ইহা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু মনে মনে সে-ইচ্ছা তার থাকে—তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি সে কামনা করে—বংশপ্রদীপ নাম লইতে চায়। নিজের উন্নতি প্রতিপত্তিতে পূর্ব্বপুরুষের সম্মান বাড়ে বলিয়া তার বিশ্বাস। কিন্তু এটা এখন প্রায়ই ঘটে না—ঘটে তার বিপরীত, এবং তা' অসম্মানজনক। পূর্ব্ব-পুরুষের সচ্ছল উদার অবস্থার সাক্ষী যারা, তাদের সম্মুখে দুঃস্থ আর সঙ্কীর্ণ দশায় দিন যাপন সেই অধঃপতন, নিত্য নৈমিত্তিক সম্ভ্রমহানি আর গ্লানির হেতু—মাথা হেঁট হইয়া থাকে।

তারপর মেয়েরা—

বড় মেয়েটি বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে প্রায়—তার পরে আরও দু'টি বাড়িতেছে। বড় বড় মেয়ে লইয়া অরক্ষিত গ্রামে বাস করা একরকম ভয়ের কথাই হইয়া উঠিয়াছে।

কাজেই পার্ব্বতীচরণ সর্ব্বস্ব লইয়া গোপালপুরে উঠিয়া আসিলেন—কিছু চেষ্টার পর মাসে ত্রিশ বত্রিশ টাকা আয়ের একটি মুহুরিগিরি তিনি পাইয়া গেলেন......

মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, বা পার্ব্বতী-চরণ আনিতে লাগিলেন।

উকিলের বাসাতেই বসিয়া পার্ব্বতীচরণ একদিন সকালের ডাকে দু'খানা পত্র পাইলেন। দু'খানা পত্রই সুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে—পার্ব্বতীচরণের মনে হইল, আজ তাঁর সুপ্রভাত।

পত্রদ্বয়ের একখানি লিখিয়াছেন প্রমোদবাবু, যাঁহার পুত্রের সহিত পার্ব্বতীচরণের কন্যার বিবাহের কথা চলিতেছে—এবং যিনি দিন দশেক আগে যূথিকাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন, এবং ফটো লইয়া গিয়াছিলেন। এই পত্রখানির জন্য পার্ব্বতীচরণের ভারী উৎকণ্ঠা ছিল।

দ্বিতীয়খানি লিখিয়াছেন শ্যামধন আচার্য্য—পার্ব্বতীচরণের বন্ধু।

পার্ব্বতীচরণ পত্র দু'খানি হাতে করিয়া হাসিমুখে বাসায় আসিলেন—

স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, পছন্দ হয়েছে।

যূথিকা বাপের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল—পছন্দ হইবার সংবাদে সে ঘুরিয়া বসিল।

পদ্মিনী বলিলেন, চিঠি এল? আর কি লিখেছে?

—লিখেছে টাকার কথা, আর বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটলে ভবিষ্যৎ আনন্দের কথা।

—চেয়েছে কত?

—বারশ' নগদ্, ছ'শ' টাকার গয়না—

পদ্মিনী বলিয়া উঠিলেন, বাবা!

—আর ঘড়ি, চেন প্রভৃতি। তার ভালমন্দের বিচার আমাকেই করতে বলেছে।

—কি করবে?

—রাজী হব। ছেলেটা ভাল।

—ও চিঠি কার?

—শ্যামধনের। ভারী বিপদ্ তার।

—সে কি! ভাল আছে ত' সবাই?

যূথিকা পুনরায় ঘুরিয়া বসিয়া বাপের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল···

পার্ব্বতীচরণ বলিলেন, ভাল তেমন নেই। ভারী ম্যালেরিয়ায় ধরেছে, আর খাজনা-পত্র আদায় মোটেই নেই। চাইলে লোকে মারতে উঠ্‌ছে। এখানে আস্‌তে চায়।

যূথিকা ভারী খুশী হইয়া উঠিল, বলিল, লিখে দাও, বাবা, আস্‌তে।

—হ্যাঁ। বাসা ঠিক করতেই লিখেছে।

যূথিকাই পুনরায় বলিল, পাশের বাড়ীটাই ঠিক করে' দাও। বেশ পাকা বাড়ী।

পার্ব্বতীচরণের মনটা সাদা, আর ভীরু। শ্যামধন গোপালপুরে আসিতে চাহিয়াছেন, আসিতে বাধ্যই হইয়াছেন—ইহার কারণটা যতই দুঃখপ্রদ হোক্, পার্ব্বতী-চরণ তাহাতে যেন আসান্ পাইলেন। নিজের গ্রামের মত স্থানটা নয়—নিজের গ্রাম বিশেষ পরিচিত আর বহুকালের মায়ায় জড়িত বলিয়া বিস্তীর্ণ; কিন্তু সহর সঙ্কীর্ণ—একান্ত আপনার বলিতে এখানে কেহই নাই, কিছুই নাই। এখানে একটা অনুদারতার মাঝে যেন হৃদয়কে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে হয়।

শ্যামধন আসিলে তাঁর এই ক্লেশটা ঘুচিবে।

প্রমোদবাবুকে তিনি পত্র দিলেন সম্মত হইয়া—শ্যামধনকে তিনি পত্র দিলেন উৎসাহী হইয়া। লিখিলেন, কালবিলম্ব না করিয়া এখানে চলিয়া আসিবে। এখানকার স্বাস্থ্য এখন ভালই চলিতেছে। সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করিয়া আসিবে; কিম্বা তাহা পরে করিলেও চলিবে। এখানে ভাল কবিরাজ এবং ডাক্তার কয়েকটিই আছেন—তাঁহারা নির্ভরযোগ্য। আমার বাসার পাশেই পাকা একটা বাড়ী চৌদ্দ টাকায় ভাড়া ঠিক্ করিয়াছি। তুমি অযথা বিলম্ব করিবে না। শুনিয়া সুখী হইবে যে, যুথিকার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেছে; সাক্ষাতে বিস্তারিত শুনিবে। তোমার থাকিবার কোনই অসুবিধা এখানে হইবে না; এবং আশা করি, শ্রীমানেরা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবে। যুথিকার বিবাহের সময়ে তোমরা উপস্থিত থাকিবে, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়!...

সুতরাং শ্যামধন ম্যালেরিয়ার রোগীগুলিকে লইয়া গোপালপুরের সেই বাসা বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।—

পার্ব্বতীচরণের গৃহে সেই উপলক্ষে ভারী উৎসব লাগিয়া গেল ..শ্যামধনের এবং তাঁর স্ত্রীর সন্দেহভঞ্জন আর সুখ-তল্লাসের আর আদর আপ্যায়ন আর তাঁর গৃহে ইহাদের যাতায়াতের অন্ত রহিল না।

এদিকেও সুখ—

যুথিকার বিবাহ প্রমোদবাবুর কৃতী পুত্র ব্রজরাজের সঙ্গে হইবেই—তাঁহারা দেড় শত টাকা বায়না লইয়াছেন।

বিবাহের মত খরচ খরচার, আয়োজন মজুতের আর সাবধানতার প্রকাণ্ড একটা ব্যাপারে শ্যামধনই হইয়াছেন কর্ত্তা—শ্যামধন নিজে যাচিয়া হন নাই, পার্ব্বতীচরণ তাঁকে করিয়া তুলিয়াছেন, যেন শ্যামধন অগ্রজ, তিনি অনুজ। উভয় পরিবারের মধ্যে অনাদি কালের প্রেমে আর বাধ্য-বাধ্যকতায় ভাবগত অগ্রজ-অনুজ সম্পর্কটাই দাঁড়াইয়া গেছে। তা' ভাবিতেও সুখ।

যুথিকার বিবাহ হইবে—

বিবাহের প্রাক্কালে বয়ঃস্থা কুমারীর মন কোন্ দিকে ধাবিত হয়, আর কত দ্রুত বিকশিত হইয়া উঠে, তাহা বলা দুষ্কর—দুঃসাহসেরই কাজ। কিন্তু যুথিকাকে দেখিয়া মনে হয়, সে যেন খানিক বাড়িয়া গেছে। শ্রী ও লাবণ্য তার বাড়িয়াছে—এ বিষয়ে প্রশ্নই নাই; তার দেহও যেন আয়তনে বাড়িয়াছে, যেমন আয়তনে বাড়ে ধীরে ধীরে উত্তাপ দিলে পরিপক্ক ফলটি—ভিতরের রস অসহিষ্ণু বিস্তৃত হইয়া মর্ম্মটিকে যেন ত্বকের উপর প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে...

যুথিকার বোনেরা তা' লক্ষ্য করিয়া ভারী ঠাট্টা করিতেছে···তার মা তাহাতে মুখ ফিরাইয়া হাসেন—জেঠিমা-ও, অর্থাৎ শ্যামধনের স্ত্রী-ও, তা-ই—মুখ ফিরাইয়া হাসেন।·· পুলক বেশ জমিয়া আছে···

কিন্তু এদিকে পার্ব্বতীচরণের দিশেহারা ব্যতিব্যস্ততার সীমা নাই। ক্ষণে ক্ষণে যাইয়া তিনি ডাকিতেছেন: দাদা?

—কি? শ্যামধনেরও সাড়া দিতে বিলম্ব হয় না, আলস্যও নাই।

—তুমি দেখ' দাদা, তোমার ওপরেই সব ভার। দেখ' যেন অপ্রস্তুতে না পড়ি।···পাঁচটা টাকা দাও দিকি।

—দিই। বলিয়া শ্যামধন টাকা আনিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করেন, কি হবে?

—ময়রা, গয়লা এদের সব বায়না দিয়ে দিয়েছি—আপদ্ চুকেছে। মেটে' গেলাস আর কাঁচা তরকারীর বায়নাটা দিয়ে আসি।

—যাও, দিয়ে এস।

এম্‌নি করিয়া সব গুছান' প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অন্ততঃ শ' তিনেক লোক খাইবে—বরযাত্রী আসিবে জন পনর'—বাসাবাড়ী হইবে শ্যামধনের বাসার বাইরের ঘরটা—ঘরটা বড়ই।···আসল কথা যে টাকা, তাহাও সংগৃহীত হইয়া আছে। কিন্তু মানুষের ভেল্‌কী মনে হয় এই-খানেই। সামান্য ব্যক্তি পার্ব্বতীচরণ, নগদ টাকায় আর অলঙ্কারে প্রায় হাজার তিনেক টাকা সংগ্রহ করিল কেমন করিয়া? পিতামহের আমলের গিনি ছিল কয়েকটি, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিল, শ্বশুর ও শ্যালক কিছু দিয়াছেন, মামা দিয়াছেন যৎকিঞ্চিৎ, কয়েকটি বন্ধুর নিকট হইতে

কিছু কিছু লইয়াছে—স্ত্রীর অলঙ্কার প্রায়ই ব্যাঙ্কে দিয়া আসিয়াছে…

এম্‌নি করিয়া টাকাটার যোগাড় করা হইয়াছে।

শ্যামধনও পরিশ্রম করিতেছেন বিস্তর—সেদিকে তাঁহাকে বাহবা দিতেই হইবে। পার্ব্বতীচরণ কৃতার্থতা জ্ঞাপন করিতে কেবলি তাঁর হাত জড়াইয়া ধরিতেছেন।

আর দু'দিন মাত্র বাকি—চঞ্চলতা খুব, উল্লাস ধরিতেছে না।

হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল প্রমোদবাবুর প্রেরিত লোক। প্রমোদবাবু বিশেষ অবস্থাপন্ন লোক নন, কিন্তু ছেলেটি ভাল। সুতরাং পণ তিনি বেশীই চাহিয়াছিলেন এবং যথাসময়ে পাইবেনও; কিন্তু তিনি লোক পাঠাইয়া পত্র দিয়া কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিয়াছেন যে, অগ্রিম যে দেড়শত টাকা তিনি পূর্ব্বেই পাইয়াছেন—তাহার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ, বৈবাহিকের সহৃদয়তা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু আরও তিনশত টাকা এই লোক মারফৎ তাঁর না পাইলেই নয়—দৈবাৎ অন্য একটা ব্যাপারে তিনি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন; দায়গ্রস্ত বৈবাহিকের সম্ভ্রম-রক্ষার্থে বৈবাহিক নিশ্চয়ই সাহায্য প্রেরণ করিবেন। বৈবাহিক যেন যথারীতি রসিদ লইয়া টাকা দেন, কারণ, টাকাকড়ির ব্যাপারে যা' দস্তুর তা' করিতেই হইবে।

পত্র পড়িয়া পার্ব্বতীচরণ কিছুই অন্যায় মনে করিলেন না—দু'দিন বাদেই দিতে হইত, তা' না হইয়া দু'দিন আগেই লইবে। ইহাতে ভদ্রলোকটি এত কুণ্ঠিত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন কেন? বলিলেন,—নিশ্চয়ই দেব। পাওয়া তাঁর হক্। আসুন দি' গিয়ে।

—চলুন। বলিয়া পত্রবাহক উঠিলেন।

—দাদা?

—কে?

সাড়া দিল শ্যামধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র পঙ্কজ। পার্ব্বতীচরণ বলিলেন, তোর বাবা কই রে?

—বাবা ত' বাড়ীতে নেই। বলিতে বলিতে পঙ্কজ আসিয়া জানালায় মুখ দিয়া দাঁড়াইল।

—কোথায় গেছে বল্‌তে পারিস্ নে?

—না।

পার্ব্বতীচরণ কুণ্ঠিত হইয়া আগন্তুককে বলিলেন, তরে একটু অপেক্ষা করতে হ'ল যে! ও বেলা পেলে হবে না?

—তা' হবে। সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাব। ইনি কে, যাঁকে আপনি দাদা বলে' ডাকলেন?

এক গ্রামেই বাস আমাদের অনেক পুরুষ থেকে। আমার সহোদরের মত।

পার্ব্বতীচরণের হৃদয় অকপটে উদ্ঘাটিত হইল তাঁর কথার বিগলিত সুরে; বুঝা গেল, সহোদরতুল্য দাদাটিকে তিনি জড়াইয়া ধরিয়া আছেন—দাদা অপরিহার্য্য; সুতরাং ভদ্রলোক সহজেই অনুমান করিয়া লইলেন—এই দাদার পরামর্শ না লইয়া টাকা ইনি হাতছাড়া করিবেন না।

বিবাহ-সম্পর্কীয় কথায়, আনন্দপ্রকাশে, দম্পতির সুখ-কামনায়, ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়া তাহা পরস্পরকে দেখাইয়া ইঁহাদের দ্বিপ্রহরটা কাটিল ভাল—আহারও হইল যথোচিত। কুটুম্ব পক্ষের লোক অনুগ্রহপূর্ব্বক শুভাগমন করিয়াছেন—দধি, মিষ্টান্ন, মোটা মাছ আসিবেই।

কিন্তু বৈকালেও শ্যামধনের দেখা পাওয়া গেল না—

বিনয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, দাদার সঙ্গে পরামর্শ করা আপনার হল না। তবু বিশ্বাস করে' টাকাটা দিলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

পার্ব্বতীচরণ দাঁতে জিব্ কাটিলেন—

বলিলেন,—ছি, ছি, রাম, রাম। অবিশ্বাস করছি ভেবেছেন? না, না, তা' নয়। বলিয়া পার্ব্বতীচরণ খানিক ঘাড় ঝাঁকাইয়া, তারপর বলিলেন,—তবে কথা এই যে, টাকা সব এঁরই কাছে রেখে দিয়েছি। আমার ভাঙা টিনের বাড়ী—অতগুলো টাকা সেখানে রাখা চলে না।

বিনয়বাবু বলিলেন,—তবে রাতটা এখানেই কাটাতে হ'ল দেখ্‌ছি।

—সৌভাগ্য আমার। বলিয়া পার্ব্বতীচরণ টাকাটা এবারেও দিতে না পারার চক্ষু লজ্জায় আরও কুণ্ঠিত হইয়া এবং বিনয়বাবুর তাঁহারই গৃহে দিবা-যাপনের পরও রাত্রি-যাপনের আনন্দে আরও অভিভূত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন…

কিন্তু শ্যামধন ফিরিয়াছিলেন বছর বার পরে—অনেক কিছু ঘটিবার পর—যুথিকার আত্মহত্যার পর, পার্ব্বতীর অপর দু'টী কন্যার মাতুলালয়ে আশ্রয়-গ্রহণের পর, পদ্মিনীর পক্ষাঘাতে শয্যাশায়িনী হইবার পর, এবং পার্ব্বতীচরণের ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুর পর।

যিশুর জন্ম-ক্ষেত্রে

(ভ্রমণ-কথা)

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলী মহিমময়ী মথুরা, রামচন্দ্রের জন্মভূমি অগণিত-জন-গণ-পূজিতা অযোধ্যা দর্শন করিয়াছিলাম। হিমাচলের পাদ-মূলে অবস্থিতা বুদ্ধের জন্মস্থলী দর্শনের সৌভাগ্যও ঘটিয়াছিল। জৈন ধর্ম্ম-প্রচারক মহাবীর স্বামী যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই পুণ্যস্থানও একদিন দেখিয়াছিলাম। যাহাদিগকে বঙ্গের বৃন্দাবন ও অযোধ্যা বলা চলে, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি সেই নবদ্বীপ ও কামারপুকুরের পবিত্র ধূলি মস্তকে লইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। জানিতাম, অ-মুসলমানের পক্ষে হজরৎ মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা নিষিদ্ধ ও নিরাপদ্ নহে, সুতরাং সে বিষয়ে কোন চেষ্টা কোন দিন করা হয় নাই। মহর্ষি ঈশার জন্ম-ক্ষেত্র দর্শন করিয়া ধন্য হইবার বাসনা বহুদিন হইতে ছিল। কয়েক জন তীর্থ-দর্শনার্থী খৃষ্টান বন্ধুর সংসর্গ ও সহৃদয়তা আমার সেই চিরপোষিত বাসনাও পূর্ণ করিল।

এই স্থানে বলা প্রয়োজন, আমরা ভারতবর্ষ হইতে মিশরে গমন করিয়াছিলাম এবং কয়েক দিন তথায় থাকিয়া প্রাচীন মিশরের অতুলনীয় কীর্ত্তিসমূহ পরিদর্শনের পর প্যালেষ্টাইনে গিয়াছিলাম। আমরা ট্রেণ হইতে নামিয়া মোটরযোগে যিশুর জন্মস্থান বেথলেহেমের দিকে যাত্রা করিয়াছিলাম।

পথের দুইধারে ইহুদীদের উপনিবেশ। প্রাচীনকালের স্মৃতি উদ্রিক্ত করিলেও, বাড়ীগুলি আধুনিক ধরণের। ফাল্গুন মাস, কিন্তু প্যালেষ্টাইনের পর্ব্বতে প্রান্তরে শুভ্র-তুষার তখনও শোভা পাইতেছে। বেগে বহমান তুষার-শীতল বাতাস জানাইতেছে, এদেশে বসন্ত এখনও আসে নাই। আমরা হেব্রনে পৌছিয়া তথাকার দর্শনীয়গুলি দেখিবার জন্য মোটর হইতে নামিলাম। ইহা ইহুদীদের অন্যতম মহাতীর্থ; ওল্ড টেষ্টামেন্টে বর্ণিত বহু বিচিত্র ঘটনা এই সকল স্থানে ঘটিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান, এই তিন সম্প্রদায়ই ইহাকে নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়া আপন আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিয়াছে।

আমরা ওল্ড টেষ্টামেণ্ট হইতে জানিতে পারি—ইহুদী-গোষ্ঠীপতি আব্রাহাম পত্নী সারার সমাধির জন্য ম্যাকপেলাহ-গুহা ক্রয় করেন। ঐ গুহার উপর মুসলমানগণ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মস্‌জিদে অ-মুসলমান-গণও প্রবেশ করিতে পারেন। অনেকেই জানেন, ইহুদী গোষ্ঠীপতি আব্রাহাম ইব্রাহিম আখ্যায় অন্যতম পয়গম্বর-রূপে মুসলমানদের দ্বারাও সম্মানিত। ইহুদী প্রফেট মাত্রই মুসলমানদের নিকট মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য। শুধু হিব্রু নামগুলি আরবীয় ভাষায় প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহুদীরা ঈশাকে মানেন না। কিন্তু ইস্‌লাম তাঁহাকে প্রাচীন পয়গম্বর বা প্রফেটদের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করেন। পার্থক্যের মধ্যে খৃষ্টানরা ঈশাকেই ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু মুসললানদের মতে ঈশা ত্রাণকর্ত্তা নহেন, সর্ব্বশেষ পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদই মানব-জাতির একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বা মুক্তিদাতা।

ম্যাকপেলাহ-গুহার উপর স্থাপিত যে মস্‌জিদের কথা আমরা কহিয়াছি, উহার রক্ষক শেখটি সহৃদয় ব্যক্তি। তিনি আমাদিগকে ভদ্রতা-সহকারে প্রত্যেক দ্রষ্টব্য দেখাইলেন। আব্রাহাম ও সারা, আইজাক ও রেবেকা এবং যেকব ও লীয়ার সমাধি-বেদী আমরা দেখিতে পাইলাম। সমাধি-বেদীগুলি সবুজ রঙের রেশমী আচ্ছাদনীয় দ্বারা আচ্ছাদিত। যোসেফের সমাধি পার্শ্ববর্ত্তী একটি গৃহে বিদ্যমান। র‍্যাচেলের সমাধি জেরুজালেম ও হেব্রনের মধ্যবর্ত্তী একটি স্থানে এবং গুম্বজ-মণ্ডিত সুদৃশ্য একটি গৃহে বিরাজিত।

অতি প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধনামা প্রফেট বা পয়গম্বরদের এবং তাঁহাদিগের পতিব্রতা পত্নীগণের সমাধি-দর্শনের পর আমরা "পুল অফ ডেভিড" বা দায়ুদের জলাশয় দেখিলাম।

ইহা এহটি বৃহৎ সম-দ্বিভুজ জলাশয়। কতকগুলি প্রাচীন ভবন ইহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান। ইহার পর "ওক অফ্ মাম্রে" (Oak of Mamre) আখ্যায় অভিহিত প্রাচীন ওক-বৃক্ষ দর্শনের জন্য হেব্রন হইতে কয়েক মাইল দূরে গমন করিলাম। এই প্রাচীন ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেরূপ সুস্থ, সবল, ও সবুজ দেহে দণ্ডায়মান, তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। এই বৃক্ষের বয়স কয়েক শত বৎসরের বেশী কি না, সে বিষয়ে অনেকের মনে সংশয় জাগিতে পারে। তবে আমরা জিজ্ঞাসার দ্বারা যাহা জানিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, সাধারণের ধারণা, ইহা চির-শ্যাম মূর্ত্তিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। এই অতি পুরাতন বৃক্ষের ফলদা শক্তি এখনও নষ্ট হয় নাই—ইহা অন্যতম বিস্ময়ের বিষয়। সাধারণের বিশ্বাস এই বৃক্ষের নীচে আব্রাহাম তাঁহার বস্ত্রাবাস বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

ওক-বৃক্ষটিকে রেলিংএর দ্বারা ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। বৃক্ষটি দেখিবার পূর্ব্বে পথে একটি গ্রীক মঠ আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম। মঠটি একটি ছোট পাহাড়ের উপর আঁকা ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে। এই পাহাড় এবং পথের মধ্যস্থলে একটি নয়ন-রঞ্জন মঞ্জুল সাইপ্রেস কুঞ্জ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ সাইপ্রেস-কুঞ্জের পরেই রেলিং-ঘেরা প্রকাণ্ড ওক গাছটি যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি বহন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

সেই পবিত্র পাদপ পরিদর্শনের পর আমরা যিশুর জন্ম-পল্লী বেথলেহেমে * গমন করিলাম। প্যালেষ্টাইনের বক্ষে লুক্কায়িত একটি নগণ্য গ্রাম আজ মানবজাতির পুণ্যতম তীর্থসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য। এই তীর্থ দর্শন করিয়া ধন্য হইবার জন্য অগণ্য নরনারী সম্ভ্রম-নতশীর্ষে আগমন করিয়া থাকে। এক দরিদ্র সূত্রধর-পুত্র যেখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইউরোপের দম্ভ-দৃপ্ত বিশ্ব-বিজয়ী জাতিবৃন্দ তথায় ধূলি-বিলুণ্ঠিত মস্তকে করযোড়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে। ইহার দ্বারা এই মহাসত্য তারস্বরে ঘোষিত হইতেছে—পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি যতই উচ্চ হউক, ধর্ম্মের নিকট তাহা নিতান্ত তুচ্ছ।

যে যুগান্তরানয়নকারী স্থানটীতে মহর্ষি ঈশা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তথায় পৃথিবী-প্রসিদ্ধ গীর্জ্জা-গৃহ "চার্চ্চ অফ্ দি নেটিভিটি" নির্ম্মিত হইয়াছে। এই উপাসনাগৃহ একটি গুহার উপর স্থাপিত। ঐ গুহা-বক্ষে মহর্ষি ঈশা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। পুরাতন-পন্থী গ্রীকগণের হস্তে এই গীর্জ্জা-গৃহের অধিকার বা তত্ত্বাবধান-ভার অর্পিত আছে। তবে আর্ম্মেনিয়ান ও রোমানরাজ দেখাশুনা করেন বলিয়া আমরা জানিতে পারিলাম। তত্ত্বাবধায়ক জাতিত্রয়ের স্থাপিত বিভিন্ন প্রার্থনা-গৃহ এখানে দেখা যায়। গীর্জ্জা-গৃহের পূর্ব্বাংশের কেন্দ্রস্থলে যে বিশাল উপাসনা-বেদী দৃষ্ট হয়, উহা গ্রীকগণের। এই উপাসনা-বেদী রৌপ্য-রচিত দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া বিশেষ মনোরম। উত্তরাংশে আর্ম্মেনিয়ানদের উপাসনা-বেদী। এই উপাসনা-স্থানের পার্শ্বে একটি দ্বার দৃষ্ট হয়। এই দ্বার দিয়া রোমানদের প্রার্থনা-স্থানে যাওয়া চলে। নিম্নে অবস্থিত গুহা-গৃহের মন্দিরে যাইবার জন্য তিনটি প্রার্থনাগারের পার্শ্বেই পথ দেখা যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গুহাটিকেই যিশুর জন্মস্থান বলিয়া মনে করা হয়।

যিশুর আবির্ভাবের স্থান ঐ কন্দর-মন্দিরে একটি অনুচ্চ বেদী দৃষ্ট হয়। এই বেদীর চারিদিকে দীপমালা শোভা পাইতেছে। ছয় প্রকার বর্ণ-বিশিষ্ট আরও কতক-গুলি আলোকাধার বেদীর নিম্নে অবস্থিত একটি মর্ম্মর-নির্ম্মিত স্থানে রক্ষিত রহিয়াছে। যে স্থানটিতে ঈশা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তথায় রজত-রচিত একটি তারকা-চিহ্ন বিদ্যমান। ঐ অনুচ্চ বেদীর পশ্চিমে একটি সঙ্কীর্ণ প্রার্থনা-স্থান বর্ত্তমান। অনেকগুলি পর্দ্দা ও প্রদীপ তথায় ঝুলিতেছে।

এই কন্দরমন্দিরকে বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত করিবার প্রস্তাবের ফলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তুমুল সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। এমন কি রক্তপাত

* যিশুর জন্ম-স্থান সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা আছে। Ernest Renau-এর মতে "Jesus was born at Nazareth, a small town of Galilee, which before his time had no celebrity. All his life he was designated by the name of "the Nazarene", and it is only by a rather embarrassed and round-about way, that in the legends respecting him, he is made to be born at Bethlehem" —প্রঃ সম্পাদক।

পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। সেই ঘটনার পর পুলিস পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিস্ময় ও বেদনার বিষয়—ঠিক বড়দিনের সময়ে সেই সঙ্কট সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যিনি উদার প্রেম-মন্ত্র-প্রচারের জন্য সংসারে আসিয়াছিলেন, তাঁহার জন্মদিন ও জন্মস্থানকে প্রচণ্ড হিংসার পরিচায়ক রক্তপাতের দ্বারা কলঙ্কিত করিতে যাহারা কুণ্ঠাবোধ করে নাই, তাহারা শুধু নামেই খৃষ্টান, খৃষ্ট-প্রচারিত শিক্ষা-দীক্ষার সহিত তাহাদের সত্য সম্বন্ধ কখনই নাই।

আমরা জেরুজালেমে গমন করিয়া বিখ্যাতনামা "চার্চ্চ অফ্ দি হোলি সেপালকার" দর্শন করিলাম। তখন ঐ চার্চ্চের প্রার্থনা-গৃহে বিশেষ উপাসনা চলিতেছিল। খৃষ্টান বন্ধুগণ ঐ উপাসনায় যোগদান করিলেন। এই বিশাল গীর্জ্জা-গৃহে গ্রীক, রোমান, আর্ম্মেনিয়ান, সিরিয়ান, এবং কপ্ট—এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনাগার রহিয়াছে। মিশরীয় খৃষ্টানগণ "কপ্ট" নামে অভিহিত। এই সময়ে যুগপৎ সকল সম্প্রদায়ের দ্বারা উপাসনা অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এই সকল অনুষ্ঠানের সহিত আমাদিগের পূজার্চ্চনার সাদৃশ্য বিদ্যমান। যেমন আমাদিগের পূজার প্রধান উপকরণ ধূপ, দীপ ও গঙ্গাজল, তেমনই ইন্‌সেন্স ও হোলি ওয়াটার না হইলে, তাহাদের অর্চ্চনাও সম্পন্ন হয় না। পূজা-বেদীর পার্শ্বে দীপমালা তাহারাও জালিয়া থাকে।

যেমন বেথলেহেমের "চার্চ্চ অফ্ নেটিভিটি" যিশুর জন্মস্থানে স্থাপিত, তেমনই জেরুজালেমের "চার্চ্চ অফ্ দি হোলি সেপালকার" যিশুর তিরোধান-স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এই স্থান হইতে হোলি ওয়াটার বা পবিত্র বারি চার্চ্চের অন্যান্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। মহর্ষি ঈশার ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া মহাপ্রস্থানের স্থানে "চাপেল অফ্ কালভারি" নামক প্রার্থনাগার অবস্থিত। খৃষ্টান ধর্ম্মের মৃত্যু-বিজয়ী পবিত্রতম প্রতীক ক্রুশ এই স্থানে প্রোথিত রহিয়াছে। গুরু-গম্ভীর গুম্বজের নিম্নে "হোলি সেপালকার" বা পরম পবিত্র সমাধি বিরাজমান।

নানা দেশ হইতে শত শত উপাসক আসিয়া উপাসনায় যোগদানপূর্ব্বক সমগ্র গীর্জ্জা গৃহকে উচ্চ কোলাহলে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। দর্শক ও ভ্রমণকারীর সংখ্যা ত' কম নহে। আমিও একজন দর্শক ও ভ্রমণকারী। কার্য্যতঃ, উপাসনায় যোগ না দিলেও, উপাসনার ভাব আমার অন্তরে সঞ্চারিত হয় নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। দর্শকদলের সহিত দূরে দাঁড়াইয়া আমিও সসম্ভ্রমে মহর্ষি ঈশার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলাম। আমার বন্ধুবর্গ এক একটি বাতি হাতে করিয়া যেভাবে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনে আমাদিগের এবং বুদ্ধবাদের অনুষ্ঠানসমূহের স্মৃতি জাগরূক হইতেছিল।

সেই সমারোহ বা আড়ম্বরকে মহর্ষি ঈশার অতি-বিনীত সাধুতাপূর্ণ সাদাসিধা জীবনের সহিত খাপ-ছাড়া বা সামঞ্জস্যশূন্য বলিয়া মনে হইতেছিল। রত্নমণ্ডিত উপাসনা-বেদী ঐশ্বর্য্যের বার্ত্তাই বহন করিতেছিল। সমস্বরে গীত, ঐকতান সঙ্গীত অন্তরতন্ত্রীকে বিচিত্র সুরে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতেছিল। বিরাট্ বন্দনাগানে স্পন্দিত সেই মহান্ মন্দিরে দাঁড়াইয়া রোমান ক্যাথলিক মতবাদের অনুমোদিত অনুষ্ঠানসমূহের সহিত তিব্বতীয় লামাবাদের ক্রিয়া-কলাপের বিস্ময়কর সাদৃশ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সমারোহ-সহকারে সম্পাদিত শোভাযাত্রার পশ্চাতে গমন করিতে করিতে যখন দেখিলাম, সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের আশঙ্কায় পুলিসের সাহায্যে শোভাযাত্রীদিগকে সংযত রাখিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে, তখন সমগ্র অন্তর বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। একই ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল বিদ্বেষ-ভাবে, এই ঐক্যের অভাব বড়ই দুঃখের বিষয়। যাঁহারা ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা, হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের কথা কহিয়া ভারতকে স্বরাজের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, এই দৃশ্য দেখিলে তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমরা নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি, যে সাম্প্রদায়িক-সহিষ্ণুতা ও উদারতা ভারতবর্ষ যত দেখাইয়াছে, অন্য কোন দেশ তাহা প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

আমরা জেরুজালেমের "সিয়ন গেট" নামক তোরণের সন্নিকটে অবস্থিত "হাউস্ অফ্ কালাফাস" আখ্যায়

অভিহিত গৃহটি দর্শন করিলাম। কালাফাস ইশার সময়ের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। এই গৃহের উচ্চতলের একটি কক্ষে বাইবেল-বর্ণিত বিখ্যাত "লাষ্ট সাপার" নামক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উচ্চে অবস্থিত এক কক্ষ হইতে নিম্নে চাহিলে জেরুজালেমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য বিশাল টেম্পল ও তাহার পারিপার্শ্বিক, জেহশ ফাত উপত্যকা ও সিলোয়াম গ্রাম দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া দর্শকের অন্তরে অপূর্ব্ব ভাবধারা সঞ্চারিত করে। এই সকল দৃশ্যের পশ্চাতে রঙ্গ-মঞ্চের পটভূমির মত "মাউন্ট অফ্ ওলিভ্স্" নামক পর্ব্বত মহিমময় মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন।

অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর ভূমি-ভাগ আমাদের নয়ন-গোচর হইল। আমরা নব্ নামক একটি পল্লী পার হইলাম। রাজা সল পশ্চাদ্ধাবন করিলে, এই পল্লীতে দায়ূদ লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। বেথেল নামক বাইবেল-বর্ণিত পল্লী এখন ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এইস্থানে এলি ও স্যামুয়েল বাস করিতেন এবং "আর্চ্চ অফ কাভিনাণ্ট" (অঙ্গীকারের খিলান) এই স্থানেই রক্ষিত হইত। ইহার পর আমরা কয়েক মাইল-ব্যাপী বৃক্ষাবৃত-বক্ষ শ্যামসুন্দর শৈল-সানুর উপর দিয়া অগ্রসর হইলাম। এই শৈল-সানুটি "রবার্স ভ্যালি" বা দস্যুর উপত্যকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।



পথ—নাজারেথ কারাফাসের গৃহ—জেরুজালেম টেম্পল—জেরুজালেম

আমরা জেরুজালেম পরিত্যাগপূর্ব্বক মোটরযোগে নাজারেথের দিকে অগ্রসর হইলাম। বাঁধা রাস্তাটি বেশ সুদৃশ্য। জেরুজালেম অধিকার করিবার পর ইংরেজরা এই পথ প্রস্তুত করিয়াছে। এই পথে জেরুজালেম হইতে নাজারেথের দূরত্ব ৮৫ মাইল। জুডিয়ার মধ্যস্থল বা হৃদয়ের উপর দিয়া এই পথ প্রসারিত। সুতরাং বাইবেল-বর্ণিত বহু বিচিত্র ব্যাপারের সহিত এই পথের সম্পর্ক আছে। প্রথম কয়েক মাইল যে সকল পাহাড় পাওয়া গেল, তাহাদিগকে বৃক্ষ-বর্জ্জিত প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপ বলা চলে। ইহার পর যখন আমরা জর্দ্দন উপত্যকা ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইলাম, তখন

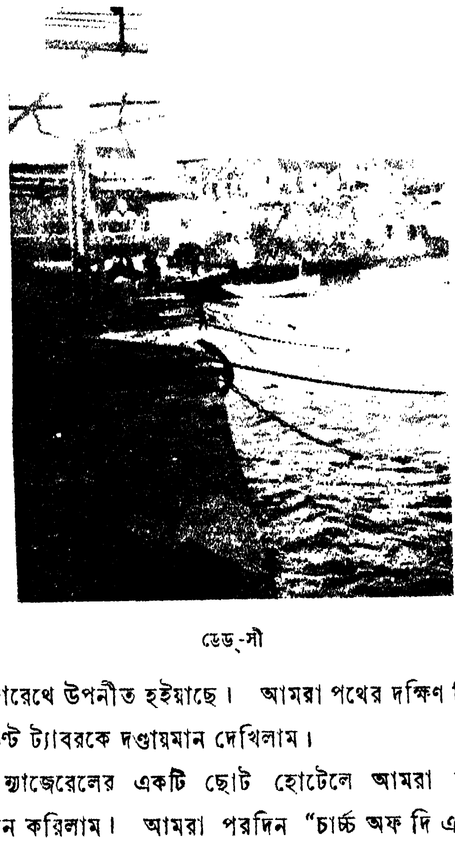
লুক্কায়িত রহিবার সুবিধা বলিয়া এই বৃক্ষ-শ্যাম শৈল-সানু প্রাচীন কাল হইতে দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের লীলা-স্থলী হইয়া রহিয়াছে। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্ব বৎসরে এক দল দস্যুর হস্তে জেরুজালেমের বিশপ বিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি মোটরযোগে যাইতেছিলেন। দস্যুদল ড্রাইভারকে হত্যা করিয়াছিল। তৎপরে আমরা "জেকবের কূপের" নিকট উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে সামারিয়াবাসিনী নারীর সহিত ইশার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। এই বিখ্যাত কূপ এখন একটি গ্রীক গীর্জ্জার অভ্যন্তরে অবস্থিত। একজন বৃদ্ধ পুরোহিত একটী বাল্টি ও বাতির সহায়তায় কিঞ্চিৎ জল ঐ পবিত্র কূপ হইতে

তুলিয়া আমার বন্ধুবর্গকে পান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। কয়েক ফোঁটা জল আমার দেহেও তাঁহারা ছিটাইয়া দিলেন।

ইহার পর আমরা সেচেম নামক প্রাচীন শহরে পৌছিলাম। ইহার অপর নাম নেবিউলাস। গেরিজিম ও এবা নামক গিরিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি সুজলা উপত্যকায় এই শহরটি অবস্থিত। গেরিজিমকে আশীর্ব্বাদের পাহাড় এবং এবাকে অভিসম্পাতের পাহাড় আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। আমরা সেচেমে অনেকগুলি আধুনিক ধরণের গৃহ দেখিতে পাইলাম। আমরা সেবাস্তিরে পাহাড়ের পাদমূল বেষ্টন করিয়া প্রাচীন সামারিয়ার ভিতর দিয়া আগাইয়া চলিলাম। সামারিয়ার অবস্থান স্থানে প্রাচীন প্রাকারাদির ধ্বংসাবশেষ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এখানে পুরাতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতদের দ্বারা বিস্তৃতভাবে খননাদি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিতে পাইলাম। বাইবেল-বর্ণিত বহু প্রাচীন কাহিনী ও কিম্বদন্তীর সহিত সামারিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য ইহা দর্শকদলের দৃষ্টিতে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়া থাকে। আসিরিয়ার সম্রাট্ সেনাচেরিবের সৈন্যসমূহ সম্বন্ধে প্রফেট এলিজা যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, এই স্থানে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া কথিত। দশ জন কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি সম্রাট্ সেনাচেরিবের সৈন্যসমূহের গোপনে পলায়ন করিবার সংবাদ নগরে আনয়ন করিয়াছিল।

ইহার পর জেনিল নামক পল্লী পার হইয়া আমরা একটি পাহাড়ের শীর্ষ-দেশে পৌছিলাম। শৈলশীর্ষ হইতে উত্তরে দৃষ্টিপাত করিলে, ত্রিশ মাইলব্যাপী ও ত্রিকোণাকৃতি জেজ্‌বিল প্রান্তর আমাদিগের নেত্র-পথে পতিত হইল। আরও দূরে সিধা উত্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তুষার-শুভ্র শরীর মাউন্ট হার্ম্মণকে দেখিতে পাইলাম। ঐ পর্ব্বতের পাদ-মূল হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত রজত-শুভ্র তুষারে সমাচ্ছন্ন। পশ্চিমে চাহিলে বিপুল-বপু স্তূপের মত দণ্ডায়মান মাউণ্ট কার্ম্মেল দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল, উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া ঐ পর্ব্বত যেন সগর্ব্বে ভূমধ্যসাগরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গিলবোয়ার গিরিশ্রেণীকে গুরু-গম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান দেখিলাম। ঐ গিরি-শ্রেণীর গাত্রে সদ্য-পতিত তুষাররাশির অবশেষ তখনও দেখা যাইতেছিল।

যে দিগন্ত-বিস্তৃত দূর-প্রসারিত প্রকাণ্ড প্রান্তরে বহু স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে এবং অল্পকাল পূর্ব্বে যেখানে তুর্কীদের সহিত তুমুল যুদ্ধে ইংরেজরা বিজয়ী হইয়া প্রায় দশ হাজার তুর্কী সৈন্যকে বন্দী করিতে সমর্থ হইয়াছিল, আমাদের পথটি তাহারই বুকের উপর দিয়া সিধা উত্তরে আগাইয়া গিয়াছে। ঐ প্রান্তর পার হইবার পর আঁকা-বাঁকা পথ উপত্যকা অতিক্রম করিয়া



ডেড্-সী

নাজারেথে উপনীত হইয়াছে। আমরা পথের দক্ষিণ দিকে মাউণ্ট ট্যাবরকে দণ্ডায়মান দেখিলাম।

ন্যাজেরেলের একটি ছোট হোটেলে আমরা রাত্রি যাপন করিলাম। আমরা পরদিন "চার্চ্চ অফ দি এনান-সিয়েশন" আখ্যায় অভিহিত উপাসনা-গৃহ দর্শন করিলাম। এই গির্জ্জাটি ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ের। গৃহটির নিম্নে একটি গুহা বিদ্যমান। ঐ গুহাটির মধ্যে দেব-দূত গেব্রিয়েলের সহিত যিশু-জননী কুমারী মেরীর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি প্রচারিত। উপাসনা-বেদীর নিম্নে অবস্থিত একটি পবিত্র প্রস্তর তীর্থ-দর্শনার্থীদের দ্বারা

সম্পূজিত হইয়া থাকে। উক্ত গুহাটির নীচে আরও কতিপয় কন্দর অবস্থিত বলিয়া জানা গেল। ঐ গুহা-গৃহগুলিতে পবিত্র পরিবার (ইশা, মাতা মেরী প্রভৃতি) বাস করিতেন বলিয়া বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে বদ্ধ-মূল। ভূ-নিম্নবর্ত্তী একটি পথ এই গুহাগুলি হইতে "যোসেকের কর্ম্মশালা" আখ্যায় অভিহিত একটি স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামের উর্দ্ধাংশে এই স্থানটি অবস্থিত। রোমানদের স্থাপিত প্রাচীন গির্জ্জার এবং ক্রুজেডার বা ধর্ম্মযোদ্ধাদের নির্ম্মিত উপাসনা-ভবনের অবশেষ এই স্থানে দেখা যায়। আমরা জোসেফের কর্ম্মশালার উপর

দিয়া সমুদ্র-কূলে উপনীত হইলাম। নাজারেথ হইতে হাইফা চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা কার্ম্মেল পাহাড়ের ঢালুর নীচে এবং ১২ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত একটি সুন্দর উপসাগরের প্রান্ত প্রদেশে বিরাজিত। এই উপসাগরের উত্তর সীমায় ক্রুজেডারগণের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ প্রাচীন একার নগর দণ্ডায়মান। ১১৯১ হইতে ১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নগর ধর্ম্মযোদ্ধাদের শাসনাধীন ছিল। বিশেষ ইংলণ্ডের রাজা পুরুষসিংহ রিচার্ডের স্মৃতির সহিত এই প্রাচীন নগর নিবিড়ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। সমুদ্র-তীরে



টাইবেরিয়াস্



চার্চ্চ অফ এনানসিয়েশন, নাজারেথ

ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ের দ্বারা একটি চার্চ্চ রচিত হইতে দেখিলাম।

নাজারেথ অঙ্কিত আলেখ্যবৎ সুদৃশ্য একটি প্রাচীন পল্লী। ইহার সঙ্কীর্ণ অথচ বাঁধা রাস্তা এবং সারি সারি সজ্জিত দোকানগুলি চিত্তাকর্ষক। আধুনিক ধরণের যে সকল গির্জ্জা-গৃহ এখন স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীন প্রণালীতে প্রস্তুত পুরাতন প্রার্থনাগার-গুলিই আমাদিগের দৃষ্টিতে অধিকতর সুন্দর।

আমরা হাইফা যাইবার জন্য জেজরিল প্রান্তর বক্ষে পুনরায় অবতরণ করিলাম এবং ঐ প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্ত

দণ্ডায়মান উচ্চ-প্রাচীর বেষ্টিত প্রাচীন দুর্গটি রোমান্স বা রূপ-কথার বিষয়ীভূত বস্তুর ন্যায় বিচিত্র দর্শন। আমরা দুর্গটির দর্শনের পর নর্ম্মান বুরুজের শীর্ষে উঠিলাম। এই বুরুজের প্রাচীরগুলির ঘনত্ব দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সমুদ্র-পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীর তুর্কীদের কীর্ত্তি বলিয়া আমরা জানিতে পারিলাম। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে দুর্গটি আক্রমণ করিবার সময়ে বৃটিশ জাহাজের গোলার দ্বারা প্রাচীরের অংশ-বিশেষ ধ্বংস পাইয়াছিল। আমরা সেই ধ্বংসের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম।

দুর্গের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র অথচ অতি সুদর্শন মসজিদ অবস্থিত। এই মসজিদের শ্যাম-সুন্দর গুম্বজ ও মিনারেট-

গুলি দেখিলে সুদক্ষ শিল্পীর অঙ্কিত আলেখ্য বলিয়া মনে হয়। প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আমরা মাউণ্ট কার্ম্মেলে আরোহণ করিলাম। তৎপরে "সী অফ্ গ্যালিলি"র তীরে বিরাজিত টাইবেরিয়াস দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। আমরা একটি শৈলশীর্ষে দাঁড়াইয়া প্রায় দেড় হাজার ফীট নিম্নে প্রসারিত সী অফ্ গ্যালিলির যে দৃশ্য দর্শন করিলাম, তাহা অতিশয় মনোমুগ্ধকর। হার্ম্মন পর্ব্বতের শীর্ষস্থ শুভ্র তুষার অস্ত-রবির রক্ত-রাগে রঞ্জিত হইয়া পরম রমণীয় অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। রজতশুভ্র তুষাররাশিতে প্রতিফলিত সান্ধ্য রবি-রশ্মি যে বিচিত্র বর্ণরাগ রচনা করিয়াছিল, তাহাকে লালের সহিত সোণালীর সম্মিলন বলা চলে। কয়েকটি বেঁকের পর পাহাড়ের পাশ দিয়া পথটি অকস্মাৎ নামিয়া পড়িয়াছে।

আমরা যখন টাইবেরিয়াস নগরে ফিরিয়া আসিলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। সমুদ্রতীরের নিকটবর্ত্তী একটি হোটেলে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম। এক দল আমেরিকান টুরিষ্টের আগমন-বার্ত্তা আমরা অবগত হইলাম। আমেরিকানদের মত পর্য্যটনপ্রিয় জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানি না। ইহারা যেখানে যায়, সেখানে অজস্র অর্থ ব্যয় করে বলিয়া ইহাদের আগমন একটি বিচিত্র ও বিরাট্ ব্যাপারে পরিণত হয়।

হোটেলের কক্ষ হইতে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত টাইবেরিয়াসের যে মনোমদ মূর্ত্তি সেই রাত্রিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা বিচিত্র চিত্রের মত চিরকাল চিত্তপটে অঙ্কিত থাকিবে। ঢক্কা-নিনাদে ও মুয়েজ্জিনের আহ্বানে অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইল। মুয়েজ্জিনের উচ্চারিত উচ্চ-কণ্ঠের আকুল আহ্বানকে ইস্লাম-ধর্ম্মের অপূর্ব্ব অবদান বলিয়া মনে হইল। মনে হইল, সেই আহ্বান যেন উদাত্ত কণ্ঠে কহিতেছে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" শয্যা ত্যাগ করিবার পর সূর্য্যোদয়ের যে সৌন্দর্য্য সেদিন দেখিয়াছিলাম, তাহাও বিস্মৃত হইবার নহে। সূর্য্যোদয়ের মত অত্যাশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড আর কিছু আছে কিনা, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। আমরা নিত্যই সেই দিব্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; কিন্তু এর একটা এমন মুহূর্ত্ত আসে, যখন আমরা সেই মহিমময় দৃশ্যের সকল মহিমা ও গরিমা—উহার আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। সেদিন সেইরূপ একটা মহান্ মুহূর্ত্ত আমাদের জীবনে আসিয়াছিল।

নিষ্কাম-কর্ম্ম

এই পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকার পায়। নিষ্কাম কর্ম্ম কি প্রকার? উহা ব্রহ্ম কর্ম্ম-সাধন-নিরত যোগীর অনুভূতির বিষয়। এই অনুভূতি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে, কলে-কারখানায়, আশ্রমে, বিদ্যালয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে যে কোনরূপ কর্ম্ম যে হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। নবযুগের দীক্ষিত সন্তানগণ জীবনদৃষ্টান্তে ইহা সপ্রমাণ করিবে। বাঙালার নবতান্ত্রিক যোগযুক্ত হইয়া নূতন ভারত গড়িয়া তুলিবে।

ভারতের ধর্ম্ম শুধু ভাবনার বস্তু নহে, তাহা কর্ম্মে মূর্ত্ত হউক। সে কর্ম্ম পূজা-হোম-অর্চ্চনায় শুধু নিবদ্ধ নহে, জীবনের সর্ব্ববিধ কর্ম্মে। সে কর্ম্ম ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত। অতএব—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

বিশ্বসিংহ

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টশালী

পূর্ব্ব কথা

[প্রাচীন কামরূপে "কামাখ্যা মন্দিরে"র পুরোহিত কালিকানন্দ গিরির কথায় দৈবক্রমে কৃষক-পুত্র বিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাষ পাইয়া বিশুর মাতা মায়াপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহর অভিমুখে ভাগ্যান্বেষণে রওনা হইলে, পথিমধ্যে কামতারাজ নীলাম্বরের সেনাপতি বিক্রমসিংহ ক্ষণিকের আলাপে উক্ত বালকের মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পাইয়া উঁহাদিগকে আশ্রয় দেন। কামতাপুরে বিক্রমসিংহের আলয়ে থাকিয়া বিশু শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পান এবং এই সময়ে উঁহার নাম হয় বিশ্বসিংহ।

একদা কামরূপে (হাজোনগর) আহম নামক যোদ্ধৃজাতির আকস্মিক আগমনে কামতারাজ নীলাম্বর বিব্রত হইয়া পুত্র পীতাম্বরকে মীমাংসার জন্য পাঠাইলে, তিনি কৌশলে উক্ত জাতির দলপতি সুহংমংকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া উঁহাদের বসবাসের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ক্রমে প্রধান মন্ত্রী শচীপুত্র তথাকার রাজপ্রতিনিধি এবং বিক্রমসিংহ সেনাপতি নিযুক্ত হন। বিশ্বসিংহ পীতাম্বরের দেহরক্ষী হিসাবে কামতাপুরেই থাকিয়া যান।

অতঃপর কামরূপের রাজপ্রতিনিধি শচীপুত্রের পুত্র যদুনন্দনের অত্যাচারে কামাখ্যামন্দিরের সেবাদাসী কালিকানন্দের কন্যার সতীত্বহরণ এবং হতভাগিনীর আত্মহত্যা, পরিশেষে কালিকানন্দ কর্ত্তৃক যদুনন্দনের রক্তে তর্পণ করিবার ভীষণ প্রতিজ্ঞা উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে অত্যাচারী গৌড়রাজ মজঃফর শা'র দৌরাত্ম্যে রাজীব রায়ের বিবাহিতা কন্যা অপহৃত হওয়ার আশঙ্কা উদয় হওয়ায়, তিনি কামতারাজের সাহায্য প্রার্থনা করায় মজঃফর শা কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। পীতাম্বর বিশ্বসিংহ সহ কয়েকজন অনুচরের সাহায্যে গৌড় দেশ হইতে রাজীব রায়ের কন্যা উর্ম্মিলাকে উদ্ধার করিয়া কামতাপুরে লইয়া আসেন। উর্ম্মিলা প্রথমে রাজপ্রাসাদে, পরে রাজোদ্যানসংলগ্ন কাত্যায়নী মন্দিরে বাস করিতে থাকেন। বিশ্বসিংহের অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বে রাজীব রায়ও এই সময়ে কারাগার হইতে পলায়নের সুযোগ পান।

ইহার ফলে অচিরে কামতারাজের সহিত দুর্দ্ধর্ষ গৌড়রাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পীতাম্বর বিশ্বসিংহ ও সেনাপতি সুবাহুর কৌশলে চালিত হিন্দু সৈন্য পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া, উঁহাদের অধিকৃত একটি বৃহৎ ভূভাগ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়া পরাজিত মজঃফর শা আবার বিলাসে মাতিয়া উঠিলেন। এই জন্য বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী হোসেন শা ও পরাগলা খাঁ সহসা পদত্যাগ করায় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অতঃপর সামসুদ্দীনের সুন্দরী কন্যাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া মজঃফর শা নিহত হন। ক্রমে হোসেন শা ও পরাগলা খাঁ সেনাপতি হইয়া পুনরায় কামতারাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত পাঠান-রাজ্যাংশের উদ্ধারচেষ্টায় ব্রতী হন।

এদিকে একদিন কামতারাজোদ্যানে রাজকুমারী করুণার সহিত এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার হইল। পীতাম্বরের ভগ্নী করুণা ইঁহার নিকট শুনিলেন যে, কামতাপুর দুর্গে মহাপাপের ছায়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহার পিতা কামতারাজ নীলাম্বরেরও নাকি বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। করুণা চিন্তিত হইলেন।

করুণা ভাবিলেন,—ইনি কি সত্যই কোনও মহাপুরুষ? না, পাঠানের গুপ্তচর! রাজকুমারী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।

তারপর—?]

তৃতীয় খণ্ড

হিন্দু-পাঠান—হোসেন শা

প্রথম অধ্যায়—ব্রহ্মপুত্রতীরে

নীলাম্বরের রাজত্বকালে, সুসঙ্গ, শ্রীহট্ট ও কাছার প্রভৃতি রাজ্য কামতা-রাজ্যাধীন এবং রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ছিল। ইহার দক্ষিণে ত্রিপুর-রাজ্য। সেই সময়ে ধন্যমাণিক্য নামে চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপতি ত্রিপুরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ত্রিপুর-রাজ্যের আয়তন ঐ সময়ে নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না; দক্ষিণে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল। চট্টল প্রদেশ সম্পূর্ণ ত্রিপুর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই চট্টল প্রদেশ লইয়া আরাকানের মগরাজের সহিত ত্রিপুর-রাজের প্রায়শঃ সংঘর্ষ হইত।

হোসেন শার পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠানরাজগণের কেহ কেহ কখন কখন চট্টল পর্য্যন্ত প্রভুত্ববিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। ঐ সকল পাঠান নৃপতিগণের কেহ কেহ ত্রিপুররাজের প্রতিও অস্থায়ীরূপে কখন কখন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। হোসেন শা গৌড়ের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া, ত্রিপুর-রাজ্যে প্রভুত্ববিস্তারের চেষ্টা করেন। ক্রমে তিনি দুইবার ত্রিপুর-রাজের নিকট পরাভূত হন। অনন্তর তিনি পাঠানদের প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে তৃতীয়বার ত্রিপুর-রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে আরাকানের মগরাজের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায়, ত্রিপুরাধিপতির প্রধান সেনাপতি বীরচূড়ামণি চয়চাগ চট্টলে গমন করেন এবং তথায় যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। ধন্যমাণিক্য এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হীনতেজঃ হইয়া পড়েন এবং পাঠানরাজ হোসেন শার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধিতে তাঁহাকে গৌড়ের আধিপত্য স্বীকার করিতে হয়; এবং যুদ্ধের ব্যয়-স্বরূপ রাজ্যের কিয়দংশ প্রদান করিতে হয়। এবম্বিধ সন্ধি-স্থাপনে, তাঁহার তেজস্বী পুত্র রত্নবিজয় (কোন কোন ইতিহাসে বিজয়মাণিক্য) পিতার উপর নিতান্ত বিরক্ত হন এবং দেশ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রগর্ভে গিয়া স্বাধীন ভাবে নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

হোসেন শা ত্রিপুরাধিপতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ও তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়া জয়োন্মত্ত হইলেন এবং তাঁহার জিগীষাবৃত্তিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হইল। তিনি কামতারাজ্যাক্রমণে ইচ্ছুক হইলেন। কামতারাজ্যাধীন সুসঙ্গ-রাজকে হীনবল এবং কামতাপুর হইতে বহুদূরে অবস্থিত বিবেচনা করিয়া, তিনি সুসঙ্গ সীমাতে গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুসঙ্গরাজ হোসেন শার অবৈধ কর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কামতারাজকে সংবাদ প্রদান করিলেন এবং শ্রীহট্ট, কাছার, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া প্রভৃতি কামতারাজ্যাধীন নৃপতিদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। হোসেন শা সুসঙ্গজয় যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, তত সহজ হইল না। তবে রাজ্যের কিয়দংশ দখল করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে হোসেনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করিলেন। তাহার পর যখন গাড়ো হইতে লুসাই পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য নৃপতিগণ সুসঙ্গের পশ্চাতে আসিয়া যোগদান করিল, তখন হোসেন শা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ চালাইয়া ঢাকা হইতে গৌড় পর্য্যন্ত সমগ্র পাঠানরাজ্য হইতে শক্তিসংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। তিনি ত্রিপুররাজসমীপেও সাহায্য প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

এ দিকে তাঁহার শক্তিবৃদ্ধির সহিত কামতারাজের প্রেরিত বিরাট্ বাহিনী, সেনাপতি সুবাহু ও রাজকুমার পীতাম্বর আসিয়া সুসঙ্গরাজের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। তখন হিন্দু পাঠান উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। যমুনাতীর হইতে সুর্ম্মাতীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্থানে স্থানে কামতা-পক্ষের শিবির। ত্রিপুর-রাজকুমার রত্নবিজয় হিন্দু পাঠানের এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে সুযোগ বুঝিয়া আপন নবগঠিত যোদ্ধগণসহ হিন্দুর সাহায্যার্থে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পীতাম্বর এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বীর যুবককে সাদরে গ্রহণ করিয়া সমর-ক্ষেত্রের পশ্চিমাংশের নেতৃত্ব প্রদান করিলেন। হিন্দু পাঠান উভয় পক্ষে সমান ভাবে যুদ্ধ চলিল; কোন পক্ষেই জয়-পরাজয় দৃষ্ট হইল না। অনন্তর খাসিয়ারাজ পর্ব্বত রায় পীতাম্বরকে এক উত্তম পরামর্শ প্রদান করিলেন,—ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্ব্বত রায়ের বিশেষ পরিচিত ছিল; সম্মুখ-যুদ্ধের ভার সুবাহুর উপর ন্যস্ত রাখিয়া, পর্ব্বত রায় স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য সেনা সহকারে পীতাম্বরের সহিত অরণ্যপথে ঘুরিয়া এগার সিন্ধু দুর্গের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র পার হইলেন এবং অতি সামান্য চেষ্টায় ঐ দুর্গ অধিকার করিলেন। হোসেন শা স্বয়ং হোসেনপুরে অবস্থিতি করিলেন। সেনাপতি পরাগল খাঁ, এবং দুই পুত্র নসরৎ শা ও মহম্মদ শা প্রচণ্ড বিক্রমে কামতা-সেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের সেই ভীষণ আক্রমণে বহুতর কামতা-সেনা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পাঠানগণ জয়ধ্বনি করিয়া সুবাহুর রচিত ব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে পীতাম্বর ও পর্ব্বত রায় এগার সিন্ধু দুর্গ অধিকার করিয়া গোলা বর্ষণ করিতে করিতে হোসেনপুরের দিকে অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। হোসেন শা ইহা জ্ঞাত হইয়া হতবুদ্ধি হইলেন। কারণ পাঠানগণ তখন একরূপ বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তরে বিশ্বসিংহ ও সুবাহু, পূর্ব্বে মণিপুর, লুসাই প্রভৃতি পার্ব্বত্য অজেয় বীর সেনা, দক্ষিণে স্বয়ং পীতাম্বর ও পর্ব্বত রায়, পশ্চিমে ত্রিপুর রাজকুমার রত্নবিজয়। হোসেন শার দর্প চূর্ণ হইল। তিনি স্ববংশে নিধন স্থির করিয়া একেবারে বিকৃতমস্তিষ্ক হইলেন এবং চারিদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজমুকুট দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন এবং "আল্লাহো, আল্লাহো" রবে নিদারুণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

হোসেন শা ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের বংশধর। তাঁহার কাতর ক্রন্দনে আল্লা দয়া করিলেন—সহসা পাঠান সেনা মধ্যে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সে শব্দে হোসেন শা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পীতাম্বরের সহিত মন্ত্রিপুত্র যদুনন্দন এই সমরক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করিতে গিয়া, হোসেন শার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ শার হস্তে বন্দী হইয়া পড়িলেন। ইহাতেই পাঠান সেনা মধ্যে জয়ধ্বনি উঠিয়াছিল।

পীতাম্বর এই সংবাদ শ্রুত হইয়া, যদুনন্দনের মুক্তি-কামনায় হোসেন শার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। হোসেন শা এই উত্তম সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাকে সন্ধিসর্ত্ত-নির্ব্বাচনের জন্য পীতাম্বর-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পীতাম্বর গৌড় রাজকুমার নসরৎ শাকে উপযুক্ত সম্মান ও আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া "কিরূপ সর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে" জিজ্ঞাসা করিলেন।

নসরৎ শা উত্তরে কহিলেন "আমাদের জয়লব্ধ স্থানগুলি এবং যুদ্ধ-খরচ উপযুক্তরূপ পাইলেই পিতা সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত আছেন।"

পীতাম্বর মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "উপযুক্ত যুদ্ধ-খরচ কিরূপ? সংখ্যা নির্ণয় করিয়া বলিলে বুঝিতে পারি।"

নসরৎ। সংখ্যা নির্ণয় আমরা আর কি করিব? আপনি বিবেচক, যুদ্ধব্যয় বিষয়ে আপনার নির্ব্বাচন বোধহয় অন্যায় হইবে না।

পীতাম্বর। আমার বিবেচনা বুদ্ধি নাই।

নসরৎ। (সবিস্ময়ে) সে কি?

পীতাম্বর। আমার বিবেচনা-বুদ্ধি থাকিলে সন্ধি প্রার্থনা করিব কেন?

নসরৎ। যুদ্ধে জয় পরাজয় সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, শেষ সকলকেই সন্ধি স্থাপন করিতে হয়।

পীতাম্বর। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে কি?

নসরৎ। না।

পীতাম্বর। কোন্ পক্ষের জয় বা পরাজয় হইয়াছে বলিতে পারেন কি?

নসরৎ। প্রকৃত পক্ষে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে, ইহা অনিশ্চিত, তবে সন্ধিপ্রার্থী হীনবল না হইলে সন্ধি প্রার্থনা করিবে কেন?

পীতাম্বর। ক্ষমা করিবেন গৌড়-রাজকুমার, ইস্‌লাম-রাজনীতি আর হিন্দু-রাজনীতির মধ্যে বৈষম্য আছে, ইহা আমার বিদিত ছিল না।

নসরৎ। আমি আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিলাম না!

পীতাম্বর। হিন্দু-রাজনীতিতে বলে, "পরাজিত পক্ষ পুনঃ পুনঃ পরাজয় হইলেও বিজেতার আধিপত্য সহজে স্বীকার করিতে চাহে না; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধই চালাইতে বাধ্য হয়; সন্ধিপ্রার্থনায় তাহাদের সাহস হয় না—পাছে প্রতিপক্ষ সন্ধিপ্রার্থীকে হীনবল মনে করিয়া (যেমন আপনি মনে করিতেছেন) অসঙ্গত দাবী করিয়া বসে, অথবা আধিপত্যস্বীকারে বাধ্য করিতে চাহে। সেইরূপ স্থলে, বৃথা লোকক্ষয়নিবারণ হেতু বিজয়ী পক্ষ সন্ধি প্রস্তাব করিয়া থাকে। আপনার বিবেচনায় আপনারা বিজয়ী মনে করিতে পারেন, সে বিজয় কেবল মন্ত্রি-পুত্র যদুনন্দনকে লইয়াই। যদুনন্দনের আশা ছাড়িয়া, আমরা যুদ্ধ চালাইলে কয়জন পাঠান জীবিত থাকিবে বলিতে পারেন?

নসরৎ। যুদ্ধের অবস্থা সকল সময়ে একরূপ থাকে না। তাহার পরিবর্ত্তন বিচিত্র নহে।

পীতাম্বর। হাঁ, আপনার ঐ উক্তি যথার্থ স্বীকার করি, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার মনে কি হয়?

নসরৎ নীরব রহিলেন।

পীতাম্বর। দেখুন, গৌড়-রাজকুমার, যদুনন্দন ব্রাহ্মণ-তনয়, যুদ্ধ তাহার জাতীয় ধর্ম্ম নহে, বরং যুদ্ধে ভীরুতাই অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতিই তাঁহার জাতীয় ধর্ম্ম; তাঁহাকে বন্দী করিয়া গৌরবান্বিত হওয়া, বীরপুরুষের কর্ত্তব্য নহে, আর বিজয়ী মনে করা নিতান্তই ভ্রম। আমাকে, সেনাপতি সুবাহুকে অথবা যে কোন ক্ষমতাপন্ন ক্ষত্রিয় বীরকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দী করিতে পারিলে প্রশংসার বিষয় ছিল; সেইরূপ প্রশংসালাভে পাঠান জাতির মধ্যে কেহ সমর্থ হইয়াছে কি? আপনি আমার অতিথি, আপনার মনে ব্যথা দেওয়া আমার সঙ্গত নহে; আপনার ভ্রম প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য।

নসরৎ। আপনার ও সেনাপতি সুবাহুর বীরত্ব প্রশংসার্হ। কিন্তু কামতারাজ্যে এক বই দ্বিতীয় পীতাম্বর কি সুবাহু নাই। সমগ্র ভারতের ক্ষত্রিয়বীর্য্যের প্রভাব মনে করিয়া সে গর্ব্ব করিলেই ভাল হইত।

পীতাম্বর। (ঈষৎ কুপিতভাবে) কোন্ পাঠান বীর কোন্ ক্ষত্রিয়কে ধর্ম্মযুদ্ধে অথবা সম্মুখ-সমরে পরাজয় করিয়াছে? স্বীকার করি, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে পাঠানদের প্রভুত্ব বিস্তারলাভ করিয়াছে; সে প্রভুত্ব কি যুদ্ধে জয়ী হইয়া—না, বিশ্বাসঘাতকতায়?

নসরৎ শা লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন।

পীতাম্বর কহিলেন, "আপনার ভ্রম আপনি বুঝিয়া থাকিলে, আপনি বলিতে পারেন, সন্ধিসর্ত্ত কিরূপ হওয়া উচিত?"

নসরৎ শা বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনিই সন্ধিসর্ত্ত নির্ব্বাচন করুন। আপনার নির্ব্বাচনে পিতা স্বীকৃত হন, উত্তম, নচেৎ পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।"

পীতাম্বর। বেশ, এ অতি উত্তম কথা। আপনি জানেন, আমরা হিন্দুজাতি; অসঙ্গত লোভ আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমার বিবেচনা হয়, গৌড়রাজ কামতা-শক্তির পুনঃপরীক্ষার নিমিত্ত এ বিরোধ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি আত্রাই সমর ভুলিতে পারেন নাই, আত্রাই ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী জনপদগুলির মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহার অধিক লোভ তাঁহার আছে কি না তিনিই জানেন। আপনি অবশ্যই বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন, আমাদের অসঙ্গত লোভ থাকিলে, আমাদের রাজ্য আরও বিস্তৃত করিতে সচেষ্ট হইতাম। আর গৌড়বিজয় করাও আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে।

নসরৎ। কামতারাজের পদ্মাতীরস্থ জনপদগুলি আক্রমণ করার উদ্দেশ্য কি?

পীতাম্বর। আপনাদের অনধিকারপ্রবেশ অথবা দুরাকাঙ্ক্ষার প্রতীকারার্থ। এখানে সন্ধি স্থাপিত হইলে, সে বিজিত জনপদ আমরা কিছুই গ্রহণ করিব না। কিন্তু এ অঞ্চলে যে জনপদগুলি আপনারা দখল করিয়াছেন, সে সমস্তই সুসঙ্গরাজকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত সমর ব্যয় আমাদিগকে দিতে হইবে। সুসঙ্গরাজ অথবা কামতারাজ এ গোলযোগের মূলে নহে; আপনারাই এই বিরোধ উপস্থিত করিয়াছেন। আর সমর-ব্যয় বিষয়ে কামতারাজ আপনাদিগকে কিছু দয়া করিতে পারেন, যদি আপনারা সুসঙ্গরাজকে রীতিমত ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত হন। এ বিরোধে তাঁহার ক্ষতিই অধিক হইয়াছে।

নসরৎ। সে ক্ষতি পূরণ করিতে কি পরিমাণ প্রয়োজন হইবে, জানিতে পারি কি?

পীতাম্বর। সে বিষয়ে আমি এখন কিছু বলিতে পারিব না; সুসঙ্গরাজের সহিত আলোচনা আবশ্যক। গৌড়রাজ আমার পূর্ব্বোক্তরূপ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, আমি ক্ষতিপূরণ বিষয়ে সুসঙ্গরাজের সহিত আলাপ করিব।

নসরৎ। আপনার ব্যবস্থা-মতে পিতা সকল বিষয়ে স্বীকৃত হইলেও, একটী বিষয়ে তাঁহার আপত্তি হওয়ার সম্ভব। ব্রহ্মপুত্র নদই সুসঙ্গরাজের দক্ষিণ সীমা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ঐ নদের উত্তর তীরে পিতার নামে একটী নগর স্থাপন করা হইয়াছে; অন্ততঃ ঐ নগরটী আমাদের দখলে থাকা আবশ্যক।

পীতাম্বর। গৌড়রাজ ইচ্ছা করিলে, ঐরূপ নগর তাঁহার অধিকারস্থ যে কোন স্থানে স্থাপন করিতে পারেন; অথবা সুসঙ্গরাজের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, উহা সুসঙ্গরাজ হইতে করদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। সন্ধি-সর্ত্তে ইহা উল্লেখ থাকিবে।

নসরৎ শা দেখিলেন, তাঁহার চতুরতা ব্যর্থ হইল। তখন পীতাম্বরকে বলিতে বাধ্য হইলেন, "তাঁহার প্রস্তাব পিতাকে বিদিত করিয়া, তাহার অভিমত যথাসময়ে জানাইবেন।"

অনন্তর নসরৎ শা পীতাম্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, আপন শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—যদুনন্দন ও মহম্মদ শা

সংসার বৈচিত্র্যময়। এ কলিযুগে—কলির প্রভাবে অনেক সময়ে দেখা যায়, কৃতজ্ঞতার মস্তকে পদাঘাত করিতে লোকে বড় কুণ্ঠিত হয় না; অর্থাৎ যিনি যাহার যতটা উপকার করিয়া থাকেন, তিনি তাহার নিকট হইতে ততোধিক অপকার পাইয়া থাকেন। কেহ কেহ বা উপকারীর অপকার এত অধিক মাত্রায় করিয়া থাকেন যে, তাহার তুলনা জগতে হয় না। কামতারাজ-কুমার পীতাম্বর কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া পাঠানদের সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, পাঠকগণ তাহা দেখিলেন, কিন্তু যাঁহার জন্য এ সন্ধিস্থাপন, যাঁহার জন্য এ ত্যাগ স্বীকার, তাঁহার কার্য্যটীও পাঠকগণ একবার দেখুন। যদুনন্দন বন্দী হইয়া যুদ্ধের অবস্থা কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁহার মুক্তির জন্যই যে পীতাম্বর সন্ধি স্থাপনে প্রস্তুত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার মত হীনচেতা লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহাকে বুঝান হইয়াছিল যে, যুদ্ধের পরাজয়-সম্ভাবনায় পীতাম্বর সন্ধির প্রার্থী হইয়াছেন। মহম্মদ শা ধূর্ত্ত লোক; যদুনন্দনের বুদ্ধির পরিচয় অল্পক্ষণ মধ্যেই পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিনা মূল্যে সংবাদ খরিদ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "মন্ত্রি-পুত্র, যুদ্ধের অবস্থা কিছু জ্ঞাত আছেন কি?"

যদু। শুনিতে পাই সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে।

মহম্মদ। হাঁ, পূর্ব্বপক্ষ কে জ্ঞাত আছেন কি?

যদু। হাঁ, শুনিয়াছি, উহা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

মহম্মদ। তবে আপনি বলিতে চাহেন, পাঠানরাজ রণে ভীত হওয়ায়, তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কামতা-রাজকুমার সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন?

যদু। বৃদ্ধ সেনাপতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, পীতাম্বরের বীরত্ব কোন্ পাঠান না জানে? তাঁহার মত সমরকুশল যোদ্ধা পূর্ব্বভারতে আর কে আছেন? কিরূপ দক্ষতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত মাত্র পঞ্চত্রিংশৎ অনুচরসহ পাঠান রাজধানী গৌড় হইতে উর্ম্মিলাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন!

মহম্মদ। সে কি বীরত্বের কাজ হইয়াছিল, না চোরের কাজ হইয়াছিল? সে ক্ষেত্রে বীরত্বের প্রশংসা করিতে হইলে, বিশ্বসিংহকেই কেবল প্রশংসা করা যাইতে পারে।

যদু। বিশ্বসিংহের বিস্ময়কর কার্য্য ভুলিতে পারেন নাই? ভুলিবেন কিরূপে? পাঠানগৌরব সেকেন্দার আলীকে যিনি তুচ্ছ পদার্থের ন্যায় নিগৃহীত করিয়াছিলেন, তাঁহার বীরত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আবার আত্রাইতীরে কাহার বীরত্বে ভীত হইয়া গজপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া কে শ্বেত পতাকা উত্থান করিয়াছিলেন?

মহম্মদ শা কুপিত হইলেন, কহিলেন, "আপনি কাহার সহিত আলাপ করিতেছেন? আপনার অবস্থা বিস্মৃত হইয়াছেন কি? আপনি জানেন, আপনার জীবন-মরণ এখন আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।"

"জীবন মরণ" শব্দ শ্রুত হইয়াই যদুনন্দনের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার বদন শুষ্ক হইল, তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া কাতরভাবে বলিলেন "আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করিবেন না, আমাকে প্রাণে বাঁচাইলে আমা হইতে অনেক সাহায্য পাইতে পারিবেন, তাহাতে আপনারা প্রকৃত লভ্যবান্ হইবেন, আমি আপনাদের দয়া ভুলিব না।"

মহম্মদ শা যদুনন্দনের ত্রাস দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন, বলিলেন "আপনি আমাদের কি সাহায্য করিতে পারেন?"

যদু। আপনি কি সাহায্য চাহেন?

মহম্মদ। আপনি কামতা-রাজ্য-জয়ে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন কি?

যদু। নিশ্চয় পারি।

মহম্মদ। কিরূপে—কি সাহায্য করিতে পারেন?

যদু। আপনি যেরূপ সাহায্য চাইবেন, তাহাই আমা হইতে পাইবেন।

মহম্মদ। আপনি রাজকুমার পীতাম্বরকে আমাদের আয়ত্তে আনিয়া দিতে পারেন কি?

যদু। তা' আর পারি না? তাহাতে আপনাদের লাভ? আমি ইচ্ছা করিলে ইহাপেক্ষাও অধিক সাহায্য প্রদান করিতে পারি।

মহম্মদ শা সবিস্ময়ে একবার যদুনন্দনের মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "আমি আপনার মনোগত অভিপ্রায় ঠিক বুঝিলাম না।"

যদু। আপনি আশা করেন—পীতাম্বরকে বন্দী করিয়া রাখিলে, কামতা-রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন? কামতারাজকে আপনারা জানেন না; তিনি অতি স্বাধীন-প্রকৃতি তেজস্বী পুরুষ। পীতাম্বর তাঁহার একমাত্র বংশধর, তিনি যুদ্ধে অথবা অন্যরূপে নিহত হইলে, পুত্রশোকে হীনতেজ হইতে পারেন, তখন আপনাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।

মহম্মদ শা শিহরিয়া উঠিলেন, তীব্র কটাক্ষে যদুনন্দনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনি পীতাম্বরকে নিহত করিতে পারেন?"

যদু। নিশ্চয়ই পারি; উহার বিনিময়ে আমাকে কিরূপ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন?

মহম্মদ। আপনি এ কাজ করিতে পারিলে, আপনি যেরূপ পুরস্কারে সন্তোষলাভ করিবেন, সেইরূপ ব্যবস্থাই করিব।

যদু। দেখুন, পাঠান রাজকুমার, আমার আকাঙ্খা অতি ক্ষুদ্র। রাজ্যশাসন আমাদ্বারা হইবে না, আমি রাজ্য চাহি না। কামতারাজকুমারী করুণার সহিত কামতা-দুর্গটী ভোগে রাখিতে চাহি মাত্র। পীতাম্বর জীবিত থাকিলে আমার এ বাসনা পূর্ণ হইবে না। পীতাম্বরের নিপাত হইলে, তাহার পর যেরূপ কামতারাজ্য-দখলের সুবিধা হইতে পারিবে, সে সুযোগও আমি করিয়া দিতে পারিব, তজ্জন্য আমাকে অর্থসাহায্য করিতে হইবে।

মহম্মদ শা এতক্ষণ যদুনন্দনের কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, ভাবিয়াছিলেন, প্রাণের দায়ে প্রলাপ-বাক্য বলিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সরলভাবে যাহা বলিলেন, ইহাতে অবিশ্বাসের কারণ রহিল না। তাঁহার দৃঢ়তা বুঝিবার জন্য বলিলেন, "ইহাই যে আপনার প্রকৃত অভিপ্রায়, তাহা ঠিক বিশ্বাস হইতেছে না।"

সহসা যদুনন্দন যজ্ঞসূত্র বাহির করিয়া, উহা স্পর্শ করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আপনি জানেন, এ পবিত্র সূত্র আপনাদের কোরাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। ইহা স্পর্শ করিয়াই আমি অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি, যাহা আমি বলিয়াছি, সত্যই বলিয়াছি—কিছুমাত্র কপটতা করি নাই।"

মহম্মদ। উত্তম, আপনার বাক্যে বিশ্বাস করিলাম। আপনার বাসনাপরিপূর্ণের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিব, অঙ্গীকার করিলাম।

যদু। পাঠান রাজকুমার, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। এরূপ গুরুতর বিষয়ে আপনাকেও আর একটু কঠিনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে দেখিলে আপনার উক্তির প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়, আর আমিও নিশ্চিন্তে আমার প্রতিশ্রুতি-পালনে যত্নশীল হইতে পারি।

মহম্মদ। আমিও কোরাণ স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করিব এবং আপনাকে আমার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিব। আপনি আমার বাক্যে অবিশ্বাস করিবেন না।

যদু। আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস না থাকিলে, আমি মন খুলিয়া কদাচ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম না। তবু কার্য্যকালে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

মহম্মদ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমাদের এ পরামর্শ আপনি ও আমি ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হইবে না। এমন কি কার্য্যসিদ্ধির সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা কিম্বা ভ্রাতাকেও বলিব না।

অনন্তর মহম্মদ শা যদুনন্দনের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রণয়-বিবাহের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

আধুনিক সমাজে প্রচলিত অভিভাবক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পাত্রপাত্রীর বিবাহ-প্রথায় প্রগতিপন্থী নরনারী আর সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। প্রণয়-বিবাহকেই তাহারা আদর্শ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে, অনেকে সাহচর্য্য বিবাহেরও (companionate marriage) পক্ষপাতী। এই নির্ব্বাচন-প্রথা এবং প্রণয়-বিবাহ, ইহার কোনটীই ভারতে নূতন নহে। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই আট প্রকার বিবাহই প্রচলিত ছিল। প্রথম ছয়টী ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত হইলেও, সুসন্তানের জনক বিধায় ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারিটীকেই প্রশস্ত বলা হইয়াছে। অপর বর্ণের কথা উল্লেখ হইল না, কারণ ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় বলিয়া, তাহার জন্যই শ্রেষ্ঠ প্রথাগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারিটীতেই নির্ব্বাচনের প্রভাব রহিয়াছে। ব্রাহ্ম প্রথায় পিতা বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন বরকে কন্যাদান করেন। দৈবে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের পুরোহিতকে কন্যাদান করা হয়; ইহা পিতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তিনি কন্যাদানের উপযোগী পুরোহিত নির্ব্বাচন করিয়া যজ্ঞ করিতে পারেন। যাগাদি কর্ম্মের নিমিত্ত বরের নিকট হইতে গোবলীবর্দ্দ গ্রহণ করিয়া কন্যাদানকে আর্ষ বিবাহ বলে। ইহার উপরও নির্ব্বাচনের প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রাজাপত্যে যৌতুক দ্বারা প্রলোভিত করিয়া মনোনীত বরকে কন্যাদান করা হয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্যই সমাজের সাধারণ প্রথা, অপর দুইটী বিশেষ কার্য্যে বিহিত এবং তজ্জন্য বিরল। নির্দ্দিষ্ট রীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলেও, আধুনিক সমাজেও ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য এই দুইটীই প্রচলিত আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নির্ব্বাচনের শ্রেষ্ঠত্ব অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ কি না জানিয়া শুনিয়াই এই সকল বিধান করিয়াছিলেন?

প্রণয় বিবাহকে পূর্ব্বে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিত। ইহা পরস্পর অনুরাগের ফল, পিতার মনোনয়ন সাপেক্ষ নহে, এবং প্রধানতঃ কামমূলক। এই প্রথাটী ভারতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পায় নাই, অথচ পাশ্চাত্য দেশে ইহাকেই আদর্শ মানিয়া লওয়া হইয়াছে, এবং তাহার প্রভাব পুনরায় ভারতে আসিয়া অগ্রগতির পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। ইহা অগ্রগতি কি পশ্চাদ্গতি বিজ্ঞানের আলোকে তাহাই আমরা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বিবাহের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য যে যৌনমিলন এবং সন্তানোৎপাদন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—কথাটী প্রথমতঃ খুবই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও, ইহাই যে পরিণাম, সে কথা এড়াইয়া গেলে চলিবে না। জন্ম-নিরোধের (contraception) পন্থা আবিষ্কার হইলেও, ইহা জনকজননীর আজীবন পুত্রহীন থাকিবার উদ্দেশ্যে নহে। বস্তুতঃ, কোন নিঃসন্তান পিতামাতাই জীবনে সুখী হইতে পারেন না। অধিক সংখ্যক সন্তানের দায়িত্ব অবশ্য অনেকেই অবাঞ্ছনীয় মনে করেন।

কিন্তু এমন পিতামাতা কোথায় আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহাদের পুত্র রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রাণা প্রতাপ বা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র হউক। উচ্ছৃঙ্খল যৌন মিলনের ফলে এরূপ সন্তান যে জন্মে না, তাহা কে অস্বীকার করিবে? হয়ত ইচ্ছামতই মানুষ রাণা প্রতাপকে সন্তানরূপে পাইতে পারে না, কিন্তু ইহার সম্ভাবনীয়তাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পারিপার্শ্বিকতাকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রতাপাদিত্যের আদর্শে পৌঁছাইতে না পারিলেও, মোহনলাল বা মীরমদন লাভ একান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহার জন্য চেষ্টা কোথায়?

গ্রীগর মেণ্ডেল আমাদিগকে এই অভিনব রাজ্যে প্রবেশের পথ দেখাইয়াছেন। হুগো ডি-ভ্রিস্ তাঁহার বাগানে প্রিম্ রোজের (বাসন্তী ফুল বিশেষ) শোভা দেখিয়া

মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কে ইহাদের ভিতর নব নব রূপ বিকশিত করে? আমরাও প্রকৃতির নানা খেয়াল দেখিয়া চমৎকৃত হই। সকল গোলাপের বর্ণ, গন্ধ, আকৃতি এক নয় কেন? এই বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি কেমন করিয়া হইল? মানুষের ভিতরও দুইটী যমজ শিশুর সাদৃশ্য আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। আবার অপর দুইটী যমজ সন্তানে অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য তেমনি আশ্চর্য্যজনক। কোন একটী পিতার বৈশিষ্ট্য পুত্রে সংক্রামিত হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে হয় না। এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে মেণ্ডেলের বংশানুক্রমবাদ (Law of heredity)। ইহার সাহায্যে প্রজনন-বিদ্যায় মানুষ অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, জাতির এবং বংশের উৎকর্ষ লাভও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

প্রাণী-জগতের অতি নিম্নস্তরে গেলে আমরা দেখিতে পাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগুলি কোশ-বিভাগ দ্বারা আপনাদের বংশ-বিস্তার করে, পিতামাতার মিলনে সন্তান উৎপন্ন হয় না। এইরূপ অযোনিজ সন্তান সকলেই প্রায় একরূপ, কাহারও সাথে কাহারও বিভিন্নতা অতি অল্প, নাই বলিলেও চলে। কিন্তু পিতামাতার যৌন-মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মে, তাহারা কেহই একরূপ নহে, যদিও কতকটা সাদৃশ্য অসম্ভব নহে। সন্তানে পিতামাতার আকৃতি এবং গুণ উভয়েই সঞ্চারিত হইয়া বৈসাদৃশ্যের সৃষ্টি করে, অর্থাৎ শিশু, পিতা ও মাতা উভয়ের কাহারও মত হয় না। এইভাবে বংশানুক্রমে রূপ-গুণ সঞ্চারিত হইয়া প্রাণী-জগতে (উদ্ভিদ্-জগতেও) নিত্যই রূপান্তর ঘটিতেছে। কি নিয়মে এই সকল রূপান্তর ঘটিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই বলা সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা আজ অনুমানের ফল নহে, পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত। কয়েকটী ঘোটক-বংশের শত বৎসরের জন্ম-বিবরণী আলোচনা করিয়া, ইহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া আশানুরূপ ঘোটক প্রজনন করা আজকাল আর অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। শুধু ঘোড়া নয়, অনেক পশু এবং উদ্ভিদেই এই প্রক্রিয়া দ্বারা বংশোন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে এবং হইতেছে। মেণ্ডেলের পূর্ব্বে যে যৌন-নির্ব্বাচন হয় নাই, তাহা নহে। তবে তখন এ সম্বন্ধে কাহারও মনে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য মিলিত হইয়া কোন্ নূতন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়, মানুষ তাহা জানিত না। এখন ইহা (পরীক্ষিত ক্ষেত্রে) জানা গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কতগুলি সন্তানের বৈশিষ্ট্য একরূপ হইবে, কতগুলির বিভিন্ন হইবে, কি কি বৈসাদৃশ্য হইবে, তাহাও বলা সম্ভব। এখনও বিস্তৃত জ্ঞানের জন্য এ সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে।

প্রজনন-প্রণালী লইয়া মানুষ বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই পরীক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ইজিপ্টের রাজবংশে এবং ইউরোপীয় রাজাদেরও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অন্তর্জনন (inbreeding) প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ হইত। এইরূপ বিবাহ যে, বিপজ্জনক তাহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে।

মেণ্ডেলের বিধি অনুসারে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তানে আসিয়া মিলিত হয়। সাধারণতঃ, যে সকল বৈশিষ্ট্য জীবন-যাত্রার প্রতিযোগিতার উপযোগী, তাহারা বিশেষ ভাবে প্রভাবশালী হইয়া উঠে। যেমন, ফুলের বর্ণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মৌমাছি মধুহরণে ফুলে ফুলে বিচরণ করে। ইহার ফলে শত শত পুংকেশর তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে লাগিয়া যায়। এই মৌমাছি যখন অন্য একটী ফুলে যায় তখন সেই দ্বিতীয় ফুলটীর কর্ণিকায় (Pistil) রেণুগুলি সংলগ্ন হইয়া থাকে। পরে ইহা গর্ভকোষে নীত হইয়া বীজ উৎপন্ন করে। এখানে ফুলের বর্ণ তাহার জীবন-সংগ্রামের সহায়ক। তজ্জন্য এইরূপ বৈশিষ্ট্যকে সঞ্চারী (dominant) বৈশিষ্ট্য বলে। অবশ্য সকল বর্ণই সমান সঞ্চারী নহে। আর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য গুপ্ত থাকে, সুযোগ পাইলে প্রকাশিত হয়। এইগুলি অসঞ্চারী (recessive)। ইহারা সাধারণতঃ জীবন-যাত্রার অনুপযোগী। অবশ্য সকল সঞ্চারী ও অসঞ্চারী বৈশিষ্ট্যের বেলাই এক নিয়ম খাটে না, কোনটীর শক্তি বেশী, কোনটীর কম।

কোন পুরুষে যদি একটী সাজ্ঞাতিক অসঞ্চারী বৈশিষ্ট্য লুকাইয়া থাকে এবং ঐ পুরুষ যদি অনুরূপ অসঞ্চারী বৈশিষ্ট্য যুক্ত কোন নারীর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানে ঐ অসঞ্চারী বৈশিষ্ট্যটী প্রকাশ হইয়া পড়ে। যেমন, একটী পুরুষ ও একটী নারীর উভয়ের পিতামহ উন্মাদ ছিলেন, কিন্তু তাহাদের সন্তান সন্ততিতে উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ঐরূপ নারী পুরুষে উন্মাদ

লক্ষণ অসঞ্চারী হইলেও, তাহাদের যৌন-মিলনে সন্তান উন্মাদ হইবে। কিন্তু উভয়ের একজনের পূর্ব্বপুরুষের কাহারও যদি উন্মাদ লক্ষণ না থাকিয়া থাকে, তবে সেরূপ ক্ষেত্রে সন্তানেও উন্মাদ-লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়াই সম্ভব, অর্থাৎ অসঞ্চারী হইয়া থাকা সম্ভব। আমেরিকায় এরূপ কতকগুলি পরিবারের ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে।

মার্টিন কিলিকাক * কোন পান্থনিবাসের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক একটী পরিচারিকার প্রলোভনে পড়েন। উভয়ের যৌন-মিলনের ফলে পারিচারিকার একটী সন্তান জন্মে। এই অবৈধ সন্তানটী হইতে পাঁচ পুরুষে ৪৮০ জন সন্তান-সন্ততির উৎপত্তি হয়। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, এই কিলিকাক বংশের মাত্র ৪৬ জন স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করিয়াছে; ১৪০ জন সম্পূর্ণ দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক এবং বাকী সকলের খবর সংগ্রহ হয় নাই। মার্টিন কিলিকাক পরে ভদ্র ঘরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার বৈধ সন্তানগুলি সকলেই সুন্দর, সবল এবং বুদ্ধিমান্।

দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক নরনারীর সহিত ভাল ঘরে বিবাহ প্রায় হয় না, তজ্জন্য ইহাদের সন্তান সন্ততি সাধারণতঃ বিকৃত স্বভাবাপন্ন হয়। ক্ষীণ-মস্তিষ্কের সহিত বংশানুক্রমে সবল, মেধাবীর যৌন-মিলন হইলে, ক্ষীণতা অসঞ্চারী হইয়া থাকে এবং এইরূপ সন্তানগুলি সমাজে নিগৃহীত হয় না। এরূপ উদাহরণের অন্ত নাই।

সুতরাং বিবাহে যতদূর সম্ভব পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় লওয়া অযৌক্তিক নহে। কুল, গোত্র, বংশে কোন কলঙ্ক আছে কিনা, প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে কিনা, ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে, ইহা দ্বারা শুধু সন্তান-সন্ততির নহে, সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা একটী অশ্ব বা কুকুরের প্রজননের জন্য শত বৎসরের ইতিহাস খুঁজিতেও বিমুখ হই না। কিন্তু মানুষের বেলা এই সত্যকে অবহেলা করিয়া প্রণয়-বিবাহকে আদর্শ মানিতে দ্বিধা বোধ করি না। আর্য্য ঋষিগণ এই তত্ত্ব যে অবগত ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মনু-সংহিতায় দেখিতে পাই—"ক্রমাবস্থিত ব্রাহ্মাদি চারি বিবাহে অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে যে যে সন্তান জন্মে, তাহারা ব্রহ্মতেজোযুক্ত ও সাধুসম্মত হন। তাহারা সুরূপ, সত্ত্বগুণ প্রধান্, ধনবান্, যশস্বী, পর্য্যাপ্ত ভোগবান্ ও ধার্ম্মিক হন এবং শত বৎসর জীবিত থাকেন।" বিবাহে নির্ব্বাচন-প্রথার শ্রেষ্ঠতা অবিসম্বাদিত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

প্রণয়-বিবাহে বরকন্যা পরস্পর পরস্পরের মনের পরিচয় ব্যতীত বংশ-পরিচয় লইতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে পারিলেও তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ।

আমাদের দেশে বিবাহের কতকগুলি বিধি আছে। এই অনুসারে নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই রীতি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। গিনিপিগের (guinea-pig) মধ্যে ২৩ পুরুষ যাবৎ অন্তর্জনন (inbreeding) করিয়া ৩০,০০০ সন্ততির মধ্যে দেখা গিয়াছে, ক্রমেই ইহাদের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। জন্মের সময় এবং স্তন্য-ত্যাগের পূর্ব্বের মৃত্যুহার, প্রজনন শক্তি, ব্যাধি-প্রতিষেধক ক্ষমতা প্রভৃতিতে ইহারা অন্তর্জনন দ্বারা বিশেষ অপকৃত হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যেই প্রজনন নিবদ্ধ রাখা হইয়াছিল।

অন্তর্জ্জননের ফলে দম্পতীর অবাঞ্ছনীয় অসঞ্চারী বৈশিষ্ট্যগুলি মিলিত হইয়া, তাহা সঞ্চারী হয় অর্থাৎ প্রকাশ পায়। দীর্ঘদিনের বংশ-পরিচয় হইতে যদি জানা যায় যে, কোন বংশে একটীও অবাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নাই, তাহা হইলে ভ্রাতা ভগিনীতে যৌন-মিলন হইলেও, ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ বংশ পাওয়া দুষ্কর এবং এই মিলনে ক্ষতি না হইলেও বংশের উন্নতি হওয়ার ও সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্যই নিকট আত্মীয়ে বিবাহ নিষিদ্ধ।

বিবাহ যে একমাত্র প্রজননের জন্যই নহে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং বংশ-পরিচয়ও যেমন দরকার, মনের পরিচয়ও তেমনি প্রয়োজন। সুতরাং পিতামাতা কর্ত্তৃক সংঘটিত বিবাহ মনোবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া অনেক সময় সাফল্য-মণ্ডিত নাও হইতে পারে। তবে প্রণয়-বিবাহে যতটা সাফল্য ঘটে, নির্ব্বাচিত বিবাহে তদপেক্ষা অনেক বেশী সাফল্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আদর্শ বিবাহে পিতামাতা কর্ত্তৃক মনোনীত বরপাত্রীর পূর্ব্বেই পরস্পরের মনের পরিচয় করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

* পরিচয় গোপন রাখার জন্য কল্পিত নাম দেওয়া হইয়াছে।

অভিভাবক কর্ত্তৃক সংঘটিত পরিণয়ে সাধারণতঃ মনের মিল হইতে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না। বিখ্যাত ডাঃ জন্‌সন্‌ একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক সমাজে নানা কারণে পিতামাতা মনোমত বর বা কন্যা সংঘটন করিয়া উঠিতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে (যেখানে জানিয়া শুনিয়া অসামঞ্জস্য সমর্থন করিতে হয়) প্রণয়-বিবাহ বরং বাঞ্ছনীয়।

প্রণয়-বিবাহ যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটা হইতেই অনুমেয়। সাহচর্য্য-বিবাহ রুষিয়ায় কৃতকার্য্য হয় নাই। পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ইহাতে ঘটিয়া উঠে না, বরং অযথা মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না যে, আধুনিক প্রণয়-বিবাহ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে।

স্বপ্নলব্ধ বাস্তব

(গল্প)

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

চল্লিশের পরে শিবদাস বিবাহ করিল।

আর ইহার পূর্ব্বেকার জীবনেতিহাস তাহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যেরই সাক্ষ্য দেয়; কেননা, অংস-বিলম্বিত কেশ, বক্ষ-বিলম্বিত শ্মশ্রু;—আর আগাগোড়াই কেমন যেন রুক্ষ কটা কটা, যদিও জটা তখনও ঠিক গজায় নাই।

শিবদাস ছিল শঙ্করের একজন একনিষ্ঠ সেবক। পশ্চিমা সাধু-সন্ন্যাসীদের চিম্‌টা বহিয়া বহিয়া গাঁজা টেপায় একদিন সে বেশ হাত পাকাইয়া ফেলিয়াছিল। সংসারের বালাই বলিয়া কিছু ছিল না তাহার ঘাড়ে। ছিল বেশ। কিন্তু ভক্তের প্রতি সহসা একদিন তুষ্ট হইলেন শঙ্কর। শঙ্কর সশরীরে আবির্ভূত হইলেন শিবদাসের সম্মুখে—অবশ্য স্বপ্নে। এবং আদেশ করিলেন, রে ভক্ত আমার! তোর কঠোর সাধনে আমি তৃপ্ত হয়েছি। আমার আদেশে তুই এখন থেকে সংসার-ধর্ম্ম পালন কর্।

শঙ্করের আদেশ অমান্য করিবার দুঃসাহস শিবদাসের নাই। কাজেই শিবদাস আদেশ যথারীতি পালন করিল। পরদিনই অংস-বিলম্বিত কেশ, বক্ষ-বিলম্বিত শ্মশ্রু নিশ্চিহ্ন করিয়া শিবদাস এক নূতন মানুষ সাজিল। শিবদাসের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মেয়ে দেখিয়া সমস্ত ঠিক-ঠাক করিয়া আসিল এবং শুভলগ্নে বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল।

শুভদৃষ্টিতেই শিবদাস সন্তুষ্ট হইল। সে-রাত্রে স্বপ্নে শঙ্কর ঠিক এমনই একটি মেয়েকেই তো তাহার হাতে সম্প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু এই অদ্ভুত সত্য সে বহুকষ্টে চাপিয়া রহিল, কাহারও কাছে কিছু প্রকাশ করিল না।

সুরু হইল নিদারুণ বাস্তব।

শিবদাসের বড় ভাই গঙ্গাদাস নিঃসন্তান, কাজেই বংশ রক্ষার আয়োজন করিয়া দিয়া হৃদ্‌রোগে বংশের মায়া কাটাইয়া শিবদাসের বিবাহের অল্পদিন পরেই বিদায় গ্রহণ করিল। শিবদাসের ঘাড়ে চাপিল সংসার। গঙ্গাদাসের স্ত্রী নবতারা ঘোর উন্মাদ, কাজেই স্বামীগৃহে তাহার স্থান হয় নাই। আর সেই কারণেই গঙ্গাদাস জীবনের প্রশস্ত ভুল-পথে পা বাড়াইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই এবং অল্পদিনেই তাই পৈতৃক ভিটাটিও বাঁধা রাখিয়া যাইতে পারিয়াছে। সংসার ঘাড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবদাস তাহা টের পাইল, কিন্তু তখন আর কিছুই করার ছিল না।

তার পরেই এক, দুই, তিন……তিন বছরে তিনটি। শিবদাসের চক্ষু কপালে উঠিল। শঙ্কর যেরূপ নির্ম্মমভাবে

তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের একটির পর একটি ভক্তের দুয়ারে পাঠাইতে সুরু করিয়াছেন তাহাতে ভক্তের প্রাণ তো কণ্ঠাগত। তিন নম্বর যেদিন ঘরে আসিল, সেদিন ঘরে চা'ল বাড়ন্ত, একটা ধাই ডাকার সামর্থ্যও শিবদাসের নাই। সকালবেলা দুধওয়ালী টাকার জন্য যে সব দুর্ব্বাক্য শুনাইয়া গিয়াছে, তাহা তখনও শিবদাসের মাথার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল।

শিবদাস অগত্যা কাতর করুণ দুইটি চক্ষু তুলিয়া ঘরের দরজার সম্মুখে বসিয়া থাকে। ইচ্ছাটি তাহার যেন, ধাই ডাকার সামর্থ্য যখন তাহার নাই, তখন ধাইয়ের কাজ নিজে করিতে আপত্তি কি?

স্ত্রীর কিন্তু আপত্তি আছে। অনেকবার বলিয়াও যখন শিবদাসকে সেখান হইতে সে উঠাইতে পারে নাই; তখন ভিতর হইতে ঘরের দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া নিশ্চুপ হইয়াছে।

এমন দিনেই শিবদাস প্রথম আবিষ্কার করিল যে, বড় ছেলেটি তাহার জিনিয়স্।

...একটা বাচ্চা পাঁঠার কাণ ধরিয়া ফেলা হিড়্হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিয়া পিতার সম্মুখে সেটিকে হাজির করাইয়া দিয়া সগর্ব্বে একটু হাসিল।

পিতার আর কোন সন্দেহই রহিল না যে, ছেলেটি তাহার অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন।

শিবদাস লোকের কাছে বলে, ও আর দেখতে হবে না, ফেলাটা নিশ্চয় গত-যুদ্ধের একটা মস্ত জেনারেল্-ফেনারেল্ কিছু হবে। নইলে কথায় কথায় বেটা বলে কিনা গুলি করবো।

সকলেই সায় দেয়, বলে, তা' হবেও বা।

কেউ আবার হয়তো বলে, শিবদা', ফেলাটা তোমার সত্যিই জিনিয়স্। আর এই বয়েসেই যা—

কিন্তু যা, তাহা আর বলিয়া কাজ নাই, কেহ তাই বলেও না।

ফেলার পরেরটি সতু। এখনও তাহার মধ্যে প্রতিভার উন্মেষ কিছু পরিলক্ষিত হয় নাই—পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছে মাত্র। আর নবজাতটির সম্বন্ধে এখন নীরব থাকাই ভাল। তবে আশা করা যায়—পিতৃহৃদয়ের আশা তাহাদেরও অচিরে জিনিয়সে পরিণত দেখিবে।

শিবদাস ছোট একটা সুরকির কলে সরকারের কাজ পাইল। কিন্তু দুইদিন কাজ করার পরেই কলের বাবু জানাইয়া দিলেন, অমন চেহারা-মাফিক লেখা হ'লেতো চলবে না বাপু। কারণ, লেখাটা আমাদেরও পড়া চাই তো? বুঝলে না?

শিবদাস সভয়ে বিশীর্ণ মুখ তুলিয়া বলিল, সেই কোন্ জন্মে ওসব বালাই ঘুচে গেচে, আবার নতুন ক'রে পত্তন বললেই হয়;...তা' দু'দিনেই ঠিক ক'রে নেব, দেখবেন।

—তা' দেখছি, নইলে ব্যবস্থাটাই পাল্টাতে হবে। কি আর করা যাবে!

শেষে ব্যবস্থাটাই পাল্টাইতে হইল।

শিবদাস দুই-চারিদিন আবার সেখানে হাঁটাহাটি করিয়া কলের কর্ত্তা প্রদোষবাবুকে নিজের দুঃখ-দৈন্যের কথা সবিস্তারে বিনাইয়া বিনাইয়া শুনাইয়া আর একটা কাজ বাগাইয়া লইল। লেখাপড়া তাহাতে নাই অবশ্য, কিন্তু অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। আদায় তহশিলের কাজ।

শিবদাস শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ মনে মনে অনুমান করিয়া লইয়া দারিদ্র্যের কঠিন পীড়ন যে এড়াইতে পারিবে তাহারই আনন্দে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

ফেলা পাড়ার একটা ফ্রী প্রাইমারী স্কুলে পড়ে। স্কুলের ছুটীর পরে ছেলের দল হল্লা করিয়া বাড়ী ফেরে। দেবী—শিবদাসের স্ত্রী—দরজার কাছে আসিয়া রাস্তার পানে চোখ পাতিয়া চাহিয়া থাকে। কত ভয়—কত শঙ্কা সে-চোখে। কি জানি, ফেলা যা' দুরন্ত। ছেলেয় ছেলেয় মারামারি তো বাধেই, আর সে-বিষয়ে ফেলা ডিগ্রী পাইয়াছে।

সেদিনও ঠিক তাই। ফেলা রাস্তার পাশের একটা বাড়ীর পাঁচিলের উপর দাঁড়াইয়া দারুণ আক্রোশে একজন

সহপাঠীকে বিশ্রী অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ সুরু করিয়াছে। আর উক্ত সহপাঠী নীচে দাঁড়াইয়া আরক্তিম মুখে বলিতেছে, নেমে আয় না দেখি একবার—

ফেলা প্রত্যুত্তরে সুর করিয়া বলিল, মুখ সাম্‌লে কথা ক'—

দেবী ডাকিল, ফেলা, অ ফেলা, হতভাগা, ভাল চাস্‌তো শীগ্‌গিরই এই দণ্ডে ঘরে আয় বল্‌চি।

ফেলা সে আহ্বান গ্রাহ্যও করিল না।

ছেলেটি ফেলার কথায় বাধা দিয়া বলিল, বলব, একশোবার বলব। তোকে বলব—তোর তোর বাবাকে—চৌদ্দপুরুষকে—বলব!

তবেরে!—বলিয়া ফেলা চোখ কাণ বুজিয়াই লাফ মারিল। ছেলেটি সভয়ে ছুটিয়া পলাইল। আর ফেলা পড়্‌তো পড়্ একেবারে মুখ থুব্‌ড়াইয়া গিয়া পড়িল—সাম্‌নের খানায়—রাস্তার নর্দ্দামায়।

দেবীর মুখ দিয়া শুধু অতি দুঃখে বাহির হইল, ও মাগো!

জীবনটা তাহার এমনই ঝকমারি। না আছে তিলেক শান্তি; না আছে সুখ। ছেলে তিনটির একটিও শায়েস্তা থাকে না। গরীব স্বামীর ঘর করিতে তাহার লজ্জা নাই; কিন্তু লোকে যে তাহার স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতার সুযোগ লইয়া দশকথা শুনাইয়া যায়, তাহা যেন তাহার অভিমানে দারুণ আঘাত হানে। ভারি পল্‌কা, একটুতেই সে ভাঙ্গিয়া পড়ে। জীবনের প্রথম বর্ণ-পরিচয়ে যে অর্থবোধ হয়, তাহার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগ আর তৃতীয় ভাগ যেন কিছুতেই খাপ খায় না। তৃতীয় ভাগ তো আজিও অন্ধকারে।

পোড়া-কপালী দেবী—অর্থাৎ নিজেকে সে যাহা বলিয়া ক্ষোভ মিটায়—কায়-মনো-বাক্যে না-দেখা দেবতার নিষ্ঠুরতা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে এই বলিয়া যে, তাহার আগেই যেন—

মাসে পনেরোটি মাত্র টাকা। সংসার চলে না বলিলেই হয়। শিবদাস ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করিয়া গুরুর নাম জপিতে জপিতে পকেট হাতড়াইয়াই আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলে, পাজিটা—নচ্ছারটা—গেল কোন্ চুলোয়?

—কেহে, কা'কে এই ভোরবেলা উঠেই চুলোয় পাঠানো হ'চ্ছে?

—আর কা'কে···এস, এস, আরে ব্রজদা' যে!

—ব'লবার আগেই আসতে তোমার ব্রজদা' কবে কসুর করেচে শুনি? যা'ক্, কার কথা বলছিলে ভায়া?

শিবদাস বিশেষ বিষণ্ণভাবেই বলে, পকেটে একটা আধুলি ছিল। মাসের শেষ তিন্‌টে দিনের সম্বল···আর নেবেই বা কে...ঐ হতভাগাটাই হয়তো।

ব্রজকিশোর বলে, তা' তোমার ওঠার দেরী দেখে বৌমাও তো খরচ করবার জন্যে নিয়ে থাকতে পারে। তা'কেই একবার জিগ্‌গেস্ ক'রে দেখো না।

এমন সময়ে ফেলা কোচরে মুড়ি-মুড়কি বাঁধিয়া হাসিমুখে মা'র কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। দেবী একটা ধমক্ দিয়া বলে, মুড়ি-মুড়কি কেনার পয়সা পেলি কোথায় শুনি?

ফেলা কোন উত্তর না দিয়া হাসে।

দেবী তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বাঁ-গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া বলে, এখনও ভাল চাসতো বল্ শীগ্‌গির।

ফেলা তাড়াতাড়ি বলে, মাইরি, মা-কালীর দিব্যি, পাঁঠার দিব্যি,...আমি চুরি করিনি।

—তবে পেলি কোথায়?

—বাবার পকেটে ছিল। সত্যি, চুরি করিনি।

শিবদাস ঘরের বাহিরে আসিয়া বলে, আর বাকী পয়সা সব কোথায়?

ফেলা বলে, পয়সা আবার কিসের? এই যে মুড়ি-মুড়কি।

শিবদাস হতাশ হইয়া বলে, একটা আধুলি ভিন্ন পকেটে যে আর কিছুই ছিল না।

দোকানদার বেমালুম অস্বীকার করিয়া বসে।

দেবী তাই রাগে দুঃখে ক্ষোভে বেধড়ক্ চড়-চাপড় বসাইয়া দিয়া ফেলাকে কাঁদায়। শিবদাস কিন্তু কিছুই

বলিতে পারে না। দৈন্য ঘুচাইতে না পারার নিদারুণ লজ্জা তাহার পাঁজ্‌রায় পাঁজ্‌রায় ব্যর্থতার করুণ মূর্চ্ছনা তুলিয়া বাজিতে থাকে।

ব্রজকিশোর শিবদাসের মুখের পানে তাকাইয়া তাহার হাতের মধ্যে আনা দশেকের পয়সা গুঁজিয়া দিয়া বলে, এতেই এ ক'টা দিন কোনরকমে চালিয়ে নাও, পারলে ও-মাসে আমাকে দিলেই চ'লবে।

দান করিয়া শিবদাসকে সে ছোট করিতে পারে না।

বাড়ী ফিরিয়া ব্রজকিশোর দেখে, মেয়ে রাণু মেছুনীর সঙ্গে দর কষাকষি করিতেছে।

রাণু বলে, বাবা, তিন আনার পয়সা দাও, একপো মাছ রাখি।

ব্রজকিশোর অতি সহজভাবেই বলে, আজতো মা আর পয়সা নেই। আর, মাস-কাবারে কি থাকে কখনও!

রাণু মেছুনীকে বিদায় করিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলে, এমন ক'রে আমাকে অপমান করবার কি দরকার ছিল? মাছ রাখতে তবে ব'লে যাওয়াই বা কেন?

—ভগবানের মান রাখতে গিয়ে তোকে যদি একটু অপমানই ক'রে থাকি রাণু···

আর কিছুই সে প্রায় বলিতে পারে না। যাহা বলে তাহাও এত আস্তে বলে যে, রাণুর অভিমান-পীড়িত অন্তরে গিয়া তাহা পৌছায় না।

হাজার ডাকেও আর সাড়া মেলে না। মানুষের হয়তো বা মেলে, কিন্তু দেবতার মেলে না। দেবী তাই অবাক হইয়া যায় যে, এতবড় মিথ্যার উপর মানুষ নির্ভর করিয়া বাঁচে কেমন করিয়া?

ছোট ছেলে দুইটীর আজ তিন দিন ধরিয়া জ্বর। দুরন্ত দামাল ছেলে দুইটিকে এমন কাহিল হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার ভাল লাগে না। অথচ চার পাঁচ দিন আগেও হয়তো সে বলিয়াছে, দস্যিগুলোর জ্বরও হয় না। দু'দণ্ড স্বস্তিতে থাকি।

মায়েরা চিরদিনই এমন বোকা।

শিবদাস ঘরে ঢুকিয়াই বলে, রামায়ণ আর মহাভারত —এ দু'টো হ'লো গিয়ে মহাকাব্য। এ'দের না মেলে জোড়া, আর না মেলে সেরা,—খাঁটি দেবতার মুখের বাণী বাবা। এর আর যুক্তিতে খণ্ডন চলে না...অকাট্য!

দেবী স্বামীর মুখের পানে অর্থহীন দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া থাকে। শিবদাসের একটা কথাও তাহার কাণে যায় না, যাহা যায় তাহাও সে ভাল করিয়া বোঝে না। এমনই দুর্ভাবনা-জর্জ্জর মাতৃহৃদয়।

শিবদাস একটু থামিয়া আবার বলিয়া চলে, সেদিনকার ছেলে সব! আরে মর্, রামায়ণ মহাভারতের মর্ম্ম তোরা বুঝবি কি! এত হেলা—কাজেই তো দশ জাতে মারে ঠেলা। গেল, গেল, সব গেল!

দেবী সভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া দুই হাত দুই ছেলের বুকের 'পরে রাখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে কে গেল।

শিবদাসের এতক্ষণে চৈতন্যোদয় হয়, বলে, না, না,... এই রাস্তায় পাড়ার যত সব ছেলেরা তর্ক তুলেছিল। যাক্, এখন ওরা কেমন আছে?

ফেলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলে, মা, ডাক্তার বাবু বলেছেন, তোমার রূপে তার নাকি পেট ভরে না, টাকা দিতে পারলেই তবে আসবেন।

য়্যা!—শিবদাস মর্ম্মাহত হয়।

দেবী ভাবপ্রকাশের শক্তিও হারাইয়া ফেলে।

—শিবদাসবাবু বাড়ী আছেন?

শিবদাস বাহিরে আসিয়া দেখে, ডাক্তার সাহেবের চাকর বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। বলে, কেন?

—ডাক্তার সাহেব একবার এখ্‌খুনি আপনাকে ডাকছে।

শিবদাস তাহার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিচলিত হইয়া বলে, খুব তাড়াতাড়ি কেন?

—গেলেই শুনতে পারবেন। আপনার দস্যি ছেলে শেলেট্ ছুঁড়ে মেরে ডাক্তার সাহেবের কপাল ফাটিয়ে এসেচে।

—বলিস্ কি বেটা?

শিবদাস বেচার সঙ্গে একপ্রকার ছুটিয়াই চলে। দেবী দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব শোনে। সমস্ত মন তাহার আনন্দে ভরিয়া ওঠে। দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজাইয়া দিয়া ডাকে ফেলা, অ ফেলা—

ফেলা ভয়ে আর সাড়া দেয় না। ফেলা স্কুলে যাওয়ার সময়ে দেবী তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল সত্য, কিন্তু ছুটি হইলে ডাক্তারবাবুর বাড়ী গিয়া যা কাণ্ড বাঁধাইয়া আসিয়াছে, সেজন্য মায়ের ডাকে সাড়া দিতেও সে আর সাহস পায় না। দেবী ঘরে ঢুকিয়া দেখে, ফেলা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে পাষাণ মূর্ত্তির মতই নিষ্প্রাণ। দেবী সস্নেহে তাহার একটা হাত ধরিয়া কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া নিয়া চুমায় চুমায় তাহার কপাল ছাইয়া দিয়া বলে, হ্যাঁরে ফেলা, তুই ডাক্তারবাবুকে শেলেট ছুড়ে মেরেছিলি নাকি?

ফেলা তখনও ভয়ে ভয়ে বলে, হ্যাঁ, মেরেছিইতো। ও কেন বললে—

দেবী তাহাকে সজোরে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের উপর নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া নীরব হইয়া থাকে। সমস্ত জীবন তাহার এই একটি মুহূর্ত্তের আনন্দে যেন ধন্য হইয়া উঠে।

শিবদাস অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিয়া আসে। পথে নিজের অদৃষ্টটাকে দোষ দেয়, শঙ্করকে স্মরণ করে। ঘরে ফিরিয়া ফেলাকে মারিতে যায়; কিন্তু দেবী আজ বাধা দেয়—অবশ্য এই প্রথম।

রাস্তার অপর পাড়ে ত্রিতল মস্ত ইমারৎ। অত বড় ইমারৎ ভোগ করে তাহারা দুইজনে—স্বামী-স্ত্রীতে। আত্মীয়ের বালাই নাই; কিন্তু দাসদাসীরও অভাব নাই।

সুমিত্রা এক-আধদিন যেন পথ ভুলিয়াই দেবীর কাছে আসে। দেবী কিন্তু মোটেই সুমিত্রাকে মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে না।

সুমিত্রা যেন মধ্যাহ্নের সূর্য্য। দেবী তাই ভয়ে ভয়ে চায়, পাছে চোখ তাহার ঝল্‌সাইয়া যায়। আর দেবী নিজেতো অস্তসূর্য্যের শেষ রশ্মিপাত—বড়ই ম্লান।

সুমিত্রা বলে, কেমন আছো দিদি? সময় ক'রে উঠতে পারি না, নইলে রোজই তো একবার আসতে সাধ যায়।

দেবীর মনে হয়; এমন করিয়া ব্যঙ্গ করার অধিকার যেন তাহার আছে।

ফেলা কয়দিন ধরিয়া একটা ঝড়ে উড়িয়া আসিয়া পড়ার শালিখ পাখীর বাচ্চা লইয়া নিতান্তই ব্যস্ত। খাঁচায় পুরিয়া সেটির খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধানেই তাহার দিন কাটে।

সুমিত্রা ফেলার পানে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। ইচ্ছা হয়, উহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকের সঙ্গে পিষিয়া ফেলিয়া দেখে যে কি এমন ক্ষুধা তাহার মেটে নাই। কিন্তু পারে কই? তাহার আভিজাত্য তাহাকে ভীষণ চোখ রাঙাইতে থাকে। কোনদিন এ-দুর্ব্বলতা সে কেন জানি জয় করিয়া উঠিতে পারিল না।

দেবী তাহার এই লোলুপদৃষ্টিকে কেমন জানি ভয় করে। সে জানে, সুমিত্রা বন্ধ্যা···মাতৃত্বের বিপুল বানে সে ভাসিয়া আসে দরিদ্রের কুটীরে—আভিজাত্যের প্রচণ্ড দাপটে করে মাতৃত্বের অবমাননা। দেবী কিছুতেই তাই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে না। ধনীর দেবতা করে কিনা জানি না।

সুমিত্রা যাবার বেলা বলে, আজ আসি তবে দিদি। ও এলে পরেই আবার মহিমবাবুর বাড়ীতে টি-পার্টিতে যেতে হবে। হয়তো এতক্ষণে এসেও গেছে। জামাই-বাবু বাড়ী ফেরেন কখন?

সমস্তই যেন ব্যঙ্গ, আর ব্যঙ্গ···দেবী উত্যক্ত হইয়া ওঠে। বলে, ওঁর ফেরার সময়তো কিছু ঠিক নেই।

আচ্ছা, আর একদিন আসব—বলিয়া সুমিত্রা ফেলার কর্ম্মচঞ্চল মুখের পানে একবার চাহিয়া চলিয়া যায়।

রাস্তায় নামিয়াই একচক্ষু দেবতাকে সুমিত্রা দোষে, ওদের ঘরে পঙ্গপাল, আর···

দেবী মনে মনে বলে, আমার দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করার অধিকারও ওর নেই।

ফেলা হঠাৎ মা'র কোলের কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলে, মা, ওকে আর বাড়ীতে ঢুকতে দিও না। ও রাক্কুসী এমন ক'রে চায়—আমার ভয় করে।

দেবী সভয়ে ফেলাকে নিজের কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরে। সতু এই সুযোগে একবার খাঁচার কাছটিতে গিয়া বসে। ফেলা মা'র বন্ধন হইতে জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া সতুর উপর তম্বি সুরু করে। সতু নিতান্ত অপরাধীর মত ধীরে ধীরে মা'র কাছে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলে। শিশু-মন অপমান সহিতে পারে না।

শিবদাস কর্ম্মান্তে সারা পথ টলিতে টলিতে বাড়ী ফেরে এমনভাবে যেন, জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া চলে, হে শঙ্কর—আরও কতদূর?

তবু আজিও সে সেদিনের মতই বিশ্বাস করে, শঙ্করের আদেশেই তাহার বিবাহ।

সহ-শিক্ষা

শ্রীসন্তোষকুমার দে এম্-এ., এইচ্. ডিপ্. এড্ (ডবলিন)

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ সহ-শিক্ষা সম্বন্ধে দৈনিক ও মাসিক পত্রে এত প্রবন্ধ ও সমালোচনা বাহির হইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে আর কিছু না লিখিলেও চলিতে পারে। এই সব প্রবন্ধ বা সমালোচনাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণী হইল, সহ-শিক্ষার পক্ষে আর দ্বিতীয় শ্রেণী হইল, ইহার বিপক্ষে। যাঁহারা সহ-শিক্ষার বিপক্ষে, তাঁহাদের প্রধান ভয়ের কারণ হইল, সহ-শিক্ষার প্রচলন হইলে, দেশের মেয়েরা বেয়াদব হইয়া পড়িবে ও নৈতিক চরিত্রের উচ্চ আদর্শ খাট হইয়া যাইবে। সহ-শিক্ষার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দিতে হইলে, এই সন্নীতির প্রশ্ন ছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে, সেগুলি আমাদের ধীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখা উচিত। এইরূপ একটি কঠিন সমস্যা এই একটি মাত্র কারণে গৃহীত বা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত নয়।

এ সমস্যা অতি আধুনিক। আমাদের দেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া পর্য্যন্ত, সহ-শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই উঠে নাই। অবশ্য তাহার কারণও আছে। প্রথমতঃ, শিক্ষা বলিতে আমাদের দেশে ধারণা ছিল, তাহা পুরুষেরই একচেটিয়া—স্ত্রীলোকের যে শিক্ষার প্রয়োজন বা শিক্ষার উপর যে তাহাদের কোন দাবী আছে, সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনে মাতৃজাতির সাহায্য যে কতটা আবশ্যক, তা' তখনকার দিনে কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁরা স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহ দেওয়া ত পরের কথা, বরাবর তাহার বিরোধিতাই করিয়া আসিয়াছেন। খনা, গার্গী, লীলাবতী যে এদেশেরই মেয়ে, তা' তাঁরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যাই হোক, এ কলঙ্ক দেশকে বহুদিন ভোগ করিতে হয় নাই। দেশে ইংরাজী-শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা প্রথমেই ব্যাপকভাবে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষানীয়াপি যত্নতঃ" এই প্রাচীন বাণী নূতন করিয়া তাঁরা দেশবাসীর সম্মুখে ধরেন। আজ তাঁদের সেই আপ্রাণ চেষ্টার ফলে স্ত্রী-শিক্ষা অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া, এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, দেশের লোককে ভাবিতে হইতেছে, সহ-শিক্ষা প্রচলন করিবেন কিনা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই হইল সহ-শিক্ষার গোড়ার কথা। এখন এই সহ-শিক্ষা আমরা অনুমোদন করিতে পারি কিনা, এবং করিলে কি কি কারণে অনুমোদন করি,

তাহা বিশদভাবে বলিতে হইবে এবং যাঁহারা ইহার বিপক্ষতাচরণ করেন, তাঁদের যুক্তিগুলিও আমাদের খণ্ডন করিতে হইবে।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, আমাদের দেশ অতি রক্ষণশীল। একটা নূতন কিছু হইলেই, সমাজ সহজেই শিহরিয়া উঠে এবং ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় প্রাণপণে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। একদিন স্ত্রী-শিক্ষাও আমাদের দেশে প্রবল বাধা পাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আজ সে বাধা অতিক্রান্ত হইয়াছে; কাজেই সহ-শিক্ষার কথা উঠিলেই, তাহাও যে দেশের লোকের কাছে প্রবল বাধা পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? তবে অনুমান হয়, কালে ইহাও সর্ব্ব বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আপন গৌরবে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে। সহ-শিক্ষা যে সম্পূর্ণ নূতন বা ইহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোক একেবারেই জানিত না, একথা ভাবা ভুল হইবে। আমেরিকা বা স্কট্‌ল্যাণ্ডে যেরূপ ব্যাপকভাবে সহ-শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, সেরূপ ব্যাপকভাবে না হইলেও, প্রাচীন ভারতে যে সহ-শিক্ষা অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, একাদশ শতাব্দীতে যে অল্পবিস্তর সহ-শিক্ষা চলিয়াছিল, তাহার কথা জানা যায়; কাজেই ইহা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন, এই অজুহাতে যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

তারপর অনেকে বলিয়া থাকেন, আমাদের দেশে সহ-শিক্ষা চালাইবার এত প্রচেষ্টা হইতেছে, কিন্তু ইহা ত ইংলণ্ডেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই এবং অক্সফোর্ডে স্ত্রীলোকেরা প্রবেশাধিকার ত মাত্র অল্পদিন হইল পাইয়াছে! ইংলণ্ডে পূর্ব্বে সহ-শিক্ষা ছিল না বটে এবং বর্ত্তমানে ইহা আমেরিকা বা স্কট্‌ল্যাণ্ডের মত ব্যাপক হয় নাই; তবে ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ দেখা যাইতেছে, সহ-শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া ইংলণ্ড দ্রুত এই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ৪০০ বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। এই দুই প্রদেশে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩০০র কিছু উপর। কাজেই দেখা যাইতেছে, প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে এবং এই সব মিশ্র বিদ্যালয়ে প্রায় এক লক্ষ বালক বালিকা শিক্ষা পাইতেছে এবং এই এক লক্ষ হইল, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বালকবালিকাদের এক চতুর্থাংশ। সত্য বটে—আমেরিকা বা স্কট্‌ল্যাণ্ডের মত ইংলণ্ড সমগ্র বালক-বালিকাদের জন্য ব্যাপকভাবে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও হয় নাই; কিন্তু যেভাবে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ এই দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে এখানেও বালকবালিকাদের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা উঠিয়া যাইবে। ইউরোপের অন্যান্য অংশে অবশ্য ব্যাপকভাবে সহ-শিক্ষা এখনও প্রচলিত হয় নাই বটে, তবে সোভিয়েট রাসিয়া, স্পেন, স্কট্‌ল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে উচ্চ-বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। এসব দেশেও যে একদল বিরুদ্ধবাদী নাই, তা' নয়, তারা মাঝে মাঝে আপত্তি করে ও নানা প্রতিকূল তর্ক তুলে; কিন্তু দেশের বেশীর ভাগ লোক ইহার স্বপক্ষে থাকায়, তাহাদের চীৎকারে কোন ফল হয় না।

সহশিক্ষার বিপক্ষীয়দের আপত্তির প্রধান কারণ হইল, সহ-শিক্ষা প্রচলিত হইলে, সামাজিক আচার, ধর্ম্ম ও নীতি সমস্তই ধ্বংস হইবে। তাঁরা বলেন, প্রথম যৌবনে যখন বুদ্ধিশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না এবং দেহ ও মনে এক অজানা মাদকতা আসিয়া উপস্থিত হয়—তখন বালক বালিকারা একত্র এক স্থানে শিক্ষালাভ করিলে, মিলামিশা করিলে, কেহই প্রলোভনের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না; ফল হইবে, শারীরিক ও মানসিক অশান্তি ও লেখাপড়ার ক্ষতি। অবশ্য তাঁহারা একটা ভয়ঙ্কর রকমের দুর্নীতির—যাহাকে ব্যভিচার বলা যাইতে পারে—তার আশঙ্কা করেন না, তবে তাঁরা বলেন, সুকুমারমতি বালকবালিকারা মিলামিশা করিলে, অকালে তাহাদের মনোজগতে এক বিরাট্‌ আলোড়ন আরম্ভ হইবে, যাহার ফলে অনর্থক মনে অশান্তি ও উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইবে; কাজে কাজেই তাহাদের শান্ত মনে সুস্থ চিত্তে পড়াশুনা করার ব্যাঘাত ত ঘটিবেই, উপরন্তু মেয়েরা প্রগল্‌ভ ও নির্লজ্জ এবং ছেলেরা অশিষ্ট ও উদ্ধত হইয়া

উঠিবে। কিন্তু তাঁরা একবারও ভাবিয়া দেখেন না, এই যে মানসিক অশান্তি, যার কথা ভাবিয়া তাঁরা শিহরিয়া উঠিতেছেন, তার জন্য দায়ী সহ-শিক্ষা একেবারেই নয়। ইহার জন্য যদি কাহাকেও দায়ী করা যায়, সে হইল প্রকৃতি। সহ-শিক্ষা থাকুক বা না থাকুক, সমস্ত বালক-বালিকাকে এই সাময়িক মানসিক অশান্তির মধ্য দিয়া পার হইতে হইবে। আমাদের দেশের বালকবালিকাদের সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়সে এবং বালকদের ১৬।১৭ বয়সে যৌবন আরম্ভ হয়। এই এক সম্পূর্ণ নূতন জীবনের প্রারম্ভে অশান্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনা আসিবেই। বালকবালিকাদের স্বাভাবিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্‌ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেও, ইহার হাত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই; বরং তার ফল হইবে আরও মন্দ। অবদমন বা গোপন যৌন-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নানারূপ শারীরিক ব্যাধি ও অপস্মার, উন্মত্ততা প্রভৃতি নানারূপ মানসিক ও স্নায়ু-সংক্রান্ত পীড়া আসিয়া উপস্থিত হইবে। Homo-sexuality, Sexual Inversion, 'Fetishism" প্রভৃতি প্রকাশ পাইবে।*

ইউরোপে বালকদের ডে-স্কুল বা বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র মোটেই ভাল বলিয়া শুনা যায় না এবং ইংলণ্ডের পাব্‌লিক স্কুলের ছাত্রদের মত দুর্দ্ধর্ষ ছাত্র খুব কমই দেখা যায়। বালিকাদের জন্য যেসব স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে, সে সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। তাদের নৈতিক চরিত্র যে উন্নততর, একথা কেহই বলিতে পারিবেন না। বড় বড় মেয়েরা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদের প্রেমে পড়িয়া থাকে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে প্রেম পত্রের আদানপ্রদান চলে, তাহার বহু প্রমাণ আছে এবং বড় বড় লেখকের গল্প ও উপন্যাসে এই সব বিষয় অনেক সময়ে বেশ সরস করিয়া লেখা হয়। অবশ্য বলিতে পারেন, গল্প বা উপন্যাস বৈজ্ঞানিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার উপর নির্ভর করিয়া কোন সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। একথা সত্য, কিন্তু এই সমস্ত লেখক যাঁরা এইসব গল্প লেখেন, তাঁরা একদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছিলেন, এসম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। তাঁদের লেখার মধ্যে সব সত্য না থাকিলেও, সবটা যে নিছক কল্পনা তাহাও বলা যায় না। মোটের উপর বালক-বালিকাদের যৌবনের প্রারম্ভে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে শিক্ষাপ্রদান করিলেও, যে-ভয়ে পিতামাতা ভীত হন, সে ভয়ের নিরাকরণ না হইয়া বরং তাহা আরও তীব্র হইয়া উঠে এবং নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে এবং বহু শিক্ষাবিশারদ এবং মনস্তাত্ত্বিকেরাও একবাক্যে বলিতেছেন যে, সহ-শিক্ষাই হইল একমাত্র পন্থা। যৌবনের আরম্ভে নরনারীর যে-যৌনলিপ্সা তীব্র হইয়া উঠে, তাহা পরস্পরের সান্নিধ্যে, একত্র বসবাসের ফলে অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়; কারণ বালক বালিকাদের মধ্যে যে-যৌন কৌতূহল জাগিয়া উঠে, তাহা পরস্পরকে না জানার ফলেই। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভ্রাতা ও ভগিনী। তাহাদের মধ্যে যে ভালবাসা, তাহা কামনাশূন্য। ভ্রাতা ও ভগিনী একই পরিবারের মধ্যে একত্র প্রতিপালিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট অজানিত নয় বলিয়া, তাহাদের মধ্যে যে সুপ্তকামনা, তাহা উদগ্র হইয়া না উঠিয়া স্নেহ ও কল্যাণের মূর্ত্তিতে রূপায়িত হইয়া উঠে। সেইরূপ মিশ্র-বিদ্যালয়ে বালকবালিকারা বয়ঃসন্ধিকালে একত্র পঠনপাঠনের সুযোগ পাইলে, তাহাদের আদিম যৌনপ্রবৃত্তি সমাজের ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, শিল্পে ও সৌন্দর্য্যসাধনার উচ্চগ্রামে রূপান্তরিত (Sublimated) হইয়া উঠিবে। ইহাই মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দের মর্ম্মকথা। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিদ উইলিয়ম ম্যাক্‌ডুগ্যাল স্পষ্ট ভাষায় সহ-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও, এইরূপ এক আলোচনাপ্রসঙ্গে যে-কথা বলিয়াছেন, তাহা এ স্থলে প্রণিধানযোগ্য।

The peculiar condition of sex-instinct in the child, with its liability to perversion, provides a weighty argument against the

* ১৩৪১ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রবর্ত্তকে "অন্তর্জগতের অনন্ত রহস্য" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

too strict segregation of the sexes at this age. For there can be little doubt that, although excitation of sexual feeling and activity to crude and direct expressions is very undesirable at this age, the awakening of the instinct in such a way that its impulse remains subdued and severaly restricted in expression, while directed towards the opposite sex, is a safeguard against perversion ; and it is probable that even at this age the energy of its impulse may be "sublimated" in the service of intellectual, moral and aesthetic development."

ইউরোপে যে যে স্থলে সহ-শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিতেছেন, সহ-শিক্ষার ফলে বিদ্যালয়ের নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, পবিত্রতার আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে—বালকবালিকারা পরস্পরকে কামনারঞ্জিত চোখে না দেখিয়া বন্ধু ও সহযোগী মনে করে।

তারপর যাঁরা বলেন, সহশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে, বালকেরা বালিকাদের এবং বালিকারা বালকদের অনুকরণ করিতে শিখিবে, ফলে ছেলেরা হইবে কোমল ও হীনবীর্য্য এবং বালিকারা হইবে রূঢ় ও নির্লজ্জ, তাহা তাঁদের নিতান্ত মনঃকল্পিত; কারণ যে সমস্ত দেশে সহশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, সেখানে এরূপ অভিযোগ শুনা যায় না। বরং যেখানে ছেলেমেয়েরা পৃথক্‌ভাবে শিক্ষা পায়, সেখানে এরূপ কথা কখনও কখনও শুনা যায়।

নীতি, ধর্ম্ম ও আচারের দিক্ দিয়া সহ-শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া হয়, ইহা হইল সেই সমস্ত যুক্তি তর্কের উত্তর। ইহা ছাড়াও, স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক ও মানসিক পার্থক্যের অজুহাতেও সহশিক্ষার বিরোধিতা করা হয়। তাঁদের এ যুক্তিগুলিও সহজে খণ্ডন করা যায়। তাঁরা বলেন যে, প্রকৃতি স্ত্রী ও পুরুষকে শরীর ও বুদ্ধি উভয় দিক্ দিয়া, পৃথক্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; কাজেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথক্ না করিয়া এক সঙ্গে করিলে, তাহাদের স্বাস্থ্যের ও মনের ক্ষতি হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ শরীরের দিক্ দিয়া যে ভিন্নভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; তাহাদের শারীরিক শক্তি পুরুষ অপেক্ষা কম এবং পুরুষের মত দীর্ঘকাল কঠিন পরিশ্রমে তারা অপারগ, সে-বিষয়ে কোন কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধির দিক্ দিয়া যে তাহারা পুরুষ অপেক্ষা সাধারণভাবে হীন, তাহা বলিয়া মনে হয় না। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা হইতে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত data পাওয়া গিয়াছে, (Consultative Commitee of the Board of Education in England এবং Stanford University Research Dept.) তাহাতে পার্থক্য খুব বেশী দেখা যাইতেছে না। অধ্যাপক টারম্যান বিনি-সাইমন-টেষ্ট্ দ্বারা এক সহস্র বালক-বালিকার সাধারণ বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে, পঞ্চম বর্ষ হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালিকারা বালকদের অপেক্ষা (অতি অল্প মাত্রায়) অধিক বুদ্ধিমতী, কিন্তু তাহার পর হইতে বুদ্ধি বিষয়ে তাহারা বালকদের সহিত সমান স্তরে আসিয়া দাঁড়ায়।

ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রায় এক হাজার বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী বালক বালিকাদের লইয়া যে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত রূপ ফল দেখা যাইতেছে :—

	বালক	বালিকা
গড়-পড়তা সাধারণ বুদ্ধি শক্তি	১৫১·৬	১৫১·৬
,, ,, ভাষার শক্তি	১৪৬·২	১৪৮·৩
,, ,, পড়িবার শক্তি	১৪৫·৩	১৪৪·৭
,, ,, পাটিগণিতের শক্তি	১৩৮·৫	১৩৫·৭
,, ,, বানানের শক্তি	১৪০·২	১৩৭·৭

এই পরীক্ষাতেও দেখা যাইতেছে যে, বালিকারা বালকদের অপেক্ষা বুদ্ধি বিষয়ে বা সাহিত্য, গণিত বা অন্যান্য বিষয়ে হীন নহে। কোন কোন বিষয়ে বালকেরা বালিকাদের অপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু মোটের উপর পার্থক্য অতি অল্প—নাই বলিলেই চলে।

স্মৃতিশক্তি বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পুরুষের স্মৃতিশক্তি ৬·৯ এবং স্ত্রীলোকের ৭·২। এইরূপ

অন্যান্য অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধিশক্তি পুরুষ অপেক্ষা বিশেষ কম নয়। আর এই তারতম্য গুণগত (qualitative) না হইয়া পরিমাণগত (quantitative)। ইহাই বলিলে মনে হয়, সত্য কথা বলা হয়। কিন্তু সাধারণে ইহা না বুঝিয়া, এই সামান্য পার্থক্যটুকু খুব বড় করিয়া দেখে। পরীক্ষার দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের বুদ্ধির পার্থক্য খুব বেশী দেখা যায় না; তবে তাহাদের Interest এবং temperament বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সব চেয়ে বেশী পার্থক্য হইল, তাহাদের বৃদ্ধির হারে। বালকদের অপেক্ষা বালিকাদের দুই বৎসর পূর্ব্বে যৌবন আরম্ভ হয় এবং সেই জন্য তাহাদের মানসিক পুষ্টিও প্রথম প্রথম বালকদের অপেক্ষা অধিক হয়; কিন্তু ইহা সাময়িক মাত্র। ১৩ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদের মনের ও দেহের বৃদ্ধি এই হারে চলিতে থাকে—তারপর আসে অবসাদ ও শ্রান্তি। সেই সময়ে অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিমতী বালিকারাও সাধারণ বালকদের পিছনে পড়িয়া যায়। এই সময়টাই হইল, বালিকাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িবার সময়; কেন না, ক্লান্ত ও অবসাদ সত্ত্বেও এবং পরিশ্রমের ক্ষমতা কমিয়া আসিলেও, পাছে কোন বালক লেখাপড়ায় তাহাকে হারাইয়া দেয়, সেই ভয়ে ও লজ্জায় সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে এবং ফল হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সাধারণ বালিকারাও এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বন্ধ না রাখিয়া, বালকদের সহিত সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে। এই জন্য যাঁহারা সহ-শিক্ষার বিরোধিতা করেন, তাঁহারা বলেন, সহ-শিক্ষা থাকিলে, বালিকারা স্বভাবতঃ অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, বালকদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া স্বাস্থ্য হারাইবে। তাঁদের এ যুক্তি ভুল, কেননা, সহ-শিক্ষা না থাকিলেও, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘুচিবে না; বরং সহ-শিক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা কিছু কমিবে, কারণ সেখানে পরস্পর পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা না করিয়া, সহকারী ও বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করিয়া থাকে।

নৈতিক, দৈহিক ও মানসিক দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে, সহ-শিক্ষার পক্ষে কোন অন্তরায় হওয়া উচিত নয়। বাকি থাকিল একমাত্র প্রয়োজনীয়তার তাগিদ্ অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক্। সহশিক্ষার বিরুদ্ধে যত যুক্তি বা তর্ক থাকুক না কেন, একমাত্র অর্থনৈতিক কারণে সে সমস্তই ভাসিয়া যাইবে। দেশে স্ত্রী-শিক্ষা এখন এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে যে, হয় সহশিক্ষা বা ঐরূপ কিছুর ব্যবস্থা করিতে হইবে, নয়ত মেয়েদের শিক্ষা একেবারেই বন্ধ রাখিতে হইবে। শিক্ষা বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট আর অর্থ প্রত্যাশা করা বৃথা। অর্থ সাহায্য দিন দিন কমিবে ছাড়া বাড়িবে না। অথচ দেশে তিন চারি শ্রেণীর বিদ্যালয় রাখিতে হইবে, তাহা কি করিয়া সম্ভব হইবে? সাধারণের জন্য এক শ্রেণীর স্কুল, মুসলমানদের জন্য আর এক শ্রেণীর স্কুল, হরিজনদের জন্য আরও এক শ্রেণীর স্কুল; তাহার উপর আবার মেয়েদের জন্য যদি আলাদা করিয়া স্কুল করিতে হয়, তাহা হইলে সে আশা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।* বড় বড় সহরে দুই চারিটি মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় করা সম্ভব; কিন্তু মফঃস্বলে, যেখানে ছাত্রীর সংখ্যা এত অধিক নয় যে তাহাতে একটি পৃথক্ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতে পারে, অথচ মেয়েদের শিক্ষার জন্য আগ্রহ ও উৎসাহ আছে, সেখানে সহশিক্ষা চালান ছাড়া আর কি উপায় আছে? হইয়াছেও তাই; শুধু বাংলাদেশে ২০০০-এর উপর বালিকা বালকদের সহিত উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়িতেছে। অবশ্য এখানে মনে রাখিতে হইবে, ঠিক যাহাকে সহ-শিক্ষা বলা হয়, তাহা চলিতেছে না। ইহা সহ-শিক্ষা ও পৃথক্ শিক্ষার একটি মাঝামাঝি ব্যবস্থা। সত্যকারের সহ-শিক্ষা হইল, যেখানে বালক এবং বালিকারা এক সঙ্গে অধ্যয়ন করে,

* There is a movement for substituting for the village school a variety of schools intended for the benefit of particular communities......We are now reaching a stage when each village wants a primary school, a Maktab and a Pathsala. In addition, it is claimed that even at the lower primary stage separate schools are necessary for girls, and in many places separate schools for children of the depressed classes. Thus, in the poorest province of India, we are asked to provide five primary schools for each village."—

—Report of the D. P. I. B. & O.

খেলা করে, স্কুল কলেজের বিতর্ক সভায় ও সাময়িক উৎসবে যোগদান করে, স্কুলের মধ্যে ও বাহিরে মিলিবার মিশিবার সুযোগ পায়। আমাদের এই রক্ষণশীল দেশে এতটা অগ্রসর না হইলেও ক্ষতি নাই। উপস্থিত যেভাবে চলিতেছে, অর্থাৎ মেয়েদের সংখ্যা খুব কম হইলে, ছেলেদের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়িতেছে; আর সংখ্যা অধিক হইলে, তাহাদের জন্য সকালে আলাদা ক্লাস করা হইতেছে। এ অবস্থায় কাহারও আপত্তির কারণ থাকা উচিত নয়। ইহাতে সহ-শিক্ষার পূর্ণ সুবিধা না থাকিলেও, শিক্ষার্থিনীদের শিক্ষার পথ ত রুদ্ধ হইতেছে না— বালকদেরই মতন বালিকারা উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষাধীন হইতে পারিতেছে। আরও এক কথা নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথক্ না করিয়া, একসঙ্গেই করা উচিত। বার বৎসর পর্য্যন্ত বালকবালিকারা একসঙ্গে পড়িলে কি ক্ষতি আছে? এমন কি দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে? আমাদের দেশে অল্প বেতনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভাল শিক্ষক ত পাওয়াই যায় না; তার চেয়ে দুরূহ ঐ অল্প বেতনে ভাল শিক্ষয়িত্রী পাওয়া। বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা নিতান্ত ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সব বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন, তাঁদের নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা অতি অল্পই; ততোধিক অল্প তাঁদের শিক্ষা দিবার যোগ্যতা। কাজেই সেখানে বালিকারা তিন চারি বৎসর পড়িয়াও কিছুই শিখিতে পারে না। ১৯৩৪-৩৫ সালের রিপোর্টে এডুকেশন কমিশনার বলিতেছেন:—"But the provision of women teachers in rural areas is a pressing problem which must be solved at once if girls' education is to expand. In a very large number of rural girls' schools, there are no woman teachers; where they are, they are mostly untrained and very poorly qualified."

এ অবস্থায় ছোট ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল হওয়া সম্ভব; কারণ ছেলে ও মেয়েদের পৃথক্‌ভাবে শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয়, সেই ব্যয় একত্রে করিলে, শিক্ষকদের বেতন কিছু বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং তাহাতে উপযুক্ত শিক্ষকও পাওয়া যাইতে পারে।

তারপর প্রাথমিক শিক্ষায় যে ভীষণ অপচয় হইতেছে, সেই অপচয় শীঘ্র নিবারণ করিতে না পারিলে, বালক ও বালিকাদের জন্য যে পৃথক্ প্রাথমিক বিদ্যালয় রাখা সম্ভব হইবে, তাহা বলিয়া মনে হয় না। অপচয়ের হিসাবটা দেখুন।

বৎসর	ছাত্র সংখ্যা	শ্রেণী
১৯২৮	৮৮৫,৪৩২	প্রথম
১৯২৯	৩৪১,৩৫০	দ্বিতীয়
১৯৩০	২৪৬,৪২১	তৃতীয়
১৯৩১	১১২,৭৮৯	চতুর্থ
১৯৩২	৯৪,০৩০	পঞ্চম

ইহার পরবর্ত্তী সময়ের হিসাবও আশাপ্রদ নয়। দেখা যাইতেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে বালিকার সংখ্যা ২৬০০,০০০। ইহাদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশের কম বালিকা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পৌছায়; প্রথম শ্রেণীর প্রতি একশত বালিকার মধ্যে মাত্র ১৩'০ জন চতুর্থ শ্রেণীতে পৌছায়। অর্থাৎ শতকরা ৮৭ জন বালিকা নিজেদের সময় ও সাধারণের প্রদত্ত অর্থ নষ্ট করিতেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেদের শিক্ষার অপচয় নিতান্ত অল্প নয়। সমস্ত ভারতবর্ষের হিসাব ধরিলে, দেখা যায় অপচয়ের পরিমাণ শতকরা ৭৪। এই অপচয়ের অবশ্য অনেক কারণ আছে; সেই সমস্ত কারণ এখানে উল্লেখ না করিয়াই এইটুকু বলা চলে যে, ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্ত একত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, অপচয়ের ও অপব্যয়ের পরিমাণ অনেকটা কমিয়া যাইবে এবং শিক্ষার ব্যবস্থাও অনেক উন্নত হইবে।

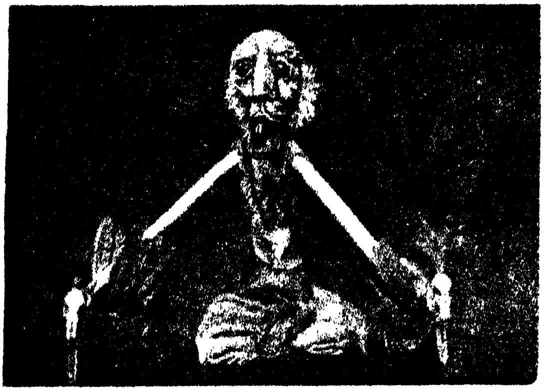
যাঁরা সহশিক্ষা সমর্থন করেন, তাঁরা ত কখনই অস্বীকার করেন না যে, স্ত্রী-পুরুষের দেহের ও মনের কিছু মাত্র পার্থক্য নাই বা তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র ভিন্ন নহে, এমন কি তাহাদের পাঠ্য বিষয়ও বিভিন্ন হওয়া উচিত নহে। বিরোধীরা বলেন, যদি এই পর্য্যন্তই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে দুই শ্রেণীর কি ভাবে একত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে,

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন, কাজেই তাহাদের পাঠ্যবস্তু কিছু কিছু ভিন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু তাহার জন্য সহশিক্ষায় কোন বাধা উপস্থিত হইতে পারে না; কেননা ছেলেদের বিদ্যালয়েতেও ত বিভিন্ন প্রকৃতির বালক পাওয়া যায়; কেহ প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন, কেহ বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, কাহারও অঙ্কে অনুরাগ, কাহারও বা ভাষায় বিরাগ। কিন্তু এই সব বিভিন্ন প্রকৃতির বালকদের একত্র শিক্ষাদানে ত কোনরূপ অসুবিধার কথা শুনা যায় না; তাহা হইলে বালিকাদের জন্য যদি পাঠ্যতালিকা একটু ভিন্ন প্রকারের হয়, তাহারা যদি জ্যামিতি, বীজগণিত কি ভূগোলের পরিবর্ত্তে সঙ্গীত, সীবন বা রন্ধনবিদ্যা লয়, তাহা হইলে তাহাদের একত্র শিক্ষাপ্রাপ্তির কি গুরুতর ব্যাঘাত হইতে পারে?

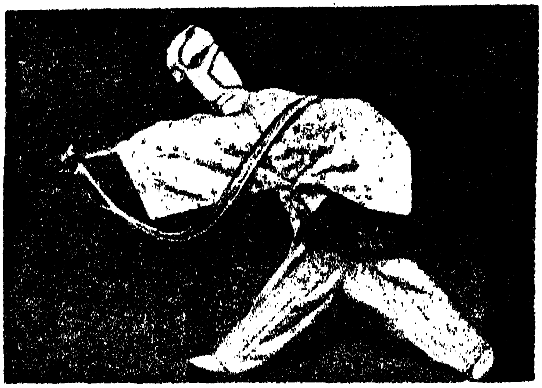
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্ত্রী-পুরুষের পাঠ্য বিষয় একরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা মনে করি না; এ-বিষয়ে "Consultative Committee of the Board of Education in England" বহু অনুসন্ধান ও তর্ক-বিতর্কের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। "As psychological study developed and as statistical enquiries and data are multiplied, it may be possible to attain some tangible and valid conclusions. In the meantime it is part of wisdom neither to assume differences nor to postulate identity, but to leave the field free for both to show themselves. It would be fatal at the present juncture to prescribe one curriculum for boys and an other for girls."

এতক্ষণ আমরা বিরুদ্ধবাদীদের শুধু যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিয়া আসিয়াছি মাত্র। সহ-শিক্ষার যে লাভ, তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। ইহার একটি প্রধান লাভ হইতেছে এই যে, নরনারী একত্র বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাওয়ার জন্য পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে, জানিতে ও বুঝিতে পারিবার অবকাশ পায়। আমাদের সমাজে যৌবনে বা যৌবনের প্রারম্ভে দুইটি অজানা, অচেনা নবীন হৃদয়কে হঠাৎ একদিন বিবাহের নামে মিলিত করিয়া দেওয়া হয়। যাহার সহিত কোন দিন সাক্ষাৎকার বা পরিচয় নাই, তাহার সহিত পরিচয় হয় একদিন, অতি "আচম্বিতে, কম্প্র বক্ষে, নম্র নেত্রপাতে, স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে, সলজ্জিত বাসরশয্যাতে।" নারীর মূল্য পুরুষ বুঝিতে শিখে না—তাহার যথার্থ মর্য্যাদা দিতে জানে না। স্ত্রীকে মনে করে, অবসর-সঙ্গিনী, খেলার সামগ্রী—ফলে বহু ক্ষেত্রে দেহের মিলন হইলেও, হয় না মনের মিলন। কিন্তু সহ-শিক্ষার ফলে, পুরুষ স্ত্রীকে বন্ধু, সহকর্ম্মী ও সহযোগিনীরূপে দেখিতে পায় তাহার যথার্থ মূল্য জানিতে পারে; কাজেই তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র আরও দৃঢ় হইয়া উঠে।

এইভাবে সমস্ত দিক্ আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, দেশে সহ-শিক্ষা প্রচলিত হইলে, ফল ভাল ছাড়া মন্দ হইবে না এবং বর্ত্তমানে অর্থের অভাবে ও প্রয়োজনীয়তার তাগিদেও ইহাকে বরণ করিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই।



রাক্ষসী



প্রত্যাখ্যান

শিল্পী টাসেন ব্রয়েক

শ্রীমতিলাল দাশ

সংসারে নিত্য দিনের অন্ন-চেষ্টা চলে—সেটা জীবন-ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। অন্নের অবজ্ঞা করি নে, কারণ আমাদের দেশে প্রাচীন ঋষিরাও ব্রহ্ম-সন্ধানের যাত্রার পথে অন্নকে ব্রহ্ম বলেছেন—কিন্তু অন্ন যোগায় ক্ষুধার তাড়না—রসের তাড়না সে নিবারণ করে না। মানুষের জীবনে রসের আহ্বান কম নয়। শাস্ত্রকার যে বলেছেন—আনন্দই সৃষ্টির মূল, অভিব্যক্তি ও লয়। একথা কবি, দার্শনিক ও সমস্ত মনীষীরাই মানবেন।

শিল্পের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পিছনে এই রসের বেদনা-শিল্পী যে আবেগ অনুভব করেন, তার প্রকাশ কিন্তু নানা, তার রূপায়ন বিচিত্র। শিল্পীর জীবন ও পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে—তার উপর আছে শিল্পীর নিজের ব্যক্তিত্ব।

টাসেন ব্রয়েক অদ্ভুত রকমের শিল্পী। যা' পরিচিত তাকে শোভন ও সুন্দর করায় আনন্দ আছে; কিন্তু কুতূহলী মানবশিশুর মনে আদিম যুগ থেকে অদ্ভুত অগোচরের প্রতি পিপাসা—কল্পনার রঙে রঙিয়ে এই কৌতূহল আজগুবী এবং অদ্ভুতকে তৈরী করে।

তাই সাহিত্য ও শিল্পে আদিম যুগ থেকে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব প্রভৃতি কাল্পনিক জীব ও কাল্পনিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের মনের দুরন্ত শিশু যখন সংসারের লেনদেনে হাঁপিয়ে ওঠে, তখন সে অনুভব করতে চায় কল্পনাবেগে, অবাধ অগ্রসরে—তার ফলে জাগে যা' অপরিচিত, যা' অদ্ভুত, যা' ভয়ের আনন্দ জাগায় এবং ভয়-জয়ের সান্ত্বনা দেয়।

হ্যারি ভ্যান টাসেন ব্রয়েকের পুতুলের প্রদর্শনী রটার্ডাম সহরে ১৯২৯ সালে হয়, তার পূর্ব্বে ও পরে নানা সহরে এই চমৎকার এবং হৃদয়-লোভন খেলার মেলা বসানো হয়েছে, সর্ব্বত্রই সেগুলি লোকপ্রিয় হয়েছে।

এই প্রদর্শনীতে দেখানো ৫৬টি পুতুলের ছবিতে পাঠকেরা শিল্পীর নানামুখী শিল্পপ্রতিভা দেখতে পাবেন। শিল্পী আমাকে বলেছিলেন—"ছোট বয়স থেকে এ রোগে আমায় ধরে—যেখানে যা' পেতাম, তাই কুড়িয়ে, জড় করে' পুতুল গড়তাম।"

এই সব পুতুলের উপকরণ অদ্ভুত—শুনলে হয়ত আপনাদের ভক্তি চটবে—সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত ঝিনুক ও শুক্তি, তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত কাঠকুটা, পাখীর পালক, পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা, ছিন্ন বস্ত্র প্রভৃতি অতি তুচ্ছ জিনিষের সমবায়ে এই দরদী শিল্পীর শিল্প রূপ-গ্রহণ করে।

তুচ্ছকে কবির দৃষ্টি দিয়ে শিল্পী দেখেছেন, তাই তুচ্ছকে তুচ্ছ করেন নি—তাকে অপরূপ ক'রে তুলেছেন। এইটাই

হল সৃষ্টিশক্তি। শিল্পীর মুখে না আছে ভাস্বর জ্যোতিঃ, না আছে প্রতিভার দীপ্ত লাস্য—চোখ দুটি বসা বসা, যেন ধ্যানস্থ ভাব—অথচ এই ক্যাবলা-গোছের লোকটির কল্পনায় গড়ে' উঠেছে নানা ভাবের ও নানা রূপের জীবন্ত পুতুল!

টাসেন ব্রয়েক সেগুলি আমায় নিজে নাচিয়ে নাচিয়ে দেখিয়েছিলেন—যাদুকরের হাতের পুতুল যেন—ইউরোপের আর্ট সাধারণতঃ বাস্তব — শরীরতত্ত্বের

কতকগুলি পুতুলে সাধারণ জীবনের ঘটনাকে রসবিদগ্ধ শিল্পী হাসি ও কৌতুকের অক্ষয় ভাণ্ডার করেছেন। লুইসা পিসীর চেহারায় ঘরে ঘরে যে সব সঞ্চয়শীলা কৃপণচিত্তা পিতৃভগিনী আছেন, তাঁদের চমৎকার আলেখ্য হয়েছে।

জুজু, ডাইনি, দৈত্য ও দানব সকল দেশের মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করেছে—শিল্পী মানুষের সেই ভয়কে লোকপ্রচলিত ভয়ের মূর্ত্তির মাঝে রূপ দিয়েছেন।



বিলাসী



মুখোস ও নৃত্য



কৃষক

ব্যতিক্রমকে ওরা পছন্দ করে না—বাস্তবে বাস্তব হিসাবে দেখতে পাওয়াই ওদের কাছে চরম কৃতিত্ব।

কিন্তু এই শিল্প বুঝতে হলে, দ্রষ্টার চাই সুগভীর কল্পনাবৃত্তি—ভাবব্যঞ্জনা অধিগম করবার শিক্ষা।

এগুলি মিষ্টিক নয়—বাস্তবের পটভূমির সহিত এই পুতুলগুলির রক্তমাংসের সম্বন্ধ—ইহাতে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান নেই—আছে সহজকে অদ্ভুত করবার লক্ষণ।

কবির চোখে সাধারণকে অসাধারণত্বে পরিণত করা সহজ কৃতিত্ব নয়। অতি পরিচয়কে যাঁরা কাব্যের মাঝে অনির্ব্বচনীয় করে' তোলেন, তাঁদের প্রতিভা অসামান্য।

অবশ্য এই পুতুলের ইতিহাসের সাথে যোগ আছে—ডাচেদের লোককাহিনী ও গল্প-কথা এর প্রকাশে রস যুগিয়েছে, সে ইতিহাস আমার জানা নেই—না জানি ডাচ ভাষা—না জানি তাদের ইতিহাস—যদিও ডাচেরা একদিন বাঙ্গালাদেশে এসে রাজ্যস্থাপন করতে বসেছিল—



মৃত্যুর স্পর্শ



মুখোসপরা বৃদ্ধ



বেশ-রূপসী



ভাবনা-ব্যাকুল



সুন্দর মুখোস



পরিণতির পানে



নৃত্য



ভারতীয় নৃত্য



নৃত্য : পিয়েরোট ও ম্যাটিলা



উজবুক



পাখী



নৃত্য: পিট্রোস্কা, ব্যালেরিণা ও মুরোর নৃত্য

যেখানে (চুঁচুড়া) বসে' লিখছি, তার চারিদিকে তাদের কীর্ত্তিকথা—তাদের পুরাতন ইতিহাস।

কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের উভয়েরই বিশেষ ও অবিশেষ দুইটি দিক্ আছে।

শিল্পের যে প্রকাশ দেশ ও কালের আড়াল ভেঙ্গে সর্ব্বকালের ও সর্ব্বমানুষের রস-সংবেদনার সামগ্রী হয়—টাসেন ত্রয়েকের অনেক পুতুলে তার প্রকাশ আছে।

প্রসাধন ও প্রসাধনীয় তার সুন্দর পরিচয়। রূপসী পরিণত-বয়সী, বয়োধর্ম্মে বলিরেখা এসে ললাট কুঞ্চিত করেছে—তবু চিরকালের চিরন্তন নারীহৃদয়ের ব্যথা এতে ফুটে উঠেছে। যৌবন চলে' যায়, সুষমা বিদায় মাগে—রূপ ফাগুনের শেষে ঝরা পাতার মত ঝরে' যায়—তবু মানুষ তাকে ধরতে চায়। এ যেন ছোট একটি লিরিক কবিতা—যত কথা বলা হল, তার চেয়ে বেশী রয়েছে অব্যক্ত—তাই এর প্রেরণা প্রতি দর্শকের কাছে তার অভিজ্ঞতায় হবে জীবন্ত—তার কল্পনায় হবে সুগম ও সুরস।

শিল্পীর দৃষ্টিতে একটি সার্ব্বভৌমিক উদারতা আছে—তাই চীনার যাদুকর, মুরের নৃত্য, ভারতীয় নৃত্য সবই তাঁর কাছে সমান আদর পেয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী এতকাল চলেছে Exploitation—তাই আমরা কেবল পুরোহিতের এবং রাষ্ট্রপতির মিথ্যা জল্পনায় ভুলে' কল্পনার প্রাচীর গড়েছি—বাইরের লোককে শোণপাংশু বলে কেবলই দূর করেছি।

কিন্তু এইখানে মস্ত ভুল হয়েছে—কালের বেড়া ও দেশের বেড়া শাশ্বত নয়—সকল রকম জুজুর ভয় ও আড়ালের পাঁচিল ভেঙ্গে মানুষে মানুষে আজ মনের মিতালি হয়ে গেছে—তাই দেখছি—পূবের চীনা আর পশ্চিমের ডাচ—ওদের মাঝে ভাবগত, কলাগত, কৃষ্টিগত কি অপূর্ব্ব সমন্বয় আছে!

এই কথাটাই বুঝতে হবে ও বুঝাতে হবে—আর্য্যামী বা গোঁড়ামী আর্য্যধর্ম্ম নয়—শূদ্র বলে' দূর করলে আমরাই শূদ্র হয়ে ক্ষুদ্র হব—বৃহৎ পৃথিবী আজ ডাক দিয়েছে—মহামানুষের শ্রীক্ষেত্রে আজ মিলনের দুন্দুভি কেবলই বাজছে—যারা পিছিয়ে থাকবে—ভুল করবে, তারা মরবেই মরবে।

লোক-কথাকে মূর্ত্তি দিতে কবির অসামান্য দক্ষতা—আলাদিনের মায়া-প্রদীপের গল্প আমরা সবই জানি—প্রদীপ-হস্ত এই রূপকথার নায়কের আশা ও ভয়ের দ্বন্দ্ব কেমন সুন্দর ফুটেছে!

রাত্রির ছবি কি চমৎকার ভাবদ্যোতক—রাত্রি যেন বৃদ্ধ ও অন্ধ, ঘুমে ও অবসাদে তার নয়ন বুজে গেছে—বুকে তার এসেছে একটু আলো, কিন্তু সে আলো তার চোখে দেয় না জ্যোতিঃ, তাই সে নীরব অবসন্ন মৌনতায় নিশ্চুপ হয়ে আছে।



মৎস্য

ডুয়েট-নৃত্য পিরোট ও ম্যাণ্টিলা—শিল্পী তার অচল উপকরণে স্রোতের ও গতির গান জাগিয়েছেন।

কবির কথাই মনে পড়ে—

"তুমি কেমন করে' গান করহে গুণী,
আমি অবাক্ হয়ে শুনি।"

সয়তানের মূর্ত্তিতে ফুটেছে দম্ভ আর গভীর আত্ম-বিশ্বাস—সে যেন কাউকে মানে না—আপন স্পর্দ্ধায় সে স্পর্দ্ধিত। ছবি দেখে আসলের সজ্জা ও গঠনের চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য বোঝা মুস্কিল।

এ যেন মায়াবীর মায়া-স্পর্শ—ধূলিমুঠি সোণা হয়ে গেছে। ছেঁড়া নেকড়ায় এত ভঙ্গী কেমন করে' প্রকাশিত হয়, সে কেবল অবাক্ হয়েই ভাবতে হয়!

গ্রন্থকীটের ছবিটিও মনে হয় যেন জীবনের সত্য অভিব্যক্তি—মনে হচ্ছে যেন বুড়া বৃটিশ মিউজিয়ামে বসে' বসে' জীবনকে অবজ্ঞা করে' কেবলই বইয়ের ধূলি ঝাড়ছে।

জীবন গান গাইছে—তার গান ওর কাণে আসে না। কোকিল ডাকছে—ফুল ফুটছে—ফুটুক—কীট শুধু ছাপার আখরে আপনাকে ডুবিয়ে মরতে বসেছে—বাহির-জগৎ বাহিরেই থাক্—যা' কিছু সার, যা' কিছু সত্য, তা' আছে কেবল বইয়ের পাতায়!

প্রত্যেকটি পুতুলের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে এমনই অৰ্দ্ধ-উন্মুক্ত কবিতা—যে জন কেবল রসিক, সে কেবলই তার ছন্দঃ জানে। কবির গান মনে পড়ে—

"ভাগ্যে আমি পথ হারিয়েছিলাম অকূলে—
নইলে এমন দেখা মিল্‌ত না হায় কোনকালে।"

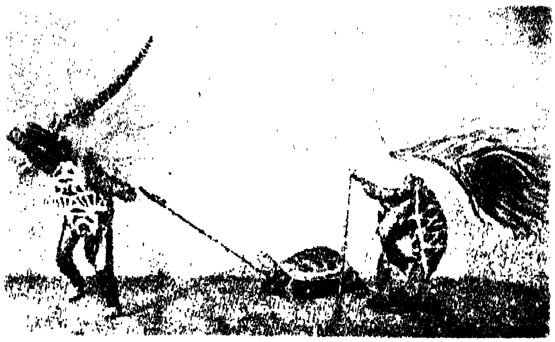
হঠাৎ দেখতে পেলাম এই মায়াভবনের মায়াবীকে—বুঝতে পারলাম ইউরোপের প্রাণ-মন্ত্র।

গীতায় পড়েছি—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ", সে কথা কি বুঝতে পারি! এমনই যখন জীবনের অভিব্যক্তি দেখি, তার আদর দেখি, তখনই বুঝি—মৃত্যুর ও বৈরাগ্যের মন্ত্র যারা বলে, তারা পাপী—সত্যের মন্ত্র তপস্যার মন্ত্র—সে তপস্যা চলে ধুনি জ্বেলে', শ্মশানে রক্ষাকালীর সামনে শবসাধনায় নয়—চারিদিকে যে আমাদের শ্মশান, তার মাঝে বসে' যারা জীবনের গৌরবের বীণা বাজায়, তারাই সত্যকার কবি—তারাই সত্যকার প্রাণবান্।

আমাদের আধ্যাত্মিকতা যখন বেঁচেছিল, তখন তারও ছিল এমনই প্রকাশ—আজ সে মরেছে, তাই তার কাছে শুধু শুনি নৈষ্কর্ম্ম্যের বুলি—পার্থ যুদ্ধ করেছিলেন, পার্থসারথি বল্গা ধরেছিলেন—তারা জান্‌ত প্রাণের প্রবাহ।

এই ছেলেখেলাগুলিকে ডাচেরা ছেলেখেলা-রূপে দেখে নি। প্রায়ই এর প্রদর্শনী খোলা হয়—সেখানে এই সব পুতুলের মেলা বসে—দিক্-দিগন্ত হতে লোক আসে—তারা পয়সা দেয়—শিল্পীর জীবনের পাথেয় নয়—দর্শকের তৃপ্তি হয়—আর চারিদিকে চলে প্রবাহের সুস্থ আব্‌হাওয়া।

হে বন্ধু, তোমায় আমায় ক্ষণ-পরিচয়—একটি রাত্রির বাধা-জটিল আলাপন, আর একটি সন্ধ্যার আন্তরিক মেলামেশা—তারা নিঃশেষ হয়নি—তোমার উদ্দেশে তাই নমস্কার জানাই। তুমি শিল্পী, আমি কবি—তুমি পশ্চিমা, আমি পূরবী—দু'জনের কণ্ঠে—কে বলে বিভিন্ন



কচ্ছপ-শিকার

সুর? যে বলে, সে মিথ্যা বলে—মানুষের একান্ত নিবিড় অনবদ্য সৌহৃদ্যের সাথী হয়ে রয়েছে তোমার আমার ক্ষণ-পরিচয়।

কিন্তু ক্ষণ কি ক্ষণিকই হয়—যেখানে সে প্রেমের স্পর্শ পায়, সেখানে সে কালের সাগর ছাড়িয়ে আনন্দের অসীমতার পাথারে ডুবে' যায়! আজ তোমার সৌহৃদ্য স্মরণ করে' বড় গলায় বল্‌ব—যারা ভেদ গড়ছে, বলছে ভেদ সত্য, তারা স্বার্থদ্বেষান্ধ—মৈত্রীর চোখে যদি দেখি, দেখ্‌ব—

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

'জ্ঞান-বিজ্ঞান'

বিজ্ঞানে অধ্যাত্মবাদ

শ্রীনলিনীগোপাল রায় বি-এস্‌সি

প্রকৃতির মায়ালোক হইতে যে সঙ্গীত শাশ্বত কাল ধরিয়া বিশ্বের অন্তরে স্বররহস্যের জাল বুনিয়া আসিতেছে, মানুষের চির অশান্ত মন চাহিল তাহার উৎসের সন্ধান। রূপকথার রাজকন্যার মায়ামূর্ত্তিতে আর সে তৃপ্ত নয়। সে চায় তার বাস্তবের রূপ। তাই তার কল্পরাজ্য জয় করিবার জন্য মানুষের কতই না কামনা, কতই না উদ্যম। অনাদিকাল থেকে সে ছুটিয়াছে এই জয়যাত্রার অভিযানে। গতির এই উদ্দামতায় তার নজরে পড়িল না বিশ্বমানবের অন্তরের দৈন্য—তাহাদের অতৃপ্তির অশ্রুধারা।

এমনি করিয়া হইল দর্শন ও বিজ্ঞানে বিচ্ছেদ। এমনকি মতাভিজাত্যের ফলে পরিণত হইল ঘোর বিরোধিতার দ্বন্দ্বে। এই দ্বন্দ্বের উপক্রমণিকা গড়িয়া উঠিল বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামীর উপর।

গ্রহ-উপগ্রহের জন্মকাহিনী বলিতে যাইয়া কেহ কেহ পুরাতন নজির দেখাইয়া বলিয়াছেন, দুইটি তারকার সংঘর্ষের ফলে তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—"No doubt can be entertained that the genesis of the stars is a single process of evolution, which has passed or is passing over a primordial distribution"—অর্থাৎ তারকা-নিচয়কে সোজাসুজি স্বয়ম্ভূ বলা চলে। তাহাদের সৃষ্টিরহস্য নিখিল বিশ্বের সৃষ্টির একটি প্রাথমিক ব্যাপার। কোন তারকাযুগলের উদ্দেশ্যবিহীন আকস্মিক মিলনের ফলে তাহাদের সৃষ্টি হয় নাই।

Sir Eddington বলিয়াছেন—"It is clear from the various relations traced among the stars that the present stage of existence of the Sidereal Universe is the first innings".

সুতরাং অধুনাতন মতবাদে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যরূপ। কিন্তু কি তাহার রূপ? বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, সৌরজগৎ কোন নক্ষত্র-যুগলের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট নয়; অথবা ইহা সাধারণ কোন প্রাকৃতিক নিয়মেও সৃষ্ট হয় নাই। ইহার সৃষ্টির মূলে আছে অসাধারণত্ব।

Sir J. H. Jeans বলিয়াছেন—"The solar system is not the typical product of development of a star; it is not even a common variety of development. It is a freak."

বিজ্ঞান সত্যের সাধক। মিথ্যার স্বরূপ যখন ধরা পড়ে, তখন সে নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে বর্জ্জন করিতে দ্বিধা করে না।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সেই উদারতার সত্যযুগ। এখন আর তত্ত্ববিজ্ঞান বা metaphysics-এর নামে বস্তু-বিজ্ঞান বা Physics চঞ্চল হয় না। এখন চলিয়াছে সত্যের সহিত সত্যের মহামিলনের একটা অভিনব অভিযান।

বিশ্বজগতের ইতিহাসে Einstein বলিয়াছেন, ইহা সসীম ও গোলাকার। কিন্তু এই সসীমত্ব একটু অদ্ভুত রকমের। ইহা দেশ হিসাবে সসীম, কিন্তু কাল হিসাবে অসীম। এই দেশ ও কালের পূর্ণ অনুভূতিও শক্ত। এই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে যে আর কোন মুহূর্ত্ত ছিল না, এরূপ কল্পনা অসম্ভব। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা কালের গতি নিরূপণ করি আমাদের জীবনের গতির হিসাব দিয়া। আমরা শৈশব হইতে চলিয়াছি বার্দ্ধক্যের দিকে; সুতরাং সেই পরিমাপে বুঝি কালও চলিয়াছে ভবিষ্যতের দিকে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু এই সাধারণ বুদ্ধির কাল-পরিমাপে সন্তুষ্ট নয়। তিনি বলেন—কাল সম্বন্ধে আমাদের যে সচেতনতা, তাহা নির্ভুল নাও হইতে পারে। এমনও

হইতে পারে যে, কাল হিসাবে আমরা ঠিক বিপরীত দিকেই অগ্রসর হইতেছি—অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে না যাইয়া অতীতের দিকেই চলিয়াছি। সেইজন্য কালের গতির দিক্-নির্ণয়ের জন্য Sir Eddington আবিষ্কার করিলেন Law of Entropy.

তিনি বলেন—বিশ্বসৃষ্টির মূলে ছিল organisation বা সংগঠন। তাহাতে দৈব উপাদান বা Random Element ছিল খুব কম। সময় যতই অগ্রসর হইতেছে, দৈব উপাদান বা Entropy ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। "Progress of time introduces more and more random-element into the constitution of the world."

এই দৈব উপাদানকেও গণিতের সূত্রে (formula) ধরিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া, অঙ্ক কষিয়া বৈজ্ঞানিক নিরূপণ করিলেন —সময় কোনদিকে অগ্রসর হইতেছে। Entropy-র এই আইনকে ভিত্তি করিয়া Jeans তাঁহার "Mysterious Universe"এ বলিয়াছেন—আমরা যদি কালপ্রবাহের বিপরীত দিকে গমন করি, তাহা হইলে এমন কতকগুলি নিদর্শন পাই, যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বহুদূর এইরূপে গমন করিবার পর আমরা এই প্রবাহের জন্মস্থলে আসিয়া পৌছিতে পারি—অর্থাৎ কালের যে অংশে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইখানে।

আইনষ্টাইন-পরিকল্পিত সসীম বিশ্বের ধারণাও কম অসাধারণ নয়। আপেক্ষিকতা-বাদ বা (Theory of Relativity-র) পূর্ব্বে সাধারণ বিশ্বাস ছিল—দেশ সীমাহীন অনন্ত। আইনষ্টাইন বলেন—দেশ সসীম, কিন্তু ইহার শেষ নাই (finite but unbounded)। সীমাহীন সসীমত্বের কল্পনাও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। বৈজ্ঞানিক বলেন—যেমন একটা বৃত্তের পরিধি-রেখা সসীম, কিন্তু ইহার শেষ নাই; বিশ্বের কল্পনাও অনেকটা সেইরূপ। যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, দেশের পর দেশ মিলিবে। "তাহার ওপার নাই"—এমন কোন কথা বৈজ্ঞানিক বিশ্বে অচল। কিন্তু তবু বৈজ্ঞানিক বলেন —ইহা সসীম এবং ইহাতে শূন্যস্থানই বেশী। নক্ষত্র-লোকেরও সুদূর পরপার পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি।

Law of Entropy-র মতে বিশ্বের দৈব-সৃষ্টির ইতিহাস কাল্পনিক। কারণ বিজ্ঞান বলে—পরমাণুর দৈব-সংগঠন একটা অসাধারণ ব্যাপার (fortuitous concourse of atoms is a rarity)। ইহার ব্যবহারের সহিত বস্তু-জগতের ব্যবহারের কোন মিল নাই। ইহা কেবল বিশ্বের একটা স্বতন্ত্র অবস্থায়ই সম্ভব। এই অবস্থার নাম—Thermo-dynamical Equilibrium of the Universe.

বিজ্ঞানের নিয়মে বস্তুর এই অবস্থায় দৈব-উপাদান বা Random-Element বা Entropy-র সংখ্যার কোন বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং সময়ের গতি যায় বন্ধ হইয়া। কারণ বৈজ্ঞানিক বলেন—সময়ের গতির পরিমাপ হইতেছে Entropy-র বৃদ্ধি বা হ্রাস। Entropy যেখানে অপরিবর্ত্তনশীল (বা steady), সময় সেখানে অচল। কিন্তু সময় যেখানে অচল, বিশ্বের এরূপ অবস্থা অস্বাভাবিক। কাজেই পরমাণুর দৈব-সংগঠনের চেয়ে পরমাণুর সংগঠনের মূলে কোন শিল্পীর উদ্দেশ্য বা Design-এর দিকেই বিজ্ঞানের বেশী পক্ষপাতিত্ব। মনে হয় যেন বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে কোন অদৃষ্ট-শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের আভাস রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক বিশ্বের সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে বিদ্যুৎ-কণা বা Electron। সাধারণ বিশ্বাস—এই "বিদ্যুৎ-কণা" মতবাদ বা Electron theory অধ্যাত্মবাদের সকল যুক্তির অবসান করিয়াছে।

একথা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায় যে, আইনষ্টাইনের দেশ ও কালের যোগাযোগ সম্বন্ধে নূতন মতবাদ বৈজ্ঞানিক জগতে একটা যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু তাহার চেয়েও অভিনব রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন Lord Rutherford. তিনিই দেখাইয়াছেন—এতদিনের যে বিশ্বাস ছিল—পরমাণু বা atom কঠিন পদার্থ (solid), তাহা ভুল। ইহা সছিদ্র (বা porous)। সর্ব্বাপেক্ষা সরল ধরণের পরমাণু হইল Hydrogen পরমাণু। ইহার ভিতর আছে একটী Proton ও একটী Electron অর্থাৎ একটী পরা ও একটী অপরা তড়িৎ-অংশ (positive and negative charge)। অন্যান্য

চরিত্রের পরমাণুও আছে। তাহাদের দেহ-তত্ত্ব একটু জটিলতর। কিছু সংখ্যক proton ও electron মিলিয়া একটা কঠিন পদার্থের সৃষ্টি করে—তাহার নাম Nucleus। অন্যান্য স্বাধীন electron-গুলি উপগ্রহের মত তাহার (Nucleus এর) চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়। এমন কি তাহারা পরমাণু হইতে পলায়ন করিয়া বস্তু বা পদার্থের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। মোটামুটিভাবে এই হইল electron-theoryর গোড়ার কথা। কিন্তু ইহার মধ্যেও জটিলতার ঘূর্ণিপাক আছে। এই যে পরা-তড়িৎবাহী Nucleus-এর চারিধারে অপরা তড়িতের বোঝা লইয়া বিদ্যুৎকণাগুলি ঘুরিতেছে, তড়িৎ-বিজ্ঞানের (Electro-dynamics) আইনানুসারে তাহারা Nucleus-এর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দুই বিষম-ধর্ম্মী বিদ্যুদংশের সংমিশ্রণে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হইত এবং তাহা হইলে বস্তু-জগতের কোন অস্তিত্বই আর থাকিত না। সুতরাং অনন্যোপায়ঃ হইয়া বৈজ্ঞানিক বলিলেন—পরমাণুর মধ্যে তড়িৎ-বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম খাটে না। সেখানকার জন্য হইবে অসাধারণ নিয়ম। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে সন্ধান মিলিবে যে, দেশ ও কাল সম্বন্ধে বস্তু-জগতে যে সাধারণ বৈজ্ঞানিক নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, পরমাণুর অভ্যন্তর-দেশে তাহা ঘটে না। বিদ্যুৎকণাগুলির চলনভঙ্গীও রহস্যময়। কখন তাহারা চলে তরঙ্গাকারে (in waves), কখনও বা চলে বস্তুকণার স্বভাবে (like particles) সরল রেখায়। এই বিষম-ধর্ম্মের সমন্বয় দেখিয়া শেষ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক বলিলেন—"Electrons are such queer things that we cannot think of them in more precise terms. They can be nothing but a Mathematical Device."

আজকাল পরমাণুর অন্তর-দেশে Electron, Proton ছাড়া Neutron ও Positron-এর সন্ধান মিলিয়াছে। ইহাদের ঘাড়েও কতকগুলি কল্পিত আইনের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—বস্তু-বিজ্ঞান যাহাকে সত্য বা reality বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তাহার গোড়াতেই রহিয়াছে কল্পনার সৃষ্টি-কৌশল। বস্তু-বিজ্ঞানের যে-সব আইন, তাহা সার্ব্বজনীন নয়। ইহা বস্তুর মোটামুটি চালচলনের একটা ইতিহাস।

বিদ্যুৎ-কণা বা Electron-এর ইতিহাস থেকে জানা যাইতেছে যে, সকল বস্তুর সৃষ্টির আদিতেই বর্ত্তমান আছে ইহারা। সুতরাং এক খণ্ড পাথর ও মনুষ্যমস্তিষ্কের মধ্যে উপাদানগত কোন পার্থক্যই থাকিতে পারে না। তাহা হইলে কোন শক্তির বলে পাথর ও মস্তিষ্কের মধ্যে এরূপ গুণ-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে? মস্তিষ্কের পরমাণুর এই চেতনাশক্তি ও বিচারশক্তি আসিল কোথা হইতে?

ইহার জবাবে বিজ্ঞান সহজ ভাষায় বলিয়াছে—মস্তিষ্কের পরমাণুগুলিতে যে চিন্তাশক্তি কিরূপে আসে, তাহা বিজ্ঞানে স্থির করিতে পারে নাই এবং পারিবে কিনা সন্দেহ।

"There is nothing to prevent the assemblage of atoms constituting a brain from being of itself a thinking object in virtue of that nature which physics leaves undetermined and undeterminable."

(Eddington)

বিজ্ঞানের এই সরলতাই বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস ছিল যে, বিশ্বজগতের বুকে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার ঢেউ বহিতেছে। যেরূপ অবস্থায় আজ Oxygen ও Hydrogen মিলিয়া জল হইতেছে, সেইরূপ অবস্থায় কালও সেই Oxygen ও Hydrogen মিলিয়া জলই হইবে। বস্তুজগতের এই সকল বাঁধাধরা কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিলেন—জীব-জগতেও এই শাশ্বত নিয়ম বর্ত্তমান। এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর তাঁহারা গড়িয়া তুলিলেন নূতন মত-বাদের এক বিরাট্ সৌধ। তাঁহারা ঠিক করিলেন—বিশ্বজগৎ যখন এই শৃঙ্খলার অধীন, তখন কার্য্যকারণ (effect and casuation) পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। অর্থাৎ অতীত হইতে সৃষ্ট হইয়াছে বর্ত্তমান এবং বর্ত্তমান হইতে জন্মিবে ভবিষ্যৎ। যে কারণে আজ সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ বা অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিতেছে, ঠিক সেই কারণেই আবার কবে সেইরূপ ঘটনা ঘটিবে, বৈজ্ঞানিকের খাতায় তাহার হিসাব মিলিতে পারে। ইহাকেই বলা হইত বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ বা

"Theory of Determination or Theory of Causality."

মহামতি Newton-এর মতবাদের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বিংশ শতাব্দী আনিল এক অভিনব মতবাদের যুগান্তর—যাহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর এই অদৃষ্টবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তাহার স্থানে গড়িয়া উঠিল অনির্দ্দিষ্টবাদের (Theory of Indeterminacy) নূতন মন্দির। এই অনির্দ্দিষ্টবাদের মূল ভিত্তি হইতেছে Quantum theory বা মাত্রাবাদের উপরে। এই সময়ে এমন কয়েকটী তথ্যের আবিষ্কার হইল, যাহার ছায়ায় পড়িয়া এই কার্য্যকারণবাদের জৌলস গেল অনেকটা কমিয়া। তন্মধ্যে একটী হইতেছে Radium ধাতুর খামখেয়ালী ব্যবহার। ইহা হইতে যে electron বা বিদ্যুৎকণা সদাসর্ব্বদা বিকীর্ণ হইতেছে, পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, তাহারা কোন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আইনের অধীনে চলিতেছে না। সমষ্টিগতভাবে যে নিয়মের ধারা বিশ্ব-জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যষ্টিগতভাবে নির্দ্দিষ্ট পরমাণুর বেলায় তাহা খাটিতেছে না। অর্থাৎ নিয়ম বলিয়া চিরন্তন জিনিষ কিছুই নাই। কোন মহাশক্তির অলঙ্ঘনীয় নীতিই যেন সকল নিয়মের প্রাণ-শক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস হইল বিংশ শতাব্দীতে অচল। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দেখিলেন—এই জগৎ কোন বাঁধাধরা নিয়েমের অধীন নয়। সাধারণ-ভাবে নিয়মের অধীন মনে হইলেও, স্থানে স্থানে ইহার অনিয়ম দেখা যায়—যাহার কোন বৈজ্ঞানিক জবাব মিলে না। এই অনির্দ্দিষ্টবাদের পুরোহিত হইতেছেন মহামতি Heisenberg। তিনি ঠিক করিলেন—বিজ্ঞানের অনির্দ্দিষ্টবাদ মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ফল নহে। ইহাই প্রকৃতির নির্দ্ধারিত নিয়ম। প্রকৃতির ঘটনাগুলি কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মে চলে না। মনে হয়, সকল কার্য্যকারণের মূলে আছে কোন পরমাশক্তি।

এইখানেই বিজ্ঞান জড় ও জীবের রহস্যোদ্ঘাটনে অগ্রসর হইয়াছে। জড় ও জীবের প্রভেদ হইতেছে—জীবের জীবনীশক্তি ও তাহার মনোধর্ম্মে। এই জীবনী-শক্তি কোথা হইতে আসে এবং ইহার স্বরূপই বা কি ইহার সমাধান আজও হয়নি; কখনও হইবে কিনা, তাহাও জানি না। মনোধর্ম্মের বিশ্লেষণে পদার্থ বিজ্ঞানের অধিকার খুব বেশী নয়। তবে যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক একটা মোটামুটি হিসাব দাখিল করিয়াছেন। 'মন' বলিয়া কোন স্থূল বা concrete জিনিষ নাই। ইহাকে আমরা জানিতে পাই—উপলব্ধির মারফতে। উপলব্ধি যদি কারণ হয়, তবে তাহার কার্য্যের কর্ত্তা হইবে মন। এইরূপেই ইহার সহিত আমাদের পরিচয়।

বস্তুবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি সময় ও ব্যবধান (space and time)। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বস্তু-বিজ্ঞানের রাজ্য। নিয়ম বলিয়া কোন সনাতন বস্তু নাই। বস্তুর মোটামুটি চাল-চলনের ধরণের নামই নিয়ম। নিয়মই জোর করিয়া বস্তুর পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দেয় না। নিয়মের অধীন বস্তু নয়। বস্তুর অধীনই নিয়ম।

বস্তু-বিজ্ঞানের মূল উপাদান হইতেছে পারিপার্শ্বিক জগতের জ্ঞান (knowledge of environment)। এই জ্ঞানের বার্ত্তা আমাদের বিভিন্ন শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া যাইয়া উপস্থিত হয় চেতনার রাজ্যে। যখন আমরা কোন ছবি দেখি, তখন তাহা হইতে আলোক-রশ্মির ঢেউ আসিয়া পড়ে আমাদের চোখে। অক্ষি-পট বা retina-তে হয় তাহার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন (chemical changes occur in the retina) এবং তাহার পর অক্ষি-স্নায়ু (বা optic nerve-এ) এবম্প্রকার প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং সর্ব্বশেষে মস্তিষ্কের পরমাণুর মধ্যে ঘটে রূপান্তর (atomic changes follow in the brain). কিন্তু তাহার পর উপলব্ধির সৃষ্টি যে কি প্রকারে হয়, তাহা বলা যায় না। Sir Eddington বলেছেন—"We do not know the last stage of the message in the physical world before it became a sensation in consciousness."

সাধারণ তড়িৎ-বার্ত্তাবহ বা telegraph-এর মত এই বার্ত্তাও চলাফেরা করে সঙ্কেত বা code-এর নিয়মে। এই ছবি দেখিবার বার্ত্তা আমাদের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেখানে সেখানে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, তাহার আকারও ছবির মত নয় অথবা সেখানে ছবির

কোন উপলব্ধি বা conception-রও সৃষ্টি হয় না। তাহা হইলে এই ছবির উপলব্ধি আসিল কোথা হইতে?

এই বার্ত্তা যখন তাহার কেন্দ্রপীঠে বা central station এ যাইয়া উপস্থিত হয়, তখন সেইখানে হয় তাহার রূপান্তর অর্থাৎ De-coding. এই রূপান্তর ঘটে দুইটী কারণে। একটী হইতেছে বংশপরম্পরার অভিজ্ঞতা-লব্ধ সহজাত মূর্ত্তি কল্পনার ফল (instinctive image-building inherited from the experience of our ancestors) এবং অপরটী নির্ভর করিতেছে কতক পরিমাণে বৈজ্ঞানিক তুলনা ও বিচার-শক্তির উপরে। (scientific comparison and reasoning). এই গৌণ এবং অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের উপরই সৃষ্ট হইয়াছে বস্তুবিজ্ঞানের সকল আবিষ্কার ও সূত্রের মায়ালোক।

বহির্জগতের যে কোন জিনিষের রূপই আমরা কল্পনা-লোকে দিই না কেন, তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি চেতনারাজ্যে যাইয়া এই রূপ-সৃষ্টির রং যোগায়। অনুভূতি-ক্রিয়ার সহিত পূর্ব্ব-সংস্কার বা অভিজ্ঞতার সংযোগে এই রূপের সৃষ্টি হয়। যেমন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পায়ের দাগ দেখিয়া অতীত যুগের কোন লুপ্তাস্তিত্ব রাক্ষসের আকার কল্পনা করিয়া লন, আমাদের বহির্জগতের বস্তুর রূপ-কল্পনাও অনেকটা সেইরূপ। আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা একটী হস্তীও হইতে পারে বা একখানা চেয়ারও হইতে পারে, কিন্তু আমাদের চেতনা-রাজ্যে তাহার যে রূপ চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, আমরা বলি আমরা তাহাই দেখিতেছি। এই সম্পর্কে Bertrand Russel একস্থানে বলিয়াছেন—

"What the physiologist sees when he is examining a brain is in the physiologist, not in the brain he is examining." অর্থাৎ মস্তিষ্কের উপাদানসমষ্টিতে যে সত্য করিয়া কি আছে না আছে, তাহা আমরা জানি না। আমরা পাই—শরীর-তত্ত্ববিদের মনের মধ্যে তদ্দর্শনে যে অনুভূতি জাগে, তাহারই সন্ধান।

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জগৎ একটী নূতন জগৎ। এখানে আমরা সন্ধান পাইলাম—কাল অনন্তবিস্তৃত। দেশকে বাদ দিয়া উহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করা চলে না। যাহা অহরহঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাই দেশের প্রকৃত স্বরূপ নহে। এই শতকের বৈজ্ঞানিকের নিকটই সম্ভব হইয়াছে স্বীকার করা যে, বিশ্বের মূলে রহিয়াছে একটী পরমাশক্তি। বলিতে গেলে এই শতকেই হইল অধ্যাত্মবাদের পুনর্জন্ম। এতদিন যাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বর্ব্বর মনোবৃত্তি বলিয়া বিদ্রূপের অংশই পাইয়া আসিয়াছে, বৈজ্ঞানিক উদারতার এই সুবর্ণ যুগে আজ তাহা পাইল বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ সম্মতির ছাপ। তাই Sir Eddington বলিতে সঙ্কোচ করেন নাই—'Religion first became possible for a reasonable scientific man about the year 1927—i. e. the year of the final overthrow of the Causality scheme.

সুতরাং এখন বিজ্ঞানের বিশ্বজগৎ শুধু আর জড়জগৎ নয়, উহা এখন জড় ও চিন্তাজগতের মিলন-তীর্থ।

বিজ্ঞান দ্বিপ্রবাহী। ইহার একটী প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে মানব-মনের ব্যবহারিক দিক্‌টার উপর দিয়া—তাহাকে আবিষ্কারের উর্ব্বরতায় সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহারই ফলে হইয়াছে মানবের জীবনযাত্রা উপভোগ্য ও সুগম। ইহার অভিজ্ঞতা বস্তু-জগতের পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ। এই জগৎকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহার নিয়ম-কানুন। কাজেই যাহা অবিমিশ্র জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্য, তাহার নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ পৃথক্। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের Differential Equation সেখানে নিষ্ক্রিয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাইতে পারে—Mendel-এর পুরুষানুক্রমবাদ বা "Theory of Heredity" ইহাও একটী বিজ্ঞান। কিন্তু বস্তুবিজ্ঞানের কোন Equation-এর শাসন এখানে চলে না; ইহার ভিত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের দর্শন ও অভিজ্ঞতার উপরে। ইহাই হইল বিজ্ঞানের অপর প্রবাহটী। ইহাকেই বলে বিজ্ঞানের জ্ঞানের দিক্। ইহার কার্য্য আমাদের আদর্শের ও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটায়। অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই শ্রেণীরই বিজ্ঞান। জড়বিজ্ঞানের কোন যন্ত্র-মারফতে ইহার সন্ধান মিলিবে না।

Darwin, Newton হইতে আরম্ভ করিয়া আইনষ্টাইন, জীনস্, হোয়াইট হেড, প্ল্যাঙ্ক প্রভৃতি অধুনাতন বৈজ্ঞানিক-

শিরোমণিরা সকলেই কেন জানি না, এই মহাসত্যা-পলাপের অনুদারতা পরিহার করিয়া মতবাদের দিক্ হইতে একটী অদ্বিতীয়তার নাম কিনিবার লোভ সম্বরণ করিয়াছেন।

আত্মা সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতামত খুব সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু তবুও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের সাধারণ মতবাদ এবং অধুনা বৈজ্ঞানিক তথ্য হইতে যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাতে প্রাচীন আত্মবাদকে অলীক বলা চলে না।

আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা দেখিতেছি—শক্তি হইতে জড়ের সৃষ্টি এবং জড়ের ধ্বংসে শক্তির উৎপত্তি পরীক্ষাসিদ্ধ; অর্থাৎ শক্তি জড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, আবার জড়ের আশ্রয় লইতে পারে। সুতরাং আত্মা জড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে পুনরায় জড়ের আশ্রয় লয়, তাহাতে আশ্চর্য্যের কি থাকিতে পারে? আত্মা সম্বন্ধে আমাদের আরও একটী ধারণা আছে। ইহাতে নাকি পূর্ব্বজন্মের সকল সংস্কার লিপিবদ্ধ থাকে।

Bertrand Russel এক জায়গায় বলিয়াছেন—"... ...while its owner was alive, part, atleast, of the contents of his brain consisted of his percepts, thoughts and feelings. Since his brain also consisted of electrons, we are compelled to conclude that an electron is a grouping of events, and that if the electron is in a human brain, some of the events composing it are likely to be some of the "mental states" of the man whom the brain belongs."

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান যে বিদ্যুৎকণা (যাহা কোন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অনুবীক্ষণেও দেখা যায় না) জড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও, তাহার ক্ষমতা রহিয়াছে মানবের পূর্ব্ব অনুভূতি বহন করিবার। সুতরাং আত্মার পক্ষে পূর্ব্ব-সংস্কার-রক্ষার যে বিশ্বাস, তাহাকে অলীকতার অপবাদে বিদ্রূপ করার মধ্যে কোন যুক্তির সন্ধান মেলে না।

প্রলয়পয়োধিজল হইতে পৃথিবীর আদি-সৃষ্টি-সূচনার ইতিহাস এখন আর পৌরাণিক কল্পলোকের কাহিনী নয়। জীন্‌স্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিক বলেন—পৃথিবীর আদি সৃষ্টির সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পরে তরল অবস্থার ভিতর দিয়াই তাহাকে বিকাশ লাভ করিতে হইয়াছে। শুধু তাই নয়, মহাপ্রলয়ের রুদ্রতালে সৃষ্টির যে মরণ-নৃত্যের ইঙ্গিত আছে পুরাণে, তাহাও বৈজ্ঞানিক-সত্য-বিরহিত নয়। প্রলয়ের দিনে দ্বাদশ সূর্য্যের আবির্ভাবে বিশ্বের তাপ-মৃত্যুর কাহিনী আজ আর শুধু ঠাকুর-মার ঝুলির কাহিনী নয়।

Jeans-Eddington-এর মতে সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্করাজি এতদিন আপন বস্তু-ভাণ্ডার ক্ষয় করিয়া বিশ্বে তাপশক্তি যোগাইতেছে। একদিন ইহারা সকলেই নিঃস্ব হইয়া কেবল তাপ-শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইবে। সেই দিনই ঘটিবে বিশ্বজীবনের অবসান—অর্থাৎ বিশ্বের ঘটিবে তাপ-মৃত্যু বা Heat-death.

বিশ্বধ্বংসের আরও একটী বৈজ্ঞানিক জবাব আছে। সময় যদি অতীতের দিকে তাহার গতি না ফিরাইয়া কেবল ভবিষ্যতের অজানা পথ ধরিয়াই চলিতে থাকে, তাহা হইলে বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে যে সংগঠনশক্তি বা organisation-এর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, Entropyর আইনানুসারে তাহার ধ্বংস হইতে থাকিবে। বিনিময়ে সৃষ্টির অন্তরদেশে দৈব-উপাদান বা Random element-এর সংখ্যা যাইবে বাড়িয়া, বহুদিন পর এরূপ এক সময় আসিবে, যখন সমস্ত সংগঠন-শক্তির ধ্বংস হইয়া বিশ্ব কেবল দৈব-উপাদানে পূর্ণ হইয়া যাইবে। ক্রমবিকাশের সেখানেই যবনিকা। বিশ্বেরও সেইখানেই শেষ।

অ-দৃষ্ট দর্শন

শ্রীমমতা ঘোষ

অজ্ঞাতকে জানবার কৌতূহল আছে মানুষ মাত্রেরই। যাকে কাছে পাই না, তাকেই ধরবার জন্যে আমরা দু'বাহু বাড়িয়ে দিই। ভগবান অনেক কিছু রহস্যাবৃত করে' রেখেছেন—এ ব্যবস্থায় আমাদের মন ভরে না। যে ব্যবধান তিনি সৃষ্টি করেন, তা' দূর করার জন্য আমরা হই ব্যস্ত। রহস্যের আবরণ মোচন করার চেষ্টায় ব্যাকুল আমরা। অ-দৃষ্টকে দেখবার আগ্রহ আমাদের অপরিসীম।

ভাগ্যে আমাদের কি আছে, তা' জানে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগণ। তারা আমাদের ভাগ্যনির্দ্দেশক। বৈজ্ঞানিকেরা একথা মানতে চান না, পুরুষকারবাদী তাঁরা। কিন্তু সাদা চোখে দেখা যায় না অথচ আছে, এমন জিনিষের অস্তিত্ব জগতে বিরল নয়। ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুও মন বোঝে, চোখ দেখে, কাণ শোনে। আত্মার জাগরণ হ'লে অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ হয়। এই ক্ষমতার সাহায্যে ভারতের ঋষিরা ত্রিকালজ্ঞ হ'য়েছিলেন; ধ্যান-নেত্রে তাঁরা দেখতে পেতেন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান। যোগদৃষ্টিবলে লব্ধ সেই জ্ঞানের সমষ্টি যে ভাবে তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তারই নাম জ্যোতিষ-শাস্ত্র। ওরই মধ্যে আছে আমাদের জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য।

ঠিক বিজ্ঞানের উপর জ্যোতিষের ভিত্তি গ'ড়ে ওঠে নি। যা' কিছু দেখা যায়, যা কিছু হাতে কলমে ক'রে সকলকে দেখানো চলে, তারই নাম বিজ্ঞান, স্থান তার বস্তুলোকে। কিন্তু জ্যোতিষ ত' তা' নয়। কতকগুলি বাঁধা নিয়ম এর আছে সত্য, তাই ব'লে তা'র সাহায্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না এ বিষয়ে। চর্ম্মচক্ষে এর গুহ্য তত্ত্ব দেখা কঠিন, দিব্য দৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয়-শক্তি-সম্পন্ন লোকই জ্যোতিষশাস্ত্রের যোগ্য অধিকারী। তাই এর নাম অলৌকিক বিজ্ঞান। অনধিকারীর হাতে এ শাস্ত্রের অমর্য্যাদা ঘটে। দিব্য অনুভূতি যাঁর আছে, তিনিই এই গোপন লোকের দ্বার খোলবার অধিকারী। অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট লোক পৃথিবীতে চিরকালই সংখ্যায় কম। অযোগ্যের কাছে গিয়ে আমরা প্রতারিত হই, ফলে জ্যোতিষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাই।

আগেই বলেছি—আকাশের গ্রহন-ক্ষত্রের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য জড়িত। বাস্তবপন্থীরা একথা অবিশ্বাস করেন। আমরা কি এতই শক্তিহীন, অসহায় যে, আমাদের জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত ক'রে দেবার ভার নিয়েছে গ্রহ-তারার দল? এই হ'ল তাঁদের উক্তি। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি নদীর জলে জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি করে। এ ঘটনা ত' সর্ব্বদাই ঘটছে। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথিতে রোগীর রোগ বৃদ্ধি পায়—এ আমরা প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি। তা'হলে প্রমাণ হ'ল যে, চন্দ্রের প্রভাব আমাদের উপর ক্রিয়াশীল। কাজেই গ্রহতারা যে আমাদের জীবরের চিত্র আঁকেন, একথা বিশ্বাস-যোগ্য। গ্রহেরা যে পথে চ'লতে নির্দ্দেশ দেন, সেইটি আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। অবুঝ ছেলে যেমন ভুল করে, তেমনি ভুল-ভ্রান্তি আমাদের জীবনেও ঘটে, নিষিদ্ধ পথে পা দিয়ে অসুবিধাগ্রস্ত হই। গ্রহগণ ভাগ্য-নিয়ন্তা না হ'ন, নির্দ্দেশক বটে।

যতটা শিক্ষা দেওয়া যায়, ততটুকু আমি বলবার চেষ্টা ক'রব। যা' অপরকে বোঝানো যায় না, তা' থাকবে অব্যক্ত। যাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হ'য়েছে, তিনি নিজের ক্ষমতায় অলক্ষ্যকে দেখবেন। অনুভূতি যাঁদের তীব্র, মন যাঁদের অন্তর্ম্মুখী, তাঁরা চর্চ্চা ক'রলে এ শাস্ত্রে সাফল্য লাভ ক'রবেন।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, এই সাতটি শুভাশুভ গ্রহ। চন্দ্রের সম্পাত-বিন্দু হ'লেও, রাহু ও কেতুকেও গ্রহের মধ্যে ধরা হ'য়েছে। আত্মা, মন, সাহস, বুদ্ধি, সুখ (ধন), প্রেম ও দুঃখ, সাতটি বিষয় সপ্ত গ্রহের দান। বারটি রাশি-দ্বারা গঠিত রাশি-চক্রে গ্রহগণ পরিভ্রমণ করেন। নিজ ক্ষেত্র, উচ্চ স্থান ও নীচ স্থান প্রত্যেক গ্রহেরই নির্দ্দিষ্ট আছে রাশি-চক্রে। রবি-চন্দ্রের ছাড়া বাকী পঞ্চ গ্রহের দুটি ক'রে ক্ষেত্র।

রাশি-চক্রে লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমকে কেন্দ্র এবং পঞ্চম ও নবমকে ত্রিকোণ বলা হয়। কেন্দ্রগত গ্রহ বলশালী ও সাফল্যসূচক। দশম হ'ল আকাশ—মাথার ওপর, দশমস্থিত গৃহ তা'ই সব চেয়ে বলবান্—মধ্যদিনের সূর্য্যের মতই দীপ্তিমান্। স্বক্ষেত্রগত ও উচ্চস্থ গ্রহ শুভ ফলদাতা। নীচস্থ, অস্তমিত, শত্রুগৃহগত ও দুঃস্থনস্থিত বা দুঃস্থানপতি যুক্ত গ্রহ দুর্ব্বল। পাপফল ভিন্ন আর কিছু এদের কাছে আশা করা যায় না। এই ভাবের পাপগ্রহ বিশেষ বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করে। রবি-যুক্ত গ্রহকে অস্তমিত বলা হয়। লগ্ন হ'তে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানের নাম দুঃস্থান। এ ছাড়া গ্রহদের দৃষ্টি আছে। গ্রহগণ নিজস্থিত স্থান থেকে সপ্তমে পূর্ণ দৃষ্টি করেন। কেবল ৩য়ে ও ১০মে শশি, ৪র্থে ৮মে মঙ্গল ও ৫মে ৯মে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি, সপ্তমেও এঁরা করেন পূর্ণ দৃষ্টি। এখানে দ্বাদশভাবের পরিচয় দিলে বিষয়টি বোঝানো সহজ হ'বে। লগ্নের নাম তনু ভাব, তারপর ধন, সহজ, বন্ধু, পুত্র, রিপু, জায়া, নিধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয়, এই নিয়ে দ্বাদশভাব। যে ভাবে ভাবপতি নিজে থাকেন বা দৃষ্টি করেন, কিম্বা শুভগ্রহ অবস্থান করেন বা দৃষ্টি করেন, সেই ভাবোক্ত বিষয়ে শুভ হয়। অশুভ গ্রহের ভাব বা দৃ দুঃখ ও ঝঞ্ঝাট আনে।

রাশি-চক্রের আদি মেষ, তারপর বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, মকর, কুম্ভ ও মীন পর পর গণনীয়। মেষে সুরু, মীনে সমাপ্তি। দ্বাদশ রাশিতে কালপুরুষের পূর্ণ অবয়ব পাওয়া যায়। যথা :—

মেষে—মাথা ও মুখ
বৃষে—গলা, চোখ
মিথুনে—কাঁধ ও বাহু
কর্কটে—বক্ষঃস্থল
সিংহে—হৃদয় ও উদর
কন্যায়—নাড়ীভুঁড়ি
তুলায়—বস্তি বা তলপেট
বৃশ্চিকে—গুহ্যদেশ
ধনুতে—গুহ্যদেশ
মকরে—জানুদেশ
কুম্ভে—জঙ্ঘা
মীনে—পায়ের পাতা

যে রাশি লগ্ন, সেইটি জাতকের মাথা। দ্বিতীয় রাশি গলা, তৃতীয় কাঁধ ও হাত এইভাবে উল্লিখিত নিয়মে গুণে যেতে হ'বে। চন্দ্রস্থিত রাশি জন্ম-রাশি ও চন্দ্রস্থিত নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র নামে অভিহিত হয়।

দ্বাদশ রাশির চর, স্থির, দ্ব্যাত্মক সংজ্ঞা আছে। ৬টি রাশি পুরুষ ও ৬ রাশি স্ত্রী-সংজ্ঞক। গ্রহের ও রাশির স্বভাব এবং কারকতা আছে। রবি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি পুরুষগ্রহ, চন্দ্র, শুক্র স্ত্রীগ্রহ, বুধ পুরুষগ্রহযুক্ত হ'লে পুরুষ ও স্ত্রীগ্রহের যোগে নারী-বিবেচিত হন। দ্বাদশ রাশি অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু ও জল—চারি ভাগে বিভক্ত। এর অর্থ:—অগ্নিরাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন, কোপন-স্বভাব, পৃথ্বী বাস্তবতাপ্রিয়, বায়ু মানসিকতাবিশিষ্ট ও জলরাশি ভাবপ্রবণ।

আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে; কিন্তু এত অল্প পরিসরে এখানে তা' আলোচনা করা সম্ভব নয়। কামিনী ও কাঞ্চন বিষয়ে মোটামুটি কিঞ্চিৎ আভাসই এখানে দিবার চেষ্টা করলাম।

জায়া সম্বন্ধে বিচার হয় সপ্তম ভাব থেকে। লগ্ন হ'তে সপ্তম রাশি জায়াস্থান, আগেই বলেছি। পত্নীসুখ হয়—যদি সপ্তমে সপ্তমপতি থাকেন বা দৃষ্টি করেন, সপ্তমে শুভগ্রহ অবস্থান করেন, সপ্তমপতি কেন্দ্রগত হন, সপ্তম ভাব শুভদৃষ্ট সপ্তমপতি শুভযুক্ত বা দৃষ্ট হন, প্রেমপ্রীতি ও কলত্রকারক শুক্র বলশালী বা কেন্দ্রস্থ থাকেন এবং স্বাভাবিক সপ্তম তুলায় শুভগ্রহ অবস্থান করেন। এগুলির অন্যথা হ'লে অশুভ হ'বে, এ আমরা সহজেই কল্পনা ক'রতে পারি। যে যোগ বা দৃষ্টি খারাপ মনে হ'বে, সেই গ্রহের স্বভাবও কারকতা জানা প্রয়োজন, কোন ভাবের অধিপতি ও কোন ভাব থেকে অশুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রছে ভাল ক'রে বুঝলে মূল কারণ গোপন থাকবে না। অর্থাৎ কি জন্যে অমঙ্গল ঘট্‌বে, সেইটি জানা যাবে। শুভ ফলও এই

ভাবে জানতে হয়। যোগকারক দুর্ব্বল গ্রহ যদি বলবান্ শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হন, তা'হলে খারাপ ফল অনেক পরিমাণে কেটে যায়। দুর্ব্বল কেন্দ্রস্থ গ্রহ বাধা ও ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে ভল দান করেন। সপ্তম পতি যদি রাহু বা কেতুযুক্ত হ'য়ে শনি বা মঙ্গল কর্ত্তৃক দুষ্ট হন, তা'হলে জাতক ব্যাভিচার-পরায়ণ হয়। শুক্র মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকলে জাতক স্ত্রীসঙ্গপ্রিয় হয়ে থাকে। এখানে মনে রাখতে হ'বে শুক্রে মোহ সৃষ্টি করে মনে, মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত বা দৃষ্ট হ'য়ে মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকলে তবেই সে প্রেম দেহজ হ'য়ে ওঠে।

সপ্তম বা জায়াভাবে পুরুষের স্ত্রীবিচার এবং নারীর স্বামী বিষয়ের বিচার হ'য়ে থাকে। চন্দ্র হ'তে সপ্তম রাশিতেও রমণীর পতি-সৌভাগ্য দেখা হয়। শুক্র হ'তে সপ্তম রাশিতে পুরুষের স্ত্রীভাগ্যের বিচার করা চলে।

বারান্তরে এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

কনে বৌয়ের মন্দির

(জনপ্রবাদমূলক গল্প)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

"বড় বউমা, টাকা থাকলেই মানুষ সুখী হয় না। সুখ, আনন্দ মানুষের মনে। আমি লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছি, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচও করেছি; জেনে-শুনে মন্দ কাজে কখনও একটি পয়সাও খরচ করিনি। তবুও আজ আমার প্রাণ হাহাকার করছে। বংশের দুলাল যজ্ঞেশ্বর, মনে করেছিলেম ও মানুষ হয়ে পিতৃপিতামহের নাম রাখবে। কিন্তু ওর যে রকম মতিগতি দেখছি, তা'তে পিতৃপুরুষের নাম রক্ষা ত দূরের কথা, ওযে বিষয়সম্পত্তি রক্ষে করতে পারবে, সে আশাও আমি করি নে। ইচ্ছাময় ভগবানের যা' ইচ্ছে তাই হবে, আমরা অন্ধ, তাই ভেবে মরি।"

বিধবা পুত্রবধূ অবগুণ্ঠনের দ্বারা বদন আবৃত করিয়া শ্বশুরের অদূরে বসিয়া বৃদ্ধের কথা শুনিতেছিলেন। বৃদ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলে, বিধবা অবনত মস্তকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাবা, যজ্ঞেশ্বরের জন্য আমার মনে তিলমাত্র শান্তি নাই। এই ছেলেবয়সেই ও যে রকম একগুঁয়ে ও অবাধ্য হয়ে উঠেছে, তাতে আমার সর্ব্বদাই ভয় হয়—ও হ'তেই আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। ওকে শোধরাবার কি আর কোন উপায় নেই, বাবা?"

"কি করবে মা, সবই কপাল! ফরাসী পড়াবার জন্য সাহেব রাখলেম, পার্শী পড়াবার জন্য মৌলবী রাখলেম, ইংরেজী পড়াবার জন্যও লোক রাখলেম। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলে না। ও-সব কপাল মা কপাল, কপালে না থাকলে বিদ্যে হয় না। এই ত চোদ্দ পনর বছর বয়স, এক একবার ভাবি, হয়ত আর একটু বয়স হলে বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে। কিন্তু ও দিন দিন যে রকম বাড়িয়ে তুলছে, তাতে ওর যে কখনও বুদ্ধি শোধরাবে সে আশা আর করতে সাহস হয় না। সকলেই নিজে নিজের কপাল নিয়ে জন্মেছে, কপালের লিখন কে খণ্ডাবে মা?"

"তবু একবার চেষ্টা করে' দেখতে হয়।"

"তোমরা দেখ মা, আমি ত হাল ছেড়ে দিয়েছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিলে, পুত্রবধূও সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আজ দু'দিন তার দেখা পাইনি। ছোট বউ আদর দিয়েই ছেলেটার আখের মাটি করলে। ছেলেকে আদরও দিতে হয়, আবার শাসনও করতে হয়।"

এই বৃদ্ধ শ্বশুর ও বিধবা পুত্রবধূর কথোপকথন হইতে তাঁহাদের মানসিক অশান্তির পরিচয় ব্যতীত আর কোন

পরিচয়ই পাওয়া গেল না, সেইজন্য পাঠকদিগের অবগতির জন্য ইঁহাদের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের উত্তরাঞ্চলে বোড় নামক পল্লীতে একজন ধনবান্ কায়স্থ বাস করিতেন, তাঁহার নাম ছিল দেবীচরণ সরকার। সরকার মহাশয়ের নানা প্রকার ব্যবসায় ছিল, তন্মধ্যে ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম প্রভৃতি প্রাচ্যদেশবাসীর পরিধেয় "লুঙ্গি" নামক বস্ত্রের চালানি কারবার হইতেই তাঁহার বৎসরে লক্ষাধিক টাকা আয় হইত। ইহা ব্যতীত বাটীর নিকটে গঙ্গার তীরে লক্ষ্মীগঞ্জে এবং বৰ্দ্ধমান, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রেও তাঁহার আড়ৎ ছিল। লুঙ্গি-বয়নের জন্য তাঁহার বিস্তৃত কারখানা ছিল, সেখানে শত শত তন্তুবায় লুঙ্গি বয়ন করিত। এতদ্ব্যতীত বহু তন্তুবায় তাঁহার নিকট হইতে অগ্রিম দাদন লইয়া, তাঁহাকে লুঙ্গি সরবরাহ করিত। চন্দননগর লালবাগানে জগন্নাথ ভড় নামক একজন ধনবান্ তন্তুবায়ের খুব বড় কারখানা ছিল, সেই কারখানাতে লুঙ্গি ও অন্যান্য নানা প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হইত, দেবীচরণ সেই কারখানার প্রায় সমস্ত লুঙ্গিই ক্রয় করিতেন। ফরাসী বণিকেরা দেবীচরণের লুঙ্গিতে জাহাজ বোঝাই করিয়া পূর্ব্বদেশে চালান দিতেন। এই ব্যবসায় হইতে কোন কোন বৎসরে তাঁহার দুই লক্ষ, আড়াই লক্ষ টাকাও আয় হইত।

তাঁহার আয় যেরূপ প্রচুর ছিল, ব্যয়ও তদনুরূপ ছিল। তাঁহার কারখানা, আড়ৎ প্রভৃতিতেও শত শত পরিবার প্রতিপালিত হইত, ইহার উপর তাঁহার দান ছিল অতুলনীয়। এখনও বোড় অঞ্চলের প্রাচীনগণের মুখে তাঁহার অসাধারণ দানশীলতার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। দুর্গোৎসবের সময়ে তিনি ব্রাহ্মণবাটীতে যে নৈবেদ্য পাঠাইতেন, তাহার প্রত্যেকটিতে এক মণ করিয়া তণ্ডুল এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য দ্রব্য থাকিত। কথিত আছে যে, সেই নৈবেদ্যের থালা এত বড় ছিল যে, অধিকাংশ দরিদ্র, এমন কি অনেক মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বাটীর দ্বার দিয়া সেই থালা বাটীর ভিতর লইয়া যাইতে পারা যাইত না, নৈবেদ্য বাহকেরা দ্বারের বাহিরে থালা নামাইয়া রাখিত, ব্রাহ্মণেরা অন্য পাত্র করিয়া ক্রমে ক্রমে দ্রব্যাদি বাটীর ভিতর রাখিয়া আসিতেন। ইহা ব্যতীত, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী ও পর্ব্বাহ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণবাটীতে যে "সিধা" বা ভোজ্য প্রেরিত হইত, তাহাতে অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক মাস সংসারযাত্রানির্ব্বাহ হইত। অর্থসাহায্যপ্রার্থী হইয়া কেহ দেবীচরণের নিকটে উপস্থিত হইলে, কখনও তাহাকে বিফলকাম হইয়া ফিরিতে হইত না। বলা বাহুল্য, এই জন্য তিনি জনসাধারণের নিকটে ভাগ্যবান্ ও প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

কিন্তু দেবীচরণ প্রাতঃস্মরণীয় হইলেও, ভাগ্যবান্ ছিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দমোহন এবং কনিষ্ঠ পুত্র কালীমোহন পিতার জীবদ্দশাতেই, সরকারদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা অন্ধকার করিয়া যৌবনেই লোকান্তরে গমন করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন নিঃসন্তান ছিলেন, কালীমোহনের একটি পুত্র হইয়াছিল। দেবীচরণের সংসারে নিকট ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় আত্মীয়ার অভাব না থাকিলেও একালের হিসাবে তাঁহার "আপনার" বলিতে পত্নী, দুইটি বিধবা পুত্রবধূ এবং শিশু পৌত্র ব্যতীত আর কেহ ছিল না। বৈদ্যনাথ নামে দেবীচরণের এক সহোদর ছিলেন এবং তাঁহারও সন্তানাদি ছিল; কিন্তু দেবীচরণের বংশধর হিসাবে ঐ শিশু পৌত্র ব্যতীত আর কেহই ছিল না।

এ অবস্থায় সেই শিশু যে পিতামহ, পিতামহী, জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যপত্নী এবং জননীর অত্যধিক আদরে লালিতপালিত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ আদরের পরিণাম সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সকলেই তাহার অন্যায় আব্দারে প্রশ্রয় দিতেন; তাহাকে যে লালনপালনের সঙ্গে শাসন করাও উচিত, এ কথা কেহই মনে করিতেন না। সে শৈশব হইতে কৌমার্য্যে, কৌমার্য্য হইতে কৈশোরে উপনীত হইল, কিন্তু তাহার শিক্ষা কিছুই হইল না। পঞ্চম বর্ষে তাহার যথাশাস্ত্র বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে উৎসবও হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিদ্যা সেই আরম্ভেই রহিয়া গেল, আট দশ বৎসরের মধ্যে কিছুমাত্র অগ্রসর হইল না অথচ অভিভাবকদিগের অনুষ্ঠানেরও ত্রুটি ছিল না। ফরাসী ও ইংরাজী শিখাইবার জন্য

সাহেব শিক্ষক, ফার্সী শিখাইবার জন্য মৌলবী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য গুরুমহাশয়—সকলই ছিল, কিন্তু তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা বালক যজ্ঞেশ্বরের প্রতি দেবী সরস্বতীর কৃপাকর্ষণে সমর্থ হইল না। যজ্ঞেশ্বর বাঙ্গালা লেখাপড়া যৎসামান্য শিখিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিদ্যালাভের জন্য তাহার পিতামহ যেরূপ অর্থব্যয় এবং শিক্ষকগণ যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা যদি অন্য কোন বালকের বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত হইত, তাহা হইলে সে যৌবনে পদার্পণ করিয়াই কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত।

এই বংশের দুলাল, নয়নের মণি পৌত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া তাহার পিতামহ এবং জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য-পত্নী কিরূপ ব্যাকুল ও চিন্তিত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন।

যজ্ঞেশ্বর কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে, তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা শতগুণ বেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এতদিন সে তাহার সমবয়স্ক বালকদিগকেই সঙ্গী করিয়া পাড়ায় বালক-সুলভ চপলতা করিয়া বেড়াইত, দুষ্টবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া প্রতিবেশীদিগের ক্ষতি করিত, বৃদ্ধ দেবীচরণ তাহা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা করিতেন। সতর আঠার বৎসর বয়সে তাহার চরিত্র দূষিত হইল, সে অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ সঙ্গীদের প্রভাবে পড়িয়া দ্রুতপদে উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার বন্ধুরূপী শত্রুদের পরামর্শ সে গুরুবাক্য অপেক্ষা পালনীয় মনে করিতে লাগিল। তাহারা সর্ব্বদা তাহাকে এইরূপ বুঝাইত যে, তাহার বৃদ্ধ পিতামহের মৃত্যুর পর সে একাই তাঁহার পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ সম্পত্তির মালিক হইবে। সে তখন ইচ্ছা করিলে, কি না করিতে পারিবে? তাহার মাথার উপর শাসনকর্ত্তৃরূপে পিতা বা পিতৃব্য নাই; যতদিন বৃদ্ধ পিতামহ আছেন, ততদিন তাহাকে একটু সাবধানে চলিতে হইবে, তাহার পর বৃদ্ধ চক্ষু মুদিত করিলে আর তাহাকে পায় কে? মা বা জেঠাইমা? তাঁরা ত স্ত্রীলোক, তাঁরা বাহিরের কি জানেন? বন্ধুদিগের মুখে বারংবার এইরূপ সদুপদেশ শুনিয়া যজ্ঞেশ্বর বুঝিল যে, পিতামহের মৃত্যু না হইলে, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলে, তাহার আনন্দ ষোল কলায় পূর্ণ হইবে না। সুতরাং পিতামহর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে একটু সাবধানে থাকিতেই হইবে। বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া সে ক্রমে ক্রমে সুরাপানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে প্রথমে সুরাপানে সম্মত হয় নাই, বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করিলে বলিত "আমি টাকা দিচ্ছি, কিনে এনে তোমরা খাও, আমি খাব না।" তাহার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই পূর্ব্বে "তাড়ি" পান করিবার পয়সা জুটিত না, এখন যজ্ঞেশ্বরের অর্থে তাহারা বহুমূল্য ফরাসী সুরা না হইলে সন্তুষ্ট হইত না। এই সুরাপান ব্যাপারটা প্রথমে সরকারদিগের বাটীতে হইত না, হইত কোন বন্ধুর বাটীতে অথবা কোন কুৎসিত পল্লীতে। তাহার বন্ধুরা যখন দেখিল যে, যজ্ঞেশ্বর কিছুতেই সুরা পান করিতে চায় না, তখন তাহারা পরামর্শ করিয়া অনতিতীব্র মিষ্টস্বাদ ফরাসী সুরা আনিয়া তাহার কাছে বসিয়া পান করিত। সে সুরার মধুর গন্ধে কক্ষ আমোদিত হইত। ইউরোপের মধ্যে ফরাসীদেশে যেরূপ উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য সুরা প্রস্তুত হয়, সেরূপ আর কোন দেশে হয় না। যজ্ঞেশ্বরের ব্যয়ে তাহার বন্ধুরা মধ্যে মধ্যে সেইরূপ সুরা পান করিত এবং যজ্ঞেশ্বরকে বলিত যে, উহা সুরাই নহে, উহাতে নেশা হয় না, মনে স্ফূর্ত্তি হয় মাত্র। বন্ধুদের অনুরোধে, যজ্ঞেশ্বর একদিন অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা, ঐরূপ মিষ্টস্বাদ সুরা জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া দেখিল—বাস্তবিকই উহা মিছরির সরবতের ন্যায় সুমিষ্ট। তখন সে সাহস করিয়া অতি অল্প মাত্রায় পান করিল। সরস্বতীর কৃপালাভে বঞ্চিত যজ্ঞেশ্বর দুষ্টা সরস্বতীর কৃপালাভ করিল, তাহার অন্য প্রকার বিদ্যারম্ভ হইল। সেদিন তাহার সুরাপানের "হাতেখড়ি" হইল।

যজ্ঞেশ্বরের বয়স ষোল বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। দেবীচরণের একমাত্র পৌত্রের বিবাহে কিরূপ সমারোহ হইয়াছিল, কিরূপ দান-খয়রাৎ, কিরূপ 'দীয়তাং ভোজ্যতাং' হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা বহুকাল ধরিয়া চন্দননগর অঞ্চলে জনপ্রবাদরূপে প্রচারিত

ছিল। সেকালে সাধারণতঃ পনর ষোল বৎসর বয়সে পুত্রের এবং পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দিবার প্রথা ছিল। অনেক সময়ে ইহা অপেক্ষাও অল্প বয়সে বিবাহ হইত, কদাচিৎ ইহার অধিক বয়সে হইত। দেবীচরণ ও তাঁহার পুত্রবধূরা মনে করিয়াছিলেন যে, বিবাহ হইলেই যজ্ঞেশ্বরের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইবে, সে শান্ত ও সুবোধ হইবে। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হইল না। যজ্ঞেশ্বরের সুবুদ্ধি হওয়া ত দূরের কথা, বিবাহের পর তাহার ধারণা হইল যে, সে এখন সা-বালক হইয়াছে, সে আর পূর্ব্বের মত বালক নহে যে, কোন অন্যায় করিয়া ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইবে।

যজ্ঞেশ্বর যে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, একথা তাহার বিশিষ্ট বন্ধুর দল ব্যতীত আর কেহই জানিত না। কিন্তু একথা অধিক দিন গোপন রহিল না; বিশিষ্ট বন্ধু হইতে সাধারণ বন্ধু, নফর, খানসামা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে তাহার গুণের কথা জানিতে পারিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেবীচরণের বাসভবন রাজপ্রাসাদের মতই বিশাল ছিল, উহার বহির্ব্বাটীতে এবং অন্তঃপুরে অসংখ্য কক্ষ ছিল, অনেক কক্ষ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কখনই ব্যবহৃত হইত না। বহির্ব্বাটীর নিম্নতলের কক্ষগুলিতে সরকার মহাশয়ের ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম্ম হইত, বিদেশী কর্ম্মচারীরা ও পরিচারকগণ বাস করিত। গৃহস্বামী বা তাঁহার সহোদর কদাচিৎ সেই সকল কক্ষে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারা দ্বিতলের কক্ষগুলি তাঁহাদের বৈঠকখানা রূপে ব্যবহার করিতেন। নিম্নতলে যেদিকে পরিচারকেরা বাস করিত, সেইদিকের কোণে একটা অব্যবহৃত কক্ষ যজ্ঞেশ্বর নিজের গুপ্ত আড্ডার জন্য বাছিয়া লইয়াছিল। এই কক্ষে বসিয়া সে তাহার বন্ধুদিগের সহিত, তাম্রকূট ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিত। সে সুরাপানে অভ্যস্ত হইবার পর, এই কক্ষে বসিয়াই বন্ধুগণের সহিত সুরাপান করিত। সে যে সুরা পান করে, একথা তাহার নিজের দুই একজন খানসামা ব্যতীত কোন লোকই জানিতে পারে নাই। শেষে একদিন, যজ্ঞেশ্বরের বুদ্ধির দোষে বা গুণে, স্বয়ং দেবীচরণই জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বংশধরের বিদ্যা কোনদিকে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর, যজ্ঞেশ্বর বন্ধুদিগকে লইয়াই সেই নিভৃত কক্ষে বসিয়া সুরাপান করিতেছিল, এমন সময়ে তাহরে খানসামা আসিয়া বলিল "বড়কর্ত্তাবাবু আপনাকে ডাকছেন।"

যজ্ঞেশ্বরের বন্ধুরা প্রমাদ গণিল, কারণ তখন যজ্ঞেশ্বর নেশায় একেবারে অজ্ঞান না হইলেও, তাহার কথায় জড়তা আরম্ভ হইয়াছিল। "বড়কর্ত্তর" সম্মুখে সে অবস্থায় যাওয়া কিছুতেই উচিত নহে, অথচ "বড়কর্ত্তার" আদেশ অলঙ্ঘনীয়। এ অবস্থায় কি করা যায়? তাহারা অবশেষে যজ্ঞেশ্বরকে বলিল "খোকাবাবু, বড়কর্ত্তার কাছে গিয়ে খুব অল্প আর ছোট ছোট কথা কইবে; যেন লম্বাই চওড়াই কর' না বা বেশী কথা বল' না। খুব সাবধান, যেন মনে থাকে।"

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "কুছপরোয়া নেই, আমাকে আর বুদ্ধি দিতে হবে না, আমি ঠিকই আছি!"

এই বলিয়া ঈষৎ স্খলিত পদে সে ভৃত্যের সহিত উপরে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল যে, খুব ছোট খাটো কথা বলিবে, বড় কথা একেবারে বলিবে না, কি জানি বড় কথা বলিলে পাছে বুড় কিছু মনে করে।

ভৃত্য তাহাকে বড়কর্ত্তার কক্ষদ্বারে পঁহুছিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল, যজ্ঞেশ্বর অনাবশ্যক দৃঢ় পদক্ষেপে, ধীরে ধীরে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতামহের কিছু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। দেবীচরণ পৌত্রকে দেখিয়া বলিলেন "দাদাভাই এসেছ? ব'স।"

যজ্ঞেশ্বর যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই নীরবে বসিয়া পড়িল। কর্ত্তা তাহা দেখিয়া বলিলেন "ওখানে কেন? এইখানে কাছে এসে বস।"

যজ্ঞেশ্বর সংক্ষেপে উত্তর করিল "থাক্, বেশ আছি।"

"এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

যজ্ঞেশ্বর মৃদুস্বরে বলিল "কোথায় আর থাকব?"

উত্তর শুনিয়া দেবীচরণ বিস্মিত হইয়া, পৌত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করছিলে?"

যজ্ঞেশ্বর বলিল "কি আর করব ?"

"তবু শুনি কি করছিলে ?"

যজ্ঞেশ্বর ভাবিল, প্রশ্নের উত্তরে কোন বড় কথা বলা হইবে না, খুবই ছোট কথা বলিতে হইবে ; তাই সে একটা ছোট কথা ভাবিয়া ঠিক করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে দেবীচরণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করছিলে শুনি ?"

যজ্ঞেশ্বর বলিল "কি আর করব ? গোটাকতক ইঁদুর ধরে' খাচ্ছিলেম।"

দেবীচরণ অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কি পাগলের মত বকৃছ ? ইঁদুর ধরে খাচ্ছিলে কি ?"

যজ্ঞেশ্বর বলিল—"তা' কি হয়েছে ? আমি ত হাতী-ঘোড়া ধরে' খাইনি, গোটাকতক ইঁদুর ধরে' খাচ্ছিলেম, তাতে আর কি দোষ হয়েছে ?"

পাছে হাতী-ঘোড়া বলিলে পিতামহের মনে সন্দেহ হয় যে, অত বৃহদাকার পশু ধরিয়া কি করিয়া খাইতেছিল, তাই তাঁহাকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য ক্ষুদ্রতম চতুষ্পদ ইন্দুরের কথা বলিয়াছিল। কে জানিত যে, তাহাতেই তাহার বিদ্যা জাহির হইয়া পড়িবে, তাহার একটা কথাতেই বৃদ্ধ পৌত্রের বিদ্যার পরিচয় পাইবেন ?

বৃদ্ধ পৌত্রের কথা শুনিয়া অনেক ক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা এখন যাও, কিন্তু সাবধান, দেখ, শেষে গলায় না বেধে যায়।"

ছোট কথায় উত্তর দিয়া পিতামহের চক্ষে ধূলি দিতে পারিয়াছে ভাবিয়া যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে সগর্ব্ব পদক্ষেপে প্রস্থান করিল। পৌত্র প্রস্থান করিলে, দেবীচরণ আলবোলার নলটা মুখে দিয়া অনেক ক্ষণ ধূমপান করিলেন, পরে একজন ভৃত্যকে বলিলেন, "বাঁড়ুষ্যে মশাইকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে, দেবীচরণের বাল্যবন্ধু এবং প্রতিবেশী প্রধান কর্ম্মচারী বা ম্যানেজার রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এমন অসময়ে ডাক পড়ল কেন ?

"বস, বলছি।"

বন্দ্যোপাধ্যায় উপবেশন করিলে, দেবীচরণ নিম্নস্বরে বলিলেন "ছোঁড়াটা একেবারে অধঃপাতে গেছে। এই মাত্র চুরচুরে মাতাল হয়ে আমার কাছে এসেছিল। কালই যা' হয় একটা ব্যবস্থা করব। তুমি কাল সকালেই গুরুদেবের কাছে গিয়ে, তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে এখানে একবার পায়ের ধুলো দিতে ব'ল। তাঁর উপদেশ-মত যা' হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বড় বৌমার দত্তক পুত্রের ব্যবস্থা করব কিনা ভাবছি। গুরুদেব যা' বলবেন, তাই হবে। এসব কথা যেন প্রকাশ না হয়।"

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি কালই তোমার গুরুদেবকে আনতে যাব।"

এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল অন্য বিষয়ের কথাবার্ত্তার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গুরুদেব আসিলেন। দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লইয়া কয়েকদিন ধরিয়া গুরুদেবের সহিত নিভৃতে আলোচনা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিলেন। সুবিধা অসুবিধা, সকল দিক্ স্থির করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি দেবত্র করা হইবে, অস্থাবর সম্পত্তি সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেক জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূকে এবং অপর অর্দ্ধেক কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে দেওয়া হইবে। নগদ টাকা এবং অলঙ্কার প্রভৃতিও অনুরূপ দুইভাগ করিয়া দুই পুত্রবধূকে দেওয়া হইবে। "কনে-বৌ" অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ যদি দত্তক পুত্র লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে লইতে পারেন। কনিষ্ঠা পুত্রবধূর পরলোক-গমনের পর তাঁহার অংশের অধিকার যজ্ঞেশ্বর পাইবে না, পাইবে তাহার পত্নী। এইরূপ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া কর্ত্তা উইল করিলেন। তাঁহার লোকান্তর-গমনের পর উইলানুযায়ী কার্য্য হইবে; যতদিন তিনি জীবিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহার ইচ্ছামতই ব্যবস্থা হইবে।

ফরাসী আইনানুসারে উইল রেজিষ্ট্রি হইবার পর, দেবীচরণ গুরুদেবের সাক্ষাতে কনে-বৌকে একদিন

বলিলেন "মা, যজ্ঞেশ্বরের যেরূপ মতিগতি দেখিতেছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার মৃত্যু হইলে ও সমস্ত সম্পত্তি দু'দিনে নষ্ট করিবে। যাহাতে সেরূপ করিতে না পারে, গুরুদেবের এবং রামের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সেইরূপ উইল করিয়াছি। তুমি ইচ্ছা করিলে পোষ্যপুত্র লইতে পার। এখন তোমার কি ইচ্ছা জানিতে পারিলে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিব।"

শ্বশুরের কথা শুনিয়া কনে-বউ বলিলেন "বাবা, আমি পোষ্যপুত্র লইব না। আমি একজন বা দুইজনের মা হইব, যদি ভগবানের সে ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আমার এমন দশা হইবে কেন? যাহা ভগবানদত্ত নহে, তাহা লইয়া কি সুখী হইব? না বাবা, পোষ্যপুত্র আমি লইব না, পরের ছেলেকে ঘরে আনিয়া আমি যজ্ঞেশ্বরের ছেলেদের জ্ঞাতিশত্রু বাড়াইব না। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার বৌমা পুত্রবতী হউন, তাঁর পুত্রই সরকার বংশের ধারা রক্ষা করিবে।"

গুরুদেব বলিলেন "পোষ্যপুত্র না লও, আমরা অনুরোধ করিব না। কিন্তু তোমার কি কোন ইচ্ছা নাই মা? যদি কোন ইচ্ছা থাকে, আমাদের কাছে প্রকাশ কর। দেবীচরণের সাধ্যাতীত না হইলে, উনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন।"

দেবীচরণ বলিলেন "নিশ্চয়ই।"

কনে-বউ বলিলেন "ঠাকুর যখন অভয় দিচ্ছেন, তখন বলি। আমার অনেক দিনের সাধ, গঙ্গার ধারে একটি সুন্দর মন্দির করে' তাহাতে মা ভুবনেশ্বরীর কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করি আর মন্দিরের দুইদিকে শিবপ্রতিষ্ঠা করি।" এই বলিয়াই মস্তক অবনত করিয়া উদ্দেশে, করযোড়ে ভুবনেশ্বরীকে প্রণাম করিলেন, কনে-বউ এই কথা বলিবামাত্র গুরুদেব "সাধু, সাধু" বলিয়া উঠিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন "মা, সরকার বংশের গৃহলক্ষ্মীর মত কথা বলিয়াছ। তোমার ধর্ম্মানুরাগ আমার মত বৃদ্ধকেও লজ্জা দিয়েছে।"

দেবীচরণ বলিলেন "তাই হবে মা। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। রাম, তুমি আজ থেকেই মন্দির-নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন কর। মা, তোমাকে এমন মন্দির করে দিব, যা' দেখে নৌকার আরোহীরা অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকবে।"

সরকারবাটীর সম্মুখেই খটির ঘাট। সেই ঘাটের পথের উভয় পার্শ্বে বড় বড় চালের খটি বা গুদাম ছিল। সেই ঘাটের উত্তরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর মন্দিরনির্ম্মাণের কথা হইল। খটির ঘাটের দক্ষিণে মহাশ্মশান বোড়াই-চণ্ডীর ঘাট। কথিত আছে, শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল হইতে পিতাকে উদ্ধার করিয়া ফিরিবার সময়ে এই চণ্ডী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

গুরুদেব পুঁথি দেখিয়া মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার শুভ-দিন নির্দ্দেশ করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বয়ং ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। গঙ্গার গর্ভ হইতে সুদূর পোস্তা গাঁথিয়া তোলা হইল। শত শত সুদক্ষ শিল্পী মন্দির-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। স্থানীয় লক্ষ্মীগঞ্জের পণ্যদ্রব্যবহনের জন্য গঙ্গার তীরে যে স্থানে প্রতি বৎসর শত শত মহাজনী কিস্তি বা বড় নৌকা নির্ম্মিত হইত, দিবারাত্রি ছুতার মিস্ত্রিদিগের কোলাহলে ও বাস-বাটালি-মুগুর-করাতের শব্দে প্রতিধ্বনিত হইত, সেই স্থান রাজ, মিস্ত্রী, মজুরদিগের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। পোস্তা গাঁথা হইলে, তাহার উপর এক শ্রেণীতে উত্তর দক্ষিণে একেবারে তেরটি মন্দির গাঁথা হইতে লাগিল। মধ্যস্থিত মন্দিরটি বড় এবং উহার উভয় পার্শ্বস্থিত মন্দিরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। মন্দিরনির্ম্মাণে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগিল। যখন মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইল, তখন সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে উহাদের বিশেষতঃ উহাদের মধ্যবর্ত্তী মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিয়া মন্দিরনির্ম্মাতৃদিগের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল। মধ্যস্থিত মন্দিরটি ত্রিতল, প্রায় পঞ্চাশ হাত উচ্চ উহার আকৃতি নয়টি চূড়া-বিশিষ্ট রথের ন্যায়। মন্দিরটি পশ্চিমদ্বারী, উহার পশ্চাৎদিকের অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের ভিতর দিয়া ত্রিতল পর্য্যন্ত উঠিবার সিঁড়ি এমন কৌশল-সহকারে নির্ম্মিত হইল যে, সহজে বুঝিতে পারা যায় না যে, কোথায় সিঁড়ি আছে। রথের চূড়ায়, সূত্রধরগণ যেরূপ কারুকার্য্য করে, এই নবরত্ন মন্দিরের নয়টি চূড়া-স্থপতিরা কেবল ইষ্টক ও চুণ-সুরকির দ্বারা ঠিক সেইরূপ বা তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর কারুকার্য্যে

অলঙ্কৃত করিল। এই "নবরত্নের" উভয়-পার্শ্বস্থিত বারটি মন্দির-মধ্যস্থিত মন্দিরের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও, উহারাও নিতান্ত ছোট হইল না।

মন্দির-নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই কাশীধামে ভুবনেশ্বরীর কালীমূর্ত্তি এবং বারটি শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইল। শিব-লিঙ্গগুলি এবং ভুবনেশ্বরীর মূর্ত্তি কৃষ্ণপ্রস্তরে এবং কালীর পদতলে শয়ান মহাদেব-মূর্ত্তি শ্বেতমর্ম্মরে নির্ম্মিত হইল। শিবলিঙ্গ ও প্রতিমার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে, নৌকা-যোগে উহা কাশী হইতে চন্দননগরে প্রেরিত হইল। শিবলিঙ্গগুলি এবং ভুবনেশ্বরীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা যথাস্থানে স্থাপিত হইলে, বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে সজ্জিত হইল। কথিত আছে যে, কালীমূর্ত্তির ললাটে তৃতীয় নয়ন একখানি বহুমূল্য অত্যুজ্জ্বল হীরকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতিমার অঙ্গে অলঙ্কার পরাইবার জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে শিল্পী আসিয়াছিল। সেই শিল্পী প্রতিমার রত্ননয়ন ও অন্যান্য রত্নালঙ্কার যথাস্থানে ধাতু দ্বারা এরূপ দৃঢ়ভাবে বসাইয়া দিয়াছিল যে, কেহ ইচ্ছা করিলেই তাহা খুলিয়া লইতে পারিত না, ছেদনীর সাহায্য ব্যতীত উহা খুলিবার কোন উপায় ছিল না। প্রতিমার অঙ্গে যে সকল রত্নালঙ্কার ছিল, তাহারই মূল্য নাকি প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল। কেবল মন্দির কয়টির নির্ম্মাণেই লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, একথা স্থানীয় প্রাচীনগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত।

মন্দিরগুলির নির্ম্মাণকার্য্য এবং যথাস্থানে প্রতিমার স্থাপন শেষ হইলে, শুভদিনে দেবতার প্রতিষ্ঠা হইল। দেবতাপ্রতিষ্ঠার জন্য কাশীধাম হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং মিথিলা, নবদ্বীপ ও অন্যান্য বিদ্যাকেন্দ্র হইতে শত শত অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হইল। প্রথম দিনে ভুবনেশ্বরী-প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্ত্তী বারদিনে বারটি শিব প্রতিষ্ঠা হইল। এই দেবতাপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অন্যূন পনর দিন ধরিয়া অগণিত ব্রাহ্মণ, ভদ্র, ইতর, রবাহুত, অনাহুত প্রভৃতি সহস্র সহস্র লোককে ভোজন করান হইল। মন্দিরনির্ম্মাণে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহার উপর দেবতা-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেও প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইল। মোটের উপর মন্দির-নির্ম্মাণ ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা ব্যাপারে দেড় লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কনে-বউ তাঁহার শ্বশুরের নিকট হইতে যে নগদ টাকা ও অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সেইজন্য সকলে ঐ মন্দিরকে "কনে-বৌয়ের মন্দির" বলিত।

৪

কনেবৌয়ের বড় সাধের মন্দির নির্ম্মিত হইলে, তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, যাহাতে চিরকাল নির্ব্বিঘ্নে দেবসেবা সম্পন্ন হইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য তিনি অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্রয় করিয়া দেব-সেবার জন্য উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। কারণ, মন্দির-প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরেই দেবীচরণ ও কনে-বৌ উভয়েই স্বর্গারোহণ করিলেন। দেবীচরণ ব্যবসায়ী ছিলেন, জমিদারী বা ভূসম্পত্তির বৃদ্ধির প্রতি তাঁহার আগ্রহ ছিল না। চন্দননগরের ভিতরে বা বাহিরে তাঁহার যে সকল ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা তিনি দেবত্র করিয়াছিলেন। ফলে কনে-বৌ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন, তিনি শ্বশুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত নগদ টাকা হইতেই নবপ্রতিষ্ঠিত দেবতার সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার লোকান্তর-গমনে সেই সকল টাকা উত্তরাধিকার-সূত্রে দেবর-পুত্র যজ্ঞেশ্বরের হাতে পড়িল। সুতরাং সেই টাকার পরিণাম যাহা হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যজ্ঞেশ্বর সাবালক হইবার পর হইতেই পিতামহের শাসন-মুক্ত হইবার জন্য বড়ই আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। সে পিতামহকে ভয় করিত, পিতৃব্য-পত্নীকেও কতকটা ভয় করিত, নিজের জননীকে গ্রাহ্য করিত না। দেবীচরণ ও কনে-বৌ স্বর্গারোহণ করিলে, যজ্ঞেশ্বর সরকার পরিবারে কর্ত্তা হইয়া বসিল। সে যে পথে পদার্পণ করিয়াছিল, সে পথে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। কনে-বৌয়ের যে টাকা তাহার হাতে পড়িয়াছিল, তাহা অল্প দিনেই নিঃশেষ হইয়া গেল। তাহার পর জননীর নিকট আব্দার—জননী চিরকাল পুত্রকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কোন আব্দারে কখনও প্রতিবাদ করেন নাই, এখনও করিতে পারিলেন না।

সছিদ্র ঘটের জলের মত তাঁহার অর্থও অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন আরম্ভ হইল অলঙ্কার-বিক্রয়।

কনে-বৌয়ের মৃত্যুর পর হইতেই ভুবনেশ্বরীর নিত্য-সেবায় নানারূপ ত্রুটি হইতে লাগিল, চারিদিকে গোলমাল বিশৃঙ্খলা, কে কোন দিক দেখিবে? দেবীচরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহার বিভিন্ন ব্যবসায়ে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সুযোগ পাইয়া স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যে অনেকেই দেবী সরকারের টাকায় "বড়লোক" হইয়া উঠিল। এইরূপে দেবীচরণের মৃত্যুর দশ পনর বৎসরের মধ্যেই চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল চরণে সরকার-বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। সরকারদের বিশাল অট্টালিকা শ্রীহীন হইয়া পড়িল।

সেই সময়ে একদিন প্রাতঃকালে ভুবনেশ্বরীর পূজক ব্রাহ্মণ দেবীর পূজা করিতে গিয়া দেখিলেন, নবরত্ন মন্দিরের কবাট উন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনিই প্রত্যহ মন্দিরের দ্বার খুলিতেন, তাই তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া তিনি ভীত ও বিস্মিত হইয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রতিমার অঙ্গ হইতে অধিকাংশ অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে হাতুড়ির আঘাতে প্রতিমার একটী বাহু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সরকারবাটীতে এই নিদারুণ সংবাদ প্রেরিত হইল, দেখিতে দেখিতে পল্লীর আবালবৃদ্ধবণিতা মন্দিরপ্রাঙ্গনে সমবেত হইয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরও তাহার অনুচর-বৃন্দকে লইয়া ঘটনাস্থলে উপনীত হইল এবং পুলিশের সাহায্যে অচিরে চোরকে ধরিয়া তাহার ফাঁসীর ব্যবস্থা করিবে বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল, কখনও বা বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখনও তাহার নেশা কাটে নাই। প্রতিবেশীরা সন্দেহ করিল যে, এই অপহরণ যজ্ঞেশ্বরের অজ্ঞাতসারে হয় নই।

অঙ্গহীন প্রতিমা মন্দিরে রাখিতে নাই, তাই সেই সুন্দর পাষাণ-দেবতাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হইল, নবরত্ন-মন্দির শূন্য হইল। কনে-বৌ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেই মন্দির দেবতাশূন্য ও পরিত্যক্ত হইল। বহু ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত এরূপ সুবৃহৎ ও সুন্দর মন্দির এত অল্প সময়ের মধ্যে পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত হইতে বড় দেখা যায় না। ভুবনেশ্বরীপ্রতিমার সহিত যে সকল শিবলিঙ্গ কাশীধাম হইতে চন্দননগরে আনীত হইয়াছিল, তাহাদের পক্ষেও "এক যাত্রায় পৃথক্ ফল" হয় নাই। এখনকার প্রায় পঞ্চাশ কি ষাট বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরের মোদক জাতীয় এক ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া আপনাকে সাক্ষাৎ মহাদেব বলিয়া প্রচার করে। সে সর্ব্বদা একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি লইয়া ভ্রমণ করিত এবং কোথাও পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত শিবমন্দির দেখিলে, শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিত বা শিবলিঙ্গকে লইয়া গিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিত। তাহার অত্যাচারে চন্দননগরে অনেক শিবমন্দিরই শিবলিঙ্গ শূন্য হইয়া আছে। কনে-বৌয়ের প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গও এই ক্ষিপ্ত কালাপাহাড়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বারটি শিবমন্দিরের মধ্যে একটি অনেকদিন পূর্ব্বেই গঙ্গাগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই সকল মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূমি দুই তিন বার হস্তান্তরিত হইলে পর অবশেষে শ্রীল নরসিংহদাস বাবাজী নামক রামাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু সাড়ে আট শত টাকায় উহা ক্রয় করেন এবং জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া মন্দির-গুলির সংস্কারের চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার এই সদিচ্ছা ফলবতী হয় নাই।

নবরত্ন-মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূমি সরকার পরিবারের হস্তচ্যুত হইবার পূর্ব্বে, গঙ্গার পরপার হইতে এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি আসিয়া প্রধান মন্দিরে একটি মৃণ্ময়ী কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর ঐ প্রতিমা গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়। শ্রীল নরসিংহ দাস বাবাজীর পূর্ব্বে যিনি ঐ সকল মন্দিরের অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি অবশিষ্ট এগারটি শিবমন্দিরের মধ্যে সাতটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। যখন মাত্র চারিটি শিবমন্দির ও প্রধান মন্দির অবশিষ্ট ছিল, সেই সময়ে বাবাজী উহা ক্রয় করেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় নরসিংহদাস

বাবাজীর নিকট হইতে একহাজার টাকা সেলামী ও বাৎসরিক বার টাকা খাজানাতে ঐ মন্দির কয়টি ও তৎসংলগ্ন ভূমি মৌরসী জমা লইয়া মন্দিরের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে নবরত্ন মন্দিরের আমূল সংস্কার এবং সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট চারিটি শিবমন্দিরেরও সংস্কার করেন। তিনি নবরত্ন মন্দিরে স্বর্ণনির্ম্মিত "ওঁকার"-খচিত একটি রজত-ঘট স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত বৎসর মন্দির হইতে সেই স্বর্ণখচিত রজত ঘটটিও অপহৃত হইয়াছে। এখন এই মন্দিরের উভয় পার্শ্বে মতিবাবু প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের জন্য দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে কনে-বৌয়ের মন্দির পরিত্যক্ত, জনশূন্য ও চতুর্দ্দিক গভীর অরণ্যে বেষ্টিত ছিল, এখন সেই মন্দির আবার সুসংস্কৃত হইয়া এবং বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থিভবনে শোভিত হইয়া দিবারাত্রি লোকসমাগমে মুখরিত হইতেছে। মন্দিরের সম্মুখে, আজ কয়েক বৎসর হইল একটি সুন্দর নাটমন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভাগীরথীর উপরে, গঙ্গার পূর্ব্ব-তীরে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির মন্দির এবং মূলাজোড়ে ৺গোপীমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির যেরূপ গঙ্গার গর্ভ হইতে পোস্তা গাঁথিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, কনে-বৌয়ের মন্দিরও সেইরূপ গঙ্গার গর্ভে পোস্তা গাঁথিয়াই নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু কাল-সহকারে এই মন্দিরের নিম্নে বিস্তীর্ণ চড়া পড়াতে গঙ্গা এখন অনেকটা পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে, যে বৎসর গঙ্গার জল বৃদ্ধি পাইয়া চড়া ডুবিয়া যায়, সেই বৎসরই গঙ্গার জল-প্রবাহ এই মন্দিরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হয়। যদি শ্রীল নরসিংহদাস বাবাজী এবং শ্রীযুক্ত মতিবাবু মন্দির রক্ষায় হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে অনেক দিন পূর্ব্বেই, কনে-বৌয়ের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত মন্দিরগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত, তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই।

দেবীচরণ সরকারের বিশাল অট্টালিকার ঠাকুরদালান ও বহির্ব্বাটী এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে, অন্দরমহল বহুকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে। দেবী সরকারের কয়েক জন বংশধর এখন তাঁহার বহির্ব্বাটীতে বাস করিতেছেন।

নির্দ্দেশ

ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদনের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভাগবত জাতি-গঠনের সঙ্কেতে অভিসার। এই লক্ষ্য অমোঘ, অব্যর্থ। সংস্কৃতি ও সংহতি যখন দিব্য হয়, সাধনের বিকাশ ক্রমেই রাষ্ট্র ও প্রজননশীল সমাজ-জীবনে ছড়াইয়া পড়িবে। ইহা স্বার্থ-বিজড়িত নহে, ঈশ্বর-বিগ্রহ—শ্রীভগবানের চতুর্ব্যূহ সৃজনীশক্তি। বেদান্তের মহাবাক্যের ন্যায় ইহা উত্তম নির্দ্দেশ।





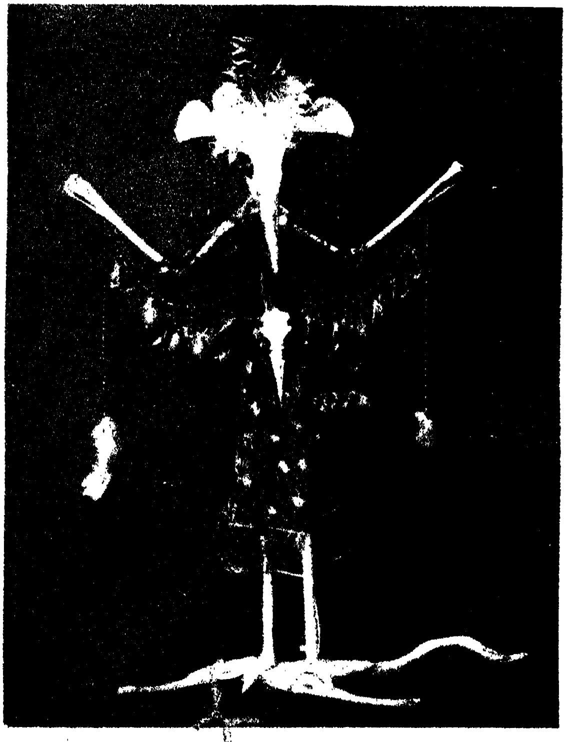
আলাদিন



সুন্দরী



[illegible]



[illegible]জোর গুরু



প্রসাধন ও প্রসাধনীয়



জুজু



গ্রন্থকীট



[illegible]



তোমার প্রতিভা ভাবে দিশেহারা খুঁজিয়া পায় না পথ
কোথাও তাহারে অতীত ডাকিছে কোথাও ভবিষ্যৎ।
—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণলাল রায় চৌ

: : বাণী=বীণা : :

উদ্বোধন-গীতিকা

শ্রীদিগেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

অশ্রুতে-ভরা উতল সুরের অলস বাঁশরী ফেলে—
কর্ম্মের বাণী শোনাইতে আয় ওরে বাঙ্‌লার ছেলে !
চাহেনা বাঙ্‌লা, চাহেনা আজিকে প্রেমিক সবুজ-কবি,
চাহে সে দেখিতে তরুণ-প্রাণের কর্ম্মে দৃপ্ত ছবি !—
বাসি হইয়াছে কবিতার যুগ—প্রেমের স্বপন বোনা,
কর্ম্ম-উদ্বোধনের গীতিকা বাঙ্‌লাকে তোরা শোনা।
ওরে ও তরুণদল !
বাঙ্‌লা-মায়ের মুকুটের মণি—সকল আশার স্থল !···

আরো বল্—'মোর ভারতের সেরা সোণার বাঙ্‌লা-ভূমি
সারা বিশ্বের নয়নলক্ষ্মী !...চির-বাঞ্ছিতা তুমি !—
তাই হেরি ওগো জননী আমার, তোমার সকল দোরে—
হানিতেছে কর জগতের যত শিল্পী ! কর্ম্মী ! ওরে !
আয় ! তোরা ছুটে আয়—
ওগো বাঙ্‌লার তরুণ-সেনানী !
জননী তোদের চায় !—

শোনা সে কোথায় অগ্নি-গিরির অসাড়—অতল-তলে
বাঙ্‌লা-মায়ের বুকের প্রদীপ স্তিমিত-শিখায় জ্বলে !
কোন্ সে অলস-দেবতার সেই ঘুম-পাড়ানোর বাঁশী
করিল তাহারে নিঝুম-নিথর আলোর দীপ্তি নাশি' !
সেই বাঁশরীর সুরের তুফানে অলস উতল প্রাণ—
কান্নাতে ভরপুর্ হয়ে ওঠে—থেমে যায় তার গান !
তাহাদের ঘুম ভাঙিয়ে তোদের তূর্য্য-নিনাদ রবে
বল্ ডেকে—'আজ অনাগত ওগো ভাইরা আয় না সবে ;

অভাব ! অভাব ! অভাব ! বলিয়া শুধুই
কাঁদিলে পরে—
আসিবে কি তোর সুখের জীবন ?...
ঘুচিবে আঁধার ওরে !···
আয় ছুটে আয় !—পথ-মঞ্জিল আগুলিয়া দাঁড়া আজ—
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ সাধন করিতে বাঙ্‌লা-মায়ের কাজ !
ভুলে বাধা—ব্যবধান—
বাঙ্‌লার ছেলে গাও প্রাণ খুলে' বাঙ্‌লার জয় গান !···

শার্দ্দূলশৈলে ত্রিশূলী

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

কে গো তুমি, শৈলরূপী বিরাট্ শার্দ্দূল
আরোহিয়া, ধরি করে মেঘের ত্রিশূল,
চেয়ে আছ হেলাইয়া দীর্ঘতর কায়া
মহাব্যোমে? ঘনস্তর কুজ্ঝটিকাচ্ছায়া
কভু অঙ্গ আবরিছে, কভু চন্দ্রকর
ললাটে বহ্নির মত ঝরিছে সুন্দর?
রন্ধ্রহীন অন্ধকারে তুঙ্গ দেবদার
ক্রম-নিম্ন শৈল-চক্রে শব-সাধনায়
ধ্যান-মগ্ন। মাঝে মাঝে দূরে শোনা যায়
কি উদাত্ত ঋক্‌মন্ত্র কণ্ঠে ঝরণার।

সতীর কাঞ্চনজঙ্ঘা হেরি বুঝি হিয়া
উচ্চকিত? নির্নিমেষ তাই বুঝি আঁখি?
সতী নাই, উজলিয়া হিমাদ্রি-ভবন
গৌরীরূপে এসেছে মা জুড়াতে বেদন।

উদ্‌ভ্রান্ত

— মীনকেতন —

স্বপনে দেখেছি যাহা,
জেগেও পেয়েছি তাই;
আমিই করেছি ভুল,
তুমিও কি কর নাই?

একি এ মায়ার খেলা
সবাই আপন-হারা,
ভাবিয়া না পাই কূল;
এর কি নাহিক মূল?

আমরা

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ভালবেসো আমাকেই শুধু, পৃথিবীতে
আমি ছাড়া আর কেউ নেইকো তোমার—
এ কথা স্মরণে রাখি' দিবসে নিশীথে,
আমারি করিও ধ্যান, নহে দেবতার।

আমার যা' ভালো লাগে প'র সেই বেশ,
অলঙ্কার অহঙ্কার—দূর ক'র তারে।
আমি চাহি ব'লে রেখো এলো ক'রে কেশ,
মানিও না আমা ছাড়া কভু আর কারে।

ঘর বল, বর বল, আমাকেই নিয়ে,
বেঁধেছ প্রেমের ফাঁসী এ পায়ে ও মনে;
র'ব তব প্রাণনাথ রাখিও জানিয়ে,
জনমে জনমে আর জীবনে মরণে।

তুমি চাঁদ, পূর্ণিমার—আমি নীলাকাশ—
আমারে জ্যোৎস্না দিয়া তুমি ভরিয়াছ,
তুমি ফুল, আমি তার মেদুর সুবাস,
তোমার পরাগে মোরে সুখে ধরিয়াছ।

আমি-তুমি শ্যাম-রাধা ছিলাম দ্বাপরে,
কলিতে হইয়া আছি স্বামী আর বধূ।
আমরা রাখিব সবে ধরণীর 'পরে
করিয়া অ-শোক, দিয়া হিয়া-মাঝে মধু।

পৌরুষেয়

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

একদা যে স্রোতস্বতী জাহ্নবীর তীরে
শাশ্বত সাহিত্য-সত্তা উপলব্ধ হয়েছিল বাল্মীকির মনে,
দস্যুতার মদগর্ব্বী আস্ফালন ঘিরে'
সমুচ্চ পর্ব্বতশীর্ষ সম প্রেম—
দুর্নিবার ছন্দে, আলোড়নে,
পশুরে গড়িল দেব, অমানুষে করিল মানুষ ;—
আমারো রঙীন্ চোখে
এখনো কি দিবালোকে
ওড়ে সেই সোণালী ফানুষ !

সদম্ভ লেখনীজালে গাঁথিনু আখর ;—
আমার নির্ব্বোধ আশা চেতনার্ত্ত
কামোচ্ছ্বল সরোবর-কূলে
চলিল যোজন-পথ, ভাঙিল কাঁকর,
রত্নাকর সম রোষে সহস্রেক শত্রুসঙ্গ নিল মাথা তু'লে।
সাহিত্য-সমরক্ষেত্রে শত্রুব্যূহে করিনু প্রবেশ
অভিমন্যু একা আমি,
যুঝিলাম অমাযামী—
করুণার নাহি অনুলেশ !

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু—হারালাম সব !—
তুচ্ছ, ঘৃণ্য কুক্কুরের মত কেহ হেলাভরে
দেখিল না চাহি !
সহিলাম আস্ফালন, শত কলরব,
দুর্ব্বার প্রাণের তেজে একলব্য রহিলাম তবু ভারবাহী !
আমার দুরন্ত বুকে উন্মাদের মত জাগে খুন,
সর্ব্বগ্রাসী চেতনায়
ব্যথা নাহি বেদনায়
প্রাণস্পন্দে ধরিয়াছে ঘুণ !

নিবিড় বনানীপ্রান্তে লুক্কায়িত রহি' ;
আমার বাড়ন্ত বহ্নি দিনে দিনে সর্ব্বভুক্
শিখার পীড়নে—
তৃষাদগ্ধ অন্তরের আর্ত্তনাদ ,সহি'
প্রান্তরে ছড়ায়ে যায়,—মধ্যাহ্নের তাপতপ্ত
ব্যথার কি[illegible]

সায়াহ্নের স্নিগ্ধ ছায়া নামিবার অবসর হবে—
এমন বাসনা মনে
তবু কেন অকারণে,
শুধু ভাবি,—কবে ? আর কবে !

আমার সম্মুখে-পার্শ্বে ব্যর্থতার বাধা—
পুঞ্জীভূত হিমালয়, বিন্ধ্যাগিরি, মলয় পর্ব্বতচূড়া জাগে,
অতর্কিতে চক্ষে হায় হাস্যকর ধাঁধা
ক্লান্তির গ্লানিমা দানি' ফুলশয্যা রচে আর
ডাকে অনুরাগে !
একপ্রান্তে হৃদয়ের দুর্নিবার অভিযান-ক্ষুধা,
আরপ্রান্তে মৃদু হাসি
কুসুমের মত রাশি
পরাজয়-শয়নের সুধা !

বীর আর কাপুরুষ—দু'জনার মাঝে
অবিশ্রাম রণলিপ্সু মনে মোর সংগ্রামের,
সংশয়ের দোলা,
মধ্যপথ হ'তে শেষে ফিরে যাব লাজে ?—
অভিসারী আত্মা মোর মৃত্যুভয়ে পিছু আসি'
রহিবে বিভোলা !
প্রাণশক্তি হবে লুপ্ত !—অপমৃত্যু হবে পৌরুষের ?
দুর্জ্জয় কামনা-কণা—
গোখুরা নামাবে ফণা
সার হবে ভার কলুষের !

মৃত্যুর পূজারী আমি—ফিরিব না পিছু !
মানিব না পরাজয়, বিন্ধ্যাচলে জল সম করিব নিঃসাড়,
অন্তরের অনুকণা আছে যাহাকিছু—
বিন্দু হ'তে সিন্ধু আর সিন্ধু হ'তে মহাসিন্ধু
করিব উজাড় !
মৃত্যুসমাধির 'পরে বসিয়া গাঁথিব জয়মালা,—
আঁকিব রক্তের আঁকে
যাহাকিছু বাকি থাকে,
রে'খে যাব লাঞ্ছিতের জ্বালা !

বঙ্কিম-প্রশস্তি

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

এ বঙ্গ সাহিত্যাকাশে তুমি ত্বিষাম্পতি—
হে বঙ্কিম শুদ্ধসত্ত্ব ! বাঙ্গালীর লহ আজ নতি।
স্তুতির অতীত তুমি—নিন্দা তোমা পরশিতে নারে ;
ব্যর্থ ভাষা আমাদের রসনার দ্বারে—
সুকরুণ স্বরে—
আহত ক্রৌঞ্চের মত আছাড়িয়া মরে !
হে মহানুভব,
তব পূজা করি' মোরা বাড়ায়েছি মোদের গৌরব ;
এ লাঞ্ছিত—পদানত—হতভাগ্য দেশে—
তুমি এসে,
সমুন্নতশির—
ঘুচাইলে গ্লানিভার তমোম্লান দীর্ঘ শতাব্দীর।

তুমি ঋষি—স্রষ্টা তুমি—মন্ত্রদ্রষ্টা—কবিকুলপতি
বাঙ্গালীর লহ আজ নতি।
এ আত্মবিস্মৃত জাতি—তুমি তব রূঢ় জ্ঞানাঞ্জনশলাকায়
আঁখি তার ফুটাইলে হায় !
যে সঙ্গীত-গুঞ্জরণে জাগে প্রাণে অপূর্ব্ব শিহর,
বহে উষ্ণ রক্তধারা ধমনী ভিতর,
হে উদ্গাতা !
গাহিলে উদাত্ত কণ্ঠে সে অদ্ভুত মেঘমন্দ্র গাথা।

আবার উদিতে যদি এই বঙ্গদেশে,
বিস্ময়ে দেখিতে তুমি এসে—
কাব্যের কমলকুঞ্জে মধুপের নাহি গুঞ্জরণ—
হৃদয়-রঞ্জন।
মদোদ্ধত করিদল সেথায় করিছে বিচরণ—
দলিত মথিত করি' ফুল্লপদ্মবন।
সাহিত্য-মন্দির মাঝে সমাগত স্বৈরাচারী-দল,
তুলিছে উন্মত্ত কোলাহল ;
জয়ডঙ্কারবে—
ভারতী-আরতিছলে আত্মপূজা করিতেছে সবে।
তুমি এস হে বিরাট্,—এই ক্ষুদ্র ব্রততীর দেশে—
অভ্রচুম্বী বনস্পতিবেশে !
তোমারে ঘেরিয়া মোরা গা'ব আজ নিঃশঙ্ক নির্ভয়—
"জয় বঙ্গজননীর জয় !"

স্বামীজী

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী আজি দিকে দিকে রটে!
বাঙ্‌লার সেরা সন্তান সে যে, প্রকৃত শাক্ত বটে।
তাহার কম্বুকণ্ঠনিনাদে জাগিল সারাটা দেশ!
সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে শিখিয়াছে ঘুচাতে জাতির ক্লেশ।
গড়িয়া উঠিল সন্ন্যাসিদল, গ্রামে গ্রামে কত মঠ! ·
স্থাপিত হয়েছে গৃহে গৃহে আজি মা'র মঙ্গলঘট।

উড়িতেছে আজি ভারতে মহান্ ত্যাগের উত্তরীয়;
সেবা-সাধনার পুণ্যপ্রভায় তরুণেরা হল প্রিয়।
দুঃস্থ দুঃখীরে দানিয়া শান্তি, পতিতারে পথে আনি'—
নবীন ভারত করিয়া গঠন আজ তারা সম্মানী।
ভোগের জীবন করিতে শোধন নারীরে পূজিছে সবে;
পথে ঘাটে তাই নির্ভয়ে তারা চলিছে সগৌরবে।

কোথা আজি বীর বিবেকানন্দ? মরনি মরনি তুমি!
আসমুদ্র-হিমাচল তব স্মরিছে জন্মভূমি!
তক্ত-তাউস্ নাই বা থাকুক, তুমি সেরা মহারাজা!
তোমারি আদেশে লাখ লাখ যুবা সঁপে' দেয় প্রাণ তাজা।
যেথা রোগ-শোক, যেথা মহামারী, যেথায় বন্যা ডাকে,
সেথা ছুটে যায় বাঙ্‌লার ছেলে হাজারে হাজারে লাখে।

মানবে মানবে ঘুচায়েছ তুমি সব বাধা-ব্যবধান।
সেবা-সাধনায় ভেদ নাই আর হিন্দু মুসলমান!
সাম্য-সামের শোনায়েছ বাণী শুধু ধর্ম্মের বলে;
দর্পীরে তুমি টানিয়া নামালে সিংহাসনের তলে।
দুর্ব্বল দেহে বিজলী চালায়ে সবল করেছ আজ;
ঘুণে-ধরা জাতি সতেজ করেছ, তুমি হে বৈদ্যরাজ!

নরের মাঝারে আছে নারায়ণ, তুমিই বলেছ আগে।
তোমার মতন এত জোরে কেহ বলে নাই অনুরাগে।
মিন্‌মিনে সুর, প্যান্‌পেনে ভাষা, ঢোঁক্ গিলে' গিলে' বলা,
ঘৃণা করে' গেছ প্রাণ মন দিয়ে পতিতের ছলা-কলা।
সবল, সুস্থ, শোভন, সুশ্রী গড়িতে নূতন জাতি,
উন্মাদ সম উঠেছিলে ক্ষেপে', খেটেছ দিবস রাতি।

বাঙ্‌লার শের্ আশুতোষ সে যে তোমারি সৃষ্টি নব!
বাঙ্‌লার শূর দেশরঞ্জন—কত কথা আর কব?
ভারতে যা'-কিছু দেখি উজ্জ্বল সকলি যে তুমিময়!
তোমারি শৌর্য্য, তোমার বীর্য্য, সব তাতে ফুটে' রয়।
সম্ভোগী কবি প্রেমের দীক্ষা পেয়েছে তোমারি মাঝে!
অগ্নিবচন শুনিনু যেদিন, ফিরিলাম ঘৃণা-লাজে।

যুবা ভারতের আদর্শ তুমি, বাঙ্‌লার তুমি প্রাণ।
তোমার মাঝারে জমাট বেঁধেছে বাঙালীর সম্মান!
লহ তুমি মোর প্রাণের অর্ঘ্য, হৃদয়ের অঞ্জলি!
তোমার স্বপ্ন কার্য্যানুবাদে দেহ যেন যায় চলি'!
নমামি, স্বজাতি-মঙ্গলকামী, অবনত করি' শির!
, নমামি তোমায়, স্বদেশবন্ধু, নমামি বীর্য্যবীর!

বাঙালা সাহিত্যের নীরব পূজারী বসন্তরঞ্জন

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

কত তপস্যায় একটা জাতি বড় হয়। এই তপস্যা সবখানি আড়ম্বর নয়; বাহিরে যাহা দেখা যায়, তার একা প্রধান প্রয়োজনীয় অংশই থাকিয়া যায় গভীরে, গোপনে-মাটীর তলে অন্তর্নিহিত শক্ত ভিত্তিই যেমন গগনস্পর্শ উচ্চ অট্টালিকার ভার বহন করে। এই অলক্ষ্য সাধনা পরিচয় রাখে কয় জন? অধিকাংশ ঐতিহাসিকেরই স্থূল দৃষ্টি উপরের তরঙ্গচূড়া গণিয়াই ক্ষান্ত হয়, অন্তরালে নীরব তপস্যার যে নিগূঢ় শক্তি-সঞ্চয়, সেদিকে প্রায়শঃই দৃষ্টি পড়ে না। অথচ এই সকল গূঢ় শক্তি-কেন্দ্রই জাতীয় অভ্যুত্থানের আসল নিদান। তাঁরা শুধু দিয়া যান সেবা ও শ্রম, চাহেন না খ্যাতি, যশঃ, মান—নামের কাঙাল ইঁহারা নহেন, পরন্তু দেওয়ার তিল তিল নিঃশেষ পরিপূর্ণতাই ইঁহাদের চরিত্রের অনুপম সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য। বঙ্গ-সাহিত্য-জগতে বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়কে এমনি একজন নীরব বাণী-পূজারীরূপেই ভবিষ্য জাতির পক্ষ হইতে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি।

বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জনের নীরব সাহিত্য-সেবার পরিচয় যাঁহারা রাখিতেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে মহাকালের চির শান্তিক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতে চলিয়া গিয়াছেন বা যাইতেছেন। সে রামেন্দ্রসুন্দর নাই, সে ব্যোমকেশ নাই, সে সমাজপতি নাই, রায় যতীন্দ্রনাথ বা শাস্ত্রী হরপ্রসাদও আজ নাই। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-বাহাদুরের রাজবাটীতে যে একত্রিশটী সুসন্তান "বেঙ্গল একাডেমী অফ লিটারেচার"কে "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ" রূপে নবজন্ম দান করিয়া বাঙালীর নবজাগ্রত জাতীয় জীবনের মূলে অক্ষয় রস-সঞ্চারের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আজ জীবিত আছেন বোধ করি, শুধু বর্ষীয়ান হীরেন্দ্রনাথ আর এই প্রাচীন বসন্তরঞ্জন। ইঁহাদেরও জীবন-দীপ দমকা হাওয়ায় কে জানে কোন দিন নিভিয়া যাইবে—সেদিন তরুণ বাঙালীর চক্ষে এই যুগের স্মৃতি-সাক্ষ্য দিবার আর কেহই বর্ত্তমান থাকিবেন না। নাম, গ্রন্থ, তৈলচিত্রে কীর্ত্তিমানের কতক স্মৃতি-রক্ষা হয় বটে, কিন্তু যিনি লোকচক্ষু এড়াইয়া চিরদিন সেবার ক্ষেত্রেই আপনার পরিচয় সংগোপিত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সে সেবাজীবনের পরিচয়টুকুও জানার অভাবে উদীয়মান তরুণ জাতির কাছে একেবারে অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কা আমাদের মনে জাগিতেছে। সাহিত্য, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সমাজ, সর্ব্বত্র এই সকল নীরব কর্ম্মীর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতিও আমরা না ভুলি, তাহার আমরা কি ব্যবস্থা করিতে পারি?



শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

বসন্তরঞ্জন বাঁকুড়া জেলায় বেলিয়াতোড়া গ্রামের অধিবাসী। ১২৭২ খৃষ্টাব্দে মহাষ্টমীর পূর্ব্বাষ্টমী তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আজ তাঁহার বয়ঃক্রম ৭২

বৎসর। তাঁহার বয়স যখন ৪০ হয় নাই, তখনই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। পত্নীবিয়োগবিধুর এই দীর্ঘ জীবন তিনি তাঁহার চিরারাধ্য দেবী বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ পূজায় কাটাইয়াছেন—একটী দিন, একটী নিমেষের জন্যও তাঁহার এই বাণী-বন্দনা বন্ধ হয় নাই—এমন অখণ্ড, নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য-সেবার অনবদ্য দৃষ্টান্ত সত্যই অল্প মিলে। এই বসন্তরঞ্জনের জীবনেতিহাস পড়িতে জানিলে, অর্দ্ধ শতাব্দী-ব্যাপী বাঙালার সাহিত্যসাধনার ফল্গু-প্রবাহের সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার চিত্তপটে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আজ পর্য্যন্ত অসংখ্য সাহিত্যিকের পবিত্র স্মৃতি ওতঃপ্রোতঃ জড়াইয়া আছে। দিনান্তে দুই দণ্ড তাঁহার সহিত কথা কহিতে বসিয়া, একে একে কত কবি, কত মনীষীর জীবনের ঘটনা ও চরিত্র-কাহিনী কতদিন তাঁহার মুখে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, কত আলাপ, উক্তি, রহস্য-পরিহাসে মাখা অতীতের স্মৃতি-পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও উল্লসিত হইয়াছি, অর্দ্ধশতাব্দীর বাঙালার ও বাঙালীর স্মৃতি-সূত্র তিনি আজও বুকে বহন করিয়া বেড়াইতেছেন—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এ যোগ-সূত্র ছিন্ন হইবে—প্রবাহে ছেদ পড়িবে। কে আর এই স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার আলো জ্বালিয়া তরুণের সম্মুখে সাহিত্য রসানুভূতি ও ভাষা-জ্ঞানের রহস্যজাল উদ্ভিন্ন করিবেন—স্বীয় জীবনব্যাপী একনিষ্ঠার অগ্নিকণা হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া ভবিষ্যৎকে নানাচ্ছলে বাণীসেবায় উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিবেন? বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল, হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর, টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র (সরকার), অক্ষয়কুমার (মৈত্রেয়), ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি, সত্যশাস্ত্রী, কাব্যবিশারদ, রাখালচন্দ্র—ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সাহিত্য-পরিচয়ের পিছনে যে মানবতার পরিচয়—তাহা শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টির নিখুঁৎ কষ্টি-পাথরে কষিয়া দেখাইবার যে অপূর্ব্ব কৌশল এই বৃদ্ধের মধ্যে দেখিয়াছি, তাহা অন্য কুত্রাপি পাই নাই—যেন একখানি অখণ্ড মুকুরে এই সব সুপ্রসিদ্ধ মানুষ আর একবার জীবন্ত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত দোষগুণ, অহমিকা-মাধুর্য্য লইয়াই আবির্ভূত হন এবং তাঁহাদের সৃজন-প্রতিভা ও হৃদয়ের দান [illegible] কেমন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে ও বাঙালীর জীবনে চিরস্থায়ী প্রভাব অঙ্কিত করিয়া গেলেন, তাহা সব স্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত হয়। অতীত-দর্শনের এমন সহজ সুযোগ আর কোথাও আমরা পাইব বলিয়া মনে হয় না।

বৃদ্ধ বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে পৌত্রস্থানীয় স্নেহের দাবী লইয়াই আমরা ঠাট্টা করিয়া "পুঁথির কীট" বলিয়া কখনও কখনও রহস্য করিয়া থাকি। সত্যই তিনি ৮০০-শতেরও অধিক প্রাচীন পুঁথি জীবনে সংগ্রহ করিয়াছেন ও তাহা সমস্তই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে উৎসর্গ করিয়াছেন—সেই পুঁথিগুলির মর্ম্মোদ্ঘাটনেই তাঁহার জীবনের মহামূল্য সময় অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়াছে। এই পুঁথির সমুদ্রে অবগাহন করিয়াই তিনি অপরূপ রত্ন "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" উদ্ধার করিয়াছেন—বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় সাহিত্যৈতিহাসিক গবেষণায় ইহা এক নবীন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। আজও তাঁহার জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যে বাঙালার ভাষাতত্ত্ব ও বৈষ্ণবতত্ত্বের মর্ম্মোদ্ধারে তাঁহার তপোলব্ধ অবদান প্রকাশ ও প্রচার করিবার শ্রম ও আকুতি অনুভব করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। তিনি এই বাণীবন্দনায় একপ্রকার উন্মাদ, সর্ব্বত্যাগী বলিলেও সত্যই অত্যুক্তি হয় না।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত ভুবনমোহন চতুষ্পাঠী—নামান্তর গদাধর মঠের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সীতারাম শিরোমণি মহাশয় তরুণ বয়সেই বসন্তরঞ্জনের বঙ্গসাহিত্যে অনুরাগ-নিষ্ঠা ও হিন্দু ভাব ও সাধনায় অপরিসীম শ্রদ্ধা দেখিয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছায় "বিদ্বদ্বল্লভ" উপাধি দিয়াছিলেন, এই কথা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি। মহামহোপাধ্যায়ের এই উপাধি বসন্তরঞ্জনের জীবনে সার্থক হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের উপদেশে ও সহযোগিতায় আমরা গত ১৩৪২ সালে "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অক্ষয়া তৃতীয়া মেলায়" "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্ত্তন" নামে একটী বিভাগে প্রাচীন-কাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নিদর্শন সহ বঙ্গলিপি ও ভাষা এবং বঙ্গসাহিত্যের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। উক্ত বিভাগটির রচনাকালে আমরা বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের এই প্রাচীন বয়সেও যে স্মৃতি, শ্রম ও

সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে; এবং এই বিভাগটী শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যে ধুরন্ধর মনীষিবর্গের সহিত সর্ব্বসাধারণেরও কতখানি মনোরঞ্জন ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ মেলার ইতিহাসে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। ইহাও তাঁহার নীরব সেবা ও অনামা অবদানের আর একটা প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

বসন্তরঞ্জন চিরদিন নির্ভীক, তেজস্বী, স্পষ্টবক্তা মানুষ। এই মৌন, সৌম্য, ধীর মানুষটীর মধ্যে কতখানি দৃপ্ত তেজ: ও স্বাধীনচিত্ততার আগুন লুকাইয়া আছে, তাহার পরিচয় পুরুষশার্দ্দূল স্যার আশুতোষ পাইয়াছিলেন ও সেইজন্যই তিনি তাঁহাকে চিরদিন শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাকেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালা সাহিত্যের অধ্যাপকের আসনে যোগ্য বোধে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এই পদে দীর্ঘদিন থাকিয়া তিনি অসংখ্য ছাত্র ও ছাত্রীকে সাহিত্য-সাধনায় শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের ন্যায় আদিরসবহুল কাব্যানুশীলনে তাঁহারা অপরূপ অধ্যাপনা-নৈপুণ্য ও অগ্নির ন্যায় ভাবশুদ্ধির সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। তরুণ-তরুণী সহাধ্যয়নে তাঁহার ন্যায় সাহিত্যগুরুর চরণতলে পবিত্র অগ্নিমন্ত্রেই দীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য বোধ করিয়াছেন ও তাঁহার চরিত্রের পুণ্য দীপ্তি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেন। এই খাঁটি বাঙালী সাহিত্যিক বাঙালার অষ্টাদশ শতাব্দীর পর উনবিংশ শতাব্দীর যে সাহিত্যিক বিবর্ত্তন, তাহার মধ্যে বৈদেশিক ভাবের যে অনুপ্রবেশ ও ছায়াপাত তাহা ঠিক অন্তরের সঙ্গে বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন—এই বৈদেশিক ভাবের আমদানী হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও মুক্ত হইতে পারেন নাই—কবি রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নাই। বঙ্কিমের নিরপেক্ষ সমালোচক পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় বহু পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই যুগের চরম পরিণতি শরৎচন্দ্রে। শরৎচন্দ্রের পর আরও ঘোরতর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বসন্তবাবু আশঙ্কার সহিত বলেন—"এর পর কি আসছে ঠিক কি!" তিনি বলেন—জাতির ভাব ও সাহিত্যে বড় পরিবর্ত্তন আনে ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রগত কারণ। অদূর ভবিষ্যতে ধর্ম্মগত কারণের চেয়ে রাষ্ট্রীয় কারণেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে যুগান্তরকারী ওলটপালটের সম্ভাবনা তিনি পরিলক্ষ্য করিতেছেন। শরৎ-সাহিত্যের আর যাহাই দোষগুণ থাক, শরৎবাবুর ভাষা স্বচ্ছ, অনবদ্য। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনে হইতেছে—অতঃপর বাঙালী রাষ্ট্রীয় বিবর্ত্তনের প্রভাবে, যে কর্ম্মময় পরিস্থিতি ও আব্‌হাওয়া লাভ করিবে, তাহাতে তাহার ভাষা আদর্শ-ভাষারূপেই পরিণত হইবে। এই আদর্শ-ভাষার লক্ষণ—তাঁহার মতে—উহা স্বল্পাক্ষর, ভাবঘন, কাব্যরসে সমৃদ্ধ ও সঙ্গে সঙ্গে দর্শনে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে অবাধিত-প্রত্যয় হইবে। স্বল্পাক্ষর অর্থে উহা কাটা-ছাঁটা হইবে, ফেনাইয়া ফোটাইয়া, অলঙ্কার উপমার অনাবশ্যক বাহুল্যে মণ্ডিত হইবে না—মানুষের কাজ বেশী হইলে, কথার বাহুল্য কমিয়া যাইবে, ইহা স্বাভাবিক। আগামী ইউরোপের যুদ্ধ ও ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন—এই ভাষাবিপ্লবের অন্যতম কারণ হইবে।

বসন্তবাবুর মতে, এই অবস্থায় বঙ্গলিপির পরিবর্ত্তনের যে প্রয়াস, তাহাতে বাঙালীর সায় দেওয়া উচিত নহে। বাঙালা ভাষার ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী হিন্দীর চেয়ে কম নহে। বাঙালা হইতে পঞ্জাব—সমগ্র উত্তর ভারত বাঙালা বুঝিবে। বাঙালীকে আজ সকলেই গলা টিপিয়া দাবিয়া রাখিতে চায়। আমাদিগকে বাঙালা ভাষা ও বাঙালা লিপির উপরই জোর দিতে হইবে। জাতির ভাবের সহিত অক্ষর-লিপি সংজড়িত। অক্ষর অবান্তর বস্তু নহে, অক্ষর লোপে ভাব-লোপও অবশ্যম্ভাবী। তাহা ছাড়া, বাঙালা অক্ষর আজ যদি রোমান অক্ষরে পরিণত হয়, বাঙালার সপ্তদশ-শতাব্দী-ব্যাপী সমস্ত প্রাচীন পুঁথি পড়িবার আর লোক পাওয়া যাইবে না।

বসন্তরঞ্জনের বড় আশা—একদল তরুণ সাহিত্যপ্রেমিক শীঘ্রই দেখা দিবেন—রামেন্দ্রসুন্দরেরই মত Nationalists of the first water—যাঁহারা মারাঠী, গুজরাটী, উড়িয়া, অসমীয়া এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য হিন্দী, (মাগধী ও শৌরসেনী) সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলি সেঁচিয়া, নব নব [illegible]পযোগী শব্দচয়নে বাঙালাকে

শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ ও সর্ব্বভাব-বহনের উপযুক্ত করিয়া তুলিবেন। ইঁহারা চারণের মত এই ভাষাই প্রবন্ধে, গল্পে, বক্তৃতায় প্রয়োগ ও প্রচার করিবেন—ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে সম্মেলন আহ্বান করিবেন। বাঙালাকেই নব-ভারতের ভাষা-রাণী রূপে দেখিতে বসন্তরঞ্জনের একান্ত আকূতি।

বসন্তরঞ্জনের জীবনের আর একটা দিক্ তাঁহার পরিচিতের মধ্যেও অল্প লোকেই বিদিত—ইহা তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনার দিক্। বসন্তবাবু সাহিত্য-সমাজেই সুপরিচিত—তাঁহার ধর্ম্মসাধনা গোপন, নিগূঢ় তাঁহার অন্তর-সম্পদ্। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বামী প্রেমানন্দের নিকটাত্মীয় ও শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত দীক্ষিত সাধক-শিষ্য। ঠাকুরের ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ সকল অন্তরঙ্গ সন্তানের সহিত তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁদের প্রীতি-সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া ভক্তি-বিশ্বাসের অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীমাতা সারদেশ্বরীর মধ্যে তিনি ঠাকুরকেই জ্বলন্তভাবে অধিষ্ঠিত দেখিয়া আত্মনিবেদন করেন এবং এই আত্মসমর্পণের জ্বলন্ত নির্ভরতাই তাঁহাকে চিরদিন দৃপ্ত তেজঃ ও উজ্জ্বল পুণ্যশিখায় মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।

নবজন্মের সাধনা

ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিপ্লবী আমরা—কণ্ঠে আমাদের জীবনের দাবী। লক্ষ্য আমাদের শূন্য নয়, তথাকথিত লয় নয়, নির্ব্বাণ নয়—সিদ্ধ জীবন। জীবন দিয়াই অমৃত আহৃত হইবে। শুধু স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় নহে—জাগ্রত চৈতন্য লইয়া এই জীবন। জীবন থাকিলে, সব প্রতিষ্ঠা পাইবে। ধর্ম্ম চাই জীবনেরই প্রয়োজনে। আচার ও সংযম ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যে আচারী, যে সংযমী, সে ইন্দ্রিয়জয়ী, ধর্ম্মপরায়ণ। এই আচার ও সংযম সাধনার মধ্য দিয়া জীবনের যে পরিচয়, তাহাই ভবিষ্য যুগের দিব্য জীবন এবং ইহার ভিতর দিয়াই জাতির নবজন্ম।

উদয়-গিরি

বাঙালার অতি-আধুনিক সাহিত্য ও তাহার রূপ

শ্রীসুখেন বসু

অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মুস্কিল হয় ইহার সংজ্ঞা লইয়া। কাহাকে অতি-আধুনিক সাহিত্য বলিব? সাহিত্য আধুনিক, অতি-আধুনিক প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হইতে পারে কি না? সাহিত্য বাংলা হইতে পারে, ইংরাজি হইতে পারে, সংস্কৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহা আধুনিক আখ্যা পাইতে পারে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমরা আধুনিক প্রেম বলিতে কি কোন নূতন প্রেমের সন্ধান পাই? প্রেম অনাদি ও চিরন্তন। তেমনি সাহিত্যেও আধুনিক বা অতি-আধুনিক নামে কোন কিছু বিশিষ্ট সাহিত্য বোধ হয় পাই না। কোন সাহিত্যের উন্মেষ-অবস্থাকে শৈশব বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, কিন্তু কোন অবস্থাকে বার্দ্ধক্য বা যৌবন বলিতে পাবি কি? অনন্ত কালের কোন শতাব্দীকে আমরা মধ্যযুগ বলিব? কাহাকেই বা আধুনিক বলিব? যদি বা প্রতি যুগের মানুষ তাহাদের যুগকে আধুনিক বলে, সাহিত্যেও কি সেই কথা খাটিবে? যাহা অনুভূতির, তাহা প্রাচীন বা আধুনিক হয় না।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়—অতি-আধুনিক সাহিত্য বলিয়া কোন এক বস্তু বঙ্গসাহিত্যের বুকে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলেও সে-বস্তুটা ঠিক কি তাহা নির্দ্ধারণ করা বিশেষ সহজ নয়। কাহারও মতে, বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডারে যাহা কিছু জমা হইয়াছে, সবই অতি-আধুনিক ব্যাজ আঁটা। কেহ বলেন—নবীন সাহিত্যিকবৃন্দ যাহা লিখিতেছেন, তাহাই অতি-আধুনিক সাহিত্য; আবার কেহ কেহ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে বঙ্গ-সাহিত্যের ছাঁদের (style) নিয়ন্ত্রণ ও অশ্লীল রচনাকে অতি-আধুনিক সাহিত্য নামে অভিহিত করিতেছেন। ইহাতে বুঝা যায়, অতি-আধুনিক সাহিত্য বলিতে কোন নির্দ্দিষ্ট সাহিত্যকে আমরা বুঝি না, নিজ বুদ্ধিবৃত্তির অনুযায়ী যাহা একটা কিছু বুঝিয়া লই।

আরও এক কথা, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যাহাকে আধুনিক সাহিত্য বলিয়াছেন, তাহা হইতে অতি-আধুনিক সাহিত্যের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা সম্ভব কি না? ঠিক কোন সময় হইতে তথা-কথিত আধুনিক সাহিত্য অতি-আধুনিকে পরিণত হইল, একথা সুনির্দ্দিষ্ট করা বোধ করি অসম্ভব।

যাহা হউক, প্রগতি-যুগের সাহিত্যকে (বস্তুতঃ তাহা ছাড়া উপায়ও নাই) অতি-আধুনিক সাহিত্য বলিয়া আমরা ধরিয়া লইলাম। প্রগতি-যুগের এই সাহিত্য হইতে আমরা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান সাহিত্যিকদিগকে বাদ দিলাম; কারণ তাঁহারা উপরি উক্ত আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে পড়িয়াছেন, অতি-আধুনিকদের মধ্যে নয়। আমরা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নবীন লেখকদের এ-যুগে লেখা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ বিচার করিব—প্রবীণ লেখকদের এ-যুগে লেখা সাহিত্যের নয়।

এ বিচার করিবার পূর্ব্বে গোড়ার একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সাহিত্য ও রচনা এক কথা নহে। যে-লেখা চিরন্তনী, মানব-সমাজে চিরকাল রাখিবার মত করিয়া লেখা, তাহাই সাহিত্য। যে-রচনা কেবলমাত্র ক্ষণকালের জন্য, তাহা সাময়িক। বর্ত্তমান কালের সমস্ত লেখাকেই আমরা সাহিত্য বলিয়া ভুল না করি, মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রের অদ্ভুত কবিতা (?), নোংরা গল্প, অর্থহীন প্রবন্ধ, রসহীন অশ্লীল উপন্যাস প্রভৃতিকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দিয়া যেন মারাত্মক ভুল না করি। তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যই নয়। অতি-আধুনিক সাহিত্য বলিতে তাহাই বুঝিব, যাহা বর্ত্তমান যুগে প্রতিভাবান্ লেখকেরা কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, [illegible] প্রভৃতির মধ্য দিয়া নিজেদের

বঙ্গ-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চান, যাহা চিন্তাশীল লেখকেরা সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদরূপে দিয়া যাইতে চান।

অতি-আধুনিক সাহিত্য জগতের আধুনিক যুগের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আধুনিক সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান (Psycho-analysis) একটি বিশিষ্ট গুণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সাহিত্যে প্রগতির এই তরঙ্গ জগতের সকল সাহিত্যেই আলোড়ন তুলিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনায় মনোবিজ্ঞানের নিখুঁত বিশ্লেষণ আমরা সর্ব্বপ্রথম পাই। অতি-আধুনিক রচয়িতারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, সুতরাং তাঁহাদের রচনায় বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান যে কিছু বেশী পরিমাণে থাকিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

বিস্মিত হইবার কারণ না থাকিলেও, ক্ষুব্ধ হইবার কারণ আছে। প্রথমতঃ, আধুনিক কালের পাশ্চাত্য সাহিত্যের ন্যায় ইহা অতি-বাস্তবতা-দোষে দুষ্ট। ইহার মধ্যে হাঁফ ছাড়িবার উপায় নাই। সামান্য ঘটনাকে মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে দোহাই দিয়া এমন মারাত্মক টানা-হেঁচড়া চলিতে থাকে যে, রস মরিয়া গিয়া তাহা ছোবড়ায় পরিণত হয়। অবশ্য, একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কোন স্থলে এ বিশ্লেষণ অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া মনে হয়, মনস্তত্ত্বের নিখুঁত সমালোচনা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলে। বুদ্ধদেববাবুর কয়েকখানি উপন্যাসে এই ধরণের বিশ্লেষণ অত্যন্ত মনোরম। কিন্তু অতি-আধুনিক যুগের উপন্যাসেই মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের নামে লেখক যে-কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা আর যাহাই হউক বিশ্লেষণ নয়—ছোবড়া লইয়া খানিক টানাটানি ও নিরীহ পাঠকদিগের উপর অত্যাচার।

এ-যুগে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের উপবীত আঁটিয়া আর একটি জিনিষ বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে—তাহা নগ্নতা বা অশ্লীলতা। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ বঙ্গ-সাহিত্যে সর্ব্বনাশ আনয়ন করিতেছে। উপন্যাসে, নাটকে নায়ক-নায়িকার মনোবিজ্ঞান-বিশ্লেষণের নাম দিয়া যে নগ্নতা ও অশ্লীলতার বান ডাকা হয়, তাহা অত্যন্ত বীভৎস। অশ্লীল যৌনবাদই সাধারণতঃ এ যুগে সাহিত্যের বিশেষ অঙ্গ। ভাষা ও সাহিত্য-জাতীয় জীবন গঠনে সর্ব্বাপেক্ষা বোধ হয় বেশী প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকরী এবং ইহার প্রভাব জাতীয় জীবনে অসীম। বঙ্গের জাতীয় জীবনের ও সাহিত্যের এই শুভ অরুণোদয়-কাল যদি কলুষিত হইতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের অত্যন্ত ভাগ্যহীন বলিতে হইবে। মানব-মনের নিপুণ ও নিখুঁত আলোচনা, তাহার গহন আঁধারে আলোকপাত বিশেষ হৃদয়হারী; কিন্তু তাই বলিয়া প্রগতিসম্পন্ন নায়ক-নায়িকার মনের সমস্ত কালী টানিয়া বাহির করিয়া উপন্যাসের প্রতি ছত্র মসীলিপ্ত করিবার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইহাতে আর যাহাই হউক, সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না।

মনে একটা প্রশ্ন স্বতঃ উঠে, মনস্তত্ত্বের এই যে বিশ্লেষণ, ইহা কি কেবলমাত্র নায়ক-নায়িকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে? আধুনিক যুগের উপযোগী যুবক যুবতী ছাড়া অন্য চরিত্রের মন বলিয়া কি কোন বালাই নাই? তাহাদের মনের ঘাত-প্রতিঘাত, তাহাদের মানসিক দ্বন্দ্বের ছবি কে আঁকিবে? বৃদ্ধ, মাতা, শিশু প্রভৃতির হৃদয় হইতে কি সাহিত্যের উপযোগী কোন উপাদানই পাওয়া যায় না? প্রকৃতপক্ষে আদিরস ব্যতীত অন্য কোন রসই তেমন আদৃত হইতেছে না। এই অতিরিক্ত যৌনবাদ সাহিত্যে ধীরে ধীরে আসন লাভ করিতেছে। সত্য, শিব ও সুন্দর সাহিত্যে যৌনবাদের এই বীভৎস লীলাখেলায় শিহরিয়া উঠিতে হয়। আশঙ্কা হয়, এমনি চলিতে থাকিলে, অদূর ভবিষ্যতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যের কবিগানের ন্যায় সাহিত্য মুখ-খারাপে পরিণত হইবে, নোংরা জিনিষ আর কত কাল রঙীন কাগজে ঢাকা থাকিবে?

এ-আশঙ্কার কথা নবীন লেখকদের কেহ কেহ না বুঝিয়াছেন, এমন নহে। বুঝাইয়াছেন বলিয়াই, কোন কোন লেখক তাঁহাদের প্রতিভা লইয়া অন্যান্য মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এবং সে রাজ্যের সুষমা চয়ন করিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিতেছেন।

সামান্য মানুষ, দরিদ্র কৃষক-পরিবার প্রভৃতি লইয়া আধুনিক যুগের কোন কোন লেখক সাহিত্য গড়িয়া তুলিতেছেন। গল্প-উপন্যাস অসাধারণ বীর ও অপূর্ব্ব সুন্দরী হইতে যে ধরার ধূলির মধ্যে তাহার উপাদান সংগ্রহ করিতেছে, ইহা সত্যই বড় আনন্দের কথা। যাহা সাধারণ, তাহাই সুন্দর। অতি সাধারণ একজন পল্লীগ্রামের শিশু—কিন্তু তাহার মনস্তত্ত্বের, তাহার ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি সৎসাহিত্যের কি অপূর্ব্ব উপাদান হইতে পারে, তাহা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা দেশকে দেখাইয়াছেন। নারকীয় রচনার প্রতিঘাতে বঙ্গসাহিত্য যদি স্বর্গীয় মাধুর্য্যে ভূষিত হইতে থাকে, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয়। কেবলমাত্র উপন্যাসক্ষেত্রেই নহে, অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা লইয়া গল্প লিখিবার রীতিও নবীন সাহিত্যে প্রবেশ করিতেছে। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মাঝে অতি তুচ্ছ ঘটনা লইয়া অনবদ্য রচনা মানব-মনকে সত্যই বড় তৃপ্তি দান করে। পাঠক সে-গল্পের, সে-উপন্যাসের মধ্যে নিজের অন্তরের সাড়া পায়। অতি তুচ্ছ উপাদান লইয়া অতি উচ্চ সাহিত্য গড়া এ-যুগের লোকেদের এক গৌরবান্বিত কীর্ত্তি। আজ এইরূপ একজন প্রতিভাবান্ ভগীরথেরই প্রয়োজন, যিনি সৎসাহিত্য-সুরধুনী আনিয়া বঙ্গসাহিত্য কলঙ্কমুক্ত করিবেন, অশুচিতা দূর করিয়া সাহিত্যে 'সত্য, শিব, সুন্দরম্'-এর প্রতিষ্ঠা করিবেন।

এই অশ্লীল নগ্নতার জন্য আমাদের পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুচিকীর্ষা অনেক পরিমাণে দায়ী। পাশ্চাত্যের বহু ক্ষেত্রেই একটি সূক্ষ্ম আবরণের পশ্চাতে যৌনবাদিতার চরম লীলাখেলা চলে। তাহার অনুকরণে আমরা কেবলমাত্র জাতীয় জীবন নয়, সাহিত্যকে অবধি কলুষিত করিয়া তুলিতেছি। অশ্লীলতা ছাড়াও ভাষা, রচনাপ্রণালী, বিষয় প্রভৃতি নিতান্ত পরকীয় হইয়া উঠিতেছে। উপন্যাস সাহিত্যে এ হীন পরকীয়তা চরমে পৌছিয়াছে। কোন কোন লেখা পড়িলে মনে সন্দেহ জাগে—লেখক বাঙ্গালী ত!

এই সমস্ত পাশ্চাত্যপ্রভাবযুক্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিদেশীভাবাপন্ন। তাহার চিন্তা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সবই অসাধারণ। চলিত বাংলায় যাহাকে জগা-র্ণি বলে, এই সকল চরিত্র তাহাই। এ-জাতীয় লেখায় আমরা না-পাই আনন্দ, না-পাই চিন্তার খোরাক। আমরা বাঙ্গালী, বাংলাদেশে যাহা স্বাভাবিক, বাংলার আলো-বাতাস যে আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করে, সে আব্‌হাওয়ায় যে প্রাণের সাড়া পাইব, তাহা বৈদেশিক চরিত্রে পাওয়া সম্ভব নয়। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের অনুলিপি আমরা সারা অন্তর দিয়া কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? রচনাচাতুর্য্যে কখন কখন মন উদ্ভ্রান্ত হয় বটে, কিন্তু মুগ্ধ হয় না। যে-সাহিত্য মনকে উদ্ভ্রান্ত করে না, মুগ্ধ করে, তাহাই সৎসাহিত্য। বিভূতিবাবু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিভাবান্ লেখকদের নিকট হইতে আমরা যে জীবন্ত প্রাণময় সাহিত্য পাই, তাহা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে।

আবার কখনও কখনও অবাক্ বিস্ময়ে দেখি—উপন্যাস বৈদেশিকও নয়, স্বদেশীও নয়—সে এক বিচিত্র। সে সমস্ত অদ্ভুত উপন্যাসের না আছে আরম্ভ, না আছে পরিণতি। চলিতে চলিতে হঠাৎ গ্রন্থ শেষ হইয়া গেল। এ উপন্যাসের বিষয়-বস্তু বলিয়া কিছু নাই। সামান্য যাহা হউক একটা ঘটনা দাঁড় করাইয়া, মনোবিজ্ঞান-বিশ্লেষণের নজীর দিয়া লেখক চারশতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এক উপন্যাস লিখিলেন। এই ভয়াবহ নূতনত্ববাদ (novelty) উপন্যাস-সাহিত্যে একটি বিশেষ গলদ। 'নতুন-কিছু-কর' মন্ত্র যে সাহিত্যক্ষেত্রে এতখানি বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে, তাহা জানিলে, বোধ হয় হাসির কবি দ্বিজেন্দ্রলালও হাসি থামাইয়া এ গান লিখিতে বিরত থাকিতেন। এমন কথা বলি না, নূতন একটা কিছু করিবার স্পৃহা সকল সময়েই হানিকর হইয়াছে। সাধারণ জিনিষ লইয়া গল্প লিখিবার নূতনত্ব, মানবমনের নিপুণ অনুশীলন ইত্যাদি নবীন সাহিত্যকে গৌরবের অধিকারী করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু কোন কোন অর্ব্বাচীন লেখক নূতনত্বের দোহাই দিয়া যে সকল অদ্ভুত কাণ্ড করিতেছেন, তাহা এ যুগের সাহিত্য-গৌরবের বিশেষ হানিকর।

এই ভয়াবহ নূতনত্বের অন্তরালে আর এক জাতীয় উপন্যাস রচিত হইতেছে, তাহাকে প্রচারধর্ম্মী উপন্যাস

বলা যাইতে পারে। সমাজ, রাজনীতি বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বিশিষ্ট মত সাহিত্যিক তাঁহার উপন্যাসে প্রচার করিতে চাহেন। কোন কোন স্থলে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ সাহিত্যিকের সাহিত্য-রূপের প্রতি দৃষ্টির অভাব প্রতি ছত্রেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

এই নূতনত্বের ধ্বজা উড়াইয়া, ভাষার উপর যে অশুভ যথেচ্ছাচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। ইংরাজী বাক্যের রচনাপ্রণালী বাংলা বাক্যের রচনাপ্রণালী হইতে ভিন্ন। এই নূতনত্ববাদীর দল বাংলা রচনা-প্রণালীকে ইংরাজী ছাঁচে ঢালিতে চান। বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্যকে হারাইয়া তাহাকে কোটপেণ্টলুন পরাইলে, ভাষার কি মহৎ উপকার সাধিত হইবে, তাহা ত আমরা বুঝি না। এ কালের প্রতিভাবান্ লেখকদের লেখাতেও এ দোষ বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে। ইংরাজী বাক্যের প্রতি কথার বাংলা প্রতিশব্দ পর পর বসাইলে যে বিচিত্র বাংলা বাক্য হইবে (বা হইবে না), সেই বিচিত্রতা বা পাগলামী ভাষা-সাহিত্যে প্রবেশ করিতেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়! এমনি উন্মত্ত অনুকরণ ও আত্মঘাতী নূতনত্ব বাংলা সাহিত্যকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতেও ক্ষতি নাই। কোন কোন ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনায় অবোধ্য আরবী ও পারসী শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করিতেছেন। বাংলাভাষায় বহু আরবী, পারসী, ইংরাজী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের প্রবেশলাভ এমনি ধীরে ধীরে ও স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে সম্পন্ন হইয়াছে যে, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন চেতনাই জাগে নাই, অর্থ না বুঝিবার বা স্বদেশীয় নহে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণই ঘটে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া জোর করিয়া যে-কোন উদ্দেশ্যেই পারসী ও আরবী শব্দ ভাষাকে গলাধঃকরণ করাইতে চাহিলে, উদরাময় হইবার সম্ভাবনা—তাহা ক্লিষ্টই করিবে, পুষ্ট করিবে না। সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, এ-সমস্ত বিষম ভ্রান্তি আজ অনেক প্রগতিবাদীর নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাই অতি প্রাঞ্জল স্বকীয় বাংলা ভাষায় সাহিত্য-রচনা আরম্ভ হইয়াছে।

তবু স্বস্তি নাই। বৈদেশিক রাহু হইতে মুক্ত হইলেও, ভাষার উপর অত্যাচার ঘুচে নাই। এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথিগণ চলিত ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী করিয়া ভাষার মর্য্যাদা দিয়াছেন। আধুনিক কালের বহু প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনায় চলিত ভাষাকে বাহন করিয়াছেন। ইহাতে কতকাংশে আমরা লাভবান্ না হইয়াছি, এমন নহে। চলিত কথায় সব কিছুই প্রকাশ করার একটু সুবিধা হয়। সন্ধি-সমাসের বেড়াজালে না পড়িয়া হাল্কা ও সহজ ভাষায় লেখক তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে কম বেগ পান। শুধু তাহাই নহে, সাধারণের পক্ষেও ইহা সহজবোধগম্য। সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রবর্ত্তনকালে এক অপূর্ব্ব রচনাপ্রণালী গড়িয়া উঠিতেছে। অতি ছোট ছোট কথায় অনবদ্য শ্রী ফুটাইয়া তোলা অতি-আধুনিক-সাহিত্যের সম্পূর্ণ নিজস্ব। সামান্য দু'এক কথায় লেখক যে অনিন্দ্যসুন্দর ছবি আঁকেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন বড় শিল্পী না বলিয়া উপায় থাকে না, তাঁহার প্রতিভার আদর করিতেই হয়। কিন্তু এ-সকল আশা-আনন্দের মধ্যেও একটা বড় রকমের চিন্তার বিষয় আছে। সাহিত্যে এই যে চলিত ভাষা চালাইবার প্রচেষ্টা, ইহা যদি বাংলার সকল স্থান হইতে চলিতে থাকে, তাহা হইলে সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? আজ যদি চট্টগ্রামবাসী বা বরিশালবাসী কোন লেখক তদ্দেশীয় চলিতভাষায় সাহিত্য গড়িতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য শতধা বিভক্ত হইবে না? সুতরাং কথ্যভাষায় সাহিত্যরচনার যত গুণই থাকুক্, ইহাতে তার উপর অত্যাচারের সম্ভাবনাও আছে।

কথ্যভাষায় রচনা ভাষার আর এক বিপদ্ ডাকিয়া আনিয়াছে। বাংলা লেখায় ইংরাজী ঢুকাইবার অর্থহীন মূঢ়তা। কথোপকথনে ইংরাজী ঢুকাইবার প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণ লেখায় পদে পদে ইংরাজী ব্যবহার করিবার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন স্থলে দেখি—সম্পূর্ণ বাক্যটাই

ইংরাজী। সেইজন্ত অনেক নবীন লেখক কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী বলিয়া মানিয়া লন নাই, এবং বোধ করি, সেই কারণেই তাঁহারা ইংরাজী 'বুকনি' ব্যবহার করিবার দোষ হইতে মুক্ত।

যে-সকল সাহিত্যিক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করার দোষে দোষী, তাঁহাদের উপন্যাসে আর এক জাতীয় ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা অতি-পাণ্ডিত্য। যিনি প্রকৃত সাহিত্যিক, তিনি এমন রচনা করিবেন, যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সাধারণ লোক সকলেই উপভোগ করিতে পারেন। বর্ত্তমান কালের রচনা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্পূর্ণ অবোধ্য। সাহিত্য গভীর ভাবে, সুন্দর কবিকল্পনায় সমৃদ্ধ হইবে, ইহা ভাল কথা; কিন্তু তাহা গুটিকতক অসাধারণে ব্যতীত আর কেহ না বুঝিতে পারিলে, তাহার সার্থকতা কোথায়? 'মিস্‌টিসিজম্‌' এ যুগ-সাহিত্যের প্রধান ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'মিস্‌টিসিজ্‌মের' ধোঁয়ায় বাংলা সাহিত্য অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। বিশেষ প্রতিভাবান্‌ লেখকের অনেক কথা কষ্টবোধ্য হইতে পারে, অনেকাংশে তাঁহার লেখা মিষ্টিক হইয়া উঠে, কিন্তু সকল লেখকই যদি ধোঁয়াটে রচনা আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সে বড় কম বিপদের কথা নয়!

দোষে-গুণে মিশ্রিত অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যত দোষ, যত ত্রুটি-বিচ্যুতিই থাকুক, ইহা যে পূর্ণতার দিকে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কি উপন্যাস-ক্ষেত্রে, কি প্রবন্ধ-রচনায়, কি কাব্যচর্চ্চায় প্রতিভাবান্‌ লেখকের আবির্ভাব হইতেছে; শিশু-সাহিত্য, বিজ্ঞানালোচনা, শারীরিক উন্নতির গ্রন্থ, হাস্যকৌতুক, রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনা প্রভৃতি সকল দিকে অতি-আধুনিক সাহিত্যের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে।

হইলেও, অনেক তথাকথিত বিজ্ঞ ব্যক্তির দল এ সাহিত্যকে ভালবাসিতে পারিতেছেন না। অতি-আধুনিক সাহিত্য আমাদের কাছে এত নিকট, এত সুস্পষ্ট যে, ইহার তলদেশ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি, এবং ভুলিয়া যাইতেছি যে, তলদেশে কিঞ্চিৎ ময়লা জমা খুবই স্বাভাবিক। অধিকাংশ ছবি একটু দূর হইতে দেখিতে ভাল লাগে। কাছে আনিলে, তাহার অনেক গলদ বাহির হইয়া পড়ে। তেমনই সাহিত্য একেবারে নাকের কাছে লইয়া গিয়া দেখিলে, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাওয়া বিচিত্র নয়। ঠিক এই কারণেই, অথবা যাঁহাদের নীতিজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, তাঁহারা এ সাহিত্যের উপর খড়্গহস্ত। সাহিত্যে অশ্লীলতার বাষ্প কিয়ৎপরিমাণে ধূমায়িত না হইয়াছে, একথা বলি না; কিন্তু ইহাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নীতিকথা ও সাহিত্যরচনা এক বস্তু নয়। নীতিকথা অত্যন্ত উপাদেয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু আর যাহাই হউক, উহাতে সাহিত্য হয় না। হিতোপদেশ বা কথামালায় আমরা নীতিশিক্ষা বহু পাই, সত্য; কিন্তু তাহাতে পাঠকের সাহিত্যতৃষ্ণা কতটুকু মেটে? অতি সাধারণ জিনিষ, বাস্তবে যাহা সর্ব্বদা ঘটিতেছে বা ঘটা সম্ভব, তাহাই সুন্দর করিয়া বলা, পাঠকের চিত্তে সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই সাহিত্যের বড় কাজ—নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া নয়।

আরও এক কথা। বর্ত্তমানকালের মানবমন সংস্কার অপেক্ষা যুক্তির, নীতির নামে হীনচিত্ততা অপেক্ষা সত্যের প্রতি বেশী অনুরাগী। ধর্ম্ম ও সমাজের ধুয়া দিয়া অসহায়-অসহায়া এত কাল নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছে; সুতরাং এ-যুগের কিয়ৎপরিমাণে উদার লেখনী সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, তথাকথিত নীতিবাগীশ দলের তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

যাহাই হউক, অতি-আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের গোমুখী-রচনার কেবলমাত্র উপন্যাসক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনা এইবার শেষ করা যাউক। আজ বঙ্গসাহিত্য জাতীয় সাহিত্যের সকল অভাব পূর্ণ করিতে অত্যুগ্র উদ্দীপনায় অগ্রসর হইয়াছে; আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে বাঙালা তাহার সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে এক উচ্চতম স্থানে বসাইতে পারিবে, অতি আধুনিক সাহিত্যের জন্য আমরা ঐ গৌরব করিতে পারিব।

পরাজিতা

(গল্প)

কুমারী চন্দ্রিমা সান্ন্যাল

প্রফেসর রায়ের সঙ্গে সৌম্যেনের এই হঠাৎ মেলামেশায় তার সমসাময়িকেরা যত না অবাক্ হ'ল, তার চতুর্গুণ আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল সৌম্যেন নিজে। পরিচয় হয় একদিন নির্জ্জনে। অবসর কালে সে লাইব্রেরীতে বসে' "রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা" পড়ছিল, মন প্রাণ ওর বইএর পাতায় যখন ডুবে গিয়েছিল, তখন প্রফেসর রায় এসে দাঁড়ালেন ওর মাথার কাছে—পেছনে। তার খেয়াল হয় নি। সহসা কাঁধের ওপর মৃদু হস্তক্ষেপে ও পেছন ফিরে অপ্রতিভ হয়ে উঠে দাঁড়াল। রায় বল্লেন সস্নেহ স্বরে, "তোমার হাতে এই বইখানি আমায় যেমনই অবাক্ করল, তেমনি আনন্দ দান ক'রল যে কতদূর—তা' আর মুখে প্রকাশ করতে পারি নে। আজকাল ত দেখি—ছেলেমেয়েদের হাতের সঙ্গে কতকগুলো খেলো 'রাবিশ' জড়িয়েই আছে। এ সবের মর্ম্ম তারা কি বুঝবে? প্রায়ই তোমাকে দেখি এখানে, কিন্তু তুমি যে মানবজীবনের সারতত্ত্বটুকু গ্রহণ করছ তা'ত জানি না! বস, বস, তোমার সঙ্গে একটু ঐ বিষয়েই আলোচনা করা যাক্।"

তারপর আরম্ভ হ'ল তাঁদের আলোচনা। এমনি করে'ই প্রতিদিনের আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক-ছাত্রের ব্যক্তিগত জীবনে একটি স্নেহশীল নিবিড় ঘনিষ্ঠতা জেগে ওঠে। একদিন রায় বল্লেন, "সৌম্যেন, বাবা, এখানে নয়; আমার বাড়ীতে তুমি এসো একদিন, সেখানে আমাদের কথাবার্ত্তা হবে।" সৌম্যেন অসম্মতি প্রকাশ করতে পা'রল না। তারপর থেকে প্রায়ই ওর যাতায়াত সুরু হ'ল রায় মহাশয়ের বাড়ীতে।

সন্ধ্যাবেলা বসে' তাদের সময় কেটে যেত নানারকম ধর্ম্মালোচনায়। সহসা যখন ঘড়িতে দশটা বাজত, তখন বাধা হয়ে রায় মহাশয়ের মা তাঁকে খাবার তাগাদা দিতেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে রায় বলতেন, "ওহে সোম, তুমিও না হয় দুটি ডালভাত খেয়ে যাও।"

শিক্ষকের সে স্নেহমিশ্রিত অনুরোধ উপেক্ষা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়্‌ত। সোমের খেতে বসে'ই হ'ত অসুবিধা। দীপার মৃদু ঠোঁট-চাপা একটা বিদ্রূপাত্মক হাসির সাম্‌নে ও কিছুতেই মুখ খুলতে পা'রত না। ওরা পরস্পরের সঙ্গে কোনদিনই কথা ব'লত না; চাক্ষুষ পরিচয়, সে কেবলমাত্র খেতে বসে। অথবা সোম হয়ত বাড়ীর মধ্যে ঢুকছে, দীপাও কলেজ থেকে ফিরছে—তখন সোমও যেমন বিনা বাক্যব্যয়ে সরে যেত, দীপাও তেমনি নিঃশব্দে গিয়ে ঢু'কত অন্য ঘরে। সোমের প্রতি দীপার আকর্ষণ ছিল চুম্বকের মত; কিন্তু মাঝে অন্তরায় ছিল ওই "রামকৃষ্ণ উপাখ্যান"। এই দীর্ঘ দিনের চোখের দেখাতেই দীপা মনে মনে তাকে ভালোবেসে ফেল্লে। শুধু প্রকাশ করাটাই যেন তার পরম পরাজয়! দীপার গর্ব্বোন্নত মন চাইত—সোম তার কাছে নত হোক্, কিন্তু সোম যে সে ধরণের ছেলে নয়, তা বুঝতে দেরী হয় না।

সেদিন খেয়ে উঠবার পরেই রায় বল্লেন, "সোম, আজ তোমার সঙ্গে ভাল করে' কোন কথাই হ'ল না।"

সৌম্যেন বল্লে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ যেন কোন চিন্তা আপনাকে বড্ড বাধা দিচ্ছিল।"

"তুমি তা'হলে সেটা ধরতে পেরেছ বাবা? আজ দু'দিন ধরে মেয়েটার এখন-তখন অবস্থা—ভুগছে আজ দশ দিন; ডাক্তার বলে গেছে—আজকার দিনটা বড়ই খারাপ। টাইফয়েড কি না! তবে কি জান, সবই ভগবানের মায়া—মায়ায় আবদ্ধ আমাদের মন। একটুতেই বিচলিত হই—তবে আর ভগবানকে ডাকার সার্থকতা কোথায়? তবু যিনি দিয়েছেন, ভাবনা-চিন্তার ভার তাঁর উপরেই ফেলে দিয়েছি।"

সোমের মনে হ'ল, সত্যিই সে আজ অনেকদিন দীপাকে কলেজ থেকে ফিরতে দেখেনি! কিন্তু তার সে-সকল দিকে কোন খেয়াল ছিল না। রায় মহাশয়কে চিন্তান্বিত দেখে সেও চিন্তিত মুখে বল্ল, "কিন্তু কোন্ ডাক্তার দেখছেন? একজন কোন ভাল ডাক্তার—"

রায় বল্লেন, "দেখি, একবার অন্য ডাক্তার এনে শেষ চেষ্টা করে'। সবই তাঁর মায়া—পুতুল, সামান্য মাটির পুতুল আমরা হে—কিছুই করতে পারি না, শুধু নাকে কেঁদে এই বিরাট্ দুনিয়াটা ধুয়ে দিতে পারি। তবে কি জান বাবা, মেয়েটা মা-মরা কি না, তাই তাঁর হাতে ভাবনা ছেড়ে দিলেও থেকে থেকে মনটায় ঐ ভাবনা-রাক্ষুসী এসে পুড়িয়ে মারে। মানুষেরই ত মন। তোমায় আর কি বলি বাবা? তুমি এখন ছেলেমানুষ। আমি এই হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, সংসারটা একটা ঝুনো পচা নারকেলের মতন, ওপরটি বেশ চক্‌চক্ করছে, ছোবড়া ছাড়িয়ে ভেঙ্গে দেখ—পচা জলের গন্ধ শুধু!

তোমাদের জ্বালাতে ইচ্ছে করে না, তবু বাধ্য হয়ে বলতেও হয়। তুমি বাবা, আজকের রাতটা যদি—কোন অসুবিধা হবেনা ত?"

সৌম্যেন বল্লে, "আজ্ঞে না, হোটেলে বলে এসেছিলাম আজ খাবো না। তা আমার কোনই অসুবিধা হবে না।"

রায় বল্লেন, "এই বুড়ো হাড়ে কাল সারারাত জেগে দেহটা নিতান্তই খারাপ হয়ে পড়েছে।"

সৌম্যেন বল্লে, "আপনি বরং একটু ঘুমোন; আমি ত আছিই, যদি দরকার হয়, ডেকে দেব।"

সৌম্যেনকে নিয়ে নিজের ঘরে এসে তিনি বল্লেন, "ঐ দরজাটা খোলা রইল। এ ঘরে দীপা আছে। আমার মাও রয়েছেন ঐ ঘরে। ও মা, এই নাও, বড় মজবুত পাহারাওয়ালা রইল আজ দীপুর মাথার কাছে; তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও দিকিন্। সোম, তুমি এখন বিশ্রাম কর, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।" রায় মহাশয় মশারি ফেলে শুয়ে পড়লেন।

সৌম্যেন দীপার ঠাকুরমার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে সামনে পেয়ে তিনি একেবারে হাউ হাউ করে' কেঁদে উঠ্‌লেন। সোম তাঁর চোখ মুছিয়ে বল্লে, "কাঁদবেন না ঠাকুমা, উনি অবশ্যই ভাল হয়ে উঠবেন।" ঠাকুরমার উদ্বেগ কিছুমাত্র কম্‌ল না। তিনি অশান্ত হৃদয়ে বল্লেন, "আর বাবা ভাল, সংসারের যিনি লক্ষ্মী তিনিও যে এই রোগে এমনি করে'ই ফাঁকি দিয়েছেন, তখন আর ওটুকুরও কোন বিশ্বাস করা যায়—"

সোম বল্ল, "ঠাকুমা, উতলা হ'লে কি চলে? আপনি এত—"

ঠাকুমা বাধা দিয়ে বল্লেন, "মুখপোড়া ডাক্তারগুলো যদি সব জবাবই দেবে, ত ডাক্তার হয়েছে কি করতে?"

সোম বল্ল, "ঠাকুমা, যিনি আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তাঁর ওপরেই বিশ্বাস রাখি, ডাক্তার-বদ্যিরা ত নিমিত্তের ভাগী।"

এই সময়ে দীপা আবার প্রলাপ বকতে লাগল। "ঐ দেখ বাবা, মা তোমায় ডাকছেন—আমি দেখতে পাচ্ছি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে!—কখন না, আমায় একলা ফেলে কখনই তুমি বাবাকে নিয়ে যাবে না। আমি যেতে দেব—না—আ—"

আবার কিছুক্ষণ নির্জ্জীব অবস্থা।

ঠাকুরমা নীরবে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, "এই দেখ বাবা, রাতের পর রাত আজ দশদিন ধরে সমানে ঐ এক ভুল বকছে। তুমি কি বউমাকে দেখতে পাচ্ছ কোথাও? তিনি সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী, তিনি কি এই ক্ষুদ্-কুঁড়োর ওপর দৃষ্টি দেবেন?"

দীপা আবার বলতে সুরু কর্‌ল, "না বাবা—তা' হবে না। আমি তাকে ছাড়া কাউকে আর বিয়ে করব না, তুমি বল্লেও না—"

ঠাকুরমা দীপার মাথায় আইস্‌ব্যাগ দিয়ে বল্লেন, "তুই সেরে ওঠ্ ভাই, যাকে চাইবি তাকেই এনে দেব, দীপু, অ—দীপু ভাই—"

দীপার মুখের কথা জড়িয়ে এল—মাথাটা ঢলে' পড়ল বুকের কাছে। ঠাকুরমা আবার কান্নায় অস্থির হয়ে উঠলেন। সৌম্যেন বাধ্য হয়ে তাকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করে' বল্লে, "ঠাকুমা, একমনে ভগবানকে ডাকুন, আমি বলছি, ফিরে পাবেন।"

ফিরে এসে সোম বস্‌ল দীপার মাথার কাছে। অনেকক্ষণ একভাবে কেটে গেল। গভীর চিন্তায় সোম মগ্ন। সহসা যেন কে ওকে জাগিয়ে তুল্লে। সে স্পষ্ট শুন্‌তে পেল, যেন কে ডেকে বল্লে, "ওরে ও সবে হবে না, ও-ঘর থেকে একটু চরণামৃত এনে দে মুখে!" অপ্নোত্থিতের মত উঠে সে রায় মহাশয়ের পূজোর ঘরে

গিয়ে দাঁড়াল। সোম আশৈশব থেকে ভগবানে বিশ্বাস রেখে এসেছে। কিন্তু তিনি যে তাঁর করুণাময় বর্ম্ম দিয়ে প্রকৃতই মানুষকে ঘিরে রাখেন—সে দৃষ্টান্ত আজ সে প্রথম দেখ্‌ল। গভীর ভক্তিতে তাঁর অন্তরাত্মা আজ এই স্তব্ধ নিশীথে তাঁর নামে আকাশ বাতাসকে কম্পিত করে' তুলতে চাইল। পুষ্পপাত্র থেকে একটুখানি চরণামৃত নিয়ে দীপার কাছে সে ফিরে এল। সন্তর্পণে তার মুখে সেটুকু ঢেলে দিয়ে সে চেয়ে রইল উদ্‌গ্রীব নয়নে। সারা রাতের মধ্যে দীপা একটি বারও চোখ মেল্‌ল না। সৌম্যেন দাঁড়াল গিয়ে বারান্দায়। প্রশান্ত প্রভাতী আকাশের বুকে সে খুঁজলে একটি সৌম্য স্নেহময় মূর্ত্তির ছায়া। দূরে গোপালের মন্দিরে তখন মৃদু মৃদু ঘণ্টা বাজছে, তারই অস্পষ্ট স্বর ভেসে আসছে মাঝে মাঝে।

সৌম্যেন মনে মনে বল্ল, "ঠাকুর, তোমায় যদি কোন-দিন যথার্থ ভক্তি-অর্ঘ্য দান করে' থাকি, তবে তোমার মনকে যেন আমার প্রার্থনা স্পর্শ করতে পারে—"

২

"বাবা, তোমার সোমবাবু ত কই আর এলেন না, আমারও তাঁকে ধন্যবাদ জানান হ'ল না—"

"তোর ধন্যবাদ পাওয়ার জন্য সে হাঁ করে' যেন বসে আছে—"

"আহা, তা'হলেও ওটা একটা সামাজিক সভ্যতা। সত্যি বুঝি তিনি খুব সেবা করেছিলেন?" দীপার অন্তরে যে ব্যাকুল ব্যগ্রতা প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল, বাহ্য-দৃষ্টিতে কিন্তু তার কোনই আভাস পাওয়া গেল না; অনবধানতা বশতঃ যদি বা প্রকাশ পেত, তবুও রায় মহাশয়ের দৃষ্টি আজ সে দিকে পড়ত না।

তিনি বল্লেন, "সেবা বলে' সেবা? মায়ের মতন যত্ন! অমন তোর ঠাকুমণি কি আমিও করতে পারতুম না। তোর অনেক পুণ্যের ফলে ওর মত লোকের সেবায় বেঁচে উঠেছিস্! এবার যা একদিন ৺বেলুড় মঠে ৺ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিয়ে জীবনটা সার্থক করে' নে দিকিন্—"

দীপা সভয়ে চমকে বল্ল, "মা-গো! আমার এমন সাধের চুল পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ইলেকট্রিক ওয়েভ করালাম, নোংরা বীজাণুভরা ধুলোয় নষ্ট হোক্ আর কি!—বাবা তোমার মনের কি অদ্ভুত ধারণা! এক রাশি মাটির পুতুল, আর ঐ দাড়ীওয়ালা বুড়োটার নাকি আবার কোন ক্ষমতা আছে? ওদেশের বড় বড় মনীষিরা বলেন, 'উইল-ফোর্সের' কাছে কিছুই লাগে না। কিন্তু তুমি এত বিদ্বান্ হয়েও সে কথাটা বুঝতে পার না!"

বাগানে পিতাপুত্রী বসেছিলেন। দীপা এখনও দুর্ব্বল। কোথাও যাওয়া-আসা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রতি সন্ধ্যাটুকু ওকে নিয়ে ঐ বাগানটার খোলা হাওয়ায় রায় মহাশয়কে বসে গল্প করে কাটাতেই হয়। দীপার অসুখ সারবার পর সোম আর বড় একটা আসে না। ও জানে, রায়মশায় তার সঙ্গে মনোমত আলোচনা বন্ধ রেখে, মেয়ের সঙ্গে বাজে কথায় কখনই অবসর নষ্ট করবেন না। আর দীপা যে ঠাকুর-দেবতার কথায় যোগদান পছন্দ করে না, সেটাও তার ভাল' করে' জানা আছে। সুতরাং ও পথ না ছোঁয়াই উত্তম পন্থা।

কিন্তু এদিকে পিতা ও পুত্রী—উভয়ের মনই তার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। উপস্থিত সোমের না আসার কথাকে কেন্দ্র করে' আলোচনা ওঠায় মেয়ের মনের গভীর দেশের যে সুপ্ত আভাসটি তিনি পেলেন, তাতে তাঁর অন্তঃস্থিত একটি গোপন পরিকল্পনা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূমিসাৎ হয়ে তাঁকে বিচলিত করে' তুল্‌ল। তাঁর মেয়ে হয়েও দীপা যে নাস্তিক, তিনি জানেন। কিন্তু সেটা—সোমের সঙ্গে আলাপ না হলে—তাঁকে কিছুমাত্র শঙ্কিত করত না। তিনি বল্লেন, 'দীপু মা, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব তোমাদের মনে বিপরীত রূপ ধারণ করেছে। ও-দেশের শিক্ষণীয় বস্তুর উৎকৃষ্টটাই নেওয়া উচিত, নিকৃষ্টটা নয়। ইচ্ছাশক্তির কথাটা তোমার চোখে সমীচীন ঠেকেছে—খুবই ভাল, বাস্তবিকই আমাদের জীবনে সফলতার প্রধান পোষক ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু এ কথা তোমায় কে বল্‌ল যে, ঈশ্বর নেই?"

দীপা নিজের জ্ঞানে দীপান্বিতা হয়ে বল্ল, "ঈশ্বর থাকবে না কেন? এক পরম জ্যোতিঃই ঈশ্বর—সে ত নিরাকার!"

রায় মহাশয় বল্লেন, "আজকাল বুঝি আবার ব্রাহ্ম-সমাজে যেতে সুরু করেছিস্? ব্রহ্মজ্ঞানী হবি?"

দীপা বল্লে, "তা' নইলে বুঝি আর জ্ঞান হয় না!"

রায় মহাশয় বল্লেন, "তোদের মতন বিদ্যে-বুদ্ধি নিয়ে যারা যায়—তারা ব্রহ্মজ্ঞানীর বদলে ব্রহ্মদৈত্য হয়ে দাঁড়ায়!"

দীপা বল্ল, "আচ্ছা, বেশ। জান, আমার যখন প্রথম অসুখ করে, আমি তখন খুব প্রার্থনা করেছিলাম—যাতে আমি বেঁচে উঠি!"

রায় মহাশয় বল্লেন, "কার কাছে প্রার্থনা করেছিলি?"

দীপা বল্লে, "তোমার ঐ বুড়োর কাছে নয়গো—আমার মনের শক্তির কাছে।"

রায় মহাশয় এতক্ষণে মেয়ের কথায় হেসে ফেল্লেন। বল্লেন, "তুই আবার কে রে? তোর কিসের শক্তি? অহং বলে যারে গর্ব্ব করছিস্—সে ত মহামায়ার শক্তি!"

দীপাও হেসে লুটিয়ে পড়ে' বল্ল, "ব্যস্—আবার তোমার আরম্ভ হ'ল ঐ পাগ্‌লামী। তোমার মহামায়া আর প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব তুমিই বোঝ আর সমঝ্‌দার তোমার ঐ সোম। বেশ মিলেছ তোমরা দু'টি!"

রায় মহাশয় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! থার্ড ইয়ারের ছাত্রী দীপা, তাঁকে আজ এমন করে' উপহাস করতে সুরু করল! বাপের মনের সরল সত্যের সন্ধান সে চায় না। বিদেশীয় নানারকম গ্রন্থের রসে হৃদয় তার পরিপূর্ণ, বিদেশী আব্‌হাওয়া তার অঙ্গের শিরায় শিরায়। ভারতের "নিরক্ষর জ্ঞানী" পরমহংসের চিন্তার স্থান সেখানে তিলমাত্র নেই। দীপাকে তিনি কতদিন "রামকৃষ্ণ-জীবনচরিত" পড়ে' তাঁর মাহাত্ম্যের কথা বুঝিয়েছেন; কিন্তু দীপা নাক মুখ ঘুরিয়ে বলেছে, "হ্যাঁ, ঐ গ্রন্থকার ইংরিজী বই'র অনুবাদ করে' তোমাদের হংসরাজের নামে চালিয়েছে—নিজের ব্যবসায় পসার বাড়াবার জন্যে! আর তোমাদের মত লোকেরাই ঐ মিথ্যে বোঝা বাড়াবার প্রশ্রয় দেয়। অত জ্ঞানের কথা আর তোমার হংসরাজকে বলতে হয় না—"

রায় বল্লেন, "যে ইংরিজী শিক্ষা, দীক্ষা, জাতের এত বড়াই করিস্—তাদের যিশুখৃষ্টও তবে কিছু নয়! তারা কেন সেই লোকটাকে এই সনাতন যুগ থেকে পূজো করে' আস্‌ছে?"

দীপা বল্ল, "বাবা, সাধেই কি আর বলি—ও সব ছাই-ভস্মগুলো পড়ে' মাথা খারাপ কর না। তোমার brainটাই কিছু inactive হয়ে পড়েছে! কিসে আর কিসে! কোথায় Jesus Christ, আর কোথায় তোমার uncultured, হাঁটুর ওপর গামছা জড়ান হংসরাজ!"

কিছু স্তব্ধ অবসর কাটবার পর রায় বল্লেন, "দেখ্ দীপু, একালের শিক্ষার সর্ব্বগ্রাসী আগুনে নিজের ভেতরকার সত্যটিকে নষ্ট করিস্ নে। ভগবানকে অমান্য করে' কোন জাত কোন দিন বড় হ'তে পারেনি। ঈশ্বর এক, তিনিই যুগে যুগে বিভিন্ন আকারে অবতার। যে যিশু, যে রাম, যে কৃষ্ণ, তিনিই এই যুগে রামকৃষ্ণ। 'নিরাকার', 'নিরাকার' করে চেঁচাচ্ছিলি, তোর কি এত গুণ হয়েছে যে নিরাকার ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারিস্? আমাদের দেশে সকলেই ত তোর মত জ্ঞানী নয় যে, একবার চোখ বুঁজেই নিরাকার ব্রহ্মের নাড়ী-নক্ষত্র বুঝে নিতে পারে! নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে বুঝতে হ'লে আগে তাঁর সাকার সগুণ রূপকে—'সীমার মাঝে অসীম'কে উপলব্ধি করতে হয়। লাফ্ দিয়ে কেউ গাছে উঠতে পারে না। সাকার সগুণ ব্রহ্মেরে কল্পনা করতে গেলেই ত্যাগী, যতি, সন্ন্যাসী, মহাপুরুষদের রূপই কল্পনা করতে হয়। তাঁদের ভক্তি-ভরে পূজো করতে করতে হৃদয় যখন ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে, জগৎ ব্রহ্ম-ময় দেখে, তখনই নিরাকার রূপের উপলব্ধি হয়। তোরা দুটো ইংরিজি বই পড়ে H_2SO_4এর মত তাঁকে বুঝে ফেল্‌বি, তা' হয় না রে! তবেই বোঝ, মাটির পুতুল মুখ্যু হিন্দুর নিছক অর্থহীন পাগ্‌লামই নয়। বড় বড় মুনিরাই বলে' গেছেন—"ষড়াঙ্গাদি বেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা কবিতাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি, গুরোরঙ্ঘ্রি-পদ্মে মনঃ শ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিম্—"

দীপা বল্ল, "ওঃ মুনিদের কথা ত আরওই বিশ্বাসজনক নয়। ঐ ভণ্ডরাই হচ্ছে আমাদের সমাজের নষ্টের গোড়া। ওরাই সয়তান। আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেরা ঐ সয়তানী অনুসরণ করে' সকলের মুণ্ডপাত করছে। ছিঃ, ছিঃ—"

রায় মহাশয় হতাশ হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, সহসা গেটের দিকে নজর পড়তেই মুখ তাঁর উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন "বাঁচালে বাবা তুমি, তোমার না আসাতেই আমার মেয়েটার সঙ্গে তর্কে বিতর্কে সময় কাটাতে হ'ল। ইংরিজী সভ্যতা আমাদের দেশের মেয়েগুলোর মাথা খেলে। তুমি ছিলে কোথায় এতদিন ?"

সৌম্যেন এগিয়ে এসে দু'জনকেই নমস্কার করে' বল্ল, "গত পরশু মা-রা সবাই দেশ থেকে এসেছেন, কিছুদিন তাই বাড়ী ঠিক করতে ব্যস্ত ছিলাম। আপনাদের সব ভাল ত ?"

রায় মহাশয় সোমকে একটা চেয়ার সরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "নাও, বস। হ্যাঁ, শরীর সকলের ভালই ছিল। তবে মেয়েটা আজ তর্কে তর্কে গুচ্ছের খানিক চেঁচিয়ে মাথাটা গরম করে' তুলেছে—আবার জ্বর না আসে!" সোম একবার তার শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানার দিকে চেয়ে দৃষ্টি নত করলে।

রায় বল্লেন, "এমন শান্ত সন্ধ্যাটি কোথায় তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করে' কাটাব, তা' না, আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েগুলোর মুখে তাঁর নিন্দে শুনেই কাটাতে হ'ল। নাও, এখন ঐ ভূতের সঙ্গে তুমি বাক্‌বিতণ্ডা কর।"

রায় মহাশয় চলে' গেলে দীপা বল্লে, "আচ্ছা সোমবাবু, বাবা না হয় বুড়ো মানুষ—ঐ সব নিয়ে মনে শান্তি পান। কিন্তু আপনি ? একজন শিক্ষিত যুবক হয়ে কি করে' ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ রাবিশ নিয়ে মেতে থাকেন ?"

সোম খানিক চুপ করে' থেকে বল্ল, "আপনার কথার অর্থ ত বুঝতে পারলাম না—ক্ষমা করবেন।"

দীপা বল্ল, "আচ্ছা, তবে বুঝিয়েই বলছি।—আমার বলবার অর্থ—আপনি ঐ একটা dull subject নিয়ে অর্থাৎ দাড়ীওয়ালা, savage-looking একটা লোকের মধ্যে কি এমন রস পেলেন, বুঝি না!"

সোম কিছুক্ষণ বিস্ফারিত লোচনে দীপার দিকে চেয়ে বল্ল, "দেখুন, যার যাতে বিশ্বাস। আপনার মনের কোন বদ্ধমূল ধারণাকে কি কেউ সহজে উৎপাটন করতে পারবে ? সেই রকম আমার মনের বিশ্বাস-ভক্তি যদি সেই savage-looking লোকের প্রতিই হয়, তবে তাকে পরিবর্ত্তিত করবার ক্ষমতা ত কারও নেই, প্রয়োজনও থাকা উচিত নয়। হয়ত আমার প্রাণ সেই লোকটার কথাই আলোচনা করে' তৃপ্তিলাভ করে। আপনি আমায় শিক্ষিত বলে' সম্বোধন করলেন, কিন্তু মনে যে শিক্ষার প্রভাবে কথাটা বল্লেন, তাকে আমি শিক্ষাই বলি না। সে শিক্ষা আমাদের—" সৌম্যেন এইখানেই থেমে গেল।

দীপা একটা নিঃশ্বাস টেনে বল্ল, "Awefully strange! বাবার influeuce আপনার ওপর বেশ act করেছে!"

সোম ব্যথিত স্বরে বল্ল, "যাক্‌, আপনার অপ্রিয় কোন বিষয় আলোচনা করা উচিত নয়। তাতে আপনার শারীরিক ক্ষতি হতে পারে।"

দীপা অন্য একটা চেয়ার টেনে পা ছড়িয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বল্ল, "সোমবাবু, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!—আপনি যে রকম আমার সেবা করেছিলেন,—"

সোম বল্ল, "ওটুকু আমাদের হাতযশ।"

দীপা বল্ল, "হয়তো তাই। কিন্তু মরণের মুখ থেকে একজনকে বাঁচিয়ে তুলে হঠাৎ আপনার আসাই বন্ধ হয়ে গেল ?"

কথা ক'টি ব'লে ফেলেই দীপা একটু অপ্রতিভের মতই সৌম্যেনের দিকে তাকিয়ে রইল। কথাগুলি বলে' সৌম্যেনও দীপার দিকে চোখ তুলে' চাইতেই, দীপা যেন একটু জুলুমের স্বরেই বল্লে,—"তবু কৃতজ্ঞতা জানাবার অপেক্ষায় যারা বসে' থাকে—তাদের জন্যেও তো প্রয়োজন থাকতে পারে!"

সোম তবু বল্ল "একটুও না।"

দীপা এইবার আরও একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্লে, "আচ্ছা, না হয় একটু অপ্রয়োজন নিয়েই আসবেন মাঝে মাঝে। হাঁ, কাল সন্ধ্যাবেলা আপনাকে আসতেই হবে একবারটি—"

সোম বল্ল, "কাল হয়ত আসতে পারব না। কাল মঠে ৺ঠাকুরের জন্মোৎসব।"

দীপা বল্ল, "না না, কাল আপনাকে নিশ্চয় করেই আসতে হবে। কাল যে আমার জন্মদিন।"

সোম আর একটিও বেশী কথা না ব'লে, বল্ল,—"ভেবে দেখব।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দীপা বল্ল, "এর বেলাতেই কি আপনার যত ভাবনা-চিন্তা?"

সোম কোন উত্তর দিল না।

দীপা বল্লে, "কোন উত্তর দিচ্ছেন না যে?"

মুখ তুলে সোম বল্লে, "আপনি আমায় বড় সঙ্কটেই ফেললেন কিন্তু! আচ্ছা, আসব তবে সন্ধ্যার পর।"

দীপা বল্লে, "ওকি! উঠ্‌ছেন যে, বাবার সঙ্গে পঞ্চায়েৎ বসবে না?"

এক পা, এক পা করে' এগিয়ে যেতে যেতে সোম বল্ল, "সেটা যে আজ আপনার সঙ্গেই সমাধা হয়ে গেল।"

সৌম্যেনের মুখের প্রচ্ছন্ন একটা খোঁচা খেয়েও দীপা নীরব দৃষ্টিতে ওর দিকেই চেয়ে রইল। সে দৃষ্টি সোমের অন্তঃস্থলকেও যেন হঠাৎ কিসের সাড়ায় জাগিয়ে তোলে! এতক্ষণে তাড়াতাড়ি একটি নমস্কার সেরে নিয়ে সে বিদায় নিল।

৩

দীপালোক-সজ্জিত কক্ষের মধ্যে বসেছিল দীপার তরুণ ও তরুণী বন্ধুরা। তাঁদের মধ্যে হাসির মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল! চলছিল বড় জোর সমালোচনা কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে। কথার ফাঁকে দীপা একবার করে' প্রবেশ-পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌ছিল—সোমের আগমন প্রতীক্ষায়।

মীরা বল্ল, "কই দীপা, তোমার বিবেকানন্দের Second Edition-এর যে দেখাই নেই এখনো? আমরা সত্যিই বুঝি তেমন সৌভাগ্য করে' আসিনি?"

দীপা হেসে বল্লে, "দাঁড়াও। সে যেমন তার গুরু-কৃপালাভের জন্যে সাধনা করে, তোমাদেরও তেমনি একটু করতে হবে তো!"

তপতী অধীর কণ্ঠে বল্লে, "উঃ! সাড়ে সাতটা যে বাজে! আর কত অপেক্ষা করা যায়?"

উৎপল বল্লে, "তিনি হয়ত ততক্ষণ মঠের গোয়ালে গড়াগড়ি দিয়ে নশ্বর জীবন সার্থক করে' নিচ্ছেন!"

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত তরুণী কণ্ঠের খিলখিল হাসির ঝরণায় ঘরটি খল্‌খল্ করে' উঠ্‌ল। পরক্ষণেই দরজায় দেখা গেল সৌম্যেনের সৌম্যমূর্ত্তিখানি। দীপার তরুণ বন্ধুরা সকলেই বিদেশীয় বেশে সজ্জিত। সোমের পরণে কিন্তু স্রেফ্ শাদা ধুতি আর পাঞ্জাবী, কপালে এক নির্ম্মল শুভ্র চন্দনটিকা, গলায় বেলফুলের মালা। মুহূর্ত্তে সেখানে বিরাট্ স্তব্ধতা দেখা দিল। সকলেই তার দীপ্ত মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। দীপা উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "ইনিই সৌম্যেনবাবু।"

তরুণের দল বলে' উঠ্‌ল, "বসুন, বসুন, সোমবাবু! আপনাকে দেখবার জন্যে কতক্ষণ থেকে অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছি। আজ আমাদের জীবন সার্থক।"

তরুণীর দল চঞ্চলভাবে বেশভূষা সাম্‌লে নিলে।

সোম আসন গ্রহণ করে' বস্‌ল—"আমাকে দেখবার এত আগ্রহের কারণটা জানতে পারি কি?"

সবিতা বল্ল—"আপনি হলেন এত বড় একজন মহাত্মা ব্রহ্মচারী পুরুষ!"

সোম বুঝল; তার আসার অনতিপূর্ব্বে যে হাসির ধমক উঠেছিল—সেটা তাকে নিয়েই। দীপা এতক্ষণ বসে বসে হয়ত ওর সম্বন্ধে টিকা-টিপ্পনী কাট্‌ছিল। নিজেকে যথেষ্ট সংযত করে' সে বল্ল—"আপনাদের এ মহানুভবতার জন্যে ধন্যবাদের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, আপনাদের প্রশংসার পাত্র হয়ে এই দীন নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছে।"

ধ্রুব বল্ল—"সেই যে ছোটবেলায় কি একটা পড়েছিলাম—"Full many a gem of purest ray serene নাকি একটা, বাকিটা ভুলে গেছি ছাই! এই সোমবাবুকে দেখে আজ সেই কথাটাই মনে পড়্‌ল। এঁর মতন একজন অসাধারণ পুরুষ আমাদের সমাজে আছেন, অথচ we are quite unaware of it!"

তরুণীদের মধ্যে একজন বল্ল—"একটু আপনার ধর্ম্ম-উপাখ্যান শুনিয়ে এই নারীদের পরিত্রাণ করুন না সোমবাবু!"

আর একজন বল্ল—"শুনছি এই আপনাদের রাজহংসটি নাকি next to our Jesus?"

আর একটি বল্ল—"তিনিও বুঝি যিশুর মত সব অলৌকিক কাণ্ড করেছেন!"

সোমের পক্ষে এ বিদ্রূপবাণী সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। আরক্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বল্ল—"দেখুন, আমায় বল্লে ত ক্ষতি হবে না। কিন্তু একজন মহাপুরুষকে অমান্য ক'রে, টিকাটিপ্পনী দিয়ে কি আপনারা নিজেদের দু' পাতা কলেজী নোট মুখস্থ-করা বিদ্যে জাহির করবার জন্যে এতই ব্যাকুল? স্ত্রী-শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল যদি এই হয়, তবে—"

এই পর্যান্ত বলে'ই ক্রোধ-রক্তিম মুখে সোম সে কক্ষ ত্যাগ করল। দীপা ভয়কম্পিত দেহে ছুটল তার পেছনে। কাছে এসে দৃঢ়ভাবে তার হাত ধরে' ফেলে বল্লে—"ক্ষমা কর সোমদা। তুমি রাগ করে' চলে গেছ শুনলে—বাবা আমার ওপর বড্ড রেগে যাবেন।" উত্তেজনায় সে থরথর করে কাঁপছিল।

সোম বল্ল—"আজ তোমার বন্ধুমহলে আমায় অপদস্থ করবার জন্যেই বুঝি এই সাদর আমন্ত্রণ?"

দীপার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠ্‌ল। বল্লে, "না, না, না!"

সোম বল্লে, "আচ্ছা, ভাল কথা! আজ এইখানেই বিদায়। অনেক কাজ ফেলে তোমার অনুরোধ রাখতে এসেছিলাম কিনা!"

অনুতপ্ত হৃদয়ে দীপা বল্লে—"সত্যি? আমার অনুরোধেই তুমি এসেছ?" গেটের দিকে পা বাড়িয়ে সোম বল্লে—"হ্যাঁ, তাই।"

আর অপেক্ষা না করে' সোম ত্বরিতপদে চলে গেল। দীপার এতদিনের রাশীকৃত অভিমান আজ শুক্‌নো ফুলের মতই ঝরে' পড়্‌ল। সৌম্যেন দীপার মৌন প্রেমকে চিরদিন উপেক্ষা করে' এসেছে। হ্যাঁ, করেছে অবশ্যই। যদি বা সে অস্বীকার করে, দীপা মানতে প্রস্তুত নয়। অনেকদিনের টুকরো ঘটনায় সৌম্যেন জেনেছে যে, দীপা তাকে ভালবাসে। কিন্তু সে বোধ করি, নিজেকে জিতেন্দ্রিয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যেই তাকে এড়িয়ে চল্‌ত! দীপার আত্মসম্মানে এইখানেই বড় বাজ্‌ত। সৌম্যেনের এই উদাসীনতাকে শাস্তি দিতে গিয়ে দীপা আজ প্রচণ্ডভাবে নিজেকেই অপমানাহত করে ফেল্লে? রক্তিম মুখে সে জন্মদিনের মজলিসে আবার ফিরে এল বটে, কিন্তু মজলিস আর সে-মজলিস রইল না।

৪

সৌম্যেন চিরকালকার "একগুঁয়ে" ধরণের ছেলে। সারা রাস্তা সে ভাবতে ভাবতে এসেছে, কি করে' দীপাকে শিক্ষা দেওয়া যায়! ওর সারা মন কেন যেন প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌লে, দীপাকে একদিন ঠাকুরের পায়ে মাথা নত করিয়ে ছাড়বে। এই সঙ্কল্পের বলেই একদিন সে রায় মহাশয়কে জানাল, দীপাকে সে চায় তার সহধর্ম্মিণীরূপে।

রায় ম'শায় তার হাত দুখানি জড়িয়ে বল্লেন, "বাবা সোম, এ আমার কল্পনাতে এসে সেখানেই একদিন মিলিয়ে যায়। এ আশা কি আমার সফল হবে? তোমার মত যথার্থ ছেলে দীপার ভাগ্যে—"স্নেহময় বৃদ্ধ আর কথা সমাপ্ত করতে পারলেন না। চোখের কোণ বেয়ে ঝরল দু'ফোঁটা অশ্রু—তাতে যে কতখানি স্নেহ, কত দূর কল্যাণ-কামনা মিশ্রিত ছিল—বুঝল সোম। এ দু' ফোঁটা অশ্রুর মূল্য সেই বোঝে—যে মানব তৃষিত মরুচারীর মত সংসারে অতৃপ্ত কুলহারা। এ অশ্রু জন্মদাতার শুভ আশীষপূর্ণ অন্তরেরই মূক বাণী!

সৌম্যেন যখন নিজের মায়ের কাছে এ প্রস্তাবের কথাটা জানাল, তখন তিনি বল্লেন—"বাবা, এ মেয়েটিকে একবার আমরা সবাই দেখলে হয় না?"

সোম বল্লে, "তার কোন দরকার নেই মা! বিয়েটা যখন করব আমিই, তখন অযথা মেয়ে দেখাদেখির হাঙ্গাম করো না, আমি যা বলি, তাই করে যাও। মেয়ে তোমার পছন্দ হবেই।"

মা একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। তবু ছেলের কথার প্রতিবাদ করলেন না। সোম মনে মনে জান্‌ত যে, তার মত গৃহস্থ ঘরে দীপাকে কখনই মানাবে না। সোম সনাতনধর্ম্মী—দীপা অতি আধুনিকা। আপত্তির কারণ এইখানেই। কিন্তু সোমের এই বিবাহ ত আর সাত জনের মত নয়, গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ।

সেদিন দীপা কলেজ থেকে ফিরতেই রায় ম'শায়

বল্লেন, "দীপু, তোমার কাল থেকে আর কলেজ গিয়ে কাজ নেই—বুঝলে?"

বোঝা ত দূরের কথা, দীপা যুগপৎ বিরক্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বল্ল, "কেন বাবা? সে রকম ত কোন কথা ছিল না।"

তার বাবা বল্লেন, "তোমার বিয়ের সব ঠিক করে' ফেলেছি। পরশু তোমার আশীর্ব্বাদ, তারপর মধ্যে মোটে একটা দিন! আর এ পাত্র হাত-ছাড়া হলে ভাল পাত্র পেতে বেগ পেতে হবে।"

দীপা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্ল, "বাবা, আমার মত না নিয়েই তুমি সব ঠিক করে' এসেছ? পাত্র পাওয়া যেত না? আমার মত মেয়ের—"

এই অবধি বলে' দীপা সত্যই এবার কেঁদে ফেল্ল। রায় মহাশয় সামান্য কঠিন হয়ে বল্লেন, "সব সময়ে ছেলেদের সঙ্গে ছেলেমানুষী করলে চলে না দীপা। আমার যত দূর বিশ্বাস, এ বিয়েতে তোমার অসুখী হওয়া উচিত নয়।"

অভিমানে স্ফীত হয়ে দীপা ঘর ছেড়ে চলে' গেল। খাটের ওপর আছড়ে পড়ে' সে প্রবলভাবে কাঁদতে লাগল। জলভরা চোখের সামনে ভাসছিল সোমের প্রশান্ত চন্দন-লিপ্ত বিশাল ললাট, সৌম্য মুখশ্রী। দীপা সোমকেই চায়। বাবা কি একবার তাকে কথাটা জানাবারও অবসর দিতে পারলেন না?

দীপার বিনা অনুমতিতেই তার বিয়ে হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময়ে, এমন কি কন্যা-সম্প্রদানের সময়েও সে একটিবার চোখ তুল্ল না। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা। অবশেষে হঠাৎ সৌম্যেনেরই স্পর্শে, সৌম্যেনেরই কণ্ঠস্বরে তার ভুল ভেঙে যায়। বাসরে দীপা বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে চেয়ে বল্ল, "সত্যিই তুমি?"

নৈরাশ্যের ভঙ্গীতে সোম বল্ল, "দুর্ভাগ্য তোমার।"

রাজহংসীর মত গ্রীবা বাঁকিয়ে সোৎসুক দীপা এইবার বল্ল—"না, কখ্‌খনো নয়। আমার সৌভাগ্য।"

এইবার দীপাকে কাছে টেনে নিয়ে সোম বল্ল, "দীপা, বিকারের ঘোরে একদিন তুমি বলেছিলে, 'তাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না'—কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা ত রাখতে পারলে না? সে হতভাগা হয়ত এতক্ষণ বিষ খাওয়ার উদ্যোগ করছে।"

দীপা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্ল "না গো না, সে অমৃতই খাচ্ছে, তুমি জান না। আমার প্রতিজ্ঞা আমি ঠিকই রেখেছি।"

দিন ওদের বয়ে চল্ল নিত্য নূতন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। সোম একদিন কতকগুলি সুন্দর বাঁধান ৺পরমহংসদেব ও শ্রীমায়ের কথামৃত এনে দীপার হাতে দিল। দীপা স্তম্ভিত, মুখ তুলে বল্ল, "এ আবার কি জিনিষ? ব্যস্ত হয়ে দোয়াত কলম টেনে নাম লিখতে লিখতে উৎফুল্ল সোম বল্লে, "মায়ের কথামৃত দীপা—চম-ৎ-কার।"

দীপা একটানে বইগুলো খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে বল্ল, "এর সঙ্গে পঞ্চাননের পাঁচালী, বটতলার চণ্ডী আর একখানা গেরুয়া আনলেই পারতে!"

সোম বল্ল, "পঞ্চাননের পাঁচালী আর এই এক হল?"

দীপা বল্ল, "এটা বুঝি তার অনুবাদ?"

সোম বল্ল, "হুঁ! গুচ্ছেরখানিক বিলিতি প্রেম-পাঁচালী পড়ে তোমার মাথা খাওয়াই হয়েছে। কোন শিক্ষাই তুমি পাওনি।"

দীপা বল্ল, "শিক্ষা পাইনি মানে? ঐ বুড়ো বামুনকে ভক্তি করতে সাধ যায় না বলে' অশিক্ষিত বলবে?"

সোম বল্ল, "তোমায় সঠিক কি যে বলা উচিত, ভেবে পাচ্ছি না।"

দীপা এবার হেসে ফেল্ল। সোমের কাছে সরে এসে বল্ল, "নাগো, দোহাই তোমার! তুমি ওগুলো কিনে বাজে পয়সা নষ্ট করো না। নষ্ট করবার মত পয়সা তোমার নেই, তা তুমি জান? তার চেয়ে মোপাসার সেটটা আমায় মনে করে এনে দিও। লক্ষ্মীটি, কেমন?"

সোম বল্ল, "সে সব বইর সারমর্ম্ম যখন গ্রহণ করতে পার না, তখন না পড়াই ভাল। প্রত্যেক লেখকেরই আদর্শ যখন সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সত্য ও সুশ্রীকে মানুষের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের অঙ্গীভূত করে' দেওয়া, তখন সে আদর্শের সত্যের অপলাপ করতে তোমায় হবে না। যখন তুমি সে বই পড়বার যোগ্য হবে তখন পড়ো।"

দীপা বল্ল, "কি? ইউনিভারসিটীর বি-এ'র কোটা

শেষ করলাম আর মোঁপাসার বই পড়বার যোগ্য নই? ও-সব বাজে কথা বলতে এসো না আমার সাম্‌নে।"

সোম বল্ল, "অযোগ্যতার কারণ ত বলে' দিলাম। নভেল ত আর তোমাদের সাময়িক ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের জন্যে সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে নরনারীকে সৎপথে টেনে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভুলচুক যা ধরা পড়ে ও পড়ে না, সেগুলোকে সংশোধন করবার জন্যে।"

দীপা বল্ল, শ্লেষের স্বরে—"কটা লোক সাহিত্য পড়ে' মহাত্মা হয়েছে শুনি, হুঁঃ, বল্‌লেই হল!"

সোম বল্ল, "তবে কি তুমি যে দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছ, এই-গুলো শেখাতেই টেনিসন্, বায়রন্, কীটস্—এঁদের জন্ম হয়েছে? শুধু সোফায় বসে টেনিসনের কবিতা আওড়ান, মোঁপাসার শ্রাদ্ধ করা আর গলস্‌ওয়র্দ্দি, টুর্গেনিভের নাম আওড়ালেই হয় না দীপা।"

দীপা বল্ল, "তবে কি ঐ সব ছেড়ে তোমার রামকৃষ্ণ উপসংহিতা না কি ছাই-পাঁশ পড়ব? বেশ, তোমার যখন এতই সাধ স্ত্রীকে যোগিনী সাজাবার, তখন না হয় একখানা গেরুয়া জড়িয়ে বইগুলো সামনে নিয়ে বসব।"

সোম বল্ল, "বই পড়ে যোগী হওয়া যায় না দীপা। যোগী হওয়ার সৌভাগ্য সকলের হয় না। একজন সামান্য নিরক্ষরও যোগী হতে পারে—সে যদি সে রকম প্রেরণা নিয়ে জন্মায় তবেই। অনাড়ম্বর সাধনাই যোগীর পথ-প্রদর্শক। আমি যাঁকে পূজো করি, যিনি আমার ধ্যান-ধারণা-সর্ব্বস্ব, তিনি ছিলেন নিরক্ষর; কিন্তু তোমার চোখের সাম্‌নে যে এক গভীর অজ্ঞানতার জাল বোনা রয়েছে—যা' থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে তোমাকে জীবন ভোর কঠিন সাধনা করতে হবে—সে অন্ধত্বকে বিনাশ করে' তোমার মনের সংশয় দূর করবার ক্ষমতা আছে তাঁর। বুঝতে পারলে আমার কথা। চল আজ তোমায় বেলুড় মঠেই নিয়ে যাই, সত্যি, তুমি আনন্দ পাবে সেখানে গেলে।"

দীপা বল্ল, "না, আজ রোমিও জুলিয়েটের শেষ দিন। আজ তোমার ও বেলুড়-ফেলুড় যাওয়া চলবে না বলে' দিলাম—"

সোম আর একটি কথাও বল্লে না। ধীরে পাঞ্জাবীর মধ্যে হাত গলিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। ওপরের জানলা দিয়ে দীপা তাই চেয়ে দেখল।

রাত দশটায় বাড়ী ফিরে রাস্তা থেকেই সোম দেখল, গোল-বারান্দায় দীপা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওঃ, এখনও সে ঘুমায় নি তাহ'লে? উপস্থিত ওর কাছে কোনমতেই যাওয়া চলবে না! ভেবে সোম নিজের পূজোর ঘরে প্রবেশ করল। সেখানে যা দৃশ্য দেখলে, তাতে ওর ইচ্ছা হল দীপাকে এখনি হাত ধরে' বাড়ীর বাহির করে' দেয়। স্বামীকে নিজের আজ্ঞাধীন করবার এ কি হীন পন্থা? সোমের উপাস্য দেবতাকে পায়ের তলে ফেলে পীড়ন করে' ও চায় তার মন জয় করতে? ৺রামকৃষ্ণদেবের ছবির কাঁচ টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ভাঙ্গা ছবিখানিকে দুমড়ে মুচড়ে যত রকমে পারা যায়, তার অসম্মান করা হয়েছে। ধূপাধার, পুষ্পপাত্র চারিদিকে ছড়িয়ে থৈ-থৈ করছে—দীপার উন্মত্ত ক্রোধের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক তারা। ঠিক যেন ভূকম্পনের অব্যবহিত পরের ধ্বংসলীলা। পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় যুবক সৌমোন কাঁদবে কি লাফাবে, স্থির করতে পারল না। শুধু দেবতার উদ্দেশ্যে হাত দু'টি সুকরুণ মিনতি ভঙ্গীতে জোড় করে' বল্ল, "অপরাধ নিও না ঠাকুর—তুমি যে দয়াময়!!'

মনভরা অশান্তি নিয়ে সে পেছন ফিরতেই চোখো-চোখী হোল দীপার সঙ্গে। দীপা একটু মুচকে হাস্‌লে।

সোম বল্ল, "মনে ক'রো না যে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে' তুমি আমায় বশে আনতে পারবে। ফল বিপরীতই হবে।"

গর্ব্বমিশ্রিত স্বরে দীপা বল্ল, "ইংরেজ রাজত্বে সব রোগেরই ওষুধ আছে। সেটা তুমিও জেনো।"

বিদ্রূপের সুরে সোম বল্ল, "এত যখন ভক্তি, তখন একটা ইংরেজকে বিয়ে করলেই পারতে।"

দীপা বল্ল, "ঝগড়া রেখে এখন যদি খেতে যাও, তাতে এই মুখ্যু স্ত্রীটাকে একটু উপকৃতই করা হয়।"

সোম বল্ল, "তুমি বুঝি খাওনি এখনও; পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা বলতে হবে!"

দীপা বল্ল, "তোমার হংসরাজকে ভক্তি করি না বলে'

যে পতিভক্তি থাকতে নেই—তার কোন প্রমাণ পেয়েছ নাকি ?"

সোম সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্ল, "আমি ত খেয়ে এসেছি।"

মুখে চোখে অস্বাভাবিক ঘৃণার রেখা অঙ্কিত করে', মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে যেতে দীপা বলে' গেল, "ছিঃ, লজ্জাও করে না, ভিক্ষুকের মত একটা আশ্রমে পাত পাড়তে !"

সোম দোর গোড়াতেই বসে' পড়ে' বল্ল, "দুর্ভাগ্য তোমার, তাই শুধু তুমি ভিক্ষাবৃত্তিই দেখলে! অন্নের মাহাত্ম্য বুঝলে না!"

পরদিন সোম তার গুটিকয়েক বন্ধুকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এল। তার পূজোর ঘরে ঠাকুরের নাম-সঙ্কীর্ত্তন হবে। তারা সবাই শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। খোল-করতাল সহযোগে কীর্ত্তন সুরু হ'ল। সোম মধ্যখানে পট্টবস্ত্র পরে' ঠাকুরের আরতি করতে দাঁড়াল। অপূর্ব্ব আরতির ভঙ্গীতে সবাই মুগ্ধ, উন্মত্ত ভগবৎপ্রেমে সবাই যেন মাতোয়ারা। কিছুক্ষণ পরে সোমের আরতি হয়ে গেল। সঙ্কীর্ত্তন তখনও চলেছে। একবার সে ভাব্‌ল দীপাকে আর একটিবার অনুরোধ করে' দেখবে, এর মধ্যে সে কোনও প্রাণের সাড়া পায় কিনা। উঠে গেল সে।

ওরা তখন গাইছে 'চিন্‌লি না মন সে রূপরতন, অহং ভাবেই রইলি মজে।'

দীপা ছাতের ওপর পায়চারী করছিল। সোম এসে দাঁড়াল তার কাছে—"দীপা, একটিবার চল, ভাল না লাগে উঠে এস—"

দীপা উত্তেজিত কণ্ঠে বল্ল, "তুমি কি আমায় বাড়ী ছাড়া করতে চাও ? একে ত নীচে ঐ ছোটলোকদের মত কাণ্ড বসিয়েছ, তায় এসেছ আমার এই নিরিবিলি শান্তিটুকুও নষ্ট করতে—"

সোম ব্যথিত হৃদয়ে ফিরে এল। তার কাণে বাজছে "চিনলি না মন সে রূপরতন।"

ঠাকুরের বিরাট্ প্রমাণ ছবিখানির দিকে চেয়ে তার দুই চোখ জলে ভরে' উঠ্‌ল।

ভক্তেরা সবাই চলে' গেছে। দীপা সেই ঘরে প্রবেশ করল। ঘরখানার মধ্যে কিছুই দেখা যায় না, খালি ধূপের ধোঁয়া। সে ধোঁয়াজাল ভেদ করে' দেখা যায় শুধু সেই বিরাট্ পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি আর তাঁরই পদতলে সোমের আবেশ-আচ্ছন্ন দেহ।

দীপা ডাকল, "শুন্‌তে পাচ্ছ ?"

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

আবার সে ডাকল, "কত রাত হল, খেয়াল আছে ?"

নীরবতা সমভাবে রইল।

দীপা তখন হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে' সজোরে এক ঠেলা দিয়ে বল্‌ল, "শুনছ না ?"

সোমের তন্দ্রাভাব কেটে এসেছিল। চোখ বুঁজেই বল্ল, "পাচ্ছি, কিন্তু সে তোমার ডাক নয় দীপা, সে তাঁর —তাঁর করুণাময় আহ্বান, তাঁর সহৃদয় বাণী!"

দীপা বল্ল, "আর আমি কি তোমার কেউই নই ?"

সোম বল্ল, "হতে পারতে হয়ত সবই, কিন্তু হলে না যে কিছুই। আমার জন্যে তুমি কতটুকু ত্যাগ করতে পার ?"

দীপা বল্ল, "সর্ব্বস্ব।"

সোম বল্ল, "তোমার মনের সে শক্তিই যদি থাকবে, তবে তুমি স্বামীকে আঘাত করতে দ্বিধা বোধ কর না কেন ?"

দীপা বল্ল, "আচ্ছা, এ তোমার কি অদ্ভুত আচরণ ? জোর করে' তুমি আমায় দিয়ে কিছুই করাতে পারবে না। আর স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কেনই বা এই তৃতীয় জনকে আনা ?"

"ঐ তৃতীয় জনের মধ্যেই যে আমি নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছি।"

"তবে আমার জীবনটাকে দুঃখের আগুনে আহুতি দেবার সঙ্কল্প কেন করেছিলে ? আমাকে জব্দ করাই কি তোমার উদ্দেশ্য ?" উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ কোন প্রকারে সামলে নিয়ে দীপা উঠে গেল।

খাটের ওপর নির্জ্জীব অবস্থায় পড়ে' আছে সোম। অনুজ্জ্বল কক্ষ। অদূরাগত মৃত্যুর ভয়াবহ আব্‌হাওয়ায় ঘরটি যেন থম্‌থম্ করছে। চারিদিকে নেমে আসছে অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য। আজ কয়েক দিন সোম শয্যাশায়ী। থেকে থেকে নিঃশ্বাস নিচ্ছে—কিন্তু তাও যেন কত যন্ত্রণাময়

ভাবে। দীপা স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে মুখের দিকে চেয়ে। দীপার মনে দ্বি-ভাব জাগে। একবার ভাবে—হয় ত বা তার জন্যেই সোমের আজ এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দিন কাটছে। ডাক্তার বলেছেন, কোন গভীর মনোবেদনায় এই রকম হয়েছে। আচ্ছা, না হয় মেনে নিল এ ভগবানের লীলাই সব। আবার বিরুদ্ধভাব বলে—কেন? দীপা, এত সহজেই তোমার পরাজয়? তোমার ইচ্ছাশক্তিকে এত অল্পেই খর্ব্ব করবে?

দ্বন্দ্বযুদ্ধে দীপা নিদারুণ শ্রান্ত হয়ে পড়ে।

সোম অস্ফুটস্বরে ডাকে, "দী-পা—"

দীপা জলভারানত নয়নে ঝুঁকে পড়ে ওর বুকের ওপর—"কি বলছ?"

সোম দীপার মাথায় হাত রেখে বলে, "আশীর্ব্বাদ করি, মিথ্যা আত্মাভিমান যেন তোমার দূর হয়ে যায়। নিজের স্বরূপকে চিনতে পারনি, ভগবানকে অপমান করে', করলে তুমি নিজের সর্ব্বনাশ—" বাকীটা দীপা শুনতে পায় না। এক রকম দৌড়ে সে পাশের পূজার ঘরে যায়। ঠাকুরের পায়ের তলায় আছড়ে পড়ে বলে, 'হে ভগবান, আমার ভ্রান্তি আমার অবজ্ঞাই কি আমার কাল হল? না, ঠাকুর! তুমি যে দয়ার আধার। ওগো, নিষ্ঠুর পরিহাস রাখ। কেমন করে' তোমায় ভক্তি করব, শেখাও আমায়! ফিরিয়ে দাও আমার সর্ব্বস্বকে!" তার সে অন্তরের দীন ব্যাকুলতায় বাতাস বোধ করি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মৃদু মর্ম্মরধ্বনি তুলে' সে আশ্বাস দিল যেন, "ভয় নেই—ভয় নেই!" কিন্তু কোথায়? এখনও ত সে আশ্বাস-বাণী মূর্ত্ত হয়ে উঠল না! ঘরের দুর্য্যোগকে ডুবিয়ে দিয়ে বাইরের রুদ্রতা যে আরও বেড়ে উঠ্‌ল। তবে কি সত্যই প্রকৃতির দুর্য্যোগের সঙ্গে হবে দীপার জীবনে ভরাডুবি? তীব্র বিজলী-ঝলকের সঙ্গে দীপা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ল।

জ্ঞান হবার সঙ্গে কার মৃদুস্পর্শে দীপা চোখ তুললে, "কে তুমি? ওকি, তোমার যে জ্বর!"

অবশ দেহে দীপার পাশে বসে' পড়ে' সোম বল্‌ল, "আমার সাধনা আজ এতদিনে সফল হ'ল দীপা! আমার জ্বর, আমার জ্বালারও এতদিনেই হ'ল অবসান!"

অপরাধীর মত সৌম্যেনের বুকে মুখ লুকিয়ে দীপাও আজ কাঁদবার অবসর পেল।

প্রাণের সাধন

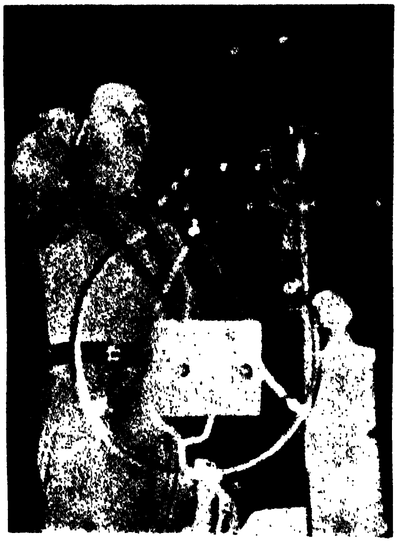
শ্রীইন্দুবালা রায়

পূজারী কহিছে "প্রভু, দাও না দেখা একটী বার।"
ঠাকুর বলেন "হিয়ার মাঝে চাও না খুলে চোখ্ তোমার।
ভক্তে আমার আমিই আছি, বাহিরেতেও সর্ব্বময়—
'একাংশেন স্থিতো জগৎ', আমি ছাড়া কিছুই নয়।
জলে আমি, স্থলে আমি, ভূতে ভূতে আমি প্রাণ;
বক্ষে তোমার প্রেমে আমি প্রভুরূপে অধিষ্ঠান।
ব্রহ্ম আমি, বিরাট্ আমি, জ্যোতিঃরূপে যোগীর ধন—
জরা-ব্যাধির বুকে ঢালি শান্তি আমি সেই মরণ।
আকাশে উজল করা বর্ণ-বিভব সেও তো মোর—
ফাগুন রাতে প্রিয়ার চোখে বঁধুর লাগি ব্যথার লোর।
মধুপ্রেমের মৃদুভাষণ, প্রীতিঢালা তিরস্কার—
প্রিয় আমার বড়ই প্রিয়, ব্রজের লীলা সেই আমার।
বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আমি, নবদ্বীপের বিশ্বম্ভর,
অরূপে যে পাও না ধরা, তাই সেজেছি সুন্দর!
ভাবনা ভাবের থাক্‌লে আমার, থাক্‌লে প্রাণের আকিঞ্চন—
পাবেই আমায়, পাবেই ধরা, সেই যে আমার সত্য পণ।
ওগো জ্ঞানী, ভক্ত, প্রেমিক, 'মামেকং শরণং ব্রজ'—
জ্ঞানে তোমার, প্রেমে তোমার, কাজের মাঝে আমায় খোঁজ।
চোখে বুকে ধ'রে আমায় পলে পলে পূজা কর—
বাহিরে অন্তরে আমি, আমায় ধর, আমায় ধর।
গীতার মাঝে জ্ঞানের সাধন, ব্রজের সাধন প্রেমলীলা—
প্রবর্ত্তকের প্রাণের সাধন বানরে ভাসায় শিলা।
সাধন-লীলার রঙ্গ মাঝে সঙ্গ আমার পাবেই তবে—
যেদিন তোমার নবজীবন, ভগবানে মরণ হবে।"



হিট্‌লারের অষ্ট্রিয়া অভিযান—

চারি বৎসর ষড়যন্ত্র এবং কূটনীতির অনুসরণ করিয়া হিট্‌লার তাঁহার জন্মভূমি অষ্ট্রিয়াকে গত ১২ই মার্চ্চ জার্ম্মানীর পতাকাতলে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার জন্য রক্তপাতের প্রয়োজন হয় নাই, ইউরোপের সমরক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের পুনরভিনয় ঘটে নাই।



'বৃহত্তর জার্ম্মানী' সম্বন্ধে বক্তৃতারত হিট্‌লার

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানী ছিল ইউরোপের একটী শক্তিশালী রাজ্য। যুদ্ধাবসানে ইহার ২৭ হাজার বর্গ মাইল পররাষ্ট্রভুক্ত হইয়া যায় এবং ৭০ লক্ষ অধিবাসী জার্ম্মান পতাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরাজয়ের এই কলঙ্ক ললাটে লিখিয়া জার্ম্মানী সেদিন পৃথিবীর দ্বারে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। কর্সিকার এক অজ্ঞাত সৈনিক যেমন একদা ছত্রভঙ্গ ফরাসী রাজ্যকে পুনর্গঠন করিয়া জগতেতিহাসে আপনার নাম মরণজয়ী করিয়া গিয়াছেন, হায় হিট্‌লারও তেমনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের বিজিত জার্ম্মানীর দুঃখ বুকে লইয়া তাঁহার নাৎসীসেনা রচনা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের মত হিট্‌লারও ছিলেন রণ-প্রত্যাগত এক অজ্ঞাত সৈনিক। রণভূমিতে বীরত্ব দেখাইবার জন্য দুই একবার তাঁহার নাম উল্লিখিত হইলেও, হিট্‌লার একজন নগণ্য সেনা ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। তারপর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নাৎসী-সেনার সাহায্যে তিনি জার্ম্মানীর রাষ্ট্র-নায়করূপে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। একদা লাঞ্ছিত জার্ম্মানী পুনরায় আত্মসম্মান ফিরিয়া পাইল।





অনুকূল জনমত গঠনের অন্যতম নিগূঢ় কারণ হিট্‌লারের আবেগপূর্ণ বক্তৃতাভঙ্গী

আল্‌সাস্-লোরিন্‌, সেসেল্‌, পোসেন্‌, ড্যান্‌জিগ, উত্তর সাইলেসিয়া, প্রাশিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট প্রভৃতি যে সকল রাজ্য জার্ম্মানী হারাইয়াছিল, শাসনভার হাতে লইয়া




হিট্লার (বর্ত্তমান ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তাদ্বয়) মদদৃপ্ত মুসোলিনী

তাহাদের উদ্ধার এবং জার্ম্মান ভাষাভাষী দেশগুলিকে জার্ম্মান-রাষ্ট্রভুক্ত করার প্রচেষ্টায় হিট্লার মনোযোগ দিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর আয়তন ছিল ২৪০, ৪৫৬ বর্গ মাইল; এই মহারাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৩১,৭৫৬ বর্গ মাইল লইয়া আধুনিক অষ্ট্রিয়া গঠিত হয়। ইহার শতকরা প্রায় ৯৭ জন লোক জার্ম্মান ভাষায় কথা বলে, বাকী অধিবাসীরা ক্রোটস্ শ্লোভেনিস্, জেক্স্ এবং মেগীয়ারস্। মহাযুদ্ধের অবসানে রাজ্য বণ্টন-নীতিতে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল; কিন্তু অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণভাষী হইলেও, শাস্তিস্বরূপ ইহাকে জার্ম্মানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে দেওয়া হয় নাই। হিট্লার তাঁহার জন্মভূমিকে জার্ম্মানীর সহিত যুক্ত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। প্রকাশ্যে ইহা সম্ভব না হইলেও, গোপনে এই ষড়যন্ত্রই চারি বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে—তাঁহার আত্মচরিতেও (My struggle) এই কল্পনাই আছে। চেকোশ্লোভেকিয়া, সেসেল, সুইজার-ল্যাণ্ড প্রভৃতি যে সকল জনপদগুলিতে জার্ম্মাণভাষীর বাস, তাহাও বৃহত্তর জার্ম্মানীর কল্পনা-চিত্রে হিট্লার আঁকিয়া রাখিয়াছেন—সুযোগের প্রতীক্ষায়।

জার্ম্মানীর রাষ্ট্রশক্তি হাতে পাইয়া হিট্লার ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই অষ্ট্রিয়ায় নাৎসী আন্দোলন চালাইতে থাকেন। নাৎসী আন্দোলনের পরিপন্থী ডাঃ ডলফাস্ এই বৎসরেই জার্ম্মান গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হন। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা-রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প ইতালী সুসজ্জিত ইতালীয়ান বাহিনী লইয়া ব্রেণার গিরিসঙ্কটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, হিট্লার সেদিন ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হন। ডাঃ কার্টজন শুশ্‌নিগ অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার হইলেন। ১৯৩৬

খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে একটি চুক্তিতে অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য জার্ম্মানী মানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু নীতিতে অষ্ট্রিয়া যে জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ, তাহা অষ্ট্রিয়া স্বীকার করে। এ দিকে ইতালী আবিসিনিয়া-যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িলে, অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য তাহার সাহায্যের পথ বন্ধ হইয়া যায়—ইংরাজ এবং ফরাসীর ক্ষীণ প্রতিবাদে হিট্‌লার কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

ইতালী জার্ম্মানীকে অষ্ট্রিয়ায় যে সুবিধা দিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে হিট্‌লার তাহাকে ভূমধ্য সাগরে আধিপত্যবিস্তারে নিশ্চয় সহায়তা করিবে।



অষ্ট্রিয়ার পথে হিট্‌লার জনসাধারণের অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন

গত ১২ই মার্চ্চের অভিযানের নাটকীয় ক্ষিপ্রতায় জগৎ বিস্ময় মানিয়াছে। মোটর-বোঝাই পদাতিক, বিমান-বাহিনী, আকাশযান, বিধ্বংসী কামান এবং কিয়েলখাল অভিমুখে ধাবমান একটী নৌবহর লইয়া জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া অধিকৃত করিয়াছে। ডাঃ শুশনিগ ১৩ই মার্চ্চ রবিবার জনমত-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে জনমত ঘোষিত হওয়ার পূর্ব্বেই অষ্ট্রিয়া দখল করা প্রয়োজন। হিট্‌লার ডাঃ শুশনিগকে পদত্যাগ করিতে বলেন এবং প্রস্তাবিত জনমত গ্রহণ রহিত করিতে নির্দ্দেশ দেন। জনমত-গ্রহণ বন্ধ করা হয়, কিন্তু চ্যান্সেলরগণ পদত্যাগে অসম্মত হন। তিন ঘণ্টা উত্তরের জন্য সময় দিয়া, জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়ার দ্বারে আসিয়া হানা দেয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ভাবিয়াছিল, ইতালী তাহার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, জার্ম্মানীকে অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশাধিকার দিবে না। তাহারা আজ নির্ব্বুদ্ধিতার চরম উদাহরণ দেখাইয়া জগতের কাছে হতমান হইল। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য ইউরোপের মানচিত্র হইতে মুছিয়া গেল।

লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ড—

ইউরোপের আশঙ্কা-সঙ্কুল অবস্থার আশ্রয় লইয়া গত ১৮ই মার্চ্চ পোল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়ার নিকট একখানি চরম-পত্র প্রেরণ করিয়া ৪৮ ঘণ্টা উত্তরের সময় দেয়। এই পত্রে পোল্যাণ্ডের ছয়টী দাবী মানিয়া লওয়ার আদেশ লিথুয়ানিয়ার উপর ছিল। হিট্‌লার তাঁহার অষ্ট্রিয়া-ভিযান সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "আমার সিদ্ধান্তের পশ্চাতে ছিল ৭½ কোটী জার্ম্মানবাসী, আর তাদের পুরোভাগে সজ্জিত জার্ম্মান সেনা।" পোল্যাণ্ডও এই হিট্‌লারী পন্থা অনুকরণ করিয়া লিথুয়ানিয়ার সীমান্তে সৈন্য-সামন্ত লইয়া দাবীর গুরুত্ব জানাইয়া দিতেছিল। সুতরাং অসন্তোষের অগ্নি অন্তরে ঢাকিয়া লিথুয়ানিয়া দাবীগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান—পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ-স্থাপন, রেল এবং বিমান চলাচলের পুনরারম্ভ এবং পোল্যাণ্ড অধিকৃত ভিলনাকে শাসনতন্ত্রে লিথুয়ানিয়ার রাজনগরী বলিয়া আখ্যার পরিবর্ত্তন। বাহিরের দিক্ দিয়া এই দাবীগুলি তেমন মারাত্মক নহে। কিন্তু এখানে যে অশান্তির অঙ্কুর রোপিত হইল, তাহা পরিণামে বিপদ্ ডাকিয়া আনিতে পারে। ইউরোপের অবস্থার শীঘ্র পরিবর্ত্তন না ঘটিলে, হিট্‌লার-প্ররোচিত পোল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়াকে গ্রাস করিতে বিমুখ হইবে না—এরূপ আশঙ্কা করা যায়। ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের অংশ

মেমেল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে লিথুয়ানিয়ার অধিকারে আছে। ইহার অধিবাসী অধিকাংশই জার্ম্মান। অচিরে জার্ম্মান শক্তির প্রতিবন্ধক জন্মাইতে না পারিলে, পোল্যাণ্ডের সহিত চুক্তি করিয়া হিট্‌লার যে মেমেল উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত হিট্‌লারের আশ্বাসে নির্ভর করিয়াই পোল্যাণ্ড জোর করিয়া লিথুয়ানিয়ার উপর রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিল। জার্ম্মানীর অষ্ট্রিয়াধিকারের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিয়া পোল্যাণ্ডও একদিন লিথুয়ানিয়া গ্রাস করিতে পারিবে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লিথুয়ানিয়া রুষের অধীন ছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে লিথুয়ানিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এক বৎসর পরে মিলিত শক্তির সুপ্রীম কাউন্সিল লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে যে সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তদনুযায়ী ভিল্‌না লিথুয়ানিয়ার অধিকারে আসে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ভিলনা পুনরায় দখল করিয়া লয়। এই ঘটনা লইয়া লিথুয়ানিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে। লিথুয়ানিয়ার আয়তন প্রায় ৬০ হাজার বর্গ মাইল, লোক-সংখ্যা ৫০ লক্ষ।

মেমেল বাল্‌টীক সাগরোপকূলে একটী প্রধান বন্দর, পোল্যাণ্ডের এই বন্দর ব্যবহার করার অধিকার আছে। জার্ম্মানী এবং পোল্যাণ্ড হইতে রিগা উপসাগরে যাইতে হইলে, লিথুয়ানিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং ছোট রাস্তা। এই সকল কারণে লিথুয়ানিয়ার সমস্যা যে ভবিষ্যতে জটিলতর হইয়া উঠিবে, তাহার সূত্রপাত হইল।

অষ্ট্রিয়ার নাৎসী নৃশংসতা—

অষ্ট্রিয়ায় মরণ-দেবতার প্রলয়-তাণ্ডব সুরু হইয়াছে। নাৎসী নৃশংসতার কঠোরতায় ১,৭০০ লোক হত এবং আত্মঘাতী হইয়াছেন। অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলর এবং জাতীয় সঙ্ঘের নেতা মেজর এমিল ফে সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছেন। ডাঃ শুশনিগ্‌, প্রিন্স ষ্টার হেমবার্গ, বিশ্ব-বিখ্যাত প্রোফেসর ফ্রয়েড্‌ প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির স্বাধীনতা বিপন্ন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীতে যে নাৎসী হত্যাকাণ্ড অভিনীত হইয়াছিল, অষ্ট্রিয়ার তুলনায় তাহা নগণ্য। অষ্ট্রিয়ার প্রায় ২ লক্ষ ইহুদী আজ পথের ভিখারী। আধুনিক সভ্যতার যুগে এ ইতিহাস বিশ্ব-মানবতার কলঙ্ক।



ষ্টালিন



ডাঃ শুশনিগ

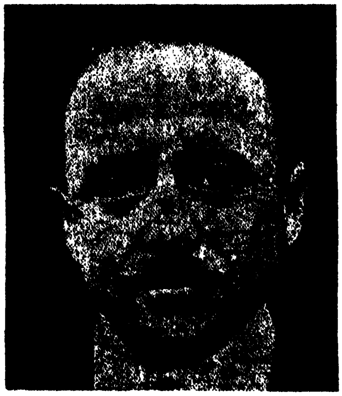
চেকোশ্লোভেকিয়া—

অষ্ট্রিয়া অধিকার করার সাথে সাথে চেকোশ্লোভেকিয়ায় নাৎসী আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন মুহূর্ত্তে জার্ম্মানী যে চেকোশ্লোভেকিয়া পিষিয়া ফেলিতে পারে, অষ্ট্রিয়ার পরিস্থিতি তাহার অনুসূচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভিয়েনার পুস্তকের দোকানে যে নূতন মানচিত্র বিক্রয়ের জন্য আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপের জার্ম্মাণ-ভাষী দেশগুলি সবই লাল রঙে রঞ্জিত



মেজর কে

করা হইয়াছে। আলসাস্-লোরিণ, সুইজারল্যাণ্ডের জার্ম্মানভাষী অংশ, দক্ষিণ টাইরল এবং চেকো-শ্লোভেকিয়ার কতকগুলি অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি সবই হিট্‌লারের কাম্য। চেকোশ্লোভেকিয়া তাই ভীত হইয়া উঠিয়াছে।



ডাঃ ডলফাস

রুশিয়া এবং ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, জার্ম্মানী চেকোশ্লোভেকিয়া আক্রমণ করিলে, তাহারা চুক্তি-অনুযায়ী সকল রকম সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছে। কিন্তু রুশিয়ায় ষ্টালিন আজ ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত, ফ্রান্সেরও নিজের সমস্যা মিটে নাই। স্থিৎ করিয়া বলা যায় না।



ক্যাপ্টেন গোয়েরিং

সিন্ধু মন্ত্রি-সভার পতন—

ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট আলোচনায় একটী ছাঁটাই প্রস্তাবে ২৩-২২ ভোটে পরাজিত হইয়া সিন্ধুর মন্ত্রি-মণ্ডলী পদত্যাগ করিয়াছেন। খান্ বাহাদুর আল্লাবক্স (প্রধান মন্ত্রী)। পীর এলাহিবক্স এবং মিঃ নিকোলদাস সি ভাজিরানীকে লইয়া নূতন মন্ত্রি-মণ্ডল গঠিত হইয়াছে। খান্ বাহাদুর এবং পীর সাহেব মিলিত দলের সভ্য; মিঃ ভাজিরানী স্বতন্ত্র হিন্দু দলের সদস্য।

সিন্ধু ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা ৬০। হিন্দু এবং মিলিত দলের মোট শক্তি মাত্র ২২। সুতরাং এই মন্ত্রি-মণ্ডল কংগ্রেস দলের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়াই মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। কংগ্রেসদল উদারনীতিক দেশহিতৈষী কাজে ইহাদের বিরোধিতা করিবে না। নূতন মন্ত্রিগণ ৫০০৲ টাকার বেশী বেতন লইবেন না, তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবেন। তাঁহারা খাদি পরিয়া অফিসে আসিতেছেন।

"আনন্দবাজার পত্রিকা" কার্য্যালয়ে একদিন

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

সংবাদ-পত্রকে "চতুর্থ শক্তি" বলা হয়—ইহা জাতির কণ্ঠ-স্বরূপ। সংবাদপত্র জাতীয় জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিফলিত করে, আবার তাহা লোক-মত গঠন করিতেও পারে। ইহা জাতি-চিত্তের নিখুঁৎ দর্পণ—জাতির যাহা আশা, আকাঙ্খা, অন্তরের চাওয়া, বাহিরের ঘটনা, উন্নতি, অগ্রগতির নিরিখ, কুসংস্কার ও দৌর্ব্বল্যের অভিব্যক্তি—সবই ইহাতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। জাতি যেন ইহার সাহায্যে আপনাকে আপনি দর্শন করিয়া, অনুভব করিয়া, চোখ চাহিয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার আলো ও সুযোগ পায়। তাই ইহার প্রয়োজন আজ অন্ন-পানীয়ের মতই অপরিহার্য্য। আর শক্তিশালী সংগঠন-প্রতিভা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলে, এই সাংবাদিক-যন্ত্রই লোক-চিত্তে নূতন চিন্তা ও সাধনার খাদ্য যোগাইয়া স্বচ্ছ, সবল অভিমত-সৃষ্টি ও জাতীয় ইচ্ছা সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারে।



সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার



প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা মাখনলাল সেন

বাঙালার সাংবাদিকতার ইতিহাসে জাতীয় জীবনেরই বিবর্ত্তনের আলেখ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। "প্রভাকর" বা "সমাচারদর্পণের" যুগ হইতে "সন্ধ্যা" "যুগান্তরের" যুগ পর্য্যন্ত একটানা স্রোতঃ নহে—বিচিত্র প্রবাহ—ক্রমোন্নতির দীর্ঘ পথ এ জাতি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। জাতীয় মন-বুদ্ধি ইহার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ যেন মুক্তি পাইয়াছে। সংবাদপত্রে তাই মুক্তি-সংগ্রামেরই জয়-যাত্রার পদ-চিহ্ন। এই মুক্তি-সংগ্রামের অধুনাতন জয়কেতন লাঞ্ছিত করিয়া "আনন্দবাজার পত্রিকার" সাংবাদিক-ক্ষেত্রে প্রবেশ "যুগান্তরের" পরবর্ত্তী নূতন যুগান্তরেরই সূচনা করে।

জাতীয় জীবনে আজ "আনন্দবাজার পত্রিকা" সমুন্নত শক্তি-স্তম্ভ। শুধু পত্রিকার প্রচার-বাহুল্যে নহে—পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা জনসাধারণে তাহার আদর ও ব্যাপ্তিরই বড় লক্ষণ বটে—এই দিক্ দিয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা" ইহার পূর্ব্বগামী সকল দৈনিক বাঙালা সংবাদ-পত্রকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়াছে—"যুগান্তরের" ঊর্দ্ধসংখ্যা প্রচার হইত ৭০০০ — ৮০০০ কিন্তু বাঙালার বিপ্লব-যুগের পর, শক্তি-সাধনার যে দ্বিতীয় স্তর আসিয়া পড়িল, সেই স্তরে মুক্তির উপাসক বাঙালীজাতি হিংসার বজ্রাগ্নির চেয়ে অমোঘ আর এক অধ্যাত্ম-আয়ুধ যাহা সে আবিষ্কার করিয়াছিল চারি শতাব্দী পূর্ব্বে, বাঙালার মহাবতার নবদ্বীপচন্দ্রের সেই নিরস্ত্র প্রেম-সংগ্রামের নীতি পুনঃ প্রয়োগ করিতে যখন উদ্যত হইল, তখন এক ফাল্গুনী দোল-পূর্ণিমার দিনেই সেই বঙ্গ-গৌরব মহাপ্রেমিকের পুণ্যস্মৃতি অঙ্গে লেখা দিল "আনন্দবাজার পত্রিকা" মুক্তিরই শঙ্খধ্বনি তুলিয়া—সেদিন নব-ভারতের বুকে নবীন যুগ-শক্তির লীলারঙ্গ আরম্ভ

হইয়া গিয়াছে—তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী কারাবরণ করিয়া বন্ধনকেই মুক্তির জন্ম-তীর্থ করিয়া তুলিয়াছেন সেইদিনই। "আনন্দবাজার পত্রিকার" এই স্মরণীয় আবির্ভাব আজও আমাদের স্মৃতি-পট হইতে মুছিয়া যায় নাই।

তারপর দীর্ঘ যুগাধিক কাল এই মুক্তি-বাণীর পূজারী একনিষ্ঠ পূজা-সম্ভারে দেশরাণীর চরণে অর্ঘ্য ঢালিয়া আসিয়াছে। ক্লান্তিহীন অভিযান—রুদ্রের বজ্রপাতে সাময়িক স্তব্ধ হইলেও, রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় তাহা আবার দ্বিগুণ তেজোগর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে। বাঙালার জনসাধারণেরই মর্ম্মবাণী বহন করার আকূতি লইয়া যাহার অভ্যুদয়, তাহা জন-সাধারণ আপন বলিয়াই চিনিতে বিলম্ব করে নাই—তাই এই জন-গণ-মনোবাণী লইয়া "আনন্দবাজার পত্রিকার" মুক্তির তূর্য্যধ্বনি আজ অর্দ্ধ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে প্রতি প্রভাতে ঝঙ্কার তোলে—ধ্বনিত করে আশার রাগিণী—সারা বাঙালার মর্ম্ম-চিত্র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, ছত্রে ছত্রে রেখাঙ্কিত করিয়া তোলে। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র এই কৃতিত্ব, এই সাফল্য, তাহার অসাধারণ ব্যাপ্তির ন্যায় অসংখ্য প্রাণে — বাঙালী মাত্রের মর্ম্মে মর্ম্মে—আনন্দ ও গৌরব সঞ্চারিত করে। ভারতীয় সাংবাদিক-জগতে তাহার এই অদ্বিতীয় কীর্ত্তি-গরিমা ভবিষ্যৎকে আরও বৃহত্তর সিদ্ধির তপস্যায় অনুপ্রাণিত ও উদ্‌যুক্ত করিবে।

এই মহতী সৃষ্টির মূলে যে মহাপ্রাণ, তাহারই পরিচয় লইবার সাধ বহুদিনের। সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথকে তরুণ জীবনেই চিনিতাম—তিনি আমাদের আশ্রমেই আসিয়াছিলেন—সে "আনন্দবাজার পত্রিকার" প্রবর্ত্তনের বহু পূর্ব্বে। সেদিন কি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ লইয়া তাঁহাকে "প্রবর্ত্তক"-সাহিত্যের অধ্যয়ন ও মর্ম্মানুধাবন করিতে দেখিয়াছিলাম। আজ তাঁহার অগ্নিময়ী লেখনী পত্রিকার স্তম্ভে স্তম্ভে প্রতিদিন যে লেখা অঙ্কিত করিয়া তুলে, তাহার প্রত্যেক ছত্র পড়িয়া আশা ও আনন্দের শিহরণই অন্তরে দুলিয়া উঠে। সত্যেন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ সম্পাদনা "আনন্দবাজার পত্রিকার" অন্যতম জয়-গৌরব ও অভিনন্দনের বস্তু।



পত্রিকা-কার্য্যালয়ে রোটারী প্রেস চলিতেছে

তারপর, অসাধারণ কর্ম্মবীর মাখনবাবু আমাদের একান্ত সুপরিচিত হইলেও, কর্ম্মগত ব্যবধানে দীর্ঘদিনের অদর্শন। মনে ছিল বুঝি একটু আশঙ্কা—এতদিনের পরও তাঁহার কি তেমনি করিয়া আমাদের মনে আছে? স্বদেশী-যুগ ও বিপ্লব-যুগ—উভয় যুগ-পর্ব্বের বিরাট্ নেতা—পূর্ব্ববঙ্গের বিপ্লবী তরুণদলের অধিনায়ক—বর্দ্ধমান-বন্যার বাঙালীর প্রথম সঙ্কটত্রাণ অভিযানের প্রথম সংগঠনকারীরূপে সেদিন ইঁহার মধ্যে যে অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি ও সংগঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া শুধু আমরা নয়, সমগ্র বাঙালাদেশ ও রাজকর্ত্তৃপক্ষ মুগ্ধ বা বিস্মিত হইয়াছিল—যুগের আবর্ত্তনে ও পরিবর্ত্তনে তাঁহার সেই কর্ম্ম ও সংগঠনপ্রতিভা শুধু ক্ষেত্রপরিবর্ত্তন করিয়াছে, পরন্তু নীতি ও ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করে নাই—যাহা ছিল সেদিন অঙ্কুরমান, অর্দ্ধবিকশিত, তাই গোপনে বা অজ্ঞাতসারে নীরবেই ফুটিতেছিল, তাহাই আজ প্রকাশ্য দিবালোকে, রাজধানীর মহাকেন্দ্রে

এমন এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে—যাহা বাঙালীর বিস্ময়, অসংখ্য মানুষের গর্ব্ব ও গৌরবেরই সামগ্রী—জাতি-নির্ম্মাণেরই এক অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র। ইহাতে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই—ইহা যে তাঁর স্বাভাবিক বিবর্ত্তন—তাঁর অলৌকিক কর্ম্মযোগেরই বিভূতি! তবু ভাবনা ছিল—এই মহাকর্ম্মীকে, তাঁর শত কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যে, কাজ ও লোকের ভীড়ে এই এতদিন পরে কি তেমন করিয়া হৃদয় দিয়া নিবিড়ভাবে পাওয়া যাইবে! ফোনে দেখা করিতে যাইবার ইচ্ছা জানাইয়া সময় স্থির করা হইল। যথাসময়ে আমরা কয়েকটী সঙ্ঘ-কর্ম্মী পূজনীয় মতিবাবুর সহিত আনন্দবাজারের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলাম। দরদীর অভিনন্দনে, প্রীতির প্লাবনে তিনি আমাদের সত্যই ভাসাইয়া দিলেন। বুঝিলাম—অনাবিল প্রেমের, প্রীতির সম্বন্ধ স্থান, কাল, কর্ম্মের ব্যবধানে ঘুচিবার নহে—ইহা অনাহত, শাশ্বত।

অনেক দিনের পর মাখনবাবুকে দেখিয়া আমরা যেমন আন্তরিক পুলকিত ও উল্লসিত হইয়াছিলাম, তিনিও যেন উচ্ছ্বসিত আবেগে, উল্লাসে আমাদের লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রেম-স্মৃতি বড় অনুপম, অনবদ্য!

মাখনবাবুর সহিত সেদিন দুই তিন ঘণ্টা আলাপ হইল। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের খুঁটিনাটি সংবাদ তিনি গ্রহণ করিলেন—আনন্দবাজার পত্রিকার অভাবনীয় উন্নতির ইতিহাস তাঁহার মুখে শুনিলাম। মাখনবাবু বলিলেন—এই গৌরবজনক জাতীয় মহানুষ্ঠানের সৃষ্টি ও সংগঠনে কিন্তু এই চির-কর্ম্মনিষ্ঠ আত্মার একটা তৃপ্তির সুর যেন তাঁর কণ্ঠে খুঁজিয়া পাইলাম না—তৃপ্তি যেন অতৃপ্তির মধ্যে বিষাইয়া উঠিয়াছে—অবসাদ ও নৈরাশ্যের আবেগে তিনি বলিলেন—"ভাই মতিলাল, যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না! এ যেন শুধু আড়ম্বর—প্রাণ নাই—জাতিকে প্রাণ দিতে পারিলাম না! বাঙালার মূলমন্ত্র যে তার কাল্‌চার, সেই জাতীয় কৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া যায়—বিঘ্নরাজ তাহা তিলে তিলে যুগপ্রভাবে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ, নিঃশেষ করিয়া দিতে চায়—বিরাট্ মহাপ্রাণ অজগরকে ঠেঙ্গাইয়া ঠেঙ্গাইয়া নির্জ্জীব করিয়া ফেলিয়া, কালপুরুষ শুধু এক একবার নাড়িয়া চাড়িয়া পরখ করিয়া লয়—এখনও সে বাঁচিয়া আছে কি না! কিন্তু বাঙালার নবীন তরুণদের দেখিয়া আশা হয় না—তারা গভীর আত্মদানে এই মুমূর্ষু জাতি-প্রাণ, তার মৌলিক কাল্‌চারকে রক্ষা করিতে পারিবে—তাই বড় অবসাদ আনে, নৈরাশ্যে বুক ভরিয়া যায়—আমার যাহা চিরদিনের সাধ—একান্ত কাম্য—বাঙালীর সেই ভাব-বৈশিষ্ট্য-রক্ষার জন্য কিছুই ত করিতে পারিলাম না!"

এ গভীর হৃদয়োত্থিত নৈরাশ্যের সুর হৃদয় আমাদের সত্যই আলোড়িত করিয়া তুলিল।

মাখনবাবু বলিয়া চলিলেন—"কর্ম্ম যেন ভূত হইয়া কাঁধে চাপিয়াছে। আবার একটা ভূত—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড—সেও অল্পদিন হইল সিন্ধবাদের মত কাঁধে চড়িয়া বসিয়াছে—মনে হয় ছুটিয়া পালাই এই সব ব্যর্থ আড়ম্বর থেকে—সত্যই যাহা জাতিকে বাঁচাইবার কাজ—তাহার ভাবাদর্শ রক্ষা করার সাধনায় আর একবার নূতন করিয়া ঝাঁপ দেই—কিন্তু আরব্ধ কর্ম্ম অষ্ট নাগপাশে ঘিরিয়া আছে, এ বন্ধনে সে সাধ পূর্ণ হইবে কি না, জানি না!"

অসাধারণ কর্ম্ম—সিদ্ধ কর্ম্মীর মনের তলে এই কর্ম্ম-জীবনের সীমা ছাড়াইয়া ভাব-সাধনার দিকে সুগভীর আকর্ষণ ও তজ্জনিত যে অপূর্ব্ব নৈরাশ্য, ইহাও অসাধারণ। মর্ম্মী ভিন্ন কে ইহার মর্ম্ম বুঝিবে! মনে হইল—উপাধ্যায়ের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের শেষ কথা—"ভাই ভবানী, কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিতে চাই, অন্য ডাক যেন কাণে বাজিতেছে!"

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। এইবার উঠিতে হইবে। মাখনবাবুকে কার্য্যালয়টী একবার আমাদের ঘুরাইয়া দেখাইয়া আনিবার জন্য বলিলাম। বিরাট্ দৈত্যের মত মহাযন্ত্র ঘুরিতেছে। তার প্রতি শ্বাসে শ্বাসে বিগলিত লক্ষ লক্ষ কাগজ বাহির হইতেছে। এক নিমেষে বিগলিত সীসা জমিয়া প্রবর্ত্তকের নাম-লেখা অক্ষরমালা যন্ত্র ঘুরিয়া বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে অগ্নিময় কর্ম্মতরঙ্গ—যেন মহাযন্ত্র চতুর্দ্দিকে লক্ষ ফণা বিস্তার করিয়া মহাকায় অজগরের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করিতেছে। এই বিপুল ও বিচিত্র কর্ম্মশালা সত্যই একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার ক্ষেত্র।

তারপর পত্রিকার কার্য্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক ও রাষ্ট্রীয় গ্রন্থশালা দেখিয়াও কম তৃপ্তি পাইলাম না। এই সঙ্গে সংস্কৃত গ্রন্থশালা—ইহাই মাখনবাবুর নূতম উদ্যম—শেষ জীবনের অভিনব পরিকল্পনা। এইবার তিনি উচ্ছ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"এই আমার শেষ জীবনের সাধ—যদি কৃষ্টি-রক্ষার একটা তীর্থ রচনা করিয়া যাইতে পারি। চপলার উপর ইহার ভার দিয়াছি। এইখানে তোমাকেও মাঝে মাঝে আসিতে হইবে অরুণচন্দ্র—কাল্‌চারেরই জন্য!"......"হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" অফিসে সম্পাদক ধীরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পূজনীয় মতিবাবুর অনেক কথা হইল—"প্রবর্ত্তক ভবন" হইতে ফোনে প্রত্যাবর্ত্তনের জরুরী ডাক—আলাপ-ভঙ্গ করিয়া অতঃপর আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

নূতন-পথে

শ্রীমতিলাল রায়

পূর্ব্ব-কথা

[শীল্ড ম্যাচ—মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিং। উৎসুক দর্শকদল চলিয়াছে। যোগেশ ট্রামের ভীড়ে এক তরুণীর হস্তে অপমানিত হইয়া, তাহাকে পাল্টা স্যাণ্ডেল দিয়া প্রহার করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। যুবতী থানায় নালিশ করিল। শমন বাহির হইলে দেখা গেল—যুবতীর পিতা সোণাপুরের জমিদার রাজা রমণীকান্ত রায় যোগেশের পিতা তারিণী চট্টোপাধ্যায়ের পরম বন্ধু। বিবাদের মীমাংসার জন্য রমণীবাবুর নিমন্ত্রণ যোগেশ রক্ষা না করায় রাশভারী তারিণীবাবু পুত্রের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পরিশেষে, রমণীবাবু কন্যা সঙ্গে নিজে আসিয়া, ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় স্পোর্টস্‌ম্যান যোগেশকে আমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত যোগেশের উদাসীন মনের অবস্থায় হরিসাধন নামে এক দেশকর্ম্মীর সহিত ঘটনাচক্রে আলাপ ও পরিচয় হইয়া গেল। সে তাঁহার কাছে একটা নূতন সৃজনমুখী কর্ম্ম-প্রেরণার সন্ধান পাইল।

ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় রেফারী রমণীবাবুর কন্যা শান্তি দেবী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অবিচার করিয়া যোগেশকে অপমানিত করিল। যোগেশ ব্যাট ছাড়িয়া, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রস্থান করিল। তাহার অনুসরণে কার্জ্জন পার্কে গিয়া, শান্তি যোগেশের ক্ষমা প্রার্থনা করিল—যোগেশ ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় লইল। সে উদাস-চিত্তে ফিয়ার্স লেনে হরিসাধনের আশ্রমে উপনীত হইল। সেই রাত্রেই সেখানে অমূল্য নামে একটী কর্ম্মীর যক্ষ্মারোগে মৃত্যু ঘটিল।

যোগেশ অতঃপর টাউনের আশ্রমে প্রেরিত হইল। এই আশ্রমেই তাহার আশ্রম-গুরু মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার, দেব-দর্শন ও কৃপালাভ। আশ্রম-শক্তি দত্তা দেবীর সহিতও তাঁহার পরিচয় হইল। একটা অদৃশ্য সম্বন্ধের আকর্ষণে যোগেশ এইবার পূর্ণরূপে আশ্রমে যোগদান করিল।

টাউন হইতে যোগেশ দেবলগ্রামের আশ্রমনেতৃরূপে হরিসাধন কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া কর্ম্ম-ভার গ্রহণ করিল। অতঃপর, পল্লী-জীবনের নানা ঘটনা—মুসলমান কর্ত্তৃক নারীহরণ, আশ্রমাক্রমণ, আশ্রম-সেবিকা বিধবা উমারাণীর উপর দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার, গ্রামবাসীর বিরোধিতা—শবদাহনান্তে যোগেশের কঠিন ব্যাধি, উমার সেবা, তাহাতে চিন্তাহরণের ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ, পল্লীর কৃষক প্রজা উমেশের সাহায্যার্থে যোগেশ টাউনে জমিদার রাজা রমণীকান্তের বাটীতে উপস্থিত হইল। শান্তি যোগেশের সহিত মিলনের আশায় আকুল হইল, কিন্তু যোগেশ রমণীবাবুর সহিত চটাচটি করিয়া বাহির হইয়া গেল।

টাউনের আশ্রমে, আশ্রমের একনিষ্ঠ কর্ম্মী যুগলের সহিত যোগেশের আলোচনায় বুঝা গেল—যোগেশের মন অমিশ্র সংগঠন ছাড়িয়া রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে চলিয়াছে। যুগল ভাবিল—আশ্রমে একটা যুগ-পরিবর্ত্তন আসন্ন, যোগেশ তাহারই অগ্রণী। চিন্তাহরণ অন্য আলোকে তাহা লইল। যোগেশ দেবলগ্রামে রওনা হইল। শান্তি দেবী টাউনের আশ্রমে তাহার সন্ধানে আসিল।

যোগেশ দেবলগ্রামে ফিরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইল। অগ্নিকাণ্ডে আশ্রম ও বিদ্যালয় পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। উমাও অন্তর্হিতা। উমার মধ্যে যোগেশের শূন্য অন্তর একটা অনাবিল সম্বন্ধের আস্বাদ অনুভব করিয়াছিল, তাহার অভাবে সে অত্যন্ত কাতর হইল, তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

দৃঢ় হৃদয়ে আবার নূতন আশ্রম যোগেশ গড়িল। এবার দত্তাদেবীর অর্থ না লইয়া, সে ইহাকে স্বাবলম্বী করিতে বদ্ধপরিকর হইল। ইতিমধ্যে চিন্তাহরণের সহিত শান্তি দেবী এইখানে উপস্থিত হইল। কিন্তু যোগেশের হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া—সে চিন্তাহরণকে বলিল, এখানে আর নারীর ঠাঁই নাই। গভীর রাত্রে শান্তি স্বয়ং তাহার ঘুম ভাঙ্গাইল—আশ্রয় চাহিল—একটী রাত্রের জন্যও। যোগেশ দৃঢ় স্বরে বলিল—"না"। প্রত্যাখ্যাতা শান্তিকে চিন্তাহরণ সঙ্গে লইল।

অন্তরে—আত্মার বন্ধনে নূতন সৃষ্টির পরিকল্পনা; কিন্তু বাহিরের ঝটিকা হাওয়ার ন্যায় রাজনৈতিক আন্দোলন। দত্তা দেবীর নিষেধ সত্ত্বেও, যোগেশ বুঝি হৃদয়-বিপ্লবকে শান্ত করিবার জন্যই ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আহবে ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

চিন্তাহরণের বাড়ী। প্রায় দশ বৎসর চিন্তাহরণ বাড়ী-ছাড়া। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন যেন হারানিধি পাইয়াছে, আদরের সীমা নাই। চিন্তাহরণেরও রাহুর দশা যেন কাটিয়া গিয়াছে। সংসারের এত সুখ, এত স্বাচ্ছন্দ্য—কি কারণে যে এই সকল পরিত্যাগ করিয়া সে এতখানি দুঃখ ভোগ করিল, তাহা নিজেই ভাবিয়া পায় না। আজ মনে হয়, শান্তি তাহার সৌভাগ্যসূর্য্য। নিরবচ্ছিন্ন সুখের সূত্র সে যদি না দেখাইত, দুঃখের অকূল পাথারে জীবনটাই শেষ হইয়া যাইত। চিন্তাহরণ দেওয়ালে লম্বিত বৃহৎ দর্পণ-খানিতে আপনার সবখানি নিরীক্ষণ করিতে করিতে অতীত জীবনে ধিক্কার দিয়া নিজের মনে মনেই বলিল "আর কয়েক বৎসর এমনই আবর্ত্তে থাকিলে সুখের অবকাশ শেষ হইয়া যাইত। এখনও সময় আছে, বয়স আছে—শান্তি পরিত্রাণ দিয়াছে, তাহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।"

মালতী চিন্তাহরণের কনিষ্ঠা ভগিনী। সে ঘরে ঢুকিয়া দাদাকে বিমনা দেখিল। কিন্তু চিন্তাহরণ ভগিনীকে দেখিয়াই বলিল, "কত বড় হয়েছিস মালতী, কত তৃপ্তি আজ তোকে দেখে।"

"কিন্তু দাদা, এতদিন ভুলেছিলে তো নিষ্ঠুর হয়ে!"

"মোহ! মানুষকে ভুতে পায়; বড় ভূত কল্পনা, আদর্শ ও স্বপ্ন, মুক্তি পেয়েছি মালতী। তোদের ভুলে থাকা যে একটা দুঃস্বপ্ন!"

"ভুলেছিলে কেন তা' কি আর বুঝিনি!"

মালতী মুখ টিপিয়া হাসিল।

"কেন বল্ দেখি?"

মালতী ঢোঁক গিলিয়া, একবার চিন্তাহরণ আর একবার ঘরের বাহিরের দিকে চাহিয়া, দাদার কিছু কাছে আসিয়া বলিল—"সত্যি তপস্যা করেছিলে দাদা, খাসা বৌ করেছ। যেমন রূপ, তেমনি গুণ।"

"চুপ, চুপ, বৌ কি রে!"

"তবে কি?"

"ও আমার বন্ধু।"

"হ্যাঁ, বন্ধু? ও যে-বন্ধু, সে-ই বৌ। আমি কিন্তু আজ থেকে বৌদিদি বলে ডাকব।"

"ওরে না না, দিদি বল্‌বি। কোথায় সে?"

"ডেকে দিচ্ছি, দাঁড়াও।"

মালতী দ্রুত প্রস্থান করিল।

চিন্তাহরণ আবার ভাবিতে লাগিল। দশ বৎসর পরে বাড়ীর প্রত্যেক মানুষটী, প্রত্যেক বস্তুটী অন্তরে যেন সুখের প্রলেপ মাখাইয়া দেয়। একবার মনে পড়িল হরিসাধন দাদার কথা—অর্থ, বিদ্যা, যৌবন, সবই লোকটা ফুরাইল এক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া। আর যোগাদা? স্বপ্ন-বিলাসী। ধনীর সন্তান; কিন্তু তার দেশানুরাগের গোড়ায় আছে, নারীর প্রতি চিত্তের নিবিড় আসক্তি। কিন্তু শান্তিকে সে উপেক্ষা করিয়াছে। উমার দায় ছাড়া আর কিছু নহে। আকাশে এক চন্দ্রই শোভা পায়। শান্তিকে সে স্থান দিতে পারে না। পুনরায় আর্শীর দিকে চাহিয়া সে চিন্তাস্রোতঃ নিবারণ করার চেষ্টা করিল; কিন্তু চিত্ত আজ শান্তিময় মনে হইল।

শান্তি তাহার বন্ধু। অকৃত্রিম বন্ধু। বন্ধু ভগ্নী নহে, মাতা নহে। কোন গুরু সম্বন্ধ বন্ধুর সঙ্গে হয় না। নারী পুরুষের অভিন্ন হৃদয়-পরিচয় বন্ধুত্বের সূত্র ধরিয়াই সিদ্ধ হয়। শান্তি তাহার বন্ধু। সে তাহার শ্রেয়ঃ করিয়াছে। তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে সুখনীড়ে, তার ঋণ হৃদয়-বিনিময়ে পরিশোধ করিতে হইবে। আর দুই বৎসর মোহঘোরে দুঃখের পাথারে সাঁতার দিলে, সে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িত। এখনও সময় আছে, শক্তি আছে, স্বাস্থ্য আছে; মানুষের মত দাঁড়াইতে পারিবে।

শরীরটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল—যাহারা হরিসাধনের ন্যায় দেশের জন্য, জাতির জন্য দুঃখ-ব্রতী, যাহারা আজন্ম বন্দিজীবন যাপন করে, তাদের কি লক্ষ্য? ব্যর্থ কি এই ত্যাগ-তপস্যায় প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় ভাস্বর জীবন? মনে হইল—অন্যায় করিয়াছি। কিন্তু সে এক নিমিষের দুর্ব্বলতা। শান্তি অমল কমলশ্রী লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "ডেকেছেন নাকি আমায়?"

"ঠিক ডাকিনি, তবে না ডাকলে কি আস্তে নেই?"

"প্রয়োজন হলেই তো আসি। তা' ছাড়া আপনার কাছে এসে দাঁড়ালে কৃতজ্ঞতার ভারে মাথা আমার নত

হয়ে পড়ে। সুখে আছি, শান্তিতে আছি। এমন মাতৃস্নেহ স্বপ্নেও দেখিনি, আপনার মায়ের ঋণ কোন দিন পরিশোধ হবে না।"

চিন্তাহরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। একটু গম্ভীর স্বরে বলিল "এই মাতৃস্নেহ এতদিন ভুলেছিলাম শান্তি—সুখ-শান্তির এই নন্দন-কানন; আত্মীয় স্বজনের প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন ভুলে' ছিলাম কি মোহে? প্রতি মুহূর্ত্ত দুঃখের পাষাণ-ভার বক্ষে বহন করে' কি সত্য সিদ্ধ হ'ত বল ত? দেহে, মনে অনাবশ্যক ক্লেশ টেনে এনে নিজেকে পিষে মারবার দুর্ব্বুদ্ধি থেকে তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছ। এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই।"

শান্তি চিন্তাহরণের মুখের দিকে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিল। চিন্তাহরণ বলিল "কি দেখছ?"

শান্তি উত্তর দিল না। চিন্তাহরণ আবার বলিল, "কি দেখছ, বল না?"

শান্তি বলিল "তবে বলি, শুনুন। আপনার কথা শুনে' মনে হয় ভূত একজনকে ছাড়ে, অন্যকে ধরে।"

"কি রকম?"

"আপনার ভ্রান্তি দূর হ'ল, আর আমি কি ভ্রান্তি-বশতঃ রাজ-প্রাসাদ, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজনের অপরিসীম স্নেহ—জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—সব বিসর্জ্জন দিয়ে আজ এই অনির্দ্দিষ্ট দুর্গম পথে চলেছি! একদিন এ ভুলও ভাঙ্গবে! আবার ফিরে যাব আপনারই মত নিজের ঘরে! আপনারই মত ভেবে স্বস্তি পাব কি ভুল করেছিল্‌ম, কি মোহে পড়েছিলাম!"

শান্তির কথায় চিন্তাহরণ স্বস্তি পাইল না। শান্তির বাক্যে বিষের ঝরণা ঝরে, ইহা সে জানিত। কিন্তু শান্তি আবার ফিরিয়া যাইবে—আজ তাহার যে আশ্রয়, তাহা ভুল মনে করিয়া মুক্তি লইবে, এ অনুভূতি দুঃস্বপ্ন মনে হইল। সে বলিল "আবার ফিরে যাবে, অতীতের পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে আবার ফিরে' যাবে তুমি? তবে কি আজ আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি শান্তি?"

শান্তি নিজেকে সামলাইয়া লইল। আজ যাহার আশ্রয়ে তাহার দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় করিয়া শান্তি চাহে ভবিষ্যতের পথ, আজ সেই তাহার আশ্রয়দাতাকে সে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহে না। সে হাসিয়া কহিল "আপনার কথার প্রতিধ্বনি তুলেছি। স্বপ্ন-শেষে জেগে উহার মত আপনি যেমন অতীতের ক্ষেত্রে ফিরে এলেন, আমারও তো সেই দশা হতে পারে! সে হয়তো এমন সুখের হবে না। নয় চিন্তাহরণবাবু?"

"ফেরা তোমার হবে না আর শান্তি। ভুল তুমি করেছিলে—সে প্রসঙ্গ উত্থাপন আর শ্রেয়ঃ নয়।"

চিন্তাহরণ শান্তির দিকে অনিমিষে চাহিয়া বিগলিত কণ্ঠে বলিল "কি জানি, ভুলের পর ভুলই করে' চলেছি কি না? শান্তি, তোমার একটা উত্তর আমায় চির যুগের জন্য শান্তি দিতে পারে।"

শান্তির হৃদয়ে বিদ্রোহের ঝড় উঠিল। নিজেকে অসহায় বলিয়া চিন্তাহরণকে প্রবঞ্চিত করা অতিশয় অন্যায় মনে হইল। নিজের মন স্থির করিয়া সে বলিল "কি আপনি পেতে চান বলুন তো?"

চিন্তাহরণের ধৈর্য্য ছিল না। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল "পেতে চাই—যে আমায় ফিরিয়ে এনেছে পরিত্যক্ত সংসারে, তার হৃদয়ের বন্ধনীতে চির যুগ বন্দী হয়ে থাকব, এ আমার দুরাশা নয়।"

"কিন্তু অভ্রভেদী গিরিগাত্র ছেয়ে যে তৃণাঙ্কুর শিকড় গাড়ে অতি দুঃখে, সে তো এই সুখের সংসারে স্থির থাকতে পারে না চিন্তাহরণবাবু! তাই মনে হয়, চঞ্চল শৈবালের ন্যায় আমি স্রোতের মুখে ভেসেই চলব চিরদিন। আমার সুখ নাই অদৃষ্টে। নিরাশ্রয়া চির যুগ।"

"সাহিত্যে, কাব্যে উলঙ্গ সত্য ঢাকা পড়ে না। তুমি তবে চাও না আমার হৃদয়ের অনবদ্য প্রেম? সত্যই অকৃতার্থ আমি।"

"নিজেকে এত হেয় করে' দেখো না। আমার অন্তর ফিরে চায় তাকে, যে আমার চাওয়া ফিরিয়ে দিলে অবাধে, অবিচারে। ভ্রম আমার—না তার? এই প্রশ্নের সমাধান না হ'লে হৃদয়ে আমার সান্ত্বনা নাই। আমি প্রতিদান চাই না, দিয়ে যদি ধন্য হই—এই আমার আকুতি।"

বিরক্তিতে চিন্তাহরণের মুখমণ্ডল কদাকার হইল। ব্যঙ্গ-স্বরে সে বলিল "কি সে—হৃদয়হীন, দুষ্ট ক্ষতচিহ্ন বুকে

একটা কুৎসিৎ পুরুষ। প্রত্যাখ্যানে প্রতিক্রিয়ার মত বার-বার ফিরে চায় তোমার চিত্ত তারই অভিমুখে। আর আমি অর্ঘ্য নিয়ে আরাধনা-রত, আমার পূজা ব্যর্থ হবে! আমার অশ্রু নিষ্ফল হবে!"

ক্ষোভে ও দুঃখে শূন্য দৃষ্টি শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল। শান্তি করুণাসিক্ত নয়নে মনে মনে ভাবিল "অতি অনায়স লভ্য এই মানুষটা। রুদ্রের বিষাণ আহ্বান যেখানে বাজে, দুর্জ্জয় আশ্রয় হিয়া চায় সেই নিঠুর কর্ম্মক্ষেত্রে পাষাণ-বিগ্রহের চরণে অর্ঘ্য হতে।

কিন্তু শান্তি বলিল –"ওসব কথা এখন থাক। ভবিতব্য কোন্ পথে নিয়ে চলে, আমি তা' জানি না। কোথায় গতির সমাপ্তি যখন তার স্থিরতা নেই, তখন অপ্রিয় প্রসঙ্গ এইখানেই সমাপ্ত করা ভাল।"

"না, না। আমি যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি শান্তি! হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে প্রত্যাখ্যানের বিকট আর্ত্তনাদ শুনি। তুমি কি আমায় সান্ত্বনা দিতে পার না?"

অসহায়া বলিয়া শান্তি কি আজ চিন্তাহরণকে প্রবঞ্চনা করিবে? হৃদয়ের সত্য সে গোপন রাখিল না, বলিল "আমায় আপনি চাইবেন না চিন্তাহরণ বাবু। আকাশের প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে ভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত কিছু দূর গিয়ে নিভে যাওয়াই আমার পরিণাম। আপনি পুরুষ, ভুলের পর ভুল করে' বৃথা আর ব্যথা পাবেন না।"

চিন্তাহরণ শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। যেন অসহ্য যন্ত্রণার কাতরোক্তি শুনা গেল তার কণ্ঠে "জীবন আমার ব্যর্থ করে' দিলে!"

শান্তির মনে তখন সেই দিগন্তবিস্তৃত সুশ্যাম মাঠের কোলের সুনিবিড় দীঘিকার ধারে ধূলিধূসরিত অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র পর্ণকুটির ভাসিয়া উঠিতেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবাণবিদ্ধ হরিণীর মত রক্তাক্ত হৃদয় শিহরিয়া মৃত্যুই শ্রেয়ঃ করিতেছিল। এমন সময়ে চিন্তাহরণের পিতা একখানি সংবাদপত্র হস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "করিছিস্ কি চিন্তাহরণ? দেবলগাঁয়ে দত্তাশ্রমে তুইও তো ছিলি, হঠাৎ ফিরে এলি বাড়ী এই মেয়েটাকে নিয়ে। রাজা রমণীকান্তের মেয়ে না হয়ে তো এ আর যায় না।" তারপর শান্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন "কেমন গা, তোমার নামই তো শান্তি? এই দেখো কাগজে তোমার বাবা বিজ্ঞাপন বার করেছেন।"

"হ্যাঁ, আমার নাম শান্তি। আমিই রাজা রমণীকান্তের মেয়ে।"

"ভাল হয়েছে, আজই 'তার' করে' দিচ্ছি। বাড়ী যাও মা। লেখাপড়া শিখে তোমরা বড় হলে না, এই দুঃখ।"

চিন্তাহরণের দিকে তিনি চাহিয়া বলিলেন "দশটা বৎসর বৃথা নষ্ট করেছ চিন্তাহরণ, ছিঃ! ছিঃ!"

পিতা প্রস্থান করিলেন। শান্তি অস্থির হইয়া চিন্তা-হরণের হাত ধরিয়া বলিল "আমায় শীঘ্র নিয়ে চলুন এখান থেকে। বাবা যদি আসেন, আত্মঘাতী হব।"

"কিন্তু—।"

"আর কিন্তু নয়। ভিক্ষায় আমায় পেতেন না আপনি। স্বেচ্ছায় বরণ করে' নিলাম আপনাকে; রক্ষা করুন।"

চিন্তাহরণ সোৎসাহে শান্তির হস্তে চুম্বন প্রদান করিয়া বলিল "তবে এস, নিখিল পৃথিবী আর খুঁজে বার করতে পাবে না তোমায়, অতল অন্ধকার হৃদয়গহ্বর আলো করে' বসো; আমার পূজা গ্রহণ কর।"

দুইজনে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দুই বৎসর পরে যোগেশ জেলের ফটকে আসিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল। মৃতব্যক্তিকে পুনর্জীবিত দেখিলেও, এমন কৌতূহল হয় না। দেখিল—হরিসাধন দাদা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যোগেশকে সে উভয় বাহুবেষ্টনে চাপিয়া ধরিল। যোগেশ বিহ্বল, বিমুগ্ধ। দুই জনের মুখেই কথা নাই। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে হরিসাধন দাদার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে, যোগেশ তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

একটা ট্যাক্সিতে চড়িয়া তাহারা ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতক্ষণ হরিসাধনের দুই একটা প্রশ্নের 'হাঁ' 'না' উত্তর দিয়াই ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সময় অবলীলাক্রমে অতিবাহিত হইতেছিল। এইবার যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "হরিদা, জেলে ছিলাম, কোন চিন্তা ছিল না! কাল রাত্রি থেকে ভাবছি—কোথায় যাব, কি করব। তোমার দেখা পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। কোথা থেকে এলে তুমি?"

"সে একটা দীর্ঘ ইতিহাস। পরে বলব। এখন চল আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যেতে হবে? এতো ষ্টীমারঘাট দেখছি।"

"ষ্টীমার ছাড়তে বেশী দেরী নাই। তোমার আপত্তি নাই তো আমার সঙ্গে যেতে?"

"আপত্তি? তোমার দেখা যে পাব, এ আশা করিনি। আমার মিনতি—চিরদিন সঙ্গে রেখো।"

তারপর হরিসাধনের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "ভাল আছ নিশ্চয়?"

"ভাল আছি।"

"সর্ব্বনেশে রোগের কথা জানিয়েছিলে। কি নিষ্ঠুর পত্র তোমার!"

হরিসাধন একটু হাসিল।

ষ্টীমার চলিয়াছে ঢেউ কাটাইয়া। মরাল গমনে চলিয়াছে, সম্মুখে অনন্ত নীল; সমুদ্র-পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে

ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, কখন বা উড়িয়া ষ্টীমারের মাস্তুলে আসিয়া বসিতেছে। দূরে, বহু দূরে তটরেখা, অন্যদিকে আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে অসীমের দিকে, নীলের মেলা—কি সুদর্শন দৃশ্য!

সন্ধ্যার ধূসর আকাশে সূর্য্যাস্তের স্বর্ণরশ্মি ঝকমক্ করিতেছে। একটা অপ্রশস্ত নদীর মুখে ষ্টীমার আসিয়া দাঁড়াইল। হরিসাধন ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—একখানা ছোট ডিঙ্গি তাহাদের জন্য নদীর তালে তালে নাচিতেছে। যোগেশের দৃষ্টিও সে দিকে পড়িল। সে সবিস্ময়ে দেখিল—দত্তাশ্রমের সুবোধ দাঁড় ধরিয়া বসিয়া আছে। সে বলিল "সুবোধ যে?"

"হাঁ, সুবোধ!"

"কিন্তু—।"

হরিসাধন বলিল "কিছু জিজ্ঞাসা করো না। আমার সঙ্গে চল, সব বুঝতে পারবে।"

যোগেশ যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় হরিসাধনের সহিত ষ্টীমার হইতে নামিয়া ডিঙ্গিতে গিয়া বসিল। সুবোধ সহাস্যে যোগেশের পদধূলি মাথায় লইয়া দাঁড় বাহিতে আরম্ভ করিল।

অপ্রশস্ত নদী। দুই কূলে বিশাল বালুস্তূপ। সূর্য্যাস্তের পর কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচন্দ্র আকাশে ভাসিতেছে। বালুরাশি জ্যোৎস্নাস্নাত—সে এক অপূর্ব্ব শ্রী! প্রকৃতির চারু হাসি দেখিয়া যোগেশের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে নৌকা তীরে ভিড়িলে, সে দেখিল—যুগল তাহাদের জন্য ঘাটে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। এ কি ইন্দ্রজাল? যোগেশের সোৎসুক দৃষ্টির দিকে হরিসাধন চাহিয়া বলিল "সবই আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা ঘটনাবিপ্লব ছাড়া আর কিছু নয়। চল এখন বাসায় গিয়ে উঠি। সারাদিন খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট—বেশ বিশ্রাম হবে।"

পথের দুই পার্শ্বে সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য বৃক্ষ। উন্নত গিরিমালায় বনানীকুঞ্জ চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট দেখা যায়। শুব্ধ পল্লী। ষ্টীমার হইতে আগত দশ বিশ জন যাত্রী ব্যতীত পথে আর অন্য লোক নাই। যোগেশ আর স্থির থাকিতে পারিল না, বলিল "হরিসাধন দাদা, স্বপ্ন দেখছি নাতো?"

যুগল হাসিয়া বলিল "স্বপ্নের চেয়ে অধিক রহস্য। মৃত্যুর পর এ যেন একটা নূতন জীবন।"

যোগেশ যুগলের কাঁধে হাত দিয়া বলিল "যা দেখছি, সব বাস্তব তো! জেল থেকে বেরিয়ে আমি জ্ঞান হারাই নি তো? যেন সব স্বপ্ন মনে হয়।"

একটী ক্ষুদ্র বাজারের মধ্য দিয়া তাহারা নাতি উচ্চ এক গিরিশিরে আরোহণ করিল। কিছু দূর গিয়া একটা পার্ব্বত্য ঝরণা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত বনভূমির মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। নানাবিধ ফল ও পুষ্পবৃক্ষে সমাকীর্ণ এই বনভূমি অতি রমণীয় স্থান। ম্লান জ্যোৎস্নাতে যোগেশ তাহা অনুমান করিয়া লইল। তারপর তাহারা আরও কিছু দূর পথ অতিবাহন করিয়া প্রাকারবেষ্টিত সুবিস্তৃত এক প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে দ্বিতল কাষ্ঠনির্ম্মিত অট্টালিকা। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু কাহারও সাড়া নাই। তাহারা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করা মাত্র কয়েক জন দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুমণ্ডিত যুবকের সাক্ষাৎকার পাইল। তাহারা যোগেশকে অভিবাদন জানাইল। যোগেশের মুখে কোন কথা নাই। হরিসাধনের ওষ্ঠপুটে হাসি লাগিয়া আছে। যোগেশকে সে একখানি গৃহমধ্যে বসাইয়া বলিল—"আজ তুমি বিশ্রাম কর, কাল কথা হবে।"

"একলা থাকব নাকি?"

"এখানে একা একাই থাক্‌তে হয়।"

"তোমরা এখানে কতদিন আছ?"

"কাল সব বলব। রাত্রি প্রায় এক প্রহর হয়, আহারাদি করে' বিশ্রাম নিতে হবে। রাত্রি ৯টার পর কোন শব্দাদি করার উপায় নেই। কথাটী পর্য্যন্ত বন্ধ। দেখছো তো—সব শুব্ধ মৌন?"

"হ্যা, বড় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্থান। শান্তির অবলোপে সব স্নিগ্ধ। মস্তিষ্ক স্বভাবতঃই শীতল হয়। বেশ জায়গা। আমার ব্যবস্থা কি হবে?"

"হাত পা ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে' নাও। তার পরে ঐ তোমার বিছানা, শুয়ে পড়। ভোরে উঠার অভ্যাস আশ্রমেও ছিল, জেলেও বজায় রাখতে হয়েছে। অতএব এইদিকে তুমি নিশ্চিন্ত। এখন আমরা আসি।"

বিস্ময়ের পরিসীমা নাই। যথারীতি খাদ্যাদির ব্যবস্থা হইল। গৃহখানিতে মানুষের বাসোপযোগী সাদাসিধে সব দ্রব্যই সুসজ্জিত, কিছুর অভাব নাই। যোগেশ সে রাত্রি অনেক চিন্তার পর নিদ্রাভিভূত হইল। কত স্বপ্ন। ভোরে উমা তাহার হাত ধরিয়া তুলিল। গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল—ইহাও স্বপ্ন! টাউনের আশ্রমে দত্তা দেবীর কর-সঞ্চালনে ঝণ্ ঝণ্ করিয়া যেমন বীণের ঝঙ্কার উঠিত, এখানেও তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। ইহাও কি স্বপ্ন? না, সত্যই সে সুমধুর সুরে প্রভাতী রাগিণী আলাপ করিতেছে। মীড়ে মীড়ে মূর্চ্ছনা উঠিয়াছে, অমৃত ঝঙ্কারে শ্রবণে মধু ঢালিয়া দেয়।৲ বাঙালার সীমাপ্রান্তে এ আশ্রম কাহার? নিশ্চয় হরিসাধনের কীর্ত্তি!

(ক্রমশঃ)

অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তা

মুসলমান "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে ও সঙ্গীতে আপত্তি তুলিয়াছে। তাই "বন্দেমাতরমের" অঙ্গচ্ছেদ। মাদ্রাজ পরিষদে প্রার্থনা-সঙ্গীত নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "শ্রী"-"পদ্ম"-চিহ্নিত প্রতীকটীর বিরুদ্ধেও মুসলমানেরা আপত্তি করায়, উহারও পরিবর্ত্তন করিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকৃত হইয়াছেন এবং কংগ্রেসেরই ন্যায় 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতির অনুবর্ত্তনে "শ্রী"-বর্জ্জন ও রবিকরোজ্জ্বল পদ্ম মাত্র প্রতীক-রূপে বরণ করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রে জাতীয়তার আদর্শে সঙ্গীত বা প্রতীকটী সংশোধনযোগ্য মনে হওয়ায়, উহার সাম্প্রদায়িকতা-দোষ বর্জ্জন করিয়া, যথাসাধ্য অসাম্প্রদায়িক জাতীয় ভাবের উপযোগী করার চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন, দেশের রাষ্ট্র বা শিক্ষাক্ষেত্র অসাম্প্রদায়িক ব্যাপার বলিয়া তাহার সবখানি অসাম্প্রদায়িক ধরণেরই হওয়া উচিত, সেখানে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব, ভাষা, প্রতীক-চিহ্ন থাকা উচিত নহে, তাঁহারাই উক্ত পরিবর্ত্তন সমর্থন করিবেন। কেহ কেহ যদি মনে করেন যে, এই ভাবের দাবী মুসলমান পক্ষ হইতে আসায় এবং সেই দাবীর মূলে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি থাকায়, ইহাতে প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িক নীতিরই পরি-পোষণ করা হইল, তাঁহাদিগের সে ধারণা যুক্তিহীন কিনা, তাহাও বিচার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তনে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তার আদর্শ সুরক্ষিত হইল অথবা ক্ষুণ্ণ হইল, ইহাই ভাবিবার বিষয়।

"বন্দেমাতরম্"—গান। "শ্রী"—একটী ভাবের প্রতীক, শব্দ-প্রতীক। এই গান, এই প্রতীক হিন্দুজাতির বিশেষ কৃষ্টি ও সাধনার অভিব্যক্তি। গানে পৌত্তলিকতার ইঙ্গিত আছে। "শ্রী" প্রতীকেও তাই। মুসলমানের এই হেতু ইহাতে ঘোরতর আপত্তি আছে। হিন্দু শাস্ত্র অপৌরুষেয় তত্ত্বই প্রচার করে। তবুও তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, হিন্দু পৌত্তলিকতাবাদী, মুসলমান তাহা নহে, তাহা হইলেও জাতীয় মন্ত্রে ও গানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল-চিহ্ন হিন্দুর হৃদয়-মনের অভিব্যক্তি কিছুই অতঃপর থাকিতে পারিবে না—ইহাই কি সিদ্ধান্ত নহে? গান বা প্রতীক শুধু তত্ত্ব নহে, হৃদয়ের রস-মূর্ত্তি। রস-বর্জ্জনে হৃদয়ের দিক্ দিয়া সে গান বা প্রতীকের আর কোনও বিশেষ সার্থকতা থাকে না। অন্ততঃ হিন্দুর কাছে তখন "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র বা গান অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল-চিহ্ন অর্থহীন, নীরস বস্তু হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন হইবে, এই একই কথা কি মুসলমানের পক্ষেও সত্য নহে? ঠিক তাই। মুসলমান যদি তার কৃষ্টিকে ভালবাসে, তবে মুসলমান-কৃষ্টির যাহা পরিপন্থী, তাহাতে মুসলমানের অন্তরাত্মা সায় দিবে না, মুসলমান সে গানে বা প্রতীকে রস পাইবে না। উপরোক্ত যুক্তি তাই শাঁখের করাতের ন্যায় 'আসিতে যাইতে কাটে'। এই বিধানে হিন্দু বা মুসলমানের কৃষ্টিগত বৈষম্য বা বৈপরীত্য থাকিতে সমজাতীয় মন্ত্র, সঙ্গীত অথবা প্রতীক-চিহ্ন হইতেই পারে না। কাহারও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ বা বর্জ্জন করিয়া যে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তা, তাহা অসাম্প্রদায়িকও নহে, জাতীয়তাও নহে, তাহা অস্বাভাবিক ও অবাস্তব—মনের ছলনা মাত্র।

এই দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া সমস্যার মীমাংসা নাই, কোন দিন সম্ভব হইবে বলিয়াও আমাদের ধারণা হয় না। এই অবাস্তবের অনুসরণে আমরা আরও জাতীয়তাভ্রষ্ট ও ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়াই পড়িতেছি। কংগ্রেস বা বিশ্ববিদ্যালয় অসাম্প্রদায়িকতার নামে এই অবাস্তব ও অস্বাভাবিকতাকেই প্রশ্রয় দিতেছেন, ইহাতে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ইন্ধনযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, আপত্তির মাত্রা

বাড়িতেছে—মনে হয়, আমরা মীমাংসার অভিমুখে না চলিয়া, বিপরীত পথেই চলিয়াছি। আমরা বাঙালাদেশের কথাই বলি—বাঙালীর স্বভাব-সুন্দর জীবনযাত্রা ইহাতে বিশেষভাবে আড়ষ্ট ও অচল হইয়াই পড়িতেছে।

বাঙালী হিন্দু বা মুসলমান, যাহাই হউক—বাঙালী—বাঙালী; আমরা এই সত্য ভুলিয়াছি। বাঙালার হিন্দু, মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি নহে—এক জাতি। এই জাতির কৃষ্টি, সভ্যতা, জাতীয়তা—হিন্দুর বা মুসলমানের কৃষ্টি, সভ্যতার সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ যুগের ইতিহাস ইহার পশ্চাতে। বাঙালী ধর্ম্মে হিন্দু বা মুসলমান যাহাই হউক, তাহার ভাষা বাঙালা ভাষা—সংস্কৃত বা আরবী-ফার্সী নহে, উর্দ্দু ও নহে। এই ভাষা বাঙালী অস্বীকার করিবে কি? বাঙালীর কৃষ্টিও তেমনি স্বতন্ত্রভাবে হিন্দুর কৃষ্টি, মুসলমানের কৃষ্টি নহে—উহা বঙ্গদেশবাসী সমগ্র হিন্দুমুসলমানেরই সম্মিলিত কৃষ্টি, উভয়ের সম্মিলিত উপাদানে উহা গড়িয়াছে। এখানে হিন্দু বলিয়া, মুসলমানের বলিয়া বর্জ্জনীয় কিছু নাই—হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব রাসায়নিক সংমিশ্রণে বাঙালীর রক্তে মিশিয়া, ধীরে ধীরে বাঙালীত্বকে জন্ম দিতে চলিয়াছে।

এই বাঙালীত্বই—বাঙালীর সত্য অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তা—ইহাই বাঙালীর হাড়ে হাড়ে, রক্তমাংসে বিঁধিয়া আছে। হিন্দুমুসলমান—শৈব-শাক্ত, সিয়া-সুন্নির ন্যায় এই বাঙালীজাতির সম্প্রদায়-ভেদ মাত্র। তাই ভেদ বড় করিয়া দেখিবার বস্তু নহে। আগে অস্তিত্ব, তারপরে ধর্ম্ম। বাঙালীরূপেই আমাদের অস্তিত্ব। প্রকৃতিভেদে ধর্ম্মভেদ ঘটিলেও, বাঙালীত্বের পরিচয়ে এই ধর্ম্মভেদ মিলাইয়া যাইবে। বাঙালীর পরিচয়েই হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শী, খৃষ্টান যে কেহ বাঙালার মাটীকে ভালবাসিবে, দেশমাতৃকাকে আপনার জননী-জন্মভূমি বলিয়া চিনিবে, সে-ই ভাইকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দিবে।

বাঙালার জননেতৃগণ সন্ধি-চুক্তির পথে যাহা হাতড়াইতেছেন, তাহা সামঞ্জস্য, উহা প্রাণের সত্য নহে। বাঙালার বাঙালীত্বই অখণ্ড সত্য বস্তু। হিন্দু বাঁচিবে, মুসলমান বাঁচিবে—সপ্তকোটী বাঙালী "বন্দেমাতরম্" বলিয়া অখণ্ড ভাব-ভাষা-কৃষ্টিময়ী বঙ্গজননীকেই জয়ধ্বনি পূর্ব্বক বন্দনা করিবে। অন্যথা গৃহ-বিবাদে উভয়েই উৎসন্ন যাইবে।

মহাত্মাজীর নৈরাশ্য

মহাত্মার অহিংসা নীতি চালাকী বা ফিকির নহে—উহা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবলের প্রভাব তিনি আত্মজীবনে অনুভব করিয়া, তাহাই রাষ্ট্রক্ষেত্রে অব্যর্থ আয়ুধরূপে প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের আকর্ষণে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের শ্রেষ্ঠ মহাপ্রাণগুলি একত্র হইয়া, এই ধর্ম্মশক্তি রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহারা অসাধারণ সাফল্যলাভও করিয়াছেন। মুক্তিসংগ্রামে এই অভিনব অধ্যাত্মনীতির অভাবনীয় বীর্য্য ও ফলবত্তা সম্বন্ধে আজ বিরুদ্ধবাদীর সংশয়-দৃষ্টি নিষ্প্রভ এবং যাঁহারা এই নীতিকে ধর্ম্মবিশ্বাস বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের অনেকেও কার্য্যকরী পলিসী হিসাবে ইহার পতাকাতলে দাঁড়াইতে আর কুণ্ঠিত নহেন। ইহাতে কার্য্যসাফল্যের দিকটা সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও, মহাত্মাজীর মর্ম্মগত ধর্ম্মরাজ্যের কল্পস্বপ্ন এখনও সার্থক হয় নাই।

এলাহাবাদের সাম্প্রদায়িক রক্তকাণ্ড তাঁর এই স্বপ্নে আঘাত দিয়াছে বড় তীব্রভাবে। তাঁর মর্ম্মতন্ত্রী করুণ সুরে মূর্চ্ছনা তুলিয়াছে। বস্তুতন্ত্র রাষ্ট্রক্ষেত্রে অহিংসার সিদ্ধশক্তি প্রযুক্ত হওয়ার সুযোগ হয় নাই, ইহাই তাঁহার মর্ম্মপীড়ার কারণ। তিনি নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করিয়া, ধীরে ধীরে যে মণ্ডলী গড়িয়া তুলিয়াছেন, রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে তাহার শক্তি ও প্রভাব অতুলনীয়। এই মণ্ডলী প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই নেতৃত্বে পরিচালিত একটী ধর্ম্মগোষ্ঠী—তাঁহার অলৌকিক গুরুশক্তির চিহ্নিত মানস সন্তান। যে ধর্ম্মশক্তি কেন্দ্র করিয়া তাঁহার এই গোষ্ঠীরচনা, তাহা ব্যাপকভাবে বস্তুতন্ত্র রাষ্ট্রক্ষেত্রে কতখানি প্রত্যক্ষতঃ সঞ্চারিত ও বিপুল মানবসমষ্টিকে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারে, সে সম্বন্ধে হয়ত তাঁহার হিসাব কল্পনায় যত বৃহৎ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কার্য্যতঃ

ততখানি আজও সত্য হওয়ার সময় আসে নাই। এই স্বপ্ন-ভঙ্গ গুরুতর নৈরাশ্যের কারণ হইবে, বিচিত্র কি!

একটী গোষ্ঠীর স্থায় একটী বিপুল জাতির স্বভাব-ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা সমান পর্য্যায়ের কথা নহে। মুষ্টিমেয় শুদ্ধ প্রাণ লইয়া গোষ্ঠীর অন্তরগঠন যে আয়াস-সাধ্য, বৃহত্তর সমষ্টি-জীবন—জাতির স্বভাব-পরিবর্ত্তনের সমস্থা তাহার চেয়ে সহস্র গুণ জটিলতর ও কঠিনতর। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রশক্তি ধর্ম্মশক্তি-প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়া—ইহাই বর্ত্তমান যুগে একটা অলৌকিক রহস্য; মহাত্মাজীর জীবন-সিদ্ধ অহিংসা ও সত্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সাফল্য তাই জগতের—বিশ্বমানবের বিস্ময়। ইহার উপর এই যান্ত্রিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই অসংখ্য মানুষের জীবনে যে সঞ্চিত স্বভাব-সংস্কার, তাহার শোধন ও রূপান্তরের স্বপ্ন কত বিপুল ও বিরাট্, তাহা মর্ম্মদর্শী উপলব্ধি করিবেন। মহাত্মাজীর অন্তরে এই রূপান্তরের স্বপ্ন যে উজ্জ্বল স্বর্ণরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিল, তাহাতে ১৭ বৎসরের অহিংস সাধনায় ইহা জাতি-জীবনে এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন—নিষ্ঠুর ঘটনাচক্রে তাহা নির্ম্মম ভাবেই চূর্ণ হওয়ায়, তিনি আজ তপ্তশ্বাস ফেলিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন—"Our Failure." তিনি মনে করিয়াছিলেন—কংগ্রেস বুঝি শক্তি হইতে শক্তি লাভ করিয়াই চলিয়াছে—কিন্তু আজ তাঁর মনে সংশয়ের দংশনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—"...Whether the Congress is really growing from strength to strength. I must own that I have been guilty of laying that claim. Have I been over-hasty in doing so?"

ধর্ম্মবিগ্রহ মহাত্মাজীর এই প্রশ্ন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণকে অন্তরপরীক্ষায় ব্যাকুল করিয়া তুলিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুজগতের কাজের অগ্নিক্ষেত্রে, শাসন-তন্ত্রের গুরুভার এই অন্তরপরীক্ষার অবসর দেয় নাই। সেদিনও বেরিলীতে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। যে কেহ জনসাধারণের শান্তিভঙ্গের চেষ্টা করিবে, তাহারা যত বড়ই হউক না কেন, তাহাদিগকেই তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা শান্তিবিধানের চেষ্টা করিবে। প্রয়োজন হইলে, যে সকল বিপজ্জনক লোক জনসাধারণের শান্তির পরিপন্থী, তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে ফাঁসী দেওয়া হইবে।"

এই বস্তুজগতের অভিজ্ঞতার পার্শ্বে অহিংসা ও সত্য-মূর্ত্তি মহাত্মাজী লক্ষ লক্ষ অহিংস সৈনিক চাহিয়াছেন—যাহা পুলিস ও সামরিক বাহিনীর কার্য্য নিষ্প্রয়োজন করিয়া তুলিবে। এমন অহিংস বাহিনী দেশে শান্তির ও অশান্তির সময়ে সমভাবেই কার্য্য করিবে। তাহারা বিবদমান সম্প্রদায়গুলিকে মিলিত করিবার জন্য, শান্তিস্থাপনের জন্য, দেশের সর্ব্ব-কেন্দ্রে, সর্ব্ব-শ্রেণীর নরনারীর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া শান্তিমন্ত্র প্রচার করিবে। প্রয়োজন হইলে, ইহারা ক্ষিপ্ত জনতার ক্রোধাগ্নিতে জীবনাহুতি দিতেও কুণ্ঠা করিবে না এবং এমন শত, সহস্র মহাপ্রাণ বলি পড়িলে, একদিন না একদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রক্তকাণ্ড চির প্রশমিত হইবে।

মহাত্মাজীর এই স্বপ্ন এখনও কল্প-জগতেরই আদর্শ হইয়া রহিবে—যতদিন না জাতির স্বভাবের রূপান্তর ঘটে। কত বড় আমূল পরিবর্ত্তন, তাহা আজ কল্পনারও অনধিগম্য বটে, কিন্তু তপস্যায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। যে অসাধারণ তপস্যার ইঙ্গিত মহাত্মার বাণীর মধ্যে অনুস্যূত, জাতি কি আজও তাহার অবধারণ করিবে না? ভবিষ্যৎ কি সেই অমোঘ মন্ত্রের অনুসরণে কাতর হইবে?

বিহারে বাঙালী-সমস্যা

সাম্প্রদায়িকতার স্থায় প্রাদেশিকতাও ক্ষিপ্রগতিতে একটা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে। বাঙালা কারণে, অকারণে সাম্প্রদায়িকতার একটী উর্ব্বর ভূমি; বাঙালার বাহিরে অতি-প্রাদেশিকতার নিপীড়নে বাঙালী বিব্রত। বাঙালায় প্রাদেশিকতা মোটেই নাই, একথা হয়ত কেহ বলিবেন না—বাঙালায় এই সঙ্কীর্ণতা পর-পীড়নের কারণ হয় নাই, ইহা বলা অন্ততঃ অন্যায় হইবে না।

এই প্রাদেশিকতার ফলে কাছাড়, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বাঙালীর জন্মভূমি আর বাঙালীর নহে; আসামীগণ মনে করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বাঙালীদের স্থান দিয়াছেন। বাঙালার চাষীর শ্রমলব্ধ পাট হইতে যে-শুল্ক পাওয়া যায়,

বাঙালার ভাগ্যে তাহা অনেক দিন ঘটে নাই—প্রাদেশিকতার প্রবল প্রতিবাদে। বোম্বে বাঙালায় কাপড় বিক্রয় করিয়া প্রভূত লাভবান্ হয়, কিন্তু বাঙালার কয়লা তাহারা ব্যবহার করিবে না। বোম্বে হইতে সাবান প্রভৃতি কলিকাতা আসিতে যে মাশুল লাগে, কলিকাতায় প্রস্তুত সাবান সে মাশুলে বোম্বে যায় না। এমন উদাহরণ সংগ্রহ করিলে রাশীকৃত হইয়া উঠিবে। ইহা কোথাও প্রাদেশিকতার ফল, কোথাও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিত্ব।

আজ এই সমস্যা বিহারে প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। বিহারীগণ মনে করেন, বিহারবাসী বাঙালী পরদেশী বা বিদেশী—বিহারীগণ অনুগ্রহ করিয়া, (বোম্বেতে যেমন পার্শী-দিগকে একদা স্থান দেওয়া হইয়াছিল) তাহাদের আশ্রয় দিয়াছেন। কংগ্রেস-শাসনের পূর্ব্বে এ সমস্যা এরূপ প্রবল হইয়া দেখা দেয় নাই—শাসন-কার্য্যে গণশক্তির তখন প্রভাব ছিল না। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের পর দেশে নানাবিধ সংস্কারে যেমন তাঁহারা দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, বিহারে বাঙালী-সংস্কারও বোধ হয় তেমনই ক্ষিপ্রতার সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই নীতির অনুসরণ-ফলে আমরা দেখিতে পাই, বিহারে বাঙালীদের বিরুদ্ধে দুইটা গভর্ণমেণ্ট সার্কুলার জারী হইয়াছে। একটিতে, গভর্ণমেণ্ট চাকুরীতে বাঙালীর অনুপাত হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত—(শতকরা ১০ জন না হওয়া পর্য্যন্ত) নূতন চাকুরী বাঙালী পাইবে না; অপরটীতে গভর্ণমেণ্ট এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ (Local bodies) কেবলমাত্র বিহারীদের নিকট হইতেই তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করিতে পারিবেন।

বিহার পরিষদে ব্রেট সার্কুলার ("Brett Circular)" এবং মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক রচিত বাঙালী-নিয়োগ সম্বন্ধে সার্কুলারের কথা উঠে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ উত্তরে বলেন—ব্রেট সার্কুলারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। বাঙালী-নিয়োগ বিষয়ে মন্ত্রিগণ কোন সার্কুলার রচনা করেন নাই। ইহা-দ্বারা সার্কুলারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই—মন্ত্রিগণের অজ্ঞতাই স্বীকৃত হইয়াছে। সার্কুলার মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক রচিত নহে, ইহা সেক্রেটারীর কাজ অবশ্য মন্ত্রিগণের সম্মতিতে। জিনিষপত্র-ক্রয় সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের পূর্ব্ব আলোচনা হয় নাই। মন্ত্রিগণ সার্কুলার দুইটি প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে—জনসাধারণের আশঙ্কা অমূলক নহে। এই সকল কারণে কর্ম্মদক্ষ পুরাতন বাঙালী কর্ম্মচারীদের অতিক্রম করিয়া নূতন বিহারী উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কর্ম্মদক্ষতার মাপকাঠী লইয়া বাদানুবাদ চলে না, বাঙালীদের অপসারিত করার ইহা একটা অমোঘ অস্ত্র—ইহাই আমরা দেখিতে পাইতেছি। শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাস ব্রেট সার্কুলারের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি ইহাকে বে-আইনী আখ্যা দিয়া দেখাইয়াছেন, ইহা ইংলিশ আইন বা কংগ্রেস-বিধির কোনটীরই অনুমোদিত নহে। বিহার-গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে বাঙালীর অনুপাত যে অত্যধিক নহে, তাহাও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। বাঙালীর অনুপাত যেখানে বেশী আছে, সে স্থানে ইহার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। যেমন, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাঙালা ভাঙিয়া বিহার-গঠনের সময়ে অনেক বাঙালী কর্ম্মচারী বিহার-গভর্ণমেণ্টে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আর একটা কথা উঠিয়াছে—সমগ্র বিহারে হিন্দুস্থানী ভাষা বাধ্যতামূলক করা হইবে, বাঙালা ভাষা কোথাও শিক্ষার বাহন হইতে পারিবে না। বিহারের সমগ্র লোক-সংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ বাঙালী। বাঙালা ভাষা কৃষ্টি, সাধনা, সৌন্দর্য্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। সীমান্ত প্রদেশে নগণ্য গুরুমুখী যদি না বন্ধ হইতে পারে, বিহারে এতগুলি বাঙালীর ভাষা পদদলিত হইবে কোন ন্যায়পরতার বলে?

বিহারে বাঙালীগণ পরদেশী বলিয়া নিগৃহীত হয়—কংগ্রেস-শাসনে ইহা কিরূপে সম্ভবে? বিহারে যে-সকল বাঙালী দীর্ঘকালের অধিবাসী, অথবা বিহার-গঠনের সময়ে বাঙালার অংশ-বিশেষ বিহারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের জন্মভূমি, বাসগৃহ, জমাজমি বিহারে চলিয়া গিয়াছিল, তাঁহারা বিহারবাসী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে "ডোমিসাইল্ সার্টিফিকেট" দাবী করা অন্যায় এবং অবৈধ। বোম্বের পার্শী সম্প্রদায় গুজরাটীও নহেন, মহারাষ্ট্রীয়ও নহেন। তাঁহারা বাঙালী

অপেক্ষাও সমৃদ্ধিতে অধিক উন্নত। কেহ তাঁহাদের নিকট এরূপ অন্যায় 'আবাস-পত্র' দাবী করে না। একজন সাহেবকে যখন 'ডমিসাইল্' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, সম্ভবতঃ তাহাকে ভারতবাসী বলিয়াই দেওয়া হয়, কোন প্রদেশের নামে দেওয়া হয় না। বাঙালী বিদেশী নহে, তবুও এরূপ বৈসদৃশ্য কেন ?

বিহারী-বাঙালীকে যদি, ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবেও তাহার প্রতি বিহার-গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য আছে। বিহারের জন-সংখ্যার শতকরা ১২ জন বাঙালী, অথচ একজন বাঙালীও বিহারে মন্ত্রিত্ব পাইল না। বোম্বেতে একজন পার্শী মন্ত্রী আছেন। বাঙালী পার্শীদের মতই আত্ম-নির্ভর হইয়া গুণের সমাদর লাভ করিতে চাহে—কোনরূপ অনুগ্রহের অভিলাষী নহে।

শুধু বাঙালী নাম ধারণ করার জন্য তাহারা সর্ব্বত্র নিগৃহীত হইবে, ইহা অযৌক্তিক ও অমানুষিক। কংগ্রেসের আদর্শের ভিতর থাকিয়া যতটুকু বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব, তাহাই বাঙালী চাহে। কেহ কারও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভুলিতে পারে না, সম্ভবও নহে। নানা সম্প্রদায় বাঙালায় আসিয়া তাহাদের কৃষ্টি ভোলে নাই, বিহারীও বাঙালী হয় নাই। বাঙালী অগ্রগতিশীল জাতি, অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং উন্নত। এই অগ্রগতি ত্যাগ করিয়া অন্য কোন জাতির সহিত অনুন্নত হইতে যাওয়া তাহার মৃত্যু।

বিহারের এই অপকৃষ্ট নীতি যদি অচিরে বন্ধ করা না হয়, তবে বাঙালী অবশ্যই দাবী করিতে পারে—বাঙালা-ভাষী জেলাগুলি বিহার হইতে বাঙালায় প্রত্যর্পণ করা হউক। এই ভাষা-হিসাবে দেশ-বিভাগ কংগ্রেস-নীতিরও বিরোধী নহে। বিহারীর প্রতি বাঙালীর কোন ঈর্ষ্যা নাই, বিহারী বা অপর কাহাকেও হীন প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

হিন্দু-তীর্থে গোহত্যা

গত ১৭ই মার্চ্চ শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাতীরে নাসিকের মহান্ত সীতারাম শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে কুম্ভমেলা উপলক্ষে সমাগত অর্দ্ধ লক্ষাধিক সাধুর এক বিরাট্ সভা হইয়াছিল। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, নাসিক, মথুরা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে যাহাতে গোহত্যা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সাধুসঙ্ঘ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ ও প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাও স্থির হয় যে, গভর্ণমেণ্ট যদি সাধুসঙ্ঘের অনুরোধ রক্ষাপূর্ব্বক গোহত্যা বন্ধের আদেশ না দেন, তাহা হইলে তাঁহারা একযোগে সত্যাগ্রহ করিবেন।

আমাদের মনে পড়ে—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভায় রাজা রঘুনন্দন সিংহ ভারতে দুগ্ধাভাবে শিশুমৃত্যুর অজুহাত দেখাইয়া গাভী-হত্যা নিষেধ আইন উপস্থাপন করিয়াছিলেন—হিন্দুপ্রাণ পণ্ডিত মালব্য ও ডাঃ মুঞ্জের ন্যায় দুই একজন হিন্দু সভ্য ছাড়া অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনাভাবে তাহা পরিত্যক্ত হয়। বর্ত্তমান দাবী—তীর্থের পবিত্রতা-রক্ষা-হেতু। গত ২২শে মার্চ্চ দিল্লী ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের প্রশ্নোত্তরে ভারত-গভর্ণমেণ্টের দেশ-রক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর উক্তি হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে ভারতে বৃটিশ সেনার ভোজনের জন্য মাসে ৬,২৫০টী গোমহিষাদি হত্যা করা হয় অর্থাৎ বার্ষিক ৭৫ হাজার পশুহত্যা এই জন্য হয়। ইহা শুধু বরাদ্দ খাদ্য—ইহা ছাড়া সমগ্র ভারতীয় খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজের পশু-খাদ্যের পরিমাণ কত, তাহার হিসাব উপরোক্ত তথ্য হইতে আমরা পাই না। সে যাহা হউক, সাধুসঙ্ঘের দাবী মাত্র হিন্দুর ধর্ম্মস্থানসমূহে, তাহাদের দেবমন্দিরের সান্নিধ্যে গোহত্যা না হয়। ইহা ন্যায়সঙ্গত দাবী। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীরই এইরূপ ন্যায়-সঙ্গত দাবী করিবার অধিকার আছে। খাদ্যের জন্যই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, গোহত্যায় যখন হিন্দুর মর্ম্মে লাগে, তখন যাহাতে অন্ততঃ হিন্দুতীর্থে অথবা তৎসন্নিকটে ইহা সংঘটিত না হয়, সর্ব্ব-ধর্ম্মে সমদর্শী গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহারই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বত্যাগী হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্ম্মরক্ষায় প্রাণপণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই সংবাদ হিন্দুজাতির প্রাণে একটা অভিনব সাড়া তুলিবে। এ সত্যাগ্রহ হইলে, সহজে ভাঙ্গিবে না। দধীচির অমর বীর্য্য শাসনে নিরস্ত হইবার নহে। আমরা পূর্ব্ব হইতে সকল প্রদেশের

কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। ভারত-ব্যবস্থাপক পরিষদেরও এই বিষয়ে অবহিত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। ধর্ম্মরক্ষায় প্রাণ জাগিলে, সংঘর্ষে ও রক্তপাতে এই প্রাণ অপচিত না হয়, সেই জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজেরও এখানে একটা কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা একযোগে দৃঢ়ভাবে সাধুসঙ্ঘের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে পূর্ব্বাহ্ণে সচেতন করিয়া তুলিতে পারেন।

"সেকালের অঙ্গরাগ" প্রবন্ধের প্রতিবাদ

(ক) পাটনা হইতে শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন,

"সেকালের অঙ্গরাগ" নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের কৈফিয়ৎ পড়িয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন যে, প্রায় তিন বৎসর আগে ঐ প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন—তাঁহার একথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছি, এবং তিনি যে "মহাকোষ" দেখিয়া প্রবন্ধ লেখেন নাই, তাহাও ঠিক। কিন্তু শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় এম. এ. বি. এল. অধুনালুপ্ত "নবারুণ" পত্রিকায় ১৩৪০ সালে "প্রাচীন ভারতের অঙ্গরাগ" নামক যে প্রবন্ধ ৭০, ১৫১, ২০২, ২৭১ ও ৩৫২ পৃষ্ঠাদিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পরে যাহা "মহাকোষে" ছাপান হইয়াছিল সেই প্রবন্ধটী কি সতীশবাবু দেখেন নাই? ত্রিদিববাবুর ঐ প্রবন্ধ পরে ইংরাজী "Soap Journal"-এও প্রকাশিত হইয়াছিল। "নবারুণে" চার বৎসর পূর্ব্বে ত্রিদিববাবুর প্রবন্ধ বাহির হয়, আর সতীশবাবু "প্রায় তিন বৎসর আগে" তাঁহার প্রবন্ধ লিখেন।"

(খ) বঙ্গীয় মহাকোষের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ লিখিতেছেন :—

"গত ফাল্গুন সংখ্যা "প্রবর্ত্তকে" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় নামক কোন ব্যক্তি 'সেকালের অঙ্গরাগ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সতীশবাবুর প্রবন্ধের সহিত 'বঙ্গীয় মহাকোষে' প্রকাশিত 'অঙ্গরাগ' শব্দের সাদৃশ্য আছে, এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত সতীশবাবুর নহে। * * * অতঃপর আমি উহা 'প্রবর্ত্তক' কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনি। সতীশবাবু চৈত্র সংখ্যা "প্রবর্ত্তকে" একটী পত্র দ্বারা তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। * * * * অবশ্য চৈত্র-সংখ্যা 'প্রবর্ত্তক' প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ফাল্গুন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে সতীশবাবুর প্রবন্ধের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া একটী সমালোচনা বাহির হইয়াছে। * * * * 'শনিবারের চিঠি'র মন্তব্য অনুযায়ী মনে হয় যেন বঙ্গীয় মহাকোষেই 'অঙ্গরাগ' শব্দ অন্যত্র হইতে অপহরণ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে অপহরণ করা হইয়াছে, বলা হয় নাই। বঙ্গীয় মহাকোষের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে "All India Soap Makers' Journal" ও 'নবারুণ' পত্রে অঙ্গরাগ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এ-ছাড়াও বিশ্বকোষের 'অঙ্গরাগ' শব্দও তাঁহার লেখা। ভারতীয় অঙ্গরাগ সম্বন্ধে ত্রিদিববাবুর যে অনেক সংগ্রহ আছে, একথা অনেকেই জানেন। বঙ্গীয় মহাকোষের "অঙ্গরাগ" শব্দের অংশবিশেষ তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী বঙ্গীয় মহাকোষের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত। বঙ্গীয় মহাকোষের 'অঙ্গ-রাগে'র অন্যতম লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী মহাশয়ও 'মাধবী' পত্রে অঙ্গরাগ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় মহাকোষের অঙ্গরাগে চুরি কোথায় বুঝিলাম না।

সতীশবাবু "প্রবর্ত্তকে" যে পত্র দিয়াছেন তাহা আরও বিস্ময়কর। তিনি বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার নিবন্ধ-রচনার পূর্ব্বে 'বিশ্বকোষ' দেখেন নাই। কিন্তু বিশ্বকোষের নাম কেন? ইহা কি ইচ্ছাকৃত ঠিকা ভুল? তিনি কি মনে করিয়াছেন যে, মহাকোষের নাম মাত্র না করিয়া বিশ্বকোষের নাম করিলে তাঁহার সততার পরিচয় পাওয়া যাইবে, কারণ বিশ্বকোষের 'অঙ্গরাগ' শব্দ লইয়া তাঁহার নিবন্ধের সহিত কোন সমস্যার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এ-ছাড়া সতীশবাবু বলিতেছেন, তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা কি ধরিয়া লইব যে, তিনি জ্যোতিষ-জাতীয় কোন বিদ্যা জানেন, অথবা ব্যাপারটা একটা ভুতুড়ে কাণ্ড? ত্রেতা যুগের 'রাম না হ'তে রামায়ণে'র রচয়িতা বাল্মীকির কথাই ভাবিতেছি!"

—ইহার উপর ভাষ্যটিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। পত্র দুইখানি পড়িলে সমস্যার জটিলতাই বৃদ্ধি পায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বাঙালা সাহিত্যের নেতৃস্থানীয় কর্ণধার ও নবীন লেখক সম্প্রদায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অতঃপর এই বিষয়ে যবনিকা ক্ষেপণ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। সাহিত্য যদি সৎ ও সত্যেরই প্রকাশ হয় এবং সাহিত্যসেবী যদি সত্যেরই সাধক হন, তাহা হইলে সাহিত্যক্ষেত্রে এই সততা-নীতি-রক্ষায় সকলেই অকপটে অবহিত হইবেন—ইহা ছাড়া আমাদের আর কি বলিবার আছে? ইতি

প্রঃ সঃ



মুক্তির সঙ্কেত

পরাধীন জাতির পক্ষে মুক্তির প্রশ্নই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু ও ব্যাপক। গত ফাল্গুনের "বঙ্গশ্রী" (১৩৪৪)-তে চিন্তাশীল সম্প্রদায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—

"রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, এই দুই-য়ের মধ্যে আধুনিক মানুষ রাষ্ট্রনীতির কথা লইয়াই অধিকতর ব্যস্ত। তাঁহাদের অধিকাংশের মতে রাষ্ট্রীয় মুক্তি সাধিত না হইলে, আর্থিক মুক্তি অথবা অন্য কোন মুক্তি সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। ভারতের ঋষিগণের মত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদের মতে আর্থিক মুক্তি সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন মুক্তি সাধিত হওয়া সম্ভব নহে এবং যতদিন পর্য্যন্ত কোন দেশে আর্থিক মুক্তি সাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য কোন মুক্তির জন্য ব্যাকুল হওয়া সম্ভব নহে। যাহাতে আর্থিক মুক্তি সাধিত হয়, তাহা না করিয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনার কার্য্যে অগ্রসর হইলে পদে পদে মনুষ্য-সমাজকে বিপর্যস্ত হইতে হয়।"

এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঁহার অন্যতম যুক্তি এই :—

"যদি দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে যাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হইলেই মানুষের মুক্তি হইতে পারে, তাঁহাদের কথা যে ভ্রান্তিময়, তাহা অস্বীকার করা যায় না।"

অতঃপর তিনি মুক্তি-সম্বন্ধীয় আধুনিক পণ্ডিতগণের মত বিশ্লেষণান্তে বলিতেছেন, যে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে এবং স্বাধীনতালাভের উপায় হিসাবে নিম্নলিখিত ছয় দফা কর্ম্ম-সূচির উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা শক্তির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ।

(২) ক্রয় বিক্রয়ে অথবা শিল্পে ও বাণিজ্যে ধাতু ও কাগজ নির্ম্মিত কৃত্রিম মুদ্রার ব্যবহারের বর্জ্জন।

(৩) অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যের কৃষিকার্য্য বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র স্বাস্থ্যকর দ্রব্যের কৃষিকার্য্যের উন্নতি।

(৪) কৃষকদিগের শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা।

(৫) যন্ত্র-শিল্পের বর্জ্জন ও কুটীরশিল্পের বিস্তৃতি সাধন।

(৬) নৈতিক চরিত্রের অবনতিকর শিক্ষার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন এবং সর্ব্বতোভাবে উন্নতিকর শিক্ষার গ্রহণ।

লেখকের প্রাচীন ভারত-কৃষ্টির আলোকে, মৌলিক চিন্তাভঙ্গী ও তাহা বুঝাইবার আকুলতা অভিনন্দনীয়।

চণ্ডীদাস-সমস্যা

বিগত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের এক আলোচনা-সভায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রমুখ মনীষিগণের মতে চণ্ডীদাস-সমস্যার নূতন করিয়া সূত্রপাত হয়। একে একে তিন জন চণ্ডীদাসের আভাষ পাইয়া আমরা অবশ্যই কৌতূহলী হইয়া উঠি। "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের" চণ্ডীদাস এবং "পদাবলীর" চণ্ডীদাস যে এক ব্যক্তি নহেন—রচনার ইতর বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কাহারও কাহারও মনে এই প্রকার ধারণা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় "বসুমতীতে" (ফাল্গুন, ১৩৪৪) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উভয় চণ্ডীদাস একই চণ্ডীদাস। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" অপরিণত বয়সের রচনা বলিয়া এবং "পদাবলী" পরিণত বয়সের রচনা বলিয়া এক "চণ্ডীদাস"কে "বহু" করিবার কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—

"...কিন্তু এদেশে বাঙ্গালা-সাহিত্য বেওয়ারিশী মাল—এখানে কোন বৃহৎ পুঁথিশালা ছিল না, যেখানে পুরাকালে প্রাচীন পুথিগুলি রাখিবার সুব্যবস্থা হইয়াছে, বিশেষতঃ এদেশের ঠাণ্ডা মৃত্তিকায় পুথি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য অনেক সময় গায়েনদিগের স্মৃতির উপরেই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইতেছে। ভণিতায় প্রায়ই গায়েনগণ যদৃচ্ছাক্রমে কবিদিগের সম্বন্ধে "দ্বিজ" "দাস" "দীন" "বড়ু" "দীনহীন" প্রভৃতি উপাধির ছড়াছড়ি দেখা যায়। এখনকার পণ্ডিতদিগের অনেকেরই চণ্ডীদাসের পদের রসোপলব্ধি নাই, তাঁহারা এই সকল উপাধির খোসা ধরিয়া টানাটানি করিয়া নিত্য নূতন নূতন অনুমান ও কল্পনার বলে এক এক জন নূতন নূতন চণ্ডীদাস খাড়া করিয়া মৌলিকত্বের দাবী করিতেছেন। যে পণ্ডিত যত বেশী চণ্ডীদাসের পরিচয় দিতে পারেন, পাঠকমহলে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকতম বাহাদুরীর দাবী করিয়া থাকেন।"

চণ্ডীদাস-সমস্যায়, দীনেশবাবুর কথাগুলিও সুধীগণের ভাবিবার যোগ্য।

সমালোচনা

পদাবলী-মাধুর্য্য—রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি-লিট, প্রণীত এবং শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ১ম সংস্করণ, ১৩৪৪ বাং। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের লেখার সহিত শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই পরিচিত। তাঁহার লেখার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে ডাঃ সেনকে চিনিবার ও বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য্য। কৈশোরে যে বৈষ্ণব পদাবলী এই তরুণ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, যাঁহার যৌবনের সকল সাহিত্য সাধনার মধ্যে এই পদাবলীর সুরই ধ্বনিত হইয়াছে, আজ বার্দ্ধক্যে তিনি সেই পদাবলী সমুদ্র মন্থন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহার মাধুর্য্য পরিবেশন করিয়াছেন। ডাঃ সেনের অমৃতময়ী লেখনী বাঙালা সাহিত্যের মধ্যমণি পদাবলী সাহিত্যের সার নিষ্কর্ষণ করিয়া সকলের নিকট উপস্থিত করিয়াছে। কোন কোন বৈষ্ণব সমালোচকের মতে ডাঃ সেনের 'মুক্তাচুরি', 'সুবল সখার কাণ্ড', 'রাখালের রাজগী' প্রভৃতি গ্রন্থ নাকি গলার মালা করিয়া রাখার যোগ্য। আমরাও এই সকল উক্তি অনুসরণ করিয়া, বলিতে পারি যে, আলোচ্য গ্রন্থখানি হরিচরণচুম্বিত সচন্দন তুলসীপত্রের মতই পবিত্র ও প্রাণারাম।

সমগ্র গ্রন্থখানি বাঁশীর সুর, দর্শন, আনন্দ, সখী সম্বোধন, মাথুর, অভিসার, মান প্রভৃতি ১৭১।৮টী অধ্যায়ে বিভক্ত। একটী অধ্যায়ে অধুনা স্বর্গত গৌরদাস কীর্ত্তনীয়ার পরিচয় ও তাহার কীর্ত্তন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা আছে। বর্ত্তমান যুগে কীর্ত্তন ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কীর্ত্তন প্রচারের ইতিহাস যাহারা লিখিবেন তাহাদের নিকট এই অধ্যায়টী বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে।

ভালমন্দ আপেক্ষিক শব্দ। অপরের নিকট যাহা ভাল, আমার নিকট তাহা মন্দ বিবেচিত হইতে পারে। আবার অপরের নিকট যাহা মন্দ আমার নিকট তাহাই হয়তো কাম্য। বাঙালীদিগকে অনেকে "সেন্টিমেন্টেল" বা ভাব-প্রবণ বলিয়া অভিহিত করেন। ইহা ভাল কি মন্দ সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। বাঙালী সেণ্টীমেণ্টাল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক সম্প্রদায়ের লোক হয়তো ডাঃ সেনের লেখাকে সেণ্টীমেণ্টাল বলিয়া অভিহিত করিবেন। কিন্তু আমরা বলিব তাঁহার লেখায় বাঙালার খাঁটী রূপটী নিখুঁতভাবে ধরা পড়িয়াছে। ইহা ভালমন্দ বিচারের উর্দ্ধে।

বাঙালীদের ভাবপ্রবণতা যাহারা যাহারা অশ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, ডাঃ সেন তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আলোচ্য গ্রন্থে একটা অনুচ্ছেদ সংযোগ করিয়াছেন। এই অনুচ্ছেদটী উদ্ধৃত করিয়া এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা শেষ করিব। "যে দেশে শীতে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, সেখানকার হাওয়া বাঙালাদেশে আসিয়া লাগাতে অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এখন চক্ষের জলের মূল্য স্বীকার করেন না। প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি কোমল ভাবের সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন এই অশ্রুর মূল্য স্বীকার করিতে হইলে নিগৃহীত পিতামাতার ও উপেক্ষিতা স্ত্রীর ঋণ স্বীকার করিতে হয়, শিক্ষিত সংজ্ঞায় অভিহিত দুর্নীত পুত্র ও স্বামীর তাহা হইলে খামখেয়ালী করায় বাধা জন্মে। অন্য দেশের কি তাহা জানি না, কিন্তু এই অশ্রুই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। চৈতন্য বক্তৃতা করেন নাই—উপদেশ দেন নাই—ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। তিনি চোখের জল দিয়া সমস্ত দেশটা বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এক বিন্দু অশ্রুতে যে প্লাবন আনাইয়াছিল, তাহা এখনও সমস্ত নগর ও পল্লী ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।" পৃঃ ১১৮।

—শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য

রস-সাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী—কবি-ভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর বি, এ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত। মূল্য ২৲ টাকা।

বাঙালার লোক-সাহিত্যের অন্যতম রস-প্রস্রবণ রস-সাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর বিরচিত ৩০৪টী সমস্যাসূচক কবিতা এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। কত যত্নে বাঙালার এই লুপ্তপ্রায় গুপ্তধনগুলি শ্রদ্ধেয় উদ্ভটসাগর মহাশয় বিস্মৃতির কবল হইতে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, তাহার কাহিনী ভূমিকায় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। উহা পড়িলে, অশ্রু-নেত্রে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলী সঙ্কলয়িতাকে উপহার দিতে ইচ্ছা করে। সংস্কৃত ও বঙ্গ-ভারতীর এই নীরব অক্লান্ত চির-সেবাব্রতীর অসাধারণ শ্রম ও সেবা-সাধনার মূল্য ও মর্য্যাদা বাঙালী কি আজ বুঝিবে?

সে যাহা হউক, রস-সাগর ভাদুড়ীর ক্ষুদ্র জীবনীসহ এই রস-গর্ভ কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে বাঙালার জাতি-জীবনের সেই সুখময় অধ্যায়েরই স্মৃতি-সংস্কার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, যে যুগে বাঙালীর দেহে ও মনে রস ছিল, হাসি ছিল, আনন্দ ছিল—সেই হাস্য-রস-আনন্দে বাঙালী সমাজ-সংসার মুখরিত, পুলকিত ছিল। বাঙালী মনীষী সেদিন হাসিতে ও হাসাইতে হাসাইতে শুধু বাণীর আরাধনা নহে, জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিশ্বাস লোক-সমাজে প্রচার করার গুরু-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পরিচয়ও এই গ্রন্থখানি পড়িলেই পাওয়া যাইবে। ভাদুড়ী যখন শ্লোক রচনা করিয়া শুনাইতেছেন—

হেন সার শূন্য দেহ নীরোগ রাখিতে
ইচ্ছা করে যদি কেহ এই পৃথিবীতে,
দুইটী উপায় তার রহে সর্ব্বক্ষণ,
"ঔষধ জাহ্নবী-জল, বৈদ্য নারায়ণ!"

—তখন ইহা আর শুধু রস-কবিতা নহে, ধর্ম্মবিশ্বাসেরই অনুপম নৈবেদ্য—সে ধর্ম্মবিশ্বাসের বীর্য্য আজ বাঙালীর হাড়-মাস নিঙড়াইয়া বুঝি নিঃশেষে বাহির হইয়া যাইতেছে। দুর্দ্দৈব ছাড়া আর কি! এমনি কত কথা মনে পড়িয়া যায় বইখানি পড়িতে পড়িতে—ভাবি, সৎ-সাহিত্য যদি থাকে, তবে তাহা ইহাই—আর এই সাহিত্যের পরিবেশক ও পাঠক উভয়ই বুঝি দিন দিন কাল-ধর্ম্মে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা মনে করিতেও হৃদয় ব্যথায় ঝুঝিয়া উঠিতে থাকে।

আমরা এই রস-গ্রন্থখানি কি উচ্ছ্বসিত ব্যথায় ও আনন্দে পাঠ করিয়াছি, তাহা ভাষায় বলিবার নহে। উদ্ভটসাগর মহাশয় চিরজীবী হউন, এমনি অনাবিল রসোদ্ধারে আমাদের শুষ্কপ্রায় জাতিজীবন রসামৃতে পুনরভিষিক্ত করুন—এই প্রার্থনা।

—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত



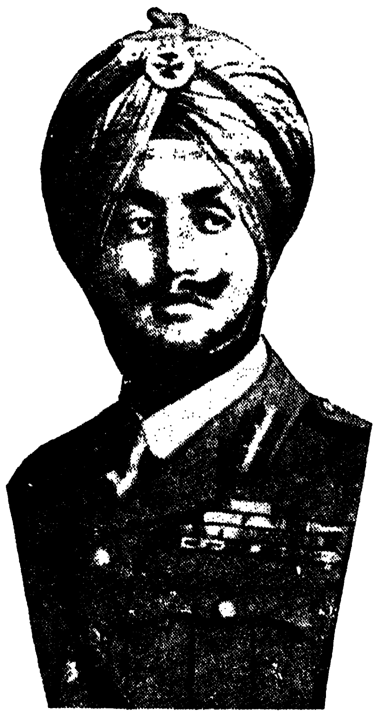
নববর্ষে—বাঙালীর নববর্ষে বাঙালীর প্রাণ তেমন নাচিয়া উঠে কৈ! বৎসরের পর কত বৎসর আসিতে যাইতে দেখিলাম। চৈত্র সংক্রান্তিতে জেলেপাড়ার সং-এর সমারোহ মহানন্দে উপভোগ করিয়াছি। অ-বাঙালী খেলুড়েদের আহ্বান করিয়া সং-এর 'সাত শ' মজা' দেখাইয়াছি। প্রাণখোলা হাসিতে তাহারা আমাদের সঙ্গে একযোগে দিক্ মুখরিত করিয়া দিয়াছে—বালক-বালিকাদের স্বচ্ছ আনন্দে জাতির সজীবতা অনুভূত হইয়াছে অপরিসীমভাবে। সে আনন্দোৎসব বাঙালীর কাছে এখন কথার কথা। বাঙালী সে হাসি আর হাসে না, হাসিবার পথ তাহার রুদ্ধ হইয়াছে। বাক্যবাগীশদের বাক্চাতুরীতে উৎসব উঠিয়া গিয়াছে। এ প্রকারের আরও কত বাঙালীর উৎসব লোপ পাইয়াছে। অর্থ অপব্যয়ের অজুহাতে বাঙালীর হাসি-খেলার সব মেলা একে একে বন্ধ হইয়া গিয়াছে—'সভ্যভব্য'দের প্ররোচনায়। 'অপব্যয়' বন্ধ করিয়া মিতব্যয়ী বাঙালী সমগ্র জাতির মুখের হাসিটা পর্য্যন্ত ঘুচাইয়া দিয়াছে। যে জাতির বালক, কিশোর, যুবক হাসির মাথা খাইয়াছে, সে জাতির ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যলাভ অস্বাভাবিক। তাই বুঝি আমরা তথায় প্রায়ই দেখিতে পাইতেছি বিসদৃশ ঘটনা! রক্তপাতের দৃষ্টান্তেরও অপ্রতুল নাই। কথায় ব'লে, যে হাসে না সে খুন করিতেও 'পেছ-পা নয়'—ক্রীড়াক্ষেত্রে আবিলতা কি ইহারই কারণে? কে জানে!

সংক্রান্তি-সমারোহ উপভোগের সময়েই আমাদের মনে পড়িয়াছে শুভ নববর্ষ উৎসবের কথা। দোকানদার 'নূতনখাতা' খুলিয়া দেনা-পাওনাতেই যে তাহা পর্য্যবসিত করিত এমন কথা মুখে আনিতে পারিব না। পূজা, হোম, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' ছিল নূতন খাতার বৈশিষ্ট্য। যে পল্লীতে যে কয়খানি দোকান তাহার 'আশ-পাশের' বালকবৃন্দের এ উৎসবে মত্ততা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পারিতোষিক-লাভের আশায় দরিদ্রকে দেখিয়াছি—কালিঝুলি মাখিয়া নাচিতে-কুঁদিতে। বাউল, বৈষ্ণব একতারা বা খোলকরতাল সহযোগে মধুর নাম—গান শুনাইয়া উৎসবের সমারোহ বর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রতিদানে সকলেই পাইয়াছে আশাতীত মিষ্টান্ন বা তাম্রখণ্ড বা উভয়ই। আরও দেখিয়াছি—ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু কোম্পানীর তাৎকালীন মালিক ৺বামাচরণ কুণ্ডুর নববর্ষ উপলক্ষে খেলোয়াড়দিগকে লইয়া উৎসব-ভোজে মত্ত হওয়া। জাতীয়তার স্ফূর্ত্তি ও সমৃদ্ধি-সাধনে ক্রীড়কগণের এই মিলনোৎসব লক্ষ্য করিবার। নববর্ষে সকলকে আনন্দ-জ্ঞাপনের সঙ্গে তাই আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম। সে দিন বাঙালীর নাই। আনিতে যত্নও ত' নাই! ক্রীড়ক ও ক্রীড়ানুরাগী বাঙালীর দিন ফিরাইতে অগ্রণী হউন—নববর্ষে ইহাই আমাদের কামনা। 'প্রবর্ত্তক' পূর্ণবয়স্ক হইয়া ত্রয়বিংশে পদার্পণ করিয়াছে। জাতির জাতীয়তা সংরক্ষণে ও বর্দ্ধনে উদ্যোগীকে সহায়তা করিতে 'প্রবর্ত্তক' সদাই প্রস্তুত। খেলা-ধূলার মধ্য দিয়া মানুষ তৈয়ারী করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য।

আমাদের কথা—"প্রবর্ত্তকে"র বয়স দ্বাবিংশ হইলেও, ইহার স্তম্ভে 'খেলা-ধূলা' স্থান পাইয়াছে মাত্র তিন বৎসর। মাদৃশ ব্যক্তির সম্পাদনায় "প্রবর্ত্তকে"র 'খেলা-ধূলা' এই অল্পকালের মধ্যে ক্রীড়ানুরাগীর মনোরঞ্জন করিতে যে পারিয়াছে, তাহা 'প্রবর্ত্তকে'রই পুণ্যে—লেখকের কৃতিত্বে নহে। তাঁহাদের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে কিন্তু অভিযোগ করেন—"খেলা-ধূলার অংশ অপেক্ষাকৃত ছোট, আরও বাড়াইয়া দিবেন।" বর্ত্তমান ব্যবস্থা-মত

এ অংশ আর বাড়ান অসম্ভব, করজোড়ে তাঁহাদিগকে জানাইতেছি। সেই সঙ্গে এ কথাও তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি—সাহিত্যের দিকে নজর রাখিয়া "প্রবর্ত্তকে" খেলা-ধূলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমরা সচেষ্ট। বিস্তৃত সংবাদ দেওয়া 'দৈনিকের' কার্য্য। ক্রীড়াধর্ম্ম পালন করিয়া ক্রীড়কেরা ক্রীড়াবিষয়ে নিপুণতা লাভ করে, সঙ্ঘ-শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যেই "প্রবর্ত্তকে" খেলা-ধূলার আলোচনা। ইহা যথাসাধ্য-ভাবে করিতে খেলা-ধূলার বাঙলা পরিভাষা সঙ্কলনেও অগ্রণী হইয়াছে "প্রবর্ত্তক"। জনসাধারণের স্নেহ-পুষ্ট হইয়া কর্ত্তব্যপালনে "প্রবর্ত্তকের" ত্রুটি বিচ্যুতি যেন না ঘটে, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা। 'খেলা-ধূলা' মাসিক সাহিত্যের অঙ্গ হওয়া এই যুগের বিশিষ্ট ঘটনা—খেলা-ধূলার সার্ব্বজনীনতার ইহা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'খেলা ধূলা'কে উত্তরোত্তর সমধিক চিত্তাকর্ষক ও ফলদায়ক করিতে "প্রবর্ত্তক" সতত চেষ্টা করিবে। শেষ কথা—খেলা-ধূলার কোনও সঙ্ঘ বিশেষের মুখপত্র "প্রবর্ত্তক" নহে। দেশের ও দশের কল্যাণকামী হইয়া পক্ষপাতশূন্য নির্ভীক আলোচনা করাই "প্রবর্ত্তকের" ব্রত—ব্যক্তিগত নিন্দা-সুখ্যাতির স্থান ইহাতে নাই। কঠোর সত্যাবলম্বনে "প্রবর্ত্তক" যদি কাহারও মনঃপীড়ার কারণ হয়, তাহার উপায় নাই।

"পাতিয়ালা"—ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলার উন্নতিকল্পে পাতিয়ালার মহারাজের কার্য্যকলাপ ক্রিকেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিতে থাকিবে। মনে পড়ে—পাতিয়ালা-একাদশ লইয়া মহারাজের কলিকাতায় প্রথম ক্রিকেট-অভিযানের কথা। বিশ্ববিশ্রুত রঞ্জী সেই একাদশের একজন হইয়া আসেন। শাদার দেশে শাদার খেলার 'ধাঁচ্' বদলাইয়া কালার দেশের রঞ্জী তখন তাহাদের গুরুর আসনে উপবিষ্ট। সেই রঞ্জীকে দলভুক্ত করিয়া 'পাতিয়ালা' কলিকাতায় আসিলেন। বঙ্গদেশে 'ক্যালকাটা ক্লাব' তখন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন—দেশীয় কোনও দলের সহিত সমানে সমানে খেলা খেলিতেও তাহারা নারাজ—বলদৃপ্তের দাম্ভিকতাই তাহাদের বর্ত্তমান। সে দম্ভ তাহাদের কোথায় ভাসিয়া গেল, রঞ্জী-পাতিয়ালা কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র। ডবলিউ জি গ্রেস্ বর্ত্তমানে রঞ্জী প্রতিভায় ইংলণ্ড তখন সম্মোহিত। কলিকাতার ক্ষুদ্র ইংলণ্ড—ক্যাল্‌কাটা ক্লাবের ইডেন্ উদ্যানের খেলার মাঠ—তাঁহার সম্মুখে তটস্থ হইবে আশ্চর্য্য কি। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল খেলার মাঠের অবহেলিত বাঙালী। কোচবেহারের তৎকালীন মহারাজের কল্যাণে কালা উঠিয়া দাঁড়াইল শাদার যোগ্য



ক্রিকেট-জগতের পরম বন্ধু : পাতিয়ালার মহারাজা

প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে—বাঙালীর ক্রিকেটের নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। 'সাপের হাঁচি বেদে চেনে' তাই বঙ্গদেশে 'পাতিয়ালার' সেই ক্রিকেট অভিযান। বর্ত্তমান যুগে বাঙালীর নিখিল-ভারত দলভুক্ত হওয়ার মূল সন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, পাতিয়ালার মহারাজের হাত আছে তাহাতে কতটা। ৺সার্ দেবপ্রসাদের কর্ত্তৃত্বাধীন ইউনিভার্সিটি-অকেজনল্‌সের উন্নতিকল্পে লর্ড উইলিংডন্ ও পাতিয়ালার মহারাজের ঐকান্তিকতা ও তাহারই ফলে অকেজনল্‌সের একজন বাঙালী খেলোয়াড়ের

নিখিল-ভারত দলভুক্ত হইয়া বিলাত যাওয়া, স্মরণে আছে বোধহয় সকলেরই। মহারাজের প্রতি বাঙালীর সুতরাং কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় ও অজস্র অর্থব্যয়ে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম নিখিল-ভারত দল প্রেরিত হয়। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে এম-সি-সির ভারত-আগমনের প্রথম উদ্যোগী এই 'পাতিয়ালা'ই। ভারতীয় ক্রিকেট-কনট্রোল্ বোর্ড স্থাপনায় মূল অনুপ্রেরণা আসে মহারাজেরই নিকট হইতে। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের ইংলণ্ডে ও এদেশে 'টেষ্ট ম্যাচের' প্রবর্ত্তন, অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে দল আনয়ন, টেনিসন—একাদশের ভারতাগমন—সকল ব্যাপারেই 'পাতিয়ালা' মাথা দিয়া কাজ তুলিয়া দিয়াছেন। বোম্বায়ে ব্রাবর্ণ ষ্ট্যাডিয়ম্ স্থাপনে তাঁহার অংশ গ্রহণ নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। ভারতবর্ষে ক্রিকিটের যাহা কিছু আজ দেখিতে পাওয়া যায় 'পাতিয়ালা' না থাকিলে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইত না, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ক্রিকেটের জন্য অর্থ দানে তিনি মুক্তহস্ত। নিজে খেলা শিখিব, দেশ ভাইকে খেলা শিখাইব—দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে প্রভূত অর্থ ব্যয়ে পাকা খেলোয়াড় আনাইয়া তাহাদের কাছে নিজে শিক্ষানবিশী হইয়াছেন, 'জাত ভাইকে'ও করাইয়াছেন। 'গুণীর' গুণ অর্থাভাবে নষ্ট পাছে হয় সেই কারণে কত খেলোয়াড়কে ষ্টেটের নামমাত্র কাজ দিয়া তাহাদের ভাতের ভাবনা ঘুচাইয়াছেন—উচ্চহারে পারিশ্রমিক দিয়া। ক্রিকেটের কত বড় বন্ধু হইলে তবে এ কার্য্য কেহ করিতে পারেন? সেই 'পাতিয়ালা' পরলোকগত। ক্রিকেটের কি অকৃত্রিম বন্ধু যে ভারতবর্ষ হারাইল ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। স্বাধীন এই নৃপতিকে খেলার মাঠে সাদা সিধা পোষাকে যে দেখিয়াছে, তাঁহার সহিত দুটা কথা যে কহিয়াছে সেই তাঁহার অনুরাগী হইয়াছে তৎক্ষণাৎ। আজ একদিকে প্রজাবৃন্দ তাঁহার বিয়োগে যারপর নাই ব্যথিত, অন্যদিকে ভারত জুড়িয়া খেলার মাঠে বিষাদসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে—"ভারতীয় ক্রিকেটের শিরে অশনিপাত হইয়াছে — পাতিয়ালা নাই—" কি ভাষায় স্বর্গতঃ মহারাজের পুত্র পরিজনকে আমরা সান্ত্বনা দিব! তাঁহার বিয়োগে আমরাও যে তাঁহাদেরই ন্যায় শোকার্ত্ত। শান্তিনাথ আমাদের সকলকে শান্তি দান করুন—মহারাজের পরলোকগত আত্মার সদগতি হউক।

অমরনাথ—ভারতবর্ষের যশস্বী ব্যাটস্‌ম্যান ও বলন্দাজ সর্ব্বজনপ্রিয় অমরনাথ ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত



ডব্‌লিউ জি গ্রেস্‌ (ক্রিকেট-জগতে অমর)



'রঞ্জী'

নেল্‌সন্ ক্লাব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া এ বৎসরের মত সেই ক্লাবভুক্ত হইলেন। অমরনাথকে পাইয়া নেল্‌সন্ ক্লাব সমধিক শক্তিশালী হইল। বিলাতী শক্তিশালী দলে খেলাইবার জন্য ভারতীয় খেলোয়াড় লইয়া যাওয়া কয়েক বৎসর ধরিয়াই চলিতেছে। ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলার ইহা খুবই সুনামের কথা। বিলাতী কোনও কোনও মুরুব্বি ভারতবর্ষে পা দিয়া কিন্তু প্রয়োজনমত উল্টা সুর গাহেন—খোকা ভুলাইবার ছড়া আওড়ানর মত। সেই জাতীয় মুরুব্বিদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি—এ দেশের খেলোয়াড় তাঁহাদের চক্ষে সত্যই যদি 'নড্ডা-গোপাল' 'পাঁজাকোলা' করিয়া ফিরাইয়া আনাইয়া এবং দলস্থ অন্যান্য খেলোয়াড়দের মনে পরস্পরের সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব জাগরিত করাইয়া। টেনিসন-পঞ্চদশ সম্প্রতি মুরুব্বিয়ানা করিয়া যাইতে পারিল—নায়াডু কোণ-ঠেসা হওয়াতে। আমাদের অপরিসীম শক্তির খর্ব্ব আমরা করিতেছি এইভাবে। এ ভাব বিদূরিত যদি না হয় খেলা-ধূলার সার্থকতা কি আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিবার আছে। অমরনাথ সম্বন্ধে 'বোম্বে কমিটি'র অভিমত সকলেই অবগত। অমরনাথ যে কোনো দোষে দোষী নহে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন



দলীপ সিং



অমরনাথ : লণ্ডনের নেল্‌সন্ ক্লাবের পক্ষে খেলিতে নিযুক্ত



'পতৌদি'

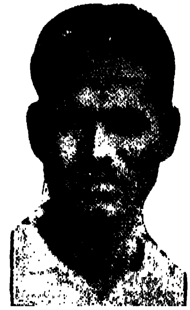
বোধ হয় তাঁহাদের 'জাত ভাই' এই ভাবে ভারতীয় খেলোয়াড় আমদানি করিতে এত আগ্রহান্বিত হয় কেন—ইংলণ্ডে ত' খেলোয়াড়ের অভাব নাই! মুরুব্বিরা মুরুব্বিয়ানা করিবার ঝোঁকে বোধ হয় ভুলিয়া যান—ইংলণ্ডের জাতীয় খেলা ক্রিকেটের ধরণ রক্ষীর ব্যাটমদারীর অভিনবত্বে তদনুরূপই করিয়া লইতে তাহাদের হয়। দলীপ, পতৌদি, নায়াডু, অমর সিং, নিসার, মার্চ্চাণ্ট বিলাতী যে কোনও দলের গৌরব বর্দ্ধন করিবে। ইহা ভুলিয়া তাঁহারা যাইলেও মুরুব্বিয়ানা অমানান হইতেছে না, মানাইয়া দিতেছি আমরাই—পরস্পরে পরস্পরের গলা চাপিয়া ধরিয়া। বিলাতে মানাইয়া দিয়াছি অমরনাথকে নেল্‌সন্ ক্লাব অমরনাথকে দলভুক্ত করাতে—তিলমাত্র দোষী হইলে নেল্‌সন্ ক্লাবে অমরনাথ যত বড় খেলোয়াড় হউন না কেন, স্থান পাইতেন না। স্বদেশ কর্ত্তৃক অবমানিত অমরনাথকে বিদেশের পরম সমাদর দানে আমরা সত্যই আনন্দিত। আশা করি ভারতীয় ক্রীড়ানুরাগী মাত্রেই আমাদের আনন্দের অংশ গ্রহণ করিবেন।

ক্রিকেট্ বোর্ড—ভারতবর্ষীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ পুনঃ পুনঃ আমরা করিয়াছি, করিতে বাধ্য হইয়াছি—ক্রীড়াক্ষেত্রে অনুসরণীয় উচ্চাদর্শকে পদে পদে পদদলিত করিবার বোর্ডের নিয়মিত

অভিযানে। নিখিল-ভারত নামধেয় হইবার ইহা যোগ্য কিনা, আমরা তাহা প্রতিবারই দেখাইয়া দিয়াছি। 'ভিজিয়ানাগ্রাম'কে বোর্ড নেতা নির্ব্বাচন করায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করিয়া আমরা তাহা করিয়াছি। অমরনাথ-ভিজিয়ানাগ্রাম ব্যাপারে ক্রিকেট্-বোর্ডই প্রকৃত অপরাধী বলিতে দ্বিধা বোধ আমরা করি নাই। টেনিসনের ভারত-অভিযান উপলক্ষে বোর্ড-নায়াডু রহস্যও উদ্ঘাটিত করিয়া দিই আমরা। অযথা অর্থব্যয় করিয়া বোর্ডের 'কাপ্তেনী' করার—সমারোহের চমক লাগাইয়া 'শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার উদ্দেশ্যে—ইঙ্গিত করি একমাত্র আমরা। দিল্লীর ক্রিকেট মসনদে বসিয়া বাঙলা এই মাসিক পত্রের গুরু অভিযোগ বোর্ড গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নাই। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত মন্তব্যাদি ক্রিকেট্ বোর্ডকে এবং 'ক্রিকেট্ ক্লাব অব্ ইণ্ডিয়া' পরিচালিত 'ক্রিকেট' পত্রে যথাসময়ে প্রেরিত হয়। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে অমরনাথ প্রসঙ্গে একবার আমরা বলি—অমরনাথকে অপমান করার প্রতিশোধ আত্মমর্য্যাদাশীল খেলোয়াড় মাত্রেই একদিন লইবে। গত সংখ্যার 'প্রবর্ত্তকে' নায়াডু, হিন্দু-জিমখানা ও কার্ত্তিক বসু প্রভৃতির কথা তুলিয়া বোর্ডের যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করিতে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সকলকে করিয়াছি। অভিযোগ পেশ করিয়াও তাহার প্রতি-বিধানের কোনও উদ্যোগ বোর্ড যখন কিছুতেই করিল না, তখন সাধারণের কাছে নিবেদন জ্ঞাপন করা ভিন্ন আমাদের দ্বিতীয় উপায় থাকে নাই। নিবেদন যথাস্থানে যাহাতে পৌঁছায় সে ব্যবস্থা করিতেও আমরা বাধ্য হই। বাঙলা মাসিক পত্র ইহার অধিক আর কি করিতে পারে! আমাদের আন্দোলনের অনুরূপ আন্দোলন বোম্বাই অঞ্চলের দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকাদিতে হইতেছে, আমরা লক্ষ্য করি। বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পত্রাদিতে বোর্ড সম্বন্ধে অসন্তোষের অনেক নিদর্শন লেখক প্রাপ্ত হয়। বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট অকস্মাৎ পদত্যাগ করিলেন। শুনা গেল বোর্ডের কার্য্য প্রণালীর সমর্থন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে তাই তাঁহার পদত্যাগ। বোর্ডের সম্পাদক ও সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন—লোকমতের প্রভাবে। এ ঘটনায় বোম্বায়ে উল্লাসের সীমা নাই। এ উল্লাস আমরা উপভোগ করিতে পারিলাম না। সম্পাদকই কি বোর্ড! সম্পাদকের ত্রুটি, বিচ্যুতি যদি হইয়া থাকে তাহার সমর্থন করিয়া ত্রুটি বিচ্যুতির অপরাধটা যে ঘাড়ে তুলিয়া লয় বোর্ডই—তাহা হইলে? জন-সাধারণের আস্থাহীনতার কারণে বোর্ডের সকল সদস্যেরই এ ক্ষেত্রে পদত্যাগ করা নীতি সম্মত। আমরা চাই বোর্ড, বোর্ড নামের উপযুক্ত হয়—এ দেশে ক্রিকেটের যথার্থ উন্নতি সাধনে ইহা একনিষ্ঠ হয়—ব্যক্তি বিশেষকে লইয়া ঘোঁট করা ক্রীড়াক্ষেত্রে দূর পরিহার না করিলে খেলাধূলার প্রধান উদ্দেশ্য—মানুষ তৈয়ারী করা ব্যর্থ হইয়া যায় যে!



আন্তপ্রাদেশিক হকি-প্রতিযোগিতায় বঙ্গদেশের কয়েকজন খেলোয়াড়



রূপসিং (গোয়ালিয়রের নেতা)

আন্তপ্রাদেশিক হকি—তিনটী দল প্রতি-যোগিতা করিবে সকলেই শুনে। (শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া

পড়ায়) প্রতিযোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় চারিটী। প্রত্যেক প্রতিযোগী দল তিন বাজী খেলিয়া জয়াঙ্ক যাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে বাজিমাত করিবে সেই দলই—অর্থাৎ লীগ প্রতিযোগিতার ধরণে শেষ জয়ী নির্দ্ধারিত হইবে, সকলেই এক মত হয়। তবে লীগের ফেরৎা খেলার ব্যবস্থা ইহাতে থাকে না। প্রতিযোগিতায় বঙ্গদেশই জয়-মাল্য ধারণ করিবে, খেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আমরা অনুমান করিয়াছিলাম। আমদের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। লোকবল গোয়ালিয়ারের খুবই ছিল। রূপসিং এবং 'ঝান্সি হিরোজে'র নামজাদা কয়েকজন খেলোয়াড় লইয়া গোয়ালিয়র আসরে নামে। আসর জমান দূরের কথা, গোয়ালিয়রের পক্ষে রূপসিংএর খেলার রূপ দেখিয়া তাহাকে চিনিবার উপায় থাকে নাই, এই সেই বিশ্ব-বিশ্রুত রূপসিং! তাহার পারিবারিক দুর্ঘটনার কারণেই ইহা ঘটে। প্রতিযোগী অন্যান্য দলেও ওদিক্‌কার নামজাদা খেলোয়াড়ে পরিপূর্ণ থাকে, বাঙ্গালার সম্মুখে কিন্তু দাঁড়াইবার শক্তি কুলায় নাই কাহারও। স্থানীয় দলের এ মিত্র ও আরিফের খেলা জয়ী দলের উপযোগী হইয়াছিল। ট্যাপ্‌সেল্, কার প্রভৃতিকে পূর্ব্ববৎ সমান তেজে খেলিতে দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম—বাঙলার হকি খেলায় প্রাধান্য লোপ পাইবার সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে নাই। খেলার ফল দাঁড়ায়—

বাঙলা	বনাম	গোয়ালিয়র	৪—১
ভোপাল	„	„	২—১
পাঞ্জাব	„	„	২—০
বাঙলা	„	পঞ্জাব	৩—২
ভোপাল	„	„	১—১
বাঙলা	„	ভোপাল	৪—০

জয়াঙ্ক তালিকা: বাঙলা ৬, পাঞ্জাব ৩, ভোপাল ৩, গোয়ালিয়র ০

হকি লীগ—স্থানীয় লীগ প্রতিযোগিতায় কাষ্টম্‌সের পুনরায় জয় সাফল্যের সম্ভাবনা। তাহারাই এখন প্রথম স্থানাধিকারী। রেঞ্জার্স দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও খেলায় কাষ্টম্‌সের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে। এ পর্য্যন্ত দুইটি খেলায় তাহাদের রক্ষণ ও আক্রমণ বিভাগের অল্প ভুলচুকে তাহারা দ্বিতীয় স্থানাধিকারী; মোহনবাগান, পোর্টকমিশনার, মিলিটারী মেডিকেল ও মোহমেডন যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকারী। দশম স্থানে আছে গ্রীয়ার, চতুর্দ্দশ স্থানে ভবানীপুর। মোহনবাগান এ পর্য্যন্ত দুইটি খেলায় পরাজিত হইয়াছে। মোহমেডনের খেলা বিশেষ আশা-প্রদ। হকিতেও তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছে। খেলার দোষ অপেক্ষা মন্দভাগ্য ভবানীপুরকে আগাইতে দিতেছে না। এ পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গোল গলাইয়াছে (২০) রেঞ্জার্সের সাম্‌টম্‌স্। র্থা (মোহনবাগানের) গোল করিয়াছে ষোল।



বোট্-রেস্‌জয়ী 'অক্সফোর্ড'

অন্যান্য লীগে—দ্বিতীয় দুই বিভাগে কাষ্টম্‌স্, দ্বিতীয় বিভাগে লিলুয়া এবং তৃতীয় বিভাগে সেণ্ট টমাস্ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চলিতেছে। ইহাদিগকে আর কাহারও স্থানচ্যুত করা বিশেষ কঠিন কার্য্য।

অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজ—এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাৎসরিক বাচ প্রতিযোগিতায় জয়ী এবারও হইয়াছে অক্সফোর্ড। কেম্ব্রিজ বারবার তের বার জয়ী হওয়ার পরে গত বৎসরে চাকা ঘুরিয়া যায় অক্সফোর্ডের দিকে। বিশ মিনিট পনের সেকেণ্ডে দুই 'লেংথে' অক্সফোর্ডের জয় সংঘটিত হইয়াছে।

সাময়িকী

সৎসঙ্গ-জননী মনোমোহিনী দেবীর মহাপ্রয়াণ

বিগত ৬ই চৈত্র রবিবার পাবনা-হিমাইৎপুরের সৎসঙ্গ-দেবতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ইষ্টময়ী জননী ও সৎসঙ্গের মাতৃস্বরূপিণী মনোমোহিনী দেবী মহাপ্রয়াণ করেন। হিমাইতপুরের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে ১২৭৭ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহার আবির্ভাব হয়।

ক্ষণিক হইলেও তাঁহার পরিচয়ের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। সাধারণ মাপ-কাঠীতে জননী মনোমোহিনীর



শ্রীশ্রীজননী মনোমোহিনী দেবী

সুদীর্ঘ জীবনেতিহাসকে বিচার, বিশ্লেষণ বা বিভাগ করিতে গেলে আসল মানুষটি অ-ধরাই রহিয়া যাইবে। ঈশ্বর-চিহ্নিতা এই নারী-বিগ্রহিণীর আশ্রয়ে একটা অখণ্ড ভাগবতী শক্তির দিব্য সৃজনের সহজ স্বতোস্ফূর্ত্ত লীলাচ্ছন্দই তাঁহার আগাগোড়া অসাধারণ জীবন-প্রবাহের অন্তর্গূঢ় অর্থ ও অভিপ্রায়—ইহা যাঁহারা চক্ষুষ্মান্ তাঁহাদের প্রথম দর্শনেই ধরা পড়িয়াছে। তাই বাল্যের সীমা অতিক্রম না করিতেই তিনি স্বপ্নে যে দীক্ষা লাভ করেন, তাহাই অষ্টম বর্ষ বয়ক্রম কালে আগরার রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের (সৎসঙ্গ) সদ্গুরু শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজের নিকট প্রত্যক্ষভাবে ঝালাইয়া লইয়া অটল সনিষ্ঠ পদসঞ্চারে, বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন-পথে শেষ পর্য্যন্ত আগাইয়া চলেন—যার পরিণতি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও হিমাইতপুর-সৎসঙ্গ। মরমী খাঁটি বাঙালী এই মহামাতৃকার রসঘন চিত্তক্ষেত্রে উপ্ত দয়ালবাগের যে অধ্যাত্ম বীজ, তাহাও বাঙ্‌লার সরস মাটি ও আব্‌হাওয়ার সুস্নিগ্ধ আবেষ্টনীর মাঝে একটা নব রূপান্তরের পর্য্যায়ে সমুন্নত হইতেই যেন দৃষ্ট হয়। শক্তি-মূর্ত্তি মা মনোমোহিনী ও মাতৃপ্রাণ আত্মনিবেদিত ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মধ্যে যে দিব্য সম্বন্ধ ও অলৌকিক সংমিশ্রণ, তাহা অভিনব মাতৃ-সাধনারই এক নিগূঢ় পরম ইঙ্গিত। এই সম্বন্ধ-রস-সঞ্জীবিত সৎসঙ্গ দিব্য মাতৃ-হৃদয়-বিগলিত অপার করুণাবগাহিত হইয়াই শনৈঃ শনৈঃ আলো ও অমৃতের পথে আগাইয়া চলিয়াছে। মহাকালের বিবর্ত্তনে শ্রীশ্রীমায়ের মর বিগ্রহের অপসারণ হইল, কিন্তু যে মহিমাময় নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব এই মহিয়সী দেবস্বভাবা নারী রাখিয়া গেলেন, তাহাই হইবে শুধু সৎসঙ্গের নয়, উদীয়মান নবীন জাতির গৌরব ও সান্ত্বনা। কিছুর পরিহার বিসর্জ্জন নয়, বর্ত্তমান পরিবেশের মধ্য দিয়াই ব্যষ্টি, পরিবার ও সমষ্টির যে পরিপুষ্টি, পরিবর্দ্ধন ও রূপান্তর তাহারই স্বতোবিকাশ ও সম্প্রসারণে হইবে ভারতজাতির স্বকীয় সমাজ-রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান এবং ইহাই এই মহিম্ন মাতৃজীবন-সাধনার পরম জাতীয় অবদান।

কবি হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী

১৩৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার দিবস কবি হেমচন্দ্রের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। ২রা বৈশাখ (১৩৪৫) হইতে সপ্তাহব্যাপী হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই উপলক্ষে হেমচন্দ্রের জন্মস্থান রাজবলহাট রাস্তাটির "হেমচন্দ্র রোড" নামকরণ, "হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থাবলী" প্রকাশ প্রভৃতি পরিকল্পিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের বাসস্থানে খিদিরপুরে ও পৈত্রিক ভবনে উত্তরপাড়ায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রভৃতি স্থানে সভার অধিবেশনও হইবে। দেশাত্মবোধের অন্যতম অগ্রদূত কবি হেমচন্দ্রের ম্রিয়মান স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া—

গতিশীল জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা করা জাতীয় জাগরণেরই লক্ষণ। এই জাতীয় বনিয়াদ রচনায় নবীন জাতির কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করি, কবি হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান বাঙালীর অকুণ্ঠ আনুকূল্যে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। এই জন্য যে অর্থসাহায্য ও সমিতির সদস্য হইবার চাঁদা, তাহা সমিতির কোষাধ্যক্ষের (১৩ নং হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট, খিদিরপুর) নিকট প্রেরিতব্য।

কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

আয়ুর্ব্বেদের ক্রমোভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়া আমরা আশান্বিত ও আনন্দিত। "আয়ুর্ব্বেদে ত্রিদোষতত্ত্ব" নামক গবেষণামূলক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া কবিরাজ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় এম, এস, সি, কবিশেখর মহাশয় ১৯৩৭ সালের জন্য লাহোর 'ভালাময়া পুরস্কার' মাদ্রাজের ডাঃ কৃষ্ণ রাওয়ের সহিত সংযুক্তভাবে লাভ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের



কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায়

মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ ক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবেষণামূলক অবদানের জন্য প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে "ত্রিদোষ তত্ত্বের" উপর মৌলিক রচনার জন্য শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় ১৯৩৬ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার জে, সি, ঘোষ পুরস্কারও লাভ করেন। রাষ্ট্র-সাহায্য-পরিপুষ্ট এলোপ্যাথি-প্লাবিত বর্ত্তমান যুগে কবিরাজ মহাশয়ের এই বায়ু-পিত্ত-কফ সম্বন্ধীয় মৌলিক গবেষণা শুধু এতাবত অবহেলিত আয়ুর্ব্বেদের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণই করিবে না, পরন্তু চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও নূতন আলোকপাত করিতে সমর্থ হইবে। দুই দুইবার নিখিল ভারতীয় সম্মান লাভ করিয়া তিনি যে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বাঙালী মাত্রেই গৌরব বোধ করিবে। কবিরাজ মহাশয়কে আমরা ব্যক্তিগতভাবে জানি। তাঁর অমায়িকতা, সদাচার, ভারতীয় ভাবানুগত জীবন ও চিন্তা সমাগত মাত্রকেই মুগ্ধ করে। তাঁহার এই সম্মানলাভে আমরা তাঁহাকে আমাদের অকপট অভিনন্দন জানাইতেছি।

সান্‌ডেস্ ডিবেটিং ক্লাবের চতুর্বার্ষিক জন্মোৎসব

গত ২০শে মার্চ্চ ৩০নং বিবেকানন্দ রোডে, অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়ের সভাপতিত্বে সান্‌ডেস্ ডিবেটিং ক্লাবের চতুর্বার্ষিক জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী উৎসব সভাপতিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া সকলকে স্বাগত সম্ভাষণপূর্ব্বক "অভিবন্দনা" শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের নিম্নলিখিত বাণী পাঠ করা হয়। "শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারকে আমার প্রীতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন। নানা কর্ম্ম ব্যস্ততা বশতঃ যোগদানে অসমর্থ হইলাম। আমার অন্তরের শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। বাণী আরাধনার ক্ষেত্রকে আমি তীর্থ মনে করি......আমার আকুতি—আপনাদের অনুষ্ঠান শনৈঃ শনৈঃ সত্য ঋতময় পথে পরিচালিত হউক।" তৎপরে রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় মহাশয়, ডাঃ সন্তোষকুমার মুখার্জ্জি প্রভৃতির বক্তৃতার পর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"সাহিত্যের স্বপ্নে থাকলেই চলবে না···বাঙ্গালী জাতটা স্বপ্ন বিলাসী হয়ে পড়েছে—তাকে এবার বাস্তবে ফিরে যেতে হবে, সতেজ রক্ত সঞ্চয় করতে হবে"—ইত্যাদি।

উৎসব উপলক্ষে গান, বাদিত বাদন ও "বসন্তোৎসব" গীতিনাট্য অভিনয় হইয়াছিল।

শুভ পরিণয়

টাঙ্গাইলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ গুহ মজুমদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সহিত সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর প্রফেসর পি, সি, সরকারের শুভ পরিণয় সম্প্রতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় ও কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবদম্পতীর জীবন-পথ শুভ ও নিরাময় হউক, ইহাই কামনা করি।



চন্দননগর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ নারী-মন্দিরে ফরাসী ভারতের গবর্ণর



কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি পুনর্নিয়োজিত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

মেদিনীপুরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

কলিকাতার বাহিরে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠান ইহাই সর্ব্বপ্রথম। এইদিক্ দিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। এইরূপ সম্মেলনের সাফল্যের জন্য যেরূপ বহুমুখী আয়োজন ও ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহারও কোন প্রকারের ক্রটি এই মফঃস্বলে হয় নাই। ১৯ ও ২০শে মার্চ্চ, এই দুই তারিখে মোট পাঁচটি অধিবেশনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক্ যথা—"বিদ্যালয় ও শিশু পাঠাগার", "সাধারণ ও বিশেষ গ্রন্থাগার", "পল্লী অঞ্চল ও সহরের গ্রন্থাগার", "গ্রন্থাগার-তত্ত্ব" প্রভৃতি শিক্ষনীয় বিষয়ের আলোচনা হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থাগারকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য দেশ-বিদেশের বহু সংগ্রহ ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাও হইয়াছিল। জাতীয় জীবন-গঠনে গ্রন্থাগারের স্থান শিক্ষার মতই অতি উচ্চে এবং অপরিহার্য্য। অতএব এই আন্দোলন যতই প্রসারলাভ করে ততই মঙ্গল। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, আগামী বর্ষে এই সম্মেলন কুমিল্লায় আহূত হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিহাররঞ্জন রায় মেদিনীপুর সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন এবং উদ্বোধন করেন কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়। উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিনা চাঁদায় পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থাই" হইবে এই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মেদিনীপুর সম্মেলন হইতে ইহা ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইতে সুরু হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব

সম্পাদক প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ, চন্দননগর, ষোড়শ বর্ষীয় অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছেন :—

অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব এবার ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উদ্যোগে বাংলার এই অতি প্রাচীন শ্রীমন্দিরকে ঘিরিয়া বর্ষে বর্ষে যে উৎসবের আয়োজন হয় তাহা অভ্যুদয়শীল জাতির জীবনে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করে। এবারকার উৎসবের বিশেষত্ব, শ্রীমন্দিরের বিগ্রহ অপহৃত হওয়ায়, নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা। আগামী ১৯শে বৈশাখ সোমবার (১৩৪৫) হইতে উৎসব আরম্ভ। তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উৎসবকাল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার প্রাণে শিক্ষা উৎসাহ ও আমোদের হিল্লোল তুলিবে।

ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ভাব ও আদর্শের অনুপ্রেরণায় উৎসবের সঙ্গে একটী বিপুল প্রদর্শনীও সংযুক্ত হইয়া থাকে। নানাবিধ শিল্প, কলা, সাহিত্যের সহিত এবার গীতার মর্ম্মকথা দশটী দৃশ্যে মৃন্মূর্ত্তি ও বাণীর আলিপনায় ফুটাইয়া তুলা হইবে। আর এই শ্রীমন্দিরের শতাব্দির অধিককালের পূত ইতিহাস এবং এই ষোড়শ বর্ষব্যাপী প্রদর্শনীর শিক্ষা ও সাধনার স্মৃতিচিত্র সর্ব্বজন সমক্ষে সুচিত্রিত করা হইবে। ভারতীয় আদর্শের অনুগত ভারতীয় ভাবময় একটী সমাজ-চিত্র মূর্ত্তি সহযোগে প্রদর্শিত হইবে। স্বাস্থ্যের ও শিল্প-কলার বিবর্ত্তন দেখাইতে রেখাচিত্রে ও উপকরণাদি সংগ্রহ করা হইবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই উৎসব নবজাতির উৎসব। ইহা একটী লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধার। মহশ্মশানের উপর পঞ্চমুণ্ডির আসনে শ্রীমূর্ত্তির প্রণব-বিগ্রহ নারী-পুরুষের অন্তরে জাতীয় ভাব ধারা উৎসরিত করিবে। আমরা বাংলার উদীয়মান জাতিকে এই উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি। জাতি গঠনের পথে ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া তরুণের এই জয়যাত্রা শ্রীভগবানই সিদ্ধ করিবেন। নবতীর্থে প্রেম ও ঐক্যের বাণী-মূর্ত্তির বেদীতলে বাংলার নারীপুরুষের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দিব্যস্মৃতি উৎসব

রঙ্গপুর সহরের নিকটবর্ত্তী "ভীমের গড়" নামক স্থানে গত ২০শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহোদয়ের সভাপতিত্বে মহারাজ দিব্যের চতুর্থ বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাজহাটের রাজা গোপাল লাল রায় মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই বিপুল জনসভায় 'ভীমের গড়', 'ভীমের জাঙ্গাল', 'ভীমের বাতি' প্রভৃতি সযত্নে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা আশা করি, সরকার ও জনসাধারণ বাঙালার এই শেষ স্বাধীন নরপতির পুণ্যস্মৃতি রক্ষাকল্পে সযত্নপর হইতে কুণ্ঠা করিবেন না।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী



'কামারশাল'

শিল্পী—শ্রীসতীন সাহা।

২৩শ বর্ষ [illegible]ম খণ্ড ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৫

প্রবর্ত্তক



ভগবানের মানুষ

তুমি ভগবানের। শুধু প্রেম দিয়ে সম্বন্ধ। প্রবঞ্চনা থাকলে পবিত্র সম্বন্ধ ব্যর্থ হবে। কিসের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হবে? আর সব সাময়িক সত্য—ভগবানকে পাওয়াই নিত্য শাশ্বত।

তুমি ভগবানের। তাই তোমার স্বভাব ভাগবত। প্রেম তোমার গুণ ও ভাব। তাই সব তোমার প্রেম—কোথাও কাম নাই, কোথাও আসক্তি নাই, অসন্তোষ নাই।

কথা তোমার প্রেম। দুঃখ-বহনের শক্তি—প্রেম। তোমার সব কাজই প্রেমের। সাংসারকে দিব্য কর প্রেমে। তন্ময়—তদ্গত যে, তার দৃষ্টিতে অমৃত ঝরে, আচরণে তাপদগ্ধ চিত্ত পায় সান্ত্বনা।

ভিখারী ভগবান। ধন্য হও, তাকে ভিক্ষা দিয়ে। বদ্ধাঞ্জলী—প্রেম-ভিক্ষা দাও। কার্পণ্য কোথাও না থাকে। সমগ্র দেওয়া যায়—প্রেম-সহযোগে। আর তবেই সমগ্রকে পাওয়া যায়—সবখানি দিয়ে। জীবনের সার্থকতা এই ছন্দে।

ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা—প্রেমাশ্রয়ীরই জীবনে। ইষ্ট মানুষ নয়—ভগবান। ভগবানের মানুষ, তাঁর অমোঘ ইচ্ছাশক্তি প্রাণে ধারণ কর। বুকে ঈশ্বরপ্রসাদ—অমৃত আর আনন্দ।

এই যোগ নূতন স্বভাব দেয়—দেহ, মনের আনে নব পরিবর্ত্তন। ইষ্টগত হয়ে এই নবজন্ম পাওয়া। অতীত বিস্মৃত হয়ে নব স্মৃতি লাভ করা। ঈশ্বরের চাওয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করে দেহে, মনে, রূপান্তরিত জীবনে। তখন অসাধারণ শক্তির অভ্যুদয়। ইহাই তো দিব্য জীবন।

এস, দীক্ষা নাও নব-জন্মের। ভয় নাই—অভয় হস্তে দেবীর আশীর্ব্বাদ এখানে মূর্ত্ত। সর্ব্বাঙ্গে পবিত্রতা। নিষ্কলুষ প্রেমের মহিমা দুরতিক্রমণীয়। তুমি আর সে—চেতনা ঘন হয়ে যে পরম যুক্তি, জীবনের তাহাই অমৃত-তত্ত্ব।

জীবনবাদের ভিত্তি

শুধু আহার, নিদ্রা ও সম্ভোগ লইয়া মানুষের যে স্বভাব-ধর্ম্ম, তাহা হইতে উন্নত চেতনায় দাঁড়াইয়া জীবন-যাপনের ব্যবস্থা বেদে আছে, তন্ত্রে আছে। ভারতের ধর্ম্ম ইহার উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। ঋষি হারীত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রুতি বৈদিকী ও তান্ত্রিকী, দ্বিবিধ বলিয়াছেন। বেদে আচার-নিষ্ঠা। তন্ত্রে ভাব-নিষ্ঠা। অল্পায়ুঃ জীবের পক্ষে আচার অপেক্ষা ভাব-সাধনাই শ্রেয়ঃ। এই জন্য এযুগে তন্ত্রই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। তন্ত্র বেদ-প্রচারের অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রুতি-বচন জীবনে সিদ্ধ করিতে হইলে যে ভাব ও আচার, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হয়। ধর্ম্মের অনুশাসন-বাক্য স্মৃতি নামে কথিত। এ জাতি প্রকৃত জীবন-বাদকে তুরীয়ে লইয়া যাইবার জন্য বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মপ্রসাদ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব তন্ত্রপ্রবর্ত্তিত জীবনে ভাবাধিক্য হইলেও, উহা একেবারে আচার-বর্জ্জিত নহে। আমরা প্রথমে প্রাকৃত জীবন-যাত্রার ভিতর দিয়া তুরীয় ক্ষেত্রে যাওয়ার দিক্‌টাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম বাঁচা। বাঁচিতে হয় শরীর, মন ও আত্মচেতনা লইয়া। চেতনাই শরীর মনকে আশ্রয় করিয়া আত্মধর্ম্ম পালন করে। এই হেতু শরীরের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও রক্ষণ ভোজনাদি ব্যাপারের উপর নির্ভর করে—কর্ম্মক্লান্ত শরীর-মনের কথঞ্চিৎ বিশ্রাম নিদ্রায় হয়। নিদ্রারও প্রয়োজন বাঁচার জন্য অস্বীকার্য্য নয়। শরীর নশ্বর। চেতনা অবিনশ্বর। এই হেতু দেহাদির নৈরন্তর্য্য-রক্ষায় বহু হওয়ার আকুতির রস ও আনন্দ স্বরূপেই নিহিত। আপনাকে বিস্তৃত করার স্বভাব-নিয়ন্ত্রিত উপায় সম্ভোগ-প্রবৃত্তি। ইহাও তাই জীবনের অনিবার্য্য ধর্ম্ম। শুধু মানুষের নয়, জীব-জগতেই এই ভাবটি অনুস্যূত। সংসারে আমরা দেখি—জীবের সব কাজই আপনাকে ঘিরিয়া। আত্মপ্রসাদ-লাভের ইহা অকাট্য নীতি। অতএব মানব-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে আত্মপ্রসাদের উপর। যাহাতে আত্মপ্রসাদ নাই, তাহাতে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয় না। এই আত্মপ্রসাদের অভিলাষকে আমরা স্বার্থও বলিয়া থাকি। স্বার্থ কামনারই নামান্তর বলা যায়। কামনা হৃদয়ের বৃত্তি। জীবন-ধারণের উক্ত মৌলিক ধর্ম্মত্রয় যখন সুচারুরূপে চরিতার্থ হয়, তখন আহার, নিদ্রাদি ব্যতীত আরও বহুপ্রকার হৃদয়বৃত্তি প্রস্ফুরিত হয়। মৌলিক জীবন-নীতিকে অতিক্রম করিয়া মানুষ চলিতে পারে না। যদি এই ভাবে চলায় কেহ বাধ্য হয়, কোন বৃত্তিই তার সাবলীল সতেজ হয় না। মানুষ দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

আমরা একদিন অশেষ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অসংখ্য প্রকার কমনীয় বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। স্বভাব-ধর্ম্ম পালন করাও যে একটা আয়াসসাধ্য ব্যাপার, তদ্বিষয়ে দীর্ঘদিন উদাসীন হইয়াছিলাম। তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এ জাতির ভিত্তি-ক্ষয় হইয়াছে দেখা যায়। স্বভাব-ধর্ম্ম বলবান্, কিন্তু আজ তাহার পুষ্টির পথ প্রশস্ত নহে। সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নরকঙ্কালের দলই তাই লক্ষ্যে পড়ে। ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে সমাজ, অর্থ, শিক্ষা, সর্ব্বক্ষেত্রে—শিল্পে, সাহিত্যে, কাব্যে প্রাণের সঙ্গীত উঠে না, মরণের বিভীষিকাই ঘনাইয়া উঠে। মানুষ যখন চাহে ইহলোকে কীর্ত্তি, পরলোকে অনুপম সুখ, তখন তাহার ভিত্তি-স্বরূপ জীবনের আদি-ধর্ম্ম অক্ষুন্ন আছে বুঝিতে হইবে। এই ধর্ম্ম অনাস্থায় অস্বীকারে নির্ম্মূল করিয়া কোন ক্ষেত্রে যশঃ বা শ্রেয়োলাভ হয় না। ঐহিক জীবনের উন্নত বৃত্তিই যখন পুষ্টি পায় না, পরলোকের আর কা কথা!

ভারত ব্যতীত জগতের অন্য সর্ব্বত্র মানব-সভ্যতা উক্ত জীবননীতির উপরই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থবিজ্ঞানে তাই জীবনের পরিচয় পরিস্ফুট। আমরাও একথা অস্বীকার করি না। আমাদেরও কথা—যদিও 'কামাত্মতা নো প্রশস্তা' অর্থাৎ কামাত্মা হওয়া প্রশংসার বিষয় নহে, কিন্তু কামনার অতীতও হওয়া যায় না। নিখিল বৈদিক ধর্ম্মও এইজন্য কামনার বিষয়ীভূত

হইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছে "যৎ যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তৎ তৎ কামস্য চেষ্টিতম্"। অর্থাৎ মানুষ যাহা কিছু করে, সকলই কামনাপ্রেরিত। কাম্য বিষয় শরীরযাত্রার প্রয়োজনাদি হইতে যাবতীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃত্তি সবই আমাদের ইন্দ্রিয় মনের আসক্তি-দূষিত। এই যে জীবনের সত্যটাকে স্বীকার করিয়া লওয়ার আকূতি, তাহা বস্তুতঃ জীবনের উপকারী না হইয়া জীবনবাদকে যে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহার কারণ আমরা এই সহজ ধর্ম্মটাকে নাকচ করিয়া চলারই প্রচেষ্টা করিয়াছি। তাই জীবনের সহজ কর্ম্মপ্রেরণার মৌলিক নীতি হেয়ঃ চক্ষে দেখার জন্য শাস্ত্র সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন—যে কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হয় আর যে জন কাম্যবিষয় ত্যাগ করে, এই উভয়ের মধ্যে ত্যাগবান্ পুরুষই শ্রেষ্ঠ। কামনা ব্যতীত কর্ম্ম হয় না। এইটুকু স্বীকার করিয়া আমরা কামনার অতীতেই পাড়ি দিয়াছি। বেদে কণ্টক দিয়া কণ্টকোৎপাটনের চেষ্টা। গীতায় কণ্টক-স্পর্শও নিষিদ্ধ হইয়াছে। গীতা শোনায়—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

কাজেই কামনাত্যাগের দায়ে আমরা গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিতে জীবনের ভিত্তি ভাঙ্গিলাম। কামনা-ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিলাম। ঐহিক সব-কিছুর প্রতি আস্থা হারাইলাম। যে আগুন সর্ব্ব শরীরে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সঞ্চারিত থাকিয়া জীবন উদ্বুদ্ধ করিতেছিল, তাহা নিভিয়া গেল স্বতঃই—আমরা হইলাম লয় ও মোক্ষমার্গী, অমৃত-লোকের যাত্রী। ভারতের এই অধ্যাত্ম-যুগ জীবনকে দোটানায় ফেলিল। শরীর পুষ্টি পাইল না। মনও স্বধর্ম্ম হারাইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। আত্মার বহু হওয়ার যে সৃজনী প্রেরণা, তাহাও রুদ্ধ হইল। জীবনের প্রয়োজন ফুরাইলে যাহা হয়, তাহার বাকি কিছু রহিল না; কিন্তু আশ্চর্য্য, জীবন-প্রবাহ তবুও শুষ্ক হইল না। উহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আপনাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিল। এই অবস্থার জন্য দায়ী কেহ নহে। ভারত অতি প্রাচীন জাতি, স্বভাব-গতি পরিণত মূর্ত্তি লইয়া অভ্যুত্থানের পথে লইয়া চলে; মর্ত্ত্যের বুক হইতে পূর্ব্ব গতি-ছন্দের শিকড় সে উপাড়িয়া লইল। এই সমস্যার সমাধান শীঘ্র হওয়া সম্ভব নহে। জীবনের স্বভাব-ধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া আমরা যতটা বড় হই, তাহার পরিমাপ সুপ্রাচীন এই জাতিটা স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। উন্নতির সীমায় গিয়া তাহার কণ্ঠে উঠিয়াছে ছোট্ট একটী কথা 'নাল্পে সুখমস্তি'—তাহার চাই শাশ্বত সুখ। ঐহিক ও পারত্রিক বলিয়া জীবনের ব্যবধান সে ভুলিয়া যাইতে চাহে। অখণ্ড সুখ, অখণ্ড জীবনেই লীলায়িত হইতে পারে। এ স্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়াছে। ভারতীর বীণায় তাই বাজিয়াছে 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'।

এই বৃহত্তর জীবনের পথে উন্নীত হওয়ার জন্য শাস্ত্র-প্রবর্ত্তিত উপায় সবখানি দিয়া আশ্রয় করা হয় নাই, আবার স্বভাব-জীবন-ক্ষেত্রে পরিক্রমণ করাও এ জাতি সম্ভব করিতে পারে নাই।

একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ভারতীয় শাস্ত্র-প্রবর্ত্তিত স্বভাব-জীবন-যাত্রার ভিতর দিয়া অপ্রাকৃত জীবন-লাভের পথ ইহাতে প্রদর্শিত হয় নাই। ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য, অর্থ গৃহ, কাম লোক-হিত, আর মোক্ষ লয় ও নির্ব্বাণ। আমরা গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষায় যে বীর্য্য লাভ করিতাম, সেই বীর্য্যই অর্থাদির সাধনায় গার্হস্থ্য-জীবনে নিরত হইত। তারপর গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া লোক-হিত-ব্রতে জীবনের আয়ুঃ-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। পরিশেষে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া পরম নির্ব্বাণ-লাভের পথে আমরা অগ্রসর হইতাম। শাস্ত্রে স্পষ্টই কথিত আছে—গৃহস্থ যখন দেখিবেন, আপনার গাত্রচর্ম্ম লোল হইয়াছে, গলিত দন্ত, পলিত কেশ হইয়াছে, তখন তিনি যে পর্য্যন্ত দেহের পতন না হয়, ততদিন জল-বায়ু ভক্ষণ করিয়া মরণের প্রতীক্ষা করিবেন। এই পরম সন্ন্যাস সর্ব্বতোভাবে ঐহিক জীবনের সহিত বিযুক্তি। সন্ন্যাসী অগ্নিহীন, বাসহীন, জরা-ব্যাধির প্রতিকারে উদাসীন থাকিবেন, ব্রহ্মযুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। জীর্ণ দেহের বিসর্জ্জনে তার পরম গতি লাভ হইবে। হিন্দু কৃষ্টি প্রতি মানবকে ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া, যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বার্দ্ধক্যে প্রব্রজ্যা লইতে বলে। এই সুমহান্ আদর্শ চরমে পরম নির্ব্বাণ লক্ষ্যে থাকায়, সমস্ত জীবনটাই প্রাক্তন কর্ম্মক্ষয়ের হেতু বলিয়া মনে হয়। জীবনের এই ক্রমগুলি মানব

মাত্রের উপর চাপাইয়া দেওয়ায় ভারত-সমাজে মানবাত্মা বিদ্রোহ করিয়াছে। বর্ণাশ্রম ও আশ্রম-চতুষ্টয় তাই ভাঙ্গিয়া যাইতে দেখি। ইহা সংযম-রক্ষার সহায়ক হয় নাই—পারত্রিক উর্দ্ধমুখী প্রেরণার আশ্রয়রূপেও আস্থা রক্ষা করে নাই। আমরা শাস্ত্র-কথিত পরম ধর্ম্ম সশ্রদ্ধায় মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেও, আত্মার অভ্যুত্থান এবং আত্মচেতনার মুক্তি লাভ হয় বলিয়া বিশ্বাস-রক্ষা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। কায়, বাক্ ও মন মানবের ঐশ্বর্য্য—এই ত্রিদণ্ড যেখানে উন্নত প্রেরণায় শাস্ত্রের সুদীর্ঘ ক্রমে অনুবর্ত্তিত হইয়া মাথা তুলিতে চাহিয়াছে, জাতির জীবনে আশার সঞ্চার সেইখান হইতেই হইয়াছে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আযৌবন ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষায়, আপ্রৌঢ় গৃহ-সম্ভোগে শক্তি-লাভ হয়, ইহা অস্বীকার্য্য নহে। জীবনের প্রথম ভাগে সত্য ও সংযম প্রভৃতির সাধনায় চিত্ত যত দৃঢ় হইবে, জীবনসংগ্রামে আমরা ততই বীরের মত অগ্রসর হইতে পারিব। এই নীতি সমাজ-জীবনের পক্ষে অমৃতস্বরূপ, ইহা সারা বিশ্বকে একদিন স্বীকার করিতে হইবে। স্বভাব-জীবনের এই পথ কিন্তু হঠাৎ শরীরের অবস্থাবিশেষের সহিত একেবারে রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য আর এক নূতন প্রেরণা ভারতাত্মা অনুভব করিল। প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রের ন্যায় ইহার বিধি-নিষেধ এখনও রচিত হয় নাই। অনুভূতির ক্ষেত্রে এক অপার্থিব আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু-কৃষ্টির প্রাচীন রীতিনীতির বন্ধন এই অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারে না। মানবাত্মাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার অনুশাসন চিরদিনের জন্য নয়—সে যুগ ফুরাইয়াছে। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহের ধর্ম্ম একটা জাতি-বিশেষের সীমায় নির্দ্ধারিত রাখা এক যুগে সম্ভব হইলেও, সর্ব্ব যুগে তাহা সম্ভব হয় না, বর্ত্তমান যুগ তাহার প্রমাণ। জীবনের কর্ম্মরূপে সংক্ষেপতঃ যাহা নিরূপিত হয়, তাহা জাতি-বিশেষের মধ্যেই সংখ্যানুসারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেই মানবাত্মা যে সীমার মধ্যে চিরযুগ আবদ্ধ থাকিবে, গতানুগতিক ধারা স্বীকার করিয়া লইবে, এমন অন্যায় দাবী চিরযুগ চলে না। মানুষের স্বরূপ-নির্ণয়কালে তাহার গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করার জন্য এককালে এই সকলের শ্রেণীনির্ণয় অসঙ্গত হয় নাই। আজ প্রজা-রক্ষিণী শক্তি যাহার আছে—অধ্যাপনার শক্তি, কৃষি-বাণিজ্যের মস্তিষ্ক, সেবার অধিকার যে তাহার থাকিবে না, এমন কথা বলা যায় না। এক সঙ্গে অনেকগুলি গুরুতর বৃত্তি-প্রকাশ মানুষের জীবনে সম্ভব নাও হইতে পারে। কেন না, মানুষের পরিমিত শরীরের শক্তিও সীমাবদ্ধ। কিন্তু এইজন্য বৃত্তিগুলি এক এক বর্গের মধ্যে বন্দী করিয়া, এক এক শ্রেণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলে, নিখিল বৃত্তি প্রত্যেক মানুষের যে অধিকারভুক্ত, মানুষের এই বিশ্বাসে উহা নাকচ হইয়া যায় না। শুধু বৃত্তি নয়, ধর্ম্মশীল আচার আভিজাত্য সুনির্দ্দিষ্ট বংশগত রাখা সম্ভব নহে—ইহার ব্যাপক প্রকাশ অনিবার্য্য। ভাল ও মন্দ, দুইই জগৎপ্রাণ সমীরণের ন্যায় সর্ব্বত্রগ। সংস্কৃত ক্ষেত্রে সদ্‌গুণ, অসংস্কৃত আশ্রয়ে অসদ্‌গুণ প্রকাশিত হয়। বংশ-পরম্পরার ক্ষেত্র যেখানে সুমার্জ্জিত, শ্রেয়ঃ লক্ষণ সেখানে সহজেই প্রকাশ পায়। কিন্তু দীর্ঘ দিনের উপেক্ষিত ক্ষেত্র সতের অনুশীলনে সদ্‌গুণাশ্রয়ী হইতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত আজ বিরল নহে। শরীর, মন ও বাক্য শুভাশুভ কর্ম্মে মানুষকে উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি দান করে। মন যেখানে অন্যায় চিন্তা হইতে বিরত, আত্মজ্ঞানরত, ঈশ্বর-চেতনায় সংযুক্ত—বাক্য যেখানে সত্য, পরনিন্দা-বিরত, নিষ্প্রয়োজন অসম্বন্ধ-প্রলাপে নিযুক্ত নহে—দেহ যেখানে অহিংস, বিশুদ্ধ, অব্যভিচারী—সেখানে মানুষ দিব্য আনন্দ ও শান্তিতে অভিষিক্ত। যাহা সৎ ও সুন্দর, তাহাতে সর্ব্বজনের অধিকার। কোন শক্তিমানের বিধান যদি অনুদার হয়, লোক-কল্যাণ তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়। অতীত ভারতের সহিত বর্ত্তমান ভারতের এই সংঘর্ষ আজ উপস্থিত। প্রাচীনের শাসন-শৃঙ্খল হইতে কৃষ্টির দিক্ দিয়া এই বিশাল জাতি আজ মুক্তি পাইয়াছে। ইহার ফলে অন্য বন্ধন সে গলায় পরিয়াছে বটে, কিন্তু মানবতার যাহা পরম লক্ষ্য, তাহা যদি সর্ব্বজাতির দৃষ্টিপথ হয়, ভারতের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল নহে।

এই পর্য্যন্ত আমরা স্বভাব-জীবনের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমুন্নত মানব-চরিত্রের আদর্শ ও তাহার ক্রমোন্নতি-চিত্র পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিলাম। ইহার উপরে মানুষের

এক অপরূপ স্বপ্নলোক আবার গড়িয়া উঠিতেছে। মানুষ কায়ার অনুশীলনে, বাক্যের ও মনের অনুশীলনে, অপার্থিব অভিনব চরিত্র লাভ করিতে পারে, কিন্তু মানব-জন্ম হইতে তাহার মুক্তি ইহাতে সম্ভব নহে। এই দেহাদির পরিণতি সুন্দর হইতে সুন্দরতর হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু এই দেহে দেহান্তর হইয়া শ্রীভগবানে নবজন্ম —এই স্বপ্নই আজ একমুষ্টি মানব-চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। এখানে অসৎ হইতে সতে নহে, অন্ধকার হইতে আলোকে নহে, ঐহিক হইতে পারত্রিকে নহে, অনন্তত্বকে মানুষ আপন জীবনে অবতরণ করাইতে চাহে। পুনর্জ্জন্মের দায় লইয়া এই ধর্ম্ম সাধ্য নহে, জন্ম ও কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া ইহা এক অভিনব জীবনবাদ। এখানে ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য নহে—গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ নহে, বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ক্রম ধরিয়া চলা নহে। সমগ্রত্বকে জীবনে ইহা অবধারণ করিয়া, নিজেকে এই অসীমের সহিত মিলাইয়া, এক করিয়া জীবন-মরণ প্রভৃতি পৃথিবীতে যত দ্বন্দ্ব আছে, সবের উপরে ভাগবত-জীবনের প্রতিষ্ঠা। সেই আশ্চর্য্য অপরূপ নব-জন্মের কথাই আমরা অতঃপর বলিব। আজ মানুষ চলিতেছে—সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এমন একজনে সংযুক্ত হইতে, যে জন অনন্ত, অনাদি—যাহার লয় নাই, মোক্ষ নাই, শ্রেয় নাই, সমাধি নাই। এই অখণ্ড শাশ্বতে যুক্তির সাধন-পথে মানুষের জয়-যাত্রা যে অসম্ভব নয়, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। সে ক্ষেত্রে মানুষের শরীর-ধর্ম্ম ঈশ্বরের। মন ও আত্মার ধর্ম্ম শ্রীভগবানে অন্বিত হইয়া মানুষ হইবে শ্রীনারায়ণের বিগ্রহ। এই বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীপুরুষোত্তম—শুধু ধ্যানে নহে, স্বপ্নে নহে, জীবনে তাহা মূর্ত্ত করিয়া বিশ্বমানব এক অভাবনীয় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আবিষ্কার করিবে। আর সে আবিষ্কার ভারতেই হইবে, ভারতবাসীই করিবে। তাই আজ বলি—তাহারাই ধন্য, যাহারা ইন্দ্রিয়বিহীন না হইয়াও অতীন্দ্রিয় জগতের অমৃত জীবনে অধিকার করিয়া অমল নিষ্পাপ তীর্থ-রচনা করিবে বিশ্বমুক্তি লক্ষ্যে রাখিয়া। সেদিন সুদূর হইতে পারে, তবে সেদিন আসিবেই—ইহা নির্ভয়েই বলিতে পারি। একথা ক্রমে বলিব।

অনুতপ্তা

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

আঁখি দুটি ছল-ছল
বল বল কা'র তরে,
কেন হেন উদাসিনী,
হাসি বাসী শ্রীঅধরে ?
যে গিয়াছে অভিমানে
পাইয়া বেদনা প্রাণে,
কেমনে ফিরা'বে তা'রে
নিজে না কাঁদিলে পরে ?

যে বিরাগে চ'লে গেছে,
আনো তা'রে অনুরাগে ;
দয়িত রহে কি দূরে
প্রাণে যদি প্রেম জাগে ?
বসনে মাখায়ে রঙ্
যোগী সে সাজিল সঙ্,
প্রেমে না রাঙায়ে মন
না পাইল মনোহরে !

চিন্তা-বীথি —

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ঐক্য বনাম স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলিয়াছেন। স্বাধীনতার জন্য দেশবাসী সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন; আবার দেশের বর্ত্তমান জটিল অবস্থায় সেই ঐক্যের পথে যে বাধা ও অন্তরায়, তাহাও স্বাধীনতা ভিন্ন দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এইরূপ একটা অন্তহীন কূট-চক্রে দেশের অবস্থা ঘূর্ণিপাক খাইতেছে—কোনও মুস্কিলের আসান যেন দৃষ্টিগোচর হয় না।

* * *

ঐক্য বলিতে এ দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে দাবী ও চাওয়ার একটা সমীকরণ সাধন করিয়া, সম্মিলিত ইচ্ছা ও শক্তি-প্রয়োগের অনুকূল অবস্থাই বুঝায়। ইহাকেই এক কথায় সংহতি-সাধনা বলা যাইতে পারে। শুধু মুক্তির জন্য কেন, যে কোন লক্ষ্যসাধনের জন্য এইরূপ সম্মিলিত ইচ্ছা ও চেষ্টায় প্রবল সংহতিরচনার একান্ত আবশ্যক আছে। এইরূপ সংহত ইচ্ছাই প্রতিকূল সকল বাধা ও অবস্থা বিদীর্ণ করিয়া, চাওয়াকে পূরণ করার শক্তি প্রাপ্ত হয়। বহু'র দাবী এক হইয়া যে মহাবীর্য্য ধারণ করে, তাহা বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। ইহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকি। ঐক্যবদ্ধ দাবীর সম্মুখে পৃথিবীর প্রবলতম বাধাও কি এক ইন্দ্রজালিক প্রভাবে যেন নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। এই সংহত চাওয়া হিংস, অহিংস অর্থাৎ সশস্ত্র নিরস্ত্র উভয় প্রকার আয়ুধ ও উপকরণরাশির মধ্য দিয়া আপনার দুর্জ্জয় দুর্ণিবার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—শক্তি আয়ুধ নহে, পশুবল নহে, জনসংখ্যাও নহে, এইগুলি শক্তির আশ্রয়—আসল শক্তি প্রবল, সুদৃঢ় ইচ্ছা-শক্তি—ইহা যখন সংহত হয়, তখন তাহা জড় অজড় সকল প্রকার সহায় সংগ্রহ করিয়া আত্মাভিব্যক্তির পথ কর্ত্তন করিয়া লয়। গোমুখী-নিঃসৃত গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় ইহা অনিবার্য্য বেগে শৈল হইতে শৈলে আপতিত হইয়া, সকল বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া সাগর-লক্ষ্যে ধাবিত হয়। মানবেচ্ছার এই সংহত-মূর্ত্তিই স্বাধীনতার—সাম্রাজ্যের—সকল প্রকার অসাধ্য সাধনার একমাত্র নিদান।

* * *

কিন্তু এইরূপ ঐক্য শ্রেণী-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে পরিকল্পনা করা আজ আমাদের পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পরস্পর ভাব ও আদর্শগত, কৃষ্টিগত এবং আচারগত এতই দূরতা ও পার্থক্য, যে তাহাদের মধ্যে সমষ্টিগত মিলনের স্বপ্ন ক্রমেই দূর হইতে দূরতর সরিয়া যাইতেছে। চেষ্টা, চুক্তি সবই ব্যর্থ হইতেছে। শুধু একটা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নহে, প্রত্যেকটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নিজেরই মধ্যে এমন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বর্ত্তমান, যাহা উপেক্ষা বা নাকচ করিয়া ঐক্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। ভারতের জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশ-পথে শুধু হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি বিশিষ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-গুলির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে মিলনচেষ্টা রক্তাক্ত হয় নাই—একই সম্প্রদায়ভুক্ত সনাতনী অসনাতনী হিন্দু বা সিয়া-সুন্নি মুসলমানও যে কতদূর পরস্পর জিঘাংসু হইয়া আততায়িতাপরায়ণ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা চক্ষের উপর দেখিয়াছি। কাজেই সাম্প্রদায়িক মিলনের কথা দূরে থাক, এক সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ ঐক্যবিধানও যে কত কঠিন ও দুঃসাধ্য, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। এ অবস্থায় স্বাধীনতার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ঐক্যসিদ্ধি স্বপ্নেরও অগম্য।

* * *

কিন্তু স্বাধীনতার জন্য সংহতিসাধন অপরিহার্য্য। এই সংহতি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নহে, এক সম্প্রদায়েরও নহে। এ সংহতি—মানবাত্মার। একটী মানবাত্মার সহিত আর একটী মানবাত্মার মিলনে—লক্ষ্য যদি স্বাধীনতা থাকে—তবে সেই উভয় আত্মার মিলিত স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষার প্রভাব

অঘটন ঘটাইতে পারে। ইহাকে অধ্যাত্ম-জগতের অকাট্য নিয়ম-বিশেষ কেহ যদি বলেন, আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষফলা নীতি। আত্ম-বীর্য্য অধ্যাত্মশক্তি হইলেও, তাহার প্রয়োগ ও প্রভাব বস্তুতন্ত্র জগতেই ধরা পড়ে। এইরূপ মিলনের সাধনা সেইজন্য বস্তুতন্ত্র জগতের জন্যই প্রযুজ্য হয়। ইতিহাসে লক্ষ্য-বিশেষের জন্য এইরূপ মানব-প্রাণের সংহতির দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। যে কোনও দেশের পরাধীনতা হইতে রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়—এমন মিলিত-প্রাণ গোষ্ঠী বা সমষ্টিই দেশের মুক্তি-পিপাসাকে উদ্বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া, ঘোর সংগ্রামে পরিশেষে স্বাধীনতাপ্রয়াস জয়যুক্ত করিয়াছে। শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রে কেন, ধর্ম্মক্ষেত্রেও আমরা এমনই সংহতি-বলের অনেক দৃষ্টান্ত পাই। এই সকল উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ধর্ম-নৈতিক, সমাজ-নৈতিক, রাষ্ট্র-নৈতিক বা অন্য যে কোনও প্রকার সমষ্টি বা জাতীয় আন্দোলন সফল করিতে হইলে, প্রাণেরই মিলন চাই—ইহাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই মিলন যদি সিদ্ধ হয়, সেই সম্মিলিত বীর্য্যের পক্ষে যে কোনও কঠোরতম লক্ষ্য-সাধনও আর অসম্ভব থাকে না।

* * *

দুইটী প্রাণের সম্পূর্ণ মিলন—ইহাই সর্ব্ব-নিম্নতম মিলন-বিন্দু (unit) বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুইএর অধিক সংখ্যা লইয়াও এই মিলন অসম্ভব নহে। আসলে ইহা সংখ্যার বীর্য্য নহে, গুণের বীর্য্য। এইজন্য মুক্তি বা অন্য যে কোনও লক্ষ্যে ইহা অনুশীলিত না হইলে, ইহা আরও উলঙ্গ অগ্নিতুল্য হইয়া উঠিতে পারে। অগ্নির ধর্ম্ম প্রজ্বলন—দীপ্তি ও প্রকাশ। কোন বিশেষ দাহ্য বস্তুকে দহন করিবার উদ্দেশ্য মনে লইয়া তাহা প্রজ্জ্বলিত হয় না। জ্বলিয়া—দীপ্তি প্রকাশ করাই তাহার স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম। অন্ধকার তাহাতে আপনি বিদূরিত হইয়া যায়। অন্ধকার দূর করিবার জন্য অগ্নিকে বিশেষ স্বতন্ত্র আয়াস প্রয়াস করিতে হয় না। এইরূপ মিলনের বীর্য্য যদি প্রদীপ্ত হয়, তাহা মুক্তি, স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য সকল প্রকার লক্ষ্য-সাধনেই সমর্থ হয়। কিন্তু মিলন-শক্তি জাগাইবার জন্য উক্ত লক্ষ্যের পরিপোষণ মনে আবশ্যক করে না। সংহতিবদ্ধ প্রাণ মিলিবার আনন্দেই যদি মিলে, সেই মিলন হয় সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রসায়ন। ইহা যেমনই শক্তিশালী, তেমনি অমৃতময়। ইহা সর্ব্বক্ষম, সর্ব্বকল্যাণপ্রদ—সিদ্ধ ও অমোঘ যোগশক্তি।

* * *

অতীত ভারতের জাতীয় ইতিহাসে, এই মিলনোদ্ভূত যোগশক্তির বিদ্যুৎপ্রভাব আমরা একাধিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহারাষ্ট্রের জীবন-প্রভাত—শ্রীরামদাস শিবাজীর মিলিত প্রাণের অগ্নিপ্রভাব বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে? পঞ্চনদে শিখ-খালসার উদ্ভব কি গুরুশক্তির চরণমূলে একটা মানবসমষ্টির আত্মদানের ফলেই সম্ভব হয় নাই? সেদিনও দক্ষিণেশ্বরের মিলন-তীর্থে সারা বাঙালার, তথা জগতের নবীন ধর্ম্মান্দোলনের অমৃতময় সূচনা—ইহা কি আমরা দেখি নাই? ভারতের বাহিরে, আরবেও মহম্মদীয় ধর্ম্মের অভ্যুত্থান এইরূপ একটা প্রাণের মিলনকেই কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ইতালীর জয়গানে ম্যাজ্জিনী-গ্যারিবল্ডীর সম্মিলিত তপস্যার কাহিনীও বিস্মৃত হইবার নহে।

* * *

বর্ত্তমান ভারতে মহাত্মা গান্ধীজির নেতৃত্বে এমনি একটী সংহতি-শক্তির অনুশীলন ও তাহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা চক্ষের সম্মুখেই দেখিতেছি। এই মহামানব ধর্ম্মকেই জীবনের মূল ভিত্তি করিয়া তাহার উপর রাষ্ট্র-জীবনের বেদীনির্ম্মাণের যে আদর্শ বাঙালীর জাতীয়তা-বাদী ঋষি শ্রীঅরবিন্দ প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই বস্তুতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্রে সিদ্ধ করিতে বিধাতা কর্ত্তৃক যেন নিয়োজিত হইয়াই আগুয়ান হইয়াছেন। সেই আদর্শের ছত্রতলে যাঁহারা তাঁহাদের প্রতিভা, মনীষা ও কর্ম্মশক্তি লইয়া সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনবদ্য প্রাণগুলি একই গুরুশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কিয়দংশে সম্মিলিত হওয়ায় যে সংহতি-বীর্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য আদর্শে সংগঠিত রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ কংগ্রেস হিউম, ওয়েডারবার্ণের কংগ্রেস নহে—সুরেন্দ্রনাথ-ওয়াচা-আনন্দচার্লুর কংগ্রেস নহে—ইহা তিলক-বেসান্তবিবির কংগ্রেস হইতেও স্বতন্ত্র

আর একটা কিছু অধ্যাত্মশক্তির আজ আশ্রয়ীভূত, ইহাই প্রণিধান করিলে দেখা যায়। আন্দোলনের অস্ত্র-পরিবর্ত্তন অহিংসা-মন্ত্র ইহার একমাত্র কারণ নহে—বর্ত্তমান কংগ্রেসের মূলে শক্তির উৎস মহাত্মার জীবন ও সেই জীবনে সম্মিলিত এক মুঠা প্রাণ-সমষ্টি। আজ ইহা উৎসর্গ-সিদ্ধ বা অন্ততঃ উৎসর্গ-সাধক প্রাণ-সমষ্টি বলিয়াই এই সংহতিশক্তিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে অধ্যাত্মশক্তিরই বিজয়মূর্ত্তি বলিতে আমাদের একটু বাধে না। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এমনই একটা প্রাণ-সম্মিলনের তপস্যা অভ্যুদিত হইয়াছে বলিয়াই আজ আমরা মুক্তি-সাধনার কিঞ্চিৎ সাফল্য দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি। ইহা আংশিক সাধনার আংশিক সাফল্য। সংহতি-সাধনার এই আংশিক বিভূতি-দর্শনেও আমরা পূর্ণতর সঙ্ঘ-সাধনার শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে আভাসে ধারণা করিয়া লইতে পারি।

* * *

পরিপূর্ণ সংহতি-সাধনাই এ জাতিকে নব-জন্ম দান করিতে পারে। ইহার মূলে পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ বা আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ-যোগ ভারতের ও বিশ্বের অধ্যাত্মজগতে শুধু ব্যক্তির আত্মসাধনার জন্য এযাবৎ নিয়ন্ত্রিত ছিল—সেই সিদ্ধযোগ ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে নামিয়া এ যুগের উৎকর্ষোন্নত মানব-মনে সমাজ, শিক্ষা, অর্থ, রাষ্ট্রে পর্য্যন্ত স্থানাধিকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাই দেখি—একই নেতৃশক্তির চরণতলে এক একটা জাতির সংগ্রহ ও ব্যূহীকরণের চেষ্টা বিশ্বের বহু ক্ষেত্রে চলিয়াছে। ইহাই ডিক্টেটারী শাসনের একমাত্র মৌলিক নিদান ও যুক্তি বলা যাইতে পারে। অবশ্য অধ্যাত্মক্ষেত্রের যাহা বিশুদ্ধ নীতি, এই সমুদয় অসংস্কৃত জীবন-ক্ষেত্রে তাহা অমিশ্র আকারে পাওয়া যাইবে, এইরূপ আশা করা আজও যায় না। ডিক্টেটার তাই স্বৈর-কর্ত্তৃত্বেরই নামান্তর-রূপে প্রতিভাত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু মানুষের হৃদয়, প্রাণ আরও যখন শুদ্ধতর হইয়া উঠিবে, তখন এই সকল নেতৃশক্তি অধ্যাত্মভাবে ও সাধনায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া গণ-নারায়ণেরই বিভূতি-মূর্ত্তিরূপে রূপান্তরিত আকারে প্রকাশ পাইতে পারে—এইরূপ আশা একেবারে অমূলক মনে হয় না। অষ্ট দিক্‌পালের বিভূতি লইয়া যে দিব্য রাজশক্তির কল্পনা ভারতীয় শাস্ত্রে, পুরাণে পাওয়া যায়, তাহা মানব-মনেরই একটা সত্য আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দান করে। ইহা যুগের গণবিপ্লবে বিশুদ্ধ হইয়া নবীন বেশে যদি আবির্ভূত হয়, আমরা তাহাতে বিস্মিত হইব না। এই রাজশক্তি গণশক্তিরই সর্ব্বস্বীকৃত রূপ হইবে—নতুবা গণ-সাধনা হইতে বিযুক্ত বা তাহার উপর অত্যাচার করিবার জন্য যে শাসনশক্তি, তাহা যুগবিপ্লবেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিষ্কাশিত ও নিরাকৃত হইবে। ভবিষ্যতের গণ-সাধনা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বা অত্যাচার হইবে না, গণ-দেবতার সিদ্ধ বিগ্রহ দেখিবার আকাঙ্ক্ষাই মানুষ রাখে। সংহতি-সাধনার সেই দিব্য রূপের পরিকল্পনা আজ মানব-হৃদয়ে কোথায় কিরূপে গোপন আছে, তাহা লইয়া আলোচনা আমরা করিব না—যাহা সত্য, যাহা কল্প-সিদ্ধ মানবাদর্শ তাহাই যথানিয়মে প্রকৃতির যৌগিক বিবর্ত্তনে প্রকাশ পাইবে।

* * *

এখন আমরা সংহতি-শক্তি বা সঙ্ঘসাধনারই জয়গান করিব। পরস্পর অন্তর-বিনিময়ে এই শক্তির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। দুইটী অন্তরের ডাক যদি সত্য হয়, তাহাদের মিলনে ভবিষ্যতের সৃষ্টিবীজ বিধৃত হওয়ারই সম্ভাবনা ফুটে। এমন বহু সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্র মন্থন করিয়া যে সিদ্ধ সঙ্ঘে দেখা দিবে, তাহাই নবজাতীয়তার জন্ম দান করিতে পারে। আজ সর্ব্বত্র তাই সংহতি-সাধনারই আবাহন চলুক—এই অনুশীলনে যে শক্তির স্ফুরণ, যে সত্যের জাগরণ ঘটিবে, তাহাকেই আজ আমরা স্বাগত আহ্বানে ডাকিতেছি—"এহি" বলিয়া। ভবিষ্য ভারত সঙ্ঘ-সাধনাকেই কেন্দ্র করিয়া নব জন্ম লাভ করিতে চলিয়াছে। সেই মহামাতারই গর্ভবেদনা আজ সর্ব্বত্র অনুস্যূত। "সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে"—ইহাই যে তপঃসিদ্ধ যুগবাণী।

হতাশ

(গল্প)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এ

সারা গ্রামে ভীষণ হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে!

চৌধুরী-বাড়ীর বড়কর্ত্তার মেঝছেলে নবীন গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিতে শহর হইতে লাল লাল কতকগুলি টিকিট আনিয়াছে—দাম এক টাকা; ওতে নাকি লাখ টাকা পাওয়া যায়! নিরেট পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত অধিবাসীরা যেদিন প্রথম জানিল যে, ভাগ্যে থাকিলে মাত্র এক টাকায় বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার—এমন কি লাখো টাকা পর্য্যন্ত ঘরে আসে, তখন তাহাদের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। নবীন তাহার সহপাঠী বন্ধু ও তাহাদের মেস-বাড়ীর পাশের দোকানের গোমস্তাটির এক টাকায় পঁচিশ আর চল্লিশ হাজার টাকা প্রাপ্তির সংবাদ বিস্ময়বিহ্বল নিরক্ষর পল্লীবাসীদের যখন দশ-পাঁচ কথার অতিরিক্ত সংযোগে রসাল করিয়া শুনায়, নির্ব্বাক্ শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে ততক্ষণে তন্ময়তার সহিত লাখ টাকার দুর্ব্বার লোভ জাগিয়া উঠে, তাদের চোখ মুখ ও হাবভাব দেখিয়াই সে তা বেশ টের পায়!

এক সপ্তাহের ভিতর লটারী আর লাখ টাকার প্রসঙ্গ গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলেও, চাঁদের আলোয় তখন চারিদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দিনের জালা-করা গরমের পর সন্ধ্যার ঝিরঝিরে হাওয়াটা বেশ লাগিতেছিল। মনসাপুকুরের সানবাঁধান ঘাটে অনেকক্ষণ ধরিয়া কয়েকটি বালকের গল্পগুজব চলিতেছে।

মৃদু আলোচনার মধ্যে হঠাৎ ঘোষবাড়ীর ধীরুর কণ্ঠস্বর সকলের আলোচনার শব্দ ছাপাইয়া শুনা গেল, মানস-দা', নবীন-দা' যে—সে কি বলে—লটারী টিকিট এনেছে, এক এক টাকা করে এর দাম! ওতে লাখ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, কিনবে? তিন চার জন মিলে একখানা কিন্‌তে পারে, আমরা কয়জন মিলে একখানা রাখি—কি বল?... আমার কাছে আছে চার আনা, চাও ত এক্ষুনি দিতে পারি।

মানস একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, তোর নবীন দা' কে রে? চৌধুরীবাড়ীর নবীনবাবুর কথা বলছিস্? ও সব—

ধীরু বাধা দিয়া কহিল, নবীন-দা' কি বলে জানো? ছ'শো লোক্ এ পুরস্কার পায়। প্রথম পুরস্কার হ'ল এক লাখ টাকা, তারপর আশী হাজার, সত্তর হাজার, পঞ্চাশ হাজার, ত্রিশ হাজার—এমনি করে' ছ'শো লোক এ পুরস্কার পাবে, সব্বার নীচের শেষ-পুরস্কার হ'ল পঁচিশ টাকা। ছ' ছ'শো লোকে পাবে, এর ভেতর নামটা ঠেকে গেলেই—ব্যস্। ছ' ছ'শো নাম উঠ্‌বে, আমরা কি একেবারে বাদ পড়ে যাব? যদি শেষ পুরস্কারটাও পাই, তা'হলেই বা মন্দ কি—একটাকা দিয়ে পঁচিশ টাকা, হজাগণ্ডা লাভ! তারপর যদি আগের দিকে নামটা উঠেই গেল—। আর এতে জাল-জুচ্চুরি নাকি হবার মোটেই ভয় নেই। নবীন-দা' বললে, গেল বার তার এক বন্ধুর ভাই ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে বসেছে! সে নাকি প্রথমটা টিকিট কিনতেই চেয়েছিল না, তার এক আত্মীয় জোর করে' টিকিট গছিয়ে দিয়ে যায়; আর যখন খেলা হয়ে গেল, তখন সে ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে বসেছে। আত্মীয়টা এসে এর পর তাকে কত খোসামুদি—সে কি আর তখন গলে!

অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিবার সময়ে সকলে এই সিদ্ধান্তে পৌছিল যে, তাহারা কয়েক জনে মিলিয়া অন্ততঃ খান দুই লটারীর টিকিট খরিদ করিবে।

মধ্যাহ্নের আগুন-ছড়ান সূর্য্য সুপারী আর বাঁশঝাড়ের আড়ালে ঈষৎ ঢাকা পড়িতেই, বারোয়ারীতলার শনিবারের বাজারটি লোকের সমাগমে অনেকটা জমিয়া উঠিয়াছে।

আড়াই সের লবণ মাপিয়া দিবার ফাঁকে নিতাই মুদী নিশি মণ্ডলের সুবিশাল বপুর পানে বার দুই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদু হাস্যসহকারে বলিল, শুন্‌লাম নিশি-দা নাকি লটারী কিনেছ, এক টাকা ক'রে, না?

নিশি মণ্ডল খানিকটা চুপ থাকিয়া, মুরুব্বিয়ানা স্বরে টানিয়া টানিয়া বলিয়া চলিল, পরশু দিন নবীন এসে একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে' পড়ল, বলে নিশি-কাকা তোমায় একখানা টিকিট নিতেই হবে। আমার কথা না শুনেই সে বই থেকে রসিদ কেটে ফেল্‌ল। ভাবলাম, বিষয় ত সে এক টাকার! কত টাকা পথে-বিপথে চলে' যাচ্ছে, একটা টাকা না হয় এ পথেই গেল! আর এটা বরাৎবাজী বৈ ত নয়। কপাল ভাল হ'লে কয়টা টাকা ঘরে আসতেও পারে।

—কালকে বিকেলের দিকে নবীনবাবু এদিকে এসেছিলেন, তিনি বললেন, দু' তিন জনে মিলেও নাকি একখানা কেনা যায়। ও-ঘরের হারু সরকারের সাথে ভাগে একখানা রাখব ঠিক করেছি। নবীনবাবু আবার কাল আসবেন বলে' গেছেন। কিনে ফেলি কি বল? দেখি একবার পোড়া কপালে কি লেখা আছে! সারা জীবন গাধার বোঝা টেনেই ত কাটল, সুখের মুখ আর দেখলাম না···ভগবান যদি মুখ তুলে চান···কোন ফাঁকে যদি বেজে গেল ত—

দুর্ব্বল মনের দুরাশার চঞ্চলতা নিতাই, নিশি মণ্ডলের শ্যেনদৃষ্টির কাছে লুকাইতে পারিল না। তখনও সে অনর্গল বলিয়া চলিয়াছে, ছ'শো লোক এ পুরস্কার পাবে—ছ'শো। এর ভেতর যদি একবার কোনক্রমে—নবীনবাবু বললেন এতে জুচ্চ্‌রি বদ্‌মাইসী হবার যো নেই, গবরমেণ্টের লোক এতে আছে।

পদ্মপাতায় বাঁধা লবণের পুঁটুলিটা হাতে লইয়া যাইতে যাইতে নিশি মণ্ডল নিতাই'র উৎসুক আগ্রহের অনুকূলে দু'টি কথা বলিয়া গেল, বেশ ত কিনে ফেল, জীবন ভরেই টাকা উপায় কর্‌লে, আর খরচও করেছ, এতে না হয় ক'টা পয়সা একবার দিলেই। আর অদৃষ্টের কথা বলা ত যায় না, আজ যে ফকির, দু'দিন বাদে তার বাড়ীতে দালান উঠে, এসব চোখের উপরেই দেখা যাচ্ছে হর্‌দম্‌।

প্রায় সাড়ে ন'টা দশটা—সূর্য্যের আলোতে বেশ তেজ ধরিয়া গিয়াছে। চামড়ার সুবিশাল ব্যাগটি পিঠের উপর ফেলিয়া আবদুল আলী পিয়ন ঢক্‌ ঢক্‌ শব্দ করিতে করিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, নবীন হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল। অর্দ্ধ-পক্ক শ্মশ্রুবিমণ্ডিত মুখমণ্ডলে মৃদু হাস্য টানিয়া, ছোট্ট একটি সেলাম ঠুকিয়া নিকটে দাঁড়াইতেই—নবীন সংক্ষেপে কুশল-প্রশ্নের ভূমিকার পর আপন বক্তব্য বিষয়টি পাড়িল, তোমার জন্য একটা লটারী টিকিট আমি রেখে দিয়েছি আবদুল—এক টাকা—এক টাকা করে' দাম। এর প্রথম পুরস্কার এক লাখ, এর পরে আশী হাজার, সত্তর হাজার, ষাট হাজার, এমনি করে ছ'শো পুরস্কার দেওয়া হবে—তোমার জন্য একখানা রেখেছি—দাম মোটে এক টাকা—ষোল গণ্ডা পয়সা।

অশিক্ষিত গ্রাম্য পিয়ন আবদুল আলী যুগপৎ বিস্ময় এবং অনিচ্ছার ভাব প্রকাশ করিয়া নেহাৎ যেন এ দায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বলিল, আজ্ঞে, আমরা গরীব মানুষ, যে একটা টাকা এতে খরচ করব, ওতে একখানা কাপড় এসে যাবে। গরীব আমরা, আমাদের কি ও-সব করা সাজে? আপনারা ধনী, রাজা মানুষ, ও-সব আপনাদের জন্য—

নবীন আবদুলের অর্দ্ধসমাপ্ত কথায় বাধা দিয়া বলিল, এ পাঁচ গাঁয়ের মধ্যে একটা লোক বের কর দেখি, যে, মাস শেষে গুণে গুণে পঁচিশটি টাকা পকেটে পুরে! খোদা রাখলে তোমার কি নেই, আর তোমার মত একটা গেরস্ত বের কর দেখি সারা সাঁওনগাঁয়ে! দু'খানা হাল, সাত-আটটা গরু, বাড়ীতে কাছারী, মসজিদ—বের কর দেখিন্‌। ভারী ত এর দাম এক টাকা—চারখানা মণি-অর্ডারের বক্‌শিসের পয়সা বৈ ত নয়!

নবীনের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতায় একটু ফাঁক পড়িলে, আবদুল আলী আপন-সপক্ষে দু'টি কথা বলিতে চাহিল, বাবু আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, এসব কিছু বুঝি নে। আমাদের যে নসীব, জীবনভোর ত গাধা-খাটুনী—আমরা পাব লাখো টাকা, ছোঃ!

নবীন পুনরায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া চলিল, সে কি বল আবদুল আলী, কত লোক এতে পুরস্কার পাবে জান? ছ'শো—ছ'শো লোকের নামে পুরস্কার উঠ্‌বে। একশো-দেড়শো নয়, ছ'শো—কার বরাৎ কখন ফিরে যায়, তা' কে বলতে পারে। আমার এক বন্ধুর পিসতুত ভাই সেবার ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে গেল! সে কি আর প্রথমতঃ টিকিট কিনতে চেয়েছিল! ঠিক তোমার মত। আমার বন্ধুটি তাকে একরকম জোর করে' গছিয়ে দিল, বললে, তুই থিয়েটার-বায়স্কোপে সব টাকা উড়চ্ছিস, তোকে একখানা টিকিট নিতেই হবে। সে একরূপ অনিচ্ছা সত্বেই একটা টাকা পকেট থেকে বের করে' দিল, আর যেদিন লটারীর লিষ্ট বেরুল, সেদিন দেখি, সে ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে বসেছে। এত নিছক বরাৎবাজী, কার কপালে কি আছে, তা' বলা যায় না। তুমি যে প্রথম হয়ে লাখ টাকা পাবে না, তাই বা কে বলতে পারে!

নবীন চাহিয়া দেখিল—আবদুল আলীর মুখে ভয়, অনিচ্ছা ও সন্দেহের ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। যাইবার সময়ে সে বলিয়া গেল, মাসের শেষ বলিয়া এখন তাহার হাত খালি; সামনের সপ্তাহে বেতন পাইয়াই এক টাকা দিয়া সে একখানা টিকিট কিনিয়া লইবে।

এর মধ্যে এক দুই করিয়া চারি মাস চলিয়া গিয়াছে এখন পথে, বারোয়ারীতলার তাসের আড্ডায়, মনসা-পুকুরের সান-বাঁধান ঘাটের সান্ধ্য আলোচনা সভায়—আজ ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর বিগ্রহের টিকিধারী বৃদ্ধ-সম্মেলনে ক্বচিৎ লটারী প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। তথাপি নিশি মণ্ডল, নিতাই মুদী, আবদুল আলী আজও যে মাঝে মাঝে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে না—তা' নয়!

সবে মাত্র ব্যাগ হইতে চিঠিগুলি খুলিয়া পিয়ন সীল-মোহরের তারিখ বদ্‌লাইতেছিল, পোষ্টমাষ্টার ছড়ান চিঠিগুলির উপর চোখ বুলাইয়া যাইবার সময়ে একটা লম্বা অফিসীয়রঙের খামে টাইপে লেখা আবদুল আলীর নাম দেখিয়া, সরকারী চিঠি ভাবিয়া ব্যস্তভাবে খামটি ছিঁড়িয়া ফেলিল। চিঠি নয়, ছোট ছোট অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা ছাপান একখণ্ড ভাঁজ করা সাদা কাগজ। সৌৎসুক্যে খুলিয়া দেখে—উপরিভাগে বড় বড় কাল অক্ষরে লটারী কোম্পানীর নাম লেখা, ঠিক তাহারই নীচভাগে লেখা রহিয়াছে, বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর লটারী খেলা হইয়াছে, পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইল। পুরস্কারের টাকা পাইবার তারিখ ও পরিমাণ এক মাসের মধ্যে জানান হইবে। পোষ্টমাষ্টার চাহিয়া দেখে প্রথমেই লেখা—আবদুল আলী পিয়ন, সাঁওনগাঁও পোষ্ট অফিস।

ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবার এবং একটু ভাবিবার অবসর না লইয়াই পোষ্টমাষ্টার অধীর কণ্ঠে একপ্রকার চীৎকার দিয়া উঠিল, আবদুল আলী লটারীতে তুমি পুরস্কার পেয়েছ, তোমার নাম প্রথম উঠেছে, এই চিঠি এসেছে আজ!

অভিভূতের মত আবদুল পোষ্ট মাষ্টারের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, কই দেখি ত চিঠি! পড়ুন, ওতে কি লেখা রয়েছে।

পোষ্টমাষ্টার অঙ্গুলী দ্বারা তাহার নামটি দেখাইয়া দিল। কয়েক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় আবদুল অন্ততঃ নিজের নামটি ইংরাজীতে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল। মিনিট দুই তিন সে মনে মনে বর্ণবিন্যাস করিয়া পড়িয়া দেখিল, ইহাতে পরিষ্কার লেখা রয়েছে—আবদুল আলী পিয়ন, সাঁওনগাঁও পোষ্ট অফিস। একেবারে সবার উপরে—প্রথমেই তাহার নাম! আবদুল আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা বিদ্যুত্তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে! সীলমোহর রাখিবার কালি-মাখা ছোট্ট কাঠের বাক্সটির উপর সে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল!

চিঠির প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান অর্দ্ধ-শিক্ষিত কয়েক জন গ্রাম্য লোক ব্যস্তভাবে জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া পোষ্ট-মাষ্টারের নিকট হইতে আবদুল আলীর চিঠিখানা চাহিয়া লইল। অধীর আগ্রহে ভীড় জমাইয়া তাহারা আবদুল আলীর নামটি ভাল করিয়া বার বার পড়িয়া লইতেছে—স্পষ্ট লিখা—আবদুল আলী পিয়ন, সাঁওনগাঁও পোষ্ট আফিস। সবার উপরে—একেবারে প্রথমেই তার নাম!

তাহাদিগকে এমনভাবে ভীড় করিতে দেখিয়া রাস্তার লোক তাহাদের আপন আপন কৌতূহল দমন করিবার

জন্য ক্রমেই ভীড়ের বহর বৃদ্ধি করিয়া চলিল। সকলেই বিস্মিত হইয়া শুনে, আবদুল আলী পিয়ন লটারী খেলায় প্রথম পুরস্কার—লাখ টাকা পাইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহরের মধ্যে আবদুল আলীর লাখ টাকা প্রাপ্তির সংবাদ বৈদ্যুতিক বাণীর মত সমস্ত সাঁওনগাঁও ছড়াইয়া পড়িল।

মধুসূদন পোদ্দার কি একটা খাতার উপর উপুড় হইয়া বসিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত কলম টানিয়া চলিয়াছে। আবদুল আলী পিয়ন একখানা কার্ডের চিঠি তাহার পাশে রাখিয়া চলিয়া যাইবার জন্য মোড় ফিরিতেই, মধুসূদন পোদ্দার তাহাকে ডাকিল, ও পিয়ন বোস, তামাক খেয়ে যাও। তারপর চাকরের উদ্দেশ্যে হাঁকিল, হরে, পিয়নকে এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা।

আবদুল আলী অত্যধিক কাজের ওজর দেখাইয়া ছাড়া পাইতে চাহিয়াও, মধু পোদ্দারের বার বার অনুরোধে তাহাকে বাধ্য হইয়া নিকটস্থ চৌপায়াটায় আসন গ্রহণ করিতে হইল।

মধুসূদন নাকের সুতাবাঁধা চশমাজোড়া কপালে তুলিয়া ঠোঁটের প্রান্তভাগে হাসির রেখা টানিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আবদুল শুনলুম তুমি লটারীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছ? বড় আনন্দের খবর এটা!...পুরস্কার পেয়েছ সত্য, কিন্তু ওতে হাঙ্গামা বিস্তর, টাকা কাগজেপত্রে পাওয়া আর হাত করা এক নয়। তুমি ত লাখ টাকা পেয়েছ, শেষ পর্য্যন্ত দেখবে চারআনী টাকাও ঘরে আনতে পারবে না ভাই! টাকা আনতেই মূল ঘরে দিতে হবে মোটা রকমের দক্ষিণা, তাও কি দু' একজন? জনে জনে ভাগে দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত জমার ঘরে প্রায় শূন্য পড়বার যোগাড় হয়ে যায়। তুমি এসব হাঙ্গামার হালচাল বুঝবেও না আর হাঙ্গামা কর্‌তে পারবেও না।

খানিকটা চুপ থাকিয়া মধু পোদ্দার তাহার চোখেমুখে একটা সৌহার্দ্দ্যব্যঞ্জক ভাব আনিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল, তোমাকে একটা ভাল পরামর্শ দেই, যদি শোন, এ সব জ্বালা-ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পেয়ে...তোমার টিকিটখানা বিক্রী করে দাও। হাজার পঁচিশেক টাকায় ছেড়ে দিলে জিত্‌বে বই ঠকবে না। এ পঁচিশ হাজার টাকা পেলে একেবারে ঘরে বসে! তোমাকে সেই দৌড়াদৌড়ি কর্‌তে হলো না, এর ওর কাছে ঘুরতে হলো না, চেক নিয়ে ট্রেজারিতে হাঁটাহাটির দরকার পড়্‌ল না, একেবারে নিরুদ্বেগে টাকাগুলো পেয়ে গেলে! তারপর ওই যে বললাম, এখানে ওখানে দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কি যে ঘরে আসে তাও ত বলা শক্ত। কি বল আবদুল—হাজার পঁচিশের টাকা নিয়ে টিকিটখানা আমায় দিয়ে দাও দেখি, একবার ঘুরে ফিরে কি হয়! ব্যাপার যেমন—সেই পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসাই দায় হবে।

মধুসূদনের সাগ্রহ প্রতীক্ষার মুখে আবদুল তার স্বভাব-মৃদুকণ্ঠে টানিয়া টানিয়া বলিল, না কর্ত্তা, তা বিক্রী করব না, খোদা যখন দিলেনই, তখন দেখি শেষ পর্য্যন্ত নসীবে কি লেখা আছে। তাঁর মর্জ্জি না হলে একখানা খড়কুটা নড়্‌তে পারে না...খোদার ইচ্ছায় যা হয় হবে, টিকিট আমি বিক্রী কর্‌ব না।

এমন অব্যর্থ বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল দেখিয়া মধুসূদন ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে পুনরায় আরম্ভ করিল, আবদুল তুমি জান না—তোমার অভিজ্ঞতা নাই বলে' একথা বল্‌ছ। এতে কি গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হয়—কি টানা-হেঁচ্‌ড়া তুমি তার ধারণাই কর্‌তে পারবে না। নেহাৎ ধড়িবাজ না হলে লটারীর টাকা ঘরে আনতে পারে না। সাত বকের পেট পুরিয়ে, সাত দরজায় ঘুষ দিয়ে যখন দেখবে তহবিলে আর কিছুই রইল না, তখন মনে হবে মধু পোদ্দার সত্যি কথাই বলেছিল।

তারপর মধুসূদন লটারীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত তার এক কাল্পনিক আত্মীয়ের দুর্দ্দশার কথা আবদুল আলীর নিকট বিবৃত করিয়া চলিল—সে ত আর টাকাই তুলতে পারে না, এসে ধরল আমাকে, আমিও গিয়ে যা হালচাল দেখলাম, তাতে মাথা ঠিক থাক্‌বার কথা নয়, এ বলে চার-আনী টাকা আমায় দিতে হবে, ও বলে আমায় দু'হাজার—এ যেন হরির লুট। শেষে অনেক কষ্টে চারআনী টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসি। ওঃ কি ফ্যাসাদ—সে কথা এ জীবনে ভুল্‌ব না।

শেষ পর্য্যন্ত আবদুল আলীর সেই এক কথা, খোদা যখন চোখ তুলিয়াই চাহিলেন, তাঁর শেষ ইচ্ছা কি সে তা দেখিবে। যায় যাক তার সব টাকা জলে, তবু সে টিকিট বিক্রয় করিবে না।

হাতে জমান গোটাকয়েক অসমাপ্ত কাজ সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে বসিয়া আবদুল আলী সারিয়া লইতেছিল। খড়মের খট্‌খট্ শব্দ করিয়া পোষ্ট মাষ্টার আসিয়া হাজির হইল—তাড়াতাড়ি সব কিছু যে গুছিয়ে নিচ্ছ দেখ্‌ছি —কোথাও কাল যাচ্ছ বুঝি?

আবদুলের তরফ হইতে সহজ উত্তর আসিল, হাতে কয়টা কাজ জমেছিল, আজ-কাল করে আর—প'ড়েই ছিল, তা বসে' বসে' সেরে ফেল্‌লাম এখন।

খানিকটা চুপ থাকিয়া নীচু গলায় পোষ্টমাষ্টার আবদুলের মনযোগ আকর্ষণ করিল, একটা কথা বলতে এসেছি আবদুল তোমার কাছে, রাখ্‌বে ত?"

কণ্ঠস্বরের নমুনাতেই আবদুল তাহার প্রয়োজনীয় কথাটি অনুমান করিয়া লইল। তথাপি সে না বুঝিবার ভাণ করিয়া বিস্মিত এবং উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বলুন কি কথা মাষ্টার বাবু, সাধ্যি হয় ত এতটুকু কসুর করব না।

মাষ্টার অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, তুমি ত জান সেরপুরের মধু সাহার বড় টিনের গুদামটা নেহাৎ দুঃসাহস করে সে মাসে ভাড়া নিয়েছি, আশাও ছিল খুবই বড়, রাখি মালের আড়ৎ করব ওতে। যে আশা-ভরসা করে এতে হাত দিয়েছিলুম—এখন দেখি সব ফাঁকা। তারিণী চক্কোত্তি আর পূব পাড়ার সালু দত্ত তখন হাতে চাঁদ দেখিয়ে কাজে নামিয়ে দিলে—আজ ওদের পাত্তাই নেই। এ অভাব, সে অসুবিধা—দেখিয়ে যার যেমন সরে পড়েছে, আমার এখন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। ওদের বলেই আমি এ কাজে হাত দেই—তাদের ভরসা না পেলে কি সাহসে আমি এতে মরতে যাব? তারা ত যার যেমন পথ দেখ্‌লে!...আসছে মরসুমে হাজার আট-ন'য়ের ধান কিনে রাখব মনে করেছি—টাকাই যে জোগাড় হয়ে উঠ্‌ছে না, যারা সব কথা দিয়েছিল কেউ এখন এক পয়সাও দিতে পার্‌লে না! তারপর একটা ঢোক গিলিয়া মাষ্টার অতি সন্তর্পণে তাহার অসমাপ্ত কথাটিকে মন্তব্যে টানিয়া আনিল, এ সময়ে তুমি যদি অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকা দিয়ে সাহায্য না কর, তবে আমার আর মান বাঁচাবার পথ নেই। সুদ চাও, রেহান-বন্ধক চাও— তোমার যেমন সুবিধা, রাজী। মধু কিছুতেই ছাড়লে না, ছ' মাসের ভাড়া অগ্রিম নিয়ে নিলে। এতগুলো টাকা নিজহাতে গুণে গুণে ঘর থেকে বের করে দিয়ে যদি ল্যাজ গুটিয়ে ঘরে ফিরি, লোকের কাছে ত মুখ দেখাতে পার্‌ব না, নিজেকেই বা কি বলে বুঝাব?

মাষ্টার থামিলে আবদুল আরও পাঁচ-সাত জনের নিকট যেমন বলিয়াছে—তাহারই পুনরাবৃত্তি করিল, টাকা ত বাবু, এখনও কাগজে-পত্রে, পরের হাতে। সেদিন যে চিঠি এসেছে—আপনি বল্‌লেন,—আর এক চিঠি আস্‌বে, তাও এখন এল না।... দশজনে দশ কথা বলে, লটারীর টাকা নাকি হাতে আনা বড় হাঙ্গাম! ঘুষ— কেবল ঘুষ—ঘুষ দিতে দিতেই ফতুর। সেদিন মধু পোদ্দার বল্‌লে তার এক আত্মীয় নাকি চারআনী টাকা নিয়ে ঘরে ফির্‌তে পারে নি। টাকা-পয়সা হাতে না আস্‌তে বিশ্বেস নেই বাবু।...মনে কত ভেবে রেখেছি— সাধ কি আর কম—খোদার মর্জ্জি! দেবার মালিক সে। ভেবেছি—বাড়ীর সাম্‌নেকার পুকুরটাকে ভাল করে কাটিয়ে একটা পাকা ঘাট করে দেব; আর পুকুর পাড়ের ছোট্ট টিনের মস্‌জিদ্‌খানাকে একটু বড় করে ইটের করে ফেল্‌ব—অনুমান হাজার সাত আটেক টাকা খরচ হবে এতে। ভাল দেখে কয়েক হাজার টাকার জমি রাখব ভেবেছি—বালবাচ্চাগুলো যেন খাওয়া-পরার অভাবে কষ্ট না পায়। বাড়ীর দক্ষিণ পাশের ডোবা আর নীচু জমিগুলি ভরাট করে বাড়ীটা কিছু দক্ষিণে সরিয়ে আনব —আলো হাওয়া যেন ভাল খেলে। খড়ের ঘর আর বাড়ীতে একদম রাখ্‌ব না ভেবেছি—সর্ব্বদা আগুনের ভয়, দেখ্‌লেন ত সেদিন চোখের উপরেই ঘোষেদের রান্না ঘরটিতে আগুন ধরে কি কাণ্ডটা হয়ে গেল! ভিটে পাকা করে চারধারে কাঠের বেড়া দিয়ে সব টিনের করে

ফেল্‌ব—হাজার পঁচিশের কমে যে সার্‌তে পার্‌ব মনে হয় না।...আপনি যখন চাইলেন পাঁচ হাজার না হোক, অন্ততঃ হাজার দুই আপনাকে আমি দেবই বল্‌লাম। তবে টাকা পয়সার কারবার, কাগজে-পত্রে রেজেষ্টারী হওয়াই ভাল। তাই দেবেন।

কথাগুলো শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘন আনন্দের মূর্ত্ত লহর আবদুলের চোখ মুখের উপর দিয়া বিদ্যুৎরেখার মত খেলিয়া গেল।

অতি আগ্রহভরে সম্মতি জানাইয়া পোষ্ট মাষ্টার একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

অপরাহ্নের কর্ম্মহীন অবসর মুহূর্ত্তগুলি রাস্তার উপর পায়চারি করিয়া কাটাইতেছি। দূর হইতে চামড়ার সুদীর্ঘ সরকারী ব্যাগ আর ছোট হাতাবিশিষ্ট খাকির পাঞ্জাবিটা দেখিয়াই বুঝিলাম—পিয়ন আবদুল আলী আসিতেছে। সেদিন শুনিয়াছি—আবদুল নাকি লটারীতে লাখ টাকা পাইয়াছে, ভাল, ব্যাপারটা তার মুখেই শুনিয়া লওয়া যাইবে।

নিকটে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, চিঠি আছে পিয়ন? একটা চিঠি আস্‌বার কথা ছিল কেন যে আসছে না—

আবদুল ঘাড় নাড়িয়া অনুচ্চ কণ্ঠে জানাইল, না।

—শুনলাম সেদিন লটারীর প্রথম পুরস্কার—লাখ টাকা তোমার নামে উঠেছে, সে টাকার কি হ'ল, আনতে যাচ্ছ কবে?

কর্ম্মব্যস্ততাব্যঞ্জক দ্রুত পদবিক্ষেপ অনেকটা সংযত করিয়া আবদুল ধীরে ধীরে জবাব দিল, বৃহস্পতিবার দিন লটারী অফিস থেকে চিঠি এসেছে। একমাস বাদে আর এক চিঠি আসবে, তারপর টাকা পাব। ডান হাতখানা ঊর্দ্ধে আকাশের পানে তুলিয়া আবদুল তাহার অসমাপ্ত কথাটির উপসংহার করিল, খোদার ইচ্ছা, সব তাঁর হুকুম—তাঁর আদেশ ছাড়া এক কণা ধূলি এখান থেকে ওখানে নড়তে পারবে না।

একটা পুলক-শিহরণ মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া চকিতে খেলিয়া গেল, স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

বাড়ী ফিরিয়া দেখি—দুর্গামণ্ডপের বাঁ ধারের বকুল-তলার মাঁচাটায় ঠাকুরবাড়ীর নরু, ঘোষবাড়ীর সুরেন, পুবপাড়ার সুধাংশু, বৈষ্ণবাড়ীর সুধীর—আমাদের সঙ্ঘের সভ্যগণ জড় হইয়া বসিয়া আছে। দূর হইতেই সজোরে হাঁকিলাম, কি ভায়ারা, বেশ ত চাঁদের হাট মিলিয়ে বসেছ, ব্যাপার কি? আবার কোথায় কোন্ আবিসিনিয়া উদ্ধারের খেয়াল আপনাদের মগজে গজাল!

আমার এ ব্যঙ্গে সায় না দিয়া ধীরু কতকটা গম্ভীরস্বরে আলোচ্য বিষয়ে গুরুত্ব আনিবার চেষ্টা করিল, শোন, কাছে এসো, সকল কাজে অমন ছেলেমো চলে না। তারপর খানিকটা থামিয়া বলিতে লাগিল, গ্রামে ত আমাদের জলের এত কষ্ট, চোত-বোশেখে পুকুরগুলো শুকিয়ে ফুটিফাটা হয়ে যায়—ঘোলা ময়লা জল খেয়ে বছর বছর কত লোক মর্‌ছে। আমরা সবাই ঠিক করেছি—আবদুল আলী পিয়ন ত লটারীতে লাখ টাকা পেয়েছে—তাকে খুব করে ধর্‌ব, সে যেন গ্রামে একটা জলের বন্দোবস্ত করে' দেয়। হয় একটা বড় পুকুর কাটিয়ে দিক, নয়ত গ্রামের চার পাশে চারটে টিউবওয়েল যেন বসিয়ে দেয়। কালকে সকালে তার নিকট সবাই যাব ঠিক করেছি, তোমাকেও যেতে হবে—না বললে চলবে না কিন্তু বলে' রাখ্‌ছি। সকাল আটটায় বাড়ী থেক, আমরা এসে ডেকে নেব, বুঝ্‌লে?

তাহাদের এ কল্পনাটি ভালই মনে হইল। এদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, প্রস্তাবিত মতে পূর্ণ সায় দিয়া বলিলাম, আচ্ছা এসো, বাড়ী থাক্‌ব—সকাল আটটায়, না?

* * *

একটা জরুরী কাজে দিন পনর ম্যাদে অন্যত্র যাইতে হইল। পনর দিনের স্থলে পঁচিশ দিন কাটিয়া গেল—বাড়ী থেকে ফিরিতে প্রায় একমাস। সেই দূর দেশে বসিয়া লটারী সম্বন্ধে নানা গুজব শুনিয়া আগ্রহে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে উদ্‌গ্রীব হইয়াছি। এসব উড়ো কথায় মাঝে মাঝে বিস্ময় লাগিয়া যাইত। কেহই আবদুল আলীর

নাম করিতেছে না, অথচ সে-ই পাইয়াছে প্রথম পুরস্কার—লাখ টাকা! পরিচিত এবং অপরিচিত মহলে এ সত্য সংবাদ প্রচার করিয়া উড়ো কথাগুলির যাথার্থ্যহীনতা প্রমাণ করিতে দু'একবার চেষ্টাও করিয়াছি।

বাড়ী ফিরিবার পথে আবদুল আলীর কথা কয়েকবার মনে হইয়াছে। হয়ত সে এতদিনে তাহার টাকা লইয়া বাড়ী আসিয়াছে! লাখ টাকা—লাখো টাকা! বিশ টাকার পিয়নের চাকুরী কি আর সে করিবে? এখন তার বাড়ী-ঘর মেরামত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে!

ঠাকুরদের পোড়োবাড়ীর সরু পথটা দিয়া সদর রাস্তার দিকে মোড় ফিরিতেই পথে আবদুল আলীর সাথে দেখা। সেই পরিচিত পোষাক—বেঁটেহাতা খাকী-পাঞ্জাবী আর চামড়ার সরকারী ব্যাগ। চোখদু'টি তাহার কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে—চারিধারে কাল দাগ যেন দোয়াতের কালীমাখা। মুখটি শুকাইয়া অশীতিপর বৃদ্ধের মত গালের দু'পাশের হাড় বাহিরে আসিয়াছে, গায়ের রং পোড়া কাঠের মত ছেঁচ্ লাগান। নিকটে আগাইয়া আসিয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, অসুখ করেছিল কি তোমার আবদুল? তোমাকে দেখে যে চিনে উঠা কষ্ট! তোমার লটারীর সে চিঠি এসেছে ত? টাকা এখনও আননি বুঝি?

আবদুল তাহার মলিন কোটরগত চোখ দুটি ক্ষণকালের জন্য আমার মুখের উপর নিশ্চলভাবে স্থাপিত করিয়া বিকৃতস্বরে উত্তর দিল, চিঠি এসেছে বাবু,—পঁচিশ টাকা মোটে।

অনেক চেষ্টা করিয়া আবদুল কথা কয়টা উচ্চারণ করিল।

কথা কহিবার শক্তি যেন হঠাৎ আমার লোপ পাইয়া গেল। সে বলে কি! কিন্তু আবদুলের উদাস অসহায় চাহনী ও তাহার পরিবর্ত্তিত চেহারার পানে তাকাইয়া সন্দেহ করিবার আর এতটুকু অবকাশ রহিল না।

অভিসারিণী চন্দ্রমা

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

নিশীথ বেলা শশী একেলা
ছাড়ি' ধবল শয্যা—
শিথিল বাসে জানালা পাশে
দাঁড়াল ভুলি' লজ্জা।
বঁধুর মুখ মিলন সুখ
স্মরিয়া বার বার—
কক্ষ হতে ছায়ারি পথে
চলে চরণ তার।
নূপুর খুলি' নিচোল তুলি'
নীরব বীথি বাহি'—
নিথর বাটে রজত ঘাটে
চলিছে মৃদু গাহি'।

পবনে দুলে' কবরী খুলে'
খসে তারারি ফুল—
থরথরিয়া কাঁপিছে হিয়া
কাঁপে কাণেরি দুল।
মেঘের তরী চাপি' কিশোরী
বাহিয়া চলে একা—
বাঁকের মোড়ে ভোরের ঘোরে
বঁধুর সনে দেখা।
কিরণ-রথে কনক পথে
সহসা নাথে হেরি'—
বুকের পরে মূরছি পড়ে
মরণ আসে ঘেরি'।

ধর্ম্ম

ধর্ম্ম—যুক্তি।

পরমাণুর সহিত পরমাণু মিলিয়া অণুর উৎপত্তি। এই অভিব্যক্তির মূলে আছে ধর্ম্ম। একের সহিত অন্যের যুক্তি, সম্বন্ধ বা মিলনই পরমাণুকে অণু, অণুকে মহতে পরিণত করিতেছে।

"অণোরণীয়ান্—মহতো মহীয়ান্"—অণুর চেয়ে অণু, মহতের চেয়ে মহীয়ান্—এই উভয়ের প্রান্ত-রেখা অসীমে। উভয়ের মধ্যে যে অভিব্যক্তির প্রবাহ, তাহা বিশেষ ও সামান্য—ব্যষ্টি ও সমষ্টিক্রমে অসংখ্য ধাপের পর ধাপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অণু ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম মহৎ বস্তুত্বের পরিকল্পনা অতিক্রম করিয়া অনন্তে গিয়া মিশিয়াছে।

এই অনন্ত এক অথবা অনির্ব্বচনীয়।

যাহা ব্যক্ত, তাহা অব্যক্ত হইতে অভ্যুদিত, অব্যক্তে গিয়াই তাহার শেষ অথবা অশেষ অর্থাৎ চরম, নিরতিশয় পরিণতি। যতক্ষণ ব্যক্ত, ততক্ষণ তাহা বস্তুত্বের সীমা-রেখায় অবিচ্ছিন্ন, চিহ্নিত। এই বস্তুত্ব—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম—ত্রিবিধ তত্ত্বে প্রকাশিত।

বস্তু যখন ব্যক্ত, তখন তাহা দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম্ম। অব্যক্তে ব্যক্তের অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের বীজভাব বর্ত্তমান। ইহা নিগূঢ়ে কূটস্থ নিহিত। দ্রব্য গুণ, কর্ম্মের মূল ভাব, প্রকৃতি, স্বরূপ সেইখানেই। ব্যক্ত আবার অব্যক্তে লয় পায়—অর্থাৎ তাহা প্রকাশ-ধর্ম্ম পুনরর্পণ করিয়া মূলে গিয়া আবার সম্মিলিত হয়। ইহাও আর এক প্রকার মিলন। মিলন ইহামুত্র সর্ব্বত্র; কোথাও তার ব্যতিক্রম নাই। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াও মিলনেরই অভিসার —যেমন ব্যক্ত ও অব্যক্তের দ্বন্দ্বও মিলনেই পর্য্যবসিত হয়। মিলন বা যুক্তি ছাড়া ধর্ম্ম নাই, পথ নাই।

অভিব্যক্তি—অভ্যুদয়। ব্যক্তেরই অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মেরই অভ্যুদয়। অব্যক্তে—ব্যক্তের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বা পরিণতি। ইহাই নিঃশ্রেয়স।

ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স—উভয়ই বস্তুতঃ, গুণতঃ ও কর্ম্মতঃ সিদ্ধ করিতে হয়।

তাই বৈশেষিক দর্শনকার ভগবান কণাদ ধর্ম্মব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া, অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রে ধর্ম্মের এই সংজ্ঞাই দিয়া গিয়াছেন—

"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"

যাহা জানিতে পাইতে গিয়া, সর্ব্বজীব, সর্ব্বজগতের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ অভিব্যক্তি ও পরিণতি বস্তুতঃ, গুণতঃ ও কর্ম্মতঃ সিদ্ধ করিতে হয়—এক কথায় যাহা আদ্যন্ত জীবন-সিদ্ধির সম্পূর্ণ নিদান, তাহাই ধর্ম্ম।

ইহার প্রমাণ—সর্ব্ব মানবের জীবন-বেদ। শাস্ত্র ও বিজ্ঞান—দর্শন ও পুরাণ—অধ্যাত্ম ও লৌকিক জীবনের সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ছন্দে এই একই মহাসত্য নিত্য ঘোষণা ও প্রতিপন্ন করিতেছে—

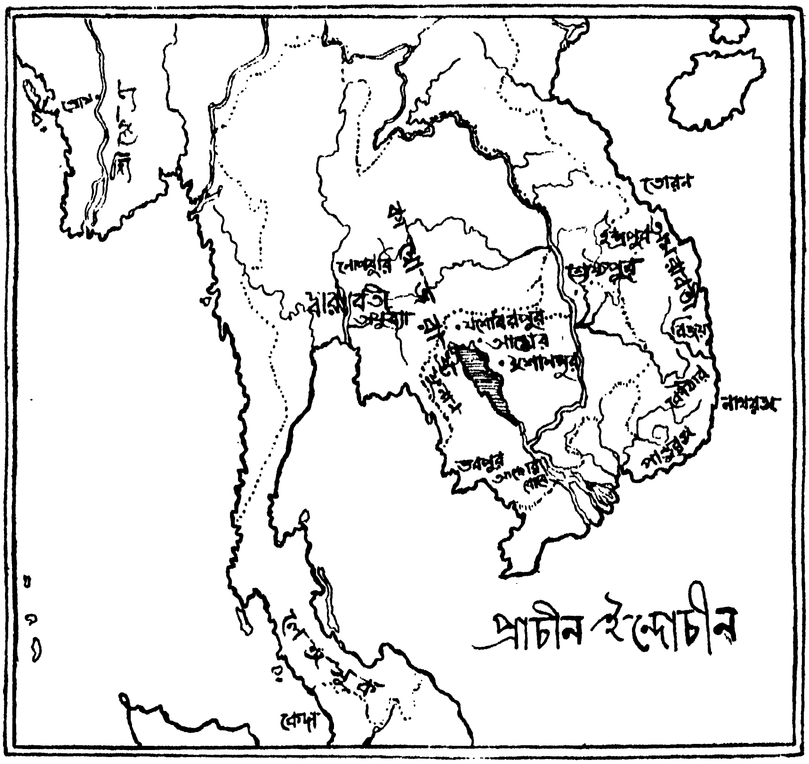
"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।"



কাম্বোজে হিন্দু-স্থাপত্য

স্বামী সদানন্দ গিরি

কাম্বোজের প্রাচীন রাজধানী, যাহা আঙ্কর থম্ (আঙ্কর=নগর; থম্=ধাম্) নামে পরিচিত, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে শ্যামের রাজা ও বহির্শত্রুকর্ত্তৃক বারংবার আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইবার ফলে কাম্বোজগণ এই বিখ্যাত রাজধানী ও ইহার অনতিদূরে অবস্থিত আঙ্কর ভাট্ নামে জগদ্বিখ্যাত বিষ্ণু-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে—ইহাদের অত্যাশ্চর্য্য স্থাপত্য-নিদর্শনসকল বন-জঙ্গলে আবৃত হইয়া পাঁচ ছয় শতাব্দী যাবত লোকনয়নের অন্তরালে কোথায় যে ছিল, এতদিন কেহ জানিত না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীরা সুদূর প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার করিবার পর হইতে, ফরাসি-প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কাম্বোজের লুপ্ত গৌরবের আবাসভূমি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। মাত্র দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টাব্দ ১৯৩৪ সালে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ গুলেবো (Dr. Victor Goloubew) আঙ্কর থমের ধ্বংশাবশেষ হইতে কাম্বোজের প্রাচীন রাজধানীর সীমানা কষ্টসাধ্য খননাদি কার্য্য দ্বারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে তিনি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সভ্যগণের সম্মুখে "নবম শতাব্দীতে আঙ্কর" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন—তাহা হইতে জানা যায় যে, বিমান-পোত হইতে যদি কেহ আলোচ্য স্থানসকল পর্য্যবেক্ষণ করেন—তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, বারে (Baray) নামে একটী প্রকাণ্ড হ্রদের পূর্ব্বদিকে আঙ্কর থম অবস্থিত। ডাঃ গুলেবো যথার্থ ই উড়ো-জাহাজের সাহায্যে এইসকল হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনজঙ্গলময় স্থানে অবতরণ করেন। আকাশ হইতে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, আঙ্কর থমের দক্ষিণে আঙ্কর ভাট্ অবস্থিত। ডাঃ গুলেবো বহুবার আকাশপথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাম্বোজের প্রাচীন রাজধানীর চারিধারে অন্যান্য যে-সকল স্থান দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন—তাহাদের বিবরণও উক্ত প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।



আঙ্কর ভাট্ নামে বিষ্ণুমন্দির সম্বন্ধে ডাঃ গুলেবো বলেন যে, এই দেবস্থান দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভাস্কর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যের আধার এই প্রস্তরময়

সুবৃহৎ মন্দিরের দ্বাদশটী উচ্চ চূড়া, ইহার গাত্রে পাষাণের ভাষায় অনূদিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ, মন্দিরের পথ-পার্শ্বে প্রস্তরময় সর্পমূর্ত্তিসকল, মন্দির-সংলগ্ন জলাশয় ও প্রস্তরময় ক্রমোচ্চ ভূমি সকল নয়নপথে আসিবামাত্র স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আঙ্কর ভাটের নক্সায় জ্যামিতির নিয়মানুসারে যেন প্রত্যেকটী অংশ চতুষ্কোণ বা বহু সরলরেখাযুক্ত এবং পরিখা-বেষ্টিত সমগ্র মন্দিরাধিকৃত ভূমি যেন চতুষ্কোণ ও জলপূর্ণ প্রশস্ত ফ্রেমে আঁটা। এই অঞ্চলের সমুদয় স্থান শৈলাবৃত। সেইজন্য উড়ো-জাহাজ হইতে মনে হয় যেন আঙ্কর ভাটের উত্তরে অবস্থিত আর একটী বৃহত্তর চতুষ্কোণ ভূমি চক্রবালের দিকে ক্রমনিম্নাভিমুখ হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আঙ্কর থম্—কাম্বোজের প্রাচীন রাজধানী যশোধরপুর। এই রাজধানী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাম্বোজের রাজা সপ্তম জয়বর্ম্মণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা নয় বর্গ কিলোমিটার ভূমির উপর অবস্থিত ও ইহার ঠিক মধ্যস্থলে বায়ন (Bayon) নামে সুবৃহৎ মন্দির—যাহার চূড়াগুলি উড়ো-জাহাজ হইতে পর্ব্বতের শিখরদেশে বহু শৃঙ্গযুক্ত অস্পষ্ট ছবির ন্যায় মনে হয়, কিন্তু এই শৃঙ্গগুলিই ভাস্করের বাটালির সাহায্যে অতিকায় মানুষের অতিশয় প্রকাণ্ড মুখাকৃতিতে পরিণত হইয়াছে।

আঙ্কর থমের দক্ষিণ দিকে একটী অনুচ্চ পাহাড় দেখা যায়। এই পাহাড়ের উপর প্নোম বাখেং (Phnom Bakheng) নামে শিব-মন্দির আছে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইহা আঙ্কর থমের আদি প্রতিষ্ঠাতা রাজা প্রথম যশোবর্ম্মণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের পবিত্র অংশগুলি অতি উচ্চ ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং এই ভিত্তি হইতে নিম্নস্থ সমতল ভূমি পর্য্যন্ত প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী আছে।

আঙ্কর থমের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে যে মন্দিরসকল দেখিতে পাওয়া যায়—সেগুলি নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেইজন্য এই মন্দিরগুলি আঙ্কর থম্ ও আঙ্কর ভাটের তুলনায় প্রাচীনতর। ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক সিদে (George's Cœdes) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই মন্দিরগুলি যে ভূমির উপর অবস্থিত—তাহা হরিহরালয় নামে কাম্বোজের প্রাচীনতর রাজধানী। সেই রাজধানী দ্বিতীয় জয়বর্ম্মণ ও ইন্দ্রবর্ম্মণ নামে দুইজন প্রসিদ্ধ রাজার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই মন্দিরগুলির মধ্যে বাকং (Bakong) নামক মন্দিরে পূর্ব্বযুগে কাম্বোজের দেবরাজদিগের প্রস্তরনির্ম্মিত লিঙ্গময় দেবমূর্ত্তি পূজিত হইত। বাকং মন্দির ও উপরোক্ত প্নোম্ বাখেং মন্দিরের মধ্যে এইটুকু সাদৃশ্য দেখা যায় যে, উভয়শ্রেণীর মন্দিরের প্রত্যেকটীর কেন্দ্রস্থ সুউচ্চ চূড়া একই আদর্শের পরিচায়ক।



আঙ্কর ভাটের অপূর্ব্ব স্থপতি-শিল্পের নিদর্শন

ডাঃ গুলেবো তাঁহার আলোচ্য প্রবন্ধে কয়েকটী প্রত্নতাত্ত্বিক সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বায়নে ভাস্কর্য্য-শিল্পের পরিচায়ক যে সকল মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল—তাহার মধ্যে বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর নামে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও অন্যান্য বহু মূর্ত্তিতে বৌদ্ধধর্ম্মের আদর্শ মুদ্রিত দেখিয়া মুসিঁয়ে লুই ফিনো (M. Louis

Finot) সন্দেহ করিয়াছিলেন যে আঙ্কর থমের মধ্যস্থলে উক্ত বায়ন মন্দিরে ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যে সকল বিধিনিয়ম প্রতিপালিত হইত—তাহা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মান্তর্গত মহাযান সম্প্রদায়ের উপযোগী ও উত্তরকালে এই মন্দির শিবমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। সম্প্রতি উক্ত মন্দিরের ভিত্তির গভীর প্রদেশে আবিষ্কৃত একটী প্রকাণ্ড



আঙ্কর ভাটের বহির্গ্যালারির থামের কারুকার্য্যখচিত কমলামূর্ত্তি

বুদ্ধমূর্ত্তি হইতে মুসিঁয়ে ফিনোর ধারণা এক্ষণে সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মুসিঁয়ে ষ্টার্ণ (M. Philippe Stern) বায়ন সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—তাহার পরে আঙ্কর থম্ নামে পরিচিত ও নবম শতাব্দীতে রাজা প্রথম যশোবর্ম্মণকর্ত্তৃক স্থাপিত সহরটী যে পূর্ব্বে কাম্বোজের বিখ্যাত প্রাচীন রাজধানী ছিল না, বৌদ্ধরাজা প্রথম সূর্য্যবর্ম্মণকর্ত্তৃক একাদশ শতাব্দীতে নিৰ্ম্মিত একটী সামান্য সহরমাত্র ছিল—তাহা এক্ষণে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, আঙ্কর থমের চারিটী কোণে প্রাপ্ত চারিটী শিলালিপির সংস্কৃত ভাষায় রচিত অনুশাসন হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আঙ্কর থম্ ও বায়নকে বেষ্টন করিয়া যে প্রাচীর আছে—তাহা পরবর্ত্তী সময়ে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। সেইজন্য আঙ্কর থম্ ও বায়নের শিল্প-নৈপুণ্যে, এমন কি প্রা-খান্, টা-প্রোম্, বেন্তেই কেদাই, বেন্তেই ছমর্ ও নীক্‌পীনে যে শিল্পের আদর্শ দেখা যায়—তাহা শিল্পের হিসাবে অবনতিরই প্রমাণ করে, উন্নতির যুগ প্রমাণ করে না। সেইজন্য আঙ্কর-থম্ নামে রাজধানী বুদ্ধভক্ত সপ্তম জয়বর্ম্মণকর্ত্তৃক ১১৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই সিদ্ধান্ত সমীচান বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ, উক্ত বৎসরে কাম্বোজদের শত্রুকর্ত্তৃক কাম্বোজের রাজধানী আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়।

অতঃপর যশোধরপুর নামে নবম শতাব্দীতে নিৰ্ম্মিত আঙ্করের প্রথম সহরের স্থান নির্দ্দিষ্ট করার কথা স্বভাবতঃই উঠে। ডাঃ গুলেবো দুই বৎসর যাবৎ খনন-কার্য্য ও বনজঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া দেখিলেন যে, সাত শত হইতে আট শত পুষ্করিণী ও অসংখ্য গৃহাদির ভগ্নাবশেষ ও অন্যান্য বহু নিদর্শন যাহা মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত ছিল—তাহা হইতে তিনি আঙ্কর থমের নামে পরিচিত কাম্বোজের সর্ব্বপ্রথম নগর বা রাজধানী পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই নগর এক্ষণে তিনি বিস্মৃতির গর্ভ হইতে বেষ্টনী, বহু মন্দির, পথ ও সেতুর সহিত উদ্ধার করিয়াছেন। এইসকল অতীতের নিদর্শন বাখেং পাহাড়কে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে। এই পাহাড়েই দেবরাজাদের বাসস্থান ছিল।

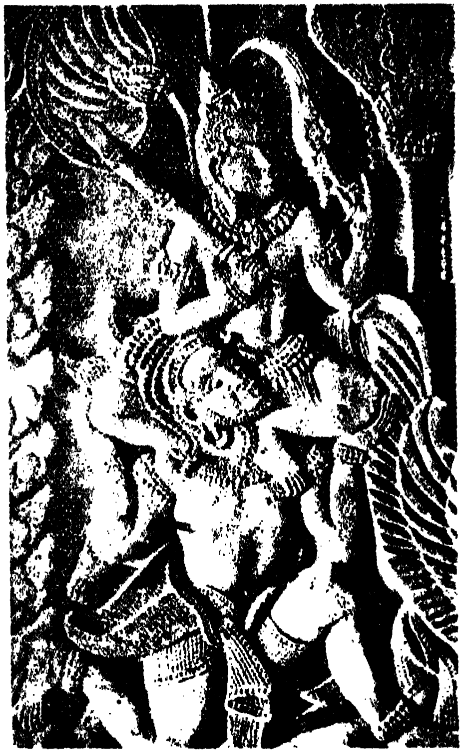
ডাঃ গুলেবোর প্রতিভা ও আশ্চর্য্য অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ! তিনি যখন ১৯৩৬ সালে "সুদূর প্রাচ্যে ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ্যালয়ের" অস্থায়ী ডিরেক্টর ছিলেন, সে সময় তাঁহার সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। এই মিষ্টভাষী অমায়িক বিদেশী রিসার্চার লেখককে আঙ্কর থম্ ও

আঙ্কর ভাট্ সংক্রান্ত যে সকল মানচিত্র দেখাইয়াছিলেন—তাহাতে প্রাচীন কাম্বোজের গৌরবময় স্থানগুলি নির্দ্দিষ্ট ও চিহ্নিত হওয়াতে কাম্বোজের প্রাচীন ইতিহাসের নূতন সংস্করণ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সে ইতিহাস লিখিবার শক্তি আমাদের নাই। সেই জন্য এস্থানে ডাঃ গ্রুলেবোর আলোচ্য প্রবন্ধের সারাংশ সন্নিবেশিত হইল।

কাম্বোজ-স্থাপত্যের প্রাণবস্তু হইতেছে ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মের ঢেউ যে আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন যুগে কাম্বোজে পঁহুছিয়াছে, সেখানকার স্থাপত্য-শিল্প ও ভাস্কর্য্যের ভিতর দিয়া তাহার বিকাশ সেই আকারে দেখা গিয়াছে। এইরূপে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ বিষ্ণু-পূজা প্রাচীন কাম্বোজের মন্দিরে মন্দিরে বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও তৎসঙ্গে মন্দিরের অবয়বে বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত রূপ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে; শৈবধর্ম্ম শিবের লিঙ্গময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও তদনুসারে মন্দিরের রূপও কল্পিত হইয়াছে; বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও মন্দিরের গাত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়াপাত হইয়াছে। কাম্বোজে দেবরাজার মূর্ত্তিপূজায় উপধর্ম্মের প্রভাবই অনুভূত হয়। সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের আদর্শে নির্ম্মিত মন্দিরে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মেরই প্রভাব অনুভব করা যায়। কাম্বোজে শিব বা বুদ্ধ-পূজায় তন্ত্রোক্ত বিধির আমদানি সেখানকার স্থাপত্যে অনুশাসনাদির প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছে। ধর্ম্মের পরে ধর্ম্মগ্রন্থের প্রভাব কাম্বোজের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে স্পষ্ট অনুভব করা যায়। আমরা সেইজন্য রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের আখ্যানবিশেষ মন্দিরগাত্রে খোদিত অসংখ্য প্রস্তরময় মূর্ত্তির ভিতর দিয়া পাঠ করিবার সুবিধা পাই। পৌরাণিক ঘটনাবলীর এইপ্রকার নির্ব্বাক্ অভিনয় ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দুর ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত উপদেশ, নীতি, অনুশাসন ও বিধি-নিয়ম মন্দিরের গাত্রস্থ পাথরের উপর ও বহু শিলা-লিপিতে স্থান পাওয়াতে, কাম্বোজে ভারতীয় কৃষ্টি মূর্ত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, মন্দিরে মন্দিরে পুস্তকাগার, নগরে নগরে চিকিৎসালয় ও জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে আমরা কাম্বোজ-স্থাপত্যে হিন্দু-সভ্যতার যে গৌরবময় ইতিহাস পাঠ করি—তাহার অনুরূপ কোনও কিছু য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রাচীন রাজধানী আঙ্কর থম্ জেলার বিবরণ

কাম্বোজের প্রাচীন রাজধানী আঙ্কর থম্ যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলাটি মন্দিরময়ম্ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কাম্বোজের বর্ত্তমান রাজধানী প্নোম্পেন হইতে



আঙ্কর ভাটের গাত্র-চিত্র

আঙ্কর থমের দিকে আমরা জলপথেই হউক, আর স্থলপথেই হউক, যতই অগ্রসর হইতে থাকি, দূর হইতে চারিদিকের বনভূমির উচ্চ বৃক্ষশির হইতেও উচ্চতর মন্দিরচূড়াসকল সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নয়নগোচর হয়। তারপরে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে উপস্থিত হইলে—সেখানেও ছোট-বড় বহু মন্দির আমরা দেখিতে পাই। বাস্তবিক বহুদূর হইতে মন্দিরের সু-উচ্চ চূড়া দেখিয়াই বুঝা যায় যে, সেই মন্দিরের সন্নিকটে কোনও না কোন গ্রাম বা নগর আছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে প্রকাণ্ড হ্রদের উল্লেখ করিয়াছি—তাহার তীরে যে মন্দির অবস্থিত, তাহা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রাচীনতর একটি ভগ্ন মন্দিরের ভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীনতর মন্দিরটী ৬৭৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুর দেবতা শিব বা হরিহরকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণে ফুম্‌প্রাসাদ নামে দেবস্থান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্যের সময় নির্ম্মিত হইলেও, বেশ ভাল অবস্থায় আছে। এখানে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর লিপি মন্দিরের গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের কাষ্ঠনির্ম্মিত দরজায় বহু মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। মন্দিরে দুইখানি পবিত্র খড়্গ সযত্নে রক্ষিত।



বায়নের প্রবেশদ্বার

প্নোম্ সন্তোক নামে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালার শিখরদেশে একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ছিল—যাহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের খাতিরে হিন্দু আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। টা' প্রাসাদে আবার যে ভূমিতে হিন্দু মন্দির ছিল—তাহাতে এক্ষণে একটি বৌদ্ধবিহার অবস্থিত। নদীসঙ্কুল এই জেলায় বহু খালের অস্তিত্ব অসংখ্য সেতু সৃষ্টি করিয়াছে। সেগুলির বিশেষত্ব এই যে, প্রকাণ্ড নাগমূর্ত্তিসকল তাহাদের স্থাপত্যে সংযোজিত হইয়াছে। আঙ্কর থম্ ও আঙ্কর ভাটের এলাকার বাহিরে উপরোক্ত হ্রদের সন্নিকটে অন্যান্য যে সকল মন্দির আছে তাহার মধ্যে লোলিয়াই, প্রাঃকো ও বাকং নামে পরিচিত মন্দিরগুলি প্রাচীনত্বের হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই মন্দিরগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত ও চারিতল বিশিষ্ট। ইহাদের গাত্রস্থ বহু লিপি বর্ত্তমান সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া দিয়াছে। উক্ত লোলিয়াই মন্দিরের দেবতা শিব। চারিটী চূড়াযুক্ত এই মন্দির ইন্দ্রবর্ম্মণের পুত্র যশোবর্ম্মণ ৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে ১২ জুলাই ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের উক্ত চারিটী চূড়া তিনি তাঁহার পিতা ও মাতা, মাতামহ ও মাতামহীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আলোচ্য মন্দির ইন্দ্রতলাকা দ্বীপের মন্দিরের সাদৃশ্যে নির্ম্মিত। মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহগুলিতে সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী শিব ও দেবীর মূর্ত্তি ব্যতীত, দেয়ালের কুলিঙ্গায় বহু মূর্ত্তি আছে। উক্ত প্রাঃকোর মন্দির ইন্দ্রবর্ম্মণ কর্ত্তৃক ২৯শে জানুয়ারী ৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দেবলোক প্রাপ্ত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই মন্দিরের গাত্রে সূক্ষ্ম শিল্পের চমৎকার নৈপুণ্য বিদ্যমান। এই মন্দির "পবিত্র বৃষভের মন্দির" নামে খ্যাত। এই শিব-মন্দিরে ঈশ ও দেবীর ছয়টী মূর্ত্তি আছে। উক্ত বাকং মন্দিরও রাজা প্রথম ইন্দ্রবর্ম্মণ ৮৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরে লিপির পাঠ হইতে জানা যায় যে, ইন্দ্রেশ্বর নামে যাঁহার উল্লেখ তাহাতে আছে—তিনিই উক্ত রাজা। এই মন্দির আলোচ্য তিনটী মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

মন্দিরের দেবতা শিব। এই মন্দির আটটী চূড়াযুক্ত ও মধ্যভাগে যে চূড়া আছে, তাহা অতি উচ্চ। আলোচ্য তিনটী মন্দিরই উচ্চ চাতালের উপর নির্ম্মিত। চাতালের উপর উঠিতে গেলে সোপানাবলী অতিক্রম করিতে হয়। আলোচ্য মন্দিরগুলি ও এই জেলার অন্যান্য মন্দির সম্বন্ধে যথাস্থানে পুনরায় আলোচনা করা যাইবে।

এ স্থলে আপাততঃ বক্তব্য, যে সকল মন্দিরের কথা লিখিত হইল সেগুলি দর্শন করিয়া সীয়েম্ রীপ সহর অতিক্রম করিয়া কাম্বোজের প্রাচীন রাজধানী আঙ্কর থমে পৌছিতে হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই সমগ্র অঞ্চল দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গলে ঢাকা ছিল। সেইজন্য আঙ্কর থমের স্মৃতি মানুষের মন হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এখন পর্য্যন্ত ফরাসি গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকগণকর্ত্তৃক এই অঞ্চলের বন-জঙ্গল পরিষ্কারের কার্য্য চলিতেছে। তিন চারি বৎসরেরও পূর্ব্বে এই বনাবৃত অঞ্চলের বহু স্থান অনাবিষ্কৃত ছিল। এক্ষণে আবিষ্কৃত মন্দির সকলের কোনও একটি অতি ক্ষুদ্র উপকরণও যাহাতে কেহ সরাইতে না পারে—তাহার জন্য খুব কড়া আইন জারী হইয়াছে।

বায়ন

সীয়েম্ রীপ্ হইতে আঙ্কর থমে প্রবেশ করিতে হইলে দক্ষিণ দিকের সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। আঙ্কর থমের পাঁচটী প্রস্তরময় সিংহদ্বার আছে। প্রশস্ত পরিখা-বেষ্টিত এই রাজধানীতে আসিতে হইলে সেতুর উপর দিয়া পরিখা পার হইয়া আসিতে হয়। দ্বারগুলিতে প্রায় একই রকম স্থাপত্য-শিল্পের নমুনা দেখা যায়। পরিখার পরে সমুদয় সহরটী প্রস্তরময় সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

আঙ্কর থমের প্রধান উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্ত্তি হইতেছে ইহার সুপ্রসিদ্ধ বায়ন (Bayon) নামে মন্দির। এই বৃহদাকার ও অতি উচ্চ প্রস্তরময় মন্দির সহরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই মন্দির সপ্তম জয়বর্ম্মণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোনও কোনও প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে এই মন্দির সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণ তখন কাম্বোজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ইহার স্থাপত্যে নূতন ভঙ্গী অর্পিত ও মন্দিরটী উচ্চতর করিয়া নির্ম্মিত হইলে—ইহার আকার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় ও হিন্দুর দেবতা শিবকে তখন ইহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে সপ্তম জয়বর্ম্মণের



নম-পেং-এর রাজপ্রাসাদের গাত্র-চিত্র

সময়কার শিলালিপি এই মন্দিরে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে থাইগণের আক্রমণের ফলে এই মন্দিরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।

বায়নের ক্রমোচ্চ ত্রিতল ছাদ-সদৃশ স্থানগুলিকে বেষ্টন করিয়া প্রস্তরময় গম্বুজাকার একান্নটী শিবলিঙ্গাকৃতি মূর্ত্তি, যাহার মধ্যে একটি গম্বুজাকার মূর্ত্তির উপর চতুর্ম্মুখযুক্ত শিব মূর্ত্তির উপরস্থ প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে লৌহ ও পিতলনির্ম্মিত ত্রিশূল শোভা পাইত। মন্দিরের নিম্ন-তলের বহির্ভাগে প্রস্তরময় নাগমূর্ত্তিসকল দেখা যায়।

সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ দেয়ালের গাত্রে অসংখ্য পাষাণময় খোদিত মূর্ত্তি সজীবতাময় ও তাহাদের মারফত আমরা দশম শতাব্দীতে কাম্বোজগণের জাতীয় জীবনের ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ইতিহাস পাঠ করিবার সুবিধা পাই। উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দুইটী পুস্তকাগার —যাহার প্রত্যেকটীর উর্দ্ধভাগে চতুর্ম্মুখ শিবের মূর্ত্তি। দ্বিতলের দেয়ালগুলিতে বহু পৌরাণিক ঘটনা নায়ক-নায়িকার প্রস্তরময় মূর্ত্তির ভিতর দিয়া সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত।

বায়নের মন্দির দেখিয়া পাশ্চাত্যগণ বিস্ময়াভিভূত ও হার স্থাপত্য-শিল্পের প্রশংসায় শতমুখ হইয়াছেন।



আঙ্কর ভাটের অপরূপ ভাস্কর্য্য

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখানে চল্লিশখানি শিলালিপি পাইয়াছেন। ভূপর্য্যটকগণ ইহার আয়তন দেখিয়া মিশরের পিরামিডের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই মন্দিরের উপরোক্ত প্রথম তলের ভাস্কর্য্যে সমসাময়িক সমাজের ঘটনাগুলি বিবৃত। কাম্বোজের রাজনৈতিক ইতিহাসও এই ভাস্কর্য্যের কৃপায় পাঠ করিবার সুবিধা হয়। পৌরাণিক কোনও ঘটনার সমাবেশ এখানে নাই। দশম শতাব্দীতে কাম্বোজের যোদ্ধারা কিরূপে সশস্ত্র সৈন্যগণের সহিত সমরাভিযানে যোগদান করিতেন, রাজপ্রাসাদসংক্রান্ত দৃশ্যাবলী, জনবহুল রাজধানীর বৈচিত্র্যময়তা ও বহির্শত্রুগণের সহিত কাম্বোজগণের অবিরাম যুদ্ধ প্রভৃতি জাতীয় ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনায় ভরা এই সকল মূক চিত্রে ভাস্কর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। প্রাচীনকালে হাটে-বাজারে কাম্বোজগণের দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যাবলী, কোথাও তাহারা অস্ত্র-প্রয়োগে ব্যস্ত, কোথাও বা তাহারা মৎস্য-শিকার করিতেছে, কিম্বা দেবতার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া রহিয়াছে, রাজসভায় আসীন কাম্বোজের রাজা বন্দিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, অথবা যুদ্ধে কাম্বোজ সৈন্যগণের নেতৃত্ব করিতেছেন, এই সব ও অন্যান্য পাষাণময় চিত্রে জীবন্তভাব ভাস্করের শিল্প-নৈপুণ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় তলের ভিতরকার প্রকোষ্ঠের দেয়ালে পৌরাণিক চরিত্রের প্রস্তরময় চিত্রেও আমরা যুদ্ধের দৃশ্য ও যোদ্ধাগণের বীরত্ব ব্যতীত ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও চিত্রসকল দেখিয়া, শিল্পীর কল্পনার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। বাস্তবিক, বায়ন কাম্বোজে হিন্দু-ভাস্কর্য্যের অমর কীর্ত্তি-স্বরূপ যেভাবে পাষাণের ঐতিহাসিক মহাকাব্য রচনা করিয়াছে—তাহার তুলনা হিন্দু ভারতেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

রাজপ্রাসাদ

বায়নের উত্তরদিকে যে প্রকাণ্ড ময়দান আছে—তাহার পশ্চিমে ও বায়নের উত্তর পশ্চিমে রাজার নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি ক্ষুদ্র নগর আছে। এই নগরে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। রাজনগর তিনদিকে প্রাচীর ও প্রাচীরের বাহিরে প্রশস্ত পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। রাজপ্রাসাদও প্রাচীর বেষ্টিত। এই প্রাসাদে আসিবার জন্য পাঁচটী দ্বার আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে বায়নের "হস্তী চত্বর"। সমতলভূমি হইতে অনেকটা উচ্চে নির্ম্মিত এই চত্বরে অবস্থান করিয়া রাজা উপরোক্ত ময়দানে সৈনিকগণের কুচকাওয়াজ ও নাগরিকগণের খেলাধূলা দর্শন করিতেন

চত্বরের মধ্যস্থানে গোপুর—যাহার ভিতর দিয়া রাজপ্রাসাদে যাইতে হয়। এই গোপুর ও ইহার সংলগ্ন প্রস্তরময় ইমারতের গাত্রে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা সূর্য্যবর্ম্মণের চারিশত কাম্বোজ সর্দ্দার রাজানুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজানুগত্যের সেই স্বীকারোক্তি এখন পর্য্যন্ত কাম্বোজে প্রচলিত আছে।

রাজপ্রাসাদে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজপ্রাসাদের প্রধান অট্টালিকা খুব জাঁকাল রকমের স্থাপত্য-শিল্পের আধার। একাধিক



নম-বেকেং-এ শ্রীবুদ্ধের পদচিহ্ন (নবম শতাব্দী)



আঙ্কর ভাটের সম্মুখে কাম্বোডিয়া নৃত্যের দৃশ্য

সুদীর্ঘ বারান্দা ও ছাদযুক্ত যাতায়াতের পথ যদিও কতকটা সৌষ্ঠবহীন, কিন্তু যে গৃহে রাজসভা ছিল তাহার জানালা-গুলির ফ্রেম স্বর্ণময়, দক্ষিণ ও বামদিকের চতুষ্কোণ স্তম্ভের সারি—যাহাতে প্রায় পঞ্চাশখানি দর্পণ শোভা পাইত। রাজা যেখানে বসিতেন তাহার উভয় পার্শ্বের দেয়ালে প্রকাণ্ড ধাতুময় দর্পণ, দর্পণের সম্মুখে সোণার ফুলদানি, ফুলদানির সম্মুখে সোণার ধুনুচি—যাহাতে সুগন্ধ ধূপ ধুনা রক্ষিত হইত।

(আগামীবারে সমাপ্য)

বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রীয় প্রতিভা*

অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌, পি-এইচ্‌-ডি

যে মহাপুরুষ "ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে ভাব-মন্দাকিনীর অবতরণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন", তিনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকাল হইতে যে এক শতাব্দী অতীত হইল, তাহার মধ্যে বাঙ্গালী জাতির যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার অনেকাংশই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভার অনুপ্রেরণায়। ইঁহাদের মধ্যে কাল-হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম এবং তাঁহার প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্র যে পাষাণরুদ্ধ ভাব-নির্ঝরিণীকে মুক্ত করিলেন, তাহাতে তাঁহার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই জলরাশি সঞ্চিত হইতেছিল। কিন্তু সেই জলরাশি ইংরাজী ভাষার পাষাণকারায় অবরুদ্ধ থাকায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে ভাবের বন্যা আনয়ন করিতে পারিতেছিল না। রাজা রামমোহনের প্রচেষ্টায় মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের মধ্যে যে স্বদেশ-প্রীতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আমরা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের "India Gazette"-এ প্রকাশিত কাশীপ্রসাদ ঘোষের একটি কবিতা হইতে পাই। কবি জন্মভূমিকে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—

Land of the Gods and lofty name
Land of the fair and beauty's spell,
Land of the bards of mighty fame,
My native land! for e'er farewell!

ইহাতে শ্রদ্ধা থাকিলেও, প্রীতি নাই; কেননা, প্রীতির ভাষা রাজভাষা নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের চার মাস পূর্ব্বে রাজা রামমোহনের প্রিয়পাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীকে সভাপতি করিয়া ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় "Society for the acquisition of general Knowledge" নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। রামগোপাল ঘোষ ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি এবং রামতনু লাহিড়ী এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। বাঙ্গালা-দেশের এই সব শ্রেষ্ঠ মনীষী ইহার সভ্য থাকা সত্ত্বেও, ইহার কার্য্যাদি ইংরাজীভাষায় পরিচালিত হইত। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার ৩৪ বৎসর পরে যখন বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" প্রচার করেন, তখনও আমাদের ইংর প্রীতির বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। "বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনায়" বঙ্কিমচন্দ্র অসীম দুঃখ ও গভীর পরিতাপের সহিত লিখিলেন—"লেখাপড়ার কথা দূরে থাক্‌, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরেজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেকচার, এসে, প্রোসিডিংস্‌ সমুদয় ইংরেজিতে। যদি



ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

* চাইবাসা বঙ্কিম শতবার্ষিকী উৎসবে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

উভয় পক্ষ ইংরেজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরেজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরেজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরেজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র হইয়াছে। আমাদিগের এখনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরেজিতে পঠিত হইবে।" বাঙ্গালা ভাষার বিরুদ্ধে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া তিনি আমাদের নমস্য। তিনি বাঙ্গালার জনসাধারণের অন্তরস্পর্শ করিবার জন্যই বাঙ্গালা ভাষায় লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে বাঙ্গালাদেশে যে ভাবের বন্যা আসিয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতভূমি আজ টলমল করিতেছে। ভাষায় নবরীতি-সংস্থাপনে বা উপন্যাসে নবভাব-বিশ্লেষণে তাঁহার প্রভাব অসামান্য হইলেও, তাঁহার রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রভাবেই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেইজন্য আমি তাঁহার রাষ্ট্রীয় দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ঔপন্যাসিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস লিখিতে হইলে যে প্রখর কল্পনাশক্তি ও নিবিড় অনুভূতির প্রয়োজন, বিধাতা তাহা তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণেই দিয়াছিলেন। তাঁহার এই উভয়শক্তিই রাষ্ট্রীয় চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। "রাধারাণী" ও "যুগলাঙ্গুরীয়"কে বড় গল্প বলিয়া ধরিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের বারখানি উপন্যাসের মধ্যে সাতখানি বাঙ্গালার ও একখানি ভারতবাসীর জীবনের গুরুতর রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের পটভূমিকার উপর রেখাবিন্যাস। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকের ঘটনা লইয়া লেখা। তখন বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ ভাগ মুঘলের করতলগত হইলেও, পাঠানশক্তি লোপ পায় নাই; এবং গড়মন্দারণের ক্ষুদ্র ভূস্বামীর ন্যায় অনেক হিন্দু জমীদার তখনও নামে না হইলেও, কার্য্যতঃ স্বাধীন থাকিবার স্বপ্ন দেখিতেন। নবীন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বঙ্কিমচন্দ্রকে তখন অতি সাবধানে লেখনী পরিচালনা করিতে হইয়াছে। দেশভক্তির উচ্ছ্বাস, স্বাধীনতালাভেচ্ছার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত তাঁহাকে সুকৌশলে অন্তরালে রাখিতে হইয়াছে। তথাপি গড়মন্দারণের পতনকাহিনী তিলোত্তমা-জগৎসিংহের প্রেমালাপের পুলক-বিহ্বলতার উপর বিষাদের ঘন-যবনিকা পাত করিয়াছে। "পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে, কখনও অধীনতা স্বীকার করে নাই", জগৎসিংহের প্রতি ওসমানের এই উক্তি বাঙ্গালীর হৃদয় আত্মধিক্কারে পূর্ণ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস "কপালকুণ্ডলা"র (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) ঘটনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ইহাতে বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় সংঘাতের কথা বিশেষ কিছু নাই বটে, কিন্তু সপ্তগ্রামের ক্রম অবনতি ও শ্রীহীনতার একটি করুণ চিত্র আছে। তৃতীয় উপন্যাস "মৃণালিনী"তে (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) কিরূপ মূঢ়তা, কাপুরুষতা, দৈবনির্ভরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাঙ্গালী জাতি তুর্কীদের নিকট স্বাধীনতা হারাইল, তাহার আত্মবিশ্লেষণমূলক বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষভাগে দেখি—দেবী অষ্টভুজার মন্দিরে আগুন লাগিয়াছে। শোকে, ধিক্কারে অনুশোচনায় পরিপূরিত-হৃদয় পশুপতি দেবীকে বলিতেছেন—"আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম, আমিই তোমাকে বিসর্জ্জন দিব। চল ইষ্টদেবি! তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিব।" ইহা পাঠ করিয়া মনে হয় না কি বাঙ্গালী নিজের হাতে তাহার স্বাধীনতাকে—তাহার জননী জন্মভূমিকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়াছে? এই ইঙ্গিত এখানে তাদৃশ স্পষ্ট না হইলেও, 'মৃণালিনী" রচনার সাত বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র "কমলাকান্তের দপ্তরে" এই কথা হৃদয়ভেদী স্পষ্টতার সহিত বলিয়াছেন—

"চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশানভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি—সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তরতর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী

কোথায়? তুমি যাহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিনী কোথায়? তুমি যাহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি! তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কলকল তরতর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে যবন ভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন; বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন।......যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?"

"মৃণালিনী" রচনার পরবর্ত্তী দশ বৎসরের কালকে (১৮৬৯-১৮৭৮) অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ৩১ হইতে ৪০ বৎসর বয়স—যে বয়সে কবি ও ঔপন্যাসিকদের প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশ হয়—তাহাকে আমরা সামাজিক উপন্যাস-রচনার যুগ বলিতে পারি। ঐ সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র "ইন্দিরা", "বিষবৃক্ষ", "যুগলাঙ্গুরীয়", "রাধারাণী", "রজনী" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রকাশ করেন। এই যুগে অতীত ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি একমাত্র "চন্দ্রশেখর" (১৮৭৫ খৃঃ অঃ) রচনা করেন। মীরকাসিমের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষে প্রতাপ নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যুদ্ধে যোগ দেওয়া তাঁহার আত্মপ্রয়োজনে,—দেশাত্মবোধের তাগিদে নহে। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসকে নিছক রসসৃষ্টির জন্য ব্যবহার করিয়া "বঙ্গ দর্শনের" প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া একটি নিজস্ব রাষ্ট্রীয় মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই যুগের যে-সকল প্রবন্ধে তাঁহার রাষ্ট্রীয় দর্শনের আভাষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে "ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?" ও "বঙ্গদেশের কৃষক" ১২৭৯ সালে, "স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" ও "সাম্য" ১২৮০ সালে, "কমলাকান্তের দপ্তর" ১২৮০ হইতে ১২৮৩ সালে, "বাঙ্গালার ইতিহাস" ও "বাঙ্গালা শাসনের কল" ১২৮১ সালে, "বাহুবল ও বাক্যবল"; "মনুষ্যত্ব কি?" ১২৮৪ সালে এবং "লোকশিক্ষা" ১২৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮৮২ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র "রাজসিংহ" (১৮৮২), "আনন্দমঠ" (১৮৮২), "দেবী-চৌধুরাণী" (১৮৮৪) ও "সীতারাম" (১৮৮৭) প্রকাশ করেন। "রাজসিংহে"র উপসংহারে মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন।" ধর্ম্ম শব্দে এখানে বঙ্কিমচন্দ্র কি বুঝাইতে চাহেন, তাহা পরে বলিব। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের উপর "আনন্দমঠ" যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এরূপ আর অন্য কোন গ্রন্থ করে নাই। রুসোর "Social Contract"-কে যে অর্থে ফরাসী বিপ্লবের নিদান বলিয়া মনে করা হয়, সেই অর্থে "বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ"কে আমরা আধুনিক ভারতের জাতীয়তা-আন্দোলনের অন্যতম নিদানরূপে গ্রহণ করিতে পারি। "দেবীচৌধুরাণীর" ঘটনাকাল "আনন্দমঠের"ই সমসাময়িক। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে নবরাষ্ট্র গঠনে পুরুষেরা কি করিতে পারে, তাহার ইঙ্গিত "আনন্দমঠে" এবং নারী কি করিতে পারে, তাহার আভাষ "দেবীচৌধুরাণীতে" পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থে এবং তাঁহার শেষ উপন্যাস "সীতারামে" রাষ্ট্রকে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্ম্মের স্বরূপ কি? তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাশীল বা মূর্ত্তিপূজায় আগ্রহান্বিত ছিলেন না। তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের শক্তিসমূহের সম্যক্ অনুশীলন ও প্রস্ফুরণই মনুষ্যের ধর্ম্ম। তিনি বলেন—"সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বজন-প্রীতি, স্বদেশ-প্রীতি, পশু-প্রীতি, দয়া এই

প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ-প্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।" বর্ত্তমান যুগে, বিশেষ করিয়া বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে সর্ব্বভূতে প্রীতির বা আন্তর্জাতিক মিলনের সহিত স্বদেশ-প্রীতির আদর্শের ঘোরতর বিরোধ বাধিয়াছে। যাঁহারা সমস্ত জগতে শান্তির প্রতিষ্ঠা চাহেন, তাঁহারা স্বদেশ-প্রীতিকে খুব ভাল চোখে দেখেন না। তাঁহাদের মতে স্বদেশ-প্রীতির আদর্শ সঙ্কীর্ণ এবং তাহার ফলে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সর্ব্বভূতে প্রীতির সহিত স্বদেশ-প্রীতির একটি মনোরম সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে—"আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম; কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এজন্য সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্ত্তব্য।" তাঁহার মতে ইউরোপীয়গণ 'Patriotism' বলিতে পরের অনিষ্টসাধন করিয়া, অন্য সমাজের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন বা শোষণ করিয়া নিজের দেশের কল্যাণসাধন বুঝিয়া থাকে। কিন্তু যথার্থ স্বদেশ-প্রীতির অর্থ হওয়া উচিত এই যে, আমরা যেমন পর-সমাজের অনিষ্ট-সাধন করিয়া নিজ সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, তেমনি "আমার সমাজের অনিষ্ট-সাধন করিয়া কাহাকেও আপনার সমাজের ইষ্ট-সাধন করিতে দিব না।" বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ-প্রীতিকে নিষ্কামভাবে অনুশীলন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সেই জন্যই স্বদেশ-প্রীতিকে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন যে আমাদের দেশে স্বদেশ-প্রীতি জনসাধারণের মনে কোন কালেই প্রাধান্য লাভ করে নাই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়দের হস্তে ন্যস্ত থাকায়, সাধারণ লোকের মনে রাষ্ট্রের প্রতি মমত্ববোধ জাগরিত হয় নাই। তাহারা সুশাসন চাহিয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা চাহে নাই। উপরন্তু ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, সমগ্র ভারতবর্ষে এক-জাতীয়তার চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় নাই। তারপর বিশ্ব-প্রীতির উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দিতে যাইয়া ভারতবাসীরা নিজের দেশের স্বার্থরক্ষায় যত্নপরায়ণ হয়েন নাই। বহুকালের প্রচলিত সংস্কারের ফলে স্বদেশের প্রতি আমাদের যে ঔদাসীন্য দেখা দিয়াছিল, তাহা দূর করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—স্বদেশ-প্রীতিকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করা। ধর্ম্মের মধ্যে পূজার ভাব থাকিবেই। স্বদেশ-প্রীতিধর্ম্মে পূজা করিব কাহাকে? বঙ্কিমচন্দ্র কোন নূতন দেবদেবীর স্থাপনা না করিয়া, দুর্গাকেই দেশজননীর প্রতীক-রূপে পূজা করিবার ব্যবস্থা দিলেন। কমলাকান্ত সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা দেখিয়া চিনিলেন—"এই আমার জননী-জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজা—দশ হাত—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কাল-স্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ-ধারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

"বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতে মায়ের এই রূপ আরও সুপরিস্ফুট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে মাতৃমূর্ত্তির সাধক সে-মূর্ত্তি কেবল অপরূপ সৌন্দর্য্য-শালিনী নহেন, তিনি অসীম শক্তিময়ী। তাঁহার এই শক্তি জাতির কোন সম্প্রদায় বিশেষের বল হইতে সঞ্জাত নহে, পরন্তু সমগ্র জাতির সংহত শক্তি ও উদ্যত অসি হইতে উদ্ভূত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুসারে বাহুবলের উপরই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। বাহুবল হারাইয়া ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছিল—বাহুবলে বলীয়ান্ হইয়াই ভারতভূমির স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। তিনি বুঝিতেন যে, বাহুবল পশুর বল, "কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশ পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।" এইজন্য মায়ের মূর্ত্তি-পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র শক্তির উপর এত জোর দিয়াছেন।

"দ্বিসপ্ত কোটি-ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে—
অবলা কেন মা এত বলে!"

জাতীয় রাষ্ট্রে প্রত্যেক নর, প্রত্যেক নারী সমান কর্ত্তব্য পালন করিবে, সমান অধিকার ভোগ করিবে—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ; তাই তিনি তদানীন্তন বঙ্গের সপ্তকোটি সন্তানের প্রত্যেকে স্বদেশ রক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, কল্পনা করিয়াছেন। আধুনিক যুগে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অত্যধিক প্রসারের ফলে সমাজের সংহতি-শক্তির হ্রাস হইয়াছে। ব্যক্তির জীবন যদি সমাজের হিতের জন্য উৎসর্গীকৃত না হয়, তাহা হইলে কি ব্যক্তির, কি সমাজের—কাহারও মঙ্গল হয় না। তাই ব্যক্তির সত্তাকে সমাজের সত্তার সহিত একীভূত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমির স্তবে লিখিলেন—

"তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

সমাজের সহিত ব্যক্তির একাত্মবোধ স্থাপন করিতে হইলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সামাজিক বিভেদ বিলোপ করা প্রয়োজন। সকলেই এক মায়ের সন্তান—প্রত্যেকেরই জীবনের একমাত্র ব্রত দেশজননীর সেবা করা—জাতি-ভেদ থাকিলে, এই বোধ প্রসার লাভ করিতে পারে না। তাই সত্যানন্দ সন্তান-ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র স্বদেশপ্রীতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। জাতীয়তাবোধ যাহাতে দৃঢ় হয় তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের ইতিহাস পাঠ করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগণের অভ্যুদয়ের অন্যতম মূল কারণ—গ্রীকো-রোমান্ সভ্যতার নবজন্মলাভ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে যে নব-জাগরণ অনুভূত হইয়াছিল—তাহার ফলে একদিকে যেমন তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনি প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার প্রতি আগ্রহ জন্মিয়াছিল। সাহিত্য ও ইতিহাস হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াই ইউরোপীয় জাতিসমূহ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারের জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক রূপ—যাহাতে কার্য্যকারণের, উত্থানপতনের মূল সূত্রের অনুসন্ধান পাওয়া যায়—তাহার আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্ব-প্রথমে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করেন। ষ্টুয়ার্ট, মার্শম্যান, লেদ্‌ব্রিজ্ সাহেবের লেখা বা মুসলমান ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতদুষ্ট রাজরাজড়ার যুদ্ধবিগ্রহ-কাহিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র 'ইতিহাস'-আখ্যা দিতে সম্মত ছিলেন না। বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস কি কি উপাদানে থাকিবে, তাহার একটা বিস্তৃত খসড়া তিনি "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামক প্রবন্ধে দিয়াছেন। আশা করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালার যে ইতিহাস প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রস্তাবিত ইতিহাস-রচনার পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করিবে।

স্বদেশপ্রীতি প্রচার ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদেরা বহু তর্কবিতর্ক করিয়া যে সিদ্ধান্তে এখন উপনীত হইয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে তাঁহাদের বহু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া উহা বঙ্গভাষায় লোকসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজ যে বেশী ব্যাপক এবং সমাজশক্তি হইতেই রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হইয়াছে, এই মত "বাহুবল ও বাক্যবল" প্রবন্ধে এবং "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রই এদেশে প্রথম স্থাপন করেন। সমাজ-জীবন বা সামাজিকতা মনুষ্যজাতির উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, এই তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, তিনি দেখাইয়াছেন যে—সমাজের মধ্য দিয়াই মানুষের জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মাচরণ সম্ভব; সমাজ-সংগঠনের পূর্ব্বে যদি মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকিত, তাহাতে মানুষের কেবলমাত্র শারীরিক প্রয়োজনগুলি কোনরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারিত। উন্নততর জীবনের চরিতার্থতা সমাজের মধ্যেই সম্ভব। রাজশক্তি সমাজ-

জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু "যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিবলে পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইঁহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইঁহারা রাজাদিগেরও গুরু।" "রাজা" শব্দে বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্রশক্তি, গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি থাকা প্রয়োজন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টকেও পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, এমন শক্তি সমাজের মধ্যে নিহিত আছে।

ভারতবর্ষের লোক রাজশক্তিকে নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিহত-রূপে স্বীকার করিতে অভ্যস্ত। এরূপ ধারণার ফলে নাগরিকগণের আত্মমর্য্যাদার হানি হয়, যে কোন প্রকার শাসন ব্যবস্থাকে তাহারা মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। রাষ্ট্রের সুশাসনের জন্য নাগরিকদের যে দায়িত্ব, যে কর্ত্তব্য আছে, তাহাকে অস্বীকার করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবাসীর সেই বিস্মৃতপ্রায় কর্ত্তব্যবোধকে উদ্বোধিত করিবার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় দর্শনকে ভারতীয় সংস্কারের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। তিনি বহুস্থানে লিখিয়াছেন যে, "রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এইরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেননা, রাজার স্বেচ্ছাচারিতায় সমাজের অমঙ্গল।"

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাম্যবাদের কথা আলোচিত হইতেছে। কয়েকটি দেশে সাম্যবাদের মূলনীতি অনুসৃত হইতেছে। সাম্যবাদকে স্বীকার করুক, না-করুক, সকল দেশের লোকই ইহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যখন "সাম্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন, তখন কোন দেশেই উহা স্বীকৃত হয় নাই; আমাদের দেশের দুই চারিজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ ঐ মতবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার মূলতত্ত্ব সরল ভাষায় বাঙ্গালী পাঠককে বুঝাইয়া দিয়া বলেন—"এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এরূপ বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিবে।" জার্ম্মাণী, ইতালী ও জাপানের সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতা সত্ত্বেও, অনেক মনীষী আজ মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়া অসম্ভব নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ধানী দৃষ্টির আলোকপাতে সময়ে সময়ে অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ তাঁহার সমক্ষে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইত। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত প্রথমে যখন "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয়, তখন কেহই ইহার অসাধারণ শক্তি লক্ষ্য করেন নাই। এমন কি দুই একজন সমালোচক বলিয়াছিলেন—"এমন ভাল জিনিষটীকে আধ সংস্কৃত, আধ বাঙ্গালায় লিখিয়া মাটী করা হইয়াছে ; এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না।" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙ্গালী মাতিয়াছে।" 'বন্দেমাতরম্' সম্বন্ধে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী যেমন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে, তেমনি সাম্যবাদের প্রভাব সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি ব্যর্থ না হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য বলিতে অধিকারের 'সাম্য' বুঝিতেন। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে, সুন্দর ও কুৎসিতের মধ্যে, সবল ও দুর্ব্বলের মধ্যে, বুদ্ধিমান্ ও নির্ব্বোধের মধ্যে যে প্রকৃতিগত বৈষম্য বর্ত্তমান—তাহা কোনপ্রকার আইনগত পরিবর্ত্তনের দ্বারা দূর করা যায় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ফলে যে বৈষম্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদ না করিলে, মানবজাতির প্রকৃত উন্নতি হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বিপ্লবের উপর আস্থাশীল ছিলেন না; তিনি বিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। তাই তিনি লিখিয়াছেন যে, বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার সংশোধন কালসাপেক্ষ।

ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে সাম্যমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রথম ধাপ হইতেছে—জমীর উপর কৃষকের

দাবী স্বীকার করা। বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সাবধানতার সহিত বলিয়াছেন যে, যে সম্পত্তি জমীদার একা ভোগ করিতেছেন, কৃষকও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত অবস্থাবৈগুণ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতেন ও হৃদয় দ্বারা অনুভব করিতেন, তাহা সব সময়ে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে পারিতেন না। এইজন্য তাঁহাকে অনেকস্থলেই ইঙ্গিতে কাজ সারিতে হইয়াছে; কোথাও কোথাও একটি সিদ্ধান্ত যুক্তিতর্ক দ্বারা স্থাপন করিয়া শেষে কর্ত্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টির জন্য হয় তাহাতে গোঁজামিল দিতে হইয়াছে অথবা সিদ্ধান্তের স্পষ্টার্থের বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া বলিতে হইয়াছে—আমরা অতিরিক্ত রাজভক্ত বা জমীদারেরা পরম হিতকারী ব্যক্তি। কেহ কেহ মনে করেন—বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন—তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাসে যবনবিতাড়ন প্রভৃতি ভাব আছে সত্য; কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলেই বুঝা যায় যে, যবন শব্দের অর্থও সকল স্থলে খুব ব্যাপক—রাজনৈতিক নিরাপত্তার খাতিরে মুসলমান শব্দ অন্য কোন শব্দের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে মুসলমানদিগের প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতিকে জানিতেন—বুঝিতেন যে, পরস্পরবিরোধী উক্তি করিলেও, নিরপেক্ষ পাঠকের পক্ষে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝা কঠিন হইবে না। কিন্তু হায় বঙ্কিমচন্দ্র! তুমি ঋষি হইয়াও ম্যাকডোনাল্ডী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পর বাঙ্গালার হাল কি হইবে, দেখিতে পাও নাই!

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করাকে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। সাম্যমূলক ধনবিভাগ-ব্যবস্থার সমর্থন করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন—"যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এ দেশে তাঁহার গর্দ্দভ জন্ম ঘটিয়া উঠে। আর যাহারা নিতান্ত অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড় মানুষ না হইয়া জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে, সকলেই প্রকৃত মনুষ্য হইত, দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদুকথা কহেন, তৎপরিবর্ত্তে তখন এই ছয়কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জ্জন—গভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্ষেপ হইতে যে গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে সফল করিতে হইলে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজী হইতে আমাদিগকে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। নবযুগের নবীন আলোক দেখাইয়া তিনি আমাদিগকে দুর্গম বন্ধুর তমসাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর হইবার অনুপ্রেরণা দিন!

নয়ন-সমুদ্র

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম্-এ

নয়ন-সায়রে তব হেরি আমি নভো সে কাজল,
সুনীল ঝরণা হয়ে শোভিতেছ যেন সমুজ্জ্বল;
যেন দুটী নীলধারা নীলাম্বর বক্ষ হ'তে নামি'
ও-নয়ন কোণে এসে শান্ত হয়ে রহিয়াছে থামি!

দুটী দৃষ্টি-পদ্ম সেই নীল স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া,
নীলিম সাগর-বাণী তীরে তীরে দেয় সুরভিয়া।
নয়ন-পল্লব-বায়ে সেই বাণী উড়িছে চঞ্চল;—
আঁখির সমুদ্র ভাষা চিরকাল রহস্য অতল!

বিশ্বসিংহ

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টশালী

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়—কলির প্রভাব

পীতাম্বরের নির্ব্বাচন অনুসারেই সন্ধি-সর্ত্ত স্থির হইল এবং সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত হইল। হোসেন সার এত বড় আড়ম্বর সকলই বৃথা হইল। তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ মনে ধ্বংসাবশিষ্ট সেনাসহ গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্যদল সুসঙ্গ সীমা হইতে প্রস্থান করিলে পর, পীতাম্বর সমাগত সামন্ত নৃপতিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নৌকা-পথে কামতাপুর যাত্রা করিলেন।

এই যুদ্ধোপলক্ষে ত্রিপুর-রাজকুমার রত্নবিজয়ের সহিত পীতাম্বরের সাক্ষাৎকার ও আলাপ। তিনি রত্নবিজয়ের স্বধর্ম্মানুরাগে ও স্বদেশপ্রীতিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাকে তাঁহার সহিত কামতাপুর গমনে বিশেষরূপ অনুরোধ করিলেন। রত্নবিজয় তাঁহার সে অনুরোধ-রক্ষায় স্বীকৃত হইতে পারিল না। তিনি ছদ্মবেশে জন্মভূমি দর্শন করিয়া তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের উন্নতিসাধনই তাঁহার প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

কামতারাজকুমারী করুণা মহাপুরুষের উপদেশের পর হইতেই রণবিদ্যাশিক্ষার জন্য সেনাপতি সুবাহুকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। সমরক্ষেত্রে যুদ্ধকৌশল দেখিবার জন্য তিনি আপন ইচ্ছায় পীতাম্বরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধশেষে সুবাহু খাসিয়া হইয়া কামতাপুর ফিরিবেন স্থির হইল, করুণা সুবাহুর সহিত খাসিয়া গমন করিলেন।

নৌকাপথে পীতাম্বর দেশে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে একই নৌকায় যদুনন্দন ও বিশ্বসিংহ। বৈশাখ মাস, দক্ষিণের অনুকূল বায়ু-প্রভাবে নৌকা স্রোতের প্রতিকূলে বেশ শীঘ্র গতিতেই অগ্রসর হইতেছিল। দ্বিতীয় দিবসের শেষ বেলায় মলয়-পবন উপভোগ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনাভিলাষে পীতাম্বর নৌকার ছাদের উপর বসিয়াছেন, যদুনন্দন ও বিশ্বসিংহ তাঁহার নিকটে ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে পীতাম্বর যদুনন্দনকে বন্দী অবস্থায় মহম্মদ সা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে যদুনন্দন মহম্মদ সার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। পীতাম্বর কহিলেন "তোমাকে পাঠানগণ এত যত্ন করিবেন, আমার বিশ্বাস ছিল না।"

যদু। তা' আর কি ইচ্ছায় করিয়াছে? ভয়ে করিয়াছে। আমি কামতারাজমন্ত্রিপুত্র, আমাকে অযত্ন করিলে গৌড়ের একখানি ইষ্টকও থাকিবে না, তাহা তাহারা জানে। মহম্মদ সা বাক্‌পটুতায় বড়ই চতুর—বড়ই তোষামুদে ও তোষামোদপ্রিয় লোক।

পীতাম্বর। কিরূপে বুঝিলে?

যদু। আমাকে বন্দী করিয়াছিলেন বলিয়া বিদায়-কালে আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমাকে কত শিষ্টাচার, কত বন্ধুত্ব জানাইলেন তাহার সীমা নাই, শেষ ব্রাহ্মণ-দক্ষিণার ব্যবস্থারও ত্রুটি করেন নাই।

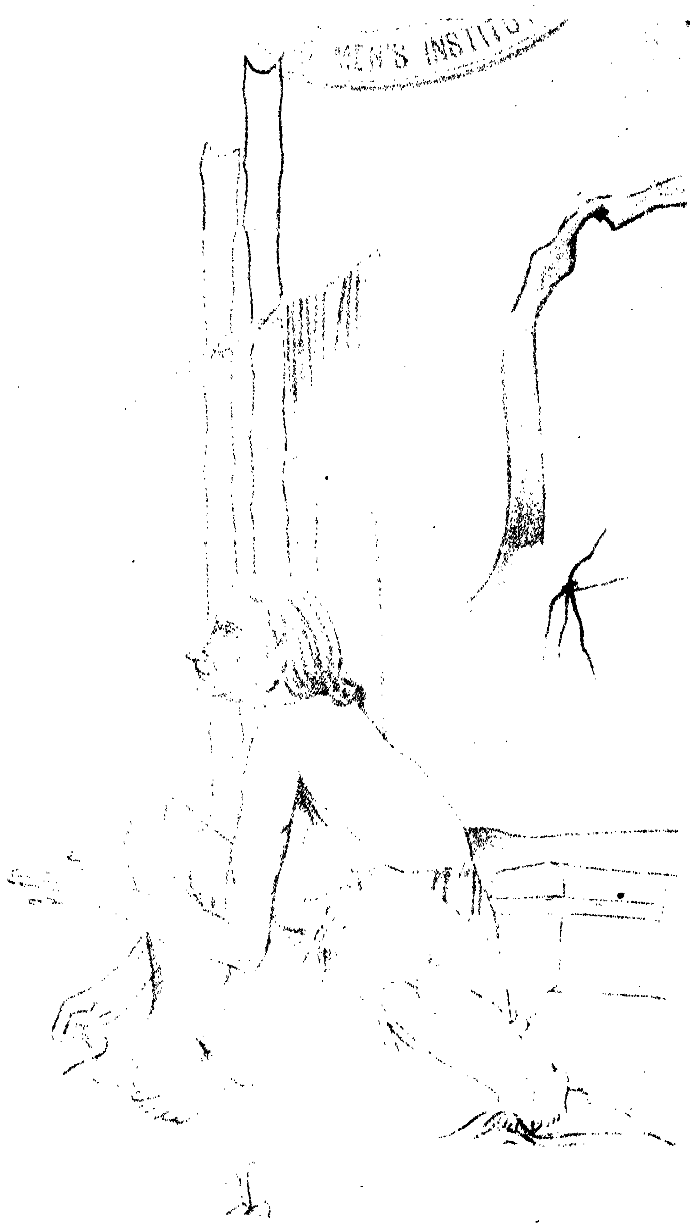
পীতাম্বর। (সবিস্ময়ে) সে কি, তুমি যবন-দান গ্রহণ করিলে?

যদুনন্দন একটু অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন "উহাকে দান বলা যায় না, উপহার বরং বলিতে পারেন। আমি ঐ উপহারকেই ব্যঙ্গভাবে ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা বলিয়াছি।"

পীতাম্বর। তবু ভাল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লোভে পড়িয়া তুমি যবন-দান গ্রহণ করিয়াছ—জাতিভ্রষ্ট হইয়াছ—তোমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যদু। রাজরাজড়াদের সঙ্গে থাকিলে, ঐরূপ দান গ্রহণ না করিয়া পারা যায় না; রাজারা ঐরূপ দান গ্রহণ করিয়া যখন প্রায়শ্চিত্ত করেন না, তখন আমিই বা প্রায়শ্চিত্ত করিব কেন?

পীতাম্বর। মহম্মদ সা তোমাকে কি উপহার দিয়াছেন?



শেষ বন্ধন

শিল্পী : শ্রীসরোজ সরস্বতী

আলোক-চিত্রে বাঙালার রূপ



১

১। ফটো—শ্রীমতী রেণুকা আচার্য

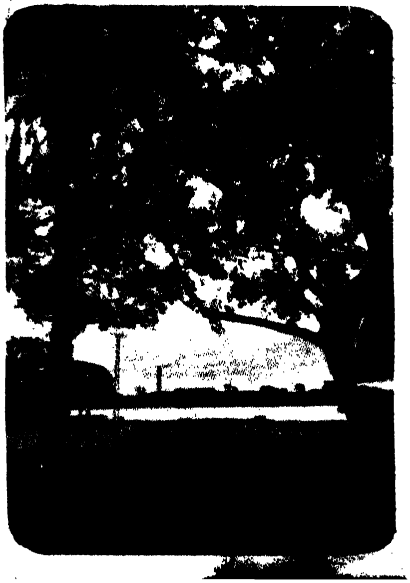
২। ফটো—কুমারী মনোবীণা সেনরায়

৩। ফটো—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। ফটো—শ্রীকুমুদকুমার ঘোষ



২



৩



৪

১। ফটো—কুমারী দেবলীনা সেন রায়
২। ফটো—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। ফটো—শ্রীঅমলচন্দ্র রায়
৪। ফটো—শ্রীমতী রেণুকা আচার্য্য



১

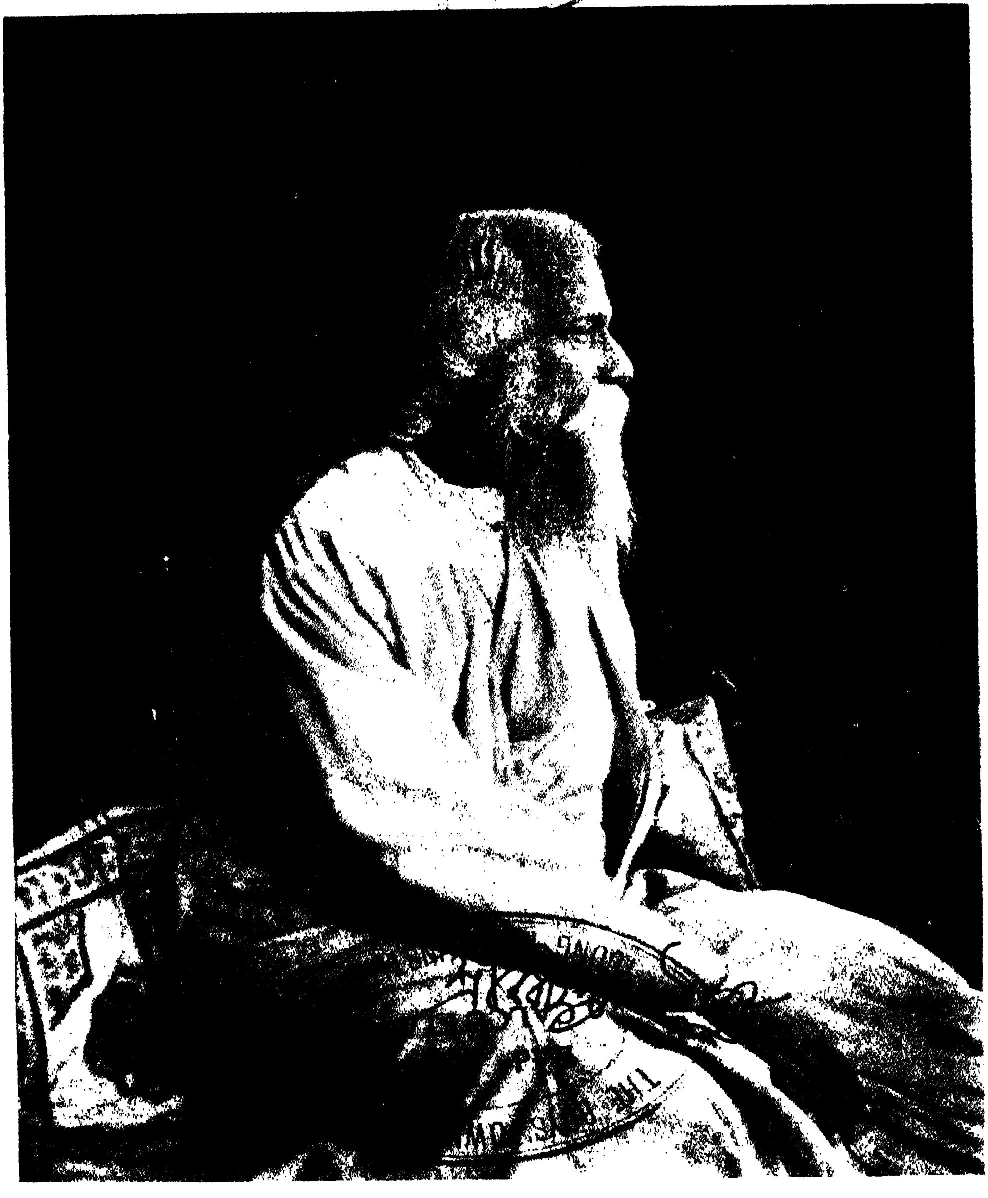


২



৩





"রাত্রি হ'ল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে লেখা লিপিখানি
হাতে ক'রে আনি,
দ্বারে আসি দিল' ডাক
পচিশে বৈশাখ।"

— রবীন্দ্রনাথ

যদু। একখানি তরবারি, আর একখানি হস্তিদন্ত নির্ম্মিত যষ্টি।

পীতাম্বর। দেখি কিরূপ?

যদুনন্দন প্রফুল্লচিত্তে ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং মুহূর্ত্ত পরে তথা হইতে ফিরিয়া ছাদের উপর আসিয়া একখানি সুন্দর তরবারি ও কারুকার্য্যখচিত একখানি যষ্টি পীতাম্বরের নিকট উপস্থাপিত করিলেন।

পীতাম্বর প্রথমে অসিখানি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে যষ্টিখানি দেখিতে লাগিলেন। যষ্টিখানির গঠনে একটু বেশ বৈচিত্র্য ছিল। উহার নিম্নাংশ গোলাকার-সদৃশ ও স্তম্ভাকৃতি; আর উর্দ্ধাংশে কারুকার্য্যখচিত সুন্দর পুষ্পলতিকা; এই লতিকায় দেববালাগণ ক্রীড়ায় মত্ত। যষ্টিখানি দেখিয়া পীতাম্বর উহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে লতিকার অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম একটী গোলাকার বৃত্ত অঙ্কিত দেখিলেন। উহা যষ্টির যোড়া সন্দেহ করিয়া খুলিবার চেষ্টা করিলেন—চেষ্টা সফল হইল। যোড়াটী প্যাচে আবদ্ধ ছিল; তিনি উহা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খুলিতে লাগিলেন। তিনি যখন যোড়াটী খুলিয়া যষ্টিখানি বিভক্ত করিলেন, তখন সহসা যষ্টির গর্ভ হইতে সূক্ষ্ম ও দীর্ঘায়তন একটী বিষধর সর্প বহির্গত হইয়া পীতাম্বরের ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে তীব্র দংশন পূর্ব্বক পতঙ্গের ন্যায় উড়িয়া চলিল। তদ্দৃষ্টে যদুনন্দন যেন ভীত হইয়া হস্তস্থিত তরবারির আঘাতে উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। বিশ্বসিংহ লম্ফ-প্রদানে যদুনন্দনকে আক্রমণ করিয়া নদীগর্ভে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিলেন, পীতাম্বর হস্তপ্রসারণে বাধা প্রদান করিয়া কহিলেন, "বিশ্বসিংহ, ক্রোধ সম্বরণ কর, যদুনন্দনের অপরাধ কি? আমারই অদৃষ্ট! উঃ, বড় জ্বালা, যদুনন্দন—যদুনন্দন, তুমি পাঠানদিগকে জান না, উহারা প্রবঞ্চক, চির বিশ্বাসঘাতক! কৌশলে শত্রুধ্বংস—বিশ্বসিংহ—ভাইরে, উঃ—বড় জ্বালা! আ-মা-কে নী-চে নি-য়ে চ-ল—পি-তা-র স-ম্ব-ল তু-মি। মা-আ কা-ত্যা-য়-নী তো-মা-র ই-চ-ছা। কা-ম-তা-পু-র—" পীতাম্বর নীরব হইলেন। তাঁহার কমনীয় গৌরকান্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে নীলিমা প্রাপ্ত হইল, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল—ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, বিশ্বসিংহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া ডাকিলেন "রাজকুমার?"

পীতাম্বর চক্ষু ঈষৎ উন্মীলন করিলেন। জড়িত ও ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন—"পি-পা-সা জ-ল।" বিশ্বসিংহ মুহূর্ত্ত মধ্যে জল আনয়ন করিয়া পীতাম্বরের মুখে প্রদান করিলেন। তিনি ঈষৎ পরিমাণে জল গ্রহণ করিয়া ক্ষীণতর কণ্ঠে কহিলেন "বি-শ্ব-সি-ং-হ, ব্রা-হ্ম-ণ ন-ন্দ-ন অ-ব-ধ্য। আ-মা-র প্র-তি বি-ধা-তা অ-প্র-স-ন্-ন—ব্র-হ্ম-শা-প। ম-হা-স্ত কা-লি-কা-ন-ন্দ প্র-ণা-ম! ভ-গি-নী ক-রু-ণা-কে দে-খি-ও, মা-তৃ-ভূ-মি কা-ম-তা-রা-জ্য, তু-মি পি-তা—সে-না-প-তি বি-দা-য়। মা-আ-কা-ত্যা-য়-নী-ঈ—চ-র-ণ—।"

পীতাম্বরের আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। পূর্ব্ব ভারতের হিন্দুগৌরবরবি এইরূপে মধ্যাহ্নাকাশেই অস্তমিত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়—বিশ্বসিংহের বৈশ্যবৃত্তি

যদুনন্দনের চরিত্রে বিশ্বসিংহ তাঁহাকে চিরকালই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার প্রতি কোনকালেই বিশ্বসিংহের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। পীতাম্বরের এই অপঘাত মৃত্যুর সহিত যদুনন্দন ও পাঠানদের কোনরূপ ষড়যন্ত্রের যোগ ছিল, পীতাম্বরের সর্পদংশন কাল হইতেই বিশ্বসিংহের ধারণা হইয়াছিল। তারপর পীতাম্বরের মুমূর্ষু অবস্থায় "ব্রাহ্মণনন্দন অবধ্য" এই উক্তিতে তাঁহার ধারণা আরও দৃঢ়তর হইল। এই উপলক্ষে যদুনন্দন ও বিশ্বসিংহের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল। যদুনন্দন মন্ত্রিপুত্র; আর বিশ্বসিংহ, একজন শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ হইলেও, সাধারণ লোকমাত্র। উভয়েই রাজসমীপে বিচারপ্রার্থী হইলেন। বিশ্বসিংহ সত্যবাদী ও সরল প্রকৃতির লোক। তিনি তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধিমতে সরলভাবে সকল কথা রাজসমীপে নিবেদন করিলেন। আর যদুনন্দন সত্যকথা কাহাকে বলে, জানে না, সুতরাং আত্মদোষ গোপন করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। পরন্তু কিরূপে বিশ্বসিংহকে নিগৃহীত করিবেন,

আপন তুষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যদিও যদুনন্দনের অপরাধ সম্বন্ধে বিশ্বসিংহের সহিত জনসাধারণ একমত ছিল, কিন্তু রাজা তাহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি উপযুক্ত প্রমাণাভাবে যদুনন্দনকে পীতাম্বরের হত্যা ও পাঠানদের সহিত ষড়যন্ত্রের অপরাধ হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন। যদুনন্দন এই গুরুতর অপরাধ হইতে মুক্তি পাওয়ায়, বিশ্বসিংহকে নিগৃহীত করিবার এক উত্তম সুযোগ পাইলেন। যদুনন্দনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপরাধ আরোপ করার অপরাধে, তিনি বিশ্বসিংহের বিরুদ্ধে রাজসমীপে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। ফলে রাজা নীলাম্বর বিশ্বসিংহকে যদুনন্দনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। বিশ্বসিংহ নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে রাজার আদেশ মত যদুনন্দনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং পরক্ষণেই নীলাম্বরের পদপ্রান্তে রাজসরকার হইতে প্রাপ্ত পরিচ্ছদ ও অসি-বর্শা প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ রাখিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রার্থনা করিলেন। রাজা নীলাম্বর এই রাজভক্ত বীরপুরুষকে নির্ব্বিকারচিত্তে বিদায় প্রদান করিলেন। ইহাতে জনসাধারণ মন্ত্রিপুত্রের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে রাজা বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়াছেন, স্থির করিলেন। কিন্তু বিশ্বসিংহের ধারণা অন্যরূপ হইল। তিনি দিব্যচক্ষে যেন রাজা নীলাম্বরের মহৎ ত্যাগ-স্বীকার ও অসাধারণ আত্মসংযমের সহিত বিশেষ কোন গূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন।

সংসারে বিশ্বসিংহের একমাত্র জননী বই আর কেহ ছিল না। তিনি তাঁহার সহিত দুর্গের অভ্যন্তরেই বাস করিতেন। রাজকার্য্য ছাড়িয়া তিনি দুর্গবাস ত্যাগ করিলেন এবং দুর্গের বাহিরে ৮ মাইল দূরে "চাপা দৈ" নামক কৃষকবহুল এক বৃহৎ পল্লীতে গিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জননীর সহিত বসবাস করিতে লাগিলেন এবং জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বণিক-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়—অঙ্গুরীয় বিনিময়

খাসিয়া ও সুসঙ্গের সীমান্ত প্রদেশের কোনও উপত্যকায় নিদাঘের শেষে, একদিন অপরাহ্ণে একটী অশ্বারোহী বালক একটী মৃগ তাড়না করিতে করিতে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছেন। বালকের তাড়নায় মৃগটী ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির হইয়া উঠিল, প্রাণভয়ে মৃগ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া কিছুতেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ ও জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল। বালকটীও ছাড়িবার পাত্র নহে, কণ্টকে, বৃক্ষশাখার ঘর্ষণে অঙ্গে বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হইল। পরিচ্ছদ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। তথাপি বালক মৃগতাড়নায় ক্ষান্ত হইল না। মৃগের পশ্চাতে সমানভাবে ছুটিতে লাগিল। সহসা মৃগ বক্রগতিতে বামদিকে ঘুরিয়া নিবিড় শালবনে প্রবেশ করিল। বালক তখন অনন্যোপায় হইয়া মৃগ লক্ষ্য করিয়া একটী শর ত্যাগ করিল। ঠিক ঐ সময়ে তদীয় অশ্বটী সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। বালকের লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় মৃগটী পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। মৃগশিকারে বালকের শর ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু ঐ শর সম্মুখস্থ নির্ঝরিণী তীরে নিদ্রিত ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে গিয়া বিদ্ধ হইল। অকস্মাৎ তীব্র আঘাতে ব্যথিত হইয়া শার্দ্দূলরাজ প্রচণ্ড হুঙ্কারে লম্ফ প্রদান করতঃ বালককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তদ্দৃষ্টে বালক বিন্দুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তূণ হইতে যুগলশর গ্রহণ করতঃ চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে শার্দ্দূলরাজকে লক্ষ্য করিয়া একে একে দুইটী শরই ত্যাগ করিল। শর প্রচণ্ডবেগে গিয়া একটী ব্যাঘ্ররাজের ললাটে ও অপরটী সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সন্ধিস্থলে বিদ্ধ রইল। পর মুহূর্ত্তেই একটী বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল। শার্দ্দূলরাজ ভীষণ আর্ত্তনাদে শালবন প্রকম্পিত করিয়া ভূপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দে বালক বিস্মিত হইয়া, ধূমরাশি ও শব্দ লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া চাহিল—দেখিল নিকটস্থ শৈল-শিখর হইতে একটী সশস্ত্র অশ্বারোহী যুবক নিম্নদিকে অবতরণ করিতেছে। ক্রুদ্ধ হইয়া বালক আপন কটিদেশ হইতে একটী ক্ষুদ্র বন্দুক বাহির করিয়া যুবকের দিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিল, তদ্দৃষ্টে যুবক আপন হস্তস্থিত বন্দুকটী ছুড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং দ্রুতগতিতে বালকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বালক, রোষ-কষায়িত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার বন্দুক ছোড়া

হইল না। যুবক বালকের সমীপে উপস্থিত হইলে, সে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বিদ্রূপ স্বরে কহিল—"মহাশয়ের বীরত্বে ধন্য হইলাম, সম্ভবতঃ মহাশয় যবন-সমর প্রত্যাগত।"

যুবক বিস্মিত হইয়া—ক্ষণেক বালকের মুখের দিকে চাহিয়া, ভূম্যবলুণ্ঠিত রুধিরাক্তকলেবর ব্যাঘ্ররাজের দিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি বালকের মুখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ বচনে কহিলেন, "বালক, আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি, ঐ ব্যাঘ্ররাজের বক্ষস্থলে বিদ্ধ তোমার একটীমাত্র শরই উহার নিধন পক্ষে যথেষ্ট। তাহার উপর তোমার নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় শর, যাহা উহার ললাটে বিদ্ধ হইয়াছে উহাই অতিরিক্ত। তদুপরি আমার গুলিবর্ষণ নিতান্তই অনাবশ্যক হইয়াছে; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ব্যাঘ্ররাজকে আমি বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি অগ্রে তাহা অবগত হও, তৎপর তোমার বিবেচনায় আমি অপরাধী স্থির হইলে, তোমার হস্তস্থিত ঐ বন্দুকে আমার শাস্তি বিধান করিও।"

বালক, সবিস্ময়ে যুবকের মুখের দিকে চাহিল, দেখিল যুবকের মুখখানি যেমন সুন্দর তেমনি প্রশান্ত। যুবক পুনরায় কহিতে লাগিলেন—"আমিও এ বনে শিকারান্বেষণে আসিয়াছি—নিরীহ মৃগশিকারে এখন আমার স্পৃহা নাই; ব্যাঘ্র, ভল্লুক অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলাম, ঐ নিদ্রিত ব্যাঘ্রটী আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছিল; নিদ্রিত পশুহননে সুখ নাই, তাই উহার নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমি বহুক্ষণ যাবৎ ঐ শৈল-শিখর হইতে তোমার মৃগ তাড়না দেখিতেছিলাম, যখন দেখিলাম তোমার নিক্ষিপ্ত শর মৃগ লক্ষ্যে ব্যর্থ হইয়া আমার বাঞ্ছিত শিকার—ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে গিয়া বিদ্ধ হইল এবং আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্যাঘ্র ভীষণ গর্জ্জনে তোমাকে আক্রমণে উদ্যত হইল, তোমার রক্ষার সঙ্গে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলাম না, বন্দুক ছুঁড়িলাম। তোমার অসীম ধনুর্ব্বিদ্যার পরিচয় আমার জানা ছিল না। তোমাকে সাধারণ বালক ও মৃগশিকারী বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। আমার ভুল ধারণা এখন দূর হইয়াছে এবং তোমার বীরত্বে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এইরূপ বীরবালকের হস্তে মৃত্যুতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে এইরূপ আদর্শ বীরবালকের পরিচয় পাইলে কৃতার্থ হইয়া পরমানন্দে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতে পারিতাম!"

বালকের উগ্রমূর্ত্তি শান্ত হইল; যুবকের আপাদমস্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া ধীর বিনম্রবচনে কহিল—"মহাশয়ের সহৃদয়তায় সন্তোষ লাভ করিলাম, কিন্তু বীরত্বে তৃপ্ত হইতে পরিলাম না। বন্য পশুহননে বীরপুরুষের বীরত্ব প্রকাশ পায় না, ইহা শস্ত্রধারী মানুষমাত্রেই পারে। একটা সামান্য বন্যপশু নিহত করিয়া আমার প্রাণরক্ষায় আপনার মত বীরপুরুষের গৌরবই বা কি? প্রাণাপেক্ষাও যাহা আমার প্রিয়, যাহা গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে বহুতর লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহাদের বিনাশ সাধনে আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন কি? তাহাদের ধ্বংসেই হৃদয়ে আনন্দ—মনে শান্তি পাইব; আর সকলে আশীর্ব্বাদ করিবে, আপনার গৌবব বৃদ্ধি পাইবে।" এই বলিয়া বালক আপন বক্ষে বিরাজিত—কারুকার্য্যখচিত দিব্য তূর্য্যটী গ্রহণ করিয়া, অরণ্য-উপত্যকা-পর্ব্বত-কন্দর-বিকম্পিত করিয়া ভীষণ ধ্বনি করিল। তৎশব্দে যুবক শিহরিয়া তীব্র দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"এ বালক কে? এ তো পার্ব্বত্য বালক নহে। ইহার উক্তি অতীব তেজকর ও উত্তেজনা-পূর্ণ; ঘোর পাঠানদ্বেষী! অবশ্যই এ কোন স্বাধীন রাজকুমার হইবে। এ পার্ব্বত্য প্রদেশে এমন সুন্দর সুকুমার বীর বালক কিরূপে—কোথা হইতে আসিল? ইহার আকৃতি কতকটা পরিচিতের মত বোধ হইতেছে, যেন কোথায় দেখিয়াছি; কিন্তু কণ্ঠস্বর একেবারেই অপরিচিত—অথচ বড়ই মধুর।"

এই সময়ে উপত্যকার চতুর্দ্দিকস্থ শৈল-শিখর হইতে অশ্বারোহণে অসংখ্য পার্ব্বত্য বালক পূর্ব্বোক্ত বালকের নিকট আসিতে লাগিল। যুবক বালকের তূর্য্যধ্বনির কারণ বুঝিল; তাঁহার বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি সস্নেহে বালককে কহিলেন—"বীর বালক, তোমার উক্তি অতি মূল্যবান, আমি যথাসাধ্য তৎপ্রতিপালনে প্রতিশ্রুত

হইলাম। এ অপরিচিতের ধৃষ্টতা গ্রহণ না করিয়া তোমার প্রকৃত পরিচয় প্রদানে সুখী করিবে, এ কামনা, এ অপরিচিত করিতে পারে কি ?"

বালক পূর্ব্ববৎ বিনম্রবচনে কহিল—"মহাশয়, নিজে বীরপুরুষ, আত্ম পরিচয় প্রদান করা বীরোচিত ধর্ম্ম কিনা সে বিচার আপনিই করিবেন, বিশেষতঃ বালকদের সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠের অনুসরণ করাই বোধ হয় কর্ত্তব্য।"

যুবক বালকের কৌশলময় উক্তিতে বুঝিলেন, বালকও তাঁহার পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক। তিনি আপন অনামিকা অঙ্গুলী হইতে একটী মূল্যবান অঙ্গুরীয় উন্মোচন করতঃ বালকের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিলেন—"আপত্তি না থাকিলে, ইহা গ্রহণ কর, অপরিচিতের পরিচয় ইহা হইতেই পাইবে।"

বালক সাগ্রহে উহা গ্রহণ করিল, এবং আপন অঙ্গুলী হইতে একটী অঙ্গুরীয় উন্মোচন করতঃ যুবকের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিল—বালকের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, বালক বয়োজ্যেষ্ঠের কার্য্যই অনুকরণ করিতেছে।"

ঠিক ইহার পরক্ষণেই পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহী বালকগণ আসিয়া যুবক ও প্রথমোক্ত বালকের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। যুবক দেখিলেন, ইহাদের সাজ-সজ্জা ও পোষাকপরিচ্ছদ প্রথমোক্ত বালকের ন্যায়। তাহারা সারি-সারি, কাতারে-কাতারে শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যুবক সে মনোহর দৃশ্য দর্শনে মুগ্ধ হইলেন এবং বিমুগ্ধচিত্তে সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

বালক যুবককে যুক্তকরে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল—"মহাশয়, তবে এখন বিদায় হই, আশা করি আপনি প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইবেন না" বলিয়াই অশ্বে কশাঘাত করিল। অশ্ব দ্রুতবেগে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। অপর বালকগণও তাহার অনুসরণ করিল।

(ক্রমশঃ)

পরাজয়

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বুকেতে ছড়ায়েছ যত
ব্যথার মুঠি
ফুল হ'য়ে প্রিয় সেগুলি এখনও
র'য়েছে ফুটি'।
নিঝ'র যত এ দুটী আঁখিতে
বহায়ে দিয়েছ আপন খুসীতে
পারিনিক' তাহা আজিও মুছিতে
র'য়েছে জমা—
তবুও বারেক অপরাধ মোর
করনি ক্ষমা!

মোর শত ডাকে দাওনিক' সাড়া
আসনি কাছে—
পাতা আছে তবু তব প্রেমাসন
হৃদয়-মাঝে।
সুষমায় তব অন্তর মোর
দিবস-রজনী হ'য়ে আছে ভোর,
গাঁথি ব'সে তাই মিলনের ডোর
প্রীতির ফুলে—
একদা এ মালা নেবে জানি এসে
কণ্ঠে তুলে!

'জ্ঞান-বিজ্ঞান'

বিজ্ঞান ও তাহার বিভাগ

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মিত্র এম, এস্‌সি

বিজ্ঞানের অর্থ

'বিজ্ঞান' কথাটি সাধারণের নিকট অপরিচিত নয়, তবে এর প্রকৃত অর্থ জানেন এমন ব্যক্তির প্রাচুর্য্য দেশে বোধ হয় এখনও হয়নি। কেউ কেউ হয় ত বিজ্ঞান বল্‌তে উড়ো জাহাজ, রেডিও, রেলগাড়ী, লোহালক্কড়ের কারখানা, চাই কি, সাব্‌মেরিণ, জেফলিন পর্য্যন্ত বুঝবেন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ এগুলি নয়, এসব হচ্ছে বিকৃত অর্থ। সুতরাং প্রারম্ভেই যদি পাঠকের তরফ হ'তে প্রশ্ন ওঠে যে, বিজ্ঞান বস্তুটি কি—তা হ'লে বিস্মিত হওয়ার কারণ মোটেই নেই, বরং আনন্দের বিষয় হ'চ্ছে এই যে, পাঠকের মনে জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি যে এখনও লুকোচুরি খেল্‌ছে, দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে এখনও যে ম'রে ভূত হ'য়ে যায়নি—এ কথাটা সহজেই প্রমাণিত হয়।

এই জিজ্ঞাসাই হ'ল বিজ্ঞানের মূল উৎস। মানুষের মনে এই প্রবৃত্তি জাগ্‌বার বহু পূর্ব্ব হ'তেই প্রকৃতি দেবী নিজের রূপ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যজালে অবগুণ্ঠিত ক'রে বিশ্বমানবের চোখের সামনে ধরেছে। তারপর যুগে যুগে ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত জিজ্ঞাসা জেগে উঠ্‌ল, অজানা জিনিষকে জানবার একটা অদম্য আকাঙ্খা মানুষকে ক'রে তুল্‌ল উন্মাদ, আর সেই উন্মাদনার পূর্ণাহুতি হ'ল রহস্যময়ী প্রকৃতির অবগুণ্ঠন মোচন কর্‌বার আপ্রাণ চেষ্টায়। যুগ যুগ ধ'রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে তার রহস্যজাল ছিন্ন কর্‌বার কাজ মানুষ গ্রহণ করেছে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে, জ্ঞানের আলোকে কুহেলিকা ছিন্ন ক'রে পান ক'রেছে প্রকৃতির অনাস্বাদিত রূপসুধা, আর প্রচার করেছে বিশ্বমানবের কাছে সে রূপসুধার অপরূপ স্বাদ। দিনের পর দিন এইভাবে মানুষ প্রকৃতির প্রাঙ্গণ লুণ্ঠন করেছে, আর লুণ্ঠিত রত্নরাজি দিয়ে তিল তিল ক'রে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে তার নিজের জ্ঞানভাণ্ডার। এ ভাণ্ডার মানুষের বড় গর্ব্বের বস্তু, কারণ দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতির বেয়াড়া নিয়মগুলি সুবোধ বালকের মত সহজবোধ্য হয়ে এই জ্ঞানভাণ্ডারে ধরা দিয়েছে ও দিচ্ছে। এই যুগসঞ্চিত জ্ঞানের ঝুলিকেই আমরা বলি 'বিজ্ঞান'।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য

কিন্তু প্রকৃতি বিরাট্‌, আর তার চেয়ে বিরাট্‌ তার রহস্য। স্বল্পশক্তি মানুষ কতটুকুই বা তার জেনেছে এই কয়েক সহস্র বৎসরের প্রচেষ্টার ফলে! যাদুকরী প্রকৃতির সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌তে গিয়ে মানুষ কতবার কত রকমে ঠকেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তবুও প্রকৃতির ইন্দ্রজালে অভিভূত হ'য়ে মানুষ নিজের লক্ষ্য হারায় নি,—সে আবার মেতে উঠেছে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রকৃতির প্রাঙ্গণে হানা দেওয়ার কাজে। আজ সে স্পর্দ্ধা কর্‌ছে যে এই বৈজ্ঞানিক অভিযান সে চালিত কর্‌বে প্রাঙ্গণ হ'তে অঙ্গনে—জেনে নেবে সে প্রকৃতির শেষ রহস্য, ধন্য হবে সে এই রহস্যসুধা আকণ্ঠ পান ক'রে। সুতরাং বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য হ'চ্ছে মুখ্যতঃ প্রাকৃতিক রহস্যের পূর্ণজ্ঞান, এবং গৌণতঃ সে পূর্ণজ্ঞানের অবলম্বনে জাগতিক সুখসমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা-সাধন। বিজ্ঞানরসিক সযত্নে জ্ঞান আহরণ করেন জগতের পরম কল্যাণের জন্য, কিন্তু অরসিকের হাতে প'ড়ে বিজ্ঞানের কত লাঞ্ছনাই না হ'ল! আরও কত হ'বে কে জানে?

বিজ্ঞানের ভাগ

আমাদের সভ্যতার আদি যুগে যখন মানুষ প্রাকৃতিক রহস্যোদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা সবে সুরু ক'রেছে, তখন তার বিজ্ঞান জ্ঞানের ভাণ্ডার আজকের মতন শ্রীসম্পন্ন ও

গোছালো ছিল না। ভাণ্ডারের পুঁজি ছিল অল্প, তার হিসেব রাখ্‌তে মানুষকে বেগ পেতে হ'ত না। কিন্তু সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে ও প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে আমদানী হ'তে লাগ্‌লো প্রচুর। এই প্রাচুর্য্যের ফলে বিশৃঙ্খলা হ'ল অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বিশৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে কাজ হয় না, হয় অকাজ। শৃঙ্খলা যে আন্‌তে হ'বে তা' বেশ বোঝা গেল, আর তার শেষ সাধন হ'ল বিজ্ঞানের বিভাগে। গোড়াতেই বিজ্ঞানকে দ্বিখণ্ডিত করা হ'ল—জড়বিজ্ঞান ও জৈববিজ্ঞান—এই দুইভাগে। জড়বিজ্ঞানের ভাগে পড়ল জড়-জগতের রহস্যালোচনা ও জ্ঞানচয়ন, আর জীবজগতের গবেষণা ও জ্ঞান নিষ্কাষণ পড়্‌ল জৈববিজ্ঞানের বখ্‌রায়।

বৈজ্ঞানিক আপাততঃ নিশ্চিন্ত হ'লেন, কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়। দিন যায়, যুগ যায়—মানুষের প্রকৃতি-ধর্ষণের চেষ্টার বিরাম থাকে না। আবার প্রকৃতির লুণ্ঠিত রত্নরাজি ভিড় জমায় বিজ্ঞানের দ্বারে। জড়বিজ্ঞান, জৈববিজ্ঞান, উভয়েরই জ্ঞানভাণ্ডার আবার ছাপিয়ে ওঠে—বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে শয়তান করে প্রভুত্ব। কাজেই পূর্ব্বের সমস্যাই আবার ফিরে এল, আর তার সমাধানও হ'ল পূর্ব্বেরই মতে।

বিজ্ঞানের বিভাগ

আবার জড়বিজ্ঞান, জৈববিজ্ঞান উভয়েরই খণ্ডন হ'ল। জড়বিজ্ঞানের অঙ্গনে ভিড় জমেছিল বেশী, সেই জন্য তাকে আবার চারটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করা হ'ল:—(১) পদার্থবিজ্ঞান, (২) রসায়ন, (৩) ভূবিজ্ঞান, (৪) জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান। এদিকে জৈববিজ্ঞানের দ্বারে ভিড়ের বহর ততটা বেশী নয় ব'লে তাকে দুই বিভাগে বিভক্ত করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হ'ল—(১) উদ্ভিদ্বিজ্ঞান ও (২) প্রাণিবিজ্ঞান। এই প্রণালীতে বিভাগ ক'রে বৈজ্ঞানিক আবার কাজের শৃঙ্খলা সমাধান করলেন। বিজ্ঞানের এই বিভাগ যুক্তিযুক্ত ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য।

বিভক্ত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

বিভাগ ত' হল, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের বিষয়বস্তুর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিয়ে এই আলোচনা শেষ করলে এই প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। সুতরাং বিজ্ঞানের ছয়টি বিভাগের বিষয়বস্তুর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রেই আমরা এবারকার মত আলোচনা শেষ করব।

(১) পদার্থ-বিজ্ঞান—

জড়বিজ্ঞান যে চারটি বিভাগে বিভক্ত হ'য়েছে, তার প্রথমটি হ'চ্ছে পদার্থবিজ্ঞান। পদার্থ বল্‌তে বোঝা যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। মানুষ যে সমস্ত অবয়বের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চেষ্টা করে—ইন্দ্রিয় অর্থে বুঝি সেই অবয়বগুলি। ইহারা সংখ্যায় পাঁচটী—চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্—তাই আমরা বলি পঞ্চেন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের শরীরের মধ্যে এক একটি জানালার কাজ করে। আমাদের ভেতরকার মানুষটি যাকে আমরা বলি অনুভবশক্তি—সে এই সকল গবাক্ষ পথ দিয়ে পরিচয় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হরেক রকম বস্তুর সঙ্গে, যাকে আমরা এক কথায় বলি পদার্থ। দৈনন্দিন ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ পুরাকাল হ'তেই জান্‌তে পেরেছে যে, পদার্থকে মোটামোটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, প্রথম জড়পদার্থ, যাকে সাধারণ ভাষায় আমরা দ্রব্য বলে থাকি, এবং দ্বিতীয়, শক্তিপদার্থ। আলোচনার গতি বোধ হয় একটু ধোঁয়াটে হ'য়ে আস্‌ছে। যাক্, এই জড়পদার্থ ও শক্তিপদার্থের রূপ ও গুণের আলোচনা আমরা পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে ক'রে থাকি। ভরসা থাকল যে, পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় হ'লে ধোঁয়া কতকটা অন্ততঃ কেটে যাবে।

(২) রসায়ন—

জড়বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগের নাম রসায়ন। এই বিভাগের বিশেষ গণ্ডী হচ্ছে জড়পদার্থের বিশ্লেষণ ও সংগঠন রহস্যের আলোচনা। রসায়নের ভাণ্ডারে যে জ্ঞানরাশি স্তূপীকৃত হয়েছে, তাতে আমরা জান্‌তে পেরেছি যে, বিশ্বের যাবতীয় জড়পদার্থের অধিকাংশেরই মৌলিকত্ব নাই। এই সব মৌলিকত্বহীন জড়পদার্থকে কতগুলি মৌলিক পদার্থে ভাগ করা যায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় হ'চ্ছে এই যে, মৌলিক পদার্থগুলির সংখ্যা খুব বেশী নয়,

সর্ব্বসাকল্যে বিরানব্বই। এই বিরানব্বইটা মৌলিক পদার্থের সংগঠনের হেরফেরে জড়জগৎ অনন্ত বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে, উৎপন্ন হয়েছে বিশ্বের যাবতীয় যৌগিক জড়পদার্থ। জড়পদার্থের এই সংগঠন-প্রণালী ও বিশ্লেষণ রসায়নের বিশেষ এলাকাভুক্ত।

(৩) ভূবিজ্ঞান—

এবার আসা যাক্ জড়-বিজ্ঞানের তৃতীয় বিভাগ ভূবিজ্ঞানে। যে পৃথিবীর উপর আমরা বাস করি, তার জন্মের ইতিহাস বড় বিস্ময়জনক। অবশ্য পৃথিবীর জন্মের এই ইতিহাস প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নয়, অনুমানমূলক। কিন্তু তা হ'লেও, এ অনুমান অনেকখানি সত্যঘেঁষা ব'লে পণ্ডিতসমাজ মেনে নিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন—অন্ধবিশ্বাস নয়—যে, আদিতে পৃথিবী ছিল সূর্য্যের অঙ্গীভূত, তার নিজের কোনও সত্তা ছিল না। জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের জিজ্ঞাসা করলে জান্‌তে পারা যায় যে, এই যে সূর্য্য, যার গহ্বরে পৃথিবী অনন্তকাল ধ'রে সুপ্ত ছিল, সে নিজে একটি তারকা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিদিন রাত্রিতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা এমন তারকা দেখ্‌তে পাই অগুণতি। আপাতদৃষ্টিতে সূর্য্যকে যেন এদের শ্রেণীভুক্ত করতে ইচ্ছে হয় না।—এর কারণ হচ্ছে সূর্য্যের সঙ্গে এদের আকারের বিভিন্নতা। এই আকারের বিভিন্নতা হয় দূরত্বের বিভিন্নতা থেকে—সুতরাং দূরত্বের বিভিন্নতা ছাড়া অসংখ্য তারকার সঙ্গে সূর্য্যের শ্রেণীমূলক বিভিন্নতা কিছুই নাই। যাক্, কাল-স্রোতের কোনও এক শুভ অথবা অশুভ মুহূর্ত্তে জানি না, একটি বিরাট্ তারকাদানবী মহাশূন্যে বিচরণ করতে করতে এই সূর্য্যতারকার অতি কাছে এসে পড়ে এবং সূর্য্যের বিরাট্ অঙ্গ হ'তে মুষ্টিমেয় মাংসপিণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে। সেই মুহূর্ত্ত হ'তে এই মাংসপিণ্ড প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়ে ক্রমাগত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। এই ঘূর্ণীপাক-খাওয়া পিণ্ডটাই আমাদের পৃথিবী। সূর্য্য পৃথিবীর পিতৃস্থানীয়—পৃথিবীর এই পিতৃ-প্রদক্ষিণ আজও সমানভাবে চলছে। জন্মের মুহূর্ত্তে সূর্য্যেরই মত গরম ছিল এই পৃথিবী—এতটা গরম যে সমস্ত বস্তুটাই ছিল একটা অত্যুত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক। কিছুকাল পরে পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমে কমে এল—ফলে উপর দিক্‌টা জমাট বাঁধল বটে, কিন্তু ভিতরের তারল্য রয়েই গেল। যতই দিন যাচ্ছে, জমাট বহিরাবরণের গভীরতা বাড়্‌ছে ততই, আর উষ্ণতাও কম্‌ছে সেই অনুপাতে। পৃথিবীর জন্মের এই ইতিহাস যে অনুমানমূলক, তা' পূর্ব্বেই বলেছি। এই অনুমান মোটামুটিভাবে সুধী-সমাজে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হলেও, জমাট বাঁধবার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মতভেদ আছে। একদল বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, পৃথিবীর বাষ্পীয় গোলকটি জমাট বাঁধ্‌তে সুরু ক'রেছে কেন্দ্র হ'তে। সেই জমাট ক্রমশঃ প্রসারিত হয়েছে কেন্দ্র হতে ভূপৃষ্ঠে। ফলে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় স্তরগুলির কাঠিন্য যত বেশী, বহিঃস্তরগুলির কাঠিন্য ততটা নয়। দুই দলের এই মতভেদ থাক্‌লেও, পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর যে বিভিন্ন সময়ে জমাট বেঁধেছে, এ বিষয়ে মতের অনৈক্য নাই। বিভিন্ন সময়ে এই সব স্তর জমাট বেঁধেছে ব'লে তাদের রূপ ও সংগঠনের অনেক প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায়। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের গঠনপ্রণালীর পর্য্যবেক্ষণ ও তার সাহায্যে পৃথিবীর জীবনের ইতিহাস অনুমান করা ভূবিজ্ঞানের কাজ।

(৪) জ্যোতির্বিজ্ঞান—

মানুষের জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি নাই। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূবিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের জ্ঞান প্রসারলাভ করেছে পার্থিব জড়পদার্থের বিষয়ে। কিন্তু এতে পিপাসার শান্তি হ'ল না। মানুষ পৃথিবী থেকে চোখ ফিরিয়ে দৃষ্টিপাত করল মহাশূন্যে,—যা' দৃষ্টিগোচর হ'ল, তাতে সে বিস্মিত হ'ল। জ্ঞানের আদিকাল হ'তে প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পর মহাশূন্যের যে রূপ মানুষ দেখ্‌ছে, তাতে সে ইচ্ছে ক'রেছে পৃথিবী থেকে উড়ে গিয়ে মহাশূন্যের রহস্য-ভেদ করতে। কিন্তু সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে পারেনি নিয়তির বিধানে। তবুও এই পৃথিবীরই কোলে ব'সে সে মহাশূন্যের বিরাট্ দানবদিগের খবরাখবর গ্রহণ করতে চেষ্টা ক'রেছে, বুঝতে চেষ্টা ক'রেছে তাদের জাতিভেদ, আচার, ব্যবহার, চলন-চালন, মেজাজ। ফলে

কতক বুঝ্‌তে পেরেছে, অনেক পারেনি। এই জ্যোতিষ্ক-দিগের বিশেষজ্ঞানই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান।

এই ত গেল জড়-বিজ্ঞানের বিভাগের কথা। ইতিহাসের দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে দেখা যায় যে, জড়-বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের পরিচয় জৈব-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বেও অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে হ'য়েছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ জড়কে নিজের ইচ্ছামত চালিত ক'রে মানুষ পরীক্ষা ক'রেছে—জড় তাতে বাধা দেয় নি, কারণ দিতে পারে না। সুতরাং জড়ের জ্ঞান আহরণ কর্‌তে মানুষকে ততটা বেগ পেতে হয়নি। যে স্থলে মানুষ জড়কে নিজের ইচ্ছামত চালিত ক'রে পরীক্ষা কর্‌তে পারেনি, সে ক্ষেত্রে তার জ্ঞানও রয়ে গেছে অতৃপ্তিকরভাবে অসম্পূর্ণ। এমন হয়েছে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে। জৈব-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কতকটা এই কথা খাটে, এবং এই কারণেই জৈব-বিজ্ঞান জড়-বিজ্ঞানের মত দ্রুতগামী ও প্রগতিশীল হ'তে পারে নি।

(৫) উদ্ভিদ্বিজ্ঞান

জীব-জগতের মধ্যে যার উপর মানুষ সহজে জবরদস্তি চালাতে পেরেছে, তারই আলোচনা সুরু হ'য়েছে প্রথমে, আর অগ্রসরও হ'য়েছে বেশী। এই জবরদস্তির ক্ষেত্র হ'চ্ছে উদ্ভিজ্জগৎ। উদ্ভিজ্জগৎ সমস্ত বৈজ্ঞানিক অত্যাচারের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না ক'রে সহ্য ক'রেছে, অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে নিজের গোপনতত্ত্ব উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছে অত্যাচারীর সম্মুখে—বেজে উঠেছে বৈজ্ঞানিকের বিজয়ডঙ্কা। উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, জীবন-প্রণালী, জাতিভেদ, তার বোধাবোধ—এই সব বৈজ্ঞানিক বিশ্বমানবের কাছে প্রচার ক'রেছে উদ্ভিদ্বিজ্ঞানের এই নাম দিয়ে।

(৬) প্রাণিবিজ্ঞান—শরীরবিজ্ঞান

জীব-জগতের দ্বিতীয় বিভাগ প্রাণিজগৎ। প্রাণীর সঙ্গে উদ্ভিদের পার্থক্য এই যে, উদ্ভিদ্ ভূপৃষ্ঠে গতিশীল হ'তে পারে না, প্রাণিগণ পারে। প্রাণীর মধ্যে আবার দুই শ্রেণীবিভাগ আছে—মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণী। সূক্ষ্ম-বিচারে মনুষ্যতত্ত্ব প্রাণিবিজ্ঞানের মধ্যেই পড়ে—কিন্তু সাধারণতঃ প্রাণীবিজ্ঞান বল্‌তে মনুষ্যেতর প্রাণীর জাতিভেদ, আচার-ব্যবহার, ক্রম-বিবর্ত্তন এই সব বোঝা যায়। সেই জন্য মনুষ্যত্ব যার আলোচ্য বিষয়, সেটি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান—তার নাম শরীর-বিজ্ঞান। শরীর-বিজ্ঞানে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অবয়বের বিশ্লেষণ ও তার কাজ আলোচনা করা হয়।

উপসংহার

প্রাণি-বিজ্ঞানের আলোচনা আজও খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেনি—তার কারণ পূর্ব্বে ইঙ্গিত করা হ'য়েছে। তবে ভরসা আছে যে, মানুষের এ বিষয়ে জ্ঞানপিপাসা অতৃপ্ত থাক্‌বে না। জড়-বিজ্ঞান যৌবনের সীমা প্রায় অতিক্রম কর্‌ছে—জৈব-বিজ্ঞানের চল্‌ছে শৈশবাবস্থা। মনে হয় যে, জৈব-বিজ্ঞান যেদিন যৌবনে পদার্পণ কর্‌বে, জড়বিজ্ঞান ততদিনে প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার হ'য়ে বার্দ্ধক্যের গৌরব অনুভব কর্‌বে।

মানুষ জ্ঞানের পঞ্চপ্রদীপ জেলে' তারই ক্ষীণ আলোতে পথ দেখে চলেছে অনন্ত অসীমের সন্ধানে। এ-চলা তার জীবন-কালে শেষ হবে না। যদি শেষ কোনও দিন হয়, তবে সে দিন বড় দুঃখের, কারণ সেটা মানুষের মৃত্যুর দিন।

সীমার শেষে

(গল্প)

ণ মৈত্র

১

অনেকদিন পর আবার সেই নদীটির ধারে আসিয়া বসা। কৈশোরের এক বিস্ময়পুলকিত দিনে এইখানেই তাহার অভিনব এক জন্ম, অভাবিত এক মৃত্যু! তাহার আগে আর পিছনে বাঁচিয়া থাকার যে অভিনয়—ইহা না-বাঁচারই সামিল। তাহার মধ্যে না আছে একটা সজীবতার লক্ষণ, না আছে আগাইয়া চলার গতিবেগ। খাঁচার মধ্যে পাখীটির মত বন্দী হইয়া থাকা; যেন একঘেয়ে—একটানা একটা পরিস্থিতির মধ্যে জড়ধর্ম্মী একটি মানুষ! বহুদিন পরে মোহন আজ চিরপরিচিত এই নদীর ধারের সুনির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে আসিয়া বসিল।

পাশেই খেলার মাঠ। কিশোর ছেলেদের হাট বসিয়া গিয়াছে। ইহাদের দিকে তাকাইয়া মোহন যেন সহসা এক হারানো-জগতের সন্ধান পায়! টুকরো টুকরো স্মৃতির কণা কেমন এক অনুভূতির বাতাসে চোখের সামনে ছড়াইয়া ছড়াইয়া পড়ে; মনের উত্তরীয় রাঙা হইয়া, ভারী হইয়া উঠে। তাহার গতিশীল যৌবনের আগতশিথিল উদ্দীপনা কৈশোরের আবেগে চলচঞ্চল হইয়া উঠিতে চায়। অসময়ের সেই উদ্যত গতিবেগ দমিত করিবার আশায় বুকে হাত চাপিয়া পরপারের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লয়। প্রতিহত গতির তীব্রতা দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া 'হুস্' করিয়া বাহির হইয়া আসে। এতক্ষণে অকারণেই সে হো হো করিয়া আপনার মনেই খানিকটা হাসিয়া ফেলে। ক্রন্দনের এই নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়াই হয়তো একদিন তাহার শেষ-নিঃশ্বাস বাতাসে মিশিয়া যাইবে!

এইভাবে কতক্ষণ গিয়াছে, জানা নাই। নিজের মধ্যে নিজেকে যখন ফিরিয়া পাইল, খেলার মাঠ খালি হইয়া গিয়াছে। গোধূলির ধূসর রঙ্ নদীর কালো জলে সমানে মিলাইয়া আসিতেছে। সম্মুখে স্রোতের বুকে নৌকা-শ্রেণীর মিটি মিটি আলো, আর মাথার উপরে জোনাকির মত তারকা-শ্রেণীর নিরাড়ম্বর সমারোহ—দু'য়ে মিলিয়া সন্ধ্যার নিবিড়তা ঘনাইয়া ঘন কালো করিয়া তুলিতেছে। এমন সময়ে একখানি নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। মোহন অনেকক্ষণ ধরিয়াই উঠি উঠি করিতেছিল, এইবার উঠিয়া পড়িল।

নদীর ধার দিয়া ঘাটের সম্মুখে রাস্তায় আসিয়া উঠিতেই নৌকায়-আগত যাত্রীদের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। পাশ কাটাইয়া আগাইয়া যাইবে, লণ্ঠনের আলোকে লক্ষ্য করিয়া যাত্রীদের মধ্যে একজন হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—এই যে! মোহন যে?

মোহন ইদানীং কাহারো সহিত বড়ো-একটা মিশিত না। নেহাৎ দায়ে না পড়িলে কথার জবাব দিতেও সে কুণ্ঠা বোধ করিত। যাত্রীদের মধ্যে সহসা একজনকে নাম ধরিয়া ডাকিতে শুনিয়া সে একটু বিরক্তই হইয়াছিল। ভদ্রতার খাতিরে অগত্যা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া গেল। একেবারে অচেনা এক ভদ্রলোক যে এইরূপে নাম ধরিয়া ডাকিবে, হাতও টানিয়া ধরিবে—ইহা প্রকৃতই অসহ্য! তথাপি মনের রাগ মনে চাপিয়াই সে হাত ছাড়াইয়া লইল। দুই পা পিছাইয়া আসিয়া ও এক পা আগাইয়া গিয়া বেশ সংযত স্বরেই বলিল—কৈ! আপনাদের তো কখনো—

কথা শেষ না হইতেই ভদ্রলোকটির পিছন হইতে একটি ডাগর মেয়ে আসিয়া সহসা তাহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। বলিল—তা' চিনতে পারবে কেন? ভাবুক মানুষ যে! মাটির দিকে তাকিয়ে তো আর চলা হয় না!

মোহন এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এতক্ষণে সে রমাকে চিনিতে পারিয়াছিল, এবং ক্রমে ভদ্রলোকটিকেও চিনিল। সুতরাং ভদ্রলোকের পায়ে হাত দিয়া ঝুপ্ করিয়া প্রণামটাও সারিয়া

লইয়া, অবশেষে রমার হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—এখনো দুষ্টুমি! বড্ডো যে পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা হয়েছিলো?

রমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—

—দেখছিলুম তোমার রকম! সাহিত্যিক হয়ে তোমার যে দুটো পাখা বেরিয়ে গেছে?

এইবার মোহনকেও হাসিতে হইল। ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

—দেখলেন তো কাকাবাবু, আপনার ভাইঝির সাহস?

কাকিমাই এই কথার উত্তর দিলেন। মোহনকে বলিলেন—

—কে পারবে বাপু ঐ পোড়ারমুখীর সঙ্গে? একে একে বি-এ পাশ দিল, একটা ভালো ছেলে দেখে—ভাবলুম বিয়েটাও দিয়ে দেই, তা' নয়—উনি পরাধীন হবেন না!

—ও বাবা! তাই নাকি?

মোহন একহাত জিভ্ কাটিয়া, পরে কাকীমাকে প্রণাম করিতে করিতে হো হো করিয়া সত্যই হাসিয়া উঠিল। একদিকে কাকীমার টিপ্পনী, অন্যদিকে মোহনদা'র হাসি—দু'য়ের যুগপৎ চাপে রমারও জলিয়া উঠিতে দেরি সহিল না। আচম্বিতে ঘাড় বাঁকাইয়া, জোর দিয়াই সে বলিল—বেশ! আমার খুশী!

তাহার কথার পিঠে পিঠেই মোহন একটা ঘুসি উঁচাইয়া লইয়া, অবশেষে কি ভাবিয়া থামিয়া যায়। পরে হাসিয়া বলে—বড্ডো বড়ো হ'য়ে গেছিস্! নইলে—

একদিন কারণে-অকারণে মোহনদা'র কিল না খাইলে—রমার ভাতও হজম হইত না, পড়াও মুখস্থ হইত না। মোহনও সেই ছোট্ট বেলাকার রমার পিঠে ছোট্ট মোহনদা'টির মতই ঘুসি উঁচাইয়া ধরিলেও, ছোট্টবেলার সেই সহজ সারল্য রমারও ছিল না, তাহারও নাই। কিন্তু বড়ো হইলেও, রমা ছেলেমানুষির অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীকেও হার মানাইয়া ছাড়িত। মোহনদা'র কথার উত্তরে সে বেশ সহজেই বলিয়া ফেলিল—

—কৈ? দাও না দেখি ঘুসি? সাহিত্যিকের বীরত্ব আমার জানা আছে!

কথায় কথায় মোহন এতক্ষণে বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। সাম্নে পুকুরের পাড় দিয়া যে পথটি তাহাদের বাড়ীর পিছনে জামতলার দিকে নামিয়া গিয়াছে, তাহার কাছে অবধি আসিয়া সে সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। কাকাবাবুকে বলিল—

—আজকে আর যাব না। আপনারা চলুন।

সঙ্গে সঙ্গে রমাই জবাব দিল। খোঁচাইয়া বলিল—

—তা'—কেই বা যেতে বলেছে তোমায়?

মোহন নিমেষে একবার রমার দিকে তাকাইয়া লইল। পরে মনের ভাব দমন করিয়া, ঠেস্ দিয়াই বলিল—

—বর্ম্মাদেশ থেকে যে-মেয়েরা ধিঙ্গিপনাই খালি শিখে' আসে, তা'রা সাধলেও আমি যাইনে!

কাকাবাবু বা কাকিমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, মোহন পুকুর পাড় দিয়া অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অগত্যা তাঁহাদেরও আগাইয়া চলিতে হইল।

সীমা আর রমা—গ্রামের মধ্যে এই দু'টি বোনই ছিল মোহনের শৈশব ও কৈশোরের সাথী। একদিন এই দু'টি বোনেরই আব্দার-অত্যাচার তাহাকে একসাথে সহ্য করিতে হইত। দুষ্টুমি করিয়া সীমা যখন রমার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিয়া সাধু বনিতে চাহিত, মোহন তৎক্ষণাৎ সীমারই 'কান টানিলে মাথা আসে কিনা'—মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া লইত। এদিকে দিদির শাস্তি দেখিয়া রমা যখন বেশ একটু মুখ ভেঙচাইয়া উঠিত—চতুর মোহনের দৃষ্টি এড়াইত না। এবার সে রমার পিঠেও কষিয়া এক কিল বসাইয়া দিত। এত করিয়াও যখন কাহারো দুষ্টুমিই কমিত না, তখন সে রাগিয়া উঠিয়া পড়িত এবং চলিয়া যাইবার ভান করিয়া দুই পা আগাইয়া যাইতেই, দুইদিক্ হইতে তাহার দুই হাত ধরিয়া দুই বোনেই সমানে ঝুলিয়া পড়িত আর অসম্ভব চেঁচাইয়া উঠিত—আর করবো না মোহনদা! এইবারটি—

তাহাদের এই "আর করবো না মোহনদা! এইবারটি—"র প্রভাব এড়াইয়া মোহনেরও আর চলিয়া যাওয়া হইত না। অগত্যা এতক্ষণে তাহাকে সত্য সত্যই

মাষ্টারী করিতে বসিতে হইত। সীমা মনোযোগের সহিত "Twinkle twinkle little star!"—আবৃত্তি করিতে করিতে যেমনই তন্ময় হইয়া পড়িত, পড়িবার তালে তালে তাহার হাতের কিলগুলি রমার পিঠে অবাধে এক ছন্দের গতি সৃষ্টি করিত। রমাও হটিবার পাত্রী নয়। "ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর"—বলিয়া ভীষণ ভাবে পাঠ আরম্ভ করিবার সাথে সাথেই, দিদির পিঠে চিম্‌টি দিয়া সেও এক পাল্টা সুর জমাইয়া লইত। এইবার দুইজনেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিত। পরে মোহনের ধমকে ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই, সীমা আবার ধরিত—"How I wonder what you are!" আর রমা ধরিত—"হেরিলাম কি আশ্চর্য্য শোভা মনোহর!" তাহাদের পড়িবার রকম এবং বলিবার ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া অতি কষ্টে হাসি চাপিয়াও মোহনের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখা চলিত না। এতক্ষণে সেও হাসিয়া ফেলিয়া দুইজনেরই মাথায় মাথা ঠুকিয়া দিত।

বৈকালে নদীর ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়া, ইহাদের পাল্লায় পড়িয়াই মোহন 'কানামাছি' খেলিত। দুই বোনের কেহই যখন চোর হইতে চাহিত না, অগত্যা মাঝে পড়িয়া ভাগ্যবানের বোঝা মোহনকেই বহিতে হইত। এইরূপে শৈশবের গণ্ডী ছাড়িয়া ক্রমে তাহারা যখন কৈশোরেরও সীমায় আসিয়া পৌছিল, অকস্মাৎ একদিন মোহন অনুভব করিল—সীমা ও রমার সহিত তাহার ব্যবহারের নিরপেক্ষতা ধীরে ধীরে যেন বৈষম্যের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। সে যেন এক আশ্চর্য্য কৌশলে দিনে দিনে সীমার পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে! অবশেষে সে নিজের মনে 'ধেৎ' বলিয়া ভয়ানক ভাবে হাসিয়া, তাহার এই অভিনব আবিষ্কারকে উপেক্ষাভরেই উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পাইত।

রমা তখন ছোটটি হইলেও, তাহার চোখে এই রহস্য ঢাকা রহিল না। হৃদয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য-বিচারে ছোট মেয়েরাও কিছু কম সজাগ নয়। ইহা তাহাদের জাতিরই একটা বৈশিষ্ট্য। তাই একদিন মোহন সীমার হাতে ভালো পেয়ারাটি আর রমার হাতে 'ছাই পেয়ারা'টি দিয়া যখন খাইতে অনুরোধ করিল, অসুখের অজুহাতে রমা তৎক্ষণাৎ তাহারটি ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দরজার বাহিরে গিয়া অনুযোগের সুরে 'চাইনে আমি খেতে' বলিয়াই সহসা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সীমারও উহা খাওয়া হইল না। দুইটি পেয়ারাই সে নীরবে মোহনের হাতে গুজিয়া দিয়া বলিল—তুমিই খেয়ে ফেল মোহন দা। আমারো কেমন খেতে ইচ্ছে নেই!

মোহনও আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পেয়ারা দু'টি ছুঁড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। মুখে বলিল—চাইনে আমিও কাউকে দিতে! ভারি আমার লাভ?

কথাগুলি একনিমিষে বলিয়া, একবারও সীমার দিকে ফিরিয়া না তাকাইয়া সহসা সে হন্ হন্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অসুখের অজুহাতে তিন দিনের মধ্যেও মোহন দা যখন ভুলিয়াও এমুখো হইল না, রমার রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল। বৈকালে সে দিদিকে একপ্রকার টানিয়া লইয়াই ভশ্চায্যি পাড়ার দিকে রওনা হইল। পথে বাহির হইয়াই সীমা জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাচ্ছিস্ শুনি?

—যমের বাড়ী!

বলিয়াই রমা বেশ জোরে হাসিয়া উঠিল। বোনের পাকামি দেখিয়া সীমা ঠাস্ করিয়া এক চড় কষিয়া দিল। বলিল—ইয়ার্কি! পাজি মেয়ে!

চড়টা রমার সত্যই লাগিয়াছিল। তবুও না রাগিয়া হাসিমুখেই বলিল—যমের বাড়ী নয় তো তোর বরের বাড়ী! কেমন?

বলিয়াই সে পিঠ বাঁচাইবার জন্য উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। বোনের এমন ঝাঁঝালো কথায় সীমা কিন্তু রাগিল না। গন্তব্যস্থান অনুমান করিয়া সে খানিকক্ষণ বিনা কারণেই রমার দিকে তাকাইয়া রহিল। সহসা হাসিয়া ফেলিয়া নিজে নিজেই বলিয়া উঠিল—আঃ হাঃ হাঃ, পোড়ারমুখী!

বোনের উদ্দেশে একটা আদরের গালাগালি দিয়া, উৎফুল্ল হইয়াই সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সেলাই লইয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরেই রমা যখন মোহনদা'র হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া বাড়ীর মধ্যে হাজির হইল, সাম্‌নের ঘরেই সেলাইরত দিদিকে দেখিয়া বলিল—

শুনলি দিদি ? অসুখ না ছাই ! গিয়ে দেখি, ক্ষীর দিয়ে, কলা দিয়ে—দিব্যি সে এক পুজোর ভোগ সাজানো ! আমিও বসে গেলুম !

দিদি একবার মাত্র চোখ তুলিয়া লইয়াই আবার কার্পেটের দিকে নামাইয়া লইল। রকম-সকম সুবিধার নয় দেখিয়া রমা মোহনের হাতখানা একবার ঝাঁকাইয়া বলিল—ওঃ ! যেই না আমার কাজের লোক ! এসো মোহন দা, কেমন ছবি এঁকেছি—দেখবে ?

মোহনকে লইয়া রমা পাশের ঘরে চলিয়া গেলে, সীমা অকস্মাৎ কুশিকাঁটা সমেত কার্পেটখানা ঝপাস্ করিয়া চেয়ারের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া হঠাৎ এক সময়ে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল এবং অবিলম্বে পাশের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া, খামোখাই রমার পিঠে দুম্ করিয়া এক-ঘা' বসাইয়া দিল। চেঁচাইয়া বলিল—উল্লুক ! আমার ডিজাইন বই ?

দু'দিন হইল দিদির কাছে চাহিয়া লইয়াই রমা বইখানি ও-পাড়ার কমলাকে দিয়াছিল। সেজন্য দিদির হঠাৎ এই রণচণ্ডী হইবার কথা নাই। অন্য সময় হইলে এই অকারণ হেনস্থা না হয় সে হজম করিত, কিন্তু মোহনদা'কে সে যখন তাহার আঁকা ছবিখানি দেখাইতে বসিয়াছে—নাঃ, রমার আর সহ্য হইল না। রাগে, অভিমানে সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল—কোনো জন্মে যদি আর তোর বইতে হাত দি—

প্রতিজ্ঞা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কেমন থামিয়া গিয়া, হিংসায় কাঁপিতে কাঁপিতে সে বেগে কমলাদের বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল। দিদিকে বই ফিরাইয়া দিয়া, সে আজ গঙ্গাজলে ডুব দিয়া বাঁচিবে !

সীমার উগ্রচণ্ডা ভাব দেখিয়া মোহনও থ' বনিয়া গিয়াছিল। তাই তাহার মুখ দিয়াও কেমন বাহির হইয়া গেল—

—শুধু আমার ওপর রে'গে রমাকে যে মারলে—এটা কিন্তু—

—হাঁ, আমারই দোষ। মানি। আর সেদিনকার পেয়ারা দেবার দোষ—সেটাও যে আমারই ! নয় ?

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সীমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে অযথাই ফোঁপাইয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া লইয়াই ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া আবার বলিল—

—আর সেইজন্যেই যে হুজুরের কাছে ক্ষমা চাই !

রুদ্ধগতি অশ্রুর বেগ রুধিতে না পারিয়া সীমা ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, মোহন হাত চাপিয়া ধরিল। দৃঢ়কণ্ঠে সেও বলিল—দোষ তোমারও নয়, রমারও নয়, দোষটা আমারই। আর আমিই যে ক্ষমা চাইতে এসেছি !

প্রাণপণে মোহনের হাত হইতে হাত ছিনাইয়া লইয়া, সীমা অনায়াসে চলিয়া গেল। রমার জন্য অপেক্ষা করিতে মোহনের আর মন সরিল না। চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীই যেন মুছিয়া আসিতেছে ! মুহূর্ত্তমাত্র দম ধরিয়া থাকিয়া, একপা একপা করিয়া সে বাড়ীর পথে বাহির হইয়া পড়িল।

ছেলেমানুষের সহিত ছেলেমানুষ সাজিয়া সময় নষ্ট করিবার আগ্রহ মোহনের আর রহিল না। ম্যাট্রিকের খবর বাহির হইতে বেশি দেরি ছিল না। অতঃপর কোন্ কলেজে ভর্ত্তি হইবে, না হইবে—ব্যবস্থা করিবার অছিলায় সকালের গাড়ীতেই কলিকাতা যাইবার জন্য সে রওনা হইয়া পড়িল।

সীমারও সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া কাটিয়াছে। নানারূপে ইতস্ততঃ করিয়া সকালে উঠিয়া সেও রমার চক্ষু এড়াইয়া মোহনের সহিত সন্ধি করিতে আসিতেছিল। মানুষকে তাহার চিনিতে বাকি ছিল না। রাস্তা ছাড়িয়া পুকুর পাড়ে আসিয়া নামিতেই, চাকরের মাথায় বাক্স-বিছানা চাপাইয়া মোহনকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া সীমা ব্যাপার বুঝিয়া লইয়াছিল। সীমাকেও হঠাৎ তাহাদের বাড়ীর দিক্ আসিতে দেখিয়া মোহনও ভড়কাইয়া গিয়াছিল। চোখোচোখি হইতে সীমাকে একটু ফোড়ং দিবার লোভ যে তাহার না হইয়াছিল—তাহা বলা যায় না। কিন্তু গত দিনের ব্যবহার কাঁটা হইয়া বুকে বিঁধিয়াছিল ! সুতরাং লোভকে যথাসম্ভব দমন করিয়া, সে সীমাকে পাশ কাটাইয়াই সোজা নদীর দিকের রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

যৎপরনাস্তি অপমানিত হইয়াও সীমা এতক্ষণে মোহনকে ডাকিয়া ফেলিল—মোহনদা!

যতই কেন না হউক, মোহনকে এইবার দাঁড়াইতে হইল। চাকরকে নদীর দিকে আগাইয়া যাইতে বলিয়া সে ফিরিয়া চাহিল। সীমা ততক্ষণে মোহনের কাছে পৌঁছাইয়া গিয়াছে। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই সে বলিয়া ফেলিল—আমিই না হয় তোমার ওপর রাগ ক'রে রমাকে মেরেছিলুম! আর এখন? আমার ওপর রাগ ক'রে—

কথা শেষ না হইতেই সাত-বছুরে খুকীটির মত হাউ হাউ করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকে থামাইয়া, অকারণে একটি প্রণাম আদায় করিয়া এবং দুই এক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া—যখন নৌকায় আসিয়া বসিল, মোহনের আর অনুশোচনার অন্ত রহিল না। কিন্তু এতদূর আগাইয়া আসিয়া শেষে ফিরিয়া গিয়া হাস্যাস্পদ হইবে কে? কাজেই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে কলিকাতা রওনা হইতে হইল।

কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়িয়া সাত-আট দিন বেশ কাটিয়া গেল। অতঃপর সীমার জন্য একটি এস্রাজ ও রমার জন্য কয়েকখানি 'মজার বই' কিনিয়া লইয়া সে যেদিন গ্রামের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, আনন্দের সীমা রহিল না। বাক্স ও বিছানা মাঝির মাথায় চাপাইয়া দিয়া সে এস্রাজ ও বইগুলি লইয়া পুকুর পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মাঝিকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া আঙুল দিয়া তাহার বাড়ী দেখাইয়া দিল। অবশেষে কিছুমাত্র দেরি না করিয়া সীমাদের বাড়ীর দিকে ধাবিত হইল।

কিছুদূর আগাইতেই বাল্যবন্ধু রবির সহিত দেখা। গ্রামে কলেরা লাগার খবর সে পৌঁছিয়াই পাইয়াছিল। এখন ইহার মুখে সীমা ও তাহার মা-বাপের মৃত্যু সংবাদ, বর্ত্তমানে তাহারই মায়ের নিকট রমার অবস্থান এবং বর্ম্মা-প্রবাসী রমার কাকাবাবুর নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইবার কথা—একে একে সবই সে শুনিতে পাইল। ইহাও কি সম্ভব? এই না সেদিন তরতাজা মানুষগুলিকে সে দেখিয়া গেল! মোহন আর বাঁচিয়া রহিল না। সে রবির সম্মুখে কাঠের পুতুলের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! হাত হইতে এস্রাজ ও বইগুলি খসিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল! আজ সে কাহাকেই বা ঐগুলি দিবে?

উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরে মোহনের একমাত্র অবলম্বন—মাও তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বাড়ী ঘর-দোরের ভার গোমস্তার উপরে দিয়া সেও এবার বাহির হইয়া পড়িল। তিন-চার বৎসর নানা দেশে ঘুরিয়া এবং তিন-চার বৎসর কলিকাতায় বসিয়া নিরলস সাহিত্য-সেবা করিয়া কাটাইয়া, অবশেষে এতদিনে সে গ্রামে ফিরিয়াছিল। গ্রামে আসিবার কয়েকদিন মধ্যেই, সুদীর্ঘ দশ বৎসর পর সীমার বোন রমাও যখন কাকাবাবু ও কাকিমার সহিত বিদুষী হইয়া ফিরিয়া আসিল, বহুদিন পরে হইলেও—তাহাদের এড়াইয়া বাড়ীতে আসিয়া মোহন সেই পুরানো স্মৃতির পাথারেই ডুবিয়া যাইতেছিল। হায়, আজ যদি তাহার মাও বাঁচিয়া থাকিতেন!

৩

এদিকে রমার মাথায়ও ভাবনার আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এতদিন পরে গ্রামে পৌঁছিয়াই মোহনদা'কে দেখিয়া অবধি স্মৃতির এক পাহাড়স্তূপ তাহারও মাথায় চাপিয়া বসিল।

দিদির মৃত্যুর কয়েকদিন পরে টেলিগ্রাম পাইয়া কাকাবাবু বর্ম্মা হইতে আসিয়া তাহাকে যখন লইয়া যান, মোহনদা'কে প্রণাম করিতে গিয়া সে কোনোক্রমেই কান্না রোধ করিতে পারে নাই। দিদিকে যে মোহনদা কত ভালবাসিত, রমা তাহা জানিত। আর জানিত বলিয়াই সেই আসন্ন বিদায়ের মুহূর্ত্তেও সে কোনো সান্ত্বনার কথা খুঁজিয়া পায় নাই। বার-তের বছরের মেয়েটি হইলেও, বুদ্ধি-বিবেচনায় সে সীমার চেয়েও বয়সে ডিঙাইয়া গিয়াছিল। কাজেই, নিজেকে একটু এড়াইয়া লইয়াই বলিয়াছিল—দেখো ভাই, দিন-রাত মন খারাপ ক'রে ব'সে থেকো না যেন! লক্ষ্মীটি! কেমন?

ইহার উত্তরে মোহন কেবল রমার হাতখানি ধরিয়া একটু আদরের ঝাঁকানি দিয়া অনাবশ্যকরূপে হাসিয়া উঠিয়াছিল। রমা এ হাসির অর্থ বুঝিয়াছিল। কিছুক্ষণ

চুপ করিয়া থাকিয়া, মোহনের একটি বুকভাঙা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের পিঠে পিঠে সেও একটি ছোট রকম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—

—আর আমার কথাটা মনে থাকবে তো? চিঠি দিলে উত্তর-ফুত্তর দেবে?

মোহন মাথা নাড়িয়া সায় দিয়াছিল। তারপর তাহাকে প্রণাম করিয়া রমা যে কখন কাকাবাবুর সহিত নৌকায় আসিয়া উঠিয়াছিল, মোহনের খেয়াল ছিল না। রমাও তাহাকে আর বিরক্ত না করিয়া, মোহনদা'র মাকে প্রণাম সারিয়া যথাসময়ে নৌকায় গিয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম প্রথম দুই বৎসরে দশখানি চিঠি দিয়া একখানির উত্তরও রমা পাইয়াছে। কিন্তু মোহনদা'র মার মৃত্যু সংবাদ পাইবার পর হইতে হাজারো চিঠি লিখিয়া হায়রাণ হইয়া গিয়াছে, ভুলিয়াও মোহনদা'র জবাব মিলে নাই। অবশেষে সে কতকটা রাগিয়া এবং কতকটা নাচার হইয়া নিরস্ত হইয়াছিল। ক্রমে লেখাপড়ার দিকে অতিরিক্ত মনযোগী হইয়া সব স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে মনস্থ করিল এবং একে একে ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ পর্য্যন্ত পাস করিয়া ফেলিল। কাকাবাবুদের কোনো ছেলেপুলে নাই। এইবার তাঁহারা ভাল একটি ছেলে দেখিয়া বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিতেই, রমা বাঁকিয়া বসিল। মেয়ের জিদ্ দেখিয়া তাঁহারাও অগত্যা পিছাইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে পেন্সনের সময় আগত দেখিয়া—কাকাবাবু যখন কাকিমার নিকট দেশে ফিরিবার প্রস্তাব করিলেন, রমা নিকটেই বসিয়াছিল। প্রস্তাব শুনিয়া সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। কাকিমার আঁচল ধরিয়া টানিয়াই সে বলিল—তাই চলো কাকীমা? মগের মুলুকে আর মন টিঁকছে না যেন!

মেয়ে বলিতেও সে, ছেলে বলিতেও সে। শেষ পর্য্যন্ত রমার জিদ্ই বজায় রহিল। পেন্সন লইয়া, যথাসময়ে দিনক্ষণ দেখিয়া কাকাবাবু—রমাদের লইয়া দেশে রওনা হইলেন।

গ্রামের ঘাটে পৌঁছিয়া দূর হইতেই রমা অন্ধকারেও মোহনদা'কে চিনিয়াছিল। ডাঙায় উঠিয়াই সে আঙুল দিয়া কাকাবাবুকে দেখাইয়া দিল—ঐ যে মোহনদা!

নিকটে আসিয়াও মোহন যখন পাশ কাটাইয়া যাইতে-ছিল, কাকাবাবু হাত ধরিলেও কোনো সাড়া না দেওয়ায়—বাধ্য হইয়া রমা আগাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মোহনদা'র সহিত কথা কাটাকাটি করিতে করিতে পুকুর পাড় পর্য্যন্ত আসিয়াও যখন তাহার অন্যমনস্কতা ঘুচিল না, এবং বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া না দিয়াই যে সে চলিয়া যাইতে চাহিল—ইহাতে কাহার না পিত্তি জ্বলিয়া যায়! সুতরাং মোহন যখন সত্যই তাহাদের ফেলিয়া চলিয়া গেল, বিন্দুমাত্রও গায়ে না মাখিয়া রমা কাকাবাবুকে বলিল—চলুন কাকাবাবু। কাজ কি অতো সাধাসাধি?

কাকাবাবুর চিঠি পাইয়া গোমস্তা আগে হইতেই বাড়ী-ঘর সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা হইতে কবে, কোন্ সময় আসিয়া পৌঁছিবেন—জানা না থাকায় কেহ তাঁহাদের আগাইয়া আনিতে যায় নাই। মাঝপথে হঠাৎ তাঁহাদের আসিবার সংবাদ পাইয়া এতক্ষণে গোমস্তাটিও লণ্ঠন লইয়া আগাইয়া আসিয়াছিল।

এইবার গোমস্তাকে সাম্‌নে পাইয়া, রাগ দেখাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পাত্র বুঝিয়া রমা খাঁ খাঁ করিয়া উঠিল—এই যে, মটরবাবুর কি এতক্ষণ ঘুম হচ্ছিল? থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে! আমাদের আর পথ দেখাতে হবে না। নৌকোয় ঠাকুর-চাকর আছে যাও, আগে জিনিষ-পত্রগুলো আনবার ব্যবস্থা করো দেখি!

গোমস্তা ওরফে মটুরা বাবাজী দিদিমণির মেজাজের সহিত বিশেষ সুপরিচিত। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কোনো-রকমে সে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া প্রণামগুলো সারিয়া লইয়া, নক্ষত্রবেগে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। সোরেগোলে রমাদের আগমন-বার্ত্তা ক্রমে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই এইবার হাট বসিয়া গেল।

সমাগত আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভীড়, স্বজন-পরিজনের কৌতুকদৃষ্টি এবং সাথী-সঙ্গিনীর সাগ্রহ প্রশ্ন এড়াইয়া চলিতে চলিতে রমা হাঁপাইয়া উঠিল। ক্রমে রাত্রির মত সব সারিয়া সুরিয়া সে যখন দ্বিতলের নির্দ্দিষ্ট ঘরে শয়নের উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত, চাহিয়া দেখিল—দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে আসিয়াও সে যে মোহনদা'র

কাছে এইরূপ ব্যবহার পাইবে—এই চিন্তাই তাহার বুকে খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিঁধিতেছিল। অভিমানে—অপমানে কেমন হইয়া গিয়া, চাদর হাতে ধরিয়াও সে একভাবে বসিয়াছিল। বিছানায় যে বিছাইতে হইবে—খেয়াল মাত্র নাই! হাতের চাদর হাতেই ধরা রহিয়াছে। এমন সময়ে কোলেরটিকে কাঁখে লইয়া পোড়ারমুখী কমলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

—ওম্মা! বাবা! বাবা! তুই নাকি বি-এ পাস দিয়েছিস্! এখনো বিয়েই করিস্‌নি? খিষ্টানদের মত—

ঘরে ঢুকিয়াই কমলা একযোগে এক কাঁড়ি প্রশ্ন করিয়া বসিল। ক্রমে জুজুবুড়ির মত ছুঁড়িকে হাঁ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, কাঁধের ওপর আচ্ছা করিয়া এক রাম-চিম্‌টি দিয়া—খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—

—আঃ মলো! ঢঙ্‌ দেখো না!

এইবারে রমা 'এ্যাঁ' বলিয়া উত্তর দিয়া কমলার দিকে চোখ ফিরাইতে না ফিরাইতেই, আবার এক ধাক্কা দিয়া কমলাই বলিল—

—ইস্! বলি—আজো তো শকুন্তলার বিয়ে হয়নি! তা' কোন্ ভাগ্যবানের কথা ভাবা হচ্ছে—শুনে দেখি?

এতক্ষণে রমাও একটু সামলাইয়া লইয়াছিল। অকস্মাৎ এই জংলী মেয়েটার অসভ্য প্রশ্নে সে একটু হকচকিয়াই উঠিল। এই জাঁহাবাজ মেয়ের সহিত পারিবারও যো ছিল না। তাই সে হাসিতে হাসিতে খাটের উপর গড়াইয়া পড়িল। পরে হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া এক সময়ে কমলার কোল হইতে খোকাটিকে ছিনাইয়া কাড়িয়া লইল, এবং আনন্দের আতিশয্যে চুমায় চুমায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। মায়ের জাতিরই একজন অপরিচিত লোকের চুমার ধমকে বেচারা খোকা ত্রাসে কাঁদিয়া উঠিতেই, ধুপুস্ করিয়া তাহাকে মেঝের উপর বসাইয়া দিয়া রমা হাঁকিয়া বলিল—

—এইটি দিয়ে ক' গণ্ডা হল, আগে তাই শুনি?

ক্রন্দনরত ছেলেকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া ঠাণ্ডা করিতে করিতে—রমার হাড়-জ্বালানো প্রশ্ন শুনিয়া কমলাও হাসিয়া ফেলিল। বাঁ হাতের কনুই দিয়া রমার পিঠে একটা চাপ দিয়া সে বলিল—আঃ গেল যা! কথার ছিরি দেখো! কেন? হিংসে হয় বুঝি?

দুম্ করিয়া কমলার পিঠে রমাও এক কিল বসাইয়া দিল। দস্তুরমত চোখ পাকাইয়া বলিল—

—মুখে আর আটকায় না, নয়? ভারি যে গিন্নী হয়েছিস্ দেখি! আঃ মরণ!

দুই বন্ধুতে অনেক দিন পরে দেখা, প্রাণ খুলিয়া তরো-বেতরো নানা কথাই হইল। কথায় কথায় মোহনদা'র কথা উঠিতেই, কমলা বলিল—

—তার কথা আর বলিস্‌নে! মা মরার পর সেই যে উধাও হয়েছিলো, আর গিয়ে আট বছর বাদে গাঁয়ে ফিরলো! এই তো এক মাসও হয়নি। বাড়ী থেকে বেরোবেও না, কারো সঙ্গে রা'ও কাড়বে না, ওই এক রকম! সত্যি ভাই! সাধ গেল তো সন্ধ্যেবেলা নদীর ধারে একবার বেরুলো, তা' নইলে—রাদ্দিন ওই লেখা আর পড়া। কে জানে বাপু—কবি না কি ছাই!

খোকার হাতখানি ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে রমা বলিল—

—দেখা-শোনার লোক ত কেউ নেই! খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা? তা'ও কি হাত পুড়িয়েই চলছে!

—আছে একটা খোট্টা ঠাকুর! মেগো! যা' ছাইপাঁশ রাঁধে—থুঃ! থুঃ! ওয়াক্!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, কমলা কবে একদিন ওপাড়া হইতে বেড়াইয়া ফিরিবার পথে মোহনের বাড়ী গিয়াছিল এবং খোট্টা বেটার রান্নার খিট্‌কেল স্বচক্ষে দেখিয়া অবাক হইয়া আসিয়াছিল—হুবহু তাহার এক নির্ভুল বর্ণনা দিতে বসিয়া গেল। অন্য সময় হইলে, কমলার এই হাত মুখ নাড়িয়া বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া রমা হয়তো হাসিয়া খান্-খান্ হইয়া যাইত। কিন্তু আজ আর তাহার ঠোঁটে হাসি আসিল না। তবুও কমলা যে মেয়ে! তাহার জন্যই রমাকে জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনিতে হইতেছিল। একথা সেকথার পর পোড়ারমুখীকে কোনো রকমে বিদায় করিয়া দিয়া, এতক্ষণে সে সজোরে দরজায় খিল আঁটিয়া দিল। বিছানায় শুইয়া প্রথমেই দিদির কথা মনে পড়িল। কী ভালোটাই না সে মোহনদা'কে বাসিত! ক্রমে মার কথা, বাবার কথাও মনে হইল। এ-পাশ সে-পাশ করিয়া কিছুতেই যখন চোখে ঘুম আসিল না, কাঁদিয়াই রাত্রি

ভোর করিয়া দিল। তাহার মত অভাগাই বা ভূ-ভারতে আর কে আছে?

৪

গ্রামে আসিয়া অবধি সাত দিন কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে না আসিয়াছে এদিকে মোহন, না গিয়াছে ওদিকে রমা। দুপুর বেলা শুইয়া শুইয়া রমা আজ এই কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল মোহনদা'রই কথা! দিদির অভাবে অমন একটি মানুষ যে সত্যই এমন অমানুষ হইয়া যাইবে—ইহা রমা ভাবিতে পারিতেছিল না। একদিন না হয় তাহার দিদিকেই সে ভালবাসিয়াছিল। তাই বলিয়া মানুষের সমস্ত জীবনটাই যে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে—এমন কি কথা? ভাল কি ভূ-ভারতে আর কেহ কাহাকেও বাসে না? মোহনদা'র এই একগুঁয়েমি তাহার ভাল ঠেকিল না।

আচ্ছা, মোহনদা'ই না হয় একগুঁয়েমি করিয়া জীবনটা নষ্ট করিয়া দিল! আর নিজেই বা সে এমন ভালটি কি করিয়াছে? সে মেয়েমানুষ হইয়া যে একগুঁয়েমি দেখাইয়াছে—তাহার তুলনায় মোহনদা? সে মানুষটি না হয় একজনকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল! কিন্তু সে? সে নিজেই বা কেন বিবাহ করিল না!

সাত পাঁচ নানাখানা ভাবিয়া অবশেষে তাহার অকারণেই মোহনের উপর রাগ হইল। চিন্তারও বাঁক ফিরিয়া গেল। আসিবার দিন ঘাটে নামিয়া ভাগ্যিস্ মোহনদা'র সহিত দেখা হইয়া গিয়াছিল! নইলে এতদিন পরে আসিয়াও যে মানুষের দেখাই মিলিত না! সে না হয় একটু রাগিয়াই ওদিকে যায় নাই। কিন্তু মোহনদা? সেও তো একবার আসিতে পারিত? আসিলে কিছু জাত খোয়া যাইবারও ছিল না! তবে?

এইবার 'দূর ছাই' বলিয়া হঠাৎ পাশ ফিরিয়া এই মাসের একখানা মাসিক পত্রিকা তুলিয়া লইল এবং অকারণেই পাতার উপর পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। সহসা "স্মৃতির সাথী" শীর্ষক মোহনদা'র একটি কবিতার উপর নজর পড়িয়া যাইতে, সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িয়া যাইতে লাগিল—

"সীমার পারে গিয়া মিলালো সীমারেখা—
জীবনে রয়ে গেল শুধু যে বিমালেখা;
এ বিমা ফুরাবে না—
বাসনা জুড়াবে না,
আশার ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়া রহি ঠেকা—
বাদলে ময়ূরী যে ভুলিয়া গেছে কেকা!

সে-রেখা বুকে এঁকে ঘুমায়ে পড়ি যদি—
তটের মায়া ছাড়ি' আঁকড়ি' ধরি নদী,
তরণী আসি' মোরে
উঠালো হাতে ধ'রে,
ডুবিতে দিল না সে স্বপনে নিরবধি—
শুকায়ে মু'ছে গেল মরুতে এ জলধি!

বাঁচিয়া ম'রে থাকি জানিনা সে কি পাপে—
ভূমিতে ঝোড়ো পাখী শিহরি' একি কাঁপে!
নীরবে পূজারী—আঃ,
দিবে কি উজাড়িয়া
সকল হিয়া, তবু ব্যথারি অনুতাপে?
না জানি কোথা এ'সে উঠেছি ধাপে ধাপে!"

—মোহনদা'র অনেক কবিতা, অনেক গল্পই সে পড়িয়াছে। তবু বার বার পড়িয়াও রমার আজ কবিতা পড়িবার আশা মিটিল না। একবার-দুইবার-তিনবার—কতবার যে কবিতাটি পড়িল, তাহার ঠিকানা নাই। মানুষকে মানুষে এমন করিয়াও ভালবাসিতে পারে?

ভাগ্যবতী দিদির উদ্দেশে অলক্ষ্যে একটি প্রণাম জানাইয়া সহসা সে উঠিয়া বসিল। সম্মুখের দেয়ালে টাঙানো মোহনদা'র ছোটবেলাকার একখানি ফটোর দিকে তাহার নজর পড়িয়া গেল। কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই ফটোখানিরও ফ্রেমের উপর মাথা রাখিয়া সে একটি প্রণাম করিয়া বসিল। অতঃপর যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া মোহনদা'র কবিতাটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ ঐ ভাবে বসিয়া ছিল—জানা নাই। একটি বুকভাঙা নিঃশ্বাস রাখিয়া সে যখন একটু সুস্থ হইল,

একবার ফটোখানির দিকে তাকাইয়াই আবার কবিতাটির দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল। অবশেষে সম্পূর্ণ অকস্মাৎ কবিতাটির পাতা একটানে ছিঁড়িয়া লইয়া কুটি কুটি করিয়া মেঝেতে ছড়াইয়া দিল। ক্রমে বইখানিও মেঝেতে ছড়াইয়া দিয়া হিহি করিয়া অস্বাভাবিক হাসিয়া উঠিল। এইবার চক্ষের নিমিষে বিছানার উপর উবু হইয়া শুইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়াও ফেলিল। তাহার মা, তাহার বাবা—আজ যেন প্রত্যেকের কথাই আবার নূতন করিয়া তাহার মনে হইতেছে!

আধঘণ্টা অঝোরে কাঁদিয়া যখন উঠিয়া বসিল, মেঘ নামিয়া গিয়াছে। এতক্ষণে যেন নিজেই নিজের কাছে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছে! একি পাগ্‌লামিতে তাহার পাইয়া বসিল? সে না শিক্ষিতা? সে না একজন গ্রাজুয়েট্! হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া এইবার আঁচল দিয়া আচ্ছা করিয়া চোখ-মুখ মুছিয়া লইল। ইহাতেও যখন খুঁৎখুঁতি গেল না, আল্‌না হইতে ভিজে তোয়ালেখানা টানিয়া লইয়া আবার একদফা ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিল। পরে উহারই মধ্যে একটু সাজিয়া গুজিয়া, আয়নার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে চুলগুলি যথাসম্ভব গুছাইয়া লইয়া, খালি-পায়েই কমলা পোড়ারমুখীদের বাড়ীর পানে বাহির হইয়া পড়িল।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়াই বৈঠকখানা ঘরের পাশ দিয়া আসিতে, গলা বাড়াইয়া দেখিল—কাকাবাবু আর মোহনদা' মুখোমুখী বসিয়া! বিস্ময়ের অবধি রহিল না! কি করিবে, না করিবে—ভাবিয়া লইয়া, পরে অতর্কিতে ঘরের মধ্যে পা দিয়া সহসা চেঁচাইয়া উঠিল—ওম্‌মা! কে ও? মোহনদা! তাই বলি—

—কেন, আসতে নেই?

মোহনের কথায় রমা কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই কাকাবাবু বলিলেন—

– বুঝলি রমা? মোহন বল্‌ছিলো—

—চাইনে বুঝতে! সাত দিনের মধ্যেও যে মানুষ—

রমার অযথা রাগ দেখিয়া মোহন আর কাকাবাবু একসাথে হাসিয়া ফেলিলে, রমা আরও জ্বলিয়া গেল। সাম্‌নের চেয়ারখানায় ধপাস্ করিয়া বসিয়া, বলিল—

—আজকেই বা আস্‌বার কি দরকার ছিল?

এইবারে মোহন আরও জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—

—বেশ! তবে উঠি। আর আস্‌বো না!

মোহনদা'কে ফোড়ং কাটিতে শুনিয়া রমার রাগ আরও চড়িয়া গেল। কিন্তু মানুষকে বিশ্বাস নাই। সত্যই যদি তাহার কথায় রাগিয়া মোহনদা' উঠিয়া চলিয়া যায়? তাই একটু নরম কাটিয়াই বলিল—

—ওম্‌মা গো! আমি বুঝি তোমায় এখানে আসতে বারণ করলুম?

মোহন সত্যই আর উঠিয়া যাইতেছিল না। একটু মাছ খেলাইয়া লইতেছিল। আরও একটু খেলাইবার জন্য বেশ গম্ভীর হইয়াই জবাব দিল—

—তা' নয় তো কী? এই না বল্‌লি—'আস্‌বার কি দরকার ছিল?'

—বেশ করেছি, বলেছি! হ'ল?

অসম্ভব রকম মুখভার করিয়া রমা সহসা উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই, মোহন গিয়া খপ করিয়া হাত চাপিয়া ধরিল। একরকম জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া আনিয়া, কাকাবাবুর চেয়ারের পাশে বসাইয়া দিয়া আদেশের সুরে বলিল—নেঃ, ঢের হয়েছে! এখন পাগ্‌লামি রাখ্ দিখি! থির হ'য়ে শোন্, কথা আছে!

রমা যতোটা না রাগিয়া উঠিয়াছিল, এতক্ষণে মোহনদা'র ছেলেমিতে মনে মনে ততোধিক খুসী হইয়া উঠিয়া আচম্‌কা হাসিয়া ফেলিল। তথাপি মুখ নাড়িয়া, মাথায় একটা ঝাঁকুনি খাইয়া বলিল—

—আ-হা-হা-হা! ভারী তো আমার ব'য়ে গেছে—কথা শুন্‌তে!

কাকাবাবু এতক্ষণ তামাসা দেখিতেছিলেন। ছেলেমানুষিতে দু'জনের কেউই কম নয়। এইবারে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে রমাকেই বলিলেন—

—খাম্‌খা যে পাগলামি করছিস্, মোহন কি এদ্দিন ছিল এখানে, যে আস্‌বে? আজ সকালেই না ও কল্‌কাতা থেকে ফিরেছে!

—ওঃ আমার কপাল! তাই নাকি?

রমা মোহনের দিকে তাকাইয়া অপ্রস্তুতের মত নাক

অবধি আঁচল চাপিয়া ধরিল। এইবার সকলকে ডিঙাইয়া নিজের উপরেই রাগ আসিয়া চাপিল। কি ছেলেমানুষিটাই না হইয়া গিয়াছে! ই-স্!

মোহনের সঙ্গে কাকাবাবুও এবার হো-হো করিয়া সমভাবে হাসিয়া উঠিলেন।

কাকাবাবুকে মধ্যস্থ রাখিয়া মোহন রমার নিকট তাহার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, রমা সবিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—

—যা' বলেছো মোহনদা'! সত্যি! চোপর দিন ব'সে আর ব'সে। হাত পা গুটিয়ে এলো বাপু! দিদির নামে কিছু একটা করি—আমারোও খুব ইচ্ছে।

তাহার আগ্রহ দেখিয়া মোহনও খুব খুসী হইল। এতক্ষণে "সীমা স্মৃতি-মন্দির"-এর পরিকল্পনা লইয়া কাকাবাবু ও রমার সহিত পরামর্শ শেষ করিয়া মোহন উঠিয়া পড়িতে, রমা সাড়ম্বরে চায়ের অনুরোধ হুকুমের সুরে জানাইয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে কেৎলি ও কাপ লইয়া রঘুনাথও হাজির হইয়া গিয়াছে।

চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিয়া মোহন কতকটা ঢোক চিবাইয়া এবং কিছুটা কথা চিবাইয়া বলিল—

—নাঃ, বিয়েই একটা করতে হ'ল দেখি, বুঝলি রমা? খোট্টার হাতের একঘেয়ে রান্না—ঘেন্না ধ'রে গেল!

কথাটা শুনিয়াই রমার বুকের ভিতরটা কেন জানি না ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই মোহনদা'র বিবাহের কারণ শুনিয়াও সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—

—ওঃ মা! এইজন্যে বুঝি! বিয়ে?

—তা' বই কি! না খেয়ে কৎদিন লোক বাঁচে?

—তা' আমাদেরও তো ওই এক কথা। তোমার হ'ল খোট্টা, আর আমাদের কি বলে ছাই—খাঁটি উৎকল!

রমা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই খুব সাবধানে জিভ কাটিয়া বসিল। রাঁধুনে ঠাকুরের উদ্দেশে তাহার এই ভব্যতাপূর্ণ উক্তির পাকামি দেখিয়া মোহনও অবিলম্বে হাসিয়া ফেলিল। হঠাৎ-হাসির ধমকে বেসামাল চায়ের পিয়ালা হইতে চুমুক-রত ঠোঁটদু'টি সরাইয়া ও সামলাইয়া লইয়া বলিল—

—আচ্ছা মেয়ে যা' হোক্! সোজা কথা বললেই চু'কে যায়, তা' নয়—'উৎ-ক-ল'! বাঙালীকে বাঙালী বল্লে যেমন ক্ষেতি নেই, উড়েকে উড়ে বলতেই বা দোষটা কিসের—শুনি?

—খবর্দ্দার! হুঁসিয়ার হ'য়ে কথা বলবে!

গম্ভীরভাবে মোহনদা'র কথায় বাধা দিয়া রমা আবার বলিল—

—উড়েকে উড়ে বলা আর চল্‌বে না। যারা আজ স্বায়ত্তশাসন পর্য্যন্ত চালাচ্ছে—তারাই কিনা উড়ে? বাঙালীও হার মেনে গেছে—জানো?

রমা আর হাসি ঠেকাইতে পারিল না। নাটকীয় কায়দায় হড়্ হড়্ করিয়া কথাগুলি বলিয়াই, সে মুখ ফিরাইয়া হাসির বেগ থামাইতে গিয়া ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কাকাবাবু এইবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

—তা' রমা নেহাৎ বাজে বলেনি মোহন! সত্যিই বলেছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে কাকাবাবুরও সমর্থন পাইয়া, রমা এইবার মোহনকে বেশ জোরের সহিতই শুনাইয়া দিল—

—কেমন? শুন্‌লে ত? হ'ল ত?

বলিয়া প্রকাশ্যেই হাসিয়া বসিল। কিন্তু মোহন তেমন ছেলেই নয়। সেদিনকার একটা মেয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করিবার কথা সে ভাবিতেও পারে না। রমার মত তাহার মতেরও উপরে থাকিয়া যাইবে—ইহা তাহার আদবেই সহ্য হইবে না! সুতরাং নিজের দৃঢ়তা বজায় রাখিবার জন্য কাকাবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

—তা' হয় না কাকাবাবু। হিন্দুস্থানীরা যেমন আমাদের বলে—"বংগালী মচ্ছিখানেবালা!" আমরাও তেমন "ছাতু!" ব'লে তার জবাব দেই। আর উড়িয়ারা আমাদের যা'ই বলুক না কেন, এতদিনকার অভ্যেস—আমরা অম্‌নি ছেড়ে দেব? বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যা—যৎদিন এই দেশগুলোর অস্তিত্ব আছে—তদ্দিন 'বংগালী', 'ছাতু' আর 'উড়ে'ও বেঁচে থাকবে, জানবেন! আর ওই বিশেষণগুলো—ওইগুলোই যে আমাদের বিশেষত্ব, আমাদের বৈশিষ্ট্য!

মোহন এইবার দমভোর হাসিয়া উঠিল। রমার এ বাড়াবাড়ি বরদাস্ত হইল না। কথার প্যাঁচে অবশ্য মোহন-দা'কে আঁটিয়া উঠিবার উপায় নাই। টানিয়া টানিয়া একটা কথাই এতবড়টা করিয়া বসিবে! অতএব রমা জাতীয় পন্থা অবলম্বন করিল। বলিল—

—যাক্‌গে বাপু! তোমার পণ্ডিতীতে আর কাজ নেই! আর খোট্টা দিয়ে দরকার? চটপট্ বিয়ে করলেই তো হ'ল! কেউ ত আর বেঁধে রাখেনি?

মোহনও এবার মুখের মত জবাব দিয়া বসিল। বলিল—

—নেঃ, তুই আর বলিস্‌নে—তাই ব'লে! নিজের দিকেই আগে তাকা? আচ্ছা কাকাবাবু, এই ধিঙ্গীটার আর ব্যবস্থা করলেন না?

রমার দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া, মোহন কাকাবাবুর দিকে চাহিল। কিন্তু কাকাবাবু সহসা মোহনের এই কথার জবাব দিতে সাহসী হইলেন না। ইহার জবাব দিলে রমা যে অনর্থ বাধাইয়া একাকার করিয়া বসিবে—এ অভিজ্ঞতা তাঁহার একাধিকবার হইয়াছে। এবং এই জন্যই একবার রমার দিকে কোনরকমে তাকাইয়া লইয়া, অবশেষে একটি নিঃশ্বাস টানিয়া মোহনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—ও-কথা আর বোলোনা! আমরা হার মেনেছি! হয়রাণ হয়ে গেছি!

বলিয়াই তিনি যেন খানিকটা বিরক্তির ভাব মুখে লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। মোহন দম্ ধরিয়া বসিয়া ছিল। কাকাবাবু বাড়ীর মধ্যে পা' বাড়াইতে না বাড়াইতেই, সেও উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—

—আমিও তবে চলি! আবার—

কি যেন কি বলিতে গিয়া মোহন থামিয়া গেল। রমাও কোনো উচ্চবাচ্য করিল না। কাকাবাবু বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে মোহন ভাবিয়াছিল, রমাকে সে একটু বাজাইয়া দেখিবে—তাহার এই বিবাহ না করিবার কারণ কি? কিন্তু মেয়েটাকে যেন কোনরকমেই চিনিবার যো নাই! কখন যে কি মূর্ত্তিতে সে কথা কয়, আর কখন বা কি মেজাজে থাকে—ইহা বোঝা দেবতারও অসাধ্য! সুতরাং পাগলকে আর না ঘাটাইয়াই সে দরজার দিকে পা বাড়াইয়া দিল। সবেমাত্র চৌকাঠ পার হইয়াছে, ঝড়ের বেগে রমা আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিল—

—কী! চ'লে যাচ্ছ যে বড়? শোন! আজই তোমাকে শুনতে হবে আমার কথা! এখ্খুনি! এই মুহূর্ত্তে!

মোহন রমার দিকে ফিরিয়া চাহিতে না চাহিতেই, সে উন্মাদের মত আবার বলিয়া উঠিল—

—নাঃ, পারবো না! দিদির স্মৃতি-মন্দিরের ভার বইতে পারবো না! আমি পা-র-বো না!

বলিয়াই সহসা উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া সে কেমন মোহনের পায়ের উপরেই উবু হইয়া পড়িয়া গেল!

এক নিমেষে কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল, মোহন কিছুই বুঝিল না। শিক্ষিতা মেয়ে, বিবাহ না করিয়া স্বাধীনভাবে থাকিবে—সে তো ভাল কথা! কিন্তু তাহার মধ্যেও যে এতটা ছেলেমানুষি, এতখানি গ্রাম্য মেয়ের ভাব থাকিয়া যাইবে—ইহা মোহন কল্পনাও করে নাই! এতক্ষণে তাই সেও কেমন বিহ্বলের মত হইয়া গিয়াছিল। তাহার মত কঠিন—সবল পুরুষের মধ্যেও যে কোন্ এক আদিম সত্যের আকর্ষণ এমন দুর্ব্বলতার রেখা টানিয়া দিবে—ইহাও বা কে জানিত? আচ্ছন্ন, বিমূঢ় অবস্থা কাটাইয়া এইবারে সে রমার দিকে চাহিয়া সত্যই শিহরিয়া উঠিল! একজন মানুষ তাহারই পায়ের উপর পড়িয়া খুন হইয়া যাইবে? নাঃ, ইহা হইতেই পারে না! অপরাধীর মত অকস্মাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে সে অগত্যা রমাকে পায়ের উপর হইতে টানিয়া তুলিয়া লইল। পরে অভিভূতের মত অকারণেই গম্ভীর স্বরে বলিল—

—তোমার কথাই সত্যি হোক্ রমা! তোমার মধ্যে আমি আমার সীমাকেই যেন আবার ফিরে পেলুম! আমায় বিশ্বাস করো!

রাগে, দুঃখে, অভিমানে, অপমানে এবং হয়তো বা আনন্দেও, রমা তখন মোহনের বুকের মধ্যে নীরবে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

আর সীমা? সে আজ কোথায়! কত দূরে!

প্রাচীন বেদান্তাচার্য্য গৌড়পাদ কি বৌদ্ধ ?

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

এতদিন অদ্বৈতমতবিরোধী পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া আসিতেছিলাম—শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ প্রচার করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমতই প্রচার করিয়াছেন।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবচ।
ময়ৈব বিহিতা পুরা কলৌ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিনা॥

ইত্যাদি পদ্মপুরাণের বচন বলিয়া তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে উক্ত মায়াবাদী ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন। অবশ্য এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, বহু প্রাচীন পুঁথিতে এই পাঠ নাই এবং ইহা শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের সময় হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। (এজন্য "ইণ্ডিয়ান্ কালচার" জানুয়ারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে দেখা যাইতেছে—ব্যাসদেব-পুত্র শুকদেবের পুত্র ও শিষ্য গৌড়পাদাচার্য্য। যাঁহাকে শঙ্করাচার্য্য "পূজ্যাভিপূজ্য পরম গুরু" বলিয়াছেন (মাণ্ডূক্যভাষ্য শেষ দ্রষ্টব্য) এবং যাঁহাকে "বেদান্ত সম্প্রদায়বিদ্ আচার্য্য" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৯ ভাষ্য দ্রষ্টব্য) বলিয়া সম্মান করিয়া তাঁহার গ্রন্থ মাণ্ডূক্য-কারিকার ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন, সেই গৌড়পাদাচার্য্যকেও বৌদ্ধ বা বৌদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকার চতুর্থ প্রকরণটী বৌদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, উহার ভাষ্যও প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য নহে, এবং মাণ্ডূক্য উপনিষৎ-খানিও বেদ নহে—ইহাও ঘোষণা করা হইতেছে।

বোলপুর বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ বিদ্যাপীঠে আসীন হইয়া মহামহোপাধ্যায় উপাধিমণ্ডিত হইয়া সম্প্রতি এই বিষয়টীর প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ইংরাজীতে একখানি গ্রন্থ মধ্যে এবং ইংরাজী পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া, তাহাকে আবার পুস্তিকাকারে পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত করিয়া এই বিষয়টী প্রকাশিত করিয়াছিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সভা করিয়া ইহার আলোচনাও করিয়াছিলেন এবং কাশীধামেও পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বাঙ্গালা ভাষার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রচার-মানসে ১৩৪৪শে'র জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে "গৌড়পাদ" নামে এক প্রবন্ধে এই বিষয়টী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে তাঁহার এই প্রচেষ্টার এইবার প্রতিবাদ করিতেছি। কারণ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের কর্ত্তা হইয়া এই ভ্রান্ত ও দুষ্ট মতটী যুবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। ইহাতে একদিকে যেমন সত্যের অপলাপ হইবে, অন্যদিকে তদ্রূপ আমাদের বৈদিক ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের হানি হইবার সম্ভাবনা আছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথমে বলিতেছেন—

"শঙ্করের পূর্ব্বে যে সমস্ত বেদান্তব্যাখ্যাতা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর একজন হইতেছেন গৌড়পাদ। শঙ্করের পূর্ব্বের ও পরের বেদান্তকে আমরা যথাক্রমে প্রাচীন ও নব্য নাম দিতে পারি। এই প্রাচীন বেদান্তে গৌড়পাদের স্থান অতি অপূর্ব্ব। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম আগম শাস্ত্র, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়পাদ-কারিকা নামে প্রসিদ্ধ। যদিও ইহা আমাদের সংস্কৃত পাঠশালায় বা টোলে পড়া ও পড়ান হইয়া থাকে, তথাপি আমার মনে হয়, সাধারণ পাঠকগণের নিকট ইহার গুরুত্ব তেমন অনুভূত হয় নাই।"

অতঃপর তিনি বলিতেছেন—

"আগমশাস্ত্র বিশেষতঃ ইহার চতুর্থ প্রকরণ (অলাতশান্তি) বৌদ্ধভাবে পূর্ণ। কেবল ইহাই নহে, তাহাতে অনেক বৌদ্ধ শব্দ আছে, এমন কি বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে তাহাতে বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে।"

অতঃপর বলিতেছেন—

"এতদিন পর্য্যন্ত এই গ্রন্থখানির সমগ্র অংশই নব্যবেদান্ত-মতে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা করিতে পারা যায় কিনা, তাহা যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা হয় নাই।"

ইহার পর তিনি বলিতেছেন—ইহার যে শঙ্কর-ভাষ্য তাহা প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের নহে, এবং ইহাকে নব্য বেদান্ত

মতে ব্যাখ্যা করাও সঙ্গত হয় নাই, এবং ইহার চতুর্থ প্রকরণটী একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, যথা—

"এই গ্রন্থখানির ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ। আমার মনে করিবার কারণ আছে যে, ইনি বেদান্তসূত্রের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য নহেন। (টীকা—এখানে ইহা আলোচনা করিতেছি না)। ইনি এবং ইঁহার অনুগামিগণ ব্যাখ্যা করিয়া সমগ্র আগম শাস্ত্র বিশুদ্ধ বেদান্ত দেখিতে পাইয়াছেন। যদিও প্রথম তিন প্রকরণ সম্বন্ধে ইহা সত্য, তথাপি আমার মনে করিবার কারণ আছে, (টীকা—ইহাও এখানে আলোচনা করিতেছি না) যে, চতুর্থ প্রকরণ সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। চতুর্থ প্রকরণে যে বস্তুতঃ বেদান্ত আলোচনা করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে এখানে অন্য আর কিছু না বলিয়া এইটুকু বলিলেই চলিতে পারে, যে ইহাতে ব্রহ্ম ও আত্মা, এই শব্দ দুটির একটিও চতুর্থ প্রকরণে পাওয়া যাইবে না। উহা বাদ দিলে কেমন বেদান্ত হয়, সহজেই বুঝা যায়। আমার আরো একটি কথা মনে করিবার কারণ আছে, যে, এই চতুর্থ প্রকরণটি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। অন্যান্য প্রকরণের ন্যায় ইহা কোন গ্রন্থের অংশবিশেষ নহে।"

এই ভাবে শাস্ত্রী মহাশয় নিজের মনের কথা বলিয়া ভূমিকার উপসংহারে বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পণ্ডিতগণকে তাঁহার দৃষ্টিতে বিষয়টী দেখা যায় কিনা, তজ্জন্য অনুরোধ করিতেছেন, যথা—

"পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতেই বুঝা গিয়াছে, আমি প্রচলিত মতের প্রতিকূলে লিখিতে বসিয়াছি। ইহাতেই অনেকের অসহিষ্ণু হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ ভাষ্যকারের বিরুদ্ধে যখন কিছু বলিতে যাইতেছি, তখন নিষ্ঠাবান্ বৈদান্তিকগণ সহজেই কুপিত হইতে পারেন। তাঁহাদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, জোনাকি যদি সূর্য্যের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে, তবেই আমি সুপ্রতিষ্ঠিত আচার্য্যদের সঙ্গে টক্কর লাগাইতে পারি। সে দম্ভ আমার নাই। পাগলেরও কথা মানুষ কখনো কখনো শোনে। তাঁহাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমি যেরূপ দেখিতে চেষ্টা করিতেছি, সেরূপ দেখা যায় কিনা, ইহাই তাঁহারা অপক্ষপাত ও স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখিবেন। আমার নিজের কোনো নির্ব্বন্ধ নাই।"

এই পর্য্যন্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের ভূমিকা। ইহা পড়িয়া আমাদের অনেক কথাই মনে হইল, তাহার কিছু এস্থলে বলিব—

প্রথম—তাঁহার নব্য ও প্রাচীন বেদান্তবিভাগ, হিন্দু আচার্য্য বা পণ্ডিতগণের সম্মত নহে; কারণ—নব্য ন্যায়ের পরিষ্কার দ্বারা যে বেদান্ত তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে, তাহাকেই উক্ত পণ্ডিতগণ নব্য বেদান্ত বলিয়াছেন, ইহাতে সিদ্ধান্তের ভেদ নাই। এজন্য শাস্ত্রী মহাশয় চিৎসুখী ন্যায়ামৃত অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ সংক্রান্ত বিচার দেখিবেন। ইহাদিগকেই নব্য বেদান্ত বলা হইয়াছে। অবশ্য শ্রীরামানুজাচার্য্য শাঙ্কর বেদান্তকে নব্য বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা নিন্দার উদ্দেশ্যে কথিত, তন্মতে তাঁহার বেদান্তই প্রাচীন। বেদান্তের তত্ত্ব বিষয়ে নব্য প্রাচীন ভেদ নাই। কারণ ইহা কাহারও মত নহে, ইহা বেদের তাৎপর্য্য, আর সেই বেদও অপৌরুষেয়। এই বিভাগ দ্বারা বস্তুতঃ শাস্ত্রী মহাশয় গৌড়পাদকে প্রাচীন বেদান্তী এবং শঙ্করাচার্য্যকে নবীন বেদান্তী বলিলেন, আর তাহার ফলে তাঁহাদের মতের মধ্যেও যে ভেদ আছে, তাহাও দেখাইলেন। ইহা কিন্তু অত্যন্ত অসঙ্গত কথা। কারণ, শঙ্করাচার্য্য, গৌড়পাদের মতেরই প্রচারক, আর গৌড়পাদ ব্যাসও শুকের অনুসরণ করিয়া উপনিষদের মতেরই ব্যাখ্যাতা। ইহা অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িলেই বুঝা যায়। এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গানুসারে তাহা অল্প বিস্তর প্রদর্শিত হইবে। শঙ্করাচার্য্য ২।১।৯ সূত্র ভাষ্যে গৌড়পাদ-কারিকার ১।১৬ শ্লোক উদ্ধৃত করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

অত্রোক্তং বেদান্ত সম্প্রদায়বিদ্ভিঃ আচার্য্যৈঃ

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥১।১৬

ইহার মধ্যে "অজমনিদ্রমস্বপ্নম" অংশটী ৪।৮১ কারিকাতেও দৃষ্ট হয়)। তদ্রূপ ১।৪।১৪ সূত্র-ভাষ্যে পাদ-কারিকার ৩।২৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

তথাচ সম্প্রদায়বিদোবদন্তি—

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যাচোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথং চ ন ॥৩।২৫

তাহার পর নিম্নলিখিত বাক্যটীও শঙ্কর কর্ত্তৃক কোন এক স্থলে উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়।—

ননিরোধো নচোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈমুক্তিরিত্যেষাপরমার্থতা ॥২।৩২

তাহার পর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্যে দেখা যায়, বলা হইতেছে—

তথাচ শুকশিষ্যো গৌড়পাদাচার্য্যঃ—

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধুমাদিভির্যুতে।
ন সর্ব্বে সংপ্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ ॥৩।৫

আবার মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্যশেষে তিনি বলিয়াছেন—

"তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোঽস্মি"।

এই সব দেখিলে মনে হইবে—শঙ্করাচার্য্য গৌড়পাদের অর্থাৎ উপনিষদের মতেরই সম্পূর্ণ অনুসারী, সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের নবীন প্রাচীন বেদান্তবিভাগ, কালগত কল্পিত বিভাগমাত্র, উহা মতগত নহে। অগত্যা শাস্ত্রীমহাশয় গৌড়পাদে বৌদ্ধভাব দেখাইলে, তাহা শঙ্করেও দেখান হইবে। কিন্তু তাহা ভ্রমেরই পরিচয় বলিতে হইবে। বস্তুতঃ ইহা অদ্বৈত-বেদান্ত-মতের প্রতি গুপ্ত শত্রুতা ভিন্ন কিছুই নহে। শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয়, লক্ষ্য করেন নাই, যে বেদান্তসম্প্রদায় গুরুচরণানুগতের সম্প্রদায়; আর শঙ্কর সম্প্রদায়ই সেই বেদান্ত সম্প্রদায়। ইঁহারা কখন গুরুমতের বিরুদ্ধে গমন করেন না। এজন্য শঙ্করের মত ও গৌড়পাদের মত অভিন্ন। নবীন প্রাচীন ভেদ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় এই সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচারই করিয়াছেন। বুদ্ধ বহু গুরু করিয়াছিলেন এবং সকলকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন, শঙ্করজীবনে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধপ্রীতিবশতঃ বোধ হয় বৌদ্ধের চশমা দিয়া দেখিতেছেন, এজন্য তাঁহার এইরূপ অভিসন্ধি হইয়াছে।

তাহার পর দেখা যায়, শাস্ত্রী মহাশয় গৌড়পাদের কারিকাকে "আগম শাস্ত্ররূপ" বিশেষ নামে নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহাও অসঙ্গত প্রয়াস। কারণ, আগম শব্দটী একটী সাধারণ নাম। এজন্য অভিধান দ্রষ্টব্য। এতদ্দ্বারা বেদতন্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্রকেই বুঝাইতে দেখা গিয়াছে। শিবোক্ত তন্ত্রকে আগম এবং দেবীর উক্তিকে নিগম নামে নির্দ্দেশ করিতে দেখা যায়। মহাভারত এবং মহাভাষ্যে বেদকে "আগম" বলা হইয়াছে। পাণিনি এবং ভাগবতে নিগমকে বেদ বলা হইয়াছে দেখাও যায়। আবার এই মাণ্ডূক্যকারিকারই প্রথম পরিচ্ছেদের নামই "আগম প্রকরণ"। ইহাতে মাণ্ডূক্য উপনিষদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদকে আগম বলা হয়, আর তাহারই ব্যাখ্যা বলিয়াই ইহার নাম আগম প্রকরণ হয় নাই কি? আমরা মনে করি যে, "বুদ্ধাগম" বলিয়া বহু বৌদ্ধগ্রন্থ প্রসিদ্ধ থাকায় "গৌড়পাদীয় আগমকে" আগম শাস্ত্র নাম দ্বারা ইহা বৌদ্ধ-গ্রন্থ করিবার ইহা একটী প্রচ্ছন্ন প্রয়াস বিশেষ। কারণ, শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, "ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'আগম শাস্ত্র', কিন্তু সাধারণতঃ ইহা মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়পাদকারিকা নামে প্রসিদ্ধ"। শাস্ত্রী মহাশয় কি কোন হস্তলিখিত পুথিতে অথবা অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে এই কথা বলা হইয়াছে বলিয়া দেখিয়াছেন? আমরা ভাবি "বুদ্ধ" নামটী এবং বৌদ্ধাগম শব্দের "আগম" নামটী সবই বৈদিকের অনুসরণ মাত্র। উদ্দেশ্য বুদ্ধ বাক্যে প্রামাণ্য বুদ্ধি উৎপাদন।

তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় ইহার চতুর্থ প্রকরণকে পৃথক্ গ্রন্থ বলিতে চাহেন। যথা—"এই চতুর্থ প্রকরণটি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। অন্যান্য প্রকরণের ন্যায় ইহা কোন গ্রন্থের অংশ বিশেষ নহে।" কিন্তু তাহা হইলে ইহার প্রথম প্রকরণের নাম "আগম প্রকরণ" থাকায় অথচ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতেও ইহার শেষ প্রকরণটী গৌড়পাদীয় আগম শাস্ত্রান্তর্গত হওয়ায় তাহারা বিভিন্ন গ্রন্থ হয় কি করিয়া? তিনি ইহার প্রথম তিন প্রকরণে বিশুদ্ধ বেদান্ত দেখিয়া চতুর্থ মধ্যে বৌদ্ধভাব দেখেন কি করিয়া? যথা—"ইনি (শঙ্করাচার্য্য) এবং ইঁহার অনুগামিগণ ব্যাখ্যা করিয়া সমগ্র আগম শাস্ত্রে বিশুদ্ধ বেদান্ত দেখিতে পাইয়াছেন। যদিও প্রথম তিন প্রকরণ সম্বন্ধে ইহা সত্য, তথাপি আমার মনে করিবার কারণ আছে, যে, চতুর্থ প্রকরণে তাহা বলা যায় না।" তিনি ইহার চারিটি পরিচ্ছেদেরই নাম "আগম শাস্ত্র" বলিতে ত আপত্তি করেন নাই। কারণ, তিনি বলিয়াছেন—"ইঁহার (গৌড়পাদের) রচিত গ্রন্থের নাম আগম শাস্ত্র কিন্তু সাধারণতঃ ইহা মাণ্ডূক্য উপনিষদের গৌড়পাদকারিকা নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে কি শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় সঙ্গতি থাকিল? এত অল্প কথার মধ্যেই যে তিনি এত পরস্পরবিরুদ্ধ কথা বলিতে পারিলেন—ইহাতে আমরা বিস্মিত হইলাম!

আমাদের দ্বিতীয় কথা এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন যে, "গৌড়পাদীয় আগমের চতুর্থ প্রকরণে অনেক বৌদ্ধ শব্দ আছে, এমন কি বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে তাহাতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে" ইত্যাদি। এই কথাগুলি মনে হইতেছে, যারপর নাই অসঙ্গত হইয়াছে, কারণ "এটী

বৌদ্ধ শব্দ" বলিয়া কোন পৃথক্ শব্দ আছে নাকি ? বৌদ্ধের পারিভাষিক শব্দ বা বৌদ্ধ কর্ত্তৃক বহুল প্রযুক্ত শব্দের মূলও বৈদিক ভাষারই শব্দ। আর তাদৃশ শব্দ দেখিলেই যে তাহা বৌদ্ধের পারিভাষিক বা তৎকর্ত্তৃক বহুল প্রযুক্ত শব্দ, তাহার ত প্রমাণ দিতে হইবে। কিন্তু সে কার্য্যটী বড় সহজ নহে। শাস্ত্রী মহাশয় কিছু পরে "দ্বিপদাংবর" শব্দকে এই জাতীয় শব্দ মধ্যে গণ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস যে ব্যর্থ, তাহা আমরাও দেখাইব। বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈদিকধর্ম্মের ক্রোড়ে উৎপন্ন, হিন্দুগণই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, হিন্দুর ভাষাই বৌদ্ধের ভাষা ছিল। বৌদ্ধগণ, কি ভাষা সৃষ্টি করায় তাঁহারা বৌদ্ধ শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন ? যদি বৌদ্ধ সাহিত্যে বহুলপ্রযুক্ত শব্দ হিন্দু গ্রন্থে দেখা যায় তাহা হইলে তাহা কি হিন্দুরই শব্দ নহে ? হিন্দুর শাস্ত্রে তাহার অর্থ হিন্দু-সম্মতই হইবে। সুতরাং শব্দ ও বচন সাহায্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের যে এই জাতীয় প্রচেষ্টা, তাহা আমাদের মনে হয় তাঁহার ভাষাতত্ত্ব বিদ্যার উৎকট অপব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। শব্দ প্রয়োগ মাত্র দেখিয়া যে অনুমান, তাহা ব্যভিচারি অনুমান, তাহাতে ব্যাপ্তি থাকে না। অতএব পণ্ডিতগণের পক্ষে এ চেষ্টা শোভন হয় না। হিন্দুর গ্রন্থের কোন বিশেষ শব্দ যদি বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার হিন্দুসম্মত অর্থই গ্রাহ্য, আর সেইরূপ কোন বিশেষ শব্দ যদি বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার বৌদ্ধসম্মত অর্থ গ্রহণ করাই সমীচন। হিন্দুর গ্রন্থের শব্দ কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিলে তাহার বৌদ্ধ অর্থ করা উচিত নহে, এবং বৌদ্ধ গ্রন্থে হিন্দুর গ্রন্থের শব্দ দেখিলে তাহার হিন্দু অর্থ করাও উচিত নহে। শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দুর গ্রন্থে উভয় সাধারণ শব্দ দেখিয়া কেন তাহার বৌদ্ধ অর্থ গ্রহণে ব্যগ্র হইয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

তাহার পর তিনি বলিতেছেন—"ইহার চতুর্থ প্রকরণ বৌদ্ধ ভাবে পূর্ণ" ইত্যাদি। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কথাটী একেবারেই অসঙ্গত হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইব উহা বেদান্ত ভাবেই পরিপূর্ণ। তিনি এজন্য মাত্র ইহার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বহু বৌদ্ধ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া যাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভিন্নতা ও অসঙ্গতি প্রভৃতি। কিন্তু ইহা ত বেদান্তেও স্বীকার্য্য। আর তাহা তিনিও এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন, যথা—

"জ্ঞান ও ধর্ম্মসমূহ কিরূপে আকাশসদৃশ, ভাষ্যকার তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। তবে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে অভেদ তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি জ্ঞেয় বলিতে আত্মা ধরিয়া তাহার সহিত জ্ঞানের অভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যাকে অসঙ্গত বলিতে পারা যায় না। (টীকা)—দ্রষ্টব্য ৩।৩৩

"অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।
ব্রহ্মজ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে॥" ইত্যাদি।

অতএব দেখা গেল জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভিন্নতা বেদান্তে স্বীকৃত হয়, ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করিতেছেন, অথচ তিনি এই কারণে গৌড়পাদের ৪র্থ প্রকরণকে বৌদ্ধ গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন !

অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয় বলিতে পারেন যে, ভাষ্যকার যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভিন্নতা দেখাইয়াছে, তাহা "জ্ঞেয় বলিতে আত্মা ধরিয়া" বিষয় ধরিয়া নহে। অর্থাৎ বিজ্ঞান-বাদীর মতে যে ভাবে ঘটরূপ জ্ঞেয় বস্তুকে ঘট বিজ্ঞানের আকার বলিয়া জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে অভিন্ন দেখান হয়, সেভাবে ভাষ্যকার দেখান নাই ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতে কোন দোষ হয় নাই। প্রত্যুত বিজ্ঞানবাদীর মতেই সে দোষ ঘটিয়া থাকে। কারণ, বিজ্ঞানবাদই অসিদ্ধ হয়; ইহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। ভাষ্যকার যে বেদান্তের কথা বলিতেছেন, সেই বেদান্তে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত। ইহা শাস্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন, এজন্য আর প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না।

পক্ষান্তরে সাকার-বিজ্ঞানবাদী ও নিরাকার-বিজ্ঞান-বাদীর মতে ক্ষণিক ঘট বিজ্ঞান কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার সঙ্গতি প্রদর্শন অসম্ভব। সাক্ষিহীন ক্ষণিক বিজ্ঞান যেমন অসিদ্ধ, তদ্রূপ নিরাকার বিজ্ঞানেরও ক্ষণিকত্ব অসিদ্ধ। আকার অর্থাৎ বিষয় দ্বারাই বিজ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে। নচেৎ বিজ্ঞানভেদই অসম্ভব। ঘটপট-বিজ্ঞানের ঘটপট বাদ দিলে বিজ্ঞানের কোন ভেদ থাকে না।

তাহার পর বিজ্ঞানবাদীর মতে ঘটবিজ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিজ্ঞান মধ্যে ঘটাকাররূপ বিষয় বা জ্ঞেয়, ঘটবিজ্ঞান এবং জ্ঞাতা এই তিনটিই থাকে বলিতে হইবে, কারণ প্রত্যেক জ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটিই থাকে। এখন ঘটপটমঠ বিজ্ঞানগুলি বিভিন্ন বলিয়া জ্ঞাতাও বিভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু সকলেই অনুভব করে—'আমারই ঘটপটমঠ জ্ঞান হইতেছে', অর্থাৎ জ্ঞাতা নিজের অভিন্নতা ও ক্ষণিকত্বই অনুভব করে। অতএব ঘট-বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াই নষ্ট হয় না। আর "আমি আমি" জ্ঞানরূপ আলয় বিজ্ঞান দ্বারাও এই অভিন্নতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত আলয় বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘট বিজ্ঞানের অংশ যে জ্ঞাতা, সেই জ্ঞাতার সহিত অভেদ সম্বন্ধ ঘটাইতে গেলে এই উভয় বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্বে আবার ব্যাঘাত ঘটিবে। আর আলয় বিজ্ঞানেও "সেই আমি" এই প্রত্যভিজ্ঞাও সম্ভব হয় না। কারণ, উৎপন্ন বিজ্ঞান, অনুৎপন্ন বিজ্ঞানে নিজ ভাব বা সাদৃশ্য উৎপাদন করে বলা যায় না। কারণ, অনুৎপন্ন বিজ্ঞান তখন নাই। আর উহা বাসনারূপে আছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, বিজ্ঞানবাদীর মতে সেই বাসনাকেও ক্ষণিক বিজ্ঞানই বলিতে হইবে। নচেৎ বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তুর সত্তাসিদ্ধ হইয়া যাইবে। আর বাসনাকে সুপ্ত বিজ্ঞানও বলা যায় না; কারণ, সুপ্ত বিজ্ঞান জাগ্রত হইলে তাহার ক্ষণিকত্ব আর সিদ্ধ হয় না। অতএব আলয়-বিজ্ঞানে "সেই আমি" ভাবই সম্ভব হয় না এবং তাহার সঙ্গে ঘটবিজ্ঞানের জ্ঞাতৃ-ভাবেরও সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ আলয় বিজ্ঞানের "আমি" ঘটকে জানিতে পারে না এবং ঘটপটমঠ বিজ্ঞানের জ্ঞাতাও এক অভিন্ন "আমি" ইহাও সিদ্ধ হয় না। এইরূপে কোন পথেই বিজ্ঞানবাদ সিদ্ধ হয় না।

তাহার পর বিজ্ঞান ক্ষণিক একথা যিনি বলিবেন, তিনিই সেই ক্ষণিক বিজ্ঞানের সাক্ষিপদবাচ্য হন। এই সাক্ষীকে স্থির বলিয়া স্বীকার না করিলে ক্ষণিকত্ব অনুভব করিবে কে? আলয়বিজ্ঞানকেও এই সাক্ষী বলা যায় না; কারণ, তাহাও ক্ষণিক-বিজ্ঞানধারা। স্থির না থাকিলে, ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয় না। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী কোন একটা কিছুকে এটা বা ওটা বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার দাবী করিতেই পারেন না। এইরূপে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদই অসিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে অধিক বিচারের অবতারণা এ-স্থলে অপ্রাসঙ্গিক; এজন্য বিরত হওয়াই উচিত বিবেচনা করি।

যাহা হউক, যে পথে শঙ্করাচার্য্য জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ দেখাইয়াছেন, সেই পথই প্রকৃত পথ, অন্য পথ বিপথ, তাহা অযৌক্তিক। আর বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব ত্যাগ করিলে তাহা ব্রহ্মবাদেই পর্য্যবসিত হয়, ইহা যিনি পঞ্চদশী গ্রন্থ পড়িয়াছেন তিনিই জানেন। তাহার পর এই গৌড়পাদের কারিকায় আদ্যোপান্ত স্থির, নিত্য অদ্বৈত বিজ্ঞানেরই সিদ্ধি করা হইয়াছে, আর তজ্জন্য ক্ষণিক বিজ্ঞানের খণ্ডনই করা হইয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং বিজ্ঞানবাদীর মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভিন্নতা প্রদর্শন করিবার প্রয়াস করিলে গ্রন্থ-তাৎপর্য্যেরই বিরোধিতা করা হইবে। শঙ্করাচার্য্য "জ্ঞেয় বলিতে আত্মা ধরিয়া তাহার সহিত জ্ঞানের অভেদ বর্ণনা" করিয়া একাধারে গ্রন্থ-তাৎপর্য্যের অনুসরণ, যুক্তি ও অনুভবেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় যে বলিলেন যে, "ইহার চতুর্থ প্রকরণ বৌদ্ধ ভাবে পূর্ণ"—এ কথার অর্থটা কি? তাহা ত তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিলেন না। গৌড়পাদ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে বৌদ্ধভাব লইয়া স্বরচিত গ্রন্থে বৌদ্ধভাবপূর্ণ করিলেন, কি বৌদ্ধগণ গৌড়পাদের নিকট হইতে বেদান্তের ভাব লইয়া তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থে বৌদ্ধ-ভাবপূর্ণ করিলেন—তাহা ত ঐ কথা হইতে বুঝা যায় না। ব্যাসপুত্র শুকের শিষ্য ও পুত্র গৌড়পাদ কলির প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময় খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় তিন হাজার বৎসর, আর তাহা হইলে আজ হইতে ২॥০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের গৌতম বুদ্ধ গৌড়পাদের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে আবির্ভূত বলিতে হইবে। সুতরাং গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ গৌড়পাদের ভাবই গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বৌদ্ধভাবের প্রচার করিয়াছিলেন—ইহাই সিদ্ধ হয় (অদ্বৈতবাদ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। গৌড়পাদ কোথাও বুদ্ধের নাম করিয়া বুদ্ধের কথা উদ্ধৃত করিতেছেন না, বৌদ্ধগণও কোথাও গৌড়পাদের নাম করিয়া বৌদ্ধ মত প্রচার

করিতেছেন না। সুতরাং এই পথ দিয়া কে কাহার নিকট হইতে লইতেছেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না! যাহা দেখা যায় তাহা উভয়ের মতবাদের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য মাত্র। কিন্তু সাদৃশ্য মাত্র দ্বারা কে কাহার নিকট ঋণী তাহাত স্থির করা যায় না। পক্ষান্তরে গৌড়পাদ জ্ঞানী অর্থে মহাভারতের অনুকরণে বুদ্ধ শব্দের বহু প্রয়োগ করিয়াছেন, কেবল এক স্থলে একজন বুদ্ধের নাম আছে, কিন্তু সে স্থলে সে বুদ্ধ বেদান্ত বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন ইহাই বলিয়াছেন, যথা—

"নেতাদং বুদ্ধেন ভাষিতম্‌॥" (৪।৯৯ গৌড়পাদকারিকা)

—আর এই বুদ্ধও ব্যাসের সময় অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রকুচ্ছাদ বুদ্ধ বলিয়াই অনুমিত হয়। (বিশ্বকোষ) দ্রষ্টব্য)। অতএব "গৌড়পাদের কারিকার চতুর্থ প্রকরণ বৌদ্ধ ভাবে পূর্ণ" একথা বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে লিখিত তাহা বোধ হয় না। আমরা কিন্তু উক্ত ইতিহাস এবং উক্ত সাদৃশ্য দেখিয়া ভাবি যে, গৌড়পাদের উপনিষদ ব্রহ্মবাদের বিকৃতি করিয়াই বুদ্ধ নিজ মতের প্রচার করিয়াছেন। কারণ, গৌড়পাদের মত, শ্রুতি যুক্তিও অনুভবসিদ্ধ, আর বুদ্ধের মত শ্রুতির পূর্ব্বপক্ষ, যুক্ত্যাভাসপূর্ণ, এবং অনুভব বিরুদ্ধ। ইহার কারণ, বুদ্ধ—বেদ সাংখ্য যোগ ও বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িয়া "আরড় কালম" প্রভৃতি একাধিক বৈদিক গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, বেদ উপেক্ষা করিয়া, নিজ মত প্রচার করায়, তাঁহার অনুভবকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি না। অলৌকিক বিষয়ে নিত্য সর্ব্বজ্ঞ বাক্য বেদই প্রমাণ। অজ্ঞ থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইলে তাঁহার বাক্য প্রমাণ হয় না। কারণ, সর্ব্বজ্ঞত্বে প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ এতাদৃশ বহু সর্ব্বজ্ঞের মধ্যে পরস্পর বিরোধই দৃষ্ট হয়। যেমন মনু ও কপিল প্রভৃতির মধ্যে বিরোধ। একথা ২।১।১ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য উপপাদন করিয়াছেন। এজন্য অজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ নামে অভিহিত হইলে তাঁহার বাক্য প্রমাণ হয় না। তাঁহারও সর্ব্বজ্ঞতাও প্রমাণ নহে। নিত্য সর্ব্বজ্ঞের নিত্য বাক্যই অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ হয়। আর তাদৃশ বাক্যই বেদ। এই বেদ অমান্য করায় অলৌকিক বিষয়ে বুদ্ধের অনুভব অপ্রমাণ। আর পৌরাণিক দৃষ্টিতেও বুদ্ধের বাক্য অপ্রমাণ। কারণ, আদি বুদ্ধ নারায়ণের মায়া মোহের অবতার। আর এই গৌতম বুদ্ধও সেই আদি বুদ্ধেরই মতানুসারী ; কারণ, বৌদ্ধগণ বলেন যে, এই বুদ্ধ পূর্ব্ব বুদ্ধের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। অবশ্য আদি বুদ্ধকে তাঁহারা নারায়ণ শরীরোৎপন্ন মায়া মোহের অবতার বলেন না। কিন্তু হিন্দুর দৃষ্টিতে এরূপই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। কোন কোন বৌদ্ধের মত এই যে, বুদ্ধ জন্মিবার পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞই ছিলেন তিনি ইচ্ছা করিয়া মানবরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার শিক্ষাদি লীলা মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও জন্মাবধি তিনি যখন সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না, তাঁহাকে যখন শিক্ষা ও সাধন করিতে হইয়াছিল, তখন অজ্ঞ বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন একথা তাহার পক্ষেও বলিতে কোন বাধা হয় না। আর তজ্জন্য বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞতায় কোন প্রমাণ নাই ইহা বলিতে কোন বাধা নাই।

তাহার পর বুদ্ধের যে যুক্তি তাহাও যে অসঙ্গত তাহা বৈদিক পণ্ডিতগণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। আর তাহারই ফলে বৌদ্ধমত ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রী মহাশয় গৌড়পাদীয় চতুর্থ প্রকরণটী বৌদ্ধভাবে পূর্ণ বলিয়া যে গৌড়পাদকে বৌদ্ধ বলিবার উপক্রম করিতেছেন, তাহা একেবারেই যুক্তিহীন, সুতরাং অনাস্থেয়। ইহার ফলে বৈদিক অদ্বৈতবাদের মূলে একেবারে কুঠারাঘাত করা হইতেছে। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস যে ব্যর্থ প্রয়াস তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না!

তৃতীয় কথা এই যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে "এত দিন পর্য্যন্ত এই গ্রন্থখানি সমগ্র অংশই নব্য বেদান্ত মতে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা করিতে পারা যায় কিনা তাহা যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা হয় নাই" বস্তুতঃ এই কথাটি বড়ই বিচিত্র হইয়াছে। আচ্ছা, কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে তাহার সমগ্র অংশেরই আলোচনা করা উচিত? না, অংশ বিশেষের আলোচনা করা উচিত? শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই গ্রন্থের সমগ্র অংশই নব্য বেদান্ত মতে বুঝিবার চেষ্টা করা ভাল হয় নাই দেখিতেছি ; যদি

এক অংশ নব্য বেদান্ত মতে আর অপর অংশ বৌদ্ধ বা অন্য মতে বুঝিতে চেষ্টা করা হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের বোধ হয় আপত্তি হইত না? এরূপ না বলিলে কি পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়!

তাহার পর, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—নব্য বেদান্ত একটা মতবিশেষ নহে। উহা নব্য ন্যায়ের পরিষ্কারের সাহায্যে ব্যাখ্যা পদ্ধতি বিশেষ। নব্য ন্যায়ের প্রচারের পর সকল শাস্ত্রই নব্য ন্যায় দ্বারা বিকৃত করা হইয়াছে, যথা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্যযোগ বেদান্ত প্রভৃতি। ইহা নিশ্চয়ই শাস্ত্রী মহাশয় জানেন। অতএব শাস্ত্রী মহাশয়ের "এতদিন পর্য্যন্ত এই গ্রন্থখানি নব্য মতে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে" ইত্যাদি কথা যারপরনাই অসঙ্গত হইয়াছে। আমরা ভাবি যাঁহাদের বেদে অপৌরুষেয় বুদ্ধি আছে, মীমাংসার বিচারের অত্যল্পও অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের হৃদয়ে এরূপ নব্য প্রাচীন বেদান্তঘটিত কল্পনা উদিতই হইতে পারে না। আর শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত শঙ্করের নব্য বেদান্ত মতে এই কারিকা যে ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধ মতে পারা যায়, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইতে পারেন নাই, প্রত্যুত বৌদ্ধ মতে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না—ইহাই আমরা ভাবি। কারণ, কারিকার বর্ণিত মূল বস্তু যে বিজ্ঞান, তাহা ক্ষণিক নহে, কিন্তু তাহা আজ স্থির, নিত্য ও অদ্বয় বস্তু, আর বৌদ্ধের বিজ্ঞান অসংখ্য ও ক্ষণিক এবং উৎপাদ বিনাশশীল। অতএব শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত কথা একেবারেই তাঁহার যোগ্য হয় নাই।

চতুর্থ কথা এই যে, গৌড়পাদীয় কারিকার ভাষ্যটি সূত্র ভাষ্যকার প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য কৃত নহে। ইহাও শাস্ত্রী মহাশয়ের মত। অবশ্য এই কথার টীকায় তিনি বলিয়াছেন —"এখানে ইহা আলোচনা করিতেছি না।" কিন্তু ইহার পরই তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উক্ত কথার কারণ যে কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সেই কথাটী এই—"ইনি (শঙ্করাচার্য্য) এবং ইহার অনুগামিগণ ব্যাখ্যা করিয়া সমগ্র আগম শাস্ত্রে বিশুদ্ধ বেদান্ত দেখিতে পাইয়াছেন। যদিও প্রথম তিন প্রকরণ সম্বন্ধে ইহা সত্য, তথাপি, আমার মনে করিবার কারণ আছে যে, চতুর্থ প্রকরণে তাহা বলা যায় না। (টীকা— ইহাও এখানে আলোচনা করিতেছি না)।" অতএব বলা যায়, গৌড়পাদীয় কারিকার ভাষ্য যে প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের নহে, তাহার একটা কারণ, এই যে, ইহাতে বিশুদ্ধ বেদান্ত মত প্রদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

আচ্ছা, গৌড়পাদীয়কারিকার ভাষ্যকার প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য না হইলে অন্য শঙ্করাচার্য্য হইবেন—ইহা তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন। আর সেই দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্যের অনুগামিগণও এই কারিকায় বিশুদ্ধ বেদান্ত দেখিতে পাইয়াছেন—ইহাও শাস্ত্রী মহাশয় তাহা হইলে বলিলেন। কিন্তু সকলেই দেখিতেছেন যে প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যেরই অনুগামিবৃন্দ অদ্যাবধি বর্ত্তমান, অপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য কে, এবং তাঁহার অনুগামিগণই বা কাহারা? তাহা কি শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইতে পারেন? এমন কোন বিশুদ্ধ বেদান্তবাদী দেখা যায় না, যাঁহারা বলেন যে, আমরা প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী নহি, কিন্তু অপর শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী। শাস্ত্রী মহাশয় এ কথার কোন প্রমাণ দিলেন না; তবে পাছে শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কথাটী কেহ অপ্রামাণিক মনে করেন, এজন্য শাস্ত্রী মহাশয় পাদ-টীকায় বলিলেন—"এখানে ইহা আলোচনা করিতেছি না"। আচ্ছা, তাহা হইলে ইহা বলা কেন? তিনি কি মনে করেন—সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে প্রমাণ না দিয়া কোন কথা বলিলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম, পদ ও উপাধির বলে লোকে তাহা গ্রহণ করিতে কোনরূপ আপত্তি করিবে না! গৌড়পাদীয় কারিকার ভাষ্যকার প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য নহেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কথা এ পর্য্যন্ত কোন হিন্দু পণ্ডিতই বলেন নাই বলিয়া আমাদের মনে হয়। বিদ্যারণ্য, অপ্পয় দীক্ষিত প্রভৃতি আচার্য্যগণ গৌড়পাদকারিকার ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য কৃত—ইহা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন। আনন্দগিরি ত টীকাই করিয়াছেন এবং মাধ্ব প্রভৃতি শঙ্কর মত বিরোধী আচার্য্যগণ এরূপ কল্পনাও করেন নাই!

উমার বিবাহ

(গল্প)

শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম আকাশপ্রান্তে পঞ্চমীর পাণ্ডুর চাঁদ নামিয়া আসিয়াছে। মাঘ মাস। চারিদিকে সূচীভেদ্য কুয়াশা—এত ঘন ও গভীর যে জল-স্থল সব একাকার হইয়া গিয়াছে। ভোর হইতে না হইতেই পাখীর কলরব সুরু হইয়াছে।

সেই আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে কাত্যায়ণী ঘড়া লইয়া পুকুর ঘাটে জল লইতে আসিলেন।

আজ সকালে উমাকে পাশের গ্রাম হইতে দেখিতে আসিবার কথা। ইহা কিছু নূতন নহে। বছর তিন ধরিয়া শুধু এই কনে-দেখা চলিতেছে। কিন্তু দেখিয়া যাইবার পর বরপক্ষ হইতে আর কোন খবরই আসে না। অবশ্য ইহার মূলে আছে এক প্রথম ও প্রধান কথা—উমা কুরূপা। অন্ততঃ গ্রামের লোকের নাকি ইহাই অভিমত।

কাত্যায়ণী জলে দাঁড়াইয়া আনমনে কি যেন ভাবিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে দু' একজন বয়স্থা স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এত সকালে কাত্যায়ণীকে দেখিয়া একজন অনুমানে ভর করিয়া বলিয়া উঠেন—

হ্যাগা, আজ নাকি আবার উমিকে দেখতে আসবে?

অপরা বৃদ্ধা অমনি স্বর করিয়া টানিয়া টানিয়া বলেন—

ও-ও, হুঁ, কাল রেতে কে যেন আমায় বলছিল। তা' আমি বলি বাপু তোমার বেটীকে কেউ পছন্দ ক'রে বিয়ে করবে না। অন্যভাবে চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে দেখ গে।

এই ধরণের টিপ্পনী এড়াইবার জন্যই কাত্যায়ণীর অতি প্রত্যুষে জল লইতে আসা। সকাল-সাঁঝে যত অমঙ্গল কামনা!

বাড়ী ফিরিয়া তিনি উঠানে গোবরছড়া দিতে লাগিলেন। প্রাঙ্গণ-কোণে শুক্‌না নারিকেলের পাতা স্তূপাকারে প্রাচীর-গাত্রে হেলান দিয়া রাখা ছিল। সেগুলি স্থানান্তরিত করিয়া মাটির দেওয়ালে-দেওয়া কাঁচা ঘুঁটেগুলি একটি একটি করিয়া তুলিয়া ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিলেন। খিড়কীর দরজার ঠিক পাশেই দেওয়ালের ভিত্তি হইতে বিরাট্ এক উইয়ের ঢিবি উঠিয়াছে; তুলসীতলার চারিদিকে এত বড় বড় ঘাস হইয়াছে যে বাঘ লুকাইয়া থাকিলেও বোধ হয় নজরে পড়িবে না। লাঙ্গল, কোদাল, শাবল প্রভৃতি চাষ করিবার যন্ত্র ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে—চারিদিকে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও শ্রীহীনতা। কাত্যায়ণী কোমরে কাপড় বাঁধিয়া ভিতর-বাড়ীর সংস্কার সাধন করিতে লাগিয়া গেলেন।

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উমা আসিয়া মাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া বলে—আজ বাড়ীতে কি হবে মা? সকাল না হ'তেই তুমি উঠোন যে একেবারে তক্ তক্ করে ফেলেছ?

হবে আর কি! আজ তোকে বনপুকুর থেকে দেখতে আসবে। যা' মা—মুখ-হাত ধুয়ে এসে ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে দে; আর হ্যা—তোর বাবাকে উঠিয়ে দিয়ে আয় ত। উঃ—এতও ঘুমুতে পারে!

আদেশ পালনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। উমা যেমন ছিল—ঠিক্ সেইভাবেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বালতির জলে গোবর গুলিতে গুলিতে এক ফাঁকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া লইয়া মেয়েকে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মা বলিলেন—যা', চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে! যা' মা যা', দেরী করিসনি!

শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে উমা উত্তর করে, না মা—আমি বলছি, আমি আর সং সাজতে পারব না।

কাত্যায়ণী প্রমাদ গণিলেন। তিনি মনে মনে ঠিক্ এইভাবের একটা কিছু আশঙ্কা করিতেছিলেন। উমা জিদ্ ধরিয়া বসিয়াছে—সে আর সাজিয়া গুজিয়া অপরকে ভুলাইবার বৃথা চেষ্টা করিবে না। কিন্তু মেয়েমানুষ—বিবাহ না করিয়া আর কয়দিন চলে! সান্ত্বনাচ্ছলে মেয়েকে এ ও-তা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কাত্যায়ণী বলেন—অনুঝ হ'লে

কি চলে মা? গাঁয়ের লোকে আমাদেরই পাঁচ কথা বলবে, আইবুড়ো মেয়েকে ত আর দুষতে যাবে না! বড় হয়েছিস্—ভালমন্দ কিসে হয় না হয় একটু বিচার ক'রে দেখ্ মা!

বেলা গড়াইয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু যাহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় কাত্যায়ণী বসিয়া বসিয়া উত্তরোত্তর ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন, তাহারা দ্বিপ্রহরেও আসিয়া পৌঁছিল না। বেলা দুইটার সময়ে হঠাৎ যে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল—তাহাকে দেখিয়া বাড়ীর সকলেই যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। কাত্যায়ণী প্রথমে বেশ করিয়া চোখ রগড়াইয়া লইলেন। তাহার পর নিকটে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরিষ্কার দিবালোকে দেখিলেন—তাঁহারই একমাত্র পুত্র রমেন তাঁহারই চোখের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সঙ্গে অপর একটি সুদর্শন যুবক। কাত্যায়ণীর অধরোষ্ঠ শুধু থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল, কোন বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। উমা এতক্ষণ মূঢ়ের মতন এক কোণে দাঁড়াইয়া এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিতেছিল! বিস্ময়ে ও আনন্দে সে একরকম চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—দাদা!

বাড়ীর কর্ত্তা দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া রৌদ্র সেবন করিতেছিলেন। হাঁপানির টান প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। উমার কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই খিন্নকণ্ঠে তিনি চেঁচাইয়া উঠেন—কে এসেছে রে উমি?

কোন উত্তর না পাইয়া তিনি পুনরায় চীৎকার করেন। কাত্যায়ণী ছুটিয়া আসিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলেন, উঠে দেখ না গা একবার? তোমার ছেলে যে বাড়ী ফিরে এসেছে!

সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া গৃহস্বামী মুখ দিয়া তুবড়ি ছুটাইতে আরম্ভ করেন—কে, রমেন এসেছে? কেন? কেন? কে আসতে বলেছে ওকে? হতভাগা ছেলে—বের ক'রে দাও ওকে বাড়ী থেকে—এক্ষুণি বের ক'রে দাও। চোর! চামার! এবার কি মতলব ফেঁদে এসেছে?

কাত্যায়ণী কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়: খানিকক্ষণ পরে গদগদভাবে তিনি স্বামীকে বলেন—ওগো আজ যে আনন্দের দিন! বাছা আমার যে ঘরে ফিরে এসেছে আজ! আজ কি আর ও-সব অলক্ষুণে কথা মুখ দে' বের করতে আছে?

নিরুপায়ভাবে বৃদ্ধ শুধু চাপা গলায় বলেন—হুঁ।

*　　*　　*

রমেন বলে—মা, তোমরা আমার ওপর নিশ্চয়ই রাগ করেছ—বাবা ত যে রকম দেখছি, আমার মুখই দেখবেন না। কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস কর মা, সে-টাকার এক পাই-পয়সাও আমি বাজে খরচে নষ্ট করিনি। আজ না বলে নেওয়ার জন্যে আমি একটুও অনুতপ্ত নই। এই উমেশকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখ না?

কাত্যায়ণী কহিলেন—টাকা থাক্‌লে কি আর মা-বাপেরই দিতে সাধ না হয় রে? কিন্তু আমাদের অবস্থা ত জানিস্—মেয়ের বিয়ের জন্যে ঐ সামান্য টাকা কর্ত্তা বছরের পর বছর ধ'রে পুঁজি ক'রে রেখেছিলেন। তবুও দেখ্ না এমনি কপাল যে, আজ অবধি মেয়ের একটাও পাত্তর জুট্‌ল না।

রমেন ঔদাসীন্য দেখাইয়া সহজ ভাবেই বলে—তা বল্‌লে কি আর মেয়ের বিয়ে বন্ধ থাকে মা? আজ হয় নি, কাল হবে।

তাহার পর রমেন মাকে উমেশের পরিচয় দেয়। শেষে উমেশের দিকে চাহিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সে বলে—ও না থাকলে আমি একলা বিদেশ বিভুঁইয়ে বিশেষ কিছুই হয়ত ক'রে উঠ্‌তে পারতাম না। বলতে গেলে আমাদের কারবারকে একরকম দাঁড় করিয়েছে উমেশই।

পশ্চিমের ছোট এক সহরে গিয়া দুইটি ছেলের বিজয়াভিযানের বিচিত্র ইতিহাস শুনিতে শুনিতে মা আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠেন—উমেশ, বাঃ, নামও ত চমৎকার! পরে আত্মগতভাবে হয়ত নিছক কৌতুহলের বশেই তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—উমেশ—উমা—বাঃ, চমৎকার মিল হয়ত!

যে দেবতাকে দেখা যায় না তাঁহার নাম অতনু। সেই সর্ব্বজ্ঞ অতনু অন্তরীক্ষে থাকিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিয়াছিলেন কিনা কে জানে!

দিন দিন করিয়া প্রায় এক মাস শেষ হইয়া আসিল। রমেন শীঘ্রই কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইবে। কি যেন ভাবিয়া

লইয়া সে মাকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া কৃত্রিম কোপের সহিত বলে—মা, কি ভেবেছ তোমরা বল ত? বলি, মেয়েকে কি তোমরা ব্যারিষ্টার না ক'রে ছাড়বে না?

মা আসিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলেন—কেন বাবা, কি হয়েছে?

হবে আবার কি? উমির বে-থা দেবে কি না?

কাত্যায়ণী হঠাৎ যেন ভয়ে ও নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়েন। শুষ্ক-পাংশু মুখে তিনি বলেন—চেষ্টার ত ত্রুটি হচ্ছে না বাবা! কিন্তু বাংলাদেশে আজকাল পাত্তরের নাকি আকাল ঘটেছে! এদিকে গাঁয়ের লোকেদের মধ্যে ত কানাঘুষার বিরাম নেই। সব দিক্ দিয়ে যেন বিধাতা আমাদের 'পরে বাদ সেধেছেন!

মার কথা কাণে না তুলিয়া যেন সমস্যার কিছুই নাই—এই ভাব দেখাইয়া মৃদু হাসিয়া রমেন বলে—পাত্তর ত তোমাদের ঘরেই আছে মা, আর তোমরা কি না সারা দুনিয়া গরু-খোঁজা ক'রে বেড়াচ্ছ?

হঠাৎ যেন একটা বাড়ীর ভিৎ খসিয়া পড়িয়া যায়! কাত্যায়ণী বিস্ময়-চকিত নয়নে খানিকক্ষণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলেন—কে, কে বাবা? কে সে?

ইতিমধ্যে উমেশ কোথা হইতে যেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাকে দেখাইয়া রমেন বলিল—এই যে উমেশ এসেছে! এরই কথা তোমায় এক্ষুণি বলছিলাম মা।

অ্যাঁ, বলিস্ কি রে?

হ্যাঁ মা, সত্যি। সংসারে এর দিদি ছাড়া আর কেউ নেই; তাই দিদির অনুরোধ পায়ে ঠেল্‌তে না পেরে উমেশ উমা ঘরে আনতে রাজি হয়েছিল। তা' আমি বল্‌লাম—আমাদের ওখানেই চল—উমা পাবে···কেমন কিনা তুমিই বল উমেশ?

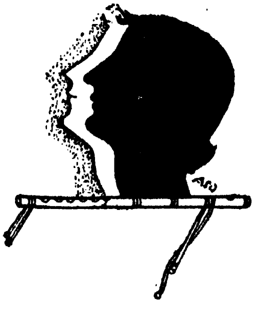
এই কথা বলিয়াই রমেন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠে। উমেশও বন্ধুর সে-হাসিতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারে না।

কাত্যায়ণী ভাবিতেছিলেন—এ সব কি সত্য? ভগবান কি তবে এতদিন পরে তাঁহাদের উপর মুখ তুলিয়া চাহিলেন?

উমেশ আসিয়া কাত্যায়নীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে।

কাত্যায়ণী কাঁদিয়া ফেলেন। তিনি আর আনন্দকে দেহে ধরিয়া রাখিতে পারেন না। উমেশের অবনত মস্তকের উপর হাত রাখিয়া বলেন—বেশ, বেশ! দেখ বাবা, আজকালই যত ফ্যাসাদ উঠেছে। সেকালে লোকে মেয়ের রূপ দেখত না, টাকাও দেখত না; লেখাপড়ার তো বালাই ছিল না—দেখত শুধু কুল। কুলীনের ঘর, সদ্বংশ দেখেই বিয়ে হ'ত—মেয়ে দেখে নয়। এই প্রগতি না কি একটা বলে—এর জ্বালায় ত গেলাম বাবা! সে যাক্ গে—আমি আশীর্ব্বাদ করছি—তোমরা দু'জনে দীর্ঘায়ুঃ হও—সুখে ঘর-কন্না কর।

উমার খোঁজে তিনি সেখান হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।



শঙ্কট-শঙ্কায়

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বিপদের কাছে মাথা নত করা
সে নহে মানব-ধর্ম্ম ;
বুক বেঁধে তারে বাধা দিতে পারা
সেই তো বীরের কর্ম্ম।
ভালবেসে যারা আসে বারে বারে,
সহানুভূতিতে বুঝায় আমারে,
হব সে-সব নর-দেবতারে
বিলায়ে হৃদয় মর্ম্ম !
বিপদের মাঝে নির্ভীক থাকা
সেই তো প্রকৃত বর্ম্ম।

কোনো নরাধমে সাধিব না নিতে
দুঃখের কিছু অংশ ;
সহায়তা তার যাচিব না কভু
হই যদি হব ধ্বংস।
মৃত্যু হলেও সে অতি শোভন,
রবে সম্মান, ফুটিবে জীবন,
শতগুণে শ্রেয়ঃ সে সুখমরণ
স্মরিবে মানববংশ ;
দুঃখ-দাহনে দহিয়া জীবনে
হব কি পরমহংস !

দৈবী বিপদে সঙ্গোপনে কি
শত্রুও করে নৃত্য ?
হেরিয়াছি সেই নরকের কীট,
কাম কামনার ভৃত্য !
পরের বিপদে হাসি-মাখা মুখ
পরের দুঃখে করে কৌতুক,
পর তুষ্টিতে ফাটে যার বুক
ঘোরে সে যে পাশে নিত্য ?
তার দুর্দ্দিন অতি সম্মুখে,—
এত ছোট হয় চিত্ত ?

ঝঞ্ঝার সাথে আসুক বজ্র,
ঝরুক প্রলয়-বৃষ্টি ;
ঘনঘটা করি' নামুক আঁধার,
করুক না অনাসৃষ্টি।
শক্তি বাড়িবে আমার বক্ষে,
হেরিতে দিব না অশ্রু চক্ষে,
প্রভু, পরীক্ষা কর অলক্ষ্যে,
ভুলিব না কৃপাদৃষ্টি ;
দুঃখও বটে তোমারি তো দান,
নহে, নহে সে তো রিষ্টি !

সকল রকম বিপদের মাঝে
প্রাণে রেখো অনুরক্তি !
পূজার চেয়েও তব প্রিয় কাজে
রহে যেন মোর ভক্তি !
স্তুতি-বন্দনা করিব না তব,
কার্য্য করিয়া যাব নব নব,
তুষ্টির সাথে রুষ্টিও ল'ব
দিয়ো মনে সেই শক্তি !
বিপদের সাথে লভিব তথাপি,
হোক্ না রক্তারক্তি !

ছোট্ট খুকী!

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বড়ুয়া

সদ্যপ্রসূত বাছুরটি উঠে দাঁড়াতেই বাড়ে খুকীর আনন্দ:
ও' হাততালি দিয়ে তার পিছু পিছু নেচে বেড়ায় আর ডাকে—
আয়, আয়, আয়—
খেলবি যদি আয়!
ফিরে-পাওয়া পুরাণ খেলার সাথীর সান্নিধ্যে পরাণ এমনি ক'রেই নেচে ওঠে।
ও আজ ভুলেছে খাওয়ার কথা, পুতুল নিয়ে খেলা;
ছুট্টে গিয়ে কচি কচি দুর্ব্বাদল তু'লে নিয়ে আদরে বাছুরকে খে'তে বলে—
বোকা বাছুর কথাও বোঝে না—!
ডাগর চোখ দুটি তুলে শুধু তাকায়।
খুকী তার গলা জড়িয়ে ধ'রে চুমা দেয়, কাণে কাণে কত কি বলে—
হারান বোবা ছেলেকে কুড়িয়ে পেলে যেমন ঠাকুরমা!
গাভী কাছে আসে—
লম্বা জিভ্ বা'র ক'রে আদরে দু'জনাকেই চেটে দেয়;
খুকী তার কচি বুকের ভালবাসা দিয়ে জয় করেছে ওই দুটি পশুর হৃদয় —
গাভীও তাকে ভালবেসেছে!
তা'দের মাঝে মিলনের যোগসূত্র এনে দেছে অপত্যস্নেহ।
ভালবাসা দিয়ে কি ক'রে পরকে আপন করে—
তা' জেনেছে ওই ছোট্ট খুকী!



হেমচন্দ্রের "বীরবাহু" কাব্য

শ্রীজহরলাল বসু

যেমন বনমধ্যে একটি সুগন্ধি ফুলের গাছ থাকিলে সেই গাছের ফুলের সৌরভে সমস্ত বন আমোদিত হয়, সেইরূপ একটি মাত্রও গুণিলোক কোন গ্রামে থাকিলে তাঁহার গৌরবে সেই গ্রাম চিরস্মরণীয় হয়, উত্তরকালে সেই গ্রাম সাহিত্যিকদিগের নিকট পীঠস্থান স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বাণীর বরপুত্র শেক্ষপীয়রের অমরস্মৃতি লইয়াই এডনতীরস্থ ষ্ট্র্যাটফোর্ডের গৌরব; 'অকাল-কোকিল মরু-তল-তরু অনীর দেশের বারি' মাইকেলের জন্যই কপোতাক্ষ তীরস্থ সাগরদাঁড়ির অমরত্ব; 'সিংহ শিশু' বিদ্যাসাগর যদি সেথায় জন্মগ্রহণ না করিতেন তো বীরসিংহ গ্রামকে কে চিনিত? সপ্তগ্রাম যে একদিন সারা বাঙ্গালার মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী পণ্যক্ষেত্র ছিল তাহা হয়তো অনেকে জানেন না, কিন্তু সেই সপ্তগ্রামের অন্তঃপাতী 'দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দপুর গ্রাম' রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের এবং অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অমরস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া সাহিত্যিকগণের চির আদরের ভূমি হইয়াছে।



কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তবে একটু গোলযোগ বাধে, যদি সেই মহাপুরুষ একস্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া প্রতিষ্ঠা পত্তন করেন। আমাদের দেশে ভাগ্যবিপর্য্যয়বশে কয়েকজন কবিকে তাহাই করিতে হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম; দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া তাঁহাকে তাঁহার সাধের দামিন্যা ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল। আমাদের আলোচ্য কবি হেমচন্দ্রের জীবনীপাঠে দেখিতে পাই—তাঁহাকেও জন্মস্থান রাজবল্লভহাট ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃবাসভূমি ছিল উত্তরপাড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়—উত্তরপাড়ার বর্ত্তমান অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন। স্বীকার করিতেই হইবে যে খিদিরপুরে হেমচন্দ্র জীবনের উত্তরকালে অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন; এবং খিদিরপুর হেমচন্দ্রের পুণ্য-স্মৃতি যত্ন-সহকারে রক্ষা করিতেছে; খিদিরপুরস্থ সুরম্য হেমচন্দ্র পাঠাগার তাহার জলন্ত নিদর্শন। আজ কয়েক বৎসর হইল—উত্তরপাড়াস্থ সারস্বত সম্মিলনের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে কবির উত্তরপাড়াস্থ পৈতৃক বাস ভবনের ভিত্তিগাত্রে একখানি প্রস্তর-ফলক সংস্থাপিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সব স্মৃতি-রক্ষার কার্য্যের দ্বারা গুণজ্ঞ ভক্তগণ নিজেদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন মাত্র; মৃত ব্যক্তির তাহাতে কিছু আসে যায় না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় অমর কবি হেমচন্দ্রের বীরবাহু কাব্য। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' বা 'কবিতা-বলী' সাধারণের নিকট যত পরিচিত ও সমাদৃত, বীরবাহু কাব্য ততটা পরিচিত বা আদৃত নয়। তাহার কয়েকটি কারণ আছে। আলঙ্কারিকেরা বলেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। সে হিসাবে কবির বৃত্রসংহারে সকল রসেরই সমন্বয় দেখিতে পাই। বীর ও করুণ রস তাহাতে প্রধানভাবে থাকিলেও বৃত্রসংহারে অন্য রসগুলিরও অভাব নাই। দাম্ভিক বৃত্রের মুখে বীরত্বব্যঞ্জক উদাত্ত গম্ভীর সদর্পোক্তির পাশেই কবি কি অপূর্ব্ব নৈপুণ্য সহকারে 'নিদাঘের ফুল' ইন্দুবালার মুখ দিয়া অনর্গল করুণরস বর্ণনা করিয়াছেন! আর, কবিতাবলীর অনেক কবিতা অনেকবার ছাত্রগণের পাঠ্য হইয়াছে; এ কারণ কবিতাবলীও অনেকের অতি পরিচিত।

কিন্তু বৃত্রসংহার বা কবিতাবলী বা কবির অন্য কাব্যের

তুল্য প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও, 'বীরবাহু-কাব্যে' কয়েকটি লক্ষ্যণীয় জিনিষ আছে। স্বীকার করিতেই হইবে—বৃত্র-সংহার বা কবিতাবলী কবির পাকা হাতের এবং পরিণত বয়সের রচনা হইলেও—ইহাতে শক্তিমান লেখকের রচনা-নৈপুণ্যের ঝলক্ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষিপ্রজলদ বর্ণনা, কষ্টকল্পনার লেশমাত্র নাই; তরল ললিতভঙ্গে আশুগতিতে নানাছন্দে বিবিধঝঙ্কারে কবি বক্তব্য আখ্যান কেমন সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন! স্বদেশ-প্রেমিক কবি গ্রন্থারম্ভেই 'ভারতের জয়কেতুর' পুনরুড্ডয়ন অসম্ভব দেখিয়া মহা আক্ষেপ করিয়া "আর কি সেদিন হবে" ইত্যাদি বলিয়াছেন; হিন্দুদের বর্ত্তমান গৌরবের কিছু বর্ণন করিবার না পাইয়া, শেষে অতীত গৌরবের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পুস্তকখানির বিজ্ঞাপনেই কবি বলিয়া দিয়াছেন—এ কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের সত্যাসত্য অবধারণার্থ ইতিহাসের পাতা ঘাঁটিলে চলিবে না। "উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক"। কবির নিজের কথায় বলিতে গেলে—"পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন"—বীরবাহু কাব্যে তাহাই বর্ণিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অভীপ্সিত বর্ণনায় কবি যতদূর সফলকাম হইয়াছেন, তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিব। আর, তার সঙ্গে লক্ষ্য করিয়া যাইব—নৈসর্গিক দৃশ্যপট বর্ণনে কবি কিরূপ তৎপরতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

গ্রীষ্মকালের প্রভাতের দৃশ্য লইয়াই কাব্যারম্ভ; কবির সূর্য্যোদয় বর্ণনটি কি চমৎকার—

যামিনী পোহায়ে যায়, ভূষা পরি উষা ধায়,
আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পথ সজ্জা করিছে।
অরুণে করিয়া সঙ্গে, অলক্ত লেপিয়া অঙ্গে,
দুই ধারে রাঙা রাঙা ঘনগুলি থুইছে॥
সুধাকরে কোলে করি শ্বেত মাটি দিয়া ধীরি,
মধুমাখা মুখ তার ভাল ক'রে ঢাকিছে।
চন্দ্রের খেলনাগুলি, তারাপুঞ্জ গুণি গুণি,
অঞ্চলের শেষ ভাগে একে একে বাঁধিছে॥
ভূষিতে দিবার রাজা ভাল [illegible] মুক্তা মাজা
শ্যাম ধরাতল বুকে সারি সারি গাঁথিছে।
রঞ্জিতে তাঁহারি মন, প্রমোদিত পুষ্পবন,
তরু 'পরে থরে থরে ফুলমালা বাঁধিছে॥
বিহগ গায়ক তায়, দিবাকর গুণ গায়,
তার সনে তালে তালে সমীরণ নাচিছে।
'জয় দিবাকর' বলি, উর্দ্ধমুখে পুটাঞ্জলি,
পূর্ব্বাননে দ্বিজগণ স্তবধ্বনি করিছে॥

'হেন গ্রীষ্ম প্রাতঃকালে' কনোজের যুবরাজ বীরবাহু মহারাজ রণবীরের নিকট উপবন যাত্রার অনুমতি পাইয়া পত্নী হেমলতাকে সঙ্গে লইতে আসিলেন। হেমলতা এ সংবাদে 'হরষিতা' হইয়া স্বামীসঙ্গে গ্রীষ্ম উপবনে চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা পথে দেখিলেন—

কোথা তরুরাজ, বটের বিরাজ
দেহেতে প্রাচীন পল্লব পরা॥
কোথা মুখ তুলে, তেজে বুক খুলে,
সূর্য্যমুখী চায় ভানুর করে।
কোথা সুশোভন, কামিনীর বন,
খুলে দেয় মন সৌরভ ভরে॥ ইত্যাদি।

বর্ণনাটি খুব সুসঙ্গত এবং সময়োচিত।

তাঁহারা গ্রীষ্ম-কুঞ্জে সারাদিন মনের সাধে বিহার করিবার পর সন্ধ্যাকালে ঘাটের ধারে বসিয়াছিলেন—

হেন কালে যোগিনীর বেশে একজন।
ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন॥

যোগিনীর আকৃতি এবং বেশ-বর্ণন সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর—

মৃগ চর্ম্ম পরিধান, মুখে শিবগুণ গান,
করতলে ত্রিশূলের ফলা।
গলিত জটিল কেশ, মহাযোগিনীর বেশ,
রুদ্রাক্ষের মালাময় গলা॥
শেষ যৌবনের ভরে, দেহ ঢল ঢল করে,
অস্তমান ভানুর তুলনা।

যোগিনী আসিয়া কুমারকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, তুমি উপবনে বামাগণ লইয়া কালহরণ করিতেছ,

আর এদিকে দুর্ব্বৃত্ত যবনগণ হিন্দুর তীর্থগুলি কলঙ্কিত করিতেছে। এমন কি হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র বারাণসীধাম পর্য্যন্ত দুর্ব্বৃত্তেরা অপবিত্র করিয়াছে। আত্ম-পরিচয় দান কালে যোগিনী বলিলেন—তিনি এক রাজকন্যা, স্বয়ম্বর সভায় অম্বরপতিকে বরণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে পতিগৃহে গমনকালে পতিমধ্যে দুষ্ট যবনেরা তাঁহার পতিকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধা করে। অতঃপর কৌশলে যোগিনীর বেশ ধরিয়া পলায়নপূর্ব্বক তিনি আত্মরক্ষা করেন। পরে দেশে দেশে ঘুরিয়া পাষণ্ড যবনের হাতে ভারতের চারিদিকে কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহাই দেখিয়া বেড়ান। যোগিনী আরও সতর্ক করিয়া দিলেন—দুরন্ত যবনদল অচিরে কনোজ আক্রমণ করিতে আসিতেছে,

দেখো যেন পুনর্ব্বার
অই কামিনীরে দুঃখী মোর মত করো না।

যোগিনীর মুখে বর্ণিত অত্যাচার-বিধ্বস্ত ভারতের বর্ণনাটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ বটে; কবি নিপুণতা সহকারে তাহার নিখুঁত ছবিটি আঁকিয়াছেন।

যোগিনীর মুখে যবনদিগের এইসকল কাহিনী শুনিয়া কুমার বীরবাহু দারুণ ক্রোধে প্রজ্জলিত হুতাশনবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাহার সমুচিত প্রতিবিধানে উদ্যোগী হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক দূত আসিয়া কনোজ-রাজকে সংবাদ দিল যে, দুরন্ত যবনদল 'কালান্ত কালের দূত' সাজিয়া দিল্লী, মথুরা, কালিঞ্জর প্রভৃতি জয় করিয়া অচিরে 'কান্যকুব্জ লুটিবারে' আসিতেছে।

তচ্ছ্রবনে মহারাজার চিত্তে ভয়ের সঞ্চার দেখিয়া যুবরাজ তাঁহাকে যে বীরোচিত উৎসাহ বাক্যগুলি বলেন—তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; কুমার এই সঙ্গে একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন—

বীর্য্য যার, ধরা তার বিধির নির্ণয়।
কালে হয় কালে বৃদ্ধি কালে পায় ক্ষয়॥

অতঃপর কুমার পিতার নিকট যুদ্ধযাত্রার অনুমতি চাহিলেন। ক্ষত্রিয় রাজা হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া যুদ্ধে যাইবার অনুমতি দিলেন। অভিমন্যু যেমন তাতঃ সন্নিধানে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি পাইয়া গর্ব্বোৎফুল্ল চিত্তে উত্তরার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন—বীরবাহুও সেইরূপ পিত্রাজ্ঞা লাভান্তে পত্নী হেমলতার নিকট যুদ্ধার্থে বিদায় লইতে আসিলেন। বীরপত্নী ক্ষত্রিয়-বালা স্বামীর যুদ্ধযাত্রায় বাধা দিলেন না, বলিলেন—

যবনে নাশিতে যাবে, জগতে সুযশ পাবে,
এমন সময়ে নাথ কি বলিব তোমারে।

তবে 'গত নিশি শেষ যামে' যে সকল দুর্লক্ষণ দেখিয়াছিলেন সেগুলি স্বামীকে শুনাইলেন। কুমার তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া নিজ 'অঙ্গুলির অঙ্গুরীয় খুলিয়া' 'প্রমদারে পরাইয়া' দিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সেনা লয়ে বীরবাহু হয়ে অগ্রসর।
নেপালের পথে আসি রহিল সত্বর॥

পরদিন অপরাহ্নে রিপু দেখা দিল। যুদ্ধে যবনের জয় হইল। কুমার যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; মহারাজা চিতানলে দেহত্যাগ করিলেন। বীরভার্য্যা হেমলতা সহচরীগণসহ দেহত্যাগ করিতে যাইবার পথে যবনহস্তে—

ব্যাধের জালেতে যেন কাননের পাখী

ধৃতা হইলেন। যবনগৃহে হেমলতার বিলাপ অতি করুণ—

মা বলা ফুরালো মাগো জনম মতন।
এইবার হারালে মা 'অঞ্চলের ধন'॥

* * *

কেন কাঙালিনী-কন্যা না করিলি মোরে।

* * *

হেন পোড়া রূপ দিতে কে বলিল তোরে॥

এইরূপে করুণভাবে বহু বিলাপ করিয়া গর্ভবতী হেমলতা বিষপানে প্রাণত্যাগ করিতে যান, হেনকালে 'সৌদামিনী-স্বরূপা' দিল্লীশ্বরের কন্যা আসিয়া দেখা দিলেন। ভাগ্যদোষে যবন-করে কলুষিতা দিল্লীশ্বর-কন্যা অনেক মিনতি করিয়া বলায় যবনরাজ হুকুম দিলেন—

যে অবধি হেমলতা প্রসব না হবে।
সে অবধি দাসীভাবে পুষ্পোদ্যানে রবে॥

এদিকে বীরবাহু চেতনলাভ করিয়া স্বপক্ষের দুর্দ্দশা-সমূহ স্বচক্ষে দেখিলেন। শেষে, একা ইহার সমুচিত প্রতিবিধানে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া, নৌকাযোগে শ্বশুর কলিঙ্গরাজের দেশ হইতে পুনরায় সৈন্যদল আনিতে চলিলেন। সমুদ্রবক্ষে তাঁহার কাতরোক্তি অতিশয় করুণ। বীরবাহু কোন মতে নিজ প্রাণ রক্ষা করিয়া—

শ্বশুরের পদে করি নমস্কার।
নিবেদিল পূর্ব্বাপর যত সমাচার॥

কলিঙ্গেশ্বর ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। জামাতার প্রার্থনা মত নিজ অগণন সৈন্য তাঁহার হাতে দিলেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে সহসা সমুদ্রবক্ষে প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত হওয়ায়—

যত তরী দল বল, সব গেল রসাতল,
দৈব বল বাদী হয়ে পাড়ে ঘোর অনর্থ॥

ভাগ্যবলে বীরবাহু—'অকূল বারিধি জলে ভাসি ভাসি চলিয়া' এক দ্বীপে উঠিয়া কোন মতে রক্ষা পাইলেন। খানিক পরেই সন্ধ্যা হইল। ক'দিনের কষ্টের পর বীরবাহু তন্দ্রাভিভূত অবস্থায় ছয়জন সুরসুন্দরীর কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। নির্জন দ্বীপে মানবীর বেশে তাঁহাদের ছয়জনকে দেখিয়া কুমার তাঁহাদের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অমনি তাঁহারা তিরোহিতা হইলেন। পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে আবার সেই ছয়জনকে দেখিয়া কুমার তাঁহাদের পরিচয় জানিলেন—তাঁহারা পাতাল-নিবাসিনী ছয় ভগ্নী বরুণ-তনয়া। পরে সেই ছয়জনকে তুষ্টা করিয়া তিনি তাঁহাদেরই সাহায্যে অলৌকিক উপায়ে পুনরায় যবনের রাজধানীতে পঁহুছিয়া মল্লযুদ্ধে যবনরাজকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া যবন-কবল হইতে পত্নী হেমলতার পুনরুদ্ধার করেন এবং হিন্দুরাজন্যবর্গের সহায়তায় যবনকুল নির্ম্মূল করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ষোল মাস পরে পত্নী হেমলতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, প্রাণাধিক নন্দনকে কোলে পাইলেন।

কাব্যখানির মোটামুটি গল্প-ভাগটি এই। এখন ইহার দোষগুণ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ কাব্যখানি কবির তরুণ বয়সের রচনা হইলেও, স্থানে স্থানে যথেষ্ট রচনামাধুর্য্য আছে। কবি কতদূর স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন তাহা সকলেই জানেন। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে ততদিন কবির ভারত-সঙ্গীত কেহ ভুলিতে পারিবে না। কবির বৃত্র-সংহারেও স্বদেশানুরক্তিপূর্ণ কবিতা যথেষ্ট আছে; নিম্নে তাহার কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম—

পরবাসে পরবশ, সদা চিত্তে মলা,
আশ্রয়দাতার মতিগতি বুঝে চলা;
* * *
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই!
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস;
সসর্প গৃহেতে বাস পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার!
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ!

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ 'বীরবাহু'-কাব্য হইতে এইরূপ দু' একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিলাম; এগুলিও কবির স্বদেশপ্রেমের জলন্ত নিদর্শন—

নাহি সে সোণার কাশী পাষাণের বারাণসী,
পাষণ্ডপ্লাবিত হ'য়ে পাপস্রোতে ভাসিছে।
প্রাণ ভয়ে বিশ্বেশ্বর, দেখিলাম স্থানান্তর,
অন্য পুরী নির্ম্মাইয়া গুপ্তভাবে জাগিছে॥
* * *
কোথায় গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব-প্রধান।
কোথা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ মতিমান্॥
বারেক কটাক্ষে হের হস্তিনা-ভবন।
সেই পুরী আজ জয় কৈল মুসলমান॥

যেন কবির প্রাণে সহ্য হইতেছে না!

এবে সেই দেশমান্য ভারত-বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে॥
* * *
বিদায় জনমভূমি জনম মতন।
বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ॥

বিদায় জননী তাত পুরবাসীজন।
বিদায় জনম শোধ প্রাণের রতন ॥

* * *

অন্যত্র—

গৃহবাসে কিবা সুখ, প্রবাসেতে কি অসুখ,
বনবাসে কি যাতনা সেই জন বুঝেছে।

* * *

বীর্য্য বিন্দু আছে যার, সেই জন বুঝে সার,
আছে বা না আছে শোক, ঐ শোক জিনিয়ে।

* * *

মা গো ও মা জন্মভূমি! আরো কতকাল তুমি
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।

* * *

কতই ঘুমাবে মাগো, জাগো গো মা জাগো জাগো,
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যা পুত্র সকলে।

* * *

কাহার জননী হয়ে, কারে আছ কোলে লয়ে,
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ।
কারে দুগ্ধ কর দান, ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহ মাঝে কালসর্প পুষিছ ॥

* * *

ধিক্ ক্ষত্রিয়কুলে, ধিক্ হিন্দু রাজগণ।
একেবারে বীর্য্যবলে দিলে বিসর্জ্জন?
জগৎবিখ্যাত কুলে জন্মিয়া ভারতে,
সমর্পিলে রাজ্য দেশ বিপক্ষ করেতে?
নারিলে বিধর্ম্মিগণে রণে পরাজিতে,
বৃথায় মানব জন্ম লাগিলে হরিতে ॥
থাকে যদি বীর্য্যবল সাজহে সমরে।
হের দুষ্ট ম্লেচ্ছদল আস্ফালন করে ॥

* * *

সেই চন্দ্রসূর্য্যবংশ অবতংস হয়ে।
শান্তভাবে যাপ কাল বৈরি দণ্ড লয়ে ॥
কেন তবে কুরুক্ষেত্রে কর তীর্থ জ্ঞান।
কেন তবে নিজ ধর্ম্মে কর অভিমান?

* * *

কবির 'বৃত্র-সংহার' বা 'কবিতাবলী' প্রভৃতি পরবর্ত্তী রচনায় যে স্বদেশ-প্রীতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার প্রথম অঙ্কুর দেখা যায় এই 'বীরবাহু'-কাব্যে।

রমণীর শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষণ বিষয়ে কবি বিশেষ সতর্ক ও কঠোর বিধানের পক্ষাশ্রয়ী। তাই হেমলতাকে দুরন্ত যবন শুধু স্পর্শ করার জন্যও সাধ্বী হেমলতা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যতা হইয়া বলিয়াছিলেন—

অশুচি যবন, করি পরশন,
ধরিয়া আনিল চুলে ॥

* * *

তোমার মহিষী, তোমার প্রেয়সী,
যেই নারী হতে চায়।
অনুমাত্র দাগ অহে মহাভাগ,
নাহি যেন থাকে তায় ॥

* * *

অকলঙ্ক কুলে কালি রাখিব না আর।

* * *

চিতার দহনে দেহ অশুচি শুধিব।

বীরবাহু সম্বন্ধে স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বলিয়াছেন, "চিন্তা-তরঙ্গিণীর মত এখানিও কবির বাল্য-রচনা হইলেও ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ়; ইহাতে ভাব-সন্নিবেশেরও উৎকর্ষ আছে। * * * দোষাদি সত্ত্বেও অনেক পরিণতবয়স্ক কবি এরূপ কাব্য রচনায় আপনাকে যশস্বী বোধ করিতে পারেন।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় 'বীরবাহু কাব্য' ও 'কবিতাবলীর' সম্বন্ধে বলিয়াছেন "হেমবাবুর কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি এই দুই পুস্তকেও যথেষ্ট পরিমাণেই প্রদর্শিত হইয়াছে।"

কাব্যখানিকে আচার্য্য দণ্ডী বা বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কষ্টিপাথরে কষিলে দেখিতে পাই—কাব্যখানির নায়ক হ'চ্ছেন সুপ্রসিদ্ধ কণৌজের মহারাজার পুত্র, সদ্বংশসম্ভূত ও শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণান্বিত। কাব্যখানিতে প্রভাত, সন্ধ্যা, দিবা, রজনী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সুন্দর বর্ণন, গ্রীষ্মাদি ঋতুবর্ণন, সমুদ্র বর্ণন, গ্রীষ্মবিহার বর্ণন, উপবন বর্ণন, যুদ্ধ বর্ণন, পৃথিবীর বীর, করুণ প্রভৃতি রসের অবতারণা, খলাদি দুষ্টের নিন্দাবাদ এবং শিষ্টের গুণকীর্ত্তন বর্ণন প্রভৃতি অল্প-

বিস্তর সবই আছে। যেখানে যে ছন্দ মানায়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কাব্যখানি নানা ছন্দে রচিত হইয়াছে। বিরহ-মিলনাদিরও বর্ণন আছে। অতএব দেখিতে পাই—যদিও কবি নিজে এখানিকে মহাকাব্য পর্য্যায়ভুক্ত করিতে প্রয়াসী হ'ন নাই; তথাপি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কষ্টিপাথরে কষিলেও এখানিতে মহাকাব্য-লক্ষণ প্রায় সবই দেখিতে পাই। শুধু নাই সর্গ-বিভাগ। আর একটি অভাব—কাব্যখানি 'ইতিহাস কথোদ্ভূত' নয়। স্বীকার করি, বঙ্গভাষায় রচিত কাব্যগুলিকে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কষ্টিপাথরে কষিতে চেষ্টা করা অন্যায়; কারণ, বাঙ্গালা কবিরা (বিশেষতঃ অতি আধুনিকেরা) সংস্কৃত বিধি-নিষেধ মানিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা শুধু দেখাইলাম যে সংস্কৃত কাব্য-লক্ষণও এই কাব্যে বর্ত্তমান আছে।

কাব্যখানি মূলতঃ ইতিহাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে বোধ হয় খুব ভালই হইত। কিন্তু তাহা হইলে আবার কবিকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে হইত। ইংরেজিতে যাহাকে plot বলে সেই ঘটনাসংস্থান হিসাবে গল্পটি তত ভাল হয় নাই, কারণ সব স্থলে ঘটনাসংস্থান বেশ সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, তবে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কাব্যখানি কবির কাঁচা হাতের রচনা; সে হিসাবে খুবই সুন্দর সন্দেহ নাই।

হেমচন্দ্রের প্রবীণ বয়সের রচনায় যে সমুদয় সদ্‌গুণ আমরা দেখিতে পাই সে সমুদয়ের প্রথম উন্মেষ বা প্রথম অঙ্কুরোদ্গম দেখিতে পাই তাঁহার চিন্তাতরঙ্গিণীতে এবং বীরবাহুতে। অনেকে বলেন, হেমচন্দ্রের কবিতায় মাইকেলের প্রভাব বিশেষরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারের কয়েকটি সর্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিলেও, উভয়ের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় অনেক প্রভেদ আছে; আর এ ছাড়া হেমচন্দ্রের রচনার মধ্যে মাইকেলের রচনার অন্য কোন বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। আর এক কথা, পরবর্ত্তী লেখকের রচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনার প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক।

হেমচন্দ্রের রচনায় বাস্তবিক প্রভাব দেখিতে পাই কবি ভারতচন্দ্রের; আর হেমচন্দ্রের রচনায় সব চেয়ে বেশী প্রভাব দেখিতে পাই কবি রঙ্গলালের। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র উভয়েই প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমিক কবি। হেমচন্দ্রের বীরবাহুতে অনেক স্থলে রঙ্গলালের পদ্মিনী বা কর্ম্মদেবীর বর্ণনার ছায়াপাত পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্ত সত্ত্বেও এই কাব্যে হেমচন্দ্রের মৌলিকতার অভাব নাই।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই হেমচন্দ্র নিজের অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বল্প কথায় তিনি অনেক কিছু ব্যক্ত করিতে পারিতেন। রঙ্গলালের মত তিনিও একজন তেজস্বী স্বদেশপ্রেমিক কবি ছিলেন। নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী চিত্রণে, কল্পনার জাল-বুননে, বীর বা করুণ-রসের অবতারণায় বা সারগর্ভ বচন-বিন্যাসে তিনি সতত সিদ্ধহস্ত। কবির করুণ রসবর্ণনার ধারার সুখ্যাতি করিয়া দীনেশবাবু বলিয়াছেন—"আছাড়ি-বিছাড়ি কাঁদিলেই করুণ রস হয় না।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন "হেমবাবু অতি অল্প কথায়, অতিশয় সম্পূর্ণ এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে পারেন। শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই এই ক্ষমতার অধিকারী।" তাঁহার এই সমস্ত ও অন্যান্য অনেক গুণের জন্য সাগরদাঁড়ির কবির তিরোধানের পর সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকেই মহাকবি-সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

কবিতা রচনার একটা প্রধান উপাদান প্রেমের চিত্র অঙ্কন করা। বলা বাহুল্য, হেমচন্দ্র এ বিষয়েও অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। কবির বীরবাহু কাব্যেও আমরা প্রেমের চিত্র যথেষ্ট দেখিতে পাই। প্রেমের চিত্র তো কবিমাত্রেই অঙ্কন করেন; কিন্তু হেমচন্দ্রের রচনা পঙ্কিল কলুষ প্রেমের বর্ণনা-বর্জ্জিত। হেমবাবুর প্রেমের চিত্র বর্ণনা সর্ব্বত্র সংযত, নির্ম্মল, পবিত্র ও পঙ্কিলতাশূন্য। তাঁহার কবিতা পাঠে আমরা দেখিতে পাই—তাঁহার মনের মধ্যে কুটিলতা নাই, পঙ্কিলতা নাই, আড়ম্বরপ্রিয়তা নাই। তাঁহার রচনা যেমন বেগময়ী তেমনি জলদগম্ভীর। তাঁহার বর্ণনায় সরলতা আছে, চপলতা নাই; দেশপ্রীতি আছে, রাজদ্রোহিতা নাই; পবিত্র প্রণয়-বর্ণন আছে, কদর্য্যকলুষ প্রেমের চিত্র কুত্রাপি নাই; প্রচণ্ড বীররসের অজস্র বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতে উন্মাদনা বা উত্তেজনা নাই। ওজোগুণের পুষ্কলতাও হেমচন্দ্রের রচনার একটি প্রধান গুণ।

জাপানের সংবাদবাহী কবুতর

যাদুকর পি, সি, সরকার

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আটলাণ্টিক মহাসাগর পথে একটা জাহাজ বহু ইংরেজযাত্রী লইয়া 'নিউইয়র্ক' গমন করে। পোর্টের নিয়মানুযায়ী জাহাজটা তখনও সমুদ্র-সৈকত হইতে বহুদূরে নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে এবং একদল গোয়েন্দা ও



একটি প্রিয় পারাবতসহ জাপানের বিখ্যাত পারাবত-শিক্ষক মিঃ টারো মাটস্থডা

পোর্ট পুলিশ যাত্রীদিগের 'পাশপোর্ট' প্রভৃতি দেখিতেছিল। পুলিশদিগের কার্য্য শেষ হইলে ডাক্তার সমস্ত যাত্রী ও জাহাজের কর্ম্মচারীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন, তারপর অনুমতি পাইলে জাহাজ 'জেটী'তে পৌছিবে। এ যাবৎ-কাল কাহারও জাহাজ হইতে তীরে যাইবার হুকুম নাই। ডাক্তার ও পুলিশ প্রভৃতির সঙ্গে ক্যামেরাসহ একদল সংবাদপত্র-অফিসের লোকও আসিয়াছে। তাঁহারা বিশেষ সংবাদ গ্রহণ করিয়া ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া সেই দিনকার সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবেন। কিন্তু সেদিন এমন একটা ঘটনা হয়, যে জন্য ঐদিনকার সমুদ্রযাত্রা সর্ব্বত্রই বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। যাত্রীগণ এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ তীরে পৌছিবার পূর্ব্বেই দেখা গেল ঐ জাহাজের কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বেকার বহু প্রয়োজনীয় সংবাদ ও 'ফটোগ্রাফ' সেইদিনকার একটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্দর্শনে সাংবাদিকগণ অত্যন্ত বিস্মিত হন যে, যাদুবিদ্যার ন্যায় ঐরূপ অদ্ভুত ক্রিয়া (Journalistic Scoop) কিরূপে সম্ভব হইল! সমগ্র আমেরিকাব্যাপী এই ভুতুড়ে কাণ্ড লইয়া তীব্র আলোচনা হয়। এক ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের কৃপায় ঐ ঘটনা পুনরভিনীত হইয়া উহার চলচ্চিত্র নিখিল বিশ্বের



সংবাদবাহী পাবাবত রাখিবার গৃহের বহির্ভাগ: পায়রাগুলিকে মুক্ত বায়ুতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে

প্রেক্ষাগারে প্রেরিত হয়—সংবাদ হিসাবে—"কিরূপে এই অদ্ভুত কাণ্ড সম্ভব হইল!"

জাপানী সংবাদপত্রওয়ালারা কিন্তু এই সংবাদ পাঠ করিয়া মোটেই বিস্মিত হয় নাই—কারণ নিউইয়র্কের ঐ

ভাগ্যবান সংবাদপত্রটী যে ভূতুড়ে কাণ্ড করিয়া রাতারাতি সর্ব্বত্র হুলস্থুলের সৃষ্টি করিল, জাপানের টোকিও ও ওশাকার বড় বড় সংবাদপত্রসমূহের উহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কারণ তাহারা জানে উহা সংবাদবাহী কবুতরের সাহায্যে সংঘটিত হইয়াছিল, কোন প্রেস-প্রতিনিধি জাহাজটী সমুদ্রে অবস্থানকালে আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া উহার (ফিল্ম) 'নেগেটীভ' ও সংবাদ কবুতরের পক্ষে বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

বর্ত্তমানে এই সংবাদবাহী কবুতরের প্রচলন জাপানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আমি জাপানে ছিলাম, তখন টোকিওর একটী প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র (Tokyo Asahi Shimbun) অফিসের ব্যবহারের নিজস্ব ৩৫০টী শিক্ষিত পারাবত দেখিয়া আসিয়াছি। আরও জানিয়াছি যে জাপানে মোট ৮০,০০০ আশী হাজার শিক্ষিত পারাবত আছে এবং ২০,০০০ বিশ হাজার সৈন্য-বিভাগে ও বাকী ৬০,০০০ ষাট হাজার সংবাদ-পত্রওয়ালা, মৎস্য-শিকারী, সাধারণ পুলিশ, গ্রাম্য ডাক্তার প্রভৃতির বাড়ীতে আছে।

জাপানের মৎস্য-শিকারীরা তাহাদের মোটর বোট (Motor boat) যোগে সমুদ্রপথে বহু মাইল পর্য্যন্ত মৎস্যের খোঁজে বাহির হয়। যখন তাহারা সমুদ্রমধ্যে কোনস্থানে খুব বেশী মাছের সন্ধান পায়— তখন ঐ কবুতর মারফৎ নিজের দলের অবশিষ্ট লোকের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। এই কবুতর কখন কখন তাহাদের জীবনও রক্ষা করে। কারণ মৎস্য-শিকার করিতে করিতে যখন সমুদ্রপথে শতাধিক মাইল পরিভ্রমণ করিয়া দৈবক্রমে উহাদের নৌকার মোটরযন্ত্র অচল হইয়া পড়ে—তখন (বেতারের ব্যবস্থা না থাকায়) ঐ সংবাদবাহী কবুতরই তীরে বন্ধুবান্ধবের নিকট সংবাদ আনিয়া দেয়। 'সিজুওকা' (Shizuoka Prefecture) অঞ্চলে দেখিয়াছি, প্রসিদ্ধ মৎস্য-শিকারীরা মৎস্যের খোঁজে বাহির হইবার সময় তাঁহাদের এরোপ্লেন মধ্যে ঐরূপ শিক্ষিত পারাবত লইয়া থাকেন। পথে কোন স্থানে মৎস্যের খোঁজ পাইলে, (এরোপ্লেনসহ প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া) তাঁহারা সেখান হইতে সংবাদবাহী কবুতর ছাড়িয়া দিয়া আবার সেই এরোপ্লেনযোগেই সমুদ্রের উপর দিয়া অন্যত্র খোঁজ করিতে থাকেন।

জাপানে সুদূর মফঃস্বলের গ্রামসমূহে যেখানে টেলিফোন, ডাক্তারখানা বা ডাক্তার প্রভৃতির প্রাচুর্য্য নাই—সেখানে গ্রাম্য ডাক্তারগণ ঐ শিক্ষিত পারাবত অনেকগুলি সঙ্গে লইয়া রোগীদের গৃহে গৃহে যাইয়া থাকেন। তাঁহারা রোগিদের 'প্রেস্ক্রপসন' লিখিয়া ঐ কবুতর মারফত ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে টোকিও সহরের নিকটবর্ত্তী 'ফুচু' (Fuchu) সহরের জেলখানার সহিত টোকিও সহরস্থ Procurator's Office-এর সংযোগ এই বার্ত্তাবাহী পারাবতের সাহায্যেই সংগঠিত হইয়াছে। তাঁহারা নাকি পারাবতের সাহায্যেই অঙ্গুলের 'টীপ' সহি ও অন্যান্য document গ্রহণ করিয়া থাকেন।



সংবাদবাহী পারাবত রাখিবার বিজ্ঞানসম্মত ঘরের অভ্যন্তরভাগ

সংবাদপত্র মহলে পূর্ব্বোক্ত টোকিও সহরস্থ সংবাদ-পত্রটীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বার্ত্তাবাহী কবুতরের ব্যবহার

করিয়া থাকেন। তাঁহাদের একজন ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞও নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার নাম মিষ্টার মাট্‌সুডা (Mr. Taro Matsuda). মিষ্টার মাটসুডা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া জাপানের সংবাদবাহী কবুতরের অনেক সংবাদ রাখেন।



যাত্রার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সংবাদবাহী পারাবত



সংবাদপ্রেরণের দু'রকম ব্যবস্থা: লম্বা নলটীতে ফিল্‌ম-ফটো থাকে এবং ছোটটীতে সংবাদ থাকে

তিনি বলেন যে মাত্র ৭ মাস বয়স্ক হইলেই কবুতরদিগকে শিক্ষা দিয়া বার্ত্তাপ্রেরণে নিযুক্ত করা চলে। এক একটী জাপানী সংবাদবাহী কবুতরের বয়স নাকি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু তাঁহার মতে ৮ বৎসর পরই নাকি উহাদিগকে পেন্সন দেওয়া উচিত। বার্ত্তাবাহী পারাবত দিন এবং রাত্রি উভয় সময়েই নাকি চলিতে পারে—(উহা নাকি উপযুক্ত শিক্ষাদানের উপর নির্ভর করে)। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে একটী কবুতরকে ছাড়িয়া দিলে উহার জোড়ার দ্বিতীয়টী বাসায় বন্ধ করিয়া রাখিতে হয় নতুবা ঐটী ঘুরিয়া আসে না। কিন্তু মিষ্টার মাটসুডা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, উহা সত্য নহে। তিনি বহুবার জোড়ায় জোড়ায় ছাড়িয়া দেখিয়াছেন উহারা ঠিক মত ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিম্নে জাপানের বার্ত্তাবাহী পারাবতের কতকগুলি ঘটনার বিবরণ দেওয়া গেল, উহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বিগত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে হাচিজো (Hachijo) দ্বীপ হইতে কবুতর ছাড়া হয় এবং উহা ২৯০ কিলোমিটার রাস্তা ৩৯০ মিনিট অর্থাৎ ৬½ ঘণ্টায় অতিক্রম করে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে টোকিও সহরে সৈন্যদের এক বিরাট্ কুচকাওয়াজ হয়। তখন ১০ই হইতে ১৮ই তারিখের মধ্যে জাপানের বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিস হইতে ১২৯০টী কবুতর ছাড়া হইয়াছিল। উহারা ১,১১১টী ফটোগ্রাফের 'নেগেটিভ' ও ২৮টী সংবাদ বহন করিয়া আনে। কাজেই দেখা যায়, ঝড়বৃষ্টি ও অন্ধকার মধ্যেও শতকরা ৯০টী কবুতর ঠিকমত কাজ করিয়াছিল। অতগুলি কবুতরের মধ্যে মাত্র ১৫১টী ফিরিয়া আসিতে পারে নাই। অবশ্য উহারা পরিশ্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছিল বা শ্যেন পক্ষীর কবলে পড়িয়াছিল বলিয়াই আর ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হয় নাই।



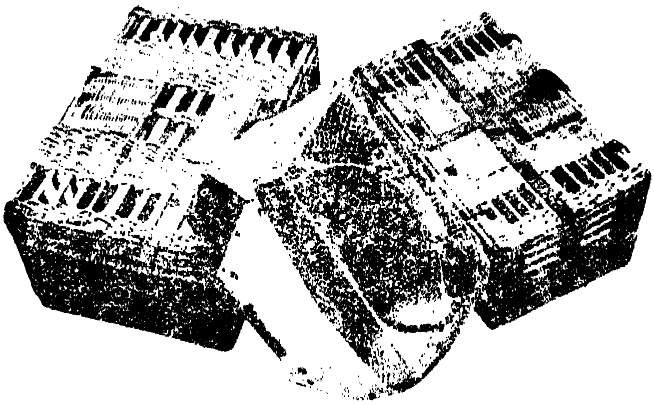
টোকিও আশাই শিমবুন অফিসের সংবাদবাহী পায়রাগুলি দৈনিক 'এক্সারসাইজ' করিতেছে

অনেক সময়ে এইরূপ শ্যেন্ পক্ষীর কবলে পড়িয়া উহারা ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হয় না। শ্যেন্ পক্ষী উহাদের

প্রবল শত্রু আর বহু মাইল উড়িয়া আসিয়া পরিশ্রান্ত শরীর লইয়া শ্যেনের সহিত জয়ী হওয়াও ইহাদের পক্ষে মুস্কিল হইয়া পড়ে। নতুবা ইহাদের ন্যায় দ্রুত উপায়ে চিত্রপ্রেরণের উপায় খুবই কম আছে। জাপানের সংবাদ-পত্র অফিসে উহারা যে কাজ দেয় তাহা এক কথায় বলা অসম্ভব। বৈকালে খেলা-ধূলার সংবাদ প্রকাশ করিবার সময় যে এক মিনিট পূর্ব্বে প্রকাশ করিবে তাহার কাগজেরই নাম বেশী। সেখানে মোটর, ট্রেণ এমন কি এরোপ্লেন অপেক্ষাও অনেক কবুতর শীঘ্র আসে। একবার রেলগাড়ী, মোটর ও বার্ত্তাবাহী কবুতরের প্রতিযোগিতা হয় এবং শুনা যায় যে কবুতরটী এরোপ্লেনকে ৩০ সেকেণ্ডের ব্যবধানে পরাজিত করিয়াছিল। একবার জাপানের সম্রাট্ ট্রেণযোগে ওশাকা অঞ্চলে পরিভ্রমণে বাহির হন। তখন সিজুওকাতে ট্রেণ পৌঁছিলে প্লাটফরমে সম্রাটের ছবি তোলা হয় এবং কবুতরের মারফৎ উহা টোকিওতে প্রেরিত হয়। টোকিওর কর্ত্তৃপক্ষ সেইটী টেলিফটো সাহায্যে 'ওশাকা আসাহী' নামক ওশাকার সংবাদপত্র অফিসে প্রেরণ করেন। সম্রাট্ কিছুক্ষণ পর রেলযোগে ওশাকা পৌছিয়া দেখেন ওখানকার 'নিচি নিচি' সংবাদপত্রে তাঁহার চিত্রসহ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সংবাদলিখিত কাগজটী গুটাইয়া কবুতরের পায়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইত কিন্তু বর্ত্তমানের পদ্ধতি আরও উন্নত। অতিশয় হালকা একটী লম্বা খাপের ভিতরে সংবাদ ও নেগেটিভ ভর্ত্তি করিয়া উহার পিঠের পাখায় বদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এবম্বিধ উপায়ে উহারা ৩½×৪½" (or 9× 12 cm) আকারের নিগেটিভও অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম সহরে এই বার্ত্তাবাহী পারাবতের অধিক ব্যবহার হইয়াছিল। এইরূপ ব্যবহার নাকি সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশেই আবিষ্কৃত হয় এবং পরে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হইয়া থাকে।

জাপানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিগত ১২৫০ খৃষ্টাব্দেও এই সংবাদবাহী কবুতরের ব্যবহার হইয়াছিল, তখন মিনামোতো-নো-ওরিতোমো



উপরের হাল্কা খাঁচাগুলিতে সংবাদবাহী পারাবতকে রিপোর্টারগণ সঙ্গে লইয়া যান

(Minamoto-no-Yoritomo) 'হোজো মাসাকো'র (Hojo Masako) নিকট বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তারপর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ওশাকার ডোজিমা (Dojima) চাউলের বাজারের সহিত দৈনন্দিন সংবাদ রাখার জন্য ইহ অঞ্চলের চাউল-ব্যবসায়ীরা এই সংবাদবাহী কবুতরের ব্যবহার করিত।

স্বাধীন জাপানের কবুতর এখনও স্বাধীনভাবে জাপানের বার্ত্তা বহিয়া বেড়াইতেছে। আর ভারতীয় পারাবত প্রাচীন গৌরবলিপি বহিতে বহিতে ভারতীয় ভাগ্যাকাশে অকস্মাৎ শ্যেন পক্ষীর কবলে পড়িয়াই হয়ত দেহত্যাগ করিয়াছে



খাঁটি বাংলা কাব্য ও কবি

সংস্কারমুক্ত বাঙালী-কবি মধুসূদনকে আমরা প্রধানতঃ রুদ্ররসের প্রবর্ত্তক এবং ছন্দের মুক্তিদাতা হিসাবে ধরিলে—তাঁহার সম্বন্ধে যে অজ্ঞই থাকিয়া যাইব, চৈত্র-সংখ্যা—১৩৪৪-এর 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাসের প্রবন্ধে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। লেখক বলিতেছেন—

"...'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র কবির চিত্তে একটা বড় দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব ছিল—কবির মন যাহা চাহিয়াছিল, প্রাণ তাহা স্বীকার করে নাই। তাই এপিক আকারের তলে তলে অন্তঃশিলা হইয়া লিরিকের ফল্গুস্রোত বহিয়াছে। এই লিরিক-সুর কবির সুপ্ত আত্মারই ক্রন্দনধ্বনি, ইহাকে নিবারণ করা কবির পক্ষে অসাধ্য ছিল। নিজ জীবনের যে নিষ্ফলতা ও নৈরাশ্য তিনি জাগ্রত চৈতন্য হইতে দূরে রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তাহারই রুদ্ধ কাতর ক্রন্দন মহাকাব্যের গীতোচ্ছ্বাসকেও প্রতিহত করিয়াছে। যে কামনা সফল হইবার আশা ছিলনা, যে আদর্শকে সারা প্রাণ দিয়া বরণ করিয়াও জীবনে জয়ী করিতে পারেন নাই, তাহাই তাঁহার প্রাণের নিভৃত কোণে অশ্রুর উৎসরূপে বিরাজ করিতেছিল। রাম লক্ষ্মণ ও বিভীষণরূপী সমাজই জয়ী হইবে, এ যেন তাঁহার নিজ জীবনেরই আক্ষেপ—তাহাদের জয়ী হওয়া উচিত নয়, তবুও হইবে। তাই, তাহাদের প্রতি কবির আক্রোশের অন্ত নাই। মেঘনাদ যখন মরিবেই, তখন তাহাকে অন্যায় যুদ্ধে হত হইতে হইবে এবং লক্ষ্মণকেই সেই হত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত না করিতে পারিলে কবির আত্মা শান্তি মানিবে না। এইজন্যই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' বীররস প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, এবং এইজন্যই তাহা একখানি নকল মহাকাব্য না হইয়া খাঁটি বাংলা কাব্য হইতে পারিয়াছে।"

বিজাতীয় সমাজের প্রভাবে বাঙালার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যচ্যুতি তাঁহার মধ্যে সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াও, গতানুগতিক ভাবপ্রবণতার উপর খড়্গহস্ত হইবার মৌলিক সঙ্কল্প অন্তরকে তাই দিগ্‌ভ্রান্ত করিতে পারে নাই; এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই সত্যসুন্দরবাবু বলিতেছেন—

"...য়ুরোপীয় আদর্শকেই তিনি নিঃসংশয়ে বরণ ও ঘোষণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি বাঙালী-জীবন ও বাঙালী-সংস্কারের মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সীতা-চরিত্রের প্রেরণা-মূলে হিন্দু-সংস্কার জয়ী হইয়াছে; বীরাঙ্গনা প্রমীলাও, বাঙ্গালী গৃহস্থ-বধূর স্নিগ্ধ শোভায়, তাহার সেই উগ্র নারীমহিমার ভাস্বরচ্ছটা সম্বরণ করিয়াছে। ইহার ফলে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বীর চরিত্রগুলিও উন্নত পর্ব্বতচূড়ার মত কঠোর জটিলতা লাভ করে নাই।...এইজন্যই হোমার মিল্‌টন হইতে গিয়াও মধুসূদন বাঙালীর কবি হইয়া রহিলেন।"

উক্ত প্রবন্ধে লেখক মধুসূদন-চরিত্রের সত্যকার রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া মনে করি।

ভারতীয় শাড়ীর প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য

এদেশের প্রবাসী য়ুরোপীয় মহিলাদের মধ্যেও যেমন ভারতীয় শাড়ীর প্রভাব অনুভূত হইতেছে, সাগর ডিঙাইয়া য়ুরোপ পর্য্যন্তও অধুনা ইহার প্রসার পরিলক্ষিত হয়। চৈত্র সংখ্যা ১৩৪৪-এর 'বুলবুল'-এ শ্রীযুক্তা আনোয়ারা চৌধুরী লিখিয়াছেন—

"পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পর্য্যন্ত নারীর যে সব পোষাক আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে শাড়ীই বোধহয় সব চেয়ে সুন্দর।...শাড়ীর সুচারু লাবণ্য ইউরোপ আমেরিকার সৌন্দর্য্যপ্রিয়দেরও মুগ্ধ করেছে। শাড়ী আজ প্রতীচ্যের সৌন্দর্য্যানুভূতিতে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করেছে। রূপসাধনা ও বিলাসিতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র প্যারিসেও শাড়ীর ঢেউ লেগেছে। প্যারিসের সৌন্দর্য্য অনুশীলনকারিগণ নব নব ডিজাইন প্রকাশের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছেন, কারণ সেখানকার অধিকাংশ সুন্দরী সান্ধ্য-পরিচ্ছদের জন্য শাড়ীই আজকাল বেছে নিচ্ছেন।"

উক্ত সংবাদটি আমাদের নিকট অবশ্যই শ্রুতিমধুর, কিন্তু শ্রীযুক্তা চৌধুরী শাড়ীর বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক ভাষার সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন—তাহা সত্যই উপভোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

"শাড়ী-পরিহিতার ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও ভাবধারা শাড়ীর ভাষাতেই পরিস্ফুট হয়। শাড়ী তার মনোভাব ও মানসিক অবস্থার প্রতীক। যখন কোন ধনীর দুলালী আরাম-কেদারায় দেহ এলিয়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন, তখন শাড়ীর উচ্ছলিত ভাঁজগুলো তার সুঠাম তন্বী দেহের চারিপাশে লুটিয়ে পড়ে' তার অলস শৈথিল্যের পরিচয় দেয়। আবার যখন কেউ চিন্তাম্লানমুখে কখনো তার সুরক্তিম চিবুক হাতের তালুর উপর ন্যস্ত করে, কখনো বা আনমনে শাড়ীর প্রান্ত আঙুলে জড়াতে থাকে তখন তার উদাস অন্যমনস্কতা প্রকাশ পায়। নারী যখন ক্রস্তে ক্রীড়ারতা অঙ্গন ছেড়ে গ্রীবা হেলিয়ে, সুবঙ্কিম ভঙ্গীতে উঠে' দাঁড়ায় তখন সে অবস্থা তার ক্রোধের পরিচায়ক। ব্রীড়ানতা

বধূর অঞ্চলই লজ্জাভরণ। লজ্জিতা সে যখন আপনাকে তার রেশমী আবরণে ঢেকে ফেলে তখন সেই গুণ্ঠনের অন্তরালে তার অশ্রুসিক্তা মুখ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে।”

সাহিত্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন বলিয়া আশা করি।

স্বদেশীয় খাদ্যের উপকারিতা

বিদেশীয় সভ্যতার প্রভাবে আচার, ব্যবহার, চাল-চলন বদলাইবার সাথে সাথে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণেও বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। জলখাবার হিসাবে এবং ভদ্রতারক্ষার আড়ম্বর হিসাবে চা-বিস্কুট যেন ছেলে-বুড়া সকলেরই মধ্যে উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বিজাতীয় খাদ্য বিস্কুট প্রভৃতি অপেক্ষা চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি যে কত উৎকৃষ্ট ও বলকারী—বৈশাখের (১৩৪৫) “ভারতবর্ষে” আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

“নিম্নের তালিকায় চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুটের পরীক্ষার ফল প্রদত্ত হইল :—

প্রতি ১০০ গ্রাম (৯ তোলা) দ্রব্যের কত ইউনিট			প্রতি ১০০ অংশ কত অংশ
	ভাইটামিন বি১	ভাইটামিন বি২	ডেক্‌ষ্ট্রিন
লাল চিড়া (কাঁচা)	৩৪·৫	১৮·৫	১·৫
„ (ভাজা)	৩৪·৪	৭·৫	৪·১
সাদা চিড়া (কাঁচা)	২২·৫	১২·৫	১·৭
„ (ভাজা)	১৮·৫	৭ ৫	২·৮
মুড়ি	১৪·৫	১১·০	৬·১
খই	১৩·০	১৪·০	৫ ৭
বিস্কুট	১২·০	১১·১	১·৯

উল্লিখিত তালিকাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি—চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি প্রত্যেক সামগ্রীতেই বিস্কুট অপেক্ষা ভাইটামিন বি১ বেশী আছে; খই এবং কাঁচা চিড়াতে ভাইটামিন বি২ বিস্কুটের চেয়ে বেশী এবং মুড়ি, খই ও ভাজা চিড়াতে বিস্কুট অপেক্ষা অনেক বেশী ডেক্‌ষ্ট্রিন বিদ্যমান। ঈষৎ ভাজা চিড়া মুখরোচক, উহাতে ডেক্‌ষ্ট্রিনের পরিমাণও বেশী, অথচ উহাতে ভাইটামিনেরও বেশী অপচয় হয় না।”

চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতাই কেবল নহে, বিস্কুট প্রভৃতি হইতে ঐ সকল খাদ্য যে কত সস্তা—আচার্য্য রায় সুন্দরভাবে তাহাও দেখাইয়াছেন—

“২ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ ছটাক ওজনের বিস্কুটের দাম দেশী হইলে ১।৶০—১॥০ বিলাতী হইলে ১৸০ হইতে ২৲, টিনের দাম ৶০—।০ তো একেবারেই অনর্থক; এখনও অনেক বাড়ীতে মুড়ির চাউল প্রস্তুত হয়, চিড়া, খইও অনেক স্থলে বাড়ীতে তৈয়ারী হইয়া থাকে। চৌদ্দ ছটাক মুড়ির চাউল ঘরে তৈয়ারী করিলে উহার দাম বড় জোর ৶০ আনা পড়ে এবং উহা বালি খোলায় ভাজিয়া লইলে গরম গরম অতি উপাদেয় মুখরোচক মুড়ি প্রস্তুত হয়। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি ২ পাউণ্ড বিস্কুট ও ২ পাউণ্ড মুড়ির দামের পার্থক্য ১৲ হইতে ১॥০ পর্য্যন্ত; সুতরাং খাদ্যোপযোগিতার (food-value) দিক্ হইতে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, তদ্ভিন্ন পয়সার দিক্ হইতেও আমাদের ঘরের তৈরী চিরপ্রচলিত ও চির-আদরের জলখাবারগুলি বিস্কুটের চেয়ে অনেক বেশী সস্তা।”

আমরা উল্লিখিত বিষয়ে আচার্য্যদেবের মতামত পাঠকপাঠিকানির্ব্বিশেষে ভাবিবার ও প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়বস্তু হিসাবে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানে ভারতের স্থান কোথায়?

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্য এখানে কাঁচা মাল ও পশুজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য বিস্ময়জনক। অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার সদ্ব্যবহার করা বর্ত্তমানের উন্নত-ভারতে কতটা সম্ভব—তাহা স্বপ্নের মত মনে হইলেও, এ-বিষয়ে পাশ্চাত্যের উদ্যমশীল প্রতিভার চমকপ্রদ নিদর্শন অস্বীকার করিবার নহে। “সংহতি”তে “কঃ পন্থাঃ” শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন—

“ক্ষেতের শস্য কিরূপ হয়, তাহার সহিত, কিছু খনিজ সম্পত্তি আর পশু হইতে প্রাপ্ত সামান্য দু' একটি বস্তু মিলিলে কি অসম্ভব ব্যবসা চলে তাহার ধারণা আমাদের কাহারও নাই। আমরা যে মোটর গাড়ী দেখিতে পাই, তাহাতে যে কৃষিজাত দ্রব্যের কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তাহা আমরা মনে করি না। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহার প্রতিখানিতে বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক অনেক পরিমাণ শস্য রূপান্তরিত করিয়া লাগাইয়াছে। Sir Haroll Hartley একটা মোটামুটি হিসাব করিয়াছেন যে দশ লক্ষ ফোর্ড গাড়ী নির্ম্মাণ করিতে ৮ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড তুলা, ৩ কোটি পাউণ্ড ভুট্টা, ২৪ লক্ষ গ্যালন তিসির তেল, ২৫ লক্ষ গ্যালন ঝোলাগুড় (molasses), ২০ লক্ষ পাউণ্ড সয়াবীনের তেল, ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ছাগলোম (mohair), ৩২ লক্ষ পাউণ্ড পশম, ১৫ লক্ষ বর্গ ফুট চামড়া, ২০ হাজার শূকরের চর্ব্বি এবং লোম লাগে। রবার, লোহা, কাচ প্রভৃতি অনুপাতের প্রয়োজনে লাগে।

প্রথম কয়েকটি প্রয়োজনীয় বস্তু শস্য হইতে প্রাপ্ত। সায়বীন ছাড়া, উহার সকলগুলিই ভারতে পাওয়া যায়। রবার, লোহা তো আছেই, কাচেরও প্রায় সকল উপাদানই ভারতে আছে। কিন্তু আমরা কি সেদিকে মনোযোগ দিয়া থাকি?”

বর্ত্তমান সভ্যতার ক্রমবর্দ্ধমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগমনের যুগে কৃষিপ্রধান ভারত এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবে—তাহা বাস্তবিকই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

স্বর্গচ্যুত

(গল্প)

শ্রীদেবব্রত ঘটক

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম:

যেন মরণের ডাক আসিয়াছে।

পৃথিবীর মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া, অন্তরের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া, সুন্দর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন করিয়া ও-পারের উদ্দেশে রওনা হইলাম।

যে কয়টা দিন পৃথিবীতে ছিলাম, পাপ কোনোদিন তার মোহময় স্পর্শে আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। ক্রোধ, হিংসা, লোভ, লালসা জয় করিয়াছি;—সত্যব্রত এবং পুণ্যাত্মা ছিলাম। আপনার অধিকারে স্বর্গে আসিয়াছি।

স্বর্গ সম্বন্ধে কত কি শুনিয়াছি, এখানে চির-বসন্ত,—সৌন্দর্য্যময় স্থান। ঘৃণিত কোলাহল, স্বার্থের সংঘাত নাই। স্বর্গ লইয়া কত খেলা, কত স্বপ্ন! এখানে আসিয়া সত্যই অবাক্ হইয়া গেলাম।

এখানে দিনরাত্রির প্রভেদ নাই—সর্ব্বদাই একটা অদৃশ্য শক্তি আলো বিকীরণ করিতেছে। গাছে গাছে ফুল, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল। একটী মাত্র নদী মৃদু-মধুর কলতানে স্বর্গ-রাজ্য পূর্ণ করিয়াছে। একটী মাত্র সূক্ষ্ম পথ ওই দেশের বুকের মাঝ দিয়া গিয়াছে- তারই পাশে একটু দূরে কয়েকটী সুসজ্জিত গৃহ।

দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া শুধু দেখিতেছিলাম। একজন আসিয়া খুব মিষ্টি হাসিয়া আমার হাত ধরিল। বলিল—তুমি এখানে কতক্ষণ হ'ল এসেছ?

—কিছুক্ষণ।

সে বলিল—তুমি তো নতুন এসেছ, চল তোমায় আমাদের দেশটা দেখিয়ে দিই। দেখো তোমার খুব ভাল লাগবে।

আমি বলিলাম—পরে তোমাদের দেশের রূপ দেখব। আগে এদেশের লোকের সাথে তুমি আমায় পরিচিত করে দাও না?

—রূপ দেখ্‌বে পরে? বলিয়া সে হাসিল—দেশের অধিবাসীদের সাথে পরিচিত হলেই সে-দেশের রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তোমায় চিনিয়ে দি'—

কিছুক্ষণ হাঁটিয়া যাইবার পর, ছোট একটা বাড়ী দেখিতে পাইলাম। ভারী চমৎকার সে বাড়ী। দালান নয়। রং দেওয়া কাঠের একতলা বাড়ী। সমুখে সামান্য একটু ফুলের বাগান। একজন লোক বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। প্রশ্ন করি—কে এ?

সে বলিল—এ কিছুদিন আগে মর্ত্ত্যেই ছিল—আরও কিছুদিন সেখানে ও থাক্‌তে পার্‌ত। শোন তবে এর ইতিহাস বলি: একদিন ও নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটু অন্যমনস্ক, হঠাৎ তার কাণে এল একটা করুণ আর্ত্তরব। মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল—প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে একটা ক্ষুদ্র শিশু ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে পড়ছে আর তীরে তার মা—পথের ভিক্ষুক—অসহায়ভাবে চীৎকার কর্‌ছে।

শুদ্ধ হইয়া বলি—তারপর?

—সেখানে আর কেউ ছিল না। মায়ের বুক-ফাটা কান্নায় আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হচ্ছিল। মুহূর্ত্ত মাত্র ভেবে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিশুকে বাঁচাল, কিন্তু পরিবর্ত্তে দিতে হল তার নিজের প্রাণ। মৃত্যুর পর তাকে ঈশ্বরের কাছে আনা হল। সে ছিল মদ্যপ, অসচ্চরিত্র। পৃথিবীতে সবাই তাকে ঘৃণা করত। কিন্তু ঈশ্বর তাকে চিরকালের জন্য স্বর্গবাসের অনুমতি দিলেন।

আনমনে তার সাথে পথ চলি। কিছুদূর আসিবার পর আর একটী গৃহে সবল, সুন্দর একটী লোকের দেখা পাইলাম। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল—এই যে লোকটা দেখছ না? এর দেশের সাথে অন্য একটা দেশের যুদ্ধ হয়। এর সব কিছু ছিল—ধন, মান, প্রেম সব কিছু। কিন্তু সমস্ত পরিত্যাগ করে' সে চলে' যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। সেখানে হয় তার মৃত্যু। বেঁচে থাকলে পৃথিবীর বুকে সদর্পে বিচরণ করতে পারত, অনেক কিছুই সে হতে পারত। কিছুই সে হল না। মৃত্যুর পরে সে এল এই দেশে।

আরও কিছুদূর চলিবার পর আর একটী লোকের দেখা পাইলাম।

সে বলিল—স্বর্গের মাঝে এই হচ্ছে সব চেয়ে হাসি-খুশী লোক। পৃথিবীতে থাকতে এ কাউকে ঘৃণা করেনি, দুঃখ দেয়নি, ঈর্ষ্যা করেনি। মানুষকে ভাই বলে বুকে টেনেছে, ভালবেসেছে। পৃথিবীর সবাইকে সে ভালবাসত, তাই সে ঈশ্বরের এত প্রিয়।

এইবার অনেকদূর হাঁটিতে হইল। নদীর ধারে লতা পাতা দিয়া ঘেরা—ফুলবাগান মাঝে—ছবির মত ছোট্ট একটা গৃহ।

তাকে প্রশ্ন করি—একে তো একটু অন্যরকমের মনে হচ্ছে ভাই।

সে একটু হাসিয়া উত্তর দিল—হ্যাঁ, এ কবি।

—কবি? স্বর্গে কেন? এঁর কি মৃত্যু হয়েছে?

—শোন। কবি তার গানে, ছন্দে, সুরে পৃথিবীকে সুন্দর করতে চেয়েছে। যা কিছু সুন্দর, মধুর, নির্ব্বিচারে কবি তাকে ভালবেসেছে—সে তার কবিতায় অপার্থিব মহান্ ছবি এঁকে সবাইকে দেখিয়েছে। পৃথিবীকে সে ফুল, মলয় আর সোণার কাঠি দিয়ে জাগাতে চায়নি—কবি তার বাঁশীতে আগমনীর গান গেয়েছে। সবাইকে সে পবিত্র আর সুন্দর করতে চেয়েছে, তাই মৃত্যুর পরে তার মৃত্যুহীন জীবন।

কবির কুটীরের পাশেই আর একটী সুসজ্জিত গৃহ দেখিলাম। প্রত্যেক স্থানেই মাত্র একটি পুরুষকেই দেখিয়াছি—এইবার তার ব্যতিক্রম হইল। এখানে দেখি নর এবং নারী।

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াই অবাক্ হইয়া গেলাম। একে যে আমি চিনি। পৃথিবীতে আমার বাড়ীর পাশেই ছিল তার বাসস্থান। আমি উদয়কে চিরদিন এড়াইয়া গিয়াছি, তার মুখ দেখিলেই আমি ভয় পাইতাম। হত্যা করিতে সে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না। নরপিশাচ,—বৃদ্ধ পিতাকে সে অর্থের জন্য হত্যা করিয়াছে। যে কোন অন্যায় কাজ সে দ্বিধা না করিয়া সম্পন্ন করিতে পারে। ক্রূর, হিংস্র, বিশ্বাসঘাতক—সে আসিল স্বর্গে?

আমার সঙ্গীটি বলিল—উদয়ের স্বর্গবাস নিয়ে সেবার একটু গোলমাল হয়েছিল। চল, যেতে যেতে বলছি।

পথ চলিতে চলিতে সে বলিল—উদয়কে যখন ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করা হল, পৃথিবীতে তার পাপকার্য্যের একটানা তালিকা দেওয়া হল। সে অস্বীকার করলে না। ঈশ্বরের বন্ধুরা গর্জ্জে উঠলেন—অনন্ত নরক-বাস!

ঈশ্বর কিন্তু চুপ করে রইলেন—তুমি কি সামান্য একটা সৎকাজও করনি?

উদয় স্তব্ধ হয়ে রইল।

—বল উদয়, একটা পুণ্য, একটা কাজ—যা সৎ না হ'তে পারে, কিন্তু যা পাপ-শূন্য?

উদয় বলে—ঈশ্বর, পৃথিবীতে আমি একটাও ভাল কাজ করিনি। যা করেছি, সবই স্বার্থের জন্য। কিন্তু একটা কাজ আমি স্বার্থ-শূণ্য, নিষ্পাপ-প্রাণে করেছি। জানি না তা' ভাল কি মন্দ। একটা নারীকে আমি ভালবেসেছি।

ঈশ্বর তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং স্বর্গবাসের অনুমতি দিলেন।

সে আমাকে ততক্ষণে ঈশ্বরের কাছে লইয়া আসিয়াছে। বন্ধু বলিল—ঈশ্বর, একে স্বর্গবাসের অনুমতি দিন।

—না।

—কেন?

—এ এমন কোন কাজ করেনি, যার জন্যে স্বর্গে থাকবার দাবী করতে পারে।

সে বলিল—কেন, কোন অন্যায় তো সে করেনি? ঈশ্বর বলিলেন—কিন্তু কোন ন্যায় কাজও তো করেনি। নিজেকে নিয়েই সে মত্ত ছিল, স্বার্থপরের মত ধর্ম্মকর্ম্ম করেছে। সে অন্য কারও পানে তাকায়নি।

তারপরে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি কাউকে নীচ থেকে ওপরে তুলেছ?

অধোমুখে বলি—না।

—কাউকে ভালবেসেছ?

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।.........

*　　　*　　　*

ভোরের ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া কাণে আসিয়া বাজিল। পাখীর ডাকে ধরণীর প্রেমের আহ্বানই যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে!

শ্রীমন্দির

শ্রীমতিলাল রায়

১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বর্ত্তমান শ্রীমন্দির ৺দেবীচরণ সরকারের কোন এক বংশধর বিশ্বনাথ সরকারের পত্নী গৌরমণি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমান ১২২৫ সালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছিল। তাহার অনেক পরে মূলাজোড়ের নবরত্ন কালীমন্দির নির্ম্মিত হয়। অতএব দেখা যায়—চন্দননগরের এই শ্রীমন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-কাল আনুমানিক উক্ত হইলেও, ইহা একেবারে অনুমান নহে। এই ধ্বংসপ্রায় শ্রীমন্দিরটির পুনঃসংস্কার-কালে ইহার গাত্রে যে স্মারক-লিপি ছিল, ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই নবরত্ন মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়া যে দুইটি পঞ্চরত্ন মন্দিরের সহিত দশটি শিবমন্দির গড়া হইয়াছিল, তাহার প্রায় সবখানি ধ্বংস-যজ্ঞে আহুতি পড়িলেও, ইহাদের মধ্যে যে ৪টী শিবমন্দির এখনও টিকিয়া আছে, তাহাদের অঙ্গ হইতে স্মারক-লিপি এখনও সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায় নাই। তাহা হইতেই দেখা যায়—কেন্দ্র-মন্দিরটী নির্ম্মিত হওয়ার পরে, বৎসরের পর বৎসর এক একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা একটী মন্দিরের স্মারক-লিপি হুবহু যেরূপ আছে, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। এই মন্দিরটি কেন্দ্র-মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত—অক্ষরগুলিতে প্রাচীন বর্ণমালার পরিচয় মিলে, "প্রবর্ত্তকে" ইহার ব্লক পাঠকদের দেখিতে অনুরোধ করি। স্পষ্ট বালি-সিমেণ্টের অক্ষরে লেখা আছে—"শ্রীশ্রীপরাম্ব রামেশ্বর", তন্নিম্নে লিখিত আছে "৺কেশ্বনাথ সরকারের শ্রীশ্রীমতী গৌরমণি।" তাহার নিম্নে তারিখ স্পষ্টাক্ষরে দেখা যায়, "শকাব্দ ১৭৪৩। সন ১২২৮ সাল।"

শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দিকে মন্দির-নির্ম্মাণের কাল ১৭৭৪ শক, সন ১২২৯। ইহাতে অনুমান হয়, কেন্দ্র-মন্দির নির্ম্মাণের পর বাম ভাগ হইতে ৬টী মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিয়া, দক্ষিণ ভাগের মন্দিরগুলি সমাপ্ত করা হইয়াছিল। এই হেতু কেন্দ্র-মন্দিরটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য ১২২৮ সালের পূর্ব্বে যে হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৪টী ভগ্ন শিবমন্দির ও শ্রীমৎ নরসিংহ দাস বাবাজী কর্ত্তৃক নব-সংস্কৃত কেন্দ্র-মন্দিরটী এবং তৎ-সংলগ্ন গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আয়ত্তাধীনে আসে। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে—শ্রীশ্রীবোড়াইচণ্ডীতলার বিখ্যাত শ্মশান আজি যেরূপ মিউনিসিপ্যালিটীর আইনে সীমাবদ্ধ, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। বর্ত্তমান কুণ্ডুর ঘাট হইতে বোড়াইচণ্ডীতলার ঘাট পর্য্যন্ত মহাশ্মশান ছিল। অনূ্যন ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও আমরা কুণ্ডুর ঘাটে শব-দাহ হইতে দেখিয়াছি। দ্বাদশ মন্দির-সংযুক্ত এই প্রায় ৭৫ ফুট সমুচ্চ সুবৃহৎ মন্দির সংস্থাপিত হইলে, শ্মশানক্ষেত্র দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যায়। এই মহাশ্মশানের উপরেই পঞ্চমুণ্ডীর আসন নির্ম্মাণ করা হয়। উপরে যে কেশ্বনাথ সরকারের নাম উক্ত হইয়াছে, উহা বিশ্বনাথ সরকার হইবে। মন্দির মেরামত কালে "ব"-য়ে আঁকুড়ি পড়িয়া "ক" হইয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বের "ই-কার" 'এ-কারে' পরিণত হইয়াছে—ইহা সহজেই বুঝা যায়। এই বিশ্বনাথ সরকার চন্দননগরের আদিম অধিবাসী, প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী দেবী সরকারের পুত্র। দেবী সরকারের মৃত্যুর পর বিশ্বনাথ সরকার প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকে গমন করেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী গৌরমণি—সকলেই তাঁহাকে "কনে-বৌ" বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি তাঁর তান্ত্রিক গুরুর অভীপ্সিত এই মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরনির্ম্মাণে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। দেবালয়-পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ সম্পত্তিও তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন। শুভ্রশিবমূর্ত্তির উপর প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি। হীরকাদি-রত্ন-খচিত বহুমূল্য অলঙ্কার তিনি দেবীর অঙ্গ-সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। কালে বিগ্রহের অঙ্গ হইতে তাঁহার কোন এক উত্তরাধিকারী অলঙ্কারাদি

উন্মোচন করিতে গিয়া দেবীর একখানি হস্ত ভগ্ন করিয়া ফেলেন। তাহার পর যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। দেববিগ্রহের চিহ্ন নাই। উৎকৃষ্ট কষ্টিপাথরের দ্বাদশ মন্দিরের সুন্দর শিবলিঙ্গগুলি কতক ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়াছে, কতক অপহৃত হইয়াছে। একটী লিঙ্গমূর্ত্তির ত্রিখণ্ড ভগ্নাংশ আমরা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। এক হইতে অন্যের হস্তান্তরিত হইতে গিয়া ৮টী মন্দির একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে শ্বেত প্রস্তরের যে বেদী ছিল, তাহারও চিহ্নমাত্র নাই। এই শূন্য মন্দির লইয়া আমরা কি করি ভাবিয়া পাই নাই

শ্রীমন্দিরের সাধারণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার উপকরণ হয় তো মিলিবে, তাহার সময়ও আছে। আমি ইহার অধ্যাত্ম ইতিহাস লিখিব। কেন না, ইহা অবগত হওয়ার সুযোগ আমি পাইয়াছি। এই মন্দিরের পূর্ব্বে খরস্রোতা ভাগীরথী। উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত ক্ষেত্রে বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি অন্য বনস্পতি। সম্মুখে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি একা শ্রীমন্দিরে বসিয়া ভাবিয়াছি—ইহার ভবিষ্যৎ। কত প্রাবৃটের ঘনঘটার গুরুগর্জ্জনে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমন্দিরের চূড়ার কোটরে অসংখ্য পেচকের বিকট রব শুনিয়া কাণে তালা ধরিয়াছে। ভাবিতে বসিয়া কুল-কিনারা পাই নাই। ঘুমাইয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি। আত্মসমর্পণ যোগ-মন্ত্রে দীক্ষিত জীবন—প্রতিমাপ্রতিষ্ঠার কল্পনায় বিচলিত হইয়াছে। দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

সাধনার পথে অনেক অতীন্দ্রিয় দর্শন হয়। অসংখ্য প্রকার বিভীষিকাও দেখিয়াছি। কিছুই আমলে আনিতে ইচ্ছা হয় নাই। যাহা সার্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে না, তাহা ব্যক্ত করিয়া অন্যের কৌতূহল-বৃদ্ধি শুধু আত্মপ্রসাদ—এই বিষয়ে আমি খুবই সতর্ক এবং অপ্রাকৃত দর্শন ও অনুভূতির কথা ব্যক্ত করাও আমি কোনদিন শ্রেয়ঃ মনে করি না। অনেক ক্ষেত্রে ইহা সত্য হইলেও, ঘৃণিত মিথ্যা ইহাতে প্রশ্রয় পায় বলিয়া, এই সকল কথা অন্যে প্রকাশ করিলেও, আমি তাহা পছন্দ করি না। এই শ্রীমন্দির সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় অনুভূতির কথা কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই।

আমি তিন দিন এক বিকট পুরুষের সাক্ষাৎকার পাই। শতাব্দীর অধিক শ্রীমন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইলেও, মাত্র দশ বৎসর কালের মধ্যেই মন্দিরের পূজাদি ব্যাপার সমাপ্ত হইয়াছে। ধ্বংসের ঘূর্ণিপাকে কয়েকটী ইষ্টকস্তূপ মাত্র ইহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিত। অরণ্যপরিবেষ্টিত এই মন্দিরে দীর্ঘদিন মানুষের বসবাস ছিল না। ইহা নিশাচর প্রাণীর আবাস হইয়া উঠিয়াছিল। দস্যু-তস্করের ইহা নিবাসভূমি হইয়াছিল। প্রেতপুরী বলিয়া এই মন্দির-ভূমি আতঙ্কের কারণ হইয়াছিল। একটা ভয় সম্মুখস্থ পথিপার্শ্বে বিপুল বটবৃক্ষে জড় হইয়া মানুষের মনকে সন্ধ্যারাত্রেই আতঙ্কিত করিয়া তুলিত। এক রাত্রে আমি মন্দিরে বসিয়া দেখিলাম—এক বিকট মনুষ্যমূর্ত্তি। প্রথম ভাবিয়াছিলাম স্বপ্ন; তারপর চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম—স্বপ্ন নয়, সত্য। কিন্তু সে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভাবিলাম, দস্যু তস্কর হইবে। তারপর আর এক রাত্রির কথা। সে দিন নিদ্রিতাবস্থায় মনে হইল—আমার বুকে কেহ চাপিয়া বসিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম—ইহাও স্বপ্ন নহে; সত্য। সেই কদাকার মূর্ত্তিটা হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিতে উদ্যত হইয়াছে। অদূরে আমার এক সহযোগী বন্ধু নিদ্রা যাইতেছিল। কিন্তু চীৎকার করার পূর্ব্বেই আমার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরায়, আমি নিরুপায় হইলাম। প্রাণরক্ষার দায়ে একটা মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এখনও শ্রীমন্দিরকে ঘিরিয়া অসংখ্য পেচক বাস করে। সে দিন শ্রীমন্দির ঘিরিয়া অট্টালিকা-শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। নীরব নিশীথে অন্ধকার কক্ষে আমার এই মল্ল-যুদ্ধ জমাইতে শত শত পেচকের কণ্ঠে বিকট চীৎকার উঠিল। কি অসাধারণ শক্তি যে অনুভব করিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না। সে পুরুষ অতি কৌশলে যেন নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, অদৃশ্য হইয়া গেল। এ কথা আমার সহযোগীদের পরে জানাইয়াছিলাম।

তারপর, আর এক সন্ধ্যারাত্রির কথা। সে দিন এই বিকটাকার পুরুষকে প্রভাবহীন মনে হইল। সে কথা বলিল; উত্তরও দিলাম; কিন্তু শব্দ নহে, অনুভূতির চেতনায়। সে আমায় মন্দির ছাড়িয়া যাইতে বলিল। এ মন্দিরের অধিকারী সে। আর কাহাকেও সে স্থান দিবে না।

শতাব্দী কালের এই অধিকারীর উপর আমার বাদ সাধিতে আসা সে পছন্দ করে না। এ মন্দির সে-ই শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, আমাকেও সে ব্যর্থ করিবে। সাজ্ঘাতিক অনুভূতি! কিন্তু শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আমার জিদ ইহাতে আরও বাড়িয়া গেল। তাহার পর এ মূর্ত্তির আর সাক্ষাৎকার পাই নাই। অতঃপর কেবল শুনিতাম—মহামন্ত্র-ধ্বনি। মন্দিরের নিম্নতল হইতে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিয়া তাহা সমগ্র মন্দিরকে মুখরিত করিতেছে। প্রতিদিন রাত্রি চতুর্থ প্রহরে এইরূপ হইতে লাগিল। আমার এক সহযোগী শিষ্য ও বন্ধুকে সঙ্গে রাখিয়া, তাঁহারও এই একই অনুভূতির কথা শুনিয়া আর সংশয় রহিল না। মন্ত্রধ্বনি গুরু-গম্ভীর নাদে আমাদের হৃদয় মন পুলকিত করিল। স্থির করিলাম—এই মন্দিরে অন্য কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিব না। শব্দ-ব্রহ্ম মহা প্রণব রক্ষা করিব। উপাসনার কণ্ঠে পূজা-আরাধনা সম্পাদিত হইবে।

শ্রদ্ধেয় দেশবরেণ্য ডাঃ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণবের আধারস্বরূপ এক রজত কলসের পরিকল্পনা দিলেন। এই রজত কলসের বক্ষে স্বর্ণাক্ষরে প্রণব লিখিত হইল। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দের অক্ষয়া তৃতীয়ায় মহাধুমধামে মন্দিরবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু সপ্তশতী হোম পূর্ণাঙ্গ হইল না। কোন এক বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় ইহা বন্ধ হইয়া গেল। গুরু, পুরোহিত, অভ্যাগত বহু জন অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন। আমি নির্ভয়। ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত প্রাণ আমি জানি "ন মে ভক্তঃ বিনশ্যতি।"

মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত বেদীর তলে সস্ত্রীক উপবেশন করিয়া যখন ঊর্দ্ধলোক হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশক্তির অবতরণ-মাধুরী লক্ষ্যে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম—এই মহাতীর্থ-রক্ষার সাধ্য গৃহীর নাই, আছে সন্ন্যাসীর। পঞ্চ-মুণ্ডীর আসন ঘিরিয়া পঞ্চ সন্ন্যাসীর ত্যাগবৈরাগ্যপ্রদীপ্ত শ্রীমূর্ত্তি লক্ষ্যে পড়িল, আমি শিহরিয়া উঠিলাম, সে অনুভূতির কথা অপ্রকাশ রাখিলাম।

বর্ষে বর্ষে অক্ষয়া তৃতীয়ায় উৎসবের ধুম চলিতে লাগিল। শ্রীমন্দিরের উত্তর কোণে একটী বিল্ববৃক্ষ ছিল। তাহার তলদেশে ধুনি জ্বলিল। আত্মাহুতির মন্ত্রে দিবারাত্রি শ্রীমন্দির মুখরিত হইতে লাগিল। ইহার পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছিল এক তরুণ সঙ্ঘসাধক—মনোরঞ্জন। ব্রত তাহার পূর্ণ না হইতেই নিদারুণ বসন্তরোগে সে আক্রান্ত হইল। কিন্তু পঞ্চতপার অগ্নিকুণ্ড ছাড়িয়া সে উঠিল না। পূত অনলোত্তাপে বসন্তের গুটিকা পুড়িয়া ছাই হইল। পূর্ণাহুতি দিয়া সে চাহিল সন্ন্যাস। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের দর্শনের পরিপূর্ত্তি।

আমি অসমর্থ। যোগী আমি, সন্ন্যাসী নহি। সস্ত্রীক পৈতৃক ভিটায় বাস করি। আমি তাহাকে প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ ভোলাগিরির নিকট পাঠাইয়া দিই। সে সতীর্থ সহ লাল-তারা-বাগ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমায় কয়েকটী রুদ্রাক্ষ উপহার দিয়া বলিল—শ্রীমৎ ভোলাগিরি মহারাজ আপনার নিকটই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, এই আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার এই মহাবাণী মাথা পাতিয়া লইলাম। রহিলাম—কালের প্রতীক্ষায়।

কাহার দায়ে কি হয়, তাহা কে বলিবে। শ্রীমন্দির-রক্ষার ভার গৃহীর নহে, সন্ন্যাসীর। তাই কি মূর্ত্তিমতী সাধ্বীকে হারাইলাম! ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বরে পারি-বারিক শেষ বন্ধন ঘুচিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের অক্ষয়া তৃতীয়ায় মনোরঞ্জনকে পুরোভাগে রাখিয়া পাঁচজনে সন্ন্যাসের দীক্ষা লইল। সে ইতিহাস বিবৃত করিয়া বক্তব্য দীর্ঘ করিব না। তার পরের কথা।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" সুপ্রতিষ্ঠ হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সমাবর্ত্তন। একটা বিপুল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি, সে অন্য কথা। সহসা শ্রীমন্দির বিগ্রহশূন্য হইবে, চেতনায় এই স্পষ্ট নির্দ্দেশ ফুটিয়া উঠিল। ব্যবস্থার ত্রুটি করি নাই। দ্বারে দ্বারে লৌহকপাট সংস্থাপিত করিয়া অর্গলবদ্ধ করার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ১৩৪৪ আষাঢ়ের ঘনঘটা রজনীতে, রাত্রি চতুর্থ প্রহরের সন্ধিক্ষণে, চক্ষের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহ অপহৃত হইল। বিধাতার বিধান! ভাবিলাম—"ততঃ কিম্"।

ভাবিয়াছি—দীর্ঘদিন। হিন্দুজাতির মর্ম্ম দেবমন্দির। সে মন্দির আজ সর্ব্বত্র কলুষিত। "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ"ও এত চেষ্টায় মন্দির-মাহাত্ম্য রক্ষায় অসমর্থ হইল। শতাব্দীর ইতিহাস পুনরাবর্ত্তিত। কি করিব? মন্দির কি

শূন্য থাকিবে? হিন্দুসমাজের এমন অকল্যাণ করি কেমন করিয়া!

দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর ও সুপণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রীযুক্ত সুন্দর শর্ম্মা আসিয়া বলিলেন—হিন্দুমন্দির-নির্ম্মাণের যে পরিমাপ ও অঙ্ক, তাহা নির্ভুল না হওয়ায়, মন্দির-বিগ্রহ স্থির হয় না, প্রতিষ্ঠাতাও শ্রেয়ঃ লাভ করে না। মন্দিরের আমূল সংস্কার প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে সমগ্র ভারতের সনাতন হিন্দুজাতির মাথার মণি আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিলেন "আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে মন্দিরটীকে শ্রীযন্ত্রের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে করি। তাহাতে যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা শ্রী-বিদ্যা ষোড়শী।" তাঁহার দীর্ঘ পত্র এখানে আর উদ্ধৃত করিব না। ষোড়শ বর্ষে দেবী ষোড়শীর শ্রীমূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করিলাম। চতুঃষষ্টিকলার মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী "শ্রী" অক্ষর শব্দ-মন্ত্র প্রণবই সিদ্ধযন্ত্র-মূর্ত্তি মন্দিরের যথার্থ বিগ্রহ। মানুষ পাঞ্চভৌতিক—শব্দ তাহার অনুভূতির সর্ব্বোচ্চ গ্রাম। মন্ত্রকে মূর্ত্তি দিয়াই ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়। শব্দ-মন্ত্র অতীত হইলে, মন্দিরের প্রয়োজন ফুরায়। তখন ঘটে ঘটে প্রতিমার অভ্যুদয়। কিন্তু তবুও লোক-সংগ্রহের জন্য আমূল ধর্ম্ম-নীতি সতত রক্ষণীয়। আমি এই হেতু মন্দির-প্রবেশমুখে দক্ষিণে অগ্নিমূর্ত্তি মরুৎ ও তেজের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলাম। বামে ক্ষিতি ও অপের গঙ্গাধর-লিঙ্গ-মূর্ত্তি স্থাপন করিলাম। পাঞ্চভৌতিক জীব যেখানে পৌঁছাইয়া অনন্তের সন্ধান পায়, সেই তীর্থে আসিয়া যেন সে বলিতে পারে—গন্ধং দদ্যান্মহীতত্ত্বম্ পুষ্পমাকাশমেবচ। ধূপংদদ্যাদ্বায়ুতত্ত্বম্ দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ। নৈবেদ্যম্ তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে॥

আমি তীর্থযাত্রীদের বলিব—রসে, গন্ধে পুরুষ, ধূপে দীপে প্রকৃতি, এই শিবশক্তির পূজা ও আরাধনার শেষে শব্দমন্ত্র ব্রহ্মের বেদীতলে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া, মানুষ পরমাত্মার সন্ধানে উদ্বুদ্ধ হউক। "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" শ্রীমন্দির জাগ্রত জাতির জাগ্রত বিগ্রহ। তাই আজ উদাত্ত কণ্ঠে বলি—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

জীবনের যাত্রা-পথ

শ্রীসমীরকুমার ঘোষ

আশা আর স্বপ্ন যদি ভাঙ্গে বার বার,
হৃদয় উদ্বেল যদি হয় আশঙ্কায়,
নৈরাশ্য প্রভাব তার করিলে বিস্তার—
আমরা লব না তুলে সে সব মাথায়।

আমরা যাত্রীর দল নবসূর্য্য তরে
তমিস্রা বিভেদ করি' অতিবাহি পথ;
অদম্য উৎসাহ আর প্রাণশক্তি-ভরে
চলেছে ছুটিয়া এই জীবনের রথ।

তমস্বিনী রজনীর ছেদি' মায়াপাশ
পূর্ব্বাচলে একদিন নূতন অরুণ—
আমাদের জয় হেরি' প্রকাশি' উল্লাস
ঢালি' দেয় নবালোক;—আমরা তরুণ—
চিরদিন জীবনের যাত্রা-পথে ভাই,
আলো আর জীবনের জয়গান গাই।

সমালোচনা

আদর্শ ফলকর—শ্রীঅমরনাথ রায় এফ, আর, এইচ, এস (লণ্ডন), দি গ্লোব নার্শারী, ২৫নং রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা। ৩৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥০ আনা।

"আদর্শ ফলকর" ফল-চাষের একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে ৮৪ রকম ফলের চাষ, জমি-নির্ব্বাচন, মৃত্তিকা-পরীক্ষা, আবহাওয়া, ভূমিকর্ষণ, ফলের সার, কলম প্রস্তুত, বীজ-নির্ব্বাচন, চারা-রোপণ, রক্ষণ, গাছের পরিচর্য্যা, কীট-পতঙ্গের প্রতিকার প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য অতি সরলভাবে সাধারণের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ফলের গুণাগুণ উপাদান এবং ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান যাঁহারা অভ্যাসবশতঃ অন্যান্য চাষে অক্ষম, তাঁহারা অনায়াসে ফল-চাষের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন। এদেশে ফলের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অতি নগণ্য। ফল যে মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষার একটী অতি আবশ্যকীয় খাদ্য, তাহা বৈদেশিকদের প্রভাবে আমরা নূতন করিয়া শিখিতেছি। কিন্তু ফল-চাষের প্রভূত সুযোগ আমরা এখনও গ্রহণ করিতে পারি নাই। এইদিকে শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইলে বেকার-সমস্যা-সমাধান এবং দেশের কল্যাণ উভয়ই হইতে পারে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার লিখিত ভূমিকায় দেখাইয়াছেন—সামান্য অবস্থা হইতে শাক-সব্জি প্রভৃতির চাষ দ্বারা বিদেশীগণ কিরূপে ধনশালী হইয়াছেন। আমাদের দেশেও ইহা সম্ভব। 'আদর্শ ফলকর'-সন্নিবিষ্ট গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতালব্ধ ফল সকলেই ইচ্ছা করিলে কাজে লাগাইয়া উপকৃত হইতে পারেন।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রীতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র শেঠ কর্ত্তৃক ১৫৩ নং বলরাম দে'র ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য।০ চারি আনা।

এই পুস্তিকায় স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রীতি সম্বন্ধে কতকগুলি কথা সংগৃহীত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বামীজীর কোন্ কোন্ পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ নাই, সুতরাং তাঁহার বক্তব্যগুলি নিঃশেষে গৃহীত হইয়াছে কিনা—পরিশ্রম না করিয়া জানিবার উপায় নাই। ইহাতে পুস্তকের উপযোগিতা খর্ব্ব হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

রুচিরা—কবিতার বই। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত এবং কবি কর্ত্তৃক ৩০।৩, লেন্স্‌ডাউন রোড্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৭৪ পৃষ্ঠা; দাম এক টাকা।

উল্লিখিত পুস্তকে কবিতা সমষ্টির মধ্যে সুপরিচিত কবির লিপি-নিপুণতা যথাক্রমে প্রকাশভঙ্গী ও ভাব-সমাবেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য লইয়াই যথানিয়মে প্রকাশ পাইয়াছে। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে যেন রসের ফোয়ারা উছলিয়া উঠিতেছে।

"উছলে গেল, পিছলে গেল, কত মিলন, কত গোসা,
উদয় হ'ল, অস্তে গেল, কত আশা—বুকে পোষা।
সকল স্মৃতির মাথায় মাথায় চিক্‌মিকিয়ে সদাই হাসে—
সেই যে উজান বেয়ে যাওয়া এক-যে ভরা ভাদ্র মাসে।"

'এক-যে ভরা ভাদ্র মাসে'র স্মৃতি কবির মানস-পটে যে রেখা আঁকিয়াছে, তাহা যেন কোন্ প্রাণের পটে প্রেম-তুলিকার ছোঁয়াছুঁয়ি! তাই—

"সজীব সবুজ ধানের গাছে ঢেকে-পড়া মাঠের পাঁকে,
কচিৎ-কচিৎ গেল শোনা "টুব-টুব-টুব" পাখী ডাকে।"

কখনও আবার—

"অসীম উদার দেদার মাঠে কূলে কূলে, প্রেমোচ্ছ্বাসে—
ঢুলে গেল নৌকাখানি এক-যে ভরা ভাদ্র মাসে।"

স্মৃতির টুকরোগুলি ছায়াছবির মত চোখের পর্দ্দায় প্রতিফলিত হয়—আবার কোথায়ও কল্পনার ফানুস গিয়া রামধনুকের রঙে রঙিয়া উঠে, আর আকাশের গায়ে সহসাই যেন বসিয়া যায়!

পুস্তকখানি যে রসপিপাসুর মনে কৌতুহল জাগাইয়া তুলিবে—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মহানিষ্ক্রমণ—নাট্যকাব্য। শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত ও ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৯০ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা।

উল্লিখিত পুস্তকে কবিতা-ছন্দে নাটিকা রচনা প্রয়াসের মধ্যে লেখকের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। সময়োপযোগী নাট্য-কাব্য রচনায় যতটা সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বকীয় লিপিকুশলতার স্বতস্ফূর্ত্তি প্রয়োজন—সেদিক্ দিয়া আশানুরূপ বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, তীরবিদ্ধ রাজহংসের প্রাণদান হইতে আরম্ভ করিয়া 'মহানিষ্ক্রমণ' পর্য্যন্ত গৌতমের বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনী সুকরুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে—বলা যায়।

ব্রতচারীর মর্ম্মকথা—প্রবন্ধসমষ্টি। শ্রীগুরুসদয় দত্ত প্রণীত এবং বাংলার ব্রতচারী সমিতি, ১২, লাউডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; উত্তম কাগজে ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক হিসাবে দত্ত মহাশয় বাঙালা তথা সমগ্র ভারতে সুপরিচিত। আলোচ্য পুস্তকে ব্রতচারী আন্দোলনের খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙালার লুপ্তপ্রায় লোক-শিল্প, লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীত প্রভৃতিকে উদ্ধার

করিয়া বাঙালীর জীবনে বৈশিষ্ট্যময় ছন্দের প্রবর্ত্তনার মধ্য দিয়া একটা বিশ্বজনীন সম্প্রসারণের দৃষ্টি যে ব্রতচারী সংচেষ্টার মধ্যে আছে—প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মধ্যেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। 'স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা'র অনুকূলে জাতীয় জীবনে বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করার যে ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই দিক্ দিয়া ব্রতচারী সংপ্রচেষ্টার মধ্যে যে জাতীয় সুর-সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়, আলোচ্য পুস্তকে দত্ত মহাশয় তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন। লেখক সত্যসত্যই বলিয়াছেন—

"ব্রতচারী সংচেষ্টা চায় মানুষের জীবনকে এই অস্বাভাবিক বিখণ্ডতা থেকে মুক্ত করে আবার আদর্শের পূর্ণতা ও আচরণের সমন্বয় দান করতে, যাতে করে প্রত্যেক মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে, বিশ্বমানবের সঙ্গে এবং তার আপন মাতৃভূমির সংস্কৃতিধারার সঙ্গে স্বাভাবিক ও সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে।...যার দ্বারা সে তার অন্তর্জীবনকে সংনিয়মিত করতে পারবে এবং কি জাতীয় কি আন্তর্জাতিক জীবনে ঐক্যের গভীর উপলব্ধি প্রাণের মধ্যে আনতে পারবে।"

আমরা এইরূপ একটি পুস্তকের বহুলপ্রচার আন্তরিক ভাবেই কামনা করি।

বাণীবিজয়—'গীত-গোবিন্দ' অবলম্বনে রচিত-কাব্যগ্রন্থ। রচয়িতা—শ্রীজীবনবালা দেবী। নিত্যগোপাল কুঞ্জ, গোপালবাগ, বৃন্দাবন হইতে প্রাপ্তব্য। ১৬+১৵০ +১৮৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা।

লেখিকা ভক্ত-কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণে 'বাণীবিজয়' রচনা করিলেও, তাঁহার রচনার মধ্যে কবিদুর্লভ আত্মপ্রতিভার মৌলিকত্ব প্রশংসনীয়। ভাবব্যঞ্জনা ও ভাষাবিন্যাসে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় এবং আন্তরিক নিগূঢ়তার সহজ প্রকাশভঙ্গীও চোখে পড়ে।

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ—লেখক ও প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র দে, বি-এ। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৷৵০+(৩)+৪৩০। মূল্য ২৲ টাকা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ জীবনীর অভাব আমরা বহুদিন হইতেই অনুভব করিতেছিলাম। বর্ত্তমান পুস্তকখানি সে অভাব দূর করিতে বহুলাংশে সমর্থ হইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানি ঠাকুরের জীবনের ঘটনাপরম্পরার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এবং কি ভাবে "তিনি মানুষের মত, চেষ্টা করিয়া, মহজ্জীবন ও উন্নত চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন" তাহারই "আলোচনা"। এ আলোচনায় লেখকের ত্রুটি নাই। কিন্তু "পরমহংসদেবের ন্যায় প্রতিভাবান্ যোগীর জীবন হইতে অতীন্দ্রিয় ঘটনা বাদ দেওয়া অসম্ভব"—এই কথা স্বীকার করিয়াও, "ঐ বিষয়ে যথাসম্ভব উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ"—রূপ অভিমত প্রকাশমাত্র করিয়া লেখক সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। এ বিষয়ে পাঠক সাধারণ তাঁহার সহিত একমত হইবে না।

"সন্ন্যাসী শিষ্য, গৃহী ভক্ত এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত ও দর্শকগণের সহিত তাঁহার মিলন-কাহিনী"ই এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য। লেখক এই বিষয়ের প্রতি অনাবশ্যক অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন। মূল জীবনী সম্পর্কে মাত্র ১৭৫ পৃষ্ঠা নিয়োগ করিয়া তিনি উক্ত বিষয়ে ২৩০ পৃষ্ঠারও অধিক স্থান ব্যয় করিয়াছেন। ইহার জন্য এরূপ অধিক স্থান ব্যয় না করিয়া মূল জীবনী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিলে সুবিচার করা হইত, পুস্তকেরও উৎকর্ষ সাধিত হইত।

পুস্তকে মুদ্রাকর প্রমাদ, বর্ণাশুদ্ধি ও অশুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ অত্যধিক। এতৎসত্ত্বেও সাধারণ ভাবে ঠাকুরের ভক্তসমাজে ইহার আদর হইবার সম্ভাবনাও যে নাই—তাহা নহে। আলোচ্য পুস্তকে ছয়-খানি সুন্দর ছবি আছে। কাগজ, ছাপা বাঁধাই ভাল; তুলনায় মূল্য সুলভ।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—প্রথম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির, কলিকাতা ১৩৪৪, মূল্য সাধারণের পক্ষে ৩৷৹, পরিষদের সদস্য পক্ষে—৩৹।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু জানিতে বা লিখিতে চাহিবেন—এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে। এই সংস্করণে প্রদত্ত প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সম্পাদকীয় বক্তব্যে সুযোগ্য সম্পাদকের বহুদর্শিতার ফল বিধৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুর নিকট এই সম্পাদকীয় বক্তব্যের জন্য আলোচ্য সংস্করণের উপযোগিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সংস্করণে অধুনা অপ্রচলিত শব্দের অকারাদি বর্ণানুক্রমিক সূচী (অর্থসহ) মুদ্রিত হইয়াছে। অধিকন্তু শতবর্ষ পূর্ব্বে অঙ্কিত বাঙ্গালী সমাজের কয়েকখানি চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে বিষয়-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই জাতীয় গ্রন্থের ভাবী সম্পাদকের আদর্শরূপেই গণ্য হইবে। সুযোগ্য সম্পাদক এই গ্রন্থ-সম্পাদনে পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই। এদেশবাসীদের মধ্যে ইতিহাস-চর্চ্চা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রতীক*

শ্রীসুন্দর শর্ম্মা বি-এ

সকল জীবের বিকাশের পশ্চাতে যে অসীম সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ রয়েছেন, মানুষ তাঁকে যখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করার প্রয়াস পেয়েছে, সে তার এই অনুভূতিকে রূপ দেওয়ার জন্য সীমার আশ্রয় না নিয়ে পারে নি, কারণ শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক সসীমতা মানুষের প্রকৃতিগত। ঋগ্বেদের প্রারম্ভ সময় থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত অসীমকে সীমায় মূর্ত্ত বা ব্যক্ত করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর বহু রূপ এবং নামের। এই নাম-রূপের বহু বিকাশকে সর্ব্বত্রই আচ্ছন্ন করে রেখেছে ঋগ্বেদের একটী চিরন্তন সত্য —"একম্ সৎ বহুধা নামানি", সত্য এক নামেরই কেবল বহুত্ব। শিল্প-শাস্ত্রের "কুম্ভ-পঞ্জার" তেমনি একটী অতি প্রাচীন ভাব মূর্ত্তি, যা আমাদের কাছে ধারাবাহিক ভাবে পরিবেশিত হয়ে এসেছে এবং যা ভাগ্যক্রমে বিগ্রহধ্বংসকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে দক্ষিণ ভারতের বহু "আল্যমে" এখনও যে-কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। স্বভাবতঃই এর শত সহস্র আকার ভেদ লক্ষ্যে পড়ে, কারণ যে স্থপতিগণ আমাদের ধ্যান-লোকের রূপ জগতের বাস্তবতায় বিগ্রহান্বিত করেছিলেন, আমাদের শিল্প-শাস্ত্র তাঁদের দিয়েছিল রূপ-বিকাশের অবাধ কল্পনা। প্রথমতঃ, নাম থেকেই আমরা অনুমান করিতে পারি, এ একটী কুম্ভ এবং যুগপৎ একটী "পঞ্জার" অর্থাৎ পঞ্জর বা খাঁচা। সিদে কথায় একে বলা যায়—কলসি-খাঁচা। এমনি একটী খাঁচাতেই অপশ্য এবং অবোধ্য অসীমকে সীমার মাঝে রূপায়িত করে তোলা হয়েছে। খাঁচাটী আবার সম্পূর্ণ রুদ্ধ এবং আচ্ছাদিত যা থেকে সাঙ্কেতিক এবং নিরূপিত হয়—এর অন্তবর্স্তর সান্নিধ্যে যাওয়া যায় না। অন্তহীন, অজ্ঞেয়, অপ্রকাশ এবং গুণাতীত যে পুরুষ এই বিশ্বের অবলম্বন, তাঁকে আমাদের ক্ষুদ্র দ্যোতনা-শক্তি বন্দী করেছে একটী কলসে। কুম্ভ রূপ-জগতের অতি সুন্দর একটী প্রতীক। কুম্ভাকার এই অনন্ত আকাশকে কলস ছাড়া আর কিছু দিয়েই চিত্রিত করা যায় না! কাজেই এমনি একটী "কুম্ভ-পঞ্জার" প্রতীকের কেন্দ্রস্থল শোভিত করে আছে।

সাংখ্য-দর্শনের মতে, যে প্রধান বা প্রকৃতি পরম পুরুষের সাথে সমন্বিত হয়ে বিধৃত হয়ে আছেন, এবং বেদান্ত যাকে অবিদ্যা বলেছে, সেই প্রকৃতিই এই বিশ্বের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য রূপ। কুম্ভের দুই দিকের ফুল দু'টী এই দ্বৈত ভাবের ব্যঞ্জক। এর মাঝে প্রবহমান যে ছন্দ, তা বিশ্ব-ছন্দেরই প্রতিকৃতি; আর এই সামঞ্জস্য দু'ধারের বিস্তারের যে নির্দ্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে চলেছে, তা এই বিশ্বের পশ্চাতে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় বিধানেরই অনুলিপি। সাংখ্য বলেন, পুরুষের দর্শন মাত্রেই প্রকৃতি নৃত্য করে ওঠেন; বেদান্তের কাছে প্রকৃতি শুধুই মায়া। সুতরাং উভয় মতেই প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য রহিয়া গেল। আলোচ্য প্রতীকে সমমাত্রিক, সুপ্রসারিত ফুলের নক্সাটী কুম্ভের ভিতর হ'তে বিকশিত হয়ে ওঠে নি; উঠেছে বাহিরের থেকে, সুসন্নিবিষ্ট ভাবে। ক্ষণস্থায়ী রেখাজালের লুকোচুরি ঘিরে যে অসীম রেখামণ্ডল প্রতিভাত হয়, তারা এই বিশ্বের মায়া রূপেরই ইঙ্গিত, যেমন এদের সুনির্দ্দিষ্ট প্রবাহ ইঙ্গিত দেয় প্রকৃতির নৃত্যের। "কুম্ভ পঞ্জারের" দু'দিকের ফুলের আলেখ্য অখণ্ডভাবে অভিনিবেশ সহকারে দেখলে, দুটী চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। একটী পাখীর মূর্ত্তি ঊর্দ্ধগামী প্রবাহে আংশিক ভাবে বসে পক্ষ সঞ্চালন করছে এবং ঠোঁট দিয়ে কলসের উপরিভাগে ঠোক্‌রাচ্ছে, যেন সে চায় কলস মুক্ত করে ধৃত বস্তু আহরণ করতে। এর তাৎপর্য্য এই যে, মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মা ঊর্দ্ধগামী হয়ে অসীমে লীন হয়ে যেতে চায়। প্রকৃতি এবং পুরুষ, জীবনের এই দ্বৈত ভাবের প্রতীক স্বরূপ দু'টী পাখীর সন্নিবেশ। সঞ্চরমান এই পাখী মূর্ত্তির সাথে নীচের ফুলের কল্পনার একটী অচ্ছেদ্য সামঞ্জস্য অনুসন্ধানীর চোখে ধরা পড়ে; এই সামঞ্জস্য নির্দ্দেশ দেয় যে, পঞ্চতন্মাত্রা (matter) উপরেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। বলা হয়ে থাকে

* প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের শ্রীমন্দিরে নবপ্রতিষ্ঠিত যে প্রতীকটীর পরিচয় এখানে দেওয়া হইল তাহার প্রতিচিত্র ২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

—উপরে ও নীচে ভেদ নেই। এ থেকে আর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়—প্রাচীন মতে, পুরুষই তাঁর প্রতিবিম্বে রূপ নিয়ে থাকেন। সাংখ্য বলেন, এই ভ্রান্ত আরোপ থেকেই বিশ্ব-সৃষ্টির উৎপত্তি।

ভারতে যে নানা সাম্প্রদায়িক মতবাদের স্থান হয়েছে, তার পেছনে আছে—প্রাগৈতিহাসিক অতীতের এমনি কতকগুলি ধারণা। এখানে রূপকের সাহায্যে এদেরই আভাস দেওয়া হয়েছে।

ভারতের চিরন্তন ভাবধারার প্রতীকরূপে একটা কমল মূলদেশে বিরাজমান। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ এর উপচারক। কমলের দলগুলি যেমন একটার সাথে আর একটা মিশে এক অখণ্ড সমষ্টির সৃষ্টি করে, এবং নয়নে সৌন্দর্য্য প্রতিভাত করে, তেমনি একীভূত সঙ্ঘ-প্রাণও কল্যাণময় এক অখণ্ড সত্তারই পরিচয়। এরি জন্যে কমল সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ বলে বিবেচিত হয়েছে।

পশ্চাৎ ভূমির দু'দিকেই রয়েছে ভারতের অতি প্রাচীন দু'টী চিহ্ন—পরস্পর সংগ্রথিত দুটী ত্রিভুজ ও স্বস্তিক। এদের প্রাচীনত্ব এবং অভিজ্ঞান-শক্তি সুপরিচিত।

এই সমগ্র কল্পনাটী আবার একটী বৃত্ত-মণ্ডলে পরি-বেষ্টিত। মণ্ডলের প্রান্ত-রেখা ভেদ করে ফুটে উঠেছে একটী মহা পদ্ম; চৌষট্টিটী দল তার—অতি সুসন্নিবদ্ধ। চৌষট্টি সংখ্যা চৌষট্টি কলার প্রতীক। কমল দলগুলির পরস্পরের সন্নিবেশ প্রাচীন শিল্প-কলার শ্রেণী বিভাগের সম্বন্ধ-নির্ণায়ক।

সঙ্ঘ কর্ত্তৃক গৃহীত কেন্দ্র-কল্পনাটী থেকে এই চৌষট্টি কলা শাখা-বিস্তার করেছে। শ্রম-শিল্পের আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা এবং তার আনুসঙ্গিক ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের প্রাচীন আদর্শ। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা এই আদর্শকেই তাঁর জীবনের সাধনা বলে গ্রহণ করেছেন। ব্যবসা যেখানে অধিক দিন প্রতিষ্ঠা পায়, সততা সেখানে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে—পাশ্চাত্য কবির এই বাণী ভারতে অনেক পূর্ব্বেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। ভারতের প্রাচীন আদর্শেরই আধুনিক জাগরণের ভিতরে সঙ্ঘ যে আবার নূতন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তা এই জড়বাদের দিনেও পাশ্চাত্য ভাব-ধারাকে অসত্য বলে প্রমাণ করতে পেরেছে। প্রতীকের অন্তর্বেষ্টনীর মূল-দেশে যেমন একটী ছোট ফুল বিকশিত হয়ে ধীরে ধীরে বহির্বেষ্টনীর বিরাট্ ফুলে পরিণতি লাভ করেছে, তেমনি আমরা আশা করি, সঙ্ঘের আদর্শ একটী বৃহত্তর ফুলে মুকুলিত হয়ে সারা দেশ ছেয়ে ফেলবে।

কেন্দ্রের পুরোভাগে রহস্যময় প্রণব-প্রতীকটী হৈম কান্তিতে তার জ্যোতিঃ বিকীরণ করছে। ভারতীয় ভাবের সাথে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা এর মর্ম্মার্থ জানেন।

ভাল করে লক্ষ্য করলে কেন্দ্র-কুম্ভের উপরিভাগে একটী অর্দ্ধচন্দ্রের অস্ফুট আভাস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এর দ্বারা এই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র হিন্দু-ধর্ম্মটী প্রকৃত পক্ষে ইন্দু-ধর্ম্ম। এই ভাবটি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার প্রতীকটিকেও অস্পষ্ট এবং অদৃশ্য করা সঙ্গত মনে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে এই পবিত্র বিগ্রহটী স্থাপিত হয়েছে, সেই "চন্দ্র-নগরের"ও এ একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন। পরিশেষে, দূর থেকে বিগ্রহটি ভাল করে লক্ষ্য করলে, ভারতীয় শিল্প যাকে "কির্ত্তীমুখ।" বলে অভিহিত করেছে, সেই সিংহ-মূর্ত্তির কল্পনা এর মধ্যে ভাবুকের চোখে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। ভারতের দ্রষ্টা কবিগণ উপনিষদে যে বর্ণনা দিয়েছেন, ভারতের দ্রষ্টা ভাস্করগণও তারই রূপ দিয়েছেন মূর্ত্তিতে। চোখকে অবলম্বন করে মনের কাছে এরা সহজ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। পরম-ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূত উপনিষদে যে অনাগত সত্য প্রচারিত, তা মোটামুটী এই:—তাঁকে সহজে দেখতে পাওয়া যায় না; তিনি অন্ধকারে প্রবেশ করেছেন; গুহায় তিনি প্রচ্ছন্ন; মহাকাশে তিনি বাস করেন; তিনি সুবর্ণ শ্মশ্রু-ভূষিত ইত্যাদি। জিজ্ঞাসিত হতে পারে, এই কল্পনাগুলির সুসমাবেশ সিংহের মুখাবয়ব ভিন্ন আর কিসে হতে পারে? উপনিষদে আছে, এই মর চোখে কেউ তাঁকে দেখে না; তাঁর ধারণা করা যায় চিত্তপটে, বুদ্ধিতে বা মনে। ভারত-কলার একটী প্রধান উপকরণ সিংহের মুখাবয়ব। ভারতীয় রূপাঙ্কন রীতির সাথে যিনি পরিচিত তিনি একথা জানেন। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রতীকে উপনিষদের এই মুখাবয়বের ভাব-চিত্রটী সংযোজিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। বিগ্রহের ঠিক মাঝখানে সেজন্য ছোট্ট একটি "কীর্ত্তিমুখা" ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় এর মুখ্য উদ্দেশ্যটা।

সংক্ষেপে এই পবিত্র প্রতীকের পরিচয় এইটুকু। খুবই আশা করা যায়, এই বিগ্রহে অচিরে এমনি শক্তি সমন্বিত হবে যে, প্রাচীন এই ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এর প্রভাব ছড়িয়ে যাবে।

* * *

সঙ্ঘে আমার কয়েকটী বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পূত প্রতীকটিতে আমি যখন বাস্তবের রূপ দিই, তখন আমার চিন্তায় যে সুরম্য কল্পনা-চিত্র এঁকে উঠেছিল, সেগুলিরই একটু পরিচয় আমি উপরে লিপিবদ্ধ করলাম। আমার পক্ষে এ কাজ করতে যাওয়া হয়ত সমীচিনই হয়েছে, কেননা আমাদের প্রাচীন শিল্পাদর্শ-গুলিতে পাশ্চাত্যের অসঙ্গত প্রভাব আরোপিত হয়ে তার যে কৃত্রিম মূল্য নিরূপিত হয়েছে, সে ঢেউ আমাদেরই স্বজাতিগণ প্রতিধ্বনিত করে গেছেন, অবশ্য জেনে শুনে এমনি তারা করেন নি! ভারতীয় শিল্পের ভাবধারা সম্বন্ধে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থহীন পাগলের প্রলাপ। আমাদের কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয়েও অসঙ্গত-রূপে এমনি কয়েকজন বিদেশী পণ্ডিত এবং কবিদের নিয়োগ করেছেন, যাঁরা স্বভাবতঃই ভারতীয় ভাবের মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারেন না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের তাঁরা শুধু শিল্পকলা নয়, কৃষ্টি শিক্ষা দিতেও অক্ষম। আমাদের দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক গঠনের আদর্শকে চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিল্পে তাঁরা উৎসাহিত এবং অভিব্যক্ত করেছেন মৃত অঙ্গসংস্থান-রীতি। অপ্রাকৃত গঠন-ভঙ্গীকে তাঁরা অতিপ্রাকৃত ভাবের নামে সম্মান দিয়েছেন।

মর্ম্মর-প্রস্তরে আমি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জন্য যে বিগ্রহটী খোদিত করেছি, আমার ভাষায় তার পরিচয় দিতে সঙ্ঘের সভ্যগণ আমায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সে জন্যে তাঁদের আমি সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ দিই। শ্রুতিতে এবং রূপ-বিকাশের ভিতর দিয়ে শ্রদ্ধেয় মতিবাবু আমায় যে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্যেও আমি তাঁর কাছে অকপট ধন্যবাদ জানাচ্ছি।*

* ভাস্কর শ্রীসুন্দর শর্ম্মার মূল ইংরাজি রচনার বঙ্গানুবাদ।

চাওয়া

শ্রীলীলা গুপ্ত

আজ কেন প্রভু বারে বারে দিলে ফাঁকি—
ভাবনা জড়ায়ে রাখিলে নিজেকে ঢাকি?
মেঘলা আকাশে লুকোচুরি খেলা চাঁদে—
একি অনুপম বিরহ-জাগান ফাঁদ এ?
অরূপ, কেমনে রূপের পরশ মাখি—
অপরূপ যদি নিজেকে রাখিলে ঢাকি'?
শ্বাসে শ্বাসে দিলে বিশ্বাস ঢালি' যত,
প্রশ্বাসে প্রিয় নিরাশা ভরিলে তত!

মেলি' আঁখি দেখি মৌন প্রকৃতিপুরী,
মুদিলে নয়ন দাঁড়াও হৃদয় জুড়ি'।
ডাকিলে আস না, না ডাকিলে অনুগত,
আশা দাও প্রাণে, উদাস করহে যত!
দরশে তোমার হরষে পরাণ কাঁদে;
অন্ধ যে শুধু খুঁজে খুঁজে ছাঁদা বাঁধে!
বোঝে নাকো তার বোঝাভারী করে খুসী,
নীচে প'ড়ে থাকে মিছে মায়া-পীড়ে তুষি'

পরশ তোমার মিলাও হে প্রভু, প্রিয়,
ঘুচে যাক্ যত বাধা, বিধি, ব্যাধি, স্বীয়।

বাপুজী সন্দর্শনে

শ্রীমতিলাল রায়

শ্রদ্ধেয় বন্ধু মহাদেব দেশাইয়ের পত্র ৮ তারিখে পাইলাম: ৯ তারিখে অপরাহ্ণ ১টার সময়ে বাপুজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র। কলিকাতার পিচের রাস্তা হইতে উষ্ণ বাষ্প উঠিতেছে। উড্‌বর্ণ পার্কে পৌঁছিবামাত্র কিল্লায় তোপধ্বনি হইল। নীচের ঘরে দুইজন সাংবাদিক কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। বাপুজীর কাছে সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। সিঁড়ির মাথায় শ্রীযুত দেশাইয়ের প্রফুল্ল মুখে সম্বর্দ্ধনা ভুলিবার নহে। লোকপ্রিয় শ্রীযুক্ত দেশাই চিরদিন বন্ধুবৎসল।

বিস্তৃত কক্ষে প্রশস্ত শয্যায় বাপুজী শয়ন করিয়াছিলেন। ডাঃ সুশীলা নায়ার তাঁহার রক্তের চাপ পরীক্ষা করিতেছিলেন। বাপুজী সহাস্যে নিকটে আহ্বান করিলেন। সুশীলা দেবীকে বুঝিতে পারি নাই—পুরুষ মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার গা ঘেঁসিয়াই চির-স্বভাব বশতঃ বাপুজীর বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম। শায়িত অবস্থায় তাঁহার চরণপ্রান্তে মাথা নত করিয়া মনে মনে বলিলাম "ভারতের রাষ্ট্র-নির্ম্মাতা দীর্ঘায়ুঃলাভ করুন—দেশ ও জাতির প্রতি তাঁহার আশীর্ব্বাদ অহিংসায়, সত্যে ও পবিত্রতায় মূর্ত্তি গ্রহণ করুক।" বাপুজী হাসিয়া বলিলেন "কত দিন পরে দেখা!" আমি হাসিয়া বলিলাম "সেই যারবেদা জেল আর এই কলিকাতা। দীর্ঘ ছয় বৎসর!" কুঞ্চিত ললাটে স্নেহাভিষিক্ত কণ্ঠে বলিলেন "দীর্ঘ দিন।"



মহাত্মাজী

আমি বলিলাম "গত বৎসর জরুরী কাজে চট্টলসঙ্ঘে যাইতে হয়। বন্ধু দেশাইয়ের পত্র যখন পাই, তখন আর সময় ছিল না—আপনার সহিত দেখা করি।"

রক্তের চাপ পরীক্ষা শেষ হইলে তিনি ডাঃ সুশীলা নায়ারের সঙ্গে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। সুশীলা দেবী প্রস্থান করিলে, অর্দ্ধপদ্মাসনে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। মাথা কর্দ্দমাক্ত, তার উপর জলপটী লাগান। ছয় বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মাজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, তাহা হইতে তাঁহার শরীরের পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার মুখ প্রসন্ন, সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল লাবণ্যে অনুলিপ্ত। পরিচ্ছন্ন শুভ্রমূর্ত্তি। দিব্য কলেবর, নরে দেব-বিগ্রহ যেন রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও একবিন্দু মালিন্য নাই।

তিনি প্রথমেই সঙ্ঘের কথা তুলিলেন—বলিলেন, "তোমার পত্রাদি ছাড়াও তোমার সম্বন্ধে সংবাদাদি অনেক লইয়া থাকি। বহুমুখী প্রেরণার উৎস সৃজন করিয়াছ। বিশেষ যান্ত্রিক শিল্প-বাণিজ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতে চলিয়াছ, প্রতিষ্ঠান খুব বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্ঘের সভ্য-সংখ্যা এখন কত?"

আমার সঙ্গে সঙ্ঘের অন্যতম সভ্য কৃষ্ণধন ছিল—সঙ্ঘ সম্বন্ধে বিস্তৃত কথাবার্ত্তা তাহার সহিত বলিতে লাগিল। তিনি সঙ্ঘের সভ্য-সংখ্যা, আর্থিক অবস্থা, বিভিন্ন কেন্দ্রের পরিচালন-ব্যবস্থা অতি আগ্রহের সহিত জানিয়া লইলেন।

তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলি কেমন চলিতেছে, কত ছাত্রসংখ্যা এবং সংস্থাগুলি কোন কোন জিলায় প্রতিষ্ঠিত?" সদুত্তর পাইয়া তিনি বেশ খুশী হইলেন। তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল মনে হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন কলেজ তোমাদের সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় কি না?"

আমি বলিলাম "না। প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ের ভারই বহন করিতে সমর্থ হই না।"

বাপুজী বলিলেন "১৮ শত ছাত্রের শিক্ষা ও চরিত্রের ভার যদি সম্পূর্ণ করিতে পার, আর কিছু তোমার করার প্রয়োজন নাই।" তার পর হঠাৎ কৃষ্ণধনের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "তোমাদের অর্থ-প্রতিষ্ঠানে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কয় জন সভ্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে?" উত্তর পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা বেতন-স্বরূপ কত টাকা গ্রহণ কর?" বেতনের হার শুনিয়া তিনি বলিলেন "২০।২৫ টাকায় কলিকাতায় চলে কি প্রকারে?" কৃষ্ণধন বলিল "আমরা সকলেই ব্রহ্মচারী। এই হেতু আমাদের খরচ-বাহুল্য হইবার কথা নহে।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "তোমরা ছাড়া যাহারা বেতনভোগী, তাহাদের সর্ব্বাধিক বেতন কত?" কৃষ্ণধন বলিল—"দেড়শত।"

বাপুজী সোৎসাহে পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের মধ্যে বিবাহিত জীবন কি কাহারও নহে?"

কৃষ্ণধন বলিল "দুইজন মাত্র আছেন, কিন্তু সঙ্ঘের নিয়মে তাঁহাদেরও ব্রহ্মচর্য্যরক্ষায় সতর্ক থাকিতে হয়।"

এইবার আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজবন্দীদের মুক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। তিনি বুঝিয়াছিলেন—এ সংবাদ অপ্রকাশ্যই থাকিবে; এই সম্বন্ধে অকপটে তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম—বন্দিদের মুক্তির জন্য মহাত্মার কর্ম্মসিদ্ধি এই যাত্রা সম্ভব নহে, তাঁহাকে পুনরায় বাঙলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

তাহার পর খাদির কথা উঠিল। শ্রীমান কৃষ্ণধন প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের খাদির যথাযথ লিখিত বিবরণ তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া এক সুদীর্ঘ বিবৃতি দান করিল। বিবরণের লিখিত অঙ্কগুলির দিকে একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া বাপুজী বলিলেন "নিখিল ভারত কাটুনী-সঙ্ঘের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া তোমরা যে এখন খাদির কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়া আছ, ইহা তোমাদের ধর্ম্ম নয়, তোমরা চলিয়াছ প্রচণ্ড বেগে, 'ইন্‌ডাষ্ট্রী'র পূর্ত্তি-সাধনে; তোমাদের খাদি আমার প্রতি তোমাদের অকৃত্রিম প্রেমেরই পরিচয়, কিন্তু যাহা তোমাদের নহে, তাহা তোমরা কিরূপে দীর্ঘ দিন রক্ষা করিবে—কতদিন ক্ষতি স্বীকার করিবে?" ইহার উপর আমাদের কথা ছিল না; মহাত্মাজী যখন খাদির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, কি এক অশরীরিণী প্রেরণায় প্রবর্ত্তকসঙ্ঘ "মৃণালিনী বস্ত্রবয়নের" কাজে আত্মনিয়োগ করে। তার পর অজস্র অর্থব্যয়ে আমরা যখন অবসন্ন, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর সহিত আমাদের পরিচয়, নিখিল ভারত কাটুনী-সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত হইয়া আজ পর্য্যন্ত অর্থক্ষয়, শক্তিক্ষয়, লোকক্ষয় অনেক হইয়াছে। কাটুনী-সঙ্ঘের সহিত বিগত তিন বৎসর বিচ্ছিন্ন হইয়াও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ খাদির কাজে অর্থের অপচয় করিয়া চলিয়াছে। সঙ্ঘ খাদি তবুও ছাড়িতে পারিতেছে না, হয় তো ইহা বাপুজীর অনবদ্য প্রীতির বন্ধনই হইবে। এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কৃষ্ণধন বলিল "আমরা খাদি ছাড়িতে পারি নাই। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বেশভূষা খাদিবস্ত্র।"

বাপুজী বেশ গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তাহা আমি জানি। কিন্তু খাদি আমার সূর্য্যমণ্ডল, যেখান হইতে আমি কর্ম্মশক্তি আহরণ করি। সূর্য্যরশ্মি যেমন সমস্ত পৃথিবী ভাসাইয়া দেয়, খাদির সূত্রে আমি তদ্রূপ অহিংসা-মন্ত্রে জগৎকে দীক্ষা দিই। খাদি আমার এক মাত্র কর্ম্ম-কেন্দ্র। খাদিকে কেন্দ্র করিয়াই আমার কর্ম্ম-সৃষ্টি। কিন্তু তোমাদের তাহা নহে।"

এ কথার উত্তর ছিল না। খাদি মহাত্মার প্রাণ। খাদিতে সে প্রাণ-প্রবাহ তাঁহার অফুরন্ত। আমরা কৃষি করিতে গিয়া অন্যূন ৩০ হাজার টাকা অপচয় করিয়াছি। খাদিতে প্রায় ২০ হাজার টাকা নষ্ট করিয়াছি। খাদিতে মহাত্মার যে অপচয়, তাহা তিনি হিসাবের মধ্যে গ্রহণ করেন না। সত্যই ইহা তাঁহার প্রাণ। আমরা এরূপ করিতে পারি না। তাই আমাদের উপার্জ্জনের অন্য ক্ষেত্র রচনা করিতে হইয়াছে। নতুবা আমাদের অস্তিত্ব-রক্ষা সম্ভব হইত না। মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলাম—খাদি আমাদের

প্রাণ-কেন্দ্র নহে, একমাত্র কর্ম্মকেন্দ্রও নহে। আমাদের জীবন-কেন্দ্র স্বতন্ত্র। কিন্তু খাদি তবু আমাদের অপরিত্যজ্য। বাপুজী বোধ হয় আমাদের অন্তরের কথা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তিনি অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিলেন "আমার মত খাদি তোমাদের এক মাত্র কর্ম্ম নহে, অনেক কর্ম্মের মধ্যে খাদিও তোমাদের একটী কর্ম্ম। এই ভাবে খাদিকে লইয়া চলা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে।" তারপর স্থির ভাবে বলিলেন "আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য নাও হইতে পারে; অবশ্য আমার মনে যাহা উদয় হইল, তাহাই বলিলাম—তোমরা ইহা ভাবিয়া দেখিও।"

ইহার পর রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের কথা উঠিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন "অহিংসা মন্ত্র সিদ্ধ করিতে হইলে, খাদি ছাড়া পথ নাই। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজিমের মধ্যে হিংসা আসিতে পারে, (Exploitation আছে), খাদিতে এই অসুবিধা নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে অনেকে অহিংসা আন্দোলনে যোগ দিয়া তলে তলে হিংসামূলক কর্ম্মনীতি চালাইতেছে, শুনা যায়। কিন্তু আমি তাহা আমলে আনি না। আমায় যদি হিংসার প্লাবনে ঘিরিয়া ধরে, তবুও আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিব।" বাপুজীর ললাটে বিদ্যুৎ ঠিকারিয়া পড়িল। তাঁহার মর্ম্ম-সত্য খাদিতে, অহিংসা-মন্ত্রের খাদি মূর্ত্ত বিগ্রহ।

আমি বলিলাম "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অমিশ্র সংগঠন-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। প্রেম তাহার প্রতিপাদ্য, ঐক্য তাহার লক্ষ্য। আমরা এখনও অর্থক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের আত্মদান পরিপূর্ণ করিতে পারি নাই। তাই আপনার দিকে চাহিয়া ভাবি—রাষ্ট্রক্ষেত্রে আপনার কোন কাজে আমরা লাগিলাম না। সময়ে সময়ে কুণ্ঠিত হই; ভাবি—আরও ব্যাপকভাবে দেশ ও ভগবানের সেবায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কি ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, এ বিষয়ে আপনার কিছু নির্দ্দেশ থাকিলে, যদি বলেন কৃতার্থ হই।"

বাপুজী স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি বৃহত্তর কর্ম্মে আত্মনিবেদন করিয়াছ—এই কর্ম্মের সাফল্য আসিলে দেশের একটা বড় কাজ সিদ্ধ হইবে। তোমার পথ অসুন্দর নয়। তুমি অবহিত হইয়া চলিতে থাক।"

আমার মনে হইল—মহাত্মার নিঃস্বার্থ প্রেমে আমি যেন বিগলিত হইয়া পড়িতেছি। তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া অনুভব হইল—এমন মহানুভবতা মর্ত্ত্যে বোধ হয় এই প্রথম। তিনি সত্যই মহাত্মা। একটু ভাব-প্রবণতা-মুগ্ধ কণ্ঠে বলিলাম "বাপুজী, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই প্রতিষ্ঠান আত্ম-প্রেরণায় চলিয়াছে—প্রেম ও ঐক্য লক্ষ্যে রাখিয়া। আপনার কোন কর্ম্মের সহিত আমাদের যুক্তি নাই, আপনি কি আমাদের মনে রাখেন?"

তাঁহার প্রত্যুত্তর শুনিয়া নিজেই লজ্জিত হইলাম। হৃদয়ের কার্পণ্য থাকিলে, প্রার্থী দাতার কাছে এই উক্তি বোধ হয় স্বভাবতঃই করিয়া থাকে। তিনি বলিলেন "তুমি কি মনে কর?" তাঁহার নয়ন দুটী করুণার্দ্র হইয়া পড়িল। তিনি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন "যদি তোমায় মনে না রাখিব, ভাল না বাসিব, এমন সময়ে আসিতে বলিয়াছি কেন? দেশাই বলিলেন ১টা হইতে ২টার মধ্যে স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের আসার কথা, মতিলালজীর সময় কেমন করিয়া হইবে! আমি জানি—স্যার নাজিমুদ্দিন ১টার সময়ে কখনই আসিবেন না, তাঁহার আসিতে ২টা হইবে; অতএব তোমার সহিত আমি দীর্ঘ সময় আলাপ করিতে পারিব।"

বাপুজীর করুণার অবধি নাই। তাঁহার বিছানার পদপ্রান্তে শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের শয্যা রচনা করা হইয়াছে। তিনি কখনও উঠিতেছেন, কখনও ঘরের বাহিরে যাইতেছেন। দেশবরেণ্য আবদুল কালাম আজাদ বিস্তৃত কক্ষে পদচারণা করিতেছিলেন, আমরা তিনটী প্রাণী নিস্তব্ধ মৌন। মহাত্মাজীর অকাতর আশীর্ব্বাদে আমাদের সর্ব্ব-শরীর যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। মহাত্মাজীর কথাই সত্য—সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল আসিয়া খবর দিলেন স্যার নাজিমুদ্দিন আসিয়াছেন।

আমার মুখের দিকে তিনি চাহিলেন। কথা ছিল, স্যার নাজিমুদ্দিন আসিলেই আমাকে উঠিতে হইবে। আবার কত দিন পরে বাপুজীর সাক্ষাৎকার পাইব, কে জানে! বলিলাম "বাপুজী, বাঙালার সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক ঘূর্ণাবর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া যেদিন সত্য ও অহিংসার দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম্মের জয়মন্ত্র নির্দ্দ্বন্দ্বে উচ্চারণ করি—সেই শুভ প্রভাতে আপনি বর ও অভয় মন্ত্র লইয়া চন্দননগরের আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। আজ

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্বভাব ও স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠ। জাতির অর্থ-ক্ষেত্রেও শিক্ষা-ক্ষেত্রে আত্মনিবেদন করিয়া পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে অভিযান-তৎপর। এই পরিণত সঙ্ঘের যৌবন-যুগে আপনি কি একবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিবেন না?"

বাপুজী পরিষ্কার করিয়া বলিলেন "আমি ভালবাসি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চন্দননগরের আশ্রম। কিন্তু এবার নয়, একদিন যাইব।" আবার বলিলেন—'I love Chandernagore Asram."

ইতিমধ্যে স্যার নাজিমুদ্দীন মহাত্মাজীর সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। আমি বাপুজীর চরণতলে মাথা নত করিয়া বলিলাম "আরও আলো, আরও পবিত্রতার প্রার্থী।"

মহাত্মাজী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "হবে, হবে, আরও হবে।" তারপর দৃষ্টি-বিনিময়ে বিদায় সম্ভাষণ।

নীচে আসিতে উৎকণ্ঠিত সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করিলেন "অনেক ক্ষণ কথা হল তো—খবর কি বলুন?"

শ্রীমান্ কৃষ্ণধন প্রত্যুত্তর দিল "কিছু না, শুধু সঙ্ঘের কথা।"

তখন পড়ন্ত রৌদ্র। কলিকাতার রাজনগরী লোক-কোলাহলে পরিপূর্ণ। অন্তর্বীণায় বাজিতে লাগিল মহাত্মার আশীর্ব্বাণী। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব, ভারতীয় ভাবের মূর্ত্ত বিগ্রহ। এখনও মনে হয়, ২ হাজার বৎসর পরে শাক্যসিংহের ন্যায় আবার এই মানব-বিগ্রহ বিশ্বের পূজা পাইবেন। মহাত্মাজী গীতার মানুষ—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনাগত

শ্রীস্নেহশীলা চৌধুরী

সমুখে আঁধার, তিমির রজনী,
একা আমি আজ পাথেয়-হারা;
পিছনে ডাকিছে শত বাহু মেলি',
অতীতের মাঝে জীবন-ধারা!
শিথিল সে বাহু নীরবে সরায়ে—
অজানা সায়রে পড়িবে ঝাঁপায়ে,
আপনারে ভুলি' কি যেন কি টানে
রবে পড়ি' হেথা জীবন সারা!

কত যে কুসুম নীরবে ঝরিবে
বেদনার গান মরমে রাখি';
আঁখিতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িবে
ছায়া-ছবিখানি যতনে আঁকি;
ধীরে ধীরে ধীরে নিভে যাবে আলো
সারাটি জীবনে যবনিকা কালো,
তাহারি মাঝারে মিশে' যাব আমি
মহান্ সাগরে বিম্ব পারা।

ভারতী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

চিরপ্রত্যাশিতা তুমি আমার বিজন মর্ম্মালয়ে,
ভাবময় স্বর্ণাসনে গীতিরূপা হে মহিমময়ি!
লীলাপথ ছন্দোবীণা রাগিণীর সুরস্বপ্নলয়ে
কবির মানসলোকে আবির্ভূতা হও মা বাঙ্ময়ি!
নীরস রুক্ষতাময় পৃথ্বীবুকে ব্যর্থতার ভয়ে
অবনম্র অহমিকা—ব্যথাভরে হয়েছি বিনয়ী,
হতদর্প অসহায় জীবনের নিত্য পরাজয়ে,
তবু মা প্রার্থনা জাগে, একদিন হ'ব দুঃখজয়ী।

সভ্যতার প্রাণশক্তি যে ভাষায় নিত্য বিনিময়,
যে ভাষা জড়ের ভাষা সে ভাষার দেবী তুমি নহ;
অশরীরী বাণী আর ছন্দোরূপে কাব্যাকাশময়
লুপ্ত ক'রে দাও দেবী বাস্তবের বেদনা দুঃসহ।
তুমি নহ নীতি, ধর্ম্ম, বিজ্ঞানের জটিল ঝঞ্ঝনা,
তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন, ভাবমগ্ন কবির কল্পনা!

শ্রীমন্দিরে নব-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

হিন্দুর সাধনা কোণে, বনে, মনে শুধু নয়, তীর্থে, মন্দিরেও। আত্মার জাগরণ অন্তরে বাহিরে যুগপৎ লক্ষণ প্রকাশ করে। জাগ্রত জাতির ধর্ম্মস্থান—মন্দির, তীর্থ-ক্ষেত্র—জাতীয় কৃষ্টি ও সাধনারই মর্ম্ম রক্ষা করে।

উৎসব—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে। মাতৃ-তীর্থ প্রবর্ত্তক আশ্রমের উপাসনা-মন্দিরে সঙ্ঘমণ্ডলীর যে প্রাতরধিবেশন হয়, তাহাতে সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা এই উৎসবের উদ্বোধন-বাণী উচ্চারণ করেন। সাধনার ত্রিপদ—দেহ ও আত্মার ভূমিকা

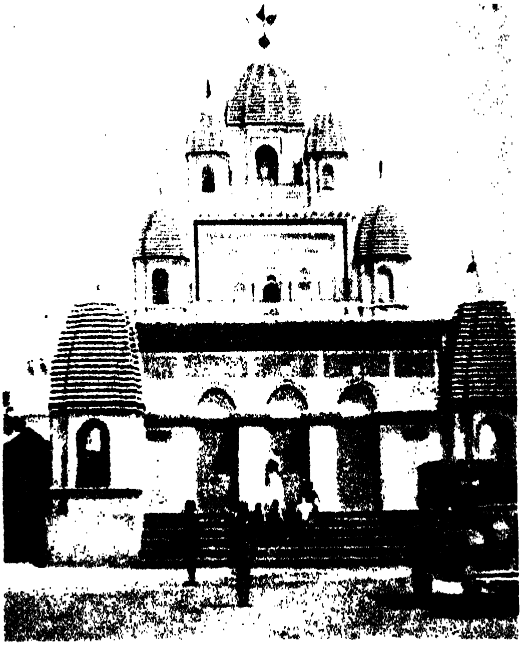


প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ শ্রীমন্দিরের নব-প্রতিষ্ঠিত প্রতীক

বিগত ১৯শে বৈশাখ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ধর্ম্মতীর্থ শ্রীমন্দিরে যে নব-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়, তাহার মধ্যে এই হিন্দুর জাগ্রত প্রাণের দ্যোতনা দেখিয়া হিন্দু মাত্রেরই চিত্ত পুলকিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতিক্রম করিয়া পরমাত্মায় নবজন্ম—ইহাই সংসার-ভোগ, অধ্যাত্ম-বৈরাগ্য ও পরিশেষে ভাগবত জীবনের আকৃতির মধ্য দিয়া স্ফুরিত হয়। প্রবৃত্তির শোধন, সাধন ও রূপান্তরের সেই ক্রমগুলির উল্লেখ করিয়া, সঙ্ঘ-দেবতা এই

নব-জীবনের সাধক-সমষ্টি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মহাযজ্ঞে বাঙালার অন্যতম ভূম্যধিকারী, হিন্দুপ্রাণ মৈমনসিংহের মহারাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরীকে পৌরোহিত্য-পদে বরণ করেন। অতঃপর আশ্রমে ঢাক, ঢোল, সানাই মঙ্গলবাদ্যধ্বনি সহ দলে দলে সঙ্কীর্ত্তন, ব্রতচারী নৃত্যগীত,



দর : সম্মুখ হইতে

তরুণ দলের বাদ্যযন্ত্র সহ বিপুল শোভাযাত্রা—সঙ্গে নব-বিগ্রহের পুষ্পমাল্যশোভিত উজ্জ্বল পট-মূর্ত্তি ও আদর্শ-বাণী-লাঞ্ছিত পতাকাগুলি—রাজপথ এই অপূর্ব্ব প্রাণ-প্রবাহে যেন নবশ্রী ধারণ করিয়াছিল। সঙ্ঘের উৎসর্গীকৃত সভ্যগণের পবিত্র মন্ত্রধ্বনি করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল-ব্যাপী এই শোভাযাত্রা বাহির হইলে, হিন্দুধর্ম্মের জাগ্রত প্রাণশক্তির লক্ষণে ও পরিচয়ে সেদিন বাঙালার পুণ্যতীর্থ চন্দ্রপুরী চন্দননগর চঞ্চল ও মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বয়ং মহারাজা সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে সঙ্গে বৈশাখের তপ্ত রৌদ্রে, ধূলিধূসরিত রাজপথে, নগ্ন পদে এই শোভাযাত্রা সহ নগর প্রদক্ষিণ করেন।

প্রায় ৯ ঘটিকায় বিপুল শোভাযাত্রা শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে, প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি ভবনের ব্রতচারী বিভাগ কর্ত্তৃক



শ্রীমন্দির : পশ্চাৎ হইতে



সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায়

মহারাজ অভিনন্দিত হন। সুপণ্ডিত ভাস্কর শ্রীসুন্দর শর্ম্মা বি, এ উৎসবে যোগদান করিয়া সমবেত সুধীবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। সাঙ্খ্যাচার্য্য শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাংখ্যকাব্য-তীর্থ এবং কুচবিহার হইতে আগত দশকর্ম্মান্বিত সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ গিরীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক শাস্ত্রীয় বিধানে শিব-লিঙ্গ ও অগ্নি-স্থণ্ডিল ও গর্ভমন্দিরে যথারীতি প্রণব-প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে অর্দ্ধ সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সন্ধ্যা ৭টায় মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিপুল সভামণ্ডপে এক বিরাট্ জনসভার আয়োজন হয়। নরনারীসমাবেশে তিল-ধারণের স্থান ছিল না। সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত সভাপতি বরণ করিলে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্বস্তি-বচন উচ্চারণ করেন। তারপর সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় বলেন—"ধর্ম্মের সমন্বয় আমি স্বীকার করি না। ধর্ম্ম মানবাত্মার অগ্নিবিশ্বাস। আমি হিন্দু—আমায় হিন্দু হইয়াই প্রমাণ করিতে হইবে—ইহার মধ্যেই সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় আছে। কোন ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্যবিধানে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের যে বাণী, তাহা ক্লীব, পঙ্গু ও স্বধর্ম্মে আস্থাহীন ব্যক্তির অন্তঃসারশূন্য উচ্ছ্বাস মাত্র; ধর্ম্মবিশ্বাসী স্বধর্ম্মের সত্য ঘোষণা করিয়াই আপনাকে উৎসর্গ করিয়া চলিবে। হিন্দুধর্ম্ম যদি সনাতন হয়, শাশ্বত হয়, সার্ব্বজনীন হয়—সামঞ্জস্য নয়, এই বিরাট্ ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্বে বিশ্বের সর্ব্বধর্ম্ম সংমিশ্রিত হইয়া অখণ্ড ধর্ম্মের জয় দিবে। আমার বিশ্বাস—বিশ্বধর্ম্ম ভারতেই বিদ্যমান।



ময়মনসিংহের মহারাজা শ্রীশশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী

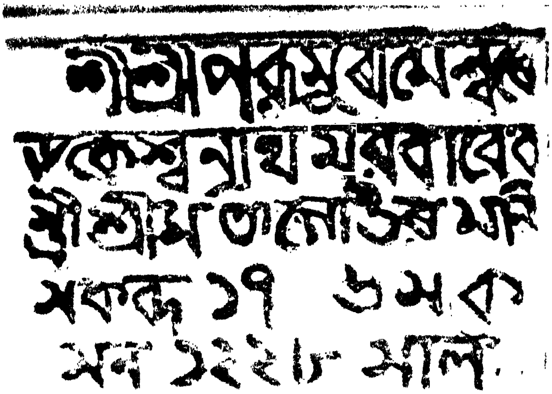
হিন্দু-জাতিকে সেই অনাবিষ্কৃত বস্তুকে আজ আবিষ্কার করিতে হইবে—ভারত-মহিমার জয়ধ্বজা উড়াইতে হইবে।" তরুণদের আহ্বান করিয়া বজ্রগর্জ্জনে তিনি বলেন—"ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল নিহিত হিন্দুধর্ম্মে। হিন্দুর বেদ, স্মৃতি, সদাচার আত্মপ্রসাদের উপর ভিত্তি করিয়া যদি ভবিষ্যৎ মাথা না তোলে, তাহার রাষ্ট্র, সমাজ-ধর্ম্ম মায়া-মরীচিকা হইবে।"

তিনি আরও বলেন—"আজ নৈমিষারণ্য নাই। আজ হিন্দুজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-রক্ষার বিজয়-দুর্গরূপে হিন্দু-মন্দিরের পুনর্গঠন চাই।" তিনি অপূর্ব্ব ভাব-ভাষার ঝঙ্কারে পঞ্চভূতাত্মক দেহে আত্মদর্শনের পথে শ্রীমন্দিরের কি বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য, তাহা শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভূতির সহিত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব্যক্ত করার সময়ে শত শত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হিন্দুজাতির অমর বীর্য্যের আভাস পাইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। তারপর শ্রীযুক্ত সুন্দর শর্ম্মা তাঁহার প্রস্তর-খচিত নূতন প্রতীক প্রসঙ্গে সাংখ্য-বেদান্তের অনুবর্ত্তী অপূর্ব্ব শিল্পমহিমার পরিচয়



স্থপতি শ্রীসুন্দর শর্ম্মা বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতেছেন

প্রদান করেন। সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, বেদান্তের মায়াবাদ পুষ্পিত লতার ন্যায় মণ্ডলে মণ্ডলে অনন্ত পুরুষোত্তমকে ঘিরিয়া প্রস্তরে কি ভাবে কবিতার নির্ঝর ঝরাইয়াছে, আর কুম্ভের গর্ভে সূর্য্যকর দশধারায় এবং প্রণবের উর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্রোদয় আর নিম্নে শতদল-শোভা সঙ্ঘের জয়-ঘোষণা



শ্রীমন্দিরের উত্তরে অবস্থিত একটি শিবমন্দিরের নির্ম্মাণকালের স্মারকলিপি (ইহার বিস্তৃত বিবরণ ১৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেমন করিয়া করিতেছে, তাহা সুললিত ইংরাজি ভাষায় তিনি সকলকে বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর সভাপতি মহারাজা বাহাদুর বলেন—"প্রাণ থাকিলে তাহার পরিচয় চাই। হিন্দুমন্দিরের বিগ্রহ অপহৃত হইয়াছে, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই প্রাণের পরিচয় ধন্যবাদার্হ। হিন্দুধর্ম্ম চেয়ার, টেবিল নয়। মতিবাবুর ভাষায় বলি—হিন্দুধর্ম্ম একটী সার্ব্বজনীন জীবন্ত সত্য। সব হিন্দু করিতে হইবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই শ্রীমন্দির আরও উন্নতিলাভ করুক। আমার এই অনুরোধ—সমবেত সুধীবৃন্দের ভক্তি ও শ্রদ্ধায় এই হিন্দুমন্দির আরও প্রসিদ্ধি লাভ করুক—পুষ্টিলাভ করুক—এই আমার প্রার্থনা।"

ডুপ্লে কলেজের ডিরেক্টর ও ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন। সভা-ভঙ্গ হইলে, বিজলী-দীপমালায় বিভূষিত একাদশচূড় শ্রীমন্দিরে দলে দলে নারীপুরুষ মর্ম্মর-রচিত বিগ্রহ দর্শন করিয়া উৎসাহ লাভ করেন। হিন্দুধর্ম্মের যেন একটা জাগরণ-যুগের স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল।

রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত কলিকাতা বরাহনগর হইতে শ্রীঅজিতকুমার ভক্তিবাচস্পতির অনুগত শিষ্য প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিচালনায় সংকীর্ত্তন দল উপাসনার পর পবিত্র নাম-কীর্ত্তনে অসংখ্য নারী-পুরুষের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করেন। ধর্ম্মের সাড়ায় এই দিন চন্দননগর এক অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মই যে জাতির প্রাণ, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই অনুষ্ঠান তাহা সুপ্রমাণিত করিয়াছে।

সাহারা

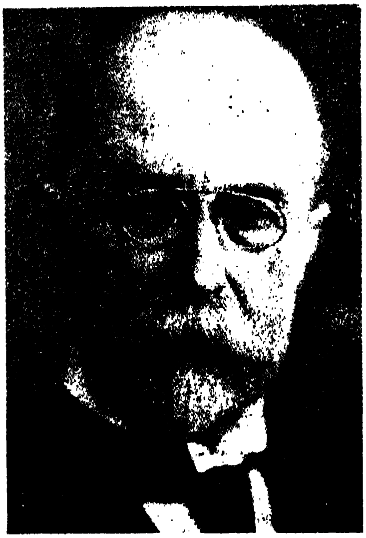
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

কী বেদন মূরছিয়া প'ড়ে কাতর সঙ্গীতে
পিপাসা ব্যাকুল বাঁশী,
বেজে চলে সারা দিনমান অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে,-
তুমি কোন ক্রীতদাসী
বর্ব্বরের কশাঘাতে গড়িয়া তুলিছ বসি,
অশ্রু পিরামিড তব,—
ধরার হিয়ার ভাষা রূপায়িত দিবানিশি
বালু বক্ষে অভিনব!
কী কাতর প্রার্থনার বাণী জলন্ত অম্বরে,
অহর্নিশ যায় ছুটি,
আতুর চাতকী সম বিদগ্ধ অন্তরে
মেলি দিয়া পক্ষ দুটি!
কী জানো মোহন মায়া মৃগ তৃষ্ণিকার
সচকিত চাহে যাত্রীদল,
তব বক্ষে যত জ্বালা ঝলসায় চারিধার,
কায়াহীন রেখাজল।
ওগো মোর অনাদৃতা চিরন্তনী তৃষা,
গোপনে গোপনে দাও তোমার চরণ,
রচিতেছ বেদী তব প্রতি হৃদি পীঠে,
(তোমা) ধরণীর সব তাই করিছে বরণ



চেকোশ্লোভেকিয়া—

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চেকোশ্লোভেকিয়া হাঙ্গেরীর অন্তর্গত ছিল। মহা-যুদ্ধের পর চেকোশ্লো-ভেকিয়াকে নব রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ



প্রেসিডেণ্ট মাসারিক

পর্য্যন্ত প্রোফেসর টি, জি, মাসারিক ইহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার স্থলে পরে ডাঃ বেনিস নিযুক্ত হন। উভয়েই অতি দক্ষতার সহিত রাজ্য-পরিচালনা করিয়া ইউরোপে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, চেকোশ্লোভেকিয়া দৃঢ় শাসনভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নাৎসী-জাগরণের পর হইতে ধীরে ধীরে চেকোশ্লোভেকিয়ার অশান্তির সূত্রপাত হইতে থাকে। হিট্‌লারের অষ্ট্রিয়া-জয়ের পর ইহার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কিয়দংশে ৩০ লক্ষ জার্ম্মাণভাষীর বাস। হিট্‌লার এই অঞ্চল জার্ম্মানীতে ফিরিয়া চাহেন। অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য আজ লুপ্ত হইয়াছে, ইতালীও জার্ম্মানীর মিত্র, সুতরাং হিট্‌লারের জার্ম্মানভাষীর মিলন-স্বপ্ন সহজে ব্যর্থ হইবার নহে। রুষিয়া এবং ফ্রান্স চেকোশ্লোভেকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেও, এই অঙ্গীকার অক্ষুন্ন রাখা সহজ নহে।

চেকোশ্লোভেকিয়ার ব্যবস্থাপক সভার ৪৯ জন সভ্য নাৎসী দলে সংহত হইয়াছে। ইহারা পূর্ব্বে দুই দল ছিল, এখন এই সংবদ্ধ দলই ব্যবস্থাপক সভার বৃহত্তম সংহতি, অথচ সমগ্র চেকোশ্লোভেকিয়ার শতকরা ২২ জনের অধিক



বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বনিস

সুডেটেন্ ডুইশ্ (জার্ম্মাণ-ভাষী) নাই। রুষ এবং ফ্রান্স ব্যতীত ইউরোপের অপর শক্তিগুলির অধিকাংশই জার্ম্মাণীকে তুষ্ট রাখিবার জন্য এই জার্ম্মাণ-ভাষী অঞ্চল হিট্‌লারকে প্রত্যর্পণ করার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। আবিসিনিয়া-যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে বৃটেনের রাজনীতি সকল দিক্ দিয়াই অন্ধকারাচ্ছন্ন—চেকোশ্লোভেকিয়ার ব্যাপারেও তাহাই।

আবিসিনিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা—

বৃটেন ও ইতালীর মধ্যে নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হইতে আবিসিনিয়াকে ইতালীর রাজ্য বলিয়া মানিয়া লইতে আগ্রহ দেখা যায়। বৃটেন লীগের সভায় এই প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইবেন, ইহা নিশ্চিত। আবিসিনিয়া লীগের সভ্য, সম্প্রতি হেল্ সেলাসী বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘে আবিসিনিয়ার নিকট প্রাপ্য চাঁদার কিয়দংশ পরিশোধ করিয়াছেন। রাষ্ট্র-সঙ্ঘ স্বীকার করিয়াছিল যে, ইতালী অন্যায়ভাবে আবিসিনিয়া দখল করিয়াছে। এখন সেই অন্যায়কেই ন্যায়রূপে মানিয়া লইতে, বৃটেন তথা লীগ অগ্রসর হইয়াছেন। যাঁহারা সভ্যতার মিশন লইয়া পৃথিবী জয় করে, ন্যায়ের তুলাদণ্ড দেখাইয়া সকল সংস্কার আরব্ধ করে, আবিসিনিয়ার অন্যায়ের জন্য মায়া-কান্নার প্রবাহ ঢালে, তাঁহারা সত্যই যাদু-সম্রাট্ নামের যোগ্য—আজিকার প্রতিশ্রুতি, আজিকার সত্য, কাল তাঁহারা অদ্ভুত যাদুবলে প্রহেলিকায় পরিণত করে। ইহাই সভ্যতার মিশন !!



আবিসিনিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ রাসতাফারি

জাপানের পরাজয়—

দক্ষিণ চীনে কয়েকটী যুদ্ধে পর পর জয়লাভ করিয়া চীন-বাহিনী আবার আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে। এই সকল যুদ্ধে প্রায় ৬০,০০০ জাপানী সৈন্য হতাহত হইয়াছে—কয়েকটী রিপোর্ট হইতে ইহাই অনুমিত হয়। দুর্দ্ধর্ষ জাপ-বাহিনীর এই পরাজয়ে জাপানের দুর্জ্জয় অহমিকা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। জাপান ইহার প্রতিশোধের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটী সংবাদে প্রকাশ, জাপ কর্ত্তৃপক্ষ পরাজয়ের হতাশায় নিশ্চেষ্ট না হইয়া ৫ লক্ষ নূতন সৈন্য, এক হাজার ট্যাঙ্ক এবং ২০০ এরোপ্লেন সংগ্রহ করিয়া চীন-বাহিনীর ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই আয়োজনের পরিমাণ যাহাই হউক, জগতের নিকট তাহার

যে মর্য্যাদা-হানি হইল, জাপান তাহা ফিরিয়া পাইতে চাহে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে চীন সামরিক শক্তির যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতে চীনের প্রতি জগতের আস্থা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। মার্শাল চ্যাং কাইশেক এবং জেনারেল চৌ এন-লেই মিলিত হইয়া চীনা-বাহিনী সুসংবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহারা জাপানকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। চীনের বিমানবাহিনীও নূতনরূপে উন্নত ধরণের কৌশলজাল বিস্তার করিয়া জাপানের জয় প্রতিহত করিতেছে।

জনশ্রুতি শোনা যায়, জাপান চীনের সহিত আপোষ করিতে চাহে। ইহার জন্য নাকি সে, বৃটেনকে মধ্যস্থ মানিতে ইঙ্গিত করিয়াছে। সরকারী ভাবে জাপান হইতে এ সংবাদ স্বীকৃত হয় নাই। জাপানের মধ্যস্থতার প্রস্তাব পরাজয়ের সমান—ইহা সে সহজে করিবে না। কিন্তু ইউরোপের পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিলে মনে হয়, জাপান—ইতালী ও জার্ম্মানীর নিকট হইতে এই সময়ে বিশেষ কিছু সাহায্যের আশা করিতে পারে না। বিস্তীর্ণ চীন সাম্রাজ্য দখল করাও সহজ নহে। চীন জয় করিতে হইলে, জাপানের সমস্ত শক্তি ইহাতেই ব্যয়িত হইয়া যাইবে। জয় তবুও সুনিশ্চিতভাবে হইবে কিনা, সন্দেহের বিষয়। পৃথিবীর ঘটনা-পরম্পরার দিকে মনোযোগ দিলে, জাপান যে জগতের একটী মহাসন্ধিক্ষণে তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া ফেলিবে—ইহা মনে করা শক্ত। অথচ মিটমাট ব্যতীত চীনের যুদ্ধে বিরত হওয়াও সম্ভব নহে। সুতরাং আপোষের প্রস্তাব নিতান্ত অমূলক নাও হইতে পারে। চীনকে একটু শিক্ষা দিয়া তারপর মিটমাটে জাপানের মর্য্যাদা-হানি হইবে না। হয়ত জাপানের ইহাই উদ্দেশ্য।

বোম্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—

গত ১৭ই এপ্রিল বোম্বে আবার দাঙ্গা সুরু হইয়াছিল। কয়েকদিনের হত এবং আহতের সংখ্যা প্রায় দেড় শত। সৌভাগ্যের বিষয় মন্ত্রিগণের দৃঢ়তায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে নাই।

নানা প্রদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি অনুসন্ধান করিলে, ইহা হইতে কতকগুলি সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। অধিকাংশ দাঙ্গার পশ্চাতেই রহিয়াছে কতকগুলি স্বার্থান্বেষীর বিদ্বেষ-প্রচার। যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস-শাসন বর্ত্তমান, সেখানেই কোন না কোন ছুঁতায় দাঙ্গা লাগে। মুসলমান লীগ-সভায় এবং ইহার বাহিরে কংগ্রেস-বিরোধী বিপ্লববাদ ছড়াইয়া দেওয়া হয়, মুস্‌লিম মনোবৃত্তিকে কংগ্রেসের শত্রুতায় পরোক্ষে, অপরোক্ষে প্ররোচিত করিয়া একদল লোক স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়ায়। হিন্দু-মুস্‌লিম মিলনের কথা, যতদিন উক্ত মনোবৃত্তি দূর না হয়, ততদিন অর্থহীন। "ইউনাইটেড্ প্রেস" বোম্বের দাঙ্গা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছে :—

(১) নর্থব্রুক গার্ডেনে জুয়াড়ীদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে এই অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে যে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা ঠিক নহে।

(২) গতকল্য দাঙ্গা আরম্ভের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নামশূন্য সাম্প্রদায়িক উস্কানিপূর্ণ বিপজ্জনক প্রচার-পত্রসমূহ সহরের সর্ব্বত্র বিতরিত হয়।

(৩) একদল দুষ্কৃতিকারীর সাম্প্রদায়িক প্রচার-কার্য্যের ফলে যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দিবার আশঙ্কা হইয়াছে, দুইখানি উর্দ্দু দৈনিক পত্রিকায় এ কথা এক পক্ষকাল পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সব দুষ্কৃতিকারী দোকান-পাট ও বাড়ীঘর লুট-পাট করিয়া লাভবান্ হইবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করে।

(৪) হঠাৎ যে এরূপ একটা অশান্তি দেখা দিবে, পুলিস তাহা পূর্ব্বে ধারণা করে নাই এবং সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল না। তবে দাঙ্গা বাধিবা মাত্র তৎপরতার সহিত পুলিস ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং অঙ্কুরেই অশান্তি দমন করে।

(৫) অন্তরালে থাকিয়া যে সব 'নেতা' এই অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদিগকে একধার হইতে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট পুলিস কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

এই মন্তব্য হইতে অনুমান করা যায় যে, ষড়যন্ত্রকারিগণই এই দাঙ্গার জন্য দায়ী।



হকি-লীগে—লীগ-বাজি মারিবে কাষ্টমস্ বা রেঞ্জার্স, প্রতিযোগিতার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত খুব পাকা লোকেও বলিতে ইতস্ততঃ করিয়াছে। ক্রীড়াদক্ষতায় ইহাদের কোন দল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট প্রতিযোগী, এই দুই দলের পক্ষে বলা এখনও কঠিন। গোল গলাইবার কেরামতি—মেণ্টের উপর রেঞ্জার্স'ই দেখাইয়াছে বেশী। আধা-পিছারী ও পুরা-পিছারীর খেলা কখনও হইয়াছে রেঞ্জার্সে'র ভাল, কখনও বা উৎরাইয়া গিয়াছে কাষ্টমসের। কাহার কেল্লাদারী সরেস, বিশেষজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে দুইজনের কাছে এক উত্তর পাইবার সম্ভাবনা অল্প। জনসাধারণের ভোটাভুটিতে হয়ত জার্ডিনই "নম্বরী" বিবেচিত হইবে। আমাদের মতামত মোটামুটিভাবে গত সংখ্যায় আমরা যাহা জানাইয়াছিলাম, শেষাশেষির খেলা দেখিয়া উভয় দলের তুলনামূলক সমালোচনায় পূর্ব্ব মতের পুনরুক্তি করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। 'কে হারে জিনে' অবস্থায় এই দুই দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল, উত্তেজনার আধিক্য দেখা গেল রেঞ্জার্সে'র পক্ষে। খেলা চলিল জোর পাল্লায়। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ—তাহা ব্যর্থ হইয়া যাওয়া—পুনরাক্রমণ—উভয় পক্ষের প্রত্যেক খেলোয়াড় দল — সাফল্যের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এ প্রকারের উচ্চাঙ্গের খেলা উপভোগ করিয়া অ-দলভুক্ত 'স্বাধীন' দর্শক উল্লসিত, দলভুক্তেরা উৎকণ্ঠিত—কি হয়, কি হয়! ঘোর উত্তেজনার কারণে রেঞ্জার্সে'র অবসাদের সূচনা হইতেই অপেক্ষাকৃত সংযত কাষ্টমস্ সেই সুযোগ গ্রহণান্তর ঝাঁপাইয়া পড়িল প্রতিপক্ষের দুর্গাভিমুখে। মাহেন্দ্রক্ষণে সেই আক্রমণ ব্যর্থ হইল না—কেল্লা ফতে হইয়া গেল। 'সমানজোরী' দুইদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'উত্তেজিত' পরাজিত হইল 'সংযতের' কাছে। ১৯৩৮-এর হকি-লীগের ইহাই সার কথা।



বোম্বায়ের 'লুসিটানিয়া' বেটন্ কাপের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দল—
শেষ-পূর্ব্ব গণ্ডীতে কাষ্টমস্ কর্ত্তৃক পরাজিত

লীগে কাষ্টমসের জয়াঙ্ক ৩৩ এবং রেঞ্জার্সে'র ৩১। মোহনবাগান তৃতীয় স্থানাধিকারী—জয়াঙ্ক ২৮। মোহনবাগানের জয়াঙ্ক দেখিয়া এই দল কাষ্টমস্ ও রেঞ্জার্সে'র হীন্ প্রতিদ্বন্দ্বী বলার মুখ সকলেরই বন্ধ। "The score board is an ass"—বহু ক্ষেত্রে বটে। বাঙালীর পি, দাস, আরিফ, মিত্র প্রভৃতির কল্যাণে মোহনবাগান সম্বন্ধে

কথা খাটিবে না। ফুটবলের ন্যায় হকিতে বাঙালীর শীঘ্র প্রতিষ্ঠা লাভের আশা করা যায়, আলোচ্য বর্ষে দৃষ্ট বাঙালীর ক্রীড়া-নিপুণতার উন্নতিসাধন যথাযথভাবে যদি হয়। মোহামেডন্ স্পোর্টিং শেষ লীগ-তালিকার ষষ্ঠ স্থানে অবস্থিত। হকি খেলায় ইহাদের উৎসাহ হালের। উৎসাহ যখন দেখা গিয়াছে একাগ্র ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মোহামেডনকে ভবিষ্যতে আরও উচ্চস্থানে দেখিবার আশা খুবই করা যায়। পোর্ট কমিশনর, মিলিটারী মেডিক্যাল ও বি, জি প্রেসের উত্তরোত্তর শক্তিশালী



পি, দাস (মোহনবাগানের কুশলী পুরা-পিছারী)

হওয়ার সম্ভাবনা আছে—এই সকল দলের খেলোয়াড়কে অন্যের টানাটানি করিবার সুযোগ নাই বলিয়া।

বঙ্গ বনাম 'অবশিষ্ট'—আন্তপ্রাদেশিক দলের খেলোয়াড়দের 'ঝড়তি পড়তি' এবং বেটন্ কাপ্ প্রতিযোগী দলের বাছাই খেলোয়াড় লইয়া হয়, 'অবশিষ্ট'। অবশিষ্টের নেতা হন, রূপ সিং। তাঁহার দলে লুসিটানিয়া, বম্বে কাষ্টমস্ এবং বাহিরের অন্যান্য শক্তিশালী দলের নামজাদা খেলোয়াড়ই স্থান পান। তাঁহাদের কেহ কেহ 'ইণ্টার ন্যাশানল' খেলোয়াড়। গঠিত এই দল হয় খুবই শক্তি-সম্পন্ন। বাঙালার সেরা খেলোয়াড় লইয়া বঙ্গদেশের দলও গঠিত হয়। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের পাঁচ ছয় জন কিন্তু বঙ্গদেশীয় দলে যোগদান করিতে পারেন নাই। তথাপি বঙ্গদেশকে 'অবশিষ্ট' পরাজিত করিতে পারে নাই। খেলার ফল এক্ষেত্রে সমান-সমান (৩-৩) হওয়া বঙ্গদেশের হকির অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে।

বেটন্-কাপ্—আই-এফ্-এ শিল্ডের ন্যায় বেটন্ কাপের নামও ছড়াইয়া পড়িয়াছে ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করা প্রতিযোগী দলের সম্মানের বিষয়, এ ধারণা বদ্ধমূল হওয়াতে প্রতিযোগী দলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বৎসরে ইহাতে ৪৪টী দল যোগদান করে। তাহাদের মধ্যে থাকে বোম্বায়ের সুবিখ্যাত কাষ্টমস্ ও লুসিটানিয়া।

কয়েকটী খেলা—অধিক সন্ন্যাসীর ন্যায় প্রতিযোগী দলের সংখ্যাধিক্যে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া



ক্যালকাটা রেঞ্জার্স লীচন—'রানার্স আপ'

দেওয়া অসম্ভব নহে। 'বাজে' দল বড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলেই 'কাজের' হইয়া পড়ে না—প্রতিযোগিতা অনর্থক দীর্ঘ করিয়া নানা অসুবিধা ঘটায়। যাহারা কখনও এ প্রতিযোগিতার খেলা 'চ'খে দেখে নি' কিন্তু 'বাঁশী শুনেছে'—বাজে খেলা দেখিয়া প্রতিযোগিতার প্রতি অনুরাগ হ্রাস পাওয়া তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। Haord much but saw so little"—বেটন্ কাপের একটী খেলা দেখিয়া একজন বিলাতী বন্ধু লেখককে এই কথা কয়টী এইবারেই বলিয়াছেন। স্বদেশে ফিরিবার তাড়ায় দ্বিতীয়

খেলা দেখিবার সুযোগ তিনি পান নাই। চ'খে দেখার ধারণা হাজার বলিলেও যায় না। কর্ম্মকর্ত্তারা কথাটা যেন একটু ভাবিয়া দেখেন।

প্রতিযোগিতার খেলার সূচনায় কাষ্টমস্ মোহামেডনকে ৬ গোলে এবং লুসিটানিয়া ফরিদপুরকে ৬ গোলে যেদিন পরাজিত করিল, সেদিন সকলেই দেখিতে পাইল গত বৎসরের বেটন্-কাপ বিজয়ী বি এন্ আরের ইহাদের সম্মুখে সহজে পাড়ি মারা সম্ভব হইবে না। ইহারা ব্যতীত রেঞ্জার্স ও বম্বে কাষ্টমসকে সামালাইতে হইবে। রেঞ্জার্স অভাবনীয় ভাবে অসামাল হইল মিলিটারী মেডিকেলের



লীগ ও বেটন্-কাপ-বিজয়ী—কাষ্টমস্

কাছে। কাষ্টমস্ বি, জি, প্রেসকে টপকাইল মাত্র এক গোলে। ওদিকে লুসিটানিয়া গণ্ডীর পর গণ্ডী টপকাইয়া শেষ-পূর্ব্ব গণ্ডীতে উপনীত হইল কাষ্টমসের সম্মুখে। খেলার মত খেলা হইল এইবার। প্রতিপক্ষের সম্মুখে কাষ্টমস্ 'হিম্‌সিম্' খাইয়া গেল। লুসিটানিয়ার প্রত্যেক বিভাগের খেলা দেখা গেল কাষ্টমসের অপেক্ষা উন্নত—এই মারে এই মারে। 'মার' কাষ্টমস্ খাইল না—দৈব যেন তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দিল—কেবল বাঁচান নহে জয়মাল্য পরাইয়া দিল। একদিন ০-০ খেলার পরে দ্বিতীয় দিনে কাষ্টমস্ জয়ী হইল ১—০ গোলে।

অপরার্দ্ধে বি, এন্, আর, মোহনবাগান ও পোর্ট কমিশনরকে পরাজিত করিল বহু কষ্টে। বম্বে কাষ্টমস্ ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের সে অগ্রগতিতে বাধা পড়িল বি, এন্, আরের সম্মুখীন হইবামাত্র। প্রাণপণ শক্তিতে যুঝিয়াও তাহারা পরাজিত হইল ১—০ গোলে। বঙ্গদেশের দুইটী দল কাষ্টমস্ ও বি, এন্, আর দাঁড়াইল শেষ-গণ্ডীতে। তুমুল সংগ্রাম বাধিল।

কাষ্টমস্ বেটন্-কাপ বিজয়ী দশবার (তখন পর্য্যন্ত)। লীগ-জয়ী তাহারা হইয়াছে পনের বার। লীগ্ ও কাপ দুইই তাহারা জয় করিয়া লইয়াছে তখন পর্য্যন্ত আ ট বা র—সুদীর্ঘ তাহাদের অভিজ্ঞতা। পূর্ব্ব বৎসরের জয়-গৌরব রক্ষা করিতে বি, এন, আর প্রাণপণ করিয়া দাঁড়াইল—ক্রীড়া-নিপুণতায় কাষ্টমসকে প্রতিপদে চমক লাগাইয়া দিল। শেষ-রক্ষা কিন্তু হইল না—অভিজ্ঞতার জয় হইল—বি, এন, আর প রা জি ত হইল এক গোলে। এই খেলার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ১৯৩৮-এর হকি খেলা শেষ হইল। বেটন-কাপের দৌলতে ভা র ত ব র্ষে হকি খেলায় বঙ্গদেশের প্রাধান্য আর একবার প্রতিপন্ন হইল।

অন্যান্য প্রতিযোগিতায়—আলিগড় ইউনি-ভার্সিটি জয় করিয়া লইয়াছে লক্ষ্মীবিলাস কাপ। কাভিয়ান কাপ জয়ী হইয়াছে 'কলেজিয়নস্'. বেঙ্গল চ্যালেঞ্জশিল্ডে বাজীমাৎ করিয়াছে মিলিটারী-মেডিকাল্।

ফুটবলের কথা—হকি শেষ হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর ফুটবল-লীগ-প্রতিযোগিতা কলিকাতায় সুরু হইয়া গিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর লীগে প্রতিযোগী দলের (দেশীয়) গত বৎসরের অনেক খেলোয়াড় এদল ওদলে যাওয়ায় নূতন করিয়া দল-গঠন যাহা হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন দলের ক্রীড়াশক্তির তারতম্য ঘটা অনিবার্য্য। শুনিতে পাওয়া

যাইতেছে ইষ্টবেঙ্গলের দল এবার গঠিত হইয়াছে যে ভাবে তাহাতে মোহামেডনের আবার লীগ-জয়ী হওয়া কঠিন হইবে। কোনোবারেই দাঁড়াইয়া, জিরাইয়া মোহামেডান লীগ জয়ী হয় নাই, এক প্রাণে সঙ্ঘ-শক্তির পূর্ণ বিকাশেই জয়যাত্রা তাহাদের সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ক্রীড়াকুশলতায় ইহাদের খেলোয়াড়েরা প্রতিযোগী অন্য কোনও কোনও দলের কোনও কোনও খেলোয়াড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও সঙ্ঘ-স্বার্থ অটুট রাখিবার চেষ্টায় তাহাদের ঐকান্তিকতা হটাইয়া দিয়াছে অপর সকল দলকেই। আমাদের বিশ্বাস মোহামেডানের এভাব বজায় থাকিলে এক আধ জন খেলোয়াড়ের অদল বদলে তাহাদের কিছু আসিয়া যাইবে না। গত বৎসরের নিদারুণ অভিজ্ঞতা এ বৎসরে কাজে লাগাইবার রকম ইষ্টবেঙ্গলের দেখিতেছি না—ই বি আর-এর সঙ্গে বৎসরের ইহা বজায় কিন্তু থাকিবে না—'রেঙ্গুন চালান' শীঘ্রই পৌঁছাইবে বলিয়া প্রকাশ। আমাদের মনে হয় এ বৎসরের এখানকার ফুটবল খেলা গত বৎসরের অপেক্ষা নিম্ন স্তরের হইবে—যত তোড়জোড় যতদিকেই হউক না কেন। গোরার দলের দু'একটা খেলার পরে এ সম্বন্ধে আমাদের স্থির মতামত জানাইবার সুবিধা হইবে।



টেলর (ক্যালকাটা ক্লাবের নেতা) নুর মহম্মদ (মোহামেডন স্পোর্টিং) সন্মথ দত্ত (মোহনবাগান)



মোহামেডন স্পোর্টিংএর কয়েকজন খেলোড়াব

প্রথম খেলাতেই তাহারা কাৎ হইয়াছে। এ খেলার সময়ে মোহমেডান বা মোহনবাগানের খেলা আরম্ভ হয় নাই। স্থানীয় খেলোয়াড় লইয়া গত বৎসরে মোহনবাগানের খেলা একেবারে নৈরাশ্য জনক হয় নাই—খেলোয়াড়-বদল ঘন ঘন না হইলে ফল আরও সন্তোষজনক হইত — আমাদের বিশ্বাস। আশা করি স্থানীয় খেলোয়াড়ের উপর অধিক ভরসা মোহনবাগান এ বৎসরেও করিবে। ক্যালকাটা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা জোরাল শুনিয়াছিলাম—এরিয়াণের বিপক্ষে তাহাদের খেলায় কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। লীগ্-তালিকায় 'ভদ্রলোকের' মত স্থান পাইতে হইলে এরিয়াণকেও আরও ডাঁটো হইতে হইবে। কালীঘাট তাহাদের প্রথম খেলায় স্থানীয় খেলোয়াড় লইয়াই খেলিয়াছে।

আই-এফ্-এ—

লেখক আই-এফ্-একে জন্মাইতে দেখিয়াছে। ইহার মঙ্গল-সাধনে অযাচিত ভাবে প্রাণপণ করিতে ইতস্ততঃ কখনও করে নাই। ওয়াইল্ডার, নর্ম্মান্-প্রিচার্ড, মিলার প্রভৃতি ইহার সম্পাদকেরা আজ থাকিলে একথা তাঁহাদেরই মুখে শুনা যাইত। তবে আই-এফ্-এ গঠনে একমাত্র বাঙালী উদ্যোগী শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ এবং কাউন্সিলের প্রথম বাঙালী সদস্য শ্রীকালীচরণ মিত্র এখনও আছেন তাঁহারা লেখকের কথার প্রতিধ্বনিই করিবেন। এক সময়ে আই-এফ্-এর গর্ব্বে আমরা গর্ব্বিত হইয়াছি। সেই আই-এফ্-এর বিপক্ষে সহজে কোনও কথা বলা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে—বলিতে হয় কর্ত্তব্য বোধে আই-এফ-এর অকর্ত্তব্যের কারণে। বহির্চাকচিক্যের জৌলসে আই-এফ্-এ বড় হয় নাই—বড় থাকিবেও না যত 'ডামাডোল' চলুক না কেন। আই-এফ-এ বড় হইয়াছিল ক্রীড়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সদস্যদিগের একপ্রাণতা

ও আপ্রাণ চেষ্টায়। তাহা রক্ষা করা সম্ভব সেই জাতীয় সদস্যগণের যোগ্য পরিচালনায়। ইহা হয় নাই বলিয়া বাহিরের লোকের 'ফেডারেশনের' ধুয়া তুলিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইয়াছে। আই এফ্ এর এই শোচনীয় ভাঙ্গনের জন্য দায়ী আমরা কাহাকে করিব? কয়বৎসর পূর্ব্বে শীল্ডের শেষ-গণ্ডিতে 'রেফারী' গিরির প্রতি দোষারোপের পরে ফেডারেশনের জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয় -'মতলবী'দের ইহা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, এ কথা আমরা ভুলিতে পারি না। তাহার পরেও অ-খেলোয়াড় রেফরীর রেফরীগিরিতে অনেকেই অনেক আপত্তি করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা কল্পনার অতীত—আই এফ্ এ অ-খেলোয়াড়কে রেফরী হইতে দেয় কেমন করিয়া! দেয় বলিয়া নামজাদা দল 'যো' পাইয়া বসে এবং অঙ্গুলি-অগ্রভাগে আই এফ্ এ-কে যদিচ্ছা নাচায়—এত উন্নতি আই এফ্-এর হইয়াছে। এ উন্নতি আমরা সহ্য করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের এ'ত কথা বলা। আরও কথা আছে; আই-এফ-এর অন্তঃর্ভুক্ত খেলোয়াড়-অদল-বদল প্রহসন। মুন্সিপালী বা কাউন্সিলী নির্ব্বাচন প্রহসনকেও ইহা ছাপাইয়া যাইতেছে এবং আই-এফ-এ প্রাণভরিয়া ইহা উপভোগ করিতেছে—ইহার ফল কি দাঁড়াইতেছে, লাঙ্গুল হেলনে দেখিবারও পরিশ্রম করিতে কাতর। 'পরদেশী' খেলোয়াড়ের প্লাবনে পরিশ্রম দেশ কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে গ্রাহ্যও নাই। খেলার শোচনীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে কোনও চেষ্টা নাই। ওদিকে কিন্তু আসরের ফাঁকি বাজির বাহার দেখাইতে দলে দলে ডিক্, টম্, হ্যারি কোম্পানীকে আনান আছে। তাহার উপর আছে ব্যয়সাধ্য কিন্তু নিরর্থক শফরের উপর শফর। নানাভাবে আমরা এই সকলের সম্পর্কে আমাদের ঘোর আপত্তির কথা বার বার জানাইয়াছি। তথাপি এ সকলের প্রতিকার করিবার চিহ্নও আই-এফ-এর-এর পক্ষে দেখা যাইতেছে না। ইহার প্রমাণ—আই-এফ্-এ এখন অষ্ট্রেলিয়াগ্রস্থ। দালাল ছুটাছুটি করিতেছে। বিভিন্ন ক্রীড়াসঙ্ঘকে এ কথা জানান আমাদের কর্ত্তব্য বোধ করিলাম। তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা করুন। ব্রহ্মদেশীয় দল এখানে আসিয়া খেলার প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা সমর্থন করি।

আগা খাঁ হকি কাপ—বোম্বায়ের এই সুপ্রসিদ্ধ হকি-প্রতিযোগিতায় টিকমগড় কিরকিকে তিন গোলে পরাজিত করিয়া কাপজয়ী হইয়াছে। জয়ীদল গঠিত হয় হিরোজ্ স্পার্টান ও ভোপালের নামজাদা খেলোয়াড় লইয়া।

খয়রাতি খেলা—'রাম না হইতে রামায়ণ' হইবার নজীর যখন রহিয়াছে তখন ফুট্‌বলের আসর বসিতে না বসিতে "খয়রাতি" খেলা খেলানয় দোষ ধরা আইনে চলে না। তা না চলুক, কিন্তু সে খেলা দেখিতে দর্শক বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। কাজেই এই খয়রাতি খেলায় টিকিট বিক্রয় বড় সুবিধার হয় নাই। খেলাও জমে নাই—মোহড়ায় যাহা হয় তাহাই হইয়াছিল। টিকিট যাহারা কিনিয়াছিল চ্যারিটি-ম্যাচের উপযোগী খেলা তাহারা দেখিতে পায় নাই। তাহার উপর নামজাদা এন্ ঘোষ 'অবশিষ্টের' দলে না থাকায় প্রায় সকলেরই বিরক্তির সীমা থাকে নাই। মোহামেডন জয়ী হয় এক গোলে।

'এফ্ এ কাপ'—লণ্ডনের ফুট্‌বল এ্যাসোসিয়েশন কাপ-জয়ী এবার প্রেষ্টন্—হাডারস্‌ফিল্ড টাউন পরাজিত হইয়াছে। খেলায় রাজা ও রাণী উপস্থিত ছিলেন। বিশাল জনতা ব্যতীত এই দুই প্রতিযোগী দলের প্রত্যেক দলের সমর্থক উপস্থিত ছিল দশ হাজার করিয়া। তাহাদের উত্তেজনার সীমা ছিল না। তথাপি তাহাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি বা কোনও গণ্ডগোল হয় নাই। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ১১৪ খানি স্পেশাল্ ট্রেন্ দেওয়া হইয়াছিল।

লণ্ডনে অষ্ট্রেলিয়া—দুই দলের ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা (টেষ্ট্) আসন্ন। ব্রাড্‌ম্যানের ব্যাট্‌ম্‌দারী সমান তেজে আরম্ভ হইয়াছে—দ্বিশতাধিক মারদৌড়ের বহর ইহারই মধ্যে তিনি দেখাইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাডকফ্, ফিন্‌গলটন প্রভৃতি তাঁহার দোসররূপে আসর গরম করিয়া তুলিয়াছেন। ম্যাকেবের ক্রীড়াদক্ষতায়ও দর্শক উল্লসিত।

লণ্ডনগামী ভারতীয় দল—রাজপুতানা ক্রিকেট্ ক্লাবের উদ্যোগে ভারতীয় একটী ক্রিকেট দল গত ১৪ই এপ্রেল লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছে। মাদ্রাজ এবং বেহার ও উড়িষ্যা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য সকল

প্রদেশেরই খেলোয়াড় এই দলে আছে। বাঙালার কার্ত্তিক বসু ও কে ভট্টাচার্জ্জ এই দলভুক্ত হইয়াছেন। দল গঠনে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকে, খেলায় সরেস অথচ লণ্ডনে পূর্ব্বে খেলিবার সুযোগ পান নাই, এই দলের



হ্যামেন্‌স্—(ইংলণ্ডের নেতা)



ব্র্যাডম্যান—(অষ্ট্রেলিয়ার নেতা)

জন্য খেলোয়াড় লইতে হইবে তাঁহাদিগকেই। এই দল লণ্ডনে খেলিবে বাইশটী খেলা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই দলের সাফল্য কামনা করি। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ইহাদের খেলা আরম্ভ হইবার কথা। প্রবর্ত্তক ছাপা হইবার সময় পর্য্যন্ত খেলার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

'বাঙ্‌লার নিজস্ব'—বঙ্গদেশীয় খেলা-ধূলার আলোচনা করিতে আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে আমরা অনুরুদ্ধ হই। তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমারাই 'প্রবর্ত্তকের' মারফতে একাধিকবার তাঁহাদিগের সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছি, আপনাপন গ্রাম বা নগরের খেলা-ধূলার সংবাদ নিয়মিত ভাবে আমাদিগকে পাঠাইতে। আমাদের সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। সংবাদ লইয়া আমরা জানিয়াছি—গ্রামে গ্রামে ফুটবল, ক্রিকেটের রেওয়াজই বেশী, বাঙলার নিজস্ব খেলা-ধূলা খেলিবার মত খেলিতে কাহারও উৎসাহ নাই। খাস কলিকাতার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ, তবে





কমল ভট্টাচার্য্য কার্ত্তিক বসু

লণ্ডনগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলের দুইজন

বাহাদুরী দেখাইবার জন্য মাঝে মধ্যে কোথাও কোথাও কেহ কেহ 'স্বদেশী' লইয়া হাঁকডাক করেন—তাহাতে না আছে কাহারও প্রাণ, না আছে কাজের অন্য কিছু। থাকিবার মধ্যে থাকে, ক্ষণিক খেয়ালী উত্তেজনা। তাহাও পর্য্যবসিত হয় সস্তায় নাম কিনিবার অভিসন্ধিতে। প্রকাশ-যোগ্য সংবাদ পাইলে সাদরে আমরা তাহা প্রকাশ করিব।

টাট্‌কা খবর—লীগে ইষ্টবেঙ্গল ভবানীপুরের সহিত ১-১ গোল করিয়া পরাজিত হয়, কে, ও, এস্, বি'র কাছে ১-০ গোলে। ভবানীপুর পরাজিত হইয়াছে ক্যালকাটার কাছে ১-০ গোলে। আর কয়েকটী খেলার ফল এই :—মোহামেডন বনাম কাষ্টমস্ (১-০), মোহনবাগান বনাম কালীঘাট (০-০), মোহনবাগান বনাম পুলিস (১-১) পুলিস বনাম এরিয়ন্‌ (৫-০)।

নূতন পথে

শ্রীমতিলাল রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক দিন, দুই দিন, এমন কতদিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, যোগেশ কথায় কথায় বুঝিয়া লইল—মহাপুরুষের ইহা কেন্দ্রস্থান। বাংলায় এমন মনোরম স্থান থাকিতে পারে, যোগেশ তাহা কল্পনা করে নাই। নীলসিন্ধুজলবিধৌত তটপ্রান্ত, প্রথম সূর্য্য-কিরণে স্বর্ণক্ষেত্রের ন্যায় ঝলসিয়া উঠে, প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকরতাপে মরীচিকা সৃষ্টি করে, গোধূলির ম্লান আলোকে কুহেলী খেলিয়া বেড়ায় কূলে কূলে, অন্ধকার রাত্রে গভীর সাগরগর্জ্জন শুনা যায়। জ্যোৎস্না-রাত্রে শিল্পীর হাতে স্বর্গ-রচনা হয়। আর দূরে দূরে নয়নমুগ্ধকর বনানীকুঞ্জ, নাতি-উচ্চ গিরিমালা চলিয়াছে কোন দূর লক্ষ্যে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মাঝে মাঝে সমতল ভূমি। বৌদ্ধদের ধর্ম্মমন্দির বেষ্টন করিয়া পার্ব্বত্য জাতির পল্লীরচনা। প্যাগোডায় বৃহৎ কাষ্ঠে ঘা দিয়া ফুঙিরা বিচিত্র বাদ্যধ্বনি করে। মগের মেয়েরা থালি সাজাইয়া আহার্য্য লইয়া ছুটে, ভিক্ষুব্রতীদের এই জীবনধারণ-নীতি সমাজে দৃঢ় শিকড় গাড়িয়াছে।

এমনই নিভৃত প্রদেশে মহাপুরুষ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আছেন, দত্তা দেবীও আছেন; কিন্তু যোগেশের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয় নাই। প্রয়োজন হয় নাই। যোগেশ এই বিষয়ে উদাসীন। কথায় কথায় জানিবার কিছু বাকি রাখে নাই সে। কল্পনা মানুষের চিত্ত অধিক অভিভূত করে। কাব্য, চারুশিল্প, কলাবিদ্যা মানুষের সুকুমার বৃত্তি। এখানে এক অভাবনীয় অধ্যাত্মবিদ্যার স্বপ্ন সৃজন করিয়া মহাপুরুষ বন্দী করিয়াছেন কয়েক জনের জীবন। চিত্ত তাদের স্বপ্নমুগ্ধ। বুদ্ধি তাদের নিদ্রাভিভূত। স্বচ্ছ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন। দিবারাত্রি স্বপ্নের বিরাম নাই। কথা কয়দিন চলিল; তার পর এই নিরালা স্থানে নৈষ্কর্ম্যময় জীবনে কথার প্রয়োজন বেশী নাই, অন্য সকলের মত যোগেশও স্তব্ধ হইয়া পড়িল। বুকে তার কর্ম্মপ্রেরণা; কিন্তু মস্তিষ্ক আলস্যে জড়িমায় তুষার-শীতল হওয়ায়, চিত্ত মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠিলেও, তাহার জন্য দুর্ভাবনা জাগে না। মস্তিষ্ককোষে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না। ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে শয্যাত্যাগ, ভোজন, প্রার্থনা, শয়ন, নিদ্রা যন্ত্রের ন্যায় চলিতে থাকে, পরিতৃপ্তির জীবন। পরাধীন পরাজিত জাতি, কৃষক শ্রমিকের নিষ্ঠুর সমস্যা, বেকারজীবনের হাহাকার, রোগ, মারী, প্রবলের অত্যাচার। অতি দূরে নিকৃষ্ট জীবনের কদাকার ছন্দঃ। এখানে গভীর অসীম নীল জলের হিল্লোলে হিল্লোলে শান্তির আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়। হরিৎ, পীত, নীল বনানীকুঞ্জ দিবালোকে ঝলসিয়া উঠে—কখন অন্ধকারের ঘনিমা বাড়ায়, আবার কখন বা চাঁদের আলোয় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। দিন চলে নির্ব্বিবাদে। দুশ্চিন্তা অন্তরের স্বকৃত দৈন্য। কোন প্রয়োজন নাই দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষের; শান্তির জীবন, আনন্দের জীবন। প্রাণ শিথিল হইয়া পড়ে। মনে রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে প্রকৃতির সুবিলাস। মস্তিষ্কে স্বপ্নালোক নামিয়া আসে, ধীর-পদ-সঞ্চারে। চরণে কিঙ্কিনীর সুমধুর আরাব। ফুৎকারে ফুৎকারে বাজে মন প্রাণ শীতল করা মধুবাঁশী। আরও প্রাণ মন আরামে ঘুমাইয়া পড়ে, মাঝে মাঝে বীণার ঝঙ্কার উঠে কোন স্বপ্নপুরী থেকে। যোগেশের স্মৃতি জাগিয়া উঠে দত্তা দেবীর স্বপ্নে।

কতদিন কাটিয়া যায়; মাস তারিখের খবর কেহ রাখে না। পথে বাহির হইলে, এখানে বাঙ্গালীর মুখ দেখা যায় না। যারা এদেশের অধিবাসী, জগতের খোঁজ তাদের নাই। পল্লীপথে তারাও হাসিয়া বেড়ায়, গান গাহিয়া গিরিপথে ছুটিয়া চলে, এ এক সুখের দেশ। দুঃখের লেশ যেন নাই।

ঘন বরষায় আকাশ সেদিন ঝাঁপিয়া আসিয়াছে। বেণুকুঞ্জ দুলিয়া দুলিয়া জলধারা মাথা পাতিয়া লইতেছে। কত সুখ, কত আনন্দ! বনস্পতির শ্যাম-শোভায় নয়নাভিরাম দৃশ্য, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সগর্জ্জনে যেন

হাঁপাইয়া উঠে। ঝর ঝর বর্ষধণারার শব্দ; আশ্রমের কাহারও মুখে কথা নাই। আজ যেন যোগেশের কিছু জানিবার আছে। যেন এই একটী কথা আজ অবগত না হইলে, প্রাণ আর টিকে না। প্রাবৃটের ঘন-ঘটার ন্যায় হৃদয়ের মেঘ এমনই ঘনাইয়া আসিয়াছে, এখনি তাহা চৌচির হইয়া ফাটিয়া বিদ্যুৎ বাহির হইবে, তাই হরিসাধনকে সে ধরিয়া বসিল, বলিল "এমন করে' কতদিন যাবে! বৌদ্ধ-শ্রমণদের মত এই নিভৃত বাস। শান্তির আশ্রয় বটে, কিন্তু হিমালয়ের দুর্গম তুষারস্তূপের ন্যায় জীবনের এই অচাঞ্চল্য, স্থির, শীতল, গম্ভীর ভাব যে প্রসন্নতা দেয়, তাহা কি নিখিল মানবজাতির প্রাপ্য হতে পারে না?"

হরিসাধন বলিল "বেশী কথা এখানে কইতে নাই। আমারও মনে এ প্রশ্ন একদিন এসেছিল। এ জীবনগ্রহণের সহায় হয়েছিল, আমার দুরারোগ্য ব্যাধি। মানুষের চেষ্টা ও অধ্যবসায়জনিত যে কর্ম্ম, তার মূলে আছে বাসনা আর অহঙ্কার। কত জীবন ক্ষয় হয় কর্ম্মে, কিন্তু মূলের গলদ দূর হয় না কোনদিন; তাই এই নিবিড় তপস্যা। কর্ম্ম বড় নয়, ভগবান বড়। ঈশ্বরপথে চলার সুপ্রভাত যাদের, তারা একে একে এখানে উপস্থিত। যেদিন লক্ষ্য সিদ্ধ হবে, ভগবান কাজ করবেন জীবনে। সেদিন অহঙ্কার, বাসনার দায়ে নয়, সে কর্ম্ম ঈশ্বরের ইচ্ছা। জীবনের সার্থকতা এইখানে।"

"এও বাসনা নয়, অহঙ্কার নয়, কে বলবে? এখানেও চেষ্টা নাই, অধ্যবসায় নাই, তাও বা কে বলতে পারে! আমি তো দেখছি কত কর্ম্মপ্রেরণা, কত ভাবপ্রেরণা, কত আকর্ষণ, কত যত্নে, কত প্রচেষ্টায় যে বারণ করে রাখতে হচ্ছে হৃদয় চেপে', তা' ব্যক্ত হয় না কথায়। শুধু হরিসাধন দাদা তোমাদের মহৎ সঙ্গে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে, যে মোহ ছাড়ার শক্তি পাই না; তাই পড়ে' আছি। তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছি। আর এই আকর্ষণটাই যে কাম্য নয়, তাই বা বলি কি ক'রে?"

"এ কামনা জীবনের উর্দ্ধমুখী প্রেরণার লক্ষ্যে। সব যখন স্থির হয়ে আসবে, পৃথিবীর দুশ্চিন্তা আর বিন্দুমাত্র থাকবে না, ভগবানের যন্ত্র বলে' নিজেকে যখন বুঝবে, সবখানি অন্তঃকরণ তখনই উর্দ্ধমুখী হবে। আজিকার কামনা রূপান্তরিত হবে ঈশ্বরেচ্ছায়। এই মহামানবতার সাধনায় মহাপুরুষ যাদের আজ চিহ্নিত করেছেন, তাঁর ইচ্ছা—তুমিও তাদের একজন হও। তাই তোমার মুক্তির দিনে তাঁরই নির্দ্দেশে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার, আর এই জন্য তুমি আজ এখানে।"

"কিন্তু এ রকম ইচ্ছাটা আমার নাই। যদিও এই আরামের জীবনটা খুবই কাম্য। বিশেষ তোমাদের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তিদের সংসর্গ অতিশয় অভিপ্রেত। কিন্তু এইজন্য পিতৃস্নেহ উপেক্ষা করিনি। জীবনের স্বভাবধর্ম্মে আস্থা হারাইনি। আমাদের দেশ আছে, আমাদের জাতি আছে। দেশ পরাধীন, জাতি উৎসন্নের পথে, এমন কল্পনার ফানুষের মত মৃদুমন্দ পবনে এখানে দোল খেয়ে একটা তৃপ্তি থাকলেও, মানুষের কর্ত্তব্য-রক্ষা ইহাতে হয় না। এই জীবনের জন্য ঋণী আমরা অনেকের কাছে। সে ঋণ পরিশোধ করতে হবে আপনার সবখানি দিয়ে; দেশকে, জাতিকে ফাঁকি দিয়ে এই যে সুগম জীবনযাত্রা, তা' আমার শ্রেয়ঃ মনে হয় না। হরিসাধন দাদা, এখানের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আছে পরিশ্রমসিক্ত কর্ম্মরত জাতিরই রক্ত-দান। তা' থেকে বিরত হয়ে এই স্বচ্ছন্দ জীবন, তাদের প্রতি ত অবিচার, আত্মারও অকল্যাণ।

হরিসাধন ধীরে ধীরে বলিল—"ভাবলে অনেক সত্য-মিথ্যা বিচার আসে। এখানে কিছু ভাবতে নেই। সব চেয়ে নিষেধ ভাবার। আমাদের মস্তিষ্কবৃত্তিকে ধারণ করতে হবে উর্দ্ধলোকের দান। তাই চাই সর্ব্বপ্রথম—সর্ব্ববিধ ভাবনার উৎসর্গ। তারপর হৃদয়, প্রাণ ও দেহের বৃত্তি মস্তিষ্ককে বার বার বিচলিত করার চেষ্টা করবে। মস্তিষ্ক বাহিরের খোঁচা থেকে মুক্তি পেলে, ইহা সম্ভব হতে পারে—এইজন্যই এই নির্জ্জন স্থানে মহাপুরুষের নবতীর্থ-রচনা। বাহিরের স্পর্শ রুদ্ধ হওয়ার পর, অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত ধীরে ধীরে স্তব্ধ হবে। নিথর নিস্তব্ধ বোধবৃত্তির উপর তবেই ঈশ্বরভাব অবতরণ করবে, তখন অতীতের প্রভাবমুক্ত স্তব্ধ অন্তঃকরণে এই অমরলোকের চেতনা নূতন অভিব্যক্তি দিবে জীবনে। জগতের ভবিষ্যৎ এইরূপ অভিনব মানবজন্মের উপরই নির্ভর করে।

মহাপুরুষ তোমার আধারকে ইহার পক্ষে যোগ্য মনে করেন।"

যোগেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "কতদিন আপনি এখানে এসেছেন ?"

"আট দশ বৎসর হয়ে গেল।"

"আর যুগল ?"

"তুমি দেবলগাঁ আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার পরই মহাপুরুষ তাকে এখানে থাকার অধিকার দিয়েছেন।"

"সুবোধ এল কবে ?"

হরিসাধন যোগেশের মুখের দিকে চাহিল। যোগেশ বুঝিল, সে যেন কিছু লুকাইতে চাহে। যোগেশ তাহাকে সে অবসর দিল না, বলিল "উমাকে বোধহয় সে-ই এখানে নিয়ে এসেছে ?"

হরিসাধন বলিল "হাঁ। কিন্তু উমা এখানে থাকতে পারল না। মহাপুরুষ বলেন, এখনও তার সময় হয়নি।"

একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া যোগেশ বলিল—"কোথায় এখন সে ?"

"দেবলগাঁয়ে।"

কথা এইখানেই বন্ধ হইল। যোগেশের অনেক কিছু প্রশ্ন ছিল, কিন্তু তাহাতে আর প্রবৃত্তি হইল না। হরিসাধনও চুপ করিয়া রহিল। সে দিন যোগেশ আর কাহারও সহিত কথা কহিল না।

যোগেশ দেবলগাঁয়ে ফিরিবার জন্য হরিসাধনের নিকট বিদায় চাহিল। হরিসাধন বলিল "তোমার দেবলগাঁয়ে যাওয়া হবে না।"

যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল "কেন ?"

—"তুমি দত্তা দেবীর কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তা' ভঙ্গ করেছ।"

"দেবলগাঁয়ে যাওয়া এইজন্য যদি নিষিদ্ধ হয়, এখানে থাকারও আমার অধিকার নাই।"

"ইহার উত্তর মহাপুরুষ দিতে পারেন।"

"সেই ভাল, তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চাই।"

হরিসাধন সে ব্যবস্থা করিয়া দিল।

যোগেশ দেখিল—মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, আর সম্মুখে দত্তা দেবী বীণা বাজাইতেছে। যোগেশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই দত্তা দেবী উঠিয়া দাঁড়াইল।

যোগেশ সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল। তৎক্ষণাৎ মনে হইল, এত রূপ উমার নহে। দত্তা দেবী যোগেশকে দেখিয়া একটু হাসিল, ইহা পরিচয়ের হাসি। বহুদিনের পর আপনার জনকে হাসির ভাষায় ইহা অভিনন্দন। দত্তা দেবী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যোগেশ ভূনত হইয়া মহাপুরুষের পদধূলি লইল। কথা কাহারও মুখে নাই। অনেক ক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যোগেশ বলিল "আমি বিদায় নিতে এসেছি।" মহাপুরুষ হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

পাশের ঘরে বীণার ঝরণা ঝরিতেছে। যোগেশ মনে করিল, মানুষটীর কোন কাজ নাই, ইহা লইয়াই দত্তা দেবী আছে। কিন্তু বীণা যে কি বলে, আকুতির মূর্চ্ছনা বিনাইয়া বিনাইয়া অব্যক্ত কত কথা, শুনিতে শুনিতে চিত্ত বিভোর হইয়া যায়! হঠাৎ বীণা বন্ধ হইল। মহাপুরুষ কহিলেন "কলিকাতায় যাবে ?"

"কলিকাতায় ? না, বাড়ী আর ফিরব না। আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন আর নয়। একবার দেবলগাঁয়ে যাব ?"

"কেন সেখানে কি ?"

যোগেশ যেন একটা মিথ্যা বলিতে যাইতেছিল। এক নিমিষে তাহা রোধ করিয়া বলিল "উমার সঙ্গে একবার দেখা করব।"

"তার পর ?"

"তার পর দেশের মুক্তি-সাধনা এখনও অসমাপ্ত। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই কাজেই আপনাকে নিয়োগ করব।"

"সে কর্ম্ম তোমার অভাবে অসম্পন্ন হবে না।"

"তা, জানি। কিন্তু এই মহাযজ্ঞে আপনাকে বলি দিতে পারলে, জীবন ধন্য হবে।"

"জীবন ধন্য হওয়ার আরও পথ আছে, আরও বৃহত্তর কর্ম্ম আছে।"

"তা' আমি জানি না। দেশের উন্নতি, জাতির স্বাধীনতার চেয়ে জীবনে আর কিছু বড় থাকতে পারে, এ বিশ্বাস আমার নেই।"

"যদি থাকে?"

"সেটা মানুষের একটা কল্পনা। জাতির দুঃখকে এড়িয়ে চলার ফিকিরও বলা যেতে পারে।"

মহাপুরুষ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে উৎকট হাসির শব্দে ঘরখানি কাঁপিয়া উঠিল। তারপর বলিলেন "জাতি স্বাধীন হবে, দেশের উন্নতি হবে—এর চেয়ে বড় স্বপ্ন দেশবাসীর কি আর থাকতে পারে, তার জন্য যে আয়োজন, এই নিয়েই প্রশ্ন। একদিন মনে হয়েছিল—অস্ত্রবলে স্বাধীনতা লাভ হবে। আজ দেখা যায়, অহিংসনীতি স্বাধীনতার্জ্জনের ব্রহ্মাস্ত্র। আমি দেখি—দেশ থাকবে, মানুষও থাকবে; বিশ্বের পরিবর্ত্তন এমনও আসতে পারে, যে এদেশের মানুষ বাধ্য হবে স্বাধীনতা নিতে। সেও এক নূতন বিধান। কিছুর জন্য যে দুর্ভাবনা, সেইটাই আমাদের প্রতিভার দৈন্য।"

"কি বলেন আপনি? স্বাধীনতার জন্য এত প্রাণ বলি, এত ত্যাগস্বীকার—একদিন বাধ্য হবে দেশ স্বাধীনতার মুকুট মাথায় নিতে! আশ্চর্য্য কথা।"

"আশ্চর্য্য কিছু নয়। একদিন যেমন পরাধীনতার শৃঙ্খল বাধ্য হয়েই হস্তপদ বদ্ধ করেছে, এমনি বাধ্য হয়েই স্বাধীনতা নিতে হবে। ভারতের ইহাই ভবিতব্য। তার জন্য প্রয়োজন অস্ত্রবল নয়, উত্তেজনাসৃষ্টি নয়; গঙ্গোত্রীকে বহন করার জন্য ধূর্জ্জটির জন্ম হয়েছিল। হিমাদ্রিশির তার জন্য উন্নত ছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ মাথা পেতে নিতে নূতন জাতি চাই, জাতির নূতন জন্ম চাই।"

"কি বলছেন আপনি?"

"আমি সত্য বলছি। স্বাধীনতা মানুষের দাবী নয়, আত্মার দাবী। সে মুক্তি চায়। ভারতাত্মা মুক্তিপ্রার্থী আজ। বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন তাহারই লক্ষণ। আজ যাহা স্বপ্ন, কাল তাহা জাগ্রত বিগ্রহ হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীতে। ভারতের জাতীয়তা তাই শুধু ভাব নয়, তারও বিগ্রহ আছে।"

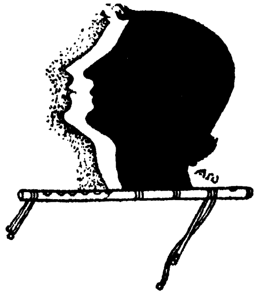
"কি সে বিগ্রহ?"

মহাপুরুষ যোগেশের দক্ষিণ হস্ত আপনার বামহস্তে চাপিয়া ধরিলেন। স্পষ্ট দিবালোক যোগেশের চক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া দিল। যোগেশ বলিল "হাত ছাড়ুন, চক্ষে আমার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।"

মহাপুরুষের দৃঢ়মুষ্টি দৃঢ়তর হইল। যোগেশ দেখিল, ঘনান্ধকার তরল হইয়া আইসে, একটা ধূসর বর্ণের মণ্ডল পটভূমি সমুজ্জ্বল নীলবর্ণে রঞ্জিয়া উঠে। তারপর দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় ক্ষেত্র। মধ্যে চিরপরিচিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। এ রূপ আগেও দেখিয়াছে যোগেশ। আজ আবার দেখিল। মহাপুরুষের গুরুগম্ভীর কণ্ঠশব্দে সেই পূর্ব্ব কথা—"ভারত জাতীয়তার এই বিগ্রহ-মূর্ত্তি। মনে রেখো, এই দণ্ড রাষ্ট্র। এই শঙ্খ তার কৃষ্টি। এই পদ্ম নব সৃষ্টি। এই চক্র তাঁর সংহতি। জাতির অন্তরে অন্তরে এই বিগ্রহকে রূপ দিতে হবে। তবেই মুক্তির গঙ্গোত্রীধারা ভারত মাথা পেতে নেবে। তারই আয়োজন এইখানে।"

যোগেশের সংজ্ঞা মহাপুরুষের বাণী শুনিতে শুনিতে বিলুপ্ত হইল। তারপর কি হইল, ইহা সে জানে না।

(ক্রমশঃ)



মত ও পথ

উড়িষ্যার মন্ত্রিত্ব-সঙ্কট

উড়িষ্যার গভর্ণর স্যার জন হাব্বাকের স্থলে একজন অধস্তন রাজকর্ম্মচারী মিঃ ডেনের নিয়োগ-প্রস্তাব লইয়া উড়িষ্যায় পুনরায় মন্ত্রিত্ব-সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কাল যিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারীরূপে কর্ম্ম করিয়াছেন, আজ তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে দেওয়া হইলে, তাহা যে কি গভর্ণর, কি মন্ত্রিমণ্ডল, উভয়েরই পক্ষে বিবিধ প্রকার অসুবিধার কারণ হইতে পারে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। এইরূপ অনুমান ও আশঙ্কা লইয়াই উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল উক্ত ব্যবস্থার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন—এমন কি, তাঁহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হইলে, তাঁহারা একযোগে পদত্যাগ করার সঙ্কল্পও প্রকাশ করেন। ব্যাপারটা খুবই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী লর্ড লিন্‌লিথগো মহোদয়ের সহিত নিভৃত সাক্ষাৎকারের পর ফিরিয়া এ সম্বন্ধে যে ফিরিস্তা প্রচার করেন, তাহা পড়িলে বুঝা যায়, এই গুরু বিষয়ে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন অভিপ্রায়ের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি ইহার মধ্যে মন্ত্রিমণ্ডলীর মর্য্যাদা ও ক্ষমতার উপর অনর্থক হস্তক্ষেপের পরিচয় পাইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন ও তাহাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যর্থতাই ফুটিয়া উঠিবে, এইরূপ মন্তব্যও করেন। লর্ড লোথিয়ানের মতে, গভর্ণরের নিয়োগে মন্ত্রিমণ্ডলের কিছু বলিবার নাই—কেন না, এ নিয়োগ খাস ভারত-সচিবের এলাকাভুক্ত, ইহাতে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। তত্রাপি তিনি এই ব্যাপারটীকে একটা রাজনৈতিক বেচাল বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারেন নাই।

ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, মিঃ ডেন কার্য্যাবসানে অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে লইয়া মন্ত্রিমণ্ডলীকে পরে আর বিব্রত হইতে হইবে না—অতএব ইহাতেই তাঁহাদের অনবধানতাজনিত ত্রুটির নিরসন হইবে। মহাত্মা গান্ধীজী ও কংগ্রেস কেহই ইহা স্বীকার করেন নাই। আশঙ্কা ছিল—ভারত-গভর্ণমেণ্ট অথবা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সিভিলিয়ানী জিদ হয়ত ছাড়িতে পারিবেন না। কিন্তু সুখের বিষয়, মন্ত্রিমণ্ডলীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহারা এই আশঙ্কা দূর করিয়াছেন। অতঃপর, উড়িষ্যার গভর্ণর স্যার জন হাব্বাক অবসর গ্রহণ করার পূর্ব্ব সঙ্কল্প নাকচ করিয়া একটা ঘনায়মান রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট সুকৌশলে পরিহার করিয়াছেন। ভারত-সচিবও তাঁহার আবেদন অনুমোদন করিয়া সকল দিক্ রক্ষা করিয়াছেন। জিদের বিরুদ্ধে জিদ্ অন্ধতা—উহা রাজনীতির পরিচয় নহে। ইংরাজ জাতির এই অন্ধতার পরিবর্ত্তে বস্তুতন্ত্র রাষ্ট্রদৃষ্টির পুনঃ পুনঃ পরিচয় আমরা অতিশয় প্রশংসনীয় মনে করি।

মহাত্মা-জিন্না-সংবাদ

কলিকাতায় মুসলিম লীগের গত বিশেষ অধিবেশনের পর মিঃ জিন্নার সহিত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি-স্থাপনের জন্য মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে সকল পত্রালাপ করেন, তাহার ফলে 'শ্রীজিন্নার' সহিত মহাত্মাজীর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোম্বাই সহরে এই আলাপ-সভা বসিয়াছে। আলাপের বিশেষ বিবরণ এখনও কিছু প্রকাশিত হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীজির উক্তি হইতে বুঝা যায়, তিনি গভীর নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া শুধু অন্তরের প্রেরণা-বশেই এই মিলন-চেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছেন—কিন্তু ইহার উপর অধিক কিছু আশার সৌধ রচনা করিতে তিনি দেশবাসীকে নিষেধ করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার মনোভাব কিরূপ, তাহা তাঁহার লীগের অভিভাষণ হইতে শুধু নয়, তাঁহার পরবর্ত্তী মন্তব্য হইতেও অনুমিত হইতে পারে। তিনি জানাইয়াছেন যে, এই

মিলন-চেষ্টা তাঁহার দিক্ হইতে আদৌ আসে নাই। এই নির্লিপ্ত ভাব প্রচেষ্টার খুব অনুকূল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। মহাত্মা গান্ধীজির আন্তরিকতায় কোনই অবিশ্বাস নাই—কিন্তু এই ক্ষেত্রে কত দূর ইহা বস্তুতন্ত্র ফলপ্রসূ হইবে, এ সম্বন্ধে দেশবাসীর পক্ষে নিঃসন্দেহ হওয়া সত্যই কঠিন।

ইতিমধ্যে কেহ কেহ এই আলাপের ফল নাকি সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কি ভাবে ইহা সন্তোষজনক হইল, চুক্তির বাস্তব মূর্ত্তি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে আশঙ্কা ও কল্পনা-জল্পনার অন্ত নাই। মহাত্মাজীর উক্তি লইয়া ভাই পরমানন্দ মন্তব্য করিয়াছেন—"the path he (Gandhiji) had chosen was not the right one and that however intense his prayer for light may be, it shall always be covered with darkness." মহাত্মা হয়ত এখনও আশা করেন যে, তিনি মুস্‌লিম-নেতা জিন্নার হৃদয়-পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবেন। ভাই পরমানন্দের ন্যায় অনেক হিন্দুরই তাহাতে আস্থা নাই। ভাইজী বিশেষভাবে বাঙালীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"কিছুদিন পরে বাঙালাদেশ জানিতে পারিবে একটী কথা, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি। মুসলমান নেতারা তাহাদের স্বধর্ম্মীর একটী স্বভাবে সর্ব্বদা নির্ভর করিতে পারে—আর তাহাই মুসলমানের শক্তি। মুসলমানের স্বধর্ম্মের প্রতি এমন অনুরাগ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা, যাহার গুরুত্ব হিন্দু বুঝিতে পারে না—কারণ হিন্দুর নিজের স্বধর্ম্মীর প্রতি সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার একান্ত অভাব।" মিঃ জিন্না যে গান্ধীজির সহিত দেখা করিবার জন্য লালায়িত হন নাই, তাহার মূলে রাজনীতিক চাল ছাড়া স্বধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মীদের উপর এই দৃঢ় প্রত্যয়ই বর্ত্তমান। মহাত্মা মুসলমানকে হৃদয়ের ঔদার্য্যে সাদা চেক ছাড়িয়া দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত—এই ঔদার্য্যের মূলেও হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন উদারভাব ও আদর্শের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও প্রত্যয়ের অনুভূতি আমরা স্বীকার করি—কিন্তু বস্তুতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্রে কৌশলীর হাতে ইহার অপপ্রয়োগেরই যথেষ্ট সম্ভাবনা বরাবর থাকিয়া গিয়াছে। পুণা-প্যাক্টে এই দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। তাহার তিক্ত ফলে বাঙালী আজ জর্জ্জরিত। সাম্প্রদায়িকতার সমাধানে চুক্তির নূতন পর্য্যায় সম্বন্ধে বাঙালীর দুশ্চিন্তাই সব চেয়ে গভীরতর। সাদা চেকের সুফলের পরিচয় বাঙালী আজ পর্য্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই পায় নাই। স্বধর্ম্মানুরাগের পথে যে সমাধান, সেই দিকেই অতঃপর তাহার অন্তরাত্মা অবহিত হইতে চায়।

ভারতের জনসংখ্যা-সমস্যা

ভারতের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে। বর্ত্তমানেই আদমসুমারীতে গণনানুসারে, এই সংখ্যা ৩৭ কোটী ৭ লক্ষের উপরে গিয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর গণনায় ইহা ছিল ৩৫ কোটী ৩ লক্ষ। বৃদ্ধির হার গড়ে বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ ধরিয়া লইলে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা ৪০ কোটী সংখ্যায় পৌছিবে। ইহা মহাচীনের সমতুল্য। এই হারে ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে মহাচীনের জনসমষ্টিকে অতিক্রম করিবে।

এই বিপুল জনসংখ্যার উপযোগী খাদ্য-সৃষ্টির ক্ষমতা ভারতের আছে কি না, সে সম্বন্ধে মনীষিগণ গবেষণা করিতেছেন। কেহ কেহ খাদ্যাভাবে ভয়াবহ পরিণাম স্মরণ করাইয়া জন্মনিয়ন্ত্রণের ধূয়া তুলিতেছেন। ভারতের প্রধান খাদ্য চাউল ও গম। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ ধান্য এ দেশে উৎপন্ন হয়, তাহা দুই-তৃতীয়াংশ দেশবাসীর জীবন-ধারণের পক্ষেই নাকি উপযোগী নহে। আগামী ২৫ বৎসরে ইহার পরিমাণ-বৃদ্ধি বড় জোর শতকরা ছয় অংশ হইবার সম্ভাবনা আছে। গমের চাষ যে হারে হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে বর্দ্ধিত জনসংখ্যা গোধূম-জাত খাদ্যের উপর নির্ভর করার তো কোন সম্ভাবনাই নাই। অধ্যাপক মেকাওয়ের মতে, শত-করা ৩৯% মাত্র লোক পোষণোপযোগী সুখাদ্য খাইতে পায়—শতকরা ৪১% অপ্রচুর খাদ্য পায়, অর্থাৎ স্বল্পাহার, অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়, বাকী শতকরা ২০ জনের খাদ্যে পুষ্টির কিছুই থাকে না, অর্থাৎ তাহা অনাহার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতভূমি তাহার সন্তানসন্ততির জন্য যে খাদ্য উৎপাদন করেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বোত্তম

উৎপাদন-শক্তির পরিচয় দেয় না। এই উৎপাদনের হার বিজ্ঞানের সহায়ে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। জাগ্রত রুষ বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিয়া সাইবিরিয়ার বিশাল মরুভূমিকে কর্ষণে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের মরুভূমি দূরে যাক্, এখনও অকর্ষিত শ্যামল ভূমিখণ্ডের পরিমাণও নগণ্য নহে। তাহা ছাড়া, প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের কৃষি-বিদ্যা দেশের নদনদীর গভীরতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে সুকল্পিত সেচ-প্রণালীর উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিয়া, এই সুজলা সুফলা মাতৃভূমিকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শস্যশ্যামলা দেশরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহার খ্যাতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, আজ বৈজ্ঞানিক যুগেও সেই উৎকৃষ্ট কার্য্য-প্রণালী অনায়াসে প্রযুক্ত হইতে পারে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বাঙালার নদীগুলির দিকে গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার সে আর্ত্তনাদে দরদী দেশনেতৃগণ অবহিত নহেন কেন? দেশের রাষ্ট্র-তন্ত্রকে ভারতের উৎপাদিকাশক্তির পরিবর্দ্ধন করিবার উপযোগী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্যত করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতের ৪০ কোটী জনসংখ্যা আমরা কখনও অতিবৃদ্ধি বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার চেয়ে সমধিক সংখ্যক সন্তানসংহতিকে ভারত-ভূমি মাতৃস্তন্যে পুষ্টি দিয়া আসিয়াছেন, তাহার পরিচয় ইতিহাসের সাক্ষ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। আজও এই বর্দ্ধিত জনসমষ্টির জন্য জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের অস্বাভাবিক পন্থার আমদানীর কোনই প্রয়োজন আমরা স্বীকার করিব না। জনবৃদ্ধির বিভীষিকা দেখাইয়া যে সব অদূরদর্শী লেখক ও বক্তা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রোপাগ্যাণ্ডা করিতেছেন, তাঁহারা বিদেশীয় ভাবের শুধু নহে, বৈদেশিক ব্যবসায়-বুদ্ধির সম্মোহনেও আত্মবিক্রয় করিয়াছেন—ইহা কল্যাণের পথ নহে, তাই তাঁহাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

অজগরের চর্ব্বি

জাতি মরিতেছে—না খাইয়া মরিতেছে। যাহারা খাইতে পাইতেছে, তাহারা খাদ্যের নামে বিষ ভোজন করিয়া রোগ-যন্ত্রণায় জীবন্মৃত, অকাল মরণে উৎসন্নের পথে আরও দ্রুত ছুটিয়াছে। সুখাদ্য এ জাতি খায় না, খাইতে পায় না। ধনীও অর্থের বিনিময়েও অমিশ্র স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য পায় না। স্বজাতিপ্রীতিহীন ব্যবসাদারের হাতে জাতিকে বিষ খাওয়াইবারই আয়োজন সর্ব্বত্র চলিয়াছে—কি খাদ্য, কি ঔষধ-পথ্য ভেজাল ছাড়া কিছুই বাজারে মিলিবে না। এই ভেজালের পরিমাণ কতদূর, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়! আমরা তিলে তিলে আত্মহত্যার পথেই চলিয়াছি—বাঁচিবার জন্য যে প্রাণ, যে ব্যবস্থার প্রয়োজন, সে প্রাণ ও ব্যবস্থা, উভয়েরই অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিহারের কংগ্রেসগভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এদিকে একটু দৃষ্টি দিয়াছেন—ইহা আশার কথা। মিঃ এম, জলিল ব্যবস্থা পরিষদে বলেন যে, তিনি চর্ম্ম-ব্যবসায়ী, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সূত্রেই তিনি জানাইতেছেন যে, অজগরের চর্ব্বি ঘৃতরূপে চালান হইতেছে। ময়দার সহিত হাড়ের গুঁড়া ও অন্যান্য দ্রব্য ভেজাল দেওয়া হইতেছে। জনৈক মাড়োয়াড়ী সদস্য এই কথায় উক্ত পাপ স্ব সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত হইতেছে মনে করিয়া, ইহাতে আপত্তি করেন এবং বলেন, যে সকল মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী এই ঘৃণিত কার্য্য করে না, কয়েকজন হয়ত করিতে পারে এবং মাড়োয়ারী ছাড়া অন্যান্য অনেকেও করে। এ যেন ঠাকুর-ঘরে কলা খাইবার মত কথা। সে যাহা হউক, অজগরের চর্ব্বি যেই ভেজাল দিক না কেন—ভেজাল যে দেওয়া হইতেছে এবং সেই চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃত সুখাদ্য বলিয়া যথামূল্যে বিক্রীত হইতেছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রী স্যার গণেশ দত্ত সিং বলেন যে, ইতঃপূর্ব্বে তিনি ভেজাল দেওয়ার পাপ নিবারণের জন্য অপরাধীদের কঠোর দণ্ডবিধানের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন, সে আইন ব্যবস্থাপক সভার বহু সদস্যের আপত্তি হেতুই প্রণীত হয় নাই। ইহা লজ্জার কথা, সন্দেহ নাই। এই বিহার-পরিষদেই কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে, ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কিশোরগণের ধূম পান দণ্ডনীয় করিবার জন্য একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়—সে প্রস্তাবও বিরুদ্ধ ভোটাধিক্যে বর্জ্জিত হয়। দেশের এই অবস্থায় আইনের সাহায্যে ভেজাল খাদ্য সরবরাহরূপ মহা পাপ দূর করার প্রচেষ্টাও কোন দিক্ দিয়া বিঘ্নসঙ্কুল, তাহা

সুধীগণ চিন্তা করিবেন। যাঁহারা আইন সভায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, তাঁহাদের যদি ভেজালখাদ্য বিক্রয়ের সহিত অন্তরঙ্গ যোগ থাকে এবং এই পাপ-ব্যবসায়লব্ধ অর্থেই যদি ইঁহারা ধনী ও জনপ্রতিনিধিদের অধিকারী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ভূতাবিষ্ট সরিষার সাহায্যে ভূত তাড়াইবার আর সম্ভাবনা কোথায়? ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর এই অভিজ্ঞতা—তবে আমরা এখনও আশা করিব যে, কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্ট নিষ্পাপ চরিত্র-বল ও স্বজাতির প্রতি যথার্থ দরদ লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা এই অবস্থার অন্ততঃ কথঞ্চিৎ প্রতিকারে সমর্থ হইবেন।

শুধু ঘৃত ও আটা নহে, চাউল, তৈল, দুগ্ধ, ঔষধ, সর্ব্বত্রই ভেজাল। যাঁহারা মনে করেন, সহরের খাদ্য-দ্রব্যাদির অবস্থাই এইরূপ শোচনীয়—পল্লীগ্রামের লোকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য, পথ্য এখনও পাইয়া থাকে—তাঁহাদের সে ধারণাও ভ্রম মাত্র। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ বেণ্টলীর কথা আমাদের মনে পড়িতেছে—তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, কলিকাতার মত সহরে তবু খাদ্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তার তুলনায় সহরবাসী বরং আছেন ভাল—কিন্তু পল্লীতে সে ব্যবস্থাও নাই। সহরে আইনের ভয়ে যদি ঘৃতে ভেজাল হয় শতকরা পঁয়তাল্লিশ, পল্লীতে তাহার মাত্রা শতকরা পঁচাত্তরেরও বেশী। পল্লীতেও আজ খাঁটি ঘি, চাউল, সরিষার তৈল, কিছুই মিলিবে না—অখাদ্য কুখাদ্য ভোজনে পল্লীবাসীও আজ উৎসন্নের পথে। ব্যবস্থা পরিষদে যদি আইনও হয়, তাহার দীর্ঘ বাহু পল্লীজীবন পর্য্যন্ত পৌঁছাইবার আশা ও তাহা যথাযথ কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু! অবশ্য নরঘাতী ব্যবসাদারের সায়েস্তার জন্য আইনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যাহাদের নিজ দেশবাসীর জন্য দরদ নাই, আইনে তাহাদের দরদ না জাগাইলেও ভীতি জাগাইবে। পাপের কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ ঘটিবে। কিন্তু ইহাতেই সবখানি প্রতিকারের আশা নাই। এইজন্য উচ্চ প্রাণ শিক্ষিত তরুণদেরই আজ আগাইতে হইবে—বিশুদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাঁহাদেরই করিতে হইবে। খাঁটি ধানভানা চাউলের জন্য ঢেঁকী, খাঁটি তৈলের জন্য ঘানী, সরিষার চাষ, খাঁটি গোদুগ্ধ ও ঘৃতের জন্য গোপালনের যোগ্য ব্যবস্থা ও গ্রামে গ্রামে গোচারণের মাঠ—এই সবেরই আজ প্রয়োজন হইয়াছে। উপযুক্ত কর্ম্মীর দল এই পথে আগাইলে, তাঁহাদের সে শুদ্ধ প্রাণশক্তির পরিচয়ে গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়েই এই সুমঙ্গল উদ্যমে সহযোগিতা করিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠা করিবেন না।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

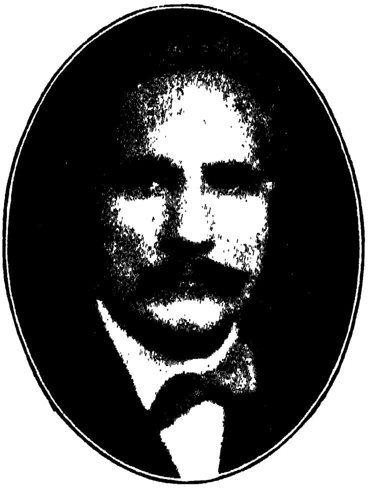
ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের বিগত অধিবেশনে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য এবং যুগোপযোগী। প্রত্যেক জাতীয় অভিব্যক্তিই স্বকীয় সংস্কৃতির ধারা ধরিয়া সম্ভব হয়। জাতীয়তা ও বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান মতবৈচিত্র্যের উপরও তিনি নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। ভারতীয় সামাজিক বিবর্ত্তন বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় সমাজ-জীবন তার নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা অনুসারে গঠিত। * * * ভারতবর্ষে ব্যষ্টি অথবা রাষ্ট্রই যে প্রধান তাহা নহে; এখানে সম্প্রদায় এবং সমষ্টিরও স্বাধীন জীবন ও স্বত্বা আছে। অনেক স্থলে উহা ব্যষ্টি এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও আদর্শের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। রাজনৈতিক বিবর্ত্তন সম্বন্ধেও তিনি যে দিক্‌দর্শন দিয়াছেন তাহাও ভাবিবার ও চিন্তা করিবার। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ধনোৎপাদন ও উহা বণ্টনের সুব্যবস্থা করাই সামাজিক জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় শ্রম; ভূমি ও মূলধন উহার আনুষঙ্গিক। কিন্তু ইহার ঊর্দ্ধেও অবস্থিত সাম্য এবং স্বাধীনতার মৌলিক আদর্শ।

জাতীয় স্বাধীনতাই জাতির আত্মপরিচয়ের পথ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি বিভিন্ন ধারায় অভিব্যক্ত। প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তির সত্যপরিচয়ের মধ্য দিয়াই আন্তর্জাতিক মৈত্রী গড়িয়া উঠিতে পারে। উপসংহারে আচার্য্য শীল সংস্কৃতিগত আদর্শকে ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত করার উপায় আবিষ্কার করিতে বলিয়াছেন। আমরা আজ আচার্য্যদেবের এই কথা উদীয়মান্ জাতিকে অবহিত হইয়া ভাবিয়া দেখিতে বলি।

সাময়িকী

পরলোকে সার মহম্মদ ইকবাল

সার মহম্মদের কাব্য-প্রতিভা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করে। সে প্রতিভা ষোল আনা নিয়োজিত হয় ইসলামকে বীর্য্যশালী ধর্ম্মরূপে প্রচার করিতে। অসামান্য শক্তি-সম্পন্ন কবি ইকবালের স্বধর্ম্মের প্রতি ইহা গভীর অনুরাগের ই নিদর্শন। তাঁহার আন্তরিকতা ও দার্শনিক ঔদার্য্যের জন্য স্বধর্ম্মীর অকপট শ্রদ্ধা-লাভ ত তিনি করেনই, পর-ধর্ম্মীর চক্ষেও তিনি আদর্শ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হ'ন। তাঁহার জীবনধারার অপূর্ব্বত্বের কারণে—"হেসে তিনি চ'লে গেলেন কাঁদিছে ভুবন।" সার মহম্মদের পরলোকগমনে ভারতবর্ষের যে অপরিমেয় ক্ষতি হইল, তাহার সম্যক্ পূরণ হওয়া কঠিন।



স্যার মহম্মদ ইকবাল

লিবিয়া ভ্রমণের সুবিধা

ইতালীর কলিকাতাস্থ কন্‌সালেট জেনারেল নিম্ন-লিখিত সংবাদটী প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন।

ইতালীর উত্তর আফ্রিকাস্থ 'কলোনী' লিবিয়ায় যাঁহারা ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সুবিধার্থ বিদেশীয়দের পক্ষে এতদিন যে 'পাশ-পোর্ট' ও 'ভিজা'র উপর কন্‌সুলার ফি লাগিত তাহা এখন হইতে ইতালীয় রাজসরকার কর্ত্তৃক মুকুব করা হইল।

বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন-বিবরণী

১৩৪৩ সালে চন্দননগরে যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন হয় তাহার সচিত্র বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সভাপতি ও শাখা সভাপতি সমূহের এবং বিভিন্ন শাখায় পঠিত বাছা বাছা প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইয়াছে। সাধারণের পক্ষে মূল্য ১৲ মাত্র। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তক অফিস (৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) হইতে উহা লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ডাকে এই বিবরণী লইতে হইলে সাধারণের পক্ষে সডাক ১৷৶০ এবং প্রতিনিধিপক্ষে ডাক খরচ ইত্যাদি বাবদ ৷৶০ নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া পত্র লিখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

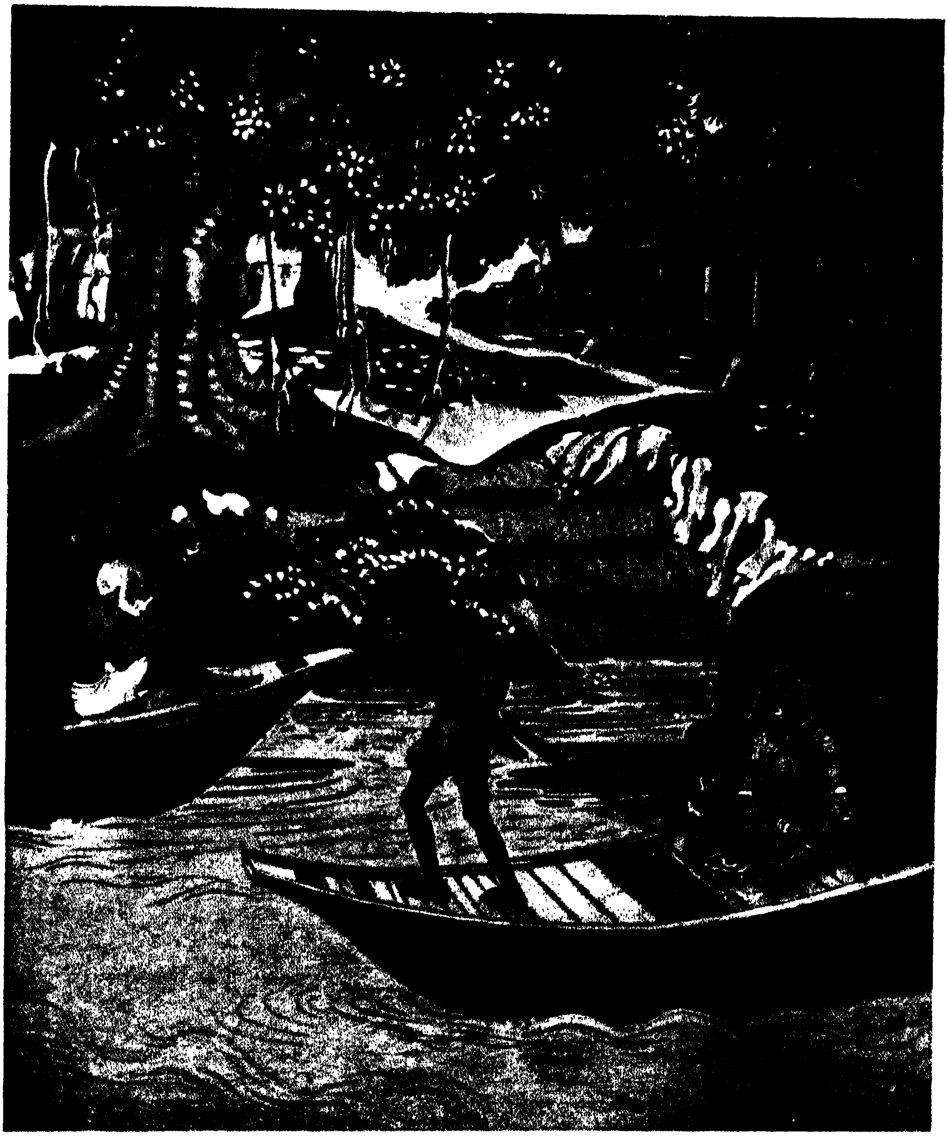
সম্পাদক, বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, চন্দননগর।

কলিকাতার পৌর-সভা

কলিকাতার নূতন মেয়র হইয়াছেন মিঃ এ, কে, এম্ জ্যাকেরিয়া এবং ডেপুটী মেয়র হইয়াছেন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর। আমরা এই দুইজনকেই অভিনন্দিত করিতেছি। আশা করি ইঁহাদের কার্য্যকালে পৌরসভার যথাযথ উন্নতি সাধিত হইবে। শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জি প্রধান কর্ম্ম-সচীবের পদে পুনরায় বাহাল হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে প্রধান কর্ম্ম-সচিবের ক্ষমতা বিশেষরূপে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একজনকে পুনর্নিয়োগ করিয়াই তাঁহার ক্ষমতা হ্রাসের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

পরিচালক ও প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর : শ্রীফণিভূষণ রায়, প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রভুর যাত্রী

শিল্পী—শ্রী[illegible]

(Reprinted)

২৩শ বর্ষ   ১ম খণ্ড   ৩য় সংখ্যা

প্রবর্ত্তক

আষাঢ়—১৩৪৫



সাধন

ভগবানের মানুষ হওয়ার সাধনা—আত্মসমর্পণযোগ। জীবনপণ সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হয়। সঙ্কল্পেই আত্মকাম স্থির হয়। সর্ব্বাসক্তি ঘন হইয়া কেন্দ্রগত হয়। এই কেন্দ্রই জাগ্রত ইষ্ট-মূর্ত্তি।

একনিষ্ঠ ইষ্ট-বুদ্ধিই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই আত্মসমর্পণ-যোগের প্রথম সাধন। ইষ্টাশ্রয়ী হৃৎ-কেন্দ্রই শ্রদ্ধা ধারণ করে। শ্রদ্ধা দৃঢ় হইয়া হৃদয়ে অসাধারণ তেজঃ ও সাহসের সৃষ্টি করে। ইহাই বীর্য্য। ইষ্টমূর্ত্তি বুকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর রসে রূপে ফুটিয়া উঠে। এই রসই স্মৃতি। স্মৃতির রসে অভিষিক্ত হৃদয় ক্রমে ক্রমে একেন্দ্রিয়, এক-রতি হইয়া যে তন্ময়ত্ব পায়, তাহাই সমাধি। সমাধির ঘনীভূত অবস্থায় ভাব-রূপে ঊর্দ্ধে চৈতন্য স্থির হয়। এই চেতনাই প্রজ্ঞাশক্তি। সাধ্যতত্ত্ব—ইষ্টধ্যানে চেতনাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরা। যে সব অন্তর্যন্ত্রের কেন্দ্রে চেতনা খণ্ডখণ্ড রূপে আটকাইয়া আছে, সেইগুলির একের সঙ্গে অন্যের যোগ করিয়া প্রথম একটা প্রবাহ সৃষ্টি করিতে হয়; তার পর সে চৈতন্য-প্রবাহ উপরের দিকে ঠেলিয়া উৎসমূলে পৌঁছাইয়া দিতে হয়—তখনই এই অমর চেতনা স্বরূপ লইয়া জীবনে লীলায়িত হয়।

প্রবাহ-রূপ প্রথম। প্রাণে মনে ঐক্য চাই। যাহা জীবন-মন্ত্র, তাহাতেই জ্ঞান, তাহাতেই হৃদয়ের প্রেম, প্রাণের শক্তি, দেহের সেবা, সব যোগ করিয়া দেওয়া চাই। বুদ্ধি যখন জাগে, হৃদয় তখন বিষণ্ণ; হৃদয় যখন প্রফুল্ল, প্রাণ তখন জাগে না। এইরূপ বিচ্ছিন্ন অবস্থা প্রবাহের মূর্ত্তি নয়।

এক কেন্দ্রের দ্যোতনার সঙ্গে সব কেন্দ্রের চেতনা যখন জাগিয়া উঠে, তখনই অখণ্ড প্রবাহ-সৃষ্টি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তার পর লয়-যোগ। প্রত্যেক কেন্দ্র-সত্যকেই ইষ্টে লয় করিয়া দিতে হইবে। পারা উত্তাপ পাইলে যেমন উপরে ঠেলিয়া উঠে, তেমনি উৎসর্গের উত্তাপে চেতনার প্রবাহ স্বভাবতঃই ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়। উৎসর্গের যজ্ঞশালায় হোমানল নিত্য জ্বালিয়া রাখ; আধারের চৈতন্যশক্তি নিরন্তর ঊর্দ্ধমুখী হইয়া তার স্বরূপে গিয়া স্থির হইবে—তখনই সিদ্ধি।

তৃতীয় পন্থা

জীবনবাদের কথা উঠিলেই ইহার প্রতিকূলে ভারতের মোক্ষবাদ, লয়বাদের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। মানব-জীবন নানাদিক্ দিয়া বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে—ইহা নিত্য নহে, মায়া বা কল্পনা। যাহা শাশ্বত সত্য নহে, এমন একটা স্বপ্ন সুখের অথবা দুঃখের হউক, তাহা অতিক্রম করাই শ্রেয়ঃ। ভারতের লক্ষ্য এই দিকে। জীবন হইতে চরম মুক্তি এই হেতু ধর্ম্ম ও সাধনা বলিয়া ভারতে খ্যাতি পাইয়াছে। মোক্ষ অর্থে মৃত্যু ও বিনাশ—অখণ্ড অদ্বয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তির বিলয়। তৈল-রহিত দীপ-শিখা যেমন নির্ব্বাপিত হয়, জীবন আসক্তি-বিরহিত হইয়া প্রত্যক্ চৈতন্যে, পরমানন্দে যে লয় পায়, তাহাই জীবের মোক্ষ বা মুক্তি। স্বরূপ-লক্ষ্যে পৌঁছিবার এই বিধান মহাজন-প্রবর্ত্তিত। ইহা জড় মৃত্যু নহে; জড়বন্ধন হইতে নিত্য-চৈতন্যে অহংকে অপসারিত করিয়া পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা না রাখা এই মরণের সাধনা। এই মতবাদের ভিত্তিরচনা করিয়াছে সাংখ্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, পাতঞ্জল যোগবিজ্ঞান—ব্রহ্মসূত্র এই ভারতীয় কৃষ্টির মূলে অগাধ প্রত্যয় সঞ্চারিত করিয়াছে। বীজ দগ্ধ হইলে যেমন তাহা হইতে আর অঙ্কুরোদ্গমের শক্তি থাকে না, লয়-সিদ্ধ জীবনেরও তদ্রূপ পুনরাবৃত্তি হয় না। বীজ ভূমিগত হইলে অঙ্কুরিত নাও হইতে পারে, কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দগ্ধ বীজের সে সম্ভাবনা নাই। লয়-মার্গী অনাবৃত্তির পথে জীবন-বীর্য্যকে নিষ্ফল করিয়াই লক্ষ্য সিদ্ধ করে। বিবেক বিনা উপদেশে জন্মে না, লয় ও মোক্ষও তেমনই বিনা সাধনে সম্ভব হয় না। ভারতের মোক্ষবাদী ইহার জন্য অকাট্য ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিয়াছে। পথ-ক্লেশ আছে, পাথেয়ও অনেক কিছু সঞ্চয় করিতে হয়। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের নর-নারী ইহার জন্য উদাসীন নহেন। যুগ যুগ দলে দলে ভারতবাসী এই পথেই চলিয়াছে।

মোক্ষবাদ যেমন একদিকে জীবন হইতে মুক্তি চায়, অন্য দিকে মানবের মধ্যে ভোগবাদ জীবনের নশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া জগতে মানবাত্মারই জয় ঘোষণা করে। ভারতে মোক্ষবাদীর সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এই উভয় দিক্ দেখিয়া এমন প্রশ্ন মনে জাগিয়া উঠা অসম্ভব নহে—মানুষের এই উভয় লক্ষ্য বিশ্বস্রষ্টার অভিপ্রেত কিনা! মানুষ একদিকে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য দ্বন্দ্বময় জগৎ হইতে নিষ্কৃতি-লাভের সুযোগ চায়, অন্য দিকে দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া দিগ্বিজয়ী বীরের মত জগতের উপর ঈশিত্ব-প্রতিষ্ঠায় সমুদ্যত, সেও ক্লেশ ও দুঃখের অন্তই দেখিতে চায়—কে বলিবে এই দুই পথই চিত্তবৃত্তিরই ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গী কি না? সৃষ্ট জীবের মধ্যে এই উভয় ভাবের মূলে স্রষ্টার ইচ্ছা অবধারণ করা সহজ নহে। কিন্তু কি ভোগবাদী, কি মোক্ষবাদী, উভয় পন্থীরই একটা সঙ্কটকাল আছে। এই সঙ্কট আর অন্য কিছু নহে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার আত্ম-সংশয়। সৃষ্টির উপর স্রষ্টার পরম কর্ত্তৃত্ব—আত্ম-কর্ত্তৃত্বকে প্রতি মুহূর্ত্তে ম্লান করিয়া দেয়। মানুষের চাওয়া, ভোগ অথবা অপবর্গ যাহাই হউক, মানুষের শক্তি একটা সীমায় গিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই এই অবস্থা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় মানুষ পরম পুরুষার্থ যাহা, তাহার সন্ধান পাইতে পারে। দুই কারণে এই অবস্থা আসে। এক লক্ষ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনায় নৈরাশ্য; আর এক—বিবেক প্রশ্ন তুলে "কেনেষিতং পততি প্রেষিত মনঃ"—ভোগ বা মোক্ষ যাহাই হউক না কেন, কে মনকে লক্ষ্য-পথে পরিচালিত করিতেছে? উত্তর ভোগবাদীও দিয়া থাকেন "ভোগঃ যোগায়তে"। মোক্ষবাদীও বলেন—"ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ"। ভগবানই ভোক্তা, ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। কিন্তু কথা তো বস্তু নয়। ভগবান কি চাহেন? এই উত্তরে সচরাচর যাহা শুনা যায় মানুষের মন সহজে তাহাতে সান্ত্বনা মানিতে চাহে না। অযথা তর্ক তুলিয়া লাভ নাই। এই দুই পন্থা ব্যতীত তৃতীয় পন্থা যদি থাকে, তাহাই বিচার্য্য। ভোগ অথবা মোক্ষ, ভগবানের চাওয়া বলিয়া নির্দ্বন্দ্ব যে হইতে পারে, সে পরম পুরুষার্থ লাভ করে। এরূপ হইলে বলিতেই হইবে, ভগবানের ইচ্ছা-বৈচিত্র্য আছে। তিনি যাঁহার ভিতর দিয়া যাহা চাহেন, জ্ঞানে অজ্ঞানে তাহাকে তাহাই করিতে হয়। অতএব কোন বাদের প্রচারাকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষার নামান্তর। প্রচার

যদি কিছু করিবার থাকে, বলিবার কথা একটী মাত্র আছে; উহা হইতেছে ভগবানে আত্মসমর্পণ। ভোগ হউক, মোক্ষ হউক—তাঁহার চাওয়াই জীবনে সিদ্ধ হইবে।

কোন বাদকে যখন প্রিয় করিয়া তদনুকূলে মত সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা হয়, তখনই দেখা যায়—অনেক অসঙ্গত পরস্পর-বিরুদ্ধ কথার অবতারণা মানুষের চিত্ত-বিভ্রম করার সুযোগ গ্রহণ করে। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, বস্তু-বিজ্ঞান, যোগবিজ্ঞান সকলের মধ্যেই স্ব স্ব মৌলিকত্ব আছে; কিন্তু অপরকে নাকচ করিয়া আপনাকে সর্ব্বপ্রধানরূপে প্রমাণ করার জিদ্ যখন আসে, তখনই তর্ক-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পতঞ্জলীর কৈবল্য-বাদ ঐ যোগবাদের চরম সূত্র। যোগ-বাদের এই চরম সূত্রটী যোগ-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের দিক্ দিয়া যখন দেখি, তখন ইহার অকাট্য যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনই সংশয় থাকে না। "পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যম্" অর্থাৎ পুরুষার্থ-শূন্য হইলে গুণসকলের প্রতিপ্রসব হয়, ইহাই কৈবল্য। তৈলহীন প্রদীপের সলিতা আলোকদানের গুণ রক্ষা করে না, প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। উক্ত সূত্রে ইহা অপেক্ষা বড় কথা নাই। মানুষ পুরুষার্থশূন্য হইলে যে গুণ যাহা হইতে প্রকাশ, পর পর তাহাতে পুনরাগত হইয়া লয়-প্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন উঠে—দুগ্ধ হইতে দধির জন্ম। দুগ্ধ যদি শক্তিহীন হয়, দধির সৃষ্টি হয় না এবং দধিও দুগ্ধে গিয়া প্রতিপ্রসব প্রাপ্ত হয় না। যদিও এরূপ হয়, গুণ সকলের প্রতিপ্রসব এক অপূর্ব্ব কল্পনা। সাংখ্য-মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, অহংকার; তারপর বিকৃতির পর বিকৃতিতে জগতের পরিণতি। এই গতি অনুলোম ছন্দে সৃষ্টির পর সৃষ্টি, রূপের পর রূপ, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া চলিয়াছে। যখন অনুলোম গতি আছে, যতই অস্বাভাবিক ও অসাধারণ হউক, তাহার প্রতিলোম-ছন্দঃও থাকিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে—কি অনুলোম, কি প্রতিলোম, মানুষের পুরুষার্থে নিয়ন্ত্রিত হয় না। অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত যে গতি-ছন্দে লীলায়িত, তাহার কোনটীই স্বকৃত গতিভঙ্গী নহে। প্রকৃতিরও নিয়ামক যদি কেহ থাকেন, তাহারই সঙ্কেতে ও ইচ্ছায় অণু হইতে অণু, মহৎ হইতে মহৎ, সকল সৃষ্টিই সীমার স্বভাবে বন্দী। পুরুষার্থ-বিকাশের ভোগ অথবা মোক্ষ যে লক্ষণেই উহা বিকশিত হউক, তাহার একটা সীমা আছে, উহাই পূর্ব্বে সঙ্কট বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই কালে এই ক্ষেত্রে মানুষ বুঝিতে পারে—চরম কর্ত্তৃত্ব কোন পথেই তাহার নাই। মোক্ষ ও ভোগ ব্যতীত তাই তৃতীয় প্রশ্ন উঠে—"কঃ পন্থা"।

মোক্ষ ও ভোগের মধ্যে যেন একটা তৃতীয় পন্থা রহিয়াই যায়। এই পন্থা যদি শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভূতির আলোকে চিত্ত উদ্ভাসিত করে, তাহা হইলে কি মোক্ষ, কি ভোগ-জীবনের যে পরিণতিই থাকুক, তাহা যে অলক্ষ্য হস্তের অকাট্য-বিধান, ইহাতে আর সংশয় থাকে না। নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার এই তৃতীয় পন্থাই বোধ হয় মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়।

শাস্ত্র—বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ। যুক্তি — ন্যায়াদি দর্শন। অনুভূতি—প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও অপরোক্ষ উপলব্ধি। কিন্তু এইখানেও প্রশ্ন—কে বলিবে শাস্ত্র, যুক্তি, অনুভূতির আলো সত্যের সন্ধান দেয়! ব্রহ্মসূত্রে এই কথাই আছে। কি বিধিশাস্ত্র, কি নিষেধ-শাস্ত্র, কি মোক্ষ-শাস্ত্র সবই অবিদ্যা-মূলক অর্থাৎ মায়া। শাস্ত্রই যখন যুক্তির ভিত্তি, আর যুক্তিই যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের কষ্টিপাথর, তখন আমাদের সবখানিই একটা বিরাট্ কল্পনা ব্যতীত আর কিছু নহে। ভোগবাদীই শুধু মায়াচক্রে আবর্ত্তিত নহেন, মোক্ষবাদীও এই একই পর্য্যায়ভুক্ত। যে শাস্ত্র ভোগ ও মোক্ষের অনুকূলে, তাহা কোন এক তৃতীয় পন্থার প্রতিকূলে হইবে, এমন কোন কথা নাই। শাস্ত্র কামধেনু। যুক্তি এইজন্যই অকাট্য এবং অনুভূতিকেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লয়। গীতায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পরিত্যাগের কথা তাই বড় উচ্চগ্রামে বলা হইয়াছে। উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গের ছন্দে ছন্দে এই যে বিশ্বসৃষ্টি; ইহার মধ্যে স্রষ্টা যদি অনুস্যূত থাকেন, তখন ছন্দের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে জীবন-গতি ধরিয়া চলার প্রচেষ্টা একটা অপচেষ্টা মাত্র। মানুষের অহমিকা আদর্শের আবর্ত্ত সৃজন করিয়া এমন প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে, যে জগতের নরনারী শতধা-বিভক্ত হইয়া এইরূপ অসংখ্য আবর্ত্তে চুবান খাইয়া মরে। প্রধানতঃ ভোগ ও মোক্ষের ফাঁদে জীবনের কৃষ্টি ধর্ম্মরূপেই আমাদের শাসন করিতেছে। মানুষেরই জয়-কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল

এই কথা যে, অনাবৃত্তির এক পথ—ও অন্য আবৃত্তির পথ—এই দুই পথই নাকচ করিতে হইবে।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগীমুহ্যতি কশ্চনঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥

অপ্রত্যক্ষ হইতে এই যে প্রত্যক্ষ জগৎ এবং তাহার চেতনা, ইহা অস্বীকার না করিয়া যদি আমরা নূতন ন্যায়ের ভিত্তি রচনা করিতে পারি, নূতন বেদ, নূতন অনুভূতির সন্ধান পাই, সম্ভবতঃ তাহা হইলেই ভারতের সমস্ত অতীতটাকে বর্ত্তমানের সহিত অখণ্ড করিয়া ধরিতে পারিব। এই জন্যই একটা ছাড়ার কথা আছে, সেটা অতীতও নহে, বর্ত্তমানও নহে। ছাড়িবার বস্তু—ধর্ম্মামৃত অপেক্ষা অমৃতহীন ধর্ম্মের কাঠামোটা। এই যে ভারতের বেদশাস্ত্র, উহাতো জীবনের গোড়ার কথা নহে। অমিশ্র আত্মানুভূতিই বেদের প্রসূতি। অনুভূতি জীবের অন্তর-বৃত্তি। উহা অপ্রত্যক্ষ বিষয় লইয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। কাল্পনিক ধর্ম্মমার্গী অক্ষর অব্যক্তকে চাহিয়া থাকে। দেহধারী জীব বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াই কিন্তু বিষয়ীর সন্ধানে চলে। ধূম-দর্শনেই অগ্নির অনুমিতি জন্মে। দৃষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য দেখিয়াই উপমিতি জ্ঞানের সূচনা। বস্তুবোধ হইতেই শব্দসৃষ্টি। এ সবই অমলিন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিণতি। শব্দমন্ত্র—উহা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা যাহাই হউক, অপ্রত্যক্ষ জগৎ হইতে আসে নাই। এই প্রত্যক্ষ জীবনের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই আমরা অনাদি অতীতকে ও অনন্ত ভবিষ্যৎকে কুক্ষিগত করিতে পারিব। যে দুঃখ, ক্লেশ, ব্যাধি হইতে মুক্তির জন্য মোক্ষ অথবা ভোগ-বিজ্ঞানের সৃষ্টি, তাহা জীবনেরই গতি-ছন্দঃ! ইহা হইতে অপসৃতির প্রচেষ্টা মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া এবং দেবত্বের দিক্ দিয়া যেমন করিয়াই আসুক, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র অহমিকার প্রচেষ্টা মাত্র।

নশ্বর শরীর ত্যাগ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পার্থিব ক্লেশ-সহিষ্ণুতাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের লক্ষণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্প-দংশনে জ্বালা আছে। প্রিয়ার আলিঙ্গনে তৃপ্তি আছে। স্পর্শের তারতম্য-শূন্যতা সমত্ব নহে। নিয়ন্তার স্পর্শানুভূতিই সর্ব্বত্র অনুস্যূত। এই অনুভব-শক্তি যাহার জাগে, সেই বিশ্বস্রষ্টার আনন্দভুক্ ব্রহ্ম-চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত পুরুষই অসাধারণ জীবন-বিগ্রহ হইয়া থাকে। মানবজাতির মধ্যেই এই রূপগুণে নারায়ণ বিগ্রহান্বিত হন। জীবনটা শরীর নহে; বাল্য, যৌবন, জরা, ব্যাধি নহে—ইহা একটা চৈতন্য-স্রোতঃ। জীবনের এই নিত্য লক্ষণ নূতন কথা নহে। এই অমৃত-পথের সন্ধান মানুষের অনুভূতিগ্রাহ্য হইয়াছিল বলিয়াই অসংখ্য ঋতময় ঋক্ বেদে, উপনিষদে সংগ্রথিত হইয়াছে। এই চিৎবস্তু অনাদি ব্রহ্মতত্ত্ব—নিত্য অখণ্ড। ওতঃপ্রোতঃ-ভাবে ভূতগ্রাম-বিশিষ্ট কোটী কোটী শরীরের লয়, সৃষ্টি ও স্থিতি ইহাতেই অনুস্যূত। জগদ্গুরুর কণ্ঠে ইহাও বেদধ্বনি "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি" এবং এই জন্ম ক্ষুদ্রত্বের নহে, বৃহতের কিছুর সহিত বিভক্ত ও বিযুক্ত অংশের নহে, অখণ্ডের। তাই "ভূতানাং ঈশ্বরোঽপি সন্"—প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া মায়ার ছন্দে যুগে যুগে তাঁহার আবির্ভাব। এই যে অহং, ইহা বিষয়-বস্তু নহে, পরন্তু বিষয়ী। যাহা বিষয়, তাহার বিনাশ আছে। তাহা স্বভাবতঃ অথবা স্বেচ্ছাকৃত যাহাই হউক, এই বিষয়ীর চেতনায় আমরা জন্ম-কর্ম্মের মধ্য দিয়া বিশ্বভুবনে জীবন-বাদের জয়ধ্বজা তুলিতে পারি। এই জীবনই শ্রী, বিজয়, সম্পদ্, সত্য, সুনীতি ও সুমতির আশ্রয়। এই জীবন যদি মর্ত্ত্যে সম্ভব না হয়, স্রষ্টার মহিমা থাকে না। এই অনুভূতিটা না জাগিলে ষড়্দর্শনের মর্ম্ম কল্পনা-বিলাস মনে হইবে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ভারতের স্থবিরত্বের পরিচয় বলিয়া উপহাস্য হইবে। স্বরূপ-চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ নর-বিগ্রহের কণ্ঠেই শাস্ত্র-মহিমা, যুক্তি ও অনুভূতির জয়-ঘোষণা সম্ভব। বেদ, পুরাণ, সংহিতা ধর্ম্মামৃত তখনই পরিবেশন করে, যখন অতিমানবের কণ্ঠে ইহার ছত্রে ছত্রে নূতন হিন্দোল, নূতন ঝঙ্কার উঠে, শ্রুতি তবেই সহায় হয়। স্মৃতি তবেই পাথেয় হয়। আর জীবন-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ তবেই শ্রীগুরুরূপে পরকে আপন করার যুক্তি দান করেন—সে কণ্ঠে কত অমৃত! সে বাঁশীর নিঃস্বনে কি যে অমৃতের ঝরণা ঝরে, তাহা বর্ণনাতীত। তখনই সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমানের সহিত জীবন্ত হইয়া সম্মুখে আলোকোজ্জ্বল অনন্ত যুগ গতির ক্ষেত্রস্বরূপ হয়। নিজেকে চিরায়ুঃ বলিয়া মনে হয়। মহাকাল জীবন-সঙ্গী হইয়া চলে,

উৎসাহের সীমা থাকে না। জীবন-সাধনার অনুগামী শাস্ত্র, গুরু, কাল ও উৎসাহের যে চতুঃসহায়ের কথা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে কীর্ত্তিত, তাহা চৈতন্যময় হইয়া নিত্য মরণের মাঝে অনিত্য নশ্বর জীবনের ফল্গুধারা সৃষ্টি করে। এই তৃতীয় পন্থাই জগদীশ্বরের কীর্ত্তি-স্বরূপ। এই বেদ-বিগ্রহের জন্ম সিদ্ধ না হইলে, ভারতের শাশ্বত সনাতন ধর্ম্ম দুর্ব্বোধ্য ও অস্পষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই পথের সন্ধানই দিবার চেষ্টা করিতেছি ও করিব।

চিন্তা-বীথি

বঙ্কিম শতবার্ষিকী হইতেছে। হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে রাজা রামমোহন শতবার্ষিকী, রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। যুগের গতিস্রোতঃ যুগবুদ্ধিই পরিমাপ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। একশত বর্ষের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা কোথায় আমাদের আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহার পরিমাণ ও পরিদর্শনের ইচ্ছা স্বাভাবিক—ইহার প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট আছে। এই আত্ম-পরীক্ষার একটু দিগ্‌দর্শন করিব।

* * * *

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে এই "প্রবর্ত্তকের" এক বিশেষ সংখ্যায় "শত বর্ষের বাঙালার" আলোচনা করা হইয়াছিল। সেই নিবন্ধমালা পরে যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাহার ভূমিকাচ্ছলে এই কথা বলিয়াছিলেন—"হাওয়া কি আবার ফিরিয়াছে, ফিরিতেছে? না হইলে বাঙালার কথা লেখেই বা কে, শোনেই বা কারা? একদিন বাঙালী বাঙালার দিকে ছুটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিংশকোটী ভারতবাসীর কথা কহেন নাই।

সপ্তকোটী কণ্ঠ কল-কল-নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে—
কে বলে মা তুমি অবলে!

—বলিয়া মায়ের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বাঙালী ভারতের মোহে পড়িয়া এই ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রের সপ্তকোটীকে ত্রিংশকোটি করিয়াছে। তারপর, বাঙালী ভুলিয়া গিয়াছে যে, যে স্বাধীনতার সাধনায় সে আজ মাতিয়াছে তাহা বাঙালীর সনাতন সাধনা। প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া এই অর্ব্বাচীন কালেও, বাঙালী শতবর্ষ ধরিয়া নানা ভাবে নানা ক্ষেত্রে এই এক লক্ষ্যের দিকেই ঋজু কুটিল নানা পথে ছুটিয়াছে। আজ লোকে যাহা নিতান্ত নূতন ভাবিতেছে, তাহা বাঙালার ইতিহাসে পুরাতন। আর মতের বা পথের পার্থক্য নিবন্ধন আজিকার নব্য বাঙালী নিজেদের স্বাদেশিকতার অভিমানের কুজ্ঝটিকায় যাঁহাদের স্বদেশ-প্রেমের মর্য্যাদা করিতে পারিতেছে না, তাঁহারাও এই মহাযজ্ঞেরই একদিন প্রধান হোতা ও পুরোহিত ছিলেন।............ বাঙালা যে কি বস্তু, বাঙালীর এই সনাতন স্বাধীনতার সাধনার স্বরূপ যে কি, ইহা তলাইয়া দেখিবার অবসর আজ বাঙালীর নাই। বাঙালী আত্মহারা হইয়াছে; অথবা মাঝখানে হইয়া পড়িয়াছিল। আবার মনে হয় যেন বাঙালীর মতি ও গতি ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

বিপিনচন্দ্রের কথামত আমরাও বলি—আজিকার শতবার্ষিকী উৎসবগুলি বাঙালীর এই মতি গতি ফিরিবারই যেন মুখর সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

* * * *

রাজা রামমোহন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঠাকুর রামকৃষ্ণ—বাঙালার এই শত বর্ষের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার জলন্ত বিগ্রহ-মূর্ত্তি যদি আমরা বলি, বোধ হয় তাহা অত্যুক্তি হইবে না। বাঙালার নবজাগ্রত ব্রাহ্মণ্যশক্তির এই ত্রি-মূর্ত্তির যথার্থ পরিচয় অবগত হইতে পারিলে, শতাব্দীর বাঙালী জাতির মর্ম্মপরিচয় আর অবিদিত থাকিবে না। শতাব্দীর যুগপ্রভাত বন্দনা করিয়া আনিলেন রাজা রামমোহন—নবদ্বীপচন্দ্র বা শ্রীচৈতন্যের পর এই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ হিন্দুর নিষ্ঠা-ভক্তি সহস্র ধারায় বিচ্ছিন্ন

হইতে দেখিয়া, উহা আত্মসাধনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকৃত করিবার জন্যই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন—তাই দেখি, তিনি একদিকে রাজানুগ্রহপুষ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রভাবের দুর্ব্বার স্রোতঃ প্রতিরোধ করিতে তাঁহার বিরাট্ ব্যক্তিত্ব লইয়া ভীম-বিক্রমে কটিবন্ধন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অন্যদিকে হিন্দুর বদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারের প্রাণহীন কাঠামে যে বহিরনুষ্ঠান, তাহার উপর আস্থাহীন হইয়া বেদোপনিষৎ-তন্ত্র-মূলে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু বাঙালার রুদ্ধ জীবনোৎস মুক্ত করারই ইহা প্রথম সংবেদনা। রাজার অনুপ্রেরণা বিপরীত ভঙ্গিমায় আঘাত দিয়াই বাঙালার প্রাণে অমর শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছে। প্রতিকূল যুগশক্তিকে আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে অধিকৃত করিয়া, তাহা জীর্ণ করিতে না পারিলে, এ জাতির কল্যাণ নাই—তাই যুগশক্তিকে অস্বীকারে প্রত্যাখ্যান না করিয়া, তিনি দূর-দর্শনে তাহাকে অভিনন্দন করিয়া লইয়াছিলেলেন। ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে জাতির প্রতিভূ-রূপে তাঁহার মধ্য দিয়া এই আত্মাশক্তির লীলামর্ম্ম যথার্থ-রূপে অনুধারণ করিতে না পারিলে, আমরা শতাব্দীর বাঙালার জীবন-গতির তাৎপর্য্যও উপলব্ধি করিতে পারিব না। হয় যুগ-শক্তির অনাবিল বিগ্রহ জ্ঞানে তাঁহার সাময়িক জীবন-প্রেরণাকেই জাতি-জীবনের চিরদিনের অনুসরণীয় মনে করিয়া অতর্কিতে যুগস্রোতে ভাসিয়া যাইব, নতুবা ঘোর প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া, তাঁহার অন্ধ বিরুদ্ধাচরণে অচল সংরক্ষণশীলতার চেষ্টা করিয়া বারবার প্রতিহত ও দিন দিন আরও শক্তিহীন হইয়া পড়িব।

* * * *

রাজার বিরাট্ চিত্তে যুগের বিজ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ছিলেন—তাঁহার সুদূর কল্পদৃষ্টির পরিধি শতাব্দীর জীবন-সাধনায়ও বাঙালী আজও নিঃশেষে অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে নাই। রাজার মূল প্রেরণা ধর্ম্ম নয়, সমাজ নয়—ধর্ম্মকে, সমাজকে তিনি ঘা দিয়া দিয়া, মোড় ফিরাইয়াছিলেন সেই মুখে, যাহা যুগের সংহতি-শক্তির সম্মুখীন হইয়া আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয়—ইহাই নবীন রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রতন্ত্র। রাজা রামমোহনকে তাঁহার দেশের এই নব যুগশক্তি-ধারণোপযোগী ধর্ম্ম ও সমাজ-বেদী সর্ব্বপ্রথমে ভাঙ্গিয়া নব-প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই অলক্ষ্য মর্ম্মপ্রেরণা সেদিন অবশ্য কাহারও স্থূল দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই—আজও তাঁহার অনুবর্ত্তক ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কয় জন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না—কিন্তু রাজার চিন্তানুভূতি ভরিয়া এই ক্ষাত্র-ব্রাহ্মশক্তিই ক্ষণে ক্ষণে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিত। তাঁহার ব্রহ্মণ্যপ্রতিভা যে কল্পদৃষ্টি অবধারণ করিয়াছিল—উহা শতাব্দীর রাষ্ট্রবিবর্ত্তনের মূল প্রেরণারূপে আজ শুধু বাঙালা নহে, বাঙালার মর্ম্ম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিনির্গত হইয়া সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শতাব্দীর মুক্তি-প্রেরণা ক্ষাত্র-তপস্যারই মৌলিক শক্তি। যুগে যুগে ব্রহ্ম-বীর্য্য এমনই করিয়া জাতিকে ক্ষাত্র-ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছে। রাজা সত্যই রাজ-শক্তির বীজ-ভাব অন্তরে গোপন রাখিয়া সুকৌশলে ধর্ম্ম ও সমাজক্ষেত্রে সংগ্রামের অভিনয় করিয়া, বাঙালীকে বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় মুক্তি-সংগ্রামেরই বীর্য্য দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "রাজা" নাম এই দিক্ দিয়া অতর্কিতেই সার্থক হইয়াছে। ইহা কেহ স্বীকার করুক আর নাই করুক—বাঙালা ও ভারতের তিনিই প্রথম সত্য রাষ্ট্রগুরু। কারণ তাঁহারই দেওয়া কল্প-স্বপ্ন সার্থক করিতে যে এ জাতির জীবন-সাধনার অব্যর্থ অভিসার, একটু ভাবিলেই তাহা আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব—রাজার রাষ্ট্র-দীক্ষা বাঙালা ও ভারতবর্ষের জীবনে কখনও ব্যর্থ যাইবে না।

* * * *

রাজার এই প্রাক্‌দৃষ্টিকে ভাষা দিতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-রথে আবির্ভাব। যুগের মন্ত্র তাঁহারই কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল—"বন্দেমাতরম্" বলিয়া বেদের ভূ-দেবীকে বাঙালার কল্প-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি প্রণত ও ধ্যানবিভোর হইলেন। মন্ত্রদ্রষ্টা—তাই তিনি যুগের ঋষি। বাঙালী-জাতির অগ্রে অগ্রে কমলাকান্তের ছদ্মবেশে তিনি ভগীরথেরই ন্যায় চিন্তা-গঙ্গাকে আকর্ষণ করিয়া অগ্রসর হইলেন—সাহিত্যের যুগশঙ্খ হাতে লইয়া। ভাবকে ধ্যানে ভাবনায় রসে পরিণত করিতে, তাঁহাকে জাতির সম্মুখে অনেক রস-মূর্ত্তি রচনা ও পরিবেশন করিতে হইয়াছিল—

বাঙালীর ভাব-ভাষার কল্পসিদ্ধ রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিতেই তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধমালা, তাঁহার "বঙ্গদর্শন" ও গীতার ভাষ্য—এ সকল রস-সৃষ্টি তাঁহার মন্ত্রশক্তিরই অভিব্যক্তির সুছন্দঃ—সেই মন্ত্র-মূর্ত্তিরই নিবিড়-ঘন রস-রূপ। "কান্তা-সম্মিত-তয়োপদেশ-যুজে"—ঋষি যেন অতি মধুর হাতছানি দিয়া, জাতির চিত্তকে রসের আস্বাদনে প্রলোভনে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া, মন্ত্র-ধারণেরই ও মন্ত্র ভাবনার যোগ্য করিয়া তুলিতে অতি সতর্ক ও সন্তর্পিত প্রয়াস করিয়াছেন। রসের অভিসারে জাতিকে নামাইয়া—'আধ-আঁচরে বঁধুয়াকে' বসাইয়া শেষে শুনাইলেন দেখাইলেন যাহা, তাহাই যে জাতীয় আরাধনার সাধ্যতত্ত্ব—ত্রিকাল-দৃষ্ট মাতৃমূর্ত্তি। "আনন্দমঠের" মহেন্দ্র, সত্যানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি—এ শুধু উপন্যাসের রস-চিত্র নয়, বাঙালার গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস, তরুণ তরুণীর নব মুক্তি-দীক্ষার জীবন্ত মূর্ত্তি। রাজার কল্প-ভাবকে বঙ্কিম রূপযুক্ত করিয়া ঘনাইয়া তুলিলেন বাঙালীর মানস-পটে ভাষার ও সাহিত্যের অমৃত তুলিকায়—এ চিত্র মুক্তি-সাধনার কল্প-রূপ—অপরূপ দ্যোতনাময়। কবি, মনীষী যাহা দেখেন, ভাবেন, তাহা যে একদিন কল্পজগৎ হইতে স্বপ্ন-রূপে নামিয়া, বস্তুজগতে ব্যক্তি ও ঘটনারূপে মূর্ত্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে—এই সম্ভাবনায় আশায়, উল্লাসে বাঙালার প্রাণ সেদিন অন্তর্লোকে নাচিয়া উঠিয়াছিল। ঋষি মাতৃ-সাধনার মহাতন্ত্রেই বাঙালীকে অভিষিক্ত করিয়া গেলেন—যুগান্তে ইতিহাসের চক্র সেই সাধ্য-সাধন সিদ্ধ করিতে কাল-ধর্ম্মে আপনিই ঘুরিতেছে, দেখা গেল।

* * * *

বঙ্কিমের মাতৃ-মূর্ত্তি—"বন্দেমাতরম্" মন্ত্রেরই সাধ্য তত্ত্ব। মনীষী বিপিনচন্দ্রেরই কথায়—"মন্ত্র মাত্রেই অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন।…এই মন্ত্র জপিতে জপিতে যে মাতৃরূপ সাধকের মানসচক্ষে মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে গুরুকৃপায় আপনি স্ফুরিত হইয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্র এই সঞ্জীবনী শক্তিতে তারই বর্ণনা করিয়াছেন। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত মায়ের সাধন-মন্ত্র নহে, মায়ের স্তব। স্তব ও মন্ত্রে অনেক প্রভেদ।…বন্দেমাতরম্ মন্ত্র, ইহার প্রকৃত অর্থ কেবল—মা।" এই মাকে আত্মসমর্পণ করা—ইহাই যুগসাধনার নিগূঢ় ইঙ্গিত, প্রত্যক্ষ সঙ্কেত। বাঙালীকে মাতৃমন্ত্র-সাধনে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া তোলাই বঙ্কিমচন্দ্রের আর্ষ নির্দ্দেশ—জাতীয় দীক্ষার আসল মর্ম্ম। রাজা রামমোহনের পর, তিনিই নবীন বাঙালার চিহ্নিত জাতিগুরু। বাঙালীর স্বদেশী যুগের ইতিহাস এই গুরুমন্ত্রের সাধনায় বাঙালীর বুকের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সে ঐতিহাসিক সাধনার মন্ত্রগুরু—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

* * * *

কিন্তু দেশমাতৃকার উপাসনা—রূপের, প্রতীকের উপাসনা। কলি-হত যুগ-চিত্তকে অন্তর্মুখে ফিরাইবার ইহা অনিবার্য্য অনুষ্ঠান। পাশ্চাত্য শিক্ষায় কক্ষচ্যুত জাতির হৃদয় জগন্মাতার অংশ-রূপিণী দেশজননীকে ইষ্ট-বোধে রাজস অর্চ্চনা করিয়া, শুদ্ধসত্ত্ব শক্তি-সাধনারই যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে জীবন-বলি দিয়াই বাঙালী নিগূঢ়তর আত্মসমর্পণযোগের সিদ্ধমন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। শতাব্দীর সাধনায় এই পূর্ণাহুতি পড়িল—পুণ্যক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-দীক্ষাভিষিক্ত জাতি এইখানেই আত্মসমর্পণে নবজন্মলাভের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিল—যুগের পরিপূর্ণ মহাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে।

* * * *

ঠাকুরের দীক্ষা—রাষ্ট্রদীক্ষা নয়, সমাজ, সাহিত্যের দীক্ষা নয়—পরন্তু এই সকলের মূল ইহা নবজীবনেরই দীক্ষা। মহাকালীর পূর্ণাবতার শতাব্দীর সাধন-সিদ্ধিকে আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া বাঙালীকে সম্পূর্ণ নব-জন্ম দান করিতেই আসিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও অখণ্ড রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠী এই নব সাধনারই বিজয়ী অগ্রদূত। আজ নবীন বঙ্গের উদীয়মান জাতি এই শতবার্ষিকী সাঙ্গ করিয়া, নব-জীবনের দীক্ষায় ব্রতী হইবে—ইহাই দেখিব, আমরা কি আশা করিতে পারি না? এ আশা—ইতিহাসের সঙ্কেত, বিধাতার অমোঘ ইচ্ছা। বাঙালী পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে জাগ্রত শ্রীভগবানে নবজন্ম লাভ করিবে—অভিনব জীবন-সাধনায় সিদ্ধ জাতিরূপে জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা সফল করিয়া তুলিবে ইহার জন্য বাঙালী আজ অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে।

সীমার মাঝে অসীম তুমি

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

এ কথা কেমনে বল?
পথের ধূলায় মলিনতা নেই, ঘরটা বেঘোর হ'ল—
এও কি সত্য কথা?
দুঃখ নেহাৎ মনের বিকার, সুখটা মাথার ব্যথা!

পথেতে যদিও কোলাহল শুধু—বেজায় মিথ্যা ওটা,
আপনার ভুলে চলাই হচ্ছে সার্থক হয়ে ফোটা!
এ দুটো চক্ষে যেমন দেখিবে নয় ক মোটেই তাহা,
ভুলটা কাজেই ভুল নয় আর নির্ভুল ভুল যাহা!
এ কথা বুঝি না ভাই,
জগতে যা' নাই অন্তরে আছে, যেটা আছে সেটা নাই!

*

দুনিয়ার হাল এই,
যতই ছোট না অজানার পানে, কোথাও মেলে না খেই;
(জান তো কোথাও নেই)!
এমন বিষম দায়—
ভুয়ো মায়া ছেড়ে পথিক-চিত্ত রূপের আকার চায়!

যতই কেননা অসীম এবং আকুল বেগেই চলো,
সঙ্গী যদিও বাঁশী-গান-সুর, আকাশ-বাতাস-আলো-
মনটা কিন্তু চলে না, মাটির পিছন পানেই চাহে
শ্রান্ত চরণে কাঁটার নূপুর অলস-রাগিণী গাহে!
তবুও বলিতে হবে—
জীবনে মুখ্য পথটা কেবল সত্য মিলিবে তবে।

তাই যদি হয় হোক্,
পথের কাদায় অমলিন হয়ে তোমার সত্য রোক্,
আমার দেবতা আছে
ছায়ার শীতল বিরল ভবনে প্রিয়ার বুকের কাছে!

প্রিয়ার কণ্ঠে মিলন-রাত্রে শুনি অসীমের ভাষা;
বকুলের বাস যে-বাণী বহিছে, নহে সে ক্ষুদ্র আশা!
আমার হৃদয়ে পাখীর কাকলি বিশ্বেরি বাণী বহে,
শান্তির মাঝে জীবন আমার নয় সে মিথ্যা নহে।
এ কথা বুঝেছি সাদা:
সীমার মাঝেই অসীম আমার কুটীর-নীড়েতে বাঁধা!

একটু সবুর

রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু রায়, বাণী-বিনোদ

কিসের ভয় বন্ধু তোমার
ভাবনা কেন আঁধার হেরি'?
অমার বুকেই শুক্‌তারকার
আলোক জাগে আকাশ ঘেরি'।
কালোর যে পাঁক ক্রমে ক্রমে,
নিত্য যেথা উঠ্‌ছে জমে,
সেথায় দেখ আলোর কমল
বহায় লহর লাবণ্যেরি'।

জমাট কালো আঁধার রাতে
নূতন দিনের আভাস ভাই!
অন্ধকার-ই করছে যে রে—
বোধন আলোর সর্ব্বদাই।
পড়িস্ যদি আঁধার ঘোরে,
হারাস্-নেকো দিশা, ওরে!
একটু সবুর করলে পরে—
দেখ্‌বি উষার নাই দেরী।

রোমাঞ্চ

(গল্প)

শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী

বাদলের দিনে আমার বৈঠকখানায় আড্ডা জমেচে ভাল,—এমন সময় আমার ভগ্নীপতি প্রদোষ ভেজা কাপড়ে ঘরে ঢুকল। তখন সন্ধ্যে হয়-হয়,—বৃষ্টির চাপে কিন্তু তখুনি মনে হচ্ছিল অনেক রাত হয়েচে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বল্লুম,—"একদম বেড়াল-ভেজা হয়ে এসেছ যে—যাও, যাও—ভেতর থেকে কাপড় ছেড়ে এসো—"

প্রদোষ ভেতর থেকে ফিরে এলে সবাই তাকে নিয়ে পড়ল। বেচারা বড্ড ভালমানুষ। সেদিন গল্প করতে করতে বলে ফেলেছিল আড্ডাতে যে, যদিও তার এক ঘুমেই রাত কাবার হয়, কিন্তু হঠাৎ কোনদিন রাতে যদি বাইরে বেরুতে হয় তো অরুণাকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে তবে সে বেরোয়। কথাটা বল্‌তে না বল্‌তেই অট্টহাস্যে সবাই ফেটে পড়ল। বলা বাহুল্য, অরুণা মদীয়া ভগিনী—প্রদোষের স্ত্রী। হাসি পেতেই পারে—কারণ প্রদোষ মস্ত জোয়ান ছেলে,—ইতিহাসে এম্‌-এ পাশ—আর অরুণার বয়েস ষোল।

আজও যখন বাক্যবাণে সবাই জর্জরিত করে' ফেল্লে তাকে,—তখন সে কিছুক্ষণ পরে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—"বাস্‌, বাস্‌—ঢের হয়েচে,—তেমন পাকে পড়লে তখন বোঝা যায়, ভূতের ভয় আছে কিনা! আমার মত জলজ্যান্ত ভূতের কাণ্ড দেখনি তোমরা, তাই এসব বড় বড় কথা বলছ। সে সব কথা শুনতে চাও তো বলি,—তখন টের পাবে আমি শুধু শুধুই ওঁদের ভয় করি কিনা—"

ভূতযোনিগণের উদ্দেশে প্রদোষকে গৌরবাত্মক সর্ব্বনাম ব্যবহার করতে দেখে রতীশ যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বল্ল,—"তোমার ওঁরা আমার মাথায় থাকুন,—আর ওঁদের কীর্ত্তি-কাহিনী কিছু শুনিয়ে আমাদের 'অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও'।"

চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে প্রদোষ বল্‌লে—"সত্যি শুনতে চাও তোমরা সে গল্প?"

কোরস্‌এ জবাব এলো "হ্যাঁ হ্যাঁ—শুনব শুনব।" প্রদোষ ইজিচেয়ার একটাতে বসে' ছিল,—এবার খাড়া হয়ে ব'সল,—তারপর ধীরে ধীরে চোখ থেকে চশমা জোড়াটা একবার খুলে, কোঁচার খুঁটে পাথর দু'খানা ভাল করে' মুছে ফের চোখে লাগাল,—যেন সে ভাল করে' দেখতে চায়—উপস্থিত সবার উপর তার গল্পের প্রভাবটা কি রকম দাঁড়ায়!

"সে অনেক দিনের কথা"—প্রদোষ সুরু করতেই জিতেন আমার দিকে চেয়ে বলে উঠ্‌ল,—"একটা point of order দাদা,—আর একবার এক এক পেয়ালা চা'য়ের ফরমাস করে' দাও,—গল্পটা জম্‌বে ভাল।"

ভজুয়াকে ডেকে চায়ের কথা বলে দিতেই, প্রদোষ ফের সুরু করলে—"সে অনেক দিনের কথা। সেবার আমি ম্যাট্রিক দিয়ে বাড়ী গিয়ে অসুখে পড়লুম। প্রথমে ত হ'ল ফ্লু,—তারপর রইল বাকী একটু কাশি আর একটু ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর। গাঁয়ের যতীন ডাক্তার তো মাসখানেক কুইনিন গিলিয়ে হাল ছেড়ে দিলে। কি আর করবে বেচারা! আমাদের পাবনা, বগুড়া অঞ্চলে জানই তো গেঁয়ো গো-বদ্যিদের জ্বরে একমাত্র ওষুধ কুইনিন্‌। বাড়ীতে তখন ছিলেন কাকা,—তিনি দেড় মাস পরে সহরে আমায় নিয়ে দেখালেন সরকারী ডাক্তারকে। তিনি আধ ঘণ্টাখানেক ধরে বুক-টুক ঠুকে কাকাকে বল্‌লেন,—"দেখুন, বুকটা ভাল বোধ হচ্ছে না। আমার মনে হয়, ফুস্‌ফুসের একটা এক্স-রে করা দরকার—" বাড়ী ফেরবার পথে কাকা তো কেঁদে ফেল্‌লেন। দেখাদেখি আমিও ফেল্‌লুম কেঁদে, কিন্তু সে না ভয়ে—না দুঃখে। ওঁর কান্না দেখে নিজের জন্য ভাবনা যা না হ'ল, কাকার জন্য কষ্ট বোধ করতে লাগলুম ঢের বেশী। বুঝতে পেরেছিলাম আমি যে, ডাক্তার আমার টি-বি সন্দেহ কচ্চেন, কিন্তু তখন আমার বয়েস সবে পনের,—তখন

কি 'আমি মরব' একথা কোন ছেলে ভাব্‌তে পারে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সেরে আমি উঠবই—তা যক্ষ্মাই হোক বা যা-ই হোক। এরপর চিকিৎসা-বিভ্রাট যা চল্‌ল আরও একমাস ধরে'—তা তোমরা অনুমান করে' নাও। গেলুম ক'লকাতা—হ'ল X'Ray—হ'ল রক্ত পরীক্ষা, কাশি পরীক্ষা,—কত জনার consultation—সবাই একবাক্যে বল্লেন—নাঃ, যক্ষ্মার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না কিছুই; কিন্তু এ-ও সাব্যস্ত হল না জ্বরটা হচ্ছে কেন? শেষে বাবা লিখে পাঠালেন কাকাকে "ওকে নিয়ে দেশেই ফিরে' যাও। যদি যক্ষ্মার পূর্ব্বলক্ষণ এ হয়-ও তা'হলে ক'লকাতার চাইতে গ্রামদেশই ভাল। আর এক কথা,—হরিপুরের শম্ভু ভট্‌চায কবরেজকে একবার ওকে দেখিও, শুনেছি তিনি একজন নাম-করা চিকিৎসক। চিকিৎসা ওঁর আমি কখনও করাই নি বটে, কিন্তু—বাবা বল্‌তেন আর আমিও জানি—লোকটা পণ্ডিত আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রে।" চিঠি পড়ে' শোনাতেই ঠাকু'মা বল্লেন—"যদু ঠিক লিখেছে,—তোরা বাবা ক'লকাতার বড় বড় ডাক্তার ছাড়া তো চিকিচ্ছে করাবি নে;—আমার কিন্তু একথা আগেই মনে হয়েছিল। শুনেছি শম্ভু ভট্‌চায নাড়ী ধরে' মানুষের পরমায়ু বলে' দিতে পারে। সেবার সতীর হ'ল কলেরা,—যমে মানুষে টানাটানি। কর্ত্তা শম্ভু ভট্‌চাযকে ডেকে আনলেন—গরুর গাড়ীতে তিন দিনের পথ সেই হরিপুর থেকে। বুড়ো এসে রোগী দেখে ঘাড় নাড়লে,—বল্লে—'দেখি মা জগদম্বা কি করেন।' তারপর সেদিন রাতে বাড়ীর কালী মন্দিরে গিয়ে বসলেন তিনি ধ্যানে। ভোরবেলা মন্দির থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে একটা বেলের ত্রিপত্র আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—একটা বড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। মার পায়ের এই বেলপাতার রস করে মেড়ে খাইয়ে দাওগে যাও। সতী ভাল হবে।—তার সাত দিন পরে সতী উঠে বস্‌ল। শম্ভু ভট্‌চাযের ওষুদ কথা কয়!"

'এহেন প্রমাণের ওপর আর সংশয় থাকলেও, কাকা জানতেন—মা গ্রাহ্য করবেন না। যথাসময়ে আমরা শম্ভু ভট্‌চাযের বাড়ী রওনা হ'লাম,—কারণ তাঁকে চিঠি লেখাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তাঁর হাতে অনেক সঙ্কটাপন্ন রোগী; তাঁর আসা অসম্ভব। তবে আমরা যদি তাঁর ওখানে যাই, তবে সদাশিবের নাতিকে তিনি চেষ্টা করবেন ভাল করে দিতে,—'তবে সবই মা জগদম্বার ইচ্ছা।' সদাশিব ছিল আমার ঠাকুরদার নাম।

হপ্তাখানেক পরে এক অপরাহ্ন বেলায় আমরা হরিপুর গিয়ে পৌছুলাম কবরেজ বাড়ী। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা থেকে প্রায় পনের ফুট চওড়া একটা শষ্পাস্তীর্ণ রাস্তা বৈঠকখানার ঘর পর্য্যন্ত এসে পৌছেছে। বৈঠকখানার ডানদিকেই কালী মন্দির। মন্দিরটিই কেবল ইঁটের তৈরী, বাকী সব ঘরই করগেট টিনের। "এসো বাবা এস", বলে' এক হাতে কাকার হাত ধরে শম্ভু ভট্‌চায তাঁকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আর এক হাত দিয়েও তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে এই চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ স্বচ্ছন্দে আমাকে পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে তুলে মাথায় চুমো খেয়ে বল্লেন, "দাদু আমায় কখনও দেখনি, কেমন?—আমার দাড়ি দেখে ভয় কচ্ছে না তো?" বাস্তবিকই সে দাড়ি আশ্চর্য্য! গুচ্ছ গুচ্ছ তরঙ্গায়িত শুভ্র কেশ কোমর পর্য্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে,—আর সে পরিবেষ্টনীর ভেতর থেকে এক জোড়া পিঙ্গলাভ চোখ যেন অর্দ্ধস্তিমিত হয়ে তোমায় দেখছে—এমনি মনে হয়! আমি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলুম যে, আমার ভয় কচ্ছে না। তাঁর গা থেকে ভুর ভুর করে' চন্দনের গন্ধ বিকীর্ণ হচ্ছে,—যদিও দেহে তার কোন চিহ্ন নজরে পড়ল না। মাথায় আজানুলম্বিত পিঙ্গল জটা। আমার মাথায় হাত রেখে আশীষ্ করতেই, ঠাকু'মাকে পাল্কী থেকে নামতে দেখে ভট্‌চায মশাই ঝুঁকে তাঁর পদধূলি নিলেন। ঠাকু'মার ধব্‌ধবে সাদা পা দু'টি ভট্‌চায মশাইর জটা-স্তূপের তলে ঢাকা পড়ে গেল মুহূর্ত্তের জন্যে। ঠাকু'মা বল্লেন,—"থাক্ থাক্ ঠাকুরপো", তার পর তাঁর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল এই কথা মনে করে' যে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আর একবার যখন তাঁদের সাক্ষাৎকার হয়েছিল তখন ঠাকুরদা বেঁচে ছিলেন। ভট্‌চায মশাই তা' লক্ষ্য করেও যেন করলেন না,—"বৌঠান আমায় নিশ্চয় ভুলেই গেছেন। আপনার দুই ছেলের বিয়ের

নানান্ হাঙ্গামায় যেতে পারলুম না,—তাই বুঝি রেগে নাতির পৈতের সময় আর খবরটাও দিলেন না?"

ঠাকুরমা বল্লেন—"হ্যাঁ, তাই বৈকি, খবর দিলেও তুমি তোমার কালীমন্দির ছেড়ে যা' যেতে তা' বেশ জানি। কিন্তু সত্যি কথা হ'ল ভাই যে, তখন উনি চলে গেছেন বছর খানেক—আমার দেওর যা' যা' বন্দোবস্ত করলেন তাই হ'ল, আমি সে-সব কথা কিছুই জানতুম না।" আবার তাঁর চোখ ছলছলিয়ে এল। বাড়ীর ভেতরের দিকে পথ দেখিয়ে যেতে যেতে শম্ভু ভট্‌চায বল্‌লেন,—"সবি মা তারার ইচ্ছে বৌঠান—দুঃখ করে' আর কি করবেন?"

এমন সময়ে ভজুয়া চা নিয়ে এল। প্রদোষ হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালাটা নিজের বাঁ দিকে রেখে ফের বলে চল্ল। আর সবাই চুপচাপ শুনচে। মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেবার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

"বিকেল বেলা সেদিন ঠাকু-মা শম্ভু ভট্‌চাযকে ধরে' বস্‌লেন যে, সেদিন রাতে আমার নামে একটা শিবা-ভোগ দিতে হবে। এই শিবাভোগ ব্যাপারটা তোমরা হয় তো জান না। কারও মঙ্গল কামনায় কালী-মন্দিরে মায়ের কাছে কিছু ভোগ নিবেদন করে' সেই ভোগ আনাচে-কনাচে কোথাও রেখে দিতে হয়। যদি শিবারূপে মা-কালী এসে তা' গ্রহণ করেন, তবে ফল শুভ, নয়ত অশুভ। শম্ভু ভট্‌চায ঠাকুমা'র নির্বন্ধাতিশয্যে রাজী হলেন—বললেন, "হ্যাঁ, ও-পাড়ার হরি মুখুজ্যের বৌএর নামেও একটা দেবার কথা আছে—বেশ এক সঙ্গেই দেওয়া যাবে।"

রাত দশটার পর পূজো। আমি তো অসুখ শরীর নিয়েও শিবাভোগ দেখবার লোভে রাত জেগে' রইলাম। পূজার আদ্যন্ত যা' কাণ্ড-কারখানা হল তা' আমি আজো ভুলিনি। মন্দিরের মধ্যে একটি মাত্র তেলের দীপ মিটমিট করে' জ্বলছিল। সেই অস্পষ্ট আলোয় শম্ভু ভট্‌চাযের রক্তাম্বর, রক্তচন্দনলিপ্ত ললাট, দুই বাহুতে সিন্দূররঞ্জিত ত্রিশূলচিহ্ন, নরকপালে তাঁর থেকে থেকে 'কারণ' পান, মুহুর্মুহু 'মা-মা' রবে তাঁর গুরুগম্ভীর উচ্চনাদ—সমস্ত মন্দিরটাকে যেন কি একটা বিভীষিকায় ভরে' তুল্‌ল। মাটিতে কত হ'ল বিচিত্র রেখা সমাবেশ,—হ্রীং-ক্রীং কত কি সব দুর্বোধ্য আওয়াজে নিশীথ রাত চম্‌কে উঠতে লাগল; হোমের আগুনের ওপাশে শম্ভু ভট্টচাযের সে দীর্ঘ গৌর-মূর্ত্তি যেন থেকে থেকে কাঁপচে—এমনি আমার মনে হচ্ছিল। রাত তখন প্রায় একটা, হঠাৎ শম্ভু ভট্টচাযের গলায় মহা-শঙ্খের দুই-ন'রী মালাটা উঠ্‌ল দুলে';—ঘাড় ফিরিয়ে চৌকাঠের বাইরে ঠাকুমার পানে তাকিয়ে বল্‌লেন—'মা এবার আসবেন মনে হচ্ছে'। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠ্‌ল; ছেলে যাচ্ছে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে—হবে না? আস্তে আস্তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দুই হাতে তাঁর দুটি মৃৎভাণ্ড,—তা' দুটি ছাগশিশুর রক্তে ভরা। টলকে তার কিছুটা পড়ে' একটা ভাঁড় বাইরে পর্য্যন্ত লালে লাল হয়ে গিয়েছে। স্বল্পালোকে তা চিক্‌মিক্ করতে লাগল।

ধীরে ধীরে খড়ম পায় দিয়ে তিনি বাইরে গেলেন—মন্দিরের পেছনে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। একটা প্রকাণ্ড ফুলের গাছ সেখানে; তার নীচে শুকনো পাতার ওপরে শম্ভু ভট্টচাযের চলার আওয়াজ অন্ধকারের বুক চিরে ভেসে আসতে লাগল—খস্-মস্, খস্-মস্। আমার বুকের ভেতরে তখন এত জোরে ঢিপ্ ঢিপ্ কচ্ছিল যে পাশে থাকলে তোমরা সে আওয়াজ শুনতে পেতে। একটু পরে ভট্টচায ফিরে এসে মা ও কাকাকে অস্ফুটে বল্‌লেন—'এই জানালাটা একটু ফাঁক করে' তোমরা তাকিয়ে থাক, কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার ফিকে বোধ হবে। সাবধানে দেখ—মা এলেন বলে। ঐ ডানদিকের ভাঁড়টা দাদুর নামে উৎসর্গ করা আর বাঁদিকেরটা হরি মুখুজ্যের বৌ-এর।' তারপর আমার হাত ধরে' বল্‌লেন—'চল দাদু, আমরাও মাকে দেখিগে ঐ জানালা থেকে।' আমি জানালার ফাঁকে চোখ দিয়ে দুঃসহ উৎকণ্ঠায় অন্ধকার যেন গিলতে লাগলুম। হ্যাঁ, সত্যিই ত অন্ধকার হাল্কা হয়ে এল। ঐ যেন দেখা যাচ্ছে ডান দিকে একখানা বড় পাথরের ওপরে একটা বাটি, আর ঐ যে আর একটা বাটি একটা ঢিবির ওপরে রাখা। হঠাৎ সর্ সর্ করে' শুকনো পাতা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল—পা করে উঠ্‌ল আমার

ছম্ ছম্। সত্যি সত্যি অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দুটো শেয়াল, আর চারদিক শুঁকে বেড়াতে লাগল। প্রথমে গেল হরি মুখুজ্যের বৌ-এর নামে উচ্ছুগ্য করা সেই ভাঁড়টার কাছে—যেটা মাটির ঢিবির ওপর রাখা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, মিনিটখানেক সেটাকে শুঁকে টুকে সে রক্ত দুটো শেয়ালের কোনটাই ছুঁলে না। তারপর আরো আশ্চর্য্য, কিছুক্ষণ ঘুরে সে দুটো যখন পাথরের ওপরে রাখা ভাঁড়টার কাছে পৌছুল, তখন কাল বিলম্ব না করে চক্ চক্ করে তা খেতে সুরু করলে। শেষ করতে সময় লাগল মিনিট দুই; তারপর আবার সেই 'সর্ সর্' শব্দ। ঐ একটু দূরে, আরো দূরে, শেয়াল দুটো অন্ধকারের সমুদ্রে ডুবে গেল। আমরা সবাই এবার মন্দিরের মধ্যিখানে এলাম। আলোতে এবার দেখ্‌লাম শম্ভু ভট্‌চাযের মুখে যেন কে কালি মাড়িয়ে দিয়েচে। ঠাকুরমা ফিস্ ফিস্ করে শুধোলেন—"কি ফল হ'ল ঠাকুরপো?" ভট্‌চায একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে' শুধু একবার বলে উঠ্‌লেন, 'হতভাগিনী'!—তারপর মুহূর্ত্তেক চুপ থেকে ফের বল্‌লেন—"দাদু তো সেরে উঠ্‌ল বলে, মার ওর ওপর তো অসীম দয়া। কিন্তু হরির বৌ-এর পাত্রটা ছুঁলেন না পর্য্যন্ত—ইচ্ছা হয়তো ওকে নিয়েই নেবেন।"

তোমরা মনে করবে আমি বানিয়ে বল্‌ছি; কিন্তু সেদিন থেকে তৃতীয় দিনে খবর পাওয়া গেল—হরি মুখুয্যের বৌ হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছে। অবশ্য দুর্ব্বল তো সে খুবই হয়েছিল।

এর পর থেকে শম্ভু ভট্‌চাযের বাড়ীতে যে দিন-কুড়ি ছিলুম, আমার সন্ধ্যার পরই কেমন ভয় ভয় করত। কিন্তু সব চাইতে স্মরণীয় দিন হচ্চে আমরা চলে আসবার আগের আগের দিন। সেদিন অমাবস্যা। সেদিন-ও শম্ভু ভট্‌চায ষোড়শোপচারে কালীপূজা করলেন। আমিও জেগে রয়েচি। কিশোর বয়সের সেই অজানার মোহ আর কি—যা চুকে বুকে গেছে, আর আসবে না! রাত তখন দুটো হবে। শম্ভু ভট্‌চায মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়ালেন। চারদিকে যাকে বলে সূচিভেদ্য অন্ধকার—তাই। শুধু প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একঝোপ বেতকাঁটার মধ্যে এক লক্ষ জোনাকী এক সঙ্গে দপ্ করে নিভছিল আর জ্বলছিল। হঠাৎ দূরে ঈশান কোণে আকাশ থেকে কি একটা শোঁ শোঁ ধ্বনি যেন আমাদের কাণে এসে পৌছল। আমাদের মানে আমার ও ভট্‌চায মশাইর। নৈবেদ্য ইত্যাদি যে ব্রাহ্মণটি যোগান দেয়—সে সবে মিনিট পনের হ'ল বাড়ী চলে গিয়েছে। এ বাড়ী থেকে প্রায় সিকি মাইল হবে তার বাড়ী। সেদিন ঠাকুমা আর কাকা জেগে নেই, তাঁরা ঘ'রে ঘুমুচ্চেন। আকাশের সেই আওয়াজ শুনে ভট্‌চায মশাই থমকে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে আকাশের পানে তাকিয়ে বল্লেন—"এ আবার কি?" আমার মনে হ'ল এক ঝাঁক পাখী উড়ে আসচে। সে-বয়সেই রবি ঠাকুর পড়তে সুরু করেছি—আমার হঠাৎ মনে পড়ল—'ঐ পক্ষধ্বনি—

শব্দময়ী অপ্সর রমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।

কিন্তু—সে মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। একটু পরেই সে আওয়াজ এত ভয়ানক হয়ে উঠ্‌ল যে 'শব্দময়ী অপ্সর রমণী' বলে ভুল করবার আর জো রইল না। তখনো এরোপ্লেন সৃষ্টি হয়নি, না হয় মনে করতেও পারতুম যে এরোপ্লেন আসচে। ভাবলুম ঝড় এলো কি? কিন্তু নিশ্চল বায়ু-সঞ্চারী ঝড় কি করে হবে! হঠাৎ ঠিক আমাদের মাথার ওপরে তারকাখচিত আকাশের তলায় খণ্ডমেঘ যেন একখানা ছুটে এলো, তারই সেই সহস্রফণা নাগের মত ফোঁসফোঁসানি। হঠাৎ শম্ভু ভট্‌চায গলা থেকে মহাশঙ্খের মালা খুলে নিয়ে শূন্যে তুলে ধরে গম্ভীর স্বরে বলে উঠ্‌লেন তিনবার—'তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ'—কি আশ্চর্য্য ভাই, মন্ত্রশান্ত সাপের মতোই সেই ছায়ারূপী বস্তুটির গর্জ্জন ধীরে ধীরে এলো কমে! বুঝতে পারলুম সেটা ক্রমশঃই নীচে নেমে আসচে। সহসা ভট্‌চাযমশাই তাঁর বাঁ হাত দিয়ে শক্ত করে আমার ডানহাতটা ধরে বল্লেন—"দাদু, তুমি সাহসী ছেলে, যা দেখবে তাতে ভয় পেয়ো না কিন্তু। আর পাবেই বা কেন—তুমি তো মা-কালীর বরপুত্র, তোমার প্রাণভিক্ষা তো তিনিই দিয়েচেন"—আর বলতে বলতেই হেঁট হয়ে তিনি ডানহাতের কড়ে আঙুল দিয়ে প্রকাণ্ড একটা বৃত্তাকার গণ্ডী টেনে ফেল্লেন। দেখতে না দেখতে

ওপরের সেই ছায়াময় বস্তুটি সেই গণ্ডীর মধ্যে এসে নামল! তাতে যা দেখ্‌লুম—তাতে ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেছি! অবস্থা দেখে শম্ভু ভট্‌চায আমার হাতে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লেন—"আমি আছি, তোমার কিছু ভয় নেই দাদু"—কি দেখলুম জান? সেই গণ্ডীর মধ্যে একটা মৃতদেহ যেন আর একটাকে জড়িয়ে পড়ে আছে! বজ্রমুষ্টিতে এবার আমার হাত ধরে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে শম্ভু ভট্‌চা'য ডান হাত দিয়ে তুলে একটা জলভরা বালতি নিয়ে এলেন। তারপর আমায় বল্‌লেন, "আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি, ঐ লোকটাকে জলের ঝাপ্টা দিতে হবে মুখে চোখে, তুমি কিন্তু আমার কাপড়ের খুঁট ছেড়ে দিও না। বরং তোমার কোঁচায় বেঁধেই নাও।" আমার তখন এমন অবস্থা যে জিজ্ঞাসা করতে পর্য্যন্ত ভুলে গেলুম যে মড়ার গায়ে জলের ছিটে দিয়ে কি হবে! ভট্‌চায মশাই এগিয়ে গিয়ে কি বিড়-বিড় করে' বল্‌তে লাগলেন ও যে দেহটা আর একটাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়েছিল, তার মুখে সজোরে মারতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখ্‌লুম নীচের শবটার হাত দু'খানা নড়ে উঠ্‌ল ও তার হাতের বাঁধন পড়ল খসে'। দু'পাশে তা' এলিয়ে পড়ল যেমন মৃতদেহের থাকে। তারপর সেটার বুকের ওপর যে আর একটা শব চিৎ হয়ে পড়েছিল—সেটাকে টেনে গণ্ডীর বাইরে নানাবিধ প্রক্রিয়া করতে লাগলেন;—আর মাঝে মাঝে চলতে লাগল জলের ঝাপ্‌টা। প্রায় পনের মিনিটের পর সে দেহটাও উঠ্‌ল নড়ে,—আর শুধু নড়া নয়,—একেবারে উঠ্‌ল বসে। আমার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট চীৎকার বেরিয়ে এল!—আমার মাথায় তখন হাত দিয়ে শম্ভু ভট্‌চায বল্লেন—"ভয় নেই, এটা মৃতদেহ নয়,—লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল মাত্র। মড়া ঐটে—" বলে গণ্ডীর মধ্যে সেই দেহটার পানে আঙুল দিয়ে দেখালেন। এ লোকটি ততক্ষণ দুই চক্ষু বারে বারে রগড়াচ্চে আর চারদিকে তাকাচ্চে। প্রথমে তার চোখে ফুটল মুহ্যমান অর্দ্ধ চেতনা; তারপর বিস্ময়; তার মিনিট কয়েক পরে সজ্ঞানতার আভাস। তাকে তখন ভট্‌চায মশাই বল্লেন—"আপনি দেখ্‌চি শব-সাধনা কচ্ছিলেন, কিন্তু কি করে এ বিপদ হ'ল?" লোকটি তখন ভট্‌চায মশাইর পায়ের ধুলো নিলে উবু হয়ে,—বল্লে,—"আপনি মহাপুরুষ, আমার জীবন দান করলেন। আমি একজন তান্ত্রিক, হরিপুরের শ্মশানে এই অমাবস্যার রাতে শব-সাধনা কচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার প্রক্রিয়ায় হল একটা মস্ত ভুল—আর মুহূর্ত্তে আমার শবাসন নড়ে উঠ্‌ল,—কোন্ প্রেতযোনি এতে এসে ভর করল জানিনে,—শবটা লাফ দিয়ে উঠে আমায় ধরলে,—তারপর লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে বাতাসে কর্‌ল ভর। আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লুম; তারপর এই আপনাকে দেখচি।" শম্ভু ভট্‌চায জিজ্ঞাসা করলেন,—"মৃতদেহটা কি কোনো চণ্ডালের?" তান্ত্রিক প্রবর উত্তর করলেন,—"হ্যাঁ মশাই, তা ছাড়া আজই শনিবার অমাবস্যায় এর মৃত্যু হয়েচে।"

শম্ভু ভট্‌চায মৃদু হাসলেন। তারপর বল্লেন "খুব ভালো করে না জেনে শুনে আর এ সব কাজে কক্ষণো হাত দেবেন না। এখন এই মৃতদেহটাকে আজ রাতেই দাহ করতে হবে।" আমায় বল্লেন—"দাদু, তোমায় তোমার ঠাকুমার কাছে রেখে আস্‌চি,—তারপর আবার শ্মশানে যেতে হবে এ দেহটাকে দাহ করতে। কিচ্ছু ভয় নেই,—কিন্তু এ-সব কথা যেন আর কাউকে বোলো না।" আমাকে তিনি ঠাকু'মার ঘরে পৌঁছে দিলেন।

পরদিন আমার বিছনা ছেড়ে উঠ্‌তে দেরী হয়ে গেল। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল সেই তান্ত্রিকের কথা। এক পা দু'পা করে বাইরে গেলুম, মন্দিরে গেলুম,—কিন্তু তান্ত্রিককে কোথাও দেখতে পেলুম না। শেষে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম ভট্‌চায মশাইকে—"দাদু,—কালকের সেই ভদ্রলোকটি কোথায়?" "তিনি ভোর হবার আগেই নিজের গাঁয়ের পথে রওনা হয়ে গেছেন। কিন্তু কি হবে তাঁকে দিয়ে দাদু? ও-সব কথা ভুলে যাও, ও নিয়ে আর ভেবো না। যাক্‌। কিন্তু তোমার তো কাল যাবার কথা—চলো তোমায় এখানে বুড়ো শিবের বাড়ী দেখিয়ে আনি। আজ রোগীদের সব শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিদায় কর্‌তেও পেরেচি।"

তার পরদিন আমরা চলে এলাম, কিন্তু সেদিনের কথা যেমনই মনে পড়ে—আমার কি একটা অশরীরী বিভীষিকায় গা রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে।

"এসব তো চোখের দেখা,—এখন বল প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করব কিনা।"

প্রদোষের কথা শেষ হল। মিনিটখানেক সবাই চুপ্ চাপ্। তারপর শিশির চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"খুব গাঁজাখুরী গল্প শোনা গেল বাবা যা হোক। এবার বাড়ী যাওয়া যাক্।"

রতীশ বল্লে,—"তাই তো,—বাদলের রাত,—ভুতের গল্প শুনে রাস্তায় যেতে গা'টা ছম্ ছম্ করে না উঠলে হয়।"

এর পরে একটি দুটি করে সবাই ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়ল। ঘরে যখন আর কেউ রইল না,—প্রদোষ আমাকে বল্লে,—"মেজদা'কে একটা ফোন করে দাও না ভাই,—যে আজ আমার আর যাওয়া হবে না। এত রাতে গাড়ীও সহজে পাওয়া যাবে না। তুমি হাসোই আর যাই করো—আমি একা—বিশেষ করে আজ রাতে তো যেতেই পারব না সেই ঢাকেশ্বরী বাড়ীর রাস্তা পর্য্যন্ত!"

মুচ্‌কি হেসে ফোনটা তুলে নিয়ে বল্লাম, "টু, থ্রি, ফোর, টু প্লীজ্।"

সাহিত্যে হ্যুম্যানিজ্‌ম্ ও শরৎচন্দ্র

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ এম্-এ

'হ্যুম্যানিজ্‌ম্' (humanism) শব্দটি ইয়োরোপ হইতে আমদানী হইলেও বাংলা-সাহিত্য-সমালোচনায় ইহার প্রয়োজন আছে। 'মানবতা', 'মানবিকতা' প্রভৃতি ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইলেও আজ পর্য্যন্ত ইহার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ তৈয়ারী হয় নাই। এই শব্দটির এমন একটা বিশেষ অর্থ আছে যে, ইহাকে পারিভাষিক শ্রেণীভুক্ত করা যায়। বাংলা সাহিত্যে ইহার আমদানী নূতন হইলেও ইয়োরোপে ইহার জন্ম হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সহিত ইহার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ট যে অনেকে ইহাকে রেনেসাঁস অর্থেও ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দটার জন্মদাতা ইতালীদেশীয় কবি পেতরার্ক। তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন গ্রীক্ ও লাটীন্ সাহিত্যকে 'literal humaniores' বা মানবধর্ম্মী সাহিত্য নামে অভিহিত করেন। মধ্যযুগের ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন ও সাহিত্য মানবতাসম্পর্কশূন্য ছিল বলিয়া মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের কথা বিস্মৃত হইয়াছিল, ইহাই ছিল রেনেসাঁসের বাণী। অমর শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো যেদিন সিষ্টাইন্ গির্জ্জার প্রাচীরগাত্রে সদ্যসৃষ্ট আদমের প্রাণবান্ মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনই শিল্পীর তুলিকায় হ্যুম্যানিজ্‌মের রূপ ফুটিয়া উঠিল। সেদিন ইয়োরোপে মানুষের বহুশতাব্দীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল, মানুষ নূতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তির স্পন্দন অনুভব করিল। মানুষ নিজের মূল্য বুঝিতে পারিয়া আপনার ব্যক্তিত্বের দাবী করিল এবং শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত হইল। ধর্ম্মজগতে মার্টিন লুথার বিপ্লবের বাণী শুনাইলেন, বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে প্রচার করিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব পন্থায় ভগবান্‌কে ডাকিতে পারে, যেহেতু ভগবান্ কোন সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। যে ধর্ম্ম মধ্যযুগের বিশাল সংস্কৃতিকে ধারণ করিয়াছিল, তাহার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত দাবীকে ইহার পূর্ব্বে কেহ এত বড় করিয়া দেখেন নাই, এইজন্য লুথারকে হ্যুম্যানিজ্‌মের প্রতিষ্ঠাতা বলিতে হইবে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের (individualism) বাণী প্রচার করিয়া ইয়োরোপে যুগান্তর আনিলেন।

হ্যুম্যানিজ্‌মের মর্ম্মকথা বুঝিতে হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা individualism জিনিসটা কি বুঝিতে হইবে, কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হইতেই হ্যুম্যানিজ্‌মের উৎপত্তি। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর দার্শনিক ম্যাক্‌মারে বলেন, 'Individualism is the self-assertion of the

individual......is, in fact, a half-and-half condition of the human mind, in which half our consciousness is on the side of authority and half of it on the side of freedom' (অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও সামাজিক শক্তির দো-টানার মধ্যে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য)। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই মানুষকে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রবৃত্তি আনিয়া দেয়, এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ নিজস্ব ন্যায়-অন্যায় বোধের মাপকাঠি লইয়া সমাজের প্রচলিত নীতি ও ধর্ম্মকে প্রশ্ন করে। এই প্রবৃত্তির নামান্তর হ্যুম্যানিজ্‌ম্। হ্যুম্যানিজ্‌মের মূল কথা, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' বাংলার আদিকবি চণ্ডীদাস প্রায় পাঁচ-শত বৎসর পূর্ব্বে এই বাণী বাঙালীকে শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু বাঙালী সেদিন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। খাঁটী হ্যুম্যানিজ্‌মের বিশেষত্ব প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি বিদ্রোহের প্রবৃত্তি ও আস্থাহীনতা। কিন্তু হ্যুম্যানিষ্ট্ 'কালাপাহাড়' নহেন। তিনি জীর্ণ পুরাতনকে সংস্কার করিতে চান, কিন্তু নূতন প্রতিষ্ঠিত করিবার মত শক্তিও তাঁহার নাই। তাঁহার নিকট মানুষ হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ ধর্ম্ম। তাঁহার নিকট হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই, তাঁহার চক্ষে সকলেই মানুষ, সকলেই এক ভগবানের সৃষ্ট জীব। 'শেষ প্রশ্নে'র কমল ছিল হ্যুম্যানিষ্ট্, তাই সে বলিয়াছিল, 'বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধিনিষেধের ধ্বজা বয়ে দাঁড়ায় কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না, এই তো ভয়? নাই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে পরিচয় দিতে ত কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই কি কম?'

বাঙলা দেশে পাশ্চাত্য দেশ হইতে হ্যুম্যানিজ্‌মের প্রবাহ আসে রামমোহন রায়ের যুগে। রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে নবযুগের ঘোষণা করিলেন তাহার অন্যতম বার্ত্তা হ্যুম্যানিজ্‌ম্। এই যুগের ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও অন্যান্য চিন্তাধারায় প্রাচীনের প্রতি সন্দেহ এবং বহুযুগের সংস্কারলব্ধ অন্ধ বিশ্বাসের উপর ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই যুগে দুইটী সংস্কৃতির সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, একটী প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতি ও আর একটী নবজাগ্রত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। এই সংঘর্ষের ফলে বাঙলাদেশে হ্যুম্যানিজ্‌মের জন্ম হইল। সাহিত্যে ইহার বাণী সর্ব্বপ্রথম শুনিলেন শ্রীমধুসূদন। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নায়ক পৌরাণিক চরিত্র হইলেও সাধারণ মনুষ্যধর্ম্ম বিশিষ্ট। তাই মেঘনাদ ও রাবণের প্রতি পাঠকের স্বতঃই সহানুভূতি জাগে এবং বিষ্ণুর অবতার রামলক্ষ্মণের প্রতি বিপরীত ভাবের উদয় হয়। মধুসূদনের মধ্যে এই যে চিরাচরিত প্রথার বিরোধিতা দেখিতে পাই, ইহাই হ্যুম্যানিষ্টের ধর্ম্ম। মেঘনাদ ও রাবণকে মনুষ্যত্বের গৌরবে মহান্ করিয়া ও রাম লক্ষ্মণের দেবত্ব খর্ব্ব করিয়া তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যে হ্যুম্যানিজ্‌মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তবে খাঁটী হ্যুম্যানিষ্ট্ তিনি নহেন। মধুসূদনের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও মানবতার আদর্শ গ্রহণ করিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি ভগবান্‌কে আদর্শ মানবরূপে অঙ্কিত করিলেন। 'মানব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা' ও 'গীতা পরিচয়ে' তিনি বিশ্বমানবের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ সৃষ্টি করিলেন। বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ হ্যুম্যানিজ্‌মের দিকে আরো অগ্রসর হইলেন। তিনি ভারত-তীর্থে মহামানবের জয়গান করিলেন। তাঁহার উপন্যাসেও মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মের কথা বলিলেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই খাঁটি হ্যুম্যানিষ্ট্ নহেন, হ্যুম্যানিজ্‌মের অগ্রদূত মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল নরনারীর জন্য অশ্রুপাত করিয়াছেন, তাহারা সকলেই সংযমী ও আদর্শ চরিত্র। ভ্রমর, সূর্য্যমুখী ও প্রফুল্লের জন্য তিনি কাঁদিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্বের প্রমাণ হয় না। তিনি যদি রোহিনী, কুন্দনন্দিনী বা শৈবলিনীর জন্য একবিন্দু অশ্রুপাত করিয়া সমাজকে প্রশ্ন করিতেন তাহাদের দুঃখময় জীবনের জন্য দায়ী কে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে খাঁটী হ্যুম্যানিষ্ট্ বলিয়া স্বীকার করিতাম। সমাজের দায়িত্বের কথা তিনি আলোচনা করেন নাই, তিনি কেবল সংযমের জয়গান করিয়াছেন ও পাপিষ্ঠের শাস্তি দিয়া

poetic justice দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিম-চন্দ্র অপেক্ষা হ্যুম্যানিজমের দিকে অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাই 'চোখের বালি'তে। বিধবা বিনোদিনীর প্রেমকে তিনি স্বাভাবিক মনে করিয়াছিলেন, তাই তিনি সে প্রেমকে লাঞ্ছিত করেন নাই। কথা-সাহিত্যে তিনিই প্রথম মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনিও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব প্রকাশ করেন নাই। বিদ্রোহের সুর প্রথম তুলিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি সমাজকে মানিলেও দেবতা বলিয়া মানিলেন না, তিনি প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তুলিলেন। তিনিই বাংলার কথা-সাহিত্যে প্রথম খাঁটী হ্যুম্যানিষ্ট্।

শরৎসাহিত্যে যে মানবপ্রীতির পরিচয় পাই তাহার মূলে ছিল তাঁহার নিজস্ব মরমীহৃদয় ও দুঃখের সহিত সত্যকার পরিচয়। পাশ্চাত্য হ্যুম্যানিষ্টদিগের নিকট তিনি সাক্ষাৎভাবে ঋণী ছিলেন না, তবে যুগের হাওয়া যে তাঁহার গায়ে লাগিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। হ্যুম্যানিষ্ট্ বলিয়া তিনি সমাজের অন্যায় ও অন্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং সংস্কারের প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তবে কোথাও কোন সমস্যার সমাধান করেন নাই। বিদেশী হ্যুম্যানিষ্ট্-সাহিত্যে অনেক সময় সামাজিক সমস্যার সমাধানের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, কিন্তু শরৎচন্দ্র শুধু সমস্যার ইঙ্গিতই করিয়াছেন, কোথাও পথ নির্দ্দেশ করেন নাই। এইখানেই তাঁহার আর্টের বৈশিষ্ট্য বা ষ্টাইলের মৌলিকত্ব।

নারীর প্রতি বাঙালী সমাজের অত্যাচার হইয়াছে নির্ম্মম, তাই হ্যুম্যানিষ্ট্ শরৎচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে নারী-চরিত্রাঙ্কনে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বাঙালীকে বিধবার দুঃখে বিচলিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু শরৎচন্দ্র বঙ্গবিধবার জীবনের করুণ চিত্র আঁকিয়া বাঙালী জাতিকে অন্তরে আঘাত করিয়াছেন। বাঙলার হিন্দু সমাজে বিধবার পক্ষে প্রেম মহাপাপ বলিয়া ঘোষিত হইলেও—তাহা যে অস্বাভাবিক নহে এবং ক্ষমার যোগ্য, ইহাই শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মাধবীর প্রেম, রমেশের প্রতি রমার প্রেম বা শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর প্রেম হয়ত সংসারে দুর্নীতি বলিয়া নিন্দনীয়, কিন্তু হ্যুম্যানিষ্টের চক্ষে তাহা সত্য ও ক্ষমার্হ। তাঁহার জিজ্ঞাস্য, ইহাদের মিলন হইলে সমাজে কি অনর্থ ঘটিত? বিলাসী নীচজাতীয়া এবং চন্দ্রমুখী পতিতা বলিয়া কি মানবী নহে? তাহাদের পক্ষে প্রেমও কি পাপ? শরৎচন্দ্র তাহাদের প্রতি দরদ না দেখাইয়া থাকিতে পারেন নাই। দেবদাসের ও পার্ব্বতীর প্রেমে অনেকে নাসিকা সঙ্কুচিত করিবেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র তথাকথিত নীতিবাদী বা puritan নহেন। সাবিত্রী মেসের ঝি বলিয়া সে কি নারী নহে? অচলার জন্য সহানুভূতি অন্য কোন লেখক দেখাইতে সাহস করিতেন না। 'বামুনের মেয়ে'র জ্ঞানদার পদস্খলন ক্ষমা করা অত্যন্ত ক্ষমাশীলের পক্ষে দুরূহ হইলেও শরৎচন্দ্রের পক্ষে নহে।' 'পথ নির্দ্দেশে'র হেম ও গুণীর প্রেমের পরিণতি কেন মিলন হইবে না—ইহাই তাঁহার প্রশ্ন। অভয়ার স্বামী থাকিতেও দ্বিতীয় সংসার তাহার পক্ষে কেন মহাপাপ—ইহাই শরৎচন্দ্রের জিজ্ঞাস্য। প্রকৃত প্রেমের অধিকারে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করে—ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস। গঞ্জিকাসেবী, মূর্খ নীলাম্বর শত দোষ ত্রুটী সত্বেও প্রেমের গৌরবে ছিল মহান্। শ্রীকান্ত ও সতীশের মনুষ্যত্বও এই প্রেমের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। নারী প্রেমের পূজারিণী বলিয়া শরৎচন্দ্র কোনদিন ছোট দেখিতে বা ভাবিতে পারেন নাই। নারীও যে রক্তমাংসে গড়া মানুষ তাহা ভুলিয়া গিয়া তাহার ক্ষুদ্রতম ত্রুটীতে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ি, কিন্তু দরদী হ্যুম্যানিষ্ট্ শরৎচন্দ্র সর্ব্বদাই মনে রাখিতেন, 'To err is human and to forgive divine.'

সামাজিক ধর্ম্ম অপেক্ষা মানুষ যে অনেক বড় জিনিষ তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস ও গল্পে দিয়াছেন। 'গৃহদাহে' এক জাতীয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের চরিত্র আঁকিয়াছেন—যাঁহারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য অসহায় নারীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া আসিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন না। ইহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহিমের মুখে শরৎচন্দ্র সমাজকে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'যে স্নেহের মর্য্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্ত্ত নারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া আসিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম্ম এত বড় স্নেহশীল ব্রাহ্মণকেও এমন চঞ্চল, প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম্ম? ইহাকে

যে স্বীকার করিয়াছে সে কোন্ সত্য বস্তু বহন করিতেছে? যাহা ধর্ম্ম, সে ত ধর্ম্মের মত আঘাত সহিবার জন্য! সে ত তার শেষ পরীক্ষা!' 'মহেশ' গল্পেও শরৎচন্দ্র মনুষ্যত্বের দাবী যে বড়, তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। গফুর মুসলমান বলিয়া যে সমাজে মনুষ্যপদবাচ্য হয় না—সে সমাজের মঙ্গল কোথায়? নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও যে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে তাহা 'পল্লীসমাজের' কামিনীর মা'তে দেখিতে পাই। এই উপন্যাসে মুসলমান লাঠিয়াল আকবর আলির মধ্যে যে মনুষ্যত্ব রহিয়াছে—ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক বেণী ঘোষালের মধ্যে তাহা নাই। অসংযমী সুরেশের জন্য যে শরৎচন্দ্র পাঠককে কাঁদাইয়াছেন—তাহার কারণ, রিপুর বশবর্ত্তী হইলেও সুরেশ জানিত মানুষের সেবা করা মনুষ্য জন্মের সার্থকতা। তাই সে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ছুটিয়াছিল প্লেগের মধ্যে, অপরিচিত অসহায় দরিদ্রদের সেবা করিয়া। শরৎচন্দ্র বলেন, 'মানুষ ত দেবতা নয়, সে যে মানুষ! তাহার দেহ দোষেগুণে জড়ানো; কিন্তু তাই বলে ত তার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের উত্তেজনাকে স্বভাব বলে মেনে নেওয়া যায় না।' কবি হ্বার্ডস্ওয়ার্থের ভাষায় শরৎচন্দ্র বলিতে চাহেন,

Tears to human suffering are due;
And mortal hopes defeated and o'erthrown
Are mourned by man'.

আধুনিক কথা-সাহিত্যে যে হ্যুম্যানিজ্মের সুর উঠিয়াছে, তাহার প্রেরণা দিয়াছেন শরৎচন্দ্র। নির্য্যাতিত, পতিত, দীন, হীন, তথাকথিত নীচ বলিয়া যাহারা এতাবৎ-কাল সাহিত্যেও অস্পৃশ্য ছিল, তাহারা আজ সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। রুষ সাহিত্যের প্রভাব এ বিষয়ে থাকিলেও, শরৎচন্দ্রের দান বড় অল্প নহে। শরৎচন্দ্র নবীন সাহিত্যিক-দিগকে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। শুধু আভিজাত্যের কাহিনী লইয়া, নীতিগ্রন্থ লিখিয়া সাহিত্য রসের সৃষ্টি হয় না—ইহাই শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন। মানুষকে সমাজের মধ্যে থাকিতে হইবে বলিয়া মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করে এমন সমাজে মানুষ থাকিবে কেন? কিন্তু শরৎচন্দ্রের হ্যুম্যানিজ্মের বাণী বর্ত্তমান সভ্যতার শেষ কথা নহে। ইউরোপে হ্যুম্যানিজ্ম্ এখন অতীতের কথা। আজ সেখানে নীট্সের অতিমানব (superman)-বাদ ও মার্ক্সের সাম্যবাদ লইয়া দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। অতি আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে আজ যে সুর বাজিতেছে, তাহা আমাদের দেশে পৌঁছিতে দেরী আছে। গর্কি, টুর্গেনিভ্ যে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও আমাদের সাহিত্যে এখনও সৃষ্টি হয় নাই। কেবল শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে তাহার সূচনা হইয়াছে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে, বাংলা দেশের রেনেসাঁসের বয়স মাত্র দেড়শত বৎসর, আর ইয়োরোপে ইহার বয়স অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর। সেই হিসাবে শরৎচন্দ্রের হ্যুম্যানিজ্ম্ আমাদের গর্ব্ব করিবার বিষয় এবং এইজন্য কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রকে আধুনিক বলিতে হইবে। তবে রবীন্দ্রনাথকে যে অর্থে আধুনিক বলি, শরৎচন্দ্র সে হিসাবে আধুনিক নহেন। রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বপ্রেমিক করিয়াছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের আধুনিকতা বাঙালীর বাঙালীত্ব অটুট রাখিয়াছে।

কাম্বোজে হিন্দু স্থাপত্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী সদানন্দ গিরি

আঙ্কর থমের ইতিহাস

রাজা যশোবর্ম্মণ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আঙ্কর থম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন মাত্র রাজপ্রাসাদ ও উপরোক্ত ময়দানের চারিধারের মন্দিরসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্রায়তন রাজধানী প্রস্তরময় উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সেই প্রাচীরের সামান্য নিদর্শন উপরোক্ত প্রাঃ পালিলাই মন্দিরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে এখন পর্য্যন্ত দেখা যায়। রাজা যশোবর্ম্মণ সহরের মধ্যভাগে অবস্থিত যশোধরগিরি নামে অনুচ্চ পাহাড়কে মন্দিরের আকারে রূপান্তরিত করিয়া, তাঁহার বংশের ইষ্টদেবতা লিঙ্গময় শিবকে সেই মন্দিরে খুব জাঁকজমকের সহিত স্থাপন করেন। তিনি যশোধরাশ্রম নামে শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তগণের জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, বৌদ্ধ ভক্তগণের জন্যও তিনি সঙ্ঘতাশ্রম নামে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (টেপ্ প্রাণাম্)। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ময়দানের অপর দিকে তিনি দ্বাদশটী প্রাসাদ ও দুইটী খ্লেয়াং প্রাসাদও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সহরের দক্ষিণ দিকে তিনি যশোধরেশ্বর মন্দির (প্নোম্ বাখেং) নির্ম্মাণ করেন। রাজা যশোবর্ম্মণের জীবদ্দশায় সহর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় নাই। তাঁহার পুত্রেরা এই কার্য্য করিতে থাকেন। তাঁহারা সেই ক্ষুদ্র সহরটীর আশে পাশে অন্যান্য ইমারত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সকল ইমারতের মধ্যে দক্ষিণ দিকে বাক্সেই চ্যামক্রং ও ক্রাভান্ প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য। রাজা চতুর্থ জয়বর্ম্মণ ৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই সহর ত্যাগ করিয়া কোঃ কারে গিয়া বাস করিতে থাকেন।

রাজা দ্বিতীয় রাজেন্দ্রবর্ম্মণ ৯৪৪ খৃষ্টাব্দে আঙ্কর থমে ফিরিয়া আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তিনি ষোল বৎসর যাবৎ পরিত্যক্ত রাজধানীকে সংস্কার করিয়া, ইহাতে স্নুবর্ণমণ্ডিত নূতন গৃহাদি মূল্যবান মণিমাণিক্যাদি প্রস্তর দ্বারা সুশোভিত করিবার ফলে আঙ্কর থম্ প্রাচ্য জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এইরূপে কাম্বোজের রাজধানীকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য রাজাকে তাঁহার মন্ত্রী কবীন্দ্রারিমথন যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। উক্ত মন্ত্রী রাজার প্রধান প্রাসাদটীও নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত, রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে নূতন আশ্রমসকল নির্ম্মিত হয়। এই সকল আশ্রমের মধ্যে পূর্ব্বমেবং, প্রে-রূপ ও তা-কেও উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক আশ্রম পাঁচটী গম্বুজযুক্ত ও স্থাপত্য-নৈপুণ্যের হিসাবে আশ্রমগুলির এই বিশেষত্ব ছিল যে, পাঁচটী গম্বুজের মধ্যে চারিটী চারিকোণে ও পঞ্চমটী মধ্যস্থলে অবস্থিত। বট্‌চুমের গম্বুজগুলি কিন্তু একটি মাত্র শ্রেণীতে আবদ্ধ। এই রাজার পুত্র রাজ-প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে বাকুয়ন্ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সময় তৎকালীন রাজধানীর বহির্ভাগের প্রাচীরকে পরিবর্ত্তিত আকার দিতে হইয়াছিল।

একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৌদ্ধ রাজা সূর্য্যবর্ম্মণ সহরটীকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সপ্তম জয়বর্ম্মণ বুদ্ধদেবের পূজার জন্য বায়ন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেইজন্য সহরটীকে অতিশয় বৃহদায়তনবিশিষ্ট করিতে হইয়াছিল। সেই সহরটীর চৌহদ্দীই এখনও বিদ্যমান। নবনির্ম্মিত আঙ্কর থমের সিংহদ্বারগুলিই আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই। সপ্তম জয়বর্ম্মণ উপরোক্ত হস্তী-চত্বর ও সহরতলীর তা-প্রোম্, বাস্তে কিদেই ও প্রাসাদ দ্রং-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সপ্তম জয়বর্ম্মণের পরবর্ত্তী রাজা বায়নের স্থাপত্যে উচ্চতর অঙ্গের শিল্পনৈপুণ্য মুদ্রিত করিবার জন্য ইহার কেন্দ্রস্থ মন্দিরগুলি নূতন আদর্শে নির্ম্মাণ করেন। এই রাজা বায়নের অবয়ব হইতে বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শনগুলি লোপ করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মণ আঙ্কর ভাট্ মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

১১৭৮ খৃষ্টাব্দে চম্পার রাজা আঙ্কর থম্ আক্রমণ করেন। তিনি বহু মন্দির লুণ্ঠন করিয়া যে সকল উপকরণ প্রাপ্ত হন, সে সব তিনি তাঁহার রাজ্যে চ্যাম্ মন্দিরগুলির শোভা বর্দ্ধনের জন্য লইয়া যান। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট্ যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন—তিনি বলেন যে, শ্যামের রাজা কর্ত্তৃক আঙ্কর থম্ লুণ্ঠিত হইয়া ধ্বংসমুখী হইয়াছে। ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দের সমকালে শ্যামের রাজা রাজাধিপতি কাম্বোজ রাজ্য আক্রমণ করেন ও আঙ্কর থম্ ষোল মাস যাবত অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবার পর শ্যামরাজ্যের সৈন্যগণ জয়ী হইয়া আঙ্কর থম্ লুণ্ঠন করে। অতঃপর আঙ্করে পর পর শ্যামদেশের তিন জন রাজা রাজত্ব করেন।

চৌ তা-কুয়ন্ নামে চৈনিক রাজদূত যিনি ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে আঙ্কর থমে অবস্থান করিতেছিলেন—তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"আঙ্করের বাহিরের প্রাচীরের পরিধি ২০ লি। ইহার পাঁচটী প্রায় একই রকম আকারের সিংহদ্বার, প্রত্যেক সিংহদ্বারের পার্শ্বে ক্রমান্বয়ে সারি দিয়া আরও অনেকগুলি পার্শ্বদ্বার। প্রাচীরের বাহিরে খুব প্রশস্ত পরিখা, পরিখার বাহিরে বাঁধান উচ্চ রাস্তা ও অনেকগুলি সেতু-মুখ। সেতুগুলির উভয়পার্শ্বে সর্ব্বশুদ্ধ একশত আটটী প্রকাণ্ড ও ভীষণ দানবমূর্ত্তি, যেন তাহারা প্রস্তরময় সেনাপতিরূপে রাজধানীকে রক্ষা করিতেছে। সেতুর দুইপার্শ্বে প্রস্তরময় আবক্ষ উচ্চ নয়টী মস্তকযুক্ত সর্পাকার দেয়াল বা আলিসা। প্রাচীর-সংলগ্ন সিংহদ্বারের ঊর্দ্ধভাগে বুদ্ধের পাঁচটী প্রস্তরময় মস্তক—যাহার মধ্যে



আঙ্কর ভাটের সম্মুখের দৃশ্য

১৪০৪ খৃষ্টাব্দে কাম্বোজ রাজ্য পুনরায় শ্যামরাজ পরম-রাজাধিরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সাতমাস যাবত অবরোধের পর আঙ্কর থম্ আত্মসমর্পণ করে ও বিজয়ী শ্যামরাজের সৈন্যগণ এই রাজধানী লুণ্ঠন করে। এই সকল আক্রমণের ফলে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে কাম্বোজের রাজা পন্হিয়া-যৎ রাজধানী আঙ্কর থম্ হইতে প্লোম্পেনে সরাইয়া লইয়া যান। তদবধি আঙ্কর থমের অধঃপতন আরম্ভ হয়। যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা প্রাঃ গামখৎ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা প্রথম সোথা আঙ্কর থমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা হইলেও অন্যান্য রাজারা কাম্বোজের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগ করাতে ইহা ক্রমশঃ নিবিড় বনজঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া যায় ও এক সময়ে যে ঐশ্বর্য্য-শালী আঙ্কর থম্ জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিত—তাহা বিস্মৃতির অন্ধকার কবরে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

মাঝখানের মস্তকটী স্বর্ণমণ্ডিত। সিংহদ্বারগুলির উভয় পার্শ্বে প্রস্তরময় হস্তীমূর্ত্তি। প্রাচীরের সবটা প্রস্তর-নির্ম্মিত ও প্রস্তরগুলি খণ্ডাকারে উপর্য্যুপরি সজ্জিত। এই সকল প্রস্তরখণ্ড দৃঢ়ভাবে সংযোজিত ও সেইজন্য কোনও আগাছা প্রাচীরের গাত্রে জন্মিতে পারে না। ফাঁক-বিশিষ্ট কোনও প্রাচীর দেখা যায় না। স্থানে স্থানে বপ্র আছে, বপ্রের ভিতর দিকটা কোনও কোনও স্থানে সু-উচ্চ যাহার উপরিভাগে বৃহৎ দ্বারসকল নির্ম্মিত। এই দ্বারগুলি রাত্রে বন্ধ করিয়া রাখা হয় ও প্রাতঃকালে খোলা হয়। দ্বারদেশে রক্ষিগণ থাকে, কেবল কুকুরসকল দ্বারে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাচীরের চারিটী কোণে চারিটী উচ্চ গম্বুজ নির্ম্মিত। যে সকল দণ্ডিত ব্যক্তির পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শাস্তির জন্য কাটা হইয়াছে তাহারাও দ্বারে প্রবেশ করিতে পায় না। স্বর্ণময় অতি উচ্চ গম্বুজ—যাহার নাম বায়ন

তাহা সহরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার চারিধারে একান্নটী প্রস্তরময় উচ্চ গম্বুজ ও কয়েকশত প্রস্তরে নির্ম্মিত ক্ষুদ্রায়তন গৃহ। পূর্ব্বদিকে একটি স্বর্ণমণ্ডিত সেতু—যাহার উভয় পার্শ্বে দুইটী করিয়া স্বর্ণময় সিংহমূর্ত্তি ও আটটী বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি, যাহা দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহগুলির পাদদেশে রক্ষিত। বায়নের স্বর্ণমণ্ডিত গম্বুজের এক লি উত্তরে পিত্তলনির্ম্মিত একটি উচ্চতর গম্বুজ যাহার নাম বাকুয়ন্। যিনি ইহা দেখিয়াছেন তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ইহার পাদদেশে দশটীরও অধিক ক্ষুদ্র প্রস্তরময় গৃহ, আরও এক লি উত্তরে রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের শয়নকক্ষ সকল যেখানে, আরও একটি স্বর্ণময় গম্বুজ সেখানে আছে—যাহার নাম বিমানোকম্। রাজপ্রাসাদ ও রাজকর্ম্মচারিগণের গৃহ প্রভৃতি সব পূর্ব্বমুখে অবস্থিত। সেতু-সংলগ্ন নামিবার স্থান অতিশয় বৃহৎ ও সেখানে বুদ্ধমূর্ত্তি বিদ্যমান।

"রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই মস্তকের কেশ চূড়ার আকারে বিন্যস্ত। নবম ও দশম শতাব্দীর প্রস্তরময় মূর্ত্তি হইতে কেশ-বিন্যাসের এই প্রথা সপ্রমাণ হয়। খ্মের সৈন্যগণের মাথার কেশ কিন্তু দীর্ঘ নয়। মাথায় ঝুঁটি রাখিবার প্রথা এখনও উচ্চশ্রেণীর কাম্বোজগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কাম্বোজগণ স্কন্ধদেশ অনাবৃত রাখে। একখানি মাত্র বস্ত্র তাহারা কোমরে জড়াইয়া রাখে। কেবলমাত্র রাজা স্বয়ং গুলবাহার পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করেন। রাজার মস্তকে সোণার মুকুট, কিন্তু যখন তাঁহার মস্তকে মুকুট থাকে না—তখন তিনি ঝুঁটিতে সুগন্ধ পুষ্পের মালা জড়াইয়া রাখেন। তাঁহার কণ্ঠে দেড় সের ওজনের মুক্তার মালা; হাতের কব্জা, পায়ের গোছ ও হাতের অঙ্গুলি বৈদুর্য্যমণি-বেষ্টিত, হস্ত ও পদতল লাল রঙে রঞ্জিত। যখন তিনি প্রজাগণের সম্মুখে বাহির হন—তখন তাঁহার হস্তে প্রাখান নামে ইন্দ্র-প্রদত্ত অসি থাকে। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিরা পালকী ব্যবহার করেন—যাহার হাতল স্বর্ণ-মণ্ডিত, চারিটী ছত্রও ব্যবহৃত হয় যাহার বাঁটও স্বর্ণমণ্ডিত।"

"যখন রাজা রাজপ্রাসাদের বাহিরে গমন করেন তখন সর্ব্বাগ্রে অশ্বারোহী সৈন্য রক্ষীস্বরূপ গমন করে, তারপর পতাকা ও বাদ্যভাণ্ড। তারপরে রাজপ্রাসাদের তিনশত হইতে পাঁচশত সুন্দরী কুমারী ফুলদার ঘাগরা পরিধান করিয়া, মাথার ঝুঁটিতে ফুল গুঁজিয়া ও জলন্ত বাতি হাতে লইয়া গমন করেন। তারপরে রাজপ্রাসাদের পরিচারিকারা সোণার ও রূপার পাত্রাদি ও বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার লইয়া গমন করে। মন্ত্রীরা, রাজকুমারগণ ও যাঁহারা রাজার আত্মীয় তাঁহারা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের সম্মুখস্থ সব কিছু দেখিতে পান তাঁহাদের সঙ্গে লাল বর্ণের অসংখ্য ছত্র থাকে। তারপরে রাজার পত্নীরা ও রক্ষিতারা পাল্‌কী, গাড়ী বা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে শতাধিক স্বর্ণমণ্ডিত ছত্রদণ্ডযুক্ত ছত্র থাকে। রাজপ্রাসাদের কুমারীগণ বর্ষা ও ঢাল ধারণ করিয়া রাজার শরীররক্ষীরূপে গমন করে। তারপরে স্বর্ণমণ্ডিত ছাগযান ও অশ্বযান সকল গমন করে। সকলের পশ্চাতে রাজা হস্তীপৃষ্ঠে প্রাখা নামে অসি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া গমন করেন। এই হস্তীর দন্তদ্বয় স্বর্ণমণ্ডিত। এতদ্ব্যতীত বহু হস্তী ও অশ্বারোহী সৈন্য রাজাকে রক্ষণ করিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া লইয়া যায়।"

আঙ্কর ভাট

কাম্বোজের প্রর্ব্বপ্রধান হিন্দু স্থাপত্য-কীর্ত্তি আঙ্কর ভাট্ নামে জগদ্বিখ্যাত বিষ্ণুর মন্দির। যে যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কাম্বোজে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই যুগে আঙ্কর ভাট্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দির একটী সুদীর্ঘ পরিখা ও পরিখার পরে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও উত্তর দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিমে ইহার চারিটী প্রবেশ-দ্বার চাঁদনিযুক্ত। প্রাচীন প্রবেশ দ্বার পশ্চিমদিকে অবস্থিত, সেখানে সুবৃহৎ চাঁদনি আছে। পরিখা পার হইতে গেলে সেতুর উপর দিয়া যে রাস্তা আছে—তাহা অতিক্রম করিতে হয়। তারপরে পশ্চিম-দিকের উক্ত সিংহদ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। এই স্থানে বহু নাগমূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত উচ্চ মঞ্চ আছে। প্রশস্ত সোপান দিয়া উঠিবার পর মঞ্চের মধ্যভাগে অবস্থিত গোপুরে পৌছিতে হয়। পশ্চিমদিকের এই সিংহদ্বার একটি উৎকৃষ্ট স্মৃতিমন্দির বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেলিং ঘেরা ইহার

দেয়ালের গায়ে ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন পাষাণে মুদ্রিত। এই দ্বারের দক্ষিণভাগে বিষ্ণুর মূর্ত্তি একখানি অখণ্ড প্রস্তর হইতে খোদিত। এই দ্বারের চৌকাটের মাথার বাজু-গুলিতে কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট। অবশিষ্ট তিনটী দ্বারে আসিবার কোনও সেতুপথ নাই ও এই দ্বারগুলি অসমাপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। দ্বারগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দির পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সোজা রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের সারি বিদ্যমান।

পশ্চিমদিকের সিংহদ্বার পার হইলেই আমরা আঙ্কর-ভাটের ব্যাপকতা উপলব্ধি করিতে পারি ও দ্বারের সন্নিকট দুই ধারে অবস্থিত প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যগুলির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। পশ্চিমদিকের উপরোক্ত সুদীর্ঘ রাস্তা প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত ও এই রাস্তার এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্ব শ্রেণীবদ্ধভাবে অসংখ্য স্তম্ভ দ্বারা সুসজ্জিত। স্তম্ভশ্রেণী সপ্ত মস্তকযুক্ত সর্পাকারে নির্ম্মিত ও তাহার মাঝে মাঝে সোপানাবলী যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য নির্ম্মিত—তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই পথের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুইটী স্বল্পায়তন সুন্দর গৃহ আছে—যাহা পুস্তকাগার ছিল। পথ যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে আমরা উচ্চ সমতল স্থানে উঠিয়া বুঝিতে পারি যে, ইহার উপরেই আঙ্কর ভাট্ মস্তক উন্নত করিয়া অবস্থান করিতেছে।



আঙ্কর ভাটের রামায়ণ বিষয়ক গাত্রচিত্র

দর্শক উপরোক্ত রাস্তা দিয়া মন্দিরের দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকেন তাঁহার বিস্ময়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখনও কিন্তু তিনি মন্দিরের রেলিং-ঘেরা বারান্দা দেখিতে পান না। বাস্তবিক, আঙ্কর ভাটের স্থাপত্যে এমন এক বিশেষত্ব আছে—যদ্দ্বারা মন্দিরের সবটা একেবারে প্রথম হইতেই দর্শকের নয়নগোচর হয় না। অতি উচ্চ অঙ্গের মহাকাব্যে কবি যেমন পাঠকের কল্পনাকে জাগাইবার জন্য কাব্যের প্লট্ ক্রমশঃ ঘনীভূত করেন, আঙ্কর ভাটের স্থপতিও সেইরূপ দর্শকের বিস্ময় উৎপাদনের জন্য তাঁহার এই পাষাণে রচিত মহাকাব্যের স্তরগুলি ক্রমবিকাশের নিয়মাধীন করিয়া সর্ব্বপ্রথম চিত্রের স্থূল রেখাগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থূলের ভিতর দিয়া এইরূপেই সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। আঙ্কর-ভাটের স্থাপত্যে আমরা সেইজন্য হিন্দুধর্ম্মের এই অমূল্য উপদেশের অন্তর্নিহিত ভাবটীর স্পষ্ট আভাস পাই। কেবল তাহাই নহে, এই জগদ্বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দিরের স্থাপত্যে আমরা একাধিক অতি উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাই।

আঙ্কর ভাটের স্থাপত্যে ক্রমোচ্চ যে তিনটী স্তর দেখা যায়—তাহাতে উপর হইতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের পৌরাণিক স্থান-নির্দ্দেশের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হইয়াছে। মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশলের ভিতর দিয়া সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট্ চিত্র কল্পিত হইয়াছে। যে বিরাট্ প্রতিভা আঙ্কর ভাট্ নির্ম্মাণ করিয়াছে—তাহাতে ক্ষুদ্রত্বের বা সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল দর্শকই আঙ্কর ভাটের বিরাট্ দৃশ্যে অভিভূত হইয়া পড়েন। সাধারণ শ্রেণীর পর্য্যটক, তীর্থযাত্রী ও যাঁহারা তত্ত্বদর্শী ও জ্ঞানপিপাসু তাঁহাদের সকলেরই মানস-পটে আঙ্কর ভাটের বিশ্ব জোড়া চিত্র প্রতিফলিত করা যে সে প্রতিভার সাধ্য নয়। আঙ্কর ভাটের স্থপতি ও ভাস্কর একই লোক কিনা—তাহা আমরা না জানিলেও, ইহার স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে কোথাও অসঙ্গতি-দোষ স্পর্শ করে নাই, ইহা উপলব্ধি

করিতে পারি। আমরা সেইজন্য আঙ্কর ভাটের পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের যে সংবাদ পাই, তাহার মূল্য সমধিক বলিয়া মনে হয়।

হিন্দুর পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থের মতে, পাতালে অর্থাৎ ভারতের দক্ষিণে বহুনিম্ন প্রদেশে সমুদ্রবেষ্টিত নাগরাজ্য অবস্থিত। নাগজাতীয় ব্যক্তিগণের জন্মভূমিও কাম্বোজ। সেইজন্য আঙ্কর ভাটের সর্ব্বনিম্ন প্রদেশ অর্থাৎ সমতল ভূমিতে জলপূর্ণ পরিখাবেষ্টিত সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দিরের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ পথে প্রস্তরের বিরাট্ নাগমূর্ত্তি সকল দেখা যায়। পাতালের উপরিভাগে মর্ত্ত্যভূমি—যেখানে মনুষ্যগণ বাস করে। এই মর্ত্ত্যভূমিই মানুষের কর্ম্মভূমি। সেই জন্য আঙ্কর ভাটের প্রথম তলে কর্ম্মময় পৌরাণিক যুগের ঘটনা সকল পাষাণের অক্ষরে দেয়ালের গাত্রে বিবৃত। আঙ্কর ভাটের স্থপতি ও ভাস্কর এই স্থানেই কর্ম্মযোগের পাষাণময় অধ্যায় আরম্ভ ও শেষ করিয়াছেন। প্রথম তলে কর্ম্মময়তার স্থূল চিত্র রচনা করিয়া শিল্পী দ্বিতীয় তলে সূক্ষ্ম তত্ত্বের অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন। সেই জন্য আঙ্কর ভাটের দ্বিতীয় তলে "পুস্তকাশ্রম" অবস্থিত। এইখানে আমরা জ্ঞানযোগের চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিতে পাই। শেষে আঙ্কর ভাটের সর্ব্বোচ্চ তৃতীয় তলে বিষ্ণুর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আমরা ভক্তি-যোগের কর্ম্ম উপলব্ধি করি। কর্ম্ম ও জ্ঞান আমাদিগের মনকে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থার ভিতর দিয়া এইরূপে ভগবদ্ভক্তির উৎস বিষ্ণুর আরাধনায় ডুবাইয়া দেয়। আঙ্কর ভাটের নামহীন অমর শিল্পী যে পর্ব্বতপ্রমাণ প্রতিভার সাহায্যে ইহার স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে সমগ্র হিন্দু-জগতকে প্রতিফলিত করিয়াছেন, রূপকের ফ্রেমে আঁটা পাথরের চিত্রফলককে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রতিভার নাগাল পাইতে পারে এমন শিল্পী বা কবি আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

আঙ্কর ভাটের ভাস্কর্য্য

আঙ্কর ভাটের স্থাপত্য শিল্পে যেমন আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব অনুভব করি, ইহার ভাস্কর্য্যেও সেইরূপ আমরা যুগে যুগে ভারতীয় ভাবধারায় প্রভাব অনুভব করি। মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিবংশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে বিবৃত ঘটনাবলী হিন্দু ভাস্কর ব্যতীত অপর কোনও শিল্পীর বাটালির মুখে অনায়াস-স্ফূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিতে পারে না। সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদির ভিতর দিয়া প্রাচীনতম আর্য্য সভ্যতার ইতিহাসের অধ্যায়গুলি পর পর পাথরের উপর মুদ্রিত করা হিন্দু-শিল্পী ব্যতীত অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

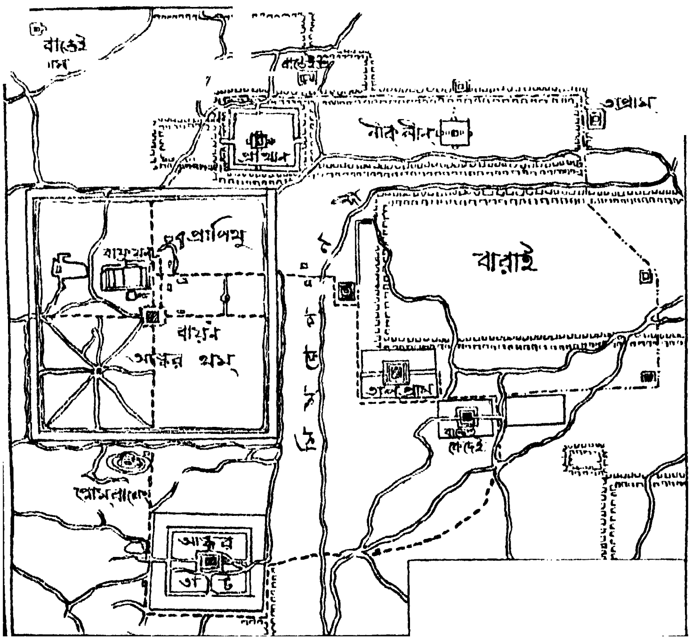
আমরা আঙ্কর ভাটের পূর্ব্বদিকের রেলিং-ঘেরা বারান্দার পার্শ্বস্থ প্রস্তরময় দেয়ালে ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থনের দৃশ্যে মুকুটধারী ৮৮জন দেবতা ও শিরস্ত্রাণযুক্ত ৯২ জন অসুরের মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত, বিষ্ণু কর্ত্তৃক দানব সৈন্য ধ্বংসের দৃশ্যে নাগগণের শত্রু নরদেহধারী গরুড়ের পৃষ্ঠে চতুর্হস্ত-বিশিষ্ট বিষ্ণুকে দানবগণের অগ্র-গতিতে বাধা দিতে সুর, নিসুন্দ, হয়গ্রীব ও পঞ্চজন নামে দানবগণকে ভূপাতিত দেখিতে পাই।

আঙ্কর ভাটের উত্তরদিকের বারান্দার পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ প্রস্তরময় দেয়ালে আমরা বাণাসুরের কাহিনীমূলক দৃশ্যে শোণিতপুরে অনিরুদ্ধের ধর্ষণকারী বাণ রাজার প্রাসাদে শ্রীকৃষ্ণের আগমন, আগুণের বেড়া-জাল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গতিরোধ, গরুড় কর্ত্তৃক অগ্নি নির্ব্বাপণ, বাণের পরাজয় ও শিবের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বন্দী বাণরাজার মুক্তি দেখিতে পাই। এই বারান্দার পশ্চিম দিকের প্রস্তরময় দেয়ালে দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে যুদ্ধের দৃশ্যে আমরা কালনেমির সহিত বিষ্ণুর দ্বন্দ-যুদ্ধ দেখিতে পাই। এই দৃশ্যের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে আমরা শস্ত্রপাণি দেবতাগণকে যে যার বাহনে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দেখিবার জন্য সমাগত দেখিতে পাই। যক্ষের স্কন্ধে আরূঢ় কুবের, ময়ুরারূঢ় দেবসেনাপতি স্কন্দ, চারিটী দন্তযুক্ত ঐরাবতে দেবরাজ ইন্দ্র, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, গোযানে উপবিষ্ট ধর্ম্মরাজ যম, হংসারূঢ় ব্রহ্মা, সূর্য্য ও তাঁহার রথচক্র ও নাগারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাই।

পশ্চিম দিকের বারান্দার উত্তর পার্শ্বস্থ দেয়ালে আমরা রামায়ণের দৃশ্যাবলীতে লঙ্কার যুদ্ধে রাক্ষস ও বানরগণকে যুদ্ধরত দেখিতে পাই। এই বারান্দার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দেয়ালে আমরা মহাভারতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের

দৃশ্যে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে, ব্রাহ্মণ সেনাপতি দ্রোণকে ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পার্থ-সারথি চতুর্হস্ত বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই।

দক্ষিণ দিকের বারান্দার পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ দেয়ালে আমরা স্বর্গ ও নরকের উনসত্তরটী দৃশ্যে ছত্রিশটী লিপিযুক্ত শিলা ও অলৌকিক ঘটনাবলীর সমাবেশ দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে যে দৃশ্যে যমরাজা বিচার করিতেছেন ও ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্ত তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন সেই দৃশ্য উল্লেখ-যোগ্য। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের কোণের দিকে



আঙ্কর থমের সন্নরতলীর নক্সা: বিমল গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তুত

দরজার চৌকাঠের গায়ে রামায়ণে বর্ণিত বহু ঘটনাবলীর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবল মাত্র দক্ষিণ দিকের বারান্দার পশ্চিমাংশে আমরা সমসাময়িক কাম্বোজের ইতিহাস পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। এখানে রাজা, রাণী ও শোভা-যাত্রা প্রভৃতির বহু চিত্র ও ২৮টী লিপি পাথরের গায়ে খোদিত দেখা যায়।

আঙ্করভাটের ভাস্কর্য্যে শিল্পীরা যে কত শত মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিল—তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ গণনা করে নাই। এই সকল প্রস্তরময় চিত্রের অসংখ্য আলোক-চিত্র ইন্দো-চীনের বাজারে বিক্রীত হয়। য়ুরোপীয় পর্য্যটকগণ আগ্রহের সহিত আঙ্কর ভাটের ফটোসকল



ষড়ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি: আঙ্কর ভাট

ক্রয় করিয়া থাকেন। পাঁচশত বৎসর যাবত পরিত্যক্ত ও বনজঙ্গলে ঢাকা আঙ্কর ভাট্ এক্ষণে পুনরায় সজীবতাময় হইয়াছে। ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কাম্বোজের রাজা সবই সোয়ামও পাঁচ শতাব্দী পরে আঙ্কর ভাটের বিগ্রহ বিষ্ণুর পূজা খুব জাঁকজমকের সহিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের সাহায্যে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে ইন্দো-চীনের ফরাসি গবর্ণর জেনারেল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ফরাসি রাজপুরুষেরা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কাম্বোজের অভিজাতশ্রেণীর সকলেই

সে সময়ে আঙ্কর ভাটে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা রাজার সম্মুখে চিরাগত প্রথানুসারে রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তদবধি ধর্ম্ম সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে কাম্বোজগণ আঙ্কর ভাটে আসিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা করে। কাম্বোজবাসী হিন্দুদের জাতীয় দেবতা যে এতদিন পরে পুনরায় আঙ্কর ভাটে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন, ইহা যে হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই।

সহরতলী

(দক্ষিণ-পশ্চিম)

প্রত্যেক দেশের রাজধানীকে ঘিরিয়া এমন অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রাম বা সহর আছে যেখানে রাজধানীর বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয় ও রাজধানীর অনুকরণে যেখানে বহু গৃহ বা মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আমরা সেইজন্য কাম্বোজের প্রাচীন রাজধানী আঙ্কর থমের চারিধারে অবস্থিত গ্রামগুলিতে নানা শ্রেণীর উৎকৃষ্ট স্থাপত্য শিল্পের পরিচায়ক মন্দিরাদি দেখিতে পাই। আঙ্কর থমের দক্ষিণ পশ্চিমে "বিজয় দ্বার" নামে যে দ্বার অবস্থিত—তাহা আঙ্কর থমের সিংহদ্বারগুলির ন্যায় স্থাপত্য শিল্পের পরিচায়ক। আঙ্কর থমের পূর্ব্বদ্বারের বাহিরে "অতিকায়দের উচ্চ পথ" আছে—যাহা অতিক্রম করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিতে হয়। ইহার উত্তর দিকে চুয়ান্নটী অসুর মূর্ত্তি ও দক্ষিণ দিকে চুয়ান্নটী দেবমূর্ত্তি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সমুদয় মূর্ত্তি সর্পাকারে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড অনুচ্চ প্রাচীর বা অলিন্দকে ধারণ করিয়া আছে। এখানেও সেই দেব দানবের মিলিত শক্তি ও বাসুকীরূপ মন্থনরজ্জুর সাহায্যে সমুদ্র মন্থনের পৌরাণিক আখ্যান স্থাপত্যের কৃপায় মূর্ত্ত হইয়াছে। উক্ত উচ্চ রাস্তা সমতল ভূমির প্রশস্ত রাস্তায় আসিয়া মিশিয়াছে ও সেখান হইতে সেই রাস্তা সোজা চলিয়া গিয়াছে সীয়েম্ রীপ্ নদীর তীর পর্য্যন্ত। এই রাস্তার দুই ধারে দুইটী প্রস্তরময় সুন্দর মন্দির আছে। ইহার মধ্যে থম্ মেশন্ নামে মন্দির রাস্তার উত্তরেও চৌষট্ টেভাডা নামে মন্দির রাস্তার দক্ষিণে অবস্থিত। মন্দির দুইটী প্রাচীন হিন্দু আদর্শে নির্ম্মিত। প্রত্যেক মন্দির তিনটী সুবৃহৎ খিলান-যুক্ত হওয়াতে গোপুরের ন্যায় সহরতলীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। পূর্ব্ব দিকের খিলানের গাত্রে রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবিশেষ প্রতিফলিত। আমার মনে হয়, হিন্দুর অতীত গৌরবময় এই স্থানটি হিন্দুমাত্রেরই দ্রষ্টব্য।

বীর্য্যবান্

কুমারী নমিতা মজুমদার

আমি কারুর আঘাত নেব না আর
আমার গায়ে,
আমি সব কুড়িয়ে ভাসিয়ে দেব
ভাসার নায়ে।

শুধু তুমি তোমার আপন প্রেমে
মারবে যে মার, সইব থেমে,
ভর্‌ব তোমার এই দানেতে—
সকল কায়ে।

তারপরে যেই শেষ হবে এই
দিনের বেলা ;
সাঙ্গ হবে যখন সবার
কর্ম্ম, খেলা

তখন মারের চিহ্ন গায়ে ভরে'
আস্‌ব তোমার দুয়ার 'পরে,
লুটিয়ে দেব আপনাকে এই
তোমার পায়ে

বিশ্বসিংহ

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টশালী

(তৃতীয় খণ্ড)

ষষ্ঠ অধ্যায়—কামতা-রাজনন্দিনী করুণা

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বীরবালক দৃষ্টি পথে ছিল, যুবক ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দিকে অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন; যখন সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন তৎপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়কটীর কথা তাহার মনে পড়িল। তিনি সূর্য্য কিরণে উহা ধরিয়া দেখিলেন—অঙ্গুরীয়কটী হস্তিদন্তে নির্ম্মিত; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র বিশিষ্ট একটী সূক্ষ্ম লতিকা চিত্রিত রহিয়াছে; ঐ লতিকার পত্রের ভিতরে ক্বচিৎ দুই একটী ফুটন্ত পুষ্পও রহিয়াছে। তখন বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছিল, সেই স্তিমিত কিরণে তিনি আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না,—অথচ বালক বলিয়াছে, ইহাতে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত চিন্তিত চিত্তে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

যখন তিনি আপন গৃহে পৌছিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। তিনি উজ্জ্বল দীপালোকে সেই অঙ্গুরীয়কটী পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বারংবার আলোড়ন বিলোড়ন করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইলেন যে, কয়েকটী ফুটন্ত পুষ্প উহাতে রহিয়াছে, উহার একটীর পুষ্পরেণু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। তিনি সেই বৃহৎ পুষ্পরেণুটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন উহার মধ্যে একটী অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে অত্যুজ্জ্বল বিচিত্র কিরণবিন্দু নির্গত হইতেছে। তিনি একটী সূচ্যগ্রভাগ ঐ ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে প্রবেশ করাইতেছিলেন, কিন্তু সূচ্যগ্রভাগের সামান্য আঘাত প্রাপ্তি মাত্রেই সহসা হস্তিদন্তের আবরণটী স্খলিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। আর মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড কিরণবৎ তীক্ষ্ণ অথচ স্নিগ্ধ রশ্মি প্রকাশ পাইল। ঐ উজ্জ্বল কিরণ প্রভাবে কক্ষস্থ দীপালোক নিষ্প্রভ হইল। যুবক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "এরূপ মূল্যবান্ অঙ্গুরীয়ক সাধারণ লোকের হইতে পারে না। এ বীর-বালক নিশ্চয় রাজাধিরাজ কামতারাজের বংশধর—পীতাম্বরের সহোদর। মুখাকৃতি ঠিক পীতাম্বরের ন্যায় দৃষ্ট হওয়ায় পরিচিত বোধ হইতেছিল। এ বালক এ পার্ব্বত্য প্রদেশে কখন কি হেতু আগমন করিল? এ বালক যদি পীতাম্বরের কনিষ্ঠ সহোদর হয়, তবে কি এ বালক পীতাম্বরের অপঘাত মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত নহে? ভ্রাতৃশোক হৃদয়ে থাকিতে মনে প্রফুল্লতা আনিতে পারে কি? মন প্রফুল্ল না হইলে কোন কাজেই স্পৃহা হয় না—শিকার করা তো দূরের কথা।" আবার ভাবিলেন, "নরশার্দ্দুল কথাটী যে বালক বলিয়াছে, উহা পাঠানদের লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছে; সেই নরশার্দ্দুল হননে অর্থাৎ পাঠান ধ্বংসে তাহার হৃদয়ে আনন্দ—মনে শান্তিলাভ হইবে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, উহার হৃদয়াভ্যন্তরে ঘোর প্রতিহিংসানল জ্বলিতেছে। তবে কি বালক রণবিদ্যা চর্চ্চার জন্যই শিকারে আগমন করিয়াছে? অসম্ভব নহে। এ প্রদেশে কেন আগমন? এখান হইতে কামতাপুর বহুদূর। নিকটে হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশ—গভীর অরণ্যশ্রেণী পড়িয়া রহিয়াছে। তবে কি সেনাপতি সুবাহু এখনও কামতাপুরে ফিরেন নাই? রণবিদ্যা শিক্ষা প্রদানের জন্য কনিষ্ঠ রাজকুমারকে নিজ বাড়ীতে আনয়ন করিয়াছেন? আহা, বালকের চরিত্র অতি উদার—একেবারে অপরিচিত জানিয়াও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নিঃসন্দেহে ঈদৃশ মূল্যবান অঙ্গুরীয়কটী অনায়াসে আমার হস্তে অর্পণ করিল? ইহার তুলনায় আমার প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক অতি তুচ্ছ। ইহার নির্ম্মাণ কৌশলও অদ্ভুত—অতি সুন্দর! ইহাতে বালকের পরিচয় রহিয়াছে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অঙ্গুরীয়কটী পুনরায় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বালকের পরিচয় লাভে বিফল মনোরথ হওয়ায় একটু চিন্তিত হইলেন। পরে গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ এবং গৃহের

আলোকটী নির্ব্বাণ করিয়া অঙ্গুরীয়কের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন উহার অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম উজ্জ্বল লোহিতাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "কামতা রাজনন্দিনী করুণা!"

সপ্তম অধ্যায়—বালিকা-পঞ্চক

সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। তপনদেব যেমন ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে আশ্রয়লাভ করিতেছিলেন—চন্দ্রমাও তেমনিই পূর্ব্বাকাশে হাস্যমুখে প্রকাশ পাইতেছিলেন। অশ্বারোহী বালকগণ যখন অরণ্য পার হইয়া একটী বিস্তৃত প্রান্তরে আসিয়া পৌছিল, তখন রাত্রি হইয়াছিল। পাঁচটী অশ্বারোহী ব্যতীত আর সকলে প্রান্তর পার হইয়া ইচ্ছামত স্থানে প্রস্থান করিল। যে পাঁচটি অশ্বারোহী ঐ প্রান্তরে রহিল, তাহারা আপন আপন অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করায় তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ পাইল। ইহারা কেহই বালক নহে—সকলেই কিশোরী, স্ফুটনোন্মুখ কুসুমের ন্যায় তাহারাও যৌবনোন্মুখী। তাহাদের ঈষৎ উন্নত পয়োধরযুগল লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত ছিল, এক্ষণে মুক্ত দেহে উহা আত্মপ্রকাশ করায় যৌবন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল। ইহাদের মস্তকের উষ্ণীষ অপসারিত হওয়ায় বেণীবদ্ধ নিবিড় কৃষ্ণকুন্তলরাজী ফণিণীর ন্যায় পৃষ্ঠদেশে লম্বিত হইয়া পড়িল। অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিয়া তাহারা পরিষ্কার শ্যামল তৃণ-শয্যায় উপবেশন করিল। অশ্বগুলিও সাময়িক স্বাধীনতা লাভে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ এবং কোমল তৃণগুলির সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করিল।

ঐ পঞ্চ বালিকার একটী আর একটী বালিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"করুণা, তোমার সঙ্কেতধ্বনির উদ্দেশ্য কিছুই তো বুঝিতে পারিলাম না।"

করুণা। ঐ অশ্বারোহী যুবকটী কে বলিতে পার?

১ম বালিকা। না, তবে ইহা বুঝিয়াছি, তিনি তোমার পূর্ব্বপরিচিত।

করুণা। (মৃদুহাস্যে) ছাই বুঝিয়াছ। ইহার সহিত আমার সাক্ষাৎ এবং আলাপ এই প্রথম।

১ম বালিকা। ইনি কে?

অপর আর একটী বালিকা ঈষৎ হাস্যে কহিল—"পার্ব্বতীর বুদ্ধিটা দেখ! অপরিচিতের সহিত অঙ্গুরীয় বিনিময় করিলেন, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ইনি কে?' ইনি কোন রাজপুত্র হইবেন—আমাদের সখীর বর।"

অমনি অপর দুইটী বালিকা সহাস্যে বলিয়া উঠিল—"তা বিজয়া আগে বলিস নে! বরটীকে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম—সখীর উপযুক্ত কিনা?"

বিজয়া। হুঁ, সখী কি আর পরীক্ষা না করিয়া অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়াছেন? সখি, ইনিই বোধহয় ত্রিপুর রাজকুমার রত্নবিজয়?

করুণা। হাঁ; কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই।

বিজয়া। তা, তিনি কিরূপে চিনিবেন? একে তো তোমাকে কখনও দেখেন নাই, তাতে আবার তোমার পুরুষবেশ। তুমি তাঁহাকে রাজকুমারের শিবিরে গুপ্তভাবে দেখিয়াছিলে, তাই চিনিতে পারিয়াছ। এবার তোমার অঙ্গুরীয় হইতেই তিনি তোমার পরিচয় পাইবেন।

পার্ব্বতী। হাঁ, ইহা ঠিক বটে, ঐ অঙ্গুরীয় হইতে যদি তিনি তোমার পরিচয় ঠিক করিতে পারেন, তবে বুঝিব লোকটী বুদ্ধিমান বটে; যেরূপ কৌশলে উহা নির্ম্মিত, বিনা সঙ্কেতে নিজ বুদ্ধিবলে উহার নির্ম্মাণকৌশল বুঝিতে পারা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বিজয়া। পার্ব্বতী একটা নিরেট বোকা; ঐ অঙ্গুরীয়টী প্রদান করাই হইয়াছে, রাজকুমারের বুদ্ধি পরীক্ষার নিমিত্ত। ব্রহ্মপুত্র তীরে তাহার ক্ষত্রিয় বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া সখী তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রশংসা সখীর মুখে ধরে না।

করুণা। পার্ব্বতী তো বোকা; আর সখি, তুমিই বা কোন্ চোখা? দাদা ইহার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাই সরলভাবে তোমাকে বলিয়াছি। আজিকার ঘটনাও তোমাকে সরলভাবে বলিব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তোমাদের ঐরূপ বিদ্রূপে আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না।

বিজয়া। আমি কি বিদ্রূপ করিলাম? তোমার পিতার অভাবে সমগ্র পূর্ব্বভারতের হিন্দুপ্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখিবার ভার তোমার উপর। শত হইলেও তুমি রমণী।

একজন পাঠানদ্বেষী বীরপুরুষ তোমার সহায় থাকিলে তোমার শক্তি দৃঢ় হইবে। আমার উক্তি অসঙ্গত অথবা অসত্য নহে! পিতামহ বাবার নিকট বলিয়াছেন, রাজকুমার নিজেই এ শুভ সংঘটনের প্রস্তাব ত্রিপুর রাজকুমারের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি ব্যতীত তোমার উপযুক্ত বর এ পূর্ব্বভারতে আর কে আছেন? ইহা তুমিও বেশ জান।

পার্ব্বতী। পার্ব্বতীটা তো নিরেট বোকা; সেই বোকা জিজ্ঞাসা করিতেছে—"যদি ত্রিপুর রাজকুমার উপস্থিত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন, তখন কি হইবে?"

বিজয়া। সখী চিরকুমারী থাকিবেন। আর আমরা নারীসেনা সহ শত্রুদলনে সখীর সাহায্য করিব।

করুণা বক্র কটাক্ষে বিজয়ার দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন—"সখি বিজয়া, তুমি বাস্তবিক আমার মন চিনিয়াছ।" পরে প্রকাশ্যে কহিলেন—"সখি, তোমার এ অঙ্গীকার বিস্মৃত হইও না।"

বিজয়া। সখি, তুমি ক্ষত্রিয়বালা, আমিও ক্ষত্রিয়কন্যা; প্রকৃত ক্ষত্রিয়সন্তান আপন অঙ্গীকার কখনও বিস্মৃত হয় না। জানিও সখি, তুমি আহ্বান কর আর না কর, যখনই তুমি সংহারমূর্ত্তিতে শত্রুদলনে অগ্রসর হইবে, তখনই উপযুক্ত নারীসেনা সহ তোমার পশ্চাতে বিজয়াকে দেখিতে পাইবে।

রোমাঞ্চিতকলেবরে পুলকিতচিত্তে সহসা করুণা উঠিয়া বিজয়াকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"সখি—সখি, তুমি প্রকৃতই আমার প্রাণের সখী। তোমার উৎসাহপূর্ণ বাক্যে আমার সাহস—আমার হৃদয়বল শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইল।"

অনন্তর তাঁহারা সকলে জাতীয়-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়—নীলাম্বর ও বিশ্বসিংহ

পীতাম্বরের অনুগ্রহে বিশ্বসিংহ নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। তাহা ছাড়া, তাঁহার চরিত্রগুণে তিনি নগরবাসী প্রায় সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি বণিকবৃত্তি গ্রহণ করিলে নগরের শ্রেষ্ঠীগণ তাঁহার কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার ব্যাবসায়ে বিশেষরূপ সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠীদের সহানুভূতি ও উৎসাহে তাঁহার সাহস বৃদ্ধি পাইল। তিনি পণ্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রথমতঃ "চাপাদৈ" গ্রামের কৃষকদিগের নিকট হইতে বাজার দর অপেক্ষা বেশী দরে পণ্য খরিদ করিয়া সামান্য লাভে উহা নগরের শ্রেষ্ঠীদিগের নিকট বিক্রয় করিলেন। ইহাতে পণ্য সংগ্রহের যেমন সুবিধা হইল, গ্রামবাসীদের সহিত তেমনি প্রীতি জন্মিল। ক্রমে তিনি চাপাদৈয়ের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী হইতেও এইরূপে পণ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাহারা বাঞ্ছিত অর্থ হইতে অধিক অর্থ পাইয়া সন্তুষ্ট এবং তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। তিনি অল্প লাভে পণ্য বিক্রয় করিতেন বটে, কিন্তু পণ্যের পরিমাণ প্রচুর হওয়ায় তাহার লাভের পরিমাণ অধিক হইতে লাগিল। ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে বেশ আর্থিক উন্নতি করিলেন এবং তাঁহার ব্যবসায়ও বেশ বিস্তৃতিলাভ করিল। ইহাতে বহু লোক তাঁহার বাধ্য হইল। স্থূলতঃ তিনি দুই বৎসরের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী লোক বলিয়া গণ্য হইলেন। পূর্ব্বে যেমন তাঁহার অদ্ভুত বীরত্বের যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার সমৃদ্ধির গৌরবও চারিদিকে প্রকাশ পাইল।

তাঁহার এই শ্রীবৃদ্ধির বার্ত্তা কামতারাজ নীলাম্বরও শ্রুত হইলেন। ইহাতে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট না হইয়া বরং কিছু চিন্তিত হইলেন। অনন্তর একদিন বিশ্বসিংহকে ডাকাইয়া আনাইলেন।

যে গৃহে নীলাম্বর বিশ্বসিংহকে ডাকাইয়া আনাইলেন, উহা তাঁহার গুপ্ত-মন্ত্রণাগৃহ। এই গৃহটী বিশ্বসিংহের বিশেষরূপে পরিচিত ছিল। পীতাম্বরের জীবিতাবস্থায় তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সামরিক আলোচনা করিতে অনেকবার এ গৃহে আসিতেন। গৃহখানি বেশ বিস্তৃত, মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক শোভায় শোভিত। হর্ম্ম্যতল শ্বেত-কৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে মণ্ডিত। তাহাতে আবার নানাবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্য! দেয়ালে মনোহর নানাবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট অতি সুন্দর দৃশ্য! কোথায়ও মনোহর পুষ্পোদ্যান, তাহাতে নানাজাতীয় পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত

হইয়া রহিয়াছে—ভ্রমর আছে—কেবল পুষ্পে গন্ধ নাই! আবার কোথায়ও স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ নয়ন-মনোমুগ্ধকর জলাশয়—তাহাতে পরিষ্কার নীলাকাশের ছায়া পতিত হওয়ায় যেন নীলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে! ঐ জলাশয়ের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ—দ্বীপের চারিদিকে জলচর বিহগকুল ভাসমান হইয়া ক্রীড়া করিতেছে! ঐ জলাশয়ের স্থানে স্থানে তরণী—কোথায়ও তীরসংলগ্ন, আবার কোথায়ও গমনশীল। কোন কোন তরণী আরোহণে ধীবরগণ মৎস্য অনুসন্ধান করিতেছে। দূরে মীনকুল সাঁতার কাটিয়া ফিরিতেছে। কোন দেওয়ালে নয়নতৃপ্তিকর ফলবান বৃক্ষের উদ্যান। সে উদ্যানে আম, জাম, লিচু, দাড়িম্ব, কমলা প্রভৃতি সুস্বাদু রাশি রাশি ফলসমূহ গুচ্ছে গুচ্ছে বৃক্ষশাখা অবনত করিয়া রাখিয়াছে। কাক, শালিক প্রভৃতি বিহগগণ সুপক্ক ফলাহারের চেষ্টা করিতেছে। কোন দেওয়ালে নিবিড় অরণ্যশ্রেণী—ঐ অরণ্যের কোনস্থানে লুক্কায়িত মৃগ, কোন স্থানে নিদ্রিত শার্দ্দূল, কোনস্থানে মহুল-ভক্ষণ-রত তীক্ষ্ননখ ভল্লুক, কোন কোন দোলায়মান বৃক্ষ-শাখায় কপিকুল, আবার কোনস্থানে স্বয়ং মৃগেন্দ্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। ঐ দেওয়ালের অন্য অংশে বিস্তৃত গোচরভূমি, তাহাতে গো-মহিষ, মেষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণ নব নব কোমল তৃণ ভক্ষণে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে। দূরে দেবমন্দির—মন্দিরের চারিদিকে বট-অশ্বত্থ প্রভৃতি মহামহীরুহ অসংখ্য শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কোন বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন যোগী যোগাসনে উপবিষ্ট; সম্মুখে হোমকুণ্ড—কুণ্ডে অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

গৃহখানি এইরূপ বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত। চিত্রগুলি সকলই মর্ম্মরপ্রস্তরের উপর খোদিত। যিনি এই গৃহে প্রবেশ করেন, তিনি এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য কিয়ৎক্ষণ না দেখিয়া পারেন না। বিশ্বসিংহ এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত ইহাতে আকৃষ্ট হয় নাই, বরং তাঁহার হৃদয় মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত; নেত্রযুগল অশ্রু-ভারাক্রান্ত, রাজকুমার পীতাম্বরের বিয়োগজনিত শোকই তাঁহার এই মর্ম্মপীড়ার কারণ।

নীলাম্বর বিশ্বসিংহকে সাদরে আহ্বান করিয়া সস্নেহে কহিলেন "বৎস বিশু, রাজবিচারে বিরক্ত ব্যথিত হইলেও মনে অশান্তি আনিতে নাই। রাজা ও পিতা একই। ইঁহাদের প্রতি অচলা ভক্তি রাখিতে হয়। তোমার শ্রীবৃদ্ধিতে আনন্দিত হইয়াছি, কিন্তু ইহা যদি আপনার জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া করিতে পারিতে, তবে বড়ই সুখের হইত।"

বিশ্বসিংহ যুক্তকরে বিনম্র বচনে কহিলেন—"সন্তানের ধৃষ্টতা গ্রহণ না করিলে দুই একটী কথা নিবেদন করিতে পারি।"

নীলাম্বর সস্নেহে কহিলেন—"তোমার সহিত আলাপ করিয়া, তোমাকে দুই চারিটী সদুপদেশ প্রদান করিব, এই ইচ্ছায়ই তোমাকে ডাকাইয়াছি, তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার বক্তব্য ব্যক্ত করিতে পার।"

বিশ্বসিংহ। মহারাজ, এ অধম কৃষককুলে জন্মধারণ করিয়াছে, কৃষি-বাণিজ্যই আমাদের জাতীয় ব্যবসায় এবং তাহাই আমি অবলম্বন করিয়াছি।

নীলাম্বর। কৃষি-বাণিজ্য বৈশ্যবৃত্তি। তুমি বৈশ্য নও, তুমি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব। তোমার ঊর্দ্ধতন কতিপয় পুরুষ আপন জাতীয়-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিম্নস্তরে অবতরণ এবং বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমাতে ক্ষত্রিয়-তেজঃ রহিয়াছে—তাহাই তোমার অনুশীলন করা উচিত। তোমার উন্নতি তাহা হইতেই হইবে। কৃষি-বাণিজ্য ক্ষত্রিয়ের জাতীয়-বৃত্তি নহে।

বিশ্বসিংহ। আমাতে ক্ষত্রিয়-তেজঃ থাকিলে কি হইবে? ক্ষত্রিয়সমাজ আমাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিবে না—করিতে পারে না। আমরা সংস্কারবিহীন হওয়ায় পতিত হইয়াছি।

নীলাম্বর। সে বিচারে তোমার নিষ্প্রয়োজন। তুমি আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাও। যদি পার জাতীয় সৈন্যদল গঠন করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর্য্যের পরিচয় দাও। ক্ষত্রিয়সমাজ তোমাদিগকে গ্রহণ না করিলে, তুমি ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় নামে নূতন স্বতন্ত্র ক্ষত্রিয়সমাজ গঠন করিয়া লইতে পারিবে।

বিশ্বসিংহ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন—"আপনার উপদেশমত কার্য্য করিতে হইলেও, আমার

পূর্ব্বতন জাতীয় ব্যবসায় বৈশ্যবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ না উপায় নাই।

নীলাম্বর। কেন?

বিশ্বসিংহ। জাতীয় সৈন্যদল গঠন করিতে হইলে, অগ্রে প্রভূত অর্থসঞ্চয় আবশ্যক।

নীলাম্বর। কি উদ্দেশ্যে তোমাকে জাতীয়দল গঠনে উপদেশ দিতেছি, বুঝিয়াছ কি?

বিশ্ব। বোধ হয় বুঝিয়াছি—দেশমাতৃকার সেবার জন্য, হিন্দুদ্বেষী পাঠানগণের হাত হইতে সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য।

নীলাম্বর। তোমার অর্থের অভাব কি? রাজকোষে অর্থ রহিয়াছে, প্রয়োজন মত গ্রহণ করিতে পারিবে।

বিশ্ব। রাজকোষের অর্থ রাজার, আমি দরিদ্র কৃষক সন্তান, তাহাতে আমার অধিকার কি?

নীলাম্বর। ইহা তোমার ভ্রান্ত ধারণা। রাজকোষের অর্থ রাজার নহে—উহা প্রজার অর্থ—জনসাধারণের অর্থ, রাজা প্রহরী মাত্র।

বিশ্বসিংহ। মহারাজ, আপনার কথায় প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কেবল আপন ভ্রান্তি অথবা সংশয় নিরাকরণের জন্যই প্রত্যুত্তরে দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে—প্রজা বা জনসাধারণের অর্থেই বা আমার দাবী কি?

নীলাম্বর। কেন? জনসাধারণের অর্থ জনসাধারণের হিতার্থে যে কেহ গ্রহণ করিয়া ব্যয় করিতে পারে।

বিশ্ব। যিনি জনসাধারণের হিতার্থে উহা সংগ্রহ করিয়াছেন, কি করিবেন, তিনিই উহা ব্যয় করিবার অধিকারী। সংগ্রহকারকের অনুগ্রহে অপরে উহা গ্রহণ করিয়া ব্যয় করিতে পারে। বিশ্বসিংহ সেরূপ অনুগ্রহ প্রার্থী নয়।

নীলাম্বর বিশ্বসিংহের সত্য, সরল ও তেজঃপূর্ণ বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস, তোমার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় আমি ঠিক বুঝিলাম না। তুমি কি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে—রাজসরকারের সংশ্রব ব্যতিরেকে দেশমাতৃকার সেবা করিতে চাহ?

বিশ্বসিংহ। (নীরব)

নীলাম্বর। বৎস, পুত্র কি পিতার কার্য্যে বিরক্ত হইয়া পিতাকে ত্যাগ করিতে পারে?

বিশ্ব। বিশ্বসিংহ বোধ হয় ততদূর অকৃতজ্ঞ নহে। তবে সাময়িক মনোব্যথায়—হৃদয়ের উত্তেজনাবশে সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে তাহার ইচ্ছা নাই।

নীলাম্বর। সে প্রতিজ্ঞা কি? বোধ হয় প্রকাশ করিতে পার।

বিশ্ব। সন্তান পিতার নিকট কিছুই গোপন করিতে চাহে না। তবে উহা প্রকাশের আবশ্যকতাও কিছু ছিল না। অধম সন্তানের প্রতিজ্ঞা এই "যতদিন রাজদ্রোহী—দেশদ্রোহী, কলুষিতচরিত্র ও প্রতারক যদুনন্দন উন্নতশিরে কামতারাজ্যে অবস্থান করিবে, ততদিন বিশ্বসিংহ কামতা রাজসরকারের অধীনে থাকিয়া অস্ত্রধারণ করিবে না, তাঁহার কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করিবে না। রাজন্, জীব মাত্রেরই জন্মগত একটা স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই। রাজা রাজশক্তি প্রয়োগে জীবের দেহের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার তাঁহার নাই। আমি আমার জন্মগত সেই স্বাধীনতার প্রভাবে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা ন্যায় কি অন্যায় করিয়াছি জানিনা, আর জানিতেও চাহি না।

নীলাম্বর স্নিগ্ধ কটাক্ষে বিশ্বসিংহের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন—"বৎস, যখন ঔষধি গলাধঃকরণ করিয়াছ, তখন আর চিন্তা করিও না, বিধাতা তোমার সহায় হউন।"

বিশ্বসিংহ নীলাম্বরকে চিন্তান্বিত দেখিয়া করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, দুঃখিত হইবেন না; অজ্ঞান সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনার স্নেহ ভুলিবার নহে, আপনাদের ঋণ জীবনে শোধ করিতে পারিব না।"

নীলাম্বর নীরব, স্থির দৃষ্টিতে বিশ্বসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বসিংহ সে সুকরুণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মনে ভাবিলেন—"হায়, যিনি একমাত্র বংশধর পুত্রশোকেও প্রশান্ত ছিলেন, যাঁহার চক্ষে বিন্দুমাত্র অশ্রু দৃষ্ট হয় নাই—তাঁহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ!" বুঝিলেন, জন্মভূমি দেশমাতৃকার চিন্তাতেই তাঁহার চিন্ত

দ্রব হইয়াছে। বিশ্বসিংহ অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

সেই অস্ফুটস্বর নীলাম্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি দুই বাহু বিস্তার করিয়া বিশ্বসিংহকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন—"বল বৎস, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

তখন নীলাম্বর ও বিশ্বসিংহ সম্মিলিতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

নবম অধ্যায়—বিশ্বসিংহ ও সুমেরুসিংহ

বিশ্বসিংহ অনেক কালের পর জন্মভূমি মায়াপুরে আসিয়াছেন। মায়াপুরে তাঁহার বাল্যবন্ধুগণ ও স্বজাতি জ্ঞাতিবর্গ ব্যতীত নিজস্ব কিছু ছিল না। যে একখানি জীর্ণ কুটীর ছিল—যাহাতে তিনি মাতার সহিত বাস করিতেন, কালবশে তাহার চিহ্নও লুপ্ত হইয়াছে। যে জমির উপর ঐ কুটীরখানি ছিল, তাহা ব্রহ্মপুত্রের অনন্ত বালুকারাশির সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে।

রাঘবসিংহ মায়াপুরের প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার ৪।৫ শত বিঘা চাষি জমি ও হাল গরু, গাই বিস্তর। অল্পদিন হইল তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিশ্বসিংহের বাল্যসুহৃদ সুমেরুসিংহ এ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। বিশ্বসিংহ তাঁহার বাড়ীতেই আজ অতিথি।

মায়াপুর গ্রামখানি কৃষকপ্রধান। অন্যূন তিনশত গৃহস্থ একই জাতীয়; তাহারা জাতি হিসাবে "কোচ" বলিয়া খ্যাত। এই গ্রামে অপর জাতীয় গৃহস্থও আছে, তাহাদের সংখ্যা কম। ৫।৭ ঘর ব্রাহ্মণ—তাঁহারা ঐ কোচদিগেরই পুরোহিত। ৪।৫ ঘর নাপিত, ৭।৮ ঘর ধোপা ও এক ঘর মালাকারও আছে। রাঘবসিংহের বাড়ীতে স্থাপিত নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা গুরু রাঘবসিংহেরই পুরোহিতবংশীয় গোলকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেমন আনুষ্ঠানিক ও নিষ্ঠাবান, তেমনি ধর্ম্মভীরু ও সরল প্রকৃতির লোক। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করে। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ২।৩ ঘণ্টাকাল, গ্রামের বালকগণকে পৌরাণিক ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাহাদিগের মন প্রফুল্ল রাখেন ও তৎসঙ্গে মোটামুটি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষণোপযোগী হিসাব-পত্র শিক্ষা দেন। তাঁহার সরল ধর্ম্মকথা শুনিয়া বালকগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের বিকাশ হয়। এই হেতু গ্রামবাসিগণ প্রায় সকলেই নীতিপরায়ণ, সরল এবং উদার প্রকৃতি।

বিশ্বসিংহের রাজানুগ্রহলাভ ও সৌভাগ্যের সংবাদ তাহারা কিছু কিছু অবগত ছিল। বিশ্বসিংহের এই অসম্ভাব্য শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতিতে তাহারা আনন্দিত এবং আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিত। তাহাদের জাতীয় গৌরব বিশ্বসিংহের সাক্ষাৎ প্রাপ্তিতে গ্রামবাসীগণ যারপর নাই আনন্দিত হইল। তাঁহার দর্শনকামনায় গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে আসিয়া প্রত্যহ সুমেরুসিংহের গৃহ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিতে লাগিল। বিশ্বসিংহ নিজেও গ্রামবাসীদের সহিত সাক্ষাৎকামনায় আজ এ পল্লীতে, কাল সে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি একমাসকাল মায়াপুরে কর্ত্তন করিলেন। এই সময় অবকাশ মত তিনি প্রিয় বন্ধু সুমেরুসিংহের সহিত ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি অনেক বিষয় আলাপ ও আলোচনা করিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে সুমেরুসিংহ, বিশ্বসিংহকে কহিলেন, "ভাই বিশু, তুমি যে জাতি-তত্ত্ব বিষয়ে মহাপুরুষ কালিকানন্দ গিরির উক্তি বর্ণন করিলে, উহা শ্রবণ করিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। আমরা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ইহা আমাদের প্রাচীনেরাও বলিয়া থাকেন, পুরোহিত গোলকনাথ ঠাকুরও তাহাই বলেন, মহাপুরুষ কালিকানন্দও সে কথা বলেন, আর কামতা-রাজ নিজে ক্ষত্রিয় হইয়া ইহা স্বীকার করেন। তবে আমরা হিন্দুসমাজে এত হতাদৃত হইলাম কেমন করিয়া?"

বিশ্বসিংহ কহিলেন, "সম্ভবতঃ কোন সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আপন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন হীনবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ হীনবৃত্তি অবলম্বনের ফলে সংস্কারবিহীন হওয়ায় ক্ষত্রিয় পর্য্যায় হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছিলেন। জগতের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যখন উত্থান পতন অনিবার্য্য, তখন আমরা পতিত হইলেও উত্থিত হইতে পারিব না কেন? আমার গুরুদেব একজন মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ, তিনি ব্রাহ্মণকুলের

গৌরব, তিনি আমাকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুশীলন ও তৎপ্রতিপালনে উপদেশ করিয়াছিলেন। আর পূর্ব্ব ভারতের একমাত্র গৌরব—ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি মহারাজাধিরাজ কামতারাজ নীলাম্বর স্বয়ং আমার ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনে আমাকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে নীরব থাকিতে পারি? জাতীয় গৌরব কে না চাহে? প্রণষ্ট জাতীয় গৌরব উদ্ধারে কি তোমাদের ইচ্ছা হয় না? আমি আজ আমার জন্মভূমি মায়াপুরের সমগ্র স্বজাতিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি—এস ভ্রাতৃগণ, জাগ, জাগাও, তোমরা সকলে মিলিয়া আমাদের প্রণষ্ট জাতীয় গৌরব উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হও। নবভাবে জাতীয়রূপ গঠন করিয়া ক্ষত্রিয় বীর্য্য প্রকাশ কর।" এই বলিয়া বিশ্বসিংহ নীরব হইলেন।

সুমেরুসিংহ বিশ্বসিংহের স্বজাতি-প্রীতি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন "ভাই বিশু, তুমি মহাপুরুষের উপদেশ ও রাজানুগ্রহে যে আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছ, কিন্তু এই অশিক্ষিত তিমিরান্ধ ভ্রাতৃগণকে কে আলোক প্রদান করিবে?"

বিশ্বসিংহ স্পর্দ্ধার সহিত কহিলেন, "বিশ্বসিংহ বিশ্বমাতার অনুগ্রহে সে আলোক প্রদানের সাহায্য করিতেই তাহার জন্মভূমি—মাতৃভূমি মায়াপুরে আসিয়াছে। মায়াপুর সুমেরু সিংহের প্রভুত্বাধীন; বিশ্বসিংহের আর কিছু বলিবার নাই।"

(ক্রমশঃ)

চিত্ত আমার জাগ্‌লো

শ্রীঅনিল চক্রবর্ত্তী, পুরাণরত্ন

চিত্ত আমার জাগ্‌লো আজি
টুট্‌লো ঘুমের ঘোর।
জ্ঞানের রবি উঠ্‌লো জ্বলে
রাত্রি হ'লো ভোর!

বাজিয়ে তোমার সোণার বাঁশী
ছড়িয়ে তোমার মোহন হাসি,
উদয় হ'লে আজ এ প্রাতে
চিত্তাকাশে মোর।

ঘুম ভাঙালে আদর ক'রে
স্নেহের পরশ দিয়ে।
গেল আমার স্বপন টুটে
দরশ-সুধা পিয়ে!

বন-বীথিকায় দুলে দুলে
লাগ্‌লো পরশ ফুলে ফুলে;
আমার হিয়া বিমল হ'লো
—ঘুচলো মোহ ঘোর।

মাঝি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

কেন অন্তর শঙ্কিত এত
সাগর সফেন-উর্ম্মি হেরি'?
তরী-মাঝে হৃদি কম্পিত, শুনি'
জল-কল্লোলে ভীষণ ভেরী।
তরণী-গরাসী তরঙ্গ-রাশি,
আসে ছুটে কূলে হাসি-উচ্ছ্বাসি'
বুঝি মোর ছোট অন্তর-তরী
ডুবাতে তাহার হবে না দেরী!

যা হয় তা হ'ক, বাহিয়া তরণী
ঊর্দ্ধে রাখিয়া দৃষ্টিখানি—
ভেসে চল মন দাঁড়ের আঘাত
বিপদ ঢেউয়ের বক্ষে হানি'।
আছে ভগবান, করুণা-নিদান,
রক্ষি' বিপদে দিবেন বিধান,
অনুকূল বায়ু বহায়ে, তরণী
কোল-কূল পানে নিবেন টানি'

'জ্ঞান-বিজ্ঞান'

বিজ্ঞান ও বাস্তব

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় এম-এ

বিজ্ঞান বলিতে অনেকেই মনে করেন, উহা শুধু ব্যবহারিক জ্ঞান। সত্য বটে, বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ তাহার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের সম্ভার অভূতপূর্ব্বরূপে বাড়াইয়া তুলিয়াছে,—ষ্টীম, এঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কারপূর্ব্বক রেল, ষ্টীমার ও উড়োজাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার বার্ত্তা ও রেডিওর ব্যবস্থা করিয়া দেশ ও কালের ব্যবধানকে সে খর্ব্ব করিয়াছে,—প্রকৃতির উদ্দাম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সে আপনার বিবিধ প্রয়োজনে ও ভোগ ব্যবস্থায় নিয়োজিত করিয়াছে। বিজ্ঞানের এই অদ্ভুত কীর্ত্তি মানব সভ্যতার ইতিহাসে অতুলনীয়, কিন্তু বিজ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্য এখানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে নাই। বিজ্ঞানের আর একটি দিক আছে—ইহার লক্ষ্য আরও ঊর্দ্ধদিকে, ইহা তাহার দার্শনিক দিক, আমাদের চারিদিকে যে বিশাল দৃশ্যমান জগৎ রহিয়াছে, যাহাতে দেশ ও কালের বিস্তীর্ণক্ষেত্রে জড়ের ও শক্তির বিবিধ ক্রিয়া আমরা অহঃরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি, উহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহার নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য; অর্থাৎ বহির্জ্জগতের যে-রূপ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সাহায্যে আমাদের নিকট ধরা পড়ে, উহাই কি তাহার বাস্তব সত্ত্বা—ইহার মীমাংসায় বিজ্ঞান নিমগ্ন। আজ আমরা বিজ্ঞানের এই দার্শনিক দিক সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিব।

মানব সভ্যতার প্রথম যুগ হইতেই বহির্জ্জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে মনীষিগণ নানাবিধ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে জড়বাদ, মায়াবাদ ইত্যাদি তত্ত্বের প্রচার অতি প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাংখ্য, বেদান্ত ইত্যাদি হিন্দু দার্শনিক গ্রন্থ এবং গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর গ্রন্থাদির উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এই সময়ে বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণপূর্ব্বক সত্যের সন্ধান করিবার উপায় অবিদিত ছিল।

বহির্জ্জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজ বুদ্ধিতেই মনে হয়, ইহাতে দুই প্রকারের বিভিন্ন সত্ত্বা রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই একটি ওজনশীল সত্ত্বা—যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলিয়া থাকি,—যেমন মাটি, পাথর, জল, বায়ু ইত্যাদি; দ্বিতীয়তঃ এক ওজনহীন শক্তি—যেমন তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ। এক টুকরা জড় পদার্থ লইয়া যে কোনরূপ পরীক্ষা করা হোক না কেন, যে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করা যাক্ না কেন, সকল অবস্থাতেই দেখা যাইবে যে তাহার স্বকীয় ওজনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এক টুকরা গন্ধককে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেও ঐ সব খণ্ডের সমবেত ওজন অখণ্ড গন্ধক-টুকরার সমান হইবে। পুনরায় ঐ গন্ধক-টুকরাকে তাপে গলাইয়া ওজন করিলেও উহার প্রথম ওজনের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এমন কি পরিমিত লৌহচূর্ণের সহিত উহাকে মিশাইয়া তাপ দিলে যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিবে এবং তাহার ফলে যে নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইবে, তাহাতেও পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে গন্ধকের প্রথম ওজনের কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে জড় পদার্থের বিনাশ নাই; তাহার রূপান্তর বা অবস্থান্তর ঘটিতে পারে মাত্র। বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক লেভইসিয়ার ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে ইহা হইতেই বিজ্ঞানের প্রথম তত্ত্ব—**জড়ের রক্ষণশীলতা** (Law of Conservation of Matter) প্রতিষ্ঠিত করেন।

বহির্জ্জগতের দ্বিতীয় সত্ত্বা—শক্তিরও রূপান্তর ঘটিতে দেখা যায়,—যেমন কয়লা পোড়াইয়া যে তাপ হয় তাহা দ্বারা জলকে বাষ্পীভূত করিয়া এঞ্জিন চালান যাইতে পারে,—অর্থাৎ তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করা যায়। কিম্বা ঐ এঞ্জিনের সাহায্যে ডাইনামো চালাইয়া ঐ তাপ-শক্তিকে পরিশেষে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা

কঠিন নহে। পুনরায় ঐ বৈদ্যুতিক শক্তিকে যে তাপ, আলোক বা যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়—তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখেই বর্ত্তমান। শক্তির পরিমাপের বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। এই পরিমাপের ফলে প্রমাণ হইয়াছে যে, জড় পদার্থের মত শক্তিরও বিনাশ নাই,—ইহার রূপান্তর ঘটিতে পারে মাত্র। ইহা হইতেই বিজ্ঞানের দ্বিতীয় তত্ত্ব—শক্তির রক্ষণশীলতা (Law of Conservation of Energy) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুইটি তত্ত্বকেই ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞানের বিচিত্র সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই দুইটি সত্তার স্বরূপ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহাই ছিল প্রথমযুগের ও উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত। অবিচ্ছিন্নতা (discontinuity), জাড্য (inertia) ও ভর বা ওজন (mass), জড়ের স্বকীয় ধর্ম্ম। নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) এবং ওজন বা ভরের অভাব (imponderable) শক্তির স্বকীয় ধর্ম্ম। জড়ের সাহায্য ভিন্ন শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধরা যায় নাই। সুতরাং জড়ই ছিল শক্তির আধার। আবার অন্যদিকে শক্তিবিযুক্ত জড়ের কল্পনাও ছিল অসম্ভব; কারণ জড়ের প্রধান ধর্ম্ম, ওজন—একটি শক্তিবিশেষ,—ইহা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিণাম। কোন জিনিষ উত্তপ্ত হইলেই আমাদের তাপের অনুভূতি হয়; অথবা কোন জিনিষ দীপ্তিমান্ হইলেই তবে আমরা আলোক পাই। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির অবিনশ্বর সত্তা—জড় ও শক্তি পরস্পরের চিরন্তন সাহচর্য্যে এই দৃশ্যমান বিশ্বজগতের উৎপত্তি করিয়াছে। এই নিবিড় সাহচর্য্য সত্ত্বেও তাহাদের পরস্পর রূপান্তর কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। অর্থাৎ জড়কে শক্তিতে অথবা শক্তিকে জড়ে পরিণত করা তখন অসম্ভব বলিয়া ধারণা ছিল।

বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিকের এই তত্ত্বকে একপ্রকার দ্বৈতবাদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ শতকের শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হইল, যাহাতে পূর্ব্বপ্রচলিত বৈজ্ঞানিক ধারা ও মতবাদসমূহ একেবারে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে; অনেকের মতে ইহা একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগ।

উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ৯২ প্রকার বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অণুপরমাণুর সংযোগে যাবতীয় জড় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ৯২ প্রকার অণুপরমাণুর মধ্যে পরস্পরের কোন সাদৃশ্য নাই। ইহাদের পরস্পর পরিণতি অসম্ভব বলিয়া ধারণা ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিলেন যে, যাবতীয় জড় পদার্থের অন্তিম উপাদান মাত্র দুইটি বিভিন্নধর্ম্মী তাড়িতকণা—ইলেক্ট্রন ও প্রোটন। ইহাদেরই সংখ্যাগত ও শৃঙ্খলাগত সমন্বয়ে ৯২ প্রকার বিভিন্ন মৌলিক অণুর সৃষ্টি হইয়াছে,—এবং এই সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরস্পর পরিণতি সাধন অসম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি বিবিধ উপায়ে এইরূপ পরিণতি-সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পারদ বা সীসাকে সোণায় পরিণত করা এখন আর আজগুবি কল্পনা বলা যাইতে পারে না। এই ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের আবার ওজন আছে। পরীক্ষার ফলে ও হিসাবে দেখা যায় একটি ইলেক্ট্রনের ওজন—প্রায় 10^{-27} gm. এবং ইহার ব্যাস—$3{\cdot}8\times10^{-13}$ c.m. অর্থাৎ একটি বালুকণাকে যদি কোন উপায়ে বাড়াইয়া পৃথিবীর আকারে পরিণত করা যায়, তবে ঐ বালুকণার মধ্যে যে সব ইলেক্ট্রন রহিয়াছে, তাহাদের এক একটির আকার হইবে এক একটি মটর দানার মত। এখানে আমরা প্রথম দেখিতে পাই যে, জড়ের ও শক্তির পার্থক্য সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কারণ, বিদ্যুৎ একটি শক্তিবিশেষ—এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞানুসারে শক্তি মাত্রই ওজনহীন ও নিরবচ্ছিন্ন, জড় পদার্থের আশ্রয়ে তাহার প্রকাশ এবং ওজনহীন সর্ব্বব্যাপী ইথার বা ব্যোমের স্কন্ধে চাপিয়া তরঙ্গাকারে তাহার গতি। কিন্তু এখন প্রমাণ হইল যে, এই বিদ্যুৎরূপ শক্তি জড় পদার্থের মত ওজনশীল অণুপরমাণুর সমষ্টি। এই সব বিদ্যুৎকণিকা অবস্থাবিশেষে জড়ের বিশিষ্ট ধর্ম্ম—জাড্য, ওজনশীলতা ও মন্থরগতি এবং অবস্থাবিশেষে শক্তির বিশিষ্ট ধর্ম্ম—তরঙ্গাকারে অপরিমিত বেগশীলতা গ্রহণ করিতে পারে।

শুধু ইহাই নহে, পরীক্ষায় আরও প্রমাণ হইয়াছে যে, আলোক বা তাপশক্তি, যাহা শুধু তরঙ্গময় বলিয়া ধারণা ছিল, অবস্থাবিশেষে আলোককণার ফোয়ারা বা "ফোটন" ধারারূপে দীপ্তিমান্ পদার্থ হইতে বিকীর্ণ হইতে পারে। অর্থাৎ আলোকশক্তিও সময়ে সময়ে জড়ের বিশিষ্ট ধর্ম্ম, নিরেট ওজনশীল কণিকার প্রকৃতি ধারণ করিতে পারে। বিংশ শতাব্দীর এই সব আবিষ্কারের ফলে জড় ও শক্তির পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে। বিশ্বজগতের ধারণা সম্বন্ধে উনবিংশ শতকের দ্বৈতবাদ বর্ত্তমানে অদ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান মতে আমাদের এই বিশ্বজগৎ শুধু তরঙ্গময়। ইহাতে তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নাই, এই তরঙ্গ আবার শক্তির—আলোক তরঙ্গ। যেখানে এই আলোক-তরঙ্গের বেগ হ্রাস হইয়া ঘূর্ণির আকার ধারণ করিয়াছে, সেখানেই জড়ের সৃষ্টি বা জড় ধর্ম্মের বিকাশ ঘটিয়াছে। আবার যখন কোন কারণে এই সব ঘূর্ণি খুলিয়া যায়, তখন উহার জড়-ধর্ম্মেরও বিলোপ ঘটে এবং বিমুক্ত শক্তিতরঙ্গ আলোকরশ্মিরূপে দ্রুতবেগে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে ঘনীভূত ও মুক্ত আলোকতরঙ্গের দ্বারা আমরা বেষ্টিত হইয়া আছি। উনবিংশ শতকের দুইটি প্রধান বৈজ্ঞানিক সূত্র—জড়ের রক্ষণশীলতা ও শক্তির রক্ষণশীলতা বর্ত্তমানে একই সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ইহাকে জড় ও শক্তির রক্ষণশীলতা বলা হয়।

বাহ্য জগতে যে সব প্রাকৃতিক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকের ধারণার এক আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিকের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, বিশ্বজগৎ একটি অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খলের অধীন, প্রকৃতির রাজ্যে কোন খেয়াল চলে না। ইহার আইনকানুন বড়ই কঠোর। যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনা এই শাশ্বত নিয়মের শাসনেই সম্পাদিত হইতেছে। কখনও কোন কারণে এই আইন-লঙ্ঘন প্রকৃতির রাজ্যে দৃষ্ট হয় নাই। এই আইনের ধারা বা শৃঙ্খলার স্বরূপ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ-বাদ বা নির্দ্দিষ্ট-বাদের (Law of Causality) সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ প্রাকৃতিক ঘটনাপরম্পরা একটি কার্য্যকারণসূত্রে পরস্পর গ্রথিত বলিয়াই এই শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে, একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। একটি বাটিতে দুধ জ্বাল দেওয়া হইতেছে; উহা হইতে বাষ্প উঠিতেছে; এই ঘটনাটি যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন অনায়াসে বলিতে পারি যে—বাটি হইতে বাষ্প উঠিবার কারণ, উহাতে দুধ গরম হইতেছে বলিয়া; দুধ গরম হইবার কারণ বাটির নীচে কেহ কয়লা জ্বালাইয়াছিল বলিয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পৌষ ও মাঘ মাসে আমাদের বেশ শীত বোধ হয়—তাহার কারণ, সূর্য্যের কিরণ তখন তীক্ষ্ণ নয় ও সূর্য্য অধিকক্ষণ আকাশে থাকে না (অর্থাৎ দিন ছোট)—ঐ সময়ে সূর্য্যের কিরণ তীক্ষ্ণ না হইবার বা দিন ছোট হইবার কারণ সূর্য্যের ও পৃথিবীর তৎকালীন পরস্পরসংস্থান। আবার এইরূপ সংস্থানের কারণ সূর্য্যকে ঘিরিয়া পৃথিবীর বার্ষিক গতি। পৃথিবীর এই বার্ষিক গতির কারণ তাহার কেন্দ্রাতিগ গতি ও পৃথিবীর উপর সূর্য্যের আকর্ষণ ইত্যাদি। এইরূপে আমরা সৃষ্টির গোড়ার অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইতে পারি, অর্থাৎ যে সব ঘটনা আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ বা অনুভব করিতেছি, তাহারা সব কারণ-পরম্পরার ভিতর দিয়া সৃষ্টির প্রথম অবস্থাকালেই নির্দ্ধারিত হইয়া আছে, এইরূপে বর্ত্তমানের ঘটনাবলী অতীতের ঘটনাবলী হইতে সম্ভূত হইয়াছে ও ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহার কারণ বীজের সৃষ্টি করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে, জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এক সূত্রে গাঁথা ও সৃষ্টির আদিকাল হইতে নির্দ্ধারিত হইয়া আছে, এই নির্দ্ধারিত পথ ভিন্ন অন্য কোন পথে চলিবার প্রকৃতি-দেবীর উপায় নাই। ইহাকে একপ্রকার বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ বলা যাইতে পারে। নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিলে আমাদের মন প্রফুল্ল হয়, অমাবস্যার অন্ধকারে আবার মলিন হয়—কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নিকট এই অমাবস্যা ও পূর্ণিমা কার্য্যকারণ সূত্রে গাঁথা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এই অমাবস্যা ও পূর্ণিমার কারণ পৃথিবীকে ঘিরিয়া চন্দ্রের গতি। এই গতি চন্দ্রের জন্মকালেই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে চন্দ্র যে কক্ষে ঘুরিতেছে, উহা হইতে তাহার নিস্তার নাই।

"অস্তিত্বের চক্রতলে, একবার বাঁধা প'লে,
নাহিক নিস্তার।"

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পরীক্ষার ফলে এই আপাত-অলঙ্ঘ্যনীয় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যে অনেক স্থলে খাটে না, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এখানে দু'একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

উনবিংশ শতকের শেষভাগে রেডিয়ম ধাতুর আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগতের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই রেডিয়ম ধাতু বা তদ্ঘটিত পদার্থ হইতে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মিরূপে বিদ্যুতসমন্বিত পদার্থের কণা, ইলেক্‌ট্রন ও হ্রস্ব শক্তিতরঙ্গ অনবরত বিকীর্ণ হইতেছে। ইহাতে রেডিয়ম পরমাণুর সহসা কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। অর্থাৎ তাহার ওজন ও শক্তির পরিমাণের বাহ্যিক কোন হ্রাস ঘটিতে দেখা যায় না। ইহাতে সহজেই প্রশ্ন উঠে—কোথা হইতে এই শক্তি আসে—কোথায় ইহার উৎস? পণ্ডিতগণ পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিয়াছেন—রেডিয়মে পরমাণুর স্বতঃবিশ্লেষণ হইতে এই শক্তির উদ্ভব ঘটিতেছে, এই বিশ্লেষণের একটি নিয়ম আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে শতকরা বা হাজারকরা এক নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে রেডিয়মে পরমাণুসমূহ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কোন স্থানে যদি এক সময়ে এক লক্ষ রেডিয়াম পরমাণু আবদ্ধ থাকে, তবে বৎসরের শেষে হয়ত দেখা যাইবে যে, উহার দশটি পরমাণু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কিন্তু ঠিক্ কোন্ দশটি রেডিয়াম পরমাণুর এইরূপে বিনাশ ঘটিবে, তাহা কোন বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন না। মনে করুন, জেলখানার কয়েদীর মত রেডিয়মে পরমাণুগুলি ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা আছে। বৎসরের শেষে কোন্ কোন্ সংখ্যার পরমাণু ভাঙ্গিবে, তাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকের কার্য্যকারণবাদের ব্যতিক্রম ঘটিতে এখানে দেখা যায়; কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ যদি এখানেও খাটিত, তাহা হইলে প্রত্যেক রেডিয়াম পরমাণুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট বিবরণ বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বেই দিতে পারিতেন কিন্তু কেবলমাত্র গড়পড়তা কয়টা পরমাণু ভাঙ্গিয়া যাইবে, ইহাই তিনি বলিতে পারেন। কলিকাতা সহরের বার্ষিক মৃত্যুর হার হাজারকরা প্রায় ২৪ জন, মোটামুটি বলা যাইতে পারে; কিন্তু ঠিক্ কোন্ ২৪ জন ব্যক্তির আয়ুঃশেষ হইবে, তাহা যেমন নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা অসম্ভব, ইহাও অনেকটা তদ্রূপ।

এইরূপে অণুপরমাণুর সূক্ষ্ম রাজ্যে বৈজ্ঞানিকগণ যতই প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন, ততই দেখিতে পান যে, এই রাজ্য নির্দ্দিষ্টবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এইখানে কার্য্যকারণ সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া কোন ভবিষ্যদ্বাণী খাটে না। সমষ্টিগতভাবে যে কার্য্যকারণের ধারা বিশ্বজগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যষ্টিগতভাবে অণুপরমাণুর বেলায় তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। ইলেক্‌ট্রনের গতিবিধি পরীক্ষা করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্বন্ধে আরও বিশদ্ প্রমাণ পাইলেন—কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থানের ইলেক্‌ট্রণকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার গতি সম্বন্ধে সঠিক খবর বলা অসম্ভব, আবার উহার গতি সম্বন্ধে সঠিক্ খবর সংগ্রহ করিতে গেলে উহার অবস্থানের সঠিক্ খবর পাওয়া যায় না। এইরূপে বিজ্ঞানে অনির্দ্দিষ্টবাদের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, এই অনির্দ্দিষ্টবাদকে (Indeterminism) গড়ের নিয়ম (Law of probability)ও বলা যাইতে পারে। কারণ উপরোক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা দেখিয়াছি যে, কি ঘটিতে পারে বা কি ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা মোটামুটি বলা যাইতে পারে—সঠিক্ ভবিষ্যদ্বাণী অসম্ভব। আরও একটি সহজ দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করিব। ফুটবলের ব্লাডারে বাতাস পুরিতে থাকিলে উহা ফুলিয়া উঠে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। কেন ফোলে, তাহার কারণও সকলে হয়ত অবগত আছেন। কারণ, বাতাসের অণুগুলি উহার গায়ে অনবরত ধাক্কা দিতে থাকে। খোলা সিনেট হলে যদি রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হয় এবং উহাতে যদি সর্ব্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ না থাকে, তবে দরজার সাম্‌নে ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া যদি কেহ ধাক্কা খাইয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে এই ফুটবল ব্লাডারের ভিতরকার বাতাসের অণুপরমাণুর অবস্থা অনুমান করা কিছুই কঠিন নয়। সাইকেলের টায়ারে যখন বাতাস ভর্ত্তি হইয়া যায়, তখন উহাতে আরও বেশী বাতাস পুরিতে গেলে মনে হয়, ইন্‌ফ্লেটারের পিস্‌টনের উপর যেন বিপরীত ঠেলা পড়িতেছে, ভিতরকার বাতাসের চাপের দরুণই এই বিপরীত বাধা আমরা অনুভব করি। সেইরূপ

একটি কাঠের বাক্স যদি বাতাস বা অন্য কোন গ্যাসে ভর্ত্তি করা হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্সের সকল পার্শ্বেই ভিতর হইতে বাতাস বা গ্যাসের অণুপরমাণুগুলি চাপ দিবে, কারণ বাক্সের ভিতর উহারা অনবরত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—কোন ফাঁক পাইলেই পালাইবে। বাক্সের পার্শ্বের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের চাপ মাপিয়া প্রমাণ করা যায় যে, প্রতি সেকেণ্ডে যত বেশী অণুপরমাণু উক্ত স্থানের উপর আসিয়া ঘা দিবে, চাপের পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। এইরূপেই Boyle's Law নামক চাপের সূত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সূত্র-মতে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তনের গ্যাসের চাপের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু এখন আমরা যদি ঐ বাক্সের পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্রতম অংশের বিষয় আলোচনা করি—এত ক্ষুদ্র যে, উহাতে হয়ত ৩।৪ সেকেণ্ড পরে একটি মাত্র অণু আসিয়া ঘা দিতে পারে, তাহা হইলে ঐ অংশের উপর গ্যাসের চাপ ত সকল সময়ে সমান থাকিতে পারে না। এখানেও নির্দ্দিষ্টবাদ ভাঙ্গিয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিককে অনির্দ্দিষ্টবাদ (probability)ও গড়ের নিয়মের (Statistics) আশ্রয় লইতে হয়।

এইরূপে বাস্তব জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে মতবাদ লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট-বাদের পন্থী ও অনির্দ্দিষ্ট বা গড়বাদের পন্থী। অবশ্য শেষের সম্প্রদায়ই বর্ত্তমানে দলে ভারী, ইঁহাদের মতে বাস্তব জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না; এমন কি বাহ্য জগতের ঘটনাপরম্পরাও কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঘটিতে দেখা যায় না। যাহা আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া মনে করি—তাহা শুধু গড়ের নিয়ম। এই নিয়ম কি ঘটিতে পারে, শুধু তাহারই খবর দেয়; সঠিক কি ঘটিবে—তাহা বলিতে অক্ষম; অর্থাৎ ইহা ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, কেবল এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব।

আবার একদল দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক মতের এবম্বিধ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলেন—বৈজ্ঞানিকের বাহ্য জগৎ একটি ভুয়ো জগৎ; উহার কোন প্রকার বাস্তব সত্তা নাই, চন্দ্রসূর্য্যসমন্বিত এই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মধ্যেই এবং এই অনুভূতির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বাহ্য জগৎও লোপ পাইবে, অর্থাৎ ইঁহারা মায়াবাদী—ইঁহাদের মতে বাহ্য জগৎ একটি মায়া। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বা অবৈজ্ঞানিক, তাহা অনায়াসেই বোঝান যায়। কারণ কোন দৈব-বিপর্য্যয়ে যদি সমস্ত মানব-জাতির ধ্বংস হয়, তথাপি চন্দ্রসূর্য্যের আলোর যে হ্রাস ঘটিবে না, বা সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহ-উপগ্রহের গতির যে বিরাম হইবে না, এই কথা কি কেহ অবিশ্বাস করিবেন?

অনির্দ্দিষ্টবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ইহা মানিয়া লইলে বুদ্ধি ও ধীশক্তিসম্পন্ন মানবজাতিকে জ্ঞানের ও সত্যের সন্ধান ছাড়িয়া শুধু জড় বা পশু-জীবন যাপন করিতে হয়, কারণ বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে যখন কিছুই সঠিক্ জানিবার উপায় নাই, তখন কাহার সন্ধানে বা কাহার সাধনায় মানব-সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে? ইহা ত বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না; সত্যের সন্ধানে কঠোর সাধনা ও শ্রান্তিহীন প্রচেষ্টাই বিজ্ঞানের লক্ষণ। জ্ঞানের পরিসমাপ্তির উপর নিশ্চিন্তভাবে বিরাম উপভোগ করাকে বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা অবতার বা গুরুবাদ মানেন, তাঁহাদের পক্ষে অবতার বা গুরুর বাণীকে চরম জ্ঞান মনে করিয়া আরামে বিশ্রাম করা চলিতে পারে—কিন্তু এবম্বিধ জীবন-যাপন বৈজ্ঞানিকের অভিপ্রেত হইতে পারে না। সত্যের অজ্ঞেয় ও অপ্রাপ্য পরিপূর্ণতার সন্ধানে বিজ্ঞানের অভিযান; এবং ইহা হইতেই মানব-সভ্যতার বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি। বিজ্ঞানের পুষ্টি পাওয়াতে নহে—চাওয়ার মধ্যেই তাহার বৃদ্ধি। কারণ এক যুগের পাওয়া পরবর্ত্তী যুগে প্রচুর হয় না—তখন উহাতে পিপাসা মিটে না, চিরসজাগ চাওয়ার সিরকায় ডুবাইয়া উহাকে সতেজ রাখিতে হয়, নতুবা বিজ্ঞানের সত্য-স্বরূপ ধরা পড়ে না।

প্রকৃতির ঘটনা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের নির্দ্ধারিত যাবতীয় বিধি যদি অসম্পূর্ণ বা অনির্দ্দিষ্ট হয় অর্থাৎ তাহাদের যদি কোন সঠিক্ মূল্য না থাকে অথবা অনির্দ্দিষ্টতা ও গড়ের নিয়মই যদি প্রকৃতির ধারা হয়, তবে যে সব সর্ব্ববাদিসম্মত অপরিবর্ত্তনীয় সঠিক বৈজ্ঞানিক মান (universal constants) বিজ্ঞানের যাবতীয় মতের ভিত্তিস্বরূপ, তাহাদের

নির্দ্দিষ্টতা কোথা হইতে আসে? দৃষ্টান্তস্বরূপ—মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মান (g), আলোকের গতি, ইলেক্‌ট্রনের ভর ও তাহার বৈদ্যুতিক ভার (mass & charge), প্লাঙ্কের অপরিবর্ত্তনীয় মান (h) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

বৈজ্ঞানিক তাহার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির বা যন্ত্রের সাহায্যে বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফল হইতেই বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে যে জগতের চিত্র তিনি অঙ্কিত করেন—তাহা বাস্তব জগতের একটি প্রতিবিম্ব বা ছায়াচিত্র মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির যে জগৎ, তাহা হইতে এই বৈজ্ঞানিক জগৎ পৃথক্ এবং এই উভয় জগৎ আবার বাস্তব জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক জগতে নির্দ্দিষ্টবাদের ব্যতিক্রম দেখা গেলেও, বাস্তব জগতে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, কারণ বৈজ্ঞানিক তাঁহার ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রের সাহায্যে যখন জাগতিক ঘটনা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করেন, তখন ঐ সব ঘটনা এইরূপ পরীক্ষা প্রণালীর ফলে, অর্থাৎ যন্ত্র বা পরীক্ষকের অবাস্তব প্রভাবে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই কারণেই বৈজ্ঞানিক জগতে নির্দ্দিষ্টবাদের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে বক্তব্যটা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। ইলেক্‌ট্রন আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির বাহিরে—উহাকে দেখিতে হইলে কিম্বা উহার গতি পরীক্ষা করিতে হইলে যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক, এই জন্য প্রখর আলোকে উহাকে আলোকিত করা হয়। কিন্তু যখনই ইলেক্‌ট্রনের উপর উজ্জ্বল আলোক পতিত হয়, আলোক-কণা বা ফোটনের ধাক্কা খাইয়া তখন উহার গতির পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং উহার প্রকৃত স্বকীয় গতি বৈজ্ঞানিকের নিকট ধরা পড়ে না। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক ও তাঁহার যন্ত্রপাতি প্রকৃতির বা বহির্জ্জগতের অংশবিশেষ এবং প্রাকৃতিক ঘটনার মত উহারাও প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। অতএব বৈজ্ঞানিক ও তাঁহার যন্ত্রকে প্রাকৃতিক ঘটনা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিলে, ঐ ঘটনার পর্য্যবেক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকে, এই অসম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে নির্দ্দিষ্টবাদের সত্যতা নির্ণয় অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর রূপকের কথা মনে পড়ে। এই রূপকের বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের চিত্রের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। রূপকটির বিবরণ দিলেই ব্যাপারটি বুঝিতে সহজ হইবে।

"আমরা পৃথিবীবাসী জীব একটি গুহায় আবদ্ধ হইয়া আছি। এই গুহার দরজা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত, বহির্জ্জগতের দিকে উন্মুক্ত। শিশুকাল হইতে আমরা এই গুহায় আবদ্ধ—আমাদের গলায় ও পায়ে শৃঙ্খল, যেন আমরা নড়িতে না পারি। এই অবস্থায় আমরা শুধু আমাদের সাম্‌নের দিকে তাকাইতে পারি—গলায় শৃঙ্খলের দরুণ পিছন ফিরিয়া দেখিতে অক্ষম। উহার দরজা পিছন করিয়া আমরা দাঁড়াইয়া আছি, আমাদের নিজের ছায়া ও বহির্জ্জগতে যে সব ঘটনা ঘটিতেছে—তাহাদের ছায়া দরজার বিপরীত গুহার দেওয়ালে আসিয়া পড়িতেছে, আমরা শুধু এই সব ছায়াই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, বৈজ্ঞানিকের বাস্তব জগৎও এইরূপ ছায়াচিত্র মাত্র।"

মোটের উপর দাঁড়াইতেছে এই—আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি, যন্ত্রপাতি ও বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে কখনও পারিব না। বাস্তবের প্রকৃতস্বরূপ বৈজ্ঞানিকের নিকট কখনও প্রকটিত হইতে পারে না, কেবলমাত্র উহার ছায়াচিত্রই বৈজ্ঞানিক দেখিতে পান, এবং এই ছায়াচিত্রে নির্দ্দিষ্টবাদের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক যদি সিদ্ধান্ত করেন যে, বাস্তবজগতের ঘটনাবলীও নির্দ্দিষ্টবাদ বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অধীন নয়, তাহা হইলে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। ম্যাক্স, প্লাঙ্ক প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাই বলিতে চান যে, জাগতিক ঘটনা পরম্পরার মধ্যে বস্তুতঃ কার্য্যকারণসূত্রের শৃঙ্খলা বর্ত্তমান। বৈজ্ঞানিকের ছায়াজগতে যে উহার ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহার জন্য বৈজ্ঞানিক ও তাঁহার যন্ত্র দায়ী। যদি কোন আদর্শ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সম্ভব হয়, যিনি প্রকৃতি হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া অর্থাৎ প্রকৃতির অংশীভূত না হইয়া প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ, তবে [illegible] নিকট বাস্তবজগতের ঘটনাপরম্পরা কার্য্যকারণ সম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতীত [illegible] সন্দেহ নাই। এই আদর্শ-

সর্ব্বদর্শী চিত্তকে (Ideal spirit) অনেকে নিছক কল্পনা বলিয়া মনে করিতে পারেন এবং বৈজ্ঞানিককে অনুমান ও বিশ্বাসের আশ্রয় লইতে দেখিয়া উপহাসও করিতে পারেন। ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলিবেন—বিজ্ঞানেও অনুমান, কল্পনা এবং বিশ্বাসের স্থান আছে, তবে ধর্ম্মের বিশ্বাসের মত ইহাতে গোঁড়ামি ও মত্ততা নাই, এই বিশ্বাস না থাকিলে, বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব হইত না। বিশ্বজগৎ শৃঙ্খলা ও অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন—এই বিশ্বাসের উৎস হইতেই নিউটন, কেপলার, গ্যালিলিও ও ফ্যারাডের মত বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানসাধনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসই বৈজ্ঞানিককে সত্যের অনুসন্ধানের অন্ধকারময় পথে আলোকপ্রদান করে। জ্ঞানের নদী কখনও সম্মুখে, কখনও পশ্চাতে এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত। সুতরাং এই বিশ্বাস না থাকিলে বৈজ্ঞানিক দিশাহারা হইয়া যাইতেন। এই কার্য্যকারণবাদই মানবশিশুর সুপ্ত আত্মাকে সজাগ করিয়া তুলে—তাই সে প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া অনবরত প্রশ্ন করিতে থাকে—"কেন, কেন এমন হচ্ছে?" এই কেন বা কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিই বৈজ্ঞানিককে কোন বিশিষ্ট মতের বা বিশ্বাসের গোঁড়ামি হইতে রক্ষা করে। কিন্তু তাই বলিয়া বৈজ্ঞানিক অবিশ্বাসী নহেন—তাঁহার বিশ্বাসে সজীবতা আছে, শ্রদ্ধা আছে। বৈজ্ঞানিক জানেন—সত্যের সঠিক্ উপলব্ধি তাঁহার অভীষ্ট হইলেও, তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি নাই। যে পথে তাঁহার যাত্রা, সে পথই যে সত্য পথ, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। এই পথেই শ্রদ্ধার সহিত বিশুদ্ধ ও সাধু-চিত্ত লইয়া উত্তরোত্তর জ্ঞানের সঞ্চয়নেই তাঁহার আনন্দ, উহাতেই তাঁহার পরম শান্তি।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপর সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥"

অবশেষে

কুমারী চন্দ্রিমা সান্যাল

অপমানিতের ব্যথা বয়ে বেড়াবার
অসীম হৃদয়-বল দাও নি ত' মোরে,
কেন? ওগো কেন হেন তীব্র অভিমান—
রেখেছ আবিল করি' সজল অন্তরে।
কেন মোরে দিলেনাক' অকরুণ হিয়া—
পাষাণ-ফলকে গাঁথা মরম প্রদেশ,
সে, যে,—ব্যথায় শিহরি' উঠে! অসহ লাজেতে হারা;
সহজ বেদনাকুল; মৃদুল আবেশ,
কোমল মমতাময় সলাজ চাহনি মধু
সহজেই জলভারে দৃষ্টি অবনত,
ই কি সমর-সাজ কঠিন ভূতল তলে?
চলেছে আঘাত ক'রে মোরে অবিরত।

হে রুদ্র দেবতা মোর! ভীষণ, ভয়াল!—
তোমারেই করিতেছি আজিকে স্মরণ;
মাতাল চরণ তালে বাজাও ডমরু তব—
ধ্বংস করিতে আন রুদ্র নাচন!
কোমলতা দূর হোক্, কঠিন পাপড়ি-তলে—
সকল স্নেহের মোর হোক্ অবসান!
নিয়ত করিব পূজা পাষাণ তোমারে আমি—
পরশিতে পারিবে না তুচ্ছ অপমান!
কিন্তু এ তো রূপ নয় কোমল নারীর!—
ব্যথাতেই সৃষ্টি তার, ব্যথাতেই লয়;
পাষাণী নয়ত নারী! নিহিত স্নেহের ছায়ে
সকল গ্লানি যে তার অবলুপ্ত হয়।

একটি সন্ধ্যা

(গল্প)

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

সরকারের কৃপায় মধ্যপ্রদেশের নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে, সেবার বদলি হইয়া যে জায়গাটিতে আসিলাম, সেখানটি সহর হইলেও কোলাহলহীন পল্লীর ন্যায়ই শান্ত। এই সহরের একটি কোণে আমার একখানি বাসা—আমি পছন্দ করিয়াই নর্ম্মদার উপকূলেই বাড়ীটি লইয়াছিলাম। এখানের সব চাইতে মনোরম বাংলার মা, সুরধুনীর মত—নর্ম্মদা সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা।

আফিস হইতে ফিরিয়া প্রায়ই আমি নর্ম্মদার উপরেই আমার বাসার যে বারান্দা, সেইখানেই বসিয়া চাহিয়া থাকিতাম, এই সৌন্দর্য্যময়ী উদ্দামহীন নিস্তব্ধ জলের প্রতি, আর তারই কোলের কাছ দিয়া যে ধূসরবর্ণ বিন্ধ্য পর্ব্বত তার দিগন্তপ্রসারিত দেহটা ছড়াইয়া আছে, সেইদিকে চাহিয়া আমার মুগ্ধ-নয়ন ফিরিতে চাহিত না। সেদিনও আসিয়া ঐখানটিতে গায়ে একটা র‍্যাপার দিয়া সেইদিকেই চাহিয়া বসিয়াছিলাম, আর আপন মনেই, আনন্দে বহুদিন আগের শোনা গানের একটু মনে আসায়, গুণগুণ করিয়া গাহিতেছিলাম—

"ওহে বিন্ধ্যাচল, গ্রীবা উচ্চ করি
কি হেরিছ বল ?
করেছ কি হেরে জীবন সফল,
সেই বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে ?"

শীতের বেলা—কোন্ সময়ে সূর্য্যদেব যে তাঁর মুখখানি লজ্জায় রাঙা করিয়া পাহাড়ের আড়ালে লুকাইয়াছেন, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখি, দিননাথকে লজ্জায় সরিয়া যাইতে দেখিয়া, অপরদিকে নিশানাথ তাঁর মধুময় হাসিতে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। নর্ম্মদার প্রতি ফিরিয়া দেখি, শত শত সন্ধ্যাদীপ তাঁর বক্ষের উপর নক্ষত্রের মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে—

—বাঁচাও—বাঁচাও!

চমকিয়া আমি চতুর্দ্দিক্ চাহিয়া দেখিলাম—কিন্তু ঘাটে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম—তবে এ নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ আসিল কোথা হ'তে!

আবার সেইরূপ ভীতিপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি—রক্ষা কর!

শব্দ লক্ষ্য করিয়া আমি ছুটিয়া যাইলাম। আমার বাড়ীর পাশেই একটি বড় অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে দাঁড়াইয়া একটি তরুণী—তাহারই কণ্ঠে এই ব্যাকুল ধ্বনি!

আমি চেঁচাইয়া বলিলাম—ভয় নেই! কি হয়েছে?

অঙ্গুলী সঙ্কেতে সে আমাকে দেখাইল।

তার নির্দ্দেশ মত চাহিয়া আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম! মস্ত সাপ!—

মেয়েটির কাছ হইতে হাত দুই দূরে তার উদ্যত ফণা লইয়া দুলিতেছে! ইহা দেখিয়া আমি যে কি করিব—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। মেয়েটির কাছে যাইবার যে রাস্তা, তাহাই অধিকার করিয়া বিষধর বসিয়া আছে! মেয়েটির পশ্চাতেই নর্ম্মদার শীতল জল—সাপের ভয়ে সে জলের এত নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যে—যেমন সে ভয়ে আর এক পা সরিতে যাইল, অমনি জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাপটি গর্জ্জন করিয়া সেইখানটিতে ছোবল্ মারিল!

আমি মুহূর্ত্ত সেদিকে চাহিয়াই নর্ম্মদার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম! কিছুদূর দ্রুত সাঁতার দিয়া যাইতেই, মেয়েটিকে ধরিয়া ফেলিলাম। নর্ম্মদার জল উপরে শান্ত হইলেও, ভিতরে প্রবল স্রোতঃ এবং গভীরতাও খুব বেশী। অতি কষ্টে আমি তাহাকে লইয়া একটি ঘাটে উঠিলাম। মেয়েটির সংজ্ঞাশূন্য দেহটা মাটির উপর শোয়াইয়া দিয়া, আমি নিজের গায়ের এবং মাথার জল ঝাড়িয়া ফেলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিলাম! মেয়েটির প্রতি চাহিয়া দেখি, অপরূপ সুন্দরী! ক্ষণকাল তার পানে চাহিয়া থাকার পর আমার মনে হইল, জলে ডোবা রুগী,—তখনি আমি তার শুশ্রূষায় মন দিলাম। অহেতুক এই বিলম্ব করার জন্য নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। মেয়েটি যদি না

বাঁচে তাহা হইলে আপশোষের আর সীমা থাকিবে না! এই অজ্ঞাতনামা তরুণীটির প্রতি ব্যথায় আমার মন কাতর হইল।

আমার কাতরতায় বোধ হয় ভগবানের দয়া হইল—মেয়েটী চক্ষু চাহিল! আমি তার মুখের উপর ঝুঁকিয়াছিলাম। আমার চোখের সহিত দৃষ্টি মিলিতেই, সে নিজের সিক্ত আঁচলখানি টানিয়া মাথায় দিতে যাইল—আমি বাধা দিয়া তার ভিজা চুলগুলি নিঙ্ড়াইতে যাইতেই, সে উঠিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—থাক্!

আমি বলিলাম—এই শীতে চুলগুলো হ'তে জল ঝর্ছে! মুছে ফেল্লে ভাল হ'ত! ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হ'তে পারে!

এক মুহূর্ত্ত সে এই কথায় আমার মুখের পানে চাহিয়া দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

আমি চাহিয়া দেখিলাম, তার মুখ চিন্তাচ্ছন্ন। বলিলাম—আপনার বাড়ী কোথায়, জান্তে পারলে, পৌছে দিতাম।

মেয়েটি বলিল—আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন।

—কষ্ট আর কি! রাত হ'য়ে গিয়েছে, আর—আপনার শরীরটাও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে—একা যাবেন! বাড়ী কি খুব বেশী দূরে?

—না।

—তবে চলুন, আমি পৌছে দিয়ে আসি।

সে চুপ করিয়া রহিল।

আমি বুঝিলাম, তার দুর্ব্বল শরীরে উঠিতে কষ্ট হইতেছে। তার সাহায্যের জন্য আমি তার একখানি হাত ধরিয়া বলিলাম—উঠুন। আর এই ঠাণ্ডায় বস্বেন না। আমারও খুব শীত কর্ছে।

মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইতেই লণ্ঠন হাতে একটি পুরুষ আর একজন বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া মেয়েটিকে বলিল—কম্লা কই! তুমি এখানে! আমি বুড়োমানুষ, তোমাকে চারদিকে খুঁজে হয়রান হ'য়ে গিয়েছি!

ইহাদের দেখিয়া বুঝিলাম যে ইহারা কমলার বাড়ীর দাস, দাসী।

বৃদ্ধাটি—আমার প্রতি চাহিয়া কমলাকে বলিল—এ বাঙ্গালীবাবু কে?

এ কথার উত্তর আমিই দিলাম। বলিলাম—আমার পরিচয় পরে জেনো—তোমাদের 'বাই' নর্ম্মদায় ডুবে গিয়েছিলেন—ওঁকে বাড়ী নিয়ে যাও!

এই কথায় সে কমলার পানে ফিরিয়া ভীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—কি সর্ব্বনাশ! আমি ত তোমার সঙ্গেই ছিলাম, কেন যে মর্তে নাথুর সঙ্গে কথা কইতে গেলাম, কাল হ'তে নর্ম্মদাকে পিদিম দিতে আর তোমাকে আস্তে দেব না।

তাহাকে থামাইয়া কমলা বলিল—তুই চুপ কর! চ, বাড়ী যাই!

আমিও আস্তে আস্তে বাসার রাস্তা ধরিলাম।

বাড়ী আসিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। সকাল হইতেই চাকর আসিয়া বলিল—এখানকার জায়গীরদার লছমন্ সিং আপনার সঙ্গে দেখা কর্তে এসেছেন।

আমি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই দেখি, মস্ত পাগড়ী মাথায় এক ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহারই অনতিদূরে কাল রাত্রের সেই নাথু দাঁড়াইয়া।

আমাকে দেখিয়াই সে মাথা নামাইয়া নমস্কার করিল। ভদ্রলোকটিও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি তাঁর প্রতি চাহিয়া বলিলাম—আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন জান্তে পারি কি?

তিনি বলিলেন, দরকার আছে বলেই তো আমার আসা! বসুন বলছি।

আমি চেয়ারে বসিলে, তিনিও বসিয়া বলিলেন—কাল রাতে আপনি আমার ভাইঝি কমলাকে নর্ম্মদার জল হ'তে তুলেছিলেন?

বুঝিলাম, ভ্রাতুষ্পুত্রীর জীবনরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছেন। আমি কিঞ্চিত লজ্জিতভাবে বলিলাম—সে আর এমন বেশী কি করেছি, বরং, এ-ত

প্রত্যেক মানুষেরই করবার কথা। তার জন্য আপনি সকালবেলা, এই ঠাণ্ডায় কেন কষ্ট ক'রে এলেন?

ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন—শুধু তার জন্যই এই শীতের সকালে আপনাকে কষ্ট দিতে আসিনি।

আমি তাঁর প্রতি চাহিয়া বলিলাম—তবে?

লছমন সিং একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কাল কমলাকে জল হ'তে উঠিয়ে আপনি তার জীবনরক্ষা করেছেন বটে, কিন্তু তার ইজ্জৎ—

ভদ্রলোকের এই ইঙ্গিতে রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি বাধা দিয়া তাঁহাকে বলিলাম—আপনি কি বলছেন, বুঝে বলবেন!

আমার মুখের পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন—বুঝেই বলেছি।

আমি রুক্ষকণ্ঠে বলিলাম—আপনার ভাইঝির আমার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় নি। আপনি ভুলে যাবেন না, আমি একজন ভদ্রলোক।

লছমন্ সিং ধীরকণ্ঠে বলিলেন—আপনি রেগে গিয়েছেন, ঠাণ্ডা হ'ন্! এ রকম কথা আমি বলিনি! আমি জানি, আপনি gentleman.

আমার কিন্তু মনের বিরক্তি বা ক্রোধ কোনটাই এ কথায় শান্ত হইল না, আমি বলিলাম—আমার আফিসের সময় হ'য়ে আসছে।

ঘড়ির প্রতি চাহিয়া লছ্মন সিং বলিলেন—ওঃ, আমার মনে ছিল না।

আমি ভ্রূ কুঁচ্কাইয়া বলিলাম—আপনারা ত আমাদের মত কেরাণী নন্! জমীদারদের বেলার দিকে লক্ষ্য রাখবার ত দরকার হয় না!

—না অসময়ের হিসেব সকলেরই থাকে! তবে আজ আমার মনটায় শান্তি নেই কমলার জন্যে!

আমি তাঁর প্রতি চাহিয়া বলিলাম—তাঁর কি অসুখ হয়েছে?

—অসুখ হ'লে ভাবনা ছিল না! বলিয়া লছ্মন সিং একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আমি বলিলাম—তবে?

—সেই জন্যেই ত আপনার কাছে এসেছি।

আমি বলিলাম—আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়—আমি করব।

আমার হাত দুখানি ধরিয়া আশাপূর্ণ কণ্ঠে লছ্মন সিং বলিলেন—আপনার দ্বারাই হবে, সুধীরবাবু! আপনি ছাড়া কমলাকে আর কেউ রক্ষা ক'রতে পারবে না! যেমন তার জীবন দিয়েছেন, তেমনি আজ তার ইজ্জৎ রক্ষা করুন।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছিনে!

লছ্মন সিং বলিলেন—আমরা ছত্রি, আমাদের বংশের রীতি, কোন পুরুষ কুমারী কন্যার যদি হাত ধরে, তার সঙ্গেই সেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

এই কথা শুনিয়া আমি এত আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে, তাঁর কথার কি জবাব দিব—তা ঠিক করিতে পারিলাম না!

ব্যাকুলকণ্ঠে লছ্মন সিং বলিলেন—এখন আপনি বুঝতে পারছেন, কেন কমলার ইজ্জতের কথা বলেছিলাম। আপনি তাকে বিয়ে না ক'রলে তার জীবনটা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

—সে কি!

—হাঁ—তাকে আমদের জাতের কোন ছেলে আর বিয়ে ক'রবে না!

আমি কোন কথা না বলিয়া বিস্মিত চোখে শুধু তাঁর প্রতি চাহিয়া রহিলাম!

তিনি বলিলেন—আপনি খুব আশ্চর্য্য হচ্ছেন! কিন্তু হাঁা—এই আমাদের কুলপ্রথা।

আমি বলিলাম—এখনকার দিনে এরকম নিয়ম যে কোন বংশে থাকতে পারে—তা আমার ধারণা ছিল না!

আপনার এ কথা খুবই সত্যি! আপনাদের কথা অবশ্য বল্তে পারি নে, কিন্তু আমাদের হিন্দুস্থানী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে, এখনও আগের দিনের অনেক প্রথাই বিদ্যমান।

আমি বলিলাম—তা হবে!

লছ্মন সিং বলিলেন—সেইজন্য বাধ্য হ'য়েই আজ আমি আপনার কাছে এসেছি! এখন কমলার সঙ্গে আপনার বিয়ে ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই।

আমি বলিলাম—আপনারা যখন ক্ষত্রিয়, ভাইঝির স্বয়ম্বর করুন না!

লছ্‌মন সিং বলিলেন—সে প্রথা অনেকদিন আগেই উঠে গিয়েছে!

তবে এ নিয়মটাই বা আঁকড়ে ধরে আছেন কেন? এটাও ত উঠিয়ে দিলেই পারেন!

— না, এটা ওঠাবার আমার সাধ্য নেই!

—তবে কি করবেন?

—আপনার সঙ্গে কমলার বিয়ে দেবো!

—আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কমলাকে আমি বিয়ে করব কেন?

আমার পানে অসহায়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া লছ্‌মন সিং বলিলেন—আপনি বিয়ে না করলে, কমলার যে আমার বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়েও বেশী হবে; আপনি অমত করবেন না—যেমন দয়া দেখিয়ে তাকে জল হ'তে তুলেছিলেন, তেমনি বিয়ে করেও তাকে লজ্জার হাত হতে বাঁচান।

—জল হ'তে তোলা তাকে যত সহজ ছিল, বিয়ে করা তত সহজ নয়।

লছ্‌মন সিং আমার দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন—কঠিন কিছুই নয়! আপনি কমলাকে দেখেছেন—তার মত সুন্দরী মেয়ে খুব কমই আছে!

আমি বলিলাম—সে কথা আমি স্বীকার করি।

আশাপূর্ণ নয়নে আমার পানে চাহিয়া লছ্‌মন সিং বলিলেন—তবে আপনি রাজী? সুধীরবাবু!

আমি বলিলাম—না, আমি কৃতদার।

—ওঃ, আমি এতক্ষণে বুঝলাম, আপনার অমত কেন!

—আমি বলিলাম—এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বিয়েয় কোন্ ভদ্রলোক মত দিতে পারে, বলুন? আর আপনিই বা সতীনের উপর মেয়ে দিতে চাইবেন কি ব'লে?

লছমন সিং বলিলেন—আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কমলা ছত্রির মেয়ে, স্বপত্নী থাকায় তারা ভয় করে না।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—কমলা যেন ছত্রির মেয়ে, কিন্তু আমি নিরীহ বামুনের ছেলে, দুটি স্ত্রী নিয়ে ঘর করবার আমার সাহস নেই।

তিনি বলিলেন—কমলার জন্যে আপনাকে কোন কষ্টই সইতে হবে না, সে আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে!

আমি বলিলাম—এ ছেড়ে দিলেও, সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক আমাদের জাত নিয়ে!

—কেন?

—আমি বাঙ্গালী বামুন, আর আপনারা হিন্দুস্থানী ক্ষত্রিয়!

—এই কথা! তাতে ত আমি কোন বাধা দেখছি নে! ক্ষত্রিয়-কন্যার সকল জাতেই বিয়ে হ'তে পারে, এর বহু দৃষ্টান্ত আছে!

—তা জানি! ক্ষত্রিয়েরা সে বিষয়ে উদার, যবনকেও কন্যা দিতে কুণ্ঠিত হয় নি! এই কথা বলিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম।

আমার এই কথায় লছ্‌মন সিং ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন—শুধু যবনের তুলনাই দিলেন! সে একের অপরাধ—ক্ষত্রিয়ের কলঙ্ক যেমন মানসিংহ ছিল, তেমনি প্রতাপও এক ছিলেন না!

আমি বলিলাম—সেত ছিলেনই! তা না থাকলে আর আজ এ গর্ব্ব ক্ষত্রিয়রা ক'রত কোথা হ'তে!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া লছ্‌মন সিং বলিলেন—আপনার কথা সত্যি!

—তবে এখন উঠি—পরের চাকর—আর ত বসবার অবসর নেই।

আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া, তিনি বলিলেন—তা হ'লে আমাকে কি বলছেন?

তার প্রতি চাহিয়া আমি বলিলাম—আপনাকে যা বলবার তা ত অনেক আগেই আমি বলেছি।

—তবে কি আমি নিরাশ হ'য়েই ফিরব?

—আপনি যদি অন্যায় আশা করেন—তা ত পূরণ করা আমার সাধ্য নয়।

লছ্‌মন সিং বলিলেন—আমাদের মেয়ের কোন ভারই আপনাকে নিতে হবে না—তার বাপের সম্পত্তির সেই

অধিকারিণী—তার আয়েই আপনারও সংসার চ'লে যাবে।

এই কথায় অপমানে আমার চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল! উপরে যাইবার জন্য পিছন ফিরিয়াছিলাম,—ফিরিয়া বলিলাম—আপনি বাড়ী যান! এত নীচ আমি নই যে স্ত্রীর পয়সায় আমি সংসার চালাব। আপনার রাজকন্যে আর আদ্দেক রাজত্বে আমার একটুও লোভ নেই!

তাঁহাকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। ভিতরে গিয়া চাকরকে বলিলাম—দেখে আয় জমীদার গেল কি না।

সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—তাঁর মোটরে চলিয়া গেলেন।

৩

ক'দিন আফিসের কাজের ভীড়ে আর কোন কিছুই স্মরণ ছিল না! সেদিন বিকেল বেলা বাড়ী ফিরিয়া আসিবামাত্র, চাকর একখানা 'টাইপ'-করা চিঠি আনিয়া হাতে দিল—এক গানের মজলিসে নিমন্ত্রণ—চিরদিন এই একটি বিষয়ে আমার সখ্ বেশী!

সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বাহির হইলাম বটে—কিন্তু নূতন জায়গা বলিয়া একখানি টাঙ্গা করিলাম। গাড়ী আসিয়া একটি গেটের ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে তক্‌মা পরিহিত দ্বারপাল নীচু হইয়া আমাকে নমস্কার করিল। প্রকাণ্ড বাড়ী—সমুখেই ফুলের বাগান। তারই মধ্যস্থানে একটি প্রস্তরের পুরুষ মূর্ত্তির পায়ের নীচে ফোয়ারার জল পড়িতেছে!

টাঙ্গা হইতে নামিতেই দু'জন ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে সমাদরে লইয়া গিয়া, সমুখের হল ঘরে বসাইল। সেখানে ফরাস বিছান, একপাশে গান বাজনার উপকরণ রাখা, জনকয়েক ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। ইঁহারা সকলেই আমার অপরিচিত। এক আমি ছাড়া সবাই এই দেশীয়—আমাকে দেখিয়া সকলে এক সঙ্গে আমার প্রতি চাহিল। তাহাদের পাশে এক জায়গায় আমি বসিতেই, পান আর সিগারেট লইয়া একটী ছোকরা আসিল। গোলাপজল আর আতর ছিটাইয়া দিয়া একজন যুবা বলিলেন—সুধীরবাবু! পান নেন্!

তাহার মুখে সুন্দর বাংলা কথা শুনিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলাম—আপনি বাঙ্গালী? মাথায় টুপি দেখে তা আমি বুঝতে পারিনি!

—একটু হাসিয়া সে বলিল—আজ্ঞে! আমি বাঙ্গালী নই।

—কিন্তু বেশ বাংলা বলছেন ত! এদেশের অনেক বাঙ্গালী, আপনার মত এত সুন্দর বাংলা ব'লতে পারে না!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ! আমি ছোট হ'তে বাংলা দেশেই ছিলাম কিনা!

—কোন জায়গায় ছিলেন?

—আজ্ঞে—শান্তি কুটিরে।

—ওঃ! তাই এত ভাল বাংলা বলছেন!

মুখখানি নীচু করিয়া সে শুধু একটু হাসিল।

এই সময়ে একজন ভদ্রলোক অপর একজনকে বলিলেন—রাজ্জান! তুমি একটা গান ধর! এই কথা বলিয়াই তিনি তবলায় চাঁটি দিতে লাগিলেন।

রাজ্জান্ বাবু হারমনিয়ম্ লইয়া গান ধরিলেন।

তাঁর গান শেষ হইলে, সকলে আমাকে গান গাহিবার জন্য ধরিলেন। আমি বলিলাম—আমাকে মাপ করুন!

যিনি বাংলা কথা বলিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—ও কথা শুনব না মশায়! আমি জানি, আপনি বেশ ভাল গাইতে পারেন।

তাঁর মুখের পানে চাহিয়া আমি বলিলাম—আপনাকে কে বল্লে?

—আপনার বন্ধু, প্রকাশ।

—প্রকাশকে আপনি কোথায় দেখলেন?

—কানপুরে! আমরা এক জায়গাতেই থাকি যে।

প্রকাশ আমার বাল্যবন্ধু! একই পাড়ায় বাস—কিন্তু অনেকদিন দেখা হয়নি তার সঙ্গে। শুনেছিলাম সেও আমারই মত ভাগ্যান্বেষণে দেশের বাহিরে আসিয়াছে!

ইহাদের পীড়াপীড়িতে আমাকে গান করিতে হইল। তাহারা আমার গান শুনিয়া খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিল।

এই সময়ে ভিতর হইতে সংবাদ আসিল—কর্ত্তা

ডাক্‌ছেন—এই আহ্বানে সকলে উঠিয়া গেলেন। আমি কিন্তু সেইখানে বসিয়া রহিলাম। তাহা দেখিয়া যিনি বাংলা বলিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—আপনি গেলেন না?

—না—আমি বাড়ী যাব!

—আপনার জন্যে যে সকলে অপেক্ষা করছেন! কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করবেন, চলুন!

—আমি বলিলাম—আর একদিন আসা যাবে!

আমার একখানি হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন—তাই কি হয়! আজ যে তিনি শুধু আপনার জন্যেই এই সব উদ্যোগ করেছেন! আসুন—আসুন!

আমার কোন আপত্তি না মানিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া অন্দরের দিকে লইয়া চলিলেন—সেখানে কতকগুলি নারী, তাদের ঘাগরা, ওড়নার মধ্য দিয়া মধুর কণ্ঠে গীত গাহিতেছিল—তাহা দেখিয়া আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, এখানে মেয়েদের মধ্যে কেন নিয়ে এলেন?

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—এঁদের হুকুমেই এনেছি!

বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম—সে কি! (মনে মনে বলিলাম)—এ দেশের কি সবই অদ্ভুত, বাবা! একজন মেয়েকে জল হ'তে তুলেছিলুম ব'লে—তাকে বিয়ে করবার জন্যে কি জুলুম! আবার গানের নেমন্তন্নে এসে—এই একদল নারীর আহ্বান!

আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—আসুন, কর্ত্তার ঘরে!

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যাহাকে দেখিলাম—তিনি আর কেহই নন্! সেই জমীদার লছ্‌মন সিং! গ্যাসের আলোয় তাঁহাকে চিনিতে আমার একটুও বিলম্ব হইল না।

লছমন্ সিং আমাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন—এস সুধীর!

তাঁর এই আত্মীয়তার ডাকে, আমি মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইলাম।

লছমন সিং বলিলেন—বাবা মদন! তুমি দেখ, সব তৈরী কি না! (আমার প্রতি ফিরিয়া বলিলেন) মদনের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে, সুধীর? আমার জামাই! বড় ভাল ছেলে—তোমাদের ভাষা ও বেশ ভাল জানে!

আমি বলিলাম—তা দেখলাম!

—আজ আর তোমাকে—আপনি-আজ্ঞে ব'ললাম না—বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট—আর আজ যখন জামাই হচ্চ!

তাঁর এই কথায় আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম—কি বল'ছেন?

সত্যি কথাই বলছি, বাবা! দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ থাকবে—এস, এইখানে বস!

আমি কিন্তু না বসিয়া, দাঁড়াইয়াই বলিলাম—বস্‌বার আর সময় নেই, রাত অনেক হ'য়েছে—এবার আমি বাসায় যাব!

এই সময়ে মদন আসিয়া বলিল—সব ঠিক্!

লছমন সিং বলিলেন, চল সুধীর!

—না, আমি আর কোথাও যাব না, এখন বাড়ীই চললাম! আমি ঘরের বাহিরে আসিতে পিছন হইতে মদন আমার কাঁধে একখানি হাত রাখিয়া বলিল—বন্ধু! দাঁড়াও! এ বাড়ী গোলক-ধাঁধা! প্রবেশ করা সহজ! মুস্কিল বা'র হওয়া।

—আমি ফিরিয়া বলিলাম—ওঃ, তাই বুঝি গেটের কাছে নাম দেখলাম চক্রব্যূহ!

একটু হাসিয়া সে মাথা নাড়িল।

তবে আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দিন্। আপনার নিশ্চয়ই সব চেনা, আপনি যখন এ বাড়ীর জামাই।

মৃদু হাসিয়া মদন বলিল—সেই সৌভাগ্যের জন্যেই ত, আজ আপনারও আগমন।

আমি বলিলাম, না ভাই, অত সুখ এ গরীবের সহ্য হবে না; এখন বাসায় গিয়ে লেপের মধ্যে শুতে পেলেই সৌভাগ্যটা বেশী মনে করব! দেন, দয়া ক'রে বাড়ী হতে বার ক'রে।

জিব্ কাটিয়া মদন হাসিতে হাসিতে বলিল—বার ক'রে দেব, কি মশাই! ও কথা আর বলবেন না! আপনি আজ আমাদের কত বড় অতিথি।

তার মুখভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া আমি বলিলাম—তবে না হয় সৎকারটাই করুন।

—কি যে সব বল্‌ছেন মশাই এই শুভদিনে—সৎকার নয়, সেবা! আমার সুন্দরী তরুণী শ্যালিকার দ্বারা এই নূতন অতিথিটির সেবা করা হ'বে—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

চাহিয়া দেখিলাম, চারিপাশ হইতে কতকগুলি কৌতূহলী নারীর দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। আমি বলিলাম—আঃ! মশায়, কি সব ঠাট্টা করছেন! চলুন, বাইরের রাস্তাটা দেখিয়ে দিন।

—আসুন, তবে আমার সঙ্গে! আজ হ'তে কিন্তু সম্বন্ধটা যা হচ্চে, তাতে তামাসা করায় বাধে না! বলিয়া মদন হাসিমুখে অগ্রসর হইল।

আমি তার পশ্চাতে চলিলাম।

একটি প্রশস্ত অঙ্গনে বড় বড় গ্যাসের আলোর মধ্যখানে একটি বেদী, তার চারিপাশ ঘিরিয়া চারটি কলাগাছ আর তার নীচে মৃন্ময় কলসের উপর আম্রশাখাসহ গোটা নারিকেল একটি করিয়া—সম্মুখেই এক আসনে এক ব্রাহ্মণ বসিয়া, তাঁর গায়ে তুলার জামার উপর একখানি নামাবলী, মুণ্ডিত মস্তকের উপর মস্ত বড় একটি শিখা।

সেই দিকে চাহিয়া আমি মদনকে বলিলাম, এ কোথায় নিয়ে এলেন?

সে বলিল, ঠিক্ জায়গায় এসেছি, মশাই! ঐ আসনটিতে গিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে পড়ুন দেখি!

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কেন, অনর্থক দেরী করাচ্ছেন, বলুন দেখি!

—একটুও না! এই এক্ষুনি কমলাকে নিয়ে আস্‌ছি! বলিয়াই সে হাসিমুখে ভিতরে চলিয়া গেল।

তার ব্যবহারে আমার মনে মনে রাগ হইল। রাস্তার অন্বেষণে চতুর্দ্দিক চাহিতেই দেখি লছ্‌মন—

—আমাকে বলিলেন—বস সুধীর, এই আসনে! আজ বিনা আড়ম্বরেই কমলার বিয়ে দিতে হচ্ছে, আমার বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে।

—আপনার ভাইঝির বিয়ে, আপনি ঘটা ক'রেই দিন বা চুপি চুপিই সারুন্ তাতে আমার কি! আমার সঙ্গে এমন প্রতারণা করবার কি দরকার ছিল? এই কথা বলিয়া আমি বিরক্ত মুখে সামনের দরজা দিয়া বাহির হইতেই, একটি ঘরের জানালা দিয়া দেখিতে পাইলাম, মদন, কমলা আর একটি নারী।

কমলা মদনকে বলিতেছে—আপনাদের এ ভয়ানক অন্যায়। কেন তাঁকে অনর্থক দুঃখু দিচ্ছে।।

তার কথা শুনিয়া আমি কৌতূহলী হইয়া আরও কিছু শুনিবার জন্য সেইখানে দাঁড়াইলাম।

মদন বলিল—এখন তাঁর কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু যখন আমার এই শালীটির নরম হাত দু'খানি হাতে পাবেন, তখন ঐ চাঁদমুখখানি দেখলেই সব কষ্ট নিমিষে ভুলে যাবেন!

অপর নারীটি এই কথায় হাসিয়া বলিল—উনি সত্যি কথাই বলেছেন, কমলা।

বিরক্তি কণ্ঠে কমলা বলিল, তুমি চুপ কর ত, দিদি!

মদন বলিল, আচ্ছা এখন এস। অনেকক্ষণ হ'তে ভদ্রলোক বলেছিলেন বড্ড দেরী হচ্ছে!

কমলা তার ম্লান মুখখানি মদনের প্রতি তুলিয়া বলিল —আমাকে মাপ করুন! জোর ক'রে একজনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার গলায় মালা দিতে আমি পারব না!

মদন বলিল—কিন্তু যেদিন তিনি তোমার হাত ধরেছেন, তোমাদের বংশের নিয়মানুসারে, সেদিন হতেই তুমি তাঁর স্ত্রী।

তা' আমি জানি! শুধু সেই জন্যেই তাঁকে দুঃখ দিতে আমি চাইনে! জ্যাঠামশায় ত বলেছেন, আমাকে সম্পত্তি দেবেন, কিন্তু তা' আমি চাইনে—শুধু এই বাড়ীর এক কোণায় যাতে আমি পড়ে থাকতে পাই, তাঁকে ব'লে তাই আপনি করিয়ে দিন।

এই সময়ে লছ্‌মন সিংহেরও গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—জানালার মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, দরজার মধ্যখানে দাঁড়াইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি বলিতেছেন—

—তা হয় না, কমলা! আমার কুলপ্রথা তোমার চেয়ে অনেক বড়।

সম্মুখে জ্যাঠাকে দেখিয়া, কমলা আর কোন কথা বলিতে পারিল না—সে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তিনি বলিলেন—আর দেরী ক'রো না, এস!

ইহারা ঘর হইতে বাহির হইবার আগেই আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম, কিন্তু ঘুরিয়া আবার সেই উঠানেই আসিয়া দাঁড়াইলাম। মনে মনে এত রাগ হইল, কি করিয়া যে এই চক্রব্যূহের বাহিরে যাইব, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিরক্তমুখে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

লছমন সিং আসিয়া বলিলেন—সুধীর! এস, বিয়ের সময় হ'য়েছে! তুমি ব্যস্ত হয়ো না, বিয়ের পর আমার গাড়ীতে তোমাকে বাসায় পাঠিয়ে দে'ব।

আমি তাঁর প্রতি ফিরিয়া ঝাঁঝের সহিত বলিলাম—আপনি যে ভেবেছেন, জোর ক'রে আমাকে বিয়ে দেবেন—তা হবে না।

গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন, তোমার সঙ্গে বেশী কথা বলবার আমার সময় নেই।

তিন চারিটি নারীর সহিত কমলাকে লইয়া মদন আসিয়া দাঁড়াইল।

পুরোহিত বলিলেন আসুন, আপনারা। বিয়ের লগ্ন ব'য়ে যাবে।

মদন আমার হাত ধরিয়া বলিল—চলুন, সুধীরবাবু!

আমি নিজের হাতটা ছিনাইয়া লইয়া, ক্রুদ্ধভাবে বলিলাম—ছাড়ুন! এ কি রকম জবরদস্তি!

নম্র গলায় মদন বলিল—কি করা যায়, বলুন। এঁদের বংশের এই নিয়মটা চিরদিনই, এঁরা মেনে আস্‌ছেন—তাই বিয়ের সময় ছেলে এসে প্রথমে কনে'র হাত ধরে।

আমি বলিলাম, ওঁদের কুলপ্রথা হ'তে পারে, কিন্তু আমার ত নয়। আমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে ক্ষত্রিয়ের মেয়েই বা বিয়ে করব কেন?

এই কথা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন, এ কথা ব'লে আপনি রেহাই পাবেন না—ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ জাতি, সকল জাতির কন্যাই সে গ্রহণ ক'রতে পারে।

আমি তাঁর প্রতি চাহিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের বংশে যা কখন হয়নি, তা আমি পারব না।

লছমন সিং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আর কথা কাটাকাটির আবশ্যক নেই।

আমি বলিলাম, তাতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু আপনারাই করাচ্ছেন। এমন ক'রে আমাকে বন্দী ক'রে না রেখে, রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই ত হয়।

মৃদুকণ্ঠে মদন বলিল—শ্বশুর মশায়কে রাগাবেন না, সুধীরবাবু! এতে আর আপনার কষ্ট কি? শুনেছি, আপনাদের ভাষাতে আছে—উপরোধে লোকে নাকি ঢেঁকি গেলে! আপনি না হয় বিয়েই করলেন।

বিরক্তি মুখে আমি বলিলাম, যান্ মশায়! এ সময়ে ঠাট্টা ভাল লাগ্‌ছে না।

—ঠাট্টা আমিও করছিনে। আপনি এঁদের অবস্থা বুঝতে পারছেন না। আপনি যদি আজ বিয়ে না করেন, তাহ'লে কমলাকে কি ভাবে থাক্‌তে হবে, জানেন?

—না।

—সমাজ পরিত্যক্তা পতিতার মতই।

—আশ্চর্য্য হইয়া আমি বলিলাম, কি বলছেন, আপনি!

—সত্যিই বলছি, বিশ্বাস করুন! এদের বংশের এই নিয়ম।

—এই এখনকার দিনেও? এ তুলে দিলেই ত হয়!

একটু হাসিয়া মদন বলিল—সে লছমন সিং বেঁচে থাক্‌তে নয়—আর বংশ-প্রথা, সংস্কার, এ সব কি কেউ ছাড়ব বললেই ছাড়তে পারে মশাই!

লছমন সিং বলিলেন—আয় কমলা! তাঁর নির্দ্দেশ মত কমলা নিকটে আসিল।

আমার প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন—কমলার হাত ধ'রে এই আসনে তুমি বস—আমি সম্প্রদান করব!

দৃঢ়স্বরে আমি বলিলাম—কখ্‌খন্ না—

আমার এই কথায় তাঁর দুটি চোখ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় চক্ষু আমার পানে স্থির করিয়া বলিলেন—এখনও না!

—আমি তেমনি দৃঢ়তার সহিত বলিলাম—নিশ্চয়ই!

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে লছমন সিং বলিলেন — ছত্রির প্রতিজ্ঞা তোমার জানা নেই বোধ হয়—এখনও রাজী হও, এই আমার শেষ কথায়!

আমি বলিলাম—কিছুতেই নয়!

মুহূর্ত্তে লছমন সিং, তাঁর জামার পকেট হইতে একটি

রিভলভার বাহির করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—উত্তর দাও, রাজী কিনা—তিন মিনিট সময়!

মুহূর্ত্তে মুখের অবগুণ্ঠন সরাইয়া কমলা তার জ্যাঠার পায়ের নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া দু'খানি হাত জোড় করিয়া বলিল - ওঁকে ছেড়ে দিন্! এর মূল আমি, আমাকে মেরে আপনার বংশমর্য্যাদা রক্ষা করুন! তাঁর দুটি চক্ষু হইতে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

লছমন সিং কমলার প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—ঠিক বলেছিস্—সেই ভাল! ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র বিনা রক্তে হাত হ'তে নামে না—আজ তোকে খুন করে, তোর খুনী এই সুধীরকে পুলিসে দেব!

আশ্চর্য্যে আমার মুখ হইতে বাহির হইল—আমি খুনী!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি! তোমারই জন্যে আজ আমার পুতুলীকে চিরদিনের জন্যে পৃথিবী হ'তে বিদেয় দিতে হচ্ছে! কিন্তু তোমাকে লছমন সিং সহজে ছাড়বে না। তাই তোমার শাস্তির ভার সরকারের হাতে দেব।

আমি রুক্ষকণ্ঠে বলিলাম—আপনি যে এতগুলি লোকের সামনে, নিজে খুন করছেন, সে কথা কি অপ্রকাশ থাকবে!

—হাঃ—হাঃ—হাঃ—করিয়া লছমন সিং এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন, যে তার হাসিতে আমি শিহরিয়া উঠিলাম!

জায়গীরদারের বাড়ীতে, আজ এ নূতন নয়! বুঝলে সুধীর! বলিয়াই কমলার প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন—কমলা! প্রস্তুত হ'!

আমি চাহিয়া দেখিলাম—কমলার চোখে আর জল নেই, মুখখানিতে এক স্বর্গীয় দীপ্তি! তার এই নির্ভীক সুষমামণ্ডিত মুখখানির প্রতি চাহিয়া বুঝিলাম—সত্যই এ ক্ষত্রিয়-কন্যা! যারা চিরদিন এমনি হাসিমুখে আগুনের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, বিষাক্ত তীরের সামনে এমনি করিয়াই তাদের কোমল বুকখানি পাতিয়া দিয়াছে! এই ত নারী! এরূপ স্ত্রীই ত পুরুষের কামনার! তখনি আমার মনের সকল দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া আমি লছমন সিংহের রিভল্ভার সমেত হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—থামুন! আমি রাজী!

এই সময়ে আমার স্ত্রী মাধবীর কণ্ঠ কাণে যাইতেই, চাহিয়া দেখি, আমার গায়ে ধাক্কা দিয়া সে বলিতেছে—বাপরে! এই সন্ধ্যেবেলা, চেয়ারে বসে কি ঘুম! কত ডাকৃছি—আজ কি খেতে দেতে হবে না?

আমি ক্ষণকাল তার প্রতি চাহিয়া থাকার পর বলিলাম—ওঃ, চল আস্ছি! মনে মনে বলিলাম এই একটি সন্ধ্যা জীবনে আমার চিরদিন স্মরণ থাকবে!

আশায়

শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

মন-আঙিনায় তব আল্‌পনা
আঁকিয়াছি আজি প্রিয়;
সাজায়ে রেখেছি পূজা-উপচার
এসো মোর বরণীয়!
হৃদয়-দেউলে করগো বসতি,
লুটায়ে পরাণ করিব আরতি,
আমার নীরবে গাঁথা এ মালিকা,
তোমার চরণে নিও—
মন-আঙিনায় তব আল্‌পনা
আঁকিয়াছি আজি প্রিয়!

দখিন হইতে মলয় পবন
আসিয়া লুটিছে পায়—
মধুর চাঁদের জ্যোছনা নীরবে
আজি উঁকি মেরে যায়;
এ-হেন মধুর ফাগুন নিশায়,
বসে আছি নাথ তোমার আশায়,
রেখেছি খুলিয়া হৃদয়-দুয়ার
চরণ-পরশ দিও—
মন-আঙিনায় তব আল্‌পনা
আঁকিয়াছি আজি প্রিয়!

দেবতার ধ্যানে মনস্তত্ত্ব ও কর্ম্মতত্ত্ব

সূর্য্যধ্যানে মনস্তত্ত্ব

ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ

সংক্ষেপে গণেশ ধ্যানে মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। এবার সূর্য্য-ধ্যানে মনস্তত্ত্ব ও কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

সূর্য্যের ধ্যান—

ওঁ রক্তাম্বুজাসনং অশেষ গুণৈক-সিন্ধুং ভানুং
সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্য-
মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং॥

(১) রক্তাম্বুজাসনং=রক্তবর্ণ কমলে আসীন। রক্ত অর্থে রাগ, ভালবাসা, ভক্তি বা প্রেম জানিতে হইবে। অম্বুজ অর্থে যাহা রসে জন্ম লাভ করে। অর্থাৎ ভালবাসা-রূপ রসে জন্মে, এরূপ আসনে যিনি আসীন, তিনিই রক্তাম্বুজাসনং। এ স্তরের মানুষ সর্ব্বদা প্রেমরসে বা ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

(২) অশেষগুণৈকসিন্ধুং—অনন্ত গুণের একটী সাগর। প্রেমিকের চরিত্র এমন মধুর ও কোমল উপাদানে নিয়মিত যে, কোনও প্রকার দোষ এঁদের চরিত্রে আরোপ করা যায় না।

(৩) ভানুং—সূর্য্য। প্রকাশ-সম্পন্ন পুরুষ অর্থাৎ শিক্ষিত লোক।

(৪) সমস্ত জগতামধিপং—সমস্ত জগতের অধীশ্বর। অর্থাৎ জগৎ পূজ্য মহাপুরুষ। এ স্তরের বিকাশ-সম্পন্নগণ বিদ্যা ও প্রতিভাবলে সমস্ত পৃথিবীতে শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হন। 'যশোভাগ্য' বলিয়া লোকের মধ্যে একটা প্রচলিত কথা আছে। এ স্তরের বিকাশসম্পন্নগণ ঐ ভাগ্যের জন্মগত অধিকারী। ইহা শিক্ষার স্তর, মানব-সমাজে যে শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহা এ স্তরে কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা। 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে'। ইহারা নিজেদের প্রতিভাবলে জগৎপূজ্য হন। ইহা জগদ্গুরুর স্তর। এ স্তরের মানুষই জগদ্গুরু হন।

(৫) ভজামি—ভজনা করি। বিস্তারিত বিষ্ণুধ্যানে 'ধ্যায়েৎ' ব্যাখ্যায় বলা হইবে।

সূর্য্যধ্যানের এই অংশ সূর্য্যস্তবের জ্ঞানীদের চরিত্রের লক্ষণ। এ স্তরের কর্ম্মি-চরিত্রের লক্ষণ ধ্যানের অবশিষ্ট অংশে প্রস্ফুটিত হইয়াছে; এই স্তরের জ্ঞানিগণকে ভক্ত আখ্যা দেওয়া যায়। এ স্তরের অনুভূতিতে ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায় 'ভগবান বিশ্ব-সংসার জুড়িয়া অবস্থিত। তিনি লীলাময়'। তিনি লীলারূপে আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিচরণ করিতেছেন। কাজেই সাধকের দৃষ্টিতে এই লীলাজগৎ খুব মধুময় দেখায়। এ স্তরের জ্ঞানিগণকে দেখিতে খুব প্রেমিক ও সুন্দর দেখায়। ইহাদের চরিত্র ও গণেশস্তরের জ্ঞানীর চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বিপরীত বলিয়া মনে হইবে। ইহারা ভক্তসঙ্গে ভগবান ও মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিয়া আনন্দ পান। গণেশ-স্তরের জ্ঞানিগণ কাহারও সঙ্গে বেশী মিলামিশা ভালবাসেন না; তাঁহারা ঈশ্বর ভগবান ও ভক্তের গুণগান অপেক্ষা যোগ-ধ্যান ও ত্যাগনিষ্ঠ হইয়া আত্মোন্নতির কাজে বেশী নিষ্ঠা-সম্পন্ন হন।

পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈঃ=দুইটী পদ্ম বর হস্তে ধারণ করিয়াছেন। এ স্তরের কর্ম্মীদের কর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য কিরূপ, তাহা এখানে ব্যক্ত হইয়াছে। ইনি দুই হাতে দুইটী পদ্ম লইয়াছেন; স্বপক্ষে অপক্ষে অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তে ও বাম হস্তে শান্তির প্রচার করেন। ইঁহারা কঠোর শাসন ভালবাসেন না। ইঁহারা প্রেমের শাসনের পক্ষ-পাতী হন। অহিংসা, প্রেম-ভালবাসা দেখাইয়া ইঁহারা সবটা পৃথিবীকে বশ করিতে চান। ইঁহাদের এইরূপ কর্ম্ম-কৌশলে পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত সমাজই ইঁহাদের উপর শ্রদ্ধাযুক্ত হন; কিন্তু আসুরিক বিকাশ-সম্পন্নগণ (বিষ্ণুচরিত্রবিশ্লেষণে বিস্তারিত বলা হইবে) ইঁহাদের এই দুর্ব্বলতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া এই স্তরের কর্ম্মনীতিতে

বিশ্বাসবান্ সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। কাজেই রাজনীতি ও সমাজনীতিতে এই স্তরের কর্ম্ম-বিজ্ঞান একটা সমাজের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই বেশী হইয়া থাকে। বর ও অভয় অন্য দুইটী হস্তে রহিয়াছে। বর অর্থে আশীর্ব্বাদ, অভয় অর্থে অন্যায়কারীকে স্নেহদান বা ক্ষমা জানিতে হইবে। এ স্তরের কর্ম্মনীতিবান্‌গণের নিকট যত ইচ্ছা অত্যাচার অনাচার কর, যখন তুমি দেখিলে এবার ভীষণ বিপদ্, তখন চালাকী করিয়াও ক্ষমা চাহিয়া দেখ, সেই ক্ষমা চাওয়ায় তোমার কত সুবিধা হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাইবে। আসুরিক বিকাশসম্পন্নগণ এই স্তরের কর্ম্ম-নীতির নিকট এই ভাবেই নিজের প্রতিষ্ঠা জমাইয়া এ স্তরের নীতিতে বিশ্বাসবাদিগণের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। বর ও অভয় গুরু-চরিত্রের ভূষণ। ইহা শিক্ষাগুরুর স্তর; তাই এ স্তরের কর্ম্মনীতিকে শিক্ষা-বিভাগে মাত্র প্রয়োগ করা উচিত। সমাজ-বিভাগে (বিষ্ণু-স্তর দেখুন) ইহা প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত ভুল হইবে।

এ স্তরের কর্ম্মনীতি এইরূপ দুই পক্ষে শান্তিপ্রচারের অনুকূল হইবার দরুণ এই স্তরের কর্ম্মনীতি আসুরিক কর্ম্মনীতির প্রকারান্তরে সমর্থক হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বেশী কিছু মন্তব্য করিতে গেলে, আমাদিগকে অনেক বড় লোকের বিরাগভাজন হইতে হইবে। ইহার কারণ— বর্ত্তমান ভারত রাষ্ট্রীয় নীতিতে এ স্তরের কর্ম্মনীতিকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

মাণিক্যমৌলিং = মাথায় মাণিক্যের মুকুট। জ্ঞানে রাজার মত পূজ্য। এ স্তরের কর্ম্মীরা রাজসম্মান লাভ করেন, ইহাদের বিপক্ষস্থিত আসুরিকগণও ইহাদের প্রশংসা করেন (মতলবের সুবিধার জন্য); কিন্তু কোন সমাজ যদি ইহাদের আদর্শে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে নাচানাচি করে, তবে সেই সমাজ শীঘ্রই ইহার ফল পাইবে।

অরুণাঙ্গরুচিং = অঙ্গের জ্যোতিঃ অরুণ-বর্ণ। খুব স্নেহমাখা ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহার; যে নিকটে আসে, সে-ই মজে। অঙ্গ হইতে যেন প্রেমের জ্যোতিঃ বহিয়া চলিয়াছে।

ত্রিনেত্রং = তিনটি চক্ষুঃ। ইহাদের স্নেহ দৃষ্টির এক দিক্—ইহারা আশাবাদী ও বিশ্বাসবাদী। ইহারা যাহাই করুন, ফলে ইহাদের অসীম বিশ্বাস। ইহারা ভগবানেও অসীম বিশ্বাস রাখেন, সত্যেও ইহাদের অসীম বিশ্বাস। ইহাদের আর দুই দিক্—শত্রু ও মিত্র পক্ষ। ইহারা অন্যায় করিয়াও ভাল চান, হৃদয়ের পরিবর্ত্তন চান, ন্যায় পক্ষেরও ভাল চান—সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চান যে, অন্যায়-পক্ষ ন্যায়-পক্ষের সহিত সদ্ব্যবহার করুন। ইহারা বিশ্বাসবাদী, তাই দেবতা ও অসুরকে এক পাত্রে জল খাওয়াইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

গণেশ-স্তরের মানুষ কঠোর-হৃদয়; সূর্য্যস্তরের মানুষ কোমল-হৃদয়। গণেশ নাস্তিকবাদী; সূর্য্য বিশ্বাসবাদী ও ভক্ত। গণেশ গোপনে গোপনে একটী একটী করিয়া আসুরিকতার বিরুদ্ধে মানুষের চরিত্র গঠন করেন; সূর্য্য প্রকাশ্যে আসুরিকতার বিরুদ্ধে প্রচার মাত্র করেন। গণেশ আসুরিকতাকে কখনও বিশ্বাস করেন না; কিন্তু সূর্য্য যদি দেখিতে পান, যে আসুরিক শক্তি শপথ-বাক্যে আশা দিয়াছে, অমনি বিশ্বাস করেন। গণেশ আবিষ্কার করেন; সূর্য্য প্রচার করেন। গণেশ চান—সমাজটাকে নাস্তিক করিয়া গড়িয়া তুলিব; সূর্য্য চান—সমাজকে আস্তিক প্রস্তুত করিব। দুই জনের কর্ম্মধারা দুই রকম।

শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, উকিল, মোক্তার, রাজদূত, পত্রসেবী, কবি, গ্রন্থকার, ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারী, রেলওয়ে কর্ম্মচারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ স্তরের বিকাশ-সম্পন্ন লোক বেশী পাওয়া যাইবে।

এ স্তরের দর্শন—ভগবান লীলাময়, তাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত হইয়াছে ও হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন গাছের পাতাটীও নড়ে না। তিনি কোনও যুগে একা ছিলেন। লীলা করিবার জন্য তিনি বহু হইয়াছেন। তিনি তাঁহার এই লীলা-রূপ কখনও ত্যাগ করিবেন না। ইহাদের দার্শনিক দৃষ্টির নিকট যুক্তির স্থান অপেক্ষা বিশ্বাসই প্রবল।

আমাদের সমাজে প্রচলিত ভক্তিবাদ সম্বন্ধে দুইখানি সুন্দর আধুনিক গ্রন্থ খুব প্রচলিত। ইহার মধ্যে একখানা 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও অন্যখানা তুলসী দাসী 'রামায়ণ'। সূর্য্যস্তরের দার্শনিক ভিত্তিকে অবলম্বনে চৈতন্য

গ্রন্থ রচিত। তুলসীদাসী রামায়ণ বিষ্ণু-স্তরের (পরে বলা যাইতেছে) অনুভূতির উপর স্থাপিত। সূর্য্যস্তরের ভগবান নিত্য লীলাময়, এঁর লীলার শেষ নাই, ভক্ত তাঁহার লীলারস যুগ যুগান্তর ধরিয়া আস্বাদন করিবেন। তুলসীদাসজীর ভগবান নিত্য লীলাময় নহেন। তিনি একা ছিলেন, বহু হইয়াছেন; আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি একও হইতে পারেন।

এ স্তরের কর্ম্মনীতি কখনও স্বাধীনতার আশা করিতে পারে না। এ স্তরের কর্ম্মনীতিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিকগণ মুখে যত বড় কথাই বলুন, অধীনতা হইতে উন্নত কোন ধারণা ইঁহারা কখনও অন্তরে পোষণ করেন না। ইঁহারা অধীন থাকা ভিন্ন অন্য কোন কিছু স্থাপনা করিবার শক্তি সমাজকে দিতেও সক্ষম নহেন। চলিত কথায় যাহাকে "নিয়মতান্ত্রিকতা" বলে, এ স্তরের কর্ম্মনীতির শেষ লক্ষ্য ইহা হইতে উন্নত হইতে পারে না। এ স্তরের কর্ম্মনীতিতে প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ যখন পূর্ণ স্বাধীনতার কথা মুখে বলে, তখন কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ উহাকে কি মনে করেন, তাহা কেবল তাঁহারাই জানেন।

(আমাদের দেওয়া মনস্তত্ত্ব ও কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন সমালোচনা করিবার থাকিলে, উহা এই "প্রবর্ত্তক" মারফৎ করিবেন। আমরা উহার যথাসম্ভব উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।)—লেখক

প্রাচীন বাঙালার বয়ন-শিল্প ও বাণিজ্য

শ্রীশচন্দ্র গুহ বি-এল

প্রাচীনত্ব

এ দেশের বস্ত্রবয়ন শিল্প কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বহু সহস্র সহস্র পূর্ব্বেও যে ভারতের বয়ন-শিল্প প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙালার বয়ন-শিল্পের ইতিহাস বাঙালার চিত্তচমৎকারী কর্ম্মশক্তি ও কৃতিত্বের ইতিহাস। খৃঃ পূঃ ৩০০০ কি ততোধিক পূর্ব্বে ঋগ্বেদে (১।১০৫।৮)—

মূষোন শিশ্নাব্যদন্তি মাধ্যঃ

স্তোতারং তে শতক্রতোবিত্তং মে অস্য বোদসি।

অর্থাৎ মূষিক যেমন সূত্র কাটিয়া ফেলে, সেইরূপ হে শতক্রতো, দুঃখ আমাকে দংশন করিতেছে। ভাষ্যকার সায়ন ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, তন্তুবায়গণ বস্ত্রবয়নে সূতায় ভাতের মণ্ড দেয়। মূষিকেরা তাহা খাইতে বড় ভালবাসে।

হণ্টার (Hunter) সাহেব ("Imperial Gazetter" Vol III P. 195) বলেন—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে ভারতে বয়নশিল্পের উৎকর্ষ ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরের কবরে মমির (Mummy) গায়ে ভারতের মস্‌লিনাবরণ পাওয়া যায়। ("Industrial Commission. Report", P. 295)।

খৃঃ পূঃ ৯২৬ বৎসর পূর্ব্বে হোমার (Homer) যে Siden বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সিন্ধু দেশের বস্ত্রের নামান্তর মাত্র। (Birdwood's "Industrial Arts of India" P. 263-264).

খৃঃ পূঃ ৪৮৪ বৎসর পূর্ব্বে হেরোডোটাস্ (Herodotus) নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন, "ভারতে এক রকম বৃক্ষ আছে, তাহার ফল হইতে এক রকম (wool) উল পাওয়া যায়, তাহাতে কাপড় প্রস্তুত করিয়া ভারতবাসীরা পরিধান করে (Murphy's "Textile Industry")। ইহা দ্বারা কার্পাস বস্ত্রই বুঝা যাইতেছে। ৩২১ খৃঃ পূঃ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পৌণ্ড্র দেশের (বাঙালার) "দুকূল" বস্ত্রের উল্লেখ আছে। "দুকূল" রেশমী সূত্রে নির্ম্মিত হইলেও, কার্পাস-বস্ত্র-বয়ন প্রচলিত ছিল, তাহা সুনিশ্চিত

৩২০-৩৮৭ খৃঃ পূঃ থিও ফ্রেষ্টাস্ (Theo Phrastus) কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; বৃক্ষের কোষ হইতে এক প্রকার উল (wool) হয়, তাহাতে ভারতবাসীরা সুলভ মূল্যে পরিধেয় প্রস্তুত করে (Murphy's "Textile Industry")। ২৩-৭৯ খৃঃ পূঃ (Pliny) প্লিনির বিবরণ (যাহা পরে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইবে) হইতে জানা যায় যে, রোমে ভারতের মস্‌লিনের আমদানীর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন তিনি চালাইয়াছিলেন। ১৪ খৃঃ পূঃ Arrian আরিয়ানের বিবরণ হইতে জানা যায়, তাঁহার সময়ে "গাঙ্গেটেকী" ("Gangeteke of Bengal" Murphys "Tex. Indus.") নামক বস্ত্র বিলাতে প্রচলিত ছিল। এ "গঙ্গেটেকী" মস্‌লিন বিশেষ।

মনুসংহিতায় বহুস্থানে কার্পাসবস্ত্রের উল্লেখ আছে। ভারতের নানা স্থানে বস্ত্রবয়নকার্য্য চলিলেও, বাঙালাই যে প্রাচীন যুগে বয়নশিল্পে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে নিঃসংশয়ে জানা যায়। জল, বায়ু, সমুদ্রসান্নিধ্য ও বাঙালার তাৎকালীন বহু বন্দর বয়ন-শিল্প-প্রসারের সবিশেষ অনুকূল ছিল।

কার্পাসের এক নাম ছিল "সমুদ্রান্তা" ("তুণ্ডকেরী সমুদ্রান্তা কার্পাসী বদরেতি চ" অমরকোষ)। এখনও ভাল কার্পাস সমুদ্রোপকূলে ও দ্বীপে ও বৃহৎ নদীর তীরে জন্মে। Sea-Island কার্পাসই উৎকৃষ্ট।

প্রাচীন বঙ্গদেশের সমুদ্রোপান্তে উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষ ছিল। বাঙালার কোন্ কোন্ স্থানে কার্পাস জন্মিত, তাহার বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাইবে।

বাঙালার বয়নশিল্পের সমৃদ্ধির যুগ

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। একদিন যে এই বাঙালীর পূর্ব্বপুরুষগণ চরকা ও তাঁতের ভিতর দিয়া তাঁহাদের অসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন—তাঁত ও চরকা যে বাঙালাকে একদিন প্রকৃতই "সোণার বাঙালা" করিয়া তুলিয়াছিল, একদিন যে বাঙালার বয়ন-শিল্পজাত কার্পাস রেশমী বস্ত্রের একটা বড় রকমের ব্যবসা-বাণিজ্য দেশে বিদেশে, সুদূর মিশর, আরব, রোম পর্য্যন্ত, অন্যদিকেও চীন, মালয়, যাভা, সিংহল প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা আজ আত্মশক্তিতে নষ্টপ্রত্যয়, হৃতগৌরব, কর্ম্মোদাসী বাঙালী ধারণাও করিতে পারে না। সে অপূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি সমসাময়িক প্রত্যক্ষকারীদের বর্ণনায় জীবন্ত না থাকিলে, তাহা সর্ব্বসংহারী মহাকালের করাল কবলে চিরদিনের জন্য লুপ্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

যোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের অধিবাসীরা কেহ বা পর্য্যটকভাবে, কেহ বা বাণিজ্য ও ধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন অনেকেই পর্ত্তুগাল, হলণ্ড, ফরাসী ও ইংলণ্ড দেশবাসী। তাঁহারা নিজ নিজ ভাষায় তাঁহাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে তাঁহাদের লিখিত বৃত্তান্ত ইংরাজি ও বাঙালা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাহাতে বাঙালার প্রাচীন শিল্প-বাণিজ্য-সম্প্রসারের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল পরিচ্ছেদ উন্মুক্ত হইয়াছে।

(১) খৃঃ প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিদেশী ইতিহাস-গ্রন্থের নাম "Periplus of the Erythrean Sea"—তাহাতে আছে, গাঙ্গেয় প্রদেশের বন্দর হইতে বিলাতে রপ্তানী হইত spikenard (সুগন্ধি উদ্ভিজ্জ) ও প্রচুর পরিমাণে পূর্ব্বোল্লিখিত বাঙালার 'গাঙ্গেটেকী' নামক মস্‌লিন্ (Mac. Crindle's "Periplus" P. 148).

(২) ১৪৯৮ খৃঃ ভাস্কো-ডি-গামা (Vasco de Gama) সর্ব্বপ্রথম ইউরোপ (পর্ত্তুগাল) হইতে সমুদ্রপথে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে আগমন করেন। তিনি তখন বাঙালা হইতে প্রচুর মূল্যবান্ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বাঙালা হইতে ২২ শিলিং দরে কাপড় কিনিয়া কালিকাটে (Calicut) বিদেশী বণিক্‌দের নিকট ৯০ শিলিং দরে বিক্রয় করিত (Compo's "Portugese in Bengal" P. 25)

(৩) ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আসিয়াছিলেন পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক ভারথেমা (Verthema) তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায়—প্রতি বৎসর বাঙালা হইতে পঞ্চাশখানা

জাহাজ বোঝাই কার্পাস ও রেশম বস্ত্র তুরস্ক, পারস্য, সিরিয়া, আরব ও আফ্রিকা দেশে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চালান হইত (সমসাময়িক ভারত—১৯ খণ্ড ১৫ পৃঃ)।

(৪) সিজার - ডি - ফ্রেডারিক (Cæsav-de-Frederici) ১৫৬৭ খৃঃ চট্টগ্রামের বন্দরে ১৮খানা জাহাজ নোঙ্গর করা দেখেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—ঐ সব জাহাজে যে সব পণ্যদ্রব্য বিদেশে চালান হইত, তার অধিকাংশই ছিল কার্পাস ও চাউল ("Purcha—His Pilgrimage" Vol. X. P. 138).

(৫) রালফ্ ফিচ (Ralph Fitch) ইংলণ্ডের তাৎকালীন রাণী (Elizabeth) এলিজাবাথের দৌত্য-কার্য্যোপলক্ষে চীনে যাওয়ার পথে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি ১৫৮৮ খৃঃ বার ভুঞার বিখ্যাত ইসা খাঁর রাজধানী সোণারগাঁও বন্দরে ও কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর বন্দরে ও কন্দর্পনারায়ণের রাজধানী বাকলা বন্দরে জাহাজে গিয়াছিলেন। ঐ সব বন্দরে তিনি কার্পাস বস্ত্রের রপ্তানী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লেখা আছে—সোণারগাঁতে তৎকালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্‌লিন ও অন্যান্য কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত। তিনি দেখিয়াছিলেন—সেই সময়ে সোণারগাঁও হইতে বাঙালার কার্পাস বস্ত্র ভারতের নানাস্থানে এবং ভারতের বাহিরে সিংহলে, পেগুতে, মালক্কা প্রভৃতি স্থানে চালান হইত। এখনও সোণারগাঁও পরগণাতেই ঢাকাই উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়।

(৬) পাইবার্ড (Pyvard) ভারতের নানা স্থানে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙালায় আসিয়াছিলেন ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি বাঙালায় রেশমের মত এক-প্রকার উদ্ভিজ্জ সূতার সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবসা দেখিতে পান। ঐ বস্ত্র এমন উজ্জ্বল ও সুন্দর ছিল যে, রেশমের বস্ত্রের মতই লোকেরা তাহার আদর করিত। এই বস্ত্রই বোধহয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রোল্লিখিত বাঙালার প্রসিদ্ধ বাকলের কাপড়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-সম্মেলনের বর্দ্ধমান অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে বাঙালার পঞ্চবিংশতি গৌরবের মধ্যে বাঙালার "দুকুল" বাঙালার একটী গৌরব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তিনি "দুকুল" বহু মূল্যে মণিরত্নের মত রাজকোষে অতি যত্নে রক্ষা করার বিধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাইবার্ড বলেন, তাঁহার সময়ে আফ্রিকা হইতে চীন পর্য্যন্ত সমস্ত নর-নারীর আপাদ-মস্তক (from head to foot) বস্ত্রাবরণ যোগাইত ভারতের তাঁত। (Compo's "Portugese in Bengal" P. 117 ও Moreland's "India at the death of Akbar" P. 198)।

আমরা ভারতের তাঁত-চরকায় এখন সম্পূর্ণ আস্থাহীন।

(৭) মানরিক (Manrique) নামক বিখ্যাত ফরাসী ডাক্তার বাদ্‌সা সাজাহানের দরবারে দীর্ঘকাল ছিলেন। তিনি তাৎকালীন বাঙালার রাজধানী ঢাকাতে ১৬৬০ খৃঃ আসিয়াছিলেন। ঢাকাতে তিনি প্রচুর পরিমাণে সূতার ও রেশমী বস্ত্রের ব্যবসা দেখিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে ঐসব বস্ত্র ইয়োরোপে ও ভারতের বাহিরে নানাস্থানে চালান হইতে তিনি দেখিয়াছিলেন ("Storia de Magor" Vol. VI. P. 429).

(৮) টেভার্ণিয়ার (Taverneer) ১৬৬৬ খৃঃ তাঁহার বিখ্যাত ভারতভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, বাঙালা হইতে কসিদা জড়িদার রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র ফরাসী প্রভেন্‌জ (Provence), Languedoc (লাঙ্গুইডক) ও ইতালী দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইতে তিনি দেখিয়াছেন।

(১০) ১৬৬৮ খৃঃ ২৪ জানুয়ারী তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতস্থ ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর ঢাকার রেসিডেণ্টকে চিঠি দিয়া জানাইয়াছিলেন যে, ঢাকার খাসা মস্‌লিন বিলাতে এত পরিমাণে রপ্তানী হইত যে, ঢাকাতে প্রেরিত বিলাতী মালের মূল্য-বিনিময়ে বিক্রীত মস্‌লিনের মূল্যের টাকা আদানপ্রদান করা চলিত না। ঐ মস্‌লিনের উদ্বৃত্ত মূল্যের দরুণ বিলাত হইতে নগদ টাকা পাঠাইতে হইত।

(১১) সুরাটের বিদেশী বণিকেরা ঢাকার মস্‌লিন এত বহুল পরিমাণে বিদেশে চালান দিত যে, নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে ঐসব মালের মূল্যের টাকা বিদেশী

মালের মূল্য দ্বারা পরিশোধিত না হওয়াতে ঢাকাতে তৎকালে আরকট মুদ্রার প্রচলন ছিল (Bradlybirt's "Dacca" P. 116)

(১২) এক সময়ে ঢাকার মস্‌লিন বস্ত্র রোমের ধনী বিলাসিনীদের এমন সখের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, আড়াই লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩৭ কোটী টাকার মস্‌লিন কেবল রোমেই বিক্রীত হইত ("Commerce and statistics of India"—Wadia P. 10) এই ভাবে রোমের ঐ অর্থের ভারতে আগমন নিবারণ জন্য Pliny Elder রোমে মস্‌লিন-বিক্রয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ("Indian Industrial Commissioners' Report" P. 295).

(১৩) স্বনামখ্যাত কটন (Cotton) সাহেব ১৮৯০ সনে লিখিয়াছিলেন যে, এক শতাব্দীকাল পূর্ব্বেও ঢাকা হইতে প্রেরিত বস্ত্রের মূল্য ছিল এককোটী টাকা। তখন ঢাকা জিলার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ২ লক্ষ। ঢাকা হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দেও ৩০ লক্ষ টাকার মস্‌লিন কেবল ইংলণ্ডেই চালান হইয়াছিল ("Industrial Commissioners Report P. 291).

সুতরাং ঢাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ের সমগ্র আয় ধরিয়া দেখা যায়, কেবল বস্ত্র-ব্যবসায় দ্বারাই ঢাকাবাসীরা সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারিত।

এই বয়নশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে যে সব আনুসঙ্গিক কৃষি-শিল্পাদির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে।

ঢাকার বস্ত্রব্যবসার সুদিনে ঢাকাতে নানা স্থান হইতে বণিকেরা ব্যবসার জন্য আসিত। কোম্পানীর আমলের বিবরণে জানা যায়—১৮২৩-২৪ খৃঃ ঢাকা হইতে ১৪ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার মোটা কাপড় রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৭৫ সালে সর্ব্বরকম ৫০ লক্ষ টাকার তাঁতের কাপড় ঢাকা হইতে চালান হইয়াছিল ("Good old days of John Company" Vol. II P. 432)

(১৩) Bolt's "Consideration of Indian Alfairs" (p. 200) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বাঙালার সুদিনের বিবরণ এখন স্বপ্নবৎ বোধ হয়। বিবরণটী এই—বাঙালার বস্ত্র ও তুলার ব্যবসা উপলক্ষ করিয়া এককালে বাঙালাতে ভারতের ও ভারতের বাহিরের নানা স্থান হইতে বহু ব্যবসায়ীর সমাগম হইত। পাঠান, মুলতানী, শ্যামদেশীয়, শিখ, বেলুচী বণিকেরা দলে দলে অশ্ব ও বলদের বহর লইয়া আসিয়া বাঙালার শিল্প-দ্রব্য লইয়া যাইত। বাঙালার এই স্থলপথে চলিত ব্যবসার আয় সমুদ্রবাহী পণ্যের আয় অপেক্ষা কম ছিল না।

(১৪) স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতের আর্থিক দুর্গতির আলোচনায় লিখিয়াছেন যে, সমস্ত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চারি বৎসরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১৫ হাজার বেল (৭৫ হাজার মণ) কার্পাস বস্ত্র এক কলিকাতা বন্দর হইতেই চালান হইয়াছিল। তার পর ১৮১৩ সন হইতে রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়।

ঢাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ের সুদিনে পল্লী হইতে বহু লোক সহরে আসিয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ের সংস্রবে বসবাস করিত। ঐ সময়ে ঢাকার রাস্তা, গল্লি, বাজার, বন্দর লোকে লোকারণ্য ছিল। ঢাকা তখন উপকণ্ঠ বর্ত্তমান টঙ্গী পর্য্যন্ত ১৪ মাইল বিস্তৃত ছিল বলিয়া প্রকাশ। ঢাকাতে ঐ সময়ে ৯ লক্ষ লোকের বসতি ছিল এবং প্রবাদ আছে ঢাকার তখন ছিল ৫২ হাজার গল্লি ৫৬ হাজার বাজার ("Bradlybirt's Dacca" p. 180)।

ভারতের শিল্পবাণিজ্যের সুদিনে ঢাকার মতই ভারতের ব্যবসার কেন্দ্রগুলি বিপুল শ্রমিক ও ব্যবসায়ী সঙ্ঘের বিশাল কর্ম্মভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। তখনকার ভারতের (Industrial towns) বাণিজ্যসহরগুলি যে কত বড় ছিল, তাহা ঐ সব নিরপেক্ষ বিদেশীদের বর্ণনা-পাঠে জানিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তার সংক্ষেপে উল্লেখ করার আগ্রহ তাই সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

Jourdin বলেন—পৃথিবীর মধ্যে বড় সহরের একটী ছিল আগ্রা। Ralph Fitch বলিয়াছেন—আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রী প্রত্যেকটীই লণ্ডনের মত বড় ছিল। Debarros বলেন—গৌড় ৯ মাইল বিস্তৃত ছিল, ২ লক্ষ লোক ছিল তার অধিবাসী, রাজপথে জনতা এত বড় হইত যে, লোক-চলাচলের পক্ষে কঠিন হইত।

Clive মুরশিদাবাদকে তাৎকালীন লণ্ডনের মত বড় দেখিয়াছিলেন। Bernier বলেন—প্যারিসের তুলনায় দিল্লী ছোট ছিল না। তিনি বলেন—আগ্রাও তাঁর সময়ে দিল্লীর মত সুবৃহৎ ছিল। Coryat বলেন—লাহোর এক কালে Constantinople নগরের সমান ছিল। Paes বলেন—বিজয়নগর প্রাচীন যুগে রোমের সমকক্ষ ছিল।

প্রাচীন বাঙালার অতীত বয়নশিল্পের কথা ভাবিতে গেলে, অজ্ঞাতে আমাদের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মাত্র বাহির হইয়া যায়।

ধূলোখেলা

(গল্প)

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

শুক্লপক্ষের রাত্রি। চাঁদের আলোতে পৃথিবী ভরিয়া গেছে। গহন বনের ফাঁকে ফাঁকে আলোর ফুল ফুটিয়াছে যেন।

ভিন্ গাঁয়ের আশু ডাক্তারের নিকট হইতে ওষুধ লইয়া বৃদ্ধ গোবিন্দ গাঙ্গুলী সঙ্কীর্ণ এক বনের পথ ধরিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। বাড়ী বলিতে শুধু একখানি ঘর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ছোট্ট একটুকরা ভিটায় ঐ একখানি ঘরই ছিল তাহার পক্ষে যথেষ্ট। সংসারে কেবল সে, তার প্রৌঢ়া স্ত্রী ও সদ্যপ্রসূতা একটী গাভী। এই নিয়াই তাহার ঘর-সংসার।

শুনা যায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলীর অবস্থা পূর্ব্বে এমন ছিল না। তাহার কিছু জমাজমি, একটি সাধারণ ধরণের বাড়ী এবং সর্ব্বোপরি একটি পুত্ররত্ন ছিল। কিন্তু একসঙ্গে সবই গিয়াছে। সে বছর পাঁচেক আগেকার কথা।

রাখাল তাহার বেশ ডাগর হইয়াছিল। লেখাপড়া হইতে খেলাধূলায় তাহার উৎসাহ ছিল বেশী। এ পাড়ার, ও পাড়ার ছেলেদিগকে লইয়া সে একটি দল গঠন করিয়াছিল। দলের কে সেক্রেটারী হইবে তাহা লইয়া একদিন গণ্ডগোল বাধিল। তাহাদের মতে দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিতে একমাত্র সেক্রেটারীকেই বুঝাইত। কারণ এই ইংরাজী শব্দের অর্থ কেহই জানিত না।

বেশী ভোট পাইয়াছিল রাখাল। কিন্তু তালুকদারের ছেলে রতন বাঁকিয়া বসিল—সে এই বিরাট্ সেক্রেটারী উপাধি লাভ করিবে। ক্রমে গালাগালি—তারপর হাতাহাতির সৃষ্টি হইল। রতন মিঠাই-মণ্ডার লোভ দেখাইয়া সমস্ত ছেলেগুলিকে নিজের পক্ষে টানিয়া আনিল।

সেদিন রাখাল দারুণ মার খাইয়া অতিকষ্টে বাড়ী আসিয়াছিল। সেই রাত্রেই তাহার জ্বর একশ-পাঁচ ডিগ্রি উঠিয়াছিল। গা-ব্যথায়ও সে কষ্ট পাইয়াছিল খুব বেশী।

তিন দিনের দিন সকালে রাখালের মৃত্যু হইল। গোবিন্দ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্ত্রী কুন্দা তখন পুত্রশোকে সম্বিতহারা।

প্রতিশোধ লইবার জন্য গোবিন্দ গাঙ্গুলী অবশ্য তালুকদারের বিরুদ্ধে কাছারিতে নালিশ করিয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে শেষ পর্য্যন্ত কুলাইয়া উঠিতে পারে নাই। মধ্য হইতে জমাজমিগুলি এবং বাড়ীটাও হাতছাড়া হইয়াছিল।

সেই পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ গোবিন্দের দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল বোধ হয়। লতাপাতার ছায়ায় সঙ্কীর্ণ বনের পথটি স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইতেছিল না। সে হুঁসিয়ার হইয়া চলিতে লাগিল।

জঙ্গলটা ছাড়াইলেই একটা ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠটা পার হইয়া একটা ভিটার সম্মুখে আসিয়া গোবিন্দ দাঁড়াইল। সেখানে একটি মাত্র দোচালা ঘর। রূপালী জ্যোৎস্না নিস্তব্ধতার সহিত মিশিয়া কেমন একটা বিভীষিকার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। চারিধারে কোন লোকের সাড়াশব্দ নাই, একটি ঝিল্লী পোকাও

ডাকিতেছে না ;—কেমন জানি থম্‌থমে আবহাওয়া। জ্যোৎস্নালোকিত স্থানে দাঁড়াইয়া বনবৃক্ষের ছায়ার দিকে তাকাইলে মনে হয়—বিকটাকার এক রাক্ষস যেন সেখানে লুকাইয়া আছে।

গোবিন্দ ডাকিল—"গিন্নি, ও গিন্নি,—বলি ঘুমুলি নাকি ?"

দুই তিন ডাকের পর কুলদা 'উঃ আঃ' শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তুমি তো কেবল আমাকে ঘুমুতেই দেখ। মরণ আর কি ! এ সময়ে কি আর কারুর ঘুম আসে ? কি ছাই রোগ যে আমায় ধরেছে, এবার আর যমের দোরে না গেলে রক্ষে নেই।"

গোবিন্দ ধমক্ দিয়া বলিল—"দ্যাখ পাগ্‌লী, ও সব কথা মুখে আন্‌বি তো ভাল হবে না বল্‌ছি। নে, আর পাগ্‌লামী করিস্‌নে—চট্ করে এক দাগ ওষুধ খেয়ে ফ্যাল্।"

ছোট্ট একটি কাচের গ্লাসে এক দাগ ওষুধ ঢালিয়া সে স্ত্রীর সম্মুখে ধরিল। কুলদা বিতৃষ্ণার ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—"না গো, ওসব জলে আমার জ্বর সারবে না। তুমি মিছেমিছি ডাক্তারকে পয়সা দিচ্ছ।"

গোবিন্দ গলার স্বর উচ্চ করিয়া বলিল—"না গো না, এটা জল নয় ; এটা হোমিপথি ওষুধ। একবার যদি এ ওষুধে রোগ ধরে—তবে যম বেটার সাধ্যি নেই তাকে টেনে নেয়।"

—"তা হোক, তবু আমি ওষুধ খাব না। সত্যি ক'রে বল্‌ছি এ যাত্রায় কিছুতেই আমি বেঁচে উঠ্‌বো না।"

গোবিন্দ এবার ভয় পাইল। কুলদা যদি মরিয়া যায়, তবে তাহার অবস্থা কি হইবে ? সে একটু অভিমানের ভাণ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"দ্যাখ্ বাম্‌নী, তোকে না অমন অলুক্ষুণে কথা বলতে মানা করেছি ! তবে দ্যাখ্ মজা—" বলিয়াই গোবিন্দ বেড়ার বাখারি হইতে হাত-দা'খানা লইয়া নিজের গলার দিকে লক্ষ্য করিল। কুলদা ভীত হইয়া গোবিন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ওগো না গো, অমন ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড করো না গো। এবার দ্যাখো, সত্যি আমি ওষুধ খাব।"

গোবিন্দ নিরস্ত হইল। তারপর দা'খানা যথাস্থানে গুঁজিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"বল্ তুই বেঁচে উঠ্‌বি ; আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাবি না।"

কুলদা বলিল—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি বেঁচে উঠ্‌ব। তোমাকে ছে'ড়ে কোথাও যাব না।"

গোবিন্দের চক্ষু দিয়া জল আসিল। মনের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"দ্যাখ্ পাগলী, সত্যি বল্‌ছি, তুই ম'রে গেলে আমি বিষ খেয়ে মর্‌ব। রাখাল আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে—তুইও যেতে চাস্ ? নে, ওষুধের তেজ ফুরিয়ে যাচ্ছে—শীগ্‌গির খেয়ে ফ্যাল্।"

কুলদা আর দ্বিরুক্তি করিল না।

পরদিন কাহার ডাকাডাকিতে গাঙ্গুলী-দম্পতির ঘুম ভাঙ্গিল। গোবিন্দ হন্তদন্ত হইয়া দরজা খুলিতেই দেখিল, রসিক গোয়ালা গাই দুইবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বেলা তখন অনেক হইয়াছিল। কদমগাছটার ডালপালার ভিতর দিয়া সূর্য্য দেখা যাইতেছে।

রসিক বলিল—"কি হে গোবিন্দ ভায়া, এত দেরী ক'রে ঘুম থেকে উঠলে যে ! গিন্নী বুঝি ছাড়তে চায় নি ?" বলিয়া অকারণেই হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গোবিন্দ জবাব দিল—"না হে না, তিনকাল গিয়ে এককাল রয়েছে, এখন কি আর ওসব ভাল লাগে ? এখন মরণ হ'লেই বাঁচি।"

—"সে কি ভায়া, মরবে কেন ? সংসারে এসেছ, খেয়ে-দেয়ে বেশ আমোদ-আহ্লাদ ক'রে নাও। মরণকে তো আর ডাকৃতে হবে না, সে একদিন নিজেই আস্‌বে। তা গিন্নীর খবর কি ? অসুখ সেরেছে তো ?"

—"তাকে নিয়েই তো ভাই মুস্কিলে পড়েছি।"

"মুস্কিল কি হে ! অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে। বিপদে মধুসূদন ;—মধুসূদনকে স্মরণ কর।...যাও, চট্ করে তেলের বাটি আর ঘটিটা নিয়ে এস তো ভায়া, গরুটা দুইয়ে দেই। বাছুরটা বড্ড ডাকাডাকি সুরু করেছে।"

রসিক দুগ্ধ দোহন করিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ নিজ হাতেই দুধ-বার্লি জ্বাল দিয়া বাটিটা কুলদার সাম্‌নে ধরিয়া বলিল—"নে লো গিন্নি, একটু করে খেয়ে নে। ডাক্তার তো আজকের এই পথ্যিই দিয়েছে।"

কুলদা আজ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। গতকল্যের ব্যাপারটার কথা মনে হইলে এখনও তার বুকটা কাঁপিয়া উঠে। ইস্! একটু এদিক্-ওদিক্ হইলে কি অবস্থাই যে হইত!...কালবিলম্ব না করিয়া শান্ত-শিষ্টের মত দুধ-বার্লিটুকু গলাধঃকরণ করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

গোবিন্দ এখন নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতে টানিতে অনিমেষ দৃষ্টিতে নিদ্রিতা ব্রাহ্মণীর দিকে তাকাইল। বার্দ্ধক্যের অত্যাচারে ও রোগের যন্ত্রণায় চক্ষু দুইটি কোটরপ্রবিষ্ট হইয়াছে, গাল-চোপা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দুই কাণের নীচ দিয়া দুইখানি অস্থি আত্মপ্রকাশের চেষ্টায় ব্যস্ত। কয়েকগাছি পাকা চুল মৃদু বাতাসে উড়িয়া আসিয়া মুখের উপর শোভা পাইতেছিল।

দেখিয়া দেখিয়া গোবিন্দের আশার তৃপ্তি হইতেছিল না। সে আর এক ছিলিম তামাক ভরিয়া পুনরায় টানিতে টানিতে স্ত্রীর দিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কখন যে কুলদা চোখ মেলিল, ভাবের আতিশয্যে গোবিন্দ তাহা খেয়াল করিল না। হঠাৎ স্ত্রীর একটা অপ্রত্যাশিত ধমক্ খাইয়া সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল।

কুলদা বলিয়া উঠিল—"কি গো, অমন হাঁ ক'রে চে'য়ে দেখ্‌ছ কি? নাবে-খাবে না? না, অমন ক'রে ব'সে থাক্‌লেই দিন যাবে?"

গোবিন্দ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি যেন বলিয়া উনান ধরাইতে বসিল। কিন্তু আজ কি যে তাহার হইল, সহজে সে উনান ধরাইতে পারিল না; কেবল আগুন নিভিয়া যাইতে লাগিল। ধোঁয়ায় তাহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। কুলদা এই ব্যাপার দেখিয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য বিছানা হইতে উঠিয়া সেদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অমনি গোবিন্দ চীৎকার করিয়া বলিল—"স্থাখ্ পাগলী, অসুখ-শরীর নিয়ে এদিকে আসবি তো ভাল হবে না বল্‌ছি। ভালয় ভালয় শু'য়ে থাক্। এখানে এ'সে তোর কোন কাজ নেই।"

কুলদা কোন শব্দ না করিয়া পুনরায় বিছানায় গিয়া শুইল। আজকাল স্বামীকে সে একটু সমীহ করিয়া চলে। স্বামী যে তাহার কিরূপ ভয়ানক, তাহা সে কালই টের পাইয়াছে।

গোবিন্দ কষ্টে-সৃষ্টে উনান ধরাইয়া যৎসামান্য রান্না করিয়া স্নান করিয়া আসিল। খাইতে বসিয়া সে ভালরূপে খাইতে পারিল না। একটি চিন্তা হঠাৎ তাহার মস্তিষ্কে আসিয়া জড় হইল। অসুখে পড়িবার আগে খাইবার সময়ে গিন্নী প্রত্যহ পাশে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিত, কিন্তু আজ ...?

এদিকে কখন যে বিড়াল মহাশয় তাহার থালার ভাত অর্দ্ধেক নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়িতেই গোবিন্দ অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া পড়িল। রক্ষা! কুলদা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে কি লজ্জাটাই না সে পাইত!

তারপর এক ছিলিম তামাক খাইয়া গোবিন্দ ঘোষাল বাড়ীর নিত্যনৈমিত্তিক আড্ডায় চলিয়া গেল।

পরদিন দুপুরবেলায় গোবিন্দ বেলগাঁয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সেখানে আজ তাহার নারায়ণ পূজার নিমন্ত্রণ। পূজা তাহাকেই করিতে হইবে। কাজেই না গেলেই নয়। যাইবার সময়ে কুলদার গায়ে হাত দিয়া দেখিল—জ্বরের উগ্রতা অনেক কমিয়াছে,—বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। মনে মনে ভাবিল—ফিরিতে সামান্য একটু রাত্র হইবে—তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না।

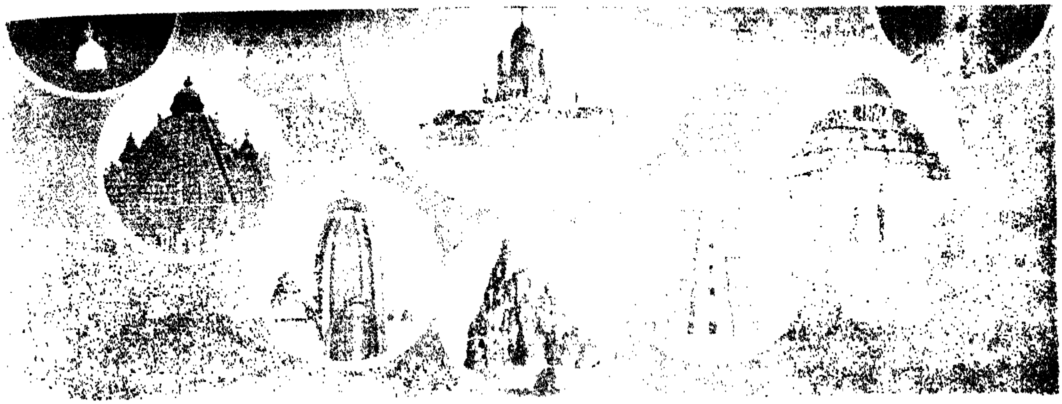
কুলদাকে দুধ-বার্লি খাওয়াইয়া গোবিন্দ রওনা হইল।

কিন্তু হায়, সে জানিল না কুলদার জ্বরের উগ্রতা কমিল শুধু মৃত্যুর জন্য—আরোগ্যের জন্য নয়। প্রদীপ নিভিয়া যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শিখাটি যেমন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে—ইহাও যে সেইরূপ!

চাঁদ যখন আকাশে আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া জ্যোৎস্না-বিকীরণে ব্যস্ত, হয়তো তখনই একটি তারা কক্ষচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল।

গোবিন্দ যখন বেলগাঁ হইতে ফিরিল—তখন এক প্রহর রাত্র অতীত হইয়া গিয়াছে। সে ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাকিল—"গিন্নি, ও গিন্নি,—বলি ঘুমুলি নাকি? ইস্ কি কুম্ভকর্ণের নিদ্রা লো তোর! এত ডাক্‌ছি তবু কাণ দিয়ে বাতাস যাচ্ছে না! গিন্নি, ও গিন্নি—"

হায়, গোবিন্দের গৃহিণী! সে তখন মহাপ্রস্থান করিয়াছে! আর কে আজ তাহার ডাকে সাড়া দিবে?



অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব

(তীর্থবাসী)

অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচয়। এই উৎসব বাঙালীর উৎসব—হিন্দু জাতির উৎসব। অক্ষয়া তৃতীয়া একটী পুণ্য তিথি। এই তিথি অনুসরণ করিয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উৎসব নহে, তিথি-মাহাত্ম্যে সঙ্ঘের যুগ-বিপ্লবই ঘটিয়াছে। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের জীবনে বিস্ময়কর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এই দিনেই পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল প্রসঙ্গ এই ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় নহে। অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসবের কথা বলিব।

১৩২৩ খৃষ্টাব্দে একটী অতি প্রাচীন বিরাট্ মন্দিরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্বর্ণ-প্রণব-সংযুক্ত রজত ঘট প্রতিষ্ঠা করেন এক শুভ অক্ষয়া তৃতীয়ায়; তার পর হইতে মহাসমারোহে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। ১৯৩৭ খৃঃ এই বহুমূল্য প্রতীক-চিহ্নটী অপহৃত হয়। এই বৎসর মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত নূতন বিগ্রহ স্থাপন করিয়া অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। এই নূতন প্রতীক সম্বন্ধে ১২ই মে তারিখে 'নবসঙ্ঘে' মতিবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। "রজত ঘট ছিল বিশুদ্ধ চরিত্রের আদর্শ। স্বর্ণ প্রণব ছিল সত্যপ্রতিষ্ঠিত ঐশ্বর্য্যসৃষ্টির প্রেরণা। রজত-ঘটের উপাসনায় মানুষ পায় মোক্ষ, লয়, বা নির্ব্বাণের পথে চলে, ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কথা। রজত-ঘট সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পথে প্রতিষ্ঠাতাকে লইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মোক্ষ নাই, লয় নাই; প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ চাহে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত জীবন। তাহারা জীবনবাদের প্রবর্ত্তক। এই হেতু দেখা যায়—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের তপস্যা অদৃষ্টের মোড় ফিরায়। তাই মোক্ষ, মুক্তির সিদ্ধ বিগ্রহ অপহৃত হইবার পর বর্ত্তমান প্রতীকের প্রতিষ্ঠা। তাহার ব্যাখ্যা দিতেছি।*

"বিশ্ব ব্রহ্মমূর্ত্তি। গীতায় শ্রীভগবান নিজেকে জগন্মূর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তবুও ঈশ্বরতত্ত্ব অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্য ও অব্যক্ত। এই অনন্ত অজ্ঞানা রূপ লইতে চাহিয়াছে বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে; তাই যাহা শাশ্বত, যাহা অনন্ত, সেই তত্ত্বকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করিয়া ভারতের ঋষি গাহিয়াছেন "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্।" নারায়ণ শুধু এই নব বিগ্রহেই আছেন তাহা নহে, তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বগত। অতএব মৃত্তিকা, প্রস্তর, বৃক্ষ প্রভৃতির আশ্রয়ে এ জাতি তত্ত্বদর্শন করিয়াছে।

তত্ত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে ব্রহ্মসূত্রে। সাংখ্য তত্ত্বের লীলাচ্ছন্দঃ প্রকৃতিবাদে পরিস্ফুট। ভারতের বেদান্ত ও সাংখ্য দুইটী দার্শনিক ভাবধারা। শ্রীমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী ঘট-চিহ্ন শাশ্বত সনাতনেরই এক কল্পমূর্ত্তি। ব্রহ্মকে কেহ জানিতে পারে না। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাক্, ন মনঃ"—কিন্তু মানবাত্মা তাহাতে তৃপ্তি পায় না। অশেষকে, অজানাকে ধরার ও জানার প্রেরণা তাহার

---

* এই নব-প্রতিষ্ঠিত প্রতীকটির প্রতিচিত্র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

আছে। এইজন্য ঘট-চিহ্নের মুখ রুদ্ধ থাকা সত্বেও, নিখিল মানবজাতির চিহ্ন-স্বরূপ দুইটী পক্ষী উভয় দিক্ হইতে এই অপৌরুষেয় সত্তাকে যেন জানার প্রচেষ্টা করিতেছে। শিল্পী মর্ম্মরপ্রস্তরে ইহা অতি যোগ্যতার সহিত খোদাই করিয়াছেন। এই শাশ্বত পুরুষকে ঘিরিয়া বেদান্তের মায়া ও সাংখ্যের প্রকৃতি লীলায়িত হইয়াছে। প্রকৃতি শাশ্বতী, মায়া পুরুষেরই মত দুরবজ্ঞেয়া। অথচ বিশ্বে মায়ার লীলা প্রত্যক্ষ, মনোমুগ্ধকর। তাই ঘটের উভয় পার্শ্বে পত্র-পুষ্পের গুচ্ছে ইহা লীলায়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই রেখাগুলি পরস্পর সন্নিবদ্ধ, সংজড়িত; কেন না প্রকৃতির লীলাভঙ্গী বিচিত্র এবং দুর্জ্জেয়। পুরুষ ও প্রকৃতিবাদের এই প্রকৃষ্ট বিগ্রহ-চিহ্ন প্রস্ফুটিত শতদলের উপর সংস্থাপিত। জীবাত্মা এই তত্ত্ব বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে পুণ্য-ফলে অবধান করিতে পারে না। ইহা কায়ার ও হিয়ার পরিপূর্ণ উৎকর্ষেই উপলব্ধিগম্য হয়। হৃদয়শতদল ঈশ্বরপ্রসাদে যাহার পরিস্ফুট হয়, তাহার কাছেই এই অনাদি তত্ত্ব সুবিদিত। এই হেতু এই পরম তত্ত্ব শতদল-শোভার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

সূর্য্য জ্ঞান-লক্ষণ। তাই ঘটের বক্ষে দশ অর-রেখা সংস্থাপিত হইয়াছে। চন্দ্রই মাস, তিথি, নক্ষত্রাদি কাল-বিভাগ মানুষের মনের সহিত নিয়ন্ত্রিত করে। চন্দ্র তাই ঘট-চিহ্নে অর্দ্ধাকারে অঙ্কিত হইয়াছে।

ভারতে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী, কৃষ্টির দুই ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈদিকী কৃষ্টি কর্ম্মবহুল, তান্ত্রিকী ভাববহুল। কর্ম্ম সত্য, শাশ্বত, ভাব তাহার মূলে—আচার ও নীতি তাহার পোষক।

তাই প্রতীক-চিহ্নের এক দিকে বৈদিকী চিহ্নের স্বস্তিক ও অন্য দিকে তান্ত্রিকী সংস্কৃতির মাতৃমন্ত্র খোদিত হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্ব-নির্ণয়ের পর মহৎ ও অহঙ্কারের উপর পঞ্চতন্মাত্রের বিকাশ—ইহাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। শব্দ ব্রহ্ম-বাচক প্রণব। ঋষি পতঞ্জলী এই কথা বলিয়াছেন। গীতায় ইহার সমর্থন আছে। কণ্ঠ বিশুদ্ধ চক্রস্থান। শব্দ-ব্রহ্ম তাই ঘটের কণ্ঠলগ্ন করা হইয়াছে। তারপর সৃষ্টি। শব্দাদি তন্মাত্রা হইতে পঞ্চ ভূতাদির সৃষ্টি, বিশ্বকর্ম্মার তুলির আঁচড়ে এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি-রচনা চতুঃষষ্টি কলায়—এই হেতু বিগ্রহকে চতুঃষষ্টি পদ্মমণ্ডলে পরিবেষ্টিত করা হইয়াছে। একখণ্ড প্রস্তরে ইহা শুধু ভারত-ধর্ম্ম নহে—বিশ্বজনীন সনাতন তত্ত্বকে রূপায়িত করিয়া একটী হিন্দুমন্দির আজ মহিমামণ্ডিত।”



সঙ্ঘে নব-প্রতীক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শোভাযাত্রা

এই নব প্রতীক-প্রতিষ্ঠার দিন যে উৎসাহ ও আনন্দের উৎস এখানে বহিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। উষারাগে আকাশ রঞ্জিত না হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত হইতে দ্বিপ্রহর রজনীকাল পর্য্যন্ত এই নব প্রতীককে ঘিরিয়া উৎসবের ধূম চলিয়াছিল। শোভা-যাত্রায় ময়মনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় পরমোৎসাহে নগর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্ঘ-সভ্যদের সহিত প্রতীক-প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত জল-গ্রহণ করেন নাই। নব-নির্ম্মিত তোরণের উপর হইতে সুমধুর সানাই বাজিতেছিল। ধূপ, দীপ, ধুনার গন্ধে দশদিক্ আমোদিত—শ্রীমন্দিরে অসংখ্য বালক, বালিকা, তরুণ তরুণী মধ্যাহ্নের পর অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করিতে সমাগত হইয়াছিল। সে বিবরণ লিখিয়া বক্তব্য দীর্ঘ করিব না।

উৎসবের বড়দিক্ সঙ্ঘের অধ্যাত্মসাধনা—উহা ধ্যান,



শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

করেন। ঐদিন রাত্রে শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ পাল "ঠাকুর রামকৃষ্ণ"র জীবন সম্বন্ধে অতি সুন্দর দীপালী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তারপর পঞ্চম দিবসে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী "মানুষের জয়যাত্রা" তাঁহার অভিনব কল্পনার প্রথম দীপালী বক্তৃতা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে দিয়াছিলেন। তাঁহার ভাব ও ভাষার ঝঙ্কারে সভামণ্ডপ মুখরিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ দিবসে নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত মণি বর্দ্ধন অপূর্ব্ব নৃত্যকলা দেখাইয়া সকলকে পুলকিত করেন। সপ্তম দিবসে ব্যায়ামবীর বসন্তবাবু সদলবলে আসিয়া, শারীরিক ব্যায়াম-কৌশল দেখাইয়া বিপুল জনসভাকে মুগ্ধ করেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অনুরাগী বন্ধু মিঃ আর হাবুনেট্ সস্ত্রীক এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। অষ্টম দিনে যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় চৌধুরী দীপালী বক্তৃতার সাহায্যে যক্ষ্মা-রোগ ও তৎপ্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষ

উপাসনা, পুরশ্চরণের মধ্যে, হোমে এক প্রকার অনেকের দৃষ্টিকে আড়াল করিয়া অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছিল। অন্য দিকে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান; শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, অভিনয় —পৌরাণিক যুগের অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় অক্ষয়া তৃতীয়া মহাযজ্ঞ বিপুল আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া চলিতেছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পরদিন ডাঃ শ্রীপ্রভাত কুমার বিশ্বাস বঙ্গীয় অন্ধত্ব-নিবারণী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে দীপালী বক্তৃতা করেন। চন্দননগরের এডমিনিস্ট্রেটার মঃ মসিয়ে বারোঁ সস্ত্রীক প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের ছাত্রবৃন্দের ব্রতচারী নৃত্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ



চন্দননগরের এডমিনিষ্ট্রেটার মঃ বারোঁ, শ্রীমতিলাল রায় ও ছাত্র-মণ্ডলী

আলোচনা করেন। নবম দিনে শ্রীযুক্ত ননী দাশগুপ্ত বি-এসসি মহাশয় সদলবলে হাস্যকৌতুক প্রদর্শন করিয়া

সভায় সকলের চিত্তে আনন্দ দান করেন। দশম দিনে স্থানীয় 'সন্তান সঙ্ঘ' শারীরিক ব্যায়াম ও বালিকাদের ব্রতচারী-নৃত্য প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। একাদশ দিন ছিল মহিলা-দিবস। আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মহাশয়ের সুযোগ্যা কন্যা শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা সরকার সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন—

"অনেকের মুখে শুনিতে পাই—আজকাল নারীরা পুরুষের সঙ্গে সকল বিষয়ে একত্র কাজ করেন, তবে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে স্বতন্ত্র মহিলাদিবসের কি প্রয়োজন? প্রয়োজন আছে বৈকি! আমাদের দুর্ব্বলতা কোথায়, শক্তিই বা কতখানি, এ সকল আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র মহিলাদিবসের প্রয়োজন বোধ করি। এই সব আলাপের ফলে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে জানিয়া আমরা সুপ্রতিষ্ঠ হইব। পুরুষ ও নারী বিধাতা স্বতন্ত্র করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন; পরস্পরের সহায়তা ইঁহারা করিবেন—কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া; কে বড়, ছোট কিংবা উভয়েই সমান—এ তর্ক বৃথা। গৃহে ও সমাজে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল—বর্ত্তমান যুগে এ ক্ষেত্র বিশালতর হইতেছে,—এই কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই আমরা নারীকে কল্যাণীমূর্ত্তিতে দেখিতে চাই। এই কথাটি যেন আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত থাকে যে, গৃহে, সমাজে ও জগতে কল্যাণের প্রতিষ্ঠাই নারীর প্রধান কর্ত্তব্য।

আমার দ্বিতীয় কথাটি নিতান্ত পুরাতন,—সেটি স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা। বর্ত্তমান যুগে বহু নারী ও অনেক পুরুষও মনে করেন যে, এখন স্ত্রী-শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছে, ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আর দরকার নাই। শিক্ষা কি, কেমন হওয়া উচিত, এসব তর্কমূলক কথা উত্থাপনের সময় ও স্থান ইহা নহে। কিন্তু যে শিক্ষার অর্থ শুধু লিখিতে পড়িতে পারা, তাহারাই বা কতটুকু আমাদের মধ্যে হইয়াছে? আপনারা অনেকেই শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী আছেন, তাঁহাদের কাছে আমার প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন আরও অনেককে এই পথে আকর্ষণ করেন। নারীর সুশিক্ষার উপর জাতীয় কল্যাণ কতখানি নির্ভর করে, তাহা আমি না বলিলেও আপনারা যথেষ্ট জানেন। যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা সুশিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার সফলতা-লাভের আশা বৃথা। আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করি—দেশের সকল নারীর জ্ঞান ও শিক্ষালাভের জন্য ব্যাকুলতা জাগাইব, তবে কি তাহা পারিব না? হইতে পারে এ ব্রত দুঃসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নহে।

আমার তৃতীয় কথা এই যে, যুগধর্ম্মপ্রভাবে নারীর সম্মুখে নিত্য নূতন সমস্যা আসিতেছে, তাহার সমাধান নারীকেই বিশেষরূপে করিতে হইবে। চারিদিকে প্রতিকূল সমালোচনা শুনিয়া নিরাশ হইলে চলিবে না। "আজকালকার মেয়ে"—এই কথাটি একটু নাক সিঁটকাইয়া বলিয়াই অনেকে খালাস। কিন্তু এই 'আজকালকার মেয়েদের' ত্রুটি কোথায়, কোথায় তাহারা সামাজিক কল্যাণের সীমা লঙ্ঘন করিতেছে ও কেন করিতেছে, তাহা কি তলাইয়া দেখা উচিত নয়? পাশ্চাত্যশিক্ষার যাহা পাইয়াছি, সবই কি অনিষ্টকর? আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার জোয়ারের জলে খড়কুটা যাহা ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহা আবার ভাসিয়াই যাইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যতটভূমিকে অধিকতর উর্ব্বর করিয়া রাখিয়া যাইবে। অমঙ্গল যদি কিছু আসিয়া থাকে, তাহা দূর করিবার ভার নারীকেই লইতে হইবে। যদি অশিক্ষিত লোকমত, অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীকে অস্ত্রধারণ করিতে হয়, তখন তিনি যেন মনে রাখেন, সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি তখনকার মত সংহাররূপিণী। সমাজের স্থিতি নষ্ট করিবার জন্য নহে, বরং তাহা দৃঢ় করিবার জন্যই তাঁহার এই ক্ষণিক যুদ্ধযাত্রা।

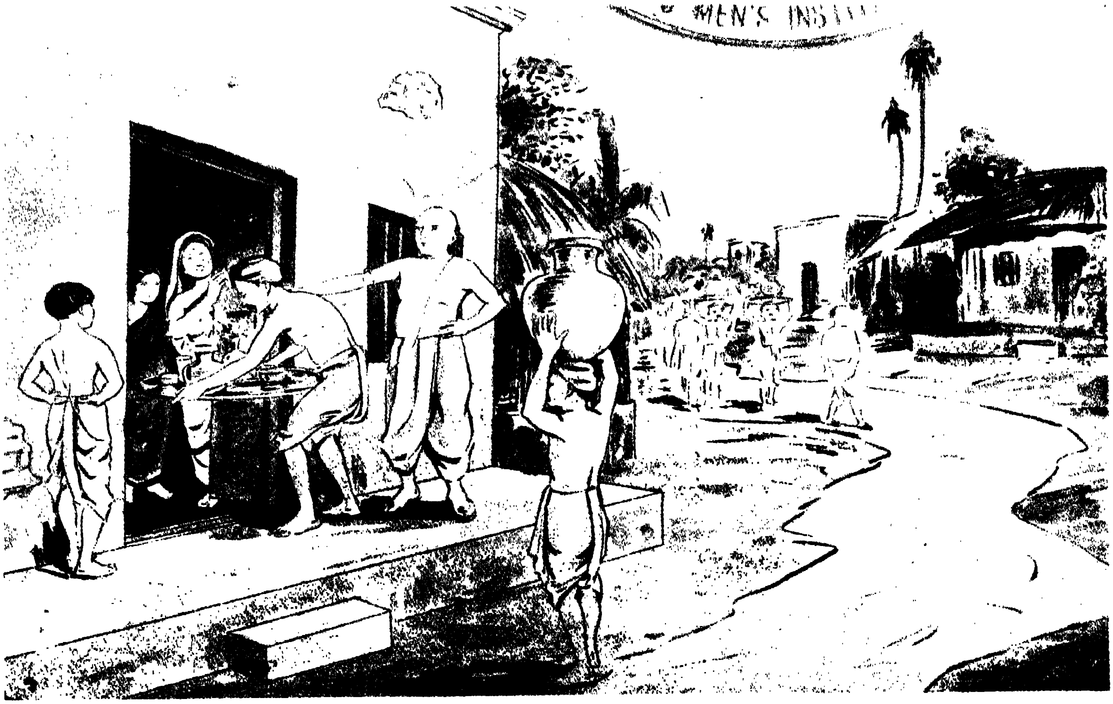
আমার আজিকার শেষকথা—নারীর মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। যে প্রাণবস্তুর প্রাচুর্য্য থাকিলে মরুভূমিতেও সতেজ বৃক্ষ জন্মায়, ঘোর গ্রীষ্মেও গাছে গাছে ফুল ফোটে, সরস ফল পাকে,—সেই অপর্য্যাপ্ত প্রাণশক্তি প্রকৃতি দেবী কি আমাদের নারীর মধ্যে দেন নাই; ইউরোপের যতই নিন্দা আমরা করি না কেন—ভুলিতে ত পারিনা সেখানে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রাণের কি গতিবেগ ও সেই উৎসাহে কর্ম্মের কি অদ্ভুত প্রেরণা! সামান্য গৃহস্থ ঘরের নারীদের সেখানে দেখিয়াছি, একমুহূর্ত্ত তাঁরা আলস্যে সময় নষ্ট করেন না। একা যিনি স্বহস্তে সকল গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করেন, আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেও তাঁহার সমান আগ্রহ। তাঁহার সারাদিনের কাজের মধ্যে প্রসন্নতার যে স্নিগ্ধধারাটি বহিয়া যায়, তাহার উৎস তাঁহার প্রাণশক্তি। আমাদের নারী কি আজ শুধু বসিয়া বসিয়া দেবীর পূজা লইবেন? এ যুগ চাহে গৃহকর্ম্মে, সমাজ-সেবায় ও দেশের উন্নতিতে নারীর শতদিকে শতহস্ত-প্রসার। আমাদের সুপ্তজাতিকে জাগাইতে আজ জাগুন আমাদের নারী। জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম ও সেবা যুক্ত হউক।

রাত্রি ৯ ঘটিকায় শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত "কাঙ্গালিনী" নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। দ্বাদশ দিনে এক বিপুল ছাত্রসভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীঅরুণ চন্দ্র দত্ত এই সভার সভাপতি ছিলেন। অন্যূন এক সহস্র ছাত্র সভায় যোগদান করেন। সদ্যমুক্ত রাজবন্দী দেশপ্রাণ অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:—

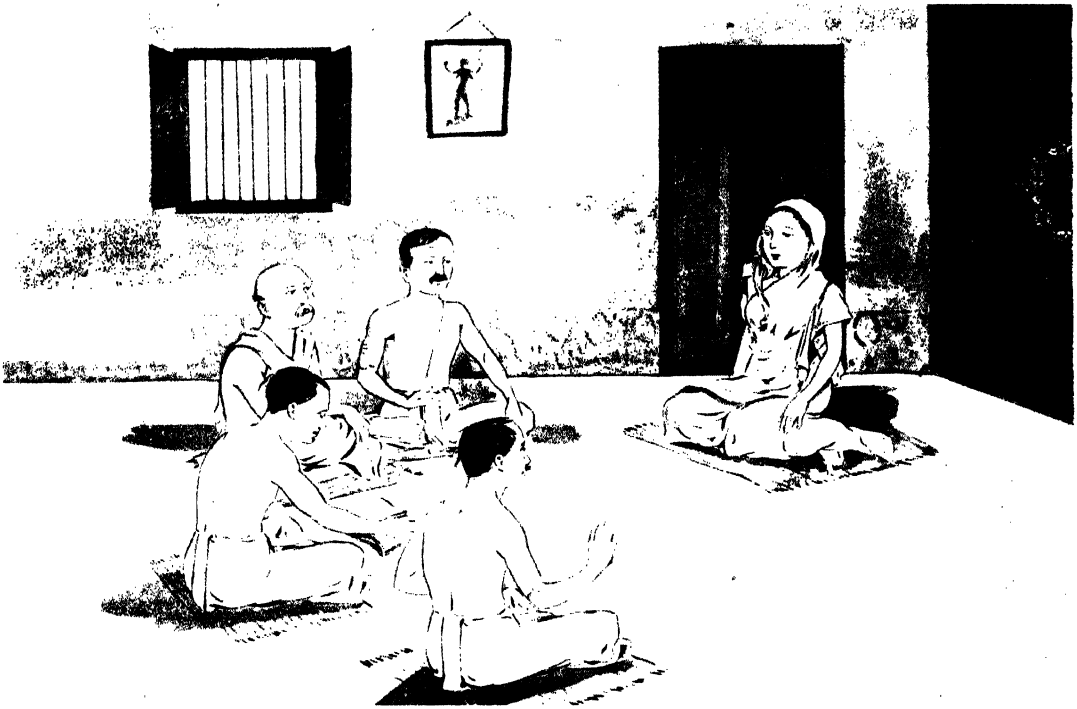
চিত্রে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ শ্রীমন্দিরের ইতিকথা



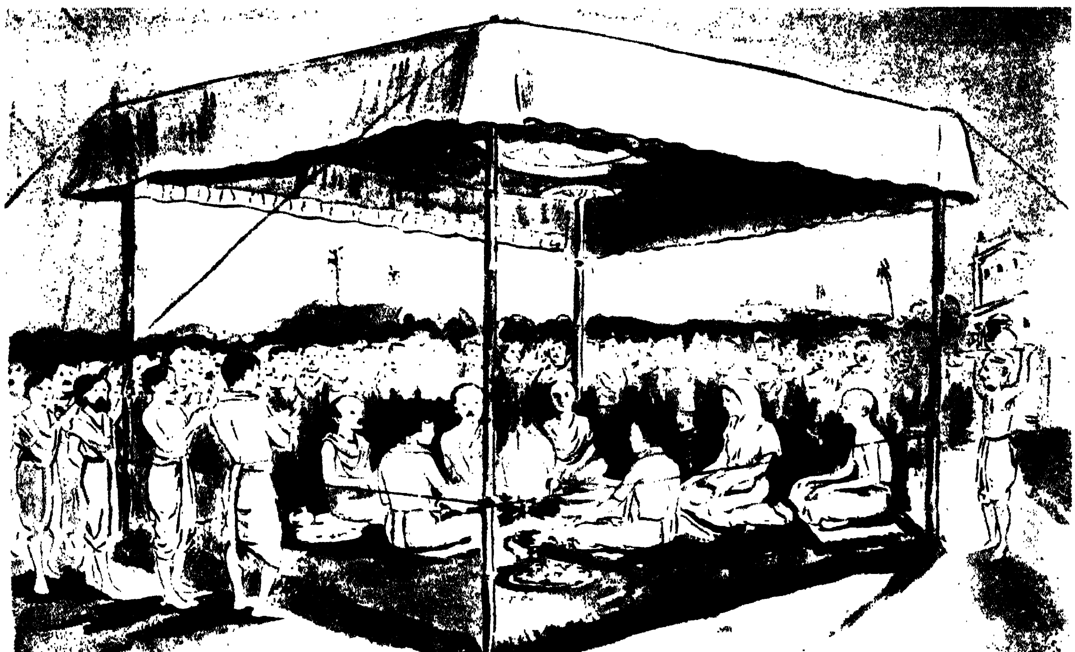
বৈঠকখানায় ৺দেবীচরণ সরকার



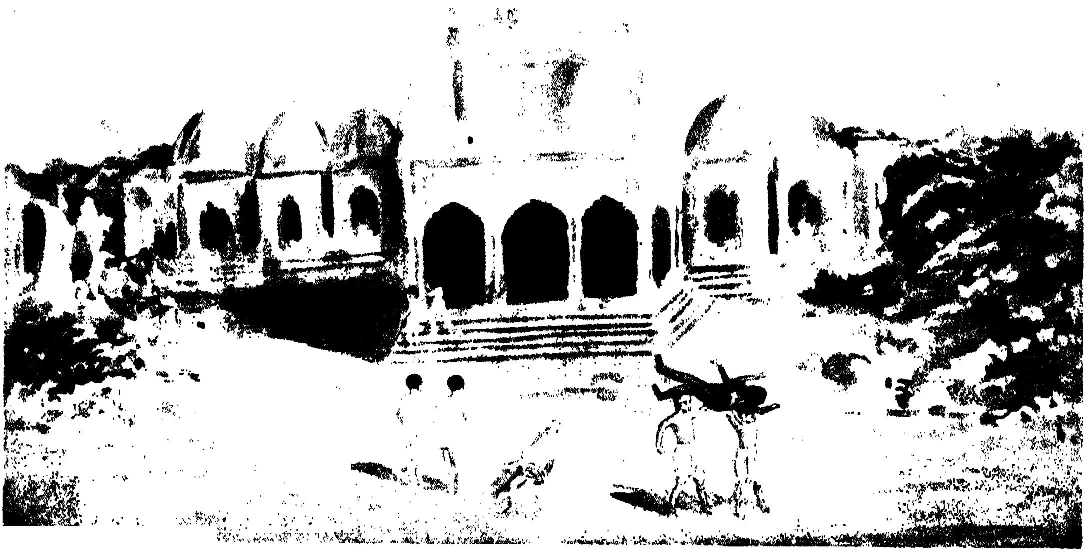
৺দেবীচরণ সবকারের দান-সামগ্রী গৃহস্থ সামলাইতে পারে না



৺বিশ্বনাথ সরকারের পত্নী ৺গৌরমণি দাসী মন্দির প্রতিষ্ঠার পরামর্শ করিতেছেন



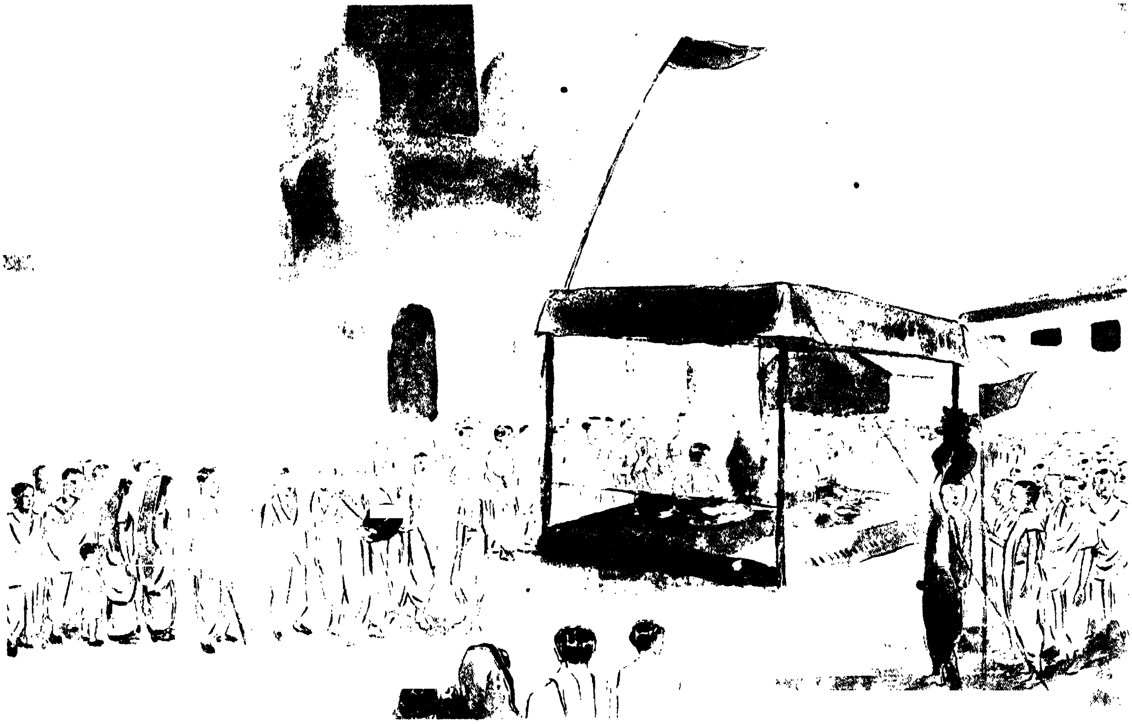
শ্রীশ্রীমাতা ভুবনেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠার আয়োজন



শ্রীমন্দিরের ধ্বংসাবস্থা : শ্রীশ্রীকালিমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হইতেছে



৭



রজতঘাটে স্বর্ণপ্রণব প্রতিষ্ঠা-দিবসে যজ্ঞ হইতেছে ঃ ১৯২৩ খৃঃ অঃ



[illegible] তারিখে বিগ্রহ অপহৃত হওয়ার দৃশ্য

"এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রগণের মধ্যে সংগঠন-মূলক কর্ম্মপ্রেরণা জাগ্রত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তক ছাত্রসম্মেলন নামে একটী সম্মেলন স্থাপিত হউক। এবং শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার সভাপতি ও শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক।"

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সুচিন্তিত অভিভাষণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। রাত্রে প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের ছাত্রমণ্ডলী ও পল্লীযুবকগণ কর্ত্তৃক "চিতোর-গৌরব" নাটক অতি যোগ্যতা সহকারে অভিনীত হয়। ত্রয়োদশ দিবসে সুবিখ্যাত জনপ্রিয় যাদুকর পি, সি, সরকার কর্ত্তৃক যাদুবিদ্যা প্রদর্শিত হয়। প্রফেসর সরকারের "এক্স-রে আইজ" খেলাটি সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। চতুর্দ্দশ দিবসে উৎসব সমাপ্তি-সভা হয়। মন্দিরের বিদ্যুৎ-প্রদীপগুলি যেন সুকরুণ দৃষ্টিতে উৎসবসমাপ্তি ঘোষণা করিতেছিল। উৎসবমুখর তীর্থ অন্যূন ৫ সহস্র লোকের সমাগম সত্ত্বেও যেন বিষাদাচ্ছন্ন বোধ হইতেছিল। সভা-মণ্ডপে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ নায়েক সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ডাঃ হারাণ চন্দ্র রায় সভার বিবৃতি পাঠ করিলে শ্রীমন্দিরে উপাসনার আহ্বান শঙ্খনিনাদে ঘোষিত হয়। উপাসনা সাঙ্গ করিয়া সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতার মর্ম্মস্পর্শী বাণীর ঝঙ্কারে বাঙ্গালীর সাধনরহস্য বিশদভাবে বর্ণিত হয়। সভাস্থ দুই সহস্র নরনারী চমৎকৃত হইয়া তাহা শ্রবণ করেন। ইহার পর স্ত্রীচরিত্রবিহীন "উদ্বোধন" নাটকের অভিনয় স্থানীয় 'সন্তান সঙ্ঘের' তরুণেরা এমন নিপুণতার সহিত করিয়াছিলেন, যে, রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ৩।০ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক দর্শক চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়াছিলেন। প্রাতঃকালের আলো যখন ফুটিল, তখন দেখা গেল উৎসব শেষ হইয়াছে। উৎসবলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।

উৎসবের এই সকল দিক্ ব্যতীত পণ্যসম্ভারপূর্ণ বিপণিশ্রেণীর শোভায় মুগ্ধ নয়ন ফিরিতে চাহিত না। সর্ব্বাপেক্ষা উৎসবের আকর্ষণ প্রদর্শনীবিভাগ। ইহা পাঁচ অংশে বিভক্ত। গীতারযোগ, সমাজচিত্র, শ্রীমন্দিরের ইতিহাস, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ও ভারতীয় শিল্পশালা। শেষোক্ত দুইটি বিভাগ কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে "শ্রীমন্দিরের ইতিহাস" বিভাগের কথাই বলিব। ইহাতে চিত্রে ও লেখনীর সাহায্যে শ্রীমন্দিরের পর্য্যায়গুলি চমৎকার করিয়া দেখান হইয়াছিল। কালের কুটিলচক্রে নিষ্পেষিত হইতে হইতে এই সুপ্রাচীন কীর্ত্তি-মন্দির অবশেষ চিহ্নটুকু লইয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের হস্তে কিরূপে অর্পিত হইল, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছিল।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ৺দেবীচরণ সরকার বোড়াইচণ্ডী তলায় বাস করিতেন। তিনি পোর্টমিটের মুৎসুদ্দি ছিলেন। এই সময়ে চন্দননগরে ১৩।১৪ শত তন্তুবায়ের বাস ছিল। তিনি বিদেশে ইহাদের নির্ম্মিত লুঙ্গি চালান দিয়া প্রভূত ধন অর্জ্জন করেন। দানে তিনি সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। অসংখ্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও পুরোহিত পূজা-পার্ব্বণে প্রচুর ধন লাভ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺বিশ্বনাথ সরকার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পত্নী ৺গৌরমণি দাসী ১৭৩০ শকে নবচূড় মন্দিরসমন্বিত ত্রয়োদশ মন্দির স্থাপন করেন। এই ধর্ম্ম-মন্দির বাংলায় এই প্রথম। এই মন্দিরনির্ম্মাণে লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রতিষ্ঠায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এক লক্ষ টাকা বিগ্রহসেবার জন্য গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল। মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে মহাকালীর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা হয়। ছাগবলির রক্তে গঙ্গাজল রাঙা হইয়া উঠিত। তাঁহার উত্তরাধিকারী ৺দেবীচরণ সরকারের পুত্র ৺যজ্ঞেশ্বর সরকার—তাঁহার দুই বিবাহ—প্রথমা পত্নীর গর্ভে রাজনারায়ণ সরকার এবং তাঁহার পুত্র ৺রাখালদাস ৺বিশ্বনাথ সরকার নিঃসন্তান ছিলেন। রাখালদাসের হস্তেই এই মন্দিরের গৌরব নষ্ট হয়। তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেবীর গাত্রের অলঙ্কার উন্মোচন করিতে গিয়া প্রতিমার একখানি হস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। সেই দিন হইতে দেবীর পূজা বন্ধ হয়। মন্দির প্রতিমা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। দ্বাদশ মন্দিরের দ্বাদশ শিব লোপাট হইয়া যায়। তাহার একটীর ভগ্নাংশ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্মৃতিচিহ্নরূপে রক্ষা করিতেছে। রাখাল দাস সরকার

মন্দিরের সম্মুখস্থ জমি নাড়ুয়া নিবাসী ৺থাকচন্দ্র সিংহ রায়কে বিক্রয় করেন। উক্ত ক্রেতা এই জমি নিলামে তুলিয়া দিলে ৺রাজেন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় উহা দেড়শত টাকায় খরিদ করিয়া লন। ১৭৪০ শকে একটী



শ্রীমন্দিরের পূর্ব্ব বিগ্রহ—ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি

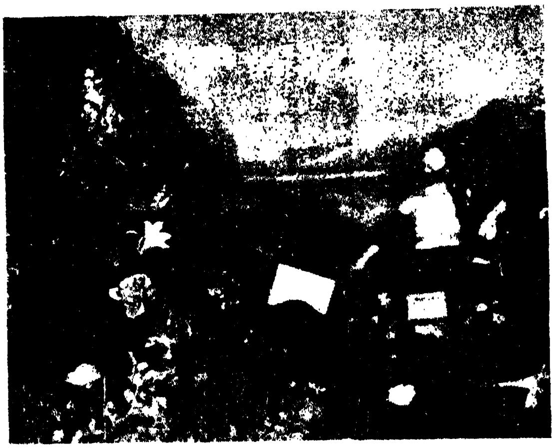
মন্দির হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। ১৭৭৫ শকে মন্দির বিগ্রহ-গুলি বিনষ্ট হয়। ১৯১৫ খৃঃ মন্দির-সংলগ্ন জমিতে শ্রীব্রজেন্দ্র গোস্বামী মহাশয় টালিখোলা করেন। তারপর সিদ্ধেশ্বর কুমার নামক একব্যক্তি মাত্র ৩০০৲ এই মন্দিরগুলি খরিদ করিয়া প্রধান মন্দিরসংলগ্ন চারিটী মন্দির ব্যতীত অবশিষ্ট মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া সুরকী প্রস্তুত করেন। কিন্তু কেহ তাহা খরিদ করে না। ইহার পর ৺হারাণচন্দ্র ঘোষ ১৫০৲ টাকায় ইহা খরিদ করেন। পরে শ্রীমৎ নরসিংহ দাস বাবাজি ইহা খরিদ করিয়া প্রধান মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। ১৯২২ খৃঃ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ইহা গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খৃঃ পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর প্রস্তরবেদী নির্ম্মাণ করিয়া প্রণব-সংযুক্ত রজত-ঘট স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা দেখেন এই শ্রীমন্দিরের কীর্ত্তিরক্ষার জন্য সন্ন্যাসীর প্রয়োজন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঁচ জন সঙ্ঘ-সভ্যকে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা দেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাতা পুনরায় দেখেন—এই ঘট অপহৃত হইবে। তিনি মন্দিরের দ্বারে দ্বারে লৌহ-কপাট সংযুক্ত করেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালের ২৫শে জুন এই ঘট সত্যই অপহৃত হয়। এই মন্দির ধনীর অর্থে অবিধিপূর্ব্বক অশাস্ত্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব মন্দির-পরিস্থিতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নূতন প্রতীক ১৯৩৮ খৃঃ ২রা মে তারিখে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীমন্দিরের তিনটী পর্য্যায়। মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর গগনচুম্বী শ্রীমন্দিরে ভুবনেশ্বরীর রূপ-বিগ্রহ। উহার বিসর্জ্জনে রজত-ঘটে স্বর্ণ-প্রণবে মহাশক্তি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া

পুনঃ অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অধ্যাত্মবিগ্রহ প্রস্তরখোদিত হইল মহাশক্তিরই বিগ্রহরূপে রূপান্তরিত হইয়া। প্রতিষ্ঠাতা বলেন "ভারতের ইহা পরম তীর্থরূপে যুগতীর্থে পরিণত হইবে। এই তীর্থরক্ষায় সন্ন্যাসীর প্রয়োজন। সে সন্ন্যাসবীর্য্য ক্ষেত্রগত।" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফলদায়ক এই মহাতীর্থে তিনি হিন্দু জাতিকে সমুচ্চ কণ্ঠে আহ্বান দিয়া বর্ত্তমান বৎসরের উৎসব-পর্ব্ব সমাপ্ত করেন।

ইহার পর **"গীতার যোগে"র** কথা। ৮টি দৃশ্যে মৃৎপুত্তলিকা ও লেখনীর সাহায্যে এমন সুন্দর ভাবে গীতার সাধন পরিদর্শিত হইয়াছিল, যাহা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণে সুগভীর অনুভূতি জাগাইয়াছিল। আলোকচিত্রে ইহার যতটা সৌন্দর্য্য প্রদান সম্ভব, এইক্ষেত্রে তাহার ত্রুটি রাখিলাম না। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর চিত্ত যে তৃপ্তিতে অভিষিক্ত হইত, তাহার সম্ভাবনা ইহাতে নাই। পর পর আটটী দৃশ্যে ইহা প্রদর্শিত হয়। আমরা পাঁচটী দৃশ্যের চিত্র লইতে সক্ষম হইয়াছি। মৃৎপুত্তলিকার সহিত লিপিকাগুলির অবিকল প্রতিলিপি উদ্ধৃত করা হইল।

গীতার শিক্ষা

১ম দৃশ্য



প্রজাপতি ব্রহ্মা ও মহামতি বেদব্যাস (১ম দৃশ্য)

"ভারতের সত্য বেদে। বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ ছন্দঃ, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ। এবং উপনিষৎ, পুরাণ প্রভৃতি ভারত-ধর্ম্মের ভিত্তি। এইগুলির সার সঙ্কলিত মহাভারতে। মহাভারত হিন্দুজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ।

মহাভারত জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাবের প্রতিকার করে। মহাভারত ধর্ম্ম, চাতুর্ব্বর্ণ্য, আশ্রম-জীবনের নীতি যজ্ঞ প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করে—তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যসাধনের নির্দ্দেশ দেয়। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রের বিবরণ, ভারতের পুণ্যতীর্থ নদ-নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন,—এই সকলের বিবরণ ও সংস্থান মহাভারতে মিলে। মহাভারত ভারতের ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের ইতিহাস।

শ্রীগীতা মহাভারতের মধ্যমণি। ভূতভাবন শ্রীভগবান যে নিমিত্ত দিব্য নর-বিগ্রহে অবতীর্ণ, তাহার তত্ত্বও ইহাতেই নিহিত। জীবের সহিত জগদীশ্বরের যোগ গীতার যোগে সুস্পষ্ট। মহাভারতের ঋষি ও প্রণেতা বেদব্যাসের চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করি।"

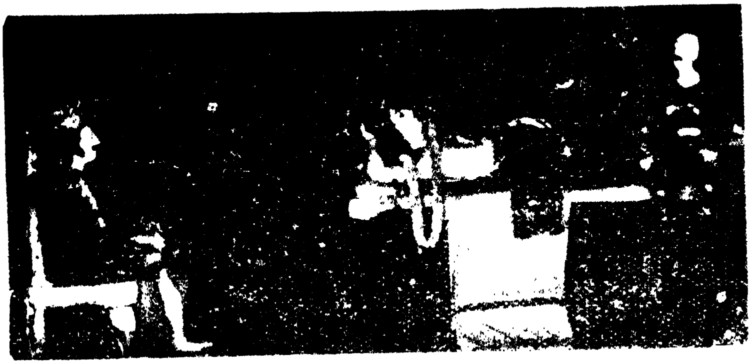
২য় দৃশ্য

"কুরুক্ষেত্র ভারতের মহাশ্মশান। ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য এইখানেই চির-অস্তমিত হইয়াছে। এইখানেই ভারতের নব-বেদ উচ্চারিত হইয়াছিল। ভারতের কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা উপস্থিত হওয়ায়, দেখা যায়, হস্তী ও অশ্ব ব্যতীত ৩৯৩৬,৬০০ জন মানুষ যুদ্ধার্থী উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কুরু-পক্ষে ৩ জন ও পাণ্ডব পক্ষে ৭ জন মাত্র যুদ্ধশেষে জীবিত দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভয়াবহ ধ্বংসলীলা আর কখনও হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্য ভারতের অমৃত উত্থিত এই মহা-বিপ্লবেই হইয়াছে। তাহাই গীতার যোগ।

এই মহাযুদ্ধ হইতে জাতিকে বিরত করার চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌরবগণ কর্ত্তৃক তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। পক্ষপাত-বিবর্জ্জিত হওয়ার জন্য তিনি একদিকে নিজেকে, অন্য দিকে অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা দিয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। কুরুরাজ সৈন্যবলই শ্রেয়ঃ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই পার্থসারথি।

৩য় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গণে উভয় পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ উপস্থিত হইলে, যুদ্ধকাল আসন্ন বুঝিয়া কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধবৃত্তান্ত জানিবার জন্য ধর্ম্মপরায়ণ রাজমন্ত্রী সঞ্জয়কে কুরুক্ষেত্রের বিবরণ দিতে আদেশ করেন। মহর্ষি বেদব্যাস, সঞ্জয়কে



শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন (২য় দৃশ্য)

দূরে থাকিয়া যুদ্ধ সন্দর্শন, কুরুক্ষেত্রের বীরবৃন্দের বাক্যাদি শ্রবণ ও তাঁহাদের মনোভাব অবগত হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন। গীতার বাণী মহামতি সঞ্জয়েরই। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥

ইহার উত্তর সঞ্জয় যাহা বলিলেন, তাহাই—

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"।"

৪র্থ দৃশ্য

কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন দেখিলেন—জয়াশা চরিতার্থ করিতে হইলে আত্মীয়-স্বজন-হত্যা অনিবার্য্য। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য যাহাদের জন্য, তাহাদিগকে হত্যা করিতে হয়। তিনি তাই যুদ্ধে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ করিলেন। কিন্তু বিবেক সায় দিল না। ইহা মনের ছলনাও তো হইতে পারে। তাই তিনি বলিলেন—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

অনুগত না হইলে, সাধন মিলে না, সত্য-দর্শন হয় না। অর্জ্জুনকে অনুগত দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয় স্বজনের প্রতি মায়াবশতঃ তাঁহার যে কার্পণ্য, তাহা হইতে তাঁহার মুক্তির জন্য আত্মার অমরতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহাকে যোগ দীক্ষা দিলেন—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"

আসক্তি থাকিতে ঈশ্বর-যুক্তি মিলে না। তাই ভগবদিচ্ছার অনুগত হইয়া যে কর্ম্ম, তাহাতে আসক্তি রাখিতে নাই। কাম থাকিতে, আসক্তি দূর হয় না। এই হেতু তিনি ঈশ্বরা-আরাধনা-রূপ কর্ম্ম করিয়া অর্জ্জুনকে কামজয়ের মন্ত্র দিলেন—



সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্র ৩য় (দৃশ্য)

"জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপম্ দুরাসদম্॥"

৫ম দৃশ্য

নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের পর জ্ঞান-যোগ। জ্ঞান হইলেই ভাগবত জন্ম ও ভাগবত কর্ম্ম অনুভূত হয়। জ্ঞানে কর্ম্ম অন্বিত হইলে, উহা বন্ধন না হইয়া মুক্তির কারণ হয়। তখন কর্ম্ম সংসার-ধর্ম্ম নহে, ঈশ্বর-সাধন। উহা ব্রহ্ম-মূর্ত্তি ধরে। প্রতি কর্ম্ম মন্ত্রময় হয়।

ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

এই অবস্থায় ইষ্টদর্শন হয়। ইষ্টের জন্ম ও কর্ম্ম আর কিছু নহে—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানাম্ সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

কিন্তু এই ব্রহ্মকর্ম্মেও সাধক সন্তুষ্ট নহেন, তাই অর্জ্জুন বলিলেন—

"দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম্॥"

নরদেহধারী নারায়ণের ঐশ্বরিক রূপ-দর্শনের লালসা স্বাভাবিক এবং ইহা না হইলে সাধন জমে না।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন। দেবতারাও এ রূপ দেখিতে সমর্থ নহেন। বেদে, তপস্যায়, দানে, যজ্ঞে এ রূপের দর্শন সম্ভব নহে। অর্জ্জুন দেখিলেন—ভক্তির সহায়তায়। যে ভাগবত-কর্ম্মপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত, নিষ্কাম-চিত্ত, এ রূপ তাহারই দর্শনযোগ্য হয়। কিন্তু এ বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া জীব বিস্ময়বিহ্বল হয়, শান্তি পায় না। অর্জ্জুনেরও তাহাই হইল। তাই শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিলেন "হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ-রূপ-দর্শনে আমি প্রসন্ন ও প্রকৃতিস্থ।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন "আমাকে যথার্থরূপে জানা শুধু দর্শনে নহে, আমাকে অভেদরূপে পাওয়ায়।" ঈশ্বর ও জীবে এই অভিন্নতাই যোগসিদ্ধি। অর্জ্জুনের ইষ্ট-নিরূপণ হইয়াছিল। তাই নরতনু দেবকী-নন্দনেই তিনি বিশ্বমূর্ত্তি এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি দুইই দেখিলেন। তাহার পর যোগসিদ্ধির কথা।



অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন (৬ষ্ঠ দৃশ্য)

৭ম দৃশ্য

ঈশ্বরমূর্ত্তি নরদেহ-ধারী নারায়ণ অর্জ্জুনের সম্মুখে; কিন্তু জীব নিরাকার ভগবানের উপাসনাও করে। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ইহার উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দিয়াছেন। মানব-তনু গ্রহণ করিয়া মানব-মূর্ত্তি ভগবানে ভক্তিসুলভ ও সহজ। নিরাকার ভগবানে আসক্ত-চিত্ত যোগী অধিকতর ক্লেশ করে। জীব স্বভাবতঃ দেহাভিমানী, তাই এইরূপ ব্রহ্ম-নিষ্ঠা দুর্লভ।

সর্ব্বকর্ম্ম যখন ভগবানের হয়, আর এই জ্ঞান যখন নিরন্তর থাকে, তখন সতত ভগবানে একাগ্রচিত্ত থাকা অসম্ভব হয় না। তাই বুদ্ধির সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরগত-চিত্ত ব্যক্তি সংসার-ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হয়। গীতার সাধন ও সিদ্ধি এই দুইটি শ্লোকে নিহিত। ইহাই গীতার যোগ।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যোগী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽপি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এই মন্ত্র-জপ, এই মন্ত্র-স্মরণ গীতার যোগপথ।

মানবজাতিকে তাই বলিতে ইচ্ছা হয় "তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাম্।"

৮ম দৃশ্য

কর্ম্ম ঈশ্বর-সমর্পিত হইলে, কর্ম্মের পরিণতি সেবায়। যাহা খাই, হোম, দান, তপস্যা কিছুই নিজের জন্য নহে, সব ভগবানের জন্য। এইরূপ কর্ম্মই সেবা নামে অভিহিত। সেবায় ঈশ্বর-কৃপা, কৃপায় দিব্য-চক্ষু লাভ হয়। অন্তরে শ্রদ্ধা জাগে। শ্রদ্ধায় ইষ্টে রুচি ও রতি। ভগবানে এইরূপ একাগ্রতায় ভাগবত জ্ঞান-লাভ হয়। জ্ঞানে অমিশ্রা



ঈশ্বরযুক্তির অনুভূতি (৮ম দৃশ্য

ভক্তির উদয়। 'ভক্তই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। গুণ ও কর্ম্ম শ্রীভগবানের লীলা মূর্ত্তি। তাহাতেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ঈশ্বর-গতি, ঈশ্বর-ভাব-লাভের ইহাই পথ। তাই গীতার কর্ম্মসূত্র ধরিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তি। কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা ভক্তিলাভ। ভক্তিই ঈশ্বরযুক্তি দিয়া থাকে। গীতার মন্ত্র বিশ্বজনীন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। অতএব কর্ম্মের পর সেবা। সেবায় কৃপা। কৃপায় শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধায় রতি। রতিতে জ্ঞান। জ্ঞানে দর্শন। দর্শনে ঈশ্বর-যুক্তি। সাধনার ইহাই ক্রম। ইহাই গীতার যোগের মর্ম্মশিক্ষা।

সমাজ-চিত্র

তারপর "সমাজ-চিত্রের" কথা। পর পর পাঁচটী দৃশ্যে সমাজের প্রাণস্পর্শী অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলি মনোরম দৃশ্যের সহিত এমন সুন্দর ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া প্রত্যেকের চিত্তই বিস্ময় ও পুলকে অভিভূত হইত। কেবল একটী দৃশ্য আলোকচিত্রে লওয়ার সুবিধা না হওয়ায় বাদ পড়িয়াছে। উহার একদিকে অকাল মৃত্যুর কশাঘাতে এক তরুণের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে পতি-বিয়োগ-কাতরা পত্নী, অপগণ্ড শিশু-সন্তানগণ এবং অন্যদিকে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা শক্তি পরীক্ষার রহস্যজনক চিত্র, গৃহের দরজা উভয় দিক্ হইতে উভয়ে ঠেলিয়া কেহই জয়লাভ করিল না। লেখাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে পাঠকগণ কথঞ্চিৎ রসানুভূতি করিতে পারিবেন।

নারী-পুরুষের সত্য সম্বন্ধ

নারী—চায় শ্রদ্ধা ও পূজা, চায় সম্মান। চায় না স্বাধীনতা, কর্ত্তৃত্ব। নারীচরিত্র গড়ে সেবায়, পুরুষের আশ্রয়ে। ইহার ব্যভিচার সর্ব্বনাশের কারণ হয়।



২য় দৃশ্য ১ম দৃশ্য

(১ম দৃশ্য) নারীর অবনতি

স্বামী—"অবাধ স্বাধীনতা। অপরিসীম কর্ত্তৃত্ব সবই দিয়েছিলাম তোমায়। কিন্তু—"

স্ত্রী—"ক্ষমা কর আমায়।"

স্বামী—"ক্ষমা সুলভ, কিন্তু প্রেম-বীর্য্য জন্ম নিতে চেয়েছিল তোমার মধ্যে, তাহা অঙ্কুরেই নষ্ট ক'রে ফেল্‌লে, মোহে, সম্মোহনে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

(২য় দৃশ্য) নারী-পূজা

স্বামী—"মন বুদ্ধি সবখানি দিয়ে দীর্ঘ জীবন সেবা দিয়েছ। কত অত্যাচার—শ্রদ্ধার জলে সব ভাসিয়ে দিয়ে আমায় নূতন জন্ম দিলে, দেবি! পূজা নাও। হৃদয়ের অনবদ্য অর্ঘ্য তোমার চরণেই অর্পণ করি, পুরুষ-জন্ম সার্থক হোক।"

খাদ্যের ব্যভিচারেই ব্যাধি ও অকাল-মৃত্যু

পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে ভোজন প্রশস্ত। একাগ্র-চিত্তে খাইতে হয়। অসময়ে খাইতে নাই। পর্য্যুষিত অন্ন-ভোজনে ব্যাধি হয়। শুষ্ক ফল, শাক ও মাংস ভক্ষণ করিতে নাই। অম্ল-দ্রব্য বা গুড়-পক্ব দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভোজন নিষিদ্ধ। সার উদ্ধৃত দুগ্ধ সেবন করিও না! মধু, অম্ল, দধি, ঘৃত, শক্তু বাকি রাখিয়া খাইও না।

ভোজনকালে প্রথমে মধুর, তারপর লবণ, তৎপরে অম্ল, পরিশেষে কটু ও তিক্ত রস ভোজন করিতে হয়।

পূর্ব্বে তরল, মধ্যে কঠিন, শেষে দ্রবণীয় বস্তু ভোজন করিলে বল, আয়ুঃ ও আরোগ্য হাতের মুঠায়।

ভোজন—উপাসনা। কেন না, ভোক্তা স্বয়ং ভগবান। এই চেতনায় নানাবিধ ভুক্ত অন্ন আরোগ্য-প্রদ হয়। ইহাই নিরবচ্ছিন্ন সুখের কারণ।

(৩য় দৃশ্য) খাদ্যের ব্যভিচার

কর্ত্তা—"দুই হাজার টাকা ইন্‌সিওর করা রইল, বুঝে চ'লো। ব্যাধি আর অকালমৃত্যু। শুধু তুমি নও, অনেক অবলা আশ্রয় হীনা হয়।"

(৪র্থ দৃশ্য) সদাচারের পরিণাম

গৃহিণী—"বুড়ো বয়সে বল-পরীক্ষা স্ত্রীর সঙ্গে! খোল তো দোর, কেমন সাধ্যি!"

কর্ত্তা—"যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ"—গিন্নি, হারজিৎ কারু হ'ল না, ৬৫ বৎসর বয়সে তোমার বাহুবলের বহরে আমার জোরের কসরৎ সার হ'ল। এখন দরজা খোল, ঘরে ঢুকি।"

দম্পতির কর্ত্তব্য—গার্হস্থ্য-বিধান

অতি-কেশা, অল্প-কেশা, অতি-কৃষ্ণা, অতি-পিঙ্গলা, বিকলাঙ্গী, কটুভাষিণী, পক্ষশূন্য নেত্রা, লোমশ-জঙ্ঘা, উন্নত গুল্‌ফা এবং হাস্যকালে যাহাদের গণ্ডে গর্ত্ত সৃষ্টি হয়—এমন নারী প্রায় সর্ব্বনাশী হয়।

শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে, প্রাঙ্গণে, তীর্থে, গোষ্ঠে, জল-মধ্যে



৬ষ্ঠ দৃশ্য ৫ম দৃশ্য

প্রত্যূষে, সন্ধ্যায়, মলমূত্রের বেগ থাকিতে স্ত্রীসংসর্গ করিতে নাই। কীর্ত্তিনাশ হইবে। কখনও পরস্ত্রী-গমন করিতে নাই। তাতে অস্থিনাশ ও আয়ুঃক্ষয় হয়। ঋতুকালে পুংনামক নক্ষত্রে, যুগ্ম রাত্রিতে স্বপত্নীগমনে গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য সুরক্ষিত হয়।

অস্নাতা, পীড়িতা, রজঃস্বলা, কুপিতা, গর্ভিণী, ক্ষুধার্ত্তা এবং অতিভোজন করিয়াছে যে নারী, তাহাতে উপগত হইতে নাই।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে স্ত্রী-সম্ভোগে শান্তি নষ্ট হয়। এই নীতি যাহারা অমান্য করেন, তাঁহাদের কুপুত্র অবশ্যম্ভাবী।

(৫ম দৃশ্য) কুসন্তান

পুত্র—"আপনি বাঁচলে বাপের নাম! কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে আমারই পেট চলে না। বুড়ো হয়েছ, যমের বাড়ী যাওয়ার নামটি নেই।"

পিতা—"ধন্যি ছেলের জন্ম দিয়েছিলাম গিন্নি! কলিকাল!"

মাতা—"আমি গর্ভে ধরেছি; ছেলের তারিফ তোমার।"

(৬ষ্ঠ দৃশ্য) সুসন্তান

পুত্র। "কিছু কষ্ট নেই মা! ব্যস্ত হয়ো না। বিশ মাইল কেন, এখনও ৫০ মাইল হাঁটতে পারি। অর্দ্ধোদয় যোগ; পয়সা নাই ব'লে কি ৮২ বছরের বুড়া মা আমার গঙ্গা নাইবে না! তবে কি জন্যে সন্তান গর্ভে ধরেছিলে!"

ধর্ম্ম ও অর্থ

গুণ ও বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ হয়। দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, পৃথিবী-পালন, পশু-পালন, বাণিজ্য, কৃষি, সেবা প্রভৃতি বৃত্তিই স্ব স্ব প্রকৃতি বুঝিয়া গ্রহণ করা বিধেয়। ধর্ম্ম বৃত্তির পথ প্রদর্শন করে। ব্রহ্মচর্য্যই ধর্ম্ম। ধর্ম্মেরই অঙ্গ অর্থ। যাহার ব্রহ্মচর্য্য নাই, তার অর্থ থাকিতেও সুখের অভাব। এইজন্য স্বধর্ম্ম-রত জীবনে যে বৃত্তি প্রশস্ত, তাহাই গ্রহণীয়। অভাবের তাড়নায় ইহাতে ব্যভিচার, দারিদ্র্য-দুঃখই দেয়।

(৭ম দৃশ্য) স্ববৃত্তি বর্জ্জনে

স্ত্রী—"খেতে দিতে পার না, বিয়ে করা কেন! পরণের কাপড়খানাও সাতত্যালি দিয়ে গুছিয়ে পরি, তাই লজ্জা-রক্ষা। খুব পুরুষ!"

স্বামী—"আরে খাট্‌তে কসুর করি কি! ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলোয় না। ছেলেটার স্কুলের মাইনে দিতে পারি নি—খেলিয়ে বেড়ায়। জামাইবাড়ী তত্ত্ব করিনি—মেয়ে পাঠায় না। করি কি বল তো!"

স্ত্রী—"মুরদ না থাকলে নানা কথা! যমেরও অরুচি আমি!"

(৮ম দৃশ্য) স্ব-বৃত্তি রক্ষণে

পিতা।—"চোগাচাপ্‌কান খোল।"

পুত্র—"কেন?"



৮ম দৃশ্য ৭ম দৃশ্য

পিতা—"পড়াশুনার কড়ি যুগিয়েছি। খেত-খামার আর খোঁয়াড়ের গরু। ঘরেই আমার অন্নপূর্ণার আসন। ঘর থেকে কড়ি গুঁজে ওকালতি, জাত-ব্যবসা নয়। লেখাপড়া শিখেছ, জমি-জায়গার উন্নতি কর। নিজের বৃত্তি নিয়ে থাক্‌লে, অর্দ্ধেক রাত্রেও অন্ন জুট্‌বে। লক্ষ্মীছাড়া হতে হবে না।"

শান্তি ও সদাচার

সদাচারেই শান্তি। সদাচার সাধুর আচার। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ এবং দুই সন্ধ্যা উপাসনা সদাচারের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

অধিক নিদ্রা, অধিক জাগরণ, অধিক স্নান, অধিক ভোজন করিতে নাই। কাহারও সহিত বিবাদ করিতে নাই। গুরুজনের সম্মুখে বিনয়ী হইতে হয়। দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করিতে নাই। স্ত্রীলোককে অবজ্ঞা করিতে নাই। পিতৃ-লোকের জন্য পিণ্ড, দেবতার জন্য উৎসর্গ, অতিথির জন্য অন্ন, ঋষির জন্য স্বাধ্যায়, প্রজাপতির জন্য অপত্য, ভূতের জন্য বলি, সকলের জন্য সত্য। নিজের জন্য কিছুই নাই। ইহাই সদাচার। ধর্ম্মই ব্রহ্মচর্য্য। অর্থ গৃহ। কাম লোকহিত। মোক্ষ নিরাসক্তি। এই চতুর্ব্বর্গের সাধন ঈশ্বর-শরণে স্বতঃই হইয়া থাকে। সদাচারী ঐহিক অখণ্ড সুখ ও পারত্রিক পরমানন্দ লাভ করে।

(৯ম দৃশ্য) শান্তিহীন সংসার

কর্ত্তা—"পূজার দিনে একি কুরুক্ষেত্র! রক্তে যে ভেসে গেছে! খুন করবি নাকি?"

গৃহিণী—"তোমার সংসার তুমি নিয়ে থাক। এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড আর সইতে পারি না। কচা-কচি লেগেই আছে দুই বউয়ে। তোরা বেটাছেলে, কোঁদল করতে এলি কেন?"

কর্ত্তা—"দালানের প্রতিমা দালানেই থাক্‌। চল গিন্নি, কাশী যাই। এ ঘরে শান্তি নাই। অর্থ আছে, স্বস্তি নাই, অনাচার ক্রমেই বাড়ে।"

(১০ম দৃশ্য) সংসারে শান্তি

কর্ত্তা—"লোকে স্বর্গ চায়, ব্রহ্মলোক চায়, নির্ব্বাণ মুক্তি চায়। আমি চাই সংসার। যুগ যুগ সেই 'হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল!"

গৃহিণী—"কেন বলতো?"

কর্ত্তা—"দেখ না, ঠাকুর-ঘরে বৌমা চলেছে পূজায়। ধূপ ধুনা, ফুলের গন্ধে বাড়ী মাতেনি শুধু, শান্তির আনন্দে বুকে তুফান উঠ্‌ছে। আর তুমি!"

গৃহিণী—"আমি আর কি!"

কর্ত্তা—"উষার রঙ্‌ সিঁথিতে। হে—হে—"

১৩৪৫ খৃঃ অক্ষয়া তৃতীয়া পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। এই উপলক্ষে প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থি ভবনের ছাত্রবৃন্দকে লইয়া গঠিত স্বেচ্ছা-



১০ম দৃশ্য ৯ম দৃশ্য

সেবকবাহিনীর সুদীর্ঘ দিবসব্যাপী আন্তরিক সেবা, অক্লান্ত শ্রম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎসবের সমাপ্তি-সভায়, সঙ্ঘদেবতার ভবিষ্যদ্বাণী—"বর্ষে বর্ষে তাহার আয়োজন প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ করিবে।" তাঁহার বাণী সত্য হউক, আমরা এই প্রার্থনাই করি। আগামী বর্ষের অক্ষয়া তৃতীয়া জাতির ধর্ম্মপ্রাণ উদ্বুদ্ধ করার জন্য সঙ্ঘ-



অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসবে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী

নব যুগের এই জাতি-তীর্থে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে যে ধর্ম্মামৃতে এই পুণ্য-তিথিতে অবগাহিত হইতে হইবে, প্রতিষ্ঠাতা সমধিক উদ্বুদ্ধ হইবেন—এই আশাই আমরা পোষণ করি।

ঋতুবরণ

(গান)

সেন মজুমদার

জাগ শাওন মেঘ হেরি' সাগরিকা,
সুনীল-বসনা, গলে নীপ-মালিকা।
তব অঙ্গের শ্যামল ছায়া
আনুক নভে কাজল মায়া—
ঝঙ্কারি' মল্লারে নব গীতিকা।

তুলি' নীলোৎপল, বাঁধ কবরী,
পর বলাকা-অঞ্চল-নীলাম্বরী।
সিন্ধু-নীল নয়নে চাহি'
তমাল-কুঞ্জ পথ বাহি',
এস বরষা-উৎসব অভিসারিকা।

দাবী

(গল্প)

শ্রীসরল দাশগুপ্ত

"অরুণাদি', তুমি আমায় সমাজের ভয় দেখাচ্ছ, আমি ত মোটেই ও ভয় করি না। সমাজকে সম্মান দেখাতে গিয়েত নিজের বুকটাকে মরুভূমি করে দিতে পারি না। যে সমাজ আমার সত্যিকারের দাবী মেনে নিতে পার্ব্বে না, আমি কেন ঐ সমাজের পায়েই আত্মবলি দিতে যাব? অরুণাদি', যা'রা চায় মান, অপমান, সুখ, দুঃখের মাঝে বেঁচে থাকতে—তা'রাই চায় সমাজ। সমাজ আমায় নিয়েই কর্ব্বে কী, আর আমিই বা সমাজ দিয়ে কর্ব্ব কী? তোমাদের ঐ সমাজের কথা শুনলেই আমার শরীরটা জলে উঠে। মনে হয়—দেই একবার সমাজের বুকটায় আগুন ধরিয়ে। যাক ওরা ফিরে ঐ বনে জঙ্গলে। এতে কতটুকু ভাল হবে জান, ন্যায়ের ধুয়া ধরে কেউ আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না। দেবতার ধ্যানে বসে চুরির ভাবনা ভাববে না। ভাল জিনিষটাই খারাপ। ওর মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই নয়। মানুষ যখন আমাদের মত ছিলনা, মানে, প্রগতির দিকে এতোটুকু এগোয় নি, ততদিন তা'দের মাঝে এসব ছিল না। কিন্তু মানুষ যতই সভ্য হতে লাগল, ততই নকল জিনিষগুলি হ'ল তা'দের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জান অরুণাদি', রঙ্গিন কাঁচ মণিমুক্তার চেয়েও বেশী ঝলকায়। এ জিনিষটা তখনই ভাল করে দেখবে, যখন তুমি কলকাতার পরেশনাথের মন্দির দেখে আগ্রার তাজমহলে দেখবে। সুখ দুঃখ যারা সমান ভাবে ভাগ করে নেয়, তা'রাই ত বন্ধু; কিন্তু কই, তোমার দুঃখে ঐ সমাজ কী করেছিল? সমাজ ত একবারও তোমার দিকে ফিরে চাইল না। বরং সমাজই চেয়েছিল তোমাকে পথে বসিয়ে মজা দেখতে। তবু তুমি আমায় ঐ সমাজের ভয়ই দেখাচ্ছ? মনে হয় এই পচা নোংরা সমাজটা মরে গেলেই বাঁচি। দেখ অরুণাদি', ঐ সমাজের কথা আর মুখেও এননা। মরতে হয় মরুক সমাজ, আমি সমাজের জন্য মরতে যাব কেন? আমি থাকব সুখে।"

এমনি করে হঠাৎ পাগলের মত ঢুকে রথীন আমায় অনেক কিছু বলে আবার হঠাৎই চলে গেল। কিন্তু তার কথাগুলো আমায় মস্ত বড় ধাক্কা দিয়ে গেল। মিলনাকাঙ্খী দুইটী তরুণ প্রাণের আমিই ছিলাম মস্ত বড় বাধা। রথীনের কথাগুলো সত্যিই আজ আমায় এক মস্ত বড় সমস্যার সমাধান করে দিল। রথীনকে কত ভয়ই দেখিয়েছিলাম—সমাজের ভয়, মা, বাবার ভয়—আরো কত কী। কিন্তু আজ—আজ ওর দাবীটাই বড় বলে মেনে নিতে হ'ল।

রথীন কুমারী মীরাকে ভালবাসে। এ ভালবাসার প্রতি একদিনও সম্মান দেখাতে পারিনি। বরং যখন রথীনের মুখে ওসব কথা শুনেছি, তখনই ওদের প্রতি ঘৃণার ভাব দেখিয়েছি। কিন্তু আজ আর পারলুম না। আজ সমগ্র মনটা ওদের প্রতি সমবেদনায় ভরে উঠ্‌ল। মনে পড়ে, আজ থেকে ১৬ বৎসরের একটী প্রভাত বেলার কথা—ঠাকুর যখন সাহেব ক্লাবের পাশ থেকে কুমারীকে কুড়িয়ে আনেন।

জানিনা কোন দুই হতভাগ্য নরনারীর অবাধ্য যৌবনের ফলে মীরা এসেছিল ধরার বুকে ভেসে। সমাজ মীরার মায়ের উপর এমনি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তা'র মাতৃ-হৃদয়ও মীরাকে কন্যা বলে ঘরে তুলে নেবার সাহস দিতে পারলে না। ফেলে গেল সাহেব ক্লাবের পাশেই।

অনেকেই অনেক সাহেবিআনা নাম রাখতে চাইলেন; শেষটায় ঠাকুর নাম রেখেছিলেন কুমারী মীরা দেবী। সেই অবধি আশ্রমের সবাই কুমারী মীরা বলে ডাকে। আজ মীরা ষোড়শী। মন-যমুনার দুই কুল ছেপেই যৌবনের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

রথীনের বয়স আঠার। আশ্রমেই কলেজে পড়ে। তা'র বাবা শিলং প্রবাসী বাঙ্গালী। পাঁচ বছরের সময়ই তা'র বাবা তা'কে আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওদের কিশোর বয়সের ভাবই এখন প্রেমে রূপ নিয়েছে।

মীরা নিজের সম্বন্ধে বড় সজাগ। কস্তুরীর গন্ধে হরিণী পাগল হয়, মীরা যৌবন আবেশে উচ্ছল হয়নি। তা'র সমস্ত দেহে জড়িয়ে ছিল এক পবিত্র সংযম। তা'র যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার চপলতা একটুও ছিলনা। তাই রথীনকেও এ বিষয়ে সজাগ করে দিতে ভুলেনি। যখন মনে পড়ে মীরার করুণ চাহনির কথা, আমার মন পাগল হয়ে ওঠে। মনে হত সমস্ত যুক্তি, সমস্ত তর্ক গঙ্গার পবিত্র জলে বিসর্জ্জন দিয়ে রথীনকে বলি, "রথীন মীরা তোমায় চায়; ওকে তুমি নাও।" আবার অমনি সমাজের কথা, আভিজাত্যের গরিমা মনের কানায় কানায় ভরে উঠ্‌ত। ওদের কথা পড়ে থাকত বহু পেছনে।

মনে পড়ে একদিনের কথা—একদিন বিকেল বেলা মাঠের ধারে—মীরা অন্তহীন নীল আকাশের দিকে চেয়ে কী ভাবছে জানি না। আমি আর রথীন বেড়াতে বেড়াতে ওর পাশেই গিয়ে দাঁড়িয়েছি। রথীন মীরাকে বল্ল, "মীরা, আমি শিলং যাচ্ছি, যাবে চল আমার সঙ্গে।" মীরা কী করুণ সুরেই না বলেছিল, "রথীন, তুমি আমায় নিতে পার্ব্বে? আমায় যে কেউ নিতে যাবে না।" আজ ভাবি, ঐ দিন মীরার কত বড় অন্তর-বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। রথীন শুধু আমার ভয়েই কিছু বলতে পার্ত্ত না। হয়ত তা'র অন্তর বলত, "আমিই তোমায় নিতে যাব মীরা।"

রথীন যা'তে মীরার পথে না দাঁড়ায় তা'র জন্য অনেক চেষ্টাই করেছিলুম। কিন্তু আজ—আজ মেনে নিতে হবে বলে সব দিক থেকে কারা যেন আমায় তাড়া করছে! আর দাঁড়াতে পারলাম না। দৌড়ে মীরার কাছে গিয়ে বল্লুম, "মীরা, বোন, আমায় ক্ষমা কর আমায় শুধু একটীবার বল, রথীন তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে তুমি সেখানেই যাবে?"

আনন্দে মীরা আমার গলা জড়িয়ে ধরল। আমার সমস্ত শরীর এক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় নেচে উঠ্‌ল। কোন্ এক অজানা আবেশে চোখ আমার বুজে এল। তা'র পর চেয়ে দেখি মীরা আমার বুকের উপর পড়ে কাঁদছে, সামনে দাঁড়িয়ে রথীন। আমার মনে কি ছিল জানিনে। মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করে নিলাম। নির্ব্বাক মীরার হাতখানি নিজ হাতে বিস্ময়বিমূঢ় রথীনের হাতে তুলে দিয়ে বল্লাম, "তোমাদের দাবীই আজ পূর্ণ হোক!"

মিলনোন্মুখ তরুণ-তরুণীর সশ্রদ্ধ অন্তর প্রণাম হয়ে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়লো। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদই বুঝি ওদের প্রার্থনা!

আলোর পথিক

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী (ফ্রেজারগঞ্জ

যে পথিক এল আঁধারের পারে
আলোক জনম চাহিয়া,
তা'রে ঘেরি চির-অমর-জীবন
মাধুরী উঠিল সাজিয়া!
মরণ বিহীন জীবন মহান
দিল সত্যের রূপ-সন্ধান—
জ্যোতিঃ-উজ্জ্বল মাধুরী-স্বর্গে
হৃদয় উঠিল জাগিয়া।

স্বরগে মরতে মহা-সমারোহে
সুষমা নিবিড় মিলনে,
নবীনা সৃষ্টি মূরতি লভিল
সাজিল মধুর কিরণে।
আলোকে পুলকে রহসে রভসে
নব-জাগরণে চেতনা সরসে
আঁধারের পারে আলোকের লোকে
অনুভূতি উঠে মাতিয়া।

বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়

১৮৮০—১৯০৫

প্রথম পর্য্যায়

শ্রীশ্রীনিবাস চৌধুরী

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—এখন কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী। বয়স প্রায় সত্তর, বাসস্থান কলিকাতা (বহুবাজার) দশ বৎসর বয়সে ফুটবল্ খেলার প্রচলন (ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে) করেন। সেকালের বয়েজ্ ক্লাব, ওয়েলিংটন ক্লাব, প্রেসিডেন্সি ক্লাব, ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব (চোরবাগানের মল্লিক বাড়ীতে) ও শোভাবাজার ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। উপরোক্ত প্রথম চারিটী ক্লাব ও শোভাবাজার রাজবাটী ক্লাব মিলাইয়া শোভাবাজার ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। শোভাবাজার ক্লাব বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রথম ক্লাব বলিয়া পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে বয়েজ ক্লাবই বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রথম ক্লাব। নগেন্দ্রপ্রসাদের পরিচালনায় শোভাবাজারের প্রধান কার্য্য হয়, কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে (বঙ্গদেশে) বাঙ্গালীর ক্লাব স্থাপনা করা। সেকালের প্রায় সমস্ত ক্লাবই শোভাবাজার ক্লাবের সাহায্যে ও উপদেশে স্থাপিত হয়। আই-এফ-এ গঠনে উদ্যোগী যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী ছিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ। ইনিই তৎকালীন কোচবেহারের মহারাজাকে ধরিয়া কোচবেহার কাপ দেওয়ান এবং শীল্ড তৈয়ারীর অধিকাংশ খরচ স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া দেন। ক্রিকেটে ইঁহারই উদ্যোগে হ্যারিসন্ শিল্ড্ প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত হয়। ইঁহারই চেষ্টায় সাহেবদের জন্য প্রবর্ত্তিত 'প্রেসিডেন্সি এথেলেটিক্ মিটিংয়ে' দেশীয়ের প্রতিযোগিতা করিবার পথ উন্মুক্ত হয় এবং শোভাবাজারের এস্, ব্যানার্জ্জি (ক্ষীর) উল্লম্ফনে (High jump) বার বার চ্যাম্পিয়ন্ হইয়া বাঙ্গালী 'এথ্লেটের' গৌরব বৃদ্ধি করেন। কেবল দেশীয়ের জন্য পরিচালিত (কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান 'লী' কর্ত্তৃক) 'ক্যালকাটা এথেলেটিক্ স্পোর্টসেরও ইনি একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন এবং 'শোভাবাজারের' কালী মিত্রকে ইহার বাৎসরিক অনুষ্ঠানের কার্য্যে সহায়তা করিতে নিযুক্ত করাইয়া দেন। ফুটবল্ (রাগ্বী ও এসোসিয়েশন্ দুইই) হকি, টেনিস, ক্রিকেট প্রভৃতি সকল খেলাই আয়ত্তাধীন করিয়া শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকুশলীর খ্যাতিলাভ করেন। ফুটবলে সেন্টার-ফরওয়ার্ড রূপে ইঁহার যশের অবধি ছিল না। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, বলিষ্ঠ দেহ, দ্রুতগতিসম্পন্ন ও মেধাবী এই খেলোয়াড়কে খেলায় নিযুক্ত অবস্থায় সাহেব খেলোয়াড় বলিয়া অপরিচিত ব্যক্তি ভ্রম করিত। আক্রমণবাহিনীর নেতারূপে খেলার মাঠে তাঁহার গুরুগম্ভীর আদেশ ও অপূর্ব্ব পরিচালনাশক্তি এবং সেন্টার-ফরওয়ার্ড রূপে তাঁহার dash ও charge দ্বিতীয় বাঙ্গালীতে আর কখনও দেখা যায় নাই। খাস গোরার দলও তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া 'হিম্সিম্' খাইয়াছে 'বাফ্সের' (Buffs) ন্যায় শক্তিশালী দল, তাহাদের পরে কলিকাতায় আর দেখা যায় নাই। সেই বাফ্সের বিরুদ্ধে খেলিয়া নগেন্দ্রপ্রসাদ তাহাদিগকেও 'খতমত' খাওয়াইয়া দেন। ১৯০২ পর্য্যন্ত ২২ বৎসর সমান তেজে ইনি খেলিয়াছেন। ম্যাচ খেলিয়াছেন সর্ব্বশুদ্ধ সাত শতের অধিক। দর্শক ও ক্রীড়ক সকলের নিকটেই 'হুজুর' বলিয়া ইনি পরিচিত ছিলেন। পুরাতনের যে দুই একজন আছেন তাঁহারা তাঁহাকে 'হুজুর' বলিয়া এখনও সম্বোধন করেন। ভারতীয়দিগের ফুটবল্ খেলার জন্মদাতা, বাঙ্গালী 'ছেলেপুলে' লইয়া এখনও খেলাধূলা করেন—দল গঠন করিয়া। দলের নাম—'নারায়ণী সাধনচক্র'। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কাব্যসাহিত্যে নগেন্দ্রবাবুর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। সেক্সপীয়রের পাঠক হিসাবেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। ধর্ম্মশাস্ত্রে নগেন্দ্রবাবুর অগাধ জ্ঞান। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার এক বালক পুত্র (বার বৎসরের) পিতার শিক্ষায় চণ্ডী ও বিরাট প্রভৃতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। অসীম দৈহিক শক্তিশালী, ক্রীড়াপটু নগেন্দ্রপ্রসাদের বাল্য ও যৌবনের জীবনধারা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই এই ভাবে পরিবর্ত্তিত বোধ হয় হইয়াছে।

নগেন সামন্ত—ওয়েলিংটন্ ক্লাবের শক্তিশালী ফুলব্যাক্ (full back) রাগ্বী ও এসোসিয়েশন্ দুইই খেলিয়াছেন। ওয়েলিংটনের পরে শোভাবাজার ক্লাবে ২।৩ বৎসর খেলেন। মোট খেলা ৫।৬ বৎসর। মৃত।

সতীশ মতিলাল—শোভাবাজারের একজন ফুল্ব্যাক্ (full back) গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ—দলের শোভা। কিকে (Kick) এর জোর যথেষ্ট। বাঁ পা' অবশ্য ডান পার মত 'চলিত' না। এই ত্রুটি আশ্চর্য্য রকমে মানাইয়া লইয়া তিনি খেলিতেন। খেলা ৭।৮ বৎসরের। ইণ্ডিয়া-গভর্ণমেণ্টের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কলিকাতার লোক। মৃত।

মোনা চৌধুরী—(শোভাবাজার) ফরওয়ার্ড। খেলার যেমন কায়দা তেমনি তেজ। মাথা খাটান আর কায়িক শক্তির সংমিশ্রণে ক্যাল্কাটা ক্লাবের জ্যাক্সন, হাণ্টারের (যাহাদের মত ফুল্ব্যাক্ কলিকাতায় আর দুইজন দেখা যায় নাই) তুল্য খেলোয়াড়ও হিম্সিম্ খাইয়াছে। লম্বে ছয় ফিটের উপর। সতেজে ৪।৫ বৎসর খেলিয়া ক্যাল্কাটার বিরুদ্ধে খেলিবার সময়ে একদিন জ্যাক্সন্ কর্ত্তৃক আহত হন—'নি ক্যাপ্' ভাঙ্গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন।—স্যার্ ৺আশুতোষ চৌধুরীর সহোদর। বহু বৎসর হইল মৃত।

বামাচরণ কুণ্ডু—(শোভাবাজার, হাওড়া স্পোর্টিং) ক্রিকেটে সমধিক খ্যাতিমান্ হইলেও ফুট্‌বলে 'এলেম'ও কম ছিল না। কলিকাতার সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু কোম্পানীর মালিক। মৃত।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ক্লাব, ওয়েলিংটন্ ও শোভাবাজার। প্রায় ২২ বৎসর খেলিয়াছেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী 'সেন্-স কোম্পানীর' বড়বাবু রূপে ইনি কর্ম্ম করেন বহুকাল। মাঠেও তাই 'বড়বাবু' নামে ইনি পরিচিত ছিলেন। 'টিমে' ইঁহার স্থান ছিল 'রাইট্ উইংয়ে'। 'বাঁ পা' ইঁহারও চলিত না—চলিলে সর্ব্বকালে ইঁহার তুল্য খেলোয়াড় হইতে পারিত না অন্য কেহই। তাঁহার দেহ যেন ইস্পাত। দৌড়াইতেন খরগোসের মত। বল লইয়া তাঁহার দৌড়ের ধরণ দেখিয়া দর্শক উল্লাস ভরে চীৎকার করিত—'Go on Burrababu'. বড়বাবুর সময়ে এবং তাঁহার পরে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় 'দৌড়দার' খেলা দেখিলেই 'মুসলমান ছোকরারা' গুণগ্রাহিতা দেখাইয়াছে, 'গো অন্ বড়বাবু' চীৎকারে—সেই খেলোয়াড়কে সম্মানিত করিয়া। 'বড়বাবু' ৭২-এর কাছাকাছি হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর ভালই ছিল—কয়েক বৎসর মাথার পীড়ায় তিনি কষ্ট পান। সম্প্রতি মৃত।

কালীচরণ মিত্র—'কেনাল্ ক্লাব' নামে এক ক্লাব করিয়া কালী মিত্র সেই ক্লাবের ক্যাপ্টেন হ'ন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি শোভাবাজার ক্লাবে যোগদান করেন এবং ১২।১৩ বৎসর নাগাড় এই ক্লাবেই খেলেন। প্রথমে ইনি ব্যাক্ খেলিতেন, পর হাফ্ ব্যাকে খেলেন। 'বাঁ পা' ইঁহারও চলিত না, তথাপি ইনি খেলায় যথেষ্ট সুনাম করেন। শোভাবাজারের ক্রিকেট্ টিমেরও ইনি একজন মাতব্বর খেলোয়াড়। আই-এফ্-এর ইনি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সদস্য। আই-এফ্-এর সহিত বহুবর্ষ ধরিয়া ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতায় এথেলেটিক স্পোর্টস ইত্যাদিতে জজ, রেফরি বা টাইমকিপার হওয়া ইঁহার লাগিয়াই ছিল। আই-এফ-এর কোচবেহার কাপ ও ইলিয়ট্ শিল্ড্ পরিচালনার ভার কয়েক বৎসর ইঁহারই উপর অর্পিত হয়। ছোট আদালতে ওকালতি করিয়া বেশ নামযশ করেন। বয়স এখন প্রায় বাহাত্তর। চক্ষের দোষ ঘটায় এখন গৃহাবদ্ধ হইয়া আছেন। অন্য বিষয়ে শরীর ভালই।

বিনয়প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—ক্লাব, শোভাবাজার। পুরাতনেরা বলেন ইঁহার তুল্য ক্রীড়াকুশলী ইঁহার পরে বঙ্গদেশে এখনও জন্মায় নাই। তাঁহার তুল্য ফুটবলে ব্যাক ও হাফব্যাক্ তখনকার কালের সাহেব খেলোয়াড়ের দলেও বিরল ছিল। দুপা সমান চালান, খেলার 'হদীশ' বোল আনা জানা ও সেই জানার ফলে খেলায় অপূর্ব্ব কুশলতা, ক্রীড়া-জগতে তাঁহাকে উচ্চ স্থান প্রদান করে। ক্রিকেটে ব্যাট্‌সম্যান্, বোলার ও ফিল্ডার হিসাবে তাঁহার সময়ে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। [illegible]দিগেও খেলায় তাঁহার কাছে পরাস্ত হইয়াছিলেন। নর্থক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপ, স্থাণ্ডারল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ, ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ প্রভৃতি তিনি একচেটে করিয়া লন। তাঁহার খেলার শ্রেষ্ঠতার জন্য বঙ্গদেশের তাৎকালীন শাসনকর্ত্তা বেল্‌ভেডিয়ারে তাঁহাকে প্রতি বৎসর আমন্ত্রণ করিয়া 'একজিবিশন গেমের' ব্যবস্থা করাইতেন। বি-এল্ পাশ করিয়া বিনয়প্রসাদ আলিপুর জজ্ কোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করেন।

কালীপদ মুখোপাধ্যায়—সর্ব্বকালে বাঙ্গালীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফুল্‌ব্যাক্। কেনাল্ ক্লাবে খেলা আরম্ভ করিয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজার ক্লাবে যোগদান করেন। বলিষ্ঠ দেহ। আক্রমণ নিবারণে অপূর্ব্বকুশলী। প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় তাঁহার পাশ দিয়া যাইবার চেষ্টা করিলে যেন হাওয়ায় পড়িয়া যাইত। প্রতিপক্ষের গায়ে 'কালী মুখুজ্যে' গা ঠেকাইয়াছে, কেহ দেখিতে পাইত না। দেখিতে পাইত আক্রমণকারী মাটি লইয়াছে। এ বিদ্যা 'কালী মুখুজ্যে' আয়ত্ত করিয়া লন শোভাবাজারের 'কোচ' বাফস্ রেজিমেণ্টের ইভান্সের নিকট হইতে। এই খেলোয়াড়কেও মুসলমান ছোকরারা সম্মানিত করিত, 'গো অন্ কালীবাবু' বলিয়া। চারিদিক হইতে আক্রমণকালেও অপূর্ব্ব ধীরতার সহিত কালীবাবু 'বল্ ক্লিয়ার' করিয়াছেন। তাঁহার বল্ মারার ধরণ অননুকরণীয়—রক্ষণ-বিভাগে যেখানে বল সেইখানেই কালী মুখুজ্যে। শেষাশেষি স্থাণ্ডাল্যের বিরুদ্ধে কোচবেহার কাপের খেলায় মোহনবাগানের হইয়া খেলিতে যাইয়া তাঁহার Knee capএ চোট লাগে। মোট খেলা প্রায় ১৫ বৎসর। ক্রিকেট্ খেলাতেও নাম-যশ যথেষ্ট করিয়াছিলেন। অক্টেভিয়স্ ষ্টীল্ কোম্পানীতে এসিষ্টাণ্টরূপে নিযুক্ত ছিলেন। মৃত।

যোগেন সিংহ—(শোভাবাজার) পাটনায় খেলিয়া কলিকাতায় আসেন। কুশলী ড্রিব্‌লার। গতি দ্রুত। খেলা অল্পদিনের। শ্রেষ্ঠ 'এথেলেট্'। 'লী-স্পোর্টসে' যোগদান করিয়া প্রথম বৎসরেই বাজিমাত করেন। বহু বৎসর ক্যালকাটা কর্পোরেশনের 'লাইসেন্স অফিসর' থাকিয়া এখন অবসর ভোগ করিতেছেন।

অমৃত পাল—(শোভাবাজার) সেণ্টার-হাফব্যাক্ সুবিখ্যাত ইণ্টারন্যাশন্যাল্ খেলোয়াড় উইল্‌ওয়ার্থের ধরণে ইনি খেলায় 'ইণ্ডিয়ন্ উইল্‌ওয়ার্থ' নামে খেলার মাঠে পরিচিত ছিলেন। কর্ম্মস্থল ক্যাল্‌কাটা টার্ফ ক্লাব। বয়স এখন প্রায় ৬৫।৬৬।

মণিদাস—(শোভাবাজার) রাইট্ হাফব্যাক্, ইস্পাতের মত মজবুত। পরিশ্রমী খেলোয়াড়। বহুবাজারের গাড়ীর কারখানা "এম্, দাস কোম্পানী"র মালিক।

মোনা ভট্টাচার্য্য—(বিশপ্‌স্ কলেজ) সেণ্টার ফরওয়ার্ড। অসাধারণ 'ড্রিব্‌লার'। 'বল' বশে রাখিবার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা। বল পাইলে বিপক্ষ দলকে চরকীর মত পাক খাওয়াইতেন।



নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী



অমৃত পাল



৺দুঃখীরাম



কালী মিত্র



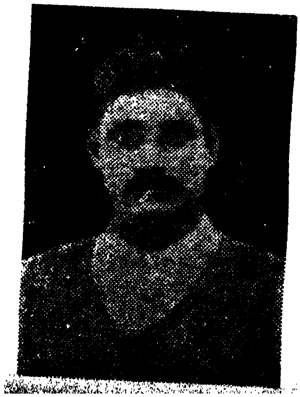
৺সতীশ মতিলাল



৺দ্বিজেন বসু



গতীশ পলসাই



বামে—

৺কালী মুখার্জ্জি

দক্ষিণে—

শরৎ সর্ব্বাধিকারী



হাওড়া ইউনাইটেডের ম্যাক্‌লিলেন ও 'মোনা'র খেলা ছিল এক রকমের। খেলা ১০।১১ বৎসর।

শরৎচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী—(হেয়ার স্পোর্টিং, শোভাবাজার) ফুল্‌ব্যাক্। পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র খেলিয়াছিলেন। এমন পরাক্রমশালী ব্যাক্ বাঙ্গালীর মধ্যে আর দ্বিতীয় দেখা যায় নাই। সাহেব কাগজওয়ালারা ইঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন—Bengal Tiger, একদিন খেলাতে 'নি ক্যাপ (Knee cap) জখম্ হওয়ায় খেলা ছাড়িয়া দিতে হয়। সুবিখ্যাত ক্যারেট্ মোরান্ কোম্পানীর সহিত পূর্ব্বে ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এখন সেই কাজ নিজ নামে করেন। বয়স প্রায় ৬২।

হরিদাস ভাদুড়ী—(শিবপুর কলেজ, শোভাবাজার), মোহনবাগান) রাইট্ উইং। বল্ লইয়া 'পিন্ পিন্' করিয়া ছুটিতেন। বল বশে রাখার ক্ষমতা বেশ ছিল। মৃত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—(মোহনবাগান, শোভাবাজার) সেণ্টার-ফরওয়ার্ড। নগেন্দ্রপ্রসাদের শিক্ষায় dashing খেলায় অভ্যাস করেন। চ'খকাণ বুজিয়া dash করা ছিল তাঁহার খেলার বিশেষত্ব। খেলা ৯।১০ বৎসর। আই, এফ-এর সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ও ফুটবল্ লীগ এসোসিয়েশনের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী প্রেসিডেণ্ট। ব্যারিষ্টার। মৃত।

সুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—(হেয়ার স্পোর্টিং, শোভাবাজার, চুঁচুড়া টাউন) খেলা প্রায় ১৭ বৎসর। গোল হইতে ফরওয়ার্ডে যে কোনও স্থানে সমান কুশলতার সহিত খেলা, এক সুশীলপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কাহাকেও খেলিতে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। ইঁহার আদি স্থান সেণ্টার-ফরওয়ার্ড। শরৎ সর্ব্বাধিকারী জখম হওয়াতে ব্যাকে খেলিতে ইনি বাধ্য হন। দ্রুতগতি, দুই পা সমান চালাইতে দক্ষ, গায়ে গা না ঠেকাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার অপূর্ব্ব কুশলতা এবং খেলা সম্বন্ধে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'জজমেণ্ট্' ইঁহার থাকায় ব্যাক খেলার প্রচলিত ধরণ ইনি উল্টাইয়া দেন। ব্যাক্ খেলিবার পূর্ব্বে 'Best centre forward's gold medal' ইনি জয় করিয়া লন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ইনি শীল্ড্ খেলিতে আরম্ভ করেন এবং প্রথম বৎসরেই জ্যাক্‌সন্-হাণ্টার ব্যাকযুক্ত ক্যাল্‌কাটা ক্লাবের বিপক্ষে একটী গোল করেন। শ্রেষ্ঠ All rounder এর খ্যাতিলাভ করিয়া ইঁহার খেলার শেষ বৎসরে (১৯০৫) ইঁহাদের দল (হেয়ার স্পোর্টিং যুক্ত চিন্‌সুরা টাউন) বাঙ্গালীর ফুটবল্ খেলার গৌরব বর্দ্ধন করে, শক্তিশালী খেতাঙ্গ-দল সমূহকে টপকাইয়া সেমি-ফাইনালে খেলিয়া। বাঙ্গালীর পক্ষে এ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। ক্রিকেটেও সুশীলপ্রসাদ ছিলেন unorthodox batsman. ফিল্ডিং করিতেন ছবির মত। এ্যাথেলেটিক্ স্পোর্টস্ ইত্যাদিতে ১৮ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন। সর্ব্বপ্রথম বে-সরকারী কাপ্ ভোলানাথ পাল চ্যালেঞ্জ কাপের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম। বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোর্ ও বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের একজন প্রধান কর্ম্মী। খেলার মাঠ হইতে সুদীর্ঘকাল বিদায় গ্রহণ করিলেও খেলাধুলার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ ইঁহার নখদর্পণে। বাঙ্গালীর খেলাধুলার সম্পূর্ণ ইতিহাস তাঁহার কাছে বাঙ্গালী পাইয়াছে। ইতিহাস লিখিয়াই ক্ষান্ত তিনি হ'ন নাই। খেলাধুলার বাঙালা পরিভাষা রচনা করিয়া খেলাধুলা সাহিত্যের পথ ইনি করিয়া দিয়াছেন। স্কটিস্‌চার্চের স্কুলে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য, 'সর্ব্বাধিকারী কাপ' দান করিয়াছেন। খেলাধুলার শুভার্থী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত। জামতাড়ার জনসাধারণ কর্ত্তৃক 'সর্ব্বাধিকারী প্যাভেলিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহারই সম্মানার্থ। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও শক্তিশালী জীবনী লেখক। ব্যারিষ্টার। বয়স ৬০।

নিতাই মুখুজ্যে—(চিন্‌সুরা টাউন্, হেয়ার স্পোর্টিং) রাইট্ আউট্। গতি খুব দ্রুত না হইলেও বল বশে রাখার কুশলতা এবং শত্রুব্যূহ ভেদ করিবার দক্ষতা এবং 'বল্ প্লেস্' করিবার কায়দার জন্য ক্রীড়ক সমাজে শ্রেষ্ঠাসন তিনি পান। একবার নহে দুইবার নহে উইকওয়ার্থকেও (International কাটাইয়া বল carry তিনি করিয়াছেন যখন ইচ্ছা। একা একা, উইকওয়ার্থকে ছাড়াইয়া যাইতে কোনো সাহেব খেলোয়াড়ও কখনো পারে নাই। Selfish game খেলিতে তাই বলিয়া তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না—যখন ফাঁক পাইতেন তখনই একটী 'ভেল্কি' লাগাইয়া দিতেন মাত্র। ভিক্টোরিয়া কাপের প্রতিষ্ঠাতা। 'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহের' সম্পাদক। সাহিত্যিক, নাট্যকার। বয়স ৬০-এর উপর।

তুলসী মণ্ডল—(চিন্‌সুরা টাউন, হেয়ার স্পোর্টিং) খালি পায়ে ব্যাক খেলিতেন—বুটপরা খেলোয়াড় (প্রতিপক্ষ) গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না। খালি পায়ের সংঘর্ষে গোরার বুটও জখম হইয়াছে। আঙ্গুলের ডগা দিয়া বল মারিবার তাঁহার কুশলতায় গোরারাও বিস্মিত হইয়াছে। ছয় ফুটের উপর লম্বা, ব্যাকে chinese wallএর ন্যায়ই দুর্ভেদ্য। আখ্যাও পাইয়াছিলেন—chinese wall. তাঁহাকে মাটি নেওয়াইতে কেহ কখনো পারে নাই। দুই পা সমান চলা, জোর কিক্, হেড্ করিতে ঘুণ। স্বপক্ষ corner kick পাইলে বিপক্ষকে টপকাইয়া কতবার 'হেড' করিয়া গোল করিয়াছেন। তুলসী থাকিতে corner kickএ বিপক্ষ কখনই গোল করিতে পারে নাই। দম অফুরন্ত। শ্রীরামপুর কোর্টের পদস্থ কর্ম্মচারী।

অন্নদা দাস—(সান্ স্পোর্টিং, হেয়ার স্পোর্টিং হাফ্ ব্যাক্। বিনয়প্রসাদের পরে বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাফ ব্যাক্। ছবির মত খেলা—যেখানে বল সেইখানেই অন্নদা দুই পায়ে ভেল্কি লাগাইয়া দিয়াছে। মারের কায়দা অননুকরণীয়। স্বপক্ষের ফরওয়ার্ডও ব্যাকের 'আসান'



৺বিনয়প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বিঃ দ্রঃ—[স্বর্গীয় বিজয়দাস ও শিবদাস ভাদুড়ীর ব্লক দুইখানি ঠিক ছাপিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নষ্ট হওয়ায় উহা মুদ্রিত হইতে পারিল না বলিয়া আমরা দুঃখিত।] —পঃ প্রঃ



তুলসী মণ্ডল



সত্যধেনু ঘোষাল



৺হরি চাটার্জ্জি



এস, চৌধুরী



সুশীল সর্ব্বাধিকারী



"গোবরা"



৺সুধীর ভট্টাচার্য্য

দিতে সতত জাগ্রত। কালো চুল না হইলে অন্নদার খেলা দেখিয়া অপরিচিত তাহাকে খাস বিলাতী খেলোয়াড় বলিয়া ভ্রম করিয়া বসিত। হেয়ার স্পোর্টিং উঠিয়া যাইলে অন্নদার 'বৃদ্ধাবস্থাতেও' মোহনবাগান সাগ্রহে তাহাকে টিম্‌ভুক্ত করে। বয়স এখন ৫৮-র কাছাকাছি।

রাধু কর্ম্মকার—(ন্যাশন্যাল, হেয়ার স্পোর্টিং) বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোল্‌কিপার। পুরাতন যুগের র‍্যাল্ আইরিসের ব্রেট্‌ফোর্ডের পরে রাধুর তুল্য গোল্‌কিপার আর দেখা যায় নাই। একাধারে রাধু খেলিত গোল্‌কিপারের খেলা এবং একজন ব্যাকের খেলা। আপনার 'রোঁদে' বাঘের মত সে বিচরণ করিত—গোলে বল কেহ গলায় সাধ্য কি। শট্ (shot) যে এঙ্গেলে (angle) বা যত জোরেই হউক না কেন কর্ম্মকার তাহার নাগাল ধরিবেই এবং গতিবদ্ধ করিবে। তাঁহার গোল বাঁচানর ব্যাপার দেখিয়া মনে হইত একই গোলে যেন 'একশো' গোল্‌কিপার খেলিতেছে। যুবাবয়সেই ইহধামের খেলাধুলা তাহার শেষ হইয়া যায়।

'গোবরা'—(ন্যাশন্যাল্) সেণ্টার-ফরওয়ার্ড। 'ব্রেণী' (Brainy) খেলোয়াড় বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বলের উপর কণ্ট্রোল্ যথেষ্ট। Passingএর কায়দা সুন্দর। Dribbling চমৎকার। শট্ (shot)ও নির্ঘাত। আত্মনির্ভরতা অসীম। খেলা ১১।১২ বৎসর।

হরি চাটুয্যে—(ন্যাশন্যাল্) 'লেফট ইন্' (Left-in) 'গোবরার জুড়িদার' বলিয়া খ্যাত। কেহ বলিত হরি চাটুজ্যের জোরেই গোবরা খেলে—কেহ বলিত গোবরার জন্যই হরির খেলা খোলে। 'বল প্রেসিংএ' চাটুজ্যের কায়দা অননুকরণীয়। stylish, খেলা শটের (shot) জোরও খুব।

এস্, চৌধুরী—(ন্যাশন্যাল্) ফুলব্যাক্। ডান বাঁ দুই পায়ের খেলা তুল্যমূল্য। সাহেবের দলে (হাওড়া ইউনাইটেড) এ পর্য্যন্ত বাঙালীর মধ্যে একা চৌধুরীই খেলিয়াছেন। প্রথম বাঙলা লীগ খেলোয়াড়ও ইনি। খেলার মত খেলা মাত্র ৮।৯ বৎসর।

সত্যধেনু ঘোষাল—(ন্যাশন্যাল্) ফুলব্যাক্। আত্মবিশ্বাস অসীম। ঘোরতর বিপদকালেও স্থির, ধীর। এই গুণের জন্য কতবার কত বিপদ কাটাইয়া হারা-ম্যাচে দলকে জিতাইয়া দিয়াছেন। ব্যারিষ্টার, কোচবেহারের জজ। খেলা ১০।১১ বৎসর।

ক্ষেত্র মিত্র—(ন্যাশন্যাল) ফরওয়ার্ড—রাইট্ আউট্, দ্রুত দৌড়বার। বল পাইলে প্রতিপক্ষের সামাল সামাল রব উঠিয়াছে।

সুধীর ভট্টাচার্য্য—(হেয়ার স্পোর্টিং, শোভাবাজার) ফরওয়ার্ড—লেফট আউট্। উচ্চগতিসম্পন্ন। ফাঁক পাইলে চক্ষের পলকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হইবার অদ্ভুত শক্তি। দৌড়াইতে দৌড়াইতে নিখুঁত সেণ্টার করা, গায়ে গা না ঠেকাইয়া হাওয়ার মত 'উড়িয়া যাওয়া' কিন্তু প্রয়োজন হইলে বিপক্ষের সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়া পর্ব্বতাকৃতি সুধীর করিয়াছে অপরূপ ভাবে। মৃত তাহার মধ্যমাগ্রজ বিজয় ভট্টাচার্য্য (এখন হাইকোর্টের এডভোকেট) ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন কুশলী খেলোয়াড়। সুধীরের পরবর্ত্তী সহোদর সুশীল ভট্টাচার্য্য (এখন তারকেশ্বরের মেডিকেল্ অফিসর) ও হেয়ার স্পোর্টিংয়ের। ইহারও বেশ খেলার কুশলতা ছিল।

ভণ্টু—হাফব্যাক্ (ন্যাশন্যাল) ক্রীড়াদক্ষতার সহিত শক্তির সংমিশ্রণে দলের সম্পদ বিশেষ।

অর্জ্জুন বসু—(সান্ স্পোর্টিং, হেয়ার স্পোর্টিং) হাফ্‌ব্যাক্। আপন দলের ফরওয়ার্ডের 'খোরাক' যোগাইতে সিদ্ধ। বিপক্ষ দলের ফরওয়ার্ডকে 'ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরার' অদ্ভুত ক্ষমতা। বুঝিয়া খেলার শক্তি অপরিসীম। সুসাহিত্যিক। মৃত।

সুকুমার সেনগুপ্ত—(হেয়ার স্পোর্টিং, টাউন) ফুল্‌ব্যাক্। লম্বে অল্প খাটো হইলেও 'জজমেণ্টে'র জোরে উচ্চাঙ্গের ব্যাক বলিয়া পরিগণিত। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে পূর্ব্বে স্পোর্টিং 'সাব এডিটরি' করিয়াছেন। পরে বেঙ্গল পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যও করেন। এখন অমৃতবাজার পত্রিকার 'স্পোর্টিং এডিটর'।

দুঃখীরাম—(এরিয়ন) সেণ্টার হাফ। 'জজমেণ্টে' সুপ। 'খাড়া অল্প খাটো হইলেও সেণ্টার-হাফের খেলায় তাঁহার 'জুড়ী' বড় ছিল না। শিক্ষাদানের (coaching) অপূর্ব্ব ক্ষমতা। কত খেলোয়াড় তিনি তৈরী করিয়াছেন সংখ্যা নাই। ক্রিকেট ক্ষেত্রেও তিনি তুল্য শক্তিমান। খেলা ১৫।১৬ বৎসর। মৃত।

অনাথ দাস—(মোহনবাগান) হাফব্যাক্। কর্ম্মঠ খেলোয়াড়। জিত, হার দলের যাহাই হউক, খেলার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমান উৎসাহে খেলিতে অভ্যস্ত। ডাক্তার। মৃত।

আমেদ—(মোহামেডন্ স্পোর্টিং) ফরওয়ার্ড। ব্যাকেও কখনও কখনও খেলিয়াছেন।

মহিম দত্ত—(হাওড়া স্পোর্টিং) ফুল্‌ব্যাক্। আক্রমণকারীকে সতেজে 'চার্জ্জ' করা এবং লম্বা বল মারার জন্য নাম হয়।

দেবেন চৌধুরী—(শোভাবাজার) গোলকিপার। প্রথম স্বদেশী ফুটবল্ প্রস্তুতকারক। 'ডি চৌধুরী' নামে স্বদেশী ফুটবলের ব্যবসা তিনি খুলেন। মৃত।

গিরিশ শর্ম্মা—(হেয়ার স্পোর্টিং) হাফব্যাক্। অফুরন্ত দম। আক্রমণ ব্যর্থ করিতে জোঁকের মত ধৈর্য্য। 'খেপ' (দৌড়াইয়া) ৫০।৬০ গজ দূরে তাঁর ধয্য বাঁধা। তাঁহারই জন্য 'খেপ্‌ইন্'

সম্বন্ধে নূতন কানুনের সৃষ্টি। 'শর্ম্মা কোম্পানীর' (ডাঃ ৺হরিশ শর্ম্মা প্রতিষ্ঠিত) মালিক। মৃত।

সতীশ পলসাই—(চন্দননগর ন্যাশন্যাল্) সেণ্টার ফরওয়ার্ড। দ্রুতগতি। একক-খেলার (Selfish Game) ঝোঁক বেশী। দম অফুরন্ত। বলের উপর আধিপত্য যথেষ্ট। আত্মনির্ভর। এখনও রেফারিগিরি করেন।

দাশরথি মুখোপাধ্যায়—(হেয়ার স্পোর্টিং) ফরওয়ার্ড—লেফটইন্, 'ব্রেনী' (Brainy) খেলোয়াড়। একক বা মেলতার খেলা যখন যাহা প্রয়োজন তখন সেই ভাবেই খেলিয়াছেন। শট্ (shot) বিশেষ কার্য্যকরী। 'কণ্ঠহার' নাটক প্রণেতা।

সুরেন সেনগুপ্ত—হেয়ার স্পোর্টিংয়ের শক্তিশালী ফুল্ব্যাক্। ফরওয়ার্ড লাইনে পাঁচজন ভাদুড়ী সমেত মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ফুল্ব্যাকের স্থান হইতে 'রিটার্ণ ভলি'তে (Return Volley) গোল করেন। এই ভাবের লম্বা মারে বিশেষ পোক্ত। 'বি ই' ব্রিজ-এঞ্জিনীয়ার রূপে ই-আই-আর এ নিযুক্ত হ'ন। বয়স এখন ৬০-এর উপর। পেন্সন ভোগী।

মুক্তিদারঞ্জন রায়—(টাউন ক্লাব ফুলব্যাক্ খেলা অল্পদিনের তথাপি উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক (পরে অধ্যক্ষ)।

আবদুল—(ফোর্টউলিয়ম আর্সেনাল) সেণ্টার-ফরওয়ার্ড। দ্রুতগতি, ড্রিব্লিং দক্ষ। একক-খেলার পক্ষপাতী না হইলে ইহারও জুড়ী মেলা দায়।

বসন্ত রায়—(কুমারটুলি) দ্রুতগতি ফরওয়ার্ড। ইনিও একক খেলার পক্ষপাতী। কুমারটুলি ক্লাবের একজন প্রতিষ্ঠাতা।

নন্দকিশোর (ন্যাশন্যাল) ফুলব্যাক। ধাক্কাধাক্কির খেলায় পোক্ত। ঘোর পরিশ্রমী।

ললিত ব্যানার্জ্জী—(মোহনবাগান, ন্যাশন্যাল হেয়ার স্পোর্টিং) কর্ম্মঠ ফুল্ব্যাক।

শচীন ব্যানার্জ্জী—(মোহনবাগান) হাফ ব্যাক্। লম্বা চওড়ায় দলের শোভা। প্রতিপক্ষের কেহ 'ফাউল্' খেলিলে তাহার শোধ ব্যানার্জ্জী লইবেই। ডাক্তার, মৃত।

'বাঘা বসু'—(মোহনবাগান) নামেও যেমন, কাজেও তেমন। বিশেষ নির্ভরযোগ্য গোলকিপার।

গিরিশ ঘোষ—(মোহনবাগান) ফুল্ ব্যাক্। প্রথমে ফরওয়ার্ড, তাহার পরে 'হাফ', সর্ব্বশেষে ব্যাক। খেলা ৭।৮ বৎসর। ব্যাক হিসাবেই সুপরিচিত হ'ন। ডাক্তার, মিউনিসিপাল কাউন্সিলর। বয়স এখন প্রায় ৫৮।

দ্বিজদাস ভাদুড়ী—(মোহনবাগান; হরিদাসের সহোদর) ফরওয়ার্ড। নিপুণ ক্রীড়ক। খেলা ৬।৭ বৎসর। জুডিসিয়াল সার্ভিসে নিযুক্ত।

রামদাস ভাদুড়ী—হরিদাসের সহোদর (এরিয়ন, হেয়ার স্পোর্টিং, মোহনবাগান) সেণ্টার-ফরওয়ার্ড, 'তেজী' খেলা। গোঁতরে দৌড়—মরি বাঁচি জ্ঞানশূন্য। খেলা ১১।১২ বৎসর। কলিকাতা কর্পোরেশনে নিযুক্ত।

বিজয়দাস ভাদুড়ী—(হরিদাসের সহোদর; মোহনবাগান) ফরওয়ার্ড—লেফট ইন্। 'জজমেণ্ট' সম্পন্ন কুশলী খেলোয়াড়। আত্মনির্ভরতা ও বলের উপর আধিপত্য অসীম। কনিষ্ঠ সহোদর শিবদাসের জুড়িদার। খেলা ১২।১৩ বৎসর। ভেটার্ণরি সার্জ্জন। মৃত।

শিবদাস ভাদুড়ী—(হেয়ার স্পোর্টিংএ হাতে খড়ি হইয়া দুঃখীরামের নজরে পড়ার পরে মোহনবাগানে যোগদান) খেলার মাঠে প্রথম দিনেই তাহাকে দেখিয়া 'চক্করী' বলিয়াছিল—'জন্ম ফুটবলার' (Born Footballer) অক্ষরে অক্ষরে শিবদাস ক্রমে ইহা সপ্রমাণ করিয়া দেয়। বল্ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের উপর শ্যেন দৃষ্টি রাখিয়া সেই বল্ আপনার আয়ত্বাধীন করা ও তদবস্থায় অপূর্ব্ব কুশলতার সহিত প্রতিপক্ষকে চরকী ঘুরান শিবদাসের যেন হাতের পাঁচ। তাহাকে প্রতিপক্ষের সামলান দায়—বল্ লইয়া সারা মাঠ খেলাইয়া একাই সে গোলে ঢুকিয়া পড়িবে। প্রতিপক্ষের দুইজন খেলোয়াড় সদা সর্ব্বদা তাহার উপর নজর রাখিয়াও বাধাদানে বেগ পাইয়াছে। কখন কোন্ ফাঁকে কোথায় সরিয়া চক্ষে সে ধূলি দিবে, প্রতিপক্ষ ভাবিয়া আকুল হইত। অসামান্য ড্রিবলিং নিপুণতা। প্রতিপক্ষের গায়ে পারতপক্ষে গা ঠেকাইবে না। প্রয়োজন হইলে কিন্তু ভীমবেগে ধাওয়া করিবে। প্রয়োজনানুসারে তাহার একক বা মেলতা খেলার বাহারে দর্শক মোহিত, প্রতিপক্ষ সন্ত্রস্ত। খেলা ১২।১৩ বৎসর। মৃত।

সুধীর চ্যাটার্জ্জি—মোহনবাগনের একজন সুদক্ষ ব্যাক।

কান্তি মুখার্জ্জী—(ন্যাশন্যাল্) গোল্ কিপার। স্থির, ধীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন—প্রথম শ্রেণীর গোল্কিপার বলিয়া গণ্য হয়। এটর্নি—হাইকোর্টের বর্ত্তমান অফিসিয়ল্ রিসিভর্।

জটাধারী—হাওড়া স্পোর্টিংয়ের কুশলী ফরওয়ার্ড।

শৈলেন বসু—মোহনবাগানের একজন আদি খেলোয়াড়, ডেভিড হেয়ার এ্যাথেলেটিক্ ক্লাবের একজন প্রতিষ্ঠাতা, ভোলানাথ পাল চ্যালেঞ্জ কাপ (সর্ব্বপ্রথম বে-সরকারী প্রতিযোগিতা) পরিচালনায় সুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সহযোগী। শরীর হাতির মত। সেই শরীর লইয়া খেলায় আশ্চর্য্য রকমের ক্ষিপ্রতা ওই



সত্যকিঙ্কর মিত্র





বিজয় ভট্টাচার্য্য (মধ্যে উপরে)



গিরিশ ঘোষ

সুশীল ভট্টাচার্য্য (মধ্যে নীচে)

প্রকারের আর কাহাতেও বড় দেখা যায় নাই। জার্ম্মাণ-মহাযুদ্ধের সময়ে বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সুবেদারের পদ লাভ করেন। মৃত।

শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী—সুবিখ্যাত হেয়ার স্পোর্টিংয়ের প্রথম গোল্‌কিপার। ইণ্ডিয়ান্ আর্ট স্কুলের বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল্।

শ্যামচাঁদ বড়াল—হেয়ার স্পোর্টিংয়ের একজন প্রথম ফুল্‌ব্যাক্। এল্-এম্-এস্ ডাক্তার। মৃত।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—(টাউন্ ক্লাব) হাফ্‌ব্যাক্। খেলার মাঠে আকৃতি ও বেশভূষায় দলের শোভা। টাউন্ ক্লাবের অতি দুঃসময়ে অকাতরে অর্থদান করিয়া ক্লাবের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। বেঙ্গল্ কো-অপারেটিভ্ ষ্টোসের সর্ব্বস্ব। জমিদার সঙ্গীতানুরাগী। সঙ্গীত বিষয়ক তাঁহার প্রবন্ধাদি মাসিক সাহিত্যের শোভাবর্দ্ধন করে।

মেদি—প্রেসিডেন্সি কলেজ দ্রুতগতি রাইট্ আউট। উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড়। খেলা অল্পদিনের। মৃত।

সত্যকিঙ্কর মিত্র—(প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেয়ার স্পোর্টিং) ফরওয়ার্ড, দ্রুতগতি রাইট্-আউট্। লম্বে ছয়ফুটের উপর। সুন্দর আকৃতি। বল লইয়া পিন্ পিন্ করিয়া দৌড়াইবার সময়ে মনে হইয়াছে বিদ্যুৎ যেন ঝলকিয়া গেল। বি এল্। ক্যাল্‌কাটা স্মল্ কজ্ কোর্টের প্রবীণ উকীল। তাঁহার এক খুল্লতাত পুত্র, পুলিশ কোর্টের পুরাতন উকীল সুরেশচন্দ্র মিত্রও ফরওয়ার্ড লাইনে কখনও কখনও তখন খেলিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

দেবেন মণ্ডল—(চিন্‌সুরা স্পোর্টিং) ফরওয়ার্ড। খেলা প্রথম শ্রেণীর। অল্প দিনেই বেশ নাম করেন। এ্যাড্‌ভোকেট্। হুগলী স্পোর্টিং এ্যাসোসিয়েশনের একজন প্রধান কর্ম্মী।

অন্যান্য—বজ্রপাণি মুখোপাধ্যায় (ভূ-কৈলাস) হরেন (ন্যাশন্যাল্) উপেন (হেয়ার স্পোর্টিং) বীরেশ্বর ও বিশ্বনাথ (এণ্টালী) সুরদাস (তালতলা) জ্ঞান মুখার্জ্জি ও ভজ্ঞ (শোভাবাজার) উপেন (মোহনবাগান) শ্রীশ্ দাসগুপ্ত (টাউন্) পি, কে, বিশ্বাস (এল্-এম্-এস্, ন্যাশন্যাল্) সতীশ পাল (চিন্‌সুরা) মণি মিত্র (শোভাবাজার) হরেন মিত্র (ন্যাশন্যাল) গোপাল (টাউন), বাগ্‌চী (এরিয়ন)—এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য।*

* ১৯০৪।৫এ-উঠ্‌তি কয়েকজন খেলোয়াড়ের নাম এ তালিকায় দেওয়া হইল না—পরবর্ত্তী তালিকায় প্রদত্ত হইবে। ইতিহাস সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের কথা পুরাতনেরই একজন বহু পরিশ্রমে সঙ্কলন করিয়াছেন। তালিকায় 'মৃত' বলিয়া যাঁহারা উল্লিখিত তাঁহারা ব্যতীত আরও অনেকে হয়তো মৃত। সঙ্কলনকারীর কিন্তু তাহা সঠিক জানা না থাকায় তাঁহাদিগকে 'মৃত' বলিয়া ছাপাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। যতদূর সম্ভব তালিকা চিত্র শোভিত করা হইল। বহু চেষ্টা করিয়াও সকলের চিত্র-সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। তালিকান্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য কোনও নাম যদি বাদ পড়িয়া থাকে, তাহা ইচ্ছাকৃত নহে। সে নাম ও ফটো আমাদিগকে কেহ দিলে 'পরিশিষ্টে' তাহা প্রকাশিত হইবে। আমরা আশা করি, বাঙালীর খেলাধুলার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পূর্ণ করিতে 'প্রবর্ত্তকে'র যে চেষ্টা তাহা দেশবাসীর আন্তরিক সমর্থন লাভ করিবে।

—পরিচালক "প্রবর্ত্তক"

নূতন পথে

শ্রীমতিলাল রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যোগেশ এক প্রকার দম বন্ধ করিয়া মহাপুরুষের আশ্রমে আরও এক বৎসর কাটাইয়া দিল। রম্য প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে তাহার উত্তপ্ত চঞ্চল মস্তিষ্ক স্থির ও শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। শ্রী ও স্বাস্থ্য সর্ব্বাঙ্গে লীলায়িত হইয়া উঠিল। চক্ষে দীপ্তি, অঙ্গে লাবণ্য তাহার অধ্যাত্মোন্নতির পরিচয় জ্ঞাপন করিল। জগতের সংবাদ সে আর রাখে না। যথানিয়মে সে শয্যা ত্যাগ করে, উপাসনার মন্দিরে গিয়া বসে। যন্ত্রের ন্যায় আহার, নিদ্রা, অধ্যয়ন, আত্মচিন্তা ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিন্তার অবসর এখানে নাই। চেতনার এক নূতন ক্ষেত্রে সে এক অভিনব জীবনস্পন্দন অনুভব করিল।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে—লৌহকারাগারে অসংখ্য তরুণের প্রাণ মুষড়িয়া মরিতেছে। তাহাদের অনেকে দেশমুক্তির সাধনায় পথে বাহির হইয়াছিল। সে পথ হয়তো তির্য্যক্, বিপথ; কিন্তু তবুও সুপথ যদি মিলে আর তাহারা যদি সে পথ শ্রেয়ঃ করে, মুক্তির আলোয় তাহাদের কে আনিবে? যাহারা নিজেদের নির্দ্দোষ মনে করে, যাহারা বিচার চাহে, কে তাহাদের দাবী জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবে? যাহারা মার্জ্জনা চাহে, মুক্তি চাহে, তাহাদের প্রার্থনাই বা কর্ত্তৃপক্ষের কাণে কে শুনাইয়া দিবে? কত প্রাণশক্তি, কত প্রতিভা সেখানে অপচিত হয়, যোগেশ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু এখানে এ চিন্তার প্রয়োজন নাই। অতর্কিতে কিছুক্ষণ মস্তিষ্কের চাকা এইভাবে ঘুরিয়া চলে; আবার সে তাহা নিরুদ্ধ করে, সতর্ক সচেতন করে। আত্মচেতনা পৃথিবীর কোন ঘটনায় মিশ্রিত না হয়, ইহাই তাহার সাধনা। তাহার মনে পড়ে—তিন বৎসরের খাজনার দায়ে পিতৃপিতামহের বাসবস্তী জমির উপর জমিদার সার্টিফিকেট করিয়া জমির সর্ত্ত কাড়িয়া লন। কৃষক-ভিটা ছাড়া হইয়া হাহাকার করে, এমন অসংখ্য নরনারীর দুর্দ্দশার প্রতিকার নাই, ও দৈত্যপুরীর ন্যায় কলে কারখানায় পশুর অধম হইয়া যে সকল নারী পুরুষ শ্রম দেয়, তাহাদের শ্রমের অধিকাংশ কড়ি মহাজন ঘরে তুলে; অস্থিচর্ম্মসার এই সকল নরনারী শ্রম দিয়া মাথা গুঁজিয়া থাকার যোগ্য আবাস পায় না। উদর-পূর্ত্তির জন্য প্রচুর অন্ন তাহাদের মিলে না। রুগ্ন শীর্ণ কন্যা-পুত্র পথের ধূলি মাখিয়া কৃমি-কীটের মত বাঁচে ও মরে। শিক্ষার ব্যবস্থা, তাহাদের মানুষের মত গড়িয়া তুলার সুযোগ কে করিবে—কে দিবে? কে এই সমাজের অন্ধদৃষ্টি দূর করিয়া ধন-সাম্য আনয়ন করিবে? যোগেশ মাথা। নাড়িয়া বিদায় করিয়া দেয় এই সব দুশ্চিন্তা। ঈশ্বর-বিধান অলঙ্ঘ্য। মানুষ ভোগ করে আপন আপন কর্ম্মফল যথানিয়মে। কর্ম্মক্ষেত্রের অসংখ্য প্রকার সমস্যা, যাহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে—সব কিছুর স্মৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে অবকাশের ফাঁকে। তাহার সাধনা আজ আর অন্য কিছু নহে, সব কিছুকে নিবারণ করিয়া আপনাকে স্থির শান্ত রাখা। প্রশান্তি যখন মিলে, তখন সে অনুভব করে, সুদৃঢ় শীতল মস্তিষ্কে কিসের যেন অভূতপূর্ব্ব স্পর্শ। স্নায়ুপেশী পর্য্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠে। কখন কখন সে চাহিয়া দেখে অনন্ত নীলের কোলে একপাল চিল পশ্চিম দিকে উড়িয়া চলিয়াছে; মনে করে উহাদের গতি এইবার উত্তর দিকে ফিরিবে, সে সবিস্ময়ে দেখে—তাহার অনুমান মিথ্যা নয়। আবার কখন সে দেখে কুকুরটা জলে ভিজিয়া রাস্তা দিয়া সোজা যাইতেছিল; হঠাৎ মনে হয়, সে এখনই ফিরিয়া তাহার তক্তাপোষের নীচে আশ্রয় লইতে আসিবে। রহস্য অপূর্ব্ব, তাহার এই চিন্তাগতির সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের এই আগমনই লক্ষ্যে পড়ে। যোগেশ বুঝিল, তাহার সিদ্ধ ইচ্ছা-শক্তি জগতের গতির সহিত যুক্তি পাইয়াছে। সে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে বিশ্ব আপনার ইচ্ছায়, অথবা যাহা

জগৎছন্দে অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য, তাহা ঘটনার পূর্ব্বেই তাহার চিত্তবৃত্তিতে লীলায়িত হইয়া উঠে। অন্তর সাধনার যুগে এমন কত অপূর্ব্ব, অলৌকিক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা তাহার মনে এই সাধনার উপর বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় করিল। আরও এক বৎসর এইভাবে তাহার অতিবাহিত হইল।

কত প্রশ্ন উঠে, আবার তাহা বিনা উত্তরে নীরব হয়। প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইলে, শুধু চিন্তা-তরঙ্গেই ইহা সামাল দেওয়া যায় না—প্রমাণের জন্য প্রাণবৃত্তি জাগিয়া উঠে। যদি প্রশ্ন উঠে, তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য কি করিতেছ? তাহার উত্তর যদি হয়—ইহার জন্য আমার কিছু করিবার নাই, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনঃ প্রশ্ন উঠে, ক্লীব যে, পঙ্গু যে, তার এই কথা। ভারতের মুক্তি-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া চলে মহাপুরুষের দল। চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে কারাক্লিষ্ট সর্ব্বহারা দৃঢ়ব্রতী তপস্বিদলের সৌম্যমূর্ত্তি। সর্ব্বাপেক্ষা মানসপটে ভাসিয়া উঠে অর্দ্ধ উলঙ্গ, সত্য ও অহিংসাপূত এক মহামানব। প্রাণশক্তি উদ্বুদ্ধ, অনাস্থা আসে বর্ত্তমানের উপর। কিন্তু পুনঃ মনে হয় ইহা আদর্শের প্রলোভন, মর্ত্ত্যের সম্মোহন। প্রশ্নের উত্তরপ্রচেষ্টা এ সাধনার রীতি নহে। অন্তরের প্রশ্নকর্ত্তা ক্রমে উত্তরের অপেক্ষায় মূক হইয়া বসিয়া থাকে। এমন করিয়া প্রশ্নোত্তরের সাড়া-সুড়ি চিত্তে আর বিক্ষোভ সৃষ্টি করে না। সব স্থির, শান্ত, ধমনীর রক্ত-নৃত্য তালে তালে কাণে শব্দ সঞ্চার করে। হৃৎপিণ্ড মাঝে মাঝে এমন সশব্দে চলে, যোগেশের কাণে যেন তালা ধরিয়া যায়। কণ্ঠ তার মৃদু হইয়া আসে—হৃদয়ের স্পন্দ ক্রমে নিঃশব্দ হইয়া পড়ে। শান্তি আর শ্রী। আনন্দ আর আলো। অন্তরে অন্তরে বড় মনোরম তুষারশীতল স্পর্শ। মৃত্যুর পদ-সঞ্চার নহে, একটা অভিনব জীবনের আলিঙ্গনে তাহার সবখানি শিহরিয়া উঠে—কণ্টকিত হয়।

এমন করিয়াই দিন চলে। কথা কহিবার কিছু নাই। অপরের সহিত আলাপ-পরিচয়েরও প্রয়োজন নাই। মানুষ আছে বটে; কিন্তু কাহারও সহিত সংসর্গ সাধনার অন্তরায়। আত্মস্থ হওয়ার পথে ইহা বাধা দেয়। চক্ষের সম্মুখে সকলেই যন্ত্রের ন্যায় দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া চলে। যাহা কিছু জানিবার ও পাইবার আপনার ভিতর হইতেই তাহার সন্ধান লইতে হইবে। মহাপুরুষের এই নির্দ্দেশ প্রত্যেকেই পালন করিয়া চলে। যোগেশও তাহা বর্ণে বর্ণে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই আশ্রমে কথা নাই। আন্দোলন আলোচনা নাই। কাহারও প্রতি প্রীতি-মমতা নাই। আছে এক অলঙ্ঘ্য অকাট্য নিয়ম। দিনের পর দিন সংহতি চলিয়াছে, তাহারই অনুগত হইয়া। যোগেশ ডুবিল আত্ম-চেতনার অগাধ সলিলে; সে আজ খুঁজিয়া পাইতে চাহে আত্ম-স্বরূপ। সেই স্বরূপপ্রতিষ্ঠ জীবনের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই গড়িয়া তুলিতে হইবে এক নূতন মনুষ্যসমাজ—তাহার ভিত্তির উপরই ভবিষ্য ভারতের সিদ্ধ ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে! বিশ্বজাতির ইহাই হইবে মুক্তি-তীর্থ। আজ যাহারা বহিঃপ্রচেষ্টায়, অসংখ্য প্রকার সমস্যাসমাধানে উদ্যোগী—সেখানে এখনও আত্ম-স্বার্থ থাকায় ভাল না হইয়া মন্দের বোঝাই বাড়িবে—সর্ব্বাগ্রে চাই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ জীবন। এই জীবনই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ জীবন—ইহার সংহতিই নির্য্যাতিত মানবজাতির পরিত্রাতা হইবে। এই মহান্ আদর্শে যোগেশের চিত্ত ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রতি চতুর্থ বৎসরে মহাপুরুষ ঘরের বাহির হন। তিনি পল্লীপথের উপর দিয়া প্রশস্ত বালুচর অতিক্রম করিয়া সমুদ্র স্নান করেন, আর সেদিন আশ্রমে উৎসবের ধুম পড়ে। সঙ্গীত-বাদ্যাদির আড়ম্বর নয়, কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদ-কৌতুক নয়; দ্বারে দ্বারে নব-পল্লবের মালা। ঘরে ঘরে স্তবকে স্তবকে কুসুম-শয্যা। প্রাঙ্গণে সারাদিন ধূপ-ধুনার ধুনি জ্বলে। সেদিন সকলে প্রাণ খুলিয়া হাসে, কথা কয়; আর মহাপুরুষকে ঘিরিয়া সকলে একত্র ভোজন করে। দত্তা দেবী অপরূপ সাজসজ্জায় বিভূষিতা হইয়া, সকলকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করায়। চারি বৎসরের আড়ষ্ট জীবন এই দিন যে সজীবতার সাড়ায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে, উৎসব-রাত্রির অবসানে তাহারই স্পন্দন আবার চারি বৎসর ধরিয়া সকলকে বাঁচাইয়া রাখে। এই অসাধারণ জীবন-যাত্রা মহাপুরুষের অধ্যাত্মপ্রভাবেই সম্ভব হয়, যোগেশকে তাহা প্রত্যয় করিতে হইয়াছে।

অতি প্রত্যূষে সঙ্গীতের ঝরণায় সকলে অভিষিক্ত

হইয়া শয্যা ত্যাগ করিল। ঘরের বাহির হইয়াই সে দেখিল—হরিসাধন তাহাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছে। প্রতিদিন তাহারা পরস্পরকে দেখে, কিন্তু আজ যেন পরিচয়ের দিন। হরিসাধন যোগেশকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "কেমন আছ?"

"ভাল আছি।"

"সাধন কেমন চল্‌ছে?"

"বেশ।"

যুগল আসিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ। পৃথিবীটাকে গিলিয়া ফেলার মত সব ইন্দ্রিয়গুলা ক্ষুধাতুর। আর কিছু না হোক্, প্রতিদিনের অপচয়ে আগে যে সব বৃত্তিগুলো অসাড় নির্জীব হয়ে পড়ত, দীর্ঘদিনের বিশ্রামে সে সব আজ স্ফূর্ত্ত, পরিপূর্ণ প্রাণ পেয়ে উৎফুল্ল। কি বলেন হরিসাধন দাদা?"

হরিসাধন বলিল, "কিন্তু ক্ষুধার ভঙ্গী দীর্ঘ উপবাসে যদি না বদলে যায়, পূর্ব্ব আস্বাদের জন্যই তারা যদি বুভুক্ষু হয়ে উঠে, সেটা বিপদের কথা হবে যে!"

যোগেশ হাসিয়া বলিল "তাই যদি হয়, অভাবে তেমন রুচি দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে রূপান্তরিত হবেই। অন্য ভয় এখানে নেই হরিসাধন দাদা।"

হরিসাধন একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "প্রয়োজন জিনিষটা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে প্রয়োজনের তাগিদে গোধূলি বলে'ও মনে হয়।"

একে একে দুই চারিটী করিয়া, আশ্রমের লোকগুলি যোগেশের ঘরের সম্মুখে জড় হইয়া দাঁড়াইল। পাথর-চাপা ঘাসের মত সকলেরই মুখশ্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির অবলেপে ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল। আজ উৎসবের উৎসাহে তাহা কথঞ্চিৎ লালিমার শোভা ধারণ করিল। চারি বৎসরের রুদ্ধ প্রাণস্রোতঃ প্রচণ্ড প্লাবন আনার জন্য শিরায় শিরায় চাঞ্চল্য সৃজন করে। যোগেশও বুঝিল, আজ যেন তাহার কিছু করা চাই। তাহা ধ্যান নহে, কাব্যরচনা নহে, তুলির আঁচড়ে স্বপ্নমূর্ত্তির অঙ্কন নহে। স্থূল-জগতের সংঘর্ষে মাংসপেশীগুলির সবেগ সঞ্চালন চাই। কিন্তু আশ্রমের উচ্চ ভূমি হইতে ঘন ঘন তূর্য্যনিনাদে উপাসনামন্দিরের আহ্বান তাহাদের অধিকক্ষণ আলাপ করার সুযোগ দিল না। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, যোগেশ উৎসবদ্বারে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিল, যাহা অনুভব করিল, তাহাতে বিগত তিন বৎসরের স্থৈর্য্য যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্লাবন সৃষ্টি করে। কিন্তু সে হরিসাধন দাদার মতই শক্ত মানুষ হইতে চাহে। এক নিমিষে দত্তা দেবীকে দেখিয়া, সে অপর সকলের ন্যায় মাথা নত করিল। ললাটে তাহার কোমল করস্পর্শে সুগন্ধি চুয়া চন্দনের টিপ আর গলায় দোলাইয়া দিল দত্তা দেবী সুরভি কুসুমের মালা। আজ আশ্রমের প্রত্যেক মানুষের এই দিব্য বেশ উৎসবের সর্ব্ব প্রথম অঙ্গ। উপাসনা-গৃহে মহাপুরুষ নির্ব্বাক্, নিশ্চেষ্ট। উপাসনার কণ্ঠে দত্তা দেবীর সুললিত স্বর সংযুক্ত হইয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দে সকলের হৃদয় মাতিয়া উঠিল। যোগেশ একবার মাথা তুলিয়া দেখিল, দত্তা দেবী নিমীলিত নয়নে, স্থির প্রসন্ন মূর্ত্তিতে উপাসনায় রত। তাঁহার শুভ্র নয়ন-পল্লবপ্রান্তে ঘনকৃষ্ণ রোমরাজী পদ্ম-কোরকে শ্রেণীবদ্ধ মধুকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উৎসব দত্তা দেবীকে লইয়াই। উপাসনার পর দেবীর মধুর কণ্ঠের ভজন শুনিয়া মহাপুরুষের চক্ষে জল ঝরিল, সকলেই নয়ন নিমীলিত করিয়া মুগ্ধ হইল। যোগেশ অনিমিষ নয়নে দত্তা দেবীর দিকে চাহিয়া বিভোর হইয়া রহিল। এমন অনিন্দ্য নরতনু যেন কোথাও নাই। গাহিতে গাহিতে অশ্রু-সিক্ত নয়ন-পল্লব উন্মীলিত করিয়া দত্তা দেবী চাহিতেই যোগেশের দৃষ্টি তাহাকে স্পর্শ করিল। সে অপলক নির্নিমেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশর দত্তা দেবী বোধ হয় উপেক্ষা করিতে পারিল না। কম্পিত কণ্ঠ হইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। ভজন চলিল দীর্ঘক্ষণ।

আজ রন্ধনশালায়ও ধুম পড়িয়াছে। আশ্রমের লোক-সংখ্যা ১৭।১৮ জনের অধিক নহে। কিন্তু আয়োজনের আড়ম্বর উৎসবের যে সাক্ষ্য দেয়, তাহাতে মনে হয়—অন্নপূর্ণা আজ এইখানেই বোধ হয় মূর্ত্ত হইয়াছেন। পরিপাটি জলযোগের সুব্যবস্থা ছিল। দত্তা দেবীর পরিবেশনে আজ সকল খাদ্যদ্রব্যই মধুরতর মনে হইল।

দেড় প্রহর বেলা হইয়াছে। মাঘ মাসের সুনীল আকাশ সূর্য্যকরোজ্জ্বল, অসীম-নীলাম্বুবক্ষে তাহারই সমুজ্জ্বল প্রতিবিম্ব—ঊর্দ্ধে নীল, সম্মুখেও অনন্ত নীল। শুভ্র পালকের

উষ্ণীষ মাথায় পরিয়া যেন অসংখ্য তরঙ্গ সবেগ আস্ফালনে বালুতটে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। পরাজয় স্বীকার করিয়া ঢেউগুলির পুনঃ পলায়নতৎপরতা স্নানার্থীদের অন্তরে অশেষ কৌতুক সৃষ্টি করে। তাহাদের অনুধাবন করিয়া আশ্রমীরা বহু দূর ছুটিয়া যায়, আবার সৈন্যদল-সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রতরঙ্গ তাড়া করিয়া আসে। ছুটিয়া ছুটিয়া বেলা-ভূমিতে পৌছিবার পূর্ব্বেই ভীমতরঙ্গের আঘাতে সকলে উলটি-পালটি খায়। দীর্ঘদিনের বন্ধন-মুক্তির পর জীবনের এই মহোল্লাস আজ অপূর্ব্ব রঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে সমুদ্রসৈকতে।

যোগেশ ফিরিয়া ফিরিয়া দেখে—এক অভাবনীয় অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে এই তরুণীর যে দুর্বোধ্য জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে, প্রকৃতির এই অবাধ রঙ্গস্থলে তাহার চিত্ত মন কি ভাবে এই উৎসব-রঙ্গ অনুভব করে। সে দেখে এক পরিচারিকার স্কন্ধে ভর করিয়া দত্তা দেবী চলিয়াছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া বহুদূরে, নির্ভীক নিশ্চিন্ত, আবক্ষ তার জলগর্ভে নিমজ্জিত হয়—উত্তাল সাগরতরঙ্গ গর্জ্জন করিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া যায়, চূর্ণ কুন্তল বক্ষে, পৃষ্ঠে, চিবুকে ফণিমালার ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে, দৃষ্টি তার কত দূরে, সে চলিয়াছে সমুদ্রের জলে সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া তাহার সহিত মিতালী করিতে। পশ্চাতে মহাপুরুষের আদেশবাণী পরিশ্রুত হইল, "দত্তার অগ্রগতি বন্ধ কর। বিপৎ-সম্ভাবনা আছে।" কণ্ঠে কণ্ঠে সে বাণী উচ্চারিত হইল। অন্যান্য স্নানার্থিগণের নিকট হইতে দত্তা দেবী বহু দূরে। দত্তা দেবী ফিরিয়া চাহিল। পরিচারিকা তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি সুরু করিল। দত্তা দেবী হস্তোত্তোলন করিয়া জানাইল—জল হাঁটুর অধিক নহে। তরঙ্গমালায় তাহার বক্ষ নিমজ্জিত করিয়াছে মাত্র।

যোগেশ বলিল "হরিসাধনদাদা, আমারও মনে হয় দত্তা দেবীকে এত দূরে রেখে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। চল, আমরা এগিয়ে যাই।"

হরিসাধন বলিল, "দত্তা দেবীর তাতে খুব অসুবিধা হবে, একে উনি পুরুষের সম্মুখে কমই বাহির হন, আজ তিনি আমাদের সঙ্গে একত্র স্নানে সঙ্কুচিতা, তাই দূরে—আমাদের ওঁর কাছে যাওয়া শিষ্টাচার হবে না।"

—"অশিষ্টাচার কি হবে বুঝি না! আর কিছু নাই হোক, দত্তা দেবীকে মানুষের চেয়ে কত বড় দেখ্‌তে হবে তাও বুঝ্‌তে পারি না। আমার মনে হয়, প্রকৃতির স্বাচ্ছন্দ্য গঠনক্ষেত্র থেকে এক অস্বাভাবিক কঠোর প্রয়াসের মধ্যে ওঁকে আমরা বন্দী করে রেখেছি। জীবনটা আলো হাওয়ার মতই ছড়িয়ে পড়ার জিনিষ। আপনাদের সঙ্কোচ অতিশয় কষ্টসাধ্য। চল হরিসাধন দাদা, ওঁর আর একটু কাছে থাক্‌লে ওঁর বিশেষ অসুবিধা হবে না।"

যোগেশ আগাইয়া চলিল। হরিসাধন অনিচ্ছাসত্ত্বে ধীরপদে তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল। ঢেউয়ের সঙ্গে লম্ফে লম্ফে ক্রীড়ারত আশ্রমীরা ইতঃস্তত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দত্তা দেবী ঢেউয়ের মধ্যে লুকোচুরী খেলিতেছেন। তাহার আকণ্ঠ সমুদ্রগর্ভে। হঠাৎ পরিচারিকা চীৎকার করিয়া, তীরের অভিমুখে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। দত্তা দেবী মুখ ফিরাইয়া দেখিল—এক বিশাল উত্তাল তরঙ্গে সব ডুবাইয়া দিয়াছে। কিছু দেখা যায় না। বালু-তটের প্রান্তে সমুচ্চ বালু-স্তূপের উপর বনজ লতা-গুল্মের হরিৎ-পীত রেখা। তরঙ্গ অপসারিত হইলে, সে দেখিল—আশ্রমের সকলেই প্রাণপণে তীরের দিকে সাঁতার দিয়া চলিয়াছে। বিকট চীৎকার সমুদ্রবক্ষে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। দত্তা দেবী কারণ কিছু বুঝিল না। সে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া, ইহার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিল। সাগরোর্ম্মী আর তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলে না, তটে আশ্রমের সকলেই প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। দত্তা দেবীর মনে হইল—জলতলে তাহার পা আর ভূমি স্পর্শ করিয়া নাই। সে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিতেছে। ঢেউয়ের তালে তালে দুই হাত আগাইয়া যায়, পুনরায় চার হাত পিছাইয়া আসে। সমুদ্রতট দূরে, দূরে, বহু দূরে। মহাপুরুষ উত্তরীয় উঠাইয়া কি যেন বলিতেছেন। শুধু শব্দ, অর্থবোধ হয় না। সীমাহীন বারিধি তাহাকে আরও নিবিড় ভাবে কোলে টানিয়া লয়। চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই; এ দুর্জ্জয় স্রোতে গা ভাসান দিয়াই চলিতে হইবে। দত্তা দেবী সন্তরণ জানিত। কিন্তু সমুদ্রকূলে পৌছিবার

বৃথা প্রচেষ্টা। বুকের মধ্যে মৃত্যুর সাড়া, দমকে দমকে নিঃশ্বাস মস্তিষ্ক অসাড় করিয়া দেয়। নয়নের দৃষ্টি কাতর হইয়া পড়ে। আজ তার সলিল-সমাধি অবধারিত। একবার প্রাণপণে মাথা তুলিয়া, যুক্তকর উঠাইয়া সে মহাপুরুষকে প্রণাম নিবেদন করিল। সুকোমল তরঙ্গ বক্ষে সে ভাসিয়া চলে জীবনের সীমার বাহিরে। এই অকূল পাথার কেহ শেষ করিতে পারে না। কোথায় চলে, কেহ জানে না। হঠাৎ ম্লান দৃষ্টির সম্মুখে কার যেন জলন্ত প্রদীপের মত দুটী নয়ন জলিয়া উঠিল। প্রায় অবসন্ন দেহ, হৃত-চেতন অবস্থায় মনে হইল, তাহার গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া কে তাহাকে আশ্রয় দিতে টানাটানি করিতেছে। একটা ঢেউয়ের আঘাতে সে তাহার কবল হইতে মুক্ত হইয়া উপুড় হইয়া পড়িল; তাহার ম্লানদৃষ্টি চকিতে দেখিল, এক পুরুষমূর্ত্তির বক্ষের উপর সে আশ্রয় পাইয়াছে। জলতরঙ্গে তাহার শ্বাসবন্ধ হয়. হঠাৎ সে এক ঝাঁকুনি খাইয়া অনুভব করিল—তাহার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া কাহার বক্ষদেশে তাহার শির বিন্যস্ত এবং তাঁহারই জানুদ্বয়ের উপর চিৎ হইয়া সে শায়িত। অস্পষ্ট চেতনা, প্রখর সূর্য্যকিরণে তাহাব ললাট ও বক্ষঃস্থল উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, সে যেন নিরাপদ্! কিন্তু সবই যেন স্বপ্ন—জল-তরঙ্গে একজনের বক্ষের উপর সে নিরাপদে ভাসিয়া চলিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মনের কথা

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

দীর্ঘ প্রবাস পরে বঁধুয়ার আজি আগমন
ওরে তোরা সাজা না লো সই,
আমার ঘুমানো হিয়া জাগাইয়া তোল্ মধুবন—
যদি ভু'লে জে'গে ম'রে রই!

যদি হেরি' ও মূরতি বঁধুয়ার ও-দু'টি নয়ন—
আমি সখি ভু'লে যাই মোরে,
হরষিয়া সে পরশে করি' তা'র পরাণ-চয়ন
উথলিয়া ঘামি' যাই ম'রে;—

শিহরিতা সুরধুনী যদি মোর হিয়ার আঁচল
শিহরি' খসিয়া যায় ভুঁয়ে,
আমারি হিয়ার কান্না বিরহের কোকিলা কাজল
যদি তা'র বুকে রয় ছুঁয়ে;

দি মোর আঁখি দু'টি পাখী হ'য়ে উড়ি' যায় চ'লে—
স্পন্দনের নাহি রয় ছায়া,
বঁধুয়ার যৌবনে—ফুলবনে মিশি' যায় গ'লে—
হ'য়ে রই নিলাজ বেহায়া;—

নীরব মনের মাঝে হায় মোর পীরিতি-কমল
যদি যায় আগে তা'র ঝ'রে—
যদি এ ব্যথার কুঁড়ি কুঁকড়িয়া পাপড়ি সকল
ধূলায় লুটায়ে যায় ভোরে;—

মধুপের চুমাভরা সুআবেশী পরাগের দাগ
লাগিয়া এ তনুটির বুকে—
এ মোর নূপুরে যদি নাহি নাচে পূর্ণিমার ফাগ
ফাগুনের দোল্নায় সুখে;—

এ কাঁকণে নাহি বাজে বেহাগের বিরহী রাগিণী
অতনুর ফল্গু আলোড়িয়া—
আপনারে নি'য়ে খালি মাতি' রহে এ মোর নাগিনী
নাহি ওঠে সুরে কুহরিয়া;

ধরিয়া রাখিস্ ও'রে বাহু দিয়া বাঁধিয়া লো সই—
তা'রে শুধু ব'লে দিস্ ছাই,
'তোমারি মাধবীলতা কুঁকড়িয়া ম'রে আছে ওই—
আর কিছু বেঁচে নাই!'



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাম্প্রদায়িক দাবী—

বাঙলায় সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী "শ্রী" এবং "পদ্ম" আন্দোলন প্রভৃতির মধ্য দিয়া ক্রমশঃ প্রকট হইতে দেখিয়া, শিক্ষা-বিষয়ে অগ্রসর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় অবশ্যই চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে আসল যোগ্যতার নিরিখে এই দাবী যে কোন-মতেই টিকে না, তাহা একটু ভাবিলেই বুঝা যায়। চৈত্রের "বসুমতী"র "সাময়িক প্রসঙ্গে" প্রকাশিত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে :—

"শিক্ষাব্যাপারে বাঙ্গালার সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ে পার্থক্য কিরূপ প্রবল, তাহা গত বৎসরের বিভিন্ন পরীক্ষায় এবং পরীক্ষার্থীর সংখ্যায় সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইবে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবং কলেজসমূহে ছাত্র-সংখ্যার শতকরা ৮৫ জন হিন্দু এবং ১৩ জন মুসলমান। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যার শতকরা ৭৬ জন হিন্দু ২২ জন মুসলমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এস্‌সি পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৩ হাজার ১ শত ২০ জন। মুসলমান ছাত্র-সংখ্যা মাত্র ১ শত ৯০ জন। বি, এস্‌সি পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে ৯ শত জন হিন্দু, মুসলমান ৪২ জন। বি, কম পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে ৩ শত ৩০ জন হিন্দু, মুসলমান ১০ জন। এম, এ পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে হিন্দু ছাত্রসংখ্যা ৫শত ৫৮ জন, মুসলমান ৩২ জন। এম, এস্‌সি পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে হিন্দু ১শত ৯১ জন, মুসলমান ৬ জন।

এই তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, শিক্ষা ব্যাপারে মুসলমানগণ কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালায় যে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে ২২ জনের অধিকসংখ্যক মুসলমান সদস্য হন নাই। বিগত বিজ্ঞান-কংগ্রেসে ২ হাজার ৪ শত সদস্যের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ১ শত ৮ জন ছিল।"

ইহা ছাড়া,

"শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দান হিসাবে যে ৮০ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে মুসলমানের দান মাত্র ১২ হাজার টাকা।"

বাঙালার সাম্প্রদায়িক দাবী ন্যায়, যুক্তি, তথ্য কোনও দিক দিয়াই সমর্থন করা যায় না।

সঙ্ঘ-সাধনা—

বাঙালায় জাতি সাধনার দৃঢ় ভিত্তি-স্বরূপ সঙ্ঘ-সাধনার সূত্রপাত হইয়াছে। কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিশিষ্ট ধর্ম্ম-গুরুকে আশ্রয় করিয়া এই সাধনার অনুশীলন সত্যই আশাজনক। এই সঙ্ঘ-জীবনের মর্ম্ম ও নীতি অভিজ্ঞ সঙ্ঘ-সাধকের হৃদয়ে কেমন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন চৈত্রের "আর্য্যদর্পণ" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। "সঙ্ঘাধিবেশনে"র লেখক ভূয়োদর্শনজাত এই সারগর্ভ কথাগুলি লিখিয়াছেন :--

"লক্ষ্য যেখানে এক, সাধন-পন্থা যেখানে সম, সাধনক্ষেত্র যেখানে অদ্বিতীয়, সেখানে বিরোধ এবং অসামঞ্জস্যের পরিকল্পনা বাতুলতারই নামান্তর। তবু যদি তাহা কোন দিন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে, তবে বুঝিতে হইবে লক্ষ্য এবং পন্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। মূল ধরিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে, নতুবা দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় সমুত্থিত সঙ্ঘসৌধ মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

স্বার্থপূর্ণ জীবনে সঙ্ঘ-সাধনা নিরর্থক। যেখানে স্বার্থের সঙ্ঘাত, সেখানে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে না। পরার্থে উৎসর্গীকৃত নিঃস্বার্থ জীবনাহুতিতেই সঙ্ঘদেবতা জাগিয়া উঠেন। দ্বন্দ্ব কোলাহলে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গে না, তাঁর ঘুম ভাঙ্গে নীরবতায়, একপ্রাণতায়, ভালবাসায়!

ব্যক্তিগত সাধনায়, ব্যক্তিগত তপস্যায় সঙ্ঘজীবন পূর্ণাঙ্গ এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠে ; আবার সঙ্ঘসেবীর ব্যক্তিগত লক্ষ্যচ্যুতির ফলে সে সঙ্ঘজীবন বিকলাঙ্গ এবং নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। এক ছন্দে, এক তালে চলিলে সঙ্ঘের অগ্রগতি হয়, ছন্দপতনে তাহার প্রগতি ব্যাহত হইয়া পড়ে। তাই সঙ্ঘসেবীদের এক স্বার্থ, এক উদ্দেশ্য, এক লক্ষ্য, এক পন্থা, এক পাথেয় হওয়া প্রয়োজন। নতুবা সঙ্ঘ-সাধনা সেখানে শুধু নিরর্থকই নয়, ভণ্ডামীর নামান্তরও বটে।"

লেখকের প্রত্যেকটী কথাই মর্ম্মস্পর্শী—সঙ্ঘধর্ম্মী-মাত্রের প্রণিধানযোগ্য।

শরৎ-সাহিত্যে বাঙালার নারী—

দরদী সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের শক্তিময়ী লেখনী বাঙালার জীবনকেই রূপ দিয়া কথাশিল্পের ইতিহাসে যুগান্তর স্থষ্টি করিয়াছে, তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য অভিনব ও অতুলনীয়। বাঙালী এই কারণেই তাঁহাকে একান্ত আপনার জন—"আত্মার আত্মীয়" বলিয়া চিরদিন মনে রাখিবে। তাঁহার এই স্থষ্টির হৃদয়-লক্ষ্মী—বাঙালার নারী। "শিক্ষা ও সাহিত্যে" শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ এম-এ, বি-টি, এই প্রসঙ্গে ঠিকই বলিয়াছেন :—

"ভগবানের স্থষ্টিতেও যেমন নারীই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যেও নারীই সৌন্দর্য্যের প্রতীক। শরৎচন্দ্র এই নারীকুলের মধ্যে বাঙালার নারীকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়াছেন। অন্তহীন দুঃখের আগুনে পুড়িয়া বাংলার নারী খাঁটী সোণা হইয়া আছে। দুঃখকে অঙ্গের আবরণ করিয়াও তাহার ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, বাংলার নারী জননীরূপে, দাস্তরূপে, ভগ্নীরূপে ও বধূরূপে বাঙালীর ঘরের লক্ষ্মী হইয়া চিরপ্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য মনীষী নীটশে বলিয়াছেন, 'It is great application only that is the ultimate emancipation of the mind'; তাই বাংলার অশিক্ষিতা, অল্প শিক্ষিতা, অল্প বয়স্কা নারীর মুখে শুনিতে পাই উচ্চ জ্ঞানের কথা। যাঁহারা এই সকল নারীর জ্ঞানকে অকালপক্কতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের জানা নাই দুঃখের পরশ-পাথরের সংস্পর্শে মানুষ সহজেই সত্যের উর্দ্ধ-স্তরে পৌছিতে পারে। তাই বাংলার নারী এত মহিমময়ী হইয়া আছে। তাহার প্রেম, সেবাধর্ম্ম, বাৎসল্য ও প্রীতি-স্নেহ বাঙালীর জীবনমরুতে নন্দন-কানন স্থষ্টি করিয়াছে।"

শরৎচন্দ্রের সত্যকার হৃদয়-রূপটিই লেখকের প্রবন্ধে ধরা পড়িয়াছে, বলা যায়।

সঙ্গীত-শিক্ষার আদর্শ—

নব-প্রকাশিত সঙ্গীত-বিষয়ক ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী, ১৯৩৮) "মিউজিক অফ ইণ্ডিয়ায়" 'ভারতীয় সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধে সৌকত আলি সাহেব দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :—

"...বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক সঙ্গীত (classical music) লোপ পাইতেছে এবং ব্যবসা-সঙ্গীতের (commercial music) প্রচলন অধিক হইতেছে।...বর্ত্তমানে কলিকাতায় প্রায় ৫০০ শত ওস্তাদ আছেন যাঁহারা এই কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। দেখা যায় যে তাঁহাদের জন্য মাসিক ২৫,০০০৲ বা বৎসরে ৩,০০,০০০৲ টাকা খরচ হইতেছে। এবং চলচ্চিত্র জগতে (Film world) যে সমস্ত বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ আছেন তাঁহাদেরও যদি আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বৎসরে মোট ৬,০০,০০০৲ টাকা। একটু চিন্তা করিয়া দেখুন যে, বৎসরে ৬,০০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইতেছে, কিন্তু উপকার হইতেছে কি? এত বড় কলিকাতা নগরে কোন ভাল সঙ্গীত-বিদ্যালয়, সঙ্গীত-পাঠাগার, সঙ্গীত-পুস্তকালয় ও সঙ্গীত-যন্ত্র প্রদর্শনী নাই।"

প্রবন্ধের উপসংহারে ইনি বলিতেছেন :—

"সমগ্র ভারতের সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলিকে এবং পরমুখাগত ঘরোয়ানী ওস্তাদগণকে একীভূত করিয়া স্বর্গীয় সঙ্গীতে সর্ব্বসাধারণের আদর্শ গঠন করিতে অনুরোধ করি।"

ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ গঠনে সৌকত আলি সাহেবের মন্তব্য বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

বন্ধন মুক্তি—

খটকা লাগে; যে-মন রাষ্ট্রের বন্ধন, রাষ্ট্রের অসত্য এবং পীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, মুক্তি-কাম হয়, সেই মন সমাজ ও ধর্ম্মের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না; খটকা লাগে, যে মন সমাজ-ধর্ম্ম-নীতির মিথ্যা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় কিন্তু রাষ্ট্র বন্ধনে বেদনা বোধ করে না, অসত্যের সঙ্গে রফা করে।

জাতির মুক্তির কামনা রাষ্ট্র ক্ষেত্রে জাগ্রত হইবে, নিদ্রিত রহিবে ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি-নীতির ব্যাপারে, অথবা জাগ্রত হইবে সমাজ ধর্ম্ম ব্যাপারে, নিদ্রিত রহিবে রাষ্ট্র ক্ষেত্রে এমন অঘটন ঘটে না।

ভারতবর্ষে বিপ্লবী মন দেখা দিয়াছে, আজ নয়, বহুদিন পূর্ব্বেই। যেই মন ধর্ম্ম ও সমাজের অসত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছিল, সেই মনই রাষ্ট্রের অসত্য ও বন্ধনের বিরুদ্ধেও মাথা তোলে। কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্রচেতনায়, রাষ্ট্র-সংস্কার প্রয়াসে প্রবল উত্তাপ থাকে—বাধাটি ঘরের তরফের নহে—সেই হেতু ইহার উন্মাদনা বৃদ্ধি পাইতে পারে; কিন্তু জাতীয় জীবনের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে দৈনন্দিন ব্যষ্টি ও সমাজ-জীবনের নির্ম্মাণ প্রচেষ্টার দ্বারা। মানুষের জীবনকে খণ্ডিত করিয়া দেখা চলে না, তাহার সমগ্রতা লইয়াই তাহাকে চিনিতে হয়। অসত্যের ও বন্ধনের বিরুদ্ধে যদি মন বিদ্রোহী হয়, তবে সেই বিদ্রোহ সার্থক হইবে তখনই যখন একই সঙ্গে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, অর্থ সকল কিছুর অসত্যের বিরুদ্ধেই জাতি-নির্ম্মাণের শুভ-প্রেরণা লইয়া সে দেখা দিবে। আজ ঘরের বহু জঞ্জাল ঘরের কোণে, মনের কোণে পুঞ্জীভূত রাখিয়াও বিদ্রোহী মন যদি কেবল বাহির লইয়া মাতে তাহাতে অনুকরণের ফাটল পতনের পাতালপুরী দেখাইয়া দিবে। তাই, অনুকরণের পথে নয়, জাতির সত্যাশ্রয়ী মন শক্তির ধ্রুব পথে—যেই পথ অনুকরণে নয়—আচরণে; শক্তির অভিনয়ে নয়, শক্তির আহরণে; আত্মপ্রতারণায় নয়—আত্ম পরীক্ষায়, নিখিল বিশ্বের জাতিগুলিকে জাতীয় শক্তি শুদ্ধে মুক্তিদানে সক্ষম হইয়াছে, সেই পথে যাত্রা করুক। বিশ্বের নব নব সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্য চাই সমাজের সতেজ প্রাণ-বস্তু, কিন্তু সমাজ গিয়াছে ভাঙ্গিয়া, নাই সেখানে প্রাণ-শক্তি, তাই ব্যষ্টির অনুকরণ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সত্য মিথ্যার ভেজাল, মিশ্র রাগ-রাগিণীর মতই অশুদ্ধ। কিন্তু যাহা হজম করে—assimilate করে সেই শক্তি ভারতবর্ষের আছে—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে—তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধানগণের এই দিকের সম্ভাবনাকে সহজভাবে সফল হইতে দিতে হইবে।

—সোণার বাংলা

সমালোচনা

বিজয়ী প্রেম—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা একখানি উপন্যাস। বিষয়-বস্তু পল্লীসমাজের প্রাচীন কাঠামো ভাঙিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু একান্ত আধুনিক না হইলেও চিত্রণ হিসাবে অবাস্তব নয়। একটি মহৎ ত্যাগশীলতার ভিতর দিয়া প্রেমকে বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। সমসাময়িক ন্যায়-বিচারে এই ত্যাগকে ঠিক realistic পর্য্যায়ে ফেলা যায় না সত্য, কিন্তু আদর্শবাদের দিক্ দিয়া ইহা উপভোগ্য। ইহার ঘটনাসংস্থানে যে একটি বিপর্য্যয়ের বিন্যাস আছে তাহা অসাধারণ নয় বলিয়াই বোধ হয় সাধারণ পাঠক ইহা সহজে পছন্দ করিবে। লেখকের ভাববাদের পশ্চাতে যে রুচিশীল একটি মনের পরিচয় পাওয়া যায় আমরা তার প্রশংসা করি।

—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বন্দিনী সুভদ্রা—শ্রীআশীষ গুপ্ত। গল্পগ্রন্থ, বিচিত্রা নিকেতন লিমিটেড, ২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বন্দিনী, পিশাচী, মায়ের পেটের ভাই, খুনী, যে জীবন দীন, সুভদ্রা এই ছয়টি গল্প লইয়া উপরোক্ত গ্রন্থ এবং গল্পগুলি ইতিপূর্ব্বে বিচিত্রা ও ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিষ্ঠা ও মনসংযোগ সহকারে বইখানি কয়েকবার পড়িয়াছি। যে সাহিত্য প্রাণবান, রসপুষ্ট, যাহার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহার পরিচয় স্বতঃই ধরা পড়ে। পড়িবার সাথে সাথে তাহা মনকে আনন্দে ও বিস্ময়ে আকর্ষণ করে; মাঝে মাঝে অনুভূতির আনন্দ এত নিবিড়, জমাট হইয়া আসে যে বই বন্ধ করিয়া অত্যন্ত ধীরে সুস্থে তাহাকে একটু একটু করিয়া উপভোগ করিতে হয়। গ্রন্থকারের লিপি-চাতুর্য্য, রুচিজ্ঞান, ভাষা ও সুনিপুণ বাক্য বিন্যাস, নব নব অনুদ্ঘাটিত বস্তুর প্রতি অপূর্ব্ব আলোকসম্পাত প্রভৃতি নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ছোট গল্পের একটা ছোট্ট কথাও যেন অনাবশ্যক অসুন্দর রূপে ব্যবহৃত না হয়, তাহা যেন আমাদের মনকে স্পর্শ করে।

'সুভদ্রা' এ পুস্তকের শ্রেষ্ঠ গল্প। লেখকের রচনা-নৈপুণ্য, গভীর অন্তরদৃষ্টি এবং সর্ব্বোপরি অন্তর্নিহিত পরম স্নেহে সুভদ্রাকে অপূর্ব্ব শ্রীময়ী করিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর শিল্পজ্ঞান না থাকিলে এইরূপ একটা জটিল চরিত্রকে স্বল্প পরিসর অবস্থানের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা সম্ভবপর হইত না। সুভদ্রার অঙ্কন পদ্ধতিতে যথেষ্ট সাহস এবং বলিষ্ঠ কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়।

'যে জীবন দীন'—সমাজের নিম্নস্তরে, আমাদের দৃষ্টির বাহিরে হেলায় অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে, এইরূপ কয়েকটা চরিত্র লইয়া এই কাহিনী। এই লেখাটি লেখকের সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। এরূপ কয়েকটা চরিত্র অবলম্বন করিয়া এই গল্প লিখিত হইয়াছে, যাহারা আমাদের কাছে একেবারে নূতন। বলিবার বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিটি, যাহা গ্রন্থকারের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাহা এই কাহিনীতে সার্থক হইয়াছে; সর্ব্বশেষে আমাদের মনকে ইহা অশ্রু ভারাক্রান্ত করে। 'বন্দিনী'ও এই দিক হইতে সার্থক।

'পিশাচী' ও 'খুনী' ছোট গল্পের সুন্দর দুটি Specimen. প্রকৃত ছোট গল্পের যে সব গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা ইহাতে বিদ্যমান। এই পুস্তকের অন্যান্য বড় গল্পের সহিত এ দুটি গল্পকে যুক্ত করায় গ্রন্থের সম্পূর্ণ একটা বিশেষ রূপ যেন খানিকটা ব্যাহত হইয়াছে।

গুণি মহলে বইখানি সমাদৃত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—শ্রীকরুণাশঙ্কর বিশ্বাস

অচল প্রেম—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত; রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্, ৯-বি, সাহানগর রোড, দক্ষিণ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৭৫, মূল্য ২৲ টাকা।

ইহা একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস। "বিচিত্রা" মাসিক পত্রিকায় যখন এই উপন্যাসখানি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল, তখন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ইহা পাঠ করিয়াছিলাম।

এই লেখকের প্রথম উপন্যাস "স্পর্শের প্রভাব" তাঁহাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস। এই গ্রন্থ-রচনায় তাঁহার পূর্ব্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে।

উপন্যাসের নায়িকা দীপ্তিময়ীর চরিত্রে প্রথমতঃ শরৎচন্দ্রের "দত্তা"র বিজয়ার ছাপ আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইলেই চরিত্রটির মৌলিকত্ব চোখে পড়ে। দীপ্তিময়ীর শিক্ষা-মার্জ্জিত রুচি, সংস্কার-বর্জ্জিত, সরল অথচ খামখেয়ালী ব্যবহার এবং চরিত্রের অনমিত, দৃপ্ত প্রখরতা পাঠকের মনকে অভিভূত করিয়া দেয়। এইরূপ একটি কোমলতাহীন সংসারের স্নেহ-মমতার আবেষ্টনহীন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বর্দ্ধিত নারী চরিত্রে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কি ভাবে প্রেমের বীজ উপ্ত হইল, এবং কি ভাবে এই অঙ্কুরিত প্রেম ক্রত বর্দ্ধমান হইয়া তাহার চরিত্রের সমস্ত দৃঢ়তা ও কঠোরতা ভাসাইয়া লইয়া গেল, গ্রন্থকার তাহা নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের মত দেখাইয়াছেন। বাণী ও কল্পনাদেবীর মত আধুনিক শিক্ষিতা প্রগতি-পরায়ণা রমণীর সর্ব্বনাশী দানবী-চরিত্র পাঠককে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। মিঃ সান্যালের

মত বিলাতী রীতি-দুরস্ত, চালিয়াৎ, জুয়াচোর, মদ্যপায়ী, ইংরেজী বুকনি-কপ্‌চানো-অভ্যস্ত, ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক বিরল নহে।

উপন্যাসে বর্ণিত প্রত্যেকটি চরিত্রই সজীব। ভাষা সাবলীল, রচনার নিজস্ব মনোহর ভঙ্গিমা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। এত বড় একখানি পুস্তক একটানা পড়িয়া যাইতে কোথায়ও ক্লান্তি আসে না। কাহিনীর চমকপ্রদ ঘাত-প্রতিঘাতে পাঠকের মনে বরাবর একটা অশান্ত কৌতূহল জাগ্রত থাকে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার।

— শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দুধের ব্যবসা — আলোচনা-পুস্তক। শ্রীনিত্য-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং নিউ বুক ষ্টল, ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। উত্তম ছাপা, মজবুত বাঁধাই, সর্ব্বসমেত ১৮৮ পৃষ্ঠা। দাম ১॥০

লেখক ভ্রমণ-বিষয়ক পুস্তকাদি লিখিয়া ইতিমধ্যেই পাঠক-সমাজে পরিচিত হইয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকে ইনি আপনার অভিজ্ঞতালব্ধ বিদেশীয় কৃষি-পদ্ধতি ও দুধের কারখানা (dairy firm)-সমূহের সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীপ্রসূত উপায় এবং তাহার ধারাবাহিক ও তুলনামূলক ব্যাখ্যার দ্বারা দুগ্ধ ব্যবসায়ের প্রসার সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এদেশীয় ব্যবসায়ীগণের পক্ষে যথেষ্ট উপকারে আসিবে। স্থানে স্থানে ছবিদ্বারা অনেক বিষয়ে পরিষ্কার বুঝাইবার চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। আমরা এইরূপ একটি প্রয়োজনীয় পুস্তকের যথাযোগ্য প্রচার কামনা করি।

বাঙালী—শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী প্রণীত ও ৩।২, হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেন, কলিকাতা হইতে প্রাপ্তব্য।

ইহা যে একখানি ঝক্‌ঝকে ছাপা অভিনব কবিতার বই, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৬ পৃষ্ঠা, দাম ৵০।

নটরাজ—মাসিক পত্রিকা—সম্পাদক—শ্রীগৌরপ্রিয় দাশগুপ্ত। ১৭, পূর্ণ ব্যানার্জ্জি লেন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা /০ আনা।

সাহিত্য-বিষয়ক খুঁটিনাটি লইয়া গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ নটরাজ প্রধানতঃ 'শনিবারের চিঠি'র কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এদেশে এইরূপ পত্রিকার ক্ষেত্র এখনও পড়িয়াই আছে এবং মফঃস্বল সহর হইতে প্রকাশিত অনুরূপ একখানি পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা কম নহে। উন্নতি কামনা করি।

—শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

বিশ্ব রাজনীতির কথা—ডাঃ শ্রীতারকনাথ দাস, এম্-এ, পি-এইচ-ডি প্রণীত। প্রকাশক — সরস্বতী লাইব্রেরী ১।১।১ বি, কলেজ স্কোয়ার (ইষ্ট) কলিঃ মূল্য ১॥০।

বিশ্বরাজনীতির কথা রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত না হইলেও, অতীত ও সমসাময়িক রাজনীতির দার্শনিক আলোচনা। বাংলা-সাহিত্যে রাজনীতিচর্চ্চার সহায়ক গ্রন্থ যে কয়খানি আছে, তাহাতে আন্তর্জাতিক অবস্থা বা পরিস্থিতির অবতারণা করা হয় নাই, অথবা যাহা হইয়াছে, তাহা রাজনৈতিক আন্দোলনের হৈ-চৈয়ের মত ভিত্তিহীন স্বপ্ন-বিলাস মাত্র। ডাঃ দাস বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তা-প্রবাহের সংবাদ রাখেন এবং রাজনীতি-দর্শনের একজন বিশেষজ্ঞরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিক অগ্রগতির রূপ কি ভাবে পরিণতি লইতে পারে, কি করিয়া জগতের প্রগতির সহিত সমচ্ছন্দে যোগাযোগ রাখিয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারে, সেই সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশের পর ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন বহু দিক্ দিয়াই হইয়াছে এবং অনেক নূতন সমস্যাও দেখা দিয়াছে। তথাপি গ্রন্থখানি অসাময়িক হইয়া পড়ে নাই, কারণ লেখকের দূর-দৃষ্টি বিশ্বের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার রূপ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে।

গ্রন্থকার ভারতের বাহিরে—দীর্ঘকাল ইয়োরোপপ্রবাসী, তথাপি ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার তীব্র সজাগ দৃষ্টি দেখিয়া অভিভূত হইতে হয়। এই দৃষ্টি এ দেশের অনেক নেতার চৈতন্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করিবে।

গ্রন্থকার বাংলার বাহিরে অবস্থান করিলেও, তাঁহার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। গ্রন্থকার বাংলাভাষায় রাজনীতিচর্চ্চার একটি নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন এবং বিশ্ব-রাজনীতিচর্চ্চার রীতির অবতারণার দ্বারা রাজনৈতিক সাহিত্য-সৃষ্টির পথ-প্রদর্শক হইলেন।

ময়মনসিংহবাসী—সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত। কার্য্যালয়—৩২ আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা।

ময়মনসিংহবাসী ময়মনসিংহের অতীত ও বর্ত্তমান সংস্কৃতির ধারক ও পরিচারক মাসিকপত্রিকা। নামের দিক্ দিয়া জিলার পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও, পত্রিকায় অন্য জেলাবাসীর রচনাও প্রকাশিত হইতেছে। ময়মনসিংহের অতীতের উজ্জ্বল ইতিকথা বাঙ্গালার ইতিহাসের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। ময়মনসিংহের সংস্কৃতিমূলক ইতিহাস বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্মৃত তথ্য ও উপাদানের রত্ন-ভাণ্ডার। ময়মনসিংহবাসীর উদ্যোক্তৃগণ এই উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদার্হ।

—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য



শিকার ও জয়পুরের বিবাদ—

জয়পুরের সামন্তরাজ্য শিকার কিছুদিন পূর্ব্বে জয়পুরের সৈন্যবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। আসন্ন সংঘর্ষের আয়োজন করিয়া জয়পুর মেশিন গান, গোলা, বারুদ, সৈন্য প্রভৃতির সমাবেশ দ্বারা আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, শিকারের সামন্ত নৃপতি রাও রাজা স্বীয় রাজধানীতে বন্দি-জীবন যাপন করিতেছিলেন।

সংবাদপত্রের স্তম্ভে হিন্দু সভার বিবরণ হইতে জানা যায়, জয়পুর ও শিকারের মধ্যে বহুদিনের মনোমালিন্য। ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী নাকি জয়পুর-রাজ্যের কর্ম্মচারিগণের ঔদ্ধত্য। জয়পুরের মহারাজা এবং রাজপুতনার পলিটিক্যাল এজেণ্ট প্রভৃতির প্রতি রাও রাজার উপেক্ষার সংবাদ ভিত্তিহীন বলিয়া বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। শিকারের রাজকুমারের বিবাহ এবং শিক্ষা ব্যাপার লইয়া জয়পুরের সহিত যে গোলযোগের কথা তাহাও অমূলক, এবং এতই সাধারণ যে, তজ্জন্য সৈন্য-সমাবেশ অবিশ্বাসযোগ্য।

রাওরাজা জনপ্রিয়। তাঁহার প্রজাগণ ধন-প্রাণ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ঘটনাগুলি অভিনিবেশসহকারে অনুধাবন করিলে মনে হয়, জয়পুরের ঔদ্ধত্যই এ ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মূলে ছিলেন জয়পুরের রাজ-কর্ম্মচারিবৃন্দ। মহারাজা বা এজেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে এজন্য দায়ী নহেন, ইহাই মনে হয়।

যাহা হউক, বিবাদের অবসান হইয়াছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গেল। রাও রাজাকে বিকৃত মস্তিষ্ক ঘোষণা করিয়া রাজ্যপরিচালনা কোর্ট অফ ওয়ার্ডে প্রদত্ত হওয়া এবং জয়পুরের পরবর্ত্তী বিবৃতি মোটেই সন্তোষজনক নহে।

শিকারের গোলযোগ এখনও জটিল। জয়পুর কর্ত্তৃক মনোনীত কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিলে, এ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা। কমিশনের সভ্যগণের উপর শিকারবাসীর আস্থা নাই। সুতরাং জয়পুরের সুবিচার শিকারের নিকট অবিচার প্রতিপন্ন না হয়, তজ্জন্য নূতন কমিশন বসান উচিত।

মেক্সিকোর আত্ম-প্রতিষ্ঠা—

মেক্সিকোর প্রাকৃতিক সম্পদের দুইটী প্রধান উপকরণ পেট্রল ও রৌপ্যের মালিক ছিলেন ইংরাজ এবং মার্কিণ বণিকগণ। বিদেশীর হাতে খনিগুলি চলিয়া যাওয়ায়, মেক্সিকোর আর্থিক শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। খনির পরিচালকগণ শুধু অর্থ শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত প্রকারান্তরে শাসনতন্ত্রের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া মেক্সিকোর আত্মপ্রতিষ্ঠায় বাধা দিতেছিলেন। দীর্ঘদিন আর্থিক দুর্গতি সহ্য করিয়া প্রেসিডেণ্ট কার্ডিনাস মেক্সিকোকে এই বৈদেশিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে চাহিলেন। তিনি বৃটিশ ও মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে, মেক্সিকোর তেলের খনিগুলির পরিচালনভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিবেন। ক্ষতিপূরণের জন্য বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত তিনি একটা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথাও জানাইয়াছিলেন। ইহা দুই বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা।

যে কারণেই হউক, মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য না করিয়া ক্ষতিপূরণ-গ্রহণে স্বীকৃত হন। বৃটেনের নিকট মেক্সিকোর এ দাবী মনঃপূত হইল না, তাঁহারা খনির মালিকী-স্বত্ব ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিলেন।

মেক্সিকোর আত্মমর্য্যাদায় ইংরাজের বিশ্বাস ছিল না। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র মেক্সিকোর সহিত পারস্যের তেলের খনি অপেক্ষা সুবিধায় একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং বৃটেন হইতে জবাব আসিল—মেক্সিকোর আর্থিক অবস্থার প্রতি ইংরাজের আস্থা নাই,

ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মত হইতে পারিবেন না। হয়ত বৃটেন ভাবিয়াছিলেন তাহাদের অসম্ভব দাবীর পরিমাণ শুনিয়া মেক্সিকো পিছাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ।

প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাস ইহার প্রত্যুত্তরে রাজশক্তির সাহায্যে সমস্ত খনিগুলি নিজ হাতে লইয়াছেন। ইহার ফলে বৃটেনের সমস্ত আশা চূর্ণ হইয়া গেল। ইউরোপে বৃটিশ নীতি দেখিয়া জগৎ বুঝিয়াছে, তাহার কথার বা ভয়-প্রদর্শনের মূল্য কতখানি। যাহা হউক, মেক্সিকো ক্ষতি-পূরণস্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ বৃটেনকে পাঠাইয়া দিয়াছে। বৃটেনকে ইহা লইয়াই অগত্যা সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

মেক্সিকোর জেনার‍্যাল লাজারো কার্ডিনাস মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে রাষ্ট্রনায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শাসন-কর্ত্তৃত্ব হাতে লইয়া তিনি রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত করিয়াছেন। শ্রমিক ও চাষীদিগের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা শুধু সমাজতন্ত্র রাজ্যেই সম্ভব। বস্তুতঃ মেক্সিকো রুষ-শাসন দ্বারা প্রভাবিত। মেক্সিকোর একটী বড় রেল কোম্পানী এবং আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সম্পত্তি মেক্সিকো গভর্ণমেণ্ট খাস করিয়া লইয়াছে। তেল ও রূপার খনি ছাড়াও মেক্সিকোতে বহু বিদেশী কোম্পানীর প্রতিপত্তি ছিল। ক্রমে ক্রমে এ সমস্তই গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে দেশের লোকের হাতে আসিতেছে। মেক্সিকোর এই নবজাগরণের প্রধান নায়ক জেনারেল কার্ডিনাস্।

চেকোশ্লোভেকিয়া—

অষ্ট্রিয়া অধিকার করার পর নাৎসী-আন্দোলনের ঢেউ চেকোশ্লোভেকিয়াকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সুযোগে চেকোশ্লোভেকিয়ার সুদেতেনবাসী জার্ম্মানগণ নানা দাবী-দাওয়া লইয়া চেকোশ্লোভেকিয়ার রাজনৈতিক সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলে। হিট্‌লার পূর্ব্বেই পৃথিবীর সমস্ত জার্ম্মানভাষীদের লইয়া বৃহত্তর জার্ম্মানীপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুদেতেন-বাসীরাও সেই আশা পোষণ করিয়া আন্দোলন সুরু করে। ভাবে-ভঙ্গীতে হিট্‌লার অষ্ট্রিয়ার ন্যায় চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রতি কি মনোবৃত্তি পোষণ করেন, তাহাও জানিতে কাহারও বাকী ছিল না। বিনা রক্তপাতে চেকো-শ্লোভেকিয়া, অন্ততঃ ইহার কিয়দংশ, জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিতে অভিসন্ধি করিলেও, এ আশা সহসা সফল হইল না—প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের দৃঢ়চিত্ততায়। রুষিয়া ফ্রান্সের



ইতালীতে হের হিট্‌লারের রাজকীয় অভিনন্দনের একটী দৃশ্য

ন্যায় চেকোশ্লোভেকিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। শক্তিমানের কাছে হিট্‌লার তাই ভীত হইয়া পড়িলেন। চেক-সীমান্তে দুই জন আন্দোলনকারী হত হইলেও এবং চেক-বিমান জার্ম্মান রাজ্যের সীমান্ত পার হইয়া উড়িয়া বেড়াইলেও, জার্ম্মানী এ লাঞ্ছনা এক প্রকার নীরবেই সহ্য করে। কথায়, ঘোষণায় জার্ম্মান-নেতা হিট্‌লার যে অধৈর্য্যের পরিচয় দিয়া থাকেন, বাস্তবক্ষেত্রে শক্তির সম্মুখীন হইতে কিন্তু তিনি ততটা প্রস্তুত নহেন—চেকোশ্লোভেকিয়ার ঘটনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। তাই এবার সমস্যা জটিল হইলেও যুদ্ধ বাধিল না, সার এবং অষ্ট্রিয়ার ন্যায় চেক-রাজ্য হস্তগত করা হইল না। বৃটেনের মৌখিক দৌত্য বহু ক্ষেত্রে অস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া জগতের নিকটে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মানী এবং ইতালী ইহার অসারতার প্রমাণ যথেষ্টই পাইয়াছে। ফ্রান্স ও রুষিয়া অগ্রসর না হইলে, এবার চেক-সমস্যা ইউরোপে স্বৈরাচার প্রশ্রয় দিত। বৃটেন ইতালীও জার্ম্মানীর কাছে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, চেক-সমস্যায়ও সে সুদেতেন জার্ম্মানীকে দেওয়ার পক্ষপাতী, যদিও ইহা ভার্সাই-সন্ধির রীতিবিরুদ্ধ।



মধ্য ইউরোপের শক্তিশালী দুই ডিক্টেটরের মোলাকাৎ

ইতালীর রাষ্ট্রনেতা মুসোলিনী কিন্তু এই ব্যাপারে কোন কথাই বলেন নাই। এদিকে বৃটেনের সহিত ইতালীর একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বৃটেন যৎসামান্য আশ্বাস পাইলেও, নিরাপদ মোটেই নয়। মেডিটেরেনিয়ানের প্রভুত্ব ইতালীর একাধিকারে, একথা বুঝিয়া বৃটেন ইতালীর যত অন্যায় নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছে, এমন কি ইতালীকে এই অন্যায়ে সাহায্য করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। আবিসিনিয়ার ব্যাপার হইতে আমরা তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি।

হিট্‌লার সম্প্রতি মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন। হিট্‌লারের ঘোষণায় বুঝা যায়, জার্ম্মানী ও ইতালীর সৌহৃদ্য আপাততঃ অচ্ছেদ্য। বৃটেন-ইতালীর মিত্রতা তাই মনে হয় কপট বা আপেক্ষিক। বৃটেন ইতালীর মোহে পড়িয়া চেক-রাজ্যের সাহায্যে ফ্রান্স ও রুষের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ দিতে বিমুখ। কিন্তু ইহাতে বৃটেনের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছিল না, ইহা অবধারিত।

চীন-জাপান—

কয়েকটী পরাজয়ের পর জাপান আবার দুর্জ্জয় শক্তিতে চীনকে নিষ্পেষিত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছে। চীনের নগরে, পল্লীতে আবার মৃত্যু-দেবতার রোষ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। জাপ-সেনা নির্দ্দয়, নির্ম্মম—তাহারা দোষী, নির্দ্দোষ বিচার করে না; নারী,



জাপানী ছাত্রদিগকে সমরপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগকে ছায়াচিত্র সহযোগে বীরত্বের কাহিনী শুনান হইতেছে

পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু — কেহই বর্ব্বরতার হাত হইতে মুক্ত নহে। একজন জার্ম্মান পরিদর্শকের মতে, ২০ হাজার নারী এ যাবৎ এই উন্মত্ত সেনার হাতে নারীত্বের অপমান সহ্য করিয়াছে—জাপসেনা সতীত্ব বলিয়া কিছু স্বীকার করে না। কিন্তু এই প্রবল ঝড় চিরদিন বহিবে না। চীন-সাম্রাজ্য বিশালায়তন, বহু যুগের ঝঞ্ঝা তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। চীন হীনশক্তি হইয়াছে—মরে নাই। এই মহাসাম্রাজ্য দখল করিতে গেলে জাপান নিঃস্ব হইয়া যাইবে—বিজয়ের মাল্য-কণ্ঠে শ্মশানে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে বিজয়ী ও বিজিত উভয়কেই।

জাপানের এক তৃতীয়াংশ সেনা চীন-সমরে নামিয়াছে। ইহাদের অনেকেই ঘরে ফিরিয়া যাইবে না, হয়ত আরও সেনার প্রয়োজন হইয়া উঠিবে। তরুণ চীনে জাতীয়তার জাগরণ আসিয়াছে। পরাজয়ের পর পরাজয় সহিয়াও চীন বাঁচিয়া থাকিবে। যে সমস্ত প্রদেশ জাপান জয় করিয়াছে, তাহা সুরক্ষিত করিতে হইলে, বন্দুক, কামান, গোলা, বারুদ, সৈন্য, সামন্ত লইয়া সব সময়েই জাপানকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। এমন করিয়া রাজ্য-শাসন সম্ভব নয়। সুতরাং মনে হয়, জাপান কয়েকটা প্রচণ্ড আঘাতে চীনকে বিব্রত করিয়া তারপর একটা আপোষের চেষ্টা করিবে।

স্পেন—

স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের গতি অতি মন্থর। জেনারেল ফ্রাঙ্কো ইতালী ও জার্ম্মানীর সাহায্যে অনেক দূর অগ্রসর হইলেও রাজশক্তি এখনও বিজয়ের আশা রাখে। ভলাণ্টিয়ার অপসারণের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নিরপেক্ষতার নামে অন্যায় আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। ইতালী ও জার্ম্মানীর নিকট কাহারও উচ্চবাচ্য করার শক্তি নাই। সেদিনও একখানি বৃটিশ জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্ষীণ প্রতিবাদ ব্যতীত বৃটেনের আর কোন শক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

স্পেনে অস্ত্র সরবরাহ করার প্রতিবন্ধক থাকায় রাজশক্তি অস্ত্রশস্ত্র হইতে বঞ্চিত। ফ্রাঙ্কো ইতালী ও জার্ম্মানী হইতে রণসম্ভার পায়—এ অন্যায়ের প্রতিবাদ ব্যতীত প্রতিকার করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। আমেরিকা ইচ্ছা থাকিলেও বৃটেনের "কুকুরের সাথে শিকার ও খরগোসের সাথে পলায়ন" নীতির মাঝে পড়িয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেছে।



বঙ্গে ব্রহ্ম—বর্ম্মা ফুট্‌বলের সুখ্যাতি অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের সময়ে 'স্কুল-টিমে' দুই একজন বর্ম্মা দেশের ছেলের খেলা যাহা দেখিয়াছি তাহাও অখ্যাতি করিবার মত নহে। কালীঘাটের দৌলতে কলিকাতার দর্শক এই শ্রেণীর খেলোয়াড়ের খেলা প্রায় প্রতিবারই উপভোগ করিয়াছে। করিস্থিয়ন্‌-ইস্‌লিংটনকে বর্ম্মার পরাভূত করা, খেলা সম্বন্ধে তাহাদের সুনাম সাধারণের কাছে বাড়াইয়া দিয়াছে। বম্মিজ দলের এখানে আসিয়া খেলার পক্ষপাতী তাই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই



পাগ্‌সলী—
বর্ম্মার চমকদার খেলোয়াড়

সা-বেলী—
বর্ম্মা দলের নেতা

হইয়া পড়েন। খেলা সম্বন্ধে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন যখন হইল তখন মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া অনেকে কিন্তু বলিলেন—"এই দল! চীনা-ফুট্‌বল ইহাদের অপেক্ষা অনেক ভাল।" অতি সংক্ষেপে বর্ম্মা-ফুট্‌বল সম্বন্ধে বঙ্গদেশের লোকাভিমত এখন এইই। বঙ্গদেশের 'পড়িয়া-যাওয়া' ফুট্‌বলের যুগে এই লোকাভিমত বর্ম্মার পক্ষে সুবিধাজনক কি? আই-এফ-এর বিরুদ্ধে মুখপাতেই বর্ম্মার পরাজয় (১-০) ও ক্যাল্‌কাটা-মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে তাহাদের জয়লাভ এবং 'ভারতীয়-একাদশের' সহিত খেলিয়া খেলার ফল সমান-সমান (১-১) হওয়া হইতে 'পড়িয়া-যাওয়া' বঙ্গদেশ অপেক্ষা 'প্রতাপশালী' বর্ম্মা উৎকৃষ্ট, কাগজে কলমে দেখান যায় না। বিশেষজ্ঞের স্থির সিদ্ধান্ত, শেষ দুইটী খেলায় বর্ম্মা কোনও প্রকারে 'তরিয়া' গিয়াছে। ইহাতে 'বঙ্গদেশ মরা-হাতী'—কেহ বলিলে আমরা তাঁহার কথায় সায় দিব না। আমরা জানি বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা অবসাদগ্রস্ত নিদ্রাতুরের ন্যায়। আমাদেরই অদূরদর্শিতার কারণে ইহার অবস্থান্তর ঘটিতেছে না—মরণের পথে ইহাকে আমরা আগাইয়া দিতেছি—বর্ম্মা প্রভৃতি স্থান হইতে 'ভাড়া-করা' খেলোয়াড় আনাইয়া। ভিতরের কথা জানা থাকায় আমরা আশা করিয়াছিলাম আমাদের 'মুরুব্বি'দের হাতে পঞ্জিকা আসিয়া পড়িলে মঙ্গলবার নির্দ্ধারণে তাঁহাদের আর কোনও গোল হইবে না এবং এই কারণেই 'বারফট্‌কা' আই-এফ্‌-এর এই সমারোহের ব্যাপারে কোনও আপত্তি আমরা করি নাই। ইস্‌লিংটনকে পরাজিত করিয়াছে বঙ্গদেশের একটী অনামা দলও, মনে রাখিয়া এবং বর্ম্মা হইতে প্রেরিত দলের খেলা দেখিয়া মোহাবসান দেশের 'দলপতি'গণের যদি হয়, এই উপলক্ষে প্রভূত অর্থ-ব্যয়ের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে নতুবা অর্থাপব্যয়ের কোঠায় ইহা পড়িবে। বম্মিজ খেলোয়াড়দের কথা সংক্ষেপে এই: একক খেলায় কুশলতা ইহাদের আছে—মেলতা খেলার প্রতি ঝোঁক ইহাদের প্রায় সকলেরই অল্প বিস্তর অভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। 'চোরা গোপ্তা'র 'খেল্' ও (foul) অল্প নহে। শির প্যাঁচে (Head) তত উন্নত নহে। আক্রমণ-বিভাগ অপেক্ষা রক্ষণ-বিভাগ কম জোরী।

ঘরের কথা—তিনটী খেলায় 'থোড়, বড়ি, খাড়া—খাড়া বড়ি থোড়ের' পরিমাণের ইতর বিশেষ এবার দেখা

যাইলেও দল নির্ব্বাচনে 'সনাতনী' ভাবের প্রাবল্য নির্ব্বাচকেরা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, নির্ব্বাচিত দল তিনটী দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। আই, এফ্, এর দলে হিন্দু খেলোয়াড়ের সংখ্যা অল্প অধিক থাকা উচিৎ ছিল এবং ভারতীয় একাদশ দলে আই-এফ-এ দলের জন্য নির্ব্বাচিত কোনও খেলোয়াড়কে না লইলেই ভাল হইত। ক্যাল্‌কাটা-মোহনবাগানের নির্ব্বাচিত দল 'ঘরোয়া'



আর্ম্মষ্ট্রং—'ক্যাল্‌কাটা'র দুর্গরক্ষক বর্ম্মার বিপক্ষে আই-এফ্-এ দলে খেলিতে পারেন নাই



কে ভট্টাচার্য্য (মোহনবাগানের) এ বৎসর কাষ্টম্‌সের হইয়া খেলিতেছেন

নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বাহিরের কাহারও বলিবার কিছু নাই। তবে এ খেলায় সম্মিলিত দল দুইটী যথার্থ সম্মিলিত ভাবের খেলা খেলিলে তিনটী খেলার মধ্যে এই খেলাই হইত সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাহার ফলে বর্ম্মাকে খুঁজিয়া পাওয়া দায় হইত—বাহিরের 'জান-চিন্' লোকে নিঃসন্দেহ। তৃতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় দল সম্বন্ধেও এ কথা অল্পবিস্তরভাবে বলা চলে।

আমাদের কথা—লীগের প্রথমার্দ্ধ শেষ করিতে ৭ই জুনের পরে বাকি রহিল কোনও দলের দুইটী কোনও দলের বা তিনটী খেলা। তালিকার শীর্ষস্থানে আছে মোহামেডন। এস্থান শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করা কি তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর? দলের গত চারি বৎসরের পরিশ্রম এবং এ বৎসরে এ পর্য্যন্ত তাহাদের খেলার ধরণের পরে স্বতঃই অনেকের মনে হইবে—স্থান রক্ষা করা বিশেষ সন্দেহজনক ব্যাপার। ইহারই মধ্যে পুলিশ, কালীঘাট ও ইষ্টবেঙ্গলের হস্তে ইহাদের পরাজয়ে ইহাদের শেষ জয়ী হইবার সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া জয়-পরাজয়ের উত্তেজনায় একটা কথা অনেকেই কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখেন না, সঙ্ঘ-ঐক্য এ দলের এখনও যাহা আছে অপর কোনও দলের তাহা নাই। এই সঙ্ঘ একতার বলেই 'পড়িয়া যাওয়া' অবস্থাতেও তাহারা এখনও শীর্ষস্থানাধিকারী—সম্ভবতঃ শেষ পর্য্যন্ত তাহারা স্থানচ্যুত হইবে না, এ বল যদি তাঁহাদের অটুট থাকে। আমাদের মনে হয় মোহামেডনের কর্ত্তৃপক্ষ একটা মারাত্মক ভুল করিয়াছেন, 'মাঝ-মোহড়ায়' খেলোয়াড় অদল-বদল করিয়া। দলে নূতন খেলোয়াড় জুড়িয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা উচিৎ ছিল সুরুতে। নবম খেলা পর্য্যন্ত একটী খেলাতেও মোহনবাগানের 'হার' না হওয়ায় অনেকেরই ইহাদের সম্বন্ধে অনেক আশা জাগিয়াছিল। 'পুলিশের তাড়নায়' তাহা ভঙ্গ হইয়াছে। মোহনবাগানের খেলার রকম মন্দ নহে তবে 'রেশ' থাকে কই! 'ত্মাবতার কৃপা-বারি' বর্ষণ এখনও হয় নাই। হইলে মোহনবাগানের যাহা আছে তাহারও ছত্রভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যে যথেষ্ট রহিয়াছে।

লম্ফ দিয়া উঠিতে ইষ্টবেঙ্গলের যে পরিমাণ 'কাঠ-খড় পোড়ান' প্রয়োজন মুর্গেশ ও লক্ষীনারায়ণের দ্বারা তাহা হইবে কি? এরিয়নের কাছে তাহাদের ৩-১ ও ক্যালকাটার কাছে ১-০ গোলে হার এবং কে-ও-এস্-বি'র সঙ্গে ০-০ গোলে সমান পাল্লা হইতে কি বুঝায়? পুলিশকে ৩-২ এ ও মোহামেডনকে ২-০-তে হারানতেই কি সে অর্থ-সমস্যার পূরণ হইবে? হইত যদি পরের খেলায় জয়ের রেশ দেখা যাইত। এই সকল কথা মনে রাখিয়া এবং পুলিশ, ই, বি, আর ও কাষ্টম্‌সের অপর যে কোনও দলকে 'ঝট্‌কা' মারার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিয়া মোহামেডনের শেষ-জয়ী হওয়া সুদূর সম্ভাবনা মনে হয় কি? গোরার দলের মধ্যে কে, ও, এস্, বিও 'তালে' চলিতেছে মন্দ নহে। নীচের দিকে যে কয়টী দল আছে তাহাদের মধ্যে ভবানীপুরকে আমরা বিশেষ সাবধান করিয়া দিতেছি।

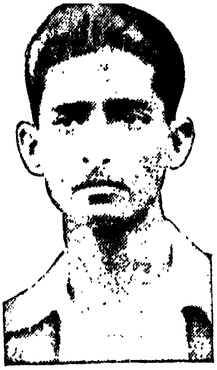
সন্তরণ-সমারোহ — কলিকাতায় 'নিখিল-ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা' বলিয়া যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহাতে বঙ্গদেশের সাঁতারুদের জয়জয়কার হইয়াছে। অদূর-ভবিষ্যতে সন্তরণে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করা বাঙালীর পক্ষে খুব কঠিন নহে, দলাদলির ভাব যদি কাটাইয়া উঠিতে পারা যায়—বিশেষজ্ঞের অভিমত। পৌরসভার অর্থাৎ কলিকাতার জনসাধারণের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতার প্রায় প্রতি সন্তরণ-সঙ্ঘই পুষ্ট। এ কথা মনে রাখিয়া সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষ সঙ্ঘ-পরিচালনা যদি করেন দলাদলি-দোষ আপনা হইতেই বোধ হয় দূর হয়। কথাটা ইঙ্গিতে বলিয়া প্রতি-যোগিতায় বঙ্গ - মুখ রক্ষাকারী সাঁতারুদের আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। প্রতি-যোগিতার বিভিন্ন ঘটনায় জয়ী হইয়াছে



সন্তরণপটু দুর্গাদাস

—১৫০০ ও ৪০০ মিটারে দুর্গাদাস, ১০০ মিটারে (ফ্রি) দিলীপ মিত্র, ২০০ মিটার বুক-সাঁতারে প্রফুল্ল মল্লিক, ১০০ মিটারে (স্ত্রী) লীলা চ্যাটার্জ্জি ও মেড্‌লি রেসে, বঙ্গদেশ। ওয়াটার পোলোতেও 'অবশিষ্ট'কে পরাজিত করিয়াছে বঙ্গদেশ ৩-২ গোলে।

লণ্ডনে কার্ত্তিক বসু—"দিল্লী ক্রিকেট্-মসনদের পার্শ্বচরগণ কর্তৃক বার বার অবহেলিত বঙ্গদেশের প্রথিত-যশা ব্যাটমদার কার্ত্তিক বসু রাজপুতানা দলের হইয়া 'বুড়া বয়সে' লণ্ডনে যে ব্যাটম্‌দারী দেখাইতেছেন তাহাতে লণ্ডনের কেহ কেহ আশ্চর্য্যান্বিত—বসুজা নিখিল-ভারত দলের সঙ্গে ইহার পূর্ব্বে আসেন নাই কেন? তাঁহার না যাওয়ার জন্য যাঁহারা দায়ী তাঁহারাও কথাটা নিশ্চয় শুনিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস বসুজা হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিবেন না, তথাপি তাহা যে অন্য দিক্ হইতে (বিশেষতঃ নিখিল-ভারত নেতাও অমরনাথের ব্যাপার হইতে) বুঝিয়া



কার্ত্তিক বসু
লণ্ডনে চমৎকার ব্যাটম্‌দারী
দেখাইতেছেন

লওয়া কাহারও পক্ষে কঠিন হইবে না! 'দিল্লী মস্‌নদের' 'সুনাম' তাহাতে যাহা হয় হউক, বসুজা বাঙালার জন্য সুনাম অর্জ্জনে সাধ্যমত ক্রুটি করিতেছেন না। বেকেন-হামের বিরুদ্ধে ১৩২, অক্স-ফোর্ডের বিরুদ্ধে ৬০, সার জুলিয়ন্ কাহান একাদশের বিরুদ্ধে ১০১—তাঁহার পাকা ব্যাটমদারীর পরিচায়ক। রাজ-পুতানা দলের এ পর্য্যন্ত খেলার প্রশংসা সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আশাকরি আগামী সংখ্যার 'প্রবর্ত্তকে' সে সকলের বিস্তৃত সমালোচনা করিবার সুযোগ আমরা করিতে পারিব।

অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ড—প্রবর্ত্তক মুদ্রিত হইবার সময়ে 'এসেজের' (Ashes) জন্য ইংলণ্ডে টেষ্ট খেলা আরম্ভ হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটমদারীর 'তোড়' ইংলণ্ডে এ পর্য্যন্ত এ বৎসরে যাহা দেখা গেল তাহা হইতে ইংলণ্ডের বলন্দাজদেরা 'টেষ্টে' 'কাল ঘাম' ছুটাইয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। শত-মারদৌড় অষ্ট্রেলিয়ার একাধিক ব্যাটমদারদের যেন হাতের পাঁচ। তাহাদিগের সহিত পাল্লা দিবার মত ব্যাটমদারী ইংলণ্ডের যে সকল দল খেলিল তাহার এক-টাতেও এক জনও দেখাইতে পারে নাই। ইহার উপর হ্যামণ্ড্ ও ক্লে টেষ্টে খেলিতে পারিবে না—টেষ্টে ইংলণ্ডের অবস্থা সুতরাং সঙ্গীন বলিতেই হইবে—ক্রীড়া-দেবতা ইংলণ্ডের ভালে আর কিছু লিখিয়া যদি থাকেন স্বতন্ত্র কথা।



হ্যামণ্ড (ইংলণ্ডের)
ইনি এবং ক্লে ইংলণ্ডের পক্ষে টেষ্টে
খেলিতে পারিবেন না।

বি, দাসের আইন

গত ভারত ব্যবস্থাপক সভায় ষোল বনাম সাতাশীখানি ভোটে শ্রীযুক্ত বি, দাসের বাল্য-বিবাহ নিরোধ বিষয়ে প্রস্তাবিত বিলটী আইনে পরিণত হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত লালচাঁদ নভাল রায়ের যে বিল বিনা প্রতিবাদে উক্ত সভায় গৃহীত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। এই উভয় আইন অতঃপর পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত সার্দ্দা আইনের যে সকল ত্রুটি থাকায়, তাহা সর্ব্বত্র কার্য্যকর হইয়া উঠিতেছিল না, তাহা পূরণ করিয়া বাল্য-বিবাহ-নিবারণ ব্যাপারে সমাজ-সংস্কারকগণের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ সমধিক প্রশস্ত করিবে, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

সার্দ্দা আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর, আইনকে ফাঁকি দিয়া বৃটিশ ভারতের বাহিরে গিয়া অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দিবার যেরূপ ধুম পড়িয়া যায়, তাহাতে উক্ত আইনটী প্রায় ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এইরূপ শুনা যায়। শ্রীযুক্ত লালচাঁদ নভালরায়ের আইন অতঃপর এই শ্রেণীর অপরাধিগণকে সার্দ্দা আইনের পরিধির মধ্যে আনয়ন করিবে। অন্য পক্ষে, শ্রীযুক্ত দাসের আইন সার্দ্দা আইনের কার্য্যকরী ক্ষমতা দৃঢ়তর করিবার জন্য (ক) আইন-ভঙ্গ পূর্ব্বক বিবাহের ব্যবস্থা হইলে, আদালতকে তদ্বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা-প্রচারের অধিকার দান করিবে; (খ) এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত স্বয়ং মামলা আনয়ন করিতে পারিবে; এবং (গ) এই প্রকারে সংঘটিত বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্বন্ধ নিবারণ করিবার ব্যবস্থাও আদালতই করিতে পারিবে।

দেখা যায়, শ্রীযুক্ত দাসের বিল সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটীর অনুমোদিত খসড়ায় ১২নং বিধানের উপর তাহারা যে দ্বিতীয় অনুবিধি সংযোজন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিনা নোটিশে অপরাধীর উপর নিষেধাজ্ঞা-প্রচারের ক্ষমতা কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আইনে সেই প্রস্তাব বর্জ্জন করা হইয়াছে। ইহাতে আইনের কার্য্যকরী ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছে। কেন না, নোটিশ পাইয়া অপরাধী সতর্ক হইয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই—তাহাতে আইনকে এড়াইবার সুযোগ প্রশস্ত করা হইল মাত্র।

কমিটীর আর একটী প্রয়োজনীয় প্রস্তাব যাহা আইনে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদনুসারে বালিকা স্ত্রীর উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর পৃথক্ ভাবে অবস্থান, স্ত্রীর ভরণপোষণ, উভয়ের অকাল-সহবাস-নিবারণের ব্যবস্থা না করায়, আইনটী সংস্কারকগণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনে করিতে পারিবেন না। এই ত্রুটি সংশোধিত হইলে, তাঁহারা অধিকতর সন্তুষ্ট হইতেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ব্যবস্থাপক সভায় সার্দ্দা আইনের প্রবর্ত্তনের-কালে যে আলোচনা আন্দোলনের তুফান উঠিয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ দেখা যায় নাই। সনাতনী দলের একমাত্র প্রতিনিধি দীর্ঘ বক্তৃতায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং মাত্র ১৫ জন সহযোগী তাঁহার সমর্থন করেন। সমাজের সংরক্ষণশীল পক্ষ ক্রমেই যেন এই প্রকার প্রতিবাদ নিরর্থক মনে করিয়া আলোচনা আন্দোলনে স্তিমিত হইয়া পড়িতেছেন। সতীদাহ বা শিশুবলি-নিষেধের ন্যায় বাল্য-বিবাহ-নিরোধের ব্যবস্থাও কি সনাতন হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ বরদাস্ত করিয়া লইতেছেন? যে পরিবর্ত্তন বিদেশীয় আইনের জোরে করিতে হয়, তাহা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন নহে, ইহাতে দ্বিমত নাই। কিন্তু ভারতের সমাজশক্তি আজ এমনই পঙ্গু, যে স্বাভাবিক বিবর্ত্তনে সংস্কার বা সংরক্ষণ, কোনও কিছু করিবার শক্তিই তাহার ভিতর হইতে ফুঁড়িয়া বাহির হয় না। কাজেই যুগশক্তি জাতিকে বাধ্য করিয়াই পরিবর্ত্তন আনে। এ অবস্থার প্রতিকার কারণ ধরিয়া না

করিলে সম্ভব নহে। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিলে, সত্যই আমরা আশ্বস্ত হইব।

মহাজন-বিধি-সংশোধন

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় মহাজন-বিধি-সংশোধনের চেষ্টা চলিতেছে। এই সম্পর্কে সিলেক্ট-কমিটীর তিনটী বিলই নাকচ করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল আর একটি বিল শীঘ্রই আইন-সভায় পেশ করিবেন, শুনা যাইতেছে। মহাজনদের সুদের হার কমাইয়া খাতকদের সহায়তা করাই যদি বিলের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সুদের সর্ব্বনিম্নতম হার এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করাই উচিত, যাহাতে মহাজনগণ ঋণদানে কুণ্ঠিত না হন। সুদের হার কমাইতে গিয়া, খাতকদের ঋণপ্রাপ্তির পথ বন্ধ হইয়া গেলে, তাহাতে আইনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। বঙ্গীয় বাণিজ্যসভা এই দিক্ দিয়া যে সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, আশা করি, মন্ত্রিমণ্ডল তাহাতে অবহিত হইবেন। আমাদের মনে হয়, ব্যাঙ্কের সুদের হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া মহাজনী সুদের হার নিয়ন্ত্রিত হইলে, তাহাতে এই আশঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে।

বাঙালার যৌথ ঋণদান সমিতিগুলির যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে পল্লী-কৃষকদের প্রয়োজন-মত টাকার সরবরাহ করিবার জন্য মহাজনদের পাশাপাশি থাকার দরকার এখনও আছে। কিন্তু মহাজন যদি আইনের নির্দ্ধারিত নিম্নতম সুদের হারে টাকা খাটাইতে রাজি না হয়, দুরবস্থা কৃষকদেরই হইবে—কেন না, কো-অপারেটিভ লোন কোম্পানী তাহাদের এই অভাব মিটাইতে সক্ষম হইবে না। এই অবস্থায় একমাত্র সরকারী ব্যাঙ্কের সহিত আনুপাতিক সামঞ্জস্য রাখিয়া মহাজনী ঋণদান-নীতি যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলেই খাতকদের উভয় কূল রক্ষা পাইতে পারে। টাকার বাজার-দরানুযায়ী ব্যাঙ্কেরও সুদের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, সুতরাং মহাজনদের পক্ষে সেই সুবিধা-টুকুর দাবী করা অনুচিত হইবে না। তদুপরি, একই ধারা সর্ব্বত্র হওয়ায়, দেশের কৃষি ও বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই একটা মূল্যগত সাম্যনীতি (parity of values) ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া অর্থনৈতিক আবহাওয়া অনেকখানি বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবে। আমরা এইরূপ ব্যবস্থার দিকেই মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রজাস্বত্ব-সংশোধন অর্ডিন্যান্স

বাঙালার গভর্ণর বাহাদুর ছয় মাসের জন্য অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে প্রজাস্বত্ব-সংশোধন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলের মুখ রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে প্রজামণ্ডলীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিশ্রুতির দায় এড়াইয়া আরও ছয় মাস বা ততোধিক সময়ের জন্য কালহরণের সুযোগ মাত্র পাইলেন—কিন্তু প্রজার যথার্থ স্বার্থ রক্ষা করিয়া তাহাদের মনে স্থায়ী নিশ্চিন্ততা বা শান্তি কিছুই সঞ্চার করিতে পারিলেন না।

অনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার জন্য প্রজাসাধারণ মন্ত্রিমণ্ডলীর আন্তরিকতার অভাবকেই স্বভাবতঃ দায়ী করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। প্রজাস্বত্ব-বিধি প্রজার স্বার্থকেই একমাত্র লক্ষ্যে রাখিয়া রচিত হয় নাই—এইজন্য কংগ্রেসপক্ষ এই বিল ব্যবস্থাপক সভায় সমর্থন করেন নাই—অবশ্য তাঁহারা তাহার প্রতিকূলতাচরণও করেন নাই, করিতে পারেন না। কেননা, যেটুকু প্রজার কল্যাণ ইহাতে সম্ভব হয়, সেইটুকুতে আপত্তি করিবার কারণ কংগ্রেসের দিক্ হইতে থাকিতে পারে না। জমিদার-পক্ষ এই সামান্য পরিবর্ত্তনেও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহারা মনে করেন—এই আইন দ্বারা শুধু বর্ত্তমান ভূমি-ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্ত্তন করা হইবে না, উহা দ্বারা বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি-সংক্রান্ত জমিদারদের কতকগুলি অধিকারও কাড়িয়া লওয়া হইবে। স্যার আবদুল হালিম গজনভীর মতে এই বিলের ফলে,

(১) ১৭৯৩ সালের রেগুলেশনে জমিদারদিগকে জমির উপর যে মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই স্বত্ব হরণ করা হইয়াছে;

(২) ঐ রেগুলেশনানুসারে জমির উপর চাষীদেরও যে স্বার্থ ছিল, তাহাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে;

(৩) জমিদারদিগকে বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ কিছু দেওয়া হয় নাই; এবং

(৪) চাষীর পরিবর্ত্তে দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট এক শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগী প্রজাই মাত্র উপকৃত হইবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যেভাবে আইনটা গঠিত হইয়াছে তাহাতে মিঃ গজনভীর এই সকল আশঙ্কা অমূলক বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। রাজস্ব-মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—জমিদারের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়া গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নহে, এই আইনও জমিদার-বিরোধী নহে। আসলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তি-স্পর্শ এই আইনে করা হয় নাই। মিঃ গজনভীর এই কথাটাই বরং সত্য যে, এই আইনের ফলে প্রজাদের জমি হস্তান্তর করার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনেক সময়েই কৃষক দায়ে পড়িয়া মধ্যস্বত্বভোগীকে জমি হস্তান্তরিত করিয়া, নিজে দিনমজুরে পরিণত হইতে পারে। এই সম্ভাবনা ভিত্তিহীন নহে। হস্তান্তরিত করণের ফী ও অগ্র-ক্রয়ের অধিকার-লোপ প্রভৃতি যে অবান্তর পরিবর্ত্তনগুলির ব্যবস্থা আইনে আছে, তাহাতে জমিদার-বর্গের আর্থিক হানি নগণ্য বলা যাইতে পারে।

এ হেন নির্জ্জলা আইনেও আপত্তি ও প্রতিবাদ যদি ভূস্বামিবর্গের পক্ষ হইতে উঠে, তাহা হইলে স্যার বিজয়-প্রসাদের কথাতেই বলিতে হয়—গভর্ণমেণ্ট শুধু জমিদার-দিগকে বলিতেছেন যে, তাঁহারা যেন কালের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলেন—কিন্তু জমিদারবর্গ কালের সহিত চলিতে এখনও প্রস্তুত নহেন।

ইহার উপর একটা কথা আছে। প্রজা ও জমিদারের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী, এই ধারণার উপর আমরা বর্ত্তমানে গড়িয়া উঠিতেছি। আজ প্রজার চেয়ে জমিদার শক্তিশালী বলিয়া, জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাশক্তিকে জাগ্রত ও সংহতিবদ্ধ করার কর্ত্তব্য যুগনির্দ্দেশেই ফুটিয়াছে। প্রজা-স্বত্ব-রক্ষায় যাঁহারা আজ অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদের আজ এইটুকু মনে রাখা উচিত যে, খাজনা আদায়ের দায় হইতে অব্যাহতির জন্য কিম্বা জমিদারদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই, বরং বাঙালার স্বাধীনতারক্ষার মেরুদণ্ড এই জমিদারশক্তিকে খণ্ড, বিভক্ত করার জন্যই এই বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন। সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বহুলাংশে সিদ্ধ হইয়াছে—এই শত বৎসরের মধ্যে বাঙালার জমিদারকুল ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া রাজশক্তির ক্রীড়াপুত্তলীতে পরিণত হইয়াছে। জমিদারের সহায়তায় রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, এক্ষণে জমিদার ও প্রজা উভয়কে একই পেষণ-যন্ত্রে দোরস্ত করিবারই ইহা নীতি নহে কি? ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জমিদারেরা আদায়ী খাজনার ৩ কোটী টাকা অর্থাৎ শতকরা ১০৲ টাকা লাভ হাতে রাখিয়া বাকী ৯০৲ রাজস্ব রাজশক্তিকে দিতেন—১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা দেয় রাজস্বের তিন চারি গুণ অর্থাৎ মোট ১৮ কোটী টাকা উপায় করিয়া সমৃদ্ধ হইতেছেন—ইহা রাজশক্তির দৃষ্টি এড়ায় নাই। কাজেই গণতন্ত্রের দায়ে, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী হইয়া, আমরা দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতেছি অথবা শাসকজাতির নিগূঢ় রাজনৈতিক চাল না বুঝিয়া তদনুকূলেই আমাদের সর্ব্বনাশের পথ আরও সহজ ও সুগম করিয়া তুলিতেছি—ইহা চিন্তাশীল দেশবাসীকে গভীর চিত্তে ভাবিয়া দেখিতে বলি। আন্দোলনের গতি কোন্ দিকে ফিরাইলে, আমরা যথার্থ শ্রেয়োলাভ করিব, তাহা আজ নূতন মেধা ও মস্তিষ্ক লইয়া চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে—উদীয়মান তরুণ অতীত ও বর্ত্তমান উভয়েরই গতানুগতিকতামুক্ত হইয়া আজ মৌলিক প্রতিভা লইয়া সকল বিষয় বুঝিতে ও চিন্তা করিতে শিখুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পরীক্ষার কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নাকি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ছয় বৎসরের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর হিসাব লইয়া দেখা যায় যে ১৯৩২ সালে—১৫,৭৫৮ জন, ১৯৩৩—২০,১৬৬, ১৯৩৪—২৩,১১৫, ১৯৩৫—২৪,৮৬৬, ১৯৩৬—২৫,৬৫৯, ১৯৩৭—২৭,৬৫২, এবং ১৯৩৮ সালে—৩০,১১৪ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে এবৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে ২৩,৫৮৩ ছাত্রছাত্রী। উত্তীর্ণের হার শতকরা ৭৮ জনের উপর দেখা যায়।

এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির একটা কারণ—কেহ বলেন, মুসলমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্য কারণ—১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন হইবে, এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষ

এই দুই বৎসর যত অধিক সংখ্যক সম্ভব ছাত্রছাত্রীকে ম্যাট্রিকুলেশনের সিংহদ্বার পার করাইয়া দিতেই মনস্থ করিয়াছেন। কারণ যাহাই হউক, শিক্ষার পথ প্রশস্ত হওয়া কোন ক্রমেই আপত্তিকর নহে।

অন্যদিকে দেখা যায়, আই-এ ও আই-এস্‌সি, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এবারে যথাক্রমে ৩৭০৫ ও ২,১৮৮—মোট ৫,৮৯৩ জন মাত্র। যে ক্ষেত্রে প্রায় ২৫।৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই ক্ষেত্রে ইহার এক চতুর্থাংশ ছাত্রছাত্রী কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। গ্র্যাজুয়েট বা তদূর্দ্ধ স্তরের কথা ছাড়িয়াই দিলাম—এই যে অবশিষ্ট প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র—যাহাদের সংখ্যা ২০,০০০ হাজারের কম হইবে না, দারিদ্র্য অথবা অন্য যে কোনও কারণে হউক, কলেজে প্রবেশ করিবে না—প্রবেশ করিলেও, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না—ইহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই দুশ্চিন্তা জাগিয়া উঠে। এই সকল ছাত্র শিক্ষাজগৎ ছাড়িয়া করিবে কি? বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীধারীদের বেকার-সমস্যা মিটাইবার জন্য কিছু কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই হাজার হাজার ম্যাট্রিক-পাশ-করা তরুণদের উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ যদি না ঘটে, তাহাদের করণীয় কি, সে সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও অভিভাবকমণ্ডলী উভয়কেই আজ চিন্তা করিতে বলি। বাঙালার অর্থসচিব মহোদয় তরুণদের বেকার-সমস্যা-সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আশা দিয়াছিলেন—তাঁহারও সক্রিয় দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি। সমস্যার মূল এইখানেই সৃষ্ট হইতেছে। এইখানেই যদি জাতির নেতৃপুরুষগণ গোড়া হইতে দৃষ্টি না দেন, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উভয়বিধ বিপত্তির সম্ভাবনা তাহাতে ঘটিবেই, ইহা ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা অনায়াসে বলিতে পারি।

নরেশচন্দ্রের রক্তের শিক্ষা

বিপ্লবযুগের শেষ দিকে বৈপ্লবিক দলাদলির ফলে যে হিংস্র ও কদর্য্য চরিত্রের নিদর্শন ফুটিয়া উঠায়, অভিজ্ঞ যাঁহারা তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজ বাঙালার অহিংসা-আন্দোলন-যুগেরও পরিণতি কি সেই একই পথে ধাবমান কিনা, সেই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিতেছে। চট্টগ্রামে সুখেন্দুবিকাশের খুনের পর, ভাবিয়াছিলাম—ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনা। এই নিষ্ঠুর কাহিনীর এইখানেই যবনিকা পড়িবে। সম্প্রতি যশোহরের তরুণ ছাত্র নরেশচন্দ্রের আত্মবলির বীভৎস বিবরণ শুনিয়া, আমাদের রুদ্ধ আশঙ্কা আবার জাগিয়া উঠিল। অতঃপর এই ঘটনার এইখানেই শেষ হইবে, এইরূপ ভাবিবার ভরসা আর হয় না। ইহা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে আর যেন অন্তরে সাহস মিলে না। ঘটনা সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে সেইভাবে গ্রহণ করা আর দেশনেতৃদের পক্ষে সুবিবেচনাজনক বলিয়াও মনে হয় না। তরুণের প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলার অপচেষ্টা আমরা বাঙালার রাষ্ট্রক্ষেত্রে দিন দিন পরিলক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি। এই গুণ্ডামীর প্রশ্রয় যদি কোনও দিক্ দিয়া চলে, তাহা বাঙালার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও বিষময় করিয়া তুলিবে।

যশোহর কর্ম্মিসম্মেলনের সভাগৃহ অধিকার করিবার জন্য কৃষাণ-সভা, ছাত্র-ফেডারেশন, যুব-সম্মেলন হানা দিবার চেষ্টা করে। কর্ম্মি-সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহাতে বাধা দেয়। নরেশ যখন সভাগৃহে প্রবেশ করিতে যায়, তখন প্রবল বৃষ্টি আসায় সে অন্য সকলের সহিত বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণের লাঠীর আঘাতে সে ভূপতিত হয়। এই আঘাতের ফলেই নরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। দেশকর্ম্মী বিজয়চন্দ্র রায় কলিকাতার হাসপাতালে—আরও অনেকে আহত হইয়াছেন। দেশের মুক্তিকামনার কি নিষ্ঠুর, শোচনীয় পরিণাম!

নরেশচন্দ্র সেন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তাহার মরণকালীন করুণ কাহিনী অসংখ্য পিতামাতার নয়ন অশ্রুসিক্ত করিবে। শ্মশানে পিতা জানকীনাথের কঠিন অভিসম্পাত—আশা করি, দেশনেতৃবৃন্দের হৃদয় স্পর্শ করিবে। তাঁহার আর্ত্ত কণ্ঠের আকুতি—রাজনীতিক্ষেত্রে শিশুদের জীবন লইয়া এই ছিনিমিনি খেলা তাঁহার পুত্রের রক্তে যেন অতঃপর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়।

মহাত্মা গান্ধী ছাত্রদের "active politics"-এ যোগদান নিষেধ করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই

কঠোর নিষেধ-বাণী সমর্থন করিতেছি। বাঙালার রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের এই প্রকার কালিমা নয়নগোচর করিয়াই তাঁহার কণ্ঠ হইতে ইতিপূর্ব্বেও সতর্ক-বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। বাঙালার তরুণকে তাঁহার এই মর্ম্ম-বাণী আমরা গভীর শ্রদ্ধায় প্রণিধান করিতে বলি—

"Bengal's bravery and sacrifice are unsurpassed, equalled perhaps in some measure by Maharastra. But divorced from purity and knowledge they would work terrific havoc. Yoked to purity and knowledge, they would be the salvation of India. My mission is the selfish one of harnessing the wonderful bravery and sacrifice of Bengal in the cause of what I hold dear."

বাঙালার যৌবন আজ নূতন আলোকে গতি পরিবর্ত্তন করুক—মুক্তিরই অভিযানে।

লবণ-শিল্প

ভারতীয় লবণ-শিল্প-রক্ষার জন্য ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যে শুল্ক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, গত ৩১শে মার্চ্চ তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। পুনরায় এই শুল্ক ধার্য্য হওয়া উচিত কি না, সে সম্বন্ধে বিচার করিবার প্রশ্ন উঠে। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বাঙালার জননেতৃবর্গ ইতিমধ্যে সময়োচিত একখানি আবেদন-পত্র প্রচার করিয়া আরও দশ বৎসরকাল এই সংরক্ষণ-নীতি বজায় রাখিবার জন্য পরামর্শ দেন এবং যাহাতে এই দাবী কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য বাঙালা দেশকেই অগ্রণী হইয়া ঘোরতর আন্দোলন চালাইতে বলেন।

বাঙালা সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী দেশ হইলেও, আজ প্রায় শতবর্ষকাল লবণ-প্রস্তুতি-কার্য্যে বঞ্চিত হইয়া আছে। বাঙালার মোট ৫,১০,৮৭,৩৩৮ জন লোকের জন্য বৎসরে প্রায় দেড় কোটী মণ লবণের প্রয়োজন হয়। গত ৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া বাঙালায় ১৪৪,৯৭,৩৩৯ মণ আমদানী হইয়াছে—তন্মধ্যে এডেন, হামবার্গ ও লিভারপুল হইতে ৭৫,২২,২৯৬ মণ এবং ভারতীয় বন্দরসমূহ হইতে অবশিষ্ট ৬৯,৮৫,১৪৩ মণ লবণ আসিয়াছে। একমাত্র এডেন হইতেই ৬৩,৩৪,১০৩ মণ অর্থাৎ সমগ্র বৈদেশিক আমদানীর প্রায় ৪৯ ভাগ লবণ এদেশে আসিয়াছে। এডেন পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত থাকায় রক্ষাশুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। সুতরাং রক্ষণ-শুল্কের যেটুকু লাভ, তাহার মোটা ভাগ এডেন গ্রহণ করিয়াছে, বাকী ভারতীয় শিল্প পাইয়াছে। অবশ্য ইহার ফলে বিলাতী লিভারপুলের ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙালীর পক্ষে তাহা কোনও কাজেই আসে নাই। বাঙালার শিশুশিল্প গভর্ণমেণ্টের পোষণাভাবে এডেন বা অন্যান্য স্থানের লবণের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া জীবন্মৃত দশায় উপনীত হইয়াছে।

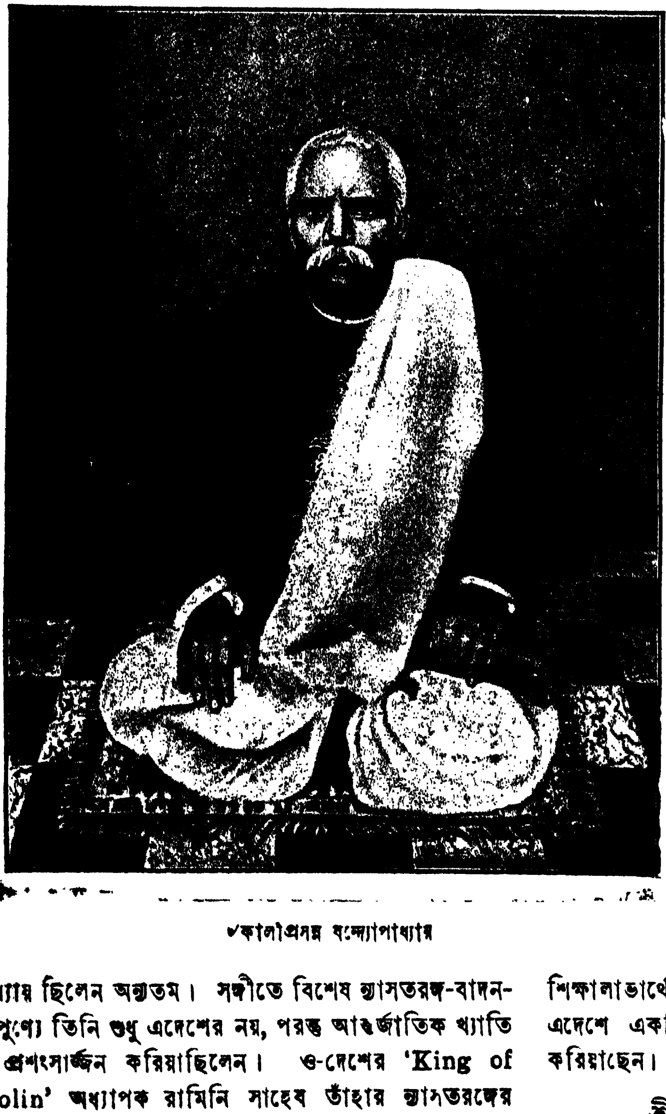
গত গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে, বাঙালী কুটীরশিল্প হিসাবে সমুদ্রতীরে কিছু কিছু লবণ তৈয়ারী আরম্ভ করিয়াছে। সমুদ্রোপকূলে কয়েকটী কারখানাও খোলা হইয়াছে। আশার কথা, মিঃ পিটের অনুসন্ধানের পরে বাঙালায় লবণ-শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা আছে, ইহা বুঝিয়া শিল্পমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রসন্নদেব রায়কত অতঃপর লবণ-শিল্পে সরকারী আনুকূল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া বাঙালীকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আগামী দশ বৎসরের মধ্যে এই আনুকূল্য সত্ত্বেও, কারখানাগুলি বিদেশের আমদানীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে বলিয়া কোন ক্রমেই আশা করা যায় না। সুতরাং অন্ততঃ এই দশবৎসর কাল সংরক্ষণ-নীতি ভারতে অব্যাহত রাখিতে হইবে এবং এডেন যখন ভারত-সাম্রাজ্যের বহির্ভুক্ত, তখন এডেনকে পূর্ব্বের মত এই রক্ষা-শুল্ক হইতে আর রেহাই দিলে চলিবে না।

বাঙালার লবণ-বাজারে এডেন ছাড়া বোম্বাই, করাচী, টিউটিকরিণের অংশই প্রধান। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের গভর্ণমেণ্টের তথ্যাঙ্কে দেখা যায় যে, কলিকাতা বন্দরে ৪,৭৭,৭১০ টন মোট লবণ আমদানী হয়; তন্মধ্যে এডেন ২১৫,৭৪১ টন, করাচী ৩৭,৬১২ টন, বোম্বাই ১৬,৫৪৭ টন, টিউটিকরিন ১৫,৪০৬ টন, লক্ষ্মী ৮,৭৩৭ টন, মুন ৪ নসের ওয়ানজী ৬,৫৮৪ টন, ওখা ৩৪,৬৭২ টন এবং গ্রাক্স ২১, ৫২০ টন পাঠাইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এডেন সহ বিদেশী লবণের উপর রক্ষা-শুল্ক এডেনের অভাব বাঙালার স্থানীয় শিল্প পূরণ করিতে এখনও বহু-দিন সমর্থ হইবে না। সুতরাং সংরক্ষণনীতি বাঙালার পক্ষ হইতে অতি প্রয়োজনীয় হইলেও, বোম্বাই বা মাদ্রাজের দিক্ হইতেও তাহাতে ক্ষতির কোনই কারণ নাই। জনসাধারণের পক্ষ হইতে, রক্ষা-শুল্কের হার যাহা ইতিপূর্ব্বে মণ প্রতি ।১০ হইতে ৵১০ ছয় আনায় কম করা হইয়াছিল, তাহা পুনরায় পূর্ব্ব হারে বৃদ্ধি করার দাবীই সঙ্গত হইবে।

সাময়িকী

কালীপ্রসন্ন স্মৃতি-বার্ষিকী

সুদীর্ঘ মধ্যযুগের অবসাদের পরে বাঙালীর জীবনে বাদ্য ও সঙ্গীতানুরাগ-জাগরণকল্পে ভারতীর যে সকল কৃতী সন্তান শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও আপ্রাণ সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো-



৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। সঙ্গীতে বিশেষ ন্যাসতরঙ্গ-বাদন-নৈপুণ্যে তিনি শুধু এদেশের নয়, পরন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রশংসার্জ্জন করিয়াছিলেন। ও-দেশের 'King of Violin' অধ্যাপক রামিনি সাহেব তাঁহার ন্যাসতরঙ্গের রাগরাগিণীর আলাপ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য "সঙ্গীতসার" ও "কণ্ঠকৌমুদী" গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকগমনের পর হইতে এতদিন পর্য্যন্ত এই সুরশিল্পীর স্মৃতি-রক্ষার আয়োজন বিশেষ কিছু হয় নাই। আমরা সুখী হইলাম যে, ইদানীং বাঙালীর দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে। বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ এলবার্ট হলে রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে সঙ্গীতাচার্য্য কালীপ্রসন্নের যে স্মৃতি-বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতানুরাগী অনেকেই উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলী দেন। আশা করি, সঙ্গীতাচার্য্যের যোগ্য স্মৃতির স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিতে জাতি উদ্যোগী হইবে।

নৃত্যবিদ্ উদয়শঙ্কর

প্রায় ২ বৎসর পর বঙ্গ-ভারতীর সুসন্তান প্রাচ্য নৃত্যবিদ্ উদয়শঙ্কর গত



উদয়শঙ্কর

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাইয়ে অবতরণ করিয়াছেন। বিগত দুই বৎসর তিনি ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সুদূর প্রতীচ্যে তাঁহার নৃত্যকলাদি প্রদর্শন করিয়া যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেই গৌরবান্বিত। তিনি সম্প্রতি সুদূর বলী ও যবদ্বীপের নৃত্য-পদ্ধতি শিক্ষালাভার্থে তথায় গমন করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি এদেশে একটি নৃত্য-শিক্ষালয় স্থাপন করিবারও মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমৎ স্বামী নির্ম্মলানন্দ মহারাজ

ইনি শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য ও লীলাসহচর এবং কলিকাতা বিবেকানন্দ-মিশন ও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠের সভাপতি ছিলেন বিগত ১৩ই বৈশাখ ৭৫ম বৎসর বয়সে দাক্ষিণাত্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত 'শ্রীনিরঞ্জন আশ্রমে' ইষ্টপাদপদ্মে ইনি লীন হইয়াছেন।



শ্রীমৎ স্বামী নির্ম্মলানন্দজী

তাঁহার সুনির্ম্মল জীবনাদর্শ, ইষ্টনিষ্ঠা, দেশ-বিদেশে বিশেষ তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র দক্ষিণভারতে শ্রীমৎ স্বামী নির্ম্মলানন্দজী চির দিন সম্পূজিত হইবেন।

নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলন

এই সম্মেলনের সাহিত্য সভার সপ্তম বার্ষিক উৎসব বিগত ৩০শে বৈশাখ স্বামী অদ্বৈতানন্দ এম-এ, পিএইচ-ডি মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাহিত্যিক যোগদান করিয়া প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যে "রবীন্দ্র-সাহিত্যে দার্শনিক প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সভাপতি মহাশয় প্রীত হইয়া এই প্রবন্ধটির জন্য একটি পদক দিবার ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা পাঠাইবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। সভাপতি মহাশয় বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া আখ্যাত করেন এবং এই বাংলা সাহিত্যের বিষয় বস্তুর উপর রচনা লিখিয়া তিনি টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন বলিয়াও গৌরব প্রকাশ করেন।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী (প্রবন্ধে), কুমারী শিবানী সরকার (বর্ণনাত্মক কবিতায়) ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য (ছোট গল্পে ও গীতি কবিতায়) সম্মেলনের বিগত বর্ষের প্রতিযোগিতামূলক রৌপ্যপদক লাভ করেন।

সৌহার্দ্দ্য স্থাপন ও সাহিত্য প্রচারের দিক দিয়া মফঃস্বলে নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলনের প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

বঙ্কিম শতবার্ষিকী

আশা ও আনন্দের কথা, জাতীয়তার মন্ত্রগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি জাতির দৃষ্টি সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শত বার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন জোর চলিয়াছে। ফরাসী চন্দন-নগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরেও এই উৎসবআগামী ১—৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হইবে জানিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যত অধিক আলোচনা হয় ততই মঙ্গল।



চুঁচুড়ায় মিত্র সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্র শততম বার্ষিকী স্মৃতি তর্পণ সভা। মধ্যস্থলে [illegible] শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়

আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ লিখিত "Bankim Chandra the Prophet of the Renissance" নামে একখানি পুস্তকও ঐ সময়ে 'দি ইণ্ডিয়ান প্রেস' কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে। বইখানি বিশেষ সময়োপযোগী হইবে এবং ইংরাজীতে লিখিত বলিয়া বঙ্কিম প্রতিভা বিষয়ক এই সমালোচনা পুস্তকখানির মধ্য দিয়া বিদেশীয়গণ বঙ্কিম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিবেন। ইহা জাতির জাগরণেরই লক্ষণ।

বালক সাঁতারু দীলিপকুমার গুহ রায়

শ্রীমান দীলিপের বয়স মাত্র সাড়ে তিন বৎসর। এত অল্প বয়সে তার সন্তরণদক্ষতা সত্যই বিস্ময়কর। সম্প্রতি বিখ্যাত সাঁতারু সন্তোষ দাশগুপ্তের শিক্ষা ও পরিচালনাধীনে শ্রীমান গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে সন্তরণ-নৈপুণ্য দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছে। না থামিয়া ৬ মাইল পর্য্যন্ত সাঁতার কাটিতে সে সমর্থ। সন্তরণ প্রদর্শনের জন্য শীঘ্রই শ্রীমান কলিকাতায় আসিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।



রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক ৫২নং বিডন ষ্ট্রীটে সুখ্যাতিসম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাধনা ঔষধালয়ের নব শাখা কেন্দ্রের উদ্বোধন দৃশ্য। এই উপলক্ষে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ঢাকা সাধনা ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রচারের ব্যাপক প্রচেষ্টা বিষয়ক একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে তাঁহার এই সৎপ্রচেষ্টার জন্য আমরাও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।



সাঁতারু দিলীপকুমার

শ্রীমানের মাতা শ্রীমতী পদ্মাবতী গুহরায়ের উৎসাহই তার এই শৈশবে সন্তরণ সাফল্যের কারণ। শ্রীমতী গুহরায় নিজেও অসি ছোরা প্রভৃতি খেলায় বিশেষ অভিজ্ঞা। এই উৎসাহ ও শিক্ষা বজায় থাকিলে শ্রীমানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

— শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক : [illegible] চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, [illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



উতল শ্রাবণ এলো দু'টি নীল নলিন-নয়নে—
ছোট এই চতুর্দ্দশী কবিতাটি খোলা আছে কোলে,
কাঁপিছে অধর ভীরু, সিন্ধুর সঙ্গীত বুকে দোলে,
বাউল কবিরে এক হয়তো বা পড়িয়াছে মনে।

—'চতুর্দ্দশী' :—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী—শ্রীহাসিরাশি দেবী

প্রবর্তক

২৩শ বর্ষ　১ম খণ্ড　৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৪৫



নব-জন্ম

যে আসক্তি প্রাকৃত ক্ষেত্রে সহজে ছড়াইয়া আছে, তাহাকে গুটাইয়া ভগবানে উৎসর্গ করা—ইহাই তো আত্মসমর্পণ। এই দেওয়ার অমৃতে নিজেকে অভিষিক্ত কর। ইহাই সিদ্ধ পথ—জীবন সার্থক করার পথ।

আত্মসমর্পণের চরম না হইলে, তত্ত্ব মূর্ত্ত হয় না—তত্ত্ববস্তু রূপ লইয়া শ্রবণ-নয়ন তৃপ্ত করে না। মানুষে ইষ্টবুদ্ধি স্থির হইলে, তবেই ভগবানকে ঠিক মত পাওয়া যায়। জ্ঞান যখন ঘন হয়, তখনই স্বরূপ-তত্ত্ব রূপ লয়। নিজ দেহও তখন সিদ্ধ দেহে পরিণত হয়।

এই দীক্ষার মন্ত্র—রূপ থেকে অরূপে যাওয়া নয়, অরূপ থেকেই রূপে আসা। ইহা অব্যক্ত দিয়াই ব্যক্তকে পাওয়া। সৃজনের বীর্য্য লইয়াই আমাদের জন্ম। তাই প্রকাশে অন্যথা হয় না। ভাবঘন চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় রূপ লইয়া ভগবানের আবির্ভাব। চক্ষু কর্ণের দ্বন্দ্ব নাই, মনের সংশয় নাই, বিচারের প্যাঁচ নাই—নিজে সঙ্কীর্ণ হইয়া যাওয়ার আতঙ্ক নাই। অন্তরের সত্যই মূর্ত্ত হয়। যোগসিদ্ধ যে, সে তার স্বরূপকেই রূপে দর্শন করে। সে তার প্রেমের, আরাধনার নিধিকে সকল ইন্দ্রিয় ও মনের সম্মুখে ধরিয়া কৃতার্থ হয়।

আত্মসমর্পণযোগীর জীবন এই রূপের সঙ্কেতেই নিয়ন্ত্রিত। ধাতুকে যেমন ছাঁচে ঢালিয়া রূপ দিতে হয়, তজ্জন্য তাকে তরল দ্রবীভূত হইতে হয়, তেমনি আপনাকে প্রেমের রসায়নে গালিয়াই ইষ্ট-রূপের ছাঁচে পুনর্গঠন করিয়া লইতে হয়। ইহাই আত্মসমর্পণে নব-জন্ম। আত্মার রূপান্তরে, দেহেরও রূপান্তর। তাই সাধকের কণ্ঠে গান—"এই দেহে দেহান্তর হইবে নিশ্চয়।"

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক প্রতিভার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদানের মন্ত্ররচনার উদ্যোক্তৃবর্গের দাবী যখন আমার নিকট পৌঁছিল, আমি উহা মাথা পাতিয়াই লইলাম; কেননা, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের পূজা করিয়াছি তাঁহার ঔপন্যাসিক অথবা সাহিত্যিক স্বরূপ লক্ষ্য রাখিয়া নহে—আমি তাঁহাকে আবাল্য ঋষি বলিয়াই জানিয়াছি। তাঁহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন তত্ত্বদর্শী মনীষী বলিয়াই বুঝিয়াছি। এই জন্য দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করার দাবী আমার নিকট নূতন বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলাম—বিগত ৭৫ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী তাঁহাকে সাহিত্য-সম্রাটের আসনে বসাইয়া পূজা দিয়াছে, দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করে নাই। পরলোকগত বাণীর বরপুত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় প্রায় দশ সহস্র লোকের সম্মুখে বঙ্কিমচন্দ্রকে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পর শ্রীঅরবিন্দ ঋষিত্বের ব্যাখ্যা ও পরিচয় দিয়া তাঁহার সংস্তুতি করেন। আজ দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের পূজা দিতে গিয়া দেখি—বাংলার সুপণ্ডিত দার্শনিক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট আলোচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন। আজ বোধ হয় দার্শনিক বঙ্কিমের পূজার যুগ আসিয়াছে। এই পুণ্য সন্ধিক্ষণে দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিবার সর্ব্ব প্রথম অধিকার পাইয়া নিজেও যেমন কৃতার্থ হইয়াছি, তেমনি এই কৃতার্থতার জন্য বঙ্কিম-শত-বার্ষিকীর উদ্যোক্তৃবর্গকেও আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে কণ্ঠ আমার মুখর হইয়াছে।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে শতবর্ষ পূর্ব্বে এমনই আষাঢ়ের ঘন-ঘটাচ্ছন্ন গগনের কোলে, শ্যাম-তরুলতা-সমাকীর্ণ স্নিগ্ধ এক পল্লীর সুরম্য অট্টালিকায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই যুগ-পরিচয় দিতে হইলে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে সময় ও ক্ষেত্র ইহা নহে। সংক্ষেপে ইহাই বলিব যে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে এক যুগপ্রবর্ত্তকের জন্ম এই হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগরে হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালীর নবজীবনলাভের পথপ্রদর্শক। তাঁহাকে বাংলার জাতীয় জাগরণের আদি ঋষি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। আর এই হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দেরই ফেব্রুয়ারী মাসে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। ইহারই ৫ বৎসর পরে হুগলী নদীর তীরে কাঁটাল-পাড়ায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। উদীয়মান জাতির এক অখণ্ড প্রাণস্রোতঃ এই তিনটী মহাপুরুষের জীবনে নিহিত দেখা যায় বলিয়াই এই ঘটনাগুলি উল্লেখ করিলাম। ভারতের ইতিহাসে নবজন্ম-লাভের যে তিনটী প্রসিদ্ধ পর্য্যায়ের কথা শুনা যায়, তাহা শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনা। বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষাকে ধর্ম্মের অংশ বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "সকল হিন্দুশাস্ত্রেই শিক্ষার প্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে।" এই শিক্ষার আদি-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন। হিন্দুশাস্ত্র যখন অবোধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছিল, রাজা রামমোহন বেদ, উপনিষৎ ও তন্ত্রের প্রচারে বাংলার হিন্দু জাতিকে নবজীবনগঠনের নূতন বিধান দেন। হিন্দুজাতি ধর্ম্মের নব-সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং দক্ষিণেশ্বরে মাতৃসাধন যুগপৎ চলিতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া নব-জাতি-গঠনের অবকাশ এই তিন মহাপুরুষেরই সম্মিলিত দান। নবোত্থিত বাঙ্গালীর জীবনমূলে রাজার শিক্ষা, ঋষি বঙ্কিমের দীক্ষা আর ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনা নিহিত হওয়ায়, বাঙ্গালী আজ যুগযাত্রী। রাষ্ট্রের চেয়ে বাঙ্গালী ধর্ম্মকে বড় করিয়া দেখিয়াছিল। ধর্ম্মজীবনের উপর ভিত্তি করিয়াই বাঙ্গালী চাহিয়াছিল নবজন্ম, নূতন রাষ্ট্র। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিয়াছেন কমলাকান্তে। কমলাকান্ত মাতৃদর্শন করিলেন—"জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীরণ করিতেছে।

চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি। এই মৃন্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী, অনন্ত-রত্নভূষিতা, একণে কালগর্ভে নিহিতা………। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না। আজি দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোতঃ পার না হইলে দেখিব না।" কমলাকান্ত কাল-সাগরগর্ভে ডুব দিয়া এই রত্ন-প্রতিমার উদ্ধারসাধন করিতে ডাকিয়াছেন। এই সুবর্ণময়ী মাতৃমূর্ত্তি আর কেহ নহেন, বঙ্গ-প্রতিমা। তিনি সপ্তকোটী সন্তানকে একত্র করিতে চাহিয়াছেন—সপ্তকোটী কণ্ঠে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিয়াছেন। এ নির্দ্দেশ বাঙ্গালীকেই দেওয়া হইয়াছে।

মাতৃমূর্ত্তির উদ্ধার-সাধনের পথ দিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন "দেশবাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ ৭ শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতির উন্নতির সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে?" উত্তরে বলিয়াছেন "নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারাই হইবে। যাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতি-সাধন, সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম। সুতরাং অনুষ্ঠেয়। অতএব নিষ্কাম হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয়দিগের উন্নতিসাধন করিবে।" জাতি-ধর্ম্ম-সাধনের এই নির্দ্দেশ যুগ-বিশেষের নহে—সর্ব্ব যুগের। ইহা হইতেই বিচক্ষণেরা দার্শনিক বঙ্কিমের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার দার্শনিকতার পরিচয় সুবিশাল। আমি তাঁহার কয়েকটী সঙ্কেত মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। মনে রাখিতে হইবে—বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগের মানুষ, যে যুগের শিক্ষিতেরা শিখিত "In matter is the only promise and potency of life." হাক্সলি, টিণ্ডেলের জড়বাদে দেশ ছাইয়া যাইতেছিল। তিনিও স্বয়ং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সুশিক্ষিত, তবুও তিনি ভারতীয় শিক্ষা-সাধনার প্রভাব অস্বীকার করেন নাই—যাহা কিছু পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ দান, সবই ভারতীয় ভাবধারায় বিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ ও প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে, ধর্ম্মতত্ত্বে, গীতার ব্যাখ্যায়, কৃষ্ণতত্ত্বে ইহার প্রমাণ মিলে। ভারতে দর্শনশাস্ত্র বলিতে আমরা বুঝি বেদার্থ-বিচার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান। কণাদ, গৌতম, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনী ও বেদব্যাস—এই ছয় জনকেই আমরা প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। ইঁহারা যথাক্রমে বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরুষ ও প্রকৃতির জ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য তত্ত্ব-নিরূপণ সাংখ্যের লক্ষ্য। সাংখ্যের তত্ত্ব-নির্ণয়ের উপর পতঞ্জলি ঈশ্বর-প্রমাণ সিদ্ধ করিয়া যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কণাদ পদার্থবিজ্ঞানে নিত্য পরমাণুবাদ প্রবর্ত্তন করিয়া দেহ হইতে আত্মার ভেদ সপ্রমাণ করিয়াছেন। গৌতম তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বুদ্ধিযোগে হেতুবিদ্যা আলোচনা করিতে ন্যায়শাস্ত্র রচনা করেন। জৈমিনীর মীমাংসাশাস্ত্র জ্ঞানের সহিত বেদোক্ত কর্ম্মের সামঞ্জস্য-বাদ। বেদব্যাস মায়াবাদ বিশ্লেষণ করিয়া বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্ম-নিরূপণ করেন। ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল বেদে। ষড়দর্শন বেদের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র অতি তরুণ বয়স হইতে তত্ত্বান্বেষী, একথা তাঁর ধর্ম্মতত্ত্বে নিজেই লিখিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের আলোচনা করিতেও তিনি কসুর করেন নাই। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে সাংখ্য-তত্ত্বের যে আলোচনা, তাহা হীরেন্দ্রবাবুর ভাষায় বলি—আজও জরতী হইয়া যায় নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির প্রথম প্লাবনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েট। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রখর কিরণে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল। ভারতের যাহা শাশ্বত সনাতন, সে বিষয়ে বিস্মৃতি অতি স্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে অভিভূত হন নাই। তিনিও ক্যাণ্ট, স্পেন্সার, ফিক্টে, হিগেল, মিলের দার্শনিক গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলেন; কোম্‌তের প্র্যাগম্যাটিক দর্শনে মানবতার পূজা অবধারণ করিলেন; কিন্তু এই জ্ঞান-প্লাবনে তিনি আত্মবিস্মৃত হইতে পারিলেন না। হিন্দুর সনাতন ভাবধারা পাশ্চাত্যের প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণে শুকাইয়া গেল না; বরং সেই যুগে ভারতীর বীণার ঝঙ্কারে বিপথগামী তরুণদের প্রাণে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার মন্ত্র নূতন ছন্দে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার "সীতারামে" উদয়গিরি ও ললিত-

গিরির মধ্যে বিরূপা নদীর তীরের যে অপূর্ব্ব বর্ণনা পাঠ করি, তাহাতে স্বদেশ-প্রীতির সহিত স্বজাতির কীর্ত্তি ও মহিমা হৃদয়ে অগ্নিশিখা জ্বালে। তিনি পর্ব্বতগাত্রে কারুকার্য্যখচিত হিন্দু-কীর্ত্তি-দর্শনে উদ্বুদ্ধ হইয়া হিন্দুকে যেন নূতন করিয়া দেখিলেন। তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—গীতা, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক। হিন্দুর কীর্ত্তি ও মহিমায় তিনি যেন নবজন্ম লাভ করিয়া বলিলেন—হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক হইয়াছে। বঙ্কিমের প্রতিভা পাশ্চাত্যের দিগ্বিজয়ী প্রতাপের কাছে হীনতায় পরাজয় স্বীকার করিল না। ঋষির কণ্ঠে "অমৃতস্য পুত্রাঃ"র মহাবাণী তাঁহার জীবনে সফল মূর্ত্তি ধারণ করিল।

আমরা জানি—বেদের পর বেদান্ত। কর্ম্মের পর জ্ঞান। শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র ভারতের প্রাণ। কিন্তু ধর্ম্ম ইহাতে বিগ্রহান্বিত হয় নাই। ভারতের ধর্ম্ম পুরাণেই রূপ লইয়াছে। ধর্ম্মের অনন্ত প্রকৃতি, মানবপ্রকৃতি সঙ্কীর্ণ। ঈশ্বরের অনন্ত গুণ, মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলিয়াছেন—"সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়? না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?" পুরাণ ও ধর্ম্মেতিহাসই মানুষকে ধর্ম্মের আদর্শ দিয়াছে। যিশুখৃষ্ট, শাক্যসিংহ, পয়গম্বর—মানব-জাতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন খণ্ড আদর্শ ধর্ম্মের বিগ্রহ পাইয়াই জীবন সার্থক করিয়াছে। ধর্ম্ম থাকিলে, ধর্ম্মের আদর্শ মহামানব থাকা চাই। বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভারত জাতিকে দেখাইয়াছেন—জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি—তদুপরি যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম আর শ্রীরামচন্দ্রের সুমহান্ আদর্শ—সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই পরম মানবতার পূর্ণতম আদর্শ - রূপে তিনি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। আজিও এ জাতি বিদেশীর ভাষা ও ভাবের অনুকরণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই বুদ্ধিবিপর্য্যয়ের যুগে "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম-ব্যক্তাসক্তচেতসাম্" এই মহাবাণী স্মরণ করিয়াই "মানুষীংতনুমাশ্রিতম্" পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শে জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। ম্যাজ্জিনী, গ্যারিবল্ডি, ওয়াশিংটন্ লেনিন, কামাল নহে — লক্ষ্যে রাখিয়া চলিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন — ভারতীয় আদর্শের অভাব আমাদের নাই।

বলিয়াছি, ষড়-দর্শনের উৎপত্তি বেদ-বিচারে। বঙ্কিমচন্দ্র এক নূতন দার্শনিক তত্ত্ব-রচনার প্রয়াস করিয়াছেন ধর্ম্মতত্ত্বে। আগে তত্ত্ব, তারপর আদর্শ। যেমন আগে ভাব, পরে ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্ব-নির্ণয়ের পর গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন, আর কৃষ্ণচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব বেদ-বিচারের উপর তত নহে, যত ষড়-দর্শন ও গীতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুধু এই মাত্র হইলে, তাঁহার তত্ত্ব অমিশ্র ভারতীয় বস্তুই হইত। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে তত্ত্ব-বিচারের উপকরণ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ইউরোপীয় মনীষিদিগের নিকট হইতে। জ্ঞেয় বস্তু ভূত, আমি ও ঈশ্বর। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিবেন জীব, জগৎ, ব্রহ্মতত্ত্ব। অহং-ব্রহ্মকে জানিলে, জগৎ জানা যায়। ক্ষর ও অক্ষর, এই দুইই ব্রহ্মতত্ত্ব। ক্ষরাক্ষর জ্ঞানের উপরই পুরুষোত্তম-বস্তুর অনুভূতি। ইহাই ভারতের পরম সাধ্যবস্তু—অমিশ্র হিন্দু-ধর্ম্মের সনাতন লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র এ পথ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি একস্থানে নিজেই বলিয়াছেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি।" কিন্তু সে বিশ্বাস তিনি ঘোষণা করিতে ভরসা করেন নাই। সে যুগে ইহার সুবিধা ছিল না, অথবা পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত প্রাচ্যের জ্ঞানের বিমিশ্রণে তিনি খেই হারাইয়াছেন—ইহার সিদ্ধান্ত বড় সহজ কথা নহে। তবে তিনি "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিতে গিয়া ভূতকে জানিবার জন্য পাশ্চাত্যের গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব ও রসায়নের আনুকূল্য লইয়াছেন—পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিয়াছেন। আর মানবতত্ত্ব জানিবার জন্য পাশ্চাত্য বায়োলজি, সোশিয়লজির সহিত কোম্‌তের হিতবাদ ঋণ করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরকে জানিতেই তিনি ভারতের উপনিষৎ দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, প্রধানতঃ গীতাকেই সম্বল করিয়াছেন। অতএব তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তার মিশ্রণ-তত্ত্ব—উভয় প্রকার জ্ঞানের সামঞ্জস্যবাদ, ইহা না বলিলেও চলে।

এইবার তাঁহার তত্ত্ববিশ্লেষণের ছন্দঃ আমরা অনুধাবন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মৌলিকতার পরিমাপ করিতে সক্ষম হইব।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন-চেতাঃ পুরুষ ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ডিগ্রী লইতে গিয়া তাঁহাকে যে পাশ্চাত্য-গুরুর শিক্ষা ও সাধনা পরিপাক করিতে হইয়াছিল, তাহার ফলে হিন্দু দর্শনের ভাষ্যরচনায় কতকটা পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব আসিয়া পড়িবে, একথা তিনি অবশ্যই জানিতেন। তাই Facultyকে বৃত্তি এবং সাধনাকে অনুশীলন নামে "ধর্ম্মতত্ত্বে" স্থান দিতে গিয়া তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন "ইহা কি অনুকরণ?" নিজেই উত্তর দিয়াছেন "অনুকরণ নহে। যদি Morals অর্থে নীতি, Science অর্থে বিজ্ঞান শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়, Faculty অর্থে বৃত্তি শব্দ বলিলে দোষের হইবে না।" তিনি নিজেই বলিয়াছেন—বৃত্তি পতঞ্জলি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা তাহা নহে। শরীর, প্রাণ ও বুদ্ধির ব্যাপারসমূহকে তিনি বৃত্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইংরাজী Culture শব্দের অর্থ অভ্যাস বলিলে, তাঁহার পাশ্চাত্যজ্ঞানানুগত লিখনভঙ্গী চলে না; তাই তার নাম দিয়াছেন অনুশীলন। অভ্যাস ও অনুশীলনের পার্থক্য দেখাইয়া, তিনি বলিতেছেন: "প্রত্যহ কুইনাইন খাওয়ার অভ্যাস করিলে উহা সুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ্য হইয়া যায়; ইহা অভ্যাসের ফল। অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা। অনুশীলনের ফল সুখ।" ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য এইখানে স্থির রাখা হইল—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অথবা "শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ"। ইহাই হিন্দু তত্ত্বসাধনার অমোঘ লক্ষ্য। এইবার বঙ্কিম-চন্দ্রের তত্ত্বব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে শেষ করিব। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইতেছে। বঙ্কিমের বৃত্তি-বিভাগ পাতঞ্জলদর্শনসম্মত নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বোক্ত 'thinking, feeling and willing'—এই তিনটী বৃত্তিকে তিনি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্যের বোধসৌকর্য্যার্থে জ্ঞানার্জ্জনী, চিত্তরঞ্জিনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি নাম দিয়াছেন। হিন্দু সংস্কৃতির মূলতত্ত্ব সৎ, চিৎ, আনন্দ—যাহার প্রকাশ সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী রূপে বৈষ্ণব দর্শনে বিশ্লেষিত, তাহাই এই ত্রিবৃত্তির সাধ্য বা প্রাপ্যরূপে স্থাপন করায়, ইহাতে তাঁহার পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীকে নিজস্ব করিয়া লওয়ার সাবলীল প্রয়াসই লক্ষ্যে পড়ে। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—ইহা আর্য্য ঋষিগণেরই আবিষ্কৃত সত্য, আজীবন চেষ্টায় যাহার মর্ম্ম-গ্রহণ তিনি করিয়াছেন, "তবে তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক, তাই উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়।" তাঁর এই কথার মধ্যে তাঁর ভাব-ভাষার সামঞ্জস্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন—

"পাশ্চাত্য 'prayer' করে বলিয়া, আমরা কি উপাসনা পরিত্যাগ করিব? এই সব বিলাতী নহে, হিন্দুধর্ম্মের সার অংশ।" রাজা রামমোহনের ন্যায়ই বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের জ্ঞান-প্রবাহকে এইরূপে নিজের কোটায় ফিরাইতে চাহিয়াছেন; ইহা অল্প প্রতিভার পরিচয় নহে। ধর্ম্ম উন্নতির মূল। শক্তির অর্থাৎ বৃত্তি-নিচয়ের তদনুকুল অনুশীলনই সাধ্য। বৃত্তির উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বলিয়া ভেদ কিছু নাই। যে বৃত্তির অনুশীলন ধর্ম্মানুকূল, তাহাই শ্রেয়ঃ। কোন এক বৃত্তির অধিক অনুশীলনে অপর এক বৃত্তি যদি ম্রিয়মাণ হয়, সেইখানে তিনি সাবধান হইতে বলিয়াছেন। তিনি বৃত্তি-সামঞ্জস্যের হিসাব কষিয়াছেন, বিধান দিয়াছেন।

তাঁহার মতে, বৃত্তিনিচয়ের তিনটী ভঙ্গী আছে। সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অনুশীলন-সাপেক্ষ। সহজ বৃত্তি আহার, নিদ্রাদি সহজাত শক্তি। এইগুলির অনুশীলনে সহজ বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়। কিন্তু এরূপ অনুশীলন অনুচিত। যে বৃত্তিগুলি সহজাত, অনুশীলন-ফলে তাহারা পুষ্ট হইলে অনুশীলন-সাপেক্ষ লোকাতীত বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হয় না। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এই অলৌকিক বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণে অন্যান্য সহজাত বৃত্তিগুলিও সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হয়। সহজ বৃত্তির উচ্ছেদ পাপ বলিয়া তিনি ঘৃণা করিয়াছেন। তিনি লম্পট ও পেটুককে নিকৃষ্ট অধার্ম্মিক বলিয়াছেন, আবার যে সকল যোগী সহজবৃত্তিরক্ষায় উদাসীন, তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট অধার্ম্মিক বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিবৃত্তিমার্গ চাহেন নাই—লোকাতীত বৃত্তির পরিস্ফুরণ ও সহজাত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যে প্রবৃত্তিমার্গই মনুষ্যত্বলাভের উপায়

বলিয়াছেন। সন্ন্যাসকে তিনি ধর্ম্ম বলিতে চাহেন নাই, অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অনুশীলন প্রবৃত্তি-মার্গ, সন্ন্যাস নিবৃত্তি-মার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম, এ কথা তাঁহার নিজের।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও আনন্দবৃত্তির অনুশীলন—সহজ বৃত্তির প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার এই মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম। মানবাদর্শ লক্ষ্যে রাখিয়া ইহা সিদ্ধ হইতে পারে, তাই গীতাকারকে নরোত্তমরূপে তিনি প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্রে"র আলোচনাও এইরূপ যুক্তিপূর্ণ। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্যের উজ্জ্বল কিরণমুগ্ধ নব্য বাঙ্গালীর সম্মুখে ধর্ম্মতত্ত্বের এইরূপ অনুশীলনমূলক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্বভাব ও স্বধর্ম্মে রুচি রক্ষা হইয়াছিল—এই জন্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে যুগগুরু বলিতে কুণ্ঠা করি না।

"বিবিধ প্রসঙ্গ", "ধর্ম্মতত্ত্ব", "গীতার ভাষ্য", "কৃষ্ণ-চরিত্র" এই সকল ব্যতীত তাঁহার অনুশীলনতত্ত্বের দৃষ্টান্ত "সীতারাম", "দেবী চৌধুরাণী" ও "আনন্দমঠ" এই উপন্যাসত্রয় যেন গল্পে পুরাণের ন্যায়ই রচিত হইয়াছে। ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির পরিচয়। প্রফুল্লের পতিভক্তি, দিবা ও নিশার কৃষ্ণপ্রীতি, ভবানী পাঠকের নিষ্কাম কর্ম্মযোগ—ঋষি বঙ্কিমের তত্ত্বপ্রকাশের সুরঞ্জিত আলেখ্য। তাঁর নারীচরিত্রে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরই তুলি চলিয়াছে—"সীতারামে" রমা, নন্দা ও শ্রীকে তিনি গুণত্রয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেন আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "দেবীচৌধুরাণীতে" প্রফুল্লকে পতিসেবায় পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া তিনি পতি-নিষ্ঠার সাফল্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার শ্রীকে ধর্ম্মনিষ্ঠায় অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—স্বামী শুনিতেছে, স্ত্রী বলিতেছে—"আমি আপনার সহধর্ম্মিণী, আমার সহিত ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিও না। ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি, তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয় পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই, কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখনই বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া সহধর্ম্মিণী সহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রেই পাপ। আপনি যখন নিষ্পাপ হইবেন, শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন—তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়িব।"

দাম্পত্য-জীবনের এই সর্ব্বোচ্চ সনাতন আদর্শ সীতারাম পালন করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই উচ্চ আদর্শের পরিপূর্ণ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলায় সাধন চলিয়াছে—চক্ষু থাকিলে, বঙ্কিমের স্বপ্ন ভিত্তিহীন মনে হইবে না। "আনন্দমঠে" জীবানন্দ ও শান্তির চরিত্রে তিনি এই লোকাতীত আদর্শেরই অনুলেপন করিয়াছেন। শান্তিও বলিয়াছে—"সতীর পতি বড়, তার চেয়ে পতির ধর্ম্ম বড়"; শান্তি পতির ধর্ম্মরক্ষায় সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন। ঋষির কণ্ঠে নবযুগের শেষ আহ্বান—"হায়, আবার আসিবে কি মা? জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি মা?"

বঙ্কিমের কবি-প্রতিভা অধ্যাত্মরহস্যপূর্ণ হইয়া বাংলায় নবযুগপ্রবর্ত্তনের সিদ্ধমন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। যে জন্য "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়"—মন্ত্রে সিদ্ধ করিতে হয়, সেই মনোবুদ্ধির জাগরণ-কল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের সাধুপ্রয়াস দেশকে ধন্য করিয়াছে, জাতিকে ধন্য করিয়াছে। তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব যুগপ্রভাবে যতই বিমিশ্র হউক, উহার পশ্চাতে যে ভারতীয় প্রাণশক্তি প্রবুদ্ধ ছিল, তাহা ভাব-ভাষায় মিশ্রণ বিদীর্ণ করিয়া জাতিকে পরম বস্তুই পরিবেশন করিয়াছে। সে অমৃত সেবন করিয়া আমরা নির্ভয়েই আজ বলিতে পারি—এ জাতির ধর্ম্মদীক্ষা ব্যর্থ হইবে না। বাংলার মন্দিরে মন্দিরে জীবন্ত সাধনপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইবে। সমাজে জীবানন্দ ও শান্তি জন্মগ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মজীবনের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া জয়-কণ্ঠে বলিবে "বন্দেমাতরম্"।*

[* চন্দননগর বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসবে তৃতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীমতিলাল রায়ের বক্তৃতার সার-মর্ম্ম।]

— চিন্তা-বীথি

বঙ্কিম শতবার্ষিকী স্মৃতি-পূজার পর বাঙালী কি ভাবিবে? কি করিবে? ভাবের উচ্ছ্বাস কি কথার নায়েগ্রা-তরঙ্গ তুলিয়াই নিঃশেষিত হইবে? বঙ্কিমচন্দ্রের মহাভাব কি তাঁহার প্রতিভার বাঙ্ময়ী পূজায় হাওয়ায় মিলাইবে? ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মহাপ্রয়াণ। এই ৫৬ বৎসরের নাতিদীর্ঘ জীবন যে অলৌকিক প্রতিভার অধিষ্ঠানরূপে বাঙালীর মনে নব ভাব, নব শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছে, বাঙালী প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই তাহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে—এইরূপ ধারণা দেখা গেল সম্পূর্ণ সত্য নহে। বাঙালার এক শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল পণ্ডিতের বিশ্বাস—বাঙালায় বঙ্কিমের যুগ তো অতীত হয়ই নাই—উহা এখনও অনাগত। বঙ্কিম-যুগ বলিতে যদি ইহাই বুঝায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি যাহা আদর্শ ও কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বস্তুতন্ত্র পরিণতি ও সাফল্য, তবে আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি—সে যুগ এখনও আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে পারি নাই—সে যুগ এখনও আমাদের সম্মুখেই। শুধু ভাব-সাধনার দিক্ দিয়াও দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থ—প্রবন্ধ ও উপন্যাস-গুলির মধ্যে যে অসীম ভাব-রাশি ঢালিয়া গিয়াছেন, বাঙালী মাঝ পথে নানা দুর্য্যোগে, জটিলতায় বিস্মৃতপ্রায় হইলেও, দুর্দ্দিনেরই তিক্ততম কষাঘাতে আজ পুনঃ সজাগ ও সচেতন হইয়া দেখিতেছে—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবদর্শন ও কল্প-সৃষ্টি উভয়ই আজ অফুরন্ত রস ও শক্তির উৎস হইয়া আমাদের নিরাশ, শুষ্ক প্রাণকে নব-সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। বঙ্কিমের মন্ত্রদীক্ষা রূপ হইতে স্বরূপে আমাদিগকে পৌছাইয়া দিলেও, এখনও তাঁহার অমর গুরুশক্তি আমাদের অন্তরে অন্তরে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। বাঙালীর মহাগুরু বাঙালীকে এখনও ঊর্দ্ধলোক হইতে আকর্ষণ করিতেছেন—যত দিন যাইতেছে, ততই এ আকর্ষণ লঘু না হইয়া, গুরু হইতে গুরুতর হইতেছে। বঙ্গব্যাপী শতবার্ষিকী পূজায় এই অমর, অনাহত, শাশ্বত সম্বন্ধের এই দুর্নিবার আকর্ষণেরই কি গুরু-গৌরব আমরা উপলব্ধি করি নাই?

* * * *

কিন্তু শতবার্ষিকী পূজার অর্ঘ্য দেওয়া শেষ হইল। এইবার আমরা কি করিব? আবার কি বিস্মৃতির ঘুম-ঘোরে আমরা এলাইয়া পড়িব? দৈনন্দিন কর্ম্মবিপাকে, সংসার-চক্র ঠেলিতে ঠেলিতে গতানুগতিকতায় বিমূঢ় হইয়া যেমন চলিতেছিলাম, তেমনই চলিব? মাঝে মাঝে শুধু হুজুগে মাতিয়া উঠিব ও ঘটনার আঘাতে জাগিয়া, সভায় বক্তৃতামঞ্চে হুঙ্কার তুলিব? বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা, যুক্তি, তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি কি গভীরভাবে মর্ম্ম দিয়া আমরা প্রণিধান করিব না? তাঁহার জাতি-গঠনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা হইতে দীপ জ্বালার ন্যায় আমাদের অন্তরে জাতি-গঠনেরই অগ্নি-আকাঙ্ক্ষা জ্বালাইয়া তরুণ জাতিকে সেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিব না? তাঁহার মানবতার স্বপ্নকে সফল করিতে সুশৃঙ্খল, ঘনসন্নিবদ্ধ, সম্মিলিত যত্ন ও প্রয়াস করিব না? জাতির অন্তরে স্বতঃই এই গঠনকরী অনুপ্রেরণা ফুটিয়া উঠিতেছে—এই জন্য আমরা নিরাশ নহি।

বঙ্কিমচন্দ্র শতদিকে শত চিন্তা সুরু করিয়াছিলেন—সেই সকল চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইতে আমরা দিব না। চিন্তা-গুলিকে যুক্তি ও অনুভূতির সাহায্যে যাচাই করিয়া, অন্তর পরিপুষ্ট করিব—নবীন জাতির মেধা গড়িয়া তুলিব। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ এই দিকে প্রথম কার্য্যকর প্রস্তাব তুলিয়াছেন, এই জন্য আমরা তাঁহার জয় কামনা করিতেছি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে ছাত্রদিগের মধ্যে বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার যাহাতে অনুশীলন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সূচনা করিতে বলিয়াছেন। তিনি বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর একটী বিশেষ পরীক্ষারও সুব্যবস্থা করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সময়োপযোগী উভয় প্রস্তাব হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়া ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদিকে আনন্দিত করিয়াছেন—আমরা তাঁহাকেও এই জন্য বাঙালীজাতির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, বাঙালার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই কার্য্যকরী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়া সারা বাঙালার তরুণমণ্ডলে নব প্রেরণা সঞ্চার করিবে—তাহাদের নবীন ও বিশুদ্ধ চিন্তা-জীবন গড়িতে সাহায্য করিবে। বাঙালার ভবিষ্যৎ সরল ও সুস্থ মস্তিষ্ক লইয়া জাগিয়া উঠিলেই তাহারাই বাঙালার জাতীয়তা সর্ব্ব আপদ্ ও আততায়িতা হইতে সুরক্ষিত করিবে। বাঙালীকে কোনও বিঘ্নরাজই আর আঘাতে বিষণ্ণ, বিপন্ন, মর্ম্মাহত করিতে সাহস

করিবে না। বঙ্কিমের অমোঘ চিন্তা ও স্বপ্নের মহাবীর্য্যে অন্তর ভরিয়া, উদীয়মান জাতি অভীঃ ও অখণ্ড হৃদয়ে উচ্চারণ করিবে — "বন্দেমাতরম্।" বাঙালার মেধা জগজ্জয়ী হইবে।

শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন—"অল্প কয়েকদিনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা করিয়া যেন বাঙালী তাহার কর্ত্তব্য সমাপন হইল, এই বোধ না করে। উৎসবাদি স্মৃতি-পূজার অঙ্গ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পূজা তখনই হইবে, যখন তাঁহার বাণী ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে, বাঙালী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিবে, তাঁহার অমোঘ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নির্ভীকভাবে আপন জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইবে। সকল দলাদলি ভুলিয়া বাঙালীর জীবন কর্ম্মময় হউক, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া বাঙালী আত্মনির্ভরশীল হউক। কাপুরুষ বাঙালীকে বঙ্কিমচন্দ্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সকল বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া যদি বাঙালী আজ মানুষের মত দাঁড়াইতে পারে এবং স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তবেই বঙ্কিমের আশীর্ব্বাণী বাঙালার উপর বর্ষিত হইবে; বাঙালা মেঘমুক্ত হইবে এবং জয়যাত্রা ঘোষণা করিয়া বাঙালী তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরধিকার করিবে।"

শুধু বঙ্কিম-সাহিত্য ঘরে ঘরে পরিবেশন করিলেই বঙ্কিমের বাণী প্রচারিত হইবে না—বাঙালী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থাবলম্বনে, অব্যর্থ দীক্ষাশক্তিলাভে জাতি-গঠনে সক্ষম হইবে না। বঙ্কিম-সাহিত্য তাঁহার ভাবের প্রতিমূর্ত্তি—এই ভাবের অনুশীলন ও সাধনার কথাই বাঙালীকে আজ ভাবিতে হইবে। তাহার জন্য স্থানে স্থানে কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারা বাঙালী জাতির সনাতন বীজ-সত্যেরই মৌলিক ও অসাধারণ অভিব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঠিকভাবে বুঝিতে হইলে, তাঁহার পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী এই অখণ্ড জাতীয়াত্মারও যত প্রকারে সম্ভব পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে—পুরাতন ও নূতন তাঁহার মধ্যে যে গঙ্গা-যমুনার পবিত্র সঙ্গম-তীর্থ রচনা করিয়াছিল, তাহার সমগ্র মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। এই জাতীয় কৃষ্টির স্পষ্টতর মর্ম্মপরিচয় না হইলে, আমাদের বঙ্কিম-ভক্তি, বঙ্কিম-পূজা বৃথা, আমাদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান শুধু বাগাড়ম্বর ও নিরর্থকতায় পর্য্যবসিত হইবে। সময় আসিয়াছে, যখন ভক্তিকে কর্ম্মে, ভাবকে জীবনে সাধ্যরূপে স্থাপন করিয়া বঙ্কিম বিদ্যাসাগর, রামমোহন রামকৃষ্ণ, কেশব দেবেন্দ্রনাথ, বিজয় - বিবেকানন্দ, উপাধ্যায় বিপিনচন্দ্র, দেশবন্ধু অরবিন্দের ভাব-সম্পদগুলি তাঁহাদের উত্তরাধিকারী জাতিকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভাবনায়, বিচারে, অনুসরণে ফলপ্রদ করিয়া তুলিতে হইবে। জাতীয় কৃষ্টি ও সাধনার এই সকল অনুশীলন ও সাধন-কেন্দ্রই আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান বলিয়া আমরা মনে করি। এই সকল কেন্দ্রে শুধু উক্ত জাতীয় মহাপুরুষগণের গ্রন্থ ও জীবনী পাঠ ও আলোচনা নহে, তরুণ জাতির মেধা ও মস্তিষ্কের, হৃদয় ও চরিত্রের পুনর্গঠনই মূল লক্ষ্য হইবে। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে চাই সারস্বত-কুঞ্জ, ভারতীর পূজাগৃহ — যেখানে যোগ্য আচার্য্যগণের তত্ত্বাবধানে বাঙালার উদীয়মান ছাত্রসম্প্রদায় ভাব-সাধনার অমর দীক্ষা লাভ করিবে। ভাব—সাধ্য। কিন্তু জীবনের উৎসর্গই তাহার পরিপূর্ণ সাধন-নীতি। বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিপূর্ণ অনুশীলন - ধর্ম্মের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ণাঙ্গ জীবন-সাধনারই জ্বলন্ত নির্দ্দেশ—এই নির্দ্দেশ জাতিকে পালন করিতে হইবে। শুধু মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়, প্রাণ, দেহ— সর্ব্বাঙ্গীন জীবন সাধনা ও জাতি-সাধনাই বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্য-সাধনের নানা তত্ত্ব ও দৃষ্টান্ত তিনি তাঁহার নানা গ্রন্থে অমর অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারও কালে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, পরবর্ত্তী যুগসাধনায় তাহা আরও বিকশিত ও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্ম্মকেই — সেই অনুশীলন-ধর্ম্মের কেন্দ্র-নীতি কৃষ্ণাদর্শ, কৃষ্ণভক্তিকে ইষ্ট - বিগ্রহে আত্মসমর্পণনীতির মধ্য দিয়া পূর্ণতর ও সিদ্ধযোগরূপে প্রাপ্ত হইয়া, বাঙালী আজ যুগোচিত সর্ব্বার্থসিদ্ধির অধিকারী হইয়া উঠুক—ইহারই জন্য আমরা আজ সারা বাঙালীর নেতৃবৃন্দকে সম্মিলিত হইয়া বস্তুতন্ত্র পরিকল্পনা অবধারণ করিতে আহ্বান করিতেছি। নেতৃবৃন্দ যদি এই দিকে দৃষ্টি না দেন, তরুণ সম্প্রদায় নিজেরাই যুগপৎ স্বাধ্যায় ও আচার-মূলক সাধনকেন্দ্র সৃষ্টি করিয়া দেশমাতৃকার নূতন বোধন বসাইতে পারেন। ঋষি বঙ্কিমের স্বপ্ন—

"তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতীর্থেই উৎসর্গশীল তরুণের জীবনের অবদানে এই ভাব-সাধনায় সাধন-মন্দির গড়িয়া উঠা অসম্ভব নহে। জাতীয় মস্তিষ্ক ও চরিত্রের আমূল বিপ্লব ও রূপান্তরেই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্প-স্বপ্ন সফল হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-ধর্ম্ম

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা, চিন্তা, ভাষা, সৃষ্ট চরিত্র, যুক্তি, তর্ক, প্রভাব, বেদনা-বোধ, সত্যানুভূতি, সমস্তই খাঁটি ভারতবাসী বাঙ্গালীর বলিয়াই আজ তাঁহাকে স্মরণ করি, বন্দনা করি, তাঁহার পুণ্য কাহিনী বলিতে অবসর পাইতেছি বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি। তিনি সারা জীবন বাঙ্গালীর জন্য কত কি ভাবনা ভাবিয়াছেন, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার লেখা বার বার পড়িতে হয়। তাঁহার লেখা যখনই পড়ি, তখনই নূতন বলিয়া মনে হয়। এই ধরুন "বাঙ্গালীর বাহুবল" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহার :—

"উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল।" এই সূত্র ধরিয়া বলিলেন "বেগবৎ অভিলাষ চাই ও তৎপ্রাপ্তির জন্য উদ্যম চাই। যখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালীই তজ্জন্য আলস্য, সুখবোধ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।"

"সাহসের জন্য চাই—সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জনও শ্রেয়োবোধ হইবে। তখন সাহস হইবে। যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।" "বাঙ্গালীর এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোনও সময়ে ঘটিতে পারে।"

তিনি একদিকে এই ভরসা করিয়াছিলেন, অপরদিকে একটী প্রকাণ্ড দুর্নামের অপনোদন করিয়াছিলেন।

"যে বলে বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক। তাহার কথা মিথ্যা।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্ত আনুসঙ্গিক আলোচনা ছাড়া "ধর্ম্মতত্ত্বে"র চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে "স্বদেশপ্রীতি" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই অদ্যকার বিষয়-বস্তু।

"দম্পতি-প্রীতি-তত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজ-ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্মধ্বংস ও সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গল-ধ্বংস।"

"যদি তাহাই হইল, যদি সমাজ-ধ্বংসে ধর্ম্মধ্বংস ও মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই কারণেই স্বজন-রক্ষা অপেক্ষাও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম।"

"বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বা স্বজন-প্রীতির বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। * * * পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্ট-সাধন করিব না এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহাকেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য। * * * আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় patriotism নহে। ইউরোপীয় patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত patriotism-প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত

হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন।"

সংক্ষেপতঃ—"আত্মরক্ষা হইতে স্বজন রক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। * * * ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।"

ধর্ম্মতত্ত্বের উপসংহারে—আবার পুনরুক্তি আছে।

"সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।"

"আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।"

"সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইওনা।"

আমার বয়োধর্ম্মে বড় বেশী ধর্ম্মের কাহিনী কহিলাম। যদি কাহারও শুনিবার আপত্তি থাকে, তবে আমি নাচার, কেন না আমার বিষয়-বস্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দেশধর্ম্ম। বঙ্কিমবাবু দেশ-প্রীতিকেই দেশধর্ম্ম বলিয়াছেন বলিয়া, তিনি ধর্ম্মবস্তুকে বুঝাইতে বা বাঙ্গালীকে ধরাইয়া দিতে ছাড়েন নাই। "ধর্ম্মতত্ত্ব" (খ) ক্রোড়পত্রে ইহার একটী অতি মনোরম ব্যাখ্যা আছে। তাঁহার শেষ কথাটী স্মরণীয়।

"যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচলিত করিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।"

ধর্ম্মের এই সংজ্ঞা দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় দেশধর্ম্ম হইতে আমাদের দূরে থাকিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা না বলিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

তাই তিনি বলিয়াছেন :—

"মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্ম্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। * অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। আজ ফ্রান্স জার্ম্মাণীর কাড়িয়া খাইতেছে, কাল জার্ম্মাণী ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে। দুর্ব্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশ-রক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম্ম ; কেন না, এ স্থলে আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা ও ধর্ম্মোন্নতির পথ মুক্ত রাখিবারও কথা।"

সুতরাং "সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানী। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ।"

এই লিবার্টির ব্যাখ্যা "হনুমদ্‌-বাবু" সংবাদে আরও বিশেষ করিয়া দেওয়া আছে।

বাবু হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"Freedom, liberty কাহাকে বলে, জানেন ?"

হনু। কিষ্কিন্ধ্যার কলেজ ও-সব শিখায় না।

বা। Freedom বলে স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানেন ত ?

হনু। আমি বনের পশু, স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি জান ?

বা। ভাল। তা যে পরিমাণে মনুষ্য স্বাধীন হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

হনু। অর্থাৎ যে পরিমাণে মনুষ্য পশুভাব প্রাপ্ত হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী !!"

এই অদ্বিতীয় সাহিত্যশিল্পী এই সকল গভীর তত্ত্বের সকল মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন বলিয়াই মৌলিক তথ্য ধরিয়াছেন—

"ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।"

গঙ্গার এক কূল হইতে এই আশার বাণী, এই ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, এই পথ-নির্দ্দেশ, এই যুগধর্ম্ম যেমন ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার অপর কূল হইতেও আর এক জন মনীষী বঙ্গ-সন্তানও তাহাই ধ্বনিত করিয়াছেন।

"ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না। পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতিপীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকট জ্ঞান ও প্রীতির মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটী মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এইখানে আমার প্রশ্নোত্তর লেখা শেষ হইল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু কেবল পরীক্ষা দিতে ত আসি নাই।

এই তত্ত্বালোচনার আর একটী দিক্ এইবার দেখিবার চেষ্টা করিব। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"জাতীয় ধর্ম্মে জাতীয় চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় ধর্ম্ম বুঝে না, সেও জাতীয় ধর্ম্মের অধীন হয়, জাতীয় ধর্ম্মে তাহার চরিত্র শাসিত হয়।"

দার্শনিক পণ্ডিত এমার্সন এই কথাটা আরও সুষ্ঠুরূপে বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"As far as the spiritual character of the period overpowers the artist and finds expression in his work, so far it will retain a certain grandeur, and will represent to future beholders the Unknown, the Inevitable, the Divine. No man can quite exclude this element of Necessity from his labour. No man can quite emancipate himself from his age and country, or produce a model in which the education, the religion, the politics, usages and arts of his times shall have no share."

অর্থাৎ যুগের আধ্যাত্মিক রূপ প্রত্যেক শিল্পীকে যতটা অভিভূত করে ও যতটা তাঁহার সৃষ্ট কার্য্যে প্রকাশ পায়, ততটাই সেই কার্য্যের উদার মহত্ত্ব সূচিত হয় এবং ভাবী বংশের জন্য অজ্ঞেয়, নিয়তি ও দৈবী সম্পদের পরিচয় প্রদান করে। কোনও মনুষ্যই তাঁহার চেষ্টা হইতে এই অবশ্যম্ভাবিত্বকে পরিহার করিতে পারেন না। কোন মনুষ্যই এমনভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত করিতে পারেন না যে, তাঁহার কাল ও দেশ প্রভাবিত করিবে না, বা এমন কোনও রূপ সৃষ্টি করিতে পারেন না, যাহাতে তাঁহার শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রশক্তি, আচারব্যবহার ও তাৎকালীন শিল্পকলার দান থাকিবে না।

এখন এই প্রতিবেশ-প্রভাবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ইং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। কপালকুণ্ডলা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। মৃণালিনী ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিষবৃক্ষকে কোলে করিয়া বাহির হয়। তদবধি ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি ভাষাজননীর সেবা করিয়া যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা নাই। মনে হয়, অনেক বৎসর ধরিয়া হইবে না। সাহিত্য-সম্রাট্ ভাবের রাজা হইয়া এখনও বসিয়া আছেন। আমরা মস্তক অবনত করিয়াই আছি ও থাকিব।

"বঙ্গদর্শনে"র পত্রসূচনাটী আমি সকলকে পুনর্ব্বার পড়িতে অনুরোধ করি। ১৩০৫ সালের "প্রদীপ" পত্রে ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন :—

"বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম, ভাষার বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ, মানুষের অভাব। বঙ্গদর্শন বলিয়া গিয়াছিল—বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে, বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।"

ঠিক সেই সময়ে আমাদের সমাজ, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার লইয়া যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহারও উল্লেখ প্রয়োজন। ইং ১৮৬৫ সালে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্ কার তাঁহার দীর্ঘ ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া ভারতবাসীর গার্হস্থ্যজীবন, চরিত্র ও আচারব্যবহার লইয়া একখানি পুস্তক বাহির করেন। তিনি ইংরাজ সরকারের ধর্ম্মনিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতির বহুমূল্যতার বিষয় স্বীকার করিয়া, জাতিভেদ বীজস্বরূপে সকল মানবজাতির ভিতর বর্ত্তমান বলেন, ভারতবাসীরা গৃহনারীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করে তাহা স্বীকার করেন, পরে শেষ কথা বলেন 'Hindus secure for themselves liberty of action within an inner sphere, and while politically in subjection, preserve a kind of social independence.'

"হিন্দুরা নিজের অন্তরঙ্গ গণ্ডীর ভিতর একপ্রকার ধর্ম্ম-স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে; রাজনৈতিক পরাধীনতা হইলেও, সামাজিক স্বাধীনতা তাহাদের আছে।"

মনে রাখিতে বলি, তখন কেবল যে মহারাণীর ঘোষণা-পত্র ছিল, তাহা নহে। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা ওয়ারেণ হেষ্টিংএর আমল হইতে নীতি ছিল। ইং ১৮৩৩ সালের সনন্দে, ভারতবাসীর ধর্ম্ম, দেহ ও মতামত সুরক্ষিত করিবার কর্ত্তব্য তখনও রাজপুরুষগণ মানিতেন, কেন না ঐ সনন্দের ঐ ধারা ইংরাজী ১৮৯০ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল।

তখনকার দিনে এই মতামতের স্বাধীনতা আইন দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই আমার অনুমান হয়, আইন-সভাকে নূতন আইন করিতে বারম্বার বিবেকের দোহাই পাড়িতে হইয়াছিল।

ইংরাজি ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহের আইন পাসের সময়ে আইনসচিব পীকক সাহেব বলেন :—

"A man's conscience was beyond the powers of law, and it has been truly said that conscience was God's province."

"মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আইনের ক্ষমতার উপরে আসীন। প্রকৃত সত্যই এই যে, বিবেকবুদ্ধি ভগবানের খাসমহল।"

১৮৬৬ অব্দে দেশীয় খ্রীষ্টানদের বিবাহ আইন পাস হয়। আইনসচিব স্বনামধন্য সাম্নার মেন বিবেকের দোহাই দেন। তিনি দম্ভভরে বলেন—"বিবেকের দাবী আমরাই প্রথম ভারতে স্বীকার করিয়াছি। আমরাই তাহা গচ্ছিত সম্পত্তির মত সুরক্ষিত করিতে পারি।"

১৮৬৮ অব্দে ঐ মেন সাহেব ভারতবাসীর বিবাহ আইন প্রথম আনয়ন করেন। ঐ আইন লইয়া হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন হয়। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার নীতির দোহাই দিয়া ঐ প্রতিবাদ চলে। মেন সাহেব বলেন—

"ব্রাহ্মরা যে বিবেকের বশে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়াছে, আইন কি তাহাদের দেখিবে না? আমরা যে দেশের ধর্ম্মে হাত দিতে চাই না—তাহা বিবেকের দাবী মানি বলিয়া। যদি একবার বিবেকের উপর পদাঘাত চলে, তবে দেশের ধর্ম্ম-বিশ্বাসীদের অবস্থা কি হইবে তাহা ভাবিতে বলি।"

চারি বৎসর পরে যিনি আইনসচিব, তিনি বিখ্যাত আইনতাত্ত্বিক ফিজ্‌জেম্‌স্ ষ্টিফেন। তিনি স্বীকার করিলেন—"হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু আইন অঙ্গাঙ্গীভাবে একই বস্তু। হয় হিন্দু ধর্ম্মকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, নয় সমগ্রভাবে ত্যাগ করিতে হইবে।"

"Brahmoism is at once the most European of native religions and the most living of all native versions of European religion."

"ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ভারতের ধর্ম্মমত সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ইউরোপীয়, আর ইউরোপের যে সকল ধর্ম্মমত ভারতে চলে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণবস্তু।"

এই কথা স্বীকার করিয়া তিনি বলেন—"আমাদের শিক্ষা সংসর্গগুণে এই মতের উদ্ভব। ইহাদের জন্য পৃথক্ আইন না করিব কেন?

ধর্ম্ম-সংঘর্ষের ও মতামত-সংঘর্ষের যে ভাবদ্বন্দ্ব তখন চলিতেছিল, তাহার প্রতিধ্বনি প্রিভি কৌন্সিলেও উঠিয়াছিল।

১৮৭১ অব্দে বিচারপতি লর্ড জেম্‌স এক প্রসিদ্ধ রায়ে বলেন :—

"ভারতে পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্ম্মমত পাশাপাশি বাস করিতেছে। তাহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার অধিকারী। স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে।"

এই একবার মাত্র ইংরাজের বিচারালয়ে ভারতের চিরাচরিত এক নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। সবটাই সুষ্ঠুভাবে স্বীকৃত হয় নাই—যেন গত্যন্তর নাই বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর যুগেই এই স্বীকৃতি। গীতার ঐ মহতী নীতি লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

শ্লোকের ব্যাখ্যার উপসংহারে বলিয়াছেন :—

"এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম—একমাত্র সর্ব্বজনাবলম্বনীয় ধর্ম্ম। ইহাই 'প্রকৃত

হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই।"

তখনকার দিনে দুইটী সাধারণ সভায় এই সকল সমস্যার আলোচনা হইত। Bethune Society বীথ্‌ন্‌ সোসাইটী ও বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন। উভয় ক্ষেত্রেই ইংরাজী-শিক্ষিত ইংরাজী ভাষাতেই এই আলোচনা চালাইতেন।

১৮৬৮ সালে উক্ত এসোসিয়েশনে পাদরি লং সাহেব "কলিকাতার নীতি-চরিত্রের দিকে অন্তর্দৃষ্টি" করেন। সেই প্রবন্ধে বলেন—"ইংরাজ বাঙ্গালী সকলের নীতি অতি নিম্নস্তরের ছিল। ফোর্ট উইলিয়ামের প্রথম ইঞ্জিনীয়ার ২০লক্ষ টাকা ঠকাইয়া লন।"

১৮৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে ভারতের আদম সুমারি সমালোচনায় বিভার্লি সাহেব—পরে ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি হন—বলেন, "ভারতে পুরুষ নারীর অপেক্ষায় সংখ্যায় অধিক। সকলেই বিবাহ করে। ভারতের বিধবা-সংখ্যা ইংলণ্ড বা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের অবিবাহিতাদের সংখ্যার কাছে পৌছায় কিনা সন্দেহ।"

১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় "বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য" সম্বন্ধে একটী ইংরাজী প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন—"বাঙ্গালীর মধ্যে অভিনব সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে।"

ঐ ১৮৭০ সাল বরাবর একটী বিলাতী মেম ভারতবর্ষে ছয় মাস থাকিয়া ও কয়েক ঘর ধনী ইংরাজি-শিক্ষিতের ঘরে মিশিয়া ভারতনারীর ও গৃহজীবনের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ এক পুস্তক প্রচার করেন। ৩০ বৎসরে জেম্‌স্‌ কার যাহা না বুঝিয়াছিলেন, তিনি ছয় মাসে তাহার অধিক বুঝেন।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্কিমের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাঙ্গালীর অভিনব সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতেই এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছিল—এই কথাটা যেন বাঙ্গালী কোনও দিন বিস্মৃত না হন। বঙ্গ-দর্শনের পর আর একবার বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ সমক্ষে ইংরাজী ভাষায় এক অপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব চালাইয়াছিলেন। হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কথা বলিতেছি। তাহা ভাষায়, যুক্তিতে, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠায়, স্বদেশ প্রেমে ও স্বজাতি গৌরবে এক অপূর্ব্ব অবদান। তাহার পরিচয় আমি পড়িয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

তাঁহার সকল লেখা সম্বন্ধে আমার এক কথা—পড়িও, পড়িও, পড়িও। নিত্য নূতন রস পাইবে। পড়িবার দুই চারিটি ইঙ্গিত মাত্র দিব।

১ম। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ কথাশিল্পী। শিল্পের (art) সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টির লক্ষণ দার্শনিক এমার্সনের মতে দুইটী—(১) they are universally intelligible, (২) they restore to us the simplest states of mind, and are religious. মানব সাধারণ বুঝিতে সক্ষম হওয়া চাই, আর মনের সহজ সরল ভাবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেওয়া চাই এবং ধর্ম্মানুমোদিত হওয়া চাই।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারে লিখেন:—"সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে, কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম। * * কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা এক অংশমাত্র। * * * সাহিত্য ত্যাগ করিও না। কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।"

২য়। তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র-চিত্রণে সাময়িক ঘটনাবলীর অনেক ঘাতপ্রতিঘাত ফলিত হইয়াছিল। তাহা বুঝিতে গেলে, তিনটা দিক্‌ নির্ণয় করিতে হয়—

(ক) তিনি বুঝিয়াছিলেন বিধবাবিবাহের আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবাসীর দাম্পত্য-সম্বন্ধের উপর আঘাত আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন—

"অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি, এই দুই বৃত্তিই অতিশয় রমণীয়। * * রমণীয়তায় এই দুইটী বৃত্তি সমস্ত মনুষ্যবৃত্তিকে এতদূর পরাভব করিয়াছে যে, এই দুইটী বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পতি প্রীতি সকল জাতির কাব্য সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়।"

তাঁহার গীতার টীকায় বলিয়াছেন—"কেবল ঈশ্বর-চিন্তার নীচে পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়।"

এই যাঁহার অন্তরের অন্তরতম ধারণা, তিনি কি করিতে পারেন? ইংরাজী-শিক্ষিত স্বাধীন প্রেমের কথা পড়িতেছেন, রূপজ মোহের নাটক নভেল পাঠ তাঁহাদের

চিত্ত-বিনোদন করিতেছে, সে সময়ে তিনি বুঝিয়াছেন—দাম্পত্যপ্রণয়ের পবিত্র বারি কলুষিত হইতে চলিয়াছে। কাজেই উপন্যাসে এই সমস্ত সমস্যা আপনিই আসিয়া পড়িল। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, তিনি সমস্যা-পূরণের জন্য উপন্যাস লিখেন নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই—

সূর্য্যমুখীর সংসারে সমস্যা যখন উঠিলই, তাহা মিটাইবার একমাত্র উপায় কুন্দকে মরিতেই হইবে। তাই কুন্দ আত্মহত্যা করিল—মরমে শেল দেই গেল। কিন্তু উপায় নাই।

সমস্যা ভ্রমরের নিজের দোষে আসিল। নতুবা শত রোহিণীতে গোবিন্দলালকে নষ্ট করিতে পারিত না। ভ্রমরের অভিমানে রোহিণীকে গুলি খাইতে হইল ও নিজেও মরিল। বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালকে দেখাইলেন ও বলাইলেন—ভগবৎপাদপদ্মে মন স্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।

জয়ন্তী শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়, এত ভালবাসিলে কিসে?"

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস—কয়দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?

জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রিদিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যেদিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।

যখন প্রফুল্ল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ। স্বামী দেখিলে, কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

নিশি তখন বুঝিল—ঈশ্বরভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।

সেই পতিভক্তির জন্য স্ত্রীকে কি শিখিতে হয়?

শান্তি বলে—"তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীর-পত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীর-ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে?" এই গেল প্রথম দিক্।

(খ) দ্বিতীয় দিক্-নির্ণয়ও বঙ্কিম ধরাইয়া দিয়াছেন। তিনি নারীচরিত্রের এক কুহেলিকার লক্ষণ ধরিয়াছিলেন—বোধহয় মায়া রূপান্তরে নারীর মধ্যেই আছে।

আয়েষা শেষ কথায় বলিতেছে—"যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন?"

চটুলা চপলা রাধারাণী আত্মপরিচয় দিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঐ প্রকৃতির কুহেলিকার জন্য কুন্দনন্দিনীর "না"। একই কারণে মৃণালিনী তাহার মাথার আঘাত অনুভব করে নাই।

"আমি পদ্মাবতী" পরিচয় দিয়াই লুৎফ-উন্নিসা কক্ষান্তরে চলিয়া যায়। রেশমী পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া দেবীরাণী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে অধিকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। গলা ধরিয়া আসিতে লাগিল। নিশি বলে, "দেবীরাণী দর্শন দিলেও দিতে পারেন"।

বঙ্কিমচন্দ্র নারীচরিত্রের এই মোহনিয়া মায়ার পরিচয় নিজে যেমনটী বুঝিয়াছিলেন, তেমনই আমাদের বুঝিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই গেল দ্বিতীয় দিক্।

(গ) এই মায়ার মোহিনী শক্তির আর একটা দিক্ আছে। তিনি হিন্দু সন্তান বিশ্বাস করিতেন, মায়া কাটাইতেই হয়। গীতায় পড়িয়াছেন

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

তিনি সর্ব্বত্র মায়ার খেলা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, প্রকৃত শান্তির পথ চিনিয়াছিলেন। স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ, নিস্পৃহ হইতে হইলে কামনা পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও তিনি জানিতেন। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কাহাকে বলে, তাহাও যেমন তিনি জানিতেন, বহুশাখা অনন্তাভিমুখী বুদ্ধি কোন্ পথে তাহাও বুঝিতেন। উপন্যাস লিখিতে গিয়া তিনি সিদ্ধান্তের গলদ্ করিয়া বসেন নাই।

সেই কারণে অগাধ জলে সাঁতারের মধ্যে কি কোমলে কঠোর দৃশ্য! শৈবলিনী প্রতাপ হয় ডুবিয়া মরুক; নতুবা শৈবলিনী শপথ করুক, আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। কবি মায়ার রূপ চিনিতেন। তাই পরে পুনরায় শৈবলিনীকে বলিতে হইল—"যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত

অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে, জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।" নবকুমারও অমর নাথকে বলে "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা; আমার কত বল দেখিয়া তোমার কি হইবে ?"

বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের মনের এই দ্বন্দ্ব অতি নিখুঁত ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন গোবিন্দলালের মনে সুমতি কুমতির দ্বন্দ্বে। কেননা, তিনি জানিতেন এই দ্বন্দ্বের হাত এড়াইতে হইলে ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হয়।

ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল বলিয়াই নবকুমার বলিতে পারিয়াছিলেন—"আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধনসম্পদ্ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।"

দুঃখে কষ্টে, নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া দ্বন্দ্বাতীত হইবার শিক্ষালাভ হইয়াছিল বলিয়াই দেবীরাণী ব্রজেশ্বরকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং টাকা ধার দিবার সময়ে বলিলেন—"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ চুরি ডাকাইতির টাকা নহে।" সংসারে ফিরিয়া সতীনদিগের ভোগের অবসর দিয়া নিজে "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব" কি করিয়া হইতে হয়, তাহা দেখাইলেন।

শান্ত সমাহিত চিত্ত দম্পতীর আদর্শ জীবানন্দ ও শান্তি সংকল্প করিলেন—"হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া দুইজনে দেবতার আরাধনা করিব। যা'তে মার মঙ্গল হয় সেই বর মাগিব"।

আর একদিক্ দিয়া এই দ্বন্দ্বসঙ্কুল মায়ার পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন। সীতারামের আরম্ভ—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে"? সীতারাম এই কথা ভাবিতে ভাবিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তাঁহার প্রজা চাঁদশাহ ফকির রাজ্যত্যাগ করিল এই বলিয়া—"যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে"। এই সমস্যা-পূরণের ভার পাঠকবর্গের উপর দিয়া গিয়াছেন। কারণ কি ইহাই নহে যে, ধর্ম্মের উপরে সীতারাম রূপজ মোহকে স্থান দিয়াছিলেন ?

এই আলোচনার প্রসঙ্গে একটা আনুষঙ্গিক কথা উঠিয়েছে। শুনিতে পাই Art বা কম-কল্পনার সৌন্দর্য্যকে হত্যা করিয়া রোহিণীকে গুলি করা হইয়াছে। রোহিণী মরিবে কেন ? আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি—রোহিণী বাঁচিবে কেন ? আমার এই হাস্যাস্পদ Art-সমালোচনায় একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু যতদিন বাঙ্গালা দেশে নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, ততদিন ঘরের গৃহিণী নর্ত্তকী হইতে পারে, চাল-চলনে যৌবনসর্ব্বস্বা হইতে পারে, ইহাও যেমন ধারণা করিবার অবসর পান নাই, কামসহচরী বিলাসিনী সেবাপরায়ণা দাসী হইতে পারে, শ্রবণ-মনন-ধ্যানের পূজার আসন পাতিয়া দিতে পারে, তাহাও তেমনই সম্ভব বলিয়া বুঝিবার অবসর পান নাই। ভ্রমর মরিতই, তখন গোবিন্দলাল ভ্রমরের ভ্রমরকে খুঁজিতে বাহির হইতেনই। তখন কি রোহিণীর শান্তির মতন হিমালয়ে কুটীর বাঁধিয়া দু'খানা লুচি ও আলুভাজা ভাজিয়া দিবার জন্য বাঁচিয়া থাকার আবশ্যকতা ছিল না কি ? রোহিণীরা ভ্রমরের অভাবও পূরণ করে না, ভ্রমরেরা রোহিণীর অভাবও পূরণ করে না, এইটাই বঙ্কিমবাবুর জ্ঞান ছিল বলিয়াই মনে হয়। রোহিণীর বস্তুত্ব একটা অভাবের পূরণ। সে অভাব পূর্ণ হইয়া গেলে রোহিণী থাকে না, গুলিই খাক্ আর জলেই ডুবুক। আজ অভাবাত্মক ভাবের বেচাকেনা চলিতেছে বলিয়া রোহিণীর চরিত্র দেখিয়া তাহার যৌবনের জন্য অক্ষয়-কামনা করা হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই হাটে মাল বেচিতে আসেন নাই। তিনি মানবতার পাঠশালায় বাঙ্গলার নরনারীকে আদর্শ শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। আদর্শের হানিকরকে নির্ম্মমভাবে নষ্ট করিতে কোনও দ্বিধা, কোনও সঙ্কোচ তাঁহাকে লেখনী বা তুলিকার রং ভুল করায় নাই। তিনি এমার্সনের মত জানিতেন—'As soon as beauty is sought, not from religion and love, but for pleasure, it degrades the seeker'—গবেষক যখনই ধর্ম্ম ও প্রেম ছাড়িয়া কেবল সুখের জন্য, ভোগের জন্য সৌন্দর্য্য খুঁজিলেন, তখনই তিনি অধঃপাতের পথে গেলেন। গোবিন্দলালও বটে, পাঠকও বটে। আর বোধহয় লেখকও বটে।

তিনি আদর্শের জন্য কতটা কঠোর হইতে পারিতেন, তাহা তাঁহার জীবনের শেষ ঘটনায় প্রকাশ। তাঁহার পিতাঠাকুর ও তিনি সন্ন্যাসীর প্রভাব অনেক লাভ

করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ কয়েক দিনের মধ্যে একদিন এক সন্ন্যাসীর সহিত তিনি রুদ্ধদ্বারে কয়েক ঘণ্টা কি আলাপ করেন। তাঁহার ব্যবহারে মনে হয়, তিনি আসন্ন দিনের খবর পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে একথা জানিতে দেন নাই। জীবন-রঙ্গমঞ্চের অনাসক্ত অভিনেতা জানিতেন—সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক, রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি, দুর্নীতি, পাপ, পুণ্য, সু, কু, দেবাসুর সংগ্রাম—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতি তাঁহার স্থির দৃষ্টি ছিল বলিয়াই ডেপুটীজীবনে চাকুরীর উপর কি করিয়া আত্মসম্মান রাখিতে হয়, তাহা তিনি বারম্বার দেখাইয়াছেন। সমস্ত যুক্তি-তর্কের উপর যে ভগবদ্ভক্তি তাহা বলিয়া তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে বসিলেন। সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে—বঙ্কিমচন্দ্র একজন আস্ত মানুষ।

৩য়। তাঁহার নারীচরিত্রচিত্রণের আর একটা দিক্ আছে। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন—ভারতের নারী ভারতনারী থাকিলেই হইল, তাহার অপর কোনও কিছু বিদ্যার প্রয়োজন নাই।

প্রফুল্লর মা বেয়ানকে বলিতেছেন—"আমি বিধবা অনাথিনী, তোমার বেটার বৌকে আমি খাওয়াই কোথা থেকে?"

সাগর-বৌ স্বামীকে বলে—"আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

কমলমণি কুন্দকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চায়—"নহিলে নয়। সোণার সংসার ছারখার গেল।"

লবঙ্গলতার ধ্রুবজ্ঞান।—"পুরুষ-মানুষ আবার সংসার, ধর্ম্ম, কুটুম-কুটুমিতার কি জানে?"—"পুরুষ মানুষের আবার মতামত কি? মেয়ে-মানুষের যে মত, পুরুষ-মানুষের সেই মত।"

ইন্দিরাকে রাঁধুনী রাখিতে হইবে। সুভাষিনী স্বামীকে বলিতেছেন—'মা ওঁকে রাখিতে চান না।'

স্বা। "কেন চান না?"

"সমস্ত বয়স।"

সুভার স্বামী একটু হাসিলেন। বলিলেন, "তা আমায় কি করিতে হইবে?"

"ওঁকে রাখিয়ে দিতে হবে"

স্বা। "কেন?"

সুভাষিণী স্বামীর নিকট গিয়া কাণে কাণে বলিলেন—"আমার হুকুম"

স্বামীও তেমনি স্বরে বলিলেন "যে আজ্ঞা।"

আমি বাঙ্গলার সংসারাভিজ্ঞ হিন্দু সংসারের কর্ত্তা-কর্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করি—এই চিত্র বাঙ্গলার কুলনারীদের যথাযথ চিত্র কিনা? আজকাল চার পয়সার চা'এর চুমুকের সঙ্গে চার পয়সার জ্ঞানসঞ্চয়ের পালা পড়িয়াছে। তাহাতে সম্প্রতি বাহির হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুনারীরা ছিল বাঁদী। একদিন বঙ্কিম-বাবুর আক্ষেপোক্তি প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলাম, আবার অবসর পাইয়াছি "হায়, কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় নারীধর্ম্ম লোপ করিতেছে। * * * যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?"

৪র্থ। আমার ৪র্থ ইঙ্গিত এই, বঙ্কিমচন্দ্রকে সমগ্রভাবে বুঝিতে হয়। তাঁহার সমস্ত লেখা, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত ভাব, সমস্ত আলোচনা, এমন কি সমস্ত জীবনটাই বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি; তিনি সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া তাহার রূপ দিয়া গিয়াছেন। সেই রূপের বৈশিষ্ট্য তাঁহার উপন্যাসে ইতস্ততঃ সল্‌মা-চুমকির ঔজ্জ্বল্য বিকাশ করিতেছে—সন্দেহ নাই। অপর দিকে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি ভারতীয় ভাবের সহিত বিযুক্ত—কোনও আজগুবি কল্পনার সৃষ্ট জীবও নহে। বস্তুতঃ তাঁহার দেশপ্রীতি ও দেশধর্ম্ম কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিজাত নহে। তাহার মূলে আছে সমগ্র জাতির মানুষের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ মমত্ববোধ ও রক্ত-ধারার প্রতি তাঁহার অপরিমিত শ্রদ্ধা। তাই তিনি যে সকল খাঁটি কথা দেশকালকে জয় করিয়া কহিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি—

"ইংরেজী শাসন, ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার

সঙ্গে সঙ্গে 'মেটিরিয়েল প্রস্‌পেরিটি'র (বাহ্যসম্পদ্‌) উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

"অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতের অতুল্য ভাষায় ঈশ্বরারাধনা করি। যতদিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, ততদিন বিনীত হইতে পারিব না।"

"ইউরোপীয়েরা এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপে বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচনা পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছুই হইতে পারে না। আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই।"

অনেকেরই নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিগুলি বিসদৃশ ঠেকিতে পারে। তাঁহাদিগের জন্য একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। লর্ড হলডেন একজন আচার্য্য-তুল্য পুরুষ। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

"ভারতীয়দিগের সার সত্যের আলোচনার নিগূঢ়ার্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। ফলে হইয়াছে, আমরা কেবল ভারতে সিপাই, শাস্ত্রী বসাইয়াছি। ভারতের আত্মবস্তুই ভারত-শাসনের চাবীকাটি হওয়া উচিত। তাহা জানি নাই, কাজেই ভারতবাসীর জীবনযাত্রার সঙ্কেতও ধরিতে পারি নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভেদকেই রাখিয়া যাইতেছি।"

আজ কত কথা মনে পড়িতেছে।

তাঁহাকে প্রথম ও শেষ দেখি ১৩০০ সালে চৈতন্য লাইব্রেরীর এক অধিবেশনে। রবীন্দ্রনাথ "ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বঙ্কিম-চন্দ্র সেই সভার সভাপতি হন। রবীন্দ্রনাথ সেই সভার সমাদর চিরদিনের জন্য লিখিয়া রাখিয়াছেন।

অল্পদিন পরেই সেই সনেই বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গেলেন। আমার ও আমার সহকর্ম্মীদের অনেকেরই নিকট এই বাঙ্গলার সুসন্তানগণের অকাল মৃত্যু বড়ই একটা রহস্য বলিয়াই মনে হয়।

ঈশ্বর গুপ্ত, কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল ৪৬ বৎসর বয়সে পলায়ন করেন। দীনবন্ধু ৪৪ বৎসরে। হরিশ্চন্দ্র ৩৯ বৎসরে। বঙ্কিমচন্দ্র ৫৬ বৎসরে, বিবেকানন্দ ৩৯ বৎসরে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ৪৬ বৎসরে।

কেশবচন্দ্র যখন ভগবানকে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখিলেন, হরিনামের মাহাত্ম্য বোধ করিলেন, তখন চলিয়া গেলেন। থাকিলে ইংরাজী-শিক্ষিতের একটা গতি হইত বলিয়া বিশ্বাস করি।

দীনবন্ধুর শোক যে কত বড় বুকের পাষাণ, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিবেকানন্দ ও উপাধ্যায় যেন সপ্তমীতে বিসর্জ্জন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার বরাবরই মনে হয়, তিনি যে সময়ে গিয়াছেন, সে সময়টাতে তাঁহার বিদায় যেন সাজানো বাগান শুখিয়ে যাওয়ার মতন।

১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম আনী বেসাণ্ট আসিয়া ভারতের ঋষি বাক্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত "দেবতত্ত্ব" আলোচনা চালাইতে পারিতেন। বাঙ্গালী কি রত্নই হারাইয়াছে ?

পর বৎসর বিবেকানন্দ মার্কিণ হইতে ফিরিলেন। বঙ্কিমবাবু যদি তাঁহার গলায় জয়মাল্য দিতেন, তবে কি আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইত না ?

অল্পদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা বাঙ্গলার ঘর-গৃহস্থালীর ও বঙ্গলক্ষ্মীদের যে চিত্র ভাষায় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্ব্বাদে নির্ম্মাল্য হইয়া উঠিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রোপিত বীজের ফল ও ফুল দেখিতে পাইতেন।

ইংরাজী ১৯০১ সালে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অন্ততঃ একজন প্রধান রাজনীতিবিদ্‌ লর্ড ব্রাইস ভারত-সাম্রাজ্যের সহিত রোমান-সাম্রাজ্যের তুলনা করিয়া গভীর গবেষণাপূর্ণ সন্দর্ভ লিখেন। সাম্রাজ্যবাদের এত বড় আশার বাণী আর কেহ দিতে পারেন নাই। তিনি আশা করেন, খ্রীষ্টীয় সভ্যতার কাছে ও ব্রিটিশ আইনের কাছে হিন্দুয়ানি, মুসলমানি, বৌদ্ধমত, সবই

ভাসিয়া যাইবে এবং ব্রিটিশ আইন সমস্ত আইনকে গ্রাস করিবে। হিন্দু ও মুসলমান কিছুদিন গতিরোধ করিতে পারে, কিন্তু কিছুদিন মাত্র।

আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি এই বিষয়ে যাহা করিতেন ও করিতে পারিতেন, তাহার সমকক্ষ সারা ভারতে আর কেহই পারিতেন না। কেন না, ভারতের ভবিষ্যতের সমগ্র ধারণা একা বঙ্কিমচন্দ্রই করিয়াছিলেন, এবং সেই ধারণার মূল ছিল ভারতের অতীতের বস্তুজ্ঞানে।

১৮৯৭ সালের জুন সংখ্যা নাইন্টিনস্থ সেঞ্চুরিতে স্বনামধন্য সার আলফ্রেড লায়েল আলোচনা করেন—মহারাণীর ঘোষণাপত্র লইয়া ছেলেখেলা করিও না। দেশীয় লোকেও না, ইংরাজও না। ইহা দ্বারা সূচিত হয়, তখন বিলাতে ঐ ঘোষণাপত্র লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার একটা কল্পনা চলিতেছিল।

ঐ পত্রের ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় জে, ডি, রীস সাহেব এক রাজকুমারীর স্বয়ম্বরা না হইয়া ব্রাহ্ম বিবাহ অবলম্বন করার সুখ্যাতি করেন। তিনি বলেন, ভারতনারীর ধর্ম্মপ্রাণতা ও উচ্চ মহৎ আদর্শের অনুবর্ত্তিতা ইহা হইতে বোঝা যায়। আমার সন্দেহ হয়, ভারতে তদানীন্তন নারীপ্রগতিপরায়ণাদের নজর পড়িতেছিল।

ঐ পত্রের ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের পেন্সনপ্রাপ্ত এক সিভিলিয়ান লিলি সাহেব রোমান ক্যাথলিকদিগের অচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধনের সুখ্যাতি করিয়া উপসংহারে বলেন—যেদিন অচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধনের পরিবর্ত্তে রদ-বদলের চুক্তি আসিবে, সে দিন বর্ত্তমান সভ্যতা যে দুর্গন্ধ পঙ্ক হইতে মানবকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেই পঙ্কে ইহা আবার ডুবিয়া যাইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র থাকিলে, বাঙ্গালা ভাষায় সমস্ত সভ্য জগতের চিন্তাধারা যথোপযুক্ত স্বাধীন ভাবে আলোচিত হইতে থাকিত।

রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লিখনভঙ্গীতে তিনি যে কি পর্য্যন্ত না আনন্দিত হইতেন, তাহা অবর্ণনীয়।

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ এই, তিনি বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনিয়া গেলেন না। যেদিন প্রথম অগ্রজপ্রতিম পণ্ডিত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি বঙ্কিমচন্দ্রকে দশ হাজার লোকের সমক্ষে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বলিয়া আখ্যাত করিলেন, সে কথার একবাক্যে জবাব হইল—"বন্দেমাতরম্।"

আমরা বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে এই গান গাহিয়াছি, দশহরায় গঙ্গাবক্ষে এই গান গাহিয়াছি—জ্যোৎস্নালোকে বাঙ্গলার ফুল্ল-কুসুমিত পল্লীবাটে এই গান গাহিয়াছি,—বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার নয়নে জ্যোতিঃ দেখিয়াছি, অশ্রু দেখিয়াছি, মস্তক অবনত দেখিয়াছি। ঐ গানের স্নিগ্ধ গম্ভীর তরঙ্গে তারা আত্মহারা হইয়াছে দেখিয়াছি। কাঁটালপাড়ায় ১৩১৩ সালের চৈত্র মাসে বঙ্কিমোৎসবে ঐ গান রাধাবল্লভকে শুনাইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়াছি, অক্ষয় চন্দ্র, হরপ্রসাদ প্রভৃতি সকলেই তাহাতে যোগদান করেন—ঐ উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে সকলেই একপ্রাণে চেষ্টা করেন। আজও মনে পড়ে, বঙ্কিম চন্দ্রের ঠাকুরদালানে পট-ভূষণে ত্রিধা চিত্র—মা যা ছিলেন, মা-যা হইয়াছেন, মা-যা হইবেন। আমার সতীর্থ নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ গৈরিক বসনে, সদল-বলে ঐ ঠাকুরদালানে বন্দেমাতরম্ গাহিয়া যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেন, তাহাতে আমাদের সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে যেন একবাক্যে বলিয়া উঠেন—আজ যদি বঙ্কিমচন্দ্র থাকিতেন!

আজও মনে পড়ে, ঐ গান গাহিতে গাহিতে দুই আশুতোষের বাটীতে দুই জনের কি ভক্তিবিনম্র আবাহন! কত হিন্দু গৃহস্থের বাটীতে কত না শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি, কত না আদর আপ্যায়ন! স্বনামধন্য তারকনাথ পালিতের বালিগঞ্জের গৃহে যখন উপস্থিত, তিনি তখন ত্রিতল হইতে নামিতে পারেন না। আমরা ৪২ জন ত্রিতলে গাহিতে গাহিতে উপস্থিত হইলাম। গান চলিতেছে, বৃদ্ধের দুই চক্ষু হইতে দর-দর ধারায় বক্ষ প্লাবিত। আমরা সাধারণতঃ দুই বার গাহিতাম। থামিতেই বলিলেন—আর একবার গাহিলাম। ছোট্ট একটী কথা—আজ কি শুনলেম! সে দিনও আমরা মনে করি, স্বয়ং বঙ্কিম চন্দ্র যদি থাকিতেন, আজ আমাদের মস্তকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিতেন। তখন তাঁহার বয়স ৭০-এর অধিক হইত না। এতই কি দুরাশা হইয়াছিল!

আমরা তখন মনে করিয়াছিলাম বঙ্কিমের উক্তি —"যবে মা'র সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন।" সেই দিন আসিয়াছিল দেখিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দিন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, সেটা সমগ্র বাঙ্গালীজাতির দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি।

অবশ্য আর অধিক দিন রাখিতে চাহিতাম না। বিশেষতঃ, যখন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে, জানি না কোন স্ফটিকাধারে, কোন্ তাপমান যন্ত্রের কোন্ সংখ্যা-গণনায়, ধরা পড়িয়া গেল বঙ্কিম, ভূদেব বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক অপব্যবহৃত করিয়া গিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে বঙ্কিম যে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন তাহা সুবিবেচনা, সন্দেহ নাই।

আর আজ বাহুবল-বঞ্চিতা, বিদ্যাহীনা, ধর্ম্মশূন্যা, হৃদয়-মর্ম্ম-নিষ্পেষিতা মন্দির-পরিত্যক্তা, মা যাহা হইবেন তদ্রূপ-বিবর্জ্জিতা, বর্ণহীনা, অসরলা, হাস্যরাগ-শূন্যা মাকে আজ কিনা ভূগোল-সীমায় ঘূর্ণ্যমানা দেখিয়া মনে হয়—হায়! বঙ্কিমচন্দ্র, কোন্ দেশে ভুল করিয়া আসিয়াছিলে?

আমি আমার অযোগ্যতার স্বীকারোক্তি করিয়া আমার বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছি। আমরা মন্ত্র পাইয়া, ক্ষেত্র পাইয়া, সাধন-ফল লাভ করিয়া, দীর্ঘ ৩০ বৎসর পরে দেখিতেছি—মা আমার আজও অন্ধকারাচ্ছন্না, কালিমাময়ী, হৃতসর্ব্বস্বা, নগ্নিকা, কঙ্কালমালিনী আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন। মন্ত্রদাতা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন ডাকিতে—"এস মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববল-ধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি"—কৈ পারি নাই ত! "কালসমুদ্রতাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া সেই স্বর্ণ-প্রতিমা" মাথায় করিয়া আনিতে পারি নাই ত! নতুবা আজ মাতৃমূর্ত্তির ঐশ্বর্য্যালঙ্কারকে অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়-ভক্তির মদিরোন্মত্তরা অপহরণ করিল! আমি এক্ষেত্রে—বঙ্কিম-চন্দ্র-স্মরণ ক্ষেত্রে—ভাবের ঘরে চুরি করিব না। আমরা অযোগ্য—নতুবা কোথাও আর "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র সেভাবে গীত হয় না কেন! আমরা অযোগ্য—কেন আজ সে মন্ত্রকে তেমনভাবে জাগাইতে পারি না! বঙ্কিমচন্দ্র, কোথায় কোন লোকে আছ জানি না, বাঙ্গালার একচ্ছত্র ভাবের ভাবুক, আশীর্ব্বাদ কর—অযোগ্যতা "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রেই আবার ঘুচিয়া যাক্।*

* চুঁচুড়ায় মিত্র-সমিতির উদ্যোগে ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম শতবার্ষিকী-স্মৃতি সভার সভাপতির অভিভাষণ।

অন্তিম প্রার্থনা

শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

কামনার পাপ-পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবিয়া দয়াময়,
অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ভোগে করিতেছি শুধু অপচয়
প্রতিটি অমূল্য দিন। শত প্রলোভন অগ্নি-শিখা
আর্ত্ত চক্ষে আঁকি' দিয়া কলঙ্ক-অঞ্জন-কৃষ্ণলিখা
আসক্তির ক্লেদস্পর্শে অজস্র করিছে কলুষিত
ইষ্ট-আশীর্ব্বাদ-পূত মোর আকাঙ্ক্ষিত ত্যাগব্রত।
তবু নাহি আত্মগ্লানি, তবু নাহি অশ্রু-বরিষণ,
তিক্ত অনুশোচনায় চিত্ত নাহি দহে অনুক্ষণ:
মাগিল না হায় তবু এ মোহ—মলিন মন মম
নিখিল-শরণ তব অনন্ত করুণা অনুপম!
শেষ-ধ্বংসস্তরে নামি' আতঙ্কে দেখিতে তাই পাই,
জীবনের মঞ্জুষায় সঞ্চিত পাথেয় কিছু নাই।
পারি না বহিতে আর হতবল এ যৌবনভার,
অতল হৃদয় ভরি' উথলিয়া উঠে বারবার:
বিষাক্ত কি বেদনার বিক্ষুব্ধ সাগর—অহর্নিশি
অপমৃত্যু চিন্তা মনে হয় যার মাঝে আছে মিশি'!..

জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে আমারে করিও প্রভু ত্রাণ,
অশ্রু-নিবেদনখানি চরণে রাখিল দগ্ধ প্রাণ।

খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্মকথা

শ্রীকালিদাস রায়

যিশুখৃষ্টের পূর্ব্বে যে ইহুদী মহাপুরুষগণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে মুসা বা মোজেসই প্রধান ও প্রথম। যিশু ইহুদিদের শেষ পয়গম্বর। যিশু ইহুদিদের বলিয়াছিলেন—আমি তোমাদের প্রচলিত ধর্ম্ম ধ্বংস করিতে আসি নাই—উহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিতে আসিয়াছি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিয়াছিলেন — তোমরা শুনিয়াছ এক গালে কেহ চড় মারিলে, তাহার দুই গালে চড় মাড়িয়া শোধ লওয়াই ধর্ম্ম—আমি বলি—এক গালে চড় মারিলে, আততায়ীকে অন্য গাল বাড়াইয়া দিবে।

যিশু ক্ষমার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা শত্রু জয় করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি জগতে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহুদীরা দেখিল, ইহাতে তাহাদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণাঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক—ইহা তাহাদের ধর্ম্মমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। তারপর যিশু বলিয়াছিলেন—

ধন্য দীনাত্মারা, স্বর্গরাজ্য পাবে দীন।
ধন্য বিনয়ীরা, ধরা হইবে অধীন॥
ধন্য দয়াবান্, দয়া পাইবে তাহারা।
ধন্য এই ধরাতলে শান্তিপ্রদাতারা॥
ধন্য যারা পবিত্রতা তরে উৎপীড়িত।
স্বর্গরাজ্য তাহারাই পাইবে নিশ্চিত।

এ সকল কথা বৈষ্ণব মতের কথা। শাক্ত ইহুদীদের এসকল কথা রুচিকর হয় নাই।

খৃষ্টের প্রচলিত ধর্ম্ম কোন গভীর দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ইহা হৃদয়াবেগের ধর্ম্ম—আপামর সাধারণ সকলের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করা চলে—তর্ক-দ্বন্দ্ব বা বাদবিতণ্ডা করা চলে না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—এমন ধর্ম্ম ইহুদীরা গ্রহণ করে নাই কেন, বুঝা গেল। কিন্তু সুসভ্য ইউরোপীয় জাতি গ্রহণ করিল কি করিয়া? ইহার উত্তর—এই ধর্ম্মকে যিশু শ্রীমুখের বাণীর দ্বারাই পুষ্ট ও জীবন্ত করেন নাই—বুকের রক্ত দিয়া ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া গিয়াছেন—মৃত্যু বরণ করিয়া ইহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্মের ভিত্তিতে কোন গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব নাই—ইহা ধর্ম্ম-গুরুর বক্ষোরক্তে পরিষিক্ত ক্রুশ-কাষ্ঠের উপর প্রতিষ্ঠিত। যিশু তাঁহার নিজের জীবন এই ধর্ম্মের কলেবরে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন। এইখানেই শেষ হয় নাই। মহাত্মা সেণ্ট পল এই ধর্ম্ম ইউরোপে প্রচার করেন, তিনি ইহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তারপর দলে দলে সহস্র সহস্র খৃষ্ট-ভক্ত এই ধর্ম্মের জন্য খৃষ্টেরই মত বক্ষোরক্ত দান করিয়া গিয়াছেন। সুসভ্য গ্রীক্ ও রোমকেরা খৃষ্ট-ভক্তদের উপর চূড়ান্ত উৎপীড়ন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছে—এ কি ধর্ম্ম, যাহার জন্য এত লোক হাসি-মুখে প্রাণ উৎসর্গ করে! ইহার মধ্যে কি গভীর সত্য নিহিত আছে? আর বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় নাই—তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন হয় নাই। বিস্ময়-বিস্ফারিত শ্রদ্ধায় তাহারা অবনত হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তারপর তাহাদের পণ্ডিতেরা ইহার মধ্যে কিছু কিছু দার্শনিক তত্ত্ব আরোপ ও আবিষ্কার করিয়াছে। তারপর হইতে যুগে যুগে ইউরোপের লোকে এই ধর্ম্মের জন্য জেহাদে যাত্রা করিয়াছে—দারুণ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে—পতিত, অধম, বন্য, বর্ব্বরদের পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে—গভীর অরণ্যে, দুর্লঙ্ঘ্য-গিরি-শৃঙ্গে, মেরুতে মেরুতে ক্রুশ প্রোথিত করিতে গিয়া নিজেরাই সমাহিত হইয়াছে। এইভাবে এই ধর্ম্মের প্রাণপুষ্টি ঘটিয়াছে। তারপর খৃষ্টের উদ্দেশে নিবেদিত—জীবন প্রচারকগণ জগতের দুঃস্থ, দুর্গত, অজ্ঞ, মূঢ়, অনাথ-গণের মধ্যে মুখের অন্ন, বুকের বল, চোখের আলোক, রোগের ঔষধ, শোকের সান্ত্বনা, আশা-আনন্দের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন—দেশে দেশে অনাথাশ্রম, আরোগ্যসত্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার এবং শত শত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। ধর্ম্মের অন্তরে

কি সত্য, কি তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা জানিবার কাহারও প্রয়োজন হয় নাই। জনসাধারণ আত্মত্যাগ, প্রেম, মৈত্রী ও জনসেবা যে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, তাহার চেয়ে সত্য ধর্ম্ম আর কি আছে? এইভাবে খৃষ্টধর্ম্ম অর্দ্ধ জগৎ জয় করিয়াছে।

আজ খৃষ্ট জগতের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে—চোখ জলে ভরিয়া আসে। মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য বুকের রক্ত দান করিয়া খৃষ্ট যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন—আজ সে ধর্ম্ম যে সকল সভ্য জাতি অনুসরণ করে, তাহারা খৃষ্টের বাণীর কি অপচারই না করিতেছে—ক্রুশের কি অমর্য্যাদাই না করিতেছে! বিংশ শতাব্দীর বুকের রক্তে যে ধর্ম্মের পরিপুষ্টি, ক্ষণিক ভোগ-সুখের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাকে আজ ধ্বংস করিতেছে। এজন্য প্রকৃত খৃষ্টান যতটা মর্ম্মাহত, অতটা অন্য কেহ নয়।

স্মৃতির পূজা

(গল্প)

শ্রীসুশীল কুমার দত্ত

বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম রশ্মিতে চতুর্দ্দিক যেন নব বধূর লাজরক্ত মুখের মতই রাঙিয়ে উঠেছে। ক্ষীণকায়া নদীটির ধীর-স্রোতা স্বচ্ছ সলিলে সেই রশ্মি প্রতিভাত হ'য়ে তৎতটবর্ত্তী ছোট কুঁড়েখানিও যেন নবীন শিল্পীর আঁকা দৃশ্য-পটের মতই সুন্দর দেখাচ্ছিল। চারিদিকে বহুদূর-বিস্তৃত খণ্ড খণ্ড ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে এই কুঁড়েখানিই নয়ন জেলের পৈতৃক ভিটা।

নয়নের বয়স হ'য়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ। কিন্তু দেখলে মনে হয়, বয়স বুঝি তার পঁচিশও পেরোয় নি। এমনি তার সুগঠন, বলিষ্ঠ চেহারা। আজ প্রায় দু'বৎসর হ'ল স্ত্রীর মৃত্যু হ'য়েছে। সংসারে তার একমাত্র আকর্ষণ, সম্বল—সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা সোহাগী।

স্ত্রীকে হারিয়েছে বটে, কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীর স্মৃতি সে এখনও ভুলতে পারেনি। যখনই তার কথা মনে পড়ে, সে যেন নিজেকে কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না; অনেক সময়ে গোপনে কেঁদে ফেলে। স্ত্রীর সেই স্বর্গীয় প্রেম, অফুরন্ত ভালবাসা, কর্ম্মক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরলে কাছে এসে গায় হাত বুলিয়ে পাখার বাতাস করা, কোন দিন ফিরতে বিলম্ব হ'লে পথপানে তার আগমনপ্রতীক্ষায় আকুল নয়নে চেয়ে থাকা—এই সব কথা যখন নয়নের মনে পড়ে, সে যেন বড় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। মেয়েটিও হ'য়েছে ঠিক যেন তারই মত। এরই মধ্যে সে তার মায়ের সব অধিকারটুকু দখল করে' বসেছে। নয়ন যখন অত্যন্ত উতলা হ'য়ে ওঠে, মেয়ের দিকে চেয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে একটু শান্ত হয়।

পাড়া প্রতিবেশীর অনেক অনুরোধ সত্ত্বে, সে আজও দ্বিতীয় বিবাহ করেনি। কেউ তার সামনে এ বিষয়ে আলোচনা সুরু করলে সেখান থেকে সে সরে' যায়। বিবাহের নামে মহা বিতৃষ্ণায় মন তার ভরে' যায়। অন্তিম শয্যায় শায়িতা স্ত্রীর হাত দু'টি ধরে' সে বলেছিল—বিয়ে আর সে করবে না। তার স্মৃতির পূজা করে'ই শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবে'। সে দেখেছিল—এখনও মনে পড়ে,—তার এই কথায় স্ত্রীর মুখ আনন্দে উজ্জল হ'য়ে উঠেছিল। সে যেন শান্তিতে মরতে পেরেছিল।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

নয়ন দাওয়ায় বসে' তামাক টানতে টানতে যখন ক্রমশঃ ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যার ধূসর ছায়াচ্ছন্না সামনের নদীটির প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে কি ভাবছিল, সোহাগী পিছনের দিক হ'তে ছুটে এসে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে। হঠাৎ ঝাঁকুনি

লেগে কাছে থেকে এক টুকরো আগুন ছিট্‌কে তারই পায় পড়তেই সোহাগী চেঁচিয়ে ওঠে—'পুড়ে গেল বাবা, কাপড় পুড়ে' গেল!'

নয়ন চকিতে উঠে কাপড়টা ঝেড়ে ফেলে দিলে, সোহাগী সেই স্থানে ছোট্ট নরম হাতখানি রেখে বাপের প্রতি স্থকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—'লেগেছে বাবা, বড্ড জলেছে!'

নয়ন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে—একটি ছোট্ট চুমু খেয়ে হেসে ফেলে—

—'কিচ্ছু লাগেনি'।

—'না লাগেনি। তুমি বল কিনা, সব চেপে রাখ'।

—'কে বল্লে চেপে রাখি!'

—'না, রাখ না।'

—'নয়ন হাসতে হাসতে তার কচি মুখখানি তুলে ধরে —'আজ খেলতে গিছ্‌লি?'

—'এই ত আস্‌ছি খেলে।'

—'কোথা দিয়ে এলি? আমি ত এখানেই বসেছিলাম।'

—'পেছনের বেড়া ডিঙিয়ে।'

—'আর বেড়া ডিঙিয়ো না।'

—'আচ্ছা—'

জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে চারিদিকে ক্ষুদ্র গ্রামের ঘরে ঘরে সন্ধ্যার দীপ জলে' ওঠে। নয়ন তখন মেয়েকে কোলে নিয়ে, দূরে, বহুদূরে—গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বিভ্রান্তের মত চেয়ে থাকে। সোহাগীর কোমল আহ্বানে তার চমক ভাঙ্গে। সন্ধ্যার আলো জ্বালা হয়।

দাওয়ায় চাটাই পেতে সামনে এক খণ্ড ইঁটের উপর তেলের প্রদীপটি রেখে নয়ন মেয়েকে পড়াতে বসে তার ছোটবেলাকার একখানি অর্দ্ধছিন্ন প্রথম ভাগ নিয়ে। নয়ন যখন ছোট ছিল, তার বাপ সখ করে' গ্রামের এক অবৈতনিক পাঠশালায় পাঠিয়ে কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিল। কয়েক মাস অধ্যয়নের ফলে সে প্রথম ভাগের জ্ঞান সঞ্চয় ক'রতে পেরেছিল এবং এখনও তা' ভুলে যায় নি।

বাপের কাছে এসে পড়তে সোহাগী এক সময়ে চোখ তুলে চেয়ে বলে—'হ্যাঁ বাবা, আমার মা কি এখনও ফিরবে না! ওরা সব বলছিল, তোর মা মরে' গিয়েছে।'

হঠাৎ এই প্রশ্নে নয়ন তার কি জবাব দেবে, ভেবে পায় না; তবুও বলে—'কে বল্লে তোর মা মরে' গিয়েছে, বেঁচে আছে।'

—'তবে আসে না কেন? আমার যে মাকে দেখতে ইচ্ছে করে।'

নয়ন সঙ্গে সঙ্গে এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার অছিলায় উঠে পড়ে—'আর পড়তে হবে না, চল্ রান্না করিগে'—

সোহাগী বোধ হয় বাপের কথায় সহজে ভুলতে চায় না—'আমার মা, ঠিক কবে আসবে বাবা?'

মেয়ের প্রশ্নে সত্যই নয়ন এবার একটু ঘাবড়ে যায়। তাকে বুকে জড়িয়ে, তার ছোট্ট কচি মুখখানি কাঁধের উপর চেপে ধরে—কোন রকমে তার জবাব দেয়—'আর এক মাস পরে ঠিক আস্‌বে। চল্—রাত হ'য়ে গেল, রান্না করে ফেলি গে।'—নয়ন আর মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়ায় না।

দিন যায়।

পিতার ঐকান্তিক স্নেহে, যত্নে, সোহাগী বোধ হয় মায়ের, ঠিক এক মাস পরে আসবার কথা ভুলে যায়।

ক্রমে গ্রীষ্ম কেটে যায়, আসে বর্ষা। নয়নকে এখন মাছ ধরার কাজে খুব ব্যস্ত থাক্‌তে হয়। ফুর্‌সৎ নেই মোটেই। ভোর রাত্রে সে জাল নিয়ে বেরিয়ে যায়। দুপুরে একবার খাবার জন্তে আসে। মেয়েকে খাওয়ায়, নিজে খায়—আবার বেরিয়ে যায়, পুনরায় ফেরে সন্ধ্যার পর। বাপের অনুপস্থিতিতে সোহাগী কোন দিন পাড়ার অপর কাহারও বাড়ী খেলতে যায়, কোন দিন থাকে ঘরে একলা। পুতুলখেলা করে। বাপের অবাধ্য সে কখনও হয় না; বাপ তার অনুপস্থিতিতে বৃষ্টিতে ভিজতে বারণ করেছে। সোহাগী সে কথা মেনে চলে। বাহিরে যখন মুষল-ধারায় বর্ষণ সুরু হয়, সোহাগী দাওয়ায় 'মোড়া' পেতে বসে' পা দুলিয়ে গুন্ গুন্ করে গান গায়, আর চেয়ে দেখে—কোন পাখী গাছের ডালে বসে' ভিজছে, উঠানে হয়ত কয়েকটা ফড়িং, উচ্চিংড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আশ্রয়ের সন্ধান ক'রছে। সে আপন মনেই হাসে আর গান গায়। এমন সময়ে হয়ত ভিজতে ভিজতে নয়ন এসে পড়ে—

সোহাগীর খেয়াল ভেঙ্গে যায়। সে ছুটে গিয়ে ঘর থেকে বাপকে শুক্‌নো কাপড় এনে দেয়—'শীগ্‌গীর ছেড়ে ফেল বাবা, অসুখ ক'রবে।

জলে ভিজলে অসুখ করে, সে বাপের কাছে শিখেছিল। নয়ন হাস্‌তে হাস্‌তে তার ছোট্ট রাঙা হাত থেকে কাপড় তুলে নিয়ে কাপড় বদ্‌লে ফেলে। তারপর চলে মেয়ের ছোট ছোট প্রশ্ন—'কটা মাছ পেলে, কি মাছ পেলে?' নয়ন তামাক টানতে টানতে তার জবাব দেয়। সোহাগী সাম্‌নে বসে শোনে, আর প্রশ্ন করে।

সেদিন ভোর রাত্রে নয়ন কাজে বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই এমন জল আরম্ভ হ'ল, যা নাকি এর মধ্যে এমন আর হয়নি। সকাল হ'ল। ক্রমে বেলা যতই বাড়তে লাগল জল যেন আরও জোর হ'য়ে এল। সোহাগী দাওয়ায় বসে খেলা করতে করতে বাহিরে বর্ষার এই তাণ্ডব লীলা লক্ষ্য করছিল। উঠানে তখন জল জমে প্রায় আধ হাত সমান হ'য়েছে। হঠাৎ কি নজরে পড়তেই সোহাগী তাড়াতাড়ি একটা চুপড়ী নিয়ে নীচে নেমে ভিজতে ভিজতে মাছ ধরতে সুরু করে দিল। সব কৈ মাছ। নদীর জল উপছে পড়ায় মাছ জমিতে এসে গেছে। সোহাগী চোখের সামনে দেখে মাছ ধরার লোভ সাম্‌লাতে পারল না; শীঘ্রই সে প্রায় এক চুপড়ী মাছ ধরে' উপরে উঠে আসে। আনন্দে যে কি করবে, ভেবে পায় না তাড়াতাড়ি চুপড়ীটাকে দাওয়ায় রেখে উপরে কিছু চাপা দেওয়ার জন্য ঘর থেকে একটা ঝুড়ি নিয়ে আসে। এসে দেখে, তিন চারটে মাছ ছিট্‌কে মাটিতে পড়ে গেছে। সোহাগী ঝুড়িটা এক পাশে রেখে মাছ কটাকে তুলতে গিয়ে হঠাৎ একটা মাছ হাতে কাঁটা ফুটিয়ে দিলে। সে জোর করে' মাছ ক'টাকে তুলে ঝুড়ি চাপা দিয়েছে—তখন তার হাতে রক্ত ঝরছে, সামান্য যন্ত্রণাও হ'চ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের পলকে যন্ত্রণা এমন বেড়ে গেল, সোহাগী মাটিতে পড়ে কাটা কৈ মাছের মতই ছট্‌ফট্‌ ক'রতে লাগ্‌ল, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। তখনও তার ভিজে কাপড়, ভিজে মাথা।

এর কিছুক্ষণ পরে নয়ন ফিরে আসে। মেয়ের অবস্থা দেখে সে যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখ্‌ল। কোন প্রকারে তার ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে মাথা মুছিয়ে হাতে ঠাণ্ডা পটি বেঁধে দেয়। তখন সোহাগীর হাত ফুলে' উঠেছে—কেঁদে চোখ দু'টো করমচার মত লাল হ'য়ে গেছে। ঘণ্টা খানেক পরে হাতের যন্ত্রণা অনেক কমে এল বটে, কিন্তু হ'ল প্রবল জ্বর। সোহাগী জ্বরের বেগ সহ্য ক'রতে পারল না; বেহুঁস হ'য়ে পড়ে রইল, আর নয়ন সারারাত্রি বিনিদ্র নয়নে তার শিয়রে বসে রইল।

পরদিন এ খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশী দেরী হ'ল না; দলে দলে নয়নের আলাপী শুভাকাঙ্খী লোকেরা এসে সোহাগীকে দেখে যেতে লাগল। একজন গ্রাম্য কবিরাজও এলেন, ঔষধের ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি হ'ল না। এই ভাবে কয়েকদিন কাট্‌ল, জ্বর ছাড়্‌ল না; প্রত্যহ বেশ ভোরেই জ্বর আস্‌তে লাগ্‌ল।

এ কয়দিন নয়নের কাজ একদম বন্ধ। যেতে পারেনি, মেয়েকে একলা ফেলে কি করে' যাবে? দুপুরে নয়ন মেয়ের পাশে বসেছিল। জ্বরটা তখন একটু নরম পড়েছে। সোহাগী একবার এ-পাশ ও-পাশ ফিরে বাপের আঙুল নিয়ে নাড়্‌তে নাড়্‌তে বলে—'বাবা, কাজ ক'রতে যাওনি?'

—'সেরে ওঠ, আবার যাব।'

—'আমি তোমার কথা শুনিনি। জলে ভিজে মাছ ধরিছি, মাছ কামড়ে দিল—তাইত আমার অসুখ ক'রল।'

নয়ন তার উষ্ণ ললাটে হাত রেখে বলে—'ও কিছু নয়, তুমি ভাল হ'য়ে ওঠ, আবার সব ঠিক হবে।'

সোহাগী চুপ করে। নয়ন পাশে বসে' তার গায় হাত বুলিয়ে দেয়।

—'কেমন আছে সোহাগী'—বলে গাঁয়ের মাধব সর্দ্দারের মেয়ে আলতা এসে ঘরে প্রবেশ করে। সোহাগীর পাশে বসে' তার একখানা হাত আপনার হাতের মধ্যে নিয়ে আবার জিজ্ঞেসা করে—

—'কেমন আছে সোহাগী?'

নয়ন উত্তর দেয়—'জ্বর ত রোজই আস্‌ছে।'

আলতা সোহাগীর গায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—'কাল থেকে কাজে যেও, আমি সোহাগীর কাছে বসব।'

নয়ন একটু বিস্মিত হয় 'তুমি বস্‌বে!'

—'হ্যাঁ। এই পুরো রোজগারের সময়ে কাজ বন্ধ দিলে কি চলে?'

আলতা একবার মুখ তুলে নয়নের প্রতি চায়। করুণায় ভরা সে চাউনি। নয়ন মুগ্ধ হয়—হঠাৎ এই দরদ দেখে। বহুদিন হ'য়েছে সে এরকম স্নেহের আকর্ষণ অনুভব করেনি কোন নারীর কথার মধ্যে। অথচ ভেবে কিছু ঠিক ক'রতে পারে না, প্রতিবাদও ক'রতে পারে না।

নয়ন আবার নিয়মিতভাবে কাজে যায়। আলতা রোজ আসে, সোহাগীর পাশে বসে' আদর করে, গল্প শোনায়, এমন কি ফুরসৎ করে' নয়নের রান্নার কাজও সেরে রাখে। সোহাগীর পথ্য নিজে হাতে করে' খাওয়ায়। নয়ন সব লক্ষ্য করে; কিন্তু কিছু ভেবে ঠিক করতে পারে না; কেন সে তার জন্য এত করে? তার উপস্থিতিতে আলতা যতক্ষণ থাকে, সে যেন একটা বিশেষ অভাব পূরণ বলে' মনে করে; যা না হ'লে, সংসার শ্মশানের সমতুল্য বল্‌লেও হয়। কিন্তু আবার কি ভেবে তার সে ক্ষণিকের আনন্দ যেন কর্পূরের ন্যায় উবে যায়।

ক্রমে আলতা ঘরের গিন্নীর আসন অধিকার করে' বসে। সংসারের অনেক কিছু অভাব সে নয়নকে দিয়ে গুছিয়ে নেয়। নয়ন যেন ইতিমধ্যে কি হ'য়ে গিয়েছিল। আলতার হুকুম অমান্য ক'রতে পারে না; সে যা বলে, যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাই করতে আরম্ভ করে। আলতার সংস্পর্শে সংসারে যেন আবার লক্ষ্মী জ্বল জ্বল করে' ওঠে। সোহাগী তখন প্রায় ভাল হ'য়ে এসেছে।

একদিন আলতা বসে তার ছেঁড়া জামা সেলাই করে' দিচ্ছিল। সোহাগী তার পাশে বসে খেলা ক'রতে ক'রতে বলে—'সবাই বলে, আমার মা নেই।'

আলতা মুখ তুলে তার প্রতি চায় 'আমিই যে তোর মা সোহাগী! আমায় মা বলবিনি?'

সোহাগী একটু অবাক্ হ'য়ে যায়—'সত্যি! আমি বাবাকে জিজ্ঞেস ক'র্‌ব।'

আলতা চঞ্চল হ'য়ে বলে—'চুপ, একথা বাপকে বলিস্‌নি। তাহ'লে আমি আর আস্‌ব না।'

—'আমি ব'লব না, রোজ আস্‌বে?'

—'আস্‌ব। তুই আমায় মা বল দিকি।'

—'মা'—

আলতা তাকে সজোরে বুকে জড়িয়ে, চুমু খেয়ে কচি গাল দু'টী লাল করে' দেয়—'আবার বল।'

—'মা-মা-মা, হ'লতো'—বলে' সোহাগী এক গাল হেসে ফেলে। কিন্তু, আলতার মুখ যেন শুকিয়ে ছোট হ'য়ে যায়। চেয়ে দেখে—নয়ন কখন এসে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

সে চকিতে উঠে' বলে—'আজ যাই, আবার আস্‌ব সোহাগী' বলে'ই সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সোহাগী হঠাৎ এই ব্যাপারে কিছু বুঝ্‌তে না পেরে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে থাকে। নয়ন ডাকে—'আলতা।'

আলতা তার আহ্বানে ফিরে চায়, নয়ন বলে—'শোন।'

আলতা তার সামনে এগিয়ে এলে, নয়ন একটু চুপ করে' থেকে বলে—'সত্যি সোহাগীর মা হ'তে পার্‌বে আলতা?'

আলতা একবার তার প্রতি চেয়ে মুখ নত করে। মৃদুস্বরে বলে—'পার্‌ব।' আর সে দাঁড়ায় না, এক রকম ছুটেই বেরিয়ে যায়।

নয়ন ক্ষণকাল তার গমন-পথে চেয়ে থেকে, ডাকে —'সোহাগী!'

—'কেন বাবা?'

—'দেখ্‌বি আয়, কি মাছ এনেছি।'

—সোহাগী খেলা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মাছ দেখে' বলে—'এত বড় বোনের মত মাছ! কি মাছ বাবা?'

—ভেট্‌কি।

আরও কিছুদিন যায়, বর্ষা শেষ হ'য়ে আসে। শরতের আগমনে চতুর্দ্দিক্ যেন এক নব সৌন্দর্য্যের রঙীন্ মায়ায় আচ্ছন্ন করে' ফেলে। নদী তার স্বাভাবিক শান্ত স্রোতঃ ফিরে পায়; মাঠে মাঠে সোনালী ধানের শিষ দুলে ওঠে; মহামায়ার আগমনের প্রতিচ্ছবি যেন এখন থেকেই শিশুর

মুখে সরল হাসির ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। ঘরে ঘরে বর্ষার জলে জীর্ণ ধানের মরাইয়ের সংস্কার আরম্ভ হয়।

আলতা সেই যে গেছে, আর আসে নি।

সেদিন নয়ন উঠানে বসে একখানা বাঁখারি চেঁচে পরিষ্কার ক'রছিল। এমন সময়ে আলতার বাপ মাধব সর্দ্দার এসে তার উঠানে প্রবেশ করে। নয়ন উঠে তাকে দাওয়ায় বস্‌তে আসন পেতে দেয়। মাধব সর্দ্দার বসে' তার সঙ্গে কয়েকটী বিষয় আলোচনা করে' এক সময়ে বলে —'একটা কথা বলি, নয়ন—'

—'বলেন।'

—'আলতার কথা বলছি। আমার ইচ্ছে, তাকে তোমার হাতে দিতে পারলে সুখী হই। আলতারও মত আছে। আর এ রকম ছন্নছাড়া সংসার নিয়ে কতদিন থাকবে? মেয়েটাও তো তোমার আছে, তার দেখাশোনা করবার—'

—আমিও এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি। কিন্তু আর—'

—'এই 'আর আর' ক'রেই ত এতদিন কাটিয়েছ। কিন্তু এ রকম কি আর ভাল দেখায়? আলতা আমার যে রকম মেয়ে, তাকে নিয়ে তুমি সুখীই হবে। সে তোমার অভাব পূরণ করতে পারবে।'

ফলকথা—নয়ন আলতাকে বিবাহ ক'রতে স্বীকৃত হয়। সেদিন যে দৃশ্য সে দেখেছিল, তার মোহ নয়ন এখনও ভুলতে পারেনি। সে আলতাকে ভালবেসেছিল, কিন্তু মুখ ফুটে' তা কারুর কাছে প্রকাশ ক'রতে পারেনি। মাধব সর্দ্দার তার স্বীকারোক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে' উঠে যায়। আগামী ১৫ই তারিখে বিবাহের দিন ঠিকও হয়।

কাল আলতার সঙ্গে নয়নের বিবাহ। সন্ধ্যার সময়ে নয়ন দাওয়ায় বসে সোহাগীকে বলে—'কাল তোর মা আসবে সোহাগী।'

—'সত্যি বাবা, ঠিক আসবে?'

—'হ্যাঁ।'—বলে'ই নয়ন যেন কি রকম হ'য়ে যায়। সে কি বলছে? সোহাগীর মা আসবে? না, না, তার মা যে মরে গিয়েছে। আবার নয়নের নূতন করে' সেই কথা মনে পড়ে যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর সময়ে সে বলেছিল—'তার স্মৃতির পূজা ক'রে, তার স্মৃতি বুকে ক'রে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবে। বিয়ে সে ক'রবে না।'—কিন্তু, কাল যে তার বিয়ে। না-না, এ বিয়ে নয়—হ'তে পারে না। নয়ন যেন অস্থির হ'য়ে ওঠে। স্থির হ'য়ে বস্‌তে পারে না, উঠে' পড়ে।

রাত্রে সোহাগীকে বুকের মধ্যে নিয়ে শুয়ে নয়ন কিছুতেই ঘুমোতে পারে না; কেবল মনে হয়, কাল তার বিয়ে—বিয়ে, বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় অসহ্য জ্বালায় তার বুকটা যেন জ্বলে' ওঠে। স্থির হ'য়ে শুতে পারে না, উঠে পড়ে। ঘুমন্ত সোহাগীকে ডেকে বলে—'ওরে! ওরে সোহাগী! ওঠ্—ওঠ্, তোর মা মরে' গিয়েছে রে, মরে' গিয়েছে। আমি তোকে ভুলিয়ে রেখেছিলাম। তোর মা নেই—নেই।' তখনও সোহাগীর ঘুম ভাঙ্গে না; নয়ন ঘুমন্ত মেয়েকে বুকে তুলে' নেয়—তারপর ধীরে ধীরে বাহিরে এসে গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়িয়ে দেয়।

সকাল হ'লে মাধব সর্দ্দার কোন প্রয়োজনে নয়নের ঘরে আসে। দেখে নয়নও নেই, সোহাগীও নেই। একবার এদিক্ ওদিক্ ঘুরে'ই দেখে, সাড়া পাওয়া যায় না। শীঘ্রই একথা গ্রামময় রাষ্ট্র হ'য়ে যায়; দলে দলে লোক নয়নের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু, সে কোথায় গেছে, কোথায় আছে, আজ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

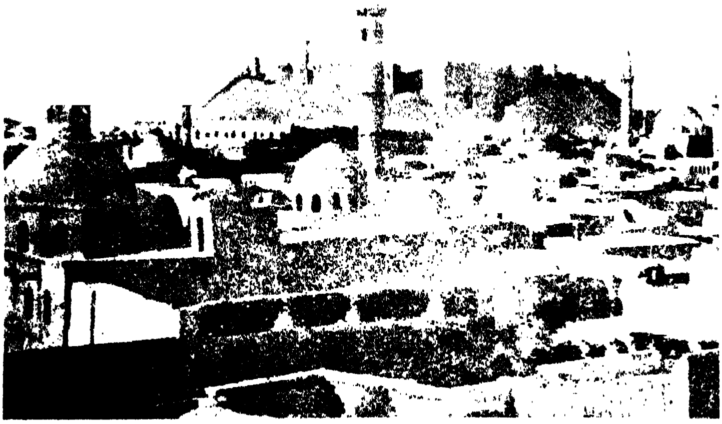


দামাস্কাস-দর্শন

(ভ্রমণ-কথা)

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

আমরা পশ্চিম এশিয়ার প্রসিদ্ধ নগর দামাস্কাস দর্শনের জন্য মোটর-যোগে যাত্রা করিলাম। আমরা "জেনাসারেথ" প্রান্তরের উপর দিয়া হ্রদের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত কাপার-নায়াম নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথাকার প্রাচীর সিন্যাগগ দর্শন করিলাম। এই প্রাচীন উপাসনা গৃহটি ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ের দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে। কাপার-নায়াম হইতে পথটি সহসা উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ হইয়া আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে মনোমদ দৃশ্যাবলী প্রকটিত করিল।



সিরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ সহর ও অন্যতম প্রাচীন রাজধানী আলেপ্পো। (সম্মুখে নগর, পশ্চাতে দুর্গ)

আমরা দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিয়া হ্রদের যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সুদক্ষ শিল্পীর অঙ্কিত আলেখ্যের মত চিত্তাকর্ষক। অবশেষে একটি গহ্বরবৎ স্থানে উপস্থিত হইলে যে দৃশ্য প্রকাশিত হইল, তাহার সৌন্দর্য্য আমাদিগকে অভিভূত করিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উত্তরে হার্ম্মণ প্রভৃতি তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতপুঞ্জ দিগন্ত-দেহে নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়া গাম্ভীর্য্যভরা সৌন্দর্য্যের দ্বারা আমাদের অন্তরকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমাদের বামে লেবানন ও আণ্টিলেবানন শৈলমালার তুষার-শুভ্র শরীরে প্রভাতের সৌরকর-সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল বুনিতেছিল বলিলে ভুল বলা হয় না। বহুদূর ব্যাপিয়া বিরাজিত সমুজ্জ্বল শুভ্র শোভায় সমৃদ্ধ সেই শৈলমালাকে রজত রচিত প্রাকার বা কোন দিব্য দেশের দ্বার বলিয়া মনে হইতেছিল। আমাদের সম্মুখে হুলা (অপর নাম মারা) নামক ক্ষুদ্র হ্রদ সূর্য্যকিরণ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হাসিতেছিল।

হুলা হ্রদকে জর্দ্দন-উপত্যকার একান্ত উত্তর প্রান্ত বলা চলে। ইহাকে আফ্রিকার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ও প্রকাণ্ড রিফ্‌ট উপত্যকার উত্তর সীমান্তও বলা চলে। আমরা পূর্ব্ব আফ্রিকায় অবস্থানকালে এই উপত্যকার প্রধান অংশ দর্শন করিয়াছিলাম। এই উপত্যকাকে পৃথিবীর প্রকাণ্ডতম ফাটল বলিলে অন্যায় হয় না। ইহা আফ্রিকার টানগানিকা ও কেনিয়া হইতে আরম্ভ হইয়া আবিসিনিয়ার অংশবিশেষের উপর দিয়া জর্দ্দন উপত্যকা ভেদ করিয়া তাওরাস পর্ব্বতমালার উপর দিয়া কৃষ্ণ সাগর অতিক্রম করিয়া আগাইয়া গিয়াছে।

আমরা জর্দ্দন-উপত্যকায় অবতরণ পূর্ব্বক ঐ নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী বৃটিশ পোষ্টে আমাদের পাস পোর্ট দেখাইলাম এবং পবিত্র জর্দ্দন নদ সেতুর সহায়তায় পার হইয়া অপর তীরে গমন করিলাম। জর্দ্দনের কর্দ্দমাক্ত জল দুর্দ্দম বেগে বহিয়া যাইতেছিল।

এইবার আমরা প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিরিয়ায় পদার্পণ করিলাম। ফরাসী পোষ্টের কর্ম্মচারীরা আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করিলেন। আগাইয়া যাইয়া আমরা ক্রমশঃ হার্ম্মণ পর্ব্বতের পূর্ব্বে প্রসারিত একটি মালভূমিতে উপনীত হইলাম। বিভিন্ন-বর্ণ-বিশিষ্ট নয়ন-রঞ্জন আরণ্য

পুষ্প-পুঞ্জ আর আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। প্রায় বিশ কি পঁচিশ মাইল একটী তুষার-শুভ্র অম্বর-চুম্বী গিরি-শৃঙ্গের গম্ভীর মূর্ত্তি বামে বিরাজিত রহিয়া আমাদের অন্তর-তন্ত্রীকে এক প্রকার গভীর স্বরে ঝঙ্কৃত করিতে লাগিল। অবশেষে দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর-বক্ষে দণ্ডায়মান দামাস্কাস নগর নেত্রপথে পতিত হইল নগরের চারিদিকে নদ-নদী ধারাভিষিক্ত মনোমদ উদ্যানাবলী ও বনরাজি বিরাজিত বলিয়া উহাকে মায়াপুরীর মত মনে হইতেছিল।

আমরা নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক একটি হোটেলে বিশ্রাম করিয়া পরিদর্শনে বাহির হইলাম। কলিকাতার হ্যারিসন রোডের মত "ষ্ট্রেট" বা ঋজু নামক একটী রাস্তা নগরের বুকের উপর দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহা প্রায় সোওয়া মাইল লম্বা। পূর্ব্ব তোরণে এই পথের পরিসমাপ্তি। পথের দুই ধারে বাড়ীর পর বাড়ী সারি সারি দাঁড়াইয়া। এ দেশে পূর্ব্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত ছাদ দৃষ্ট হইত। তুর্কীরা করোগেটেড লৌহের ছাদ প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

এই ষ্ট্রেট-নামক পথটির সহিত খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রথম প্রচারপ্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট করিবার বিচিত্র ব্যাপারের পুণ্যস্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। ঈশা প্রবর্ত্তক হইলেও, যাঁহাকে ক্রিশ্চিয়ান-চার্চ্চের রচয়িতা বা প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে, সেই প্রসিদ্ধনামা সেণ্ট পল এই পথে বাস করিতেন বলিয়া কথিত। পল প্রথমে ঈশা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ-বাদী ছিলেন, পরে উহার প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইয়া পড়েন। প্রচারকালে পলের কণ্ঠ হইতে যে উদ্দীপনাময়ী বহ্নিবৎ বাণী বিনির্গত হইত, তাহাকে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা ক্ষীণা নির্ঝরিণী ছিল, পলের প্রাণপণ প্রচার তাহাকে কূল-প্লাবিনী প্রবলা প্রবাহিনীতে পরিণত করে। পল খৃষ্ট-ধর্ম্ম-সমর্থনে ওজস্বিনী বক্তৃতা এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম প্রদান করেন।

দামাস্কাস নগর প্রাচীনকাল হইতে পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া নানা প্রকার পণ্যের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। দামাস্কাসের ছোরা পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এক সময়ে এই ছোরাই ছিল দামাস্কাসের প্রধানতম পণ্য। বর্ত্তমানে রেশম ও কার্পাস প্রস্তুত নানা প্রকার পণ্যই প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। দামাস্কাসের চামড়ার জিনিষের চাহিদাও এ অঞ্চলে প্রবল এবং উহা বিদেশেও চালান যায়। এখানকার অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্য সাবান। খাবারের দোকানগুলিতে নানা প্রকার রুটি ও পিষ্টক সজ্জিত দেখিলাম। মোটের উপর,

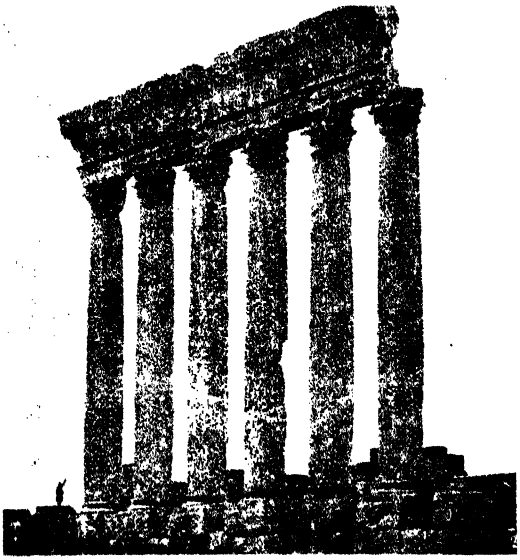


ব্যাক্কাস মন্দিরের তোরণ—এক্রপোলস

দামাস্কাসের বিস্তৃত বাজার দর্শনের যোগ্য বটে! নিজ নিজ পণ্যের গুণ-গীতি গাহিয়া ফেরি-ওয়ালারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দামাস্কাসের পান্থ-নিবাস বা কারাভান-সরাইগুলি দেখিবার যোগ্য জিনিষ। পারস্য প্রভৃতি এশিয়ার পশ্চিমাংশের প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক পল্লীতে ও সহরে কারাভান-সরাই দেখা যায়। এই সকল দেশ সাধারণতঃ

মরু-প্রধান ও পর্ব্বতাবৃত বলিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইলে মনুষ্য ও পশু উভয়ের পক্ষেই এইরূপ বিশ্রামাবাস একান্ত প্রয়োজন। যতদিন রেল-পথের বিশেষ বিস্তার না ঘটিবে, ততদিন এই বিশ্রামগৃহগুলির কার্য্যকারিতা কমিবে না। যাঁহারা ভারতের পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তী পেশওয়ারের সহিত পরিচিত তাঁহারা কারাভান সরাই ভারতবর্ষের বক্ষেই দেখিয়া থাকিবেন। অনেক বিষয় ভারতের পশ্চিম-দ্বার স্বরূপ পেশওয়ারের সহিত পশ্চিম-এশিয়ার সহর-সমূহের সাদৃশ্য বিদ্যমান।



জুপিটর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের অংশবিশেষ বায়ালবেক

আমরা দামাস্কাসের সর্ব্বপ্রধান কারাভান-সরাইটি দেখিতে গমন করিলাম। চতুষ্ক প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ মর্ম্মর-প্রস্তর-প্রস্তুত স্তম্ভশ্রেণী অবলম্বন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল এই ছায়া-শীতল প্রকোষ্ঠগুলি কত পরিশ্রান্ত পান্থকে শান্তি দিয়াছে—কত দূর ও দুর্গমের যাত্রী এখানে রাত্রি যাপন করিয়াছে!

ইস্‌লামীয় উপাসনা-গৃহগুলি দামাস্কাসের অন্যতম প্রধান দর্শনীয়। প্রায় দুইশত উপাসনা-গৃহ এই নগরে বিদ্যমান। সন্ধ্যায় অন্ধকার নামিয়া আসাতে আমরা সেই সকল দর্শনীয় পরদিন দেখিব বলিয়া মনঃস্থ করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

এইখানে দামাস্কাসের ইতিহাস একটু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দামাস্কাস অতি প্রাচীন স্থান, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এই স্থানের ভৌগোলিক পরিস্থিতির উপযুক্ততা উপলব্ধি করা যায়। প্রাচীন কাল হইতে এই নগরের ভিতর দিয়া পারস্য এবং পূর্ব্বে অবস্থিত অন্যান্য দেশে বাণিজ্যাভিযানগুলি যাইত। প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে দামাস্কাস কিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহা আমরা না জানিলেও, ইহা যে ইহুদী-অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে সংশয় নাই। যখন ইশ্রায়েলের সিংহাসনে রাজা সলোমন অধিষ্ঠিত, তখন দামাস্কাস একটি সমৃদ্ধিশালী স্বতন্ত্র রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। কখন কখন উভয় রাজ্য মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইত, আবার সময়ে সময়ে তাহারা পরস্পর প্রতিকূল বা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িত। একবার দামাস্কাসপতি হাজায়েল ইশ্রায়েল আক্রমণ করিয়াছিলেন। অন্য সময়ে দামাস্কাস ও ইশ্রায়েল উভয়ে মিলিত হইয়া জুদিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। অবশেষে যুদিয়ার রাজা আহাজ উভয়কে দমন করিবার জন্য আসীরিয়ানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি। সে সময়ে সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে সামরিক শক্তি-সামর্থ্যে আসীরিয়ার ন্যায় পরাক্রান্ত আর কেহই ছিল না। শুধু পশ্চিম এশিয়াই বা বলি কেন, এক সময়ে সমগ্র প্রাচীর মধ্যে আসীরিয়া সর্ব্বাধিক প্রভাবশালী হইয়া পড়িয়াছিল।

ইশ্রায়েল, দামাস্কাস ও জুদিয়া - এই তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ রহিলে প্রবল পরাক্রান্ত আসীরিয়া তাহাদের স্বতন্ত্রতা হরণ করিতে পারিত না, কিন্তু তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য আসীরিয়ার পক্ষে তাহাদিগকে জয় করা সহজ ব্যাপার হইয়া পড়িল।

ইহার পর দামাস্কাসে ক্রমশঃ পারসিক ও গ্রীক প্রভাব প্রসারিত হইল। ইহা বহুদিন ধরিয়া দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার-গঠিত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অবশেষে ইহা বিজয়ী রোমানদিগের উপনিবেশ-বিশেষে পরিণতি পায়।

ক্রিশ্চিয়ান চার্চ্চের প্রবর্ত্তন-যুগ বা সূচনা সময়ের ইতিহাসের সহিত এই সহরের সম্বন্ধের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ইস্‌লামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি-কেন্দ্র হইলেও, খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

যাহা হউক, ইস্‌লামের অভ্যুদয়ের সহিত দামাস্কাসের সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অবশেষে ইহা উন্নতির ঊর্দ্ধতম শিখরে আরোহণ করে। মরুময় আরবের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে বিরাজিত বলিয়া ইস্‌লামপ্রসূতি ঐ দেশের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ক্রমশঃ দামাস্কাসে বিজয়ী আরব জাতির প্রভাব প্রসারিত হইতে আরম্ভ করে। বিশ্ব-বিখ্যাত বীজানটাইনযুগে এই আরবীয় প্রভাব প্রবল হইয়া পড়িলেও, কার্য্যতঃ ইহা তখনও পর্য্যন্ত আরবদের শাসনাধীন হয় নাই। ইহা ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর আরবদের অধীন হয় এবং ওমরাইদদের শাসন-সময়ে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সর্ব্বজনমনোরম হইয়া পড়ে।

আব্বা সাইদরা রাজধানীকে দামাস্কাস হইতে বাগদাদ নগরে স্থানান্তরিত করেন। পরে ফাতিমাইট সম্প্রদায়ের শাসন-সময়ে মিশরের তুলনাইদরা দামাস্কাস আক্রমণ করিলে, শক্তিশূন্য শাসকগণ উহা রক্ষা করিতে অক্ষম হন। ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা সেলজুকদের হস্তগত হয়। ইহা কিছুদিন ক্রুজেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত সালাদিনের রাজধানী ছিল। এই নগর আক্রমণ করিবার জন্য ক্রুজেডার বা ধর্ম্মযোদ্ধগণ বার বার চেষ্টা করেন। অল্পকাল মিশরের মামলিউকগণের শাসনাধীন রহিলে, দামাস্কাস পরিশেষে দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। রাজধানী সমরকন্দ নগরকে সুন্দরতর করিবার জন্য তৈমুরলঙ্গ দামাস্কাস হইতে বহু সাজ-সজ্জা লইয়া যান বলিয়া আমরা জানিতে পারি। দামাস্কাসের সুবিখ্যাত অস্ত্র-শস্ত্রও তিনি সমরকন্দে লইয়া গিয়াছিলেন।

কোন নগর সমরকন্দ হইতে সুন্দরতর হইবে ইহা তৈমুরলঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না। পারস্যের সুফি-কবি হাফেজের কণ্ঠে সিরাজের গুণগান শুনিয়া তিনি হাফেজকে সমরকন্দে আহ্বান করেন এবং তাঁহার পরম প্রিয় নগরের গৌরব-গীতি গাহিতে বলেন। হাফেজ তদুত্তরে সিরাজের প্রশংসায় পূর্ণ একটি কবিতা তৈমুরলঙ্গের নিকট পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, ঐ কবিতা পাইয়া তৈমুরলঙ্গ ক্রোধে আত্মহারা হন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে দামাস্কাসের বুকে তুরস্কের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা পরদিন দামাস্কাসের ইস্‌লামীয় উপাসনা-গৃহগুলি দর্শনের জন্য যাত্রা করিলাম। এই উপাসনাগার-গুলির মধ্যে "মস্ক" নামে অভিহিত বিশ্ববিখ্যাত মহান্ মস্‌জেদটিই প্রধান। ইহা ক্রিশ্চিয়ান চার্চ্চ হইতে মুসলমান মসজেদে রূপান্তরিত হইয়া ঘটনাস্রোতের বিচিত্র পরিণতির বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। এই মহান্ মস্‌জেদটি তিনটি মিনারেটের দ্বারা মণ্ডিত এবং



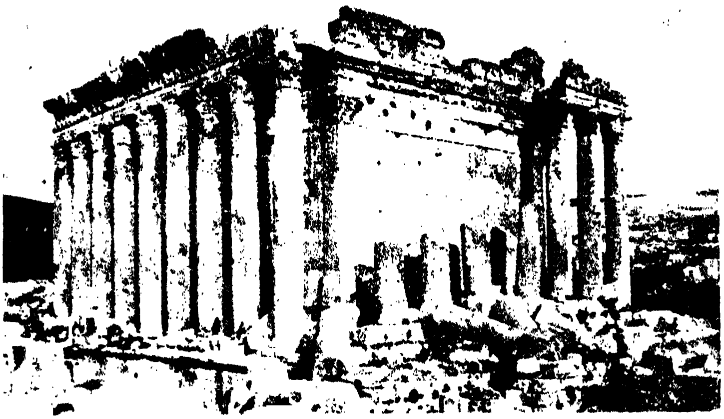
দুর্গ-দ্বার : আলেপ্পা (সিরিয়ান-স্থাপত্যের নিদর্শন)

সম-দ্বিভুজাকার প্রাঙ্গণবিশিষ্ট। মস্‌জেদের প্রধান অংশে সবুজ-গুম্বজ-ভূষিত একটি ক্ষুদ্র সমাধি-মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানে খৃষ্ট-ধর্ম্মের অগ্রদূত বিশ্ব-বিখ্যাত জন দি ব্যাপটিষ্টের মস্তক সমাহিত রহিয়াছে বলিয়া কথিত। মস্‌জেদের উত্তরস্থ প্রাঙ্গণে সুপ্রসিদ্ধ সালাদিনের সমাধি।

আমরা এল আজাম নামক প্রাসাদ দর্শন করিলাম। ফরাসীরা ইহাকে যাদুঘরে পরিণত করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত "ডুরুস" বিদ্রোহের সময়ে অগ্নির দ্বারা এই প্রাসাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। দামাস্কাসের দুর্গটি নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তখন ফরাসী সৈন্যগণের দ্বারা দুর্গটি অধিকৃত ছিল। দুর্গ-প্রাকার হইতে উদ্যানাবলী

বেষ্টিত দামাস্কাসের দৃশ্য বিশেষ মনোমদ। ইহার পর আমরা এল ময়দান নামক উপকণ্ঠ দর্শন করিলাম। ড্রুস বিদ্রোহের সময়ে ফরাসী আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা এই উপকণ্ঠের অনেক অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সেই দিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমরা বাজার পরিদর্শন করিলাম। বাজার দেখিলেই বুঝা যায়—দামাস্কাসের সে সমৃদ্ধি আর নাই। বৈচিত্র্যে বাগদাদের বাজার আরও চিত্তাকর্ষক। আমাদের মনে হয়, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের প্রধান শহর পেশওয়ারও ইহা অপেক্ষা বহুগুণ বৈচিত্র্য-বহুল।



ব্যাক্‌কাস-মন্দিরের বহিরংশ

বাজার-পরিদর্শনের পর আমরা শহরের পার্শ্ববর্ত্তী শৈল-শীর্ষে অবস্থিত সেই স্থানটি দেখিলাম, যাহা "সপ্ত সুপ্তি-মগ্ন ভ্রাতার সমাধি" আখ্যায় অভিহিত। শৈল-শীর্ষ হইতে দামাস্কাসের দৃশ্য একান্ত মনোমুগ্ধকর। দিনের আলো দিগন্ত-কোলে বিলীন হইয়া আসিতেছিল। দিনান্তের শান্ত-শীতল মায়াময়ী ছায়া নামিয়া আসিয়া শ্যাম-সুন্দর উপবনাবলীর বুকে স্বপ্নজাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রিচার্ড বার্টন এই শৈলশীর্ষ হইতে স্বপ্নপুরী-সদৃশ দামাস্কাস দর্শন করিয়া এত দূর মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ রোমান্স বা রূপ-কথার রাজা আরব্যরজনীকে ইংরেজীতে অনুবাদ করিবার সঙ্কল্প বা পরিকল্পনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন সন্ধ্যার তন্দ্রালস অন্ধকার সত্য সত্যই শহরটিকে স্বপ্নপুরীতে পরিণত করিয়াছিল।

পূর্ব্ব হইতেই বায়াল বেকের বিশ্ববিখ্যাত ধ্বংসাবশেষ-দর্শনের সঙ্কল্প আমাদিগের ছিল। আমরা দামাস্কাস হইতে রেলপথে যাত্রা করিলাম। রেয়াক নামক একটি ক্ষুদ্র জংশনে আমাদিগকে গাড়ী বদল করিতে হইল। আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না। আমরা যখন বায়ালবেকে পৌঁছিলাম, তখন বেগবান্ বাতাস বিরহ-বিহ্বল দৈত্য-দলের দীর্ঘশ্বাসের মত বহিতেছিল।

বায়ালবেকের বক্ষে বিরাজমান এক্রপলিসের ধ্বংসাবশেষ বিশ্বের বিস্ময়কর দর্শনীয়-সমূহের অন্যতম। প্রাচীন সভ্যতায় প্রাচীন দেববাদের বিচিত্র অভিব্যক্তি বা নিদর্শন ইহারা। অতীতের যে সকল নিদর্শনের জন্য বিশ্ব-বাসীর বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি মিশরের দিকে নিবদ্ধ—ইহাদিগকে তাহাদিগের সহিত তুলনা করা চলে। কবে এই নগর প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে আসীরিয়া যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ়, তখনও এই নগর বিদ্যমান ছিল, সন্দেহ নাই। বায়ালবেক নাম প্রাচীন পশ্চিম এসিয়ার প্রধান দেবতা বায়ালদেবের সহিত সম্পর্কের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

পরম রমণীয় প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক এক্রপলিসের ভগ্নাবশেষগুলির বৈচিত্র্য ও চিত্তাকর্ষকতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ওরনটেস ও লিয়নটেস অভিষিক্ত প্রদেশের উপর ইহা দাঁড়াইয়াছে। কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলে যে মহান্ দৃশ্য পুরোভাগে প্রকাশিত হয়, এক্রপলিসের জুপিটর মন্দিরের সোপানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখবর্ত্তী উপত্যকার দিকে চাহিলে অনেকটা সেই প্রকার দৃশ্য দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধের মত করিয়া তুলে। দূরে—দিগন্ত-ক্রোড়ে শুভ্র-তুষারমণ্ডিত মূর্ত্তি অভ্র-ভেদী শীর্ষশালী হার্ম্মণ নীরবে দণ্ডায়মান।

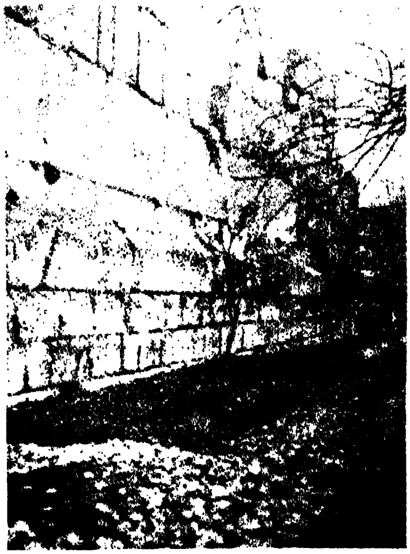
বায়ালবেকের জুপিটরের মন্দির পৃথিবীর প্রকাণ্ডতম মন্দিরসমূহের অন্যতম। প্রথমে এই স্থানে বায়ালদেবের মন্দির স্থাপিত ছিল। পরে গ্রীকগণ ঐ মন্দিরকে সূর্য্য-মন্দিরে পরিণত করিয়া সমগ্র নগরটিকে হেলিওপলিস নামে অভিহিত করে। এই নামটি অনেকের মনে মিশরের হেলিওপলিসের স্মৃতি উদ্রিক্ত করিতে পারে। ঐ নগরও



দামাস্কাসের "মহান্ মস্জেদ" (অভ্যন্তরভাগ)

মিশরীয় সূর্য্যবাদের কেন্দ্রস্থলী ছিল এবং নামটি গ্রীকদেরই দেওয়া। পরে বিজয়ী রোমানগণ সিরিয়ার বুকে সাম্রাজ্য ও শাসনবিস্তারের সময়ে মিশরীয় স্থাপত্যের অনুকরণে এই জুপিটর-মন্দির নির্ম্মাণ করে। সিরিয়ার বক্ষে রোমান দেব-বাদ প্রচারের কামনাও তাহাদিগের ছিল।

এই মহামন্দির নির্ম্মাণ করিতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল বলিয়া কথিত। ১ লক্ষ ৫০ হাজার ক্রীতদাস এই নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এই সকল ক্রীতদাসের অধিকাংশই ইহুদী ও সিরিয়াবাসী ছিল। এই মন্দিরের বাহিরের প্রাচীর প্রস্তুত করিতে যে সকল প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করা হইয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ বলেন, সেরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড আর কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। এক মাইল দূরবর্ত্তী একটি প্রস্তরাকর হইতে উহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। প্রস্তরগুলির মধ্যে যাহারা বৃহত্তম, তাহাদিগের আকার দৈর্ঘ্যে ৬৩ ফীট, উচ্চতায় ১৩ ফীট, ঘনত্বে ১১ ফীট এবং ওজনে প্রায় ১ হাজার টন। তিনটি প্রকাণ্ডতম প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া এই মন্দির "ত্রি-লিথন" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। যে আকর হইতে এই প্রস্তরগুলি আনীত হইয়াছিল, তথায় "হাজার-এল-হুবলা" অর্থাৎ গর্ভবতী নারীর প্রস্তর নামক শিলাখণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহা আকারে বৃহত্তর। এই প্রস্তরখানি ৭০ ফীট দীর্ঘ, ১৪ ফীট এবং ১৩ ফীট প্রশস্ত। ওজনে ইহা হাজার টনের অধিক। কেমন করিয়া এই সকল শিলাখণ্ডকে গিরিগাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা হইয়াছে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। আমাদিগের মনে হয়, রোমানগণ প্রাচীন মিশরের আসুয়ান নামক স্থানে অবস্থিত প্রসিদ্ধ প্রস্তরাকর দর্শন করিয়াছিল। মিশরীয়দিগের পাথর কাটিবার প্রণালীও তাহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকিবে।



জুপিটর মন্দিরের বহিঃ-প্রাচীর

আধুনিক সহরের অব্যবহিত বাহিরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে এক্রপলিসের যে দৃশ্য নেত্র-পথে পতিত হয়, তাহা অতিশয় মনোমদ। রোমসম্রাট এণ্টোনিয়স পাইয়াস এক্রপলিসে মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন; সুবিখ্যাত সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনের সময়ে ইহা সমাপ্তি লাভ করে। গ্রীক প্রমোদ-দেবতা ব্যাক্কাসের মন্দির খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে

এ্টোনিয়সের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের সম্পূর্ণতা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া জানা যায়। যাহা হউক, এই মন্দিরের শিল্পসৌন্দর্য্যমণ্ডিত সুবিশাল স্তম্ভশ্রেণী ও তোরণাদির গাম্ভীর্য্য ও মনের উপর প্রভাব প্রসারিত করে। কালস্রোতঃ বিরাট্ জুপিটর-মন্দিরের উপর ধ্বংসকর প্রভাব যতখানি প্রসারিত করিয়াছে, ব্যাক্কাস-মন্দিরের উপর ততখানি পারে নাই বলিয়া ইহার কোন কোন অংশ অবিকৃত রহিয়াছে।

রোমানদিগের রচিত এই সকল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে আরব ও তুর্কীদিগের দম্ভ-সম্পর্কীয় ও সামরিক সৌধসমূহের ভগ্নাবশেষ বিরাজিত। সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনের সময়ে রোম খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সিরীয়, গ্রীক ও রোমান দেব-বাদের লীলাস্থলী বায়ালবেকের বক্ষে মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্য সহসা স্থগিত হয়, সন্দেহ নাই। বার বার সঙ্ঘটিত ভূ-কম্পনের দ্বারা এই সকল প্রাচীন মন্দিরের বহু অংশ ধ্বংস পাইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে আরবরা এক্রপলিসকে দুর্গে পরিণত করে। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে হুলাগু খাঁ ইহা অধিকার করিয়া চারিদিকে নৃশংস ধ্বংস-ধারা বহাইয়া দেয়। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি তৈমুরলঙ্গের দ্বারা সেটুকু বিনষ্ট হয়।

প্রতিবিম্ব

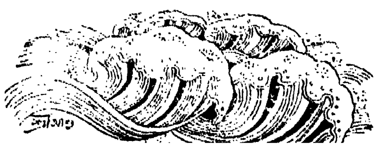
শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার

ভোরে উঠি' সাধু এক নদীর ওপারে
প্রতিদিন এসে' তার প্রাতঃস্নান সারে।
সিঁধ কেটে সারারাত গায়ে লাগে মাটি,
এ পারেতে করে' চোর স্নান পরিপাটী।
কেহ কারে নাহি চেনে, নিয়মিত দেখা—
দুই পারে দুইজনে ভাবে একা একা।
চোর ভাবে "মোর চেয়ে ওটা বড় দাগী"—
সাধু ভাবে "উনি বড় কৃষ্ণ-অনুরাগী"।
নিজ নিজ রুচি ভেদে চড়াইয়া রং,
পরকলা এঁটে' দেখা মনের ধরম॥

পথ

শ্রীগঙ্গাধর রায়চৌধুরী এম, এ

মোহের পথ ছাড়হে ছাড়, ধ্যানের পথ ধর'না—
কমল-বন ঘিরবে কত রূপালি বন-ঝরণা।
মেঘের রথ কত না পাবে স্বরগ-লোক-গমনা—
স্বপন-রবি- কিরণ পাবে উজল-রাগ শোভনা।
মিলবে কত জ্যোছনা-নদী তারার ফুল কত না
চাঁদের তরী দেখ্‌বে কূলে কত না পথ-লগনা।
গাহিবে কত সোণালী পাখী মধুর-সুর-রচনা
মানসী-প্রিয়া রচিবে কত বিজলী-প্রীতি-ঝুলনা।
মিল্‌বে কত রূপের পরী কনক-সাজ-পরণা—
প্রণয়-নাটে ঝরাবে চির স্বপন-সুখ-ঝরণা।



গ্রামের বুকে

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

জীবন আমার তোমার বুকে
জুড়িয়ে যাক্,
মিশিয়ে থাক্,
হারিয়ে যাক্।
ওগো আমার পল্লীমাতা
তোমার মাটী, ধূলায়, ঘাসে
এ প্রাণ মম বিছিয়ে থাক্।

বিছিয়ে যাক্ সে উদার মাঠে,
এঁকে বেঁকে পথে ঘাটে,
অশথ্-ছায়ায়, নদীর বাঁকে
হারাক প্রাণ।

দুলুক্ দীঘির দোদুল জলে,
শালুক ফোটা পাত্ড়া-দলে,
ঘুঘুর ডাকে তন্দ্রাসুখে
মুহ্যমান।

বাঁশের বাহু যেথায় ধীরে
জড়ায় শীর্ণ তটিনীরে
সেইখানে যে টোলখাওয়া জল—
তাতেই পরাণ ঘুরতে থাক্।

বনের মাঝে কোন্ অজানা
ফুলের বাসে দিচ্ছে হানা,
সেই ফুলেরে খুঁজ্তে পরাণ
ঝোপে ঝাপে দেখ্তে থাক।

উঠুক্ কেঁপে ফিঙের হাঁকে,
থম্‌কে রহুক হুতোম-ডাকে,
গভীর রাতের ডাহুক-ডাকে
তরাস পাক্।

দিন-দুপুরে শেয়াল ঘোরে,
সাপ সে ঘুমোয় পথে প'ড়ে,
মহিষ রহে পুকুর-জলে
জাগিয়ে নাক।

সন্ধ্যাবেলা মউল-গাছে
সরব বাদুড় খাদ্য যাচে,
তীরের মত ধায় অজানা
পাখীর ঝাঁক।

ডাহুক ডাকে, শেয়াল হাঁকে,
জোনাক্ জলে ঝাঁকে ঝাঁকে,
কোটর ছেড়ে উড়্‌ল পেঁচা
ছড়িয়ে ডাক।

দীঘির জলে লক্ষ তারা
নাচ্ছে ঢেউএ শিশুর পারা,
গাছের ডালে ডালে আঁধার
জড়ায় পাক।

এই তো আমার গ্রাম-জননী—
লক্ষ্মীরূপে লাখ-বরণী,
শস্য দিয়ে পুষ্ছে জীবে
লাখ ও লাখ।

সাপ-নেউলে, ইঁদুর পেঁচায়,
প্রজাপতি-কেঁচোয় সেথায়
পল্লীমাতার সমান স্নেহে
পাচ্ছে ভাগ।

হে জননি শান্তিময়ি,
বঙ্গমাতার মূর্ত্তি অয়ি,
হে কোমলা, হে শ্যামলা,
অন্নবতি!

দীঘির জলে হে সুজলা,
লক্ষ ফলে হে সুফলা,
মৃদুল হাওয়ায় হে শীতলা,
স্নিগ্ধা অতি!

যেথায় আমি থাকি না'ক,
নিত্য তুমি চিত্তে জাগ,
কর্ম্মে থাকি, দুঃখে থাকি
তোমায় স্মরি।

তোমার পথ ও নদী, কানন,
গাছের ছায়া, পাতার কাঁপন
জাগরণে, স্বপ্নে রহে
চিত্ত ভরি'।

আত্মপ্রেম

শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল

"আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"
"কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আত্মপ্রেম বা আত্মতৃপ্তি সকল সুখের মূল। আমি যে অবস্থায় আছি, তাহাই যদি আমার সুখের ও আত্ম-প্রবোধের আদর্শ হয়, তাহা হইলে তো দুঃখ স্পর্শই করিতে পারে না! যদি একটু ভাবিয়া দেখি,—যদি একটু বুঝিতে পারি—বৃহত্ত্বের ও ক্ষুদ্রত্বের সীমারেখায় যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি বৃহত্তম হইয়াও ক্ষুদ্রতম, আবার ক্ষুদ্রতম হইয়াও বৃহত্তম; যদি স্বরূপ বুঝিতে পারি, যদি আত্মপ্রীতির উদয় হয়, তাহা হইলে ক্ষোভের বা দুঃখের কোনও কারণ থাকে না। সেই জ্ঞানেই, সেই আত্মপ্রীতি-লাভেই তো সুখ! তাহাই তো সকল দুঃখের নিবৃত্তি! সেই লাভই তো মহৎ লাভ! তাহার নিকট অন্য লাভ তো তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর! গীতায় তাই ব্যক্ত হইয়াছে;—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

এখন জিজ্ঞাস্য—সেই আত্মপ্রেম কি? কিসে আত্ম-প্রেম লাভ হয়? আত্মপ্রেমের সেই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই সকল দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে। 'আত্ম' এবং 'প্রেম'—এই দুইটীর যথার্থ জ্ঞান লাভ করিলে আত্মপ্রেম লাভ হয়। প্রথমতঃ 'আত্ম' ও 'প্রেম' পদদ্বয়ের তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যাউক। প্রেম বা ভালবাসা জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা—মানুষের যেমন স্বভাবসিদ্ধ নিত্য সহচর; প্রেম বা ভালবাসাও তদ্রূপ। মানুষের জ্ঞান-প্রেম, ধন-প্রেম, মনোপ্রেম, শক্তি-প্রেম, জীবন-প্রেম—যেন প্রেমের এক অনন্ত প্রবাহ প্রবাহিত। আত্মপ্রেমও মানুষের নিত্য সহচর। অনাদি অনন্ত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ভগবান, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—সকলেরই মূলে সেই বিরাট্ আত্মপ্রেম। সেই প্রেমই আনন্দ। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তাই তত্ত্বদর্শী ঋষি বলিয়াছেন,—

"স তপস্তপ্ত্বা আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যাভিসংবিশন্তীতি॥"

ফলতঃ, আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি, আনন্দেই তাহার স্থিতি, আবার আনন্দেই তাহার লয় বা চরম পরিণতি। সাধারণ-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, আনন্দের ক্রোড়ে জন্ম; তাই জন্মকালে আনন্দের হাট বসিয়া যায়। আনন্দের শীতল ছায়ায় বসিয়া জীবন অতিবাহিত হয়; তাই নিত্য-পূজা-পার্ব্বণে আনন্দের কল-কোলাহল উঠে; তাই পুত্রকন্যাদির বিবাহেও উপনয়নোৎসবে কলকণ্ঠে আনন্দের লহরী ছুটে। আবার যখন অনন্তের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি, তখনও আনন্দময়ী সুষুপ্তিতে আনন্দ-সাগরে সদা ভাসমান হই,—নিত্যানন্দের আনন্দঘন চরণ-সরোজে নিত্যানন্দ-মধুপানে নিরত থাকি। ফলতঃ, অজাতপক্ষ মধুপশিশুর ন্যায় জীব অনাদি অনন্ত কাল সেই আনন্দ-হ্রদে নিমজ্জমান রহিয়াছে। এ আনন্দে—এ প্রেমে, যেন তাহার জন্মগত নিত্য অধিকার।

প্রেমই সংসারে মানুষকে মমতার বন্ধনে আবদ্ধ করে; প্রেমই সংসার-বন্ধনের সূত্রপাত করিয়া দেয়। এক হিসাবে প্রেম ও ভালবাসা অভিন্ন। সংসারে যাহাকে ভালবাসি না, তাহার প্রতি মমতা জন্মে না; আবার যাহাকে যতটুকু ভালবাসি, তাহার প্রতি ততটুকু মমতা জন্মে। মনীষিগণ তাই বলিয়া থাকেন,—"আত্মাধ্যাসতার-তম্যেন প্রেমতারতম্যং।" ফলতঃ, আত্মপ্রেম বা ভালবাসার প্রবৃত্তি মানুষের অনন্তকালসঞ্চিত অপার্থিব রত্ন। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিয়ত দুঃখদারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, অভাব-অনটনের শত-বৃশ্চিক-দংশনে জর্জ্জরিত, অদৃষ্ট-নিগৃহীত অভাগা ব্যক্তিও আত্মপ্রেমের

বিমল জ্যোতিঃ লাভে সকল জ্বালাযন্ত্রণার অবসান করিতে অভিলাষী হয়। মহামতি ব্যাসদেব তাই বলিয়াছেন,—"সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিয়ং আত্মাশীনিত্যা ভবতি মানভুবং ভূয়াসমেবেতি।" অর্থাৎ—প্রাণি মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রার্থনা, তাহার যেন ধ্বংস না হয়, সে যেন চিরঞ্জীবী হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এতদনুসরণে সিদ্ধান্ত করেন—"সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ। (সর্ব্বো হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি। ন নাহমস্মিতি। যদিহি নাত্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধি স্যাৎ) সর্ব্বলোকানামহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। আত্মা চ ব্রহ্ম।"

ব্রহ্ম আত্মারূপে সর্ব্ব জীবে বিরাজিত। 'আমি আছি'—সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। 'আমি নাই'—এরূপ কোথাও শ্রুত হয় না। 'আমি' যদি না থাকিত, আত্মার সত্তা উপলব্ধ হইত না। আবার আত্মা না থাকিলে, 'আমি'র অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইত। এক কথায়—এই আত্মাই ব্রহ্ম। ফলতঃ, আমি যাহাকে 'আমি' বলি, তুমি যাহাকে 'তুমি' বল, সে যাহাকে 'সে' বলে, সেই 'আমি' সেই 'তুমি', সেই 'সে'—সকলই সেই এক আত্মা বা ব্রহ্ম পদার্থ। সুবর্ণবলয়াদি বিনষ্ট হইলে যেমন সুবর্ণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ, আমি, তুমি ও সে—বিনষ্ট হইলে, কেবলমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মাই বিদ্যমান থাকেন। সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন বলয়াদি বিভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হইলেও, সুবর্ণেই যেমন তাহাদের পরিণতি ঘটে; তেমনি বিভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হইলেও, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অনন্ত কোটী জীব এবং অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে সেই ব্রহ্মেই বা আত্মাতেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। সেই ব্রহ্মেই সারা বিশ্বের পরিণতি ঘটে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তিনি আত্মা বা ব্রহ্ম। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে,—সকলই যদি সেই ব্রহ্মের বা আত্মার অভিব্যক্তি, তাহা হইলে প্রলয়ে বা ধ্বংসে তাহাদের ঐকান্তিক ধ্বংস সাধিত হয় কি না। ব্রহ্ম বা আত্মা—অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। সুতরাং ব্রহ্মময় বলিয়া কাহারও ঐকান্তিক ধ্বংস সাধিত হয় না। "অধিষ্ঠানাবশেষ হি নাশঃ কল্পিতবস্তুনঃ।" অর্থাৎ, নাম-রূপ-যুক্ত বস্তুর উদাপানরূপে অবস্থিতির নাম ধ্বংস বা বিনাশ। বিষয়টী বিশদীকৃত করিতেছি। ব্যবহার বা প্রয়োজন-নির্ব্বাহের জন্য কৃত্রিম আকৃতি-বিশেষ প্রাপ্ত মৃৎপিণ্ড 'ঘট' বা 'কলস' নামে অভিহিত হয়। ঘট বা কলস বিনষ্ট হইলে নামরূপ-বিবর্জ্জিত মৃত্তিকাই অবশিষ্ট থাকে। মূল উপাদান মৃত্তিকার কোনও বিকার বা অপচয় ঘটে না। আকৃতি-বিশেষ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে এবং আকৃতি নষ্ট হইলে, যেমন মৃত্তিকা তেমনি মৃত্তিকাই অবশিষ্ট থাকে। সেইরূপ যতক্ষণ 'আমি' আছি, ততক্ষণ আমার বাহ্য জগতও আছে। যখন আমার 'আমিত্ব' চলিয়া যাইবে, তন্মুহূর্ত্তে জগতও চলিয়া যাইবে। তখন আমি জগন্ময় এবং জগৎ আমিময়। ফলতঃ, আত্মা বা ব্রহ্ম—জগতের অদ্বিতীয় অধিষ্ঠান। আমার পূর্ণ সত্তা, আমার নিখিল জ্ঞান এবং আমার যত-কিছু সুখ-শান্তি সকলই সেই আত্মাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত। যখন আমার এই আমিত্বটুকু নষ্ট হইবে, তখনই মোক্ষ অধিগত হইবে।

মানুষ যখন এই আত্মার সন্ধান পায়, যখন সে আত্মপ্রেমের রসাস্বাদে সমর্থ হয়, তখনই সে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তখনই তাহার স্বমুখে আত্ম-বিস্মৃতি জন্মে। কিন্তু যতক্ষণ তোমাতে অবিদ্যার লেশমাত্র থাকিবে, ততক্ষণ সে অধিকার জন্মিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত ছায়াকে কায়াভ্রমে, অনাত্মভূত সংসারবন্ধনমূল পুত্রকলত্রাদিকে আত্ম বা আমি বলিয়া বুঝিবে, ততদিন তাহাদের প্রতি তোমার যে অন্ধ মমতা, তাহাই তোমার আত্মপ্রেমের রত্নবেদী অধিকার করিয়া থাকিবে—তাহাই তোমার আত্মপ্রেম-লাভের পরিপন্থী হইবে। সুতরাং আত্মপ্রীতি লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানালোক সাহায্যে অবিদ্যা-তিমির চিরতরে নির্ব্বাসিত কর। অবিদ্যা-তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মানসবৃক্ষে আত্মপ্রেমরূপ সুপক্ব ফল পরিদৃষ্ট হইবে।

ভ্রমবশতঃ মানুষ আত্মার নানা স্বরূপ কল্পনা করিয়া লয়। ফলে, স্বরূপ জ্ঞান-লাভে নানা অন্তরায় ঘটে;—ঘোর অন্ধকারে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া মরে;—প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবিৎ বা আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে হইলে, আত্মবস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। যে জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আত্মপ্রেম বা আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল, সেই জ্ঞানই যথার্থ

জ্ঞান। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে 'আত্মা', 'আমি' বা 'ব্রহ্ম' বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা যথার্থ 'আত্মা' বা 'আমি' নহে। ভ্রমবুদ্ধি-বশে আমরা কখনও এই রক্তমাংসপিণ্ড জড়দেহকে, কখনও ইন্দ্রিয়সমূহকে, কখনও মনকে, কখনও প্রাণকে, কখনও বুদ্ধিকে আত্মারূপে কল্পনা করিয়া লই। কিন্তু উহার কোনটাই প্রকৃত 'আত্ম' বা 'আত্মা' পদবাচ্য নহে। উহাদের প্রত্যেকটাই বিকারাধীন। সুতরাং কোনটাই 'আত্মার' স্থান অধিকার করিতে পারে না। আত্মা নিত্য, শাশ্বত, চৈতন্য-স্বরূপ। উহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, উহার পরিবর্ত্তন নাই। আত্মা—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা
ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং ন হন্যতে
হন্যমানে শরীরে॥"

কিন্তু আমাদের এই দেহ বা শরীর ক্ষণবিধ্বংসী। সুতরাং জন্মজরামরণশীল এই দেহ, প্রতি পলে যাহার নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়াদিও আত্মা নহে। কারণ, ইন্দ্রিয়গণও সদা পরিবর্ত্তনশীল। বাল্য, যৌবন, কৈশোর, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রাবল্য ও শৈথিল্য ঘটিয়া থাকে। আবার বালক, বৃদ্ধ, যুবা ইহাদের ইন্দ্রিয়-শক্তির যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়। এদিকে আবার জীবিতকালের মধ্যেও মানুষের ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য বা ধ্বংস দেখিতে পাই। সুতরাং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণবিধ্বংসী ইন্দ্রিয় কখনও আত্মা হইতে পারে না। সূক্ষ্মালোচনায় প্রতীত হয়,—আত্মাই ইন্দ্রিয়সমূহের প্রেরক ও চালক, নিয়ন্তা ও কর্ত্তা। সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মত্বের আরোপ কদাচ সমীচীন নহে। মনও আত্মা নহে। কারণ, মনেরও নানা পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। "আত্মনো মনোজাতং ইতি তত্রৈব বিলীয়তে।" সুষুপ্তিতে মনের লয় এবং জাগ্রদবস্থায় মনের উৎপত্তি অনুভূত হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে, মানুষের মানসিক অবস্থান্তরের নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এদিকে আবার উন্মত্তের মন সম্পূর্ণ বিকৃতি-প্রাপ্ত। সুতরাং বিকৃতি-স্বভাব-সম্পন্ন, সদা পরিবর্ত্তনশীল, অবস্থান্তরের অধীন, উৎপত্তি-বিলয়ধর্ম্ম-সম্পন্ন মন কখনও চিন্ময়, অক্ষর, অব্যয় আত্মা পদবাচ্য হইতে পারে না।

প্রাণকেও আত্মার সহিত অভিন্ন বলা যায় না। প্রাণ চেতনাহীন। আমরা যখন নিদ্রিত হই, সেই সুষুপ্তি অবস্থায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইলেও, বাস্তব পক্ষে উহাতে চেতনার লেশ মাত্র থাকে না। তখন আন্তর বা বাহ্য কোনও পদার্থই সে জানিতে পারে না। জড় প্রাণ জড় দেহকে পরিচালিত করে সত্য; কিন্তু উহার পরিচালন-ক্রিয়া স্বাধীন নহে। পাখার সাহায্যে বায়ু-সঞ্চালনের ন্যায় প্রাণও অপর কোনও শক্তির সাহায্যে পরিচালিত হয়। দারুণ গ্রীষ্মে শীতলতা সম্পাদন করিবার জন্য আমি পাখার সাহায্যে বায়ুকে সঞ্চালিত করিলাম। বায়ু বেগবান্ হইল; শান্তিলাভ করিলাম। এস্থলে পাখা জড়—ক্রিয়াশক্তিহীন; সুতরাং স্বচেষ্টায় তাহার বায়ু-বিতাড়নের কোনই সামর্থ্য নাই। আমার অজড় আত্মার প্রেরণায় পাখা-শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া চেষ্টাযুক্তের ন্যায় কার্য্য করিতেছে মাত্র। প্রাণকেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। নচেৎ, সুষুপ্তি অবস্থায় চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া যখন সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, এমন কি এক পর্য্যঙ্ক-শায়িনী সহধর্ম্মিণীর অঙ্গাভরণ উন্মোচন করিয়া লয়, তখন প্রাণ তাহার কিছুই জানিতে পারে না কেন? এইরূপ বুদ্ধিও আত্মা পদবাচ্য নহে। কারণ, প্রাণের ন্যায় বুদ্ধিও সুষুপ্তিকালে নিষ্ক্রিয়। নিদ্রাবস্থায় বুদ্ধিতে কোনও ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। পরন্তু অবস্থা ভেদে, দেশকালপাত্র-ভেদে বুদ্ধিরও নানা অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি,—কেহই 'আত্মা' পদবাচ্য নহে; সকলেই আত্মার বিকাশ বা আভাস মাত্র।

এখানে এক সমস্যার প্রশ্ন উদয় হয়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধির কেহই যদি 'আত্মা' নহে, তাহা হইলে আত্মার স্বরূপ কি? আত্মা কাহাকে বলিব? শাস্ত্রকারগণ আত্মার স্বরূপ-নির্দ্দেশে বলিয়াছেন,—"নিরুপাধিকং প্রেমাস্পদত্বং খলু আত্মত্বং।" অর্থাৎ, অহৈতুকী এবং

নিঃস্বার্থ ভালবাসা যাঁহার প্রতি অর্পিত হয়, তিনিই আমার 'আত্মা' বা 'আমি'। ভালবাসিবার কোনও কারণ নাই, অথচ ভালবাসিতেছি। কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই, স্বার্থসিদ্ধির কোনই আশা রাখি না, অথচ ভালবাসিতেছি। এই ভালবাসার জন্যই আমরা অহর্নিশ ছুটাছুটি করিতেছি। এই ভালবাসাই—এই প্রেমই আত্মপ্রেমের বা আত্মপ্রীতির সোপান। বৃহদারণ্যকে মহামতি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন—"জাগতিক প্রেমের একমাত্র সম্মিলিত কেন্দ্র আত্মা; প্রেমসিক্ত বিশাল বিশ্ব কেবল আত্মপ্রেম অধিষ্ঠানেই প্রতিষ্ঠিত। মানবের হৃদয়-কন্দর-নিঃসৃত কোটিমুখী ভালবাসা বা প্রীতি-নির্ঝরিণী সেই অনন্ত প্রেম-সাগরের দিকেই উধাও হইয়া অবিরাম স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে।"

ফলতঃ, আলোক সাহায্যে আলোক-লাভের ন্যায়, প্রেমের সাহায্যে প্রেমময় আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রীতি বা ভালবাসা, সে কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য কামনাযুক্ত ভালবাসা। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথোপকথনে তাই প্রকাশ পাইয়াছে—

"সহোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ
প্রিয়ো ভবতি।…
ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু
কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"

অর্থাৎ—'অরে মৈত্রেয়ী! পত্নী পতির প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত পতিকে ভালবাসে না; কেবল আত্মার প্রয়োজনের (প্রীতি-সাধনের) নিমিত্তই পত্নী পতিকে ভালবাসিয়া থাকে। কাহারও প্রীতির নিমিত্ত কেহ কাহাকেও ভালবাসে না; সকলেই আত্মার বা নিজের প্রীতির জন্য সকলকে ভালবাসিয়া থাকে।'

এইরূপে বুঝিতে পারি—নিজের তৃপ্তির জন্যই, নিজের সুখের জন্যই আমরা অপরকে ভালবাসিয়া থাকি। তাই যেখানেই প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত দেখি, সেখানেই আত্মপ্রেম—আত্মতৃপ্তির আভাষ পাইয়া থাকি। শাস্ত্রেও তাই দেখিতে পাই,—

"শেষাঃ প্রাণাদি বিত্তান্তাঃ আসন্নাস্তরতমাতঃ।
প্রীতেস্তথা তারতম্যং তেষু সর্ব্বেষু বীক্ষতে॥
বিত্তাৎ পুত্রঃ প্রিয় পুত্রাৎ পিণ্ডঃ পিণ্ডাত্তথেন্দ্রিয়ঃ।
ইন্দ্রিয়াচ্চ প্রিয়ঃ প্রাণাঃ প্রাণাদাত্মা পরঃ প্রিয়ঃ॥"

—পঞ্চদশী।

অর্থাৎ,—প্রাণ প্রভৃতি অর্থ পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ যে যতটা আত্মার নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত, সে ততটা প্রিয়, ইহা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। বিত্ত পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, পুত্র অপেক্ষা স্বীয় শরীর প্রিয়, শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ প্রিয় এবং প্রাণ অপেক্ষা আত্মা পরম প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই আত্মপ্রেমের নিম্নরূপ বিবৃতি পরিদৃষ্ট হয়,—

"সর্ব্বেষামেব ভূতানাং নৃপস্বাত্মৈববল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তবল্লভঃ তয়ৈবহি॥"

সুতরাং আত্মসুখই সকলের অভিপ্রেত; নিজের সুখের জন্যই আমরা অপরকে ভালবাসিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন অপরকে ভালবাসিবার অন্য কোন হেতু নাই।

অতএব বুঝা যাইতেছে—আত্মাই জীবমাত্রের একমাত্র প্রিয় সামগ্রী—আত্ম-প্রীতি-সাধনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। বেদান্ত-দর্শনে এই আত্মার স্বরূপ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যত্র সেই আত্মা "স হি অনির্ব্বচনীয়-প্রেম-স্বরূপঃ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং যাহা সৎ, যাহা চিৎ, যাহা আনন্দ; যাহা 'তৎ', যাহা 'ত্বং', যাহা 'অসি'—তাহাই আত্মা বা ব্রহ্ম। যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর—তাহাই আত্মার বা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ স্বরূপ।

আত্মা—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। এই আত্মার সহিত প্রেমের সম্মিলনই আত্ম-প্রেম বা আত্ম-প্রীতি। এ প্রেম পার্থিব প্রেম নয়, এ প্রেম মানুষী প্রেম নয়; এ প্রেম আনন্দময়ের আনন্দরস-সাগরে ডুবিয়া থাকা। এ প্রেম—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ; এ প্রেম শারদ কৌমুদীর ন্যায় শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্ম্মল—ত্রিভুবনমনোহর। এ প্রেমের উদয়ে, চন্দ্রোদয়ে সাগরসলিলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সমগ্র আনন্দ-সিন্ধু উথলিত হইয়া উঠে। এ প্রেম অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়। শাস্ত্রকার এই প্রেমের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতম্ সত্যপি ধ্বংসকারণে।

যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমো পরিকীর্ত্তিত ॥"

অথাৎ—বিনাশ-হেতু বর্ত্তমানেও যাহা বিনাশরহিত এবং যাহা যুবক-যুবতীর হৃদয়ের অচ্ছেদ্য গ্রন্থি, তাহাই প্রেম। এ সংসারে যাহা কিছু সার-সামগ্রী, যাহা কিছু সুন্দর, তৎসমুদায় লইয়া কোনও শ্রেষ্ঠ শিল্পী যদি কোনও অভিনব সামগ্রীর সৃষ্টি করেন, তাহার যেমন নামরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় না, তাহা যেমন 'সুন্দর, অতি সুন্দর' আখ্যায় অভিহিত হওয়া ভিন্ন সর্ব্বোৎকর্ষ-খ্যাপনের অন্যবিধ উপায়-নির্দ্দেশ হয় না; প্রেম সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস তাই গাহিয়াছেন,—

"বিধি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল 'পি';
রসের সাগর মন্থন করিতে
তাহে উপজিল 'রী'।
পুনঃ যে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল 'তি';
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি!"

ফলতঃ, প্রেম স্বতঃসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ। প্রেম অমৃত। যুগান্তব্যাপী তপস্যা ব্যতিরেকে এ অমৃতের সুখাস্বাদ কখনও সম্ভবপর হয় না। তাই আমরা দেখিতে পাই, পাগল ভোলানাথের প্রেমকণালাভের নিমিত্ত ভবানী তপস্বিনী সাজিয়া, তপস্যাই যে প্রেমমন্দিরপ্রবেশের অদ্বিতীয় সোপান, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। প্রেম-মন্ত্রদ্রষ্টা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন তপস্বিগণও গাহিয়াছেন,—

"অমৃতং নামৃতং দেবাঃ নাময়াঃ কল্পনাশকাঃ।

অমৃতং তু পরং প্রেম প্রেমবানমরস্তথা।"

ভাব এই যে, পরপ্রেমই যথার্থ অমৃত; সেই অমৃত পান করিয়াই প্রেমিক সনাতন অমরত্ব লাভ করেন। সেই প্রেমের মহীয়সী মহিমার অবধি নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক সনাতন, নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি যে প্রেমামৃত-পানে অমর হইয়া আছেন, সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম। সেই প্রেমের মহিমাই ভারতের গগন পবনে, প্রতি অণু-পরমাণুতে প্রতিধ্বনিত রহিয়াছে।

শাণ্ডিল্য-সূত্রে প্রেমের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে মহর্ষি বলিয়াছেন,—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে", "তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ।" অর্থাৎ, ঈশ্বরে 'পরা' বা ঐকান্তিকী ভক্তির বা অনুরাগের নাম—প্রেম। পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ প্রেমকেই অমরত্ব-লাভের বীজ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। প্রেমের পাগল নারদ ঋষি 'ভক্তিসূত্রে" হৃদয়-বীণার সুমধুর ঝঙ্কার তুলিয়া তাই গাহিয়াছেন,—

"সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা; অমৃতস্বরূপা চ।

যল্লব্ধা পুমান সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।"

শ্রীভগবানে পরম প্রেম—ভক্তি; প্রেমভক্তি অমৃতস্বরূপ; ভগবানের লীলাবারিধি-মন্থনে প্রেমামৃতের উদ্ভব। প্রেমাধিকারী হইতে পারিলে, জীব সর্ব্বসিদ্ধ, নিত্যতৃপ্ত, অমর হয়। শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥"

অর্থাৎ,—হে অর্জ্জুন, যাহা লাভ করিলে জীবের সকল লাভেচ্ছার অবসান হয়, এবং যে প্রেমস্বরূপ আমাতে অবস্থিত জীব পার্থিব দুঃখ-দাবানলের অসহ্য তাপেও বিচলিত হয় না।

প্রেমের প্রভাবে জড় পদার্থও যে সজীবতা লাভ করে, ভক্ত কবি জয়দেব মধুর কণ্ঠে তাহা আমাদিগকে শুনাইয়া গিয়াছেন,—

"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপয়ানং।

রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥"

রাধা প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠার বিষয় বর্ণন করিয়া সখী কহিতেছেন—"তোমার প্রেমাভিলাষী বনমালী ধীরসমীরশীতল যমুনাতীরবর্ত্তী নিধুবনে অতি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে কালযাপন করিতেছেন। তিনি প্রতি পত্রের উল্লম্ফন শব্দে, প্রতি পত্রের বিচালন-ধ্বনিতে, তোমার আগমন-সম্ভাবনায় পদধ্বনি অনুমান করিয়া শয়ন রচনা করিতেছেন এবং চকিতনেত্রে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।" ফলতঃ, প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। মূক ব্যক্তির আস্বাদনের ন্যায় উহা বাক্যের অবিষয়। প্রেম কখনও কোনও পাত্র-বিশেষে স্বয়ং প্রকাশিত হয়। প্রেম গুণাতীত কামনার অগোচর; নিয়ত

বর্দ্ধনশীল প্রেমের প্রবাহ অপ্রতিহত, সূক্ষ্ম অনুভব-সাপেক্ষ। যাহার আত্মায় একবার এই প্রেম আবির্ভূত হয়, তিনি অনিমিষ নয়নে কেবল ইহাকেই দেখেন, ইহাকেই শুনেন এবং ইহারই অনুবর্ত্তী হয়েন। প্রেমের পাগল নারদ ঋষি তাই বলিয়াছেন,—

"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপং, মূকাস্বাদনবৎ,
প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে
গুণরহিতং, প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং
সূক্ষ্মতরমনুভবরূপং;
তৎপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি, তদেব
শৃণোতি তদেব চিন্তয়তি।"

অনেক সময়ে আমরা প্রেমের কদর্থ সূচনা করিয়া নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকি। 'প্রেম' বলিতে অনেকে 'ভালবাসা' অর্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু সে ভালবাসা লৌকিক ভালবাসা হইতে অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। সে ভালবাসা ভগবৎ-প্রীতি। সে ভালবাসা—আত্মদানের আকাঙ্খা। লৌকিক ভালবাসার মূল—অপবিত্র। সেইজন্য মহাজনগণ উহাকে কাম-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। কামের ফল বিষময়। কিন্তু যথার্থ ভালবাসার পরিণতি বড়ই মধুর—ভগবৎপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় সোপান। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' এই লৌকিক ও অলৌকিক ভালবাসার পরস্পর পার্থক্য-প্রদর্শনে প্রেমের স্বরূপ যে ভাবে পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন নিম্নে প্রকটিত করিতেছি; যথা,—

"আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

ফলতঃ, প্রেমই ভগবান, আবার ভগবানই প্রেম। আত্ম-প্রেম — ভগবৎপ্রেম বা ভগবৎপ্রীতি। অনন্ত ভক্তি-সহকারে তাঁহার প্রতি প্রীতিপরায়ণ হইলে, তাঁহাতে প্রেম সংস্থাপন করিতে পারিলে, জীবের সকল বন্ধন টুটিয়া যায়, সংসারে পুনঃ পুনঃ গতাগতি নিরোধ হয়।

আত্মপ্রেমে মোক্ষ লাভ হয়। সেই প্রেমের স্বরূপ বুঝিয়া, সচ্চিদানন্দময় প্রেমাম্বুধির অতলতলে নিমজ্জিত হও; পরমানন্দ-লাভে কৃতার্থ হইবে। যদি পরমার্থ-লাভে অভিলাষী হইয়া থাক; প্রেমস্বরূপে দেহমন উৎসর্গ কর। প্রেমভ্রমে কামের বশবর্ত্তী হইলে, ফল বিষময় হইবে। যে প্রেম জীবের জীবনসর্ব্বস্ব, যাহার বিহনে জীবের জীবনধারণ সম্ভব হয় না, সেই প্রেম-ভালবাসা প্রেমের প্রস্রবণ প্রেমময় আত্মাতে নিয়োজিত কর; চিদানন্দ লাভ করিতে পারিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সকলই সেই প্রেম। সংসারের যাবতীয় কাম্য বস্তু, সংসারের যাবতীয় ভোগ্য, সংসারের যাবতীয় পুরুষার্থ, সংসারের যাবতীয় ধর্ম্ম, সংসারের যাবতীয় মোক্ষ, সংসারের যাবতীয় পরমার্থ—সকলই সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের চিদানন্দময় প্রেম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সকলই সেই প্রেম, ঈশ্বর, জীব, জগৎ—সকলই সেই প্রেম। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন—সকলই সেই প্রেম। ফলতঃ, প্রেমই ভোক্তা, প্রেমই ভোগ্য, প্রেমই ভোজ্য; প্রেমই তৎ, প্রেমই ত্বং, প্রেমই অসি। আদি, অন্ত, মধ্য—সকলই প্রেমময়; জনন, জীবন, মরণ—সকলই সেই প্রেমের আনন্দময় ধারা। তাই যত কাল প্রেম বিদ্যমান আছে, তত কাল তোমার, আমার ও জগতের সত্তা। সেই আত্ম-প্রেমের মাহাত্ম্য-খ্যাপনে শ্রীভগবান তাই শিখাইয়াছেন,—"মামেকং শরণং ব্রজ।" আমি প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ; যদি মুক্তি চাও, একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর; একমাত্র আত্ম-প্রেমে—একমাত্র আমারই প্রেমে—বিভোর হইয়া যাও। আর সেই প্রেমানন্দ-পানে ভূমানন্দ-লাভে অমৃতের অধিকারী হইয়া আনন্দে গাইতে থাক—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

বিশ্বসিংহ

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টশালী

(তৃতীয় খণ্ড)

দশম অধ্যায়—নবীন সন্ন্যাসী

দুর্গোৎসব হিন্দু জাতির সর্ব্ব প্রধান পর্ব্ব। কামতাপুর হিন্দু রাজ্যের রাজধানী। তথায় দুর্গোৎসবে বিরাট্ ঘটা। এই উপলক্ষে সাধু সন্ন্যাসীর সমাবেশ ও মাসাধিক কাল-ব্যাপী বিরাট্ মেলা, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহালয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী নবমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া জগদ্ধাত্রী-পূজা পর্য্যন্ত মেলার অবস্থিতি-কাল। এই সময়ে দিক্-দিগন্ত হইতে, এমন কি হিমাদ্রির গর্ভাশ্রিত প্রদেশ হইতেও বহুতর সাধু-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। কাত্যায়ণী-মন্দিরের সান্নিধ্যে বিস্তৃত ময়দানে—মন্দিরসংলগ্ন উদ্যানে—মন্দিরপ্রাঙ্গণে ধুনী প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তাঁহারা আসন স্থাপন করেন এবং জগদ্ধাত্রীপূজা পর্য্যন্ত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে স্থানান্তরে গমন করেন। এই মেলার কাল ব্যতীতও সময়ে সময়ে যখন তখন ২।৪টী সাধু-সন্ন্যাসী মন্দিরপার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণে—বিল্ববৃক্ষতলে অবস্থান করিয়া থাকেন।

পীতাম্বরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর, একবার জগদ্ধাত্রী-পূজান্তে প্রায় সকল সাধু-সন্ন্যাসী প্রস্থান করিয়াছিলেন, কেবল তিনটী সাধুকে তথায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে দেখা গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দুইটী সন্ন্যাসী মন্দিরপার্শ্বস্থ বিল্ববৃক্ষমূলে এবং অপর নবাগত ও নবীন সন্ন্যাসীটী মন্দিরপ্রাঙ্গণে ছিলেন। ইনি আর কখনও এখানে আসেন নাই। তাঁহার ক্রিয়াকলাপেও কিছু নূতনত্ব দৃষ্টি হইতেছিল।

ঊর্ম্মিলা দেবী এখন প্রকৃত প্রস্তাবে কাত্যায়ণী মায়ের প্রধান সেবিকা। পূজারী বা অধ্যক্ষ সচ্চিদানন্দ ঠাকুর আর পুষ্প চয়ন করেন না, পূজোপকরণ-সংগ্রহ ও প্রস্তুত-করণ এবং ভোগের পাক প্রভৃতি পূজার সমস্ত আয়োজনই ঊর্ম্মিলা নিজে করিয়া থাকেন। কেবল পূজা ও চণ্ডীপাঠ সচ্চিদানন্দকে করিতে হয়। পূজার আয়োজন সুশৃঙ্খলার সহিত করিয়াও চণ্ডীপাঠকালে ঊর্ম্মিলা মায়ের নিকটে উপস্থিত থাকিতে ত্রুটি করিতেন না। তৎকালে তিনি প্রায় বাহ্যজ্ঞানরহিত ও মাতৃপ্রেমে আত্মহারা হইয়া তদ্গতচিত্তে অবস্থিতি করিতেন। সেই সময়ে আগন্তুক দর্শকবৃন্দ অথবা সাধু-সন্ন্যাসী যে কেহ মাতৃদর্শনাভিলাষে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা অষ্টধাতু নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কাত্যায়নী মূর্ত্তি দেখিবার পূর্ব্বে তৎসম্মুখস্থ নবযৌবনসম্পন্না অনুপম-রূপলাবণ্যবতী সজীব মাতৃমূর্ত্তি ঊর্ম্মিলাকে সম্মুখে দেখিয়া দেবীভ্রমে প্রথমতঃ তাঁহাকেই ভক্তি উপহার প্রদান করিতেন, তৎপরে ভ্রম সংশোধন করিতেন।

যে নবাগত নবীন সন্ন্যাসীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি দুর্গোৎসবের পূর্ব্বদিনে এখানে উপস্থিত হওয়ায়, স্থানাভাব-বশতঃই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক, কাত্যায়ণীমন্দিরের সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। মাতৃদর্শনাভিলাষে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনিও এইরূপ ভ্রমেই পতিত হইয়াছিলেন। ঊর্ম্মিলা কাত্যায়ণী মায়ের সম্মুখভাগে একপার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক অন্তর্নিবিষ্ট চিত্তে ও স্থির দৃষ্টিতে ঈষৎ বক্রভাবে জগজ্জননীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার মুখাকৃতির এক অংশ মন্দিরদ্বারস্থ দর্শকগণ দেখিতে পাইতেন। এই নবীন সন্ন্যাসীও সেইরূপ দেখিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার চিত্তও যেন একটু অবশ হইয়াছিল; তিনি মায়ের দিকে আর না চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক ক্ষণ ঊর্ম্মিলার বদন-সুধাই পান করিলেন; পরে ধীরে ধীরে যেন বিকলচিত্তে আপন আসনে গিয়া বসিলেন।

দুর্গোৎসবের দিবসত্রয় দিবা-নিশি রাগ-রাগিণী-সমন্বিত স্তব-স্তোত্রাদি মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থ মাতৃভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক পঠিত হইত। তাহা বড়ই শ্রুতিমধুর ও ভাবপ্রবণ। নিতান্ত

পাষণ্ড প্রকৃতির লোকের হৃদয়ও এই স্তোত্রাদিতে ক্ষণিকের জন্য ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত না হইয়া পারিত না।

আমাদের বর্ণিত নবীন সন্ন্যাসী যেমন সুকণ্ঠ, তেমন সঙ্গীতনিপুণ। ইনি যখন ভক্তিরসে আত্মহারা হইয়া মনের আবেগে হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিয়া সপ্তমে সুর উঠাইয়াছিলেন, তখন অধিকাংশ লোকের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সুমধুর ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর উর্ম্মিলার কর্ণেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তিনি পরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইয়া সবিস্ময়ে মুহূর্ত্তের জন্য মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং কটাক্ষে সেই গায়কের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ঠিক সেই সময়েই যেন কোন আকস্মিক কারণে অথবা কোন সম্মোহন আকর্ষণে গায়কের নিমীলিত নেত্রও সহসা উন্মীলিত হইল এবং কটাক্ষে কটাক্ষ সংযোগ হইয়া গেল। উর্ম্মিলা গায়ক সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই চিনিলেন।

জগদ্ধাত্রীপূজার পর সন্ন্যাসীদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের জনতা যেমন কমিয়া গেল, স্তব-স্তোত্রের ধ্বনিও তেমনি নীরব হইল। কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীর কাজ কিছু বাড়িয়া গেল। তিনি মাতৃপূজাকালে, সন্ধ্যারতির সময়ে মাতৃদর্শনাভিলাষী হইয়া অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন—পূজারতি শেষ হইলে, আবার আপন আসনে গিয়া বসিতেন। ইহাতে সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে বিশ্বজননীর পরম ভক্ত সন্তান বলিয়াই ধারণা করিত। তবে ইঁহার মনোমধ্যে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল কিনা কে বলিতে পারে?

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজমহিষী, রাজনন্দিনী ও অপর রাজপুরমহিলাগণ সান্ধ্যারতির সময়ে প্রায়শঃই মন্দিরে আসিতেন। একদিন আরতি-শেষে নবীন সন্ন্যাসী যখন মন্দিরদ্বার হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন সহসা করুণা সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইয়া ভক্তিভরে প্রণতি-পূর্ব্বক বিনম্র বচনে কহিলেন "প্রভু, অজ্ঞান সন্তানের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া অনুমতি প্রদান করিলে, দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি?"

সন্ন্যাসী সবিস্ময়ে করুণার মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বক্তব্য কি মা?"

করুণা। আপনার কণ্ঠ-নিঃসৃত অমৃতময় সঙ্গীত-শ্রবণে আমরা বঞ্চিত হইলাম কেন?

সন্ন্যাসী। মা, তুমি বালিকা; আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে এখন অসমর্থ। মন্দিরে যে দেবী রহিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি উত্তর দিবেন।

করুণা। আপনার এ উক্তির মর্ম্ম বুঝিলাম না। আপনি সাধক, সাধনার বলে বিশ্বজননীর সহিত আলাপ করিতে পারেন। আমার কোন্ সাধনার বলে তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন?

সন্ন্যাসী। বেশ, তুমি দেবীকে প্রশ্ন করিয়া দেখ; উত্তর না পাইলে, পরে আমাকে বলিও।

সন্ন্যাসী গমন করিলেন; করুণা যৎপরোনাস্তি বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিতে করিতে মনে মনে ভাবিলেন "সন্ন্যাসীর কথিত দেবী কে? উর্ম্মিলা দিদিই কি দেবী? তিনি বিশ্বমাতাকে মা না বলিয়া দেবী বলিলেন কেন? উর্ম্মিলা দেবী কি ইঁহার পরিচিত?" এইরূপ চিন্তা করিয়া—উর্ম্মিলাকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, তুমি এই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে চেন?"

উর্ম্মিলা। আজ তোমার এ প্রশ্ন কেন করুণা?

করুণা। অল্পক্ষণ হইল, আমি সন্ন্যাসীকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি উত্তরে বলিলেন, "মন্দিরে যে দেবী রহিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন"। এ দেবী কে? কাত্যায়ণী না তুমি?

উর্ম্মিলা মৃদু হাসিয়া কহিলেন "তোমার মনে কি হয়?"

করুণা। কাত্যায়ণীকে 'মা' না বলিয়া শুধু দেবী বলিবেন কেন? আর তুমি তো মন্দির ছাড়িয়া কোথাও যাও না, কাহারও সহিত আলাপ কর না; ইহার সহিত তোমার আলাপ না থাকিলে, ইনিই বা তোমাকে দেবী বলিবেন কেন? তা' ছাড়া তোমার নিকট হইতে উত্তর পাওয়ার আশ্বাস আমাকে দিবেন কেন?

উর্ম্মিলা পূর্ব্ববৎ মৃদু হাসিয়া কহিলেন "তোমার প্রশ্ন কি করুণা?"

করুণা। দেখ দিদি, ভগবদ্ভক্তের নিকট ভক্তি-মাখা সঙ্গীত শ্রবণ বড়ই মধুর। ইনি সেই সুধামাখা সঙ্গীত কেন করিতেছেন না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

উর্ম্মিলা। ইনি যে ভগবদ্ভক্ত, তাহার প্রমাণ?

করুণা। ভক্ত না হইলে, হৃদয়াভ্যন্তর হইতে ঐরূপ প্রাণমাতোয়ারা সঙ্গীতধ্বনি কখনও বাহির হইতে পারে না।

উর্ম্মিলা। জনতার ভিতর সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণের জন্য যিনি উচ্চকণ্ঠে সঙ্গীত করেন, আমি তাঁহাকে প্রকৃত ভক্ত বলিতে পারি না।

করুণা। তবে তুমি ইঁহাকে ভণ্ড বা ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বলিতে চাও?

উর্ম্মিলা। সেরূপ বলিলে, তোমার মনে বিশ্বাস হইবে কি?

করুণা। তুমি ইঁহাকে চেন?

উর্ম্মিলা। চিনি—খুব চিনি। ইনি গৌড়বাসী। ইনি যে ছদ্মবেশী গুপ্তচর নহেন, তাহার প্রমাণ কি?

করুণা। তাহা হইলে জানিয়া ও চিনিয়া তুমি অন্ততঃ ইঁহাকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে স্থান দিতে আপত্তি করিতে। ইনি ভক্ত না হইলে, সেই ভক্তিমাখা সঙ্গীতের সহিত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত না।

উর্ম্মিলা। ঐটাই তোমার বুঝিবার ভ্রম। প্রকৃত ছদ্মবেশীদের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহারা যদি ভণ্ডামী অথবা ছলনার প্রভাবে অসত্যকে সত্য বলিয়া বুঝাইতে না পারিবে, তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে কিরূপে? পরন্তু ধরা পড়িবে।

করুণা। ইনি যে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর নহেন, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা; যদি তাহা না হইলেন, তবে আর কোন ভণ্ডামী করিতে এখানে আসিবেন?

উর্ম্মিলা। ইঁহার সহিত ভালরূপ আলাপ করিয়া দেখ, তারপর বুঝিতে হয় বুঝিবে ইনি প্রকৃত সাধু, না ভণ্ড?

করুণা। ইঁহার সহিত তোমার আলাপ আছে?

উর্ম্মিলা। বেশ কথা বলিতেছ! ইনি আমার চেনা লোক, আর ইঁহার সহিত আলাপ নাই?

করুণা। এখানে আলাপ করিয়াছ?

উর্ম্মিলা। না, এখানে আলাপ করা হয় নাই!

করুণা। ইনি তোমাকে চিনিয়াছেন?

উর্ম্মিলা। না চিনিলে, ইনি এই মন্দির-প্রাঙ্গণে পড়িয়া থাকিবেন কেন? আর তোমাকেই বা প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য উপদেশ দিবেন কেন?

করুণা শিহরিয়া উঠিলেন, তিনি মনে মনে কি চিন্তা করিলেন; তৎপরে উর্ম্মিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি, ইনি তোমার কেহ হন কি?"

উর্ম্মিলা। এ জগতে আমার ঐ মা বই আর কেহ নাই।

করুণা এবার বেশ বুঝিলেন—এ সন্ন্যাসী কে। কিন্তু উর্ম্মিলার মনোভাবে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; তথাপি বলিলেন, "চল দিদি, সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত আলাপ করিয়া আসি।"

উর্ম্মিলা। হাঁ, আমারও উহাই ইচ্ছা; একবার আলাপ না করিয়া, ইনি এখান হইতে বিদায় হইবেন না।

করুণার করুণ হৃদয় উর্ম্মিলার কঠোরতায় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "কি সর্ব্বনেশে লোক! রমণীর হৃদয় এত কঠিন? ইনি যাঁর জন্য সর্ব্বত্যাগী—সন্ন্যাসী, তাঁর ব্যবহার এত কঠোর—একেবারে বিদায় করিতে চাহিতেছেন?" এই ভাবিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে উর্ম্মিলার মুখের দিকে চাহিলেন।

উর্ম্মিলা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছ?"

করুণা সহাস্যে কহিলেন "দেখিতেছি তোমার মুখখানি সুন্দর, না ঐ মায়ের মুখখানি সুন্দর; সন্ন্যাসী মাতৃদর্শনে আসিয়াছেন, না তোমার রূপসুধা পান করিতে আসিয়াছেন!"

উর্ম্মিলা। তুই যে করুণা, একেবারে মুখপোড়া বাঁদর হইলি!

করুণা। কি করিব দিদি, চ'ক-পোড়ার সংসর্গে পড়িয়া মুখপোড়া না হইয়া উপায় কি?

একাদশ অধ্যায়—সন্ন্যাসী সকাশে

সেই নবীন সন্ন্যাসী আপন আসনে উপবেশন করিয়া, প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপন করিলেন। পরে অগ্নি

প্রজ্জ্বলিত করিয়া শীত নিবারণের চেষ্টা করিলেন। এমন সময়ে উর্ম্মিলা ও করুণা তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। করুণা পূর্ব্বের ন্যায় সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলেন; কিন্তু উর্ম্মিলা সন্ন্যাসীকে কোনরূপ সম্মান বা ভক্তি প্রদর্শন না করায়, করুণা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সন্ন্যাসী করুণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাও নাই?"

করুণা বিনম্র-বচনে কহিলেন, "আপনি কি ইঁহারই নিকট আমাকে প্রশ্ন করিতে বলিয়াছিলেন?"

সন্ন্যাসী। হাঁ।

করুণা। ইঁহার সহিত আপনার পরিচয় ছিল কি?

সন্ন্যাসী। ইনিই বলিতে পারেন।

করুণা। ইঁহার সহিত আপনার আলাপের ইচ্ছা আছে কি?

সন্ন্যাসী। সে সৌভাগ্য আমার আছে কি?

করুণা। নচেৎ ইনি এখানে আসিবেন কেন?

সন্ন্যাসী। উনিই জানেন।

করুণা। ইঁহার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর আপনি প্রদান করিবেন কি?

সন্ন্যাসী। আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর যদি ইনি প্রদান করেন, তবে আমিও করিব।

করুণা। আপনি দীক্ষিত হইয়াছেন কি?

সন্ন্যাসী। তোমার এরূপ প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নহে।

উর্ম্মিলা ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এ প্রশ্ন করুণার নহে, ইহা আমারই প্রশ্ন।"

সন্ন্যাসী। না, আমি এখনও দীক্ষিত হই নাই। দীক্ষিত হইয়া কি করিব? উর্ম্মিলা, তুমি কি আমার হৃদয় জান না? আমার হৃদয়-ব্যথা নূতন করিয়া কি জানাইব? উর্ম্মিলা—উর্ম্মিলা, আমার অপরাধ কি? আজ ২।৩ মাস, তোমার দ্বারস্থ; আমাকে ভণ্ড বল, আর কপট বল, আমি কাত্যায়নীদর্শনোদ্দেশ্যে যে এ মন্দিরে আসি নাই, তাহা তুমি বুঝিয়াছ কি না, জানি না। আমার হৃদয় যাহা দেখিতে চাহিয়াছে,—তাহা দেখিতে আসিয়াছি ও দেখিয়াছি, দেখিতেছি! তৃপ্ত হইতে পারি নাই! উর্ম্মিলা, তোমার হৃদয় যে এত কঠোর, তাহা জানিতাম না। তুমি আমাকে দেখিয়া চিনিয়া একটীবারও আলাপের সুযোগ প্রদান কর নাই।

সন্ন্যাসীর নেত্রযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত।

উর্ম্মিলা করুণ স্বরে কহিলেন, "কেন সে সুযোগ প্রদান করি নাই, সে কথা বলিতে হইলে অনেক বলিতে হয়; তত কথা বলিবার এখন আর ইচ্ছা নাই—আবশ্যকও নাই। তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে ফিরিয়া যাও। দার-পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হও। তোমার ভোগস্পৃহা রহিয়াছে, কেন এ পবিত্র পরিচ্ছদের অবমাননা করিতেছ?"

সন্ন্যাসী। যদি অন্য উপায়ে তোমার সাক্ষাৎকার লাভের সম্ভাবনা থাকিত, তবে এ উপায় অবলম্বন করিতাম না। তুমি আমার অবস্থা একবার পরিজ্ঞাত হইয়া, তারপর তোমার যাহা ইচ্ছা করিও।

উর্ম্মিলা। এখানে পিতার সহিত দুইবার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল; তাহা বোধ হয় জান। সুতরাং আমি স্থূলতঃ তোমাদের সকলের অবস্থাই জ্ঞাত আছি। তোমার অথবা আমার ইচ্ছায় জগৎ চলে না। যাঁহার ইচ্ছায় জগৎ চলিয়া থাকে, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে মানুষের কিছু করিবার সাধ্য নাই। হিন্দুনারীর পতিই গুরু—পতিই একমাত্র উপাস্য দেবতা,—পতিই সর্ব্বস্ব। তুমি আমার সেই সর্ব্বস্ব পতি-দেবতা। এখনও কায়মনোবাক্যে তোমারই আরাধনা করিয়া থাকি। তোমার সহিত আমার আন্তরিক সম্বন্ধ এখনও আছে এবং চিরকালই থাকিবে। কিন্তু বাহ্য সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়াছে, বিধাতা তাঁহার বিধানমত কার্য্য করিয়াছেন। তুমি বিজ্ঞ ও পণ্ডিত, আমি তোমাকে কি বুঝাইব? আমি পুনরায় তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার আশা ছাড়িয়া গৃহে প্রতিগমন কর, আমাপেক্ষা রূপগুণবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হও; তাহা হইলেই আমাকে ভুলিতে পারিবে।

সন্ন্যাসী কাতর ও ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাকে ভুলিতে পারিব উর্ম্মিলা? উর্ম্মিলা—উর্ম্মিলা, তুমি যে আমার প্রাণের উর্ম্মিলা! তোমাকে ভুলিব? আত্মবিস্মৃতি বরং সম্ভব, কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারিব না।

তোমার বিচ্ছেদে আমার চিত্তের অবস্থা কি হইয়াছে তা' যদি তুমি বুঝিতে উর্ম্মিলা, তাহা হইলে একথা বলিতে না। তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার ধ্যান, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। উর্ম্মিলা—উর্ম্মিলা, তোমাকে অধিক কি বলিব—আমি মুদ্রিত নেত্রে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, হৃদয়াভ্যন্তরে তোমার মূর্ত্তি দেখিতে পাই; নেত্র উন্মীলন করিয়া বাহ্য-জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তোমার ছবি দেখিতে পাই; বৃক্ষ-পত্র-লতিকা, মৃত্তিকা, বায়ু, আকাশ, সর্ব্বত্রই তোমার মূর্ত্তি! উর্ম্মিলা, তুমি আমার দিকে ফিরিয়া চাও, আর না চাও, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। তোমাকে না পাই, তাহাতে দুঃখ নাই, দিনান্তে তোমাকে একবার দেখিতে পাইলেই হৃদয়ে শান্তি পাইব।"

উর্ম্মিলা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার আর একটা অনুরোধ রাখিবে কি?"

সন্ন্যাসী। কি অনুরোধ উর্ম্মিলা?

উর্ম্মিলা। বৈকুণ্ঠপুরে আদ্যাশক্তির মন্দির আছে, তথায় এক মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, আমি তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছি। সংসারে প্রকৃতই তোমার অনাস্থা থাকিলে, তাঁহার নিকট গমন করিয়া দীক্ষিত হইও; হৃদয়ে শান্তি পাইবে। তারপর এখানে আসিতে ইচ্ছা হয় তো আসিও।

অনন্তর উর্ম্মিলা ও করুণা সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরদিন এই নবীন সন্ন্যাসীকে কেহ মন্দিরে দেখিতে পাইল না। পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিয়াছেন, এ নবীন সন্ন্যাসী আর কেহই নহেন, উর্ম্মিলার স্বামী কৃষ্ণবিহারী রায়।

দ্বাদশ অধ্যায়—শিখণ্ডীবাহন

পীতাম্বর-নিধন জনিত গোলযোগ হইতে মুক্তি পাইয়া যদুনন্দন কিছুদিন শান্তভাবে অতিবাহিত করিলেন। যখন দেখিলেন—সেই গোলযোগের আন্দোলন একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছে, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কুকার্য্যে লিপ্ত হইলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়বিলাসে বাধা দেওয়ার লোক এখন আর কেহ নাই। আবার নগরে ও পল্লীগ্রামে কুলললনাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইল। তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া নগরবাসী এবং পল্লীবাসিগণ কখন কখন রাজ-বিচারপ্রার্থী হইত; কিন্তু শচীপুত্রের জন্য তাহারা সাফল্যলাভ করিতে পারিত না। শচীপুত্র ঐ সকল অভিযোক্তৃদিগের কাহাকেও ভীতি-প্রদর্শনে, কাহাকে মিষ্ট বাক্যে, কাহাকেও বা অর্থদ্বারা বিদায় করিয়া দিতেন। পরন্তু ঐ সকল কুকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য যদুনন্দনকে তিনি কোনরূপ শাসন অথবা তিরস্কার করাও আবশ্যক বোধ করিতেন না। ইহাতে যদুনন্দনের দুঃসাহস ও দুরাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর ইন্দ্রিয়বিলাস ছাড়াও যে ভয়ঙ্কর কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহার ফল অতি ভয়ঙ্কর—অতি শোচনীয় হইয়াছিল।

গোবর্দ্ধন দাস ও শিখণ্ডীবাহন নামক নীচকুলোদ্ভব তাঁহার দুইটী সহচর বা অনুচর ছিল; উহারা এরূপ দুরাত্মা ছিল যে, জগতের কোনরূপ পাপানুষ্ঠানেই তাহারা পশ্চাৎপদ হইত না। যদুনন্দন এই দুইটী পাপিষ্ঠের সাহায্যে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই ব্রহ্মপুত্রতীরের সংগ্রামকালে যদুনন্দন ও গৌড়-রাজকুমার মহম্মদ শার মধ্যে যে পরামর্শ হইয়াছিল, যাহার ফলে কৌশলে ক্ষত্রিয়কুল-গৌরব বীর-কেশরী কামতারাজ কুমার পীতাম্বরের নিধন সাধিত হইয়াছিল, সেই পরামর্শের অবশিষ্ট অঙ্গ সংসাধন করিতে যদুনন্দনের এই নূতন ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রানুসারে তিনি গোবর্দ্ধন দাসকে পূর্ব্বাঞ্চলে ও শিখণ্ডীবাহনকে পশ্চিমাঞ্চল পাঠান-রাজধানী গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। শিখণ্ডীবাহন মহম্মদ শার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া যেরূপ কথোপকথন করিল, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। শিখণ্ডীবাহন কহিল "আপনার অনুরোধানুসারে আমার প্রভু যদুনন্দন কামতারাজ্য পাঠানাধিকারে আনয়নের জন্য যে সুযোগ-সংঘটনের প্রয়াস পাইতেছেন, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ আপনার প্রেরিত দুই লক্ষ মুদ্রায় অকুলান হইয়া পড়িয়াছে; পরিশেষে শচীপুত্রের সঞ্চিত অর্থে কার্য্য চালাইতে হইয়াছে। আপনি এদিকে কত দূর কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছেন, তিনি জানিতে চাহিয়াছেন।"

মহম্মদ শা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "দুই লক্ষ মুদ্রায়ও অর্থাভাব হইল!"

শিখণ্ডী। ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া দেখিবেন; প্রথমতঃ রাজকুমার-নিধন উপলক্ষে যে গোলযোগ ঘটিয়াছিল, ধূলিকণাবৎ অর্থ না ছড়াইলে, আমার প্রভু যদুনন্দনের নামটী জগৎ হইতে লুপ্ত হইত। আপনি বিশ্বসিংহকে বোধ হয় জানেন?

মহম্মদ। ঐ যে সেই মর্কটটা? সে কি করিয়াছে?

শিখণ্ডী। সেই তো সকল সর্বনাশের—সকল গোলযোগের মূল। সে যদি যদুনন্দনের বিরুদ্ধে রাজপুত্র-হত্যার অভিযোগ উপস্থাপিত না করিত, তবে সর্প-দংশনে রাজকুমার নিহত হইয়াছেন—ইহাই সকলে জানিত, কোন গোলযোগ উপস্থিত হইত না। সে রীতিমত সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ অভিযোগ উপস্থিত করে। কেবল অর্থবলে ও যদুনন্দনের বুদ্ধিকৌশলে অভিযোগের ফল বিপরীত হয়। যদুনন্দন অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন আর মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করার অপরাধে বিশ্বসিংহের শাস্তি হয়। এখন তো আর রাজকুমার নাই, তাহাকে রক্ষা করিবে কে? সে রাজবিচারে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

মহম্মদ শা অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে কহিলেন "বলেন কি মহাশয়, ঐ মর্কটটা একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছে?"

শিখণ্ডী। সে যেমন তেমন নির্ব্বাসন নহে—তাহাকে কামতা-রাজ্য হইতে চির বিদায়—একেবারে চীন দেশে পাঠান হইয়াছে। আপনি বিস্মিত হইবেন না, যদু-নন্দনের বুদ্ধিকৌশলের আরও পরিচয় শুনুন। কামতা-রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমায় আহম্ জাতির বাস; তাহাদের সর্দ্দার বা রাজার নাম হুহংমং। তিনি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও তেজস্বী বীরপুরুষ।

মহম্মদ। হাঁ, আমরা তাঁহার নাম শুনিয়াছি; তিনি নাকি খুব পরাক্রমশালী। তাঁহার কি হইয়াছে?

শিখণ্ডী। না, তাঁহার কিছু হয় নাই। তিনি যদু-নন্দনের বাল্যবন্ধু।

মহম্মদ। (সবিস্ময়ে) আপনি যে বিপরীত বাক্য বলিতেছেন! আমরা শুনিয়াছি, তিনি মৃত পীতাম্বরের বন্ধু।

শিখণ্ডী। (সহাস্যে) আপনারা ভুল শুনিয়াছেন। গৌড়-রাজ্য ও আহম্-রাজ্য মধ্যে বিশাল কামতা রাজ্য; প্রকৃত কথা আপনাদের জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে; যাহা কামতা-রাজ্য হইতে প্রচারিত হইয়াছে, সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, তাহাই সত্য বলিয়া আপনারা বুঝিয়াছেন। যদি আহম-রাজ পীতাম্বরের সুহৃদ্ হইবেন, তবে ব্রহ্মপুত্রতীরের সেই ভীষণ সমরে তিনি নিশ্চয়ই উপস্থিত হইতেন। ভিতরের কথা আপনারা কিছুই জ্ঞাত নহেন।

মহম্মদ শা নিতান্ত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কামতারাজসংসারের অভ্যন্তরে অনেক রহস্য আছে কি?"

শিখণ্ডী। তা' আছে বৈ কি? সে সকল কথার সহিত যদুনন্দন কিরূপে কামতা-রাজ্য আপনাদের করায়ত্তে আনিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা জানাইতেই তো আসিয়াছি। এক্ষণে আহম্-রাজ্যের সহিত কামতা-রাজের প্রীতি কিরূপ তা' শুনুন। "কামতা-রাজ্যে পূর্ব্ব-সীমায় প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের অনতিদূরে বিখ্যাত কামাখ্যা-দেবীর মন্দির। ঐ মন্দিরের পুরোহিতগণ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত; তাহারা ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক। তাই জাতীয় গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অনেক সময়ে রাজশাসনকেও উপেক্ষা করিয়া জন-সাধারণের প্রতি বড় অত্যাচার করিত। কামতারাজ ক্ষত্রিয় নৃপতি। তিনি বড় ধর্ম্মভীরু, তাই তিনি ব্রাহ্মণদের উপর প্রভুত্ববিস্তারের চেষ্টা না করিয়া যদুনন্দনের পিতা শচীপুত্রকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তথায় পাঠাইলেন। তিনি প্রখর-বুদ্ধিসম্পন্ন কার্য্যদক্ষ লোক। তিনি জনসাধারণের দুঃখে বিগলিত হইয়া গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদের গর্ব্ব চূর্ণ করেন। ইহাতে ঐ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আহম্‌দের সহিত মিশিয়া পূর্ব্ব-সীমায় ভীষণ গোল-যোগের সৃষ্টি করে। শচীপুত্র কৌশলী লোক; তিনি আহম্‌রাজ হুহংমংএর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার প্রতি বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করিয়া যদুনন্দনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া যদুনন্দনের নামে একটা মিথ্যা অপবাদের সৃষ্টি পূর্ব্বক কামতা-রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত করেন। কামতারাজ তখন ব্রাহ্মণদের অনুরোধে শচীপুত্রকে কামতাপুরে আনাইলেন এবং তাঁহার স্থানে পীতাম্বরকে পাঠাইলেন। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর আহমরাজ যদু-

নন্দনকে রাজপ্রতিনিধিরূপে অথবা স্বাধীনভাবে প্রাগ্-জ্যোতিষপুরে গিয়া রাজত্ব করিতে অনুরোধ করেন। যদুনন্দনের রাজ্যভোগই কেবল যদি ইচ্ছা হইত, তবে সেই সুযোগে আহমুরাজের সাহায্যে একটা সুবিধা করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার ইচ্ছা কি, তাহা আপনি অবগত আছেন। তিনি তাঁহার সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত এক সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছেন। তিনি কৌশলক্রমে আহমুরাজ-দ্বারা পূর্ব্ব-সীমায় একটা গোলযোগ বাধাইবেন, সেই গোলযোগ-নিষ্পত্তির জন্য স্বয়ং কামতারাজকে ঐ অঞ্চলে যাইতে হইবে। কারণ এখন আর পীতাম্বর জীবিত নাই, শচীপুত্রকেও ঐ অঞ্চলে পাঠান হইবে না। রাজার সঙ্গে সেনাপতি সুবাহু যাইবেন। তখন কামতাপুরে নেতৃস্থানীয় কেহই থাকিবেন না। সেই সময়ে আপনারা কামতাপুর আক্রমণ করিবেন, উহা দখল করিতে কোনও কষ্ট হইবে না। আপনি গোবর্দ্ধন দাসকে জানেন; তিনি কিরূপ চতুর লোক, তাহাও বোধ হয় অবগত আছেন। সেই গোবর্দ্ধন দাসকে এই গোলযোগ সৃষ্টির জন্য পূর্ব্বাঞ্চলে পাঠান হইয়াছে। আপনি এদিকে প্রস্তুত হইয়া থাকুন; যেমন সেইদিকে গোলযোগের সূত্রপাত হইবে, আর কামতারাজ তথায় যাইবেন, অমনি আপনাকে সংবাদ প্রদান করা হইবে। কামতাপুর-জয়ের ইহাপেক্ষা উত্তম সুযোগ আর পাইবেন না।"

মহম্মদ শা শিখণ্ডীবাহনের কথিত বিষয় বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। শিখণ্ডীবাহন যেরূপভাবে সাজাইয়া বলিয়াছে, তাহাতে তাহা একেবারে অসত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি এরূপ ক্ষেত্রে আরও একটু পাকাপাকি বন্দোবস্ত না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত নহে ভাবিয়া শিখণ্ডীবাহনকে কহিলেন, "আপনাদের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছে, তবে ইহাতে আরও একটু সতর্কতাবলম্বন আবশ্যক। যদুনন্দন আমার প্রিয় বন্ধু; তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ্ না করিয়া কিছু করিতে পারি না। যুদ্ধাদি ব্যাপার অনেক সময়ে দৈবের প্রতি নির্ভর করে। যদি যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, যদুনন্দনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা জয়ী হইতে না পারিলে, যদুনন্দনের উপায় কি হইবে, সে চিন্তা পূর্ব্বেই আমাকে করিতে হইবে। তাই আমার মতে কামতারাজ পূর্ব্বাঞ্চলে চলিয়া গেলে, ঐ সংবাদসহ যদুনন্দন নিজে আমাদের সহিত মিলিত হইলেই ভাল ও সঙ্গত কাজ হয়। ইহাতে তাঁহার জীবনের কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

শিখণ্ডীবাহন হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "আপনার এ পরামর্শ অতি উত্তম, আমি আপনার এ পরামর্শ যদুনন্দকে জ্ঞাত করাইব।"

মহম্মদ। আমার বন্ধুবরকে আরও বলিবেন, "অর্থের জন্য যেন তিনি কোন চিন্তা না করেন। আমি সম্প্রতি আপনার সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা-প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছি; পরে প্রয়োজনমত আরও পাঠাইব। আমি বেশ বুঝি, এই সকল ব্যাপারে জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আর একটী কথা, আমাদের এই সকল কাজের জন্য তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যেন অচিরেই পরিশোধ করা হয়। এই অর্থ থাকিলে অসময়ে উপকার দিবে।"

শিখণ্ডীবাহন নগদ মুদ্রা প্রাপ্তিতে বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সে পুলকিতচিত্তে কহিল, "আপনার উদারতায় বড়ই প্রীত হইলাম। যদুনন্দন বহু তপস্যার ফলে আপনার ন্যায় হৃদয়বান্ বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

অনন্তর শিখণ্ডীবাহন মহম্মদ শার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কামতাপুরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)



'জ্ঞান-বিজ্ঞান'

বিজ্ঞান ও দর্শন

শ্রীতারাকিশোর বর্দ্ধন, বি-এ

দর্শন বা ফিলজফির বিরুদ্ধে নানা সময়ে নানা কথা শোনা যায়। আজকাল অনেকেই বলেন যে, দর্শনের দ্বারা কোনও শেষ প্রশ্নেরই মীমাংসা আজিও হইতে পারে নাই, সুতরাং দর্শন ত্যাগ করিয়া ইংরেজের মত সাধারণ বুদ্ধির (common sense) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সংসার চালাইবার চেষ্টা করাই ভাল। আমাদের দেশেও পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলাধার পাত্র প্রভৃতি প্রবাদবাক্য দর্শনের অপ্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করে। যিনি যাহাই বলুন, যতদিন মানবসমাজ আছে, ততদিন দর্শনশাস্ত্র থাকিবেই। দর্শন জাতীয় জীবনের মূল উৎস। কাব্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই দার্শনিক তথ্যের দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের প্রধানতম রাষ্ট্রীয় মতবাদ কমিউনিজম্, সোশিয়েলিজম্ এবং ডেমক্রেসি ও দার্শনিক মূল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মানবজীবন ও এই জগৎ নানাভাবে নানাদেশের লোকের মন আলোড়ন বিলোড়ন করিতেছে ও করিবে। জগৎসমস্যা নানামূর্ত্তিতে নানাজনের কাছে প্রকটিত হইতেছে। যে জাতি যতটা গভীর ভাবে এ প্রশ্নের আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে জাতির জীবনী-শক্তিও যেন তত অধিকতর স্থিতিশীল। কারণ, দর্শনই জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। চিন্তাশক্তি মনুষ্যশক্তির প্রধান উপাদান। সে শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শেষফল— "দর্শন"। এ কারণেই প্রাচীন ভারত বাহ্যতঃ পরপদানত হইলেও, হৃদয়রাজ্যে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া এখনও অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছে। রোম এক সময়ে গ্রীসের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু রোমের দর্শন ছিল না। তাই মনোরাজ্যের উপর রোমের প্রভাব কম। কিন্তু গ্রীসের সক্রেটীস, প্লেটো, এরিষ্টট্ল এখনও জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে।

দর্শন সমাজের পুঞ্জীভূত জীবন্ত ভাবসমূহের সার। মানবজীবন সম্বন্ধে যে সকল নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবস্থিত হইয়াছে, যে সব ভাব সমাজকে আলোড়িত করিতেছে, দর্শন সে সকল ধীরে ধীরে নিজ কলেবরের ভিতর গ্রহণ করিয়া সারতত্ত্ব প্রকাশ করে এবং মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন-পথ নির্ণয় করিয়া দেয়। যে জাতি জীবন্ত, তাহাতে নূতন নূতন দার্শনিকেরও আবির্ভাব হইতেছে। যে দেশ হইতে দার্শনিক শিক্ষাগুরুর লোপ পাইয়াছে, সে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়।

কেন আসিয়াছি? কোথায় যাইব? কে আমি? এসব প্রশ্নের যদি মীমাংসাই না হইল, অন্ততঃ এ সব বুঝিবার যদি চেষ্টাই না হইল, তাহা হইলে এই জীবন-ব্যাপার যে একান্ত অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। এ সকল চিন্তার হাত হইতে এড়ান যায় কি করিয়া? এদের উপরেই যে মনুষ্যত্বের মন্দির প্রতিষ্ঠিত! আমাদের চারিদিকে সব সময়েই মৃত্যুর লীলা চলিতেছে। লোকজন, বাড়ীঘর, যা'র দিকে দৃষ্টি কর, সবকেই চলিয়া যাইতে হইবে। কিছুই থাকিবে না। শুধু দিন কয়েকের জন্য হৈ, চৈ। মৃত্যুর পর কি থাকিবে? আত্মা আছে কি? ভগবান আছেন কি? এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর মত কোটী কোটী গ্রহ নক্ষত্র লইয়া যে বিশাল জগৎ কোটী কোটী বৎসর বিরাজ করিতেছে, তাহার কার্য্য-কারণের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিবে কে? প্রতি মুহূর্ত্তে আমি ও জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছি। পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনার সংযোগপরম্পরায় আমার দেহ-মধ্যে যে ধারণার সূত্র রচিত হইতেছে তাহা কি? কে বলিবে? তাহাই কি আত্মা? প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্রকে লইয়া অনন্তকাল ধরিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কাহাকে ধারণ করিয়া এই মহাপরিবর্ত্তন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, কে বলিবে?

এ জীবনটা কি? ও ইহাকে লইয়া কি করিতে

হইবে? এই দুইটী সনাতন প্রশ্ন পূর্ব্বাপর মানব-মনকে আলোড়িত করিতেছে। বুদ্ধদেবের মতে আত্মা দুর্জ্ঞেয় এবং ভগবানও দুর্জ্ঞেয়। জগতে দুঃখ আছে এবং উহা হইতে ত্রাণ পাইতে হইবে, ইহাই তাঁহার শিক্ষার সার। জন্মগ্রহণ যন্ত্রণাময়, তারপর জীবনে তো দুঃখ মানুষের লাগিয়াই আছে। প্রকৃতি মানুষকে সর্ব্বদাই দুঃখে ফেলিতেছেন। রৌদ্রে বা ঝড়বৃষ্টিতে মানুষ কষ্ট পায়। সেজন্য মানুষও দুঃখমোচনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে। ফলে তাহার গৃহাদি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ঘর বাড়ীরও স্থায়িত্ব রাখিতে গেলে সর্ব্বদাই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। তুমি যাহা কিছু সুখ ভোগ কর, সে বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই লাভ কর। মানবজীবন প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মাত্র। যখন তুমি সমরে জয়ী হইলে, তখনই কিছু সুখ ভোগ করিবে। কিন্তু মানুষের বলের চাইতে প্রকৃতির বল অনেক গুরুতর। অতএব মানুষের জয় কদাচিৎ এবং প্রকৃতির জয় প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। তাহা হইলেই দেখা যায় যে, জীবন যন্ত্রণাময়। "আর্য্য-মতে আবার উহার পৌনঃপুন্যঃ আছে।" ইহজীবনের অনন্ত দুঃখ কোনও রকমে কাটাইয়া প্রকৃতির রণে শেষে পরাস্ত হইয়া যদি জীব দেহত্যাগ করিল—তথাপি ক্ষমা নাই, আবার জন্মিতে হইবে—আবার মরিতে হইবে—আবার জন্মিতে হইবে। আবার দুঃখ। এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মানুষের কি নিস্তার নাই?

এই প্রশ্নের দুইটী উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়; আর এক উত্তর ভারতীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন যে, প্রকৃতিকে পরাস্ত করা যায়। যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার, সেই চেষ্টা দেখ। এই জীবনসংগ্রামে প্রকৃতিকে জয় করিবার মত অস্ত্র সংগ্রহ কর। সেই অস্ত্র কি, তাহা প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন। প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্ব সকল অধ্যয়ন এবং তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফলে ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য বস্তুবাদ বা জড়বাদ (materialism)। উঁহারা ক্রমবিকাশবাদ অবলম্বন করিয়া বলিবেন—যে, সংসার হইতে ক্রমশঃ দুঃখভাগ বিলুপ্ত হইয়া অবশেষে কেবল মঙ্গলই বিদ্যমান থাকিবে। এই যুক্তি খুব সুন্দর, কিন্তু উহা ভ্রমপূর্ণ। ক্রমশঃ পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। যেখানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি বিদ্যমান, কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যেখানে সুখোদ্দীপক শক্তি বর্ত্তমান, দুঃখদায়িকা শক্তিও সেইখানে লুক্কায়িত। কেবল সুখের বা কেবল দুঃখের সংসার হইতেই পারে না। অমঙ্গল ও মঙ্গল, দুইটি পৃথক্ সত্তা নহে। এই সংসারে এমন একটী বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক বা সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। একই ঘটনা, যাহা আজ শুভ বলিয়া মনে হইতেছে, কালই তাহা আবার অশুভজনক বোধ হইতে পারে। একই বস্তু, যাহা একজনকে সুখী করিতে পারে, তাহাই আবার অপরের দুঃখ উৎপাদন করিতে পারে।

সুতরাং ইউরোপীয় উত্তর না মানিয়া ঐ প্রশ্নের ভারতবর্ষীয় উত্তর এই যে প্রকৃতি অজেয়। যতদিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন দুঃখও থাকিবে। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই দুঃখ-নিবারণের একমাত্র উপায়। সেই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফলে ভারতীয় দর্শন। যথার্থ অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য এবং সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত। পাশ্চাত্য ফিলজফির সঙ্গে দর্শনের প্রভেদ এই যে, ফিলজফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; কিন্তু দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র। দর্শন বলে—যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানলাভ হইলেই জীব দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। পাশ্চাত্যমতে জ্ঞানেই শক্তি (Knowledge is power); কিন্তু দর্শন বলে—জ্ঞানেই মুক্তি।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চা বেশী হইয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকেরাও বিশ্বের রচনাকৌশলের কতকটা সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ বৈজ্ঞানিক তথ্য-সকল খৃষ্টজগতের বাইবেলের সৃষ্টি-সংক্রান্ত তথ্যের প্রতিকূল বলিয়া গোঁড়া খৃষ্টান সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিকের উপর খড়্গহস্ত। এমন কি, ডারউইন সাহেবকেও অনেক প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। গ্যালিলিও



ছন্দা

শিল্পী: শ্রীঅবনী সেন

কোপার্নিকাশের তো কথাই নাই। কিন্তু ইহাই একান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিশ্বরচনা-কৌশলের যতটুকু বৈজ্ঞানিকের আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে সাংখ্য বা বেদান্তের সৃষ্টি-সংক্রান্ত তথ্যের বিভিন্নতা নাই। বিজ্ঞানের যতই নূতন আবিষ্কার হইতেছে, ততই অধিক পরিমাণে সাংখ্যবর্ণিত বিশ্বরচনাকৌশলের সহিত উহা মিলিয়া যাইতেছে। এ সব দেখিয়া এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, বৈজ্ঞানিকের নূতন নূতন আবিষ্কার ক্রমশঃ হিন্দু-দর্শনের মতবাদকেই অপর একদিন গৌরবান্বিত করিবে।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের সৃষ্টিবিষয়ক সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে, প্রথমেই কয়েকটী মূল তথ্য পাঠকের জানিয়া রাখা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্য বিশ্লেষণ করিলে ইহাদিগকে জৈব (organic) এবং অজৈব (in-organic) এই দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, ধাতু, শিলা, বাষ্প, সাগর, গন্ধক, আর্সেনিক প্রভৃতি অজৈব পর্য্যায়ভুক্ত। আর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, মানুষ প্রভৃতি জৈব-পর্য্যায়ভুক্ত। রসায়নশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যাবতীয় অজৈব পদার্থ বিশ্লেষণ করিলে আমরা প্রায় ৯৩টী মূলভূতে বা মূলপদার্থে (elements) উপনীত হই। যেমন হাইড্রজেন, অক্‌সিজেন, সোণা, লোহা, পারা, গন্ধক, আর্সেনিক, এণ্টিমনি, রেডিয়ম্, ফস্ফরাস্ প্রভৃতি মূল পদার্থ। এই মূল পদার্থগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র। অর্থাৎ সোণা সর্ব্বদা সোণাই থাকিবে, উহা কখনও পারা হইবে না এবং পারাও সর্ব্বদা পারাই থাকিবে, উহা কখনও সোণা হইবে না। বিভিন্ন প্রকার মূল পদার্থের বিভিন্ন মাত্রায় সংযোগে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। আবার যে কোনও জৈব পদার্থেরই (organic) বিশ্লেষণ করি না কেন, আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাতে শরীর কতকগুলি কোষাণু (cells) দ্বারা গঠিত। এই তত্ত্বকে Cellular theory বলে। ঐ কোষাণুগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে আবার আমরা পূর্ব্বোক্ত ৯৩টী মূলভূতের দেখা পাইব। সুতরাং রসায়ন শাস্ত্রানুসারে এই জড় জগৎ ৯৩টী মূলভূতের সংযোগে ও সংহননে রচিত (১)। এই জড়ের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উপচয়, অপচয় নাই, উহার কেবল রূপান্তরিত হয় মাত্র। যথা—প্রদীপ জ্বালিলে তৈল বিনষ্ট হইয়াছে, একথা বলা চলে না। বরঞ্চ তৈলের মূল পরমাণুগুলি রূপান্তরিত হইয়া কাজল, ধোঁয়া, carbon dioxde প্রভৃতিতে পরিণত হইতেছে, একথা বিজ্ঞানমতে বলিতে হয়। "জড় পদার্থের রূপান্তর হয়, ধ্বংস হয় না", এই তথ্যকে 'Conservation of Matter' বলে।

কিন্তু ঐ সকল মূলভূত ছাড়া জগতে আরও একটী বস্তু আছে। বিজ্ঞান তাহার নাম দিয়াছেন শক্তি Force বা energy। প্রথম দৃষ্টিতে শক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য বা ভেদ দেখা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ ভৌতিক শক্তি ৬টী মাত্র বিভাগের অন্তর্গত। যথা:—গতি (motion), তাপ (heat), আলোক (light), তড়িৎ (electricity), চৌম্বকশক্তি (Magnetism) এবং রসায়নশক্তি (Chemical affinity)—ইহারা জড়শক্তি বা ভৌতিক শক্তি (Physical forces)। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনেকদিন বিশ্বাস করিতেন যে, ঐ ৬টী শক্তি পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত ছয় প্রকার জড় শক্তিকে পরস্পর রূপান্তরিত করা যায়। অর্থাৎ উহারা একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। বৈদ্যুতিক শক্তি-দ্বারা যখন আলোক জ্বালা হয়, তখন তাড়িৎ বিনষ্ট হইয়াছে, একথা না বলিয়া বিদ্যুৎ-শক্তি রূপান্তরিত হইয়া আলোক (light) নামক আর একটা স্বতন্ত্র শক্তিতে পরিণত হইয়াছে, একথা বিজ্ঞানশাস্ত্র বলেন। সেইরূপ বৈদ্যুতিক ষ্টোভে রান্না করিলে, ঐ শক্তি তাপ (heat) নামক আর একটা শক্তিতে পরিণত হয়। এবং রেডিওতে যখন আপনারা গান শুনিতে পান, তখন বিদ্যুৎশক্তি রূপান্তরিত হইয়া লাউড্‌স্পীকার যন্ত্র-সাহায্যে শব্দ (sound) নামক একটা পৃথক্ শক্তিতে পরিণত

(১) মূলভূতের সংখ্যা আরও বেশী হইতে পারে। সবগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহা ছাড়া নক্ষত্রগুলিতে আরও কয়েকটী মূলভূতের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, যেগুলি পৃথিবীতে নাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না।

হয়। অন্যদিকে তাপ, আলোক বা চৌম্বকশক্তিকেও আবার তাড়িতে রূপান্তরিত করা যায়। এজন্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হইল—শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, উপচয় অপচয় নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই—শুধু আছে রূপান্তর ও ভাবান্তর; শুধু আছে আবির্ভাব ও তিরোভাব। এই ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিকের ভাষায় 'conservation of energy' বলে। উপরে উক্ত—"শক্তির উৎপত্তি-বিনাশ নাই", বিজ্ঞানের এই কথাটিকে পরের প্যারাগ্রাফে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। এই কথাটী পাঠকবর্গ অনুক্ষণ স্মরণ রাখিবেন, তাহা হইলেই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্যাদি সহজে আয়ত্তাধীনে আসিবে।

ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, জড় এবং শক্তি, matter এবং force, ইহারা সমবায় সম্বন্ধে জড়িত। যেখানে matter, সেইখানেই force। জড় এবং শক্তি পরস্পর নিত্য সহচর। জড় আশ্রয় না করিয়া, শক্তির প্রকাশ হইতে পারে না। 'No force without matter, no matter without force.' এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—জড় ও শক্তি, এই দ্বৈতকে অদ্বৈতে পর্য্যবসিত করা যায় কি না! আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ বলেন যে এই রাসায়নিকের ৯০টী মূলভূত নিত্যজিনিষ নয় এবং স্বতন্ত্রও নয়। তাহাদের প্রত্যেকটী আবার ছোট ছোট শক্তি-কণিকা অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রন একই প্রোটন দ্বারা তৈরী। অর্থাৎ রাসায়নিকের ৯০টী মূলভূত ও এক অদ্বিতীয় উপাদানে নির্ম্মিত। সুতরাং স্বর্ণ সর্ব্বদা স্বর্ণই থাকিবে—রাসায়নিকের এ মত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। পদার্থবিজ্ঞান বলেন যে, শক্তির আবর্ত্ত হইতেই জড় সৃষ্টি হইয়াছে (১)। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিজ্ঞানানুসারে এই জড়জগতে বস্তু (substance) একটীই। তাহার দুইটী জড় বা বিভূতি (attribute) আছে। যথা জড় এবং শক্তি। ঐ অদ্বিতীয় বস্তুকে হেকেল (Hackel) সাহেব 'substance' আখ্যা দিয়াছেন। জড় ও শক্তির মূলাধার এই 'substance' সর্ব্বদাই একটী নিয়ম মানিয়া চলে। তাহা এই—"The amount of cosmic force and matter is constant"—অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাপিয়া যে জড় ও শক্তির খেলা চলিতেছে, তাহাদের পরিমাণ নিয়তই সমান থাকিতে বাধ্য। অন্য কথায়, জড় ও শক্তি—উহাদের হ্রাসবৃদ্ধি নাই, উপচয় অপচয় নাই, উৎপত্তি বিনাশ নাই। সুতরাং উহারা অনাদি, অসীম ও অবিনাশী—উহাদের কখনও আরম্ভ হয় নাই এবং কখনও শেষ হইবে না। যে জিনিষের বিনাশ নাই, হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তাহা যে কোনও দিন সৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। কারণ উক্ত 'law of substance' অনুসারে উহার পরিমাণ সর্ব্বদাই সমান থাকা চাই। উহা অমুক দিনে সৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা বলার অর্থ এই যে—সৃষ্টির দিনটীর পূর্ব্বে উহা ছিল না। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; যেহেতু উহার পরিমাণ সর্ব্বদাই সমান থাকিতে বাধ্য। এজন্যই উক্ত substance কোনও বিশিষ্ট শুভক্ষণে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা না বলিয়া আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে, জড় ও শক্তির মূলাধার এই substance—অনাদি, অসীম ও অবিনাশী। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত হিন্দু-দর্শনের সৃষ্টি-বিষয়ক সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করিতেছে—যদিও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি বিষয়ক সিদ্ধান্তের সঙ্গে উহার প্রবল বিরোধ বিদ্যমান। এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকটে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানে সৃষ্টি-রহস্যের যে সন্ধান পাইয়াছি, তাহা নিম্নলিখিত ১২টী প্যারাগ্রাফের আকারে উপস্থাপিত করিতেছি। বিজ্ঞানের সৃষ্টি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত এই:—

(১) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনাদি, অসীম ও অবিনাশী; ইহার কখনও আরম্ভ হয় নাই, কখনও শেষ হইবে না।

(২) উহা যে এক অদ্বিতীয় সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার দুইটী বিভূতি বা ধারা আছে—যথা, জড় পদার্থ ও জড়শক্তি (matter and force); উহারা বিশ্বের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে ও সর্ব্বদা গতিশীল।

(৩) ঐ গতি অক্ষুন্ন ধারায় অনন্তকাল ব্যাপিয়া প্রবাহিত হয়—যদিও একটু সাময়িক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া;—যেমন জীবন হইতে মৃত্যু;—যেমন ক্রমবিকাশ হইতে ক্রমসঙ্কোচ (evolution and dissolution)।

(৪) যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র

(১) আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের "অব্যক্ত" নামক পুস্তক দেখুন।

ছড়াইয়া আছে, তাহারা সকলেই পদার্থজগতের সকল শৃঙ্খলা মানিয়া চলে। সুতরাং উহারা জন্মমৃত্যু নিয়মের অধীন। কিন্তু বিশ্বজগতের এক অংশে যদি একটী জ্যোতিষ্ক ধ্বংসমুখে পতিত হয়—তবে উহার অন্য অংশে নূতন জ্যোতিষ্কের উৎপত্তিও হয়।

(৫) আমাদের সূর্য্য ঐ প্রকার মরণশীল অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর একটী, এবং আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীও অসংখ্য ক্ষণস্থায়ী গ্রহগুলির একটী যাহারা সূর্য্য বা তারকা নামক জ্যোতিষ্কগুলির চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে যথাসময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(৬) আমাদের পৃথিবী এক সময়ে অত্যন্ত গরমে দ্রবীভূত অবস্থায় ছিল। তারপর ক্রমশঃ শীতল হইয়া ধরাপৃষ্ঠে তরল পদার্থরূপে জল দেখা দিবার পূর্ব্বে বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়। ঐ জলেতেই প্রথমে জীবাদি (Protoplasm) অর্থাৎ একটী মাত্র কোষাণুবিশিষ্ট এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র কীটের (uni-cellular organism) আবির্ভাব হয়। উহাই পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির আদি কাণ্ড।

(৭) অতঃপর ক্রমবিকাশের নিয়মানুযায়ী প্রাথমিক পার্থিব জীবসমূহের (অর্থাৎ ঐ Protoplasm ও তাহা হইতে উদ্ভূত জীব-সমূহের) ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। তাহাতে লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হয়।

(৮) অতঃপর জীবরাজ্যের মধ্যে মেরুদণ্ডযুক্ত জীবেরাই জীবনসংগ্রামে জয়যুক্ত হইতে থাকে এবং মেরুদণ্ডহীন প্রাণীরা হটিয়া যাইতে থাকে।

(৯) মেরুদণ্ডযুক্ত জীবের মধ্যে ক্রমশঃ স্তন্যপায়ী জীবেরাই জীবনসংগ্রামে অধিকতর সফলকাম হয়।

(১০) স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে আবার বুদ্ধিবৃত্তিতে বানরজাতিরাই শীর্ষস্থান অধিকার করে। নিম্ন শ্রেণীর জীব হইতে যখন প্রাথমিক বানরজাতির অভিব্যক্তি হয়—সেই সময়টাকে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ত্রিশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(১১) বানর শাখার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ, উন্নত ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পল্লব হইতেছে মনুষ্যজাতি।

(১২) এক্ষণে যাহাকে আমরা ইতিহাস বলি, তাহা তো মাত্র ৪।৫ হাজার বৎসরের সভ্যতার ইতিহাস। জীবজগতের বিবর্ত্তনের ইতিহাসের মধ্যে উহা একটী ক্ষুদ্রতম অংশ। আবার পার্থিব জীবসৃষ্টির ব্যাপারও গ্রহাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উৎপত্তির ইতিহাসের একটী সামান্যতম অংশ। জানালার ছিদ্র-পথে সূর্য্যালোকে যে ছোট ছোট ধূলিকণা দেখা যায়, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের পৃথিবীও যেমন একটী ক্ষুদ্র ধূলিকণা; সেইরূপ পার্থিব প্রকৃতির রাজ্য মধ্যে মানুষও ঐ প্রকার ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র একটী জীবাণু মাত্র।

উপরে লিখিত ১২ দফা তথ্য বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। উহাদিগকে অমান্য করিবার কারণ মাত্র নাই। বরঞ্চ উহারা হিন্দুদর্শনোক্ত জগৎ-সমস্যা বুঝিতে পাঠককে সহায়তা করিবে বলিয়াই এস্থলে উল্লেখ করিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্র বলেন যে, ধরাপৃষ্ঠে জল দেখা দিবার পর হইতেই জীবসৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রথমে একটী মাত্র কোষবিশিষ্ট এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি হয়। উহাকে জীবাদি বলা যায়; কারণ ইহাতেই পৃথিবীতে প্রাণস্পন্দনের প্রাথমিক অস্তিত্ব এবং উহা হইতেই প্রাণি-জগৎ ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর পরিণতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছে এবং তদনুসারে জলচর, উভচর, খেচর, স্থলচর, মেরুদণ্ডহীন বা মেরুদণ্ডযুক্ত, সরীসৃপ, মৎস্য নানা প্রকার বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং মানুষও ক্রমশঃ উন্নত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। ডারউইন প্রভৃতি বিশ্বপণ্ডিতেরা ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তথাপি আত্মা বলিয়া মূলে পৃথক্ কোনও বস্তু স্বীকার করা যাইবে কিনা, এ বিষয়ে আধিভৌতিকবাদী (জড়বাদী বা materialist) এবং অধ্যাত্মবাদীর মধ্যে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। হেকেল (Heackel) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জড় হইতেই বাড়িতে বাড়িতে আত্মা ও চৈতন্য উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ স্বীকার করিয়া জড়াদ্বৈত প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "Riddle of the Universe" নামক গ্রন্থে পাঠক সে বিবরণ পাইবেন। কিন্তু হিন্দু অধ্যাত্মবাদী বলিবেন—বাহ্যজগতের জ্ঞাতা হইতেছে আত্মা, উহাকে বাহ্যজগতের এক অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা—"আমি আমার স্কন্ধের উপর বসিতে পারি"—এই কথার ন্যায় তর্কদুষ্টিতে

অসম্ভব। এই জন্যই সাংখ্য শাস্ত্রে পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুই তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। গীতা বলিয়াছেন—আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, আত্মা শাশ্বত, নিত্য। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য; আত্মা অচল, গতিশূন্য এবং সনাতন।

বস্তুবাদী ও অধ্যাত্মবাদীর তর্কের মধ্য দিয়া পাঠক এক্ষণে দর্শনের দুরবাগাহ্ন অরণ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। জড়বাদ, বস্তুবাদ অথবা আধিভৌতিকবাদকে ইংরাজীতে 'Materialism' বলে এবং অধ্যাত্মবাদকে সাধারণতঃ 'Idealism' বলে। এই বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দুর্গা

(গল্প)

শ্রীপরিমলকুমার বিশ্বাস

গাঁয়ের সবাই দুর্গাকে বলে পাগলী। কিন্তু দুর্গা এতে রাগ করে না। বরং সে ক্ষমার দৃষ্টিতে এদের পানে চেয়ে থাকে, হয়ত বা একটু হাসে, বেশী বিরক্ত হলে সবার আড়ে ছাদের উপর পালিয়ে আসে। সারা বাড়ীটার মধ্যে এই ছাদে এসে দুর্গা নিজেকে অনেকটা নিরাপদ্ মনে করে। ছাদটাকে দুর্গার দুর্গ বলা যেতে পারে। এখানে এসে কখনও সে চুপ করে বসে থাকে, হঠাৎ হাওয়া উঠলে আঁচল উড়িয়ে সে ছুটো ছুটি করে, আকাশে বক উড়তে দেখলে শঙ্খচিল ভেবে অকারণে চীৎকার করে নেচে ওঠে।

দুর্গার বয়স বারো এবং তেরোর মাঝামাঝি। কিন্তু তার বাড়ন্ত গড়ন দেখলে পনেরো বলে অনায়াসে ভুল হতে পারে। আর শুধু বাড়ন্ত গড়নই নয়, দুর্গার মুখের পানে চাইলে মুখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। দুর্গার মা বলেন, 'মেয়ে ত নয়, সাক্ষাৎ প্রতিমে।' কথাটা মিথ্যে নয়। কাঁচা সোণার মত গায়ের রং, কিন্তু যত্নাভাবে ধূলি-মলিন; প্রতিমারই মত টানা টানা দু'টি চোখ, কিন্তু সে চোখে যেন বিষাদের ছায়া নেমেছে; মাথায় মেঘের মত একরাশ চুল, কিন্তু অবহেলায় সে চুল রুক্ষ, এলোমেলো। দুর্গা যেন প্রকৃতির মেয়ে। প্রকৃতি আপন হাতে তাকে মনের মত করে সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এত যে রূপ, দুর্গার মা'র বুকের ভেতরটা তবু কেমন যেন করে ওঠে—

সেদিন ছাদের ওপর দুড়্দাড়্ আওয়াজ শুনে দুর্গার মা জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন—'দুর্গা, অ দুর্গা, আবার তুই ছাদে উঠেছিস্?"

কিন্তু কে কা'র কথা শোনে! দুর্গা তখন ছাদের আল্‌সে বেয়ে ছুটতে লেগেছে।

'নেমে আয়, ভালো চাস্ তো নেমে আয় বল্‌ছি। কিন্তু দুর্গার নামবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। সে ছুটতে ছুটতে খিল খিল করে হেসে উঠছে।

জ্ঞানদা ভয়ে ভয়ে আরও দু'পা এগিয়ে এলেন, 'ও রকম করে ছোটে না দুগ্‌গা, এক্ষুণি পড়ে যাবি যে!'

দুর্গা হঠাৎ থেমে গেলো। আকাশে চোখ তুলে বললে, 'ওই দেখ মা শঙ্খচিল—আমি ওম্‌নি উড়তে পারি··· দেখবে, দেখবে মা? ডানার মত হাত দু'টো ওপর দিকে তুলে দুর্গা আল্‌সের ধারে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ল।

জ্ঞানদার হাত পা অসাড় হয়ে এল। ছুটে গিয়ে ধরতে সাহস হয় না, পাগ্‌লী মেয়েটা হয়ত এক্ষুণি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে।

উপায় বিহীন হয়ে জ্ঞানদা বললেন, 'ওই আস্‌ছে সিদ্ধেশ্বর—ডাকবো সিধু কাকাকে?'

সিদ্ধেশ্বর জমিদারের নায়েব। গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সকলেরই পরিচিত। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরের নাম করবা মাত্র দুর্গা বোঁ করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং পরক্ষণেই

'আমি সিদ্ধি খাবো, সিদ্ধি খাবো, সিদ্ধি খাবো' বলতে বলতে হি হি করে হেসে উঠে আগের মত ছুটতে আরম্ভ করল।

জ্ঞানদার ক্রমেই রাগ হচ্ছিল। কিন্তু তিনি হাসি টেনে বললেন, 'তোর জন্যে সেই ডুরে শাড়ীটা বের করে রেখেছি, পরবি নে দুগ্‌গা?'

এটা অমোঘ অস্ত্র। দুর্গা ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'সত্যি? সত্যি বলচো মা? আমায় ডুরে শাড়ীটা পরতে দেবে?

'দোবো বৈকি, আয়'—জ্ঞানদা দুর্গাকে নিয়ে নেমে এলেন। এই ডুরে শাড়ীটার ওপর ছিল একটা দুর্দ্দমনীয় প্রচণ্ড লোভ। এইখানে ছিল তার দুর্ব্বলতা। গরীবের মেয়ের পক্ষে এটা হয়ত খুবই স্বাভাবিক। এই শাড়ীখানির জন্য দুর্গা তার সমস্ত দুষ্টুমি, সব চঞ্চলতা ভুলতে প্রস্তুত ছিল। ডুরে শাড়ী প'রে দুর্গা যখন লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপটি করে বসে থাকতো, আর ঘন ঘন ঘাড় ঘুরিয়ে খুসী ভরা চোখে নিজের পানে চাইতো, তখন কী জানি কেন আড়াল থেকে দুর্গার পানে চেয়ে জ্ঞানদার চোখ দিয়ে হু হু করে জল নেমে আসতো।

দিন কয়েক পরে।

জ্ঞানদা দুপুরের স্নান সেরে বাড়ী এসে রান্নাঘরের পিঁড়েয় জলের ঘড়াটা সবে নামিয়ে রাখবেন, হঠাৎ একটা চাৎকারে তিনি চমকে উঠলেন। কে, দুর্গা না? তাঁর হাত কেঁপে গিয়ে জলের ঘড়াটা কাৎ হয়ে উল্‌টে পড়ল। তিনি চাৎকার করে উঠলেন, 'ওমা কী হবে গো—দুর্গা বোধ হয় ছাত থেকে প'ড়ে গেছে—'

দুর্গার বাপ হরিচরণ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—'কী হয়েছে?' 'সর্ব্বনাশ হোয়েছে গো, দুগ্‌গা ছাত থেকে প'ড়ে গেছে—'

'এ্যাঁ, পড়ে গেছে—কই—কোথায়' হরিচরণ পাগলের মত ছুটলেন দালানের দিকে, তাঁর পিছনে জ্ঞানদা, তাঁর পিছনে কামিনী ঝি—

কিন্তু চারিদিক খোঁজাখুজি করেও দুর্গাকে পাওয়া গেল না। কামিনী বললে, 'এদিকে ত নয় মা, আওয়াজটা যেন ওপর থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে…'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক ত, তাই ত…' হুড়মুড় করে সব ছুট্‌লো ছাতে। কিন্তু ছাতেও দুর্গা নেই। হঠাৎ জ্ঞানদা একদিকে চেয়ে ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। জ্ঞানদার দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই সেই দিকে চেয়ে যা দেখলে, তাতে কারও মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোনও কথা বের হল না। পেয়ারা গাছের একটা বড় ডাল ছাদের দক্ষিণ কোণে এসে পড়েছে। সেই ডালের খোঁচে দুর্গার আঁচল বেধে গিয়ে আল্‌সের খানিকটা নীচে দুর্গা শূন্যে ঝুলছে। গোলমাল শুনে পাড়ার দু'চারজন ইতিমধ্যে এসে জুটেছিল। খানিক পরে দুর্গাকে যখন নীচে নামিয়ে আনা হোল, লোকজনের ভীড় দেখে সে বেচারা রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চারদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাইতে লাগ্‌লো।

একজন বললে, 'খুব বেঁচে গেছে। ভাগ্যিস্ গাছের ডালে কাপড় আট্‌কালো, নইলে—' সে কথাটা আর শেষ কর্‌লো না।

হরিচরণ বল্‌লেন, 'কাপড়টা গলায় জড়িয়ে ঝুলতে পারলি নে, বজ্জাত মেয়ে কোথাকার!'

দুর্গা ক্রমেই ধাতস্থ হয়ে আস্‌ছিল। হরিচরণের কথায় বললে, 'বারে, আমি ত শঙ্খচিল দেখতে গিয়েছিলাম!'

'দেখাচ্ছি শঙ্খ-চিল। এক গাছা কঞ্চি নিয়ে আয় তো রে—' কিন্তু কঞ্চির জন্য অপেক্ষা কর্‌বার মত ধৈর্য্য তখন হরিচরণের ছিল না। ঠাস্ করে দুর্গার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, 'যাবি, আর যাবি কখনও ছাতে?'

চড়টা যে খুব গুরুতর হয়েছিল তা নয়। কিন্তু দুর্গার ফর্সা গাল সঙ্গে সঙ্গে লাল হোয়ে উঠ্‌লো। দুর্গা কিন্তু কাঁদলেও না, কিছু বল্‌লেও না। ঠোঁট কামড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জ্ঞানদার আর সহ্য হল না। তীব্রকণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন, 'যাও, ঢের হয়েছে, তোমাকে আর শাসন-গিরি ফলাতে হবে না।' সবাইকার চক্ষুর সম্মুখ হ'তে তিনি দুর্গাকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে এনে, একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, দড়াম্ করে বাইরে থেকে শেকলটা তুলে দিলেন। অনেকটা নিজের মনেই বললেন, 'থাকো এখানে!'

পড়্‌শীরা একটু নিরাশ হয়েই চলে গেল।

সিদ্ধেশ্বর তখন কাছারী যাচ্ছিলেন। হরিচরণের বাড়ীর কাছে এসে চারিদিক তিনি একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর ছাতাটাকে বন্ধ করে বগলে পুরে হরিচরণের দাওয়ায় উঠে ডাকলেন,—'হরিচরণ, ও হরিচরণ—'

ডাক শুনে হরিচরণ বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখ দু'টো জবা-ফুলের মত লাল।

সিদ্ধেশ্বর সে সব লক্ষ্য না করে বললেন, 'ব্যাপার কী হরিচরণ—বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে নাকি! এত গোলমাল কিসের?'—সিদ্ধেশ্বর উত্তেজনায় বগল থেকে ছাতাটা বের করে আবার বগলে পুরলেন।

হরিচরণ খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বল্‌লেন।

সিদ্ধেশ্বর ছাতাটা আর একবার বের করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হরিচরণের শেষ কথাটা শুনে থেমে গেলেন—'এ্যাঁ, তাই বলে তুমি ওই এক ফোঁটা মেয়ের গায়ে হাত তুললে! রাগলে দেখছি তোমারও মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, ওই সবে একটা মেয়ে···না না, এ অন্যায়, ভারী অন্যায়···মেয়ে-মানুষের গায়ে হাত তোলাটা আমি মোটেই পছন্দ করি নে—তা সে নিজের মেয়েই হোক, আর পরের মেয়েই হোক। তোমাকে ভাল লোক বলেই জানতাম হরিচরণ—ছিঃ ছিঃ! ভারী অন্যায়—ডাকো দিকিন্ একবার সেই পাগলীকে—আমি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাই—ছি ছি—'

হরিচরণ অপরাধীর মত চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। সিদ্ধেশ্বর থামলে বল্‌লেন, 'কিন্তু দুর্গার মা এখন ওকে ছাড়বে না—'

'যতই হোক মায়ের প্রাণ তো! তোমার মত সবাই নয়, বুঝলে হরিচরণ—আচ্ছা, আমি এখন চললুম, আজ আবার একটা নীলেম আছে কিনা—' সিদ্ধেশ্বর চলে গেলেন। হরিচরণ তখনও স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

হরিচরণের বাড়ীর পিছন দিকে একটা সরু গলি। গলিটা দিয়ে শিবু যাচ্ছিল। শিবু পাড়ার ছেলে। হরিচরণের বাড়ীর কাছাকাছি আস্‌তেই পথের ওপর কী একটা জিনিষ চক্‌ চক্‌ করছে দেখে শিবু সেটা কুড়িয়ে নিলে। একগাছি সোণার চুড়ী। শিবু চুড়ীটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে, হঠাৎ—'এই শিবু, শোন'!

শিবু চেয়ে দেখে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দুর্গা। শিবু জানালা-গোড়ায় সরে এল। দুর্গা দু'হাত দিয়ে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল। তার এক হাতে এক গাছি সোণার সরু চুড়ী চিক্‌চিক্‌ করছে, আর এক হাত খালি। দুর্গার হাতের দিকে চেয়ে শিবু বললে, 'তুই চুড়ী ফেলেছিস দুর্গা?'

দুর্গা বললে, 'ফেলেইছি ত। মা আমায় দরজা বন্ধ করে রাখবে কেন? পেরিয়ে এসে দেনা শিবু দরজাটা খুলে—'

'হুঁ, আমি দরজা খুলে দি, আর তুই অম্‌নি ছাদে গিয়ে হা-ডু-ডু খেলতে সুরু কর'—শিবু চলে যাবার ভান করলে।

'অ শিবু দা' লক্ষ্মীটী—'

'আগে বল্ ছাদে যাবি নে?

'না, যাবো না।'

জ্ঞানদা বোধ হয় তখন রান্না-ঘরে ব্যস্ত ছিলেন। শিবু চুপি চুপি এসে শেকল খুলে দুর্গার ঘরে ঢুকলো। বললে, 'কই, দেখি তোর হাত—'

দুর্গা তার ডান হাতটা শিবুর দিকে এগিয়ে দিলে। শিবু তার হাতে চুড়ীটা পড়িয়ে দিচ্ছিল।

দুর্গা চেঁচিয়ে উঠলো—'উঃ, আস্তে শিবুদা, লাগে।'

'চুড়ী আর খুলবি কখনও?'

'না'।

একটু পরে হঠাৎ দুর্গা বললে, 'এসো না শিবু দা, বাঘ-বন্দী খেলি।'

'আমি কিন্তু বাঘ হব। বাঘ হয়ে আমি সিধু কাকার ঘাড় মট্‌কাবো'—দুর্গা হি-হি করে হেসে উঠ্‌লো।

শিবু বললে, 'তুই যদি ও-রকম হাসবি, আমি এক্ষুণি চলে যাবো।'

হাসি থামিয়ে দুর্গা বললে, 'এই শিবু, আমায় বিয়ে করবি?'

শিবু ঠোঁট উল্টে বললে, 'পাগলীকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে!'

'পাগলী মেয়ে এলোকেশী রণে চেপেছে,
শিবের গলায় পা'টি দিয়ে জিভ্‌টি কেটেছে—'

দুর্গা আবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো এবং পর-মুহূর্ত্তেই 'ওমা, তুমি যে আমার বর গো' বলে তিনি হাত ঘোমটা টেনে ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

দুর্গার বিয়ের জন্য জ্ঞানদা আজকাল রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দুর্গার শরীরের বাড় দেখে রাত্রে তাঁর ভালো করে ঘুম হয় না। মেয়ের যে এত রূপ, তবুও তার বিয়ের জন্যে ভাবতে হবে—এই চিন্তাটাই সব সময়ে তাঁর মাতৃ-হৃদয়কে পীড়া দিতে থাকে। একদিন হরিচরণকে বল্লেন, 'দুগ্‌গা যে এবার তেরোয় পড়বে গো—' তিনি ব্যাকুলদৃষ্টিতে হরিচরণের পানে চাহিলেন।

'তা পড়বেই তো, জোর করে তো আর আটকানো যায় না—' হরিচরণ হুঁকা থেকে কল্‌কেটা তুলে নিয়ে একান্ত নিবিষ্টচিত্তে ফুঁ দিতে লাগ্‌লেন।

'এরপর ওর একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে তো আর চলে না।'

হরিচরণ কল্‌কে থেকে মুখ তুলে জ্ঞানদার পানে চাহিলেন—'তুমি কি ভেবেছো জ্ঞানদা, ওই পাগ্‌লীটাকে বিয়ে করবার জন্যে লোকে মাথায় টোপর পরে বসে রয়েছে? হুঁ!' হরিচরণ হুকা টানতে লাগলেন।

জ্ঞানদার সাম্‌নে দুর্গাকে কেউ পাগলী বললে জ্ঞানদার বড় রাগ হয়। হবারই কথা। তিনি বললেন, 'মেয়ে তো আমার পাগল নয়, পাগল হচ্ছ তোমরা। ওকে তোমরা বুঝতে পারো না, তাই পাগল বলে উড়িয়ে দাও। কিন্তু দুগ্‌গার বিয়ে আমি দোবই। কার্ত্তিকের মত জামাই আনবো—নইলে দুগ্‌গার সঙ্গে মানাবে কেন?'

হরিচরণ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'তাই এনো।'

'হ্যাঁ, আনবোই তো। চেলীর সাড়ী পরে, চন্দনের ফোঁটা কপালে, পাল্‌কী চড়ে দুগ্‌গা শ্বশুর বাড়ী যাবে, সঙ্গে যাবে কামিনী...তারপর দুগ্‌গার ফুটফুটে একটি ছেলে হবে···' জ্ঞানদা কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না, তাঁর বুক ঠেলে কান্না আস্‌ছিল।

'—তারপর রূপোর ঝিনুক দিয়ে তুমি নাতীর মুখ দেখবে—বলে যাও জ্ঞানদা, থাম্‌লে কেন...তোমার স্বপ্নে আমি বাধা দোব না, বলে যাও'—হরিচরণের হুঁকো আরও জোরে জোরে ডাকতে লাগ্‌ল।

'ওগো, নইলে আমি যে মরেও শান্তি পাবো না'—জ্ঞানদা এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শিবু চান্ করে পলাশডাঙ্গার রাস্তাটা দিয়ে আস্‌ছিল। বাঁক ফিরতেই একটা গাছের ওপর থেকে কে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল। শিবু ওপর দিকে চেয়ে দেখে—পলাশ ডালে পা ঝুলিয়ে বসে দুর্গা হাস্‌ছে।

শিবু অবাক্ হয়ে বললে, 'কে রে দুগ্‌গা?'

দুর্গা তেম্‌নি হাসতে লাগলো।

'দুপুর রোদে এখানে কি করছিস্ রে?'

'ফুল পাড়ছি, এই দেখো না এক আঁচল ফুল হয়েছে।'

'অত ফুল কি হবে?'

'কাপড় ছোপাবো'—দুর্গা গাছের ডাল ধরে আস্তে আস্তে নামতে লাগ্‌ল। কিন্তু খানিকটা নেমে আর নামতে পারে না। 'ও শিবুদা, আমায় নামিয়ে দাও না'—ওপর থেকে দুর্গা করুণ দৃষ্টিতে শিবুর পানে চাইলে।

'দাঁড়া দুগ্‌গা, তাড়াতাড়ি করিস্‌নে'—শিবু গামছাটা বেশ করে, কোমড়ে জড়িয়ে গাছের গুঁড়ি বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠলো। তারপর এক হাতে গাছের একটা ডাল ধরে, আর এক হাত দিয়ে দুর্গার একটা হাত ধরে বললে, 'আমার ঘাড়ে পা দে—'

'ওমা, তুমি যে আমার—'

'ধ্যেৎ! হ্যাঁ, আস্তে, তাড়াতাড়ি করিস্‌নে·· এর পর লাফিয়ে পড়—বেশী উঁচু নেই...।

দুর্গা ঝুপ্ করে মাটির ওপর লাফিয়ে পড়লো। শিবুও নেমে এল। তারপর তা'রা দু'জনে পাশাপাশি পথ চলতে লাগলো।

খানিক দূর এসে, হঠাৎ এক সময়ে 'আঁক্' করে আঁৎকে উঠে, দুর্গা শিবুকে দু' হাত দিয়ে জাপ্‌টে ধরল। শিবু ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'কি রে দুগ্‌গা, সাপ না ব্যাঙ?'

দুর্গা ভয়-চকিত দৃষ্টিতে সাম্‌নের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'কাবুলীওলা—'

একটা কাবুলীওয়ালা সেই দিকেই আস্‌ছিল। দুর্গার ভয় দেখে শিবু একটু হেসে বললে, 'তুই তো আচ্ছা ভীতু! ও কাবুলীওলা—' ভয়ে দুর্গা শিবুর গায়ে লেপ্‌টে রইলো, —'লক্ষ্মীটি শিবুদা—'

কাবুলীওয়ালা কিন্তু কাছে এসে দাঁড়াতেই শিবুর শুষ্ক মুখ শুকিয়ে গেল। হঠাৎ দুর্গার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে একটা বুদ্ধি জোগালো। সে ভাবলে কাবলীটাকে কোনও রকমে খুশী করতে পারলে, সে আর তাকে ধরবে না। অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে দুর্গা বললে, 'কাবুলীওলা, তুমি ফুল নেবে?'

কাব্‌লী কি বুঝলে জানি না, কিন্তু সে তার মোটা মোটা আঙুলওয়ালা শিরাবহুল একটা হাত দুর্গার দিকে বাড়িয়ে দিলে।

দুর্গা তার আঁচল থেকে কতকগুলো ফুল নিয়ে আল্‌গোছে কাবুলীওয়ালার হাতে ফেলে দিলে। দেবতার প্রসাদী ফুলের মত ফুলগুলো নিজের পাগ্‌ড়ীতে গুঁজে, একটু হেসে কাবুলীওলা চলে গেল। খানিক পরেই সে বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু তার ডাক তখনও শোনা যাচ্ছিল—'হীং আছে হীং, ভাল হীং···গুজরাটী হী···মূলতানী হী···ং···'

শিবু চারিদিকটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললে, 'বেটার গায়ে কি বিশ্রী গন্ধ রে!'

'হুঁ, বমি আসে'—দুর্গা মুখ বিকৃতি করলে।

হঠাৎ শিবুর কি খেয়াল হোল, কোমর থেকে গামছাটা খুলে নিয়ে, কাবুলীওয়ালার অনুকরণে নিজের মাথায় পাগড়ীর মত করে বাঁধলে, বললে, 'কেমন দেখাচ্ছে রে দুগ্‌গা?'

দুর্গা হি-হি করে হেসে উঠলো, যেন হাসির চোটে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে···। হাসতে হাসতে বললে, 'তোমার মাথায় পাগ্‌ড়ী, যেন শিবের মাথায় জটা...

হি-হি শিবের মাথায় জটা
ও শিব বিয়ে করবে ক'টা?'

হাসতে হাসতে দুর্গা রাস্তার ওপর প্রায় গড়িয়ে পড়লো।

শিবু তাড়াতাড়ি তার পাগ্‌ড়ী খুলে বললে, 'ধোৎ, আচ্ছা বিয়ে-পাগ্‌লী মেয়ে তো! চল্ বাড়ী যাই—'

হরিচরণ বাহিরের ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। সিদ্ধেশ্বর ডাকলেন, 'হরিচরণ নাকি? তামাকের বেড়ে খোস্‌বুই ছুটিয়েছ তো! বিষ্টুপুরী তামাক বুঝি? পেরিয়ে যাচ্ছিলাম রাস্তা দিয়ে—হুঁকোর ডাক শুনে ঢুকে পড়লাম। ভাবলাম দু'টো সুখ-টান দিয়ে যাই। হুঁকোটা একবার বাড়িয়ে দাও দিকিন্—' ছাতাটা পাশে রেখে সিদ্ধেশ্বর তক্তপোষের ওপর বসে পড়লেন। হরিচরণের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে দুটো টান্ দিয়ে বললেন, 'দেখলে হরিচরণ, কুঞ্জ সাহার কাণ্ডটা একবার দেখলে—'

কুঞ্জ সাহার কাণ্ডটা হরিচরণ এখনও দেখে নাই বা শুনে নাই জেনে, অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সিদ্ধেশ্বর তাঁর পানে চাহিলেন, এত বড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, গাঁয়ে বসে তুমি এখনও শোননি! স্ত্রীবিয়োগের অশুচটা পেরোতে তর্ সইলো না, ছাপ্পান্ন বছরের বুড়ো আর একটা বিয়ে করে বসলো...মেয়ের বাপকেও বলিহারী! এর চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিলেই পারতিস্। ছি! ছি! এরা মানুষ না জানোয়ার! এই যে একটা কচি মেয়ের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—এর কি কোনও প্রতিবিধান নেই? এ্যা?' সিদ্ধেশ্বর খুব জোরে জোরে হুঁকা টান্‌তে লাগলেন। হরিচরণ চুপ করে বসে।

'কি, চুপ্ করে রইলে যে! এর একটা জবাব দাও?' হরিচরণ তখনও চুপ।

'তুমি কি ভাবছো বলো তো হরিচরণ?'

'ভাবছি দুর্গার কথা। ওর-ও একটা বিয়ে দিতে হবে ত?'

সিদ্ধেশ্বর ক্ষেপে ফেললেন,—'কি বললে, ওই এক ফোঁটা মেয়ের বিয়ে—' হুঁকোটা সিদ্ধেশ্বর তক্তপোষের গায়ে ঠেসিয়ে রাখলেন,—'তোমার মতলবটা কি বলো তো হরিচরণ—সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, ওই একটা মেয়ে··· ওকে বিদেয় করবার জন্য হঠাৎ তুমি এতটা ক্ষেপে উঠলে কেন? বিয়ে দেওয়া মানেই মেয়েকে পর করে দেওয়া— মেয়ের বাপকে এ কথাটাও বুঝিয়ে বলতে হবে?'

'সবই বুঝি সিদ্ধেশ্বর, কিন্তু ওর মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনে—'

'পারবেও না। যতই হোক, মায়ের প্রাণ ত! একটা কথা কি জান, বিয়েটা যতই আনন্দের ব্যাপার হোক, কোনও মেয়ের বিয়ে হবে শুনলেই মনটা আমার কেমন যেন খারাপ হয়ে যায়—তা সে আমার নিজের মেয়েই হোক, আর পরের মেয়েই হোক। আমি নিজে বৈরিগী মানুষ, কিন্তু তবুও তোমাদের মত মনটাকে পাথর করতে পারি নে হরিচরণ—। 'হ্যাঁ, ভাল কথা, কই পাগ্‌লীকে দেখতে পাচ্ছি নে তো?'

'কি জানি কোথায় হয়ত রোদে রোদে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—' হরিচরণ নির্লিপ্তকণ্ঠে বল্‌লেন।

সিদ্ধেশ্বর হাসলেন,—'ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ। আর এরই বিয়ের জন্যে তোমার চোখে ঘুম নেই। পাগল কি আর গাছে ফলে! আচ্ছা, আমি এখন উঠি। সুয্যি কৈবর্ত্তকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি... দু' বছরের খাজনা বাকী···কিছু বলতে গেলেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠ্‌বে···এদের নিয়ে মহা ফ্যাসাদেই পড়া গেছে···খাসা তামাকটা হরিচরণ, ফেরবার মুখে আর দু'টো টান্ দিয়ে যাবো'খন—' ছাতাটা বগলে পুরে সিদ্ধেশ্বর বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু বছরখানেক পরে একদিন সত্যি সত্যিই দুর্গার বিয়ে হয়ে গেল। নেহাৎ কার্ত্তিকের মত না হলেও, পাত্র হিসেবে সনাতন মন্দ নয়। বয়স ২৭।২৮, দেখতে শুনতে চলন-সই। বাড়ীর অবস্থাও ভালই বল্‌তে হবে। জমি-জমা আছে, পাকা দালান বাড়ী আছে, গোয়াল-ভরা গরু আছে—আর কি চায়! এককালে এরাই নাকি ছিল ঝুমঝুমিপুরের জমিদার। কিন্তু সে অনেক কালের কথা।

গাঁয়ের সুরোপিসি কাদম্বিনীকে আড়ালে ডেকে বল্‌লেন, 'কপাল না কপাল! নইলে এত মেয়ে থাকতে ওই হাবা-গোবা পাগ্‌লীটাকেই ওদের মনে ধরবে কেন? দেখেছিস্ ত আমার বোন্-ঝিকে!'

"খুব দেখেছি। সুরোপিসির বোন-ঝি থাকতে দুগ্‌গা পাগ্‌লীকে ওদের কি করে যে পছন্দ হল, আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারি না। আর শুধু কি পছন্দ! সনাতনের বাপ এক রকম নিজে যেচে এ বিয়ে ঠিক করেছে। বিয়ের খরচ ছাড়া এক পয়সাও নাকি নেয় নি। ছি, ছি, লাজে মরে যাই!"

কাদম্বিনী সত্যিই লাজে মরে গেলে, কারও কোনও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু শ্বশুড়বাড়ী গিয়ে দুর্গার আদরের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। মেয়ের দল তাকে ভীড় করে ঘিরে রইল, নড়তে চায় না। কেউ তার গায়ের রং দেখে অবাক্ হয়ে গেল, কেউ তার চোখের পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কেউ তার চুলের গোছা নিয়ে টানাটানি সুরু করে দিলে। একটি কৌতূহলী মেয়ে ভীড়ের ভেতর থেকে দুর্গার গা টিপে দেখলে। বোধ হয় সে দেখতে চাইলে দুর্গা সত্যিই মানুষ, না মানুষের ছাঁচে ঢালা সোণার প্রতিমূর্ত্তি। লোকের ভীড়ে, আদর যত্নের আড়ম্বরে, এবং অবিশ্রান্ত কোলাহলে ঘাব্‌ড়ে গিয়ে দুর্গা শেষকালে কেঁদে ফেললে।

দু' তিন মাস কেটে গেল। বিয়ের পর দুর্গা একেবারে পাল্‌টে গেল। সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠ্‌ল। তার কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে কেউ কোনও খুঁৎ খুঁজে পেলে না।

কিন্তু একদিন দুর্গা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। সেদিন দুপুরে দুর্গা ভাত খাচ্ছে আর পুষী বেড়ালটা অদূরে বসে নিতান্ত ভালোমানুষের মত তাই দেখছে, আর মাঝে মাঝে হাই তুলছে।

দুর্গাকে মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক দেখে বেড়ালটা নিঃশব্দে এসে ফস্ করে তার পাত থেকে মাছের খানিকটা তুলে নিলে। 'ওই যাঃ! বেড়ালে আমার মাছ নিয়ে পালালো'—খাওয়া ফেলে দুর্গা ছুট্‌লো বেড়ালের পিছনে। বেড়ালটা তখন আড়ালে গিয়ে মাছের খানিকটা সদ্‌গতির চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। দুর্গা ছুটে গিয়ে এঁটো হাতেই বেড়ালটাকে খপ্ করে ধরে ফেললে। বেড়ালটা দুর্গার এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না, ঘাবড়ে গিয়ে নখ দিয়ে আঁচড়ে সে দুর্গার হাত ক্ষত বিক্ষত করে দিলে। দুর্গা কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না। বেড়াল যত আঁচড়ায়, দুর্গা তত তার কাণ ধরে টানে। শেষকালে দুর্গাকে যখন ছাড়িয়ে নেওয়া হল, তার মুখে তখনও সেই এক কথা—'ও আমার মাছ নিয়ে পালাবে কেন?'

দুর্গার কাণ্ড দেখে সকলে ত অবাক্। একি অনাছিষ্টি ব্যাপার! একি অলুক্ষণে কাণ্ড! ছি ছি, লোকে শুনলে বলবে কি!

দুর্গার শাশুড়ী তার হাতে ধরে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'বলি হাঁ বাছা, একি কাণ্ড বল দিকিন্? বাপের বাড়ী থেকে এই শিক্ষেই পেয়ে এসেছ নাকি! এটা গেরস্ত-বাড়ী, ও-সব বেল্লিকি-পনা এখানে চলবে না বাছা···নাও, সঙের মত আর এঁটো হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, গিয়ে হাত মুখ ধোও···রাগে তুম্ তুম্ করতে করতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু এর দিন পনেরো পরে যে ব্যাপারটা ঘট্‌লো, সেটা আরও সাংঘাতিক। রাত্রে দুর্গা আর সনাতন শুয়েছিল। সনাতন তখনও ঘুমোয় নি; হঠাৎ দুর্গা বিছানার ওপর উঠে বসলো।

সনাতন বললে, 'উঠলে যে?'

দুর্গা বললে, 'আমি বাড়ী যাবো।'

সনাতন অবাক্ হয়ে বললে, 'বাড়ী যাবে—এই রাত্রে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এটাও কি তোমার বাড়ী নয়?'

'না।'

'এখানে থাকতে তোমার ভাল লাগে না?'

'না।'

'আমার কাছে থাকতে তোমার ভাল লাগে না?'

'না'

'কিন্তু আমি তোমার স্বামী—আমায় তুমি ভালবাস না?'

'না'

সনাতন গম্ভীর হল। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'বেশ, কাল তোমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দোব, এখন শোও—' দুর্গাকে ধরে সনাতন শুইয়ে দিলে। হঠাৎ সনাতনের কি খেয়াল হোল, দুর্গাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিলে, বললে, 'দুর্গা, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?'

দুর্গা কিছু জবাব দিলে না, খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। ব্যাপারটা সনাতন ঠিক বুঝতে পারলে না, বললে, 'তুমি হাসছো কেন?'

'ছাড়ো, আমার বড্ড সুড়্‌সুড়ি লাগছে'—দুর্গা তেমনি হাসতে লাগল। সনাতন কিন্তু ছাড়লে না, আরও নিবিড়ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

'ছাড়ো—'

'না।'

'ছাড়ো—'

'না।'

'আঃ, ছাড়ো—হি হি!···'

সনাতন নাছোড়বান্দা। হঠাৎ দুর্গা একটা অঘটন ঘটিয়ে বসলো। সনাতনের কাঁধে দিলে একটা প্রচণ্ড কামড় বসিয়ে। এর ফল হল অত্যন্ত শোচনীয়। আঘাতটা গুরুতর হওয়ায় সনাতন যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠ্‌ল। ভয় পেয়ে দুর্গা দরজা খুলে অন্ধকার বারান্দার এক কোণে এসে দাঁড়ালো। সনাতনের চীৎকারে বাড়ী শুদ্ধ সকলে ছুটে এল। সনাতন কাঁধ দেখিয়ে বললে, 'ও রাক্ষুসী আমায় একেবারে মেরে ফেলেছে।' সনাতনের কাঁধ থেকে তখন রক্ত পড়ছে।

একজন বললে, 'রাক্ষুসী মাগি গেলো কোথা—'

অপর একজন প্রবীণা বললেন, 'রাক্ষুসী নয়, ডাইনী—ওর চোখ দেখে তখুনি আমার মনে হয়েছিল—খেঁদী, নিয়ে আয় তো ঝাঁটা গাছটা, আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন—'

দুর্গার সঙ্গে কামিনী-ঝি এসেছিল। গোলমাল শুনে সেও ছুটে এল,—'কি হয়েছে গা, এত গোলমাল কিসের?'

'গোলমাল কিসের! কাণা হয়েছিস নাকি মাগি? দেখতে পাচ্ছিস্ নে? যত সব ছোটলোকের কাণ্ড,—সেই আবাগীর বেটী গেলো কোথা—নোড়া দিয়ে ছেঁচে আজ ওর দাঁত ভোঁতা করে ছাড়্‌বো না···।'

দুর্গা চুপি চুপি উঠোন পেরিয়ে খিড়্‌কী দরজা খুলে পথে এসে দাঁড়ালো। পথ পেরিয়ে মাঠে নামলো। একবার ভয়চকিত দৃষ্টিতে পিছন ফিরে চাইলে, তারপর মাঠ ভেঙে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে আরম্ভ করলো। 'ও কামিনী

পিসি, শীগ্‌গির আয়—এরা আমায় মারবে। ও কামিনী পিসি, ও শিবুদা, তোমরা কোথায় গো, শীগ্‌গির এসো—এরা আমায় মারবে'—দুর্গা ছুট্‌তে লাগলো।

রাত্রি অন্ধকার। আকাশে মেঘ থাকায় অন্ধকার আরও গভীর, আরও নিবিড়। পথ-মাঠ-ঘাট কিছুই দেখা যায় না। সেই অন্ধকারের মাঝে উদ্‌ভ্রান্তের মত দুর্গা ছুটতে লাগলো। দুর্গা খানিক ছোটে, খানিক দাঁড়ায়, পিছন ফিরে চায়, আবার ছোটে। ক্রমে হাওয়া উঠ্‌লো, অদূরে তালগাছের মাথাগুলো শন্‌শন্‌ করতে লাগল, আকাশের তারা মুছে গেল......তারপর ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে বৃষ্টি নামলো। দুর্গা তবু ছুট্‌তে লাগ্‌লো।

মাঠ পিছল হ'ল। কাদায় দুর্গার পা ডুবে যেতে লাগলো, হোঁচট লেগে পড়ে গিয়ে তার হাঁটু ছড়ে গেল। দুর্গা তবু ছুটতে লাগলো......

বৃষ্টির দাপটে দু' একটা শেয়াল তার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল, দু' একটা সাপ তার পায়ের তলে কিল্‌বিল্‌ করে উঠলো, দু' একটা পেঁচা বিশ্রী শব্দ করতে করতে তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। দুর্গা তবু ছুটতে লাগলো...

ক্রমে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এল, বৃষ্টি আরও জোরে চেপে এল। বৃষ্টির ফোঁটা দুর্গার গায়ে ছুঁচের মত বিঁধতে লাগলো, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা তার চারপাশে যেন একটা দুর্ভেদ্য দেওয়াল সৃষ্টি করে, তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। দুর্গা আর ছুটতে পারলে না, একটা গাছের তলায় এসে দাঁড়ালো। কয়েক মিনিট দাঁড়াবার পরই দুর্গার গা হাত পা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল, তার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসতে লাগল। দুর্গার ভয় হল—না ছুটলে সে হয়ত আর ছুটতে পারবে না, ঠাণ্ডায় তার হাত পা জমে যাবে। 'কামিনীপিসি, শিবু-দা, তোমরা কোথায় গো, আমি যে আর ছুটতে পারি নে'—দুর্গা আবার ছুটতে আরম্ভ করলো। দাঁতে দাঁত চেপে, দু'হাত মুঠি করে পাগ্‌লী দুর্গা পাগলিনীর মত ছুটতে লাগলো।

মাঠ পেরিয়ে একটা বস্তী। বস্তীটা সুপ্ত। জনামনিষ্যির সাড়াশব্দ নেই। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে দুর্গাকে তাড়া করে এল। বস্তীর পিছনে গুলঞ্চ-বন, তার পেছনে দলুমীদীঘি, তার পেছনে ধান-ক্ষেত। দুর্গা ধানক্ষেতের আ'ল্‌ বেয়ে ছুটতে লাগল। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে, অন্ধকারও অনেকটা কমেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কোথায় গাঁয়ের নালা দিয়ে জল বয়ে চলেছে—তার একটা হু হু শব্দ আসছে। আ'ল্‌ বেয়ে দুর্গা ছুটতে লাগল। আ'লের দু'পাশে ক্ষেতের মাঝে এক কোমর জল দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ পা পিছলে দুর্গা আ'ল্‌ থেকে জলের ওপর পড়ে গেল। জল থেকে উঠে দুর্গা আবার ছুটতে লাগল। হঠাৎ দেখলে অদূরে আলো জ্বলছে। আলেয়া নয় ত! এত রাত্রে মাঠের মাঝে আলো! হোক আলেয়া। দুর্গা মরি বাঁচি করে ছুটলো সেই আলো লক্ষ্য করে। দু'জন লোক কোদাল হাতে ক্ষেতের আ'ল্‌ বাঁধছিল—বৃষ্টির জল যা'তে বেরিয়ে না যায়। চাষী-বাসী হবে।

দুর্গা ছুটে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'হ্যাঁ-গা, এখান থেকে কাঁকনজোড় কতদূর?'

দুর্গাকে দেখে তা'রা ভীষণ চম্‌কে গেল। প্রথমে তাদের মুখ দিয়ে কোনও কথাই বে'র হ'ল না। তারা দুজনেই অবাক্‌ হয়ে দুর্গার মুখের পানে চেয়ে রইল।

দুর্গা আবার বললে, 'এখান থেকে কাঁকনজোড় কত দূর বল নাগো? একজন আম্‌তা আম্‌তা করে বললে, 'কাঁকনজোড়? সে ত অনেক দূর—'

'কত দূর?'

'কোশ দুই হবে। কিন্তু তুমি কে গা?'

'আমি দুগ্‌গা'—দুর্গা আবার ছুটতে আরম্ভ করল।

দুর্গা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবামাত্র প্রথম চাষী বললে, 'ব্যাপারটা কিছু বুঝলে হীরু খুড়ো?'

হীরু খুড়ো গম্ভীরভাবে বললে, 'দলুমীদীঘির পাড়ে সেই যে বিশালাক্ষীর মন্দির আছে—আমার মনে হয়'—কি যে মনে হয় সেটা ইঙ্গিতে প্রকাশ করে বললে, 'দেখলি নে চোখ!'

ঘণ্টাখানেক পরে কামিনী-ঝী, হীরু খুড়ো এবং তার সঙ্গীকে নিয়ে দুর্গার খোঁজ করতে করতে বোরাইচণ্ডীর মাঠে এসে দেখলে, একটা শিমুলগাছের তলায় দুর্গা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার কপালের কাছে খানিকটা কেটে গিয়ে সেখানটা রক্তে কালো হয়ে আছে।

পরদিন সকালে কাঁকনজোড় গ্রামে হরিচরণের বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। সিদ্ধেশ্বরের গলার আওয়াজটাই বেশী শোনা যাচ্ছিল—'ভগবান নেই? আদালত নেই? বেটাদের নামে নালিশ করবো—পুলিশে দোব·····মেয়েমানুষের গায়ে হাত! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব না! হরিচরণ, তুমি যদি মানুষ হও, মেয়েকে আর ও ছোটলোকের বাড়ীতে পাঠিও না...জোচ্চোর, বদমাইস! এ্যাঁ, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা! জুতিয়ে...'

সুরোপিসি কাদম্বিনীকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'কপাল লা সবই কপাল! অমন সোয়ামীর ঘর করতে পেলে না। নইলে দেখেছিস্ তো আমার বোনঝিকে? পড়লই বা দোজ-বরে! আর ক'দিনই বা বিয়ে হয়েছে—মাস দুই বই তো নয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে এরই মধ্যে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে। উল্টো রথে আসবো বলেছে—'

কাদম্বিনী একটু চুপ করে থেকে বললে, 'দুগ্‌গার কাণ্ড দেখে ঘেন্নায় মরে যাই। ছি ছি!'

ও ঘরে দুর্গা শুয়ে রয়েছে। দুর্গার জ্বর। মাথার গোড়ায় জ্ঞানদা বসে নিঃশব্দে কাঁদছেন, পায়ের গোড়ায় বসে কামিনী ঘন ঘন আঁচলে চোখ মুছছে।

দিন দুই তিন পরে জ্ঞানদা হরিচরণকে বললে, 'দুর্গাকে তুমি যদি আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাও, আমি গলায় দড়ী দিয়ে মরব।'

হরিচরণ কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানদার মুখের পানে চেয়ে চুপ করে গেলেন।

দুর্গার জ্বরটা গোড়ার দিকে একটু বেশী উঠলেও, বেশী দিন স্থায়ী হল না। দুর্গার স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল। জ্বরে তাকে বিশেষ কাবু করতে পারলে না। সাত আট দিন ভোগের পর আস্তে আস্তে জ্বর ছেড়ে গেল। দুর্গা আবার উঠে বসলো। শুধু তাই নয়, তার জীবনে একটা প্রতিক্রিয়া সুরু হল। শ্বশুর-বাড়ীতে কয়েক মাসের পরাধীন জীবন-যাত্রার পর, প্রকৃতির সবুজ কোলে আবার নিঃসংশয়ে ছাড়া পেয়ে দুর্গার স্বাভাবিক চঞ্চলতা উদ্দাম হয়ে উঠল। মুক্তির অবাধ আনন্দে তার চরিত্রগত বন্য প্রকৃতি আবার সজাগ হয়ে উঠলো। দুর্গা চিরকাল ঘরছাড়া। পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো, পুকুরে সাঁতার কাটা, বৃষ্টিতে ভেজা, বনে বনে ফুল কুড়োনো—এই তার চিরকালের অভ্যেস। দুর্গা এখন শুধু ভবঘুরেই নয়, প্রকৃতির মেয়ে সে এখন হল পুরোমাত্রায় বন-চারিণী।

একদিন শিবু চুপি চুপি বললে, কিরে দুগ্‌গা, ফিরে এলি?

'হ্যাঁ শিবুদা—'

'আর যাস্‌নে যেন—'

ঘাড় নেড়ে দুর্গা বললে 'না'।

মাস দেড় পরের কথা। গ্রামের বলাই কুণ্ডু কি কাজে ঝুমঝুমিপুর গিয়েছিল। ফিরে এসে খবর দিলে, কাঁধের ঘা শুকোবার পরই সনাতন আর একটা বিয়ে করেছে। এবারের বৌটি কালো। সনাতন নাকি ইচ্ছে করেই এবার কালো বৌ এনেছে।

হরিচরণ জ্ঞানদাকে গিয়ে বললেন, 'শুনেছ জ্ঞানদা?'

'কি?'

'সনাতন আর একটা বিয়ে করেছে'—হরিচরণের মুখ পাথরের মত কঠিন। 'ওর নাম তুমি আমার কাছে করো না—' জ্ঞানদা অন্যত্র চলে গেলেন।

দিন কয়েক পরে একদিন সন্ধ্যার সময়ে দুর্গা চন্দনসায়রের ঘাটে নাইতে গেল।, সন্ধ্যা উত্‌রে গেল, রাত হল—দুর্গা আর ফিরলো না।

জ্ঞানদা চিন্তিত হলেন। আরও খানিক অপেক্ষা করে, পুকুর ঘাটে এসে তিনি অবাক্ হলেন—দুর্গা নেই। তিনি এ ঘাট, সে ঘাট খুঁজলেন, বার কয়েক ডাকলেন, কিন্তু কারও দেখা বা সাড়া পেলেন না।

তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে হরিচরণকে বললেন, 'ওগো শীগ্‌গির এস, দুগ্‌গা ডুবে গেছে—'

হরিচরণ হুঁকো টানছিলেন—কল্‌কের আগুন নিভে গিয়েছিল, তবুও টানছিলেন। জ্ঞানদার কথা শুনে তাঁর হাত থেকে হুঁকো পড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু দুর্গা ত ডুববে না, সে সাঁতার জানে।'

জ্ঞানদা ডাক ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। হরিচরণ বললেন, 'তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না জ্ঞানদা। আর, লণ্ঠনটা আবার গেলো কোথা···!'

লণ্ঠনটা সাম্‌নেই জ্বলছিল। কামিনী এনে হরিচণের হাতে ধরিয়ে দিলে, কথা শুনে আশেপাশের লোকজন এসে জুটেছিল। ব্যাপার শুনে সবাই ছুটলো পুকুরের দিকে। এক দল লোক ছুটলো জেলেদের বাড়ী।

পুকুরের চার পাশ খোঁজা হল। পুকুরের উত্তর পাড়ে পলাশ-বন—সেখানে খোঁজা হল; পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে বাঘা-নালা দ্বারকেশ্বরের খালে গিয়ে পড়েছে—নালাটা প্রায় এক কোমর গভীর—আগাছায় ওপরটা ঢেকে রয়েছে···অনেকে বলে, কখনও কখনও কুমীর অথবা বাঘ সেই নালা দিয়ে গ্রামে আসে—সেই বাঘা-নালা খোঁজা হল,' কিন্তু দুর্গাকে পাওয়া গেল না।

জেলেরা জাল নিয়ে পুকুর-ঘাটে হাজির হল। হঠাৎ সবাই দেখলে, জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে কে যেন ঘাটের দিকে আসছে।

হরিচরণ চোখ বুজলেন, মনে মনে বিপত্তারিণীকে স্মরণ করে পাঁঠা মানৎ করলেন। জল থেকে ঘাটের ওপর উঠে দাঁড়াতেই সকলে আলো নিয়ে ছুটলো সেইদিকে—'কে ? কে ?'

'আমি শিবু। দুগ্‌গাকে খুঁজছিলুম—পেলুম না।' পুকুরে জাল ফেলা হল। দুর্গা উঠলো না। সমস্ত রাত্রি ধরে দুর্গার খোঁজ করা হল, তার পরদিন সমস্ত গ্রাম—দুর্গাকে কিন্তু পাওয়া গেল না। কেউ বললে, 'দুর্গা ডুবে মরেছে।' অপর কেউ বললে, 'দুর্গাকে বাঘে নিয়ে গেছে।' কেউ বললে, 'কুমীরে'।

দু'দিন পেরিয়ে গেল। তৃতীয় দিন খুব ভোরে বাহিরে শুনে হরিচরণ বেরিয়ে এসে বললেন—'কে ?'

'আজ্ঞে, আমি সুথ্যি কৈবর্ত্ত। দা' ঠাকুর, দুগ্‌গা-মাকে পাওয়া গেছে।'

'এঁ্যা, পাওয়া গেছে ?' হরিচরণ প'ড়ে যাচ্ছিলেন, সুখ্যি ধরে ফেললে।

'আজ্ঞে হাঁ দা'ঠাকুর, পাওয়া গেছে। চন্দন সায়রের দক্ষিণ পাড়ে বাঘা-নালার ভেতর।

'কিন্তু সেখানে তো খোঁজা হয়েছিল—'

'কি জানি দা' ঠাকুর। পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরছিলাম, হঠাৎ একটা বড় রুই চুপ্‌ড়ীর ভেতর থেকে লাফিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে সেই নালার ভেতর গিয়ে পড়লো। মাছটাকে তুলতে গিয়ে দেখি দুগ্‌গা ঠাকরুণ—যেন পাঁকের মধ্যে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে—' সুখ্যি কৈবর্ত্ত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

সকলে মিলে ধরাধরি করে দুর্গাকে যখন ঘরে এনে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলে, দুর্গার তখন প্রাণ আছে, কিন্তু জ্ঞান নেই। ডাক্তার এসে রুগী পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন — আশা কম। ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়া হল, হাতে পায়ে গরম সেঁক দেওয়া হল, দুর্গা কিন্তু তেম্‌নি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল। খানিক পরে হঠাৎ দুর্গার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বের হল। ডাক্তার নাড়ী দেখলেন, তারপর দুর্গার হাত আস্তে আস্তে বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দুর্গা একবারে চোখ মেলে চাইলে — তার ঘোলাটে দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য স্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ একটা ভীষণ চীৎকার করে দুর্গা বিছানার উপর উঠে বসলো—'ওই, ওই আবার আসছে...উঃ ছাড়ো...ও সিধু কাকা, তোমার পায়ে পড়ি—আমায় ছেড়ে দাও...আমি বাড়ী যাবো...মা যে আমায় খুঁজবে, ছাড়ো... উঃ মাগো... !' দুর্গা বিছানার ওপর পড়ে গেল।

তার ডাক বোধহয় যথাস্থানে পৌঁছেছিল।

স্যার আশুতোষ

শ্রীমতিলাল রায়

কণ্ঠে আমার শ্রদ্ধাতর্পণের যে মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, তাহা ভারতের কোটী কোটী নর নারীর মর্ম্মবাণী। এই ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিত্ব কিছু নাই, আমি নিরাপদ্।

স্যার আশুতোষ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র বলিয়া বড় নহেন। তাঁহার মহত্ত্ব কলিকাতার উচ্চ আদালতে জজীয়তির জন্যও শুধু নহে। তিনি ১৯০৬ খৃঃ হইতে উপর্য্যুপরি তিন বার ভাইস্‌চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মহিমা নয়। এমন কি তাঁহার অকৃত্রিম স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগের জন্যও আমি তাঁহাকে অসামান্য পুরুষ বলিয়া মনে করি না। তাঁহাকে আমি পূজা করি, শ্রদ্ধা করি, তিনি ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার গঙ্গোত্রীধারা ধূর্জ্জটীর মত মাথা পাতিয়া ধরিয়াছিলেন সেই যুগে, যে যুগে রামমোহন রায়ের প্রতিভা-সূর্য্য বহুপূর্ব্বে অস্তমিত হইয়াছিল — কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব কালচক্রে অন্তর্হিতপ্রায়—দক্ষিণেশ্বরের কণ্ঠও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। সিংহগ্রীব বিবেকানন্দ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিরোধান করিলে, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ভিত্তিরক্ষায় স্যার আশুতোষের আত্মদান কি অপূর্ব্ব জয়শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্যার আশুতোষ আজ ভারতপূজ্য। তিনি ভারতের রাষ্ট্র-স্বাধীনতায় তনু-মন-প্রাণ না ঢালিলেও, ভারতের মৌলিক জ্ঞান-গরিমা-রক্ষায় তিলে তিলে আয়ুঃদান করিয়াছেন। তিনি নির্ভীক, তেজস্বী পুরুষ। তিনি স্বাধীনতার অকপট উপাসক ছিলেন। কিন্তু সে অবিদ্রোহী আত্মার স্বাধীনতাস্পৃহা বিদেশীর শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার জন্য তত নহে, যত জাতির সর্ব্বাঙ্গের মুক্তি—অন্তরের, বাহিরের, বুদ্ধির, মনের, প্রাণের মুক্তির জন্য। জাতির মধ্যে প্রতি মানুষকে মুক্তির অমৃতে নূতন জন্ম দিবার জন্য তাঁহার জন্ম, তাঁহার বাণী—উহা সার্থক হইয়াছে।

পরিত্রাণায় চ সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

স্যার আশুতোষের স্মৃতিপূজার মন্ত্র-চয়নের জন্য আমি তাঁর জীবন-চরিত লইয়া বসিয়াছি। কন্‌ভোকেশনের বীরবাণী আলোচনা করার চেষ্টা করিয়াছি। বাঁকিপুর, হাওড়া, রংপুর সাহিত্যসভার অভিভাষণগুলি অনুধাবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। লর্ড লিটনের সহিত তাঁহার পত্র-ব্যবহারের প্রতিলিপিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে চাহিয়াছি। কিন্তু বস্তুকে জানার ভারতের সনাতন নীতি আমায় অভিভূত করিয়াছে। স্মরণে পড়িয়াছে শ্রুতিবাক্য "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—আশুতোষকে জানিতে আশুতোষে চিত্তলয় করিতে গিয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে আশুতোষের বিস্তৃত নয়নের ভাস্বর দৃষ্টি, তাঁহার সুবিশাল বক্ষের উপর রজতশুভ্র উপবীত। আমি সকল গ্রন্থরাজী দূরে নিক্ষেপ করিয়া, স্যার আশুতোষের অনিন্দ্য অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ প্রাণে ছুটিয়া আসিয়াছি শ্রদ্ধাঞ্জলীর নূতন মন্ত্র কণ্ঠে ধরিয়া, আমি তাহাই সশ্রদ্ধায় ঢালিয়া দিয়া যাইব।

বেদ দিয়াছে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভারতের দিব্য সংস্কৃতি। বেদের কর্ম্ম যজ্ঞ। বেদের জ্ঞান ব্রহ্ম। এই বেদের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছে ষড়দর্শন। কপিলের সাংখ্য। পতঞ্জলের যোগ। কণাদের বৈশেষিক। গৌতমের ন্যায়। জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসা। বেদব্যাসের বেদান্ত দর্শন। এই সকল আমাদের তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছে, ভাব দিয়াছে, ভাষা দিয়াছে। গীতায় এই কর্ম্ম জ্ঞানে অন্বিত হইয়া ব্রহ্ম-কর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। আমরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। কিন্তু প্রাণ দিয়াছে ভারতের পুরাণ, ভারতের সংহিতা। যাহা ছিল বিধেয়, তাহা অনুবাদিত হইয়া ভারতের ধর্ম্ম যখন বিগ্রহে পরিণত হইল, তখনই বুঝা গেল

"ময্যেব মন আধৎস ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঃ ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

—এই মহামন্ত্রের তত্ত্ব-মর্ম্ম। আর তখনই শরীরের শিরায় শিরায় রক্তকণিকায় "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং

ব্রজ"—এই মহাবাণী আদর্শ পাইয়া জীবন সফল করিল। ভারতের সংস্কৃতি বিজয়ী হইল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে নব শিক্ষা-সভ্যতার নায়েগ্রাপ্রপাত ইউরোপের সীমায় রুদ্ধ রহিল না, হাক্সলী-টিণ্ডেলের জড়বিজ্ঞানে এদেশও ছাইয়া গেল। কোম্তের প্র্যাগ্‌মেটিক মতবাদে আমাদের সিদ্ধ অধ্যাত্মবিজ্ঞান মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। হিগেল, ক্যাণ্ট, স্পেন্সার, মিলের দার্শনিক প্রভাবে আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া যাওয়ার উপক্রম করিল। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রথিগণ আয়ুঃশেষে রণে ভঙ্গ দিলেন, আর তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ করিতে উঠিলেন স্যার আশুতোষ। নীলকণ্ঠ শিবের মতই তিনি পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সভ্যতা উপাদেয় বলিয়া আত্মসাৎ করিয়া, গড়িয়া তুলিলেন নব যুগের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়। সে এক যুগ ছিল, যে যুগে নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার, কঙ্খল, হিমালয়কন্দর ছিল ভারতের জাতীয় বিদ্যালয়। পরবর্ত্তী যুগে কাশী, কাঞ্চী, মিথিলায় সেই জাতীয় বিদ্যালয় নবরূপে জন্ম লইয়াছিল। তারপর উজ্জয়িনী, নালান্দা, তক্ষশিলা ভারতের জাতিকে, ভারতের প্রকৃতিকে লইয়া, ভারতের সত্য লইয়া জিয়াইয়াছিল। আর আজ আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া যুগধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। এ কৃতিত্ব ভুলিবার নহে। এ মহত্বের পূজার মন্ত্র জাতির কণ্ঠ-ছাড়া হইবে না। আজ আমার মনে হয়—পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটেরে ঠাঁই দিতে গিয়া একটা হার্ডিঞ্জ, একটা দ্বারভাঙ্গার সৌধচূড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভা নয়, গঙ্গাতীর হইতে গোলদীঘিকে ঘিরিয়া নূতন নালান্দা গড়িয়া উঠুক অথবা স্যার আশুতোষের স্বপ্ন কোলাহলময়ী রাজনগরীর বাহিরে সুবিস্তৃত পল্লীভূমির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নগরী সংস্থাপিত হউক।

আমরা হিন্দু, তত্ত্ব আমাদের ভাব নহে, ভাষা নহে, আদর্শ-বস্তু। আমরা পাইয়াছি দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিকে; পাইয়াছি নারদ, বশিষ্ঠ ও জনককে। আমরা পূজা করিয়াছি পার্থের, দেবব্রত ভীষ্মের, শ্রীরামচন্দ্রের। আমরা মানবতার অবতার শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করি। উদীয়মান জাতি এই সঙ্কটযুগে ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার মহিমা-রক্ষার ধূর্জ্জটী স্যার আশুতোষের স্মৃতি-পূজা করিবে না কেন?

চারি-পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, নবদ্বীপে প্রেমঘন বিগ্রহ দর্শন করিয়াছি। বৃন্দাবনের বাঁশী কাণে শুনিয়াছি। মরম ভরাইয়াছি; কিন্তু চক্ষে দেখি নাই, স্পর্শ করি নাই। সে প্রেমের মুরলী বাণী হইয়াই থাকিত, শ্রীগৌরাঙ্গে তাঁহার অনুবাদ-মূর্ত্তি যদি না প্রকট হইত। প্রেমের দান আজিও হুগলী নদীর দুই কূলে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে। রাখালের বাঁশী আজিও ভারতের শাশ্বত ধর্ম্মের মূর্চ্ছনা তুলে। জাতির সেই মহিম্ন-স্তুতি ভারত-সভ্যতার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অগ্নিপরীক্ষার যুগে, কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়ার কালে যে প্রাণ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতের জয়গান করিল, তাহার তুলনা কোথায় পাইব? ১৯২২ খৃঃ কন্‌ভোকেশন-সভায় এই মহাত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে ভারতের জয় দিয়া নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যের নায়েগ্রাপ্রপাতে ভারতের গৈরিকস্রাবী জাহ্নবী-ধারা শুকাইয়া যায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রমাণ। এই অমিশ্র ভারত-প্রাণ লইয়াই স্যার আশুতোষের অভ্যুত্থান। তাই অসহযোগ আন্দোলনের যুগে দেশবন্ধুকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "দাও টাকা, আমি গড়িব, বাংলায় নূতন নালান্দা প্রতিষ্ঠা করিব।" তাই বলি, ভারতের মাহাত্ম্যস্মরণে যদি রাম-নবমী, জন্মাষ্টমী আমাদের পুণ্যানুষ্ঠান হয়, এই নবযুগে স্যার আশুতোষের জন্মতিথি জাতীয় উৎসবে পরিণত না হইবে কেন? এই বিজয়-রথ যেদিন চলিবে, তার কাছির প্রান্তভাগও যদি স্পর্শ করিতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর মনীষা-মন্দিরের বিগ্রহ-মূর্ত্তিগুলি কালের যবনিকায় অন্তর্হিত হইলে, বিংশ শতাব্দীর আয়ুঃ-রক্ষার যে ঘৃত-প্রদীপ আমাদের প্রাণে প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিল, বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিদ্যালয়রূপে গড়ার প্রেরণা দিল, তাহা আমরা ভুলিতে পারিব না। হিমালয়ের বাধা ঠেলিয়া তাঁর স্বপ্ন-স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিব। আজ এই ক্ষণজন্মা পুরুষের উদ্দেশ্যে আমি সমগ্র জাতির সহিত অখণ্ড পরিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি।*

---

* আশুতোষ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভবানীপুর আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ।

বঙ্কিম-স্মরণে

শ্রীকালিদাস রায়

তোমা মনে পড়ে, যবে চারিদিকে হেরি অনাচার—
সাহিত্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, শিক্ষাক্ষেত্রে, জয় জয়কার
অসংযত অসত্যের, হেরি যবে হারায়ে শৃঙ্খলা
সৃষ্টির সাধনা যত সর্ব্বক্ষেত্রে হতেছে নিষ্ফলা
স্বেচ্ছাচারে, শ্লথতায়। চিন্তাকাশ ধূম-কুয়াশায়
ভরিয়া উঠিছে যত আচ্ছাদিয়া সত্য সবিতায়,
জাতীয় স্বাতন্ত্র্য যত হারাইয়া আহারে, বিহারে,
ভাষায়, ভূষায়, ভাবে হায়, তব দেশ আপনারে
বিকায় পরের পায়, হারাইয়া পৌরুষের বল,
নারীত্বের, ক্লীবত্বের অভিনয় পুরুষের দল
করে যত গর্ব্বভরে ভঙ্গ দিয়া জীবনের রণে,
হে পুরুষসিংহ, তত বারবার তোমা পড়ে মনে।

পাপে রোচনীয় করি তুলিবার শত আয়োজন
হেরি যত দেশ ভরি, অসত্যেরে পরায়ে ভূষণ,
রমণীয় করিবার চেষ্টা যত হেরি চারিপাশে,
ন্যায়-যুক্তি হারাইয়া অলঙ্কৃত অলস উচ্ছ্বাসে
বাগ্দেবীর ভক্তদের কণ্ঠ যত উঠিতেছে ভরি,'
সত্যব্রত লোকগুরু, তত তোমা বারবার স্মরি।

বহু সাধনার ধন তপোলভ্য ভেবেছিলে যারে,
যার তরে, হে সাধক, নিবেদন করি' আপনারে
অমর হয়েছ তুমি, হের তাহা অলস স্বপনে
ভরিয়া গিয়াছে আজ। সংযমের শৃঙ্খলা-বন্ধনে
বাঁধিতে চাহিলে তুমি এ দেশের যে জনসমাজ,
হের তাহা স্বৈরাচারে ক্ষণসুখে মত্ত হয়ে আজ
করিতেছে লক্ষ্যহারা প্রজাপতি-জীবন-যাপন।
মহাব্রতে দীক্ষা দিয়া যেই নব জাতীয় জীবন
গড়িতে চাহিলে, হের তাহা শ্লথ অসংহত হায়,
কাজ হ'তে বড় বলি মনে করে লীলায়, খেলায়।
জাতীয় বেদের ঋষি, তব স্মৃতি-উৎসব-বাসরে,
তব দেশ পানে চেয়ে চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু ঝরে।*

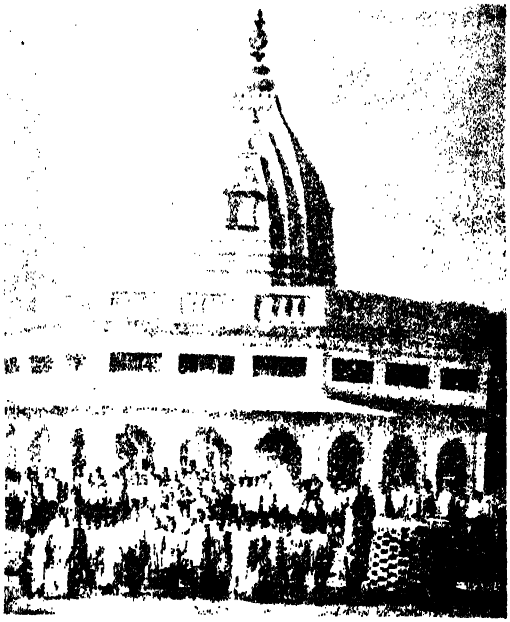
* চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবে পঠিত।

হিমালয়ের বুকে

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

জৈনদের মহাতীর্থ পরেশনাথ পাহাড়ে ভ্রমণান্তর, হিমালয়ের প্রতি লক্ষ্য ছিল; সহসা কুম্ভস্নানের জন্য বন্ধুবর নিতাইচাঁদ বসু মল্লিক সাদর নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতে, পায়ে হেঁটে হরিদ্বার যাবার সঙ্কল্প করলাম, কিন্তু "মহাপ্রস্থানের পথের" প্রত্যাগত পথিক শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রবোধকুমার সান্যাল বিপদাশঙ্কায় সে কার্য্যে বাধা দান করায়—আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই ৯২২ মাইল পথ দুই দিনে অতিক্রম করে' হরিদ্বারে বন্ধুবরের নবনির্ম্মিত "শান্তিনিকতনে" উপস্থিত হলাম।

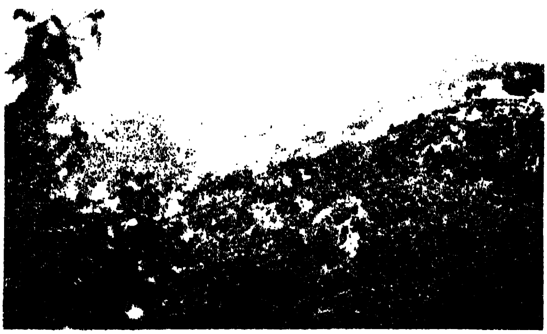
কনখলে শান্তিনিকেতনের সামনে হিমালয়ের রেঞ্জ 'চণ্ডীর পাহাড়' বা নীলপর্ব্বত, তার নীচেই নীলধারা প্রখরবেগে বহে চলেছে ..বাড়ীর গায়েই দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির এবং চামুণ্ডার মন্দির! দক্ষঘাটের নিকট গঙ্গা ত্রিবেণীরূপে ত্রিধাবিভক্ত, কাজেই এই সঙ্গমক্ষেত্রে স্নানার্থীর বিষম ভীড়! প্রথম দিন গঙ্গার তুষারশীতল জলে কাঁপতে কাঁপতে স্নান হ'ল বটে...কিন্তু যত দিন যেতে লাগল—আর গরমে বরফ গলে এসে গঙ্গা হীরকের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন—ততই যেন স্নানে আনন্দ পাওয়া যেতে লাগল। মনে প্রাণে অনুভব করলাম—গঙ্গা কাকে বলে! ছেলে বয়সে কাশী-এলাহাবাদের গঙ্গা দেখে মনে করেছিলাম—এমন নদী বুঝি জগতে নাই, এবারে হরিদ্বারে এসে কৈশোরকালের সে অভিজ্ঞতা তুচ্ছ হয়ে গেল! এইখানে "বাপ-বেটিকে" একত্র দেখে যেমন উল্লাসে প্রফুল্ল হয়ে উঠলাম...তদ্‌পরিমাণে স্তম্ভিত হলাম "ব্রিটিশ সিংহের" চাবুকের জোর দেখে। অর্থাৎ গঙ্গার অসীম জল প্রবাহ... পূর্ত্তবিদ্যার সাহায্যে ঘুরিয়ে যে কাটা খালে ঢোকান হয়েছে...সেই খাল সুদূর রুড়কি অতিক্রম করে ..পাঞ্জাবের রুক্ষ মৃত্তিকা শ্যামল করেছে। কেন্সাল বা নহরের ধারেই কেন্সাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের মাইল ব্যাপী এলাকা ও বাগান-বাড়ী। চারিদিকে সাইন বোর্ড "এখানে মাছ ধরলে জরিমানা হবে।" হরিদ্বারের মধ্যে মছ্‌লি খাওয়া নিষেধ ...তথাপি ওই লেখাটার একটু বিশেষ কারণ আছে। মানে যেখানে খালে ঢোকাবার জন্যে লোহার তক্তা নামিয়ে গঙ্গার স্রোতকে বাধা দেওয়া হয়েছে...সেখানে গঙ্গার গভীর স্রোতে অতি বিশাল "বাগাড়" মাছ থাকে, এক একটির ওজন অন্ততঃ ছয় মণ। সেই ভয়ঙ্কর স্রোতের মধ্যে মাছগুলি অবলীলাক্রমে খেলা করে বেড়াচ্ছিল! এই স্নান থেকে সপ্তধারা পাঁচ মাইল। সপ্তধারা মানে সাতটি বিভিন্ন ধারায় গঙ্গা পাহাড় থেকে যেখানে সর্ব্বপ্রথম সমতল



গুরুকুলের যজ্ঞশালা : হরিদ্বার

ভূমিতে অবতরণ করেছেন। এখান থেকে হৃষীকেশের পাহাড়ে ছবির মত নরেন্দ্রনগর দেখা যায়। সপ্তধারার নির্জ্জন নদীতীরে উলুর ঘরে বহু সন্ন্যাসী উদাস মুখে বসে আছেন...কেউ কেউ স্নান জপ করছেন! সব চেয়ে আশ্চর্য্য বোধ করলাম ..একটা কুকুরকে গঙ্গায় নেমে স্নান করতে দেখে...সাধুরা বল্লেন—কুকুরটি দিনের মধ্যে পঁচিশ বার এখানে স্নান করতে আসে! ভাবলাম যুধিষ্ঠিরের সারমেয়ের কি কোন বংশধর এখনো বেঁচে আছে!

সপ্তধারা থেকে বিল্বোকেশ্বর শিব মন্দির এবং ভীমগোড়া কাছেই! ভীমগোড়ার সুড়ঙ্গ দিয়ে ডবল এঞ্জিনযুক্ত ট্রেণ আসা-যাওয়া করে। সুড়ঙ্গের মুখে একটি সন্ন্যাসী ট্রেণ চাপা পড়েছিল কুম্ভমেলার সময়। ভীমগোড়ার পিচের রাস্তা একটি উত্তরমুখে বরাবর হৃষীকেশ চলে গেছে' আর একটি দক্ষিণ মুখে একেবারে কনখলের শেষ প্রান্তে এসে থেমেছে। সমগ্র হরিদ্বারে এইটিই প্রধান রাস্তা! এই রাস্তার ধারে ধারে কুম্ভ মেলা উপলক্ষে তাঁবু আর উলুর ছপ্পরে ভরে গেছে! "সীতা প্রেসের" প্রকাণ্ড পাঠাগারে শত শত লোক নিবিষ্ট মনে পুস্তক বা সংবাদপত্র পাঠ করছে, কোনো তাঁবু থেকে লাউড স্পীকারের গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনে লোকে ঢুকে আসন



ল্যাণ্ডোর ডিপো: মসৌরী

সংগ্রহ করছে, বক্তৃতা শুনবে বলে। সন্ধ্যা হতে না হতেই দশ পনেরোটা সিনেমা-গৃহের বাজনায় প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। হঠাৎ ঘণ্টার শব্দে মুখ ফিরিয়ে পেছনে—হাতী এসে পড়েছে দেখে পথচারী এ ওর ঘাড়ে পড়ছে—বিশেষ হাতী যদি তার নাকী গলায় ডেকে উঠল, তাহলে ত কথাই নেই...ভীড়ের মধ্যে যেন "গন্ধর্ব্ব বাণ" ছেড়ে দেওয়া হ'ল। পাঞ্জাবের মেয়েরা পথে হস্তিবিষ্ঠা পেলেই কুড়িয়ে নেয়—যেমন বাংলার মেয়েরা গোময় তুলে নিয়ে যায়! শুনলাম হস্তিবিষ্ঠা মাখালে নাকি লোকে হাতীর মত বলবান হয়।

কনখলের চৌকবাজারের মোড় থেকে একটি নুড়ি বসানো রাস্তা "জোয়ালাপুর" পর্য্যন্ত গেছে। এবং ভীমগোড়ার পিচের রাস্তা ষ্টেশনের পথ থেকে এসে সেইখানে মিলিত হয়েছে। জোয়ালাপুরে এরোড্রোম আছে—আকাশযানে একবার চড়তে আড়াই টাকা ভাড়া নেয়। এই সহরের কিছু বিশেষত্ব নেই, পাণ্ডাদের এবং অধিকাংশ মুসলমানদের বাস। জোয়ালাপুর এবং কনখলের মাঝামাঝি "কন্যা গুরুকুলের অট্টালিকা এবং গুরুকুল কাংড়ি"। কাংড়ি অর্থাৎ গ্রাম। গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্য ব্যাতিরেকে পাঞ্জাবের গৌরব স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে গুরু শিষ্য একত্র বাস ও শিষ্য "স্নাতক" বা গ্রাজুয়েট না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। ইংরাজীও পড়ানো হয়...এমন কি এলোপ্যাথিক চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে·· আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনুশীলনও হয়। অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী এই অপূর্ব্ব শিক্ষায়তন···নালন্দা, তক্ষশিলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাগ্যক্রমে গুরুকুলের Convocation বা "দীক্ষান্ত-সংস্কার" দেখবার নিমন্ত্রণ পেলাম··· গুরুকুলের সেক্রেটারী পণ্ডিত দীনদয়ালু শাস্ত্রীজীর আদর-আপ্যায়ন স্মরণীয়। দীক্ষান্ত-সংস্কার মণ্ডপে লাউড স্পীকার সহযোগে...যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ হিন্দিতে বক্তৃতা দিলেন। গুরুকুলের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান "ঋষিকুল" ষ্টেশনের নিকটেই। তবে গুরুকুল আর্য্য-সমাজীদের বলে'—মন্দিরেরব দলে আছে "যজ্ঞাগার।" আর ঋষিকুলে আছে—"বেদ মাতার" মন্দির। এবং চিরাচরিত প্রথানুসারে এই সনাতনী ও আর্য্যসমাজীদের মধ্যেও সদ্ভাব নেই···অথচ আধুনিক যুগে গণতন্ত্র নামে যথেচ্ছ তন্ত্রের প্রচলন হওয়ায় আর্য্যসমাজীদের দলপুষ্টি হচ্ছে—কাজেই গুরুকুলেরও উত্তরোত্তর উন্নতিই দেখা যাচ্ছে...ঋষিকুল কিছু নিষ্প্রভ। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এখানে বাঙালী সকলকে পরাস্ত করেছে সেবাব্রত নিয়ে। কনখলে মহানন্দ মিশন এবং রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ওরফে "বাঙালী হাঁসপাতাল" সর্ব্বজন পরিচিত লোকমঙ্গল মঠ। হরিদ্বারে সাধুদের ভয়ানক কষ্ট এবং ঔষধাভাব দেখে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ সামান্যভাবে এই সেবাশ্রম গঠন করেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষে এঁদের আশ্রমে এবং মঠ কম্পাউণ্ডে শত শত তাঁবুতে

যত বাঙালী স্ত্রী কন্যা নিয়ে উঠেছেন, তাঁদের আহারের ভারও উপস্থিত মঠাধ্যক্ষ স্বামী অসীমানন্দ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য অনেক তাঁবুতে স্বপাক আহারও চলছিল। এই দুইটি ছাড়া হরিদ্বারে ভোলাগিরির আশ্রম ও ধর্ম্মশালা বাঙালীর আশ্রয় স্থল। পথে অনেক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হতে লাগল—অনেক অপরিচিত বাঙালী দেখতে পেলে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করে আলাপ করতে লাগলেন—এমন কি যে যার ডেরায় টেনে নিয়ে গিয়ে কিছু জলযোগও না করিয়ে ছাড়লেন না। আশ্চর্য্য এই বাঙালী জাতি—পাশের বাড়ীর লোকের সঙ্গে আলাপ নেই—অথচ বিদেশে কত শীঘ্রই এরা আত্মীয়তা পাকাতে পারে। তবে দিন পনেরো হরিদ্বারের পথ ভ্রমণের পর সখ মিটে গেল, যেহেতু স্নানের দিন যত কাছে আসতে লাগল, ততই ভীড়ের ধাক্কায় পথ চলা বিরক্তি ও ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। বিশেষ পাঞ্জাবী মহিলাদের সঙ্কোচহীন শুভ্র বাহু যে রকম মোলায়েমভাবে আমাদের "ঢকেল" দিতেন তাতে ফাঁকা রাস্তা হলে বোধ হয় হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়। প্রায় চৌদ্দ লক্ষ লোক এবার হরিদ্বারে এসেছেন, তার মধ্যে দুই চার লক্ষ ছাড়া সবই পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবী মানে শিখ আকালী নয়, শিখেদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, তবে যা আছেন—তার দাপটে স্থানীয় পুলিশকে হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হয়। পাঞ্জাবীরা অবিকল সুন্দর বাঙালীদের মত দেখতে, ইংরাজী শিক্ষায় তাঁরা স্ত্রীপুরুষে বাংলাকে ছাপিয়ে চলে গেছেন, বাবুয়ানি দেখলে বোঝা যায় টাকা-পয়সার কিছুমাত্র অভাব নেই এবং চরিত্রের বালাই বলে কোন বস্তুই ওরা বড় ক'রে দেখে না। মেয়েরা সেজেগুজে একাকিনী সর্ব্বত্র বিচরণ করছে—কারো তোয়াক্কাই রাখে না...! সমাজ-শাসন শিথিল বলে যথেচ্ছ ব্যবহারে পাঞ্জাবে কুসংস্কার অবিকল আমেরিকার মতই প্রবেশ করেছে...মেয়েরা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় বিবসনা হয়ে নদীতে স্নান করছে—এবং পুরুষ ত নগ্ন হয়ে পথে চলেছেই সন্ন্যাসীরূপে!—স্থানীয় লোকের নিকট শুনলাম—বদমাস ছোঁড়ারা অনেক সময় ছাই মেখে নাগা হয়ে রাস্তায় বার হয়—কথাটা যে মিথ্যা নয়—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেলাম! ধর্ম্মের মধ্যে মেয়েরা মন্দিরে এসে ঘণ্টা নাড়া দেয়-আর পাই পয়সা বিলি করে! কলকাতার একটি গাঁজাখোর ভিখারী পাই পয়সা পেয়ে বলে উঠল "এ মাই! আমাদের কলকাত্তামে পাই ছুঁতা নেই; ছি ছি ছি এ কেয়া দিয়া?" ভদ্রমহিলা তাকে একটি পয়সা দিয়ে তবে মুক্তি পেয়েছিলেন। প্রায় ২৫।৩০ জন দরিদ্র বাঙালী—ভিক্ষা করতে করতে হরিদ্বারে স্নান করতে এসেছিল—তার মধ্যে অনেকে একবেলা খেতে পেয়েছিল—কেউ বা দু একদিন না খেয়েই থেকেছে..! সমাজের এই অবস্থা, অথচ শত শত ছত্র ঠিক চলে যাচ্ছে এবং সন্ন্যাসীরূপী শত শত গুণ্ডা নির্ব্বিঘ্নে দিনাতিপাত করে চলেছে। এমনিই লজ্জার কথা, রোচীতে যেখানে গঙ্গার চরে দুই ক্রোশ জুড়ে



স্বর্গাশ্রম : হৃষীকেশ

সাধুদের আস্তানা পড়েছিল—এক দিনের জন্যে সে দিকে স্ত্রীলোক যেতে দেখিনি...এমন কি রাত হয়ে গেলে ক্ষীণকায় বাঙালীরা সন্ন্যাসিদের আড্ডায় মানিব্যাগ শুদ্ধ যেতে সাহস করতেন না! পথে ঘাটে মারামারি লেগেই আছে—মেয়েদের মুষ্টিযুদ্ধ থামিয়ে না দিলে রক্তপাত হয়...সংযুক্তা পদ্মিনীর জাত—ইতর পুরুষকে সমঝে চলতে হয় তাঁদের কাছে! ষ্টেশনের কাছে একটি তরুণী—এক ক্ষীণদেহ ভণ্ড তপস্বীর টুঁটি চেপে ধরেছেন দেখে হাঁ হাঁ করে তরুণীর হাত চেপে ধরলাম—তিনি ক্রোধ সম্বরণ করে thanks দিয়ে এমন ভাবে চলে গেলেন—যেন খুব বেঁচে গেলি পাজি...

কুম্ভস্নান আরম্ভ হয়েছে ১লা চৈত্র দোল-পূর্ণিমা থেকে, তারপর চৈত্র অমাবস্যা, রাম নবমীর স্নানের পর

মহাকুম্ভযোগ চৈত্র সংক্রান্তিতে। এই দিন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করবে বলে চৌদ্দ লক্ষ লোক প্রাণপণ করে এসেছে। অথর্ব্ব জরাগ্রস্তের এই পুণ্যলালসা স্বাভাবিক—তাঁরা বিশ্বাস রাখেন, মৃত্যু শিয়রে—এই সময়ে যদি ওপারের কড়ি সঞ্চয় করতে পারি তা হ'লে আখেরে কাজ দেবে। মানুষের মনোগত অভিপ্রায় বুঝেই এই সব প্রথার উদ্ভব সন্দেহ নাই···এবং প্রথা রক্ষা করাই পরবর্ত্তী বংশধরের কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় বনিয়াদী বংশের কোনো প্রথাই যেমন আধুনিক অক্ষম ক্লীব সন্তানের দ্বারা রক্ষিত হচ্ছে না—তেমনি হিন্দুর ধর্ম্মের ব্যাপারেও তার আনুসঙ্গিক ইতি-কর্ত্তব্যতার লোপ হয়ে গেছে। হাতী, ঘোড়া, উট, পাল্কি মায় মোটর চেপে যখন লক্ষপতি মোহান্তগণ শোভাযাত্রায়



হরিদ্বার পবিত্র-সঙ্ঘ: বাম হইতে তৃতীয় ব্যক্তি লেখক (সর্ব্বনিম্ন সারি)

বা'র হলেন এবং তাঁদের পশ্চাতে সহস্র সহস্র ঔদরিক দীর্ঘ দেহ নাগা এবং বৈষ্ণব, শৈব, নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, আকাল সাধুদের দেখলাম—তখন তাদের প্রতি কেন যে কিছুমাত্র শ্রদ্ধা হল না, বুঝলাম না। ভক্তির চোখে দেখি নাই তা নয়—বরং সংসারত্যাগীদের প্রশান্তি দেখে ধন্য হব এই ধারণাই ছিল। কিন্তু স্নানের সময় কথা কাটাকাটির দরুণ দুই দল সন্ন্যাসী যখন জিঘাংসায় উন্মত্ত হয়ে বড় বড় পাথর ছুঁড়ে রক্তাক্ত কলেবরে ধুলায় পড়ল, তখন স্বতঃই মনে হ'ল—হরিদ্বারের সমস্ত জমিদারীই সাধুদের; দু পাঁচশ থেকে লাখোপতি, দিবারাত্র টাকার উপর বসে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী, তারপর দুই বেলা মুগুর ভেঁজে এই বিরাট্ অসুরাকৃতি সাধুরা, দুই চারজন দরিদ্র লোকের আহার্য্য একা গ্রহণ ক'রে পৃথিবীর কী মঙ্গল সাধন করছেন? অধ্যাত্ম সাধনার নামে আলস্যের কোলে আত্মসমর্পণ ক'রে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছেন—এই কথাই বার বার মনে হ'ল। এইখানে যোগদান ক'রে পয়সা খরচ ক'রে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, পাপকে আলিঙ্গন করা হচ্ছে। এই ধারণাটা আবার বদ্ধমূল হয়ে গেল যখন দেখলাম—শত শত লোকের ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ এবং মুখ্যস্নানের দুই দিন পরে রোড়ীর ধারে যাত্রীনিবাসে এবং মেলা স্থানের সমস্ত দোকান দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। অনেকে বল্লেন "দুই আনা সের দুধ এক টাকা সের বেচেছ ও পয়সা কি থাকে?" সামান্য একটা ফায়ার ব্রিগেড সম্বল, তা দিয়ে কি হবে? খাণ্ডব দাহনে যেমন একটি মাত্র প্রাণী বাঁচেনি—তেমনি একটি মাত্র দোকান অগ্নিদেবের ভয়াল গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারল না। নোটের গোছা থেকে পাথরের জিনিস কিছু বাঁচেনি। সেই মহা শ্মশানের দগ্ধ গাছগুলির দিকেও চেয়ে থাকতে পারা যায় না। এইখানে মাথা পিছু পাঁচ টাকা ভাড়া দিয়ে যে সব যাত্রী ছিল—৫০৲ থেকে ১০০৲ টাকার উলুর ছপুর ভাড়া নিয়েছিল তাদের শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে চোখের জল ধরে' রাখা যায় না। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের কি এই পরিণাম? সাধুদের সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে গঙ্গার কূলে কূলে বেড়াচ্ছি—সহসা একদা রাত্রে আকাশ লাল হয়ে উঠল দেখে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলাম—গুজব রটল, সন্ন্যাসীদের ধুনির কাঠ আনতে দেয়নি বলে তারা জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে চলে গেছে। স্তব্ধ হয়ে গেলাম, একি সত্য? এও কি বিশ্বাসযোগ্য? দুই রাত দুই দিন নীলপাহাড়ের ধারের জঙ্গল জ্বলতে লাগল, স্তবকে স্তবকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল···অতি ভয়াবহ দৃশ্য! সাত মাইল দূরে দাবানল—তবু মনে হচ্ছিল—এই বুঝি এধারে এসে পড়ে। ক্রুদ্ধ সর্পিল গতিতে লাল আগুনের সেই শিখা যেন ঘোষণা করছিল—ধর্ম্মের গ্লানি ও আচারের নামে অত্যাচারের কাহিনী। আগুন যে কি প্রকার বস্তু তা এই প্রথম বুঝলাম। অবশেষে নিতাইয়ের ঘৃতপক্ক মালপোর মায়া কাটিয়ে হৃষীকেশ পৌছে গেলাম।

হৃষীকেশে এসে হিমালয়ের মৌন-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে "বসুধা শৃঙ্গার হীরাবলী" এ শব্দের অর্থবোধ হল। স্তূপে

স্তূপে বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উত্তুঙ্গ পর্ব্বত পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের পথ বুকে করে দাঁড়িয়ে আছেন আর তার নীচে নীলবর্ণা গঙ্গা। সেই আলো-ছায়া আর রঙের খেলা না দেখলে ছবিতে বোঝা যায় না। এইখান থেকে তীর্থযাত্রীরা বদরীনারায়ণ, কেদারনাথ প্রভৃতি যাত্রা করেন। দেবপ্রয়াগ অবধি মাথাপিছু পাঁচ টাকা ভাড়ায় প্রত্যহ একবার মোটর-বাস যায় এবং ফিরে আসে। অর্থশালী লোকে অনেকে শাস্তিতে চলেছেন…কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই পাহাড়ি হাল্কা লাঠি হাতে আর গৈরিক জামা কাপড় পরে পদব্রজে চলেছেন। পাহাড়ী কুলি মাল নিয়ে যায়, প্রতি মণ জিনিসে চল্লিশ টাকা ভাড়া এবং দুই বেলা আহার। হৃষীকেশ থেকে যমুনোত্রী ১৫০ মাইল, সেখান থেকে গঙ্গোত্রী ৯৮ মাইল। তবে সকলে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী না হয়ে কেবল মাত্র কেদার বদরি সেরে আসেন…হৃষিকেশ থেকে শুধু বদরিনাথ ১৬৭ মাইল দূর। এইখানে বিখ্যাত কালিকমলিওয়ালার ধর্ম্মশালা ও ছত্র। এই কালিকমলিওয়ালার ব্যবস্থা না থাকলে উত্তরাখণ্ডের তীর্থযাত্রা এত সহজ হত না। এঁরা স্থানে স্থানে চটি, সদাব্রত ধর্ম্মশালা, পিয়াযু, ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করে যে মহৎ পুণ্য করেছেন তার তুলনা হয় না। কালিকমলিওয়ালার রন্ধনশালা ও ভাঁড়ারে অত্যন্ত প্রকাণ্ডকায় হাঁড়ি, চাটু, গাম্লা, ঘড়া…শত শত থালা, ঘটি, বাটি, গেলাস, চামচে দেখলে রাজার ঐশ্বর্য্যও তুচ্ছ মনে হয়। যাঁরা বদরীকেদার যাত্রা করেন, তাঁরা প্রায়ই একরকম পাহাড়ী আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন, কালিকমলিওয়ালা বিনা মূল্যে সেই রোগের ঔষধ এইখান থেকে সঙ্গে দিয়ে দেন। চৈত্র মাস থেকে শ্রাবণ মাস অবধি যাত্রীদের জন্যে রাস্তা খোলা থাকে—তারপর বন্ধ হয়ে যায়…কারণ যাওয়া আসায় দেড় মাস সময় লাগে। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী হয়ে গেলে সব শুদ্ধ ৬৫৫ মাইল পথ—প্রত্যহ দশ থেকে পনেরো মাইল হিসাবে যাওয়া আসায় দুই বা আড়াই মাস সময় লাগে…শীতের আগেই সকলে ফিরে আসতে বাধ্য হন…নচেৎ তুষারে পথ বন্ধ হয়ে গেলে প্রাণহানি অবশ্যম্ভাবী। অর্থশালী লোক ১০০৲ টাকা দিয়ে হরিদ্বার থেকে The Himalya Air Transport and Survey Ltd. এবং আকাশযানে করে "গাউচার" এবং 'অগস্ত্যমুনি' অবধি উড়ে যেতে পারেন, তবে সে রকম যাত্রী এ বছরে কাউকে দেখা গেল না। সকলেই চিরাচরিত প্রথায় টিহ্‌রী দরবারের নিয়োজিত ডাণ্ডি 'মুনি কি রেতি' থেকে ১২৫৲ টাকা থেকে ১৭৫৲ টাকায় এক পিঠের ভাড়া দিয়ে কুলি ও টাণ্ডেল সঙ্গে… পর্ব্বতারোহণ করছেন। টিহ্‌রী দরবারের রেজিষ্টার করা কুলি ব্যতীত আর কাউকে বিশ্বাস করা সমীচীন নয় শুনলাম। কালি কমলিওয়ালার আশ্রম থেকে এই সব বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করে "লছমন ঝোলা" দেখতে যাই। এখানে মন্দিরের মধ্যে লক্ষ্মণের মন্দির…আর রায় বাহাদুর



গঙ্গার ঘাটে জপ-নিরত জনৈক বৃদ্ধা

সূরযমল শিবপ্রসাদ নির্ম্মিত এই ঝোলা। লছমন ঝুলায় আগে রজ্জু নির্ম্মিত ছিল, পরে লোহার তৈয়ারী পোল হয় কিন্তু মহাদেবের জটা নির্গত গঙ্গার প্রচণ্ড স্রোতে সে পুল শত খণ্ড হয়ে ভেসে গেছে…এটি নব নির্ম্মিত ঝুলন্ত পুল। এর নিকটে কলকাতার নরেন্দ্র মিত্রের কুটিয়াটি বাঙালী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য হৃষীকেষে পর্ব্বতগাত্রে গঙ্গাতীরে যতগুলি কুটিয়া আছে সবগুলির শোভাই মনোমুগ্ধকর। এমন গম্ভীর আর এমন পবিত্র উদাসীনতায় এই স্থান স্তব্ধ হয়ে আছে যে, কলকোলাহল মুখরিত রাজধানীর ব্যক্তি মাত্রেই প্রকৃতি রাণীর এই ছায়াশীতল কোলে

ঘুমিয়ে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠবে। জলের ধারে একটি বড় পাথরে বসে—অসংখ্য মৃগেল মাছের নির্ভয় সঞ্চরণ দেখতে দেখতে এই কবিতাটি মনের মধ্যে স্বতঃই জন্মলাভ করল।

কেন, উতল কর ওগো উতলা নদি
উপলের আড়ালেতে হাসিয়া
ঝর ঝর্ঝর ধ্বনি শুনি' সারী শুকে
ডাকিছে কত ভালবাসিয়া
ডাকিছে শাখা মেলে শাল করবী
ডাকিছে ঢলে' পড়া অস্ত রবি
তুমি দুলায়ে তারে মৃদু হিম সমীরে
আনমনে চলে যাও ভাসিয়া।

অতঃপর কৈলাশাশ্রম ও স্বর্গাশ্রম দেখে নৌকায় করে' আবার হৃষীকেশে ফিরলাম। হৃষীকেশ থেকে লছমণ ঝুলা যাওয়া আসা ছয় মাইল। গাড়োয়ালীরা বলবান এবং বীর তবে লেখাপড়ার নামে ভয় পায়…কাজেই…এদিকে এবার দ্রুত শিক্ষার ব্যবস্থা চলছে। এমন কি দুই চার গাছা মুঞ্জ বা দর্মার আচ্ছাদন দেওয়া ঘরে হরিজন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টাঙ্গাওয়ালারাও দু একটি ইংরাজী শব্দে অভ্যস্ত



উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী : গঙ্গাতীরে সাধুর মেলা

হচ্ছে…দুশ্চিন্তা এইখানেই। পাঞ্জাবের মত এখানেও যদি সভ্যতার ইলেক্ট্রিক আলোক প্রবেশ করে তা হ'লে কোথায় থাকবে এই তীর্থবিশ্বাসীগণ? যদিচ "সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই" তবু যখন হিমালয় পাহাড়ের কোলে গঙ্গাগর্ভে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণগণ আলোকিত পঞ্চপ্রদীপ তুলে গঙ্গারতি করতে থাকেন…তখন অতি বড় নাস্তিকের মনেও ঐশ্বরিক ভাবের স্রোতঃ বহে যায়। মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, প্রয়াগ সর্ব্বত্র গঙ্গা যমুনার আরতি দেখেছি, কিন্তু এমন ঘরছাড়ান বৈরাগ্যের প্রচ্ছন্ন সুর কোথাও শুনিনি! হৃষীকেশ থেকে মোটর বাসে করে' হরিদ্বার ফেরবার পথে পাহাড়ী নদী ও জঙ্গল অতিক্রম করতে করতে ক্রমাগত শ্রীবদরিনাথের সেই স্তোত্র কাণে এসে যেন পেছু টানছিল—

পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল হেম-মন্দির-শোভিতম্
নিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল—শ্রীবদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শেষ সুমিরণ করত নিশিদিন, ধরত ধ্যানে মহেশ্বরম্
শ্রীবেদ ব্রহ্মা করত স্তুতি শ্রীবদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শক্তি গৌরী গণেশ শারদ, নারদমুনি উচ্চারণম্
যোগ ধ্যান অপার লীলা, শ্রীবদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের দিনকর, ধূপ দীপ প্রকাশিতম্
সিদ্ধ মুনিজন করত জয় জয় শ্রীবদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্।
যক্ষ কিন্নর করত কৌতুক জ্ঞান গন্ধর্ব্ব প্রকাশিতম্
শ্রীলক্ষ্মী কমলা চংবর দোলে শ্রীবদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্।

হৃষীকেশ থেকে ফিরে দুই চারদিন হরিদ্বারে 'আদা জল খেয়ে' ডেরাডুন যাত্রা করি। বন্ধুবর অশোক রায় সরণপুরায় তাঁর মামার বাড়ীতে উঠতে বারম্বার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আমি 'মুসাফির'—গৃহস্থের ঘরে উৎপাত করতে অপারগ হলাম, ষ্টেশনের নিকটস্থ "নিউ বাংলোতেই" উঠলাম, এবং আহারান্তে নগর ভ্রমণে বার হলাম। ডেরাডুন সহরটি খুব বড়…এবং মিলিটারী হেড কোয়ার্টার বলে বহু ইংরাজের রূঢ় মুখশ্রী নজরে পড়ে…এবং তথাকথিত বনিয়াদী বাঙালীর পেলব তনুকে সান্ধ্য বায়ু সেবনে রত দেখা যায়। বাঙালীদের বহু চিত্র সদৃশ বাড়ীও আছে…এবং তার মধ্যে বেতের চেয়ারে সুখের পায়রাদের কূজন-রত দেখে মনটা আপনিই কেমন বলে ওঠে জোর বরাত, জোর বরাত। চক্রাতা রোডে স্বর্গীয় প্রফুল্ল ঠাকুরের বাড়ীতে যাবার কথা ছিল, তাও ঘটে উঠল না, আমি পল্টন্ বাজার খিচারি রোড ঘুরে, গুরুরাম রায়ের বিখ্যাত মন্দির

ইত্যাদি দেখি। শিখেদের গুরু দোয়ারা এক আশ্চর্য্য দর্শন মন্দির......প্রথমে মনে হবে মস্‌জিদ—এমনি তার গম্বুজ......কিন্তু ভেতরে ঢুকলে স্থাপত্য শিল্পে হিন্দু গন্ধ পাওয়া যায়। ডেরাডুনে প্যারেড গ্রাউণ্ডটি মস্ত বড়—তার লাগোয়া ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক এবং তার নীচে সাহেবী দোকানের পারিপাট্য দেখলে কলকাতার চৌরঙ্গী বলে ভ্রম হয়। ডেরাডুনের প্রধান দ্রষ্টব্য Forest Reasearch Institute বা জঙ্গলি-আফিস। ডেরাডুন থেকে রাজপুর সাত মাইল ট্যাক্সিতে এলাম......রাজপুর থেকে মোটর বাসের রাস্তা বারো মাইল, এবং পাকণ্ডী দিয়ে হাঁটা পথে সাত মাইল। মোটর বাস, ঝাম্পান, ঝাণ্ডী, ডাণ্ডী এবং ঘোড়ার ভাড়া লোক পিছু দেড় টাকা এবং কুলহু ক্ষেতের Total tax দেড় টাকা। আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে পাহাড় চড়তে আরম্ভ করলাম·· একা ঠিক হলাম না, কারণ তিব্বতী কুলিরা ঘাড়ে মোট নিয়ে মন্থরগতিতে সেই পথে মসৌরী যাচ্ছিল। কুলিরা ঘাড় থেকে কোমর অবধি মালের বোঝা নিয়ে যে ভাবে পাহাড়ে ওঠে সে এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা। রাজপুরে মালের জন্যেও টোল দিতে হয় এবং মসৌরী থেকে মাল আনবার সময় তাও দিতে হয়। 'তারা কি সাট্রা' বলে স্থান থেকে নীচে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় গিরি আরোহণ ব্যতীত বসুধার রূপ কখনোই বোঝা যায় না। বহুদূরে সর্পিল পথ দিয়ে ছেলে খেলার মোটরের মত মোটরগুলি ক্রমাগত বাঁক খেতে খেতে উঠ্‌ছিল। রাজপুর থেকে তিন মাইল উঠে "বারি পানি"। এখানে সর্ব্বশেষ টোল অফিস। এই টোলে মধ্যপথে তাই Halt way hotel পাওয়া গেল··· একটি ইংরাজ দম্পতি এর মালিক···চা-পান করে নব বলে বলীয়ান হলাম এখানে। এখানে নেপাল মহারাজার প্রধান মন্ত্রী শ্রীদেব সমশের জঙ্গ বাহাদুর রানার ইন্দ্রালয় বাড়ী......। এবং বড় বড় অফিসার ইংরাজের ছেলেদের "ওক্ গ্রোভ স্কুল"। এই স্কুলটি দেখলে বুঝতে পারা যায় ইংরাজ কেমন করে ছেলে মানুষ করে; প্রায় ১০০ বালক এখানে থাকে··· ··বরফ পড়তে আরম্ভ হলে এ স্থান ত্যাগ করে' চারমাস অন্যত্র কাটায়। সমতল ক্ষেত্র এদিকে আধ মাইলও মেলে না অথচ পাহাড়ের শীর্ষদেশ সমতল করে'—প্রকাণ্ড বাগান বানিয়ে ওক গ্রোভ স্কুলের ছাত্রাবাস। আরো এক মাইল চড়াই উঠে বার্লোগঞ্জ। এইখানে 'মসি' জলপ্রপাত। বলতে ভুলেছি, 'তারা কি সাট্রা'র কাছে সাল্‌ফারস্ স্প্রিং...তবে এটার চেয়ে 'মসির' নির্ঝর সুশ্রী। গিরিডির 'উশ্রী ফল' দেখে, জলপ্রপাত দেখবার একটা নেশা চেপে গিয়েছিল—তাই পথিপার্শ্বে 'এদের সঙ্গে মোলাকাৎ না করে' থাকতে পারিনি। আরো দুই মাইল গিয়ে তবে মসৌরী সহর। দূর থেকে পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে লাল নীল সাদা—সব রঙিন বাগান-বাড়ী দেখে মনে হচ্ছিল—ওই কি ইন্দ্রপুরী! এ কি মানুষ তৈরী করতে পারে!·· এত সৌন্দর্য্য যে মাটির বুকে আছে—তা এই প্রথম দেখলাম! নিঃশব্দ মৌন ভাষায় সেই যক্ষপুরী কত রূপ-কথার গল্প যে বলছিল, কত স্বপ্নলোকের বাস্তব ইতিকথা গেয়ে যাচ্ছিল—তা আমার অন্তর্য্যামী শুনেছেন। বুঝতে পারলাম—এই দেখেই কালিদাস কবি, এই দেখেই ঋষিরা দেবলোকের কল্পনা করতে পেরেছিলেন।



হরিদ্বারে সমাগত তীর্থ-যাত্রী

সাত মাইল খাড়া চড়াই ভেঙ্গে শরীরের অবস্থা শোচনীয় —তাই রক্ষা—নচেৎ বসুমতীর পাগল করা রূপে বোধ হয় 'দেওয়ানা' হয়ে যেতাম। আমার ভারতবর্ষ, আমার এই দেশ এত সুন্দর! মসৌরী সহরে পা দিয়েই একটু থমকে গেলাম; ইয়োরোপ দেখিনি, বর্ণনা শোনা ছিল, মনে হল ইয়োরোপের কোনো পার্ব্বত্য সহরে এসে পড়েছি। দোকান-পশার সব তাতেই কেমন একটা সাহেবী গন্ধ মাখান। পিক্‌চার প্যালেসের (বায়স্কোপ গৃহ) পাশেই বাজার,… …তার সামনে ইন্দ্‌রার রেস্তরাঁ। ঢুকে পড়লাম… …স্নানের জন্যে গরম জল পাওয়া গেল, কিন্তু তার দাম চার আনা। রাস্তায় ট্যাপ আছে পানীয়



সাধু-দর্শনাভিলাষী ব্যাকুল নর-নারী

জলের জন্য; এখানে জলের দাম খুব চড়া। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় রিজারভয়ার আছে…হিসাব করে জল খরচ হয়। হোটেলে সহবৎ খুব, কাঁচের প্লেটেতে টেবিল ভরে যায়, কিন্তু দুই বেলা দুই টাকা দান দিলেও পেট ভরে না। চাউল, মাছ মহার্ঘ্য, কাজেই এক বেলা খেয়েই মাংস এবং ফুলকাতেই মনোনিবেশ করলাম। তবে রান্না ভাল…কেবল চাটনিটায় কেমন যেন রবারের গন্ধ পেতাম। এখানে Fitch & Co-র অফিস এবং দোকান সবচেয়ে বড়, পাওয়া যায় না এমন জিনিস নেই। মেম সাহেবরা দর্জ্জিগিরি এবং কেক তৈরী করে' বড়লোক হয়ে উঠেছে। কথাটা ভুল হল…দু'চারজন দোকানদার-কুলি ছাড়া গরীব লোক কাউকে দেখলাম না—মসৌরী গরীবের বা মধ্যবিত্ত লোকের থাকবার স্থান নয়। দার্জ্জিলিঙ্গ বাস করা তবু চলে—কিন্তু মসৌরী একেবারে অচল। রিক্‌স চাপলেই পাঁচসিকা খরচ তারপর ঘণ্টাপিছু বার আনা। সৌখীন বাবুরা নৈশ নৃত্যের আসরে একনা মূল্যে বসবার আসন পেয়ে রাত দশটা এগারোটা অবধি গন্ধর্ব্বলোকে বাস করে যান…অবশ্য কিন্নর কিন্নরীরা সকলকেই সমাদর করেন। এই নৃত্যশালাটি এখানকার বিশেষত্ব। "হিমালয়ান ক্লাব" অতি বিখ্যাত—এ ছাড়া আরো ক্লাব আছে। বিখ্যাত "কাম্পটি ফল" দেখবার জন্যে আধা রাস্তা গিয়ে ফিরে আসি…কারণ পথ অত্যন্ত খারাপ এবং ভীষণ "স্লোপে" নেমে গেছে মসৌরি থেকে আট মাইল… ফেরবার পথে এইটে চড়াই পড়বে অর্থাৎ প্রাণান্তকর পরিশ্রম হবে। কাজেই মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন ইত্যাদি দেখে নিরস্ত থাকতে হ'ল। মসৌরীর মল (Mall) এবং বাজার দেখা হতে তিন মাইল দূরে ল্যাণ্ডোরে গেলাম। ল্যাণ্ডোর মসৌরি থেকে আরো উঁচুতে। এখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে; গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী বা উত্তর কাশী যাত্রীদের জন্য…। ল্যাণ্ডোরের দৃশ্য আরো সুন্দর…গোরা পল্টনের ব্যারাক এবং সার্ভে অফিস। সার্ভে অফিসের মধ্যে…"নক্সা" বা সমগ্র হিমালয়ের একটি বাঁধানো চর্ট আছে…এই স্থান সমুদ্র সমতট থেকে ৭৫৩৩ ফিট উচ্চ…এবং নন্দাদেবী ২৫০০০ ফিট উচ্চ…অদূরে রৌদ্র-ঝলসিত তুষার-শৃঙ্গ। সেই শুভ্র রজতময় হিমরাশির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে স্বতঃই ধ্বনিত হয় "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।" এই ত আত্মভোলা সমাধি-মগ্ন মহাদেবের বাসস্থান… অসীম স্নিগ্ধতায় দিগন্ত থম্ থম্ করছে।…এখানে সংসারের কোলাহল নেই…ভাই ভাই বিসম্বাদে রক্তস্রোত নেই… আত্মীয় স্বজনের হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই…এখানে

আছে অগাধ অপরিমেয় নিঃসঙ্গতার মধ্যে অনাবিল শান্তি! মনে হল সার্থক আমার তীর্থযাত্রা, কুম্ভযোগে স্নানের ফল ত হাতে হাতে পেলাম···দুই চোখ দিয়ে দেখে কি মানুষ এত আনন্দ পায়! দূরে বহুদূরে বদরী-নারায়ণের পাহাড় দেখা যাচ্ছিল···তাই দেখে এত আনন্দ হল কেন? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও বরাবর ভালই লেগেছে, নয়ন-মন মুগ্ধ হয়েছে···কিন্তু হিমালয়ের শীর্ষদেশে তুষারমুকুট দেখে প্রাণে আনন্দের এ শিহরণ হচ্ছে কেন... তীর্থোদযাপনের মত একটা সাফল্যের আস্বাদ পেয়ে অন্তর উল্লসিত হয়ে উঠেছে কেন?...এ কেনর উত্তর পেতে হলে মহাজ্ঞানের প্রয়োজন...তবু যেন কবির উক্তিতে এই কথাটা পরিস্ফুট হচ্ছে—

"তুলসীয়ে সংসার মে সব সে মিলিয়ে ধায়।
কো জানে কিস্ রূপ মে নারায়ণ মিল যায়।
প্রাতহি উঠিকে নিত্যনিত, করিয়ে প্রভুকে ধ্যান
জাতে জগ মে হোয় সুখ, অরু উপজে সৎ জ্ঞান।"*

* [প্রবন্ধটি কুম্ভমেলার কিছুদিন পরেই হস্তগত হইলেও প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত। প্রবন্ধের ফটোগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত। —সঃ প্রঃ ।]

ছাত্র-সংগঠন

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

ছাত্র আমি চিরদিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরেও জীবনের যে বিশাল বিচিত্র শিক্ষাশালা, সেইখানেই আজও আমি একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী। ছাত্র-সম্প্রদায়ের অন্তরের মর্ম্মকথা তাই হয়ত আমি কথঞ্চিৎ মর্ম্ম দিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। ছাত্রজীবনের যে সাধনা, যে সমস্যা, তাহা লইয়া একটু আলোচনা করিতে তাই আমার কুণ্ঠা নাই।

শুনিয়াছি, মহামতি লুথার প্রতিদিন তাঁহার অধ্যাপনা-রম্ভে ছাত্রগণকে টুপি খুলিয়া অভিনন্দন করিতেন এই বলিয়া "I bow to you, great men of the future, famous administrators yet to be, men of learning, men of character, who will take upon themselves the burden of the world." প্রতি ছাত্রের মধ্যে এই জাতির ভবিষ্যৎকে আমরাও বন্দনা করিব। ছাত্রজীবন যদি সত্য হয়, সুন্দর হয়, সর্ব্বতো-ভাবে কল্যাণপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে, এ জাতির মুক্তি ও কল্যাণ কেহই আর নিবারণ করিতে পারিবে না।

কি সমস্যা আজ ছাত্রজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে? সে কি শুধু রাষ্ট্রে, সমাজে ছাত্রশক্তির, ছাত্র-সাধনার স্থান লইয়া? শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম—কোথায় আজ ছাত্রজীবনের নিগূঢ় সমস্যা গুমরিয়া মরিতেছে? ছাত্র-সম্প্রদায়ের সম্মুখে আদর্শ-বৈশিষ্ট্য লইয়াই বা এত গণ্ডগোল কেন? সংঘাত কেন? আমার মনে হয়—ছাত্রেরা আসলে ছাত্রই—অন্য কিছু নহে। তাই তাহাদের সমস্যা, সাধনার কথা ছাত্র-হিসাবেই আমাদের দেখা উচিত। ছাত্র যদি জাতির ভবিষ্যৎরূপেই আপনাকে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পায়, চেষ্টা করে, আর যাহা কিছু হইবার তাহা আপনিই হইবে—তাহার জন্য ভাবনার প্রয়োজন হইবে না।

ছাত্রের জীবন—গঠনের জীবন। এই গঠন—'আত্মগঠন। গঠন বড় পবিত্র কর্ম্ম—অত্যন্ত কঠিন আর দায়িত্বপূর্ণ। এই গঠন আদর্শ ব্যতীত সম্ভব হয় না। কিন্তু সে আদর্শ জীবন্ত আদর্শ হওয়া চাই। ভারতের ছাত্রজীবন এই জন্য গড়িয়া উঠিত গুরুগৃহে—আদর্শ মানুষকে আচার্য্য বা গুরুরূপে সম্মুখে রাখিয়া। গুরুর প্রতি আত্মনিবেদনে তার হৃদয়-কমল ফুটিয়া উঠিত। তপস্যায় জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাইত—বেদ-রূপে। সে বড় সুন্দর যুগ। শিক্ষায় দেহ, মন, প্রাণ প্রস্তুত হইলে, গুরুই তাঁহাকে দিতেন অধ্যাত্মজাগরণের দীক্ষা। আত্মগঠনের ইহা নিখুঁৎ ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আয়োজন, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সে যুগের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। আজ সেই শিক্ষা ও দীক্ষার বাস্তব পরিস্থিতি কোথায়? স্কুলের বোর্ডিং ছাত্রাবাস—আশ্রম নহে। এ যুগের অধ্যাপক বা আচার্য্য শিক্ষা দেন—দীক্ষা দেন না। সে শিক্ষাও কি শিক্ষা, তাহা আমরা সকলেই জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি স্বাধীন দেশে যতই উৎকর্ষ লাভ করুক, আমাদের পরাধীন দেশে তাহার যথার্থ পরিচয় এখনও আমরা পাই না। যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা নানা কারণে বিকৃত—আশাপ্রদ নহে। যেখানে যতটুকু সম্ভব, সেখানে এই বিকৃতি ও অসম্পূর্ণতার সংশোধন-চেষ্টা চলিতেছে। ইহাকেই আমরা জাতীয় শিক্ষা বলিতেছি। তাহারও বীজগত অসম্পূর্ণতা নানা আকারে পরিস্ফুট হইতেছে দেখা যায়। অন্ততঃ এই জাতীয় শিক্ষাও সমালোচনার অতীত নহে। একটা আদর্শ বা 'স্কীম'কে কার্য্যকারী করা যে কত কঠিন, তাহা বস্তুতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যতীত বুঝিয়া উঠাও সম্ভব নহে। মহাত্মাজীর 'ওয়ার্দ্ধা-স্কীম' এই দিক্ দিয়া যাচাই হইতে চলিয়াছে। বঙ্গে কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্ট যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, এই শিক্ষা-পদ্ধতির আমদানীতেও হয়ত বিলম্ব হইবে না।

শিক্ষার সৌধ যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজে ভাঙ্গিবে না—ভাঙ্গিতে পারিলেও, আমরা বলিব, ভাঙ্গা উচিত নহে। বর্ত্তমান শিক্ষানীতির সঙ্কোচ কোথাও আমরা চাহিব না। বাঙালার ছাত্র-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আমরা এই কথাই আজ ঘোষণা করিতে চাই—যে, কোনও রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক কারণে আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচ হইতে দিব না। ভাব, ভাষা, গ্রন্থমালা বা পরীক্ষাদির ব্যবস্থাগত যে পরিবর্ত্তনই আসুক, শিক্ষার পরিমাণ যেন বাড়েই—কোন মতে কমে না।

কিন্তু এই শিক্ষার গুণগত পরিবর্ত্তন আজ একান্ত অবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা চাহি—সৎশিক্ষা। শুধু ভাষাশিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা বা ইতিহাস, বিজ্ঞানাদির শিক্ষার সুব্যবস্থা হইলেই সৎশিক্ষা হয় না। সেই শিক্ষাই সৎ, যাহা মনোবৃত্তির শোধন করে—যাহা চরিত্রকে করে শক্ত, সবল, নিষ্কলুষ, নিঃস্বার্থ—হৃদয়কে বিমল প্রীতি ও সেবার রসে অভিষিক্ত ও আপূর্য্যমান করিয়া তুলে। এই শিক্ষা কে দিবে? কোথায় পাইব প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহ, আচার্য্যগৃহ, আশ্রম, তপোবন যখন নাই, তখন তাহা কি নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে? অথবা বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে থাকিয়াই, আদর্শ ও নীতির পরিবর্ত্তনে, এই বিকৃত শিক্ষারই মর্ম্ম সংশোধন করিয়া সুষ্ঠু ও সুন্দর স্ব-শিক্ষায় পরিণত করা যাইবে? ছাত্র-সম্মেলনে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। আমরা জানি, এ প্রশ্নের সদুত্তর একা ছাত্র-সম্প্রদায়ই কখনও দিতে পারে না। ইহার জন্য দেশের নেতৃবৃন্দ ও মনীষিগণের সাহায্য ও সৎপরামর্শ চাই। কিন্তু জীবনগঠনের জন্য সৎশিক্ষা ও সদনুশীলনের যে ব্যবস্থা, তাহার আলোচনায় ছাত্রগণেরও জানিবার ও জানাইবার কিছু আছে। উন্নত মানুষের সাহচর্য্য বাছিয়া লইয়া, জীবন-গঠনের শক্তি-লাভ করার জন্য ছাত্রগণের দৃঢ় ইচ্ছা ও আকুলতা চাই—ইহা আসে ভিতর হইতে। ছাত্রদের এই প্রয়োজন-বোধ তীব্র করিয়া তুলিতে হইবে। যে যুগের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি, সে যুগের পর একটা জীবনস্তরে এই উন্নততর জীবন-গঠনের তীব্র আকূতি ও অনুভূতি ছাত্র-দের বুকে হয়ত দর্শনের অভাবেই তত স্পষ্ট করিয়া পরিলক্ষ্য করিতে পাই নাই অথবা পারি নাই—সুখের বিষয়, আজ আবার স্রোতঃ যেন ফিরিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। ইচ্ছা জাগিলে, চাহিদা-পূর্ত্তির স্বাভাবিক নিয়মেই পূরণের অনুকূল পরিস্থিতি ও ব্যবস্থা হইবেই হইবে।

তারপর, ছাত্র-আন্দোলনের কথা। আমি এ কথা বলিলে তোমরা কি মনে করিবে জানি না যে, আমি এই ছাত্র-আন্দোলন কথাটার ঠিক অর্থ বুঝিতে পারি না। ছাত্র-জীবন-গঠনের জন্য যে উৎসাহের প্রয়োজন, সে উৎসাহের আগুন বুকে বুকে জ্বালাইয়া তোলাই যদি এই আন্দোলনের অর্থ হয়, ইহার প্রয়োজন অস্বীকার করি না। কিন্তু এই উৎসাহ উত্তেজনা নহে। ভাব ও কর্ম্মেই উৎসাহ দানা বাঁধিয়া উঠে। ছাত্র-আন্দোলন যদি ছাত্রদের জাগরণ হয় সত্যের জন্য, প্রীতির জন্য, দেশ ও জাতির সেবার জন্য, সে জাগরণ দানা বাঁধিয়া উঠিবে দলে দলে—কেন্দ্রে

কেন্দ্রে—সম্বন্ধকে মূল করিয়া। ইহাই সংহতি। আত্ম-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই সংহতি-গঠনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ—উভয়ে ওতঃপ্রোতঃ—বস্ত্রের টানা ও পড়েনের মত। সংহতি হয় হৃদয়-বিনিময়ে—প্রাণের সহিত প্রাণের মিলনে। গুরু-গৃহে তাই সংহতির উদয় হয়—কেন না, গুরুকে লক্ষ্য করিয়া যে হৃদয় উন্নত হয়, প্রাণের প্রবৃত্তি উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠে, তাহাই বিশুদ্ধ সম্বন্ধের বাঁধনে সম-বিশ্বাসী হৃদয়-প্রাণকে যুক্ত করিয়া লয় আপনার সঙ্গে। এই সংযুক্তিই আসল সংহতি—"Association within the heart." এমন সংহতির বন্ধন কোনও আততায়ীর খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইতে পারে না। বাঙালার প্রতি পল্লীকেন্দ্রে যদি ছাত্র-সম্প্রদায় মণ্ডলে মণ্ডলে এমনই তরুণের সংহতি—"Association within the heart"—গড়িয়া তুলিতে পারে—বাঙালীর ভবিষ্যৎ অক্ষয় বটের মত দৃঢ়মূল হইবে। সংহতির নিয়ম-কানুন বাহ্যতন্ত্র—উহা বাহিরের অনুশাসন; আসল সঙ্ঘত্ব হৃদয়ে—প্রাণে—পরস্পর চাওয়া ও পাওয়ার বিনিময়ে যে নিবিড় পরিচয় ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, তাহাই মৃত্যুর অতীতে লইয়া যাইবার মহামৃত। এই অমৃত-সিঞ্চনেই বাঙালায় নূতন সমাজ ও জাতির সৃষ্টি সম্ভব হইবে। ছাত্র-সম্মেলনকে উত্তেজনা-মূলক আন্দোলনের পরিবর্ত্তে এই অনুভূতিমূলক নিবিড় সৃষ্টি-সাধনায় উদ্বুদ্ধ দেখিলে, আমি বড় আনন্দ পাইব।

আন্দোলনের সঙ্গে রাষ্ট্রের কথা বিজড়িত। ছাত্রেরা রাজনীতি-চর্চ্চা করিবে কিনা? রাষ্ট্রের সেবায় ও সাধনায় তাহাদের কি স্থান ও অধিকার? এ সকল প্রশ্ন আমি আদৌ জটিল মনে করি না। দেশ ও জাতির সেবায় সর্ব্ব কর্ম্মেই প্রত্যেক তরুণের অধিকার আছে। দেশ-সেবা হৃদয়ের ধর্ম্ম। ইহার মধ্য দিয়া সেবক নিষ্কাম-চিত্ত হয়, দেহেন্দ্রিয়ের শোধন করে। সেবাবৃত্তি রাষ্ট্রচর্চ্চা নহে। প্রত্যেক ছাত্রকেই সমাজ ও রাষ্ট্রসেবার জন ও দায়িত্ব-বুদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইবে। ইহা ধীর শিক্ষা ও অনু-শীলন-সাপেক্ষ। উত্তেজনার প্রবাহে যারা ভাসিয়া বেড়ায়, তারা প্রকৃত দেশ-জাতি-সেবার উপযোগী নৈপুণ্য ও দায়িত্ব সঞ্চয় করিতে পারে না, ফলে ত্যাগ ও কর্ম্ম উভয়ই নিষ্ফল হয়। ছাত্রদের তাই শিক্ষা ও জীবন-গঠনের সঙ্গে সংহতির মধ্য দিয়া নেতার অধীনে, কর্ম্মশৃঙ্খলা ও দায়িত্ব গ্রহণপূর্ব্বক নানাবিধ দেশকর্ম্মে কর্ম্মনৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে বলিব—কিন্তু ইহা সংহতিরই কর্ম্ম, রাষ্ট্রকর্ম্ম নহে—এ কর্ম্ম সেবাধর্ম্ম। ছাত্র-সম্মেলন এইরূপ সেবানিষ্ঠ কর্ম্ম-তন্ত্র বরণ করিয়া অগ্রসর হইলে, তাহা যেমন দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করিবে, তেমনি আত্মগঠনে প্রবুদ্ধ করিবে, সংহতিকেও দৃঢ়মূল করিয়া তুলিবে।

বাঙালার তরুণজাতি বেকার-সমস্যার দায়ে বিভ্রান্ত। ছাত্র-সম্প্রদায়ে এই পীড়নের চাপ অনেকেই অনুভব করিলেও, তাহাদের জীবন পর-নির্ভরশীল—ঠিক বেকার নহে। কিন্তু এই পরনির্ভরশীল জীবনে কাহাকে পিতৃমাতৃ-অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থ সিনেমায়, রঙ্গমঞ্চে, নেশায়, ধূমপানে ব্যয় করিতে দেখিলে, নিষ্ঠুর হাসি পায়—এই তরল লঘু আমোদের নেশা যেন সর্ব্বত্র ক্রমেই বাড়িতেছে। মনে হয়—বড় দুঃখ হয় যে, ইহা দেশের ছাত্র-সম্প্রদায়েই বিশেষ ভাবে বাড়িতেছে। স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনা শিক্ষার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব গ্রহণ করিয়াও, ছাত্র-জীবন যে সংযম সাধনের যুগ—ইহা বিলাস-ব্যসনের যুগ নহে, এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। সমাজের নানা ব্যাধির সঙ্গে এই বিলাস-ব্যসনের ব্যাধি দূর করার ব্রত ছাত্রসম্প্রদায়ই গ্রহণ করিতে পারে—ইহা তাহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিলেও হয় ত আমার অত্যুক্তি হইবে না।

বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ছাত্র-সম্প্রদায়কে শিক্ষা-সেবা-ব্রতে সেদিন আহ্বান দিয়াছেন। প্রত্যেক ছাত্রকে বিদ্যালয়ের অবকাশ-কালে অন্ততঃ ২০ জন নিরক্ষর পূর্ণ-বয়স্ক গ্রামবাসীর অক্ষরশিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। ইহার জন্য একটী "গণশিক্ষাদিবস" নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে "বিদ্যামন্দির"-পরি-পরিচালনার জন্য ২৫ বৎসরের জন্য স্থায়ী কর্ম্মী নিযুক্ত হইতেছেন—অবশ্য ইহারা বেতনভোগী কর্ম্মী, স্বেচ্ছা-সেবক ছাত্র নহেন। মহাত্মাজী এই সকল কর্ম্মীদের সম্বোধন করিয়া সেদিন বলিয়াছেন:—

"Herr Hitler is achieving his goal through the sword, I through the soul. Cast off western ideas and identify yourselves

with villagers and live their lives. The westerners are giving destructive instructious; we constructive, through non-violence."

চীনের ছাত্র-সম্প্রদায়ও দেশে যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে এইভাবে গণ-শিক্ষার জন্য আপনাদিগকে নিয়োজিত করিয়া, দেশ-সেবার নবীন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। বাঙালার ছাত্র-সম্প্রদায় চীনের বা বিহারের আদর্শ গ্রহণ করিয়া কিছু করিতে পারে কি না, তাহা এই ছাত্র-সম্মেলন বিবেচনা করিতে পারে। ইহাও আন্দোলন-স্বরূপে নয়, সংহতি-সাধনার অন্যতম সাধন-নীতিরূপে অনুষ্ঠিত হইলে সত্য সত্যই স্থায়ী ফলপ্রসূ হইতে পারে। সংহতি-সাধনেও mass contact হয়; কিন্তু তাহা রাষ্ট্রীয় প্রপোগ্যাণ্ডার মত আশু-লক্ষ্যমুখী না হওয়ায়, ইহা জাতি-জীবনকে গভীর ভাবেই স্পর্শ দিয়া তাহার ভগ্ন জীর্ণ আর্থিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত মেরুদণ্ডটীকে ধীর তপস্যায় পুনর্গঠন ও পুনর্জ্জীবন দান করিতে সক্ষম হয়।

জাতিকে ভিতর হইতে পুনর্গঠিত করিয়া তোলাই আজ আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। রাষ্ট্র-সাধনা যেদিক্ হইতে এই জাতি-নির্ম্মাণে ক্ষিপ্রবেগে অগ্রসর হইতেছে, তাহা উপেক্ষার নহে। ইহাতে যুগ-শক্তির প্রভাব আমরা স্পষ্ট পরিলক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া দেখিলে দেখা যাইবে—ইহাতে একটা বড় দিক্ অপূর্ণ রহিয়া যাইতেছে; এই দিক্ কৃষ্টি ও সাধনার দিক্—অন্তর্গঠনের দিক্। দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের খরবেগে এই ভিতরের দিক্টা আজ হয়ত আমাদের কাছে তত সুস্পষ্টভাবে গোচরীভূত হইতেছে না; কিন্তু আশ্চর্য্য, বিলাতের প্রফেসার হ্যালডেনের ন্যায় মনীষী দূর হইতেও আজ আমাদের এই ত্রুটি ও অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন- তাই তার স্বরে লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্র-সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—"আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে—বিরাট্ বৃটিশ সাম্রাজ্যও হয়ত রূপান্তরিত হইবে—কিন্তু ভারতের তরুণ যদি আজও ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনাকে রক্ষা করার জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, ভারত বাঁচিবে কি লইয়া?" এই কৃষ্টি-রক্ষার চেতনাই আজ প্রবর্ত্তক-ছাত্র সম্মেলনকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। আজ ক্ষুদ্র আত্মজীবনের ও সঙ্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা জলন্তরূপেই বুঝিয়াছি—স্বাধীনতার জয়যাত্রায় শ্রীভগবানের জাগ্রত স্পর্শ ও অনুভূতি না হইলে সকলই বৃথা। দেশ-মুক্তির জন্য চাই চরিত্রের সংগঠন। তাহার ভিত্তি—ধর্ম্ম—ভগবানের সহিত সংযুক্তি। ইহাই ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার মূলমন্ত্র। আজ মুক্তিব্রতী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 'স্বরাজমন্ত্রের" ব্যাখ্যা প্রাণে নূতন মর্ম্ম ফুটাইয়া তুলিতেছে —"স্বে মহিম্নি রাজতে"—নিজের মহিমায় বিরাজ করিতে নিজের কোটেই ফিরিতে হইবে—বহির্ম্মুখী দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী করিতে হইবে। আজ বিবেকানন্দের বীর-বাণী কোটী বার কণ্ঠে ঝঙ্কার দিতেছে—"মা, আমাদের সর্ব্বদোষ অপহরণ করিয়া মনুষ্যত্ব দাও, আমরা মানুষ হইয়া দাঁড়াই।" আজ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সঙ্কেত—গীতার উত্তম রহস্য—মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব জাগাইতেছে—মানুষের মুক্তি শ্রীভগবানে নবজন্মে—"মামেবৈষ্যসি" "মামেতি"—সর্ব্বত্যাগী আত্ম-সমর্পণযোগী ভগবানেই বাস করে, ভগবানকেই পায়। ইহাই ভারতের সনাতন ধর্ম্ম, সনাতন পথ। গুরু এই মন্ত্রেই আমাদের দীক্ষা দিয়াছেন। তোমাদের এই মন্ত্রের সঙ্কেতটুকুই আমি অকপটে জানাইতে পারি।

উদীয়মান তরুণ, কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাই তোমাদের সেই গুরুবাণীরই প্রতিধ্বনি শুনাই :—

দেখিয়াছি সত্য, পাইয়াছি পথ—
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ।
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই, নাই আর কিছু।
আর এস, জনে জনে এই অনুভূতির সাড়া তুলি—
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসে মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে—
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ!*

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

* অক্ষয়া তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।

আর্ট ও ফ্লার্ট

(গল্প)

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

সাইকেলটা দেওয়ালের গায়ে রেখেই সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে আসে একটী যুবক। হাতে তার একতাড়া কাগজ, একটু উৎসুক, একটু ব্যস্ত সে। উঠেই সাম্‌নে দেখতে পায় একটী মেয়েকে—যে বয়সে মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর দেখায়, সে বয়সেরই মেয়েটী—সত্যিকার সুন্দরী। কয়েক মুহূর্ত্ত দু'জনেই দু'জনার দিকে চেয়ে থাকে। অভিজাত-সম্প্রদায়ের মেয়ে মাধুরী তারই মত কোন সম্ভ্রান্ত যুবকের জন্যে অপেক্ষা ক'রতে থাকলেও, তার দিকে না চেয়ে পারে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে যুবক বলে, মিঃ মুখার্জ্জি আছেন কি?

একটা গাড়ী এসে থামে গাড়ী-বারান্দার তলায়- একটী যুবক নেমে পড়ে।

তার দিকে চেয়েই মাধুরী বলে, এত দেরী? ব'স, আমার একটু কাজ আছে।

ধীরাজ বলে, মন্দ নয়, দেরী অথচ কাজ আছে।

তাকে একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে মাধুরী বলে, হাঁা, আসুন, ওই পাশের ঘরেই আছেন তিনি।

মাধুরী এগিয়ে যায়, যুবকটী যায় তার পেছনে—ধীরাজ একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। একটা কালো ছায়া তার মুখের ওপর দিয়ে ভেসে গেলেও, চুপ ক'রে না দাঁড়িয়ে থেকে সে পারে না।

মিঃ মুখার্জ্জীর সঙ্গে কাজ সেরে যুবকটীর বেরিয়ে আসতে লাগে মিনিট দশেক। ঘর থেকে বেরিয়েই সামনে দেখতে পায় মাধুরীকে। হঠাৎ কি যেন মনে হওয়ায় হাত তুলে নমস্কার ক'রে সে বলে, ধন্যবাদ, আপনি একটু উপকার ক'রেছেন তাড়াতাড়ি দেখা করিয়ে দিয়ে।

মাধুরী লজ্জিত হ'য়ে পড়ে, বলে, এ ত' কিছুই নয়, এর জন্যে ধন্যবাদের কি আছে। যুবক হাসে, বলে, আছে বই কি, বন্ধুকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে সঙ্গে ক'রে পৌঁছিয়ে দিলেন সে কি কম কথা। হয়ত' আপনার বন্ধুর বিশেষ কাজই আছে।

মাধুরী একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে, ব'লে, না কাজ আমারই, ওঁকে আমিই আসতে ব'লেছি এ সময়ে। হাসি-মুখেই যুবক বলে, না সে কথা নয়, আসতে না ব'ললেও হয়ত আসতেন উনি, কিন্তু—। আচ্ছা চলি আমি, আর দেরী করাব না আপনার। আর একবার নমস্কার জানিয়ে ও বেরিয়ে যায় সাইকেলটা নিয়ে।

মাধুরী এসে ধীরাজকে একটা মৃদু ঠেলা দেয়, বলে, চল, আর দেরী ক'রলে চ'লবে না। আমি একেবারে প্রথম থেকেই থাকতে চাই।

ধীরাজ বলে, দেরী যা' ক'রেছ তা' তুমিই। কি কাজ যে তোমার হঠাৎ পড়ে তা ত' বুঝতেই পারি না। কাজগুলোর কি সময় অসময় থাকে না? ধীরাজের মুখ বেশ গম্ভীর।

মাধুরী হাসে, বলে, তোমাকে দেখেই শিখ্‌ছি কিনা। সময়ে অসময়ে এখানে যেমন তোমার হঠাৎ কাজ পড়ে, এও তেমনি হঠাৎ প'ড়েছে যে। ও খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে।

আর একটু গম্ভীর হ'য়ে ধীরাজ বলে, এখানে আমার কাজ পড়ে তোমার জন্যে; কিন্তু তোমার যে কি জন্যে প'ড়ল, তা' ত বুঝতে পারছি না। কতক্ষণ এসেছিল ও লোকটা?

মাধুরী বলে, ভয় নেই। এস, আর দেরী ক'র না, সত্যি, কে একজন লোক এসেছে তাই নিয়েই·· যাও।

ধীরাজ ওর মুখের দিকে চায়, তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, বলে, সত্যি ভয় লেগেছিল — লোকটার চেহারাটা যে—।

'হিংসে ক'রে লাভ নেই, চেহারা বদলাবার কোন উপায়ই নেই—মন্তর জানা থাকলে না হয় তোমার সঙ্গে অদল-বদল ক'রে দেওয়া যেত'।' মাধুরী হেসে ফেলে।

ওর একটা হাত জোরে চেপে ধ'রে ধীরাজ বলে' কিন্তু যদি পালাবার চেষ্টা কর ত' মজা বুঝতে পারবে। একেবারে—।

'চুপ, আর কোন কথা নয়।'

ওরা গাড়ীতে উঠে বসে। গাড়ী চ'লতে সুরু করে।

মাধুরীর দিকে চেয়ে ধীরাজ বলে, আচ্ছা হঠাৎ এই সাহিত্য-সভাটার ওপর এত' ঝোঁক হ'ল কেন তোমার? অনেক জায়গায়ই ত' যাওনি, এটার বেলা একেবারে প্রথম থেকেই, ব্যাপার কি?

অন্যমনস্কভাবে মাধুরী বলে, শেখরবাবু আসবেন যে।

ধীরাজ চ'মকে ওঠে, বলে, শেখরবাবু? সে আবার কে?

মাধুরী উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে, বলে, কে? তোমার কি কিছুই মনে থাকে না? আমার কয়েকটা লেখার যখন খুব প্রশংসা সুরু হয়, তখন কে এক শেখর তার তীব্র সমালোচনায় আমায় যেন গুঁড়ো ক'রে দেয়, তা' কি ভুলে গিয়েছ? তুমি ভুলতে পার, কিন্তু আমি ত' পারি না কিছুতেই।—সে আসবে আজ, তাকে দেখতে চাই।

ধীরাজ বলে, কিন্তু দেখে ক'রবে কি? দেখলেই কি শোধ নেওয়া হবে?

আস্তে আস্তে মাধুরী বলে, না, তা নেওয়া হবে না; কিন্তু তাকে দেখতেও চাই। এতগুলো লোকের প্রশংসাকে তীব্রতার ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার স্পর্দ্ধা রাখে যে, তাকে না দেখেই কি স্থির থাকা যায়!

'কিন্তু কি লাভ? সে হয়ত' আরও গর্ব্বিত হ'য়ে উঠবে তাতে।'

মিষ্টি হাসি হেসে মাধুরী বলে, আমাকেও অস্ত্র ধরতে হবে ত', আর তারই রসদ সংগ্রহ ক'রতে হ'লে তাঁর সঙ্গে আলাপ না ক'রেই বা উপায় কি। কিন্তু থাক্, আমাদের নামবার সময় হ'য়ে এসেছে।

গাড়ী এসে থামে প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর সামনে।

কোথাকার জমিদারের ছেলে সাহিত্যিক হ'য়ে উঠেছে। আজ তারই বাড়ীর হলঘরে সাহিত্য আলোচনা হবে, আর তারপর চা-পান হবে বাগানে। বহু সাহিত্যিক আসবে আজ—গণ্যমান্য থেকে চুনোপুটি পর্য্যন্ত। আর আসবে শেখর, যার তীক্ষ্ণ কলমের খোঁচা অনেকেই খেয়েছে—অনেককেই সাহিত্য-জগৎ থেকে খসে প'ড়তে হয়েছে তার আঘাতে, একটা অসীম শক্তি নিয়ে যে সে জন্মেছে তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই—মাধুরীও করে না।

জমিদার-নন্দন তার কাছে এসে বিনয়ে নুয়ে পড়ে, পথ দেখিয়ে বলে, আসুন, সবাই এসে গেছেন। আপনার আর শেখরবাবুর জন্য অপেক্ষা ক'রছি আমরা, তা' তিনি এখনও—কিন্তু কখনই তিনি দেরী করেন না। এ বিষয়ে তিনি একেবারে মিলিটারী, আজ যে কি হয়েছে কে জানে!

হলঘরে এসে পরিচিত অপরিচিত অনেককেই দেখতে পায় সে। কয়েকটি মহিলাও আছেন—আর তাদেরই মধ্যে আছে তার পুরণো বান্ধবী মীরা।

মাধুরীকে কাছে টেনে নিয়ে মীরা বলে, সব জায়গাতেই জোড়ে যে।—তা' ও ভদ্রলোককে আজ কষ্ট দিলে কেন—বেচারা একেবারেই অসাহিত্যিক।

এদিক্ ওদিক্ চেয়ে ধীরাজ চুপটি ক'রে ব'সে পড়ে এক কোণে। সাহিত্য-জগতের মাথা প্রৌঢ় রজনীবাবু বলেন, আর দেরী করে' লাভ কি—যার যার কাগজ বার করুন।

যুবক হরিশ বলে, কিন্তু আর একজন বাকী, শেখর, ওকে বাদ দিলে খোঁচা খেতে হবে না বটে; কিন্তু তাতে মজাও নেই—আলোচনাও ঠিক হবে না।

হাসিমুখে রজনী বাবু বলেন, ও আমাদের কথা শুনবেও না হয়ত'। ও হ'চ্ছে প্রচণ্ড শক্তি, আমাদের বাজে কথায় কাণ দেওয়া প্রয়োজনও মনে করে না সে। ওকে বাদ দিলে সাহিত্য চলে না বটে, কিন্তু এখানকার কাজ চ'লবে।

হ'য়ে ওঠে, মনের আবেগ স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে।

ঠিক এমনি সময়ে ঘরে এসে হাজির হয় একটী যুবক। সবাই সাগ্রহে বলে, এত দেরী যে?

বাধা পেয়ে চেয়ে দেখেই মাধুরী চ'মকে যায়—এ যে সেই! তারই বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিল যে, মিষ্টভাষী, প্রাণশক্তিতে পুষ্ট সেই যুবক—এই শেখর? মাধুরীর বুক কেঁপে ওঠে, নিজের অজ্ঞাতসারেই গাল দু'টো লাল হ'য়ে যায়। প্রগতিবাদী, উদ্দীপ্ত মাধুরীর চোখও কি এক লজ্জায় মাটীর দিকে নেমে আসে।

তার দিকে চেয়ে হেসে শেখর বলে, আপনি? আপনিও সাহিত্যিক নাকি? মাধুরীকে কে যেন আঘাত করে, কিন্তু তবু স্থির হ'তে পারে না সে—বুক তার তখনও কাঁপে।

হরিশ বলে, কি ব'লছ শেখর, সাহিত্যিক নাকি মানে? উনিই ত' মিস্ মাধুরী মুখার্জ্জি—নাম শুনেছ নিশ্চয়ই।

'বটে? আন্দাজ ক'রে নেওয়া উচিত ছিল আমার। থামলেন কেন, প'ড়ে যান।'

এক ধারে ব'সে প'ড়ে শেখর একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাতে থাকে। মাধুরী আবার প'ড়তে আরম্ভ করে, কিন্তু ঠিক তেমনি ক'রে পড়া আর হয় না, অনেকবার থামতে হয় তাকে, যেন আট্‌কে যায়। কিন্তু উপায়ই বা কি, বুক যে তার স্থির হয় না কিছুতেই।

পড়া শেষ হয়ে যায়।

সকলেই প্রশংশা করে, তাদের দৃষ্টির সামনে সে কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে।

হরিশ বলে, চমৎকার, এমনি দৃঢ় শক্তিশালী লেখাই চাই আজকাল, ভারী ভাল লাগছে, তোমার কি মত শেখর?

মাধুরী শেখরের দিকে চোখ তুলে চায়, আর শেখর চায় তার দিকে। একটু হাসি শেখরের মুখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়, বলে, আমার মত-প্রকাশের কোন মানেই হয় না, শুনেছি আমি একটুখানি। তবে তোমাদের যখন ভাল লেগেছে, তখন ভাল হ'য়েছে নিশ্চয়। কিন্তু সেই ভাল শক্তিশালী লেখাটা তোমরা শুধু হজম ক'রে ফেল' না যেন। রজনী বাবুর কাগজে ছাপিয়ে দিয়ে অন্য সবাইকে জানতে দাও।

কে একজন বলে, একটু ভাল কথাও কি ব'লতে জান না শেখর!

শেখর হাসে, বলে, কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যে, আপনি যাঁর জন্যে ওকালতি করছেন তাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন, ভাল কথা আমি জানি কিনা। আপনার মক্কেলই আমার সাক্ষী।

সবাই হেসে ওঠে—মাধুরীর চোখে মুখেও হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায়। এ দিক্‌কার কাজ শেষ হ'য়ে যায়—সবাইকে বাগানে চায়ের টেব্‌লে আসতে হয় এবার। বেয়ারারা চা এবং আনুসঙ্গিক সব কিছু সাজিয়ে দিয়ে যায়।

মাধুরী এতক্ষণে নিজেকে সাম্‌লিয়ে নেয়, শেখরের কাছে এসে বলে, চলুন ওদিক্‌কার টেব্‌লটায়। শেখর মুখ তুলে চায়, বলে, মাত্র দু'টো চেয়ার যে ওখানে, আপনার সঙ্গী ব'সবেন কোথায়? আপনি যখন প'ড়ছিলেন, আমি তখন তাঁর দিকে চেয়েছিলুম, এখন হয়ত' তিনি আপনাকে একটু আড়ালে প্রশংসা ক'রতে চান। অতএব ও জায়গাটা—

মাধুরী আর লজ্জা পায় না, বলে, ওঁর ভার মীরাই নিয়েছে এখন। আর প্রশংসা তা' ত' করেন অনেকেই, আর উনিও বাদ যান না। যাবার সময়ে গাড়ীতে আমাকে একাই পাবেন, আপনার ভাববার দরকার নেই—এখন নির্জ্জনে না হয় একটু গালাগালিই শুনি। তবু নূতন কিছু ত' বটে!

ওরা এগিয়ে যায়।

চেয়ারে ব'সতে ব'সতে শেখর বলে, প্রশংসায় অরুচি ধরেছে, এবার একটু চাটনি চান, এই ত'? কিন্তু দেখবেন, বেশী খাবেন না যেন—বিপদ্ হ'তে পারে।

'মেয়েরা চাট্‌নি একটু বেশী ভালবাসে।' মাধুরী হেসে ফেলে। 'বটে? প্রগতিবাদীরাও নাকি? মেয়েদের খবর ত' ঠিক জানি না।' শেখর জবাব দেয়। 'তবু ভাল, সত্যি কথা স্বীকার করেছেন—পুরুষরা মনে করে, মেয়েদের তারা খুব বোঝে। হেসে কথা ব'ললে, ঘরে ব'সতে দিয়ে ফ্যান্ চালিয়ে দিলে অথবা আঁচলটা একটু

গায়ে লেগে গেলে, তারা মনে করে প্রেমে প'ড়েছে। আমাদের কিন্তু হাসি পায়। পুরুষরা বেশী বুদ্ধিমান্ কিনা!'

শেখর জোরে হেসে ওঠে, বলে, এ বিষয়ে মেয়ে পুরুষ দুই-ই সমান। অবশ্য বুদ্ধি যাদের আছে, তাদের কথাই ব'লছি। আমি কিন্তু একেবারেই বোকা, ঠিক আপনার মত।

ওরা দু'জনেই হেসে ওঠে বেশ সহজ ভাবে।

পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে মাধুরী বলে,—আপনার সঙ্গে আলাপ যখন হ'ল, তখন আর ছাড়ছি না কিছুতেই। সাহিত্য জিনিষটা আমার ভাল লাগে, আপনাকে গুরু বরণ ক'রে নিলুম তাই।

চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে শেখর বলে,—গুরু? অর্থাৎ গরু বলার সুযোগ ক'রে নিতে চান—পথটা খুবই সোজা স্বীকার করি। জানেন ত' ভালবাসার উল্টো দিকে আছে ঘৃণা, একটু এদিক্ ওদিক্ হ'লেই বিপদ্—এও ঠিক তাই, কি বলুন!

'ওসব শুনতে চাই না আমি, কাল বিকেলে আপনাকে যেতে হবে আমাদের বাড়ী। আপনার কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখে নিতে চাই আমি। শুনেছি আপনি গান শুনতে ভালবাসেন, আমি তা' শোনাব আপনাকে, আর তার বদলে আপনি হবেন আমার সাহিত্য-গুরু।' মাধুরী ওর মুখের দিকে চায়।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে কি ভেবে শেখর বলে, কাল? আচ্ছা তাই হবে, কালই যেতে পারব', ঠিক ছ'টার সময়ে।

'আপনার নূতনতম লেখাটা নিয়ে যাবেন। কিন্তু।' মাধুরী বলে।

'কিন্তু প্রথম দিনেই ওসব ক'রতে নেই—গুরুকে যাচাই করা পাপ, বিশেষতঃ প্রথম দিনেই।' শেখর হাসে। মাধুরীও হাসে, বলে, না সত্যিই ভাল কথা জানেন না আপনি—প্রত্যেক কথাতেই খোঁচা। কিন্তু সে-সব চ'লবে না, আমার কথাই শুনতে হবে আপনাকে, লেখা নিয়ে যাওয়া চাই-ই।

শেখর বলে, বেশ তাই হবে, কিন্তু তার বদলে চাই দুটো নূতন গান।

দু'জনাই হাসে।

ফেরবার পথে চুপি চুপি হরিশ বলে, কি অত আলাপ হচ্ছিল শেখর? দেখছে ভাই—

হাসি-মুখে শেখর বলে, কিন্তু অত কৌতূহল ভাল নয়—আর এও ঠিক, কথাগুলো শুনলে তুমি খুসি ত' হবেই না হয়ত' আরও বেশী চ'টে যাবে।

শেখর হাসে, হরিশ আর কিছু বলে না।

গাড়ীতে উঠে মাধুরী বলে, ভারী ভাল লাগ্‌ল আজ, কি বল?

উত্তর না দিয়ে মুখ কালো ক'রে ধীরাজ বাইরের দিকে চায়। তার মুখের দিকে একবার চেয়েই মাধুরীও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির চপল গতিভঙ্গী দেখতে থাকে।

* * * *

পরদিন।

শেখর এসেই মাধুরীকে দেখতে পায় বারান্দার ওপর। সে তারই জন্যে দাঁড়িয়ে আছে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে। শেখর বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে। সুসজ্জিত মাধুরীর রূপ যেন আর বাধা মানে না। শেখরের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে সে লজ্জিত হ'য়ে পড়ে, মুখে তার ফুটে ওঠে মিষ্টি একটুক্‌রো হাসি।

গান সুরু হয়, শেখর চুপ ক'রে শোনে। মাধুরী নিজেকে হারিয়ে ফেলে গানের মধ্যে—হয়ত' কোন এক গোপন তারে ঝঙ্কার উঠেছে আজ, তার মন মানে না বাধা, দেহ মানে না শাসন।

ঠিক এমনি সময়ে ধীরাজ এসে হাজির হয়। চ'মকে যায় সে শেখরকে দেখে। মাধুরীও হঠাৎ থেমে যায়, তার হাত যেন আর চলে না। হতাশভাবে সে শেখরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

শেখর বলে, আসুন, কিন্তু বড় দেরী করেছেন—অনেকক্ষণ থেকেই আপনাকে আশা ক'রছিলুম। কিন্তু গানের গলা টিপে মারা হ'ল যে, এ কিন্তু নিষ্ঠুর লোকেরাও করে না।

ধীরাজ বলে, থাক, এখন আমি যাই, একটা কাজ ছিল, তা' অন্য সময়ে এলেও চলবে।

শেখর হেসে ফেলে, বলে, কিন্তু এটা ভারী অন্যায়

ধীরাজ বাবু, কেন দু'জনেই না হয় থাকলুম খানিকক্ষণ।

জিনিষটা আমার যখন ভাল লাগবে, তখন যে আপনার খারাপ লাগতেই হবে—এর ত' কোন মানে নেই। ব'সে পড়ুন—নইলে কলা-বিদ্যার অপমান হবে যে!

ধীরাজকে ব'সতেই হয়; কিন্তু তেমন ক'রে আর কোন কিছুই জমে না।

এমনি ক'রেই দিন কেটে যায়। মাধুরী যেন একটু একটু ক'রে শেখরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, শেখর তা' বুঝতে পারে—ধীরাজও।

সেদিন 'রোমিও জুলিয়েট' দেখে মাধুরী আর শেখর গিয়ে উঠে একটা হোটেলে। বেয়ারাকে আদেশ ক'রে, পর্দাটা টেনে দিয়ে চেয়ারে ব'সতে ব'সতে মাধুরী বলে, সত্যি চমৎকার হ'য়েছে—চমৎকার ফুটেছে জুলিয়েট, আর ব্যারিমুর একেবারে আশ্চর্য্যজনক। দেখতে দেখতে নিজেকে আমার জুলিয়েট বলেই মনে হচ্ছিল।

শেখর বলে, কিন্তু ধীরাজবাবুকে নিয়ে এলে হ'ত। আড়চোখে সে মাধুরীর মুখের দিকে চায়। মাধুরী ব্যস্ত ভাবে বলে, না, না কি যে বলেন, একটু রস-গ্রহণ ক'রবার ক্ষমতা থাকা চাইত'। একেবারে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে থেকে, কেবল হুঁ দিলেই, কি সব সময়ে ভাল লাগে?

শেখর সহজভাবেই বলে, কিন্তু এ ভারী অন্যায়, ভদ্রলোক সেদিন আপনাকে নিয়ে যেতে চাইলেন, তা ত' গেলেনই না, আবার আজ দিলেন তাঁকে বাদ। ওঁর কিন্তু আপনার সঙ্গে যেতে খুব ভাল লাগে।

হঠাৎ মাধুরী যেন উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে, বলে, তা' হ'তে পারে, কিন্তু আমার ভাল লাগে কিনা, তাও ত' দেখতে হবে। তার হ'য়ে ত' খুব কথা কইছেন, কিন্তু আমরা বুঝি মানুষ নই? আমাদের ভাল লাগা বুঝি কিছুই নয়?

'আমার সঙ্গে এসে আপনার খুব ভাল লেগেছে তা'হলে?' শেখর ওর চোখের দিকে চায়, ওর চোখও এসে মেশে তার চোখের সঙ্গে। আস্তে আস্তে মাধুরীর চোখ নীচের দিকে নেমে আসে লজ্জায়—শেখর একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে।

* * * *

শেখর থাকে একা একটা ঘরে। নিজেই সে বাবু, আবার নিজেই ভৃত্য। সমস্ত ঘরটার অধীশ্বর শেখর একা।

সেদিন বিকেল বেলা এক কাপ চা ছেঁকে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এসে ঢোকে মাধুরী। শেখর চীৎকার ক'রে বলে, আসুন, ভয় কি, ও কিছু নয় ইঁদুর টিঁদুর হবে বোধ হয়। তাইত, ব'সবার জায়গা চাই? বিছানাটা পাতাই র'য়েছে, ওখানে ব'সে কাজ নেই, বড় নোংরা, নয়? তার চেয়ে ওই বইগুলোর ওপরই ব'সে পড়ুন।

মাধুরীর মুখ শুকিয়ে যায়, কি ক'রে মানুষ এর ভেতর থাকতে পারে তা' সে ভেবেই পায় না। দেশলাইয়ের যে এতগুলো কাঠি থাকতে পারে, একটা লোক যে কি ক'রে এতগুলো বিড়ি আর সিগারেট খেতে পারে, তা সে ধারণা ক'রতেও পারে না। শুধু কাঠি আর পোড়া বিড়ি সিগেরেটই নয়—জল, নোংরা জামা, খাতার পাতা, বইয়ের মলাট, ছেঁড়া জুতো, এমনি নানা জিনিষ ঘরটাকে যেন তার কাছে অদ্ভুত ক'রে তোলে। একটা বিশ্রী গন্ধ যেন কোথা থেকে ভেসে এসে তাকে পাগল ক'রে দেয়।

তার মুখের দিকে চেয়ে তার মনের অবস্থা বুঝে একটু খুসী হ'য়েই শেখর বলে, চমৎকার, একেবারে রোমিওর সুসজ্জিত কক্ষ, কি বলুন? কেমন আর্ট দেখুন ত'?

এসেন্স-মাখা রুমালটা বার ক'রে মাধুরী বলে, কিন্তু থাক্ আপনার আর্ট, এমনি আর্ট নিয়ে বাঁচা যায় না। আমি চলি।

শেখর হাসে, বলে, তা' কি হয়? একটু চা খেতেই হবে আপনাকে। কলাই-করা কাপে খেতে পারবেন না বোধ হয়? জিনিষটা চমৎকার, ভাঙে না। থাক্, ভাল কাপ আছে একটা, হাতলটা কিন্তু ভাঙা, তা' হক্—এও একরকম আর্ট।

আবার আর্ট! মাধুরী আর সহ্য ক'রতে পারে না, বলে, আর্ট ত' বুঝলুম, কিন্তু এসব ভদ্রলোকের জন্যে নয়। চা আপনিই খান দু' কাপ—আমি চলি।

একটু গম্ভীর হ'য়ে শেখর বলে, কিন্তু সত্যি ভারী চমৎকার হ'য়েছে চা—তেল-মাখা মুড়ি পেঁয়াজ দিয়ে খেয়েছেন কখনও—ভারী ভাল লাগে চায়ের সঙ্গে। পেঁয়াজ

চোখ ভাল করে আর মুড়ির মচ্‌মচানি কলাজগতের একটা বড় দান।

মাধুরী উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে, বলে, আপনি কি তামাসা ক'রছেন নাকি ?

হাসিমুখে শেখর বলে, ঠিক ধ'রেছেন। ধীরাজবাবুকে বাদ দিয়ে আর্ট চাইছিলেন কিনা তাই। জীবনে আর্টটাই আসল নয়, বুঝেছেন ? নূতন ব'লে মনে হওয়া মাত্রই যদি ঘুরে দাঁড়ান, তা' হলে ধীরাজ শেখরে কুলোবে না—স্থির হ'তে পারবেন না কোন দিন, চোখ যাবে ধাঁধিয়ে, শান্তি পাবেন না কোনদিন—অথচ ওইটাই জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস। আপনাকে একদিন আসতে ব'লেছিলুম ঠিক ; এই সব জানাবার জন্যেই। সাহিত্য ক'রে আর কত পাওয়া যায়, মাসে টাকা কুড়ির বেশী মেলে না বড় একটা—আর বই লিখে পূর্ব্বপুরুষের ধার শোধ করবার চেষ্টা ক'রতে হয়, কিন্তু তাতেই কি চলে ? বুড়ো বাপ আর বুড়ী মা আছেন—দেশে তাঁদেরও ত' বাঁচাতে হবে। তাই আপনার বাবার অফিসের পিয়ন হ'য়ে ব'সলুম। কিন্তু ধীরাজবাবুর দিকে পেছন ফিরে আপনি ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে—কাজেই চাকরী ছাড়তে হ'ল। এসব আর্টের খেলা। ফিরে গিয়ে ধীরাজবাবুর কাছে মাপ চেয়ে নিন, আর সাহিত্য ছেড়ে অন্য কাজে মন দিন। সাহিত্য থাক আমাদের, আপনারা হন আমাদের খোরাক। আচ্ছা যেতে পারেন, নমস্কার।

মাধুরী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়—চায়ের পেয়ালায় শেখর দেয় লম্বা একটা চুমুক।

আনন্দরূপম্

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন—অন্তরের একাকিত্ব ভরি'
মহাশান্তি পরিব্যাপ্ত ! কত কোটী দিবস-শর্ব্বরী
মহাকাল-সিন্ধুবক্ষে উর্ম্মির মতন ভঙ্গিমায়
আসে যায়—কল্লোলের স্পন্দন শিহরে শূন্যতায়
দিক্‌চক্রবাল-পারে ; আলোছায়া ছন্দায়িত পথে
অনাহত ধ্বনিগুলি মূর্ত্তি লভে আনন্দ-মণ্ডলে
মাধুরী মধুর রূপে ! দেহের বিদেহ পরকাশ—
সৃষ্টির অনাদি স্রোতে সৌন্দর্য্যের শাশ্বত বিলাস।

চিরন্তন সঙ্গীত-মুরতি ! অন্তরের নীরবতা
উদ্ঘাটি' শুনাল কোন নন্দনের আনন্দ-বারতা !
আপন নিরবচ্ছিন্ন মহীয়ান্ একাকিত্ব মাঝে
লভিয়াছে সত্যরূপ—চিরন্তন অক্ষয় বিরাজে ;
মুগ্ধ আমি ! ডুবে আছি অতলের গভীর অতলে
ধ্যানমৌন অন্তরের আনন্দের চির-মর্ম্মস্থলে !

বঙ্কিম-স্মৃতি

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, কোনটিই জীবন হ'তে পৃথক্ নয়; প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্য—ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে জীবনের কোন বিশিষ্ট ভাবকে রূপায়িত করা। ইহারা প্রত্যেকেই জীবনের উৎস হতে রস সংগ্রহ করে। তাই প্রত্যেক সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে জাতীয় ও সমাজগত ঘনিষ্ঠ প্রভাব দেখা যায়। এই জাতীয়, সমাজগত ও ব্যক্তিগত জীবনের পরিস্থিতি অনুকূল না হলে, কোন বড় সৃষ্টি অথবা কোন বড় স্রষ্টা সম্ভবপর হয় না।

ইংলণ্ডের স্বর্ণ-যুগে যখন সমগ্র জাতি ও সমগ্র সমাজের ভিতর নূতন জীবনের সাড়া এল, দেশের প্রত্যেক শ্রেণী এবং প্রত্যেক স্তরের লোকের হৃদয়-বৃত্তি যখন সফলতা ও সমৃদ্ধির আনন্দে স্ফীত, তখনি সেক্সপীয়রের মত মনীষী এবং স্রষ্টা সম্ভবপর হয়েছিল। ভিক্টোরিয়ান যুগেও ইহার পুনরুক্তি হয়েছিল। ভারতবর্ষ যখন সমৃদ্ধি, সাফল্য ও গৌরবের উচ্চতম সোপানে আরূঢ়, সেই সময়েই কালিদাসের আবির্ভাব।

বাঙালীর জাতীয় জীবনেও এইরূপ অনুকূল পরিস্থিতি, নূতন ভাবধারার আবির্ভাব হয়েছিল বৃটিশ রাজত্বের প্রথম যুগে। যখন বিজেতা ইংরাজদের সহযোগিতায় বাঙালী কর্ম্মগত জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উন্নতির পথে অগ্রবর্ত্তী, যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বাঙালীর ভাবগত জীবনে নূতন সাড়া এনেছে, যখন শিক্ষিত সমাজের প্রত্যেক স্তরে জীবনকে নূতনরূপে দেখবার, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নূতন সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার আগ্রহ এসেছে, তখনি বড় শিল্পীর, বড় স্রষ্টার অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। সেই উপযুক্ত সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে তার এক একটি দিক্ ধরে অনেক কিছু বলা চলে—তাঁর ভাষা, তাঁর ষ্টাইল, তাঁর চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি সবই রসভূয়িষ্ঠ ও আনন্দপ্রদ। তখনকার দিনে "মনস্তত্ত্ব" কথাটির সাড়া ছিল না, কিন্তু তাঁর চরিত্রগুলি সম্বন্ধে সে অভাবও কেহ বোধ করেন নাই। ভাবনায়, চিন্তায়, কাজে-কর্ম্মে, কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে তাদের পরিচয় স্বতঃসম্পূর্ণ। তাই পাঠকদের তারা কেবল মুগ্ধই করে না, তাঁদের স্মৃতিকেও চিরদিনের মত অধিকার ক'রে থাকে।

আয়েষা, কপালকুণ্ডলা কি কুন্দের জন্য কার না কাতর শ্বাস পড়েছে ও পড়ে। তাঁর সূর্য্যমুখী, কমল, ভ্রমর, প্রফুল্ল প্রভৃতিকে আমরা আপন ঘরের লোকের মতই বুঝতে পারি—তাঁদের স্বতন্ত্র মনোবিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখি না। তাঁদের সঙ্গে আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের পরিচয়, কিন্তু আজিও তাঁরা আমার স্মৃতিতে সজীব ও সহজ।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সৌন্দর্য্যরস-পিপাসাপরিতৃপ্তির জন্যই লেখনী ধারণ করেন নাই, কিন্তু প্রতিভাশ্রিত সকল দেশ ও জাতির কল্যাণকামনায় তাঁকে সকল দিকেই আকৃষ্ট করেছিল। সাহিত্য সাধনায় বঙ্কিম সত্য ও সুন্দরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে সাধকের অভীষ্ট প্রতিমা মধুর ফলের মত প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সেই দরদের সৃষ্টি তাই এত মনোজ্ঞ।

এখানে একটা অন্য কথা বলি। সেটা 'নব-জীবন' পত্রিকার জন্ম-সময়। আমার সাহিত্যিক বন্ধু বিপিন বন্দ্যো ও আমি উক্ত পত্রিকার গ্রাহক হইবার ইচ্ছায় অক্ষয় সরকার মহাশয়ের নিকট যাই। বিপিনবাবু তখন সরকার মহাশয়ের 'সাধারণী' পত্রিকার জনৈক লেখক। পূর্ব্ব পরিচয় কাহারো ছিল না, সেই প্রথম সাক্ষাৎ। সরকার মহাশয় তখন হেমচন্দ্রের 'মদনপূজা' বলে' কবিতাটির প্রুফ্ দেখছিলেন। আমি তাঁর বিস্তৃত ললাট দেখছিলাম। এই সময়ে দুইজন ভদ্রলোক আপিসের পোষাকে এসে ঢুকলেন। চেয়ে চমকে গেলুম, বঙ্কিমবাবু যে! অপর ভদ্রলোকটিকে চিনি না।

"এই লও" বলে' বঙ্কিমবাবু টেবিলের উপর একতাড়া কাগজ ফেলে দিলেন।

আমি তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধূলা নিতেই—"কে? ওঃ, কেমন আছ? লেখায় পেয়েছে বুঝি!" বলে' হাসলেন। বললাম—"না, "নবজীবন" পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্যে, টাকা জমা দিতে এসেছি।"

—"তোমার সে কাগজ?"...

"সংবাদ-দর্পণ?—বন্ধ ক'রে দিয়েছি।"

—"বেশ ক'রেছ, ভাল' ক'রেছ। চল্লিশ বছর বয়সের পর "সংসার-দর্পণ" লেখার অধিকার জন্মায়?"

বল্‌লাম—"আমার এই বন্ধু বিপিনবাবু, ভাল প্রবন্ধ-লেখক, "সাধারণী পত্রিকায় লেখেন।"

—"বেশ, সরকার যখন পছন্দ করেছেন, তখন ভালই হবে।"

সরকার মশায় বল্‌লেন,—"হাঁ, ছোক্‌রা লেখে ভাল..."

—"বটে, তা হ'লে ভূদেববাবুর কাছে উপদেশ নিলে যে ভাল হয়, পাঠিয়ে দিও।"

বললাম, "সম্প্রতি ওঁর উপন্যাস লেখবার ঝোঁক ধরেছে।"

আর কথা কইলেন না—একবার মাত্র সেই তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী দৃষ্টির আভাস হেনে অন্য কক্ষে চলে গেলেন। আমি লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেলুম।

বেশীক্ষণ ছিলেন না,—মিনিট পনের হবে। বেরিয়ে যাবার সময়ে হাসিমুখে চেয়ে বল্‌লেন—"বিবাহ নিশ্চয়ই করেছ, উপন্যাস লেখবার ইচ্ছা হয় তো—বিবাহের ১০।১৫ বছর পরে", বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

সরকার মহাশয় তাঁদের সিঁড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমাকে বিশেষ ভালবাসেন দেখছি! ওঁকে ছোকরাদের সঙ্গে ওরূপভাবে এত কথা কইতে কখনো তো দেখিনি!" আমরাও কথা কইতে সাহস পাই না—"

বল্‌লাম—"কি জানি কি শুভক্ষণে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল! সেই পর্য্যন্ত ওঁর স্নেহ, ওঁর ভালোবাসা আমার যেন সহজলব্ধ সৌভাগ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।"

—"তাই তো দেখলুম! কিন্তু উপন্যাসের কথাটা তোলা ভাল হয়নি। উনি দেশকে দেবার কোনো জিনিসকেই সামান্য বলে' বা বিলাসের বস্তু বলে' ভাবেন না—বিশেষ উপন্যাসকে।"

আমার বন্ধুর উপন্যাস লেখবার নেশা সেইখানেই ছুটে গিয়েছিল।

এ থেকে বেশ বোঝা যায়, দেশকে ও জাতিকে যা কিছু দিতে হবে, তা কল্যাণকর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই ঘটনাটির উল্লেখ করলাম।

এসিয়ার প্রাচীন সভ্য, রক্ষণশীল, আভিজাত্যপ্রেমী, আর একটি স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা-তৎপর জাতির মর্ম্মকথা শুনুন। জাতীয়তা-রক্ষার জন্য ও আত্মধারা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তাঁদের মনোভাবের পরিচয় পাবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। সেটা ১৯০৪ খৃঃ আমি তখন কার্য্যোপলক্ষে চীনে। বক্সার হাঙ্গামা তখন মিটেছে, জগতের যুযুধান সভ্য জাতিদের অনেক টাকা দিয়ে মেটাতে ও তুষ্ট করতে হয়েছে। এই জবরদস্তির অত্যাচার চীনেদের প্রাণে বিশেষ বেদনা দেয়। সে অত্যাচার ও অপমানে তারা তখন পীড়িত ও জর্জ্জরিত।

সেই সময়ে আমার একজন সহকারীর আবশ্যক হওয়ায়, সাঙ্ঘাই কলেজে লিখে একজনকে আনাতে হয়। যুবকটির বয়স তখন ২২।২৩। কি করতে হবে, তাকে ইঙ্গিতে একবার মাত্র বলে দিলেই হ'ত। যুবক কিন্তু সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকতো। দু'ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় শেষ করে দিয়ে, নিজের অন্য কাজে সময় কাটাতো। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—"মিষ্টার যুই, তুমি কি অত লেখ, কি ভাব?" সে ম্লান হাসি হেসে বললে—"সিংহাসন মাঞ্চু বংশের অধিকারে থাকায়, আমাদের নানা প্রকারে অপমানিত হতে' হচ্ছে—এর মূলচ্ছেদ যতদিন না হয়, ততদিন দুর্গতি ভোগ করতে হবে। এর ভিতরকার কথা আপনাকে বোঝাতে পারব না ব্যানার্জ্জি। মাটির বিভিন্নতাই মানুষের প্রকৃতির তারতম্য ঘটায়। চীনের মাটি আর মাঞ্চুরিয়ার মাটি এক নয়। মাঞ্চুর লোকের ভিন্ন প্রকৃতি, আমাদের দুর্গতি বাড়াচ্ছে। নিজের সত্তা হারালেই জাতির স্বাতন্ত্র্য যায়, যা কতদিনে, কত শিক্ষা দীক্ষায় দেশের ধাতুগত হয়েছিল, তাকে শক্তি যুগিয়েছিল, বড় করেছিল, তা খোয়ানোর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর নেই। আমাদের সেই দুর্দিন এসেছে।"

আজ সেই কথা মনে পড়ছে। বঙ্কিমচন্দ্রও বোধ করি ওইরূপ আশঙ্কায় পড়ে থাকবেন।*

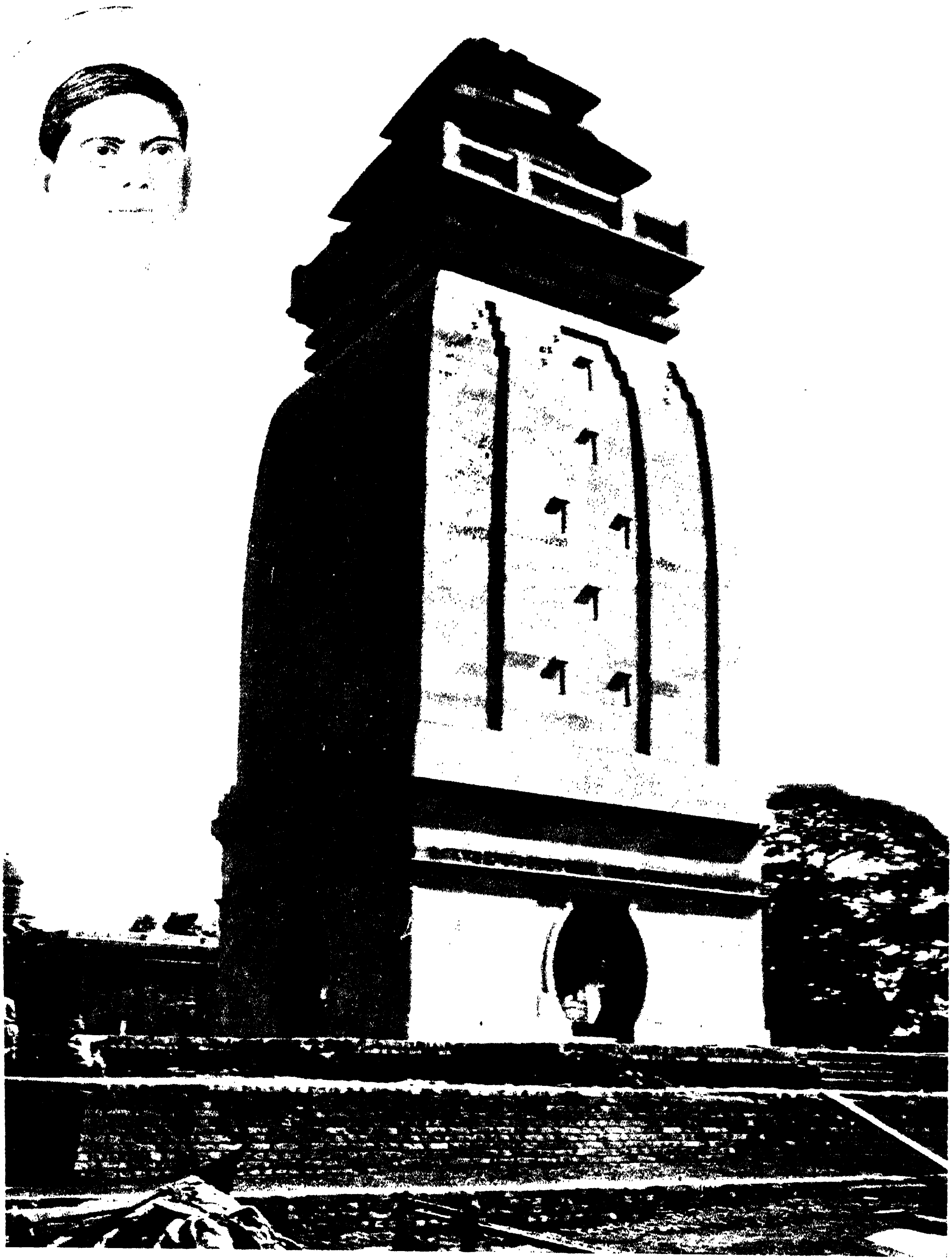
* চন্দননগর বঙ্কিম-শতবার্ষিকী-উৎসব উপলক্ষে তৃতীয় দিনের সভাপতির অভিভাষণ।



স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়



ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র



"স্বদেশের যে ধূলিকে শেষ স্পর্শ দিয়ে গেলে তুমি
বক্ষের অঞ্চল পাতে সেথায় তোমার জন্মভূমি।
দেশের বন্দনা বাজে শব্দহীন পাষাণের গীতে
এসো দেহহীন স্মৃতি মৃত্যুহীন প্রেমের বেদীতে।"

দেশবন্ধু-স্মৃতি-সৌধ : ১৬ই জুন তারিখে দেশবন্ধুর স্মৃতি-পূজা অনুষ্ঠিত হয়

নূতন পথে

শ্রীমতিলাল রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৌবাজারের একটা দ্বিতল বাটীর এক কক্ষে এক রমণী শুইয়াছিল; কুঞ্চিত ললাটে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল কত কথা। বিছানার পাশে একটী ১১।১২ বৎসরের কিশোর বসিয়া নানা প্রশ্ন করিতেছিল, কিন্তু তরুণী কোন উত্তর দেয় না দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ইচ্ছা ঘর হইতে চলিয়া যায়; রমণী তখন তাহাকে ডাকিয়া বলিল "ন্টু! যাস্ কোথা?"

ছেলেটি বলিল "স্কুলের বেলা হয়ে যায়, আর তোমার মুখেও কথা নাই, শুধু শুধু বসে থাকি কি করে?"

"কত বাজলো বল দেখি?"

"প্রায় ৯॥০ টা। আচ্ছা দিদি, পরেশবাবু তো কোন কাজকর্ম্ম করেন না, তোমার মাহিনাতেই সব চলে বুঝি? বি, এ, পাশ করেছ?"

রমণী কোন উত্তর দিল না। কেবল ন্টুর দিকে চাহিয়া বলিল, "তোর সেই গানটা আমার খুব ভাল লাগে, গা তো!"

"কোন্‌টা?"

"সেই যে, 'চাহিলাম যারে দিয়ে প্রাণ ডালি'।"

'গানটা তোমার খুব পছন্দ হয়েছে দেখছি' ন্টু গাহিল—

চাহিলাম যারে দিয়ে প্রাণ-ডালি
ফিরায়ে দিল সে কাঁদায়ে,
অভিমানে যত দূরে যাই চলি',
মন নেয় তত কুড়ায়ে।

হৃদয় খুঁজিয়া দেখি,
কিছু নাই সব ফাঁকি,
টুটিল না ঘুম-ঘোর
গেছে মন হারায়ে।
মরুতে ফুটিল ফুল,
আমারে করে আকুল,
নিরালা কুটীরে একা
প্রাণ যাবে জুড়ায়ে।

ন্টু খুব উৎসাহে গানটা পাল্‌টা ধরিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে সে দেখিল সম্মুখেই পরেশবাবু। ন্টু কাচুমাচু মুখে ঘর হইতে সরিয়া পড়িল। আর পরেশবাবু অতিশয় বিরক্তিসহকারে বলিয়া উঠিল "আড্ডা আর আড্ডা, এই ছোঁড়াটাই তোমায় মাটি করবে দেখছি! কলকাতার ফিচেল ছেলে, আড্ডা পেলে আর নড়ে না।"

সেই রমণী বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল। বক্র কটাক্ষে বলিল—"গরীব হলেও, ন্টু ভদ্রলোকের ছেলে। ওকে যা' তা' বলা আমাকেই অপমান করা।"

কথা শুনিয়া আগন্তুক ক্রুদ্ধ হইয়া চাপা গলায় বলিল "দেখ শান্তি! তোমায় নিয়ে ঘর করা মাটী-পাথরের মানুষ না হলে সম্ভব নয়। একটী কথা বলার যো নাই, আমায় অতিষ্ঠ করে' তুলেছ তুমি।"

শান্তিকে লইয়া চিন্তাহরণ কলিকাতায় আসিয়াছিল যে আশা বুকে লইয়া, তাহার আচরণে তাহা ক্রমেই দুরাশায় পরিণত হয়। তাহা ছাড়া চিন্তাহরণ ভাবিয়াছিল—কলিকাতায় সে একটা বড় মাহিনার চাকুরী যোগাড় করিয়া লইতে পারিবে; কিন্তু অনেক উমেদারী করিয়াও তাহা যখন সম্ভব হইল না, তখন সে নিরাশ হইয়া পড়িল। শান্তিও অলঙ্কারপত্র বিশেষ কিছু লইয়া আসে নাই; যাহা সামান্য কিছু ছিল, দুই এক মাসেই তাহা শেষ হইয়া গেল। কত বার তাহার মনে হইয়াছে, সে ফিরিয়া যায় তাহার পিতার কাছে; কিন্তু এ মুখ লইয়া লোকসমাজে দাঁড়াইবার মত ভরসা তাহার নাই। যোগেশের নিকট প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে

তাহার সবখানি বিদ্রোহী হইয়া নিজেকে পুড়াইয়া ছাই করিতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু কে যেন তাহাকে আত্মঘাতী হইতে দেয় না। যোগেশের শত উপেক্ষায় তাহার হৃদয়ে তাহারই বৈরাগ্যদীপ্ত মূর্ত্তিটী বিকশিত হয় অপার্থিব ঘনিমায়। সে যেন অশরীরী হইয়া শান্তিকে আগুলিয়া রাখে, তাহার কিছু করিবার উপায় নাই। মনে হয়—নাই পাইলাম তাঁহাকে ইহজীবনে; এই জীবনের পর আরও তো জীবন আছে, আজ যদি তাঁহাকে ছাড়ি—অন্যে আত্মদান করি, তাঁহাকে পাওয়ার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। আর পরকাল যদি নাই থাকে, যদি তার ঐকান্তিকতা থাকে—এমন দিন নিশ্চয় আসিবে, যেদিন মৃত্যুকালেও যোগেশকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে হইবে। সেইটুকুই যে তাহার পরম তৃপ্তি। বাঞ্ছিতকে পাওয়ার এই আশার স্বপ্নে চিন্তাহরণকে সে দূরে দূরে রাখিয়াই চলে। বাহিরে অপবাদের প্রলেপ অন্তরের অমল সত্যকে আবরণ দিতে পারিবে না, এই বিশ্বাস তাহার আছে। সে যখনই চিন্তাহরণের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহে, তাহার মনে হয়, সেই দৃষ্টি, যাহা যোগেশের প্রাপ্য, তাহা যেন এখানে উচ্ছিষ্ট হইয়া না যায়। যদি কোন দিন যোগেশের দিকে অপলকে চাহিয়া থাকার সুযোগ আসে, সেদিন অতীতের লাঞ্ছিত দৃষ্টি সভয়ে নত করিতে হইবে না। চিন্তাহরণ কত দিন চাহিয়াছে, শান্তির কর-কমল নিজের করপুটে ধরিয়া সোহাগ দেখাইতে; শান্তি ছল করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুকে এই বেদনাই বিদ্যুৎস্পর্শ দিয়া তাহাকে দগ্ধ করে—তাহার মনে হয় তেমন সুদিন যদি ঘটে অদৃষ্টে, এই অস্পর্শ অমলিন হাত দুখানি দিয়া তার করকমল নিঃসঙ্কোচেই সে ধরিতে পারিবে। পরপীড়নে মলিন হস্ত দেবতাকে কি স্পর্শ করিতে পারে? চিন্তাহরণের উন্মুখ ওষ্ঠপুটের সম্মুখে সন্ত্রাসিত শান্তি মুখখানি কত বার ফিরাইয়া লইয়াছে, কেবলই ঐ একেরই চিন্তায়। যদি কোন দিন সৌভাগ্য হয় দেবতার অধর-চুম্বনের, সেদিন এই উচ্ছিষ্ট অধরপুট আগাইয়া দিতে নিজের হৃদয়ই যে বাধা দিবে। সে চাহে অনাঘ্রাত ফুলের ন্যায় দেবতার পূজা; যদি এ জন্মে সম্ভব না হয়, যুগ যুগ প্রতীক্ষায় সে ধৈর্য্য হারাইবে না। প্রণয়ের অপ্রাকৃত আকর্ষণে ঊর্দ্ধ-ফণা ভুজঙ্গের সম্মুখে সাপুড়িয়ার ন্যায় সে চিন্তাহরণের সঙ্গে এমনই সংযমে দিনের পর দিন কাটাইতেছিল।

চিন্তাহরণ যখন দিনগুজরাণের পথ খুঁজিয়া পাইল না, শান্তি বাহির হইল চাকুরীর সন্ধানে। একটা মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে সে হেড মিষ্ট্রেসের চাকুরী পাইল ষাট টাকা বেতনে। স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ সস্তায় ভাল লোক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে মনে জিৎ হইয়াছে ভাবিয়া হাসিল। শান্তি উপস্থিত মাথা রক্ষা হইল বলিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল।

ঘরখানির ভাড়া দিতে হয় ২০৲। বাকি ৪০৲ টাকায় দুইজনের দিন বেশ চলিয়া যায়। শান্তি ভাবে—পূর্ব্বজন্ম আছে, নতুবা রাজার মেয়ে তাহার এই দুর্গতি কেন? যোগেশ ছাড়া আর যে সে কাহাকেও চাহে না, হৃদয়টা এমন হইল, তাহা কি পূর্ব্বজন্মের ফল নহে? সে গ্রীবাদেশে বামহস্ত রাখিয়া ভূনত নয়নে ভাবে—যোগেশ কেন তাহার প্রতি সদয় হইল না। প্রথম যৌবনের লঘু তারল্য, সে যে আত্মরক্ষারই দায়। যোগেশ কেন তাহা বুঝিল না। অদৃষ্ট! কিন্তু তারও তো কারণ আছে, পূর্ব্বজন্ম ছাড়া আর কি বলিব!

চিন্তাহরণের দিন ক্রমেই দুঃখময় হইয়া উঠিতেছিল। শান্তিকে সে এমন কায়দায় পাইয়াও তাহার সহজ বৃত্তিটা চরিতার্থ হইবে না, এমন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। দিনের পর দিন যায়, দেখে এ নারী অসাধারণ প্রকৃতির। সে তাহাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করিবে, কিন্তু ঘৃণাক্ষরেও তাহার বিনিময় দিবে না। শান্তির আশা সে এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিল। চিন্তাহরণ আধুনিক মার্জ্জিতবুদ্ধি তরুণ, সে দেখিল জোর জবরদস্তি করিয়া প্রণয় হয় না, প্রণয়ের ফুল ফুটে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে। সে ফুলের আঘ্রাণ সে এখানে পাইবে না। সে আজ মনে মনে ঠিক করিয়াই আসিয়াছিল, কোন একটা অছিলা ধরিয়া বিদায় লইবে। তাই সে শান্তির কথার উত্তরে পুনরায় বলিল, "তোমার অপমান কি হল ব'ল তো!"

শান্তি বলিল, "আমার অপমান বৈ কি! ছেলেটা মনে করবে এখানে আমার কর্তৃত্ব, আমার অধিকার একবিন্দু নেই; তুমিই প্রভু, তুমিই গৃহস্বামী।"

চিন্তাহরণ ব্যঙ্গ-স্বরে বলিল "তুমি কি ওকে জানিয়ে দাওনি আমি এ বাড়ীর ভৃত্য, আমি পোষ্য, তুমি চাকরী করে' আন, আমি বসে' বসে' খাই। তুমি হুকুম কর—আমি আজ্ঞা পালন করি।"

শান্তি এইবার স্থির অবিচল কণ্ঠে বলিল, "দেখ, আর আমাদের এক সঙ্গে থাকা পোষাবে না। এই অস্বাভাবিক জীবনের দায়ে আমারও শরীর ভাঙ্গছে। এমন ব্যবস্থা কর, দু'জনেই স্বতন্ত্র থাকি। অপ্রিয় কথা নিয়ে দু'জনেই বিষাক্ত না হই।"

চিন্তাহরণ ইহাই চাহিতেছিল, কিন্তু তার মনটা শান্তিকে আর একটু আঘাত না দিয়া যেন ছাড়িতে চাহে না। তাই সে শান্তির নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিল "আমি অক্ষম, আমি বেকার, আমি অভিশপ্ত। জীবন আমার ব্যর্থ করে' দেয়েছ।"

শান্তি হুতাশনের ন্যায় জলিয়া উঠিল। বলিল "তার জন্য আমি একাই দায়ী?"

"না। আমি নিজের হাতেই বিষ খেয়েছি। যোগাদা তোমায় তাড়িয়ে দিলে, অজ্ঞাত পল্লী, অন্ধকার রাত্রি, একাকিনী তুমি—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে' তোমার সহায় হলুম। দায় আমার নৈ কি!"

শান্তি বিরক্ত হইয়া চিন্তাহরণের দিকে চাহিল। চিন্তাহরণ বলিল "নিরাশ্রয়া তুমি। পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয় পরিত্যাগ করেছিলাম। দেশ ও জাতির সেবাধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করেছিলাম। মাথা নীচু করে' ফিরে এলাম পরিত্যক্ত সংসারে। দায় আমারই!"

"আরও কিছু বলার আছে?"

"রাজপুত্রি! তোমায় লুকিয়ে রাখার ঠাঁই পিতামাতার আশ্রয়ে হল না, স্বেচ্ছায় সেদিন চেয়েছিলে আমার আশ্রয়; তাই আজ অজ্ঞাত অখ্যাত জীবন নিয়ে তোমারই পদপ্রান্তে, তোমারই অনুগ্রহে জীবনধারণ করি। দায় আমার বৈকি!"

শান্তির চক্ষে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিল। চিন্তাহরণ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "কেঁদো না শান্তি! কেঁদো না, আমি আর যা হই—মানুষ; আজ এ দায় প্রতিদানের প্রতীক্ষায় নয়। আমি এ দায় থেকে মুক্তিও চাই না। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার।"

শান্তি কি বলিতে যাইতেছিল, ঘড়ির বড় কাঁটাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সময় ১০॥টা। শান্তি বলিল "বেলা হয়ে গেল, এখন আসি। জীবনের সৌরভ আমার ফুরিয়ে গেছে। সত্যই এখানে থাকা দু'জনেরই বিড়ম্বনা।"

শান্তির চক্ষে জলধারা। চিন্তাহরণ দুই পা আগাইয়া, বাম হস্তে শান্তির গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিবার জন্য বাড়াইয়া দিল। শান্তি দুই পা পশ্চাতে হটিয়া স্যাণ্ডেলে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে বলিল "এই নাটকের যবনিকা-পাতের আর বেশী দেরী নেই। ওবেলা কথা হবে।" শান্তি দ্রুত প্রস্থান করিল।

চিন্তাহরণের জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সিনেমা দেখিবার পয়সা শান্তির নিকট হইতে চাহিয়া লইতে হয়। নাপিতের খরচ, সিগারেটের পয়সাও শান্তির নিকট হইতে হাত পাতিয়া চাহিতে হয়। দুর্ব্বহ জীবন। ভিক্ষুকের ন্যায় এই অবস্থায় চিন্তাহরণ বুঝিতেছিল—এমন করিয়া দিন চলিবে না। এই দুঃসহ জীবন-যন্ত্রণারও লাঘব হইত শান্তির প্রেমের অর্ঘ্যে। কিন্তু ক্রমেই সে বুঝিয়াছিল, সে আশা শূন্য মাত্র। জীবনটা এক প্রকার আরামের বটে; কিন্তু হৃদয়ের ক্ষুধা লইয়া বাঁচা যায় না। সে বাহিরে বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়াইত।

সে একদিন—টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। ট্রাম ধরিবার জন্য সে এক গাড়ী-বারান্দায় আশ্রয় লইল। ছুটিতে ছুটিতে একজন নার্স তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে জিজ্ঞাসা করিল "এস্প্ল্যানেডের ট্রাম কি বেরিয়ে গেল?"

চিন্তাহরণ বলিল "না।" তারপর দূরে চাহিয়া বলিল, "ঐ আস্‌ছে।" হঠাৎ নার্সের হাত হইতে এটাচীটা পড়িয়া গেল, চিন্তাহরণ সাগ্রহে উহা তুলিয়া নার্সের হাতে দিল। সে বলিল "থ্যাঙ্ক্‌স্।" তারপর দু'জনেই গাড়ীতে বসিল। চিন্তাহরণের উদাসীন অনিয়ন্ত্রিত মন

নার্সের সহিত পরিচয় করিয়া লইল। দুই-চারি কথায় নার্স বুঝিল—লোকটী বেশ মিষ্ট প্রকৃতির। শীকার পাইলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের চক্ষু যেমন প্রদীপের মত জ্বলিতে থাকে, চিন্তাহরণের মুখের দিকে চাহিয়া সেইরূপ প্রদীপ্ত চক্ষে সে অনেক কথা বলিল। ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া সে বলিল, "গুড্ বাই। আপনার সঙ্গে আলাপ করে' বড় সুখী হলুম। আমার কামরার ঠিকানা '—' নং ব্লক; কাল বৈকাল থেকে আমার ডিউটি নেই, আপনি এলে খুব খুশী হব।"

ইহার পর হইতেই চিন্তাহরণের সহিত নার্সের আলাপ বেশ ঘনাইয়া উঠিল। দু'জনেরই জীবন নিঃসঙ্গ। এই অবস্থায় উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা খুব স্বাভাবিক। নার্স বলিল "আমার পরিচয় পেয়েছেন। আপনার পরিচয় পেলে একটা কথা বলি।"

চিন্তাহরণ বলিল "খুব উৎসাহী তুমি। আমিও তোমার মত একটা আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলাম, অনেকটা সময়ই নষ্ট হয়েছে বল্‌ব। বাপ আমার ধনী, কিন্তু তাঁর গলগ্রহ হতে চাই না। একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টায় আছি।"

নার্সের নাম কমলা। সে বাল্যকাল হইতেই এক আশ্রমে মানুষ হইয়াছিল। বয়স বাড়িলে, সে তার ভ্রাতার নির্দ্দেশে নার্সের উপযোগী শিক্ষালাভ করে। এক্ষণে সে একটা বড় হাসপাতালে ৭৫৲ মাহিনায় কাজ পাইয়াছে। ভাই তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করে, সে তাহাতে রাজী হয় না। তাহার কারণ নার্স-জীবনে যে ভাবের প্রকৃতি তাহার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সে গৃহ-বন্ধন ভাল মনে করে নাই। অন্য কারণ, সে কোন এক ক্ষেত্রে প্রণয়-ভঙ্গ হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—বিবাহ আর করিবে না। ইহা লইয়া ভাইয়ের সহিত তাহার আর মুখ দেখাদেখি ছিল না। এইরূপ ক্ষুণ্ণতা লইয়া কমলার দিন অতি দুঃখেই গড়াইয়া চলিতেছিল। ইহার পর চিন্তাহরণের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার। দুইজনেরই অন্তর শূন্য ছিল। অবকাশের সদ্ব্যবহার তো বটেই, কমলা এই সঙ্গে চিন্তাহরণকে লইয়া একটা সোণার স্বপ্নও মনে মনে গড়িয়া লইল। চিন্তাহরণ ছিল দোটানায়। কিন্তু শান্তির দিক্‌টা যতই ধোঁয়াটে অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, কমলাকে লইয়া একটা ঘর গড়ার স্বপ্ন তত তাহাকে পাইয়া বসিতেছিল। এইরূপ অবস্থায় যেদিন শান্তি চিন্তাহরণের সহিত মনোমালিন্য করিয়া স্কুলে চলিয়া গেল, সেই দিনই মধ্যাহ্নে কমলা চিন্তাহরণের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চিন্তাহরণ সচকিত হইয়া বলিল "তুমি, তুমি, হঠাৎ এখানে!" কমলা বলিল "কোনদিন আসি নি, পাছে তোমার ভগ্নী কিছু মনে করেন এই ভয়ে।"

চিন্তাহরণ শান্তিকে নিজের ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

চিন্তাহরণের কথার উত্তরে কমলা বলিল, "আর সাস্পেন্সনে থাকা নয়, পরেশবাবু।"

কলিকাতায় চিন্তাহরণ পরেশ নামেই পরিচিত হইয়াছিল। কমলা তাহার পর বলিল, "ঢাকায় বদলী হয়ে যাচ্ছি। তুমি রাজী আছ তো? দুই একদিন ছুটী নিয়ে কাজটা সেরে যাই।"

চিন্তাহরণ এক প্রকার স্থিরই করিয়াছিল—শান্তির আশ্রয় হইতে সে মুক্তি লইবে। শান্তি কি করিবে, সে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন তাহার নাই। শান্তির পথ শান্তি নিজেই দেখিয়া লইতে পারিবে। চিন্তাহরণ কমলার হাত ধরিল, বিছানায় বসাইয়া বলিল, "আমি রাজী কমলা, আমি রাজী।"

তার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস লইয়া নিজের মনে মনেই বলিল "ভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটে চলা আর সহ্য হয় না।" কমলার মুখের দিকে চাহিয়া সে পুনরায় বলিল "কিন্তু কমলা, আমি আজও সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, আমি আজও বেকার।"

কমলা চিন্তাহরণের হাতখানা টিপিয়া বলিল "চিরদিন এক ভাবে কারও যায় না। আমার চাকরী আছে, দিন চলে' যাবে। তুমিও অক্ষম নয়, চাকরী এক দিন হবেই; তখন সুখের দিন আরও সুখের হবে।" আবেগ-ভরে কমলা চিন্তাহরণকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া বলিল "আশ্রম ছেড়ে অবধি ভগবানে বিশ্বাস হারিয়েছিলাম, আজ মনে হয় তিনি আছেন; তা' না হলে"—বিস্ফারিত নেত্রে কমলা চিন্তাহরণের দিকে চাহিল। চিন্তাহরণ বলিল "তা' না হলে কি?"

"এমন হবে কেন? কত সাধাসাধি। 'না' ছাড়া কোথাও 'হঁ' বলি নি।" চিন্তাহরণের গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া কমলা তার বুকের উপর মাথা নামাইয়া সরমজড়িত অস্ফুট স্বরে বলিল "সেধে প্রাণ তুলে দিই, দেখো কিন্তু—।'

চিন্তাহরণ কমলাকে বাহুবেষ্টনে বুকে লইয়া বলিল, "মরুময় এ হৃদয়ে প্রাবৃটের বর্ষণ, কমলা এ প্রাণ তোমারই।" চিন্তাহরণ শিহরিয়া কমলাকে ছাড়িয়া দিল। কমলা ফিরিয়া দেখিল—গৃহমধ্যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী। পরেশবাবুর ভগ্নী। সে সলজ্জে অথচ যেন রণজয়ে উল্লসিত কণ্ঠে বলিল "গুড্-বাই।" চকিতে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

শান্তি বলিল "কে ও চিন্তাহরণবাবু?"

"ও একজন নার্স, নাম কমলা।"

"বেশ। দেখে সুখী হলুম। কিন্তু আমিও আজ শেষ বিদায় নিতে এসেছি। এই জন্য অসময়েই এসে পড়েছি।"

চিন্তাহরণের মুখ শুকাইয়া গেল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল "কি যে বল শান্তি!"

শান্তি বিছানায় বসিয়া পড়িল। জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছিল। ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল "আজ বিনা মাহিনায় ছুটী নিয়ে এলুম। খরচের টাকা হাতে নেই। কি হবে বল তো?"

"ভিক্ষা করতে বল, রাজী আছি।"

"অত দুঃখ তোমার হবে না। নিজের চোখেই দেখেছি। —আমায় একটা গাড়ী ডেকে দিতে পার?

"কোথায় যাবে তুমি?"

"যোগাদার আশ্রমে।"

চিন্তাহরণের ওষ্ঠ দুটী ক্রোধে স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

শান্তি বলিল "আমি তাঁর পূত স্মৃতি মুছে ফেল্‌তে পারি না। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায়, অন্তরের অগ্নিশিখায় ছাই হয়ে গেছি, তাঁতে সংলিপ্ত হয়ে যেতে চাই। একখানা গাড়ী ডেকে দাও।"

ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে চিন্তাহরণ বলিল "আমি তোমার ভৃত্য নয়।"

শান্তি উৎক্ষিপ্ত হইয়া বলিল "তবে বিদায় হও।"

"আপত্তি নাই। কিন্তু তবুও আমার একটা কর্ত্তব্য আছে।"

"কিছু নাই।"

শান্তি উচ্চৈঃস্বরে মুটুকে ডাকিল। মুটু অন্য এক ভাড়াটিয়ার পুত্র। সে শান্তির বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মুটু আসিয়া শান্তির সম্মুখে দাঁড়াইল। শান্তি ধুঁকিতে ধুঁকিতে বলিল "একখানি ট্যাক্সি ডেকে আন, শেয়ালদা ষ্টেশনে যাব।" মুটু প্রস্থান করিল।

অকস্মাৎ এই বৈপ্লবিক কাণ্ডে চিন্তাহরণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িল, সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "রাগের মাথায় এমন একটা কিছু করছ, যার পরিণাম আরও দুঃখকর।"

"তুমি অন্ধ। দুঃখের সাগর আজ পার হয়ে এসেছি; তাই তরী আমার তীরে ভিড়ে, জীবন শেষ হয়। শেষ নিঃশ্বাস তাঁরই চরণ স্পর্শ করবে।"

চিন্তাহরণ বিরক্ত হইয়া বলিল "অকৃতজ্ঞ!"

শান্তি হাসিল, বলিল "প্রায়শ্চিত্তের আর সময় নেই।"

মুটু আসিয়া বলিল, "গাড়ী এসেছে।"

শান্তি দু'খানা নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল "বাবাকে বলিস্, ভাল বই যেন তোকে কিনে দেয়। যোগাদার জীবন-কথা একখানা কিনিস, যতদিন বাঁচবি সঙ্গে রাখিস্।"

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল, সত্যই সে চলিয়া যায়। ঘরের সকল দ্রব্যই পড়িয়া রহে। শান্তি কিছুই লয় না। চিন্তাহরণ বিস্মিত হইয়া বলিল, "সুটকেসটা সঙ্গে নাও আর কিছু টাকা।"

শান্তি বলিল "লজ্জানিবারণের বস্ত্র আর দেবলগাঁয়ে যাওয়ার ভাড়া, শান্তির আর কিছুর প্রয়োজন নাই।"

ভাগ্যহীন চিন্তাহরণ। শান্তি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কমলা প্রেতিনী, প্রেমশতদল শান্তি। কালসাগরের উত্তাল তরঙ্গে আজ যেন তাহার সব ভাসিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

খেলা-ধুলার বাঙ্‌লা পরিভাষা (হকি, টেনিস্)

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, বার্-এট্-ল

খেলা-ধূলার বাঙলা পরিভাষা অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহার জন্য 'প্রবর্ত্তক' এবং অন্যান্য উৎসাহীরা যথেষ্ট তাগিদ আমাকে দিলেও, নানা কারণে তাঁহাদের অনুরোধ এতদিন রক্ষা করিতে আমি পারি নাই। আমার এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি দয়া করিয়া যেন তাঁহারা মার্জ্জনা করেন। আমার পরম সৌভাগ্য, মৎসঙ্কলিত ও প্রকাশিত পরিভাষা অতি অল্পকালের মধ্যে সুধীজনের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছে।

অনেকের ধারণা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই পরিভাষা লিখিতে আমি ব্রতী হই। এ ধারণার কোনও ভিত্তি নাই। ফুটবল-খেলার সংবাদ বাঙলায় সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পত্রিকা 'রঙ্গালয়ে'। ইহা বহুবর্ষ পূর্ব্বের কথা। তখনও আমি ছাত্রাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হই নাই। খেলোয়াড় হিসাবে কলিকাতার অনেকেই তখন আমাকে চিনিতেন। সম্ভবতঃ সেই চেনার ফলেই আমার সগ্রমাগ্রজ সর্ব্বজনপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর মারফতে 'রঙ্গালয়ে' খেলার কথা লিখিতে আমি আহূত হই। ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতে আমার কনিষ্ঠ খুল্লতাত স্বর্গত রায় বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর দৈনিক 'হিন্দু পেট্রিয়টের' স্পোর্টস্-এডিটর আমি ছিলাম এবং পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৈনিক 'বেঙ্গলী'র 'স্পেশাল কনট্রিবিউটরের' সমাদরে সমাদৃত হইয়াছিলাম। ইহা ব্যতীত ইংলিশম্যান্, ষ্টেটস্‌ম্যান্ ও ইণ্ডিয়ান্ ডেলি নিউজেও খেলা-ধূলা সম্বন্ধে আমার 'লেখা' আগ্রহের সহিত গৃহীত তখন হইতেছিল।

এই সকল কারণে ইংরাজীতে লেখা অল্পবিস্তর সড়গড় তখন থাকিলেও, বাঙলায় সে সকল লেখা তত সহজ আমার বোধ হয় নাই, কারণ ইংরাজী সংবাদ সম্পূর্ণভাবে অনুবাদ করিবার মত ভাষা বাঙলায় তখন ছিল না অথচ আমার ইচ্ছা সব কথা বাঙলাতেই আমি লিখি। মনের কথা মনেই থাকিয়া গেল—দুধের সাধ ঘোলেই মিটাইতে হইল, ইংরাজী কথা বাঙলা হরফে লিখিয়া। তাহা হইলেও, খেলার কথার 'হেডিং' বাছিয়া দিলাম "খেলা-ধূলা"। এ নাম ব্যবহৃত হইল সেই সর্ব্বপ্রথম।

'রঙ্গালয়ে' খেলা-ধূলার কথা নিয়মিতভাবে লিখিতে আমি পারি নাই, মন না বসাতে—ভাষার অপ্রতুলতা হেতু। 'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহে' 'বাঙালীর ফুট্‌বল্ খেলা' লিখিবার কালে এবং 'হিতবাদী'তে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রকাশিত করাইবার সময়ে 'রঙ্গালয়ের' সম্পর্কে যে অভাব বোধ করিয়াছিলাম, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন তখনও ঘটে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা পরিভাষা কমিটী তখন বর্ত্তমান। খেলা-ধূলার সার্ব্বজনীনতা হেতু সেই পরিভাষা কমিটী খেলা-ধূলার বাঙলা পরিভাষা লিখাইবার দিকেও দৃষ্টি দিবেন, আশা করিয়াছিলাম। সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াও আশা যখন পূর্ণ হইল না, তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গুরুভার আপনার স্কন্ধেই তুলিয়া লই।

খেলা-ধূলার এই বাঙলা পরিভাষা এ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, "প্রবর্ত্তকে"র কর্তৃপক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে যথাসময়ে তাহা পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই দপ্তর ঘাঁটিয়া কাহারও যদি ধারণা হইয়া থাকে, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে রচিত এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি কেহ ভুল কথা প্রচার করিয়া থাকেন, তাহার জন্য দায়ী প্রচারকই। লেখক এ পরিভাষা-রচনার ইতিহাস জানাইয়া খালাস।

ইহার সম্বন্ধে আরও একটু কথা আছে। মদীয় জ্যেষ্ঠতাত ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাঙলা পাটীগণিত ও বীজগণিত বঙ্গদেশের সর্ব্বজনসমাদৃত দুইখানি আদি গণিত-গ্রন্থ। কনিষ্ঠ খুল্লতাত ৺রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীও ইংলণ্ডের Constitutional History সর্ব্বপ্রথম বাঙলায় রূপান্তরিত করেন। সেই বংশের এক অকৃতী সন্তান খেলা-ধূলার সম্বন্ধে পরিভাষার অভাব বোধ করিয়া তাঁহাদের চরণ ধ্যান করিয়া, গুরুকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয়। এ পরিভাষা-রচনার পরে সুধীজনের ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত 'স্বর্গত' কর্ম্মবীরদিগের পুণ্যে। তাঁহাদেরই চরণ স্মরণ করিয়া পরিভাষার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

ফুট্‌বলের সুদীর্ঘ তালিকার অনেকাংশ হকির সম্পর্কেও ব্যবহৃত হইবে। যে যে অংশ এই দুইটী বিভিন্ন খেলার

উপযোগী, সেই সেই অংশ নিম্নলিখিত তালিকায় প্রদত্ত হইল না।

Striking Circle	তাড়ন বৃত্ত বা গোলক।
Starting Bully	আগ-বলি।
Penalty Bully	ফাঁক-বলি।
Penalty Corner	ফাঁক-কোণা।
Stick	ক্রীড়াদণ্ড।
Striker	দণ্ডচালক, তাড়নকারী • ঠোকনদার।
Scoop Strike	তক্ষণা, তোলামার।
Hooking	আঁকৃশী-টান।
Roller In	ঘুরণদার।
Roller	ঘুরণ।
Bounce	ঠেক্ ক্ষেপ।
Free Hit	খোস মার।
Seven Yard Line	সপ্তগজী।
Umpire	পরিচালক।
Linesman	নিশানদার।
Toss	মুদ্রা-ক্ষেপণ।
Perpendicular Post	খাড়া খুঁটি।
Shoving	ঠেলাঠেলি।
Tripping	ল্যাংবাজি।
Pad	জঙ্ঘা-ত্রাণ, পা-ঠুলি।
Glove	করত্রাণ, হাত-ঠুলি।
Uniform	এক-সাজ, সম-সাজ।
Vice-Captain	সহকারী নেতা।
Ground Secretary	ক্ষেত্র-সম্পাদক।

[এই তালিকার উল্লিখিত কয়েকটী কথা ফুটবলেও প্রযুজ্য]

টেনিস ঃ—

Server	পরিবেশক, চালক।
Service	পরিবেশন, চালা।
Receiver	গ্রহীতা, ধারক।
Fault	বেতাক্, ফাল্‌তু।
Let	ফিরেফিক্তি।
Return	প্রতি-মার।
Screw	ইস্ক্রুপ্-মার।
Out	কাটা-মার।
Volley	ব্যোম-তাড়া।
Back Play	পেছ্-খেল্।
Forward Play	আগ্-খেল্।
Out	বা'র।
Wrong Service	ভুল-চালা।
15 Love	পনের জিত।
Love 15	পনের হার।
15 All	পনের-পাল্লা।

[এইরূপ 30 Love, Love 30 ইত্যাদি। 30—15 = ৩০—১৫, 15—30 = ১৫—৩০, 30 All = ত্রিশ-পাল্লা ইত্যাদি]

Deuce	ডাঁশা।
Vantage In	বান জিত।
Vantage Out	বান-হার।
Set	দান।

উপরি উক্ত তালিকার কয়েকটী কথা, যথা 'ফিরেফিক্তি' 'ফাল্‌তু', 'বান-লাভ', 'বান-হার' — ব্যবহার করিবার কারণ বলিয়া দেওয়া ভাল।

ফিরেফিক্তি—চালক বল চালিল। চালা বল জালের উপরিভাগে ঠেকিয়া প্রতিপক্ষের সীমায় পড়িল। এই অবস্থার ডাক, 'Let' = Allow again = আবার চাল। ইহার বাংলা ডাক, তাই করা হইল ফিরেফিক্তি।

ফাল্‌তু—চালক বল চালিল। চালা বল প্রতিপক্ষের দিকে আঁকা নির্দ্ধারিত ঘরের মধ্যে না পড়িয়া পড়িল অন্যত্র। এ-ক্ষেত্রে ডাক্ ইংরাজীতে Fault. ডাক্ Fault - এর বাংলা হইল 'বেতাক'। 'বেতাক' হইলে চালকের প্রতিপক্ষের জয়াঙ্ক অর্শায়। চালা হইয়া যায় 'ফাল্‌তু'। Fault-এর স্থানে 'ফাল্‌তু' সুতরাং অর্থশূন্য নহে।

ডাঁশা—দুই পক্ষের জয়াঙ্ক ৪০ করিয়া হইলেই হয়, Deuce ইহার বাংলা করা হইল 'ডাঁশা'। পাকিতে পাকিতে অর্থাৎ জয় হয় হয়—খেলা 'ডাঁশিয়া'!

বান-জিত, বান-হার—ডাঁশিয়া যাওয়ার পরে চালকের জয়াঙ্ক-লাভ হইলে = বান-জিত, ধারকের জয়াঙ্ক-লাভ হইলে = বান-হার।

কথা কয়টী নূতন হইলেও, আশা করি, ক্রীড়াভিজ্ঞের ইহা বুঝিতে বা ব্যবহার করিতে কোনও অসুবিধা হইবে না।



স্পেনের নূতন পরিস্থিতি—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্পেনের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার নিমিত্ত স্পেনে গিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছেন, রাজশক্তির মনে এখনও অদম্য আশা এবং দৃঢ়-চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় গণতন্ত্র স্পেনকে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে পরাজয় করা একরূপ অসাধ্য।

প্রায় দুই বৎসর যুদ্ধের পর স্পেনের মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, জার্ম্মানী ও ইতালীর সহায়তা সত্ত্বেও, ফ্রাঙ্কো গত ছয় মাসে তাঁহার স্পেনের অধিকৃত রাজ্য বেশী বাড়াইতে পারেন নাই। নানা সংবাদপত্রে বিদেশী এজেন্সীর সাহায্যে আমরা স্পেন সম্বন্ধে যে সংবাদ পাই, তাহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। অনেক সময়েই আমরা ভাবি—স্পেন গভর্ণমেণ্টের পতনের দিন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অধিকৃত রাজ্য তুলনা করিয়া দেখি, ফ্রাঙ্কোর স্পেন জয় সুদূরপরাহত। সুতরাং পণ্ডিত নেহেরুর অভিমত মোটেই অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

সম্প্রতি লণ্ডনে নিরপেক্ষতা কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল। বৃটিশ কল্পনানুযায়ী স্পেন হইতে স্বেচ্ছা-বাহিনীর অপসারণের চুক্তি আসন্ন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার সাফল্য রুশিয়ার অভিমতের উপর নির্ভর করিতেছে। রুষ একমাত্র স্থলপথের পাহারায় সন্তুষ্ট নহে, জলপথের জন্য সতর্কতাবলম্বনের দাবী তুলিয়াছে। ইহা খুবই ন্যায্য।

ইতিমধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও ইতালী প্রত্যেকে আন্তর্জ্জাতিক বোর্ডে ১২,৫০০ পাউণ্ড দিয়া নিরপেক্ষতা-রক্ষার প্রাথমিক কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছেন। জলপথে সতর্কতাবলম্বন ব্যয়সাধ্য বলিয়া, ইহা ক্রমান্বয়ে অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহাই কমিটীর মত।

কমিটীর প্রস্তাবের মর্ম্ম যতদূর জানা যায়, তাহাতে স্পেনের বিদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের চারিটী বন্দরে সংগৃহীত করার কথা হইয়াছে। ইহারা—হ্যামবার্গ, লণ্ডন, মার্সেলি এবং জেনোয়া। স্পেন-গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যে সকল ভলাণ্টিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপ হইতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে যথাক্রমে লণ্ডন ও মার্সেলিতে, এবং ফ্রাঙ্কোর পক্ষীয় ভলাণ্টিয়ারদের হ্যাম্বার্গ ও জেনোয়াতে একত্র করা হইবে। তারপর তাহারা তাহাদের নিজ নিজ দেশে প্রেরিত হইবে।

নিরপেক্ষতা কমিটীর সিদ্ধান্ত যে বিশেষ ফলদায়ক হইবে, তাহাতে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। নিরপেক্ষতা এবং জলপথে পাহারার পূর্ব্ব ইতিহাস কেহই ভুলে নাই। ইতিপূর্ব্বে যে সকল পরিকল্পনা হইয়াছিল, তাহার একটীও কার্য্যকরী হয় নাই। এবারকার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও ইতালীতে সন্দেহ উঠিয়াছে। একমাত্র বৃটেনই প্রস্তাবক এবং বৃটেনই আশান্বিত। বৃটেনের মতামতের কোন মূল্য জগতের চক্ষে অতি অল্প।

ইংরাজ ও ইতালীর মধ্যে যে চুক্তিপত্র স্থির হইয়া রহিয়াছে, তাহা এখনও বলবৎ হয় নাই, কবে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। স্পেনের ব্যাপারও ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে। সুতরাং নিরপেক্ষতা-কমিটীর কার্য্যে আশান্বিত হওয়া যায় না।

ডি, ভ্যালেরার জয়—

গত মে মাসে ডেইলের অধিবেশনে একটী প্রস্তাবে ডি, ভ্যালেরার দল ৫২-৫১ ভোটে পরাজিত হওয়ায় ডি, ভ্যালেরা ডেইল ভাঙ্গিয়া দেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন যে, জাতীয় নির্ম্মাণ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে শক্তিশালী গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন।

গত জুন মাসে আয়ারের পুনর্নির্ব্বাচন হয়। ইহাতে

ফ্যায়ানা ফেইল (ডি, ভ্যালেরার দল)	৭৭টী আসন
কনগ্রীভ দল	৪৫টী আসন
শ্রমিক	৯টী আসন
ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট	৭টী আসন

ডেইলে পাইয়াছে। অন্যান্য দলের মিলিত শক্তি অপেক্ষা ডি, ভ্যালেরা ১৬টী আসন বেশী পাইয়াছেন। এইবার আর তাঁহাকে কোন দলের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া ডি, ভ্যালেরা এবার তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। কেহ কেহ এই জন্য আইরিশ নেতার লোকপ্রিয়তার হানি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। গত নির্ব্বাচনে দেখা যায়, ডি, ভ্যালেরার প্রভাব না কমিয়া বরং বাড়িতেছে।

বৃটিশ রাজনৈতিকদের কূট পরিচালনায় উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড বা আলষ্টার আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ডি, ভ্যালেরা এ পর্য্যন্ত ইহা আয়ারের অধীন আনিতে পারেন নাই। তাঁহার জাতিগঠনের প্রচেষ্টা ক্রমেই বলবতী হইতেছে এবং আশা করা যায়, আলষ্টারও শীঘ্রই আয়ারের শাসনাধীন আসিবে।

পণ্ডিত নেহেরুর বিদেশ-ভ্রমণ—

পণ্ডিত জওহরলালজীর এবারকার প্রতীচ্য-ভ্রমণ সখের বা কোন ব্যক্তিগত কারণের জন্য যে নহে তাহা তিনি যাত্রার প্রাক্কালে নিজেই অভিব্যক্তি দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কংগ্রেসকে প্রচার এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত-গঠন। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ প্রচারের অত্যাবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্বাধীনতান্দোলনের মূর্ত্তিমান বিগ্রহস্বরূপ পণ্ডিতজী ইহার যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি তাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছেন এবং এইবারও করিতেছেন।

পণ্ডিতজী বার্সিলোনায় স্পেনীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার্জ্জনপূর্ব্বক প্যারী হইয়া সম্প্রতি লণ্ডনে গমন করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইয়াছেন। বিদেশে কংগ্রেস-প্রতিনিধি পণ্ডিতজীর এই সপ্রশংসমান সম্বর্দ্ধনায় ভারতবাসী গৌরবান্বিত ও আশান্বিত।

পণ্ডিতজীর সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রীতি, আত্মত্যাগ, মানবপ্রেম, সর্ব্বোপরি অনমনীয় সঙ্কল্পপরায়ণতা সর্ব্বত্রই তাঁহাকে এই রাষ্ট্র-দৌত্যগিরিতে অপরাজেয় আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। সর্ব্বদেশের শ্রমিক ও শ্রমিক-নেতৃগণ পণ্ডিতজীর মাঝে তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অকপট সহৃদয়তা ও সহানুভূতির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বর্ত্তমান দুনিয়া হইতে ফ্যাসিষ্ট-বিভীষিকা বিদূরণের জন্য ও-দেশের শ্রেষ্ঠ শ্রমিকসঙ্ঘ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রধান নেতা স্যার ওয়াল্টার ও অন্যান্য শ্রমিকদলপতিরা পণ্ডিতজীর সঙ্গে গভীরভাবে পরামর্শ করেন এবং ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন। এই সকল ক্ষেত্রেও পণ্ডিতজী স্পষ্ট কথায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, একমাত্র সমকক্ষ হিসাবেই ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে চুক্তি সম্ভব এবং কোনরূপ আপোষ করিবার পূর্ব্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রথমে বৃটেনের স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে; পণ্ডিত নেহেরু অবিকম্পিত কণ্ঠে লণ্ডনের প্রতিটি সভায়ই ভারতের স্বাধীনতার ও তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে স্বীকার করিয়া লইবার দাবী জানাইয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতার মর্ম্মকথা এই যে, ভারতের বর্ত্তমান মূল সমস্যা ভয়াবহ দারিদ্র্য ও ক্ষুধার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ফ্যাসিজিম্ জগতের শত্রু কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজিম্ জ্ঞাতিভাই। স্পেন ও চীনে যদি বোমাবর্ষণ নিন্দনীয় হয় তবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইংরাজের বোমাবর্ষণনীতিও নিন্দনীয়। মানবতা এবং আন্তর্জাতিক শান্তির দিক্ হইতে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের অপরাপর দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক রাজনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথাও পণ্ডিতজী জোরের সঙ্গেই উল্লেখ করেন।

কংগ্রেসের প্রচার ও ভারতের স্বপক্ষে বৈদেশিক জনমত গঠনের আনুকূল্য যে পণ্ডিতজীর বর্ত্তমান প্রতীচ্য-পরিভ্রমণ অনেকখানি করিবে, সে আশা আমরা করিতে পারি।

নমিতা

(গল্প)

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

১

'পথের বাধাকে দু' পায়ে সরিয়ে হেঁটে চলে যাব,—ভগবান দুর্ব্বলের জন্যে, ধর্ম্ম দুর্ব্বলের জন্যে, ধর্ম্মশাস্ত্র কাপুরুষদের জন্যে! আজ হাজার বছর ধরে কতকগুলো অর্থহীন পুঁথির অত্যাচারে জাতির নাভিশ্বাস ধরেছে চলেছে—এই ভণ্ডামীর আমূল পরিবর্ত্তন দরকার!'

নন্দ এই কথাগুলি রমেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া যাইতেছিল।

রমেশ বলিল, আশ্চর্য্য! এই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই বিজাতীয় নাস্তিকতা!

নন্দ বলিল: চুপ্ করো রমেশ, এই পঙ্গু জাতটার প্রাণশক্তি কেড়ে নিয়েচে, ওই শুধু ভগবানের মুখ চাওয়া—

বাধা দিয়া রমেশ বলিল: তবে, আমি বলি শোন, আজ হাজার বছর পূর্ব্বে তোমার মত একদল নাস্তিক এ দেশে জন্মেছিল, তাদেরই পাপে আজ আমাদের এই অবস্থা। দেখ, নন্দ, ভারতের অতীত, সত্যসুন্দর সাধনার একটা বিরাট্ উদ্যম, এই অতীতকে বাদ দিয়ে, ভারতের জীবন-ধারাকে বাদ দিয়ে কোন ভবিষ্যৎই গড়ে উঠ্‌তে পারে না।

নন্দ চটে গিয়ে সুরু করলে: ভারতের কি অতীত আছে? ভারতের অতীত হাজার হাজার বছরে তৈরী এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ—অন্ধকার, কেবল অন্ধকার!

রমেশ: স্বীকার করি, ভারতের ইতিহাস এক অন্ধকার গহ্বর, কিন্তু আলো ফিরে পেতে হ'লে আরও দূর অতীতের পানে তীর্থযাত্রা করতে হবে, যে অতীতের কোলে দধীচির হাড়ে গড়া এক সুন্দরের মন্দির তৈরী হয়েছিল, যে অতীতের কোলে এক বিপুল আনন্দ-দীপালী বসেছিল—সেই অতীতকে খুঁজে বের করা চাই, তবেই তোমার ভবিষ্যৎ ঠাওরাতে পারবে!

নন্দ: এসব তোমার মন-বোঝান কথা, ওই বুজরুকীতে আর ভুললে চলবে না, ধর্ম্মের চেয়েও বড় জিনিষ আজ মানুষ মাথা থেকে বার করেছে, ভগবানের চেয়েও বড় শক্তি মানুষ আজ চায়, সেটা কি জান রমেশ?'

রমেশ: কি?

নন্দ: এক মুঠো ভাত!

রমেশ: রেখে দাও তোমার বাজে কথা—মানুষ শুধু ভাত খেয়েই বাঁচে না—কিন্তু এই ভাতই এক অচিন্ত্য শক্তি মানুষের বুকে আপনিই জুগিয়ে দেয়।

নন্দ: ওইখানেই তোমরা ভুল করছ। তিল তিল করে মরণোন্মুখ হয়েও, সে ভুল শোধরাতে পারোনি। কাজ চাই, অজয়কে জয় করবার শক্তি চাই, এ দেশের লোকগুলোকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই—ঈশ্বরের দিকে মুখ চেয়ে থাকাও যা, আর মরণও তাই।

রমেশ: মানুষের শক্তি কতখানি? মানুষ কি করতে পারে? কুমোরেরা যেমন ঘূর্ণায়মান এক চাকায় কাদা রেখে কত কি মাটির জিনিষ তৈরী করে, তেমনি এ কালচক্রে কোন্ এক অজানার অদৃশ্য শক্তিবলে পৃথিবী—পৃথিবী কেন, সারা বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—তুমি আমি কে? আমরা তো পুতুল!

নন্দ:—পুতুল? আমরা এক একটা মানুষ, বিপুল শক্তির কেন্দ্র!

রমেশ: সে শক্তিকে জাগাতে হলে, ফিরে যেতে হবে দূর—দূর অতীতে—যেখানে এদেশের মানুষ বিশ্বামিত্রের মত এক নূতন সৃষ্টি, এক নূতন জগৎ তৈরী করতে পেরেছিল—তাই, অতীত মিথ্যে নয়!

সে এক প্রভাত। নন্দ প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। ভট্টপল্লীর প্রান্তে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী। সে চলিয়াছিল সেই পথে। পূর্ব্বদিগন্ত মাত্র সিঁদুরে লাল, বন-প্রকৃতি প্রভাতী পুষ্পের ডালি লইয়া উষার আহ্বান করিতেছে।

নন্দ কিছুদিন ধরিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পড়িতেছিল, সেই জন্ত এই প্রভাতের সৌন্দর্য্যে তন্ময় হইয়া ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল। নন্দ ভাবিতেছিল—হাজার বছর পূর্ব্বে গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, কৃষ্ণা, কাবেরীর তীরে তীরে কোটি দেব-মন্দিরে আসমুদ্রহিমাচল যেমন প্রভাতীর বন্দনা বসিত, আজও তাই বসে। কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খের ধ্বনিতে, ধূনা-অগুরু-চন্দন-পুষ্পের সৌরভে, স্তব-সঙ্গীতের ঐক্যতানে মন্দিরপ্রাঙ্গণগুলি যেমন মুখরিত থাকিত, আজও তাই থাকে। ধ্যানস্থ হিমাদ্রির শীর্ষে শীর্ষে প্রভাতের প্রথম পুলকপাত যেমনটি হইত, আজও তাই হয়। রাজপুতানার মরুপ্রান্তে, উত্তর ভারতের নানা জাতীয় শস্য ও গমের ক্ষেতে, বাংলার ঐশ্বর্য্যময় শ্যামলিত বক্ষে, গোলকুণ্ডার হীরকক্ষেত্রে, মহীশূরের চন্দনবৃক্ষশীর্ষে, ব্রহ্মদেশের রত্নভূমিতে, বিন্ধ্যারণ্যের নিবিড় পর্ব্বতায়িত রুদ্র সৌন্দর্য্যের মাঝখানে, অজন্তার গৃহদ্বারে, বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র গন্ধে, বিচিত্র শোভায় যেমনটি হাজার বছর পূর্ব্বেকার প্রভাত আসিয়া দাঁড়াইত, আজও বোধ হয় তেমনটিই আসে।

পথ চলিতে চলিতে এক জীর্ণ মন্দিরের কাছে আসিয়া নন্দ থমকিয়া দাঁড়াইল—এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া। এক কিশোরী, পূজারিণী বেশে পূজা সাঙ্গ করিয়া শূন্য পুষ্প-নৈবেদ্যের ডালা হাতে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। চুলগুলি সদ্যস্নাতার মত পিছন দিকে এলাইয়া দেওয়া। মাত্র একখানি রাঙাপাড় শাড়ী তার পরিধানে। দু'দিন পূর্ব্বে হয়ত আলতা পরিয়াছিল, তার রেশটুকু আজও বেশ দেখাইতেছিল। মহাদেবকে বোধ হয় ভক্তিভরে প্রণাম করিয়াছে, তাই আঁচলটা গলার দিকে ঝোলান।

নন্দকে দেখিয়া কিশোরী মাথা নীচু করিল। নন্দ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেও, তাকে চিনিয়া লইল। সে যে রমেশের বোন নমিতা!

নন্দ তাহার মনের ভাব কোন প্রকারে সংযত করিয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গার দিকে চলিল। গঙ্গার তীরে আসিয়াও সে নমিতার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌম্য-মূর্ত্তির কথা ভাবিতে লাগিল।

হিন্দুয়ানীর সবটুকু যার চোখে বিসদৃশ ঠেকে, তার চোখেও পূজারিণীর ছবিটি মন্দ লাগিল না। নমিতাকে দেখিয়াছে সে অনেকবার, রমেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে—নমিতা কত বার তাহাদের কাছে আসিয়া ফরমাস্ খাটিয়াছে। কিন্তু তাহাকে কোনদিনই এত সুন্দর দেখায় নাই!

কেই বা মহাদেব, কিই বা পূজা—কিন্তু এ পূজারিণী-বেশ এত মধুর কেন? ভাবিতে লাগিল নন্দ—কি যে অহৈতুকী ভক্তির ডালা লইয়া ইহারা পাথরের নুড়ির কাছে মাথা লুটায়, বুঝি না কিছু; ফুল-বিল্বপত্র মাথায় চাপাইয়া কি যে লাভ, তাও বুঝি না; কিন্তু যে পূজারিণী, সে কেন তাহার চোখে এত সুন্দর ঠেকে—এ বেশের কি এমন মাধুর্য্য আছে যে, এই সরলতাময় ঘরোয়া রূপকে সুন্দরতর করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারে!

এই আবল-তাবল ভাবনা আসিয়া জুটিল তার মনে। এই ভাবেই সেদিনকার প্রাতভ্রমণ শেষ হইল।

নন্দের পিতা এবং রমেশের পিতা বাল্যবন্ধু। নন্দের নাস্তিকতা দৃশ্যতঃ প্রতিবন্ধক হইলেও, 'কালে শুধরাইয়া যাইবে'—চিরাচরিত এই নীতির উপর নির্ভর করিয়াই রমেশের বোন নমিতার সহিত নন্দের বিবাহ-প্রস্তাব দুই পক্ষেই চলিতে লাগিল।

ধর্ম্মপ্রবণ রমেশ নাস্তিক বন্ধু নন্দের সহিত বোনের বিবাহের পক্ষে ছিল না। তাহার চেয়ে না হয় হাত পা বাঁধিয়া নমিতাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া চলিবে। তবু বিধাতারই বিধান তাহাকে অবশেষে মানিয়া লইতে হইল।

তাই যাহা হইবার, তাহা হইতে বাধিল না। 'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে'—হয়তো এই প্রবাদ-বাক্যটির সার্থকতা যথানিয়মে প্রমাণিত হইবার জন্যই, নানারূপ প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও একদিন দুই হাত এক হইয়া গেল।

অর্থাৎ—

নন্দর সহিত নমিতার বিবাহ হইয়া গেল।...

বিবাহের পরে একদিন নব বধূ প্রশ্ন করিল—তুমি নাকি নাস্তিক!

নন্দ—হাঁ, আমি নাস্তিক।

নমিতা বলিল—বটে? আমি কিন্তু নাস্তিক পছন্দ করি না, তোমায় আস্তিক হতে হবে।

নন্দ—কেন আমি যদি আস্তিক না হই, তবে কি তুমি আমায় ভালবাস্‌বে না?

নমিতা—আমি ঘোর আস্তিক কিন্তু, তাই তোমাকে দেবতার মত পূজো কর্‌তে শিখেছি ছোটবেলা থেকে। আমার দেবতা তুমি, তোমায় কি না ভালবেসে থাক্‌তে পারি! আমি তো আর নাস্তিক নই।

নন্দ—তা'হলে তুমি আমায় ভালবাস?

নমিতা—বাসি,—কিন্তু তুমি কি আস্তিক হবে না?

নন্দ: যাকে পাব না, তার জন্যে মাথা ঘামাই নে; যাকে পাব বা পেতে পারি, তার জন্যেই আমি প্রস্তুত।

নমিতা: কেন, তুমি তো ভগবানকেও পেতে পার!

নন্দ: তুমি তো এইটুকু মেয়ে, ভগবান্ বল্‌তে কি বোঝ বল দেখি!

নমিতা: তুমি নাস্তিক, তুমি ভগবানের কথা কিছুই বোঝ না; কিন্তু আমি আস্তিক, তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, সেই হিসেবে তোমার চেয়ে তাঁকে কিছু বেশী চিনি।

নন্দ: বাঃ রে! বেশ তো তর্ক কর্‌তে পার! কিন্তু তোমার দাদা পারে না।

এই বলিয়া নন্দ নমিতাকে বুকে টানিয়া লইল।

৪

নন্দকে ভাল লাগিলেও, নমিতা দিন দিন মুস্‌ড়িয়া পড়িতেছে—তাহার নাস্তিক ভাব দেখিয়া।

নন্দ কিন্তু ভাবিত, কোথাকার একরত্তি মেয়ে ভগবানকে লইয়া পড়িয়া আছে, এ কি কুসংস্কার!

ঘনাইয়া উঠিত নমিতার দুঃখ, লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিয়া বেড়াইত সে। বলিত: ভগবান, তুমি ওকে সুমতি দাও, নইলে আমি বাঁচব না।

নন্দ বলিত: চব্বিশ ঘণ্টা পূজো নিয়ে থাক্‌তে পার, আর আমার টেবিলের বইগুলো গুছিয়ে রাখ্‌তে পার না!

তখন ইউরোপে মহাসমর বাধিয়াছে। নন্দ ও নমিতার মধ্যে একটা মনের অমিল ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

নন্দ মনে করিল, জীবনটা তার তিক্ত ঠেকিতেছে। একদিন কি একটা খুঁটিনাটি লইয়া ঝগড়ার পর নন্দ বলিল: শোন নমিতা, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি! তুমি জান বোধ হয় চন্দননগরে আমাদের একখানা বাড়ী আছে, সেই অজুহাতে আজ ফরাসী পল্টনে নাম দিয়ে এসেছি। শীঘ্রই ফ্রান্সে যেতে হবে। তুমি তোমার ভগবানকে নিয়েই থাক, আমি চল্লুম।

নমিতার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মুখখানা রাগে লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া সে বলিল: বেশ, তা' হলে তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

নন্দ: পার, খুব পার।

নমিতা: এ যুদ্ধ তুমি কার জন্যে কর্‌বে?

নন্দ: কেন, দেশের, দশের জন্যে!

নমিতা:—কিন্তু জিজ্ঞেস্ করি, দেশ হল তোমার ভাটপাড়ায় না হয় চন্দননগরে, কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে দেশের হয়ে কি যুদ্ধ কর্‌বে, আমায় একটু বুঝিয়ে দেবে কি? এতে তোমার কি স্বার্থ আছে—তোমার দেশের বা তোমার দশের কি স্বার্থ আছে, একটু বল্‌বে কি?

নন্দ চুপ করিয়া রহিল, কি যেন ভাবিতে লাগিল।

নমিতা: বল, তুমি বিদ্বান্, আমার কথার জবাব দাও, তারপর যুদ্ধে যেও।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া নন্দ উত্তর দিল—রাজার জন্যে!

নমিতা: শুনেছি, ফরাসী দেশে রাজা নেই, সত্যি কি?

নন্দ: রাজা না থাক্, রাজার দেশের জন্যে।

নমিতা: রাজা যদি না থাক্‌ল, তবে রাজার দেশ কোথা থেকে হল, আমায় বুঝিয়ে দেবে?

নন্দ: এত কথার উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নই, আমি যুদ্ধে যাব, এই পর্য্যন্ত, তুমি জেনে রাখ।

নমিতা: আচ্ছা যেয়ো।

নন্দ কি জানি কেন চটিয়া গিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পর নমিতার ঘরে ঢুকিয়া

বলিল: দেখ, নমিতা, তুমি কথায় কথায় আমায় বড় অপমান কর!

নমিতা: অপমান! কই তা' কিছু তো আমার মনে পড়ছে না! মনে রেখো—তুমি আমার ভগবান্!

• ভগবানের নাম শুনিয়া নন্দ দ্বিগুণ চটিয়া গেল।

নন্দ বলিল: আমি দেশত্যাগী হব—হিমালয়ের দিকে বেরিয়ে যাব।

নমিতা: কেন যুদ্ধে যাবে না? এবার হিমালয়ের দিকে যাবে? কোন্ দুঃখে শুনি, একি তপস্যার জন্যে?

নন্দ: যাও, তোমার সঙ্গে কথা কয়েও আমি শান্তি পাই না, জীবন আমার তেঁতো হয়ে গেছে!

নমিতা চুপ করিয়া কথাগুলি শুনিয়া, একবার একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া বলিল: বটে!

অগ্নিশর্ম্মা হইয়া নন্দ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এইরূপে সরলবিশ্বাসী তরুণী স্ত্রী ও বুদ্ধিমান্ তরুণ স্বামীর মধ্যে খুঁটিনাটি লইয়া সামঞ্জস্যের অভাব ক্রমাগতই ব্যবধানের কৃষ্ণমেঘ হইয়া জমিতে লাগিল। নমিতা একদিন বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন নন্দ'র সংবাদ পাওয়া গেল না। সবাই অবাক্ হইয়া গেল। অবাক্ শুধু হয় নাই নমিতা।

নন্দ চলিল হিমালয়ের দিকে।···

মানুষের সমাজ সে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে বহুদিন। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু সেদিন তরঙ্গায়িত ধূম্র পাহাড়ের গায়ে, শ্যাম বনানীর শীর্ষে শীর্ষে নাচিয়া উঠিতেছিল; আশেপাশে পার্ব্বত্য ঝরণার ঝর্-ঝর্ শব্দ, সান্ধ্য-বিহগের উপাসনা-কাকলি, থাকিয়া থাকিয়া সঞ্চরমান স্নিগ্ধ উদাসী বাতাসের নাচ তাহার মনটাকে সেদিন এক বিচিত্র বিস্ময়ে ভরিয়া দিতেছিল।

সারাদিন পথ চলার অবসাদে কাতর দেহটাকে একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে এলাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িল; তারপর সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা সে জানে না।

অর্দ্ধেক রাত্রে আচম্‌কা তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়াই সে শুনিতে পাইল কোথায় যেন কন্‌সার্ট বাজিতেছে। সে বাজনা বিলাতী কন্‌সার্ট নয়, বীণা-মুরজ-মুরলীর এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। আর তাহার সঙ্গে যেন এক উপাসনা-গীতি।

তার প্রতি রোমকূপ শিহরিয়া উঠিল। তার পরদিন সে তন্ন তন্ন করিয়া সেই পার্ব্বত্য উপত্যকাটি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। মানুষ কই? এ ঝঙ্কার কোথা হইতে আসিতেছে? সারা দিন হায়রাণ হইয়া আবার সে ফিরিয়া আসিল তাহার সেই গাছতলায়, যেখানে বসিয়া সে সেই অদ্ভুত সঙ্গীত শুনিয়াছিল।

এই প্রকারে তাহার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। প্রতি সন্ধ্যার পর সেই কন্‌সার্ট বাজিত; মনে হইত—যেন তাহার সঙ্গে একটা উপাসনা-গীতি মাখান রহিয়াছে, সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। প্রত্যহই সে বাহির হইত সেই গানের উৎসের সন্ধানে, পার্ব্বত্যভূমির প্রতি লতা-পাদপ, প্রতি নির্ঝরিণী, প্রতি পুষ্পের দিকে চাহিয়া বেড়াইত—যদি সেই গানের কিনারা মিলে। পথ চলিতে পাহাড়ী পাখীরা ডাকিয়া উঠিত; সে থমকাইয়া দাঁড়াইত ভাবিত ওটা মানুষের কণ্ঠ, ছুটিত সেই দিকে—আবার যাইতে যাইতে আর একটা পাখী ডাকিয়া উঠিত, আবার সে ফিরিত। কোথাও হয়ত পার্ব্বত্য ঝরণার ঝর্-ঝর্ শব্দ, সে মনে করিত, এই বুঝি সাধুরা কথা কহিতেছে। এমনি করিয়া কল্পনার আলেয়ার পানে সে ছুটিয়া বেড়াইত, সারা পার্ব্বত্য উপত্যকাময়। কিন্তু কই সে গানের আড্ডা, তার কল্পিত সাধুদের ভজন-গানের মজ্‌লিস।

সে ভাবিল, সে নড়িবে না। যতদিন না এই গানের কেন্দ্র খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে, ততদিন এমনি করিয়া সে সেখানেই দিনগুলি কাটাইয়া দিবে।

কোন পথিক কি মিলিবে না, যে এই পথের সন্ধান জানে!

কোথায় ভারতের অতীত, কোথায় ভগবান্, কোথায় ধর্ম্ম, কোথায় সে তথাকথিত আলোর রাজ্য!

চিন্তা, ক্লেশ, অনাহার, বিস্ময়, অপমানে তার দেহ সেদিন দ্বিপ্রহরে তন্দ্রায় এলাইয়া পড়িল।·····

নন্দ দেখিতেছে—অদূরে এক মূর্ত্তি ক্রমশঃ তার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। যখন আরও অগ্রসর হইল, সে দেখিল উহা এক স্ত্রীমূর্ত্তি। যখন আরও নিকটে অগ্রসর হইল, দেখিল, তাহার সম্মুখে নমিতাই দণ্ডায়মান।

নন্দ'র আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। নন্দ বলিল: তুমি এখানেও ছুটে এসেছ? আমার কি কিছুতেই শান্তি নেই?

মূর্ত্তি: তুমি যাকে খুঁজ্‌ছ—এই নিশ্মানুষ পার্ব্বত্য গহনে তুমি যাকে চাও, সে-ই আমি।

নন্দ: তুমি তো নমিতা। কে তুমি? নমিতা নও?

মূর্ত্তি: আমি এই ভারতের বাণী, যার সন্ধানে তুমি আজ এখানে।

নন্দ: তবে নমিতার রূপ নিয়ে এসেছ কেন?

মূর্ত্তি: প্রত্যেক নমিতাই ভারতের বাণী। তাই নমিতার রূপ নিয়ে তোমার কাছে এসেছি।

নন্দ বেশী কথা কহিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল: সব শুন্‌লাম, তুমি কি বল্‌তে পার, এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য উপত্যকা প্লাবিত ক'রে যে সঙ্গীত উপাসনা-গীতি উঠে, সেটা কি?

মূর্ত্তি: সে-ই আমি।

নন্দ দেখিতেছে—আলোয় আলোময় হইয়া উঠিয়াছে নিখিলবিশ্ব। নমিতা-মূর্ত্তি যেন হাসিতেছে।

মূর্ত্তি আবার বলিল: এই গান গোমুখীর কল-নাদের মত দূর অতীত থেকে ভেসে আস্‌ছে—এই গান ভারতের মহাতীতের বিগ্রহ মাত্র।...আত্মস্থ হও, অন্তর্ম্মুখী তোমার শক্তির কাছে পৃথিবী একদিন মাথা হেঁট কর্‌বে। আর কোন শক্তির আবশ্যকতা নেই। যাও, বাড়ী ফিরে যাও!

নন্দ'র স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল, সেই নমিতা-মূর্ত্তি যেন তখনও দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। নন্দ যেন কি কথা বলিতে গেল। মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল।

নন্দ'র হৃদয়-তন্ত্রীতে অপূর্ব্ব আনন্দের ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। তাহার অহল্যা-পাষাণের মত জড় হৃদয় কোন্ শ্রীরামচন্দ্রের চরণ স্পর্শে সহসা জীবন-চ্ছন্দে নাচিয়া উঠিল! তবুও নন্দ ভাবে—একি স্বপ্ন না মায়াজাল!

তবে এত আনন্দ কোথা হইতে আসিল? শেষে আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল: তবে বুঝি স্বপ্নই সত্য!

নন্দ নিরুদ্দেশ হইবার পরই নমিতা বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া আসিল। কাহারও নিষেধ সে শুনে নাই।

একদিন তাহার সই বেড়াতে আসিয়াছিল, সহানুভূতি জানাইতে।

'...তা' কেন নন্দ বেরিয়ে গেল বল্‌তে পারিস্?'

নমিতা: তা কেমন করে জান্‌ব ভাই, একবার বল্‌লে যুদ্ধে যাব, আবার বল্‌লে, হিমালয়ে যাব, সে যে কোথায় গেছে তা' সেই-ই জানে।

সই: তা' কারণ কি তা' তুই কিছুই জানিস্ নে?

নমিতা: কারণ সেই-ই জানে। তবে একদিনকার কথা আমার মনে আছে। আমি একদিন মহাদেব পূজা করছিলুম, সে ঝড়ের মত এসে মহাদেবের মাথায় লাথি মার্‌লে। আমি তাকে বল্‌লুম: তুমি লাথি মার্‌লে কেন? সে বল্‌লে: ওসব অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, পুতুল-পূজো আমাদের বাড়ী চল্‌বে না।

তাইতে আমি বলেছিলুম: আমার বিশ্বাস অন্ধই হোক আর জাগ্রতই হোক, তুমি লাথি মার্‌বার কে? আমার বিশ্বাসে লাথি মারবার কোন অধিকার নেই তোমার!

সে বল্‌লে: স্বামীর কথা শুন্‌বে?

আমি বল্‌লুম: না, ও রকম অন্যায় হুকুম আমি শুন্‌তে রাজী নয়। তুমি যা' করেছ, তা' করেছ, ভবিষ্যতে এমনটি আর করো না, আমি তোমায় নিষেধ করে' দিচ্ছি।

সে ভাই এসব কথা শুনে কিছু বল্‌লে না। দু' চার দিন আমার সঙ্গে কথা কয়নি, তারপর আমি বাপের বাড়ী চ'লে গেলে একদিন কোথায় সে উধাও হ'ল সেই জানে।

সই: যাই হোক্, স্বামীকে অত কড়া কথা বলা তোর উচিত হয় নি।

নমিতা: কড়া কথা কিছুই বলিনি, আমি যা' বলেছি তারই ভালর জন্য, আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। কিন্তু স্বামী...

এই বল্‌তে বল্‌তে নমিতা কেঁদে ফেল্‌লে।

সই বলিল : কাঁদিস্‌ নি, কেঁদে আর কি করবি ভাই!

আজ বড় আনন্দ। নন্দ'র পিতামাতা আনন্দাশ্রু ফেলিতেছেন। নমিতার পিতামাতাও আসিয়াছেন। রমেশও আসিয়াছে। বহুদিন পরে নন্দ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। নমিতা তখন আপনার ঘরের মেঝেতে শুইয়া আছে।

নন্দ আসিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল। নমিতা নিষ্পলক দৃষ্টিতে নন্দ'র দিকে চাহিয়া রহিল।

নন্দ বলিল : নমিতা, কথা কইচো না তো?

নমিতা চুপ করিয়া রহিল তেমনি।

নন্দ আবার বলিল : নমিতা অমন করে' দেখছ কি, আমি যে ফিরে' এসেছি।

নমিতা ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল : কেন, এই মূর্ত্তিই তো আমি রোজই দেখি, অহরহ আমার চোখের সাম্‌নে এই মূর্ত্তি বেড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু সে মূর্ত্তি তো কথা কয় না। তবে সত্যিই কি তুমি ফিরে' এসেছ?

নন্দ : কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?

নমিতা কিছুই বলিল না। সুবৃহৎ চোখ দুটি দিয়া অবিরল অশ্রুপাত হইতে লাগিল

গলবস্ত্র হইয়া নমিতা আসিয়া নন্দ'র পায়ের তলায় লুটাইয়া প্রণাম করিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল : আমায় ক্ষমা কর।

নন্দ : ক্ষমা আমি তো তোমায় করব না, তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

এতক্ষণে হাসি ফুটিল। নমিতা বলিল : কেন তোমার আবার অপরাধ কি?

নন্দ : গুরু অপরাধ, আমি তোমার মহাদেবকে লাথি মেরেছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।

নমিতা : যাক্‌, ওসব কথা আর ভাবে না।

নন্দ : ওসব কথাই সার কথা। আজ জেনেছি, বুঝেছি, কিছুই মিথ্যে নয়, ওই পাথরের নুড়ি, এই মৃণ্ময়ী প্রতিমা, ওরই ভেতর দিয়ে মূর্ত্তিহীনকে পাওয়া যায়—নমিতা, এদেশের সব সত্যি, কিছুই মিথ্যে নয়।

নমিতা হাসিয়া বলিল : কি ক'রে জান্‌লে?

নন্দ : তোমার মধ্য দিয়েই কি যে আনন্দ কুড়িয়ে পেয়েছি, তা' আর ভাষায় বল্‌তে পারি না। নমিতা সত্যই কি তুমি দেবী?

নমিতা নন্দ'র পা দুখানি জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল : দেবতা আমার, আমি দেবী নই, তুমি-ই আমার দেবতা। তোমার নিষ্ঠা আজ আমায় পূর্ণ ক'রে তুলেছে।

গান

শ্রীহরীশ দেবনাথ

ঘুমঘোরে রাতে শুনেছি যে গান
মনে মনে
দিনের আলোক ঝলকে না কেন
জাগরণে?

চৈতী-রাতের গীতালি ঢালিয়া
কণ্ঠে সুধার কী মোহ ছানিয়া—
গানের শিখায় জ্বলিল যে সুর
ক্ষণে ক্ষণে—
দিনের আলোকে ঝলকে না কেন
জাগরণে?

গাছের শাখায় থাকিয়া থাকিয়া—
সে সুর উঠে কী কাঁপিয়া কাঁপিয়া
বাতাসে রণে কী ধ্বনিটুকু তার
বনে বনে—
শোনা যায় যেন—তবু কেন রয়
আবরণে?



কবি

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অনেক গুণ থাকিলেও, বিশেষ প্রশংসা নাই। * * * সৃষ্টিক্ষমতামাত্রই প্রশংসনীয় নহে। * * * সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুইয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না।

— বিবিধ প্রবন্ধ

কাব্যের উদ্দেশ্য

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষসাধন, চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, কিন্তু নীতি দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না, কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ-সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধ্যাদি বিধান করেন।

এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

– বিবিধ প্রবন্ধ

গ্রন্থকার

পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা।

—বিবিধ প্রবন্ধ

মহাভারত

মহাভারত পঞ্চম বেদ। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, কিন্তু Mass Education লইয়া তর্ক-বিতর্ক আজ নূতন ইংরাজ আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার।.....তাঁহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায়, যাহা শিখিবার তাহা স্ত্রীলোক ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও একস্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়।......তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা ব্রাহ্মণদিগের লোকশিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্ত্তি।

— কৃষ্ণচরিত্র

যশ

যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে, যশ আপনি আসিবে।

—বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)

যুদ্ধ

আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম. আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম। আমরা বাঙ্গালীজাতি শত শত বর্ষ সেই অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি।

— কৃষ্ণচরিত্র

বিলাতী

আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য।... আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে।

—কৃষ্ণচরিত্র

বৈষ্ণব ধর্ম্ম

প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা।......তিনি জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্মমাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়, কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্তশক্তিময়।

—আনন্দমঠ

স্বদেশ-প্রীতি

সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বজন-প্রীতি, স্বদেশ-প্রীতি, পশু-প্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ-প্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।

অনুশীলন

স্ত্রী

স্ত্রী বাল্যকালে ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে জীবনাবলম্বন।...... গৃহে দাসী, শয়নে অপ্সরা, বিপদে বন্ধু, রোগে বৈদ্য, কার্য্যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় সখী, বিদ্যায় শিষ্য, ধর্ম্মে গুরু, আশ্রমে আরাম, প্রবাসে চিন্তা, স্বাস্থ্যে সুখ, রোগে ঔষধ, অর্জ্জনে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যশ, বিপদে বুদ্ধি, সম্পদে শোভা।

বিবিধ প্রবন্ধ

লোক-শিক্ষা

দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার মূল কারণ—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই।

—বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)

(বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা হইতে উদ্ধৃত)

সমালোচনা

বাঙ্গালা-সাহিত্যের নবযুগ — শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত—২১ এ রাজা বসন্ত রায় রোড, দক্ষিণ কলিকাতা হইতে রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১০+২১৪, মূল্য দুই টাকা।

এই গ্রন্থখানিতে বিহারীলাল-বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক সময়ের বাঙ্গালাসাহিত্যের কাব্য, নাটক ও উপন্যাসের সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচনার নামে এদেশে হয় ভাব-গদগদ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, না হয় ঈর্ষ্যাবিষজর্জ্জরিত তীক্ষ্ণ শেল নিক্ষেপ চলিয়া আসিতেছে। সুপণ্ডিত নবীন গ্রন্থকার নিজের সূক্ষ্ম রসবোধের দ্বারা এই সহজ, সুলভ ও প্রচলিত পথের মোহ ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। তিনি গ্রীক্, সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের উচ্চ স্তরের সমালোচনা (Higher criticism) সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত এবং তাহার আলোকে বাঙ্গালার নবযুগের সাহিত্যকে যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার রচনার মধ্যে বাঙ্গালার মধ্য যুগের সাহিত্যের, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রচুর সাক্ষ্য রহিয়াছে। এই জন্যই নব-যুগের সাহিত্যের সহিত প্রাচীন সাহিত্যের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা লেখক অবলীলাক্রমে ধরিতে পারিয়াছেন।

গ্রন্থখানিতে উপন্যাস সম্বন্ধে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যের আদর্শবাদ" এবং "শরৎ-সাহিত্যের শাশ্বত নারী ও পুরুষ" শীর্ষক দুটী প্রবন্ধ; নাটক সম্বন্ধে 'ট্র্যাজিডি ও তাহার বিবর্ত্তন" এবং "দৃশ্যকাব্য ও আমাদের নাট্য-সাহিত্য" নামক দুইটী এবং কাব্য সম্বন্ধে পাঁচটী প্রবন্ধ আছে। কাব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঁচটীর মধ্যে দুইটীতে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা বিচার এবং অপর তিনটীতে বিহারীলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যবিচার রহিয়াছে।

লেখক প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রারম্ভেই সাহিত্যের মূলসূত্রগুলি স্থাপন করিয়া, তারপর বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন। আর্টের সহিত নীতির সম্বন্ধ, ট্র্যাজিডির মূল উৎস প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার মত স্পষ্ট করিয়া আর কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই—অবশ্য অনেকে তাঁহার পূর্ব্বে দুষ্পাচ্য পাণ্ডিত্যসহকারে যথাসম্ভব দুর্ব্বোধ্য করিয়া এসব কথা আলোচনা করিয়াছেন। কোন স্রষ্টার রচনা আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি যুগপ্রভাবকে বিস্মৃত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র আদর্শবাদের প্রাধান্য দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সময়ে যে বাঙ্গালীর সমগ্র জীবনকে নবীন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কবি, ঔপন্যাসিক, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক নেতা ও ধর্ম্মপ্রচারকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন, একথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

লেখক কঠোর সত্য মিষ্ট করিয়া বলিবার অপূর্ব্ব কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। শৈবলিনীর চরিত্র আঁকিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সাহিত্যের পথ ত্যাগ করিয়া শেষে স্মার্ত্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহা সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। শরৎ-সাহিত্যে "শাশ্বত নারী ও পুরুষ" এই গালভরা নাম দিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্রের "আশেপাশের চরিত্রগুলি যতই বৈচিত্র্যময় হইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অভিনব হইয়া উঠুক না কেন, প্রধান চরিত্রগুলি যেন সব সময়ে এক একটি নূতন ব্যক্তিত্ব লইয়া আমাদের কাছে ধরা দেয় না।"

অতি আধুনিক সাহিত্য তাঁহার আলোচনায় প্রাধান্য না পাইলেও, তিনি প্রসঙ্গক্রমে দেখাইয়াছেন যে এ যুগে 'Art for Art's sake' নীতি ঘোষিত হইলেও, সাহিত্যের ভিতর দিয়া চেষ্টা হইতেছে কৃষক ও শ্রমিককে উদ্বুদ্ধ করা। কলিকাতার মধ্যবিত্ত বা ধনীর পরিবারে প্রতিপালিত হইয়া মজুরজীবনের বা পল্লীজীবনের জয়গান করার মধ্যে যে দুঃসহ ন্যাকামী আছে, তাহা লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বৈষ্ণব কবিতায় যে যথার্থ বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গী নাই, তাহা যে কেবলমাত্র একটি সাহিত্যিক শৈলীর অনুকরণ, এই কথা লেখক বহু প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রতিপাদন করিয়াছেন। গত বৎসর যখন মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতিসভায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আমি 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যকে বিলাতী বৈষ্ণবের রচনা বলিয়াছিলাম তখন প্রাচীনপন্থী বহু বক্তা আমার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আজ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে শশিভূষণবাবু নিজস্ব ভঙ্গীতে সেই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন।

লেখক বলিয়াছেন "আধুনিক যুগে আর খাঁটি দৃশ্যকাব্য রচিত হইতে পারে না।" সোভিয়েট রাশিয়ার নব নাট্য-সাহিত্য পাঠ করিলে তাঁহার মত সমর্থন করা কঠিন হয়। তিনি বিহারীলালের কাব্যসমীক্ষায় বৈষ্ণব কবিতায় কবিদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা প্রকাশের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন ঠিক; কিন্তু বাঙ্গালার গীতি কবিতায় "ব্যক্তি জীবনের স্পন্দন" বিহারীলাল হইতে আরম্ভ হয় নাই, আরম্ভ হইয়াছে রামপ্রসাদ সেন হইতে। এরূপ দুই চারিটী বিষয়ে লেখকের সহিত আমার মতভেদ থাকিলেও, আমি তাঁহার সমালোচনার ভঙ্গী, রসবোধ ও সুগভীর পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম গ্রন্থ লইয়া আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান লাভের যোগ্য হইয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

মত ও পথ

মন্ত্রিমণ্ডলীর দায়িত্ব

সুখী - পরিবার ভাঙ্গিয়াছে। স্বায়ত্তশাসন - মন্ত্রী সৈয়দ নৌসের আলীকে বাদ দিয়া অতঃপর মন্ত্রি-মণ্ডল পুনর্গঠিত হইয়াছে। মিঃ নৌসের আলির সহিত প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণের ভিতরে ভিতরে যে গভীর মনোমালিন্য চলিতেছিল, তাহার এক অঙ্কে এইরূপে যবনিকা পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে যে পত্রাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ভিতরের আসল কথার মর্ম্ম পরিগ্রহ করা কঠিন। মনোমালিন্যটুকুই সত্য—পরস্পরের বিরুদ্ধে যে যুক্তি ও দোষারোপ, তাহার মধ্যে নির্জ্জলা সত্যের সন্ধান পাওয়া সাধারণ দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব নহে। দেশবাসীর তাহা জানিয়া বিশেষ লাভও নাই। মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাদের কার্য্যে বাঙ্গালার জনসাধারণের অনেক ক্ষেত্রেই আশাভঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই গৃহবিরোধে প্রজার দিক্ দিয়া নূতন আশাবৃদ্ধি বা আশাভঙ্গের কোনই কারণ ঘটে নাই।

কিন্তু মন্ত্রিগণের পদত্যাগ প্রসঙ্গে যে শাসনতন্ত্রঘটিত প্রশ্ন উঠিয়াছে, সেইটুকু সম্বন্ধেই দেশবাসী একটা সুমীমাংসার দাবী করে। যাঁহারা বলেন, মিঃ নৌসের আলীকে প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহার পদত্যাগে অস্বীকৃত হওয়া সমীচিনই হইয়াছিল, তাঁহাদের কথায় আমরা যুক্তি খুঁজিয়া পাই না। মিঃ নৌসের আলীর পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান ব্যক্তিগত চরিত্র, ইচ্ছা, বা কার্য্যনীতি যাহাই হউক, এই ক্ষেত্রে পদত্যাগে অস্বীকার করিয়া তিনি শাসনতন্ত্রে অচল অবস্থাই সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। মিঃ নৌসের আলীর মতে বস্তুতঃ ও আইনতঃ মন্ত্রিসভায় সম্মিলিত ভাবে কোন দায়িত্ব নাই; প্রত্যেক মন্ত্রীর দায়িত্বই পৃথক্ পৃথক ও ব্যক্তিগত। এই কারণে প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে তিনি নিজ দায়িত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারেন না—একমাত্র স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে বা গভর্ণর স্বীয় ক্ষমতাবলে তাঁহাকে অপসারিত করিলে, তবেই এই দায়িত্ব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন। তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন—মন্ত্রীদের এই ঘরোয়া বিবাদে গভর্ণর হস্তক্ষেপ করিবেন না। প্রকাশ, তিনি গভর্ণরের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা - প্রসঙ্গে তাঁহাকে অনুরোধও করেন যে, এই জটিল সমস্যায় ব্যবস্থাপরিষদের সিদ্ধান্ত অবগত হইবার জন্য তিনি যেন পরিষদের অধিবেশন অবিলম্বে আহ্বান করেন; অথবা যদি এইরূপ অধিবেশন আহ্বান করিতে গভর্ণর অসম্মত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি যে পরিষদের অধিকাংশ সভ্যের আস্থা আছে, তাহা প্রমাণ করিতে তাঁহাকে সুযোগ দান করেন। গভর্ণর এই উভয় প্রস্তাবের কোনটাই গ্রহণ করেন নাই।

মন্ত্রিমণ্ডলের সম্মিলিত দায়িত্ব অস্বীকার করিলে, সংস্কৃত শাসনতন্ত্র অচল হয়। মধ্য প্রদেশের মন্ত্রী মিঃ সরিফ যদি মন্ত্রিমণ্ডলের আদেশ-মত পদত্যাগে অসম্মত হইতেন এবং একমাত্র গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাবলে তাঁহাকে অপসারিত করিতে হইত, তদ্দণ্ডেই উক্ত প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডলের স্বাধিকার ধূলিসাৎ হইত। বাঙালার মন্ত্রি-মণ্ডল কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল নহে বলিয়া, স্বায়ত্তশাসনের মূল তন্ত্রে আঘাত দেওয়া সমীচিন নহে। কংগ্রেসী হউক, অকংগ্রেসী হউক—মন্ত্রিমণ্ডলের অধিকার-ভঙ্গের দৃষ্টান্ত রক্ষা করিলে, এ জাতির ভবিষ্য আত্মশাসননীতির পক্ষে তাহা কখনও শুভাবহ হইবে না। দেশবাসী এইজন্য মিঃ নৌসের আলীর পক্ষে অন্য দিক্ দিয়া সমর্থন করিতে চাহিলেও, তাঁহার এই বিধি-বহির্ভূত আচরণে সুখী হইতে পারিবেন না।

রাজবন্দীর মুক্তিসমস্যা

বাঙালায় রাজবন্দীদের মুক্তি-প্রসঙ্গে ওয়ার্দ্ধা হইতে মহাত্মাজীর সহিত সুদীর্ঘ আলোচনান্তে ফিরিয়া রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বন্দীদিগকে ও দেশবাসীকে আরও কিছুকাল ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, বিষয়টী যেরূপ গুরুতর, তাহাতে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করিয়া ফেলা সঙ্গত হইবে না। বিষয়টীর চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য মহাত্মা গান্ধী উদ্যত আছেন, এ সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করে না। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব-গ্রহণে গভর্ণমেণ্টের কি বাধা, তৎসম্বন্ধে সাধারণের জানিবার অধিকার আছে। আমরা শুনিয়াছিলাম—মহাত্মা গান্ধী ও বাঙালা গভর্ণমেণ্টের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা না হইলেও, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের জুলাই মাসের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই অন্ততঃ ৪০০ শত রাজবন্দী ও রেগুলেশন-বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা মন্ত্রিমণ্ডলের আছে—কেবল গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি-সমস্যাই এই মীমাংসার প্রধান বাধাস্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, এমন কি বর্ম্মা দেশেও চরম দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দিদিগকে মুক্ত করিতে তত্তৎ-স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট পশ্চাৎপদ হন নাই। কোথাও ইহা বাধা সৃষ্টি করে নাই। বাঙালার এ বাধা এত দুর্ল্লঙ্ঘ্য মনে করিবার কি বিশিষ্ট কারণ আছে?

বাঙালার রাজনৈতিক বন্দী অনেকেই হিংসামার্গ পরিহার করার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিশ্চয় মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা মুক্তি-লাভের পর স্বীকৃতি-পালনে বিমুখ হইয়াছেন, এরূপ মনে করার কোনও কারণ পাওয়া যায় নাই। দেশের রাজনৈতিক আব্‌হাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হিংসা-নীতির পরিস্থিতি এখন আর নাই। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকেরই হাতে অনেকখানি আসায়, যতখানি এ পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে, বাঙালায় তাহা ঘটে নাই। কিন্তু না ঘটিলেও, ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। বাঙালার নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলে কংগ্রেস পক্ষ না থাকিলেও, বৈপ্লবিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন-সাধনে কংগ্রেস, অকংগ্রেস সকলেই এখন সম-মত। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলই রাজনৈতিক বন্দিগণের মুক্তি-বিধানে অকংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দেশবাসীর এক প্রধান বেদনার কারণ অপসারিত করিয়া, নূতন অবস্থা সৃজনে অনায়াসে সহায়তা করিতে পারেন এবং ইহাতে জনসাধারণের প্রীতি-আকর্ষণেও তাঁহারা সমর্থ হইবেন। দেশ চায়—বিপ্লব-নীতিতে আর আস্থাবান্ নহেন যাঁহারা, এমন সকল রাজনৈতিক বন্দীরই মুক্তি। এ বিষয়ে কার্পণ্যে রাজনীতিক লাভ নাই—মুক্তিস্রোতঃ যখন অনিবার্য্য, তখন কালবিলম্বে অবরুদ্ধ তরুণগণের মনোবৃত্তি-পরিবর্ত্তনে অনর্থক বিলম্ব ঘটিবারই সম্ভাবনা।

সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ

সুভাষচন্দ্র কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেসী দলের কর্ম্মনীতি অচল দেখিয়া তিনি তিক্ত হৃদয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—এই কথা তাঁহার নিজ উক্তি হইতেই বুঝিতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়ের স্মৃতিবিজড়িত কলিকাতা কর্পোরেশনে আজ রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র তথা কংগ্রেসের কার্য্য-নীতির ঠাঁই নাই, ইহা কর্পোরেশনের পক্ষে গৌরবের কথা নহে। সুভাষচন্দ্র চাহিয়াছিলেন—কর্পোরেশনের কংগ্রেসী সভ্যবৃন্দ একযোগে কংগ্রেসের কার্য্যনীতি অনুসরণ করিয়া, কর্পোরেশনে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ও গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবেন—কিন্তু তাঁহার সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। কংগ্রেসের নামে যাঁহারা কর্পোরেশনে প্রবেশ করিয়া, এক্ষণে তাহার সুনাম ও প্রভাব উভয়ই ক্ষুন্ন করিতেছেন, তাঁহাদের এই চরিত্র কখনই প্রশংসনীয় নহে। বিশেষতঃ, শিক্ষয়িত্রীঘটিত ব্যাপারের যে ভাবে যবনিকাপাত করা হইয়াছে, তাহাতে শুধু কর্পোরেশনের কংগ্রেস-পক্ষ নহে, সমগ্র কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল-মণ্ডলীর উপর সহরবাসীর আস্থা ও সহানুভূতি বিচলিত হইয়া পড়ে।

এই শিক্ষয়িত্রীঘটিত ব্যাপারে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তে জনসাধারণ আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

কর্পোরেশনের নিয়োজিত বিশেষ তদন্তকমিটীর অনুসন্ধান-পদ্ধতি অনেকেরই আস্থাজনক হয় নাই। স্যার পি, সি, রায় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ ইহার উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষকে পুনরায় তদন্তের ব্যবস্থা ও শিক্ষাসচিবের কর্ম্মচ্যুতি-বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। কর্পোরেশন সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। সুভাষচন্দ্রও কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন—আলোচনার মুখ বন্ধ করিলে জনসাধারণের সন্দেহের মাত্রাই বৃদ্ধি পাইবে। তিনিও তাই পুনরায় তদন্তের ব্যবস্থা করিতে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করেন—কেন না, শিক্ষা-সচিবের অপরাধ সম্বন্ধে কর্পোরেশন যদি নিঃসন্দেহ হইয়াও থাকেন, তাহা হইলেও জনসাধারণের চিত্তে সেই আস্থা-সঞ্চারের জন্য পুনরায় তদন্তের প্রয়োজন আছে। ইহাতে মিউনিসিপ্যাল-মণ্ডলীর 'প্রেষ্টিজ' খর্ব্ব হইবে না, বরং তাঁহারা জনসাধারণকে সপক্ষে পাইবেন, ইহারই সম্ভাবনা বেশী। পক্ষান্তরে, যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতেও একটা অবিচারের দায় হইতে কর্পোরেশন রক্ষা পাইবে।

কিন্তু কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের এই যুক্তিসঙ্গত দাবী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেদের সিদ্ধান্ত বিনা তদন্তেই বজায় রাখিলেন। ইহাতে তাঁহারা শুধু সুভাষচন্দ্রকে হারাইলেন না, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সমগ্র জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন, এই আশঙ্কাও অমূলক নহে। যে ক্ষেত্র জন-সেবার ক্ষেত্র, সেখানে জনসেবার মূল নীতি গণনারায়ণের ন্যায্য দাবী অস্বীকার করিলে, তাহাতে জনসাধারণ দীর্ঘ দিন আস্থা রক্ষা করিতে পারেন না। কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের যুক্তিমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে, এখনও রাষ্ট্রপতির মর্য্যাদা-রক্ষা নহে, দেশের এই গৌরবার্হ প্রতিষ্ঠানটীকে কলুষ ও অগৌরবের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন।

হিন্দী প্রচার

ভারতে ইংরাজীশিক্ষার প্রচলন যুগের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। বাঙালার প্রাতঃসূর্য্য তুল্য প্রতিভাশালী রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় যুগ-প্রবর্ত্তক যখন সংরক্ষণশীল পক্ষের প্রবল বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করেন, সে কার্য্য যুগ-শক্তির সমর্থনেই সিদ্ধ হইয়াছিল। আজ সারা ভারতে ইংরাজীভাষা ভারতবাসীর রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। শতবর্ষ পরে, কংগ্রেস ইংরাজের অনুকরণে নিখিল ভারতে, দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীর প্রচলনে উদ্যত হইয়াছেন। এই উদ্যমের মূলে যুগ-প্রয়োজনের অনিবার্য্য অনুভূতি পাওয়া যায় না। ইহা ইংরাজের প্রতিক্রিয়া বলিয়াই আমাদের মনে হয়। হিন্দীভাষার সপক্ষে বা বিপক্ষে রাষ্ট্রভাষা হইবার কি যোগ্যতা-বিচার আছে, আমরা সে প্রসঙ্গ এখানে তুলিব না। মান্দ্রাজের কুশপুত্তলিকাদাহের পর, বাঙালায় হিন্দী চালাইবার প্রয়াস আমাদের হাসিয়াই উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করে। কলিকাতা কর্পোরেশনে যে অবাঙালী মহিমা এই প্রস্তাব তুলিয়া, বাঙালীর মনোভাব এই সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে শুধু এই জন্যই অভিনন্দিত করিতেছি।

কলিকাতার প্রধান নাগরিক মিঃ জ্যাকারিয়া স্বয়ং একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান হইয়া এই প্রসঙ্গে যে সারগর্ভ আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশ করেন, আশা করি, প্রচারক-গণের উৎসাহ-নিরোধের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। মিঃ জ্যাকারিয়া বলিয়াছেন—বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের উত্তরাধিকারী জাতি হিন্দী শিক্ষা করিতে গিয়া শক্তির অপচয় করিবে কেন, তাহার কোনই যুক্তি নাই। তিনি বাঙালার হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই মাতৃভাষায় সমধিক অনুরাগী হইতেই পরামর্শ দিয়াছেন। যে দুর্দ্দৈবে "বন্দেমাতরমে"র অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাহারই অন্য এক ভঙ্গী—এই হিন্দীভাষার প্রচলন। বাঙালী মান্দ্রাজের ন্যায় কুশপুত্তলিকা দহন করিবে না বটে, কিন্তু "বন্দেমাতরম্" বলিয়া বঙ্গজননীর কণ্ঠে বঙ্গভাষারই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিয়া মাতৃপ্রেমে উন্মাদ হইবে। রাষ্ট্র গড়িলে, রাষ্ট্রীয় ভাষা আপনিই আসিবে—সেখানে কাহারও মাতৃভাষার গলা টিপিয়া রাষ্ট্রভাষা-প্রচলনের এই কৃত্রিম আন্দোলনের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

আমরা হিন্দীশিক্ষার বিরোধী নহি—কিন্তু হিন্দী-

প্রচারের এই রাজনৈতিক কূট চাল এক-জাতীয়তা-গঠনের পক্ষেই দারুণ বাধাস্বরূপ বলিয়া মনে করি। বাঙালীর পক্ষ হইতে আমরা এই প্রপোগ্যাণ্ডার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। কমিউন্যাল এওয়ার্ড, বন্দেমাতরম্, তারপর এই হিন্দীভাষার গলাধঃকরণ নীতির একত্র ত্র্যহস্পর্শ যোগ বাঙালী কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিবে না।

বাঙালার আর্থিক শোষণ

বাঙালা ভারতের কামধেনু। বাঙালী ছাড়া আর সকলেই তাহার আর্থিক রস শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে। বাঙালা হইতে অবাঙালীর বার্ষিক অর্থশোষণের পরিমাণ সহযোগী "প্রবাসীর" প্রদত্ত অর্থ ঠিক হইলে, উহা ৮ কোটী (?) টাকার কম হইবে না। ইহার উপর মেষ্টন এওয়ার্ড আছে—অটো নিমেয়ারের অভিমত বিদ্যমান আছে। অর্থশাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন—বাঙালার ৩৮ কোটী টাকা রাজস্ব যদি সবখানি বাঙালার জন্যই ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে বাঙালা সব চেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশে পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু বাঙালাকে এই ৩৮ কোটী টাকার মধ্যে ২৬ কোটী টাকাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দিতে হয়। অবশিষ্ট ১২ কোটী মাত্র টাকায় ৫০ কোটী নরনারীর জন্য খরচ হইলে, মাথা প্রতি ২৷৷০ টাকা মাত্র হয়। পক্ষান্তরে, এই ক্ষেত্রে প্রতি বোম্বাইবাসী পায় ৮৲ টাকা, পাঞ্জাবী পায় ৫৷৷০ টাকা ও মাদ্রাজী ৪৲ টাকা। বাঙালার প্রতি ইহা অবিচার নহে কি? এই খরচের মধ্যে আবার জাতি গঠনের ব্যয় তুলনা করিলে, বোম্বাই যেখানে পায় জনপ্রতি ৩৲ টাকা, মাদ্রাজে ২৸০ আনা, সেখানে বাঙালা পায় ৸৴০ আনা মাত্র। বোম্বাই প্রভৃতির তুলনায় বাঙালার রাজস্বের অন্ততঃ ৩০ কোটী টাকা তাহার পাওয়া উচিত। অন্যদিকে বাঙালীর উপর খাজনার বোঝা সব চেয়ে গুরুতর। এই খাজনার হার বাঙালায় জনপ্রতি ৭৷৷০ টাকা; যেখানে যুক্তপ্রদেশে ৩৷৷০ ও বিহারে মাত্র ১৸০ আনা। এখানেও বাঙালী যথেষ্ট অবিচার ভোগ করে।

বাঙালাকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য তাহার রাজস্বের দুই তৃতীয়াংশের অধিক দিতে হইবে কেন, তাহার কোনও যুক্তি নাই। আশ্চর্য্য এই ধারা গোড়া হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বাঙালীর প্রাদেশিক স্বার্থ বলি দিয়াই বরাবর কেন্দ্র গভর্ণমেণ্টকে পুষ্ট করিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত তথ্য হইতে পাওয়া যায়—বৃটিশ শাসন সূচনার আদিযুগে ১৭৮০ হইতে ৮৩ খৃষ্টাব্দ এই তিন বৎসরে বাঙালা মাদ্রাজকে দিয়াছে ২ কোটী টাকা। গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্র গভর্ণমেণ্টকে বাঙালা যাহা দিয়াছে, তাহা মাদ্রাজ, বোম্বাই বা যুক্তপ্রদেশের প্রদত্ত পরিমাণের ত্রিগুণ। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কেন্দ্রে প্রদত্ত সমগ্র পরিমাণের শতকরা ৪৫ অংশ একা বাঙালাকেই দিতে হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রে বোম্বাই ছাড়া আর সকল প্রদেশ দিয়াছে মাত্র শতকরা ১৫৲ টাকা। বর্ত্তমানেও বাঙালার আয়করের শতকরা ৩৬৲ টাকা কেন্দ্র গভর্ণমেণ্টকে দিতে হইতেছে।

স্যার জন এণ্ডারসন বাঙালার পাট-কর লব্ধ আয় যাহা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে চলিয়া যাইত, তাহা হইতে ১২ কোটী টাকা উদ্ধার করিয়া বাঙালার কিছু ঘাটতি পূরণ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও বাঙালার সকল বিভাগেই টাকার প্রয়োজন। শিক্ষার জন্য বোম্বাই যাহা ব্যয় করে, তাহার $\frac{১}{১০}$ অংশ মাত্র বাঙালী ব্যয় করে, এমন কি মাদ্রাজের $\frac{১}{৩}$ অংশ। স্বাস্থ্যের জন্য—বাঙালার ব্যয় বোম্বাই এর অর্দ্ধেক এবং কৃষি প্রভৃতি জনহিতকর অন্যান্য কর্ম্মগুলির জন্য $\frac{১}{৫}$ অংশ মাত্র। শুধু বাঙালার আইন ও শৃঙ্খলার জন্য ব্যয় সকল প্রদেশের ব্যয়ের মাত্রা ছাড়াইয়া যায়—সেখানে ২০০০ অন্তরীণের জন্য তাহার ব্যয় অর্দ্ধ কোটী। বাঙালার কৃষিবিভাগে, জলনিকাশ বিভাগে অর্থাভাবে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িলেও কোনও কার্য্যকরী প্রস্তাব গৃহীত হয় না—অথচ এই টাকা জলস্রোতের ন্যায় বাহিরে চলিয়া যায়, এ স্রোতঃ রুদ্ধ হইতেছে না।

বাঙালার অপহৃত ভূখণ্ড, ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব—সমস্তই আজ বাঙালীকে ফিরাইয়া দেওয়া হউক। আমরা রাধাকমল বাবুর এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।



ফুটবল-লীগ—১৯৩৮-এর লীগের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী—কাল্‌কাটা ফুটবল ক্লাবের দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া যাওয়া। এমন দিন ক্যালকাটার গিয়াছে, মাত্র সাতজন খেলোয়াড় লইয়া 'দিন কিনিয়া' তাহারা ঘরে ফিরিয়াছে। কত গৌরবময় কীর্ত্তি ও কাহিনী ক্যালকাটাকে ঘিরিয়া জড়িত রহিয়াছে!

প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগে ভবানীপুর 'নামিয়া যাওয়ার' অপমান হইতে রক্ষা পাইল। তাহার পরে? ঘরের ছেলেকে মনের মত করিয়া এক বৎসরে গড়িয়া তোলা কি এত কঠিন? ভবানীপুরের সময়, সুযোগ অর্থের অভাব নাই—একবার ভাল করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি?

'আমাদের অনুমানই শেষে বর্ণে বর্ণে মিলিল—মোহামেডানকে (এ বৎসর তাহাদের খেলা অনেক অপকৃষ্ট হইলেও) স্থানচ্যুত করিতে পারিল না অন্য কোনও দল। দ্বিতীয় স্থানে, কাষ্টমস—পুরুষকারের বলে। প্রধানতঃ হকি-ধুরন্ধর এই মোহামেডানকে যেভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে সত্যই তাহা বিস্ময়কর। দুই দল 'গলায় গলায়' হওয়াতে 'বাড়তি' খেলায় মোহামেডান্ 'তরিয়া' যায়—বাহাদুরী বেশী কাহার? যে সঙ্ঘ-ঐক্যের বলে মোহামেডান্ শেষ-জয়ী হইল—ফুট্‌বল-ধুরন্ধর না হইলেও সেই সঙ্ঘ-ঐক্যই তাহাদিগকে জয়ীর যোগ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগণিত করিল। তৃতীয় স্থানে—প্রথম বিভাগে সদ্য উত্তোলিত দল, পুলিশ। এ দল 'বাঘাভাল্লুক' মারিয়াছে যে ভাবে—'লীগ মারিলেও' আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম না। ইষ্টবেঙ্গলের এত আয়োজন, এত অর্থব্যয়, সব বৃথা হইয়া গেল। 'আশার ছলনে ভুলি' যাহা করিবার নয় তাহা করিলে যাহা হয়! ইহার পরে মোহনবাগান প্রভৃতির স্থান। আপনার ওজন বুঝিয়া মোহনবাগান



লীগ কাপ্—মোহামেডান্ স্পোর্টিং ক্লাব উপর্যুপরি পাঁচবার জয়লাভ করিয়াছে



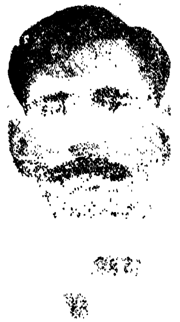
মোহামেডান স্পোর্টিং-এর কয়েকজন কুশলী খেলোয়াড়

'হাঁপাহাঁপি করা' যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। তবে সাবধানতার মাত্রাটা কিছু বেশী হওয়াতে তাহাদের চিরাভ্যস্ত 'ফাঁকের ঘর'ও সময়ে সময়ে ফাঁক এবার পড়িয়া গিয়াছে। বাহাদুরী কিন্তু এরিয়নের—এক ঢোল এক কাঁসি সম্বল করিয়া, 'রামের মায়ের গেল' মধ্যে মধ্যে ইহারা যাহা দেখাইয়াছে তাহার তুলনা নাই। মোহামেডানের জয় সাফল্যের মূলে নিহিত জাতি ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার্থ সঙ্ঘের অনমুকরণীয় এক প্রাণতা — ক্রীড়ামোদী সকলেরই যেন ইহা স্মরণে থাকে।





এস, চৌধুরী (মোহনবাগান) বেণীপ্রসাদ



সামাদ (ই, বি, আর)





কে, দত্ত (ইষ্টবেঙ্গল) লক্ষ্মীনারায়ণ

'শীল্ড্-শিকার'—রক্ষা 'হালুম'-এর ভয় নাই। কাজেই 'নাকের উপর টাকা ধরিয়া' না দিয়া শিকারীর সাজে নামিয়া পড়ুক যাহার ইচ্ছা। একদিকে এই, অন্য দিকে 'টাকা কবলাইয়া' 'পাঁচু ফুটে' গোরা খেলোয়াড়ের দল আনাইয়া মুরুব্বিদের আসর সাজান—তাহার পরে সল্লা করিয়া 'কাগজবাজি'—"এমন হয় না, হবে না"। ইহার অন্তঃসারশূন্যতা ধরাইয়া দিই আমরা এবং সেই সঙ্গে ইহাও দেখাইয়া দিই সাধারণের অর্থ কি ভাবে অপব্যয়িত হইয়া বঙ্গদেশের ফুটবল্ খেলার অনিষ্ট সাধন করিতেছে। আন্দোলনের তীব্রতা বা অন্য যে কারণেই হউক, এবার শুনা গেল—শীল্ডে প্রতিযোগীর দল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লওয়া হইবে। 'ভাত ছড়ান'র বহরও তত দেখা গেল না। শেষে কিন্তু 'নাকের উপর টাকা ধরিয়া দেওয়ার দল' বড় কম দেখা গেল না—"যে বুঝহ, জানহ সন্ধান"।

খেলার ছকের উপরের দিকে মোহামেডনের কাজ—'কলা গাছ কাটন'। চতুর্থ বা তাহার পরের গণ্ডীতে পুলিস বা কাষ্টমসের সঙ্গে সম্ভবতঃ তাহাদের খেলা পড়িবে। নীচের দিকে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলে দেখা শুনা হইবে সম্ভবতঃ তৃতীয় গণ্ডীতে। এবার শিল্ডজয়ীকে বিশেষ ধীরতা সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে।

"ফুটবল্-খেলোয়াড়"—গতবারে প্রকাশিত তালিকায় ভ্রম বশতঃ "শচীন ব্যানার্জ্জী মৃত" বলিয়া উল্লিখিত। ক্যাপ্টেন ব্যানার্জ্জী সুস্থ শরীরে বাহাল তবিয়তে বিরাজ করিতেছেন—সুদীর্ঘকাল তিনি তাহা করুন, চক্ষু সার্থক করিয়া সকলে দেখুক।

অষ্ট্রেলিয়ায় আই-এফ্-এ—আই-এফ্-এর ১৭ জন খেলোয়াড় ১লা আগষ্ট কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ৬ই তারিখে কলম্বো হইতে অষ্ট্রেলিয়া রওনা হইবে। দলের নেতা কে, ভট্টাচার্য্য।



কে, ভট্টাচার্য্য—কাষ্টমস্-এর কুশলী খেলোয়াড় আই-এফ-এ'র নেতারূপে অষ্ট্রেলিয়া যাইতেছেন

লণ্ডনে "রাজপুতানা"—আমাদের কার্ত্তিক বসু প্রভৃতিকে লইয়া বিলাতে যে ভারতীয় দল খেলিতেছিল — খেলার মাঝামাঝি অর্থাভাবে তাহাদিগকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে, বড়ই দুঃখের কথা।

'টেষ্টে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া'—৬২ বৎসর পূর্ব্বে এই দুই মহাদেশের **প্রথম 'টেষ্ট'** খেলা হয় অষ্ট্রেলিয়ায়। জার্ম্মান মহাযুদ্ধের কারণে ১৯১২ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত নয় বৎসর 'টেষ্ট' বন্ধ থাকে। এই বন্ধ থাকা ব্যতীত অদ্যাবধি প্রতি বৎসরেই এই প্রতিযোগিতা হইয়াছে—হয় ইংলণ্ডে, নয় অষ্ট্রেলিয়ায়। প্রথম টেষ্টের নেতা—ইংলণ্ডের পক্ষে লিলি-হোয়াইট, ১৯৩৮-এর নেতা—ইংলণ্ডের পক্ষে হ্যামণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ব্রাড্ম্যান্। ১৯৩৭ পর্য্যন্ত টেষ্টের

সংখ্যা ১৩৯। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড জয়ী হইয়াছে ৫৪ বার (ইংলণ্ডে ৩৪ বার, অষ্ট্রেলিয়ায় ২০ বার) অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হইয়াছে ৫৬ বার (অষ্ট্রেলিয়ায় ৪১ বার, ইংলণ্ডে ১৫ বার) এবং খেলার ফল সমান সমান হইয়াছে ২৯ বার।

'টেষ্টের তোড়জোড়'—এ বৎসরের প্রথম টেষ্টের পূর্ব্বে 'হাত শানাইতে' ইংলণ্ডের বিভিন্ন দল ও অষ্ট্রেলিয়ার ১১টী খেলার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার জয়াঙ্ক সাত। তন্মধ্যে পাঁচবার তাহারা জয়ী হইয়াছে একটী করিয়া পূরা দান না খেলিয়াই। বিপক্ষের বল করার তোড়ে ইংলণ্ডের দল সমূহ চক্ষে 'ধুতুরা ফুল' দেখিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শত-মারদৌড় দিতে পারিয়াছে মাত্র একজন একবার। সতেরবার শতমারদৌড় দিয়াছে কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন খেলোয়াড়েরা। টেষ্টের পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার এই তোড়জোড়ে ইংলণ্ডের জয়াশা অনেকের কাছে সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হইয়াছে। তবে টেষ্টের জন্য ইংলণ্ডের পক্ষে নির্ব্বাচিত হ্যামণ্ড, ভেরিটি, হার্টন্, এমিস্, রাইট্ এবং পেণ্টার টেষ্টের পূর্ব্বের কোনও খেলায় খেলে নাই।

প্রথম 'টেষ্ট'—গত বৎসরে অষ্ট্রেলিয়া কর্ত্তৃক পরাজিত এবং এ বৎসরেও ইংলণ্ডের বহু দল তাহাদের হস্তে ভীষণভাবে পরাভূত হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ডের অধিবাসী স্বদেশের উপর আস্থা হারায় নাই, তাহার প্রমাণ ন্যূনাধিক ৩৫,০০০ হাজার ব্যক্তির নটিংহামের ট্রেণ্ট্ ব্রিজের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে সমাবেশ। দেশবাসীর অপরিসীম উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া ইংলণ্ড ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ। ওদিকে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রেলিয়াবাসী খেলার প্রতি মুহূর্ত্তের ঘটনা জানিতে 'রেডিও'র সম্মুখে সমাসীন। মুদ্রাক্ষেপে জয়ী হইয়া ব্যাটম্‌দারী আরম্ভ হইল ইংলণ্ডের। অপূর্ব্ব কুশলতাসহকারে চলিল ব্যাটমদারী। অষ্ট্রেলিয়ার বলন্দাজী ব্যাটম্‌দারদের রাখিতে পারে না কিছুতে। ব্যাটমদারেরা নিদ্রাভঙ্গ সিংহের ন্যায় যেন দণ্ডায়মান। মাত্র ৮ জন মোড় হইয়া মোট মারদৌড়ের সংখ্যা হইল ৬৫৮। তাহার মধ্যে করিল হার্টন্ ১০০, বার্ণেট্ ১২৬, পেণ্টার ২১৬ (অমোড়) ও কম্পটন্ ১০২। সব খেলোয়াড় না খেলাইয়া ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াকে খেলা ছাড়িয়া দিল। ব্যাটম্‌দারী করিয়া অষ্ট্রেলিয়া করিল ৪১১—ইহার মধ্যে ম্যাকেবের হইল ২৩২। খেলার নিয়মানুসারে ব্যাটম্‌দারী করিতে হইল আবার অষ্ট্রেলিয়াকে। এবার তাহারা ৬ জনে করিল ৩২৭। ইহার মধ্যে ব্রাউনের অংশ ১৩৩ ও ব্র্যাড্‌ম্যানের ১৪৪ (অমোড়) এই অবস্থায় খেলার সময় উত্তীর্ণ হইল। খেলার ফল হইল সুতরাং সমান-সমান। 'হারা' অবস্থার এইভাবে গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে খুবই বাহাদুরীর কথা। জিতিয়াও জিতিল না ইংলণ্ড। ইহা কিসের লক্ষণ?

দ্বিতীয় টেষ্ট—প্রথম টেষ্টের ন্যায় দ্বিতীয় টেষ্টেরও খেলার ফল হইল সমান সমান :—

ইংলণ্ড—৪৯৩, ৩৮৮ (৫ জন মোড় হইলে খেলা ছাড়িয়া দেওয়া হয়)।

অষ্ট্রেলিয়া—৪২২, ২০৩ (৬ জনে)।

চাক্তি চালায় জিতিয়া ইংলণ্ড ব্যাটম্‌দারী সুরু করিয়া দিল—ধীরতা ও আত্মনির্ভরতার সহিত ব্যাটম্‌দারী চলিতে লাগিল। অষ্ট্রেলিয়ার নিপুণ-বলন্দাজী হ্যামণ্ড কার্য্যকরী হইতে দিল না—৪৯৩-এর ভিতর একা হ্যামণ্ড করিল ২৪০।

অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাট্ করিবার পালা আসিলে অষ্ট্রেলিয়াও উ'তোর' দিল বেশ ৪২২। হ্যামণ্ডের ব্যাটম্‌দারী ম্লান হইয়া গেল, ব্রাউনের ২০৬, অমোড়ের পাশে। দুই দলের প্রথম দানের খেলার পরে ইংলণ্ডের হাতে রহিল ৭১ মার-দৌড়। দ্বিতীয় দানে ইংলণ্ডের কম্পটন ৭৬ অমোড় হওয়ায় একটা সঙ্গীন অবস্থা হইতে ইংলণ্ড রক্ষা পাইল। ইংলণ্ডের ব্যাটম্‌দারের ঘন পতনে বাধা পড়ে কম্প্‌টন্ 'স্থিত-বিত' হইয়া বসিতে। দ্বিতীয় দানে অষ্ট্রেলিয়ার ২০৩-এর মধ্যে ব্রাড্‌ম্যানের দান—১০২ (অমোড়।)

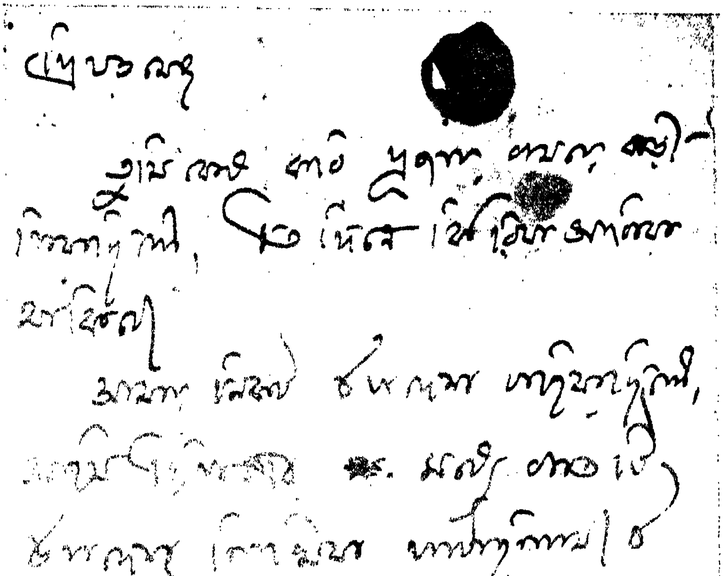
দ্বিতীয় টেষ্টেও বলন্দাজী অপেক্ষা ব্যাটম্‌দারীর (উভয় পক্ষের) বাহারই দেখা গেল।

তৃতীয় টেষ্ট—হয় নাই। ম্যাঞ্চেষ্টারে অনবরত চারিদিন বৃষ্টি হওয়ায়—দুই দলের 'সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকাই' সার হয়।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ *

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৮ সালে পিতৃদেব জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) বেঙ্গল পুলিসের ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্র সাতটী উপদেশ সহ একখানি পত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রকে লিখিয়া পাঠান। নিম্নে পত্রখানির হাফটোন ব্লক এবং অবিকল উপদেশগুলি এখানে দেওয়া হইল।



বিশেষ উপদেশ

I. প্রথম প্রয়োজনীয় কথা। সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্তপক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় না।

II. দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না। কখন কোন কাজ পড়িয়া না থাকে।

III. উপরওয়ালাদিগের আজ্ঞাকারিতা। তাহাদিগের নিকট বিনীতভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না।

IV. আপনার কাজের Rules & Laws বিশেষরূপে অবগত হইবে।

V. কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিষের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে তাহা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না বা অধিনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

VI. সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে সদ্ব্যবহার দ্বারা বশীভূত করিবে।

এ পদ দুর্লভ ছিল এবং যথেষ্ট সম্মানার্হ ছিল। জ্যোতিশ্চন্দ্র পদে নিযুক্ত হইয়া, পিতৃব্য বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট পুলিশের কার্য্য পরিচালনার কিছু উপদেশ চাহিলেন। তদুত্তরে

কেহ শত্রু না হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়। তাহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই।

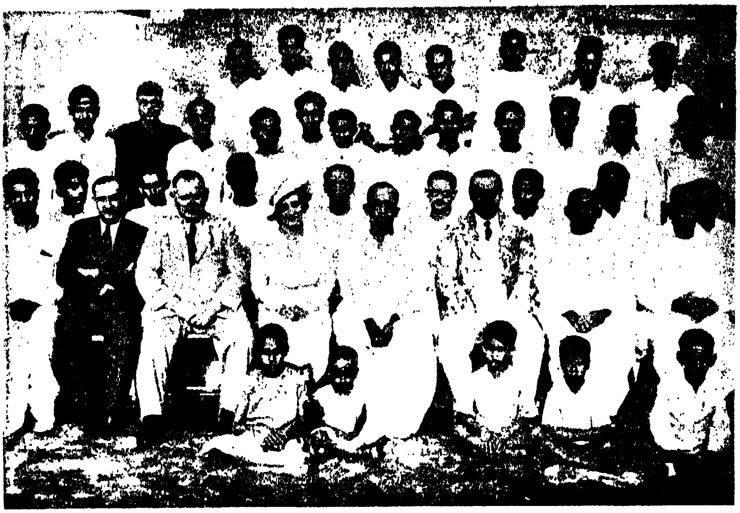
VII. নিষ্কারণে ভীত হইবে না।

* লেখক "প্রবর্ত্তকে" বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য অপ্রকাশিত রচনা "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে" লিখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সাময়িকী

যক্ষ্মা-নিবারণী তহবিল

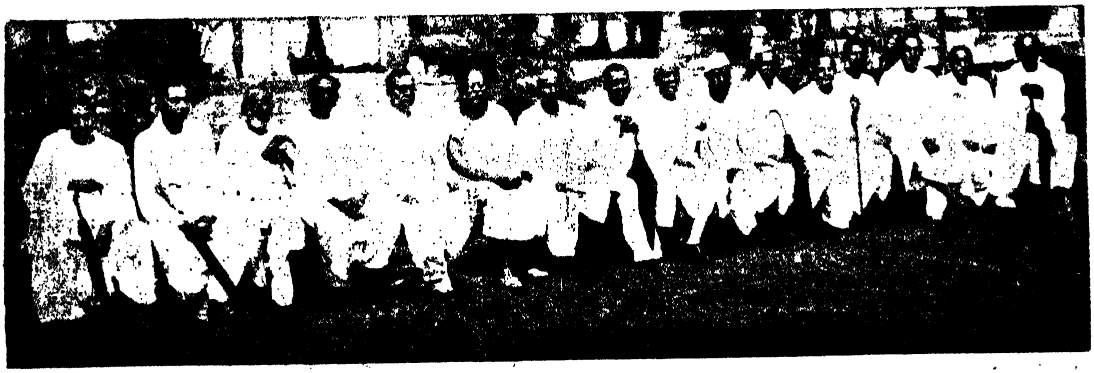
বিগত ২৫ শে জুন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে "কিং এ্যাম্পারারস্ এন্টি টি-বি ফণ্ডে" মোট ৩,৬৪,১৭১।৵৫ টাকা আদায় হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন এই তহবিলে ৫০,০০০৲ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সম্প্রতি এই দেশে ক্ষয়রোগ যেরূপ দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে তাহাতে দেশবাসীর এই মহান উদ্দেশ্যে মুক্তহস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।



৯ই জুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষা-কেন্দ্রের পরিসমাপ্তি উৎসব উপলক্ষে পরিষদ্-সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রদত্ত প্রীতি-সম্মেলনে উপস্থিত অতিথী ও ছাত্রবৃন্দ

শ্রীশ্রীরাধারমণ সাধনাশ্রম

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন কর এম-এ প্রমুখ জনকয়েক ত্যাগী সেবকের প্রচেষ্টায় এই আশ্রমটি নদীয়া-রাজপুর গ্রামে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের সেবা ও সাধনার আব্‌হাওয়ায় ঐ পল্লী অঞ্চলে নূতন প্রাণ ও প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে। বিগত ১৯শে আষাঢ় আশ্রম-বিগ্রহ শ্রীমৎ রাধারমণ দেবের ৪৫শ জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আশ্রমবাসী ও স্থানীয় নরনারী অপূর্ব্ব পুলকানুভূতির স্পর্শে যেন মাতিয়া উঠে। এইরূপ আশ্রম আজিকার পরিত্যক্ত পল্লী অঞ্চলে যত বেশী হয় ততই মঙ্গল।



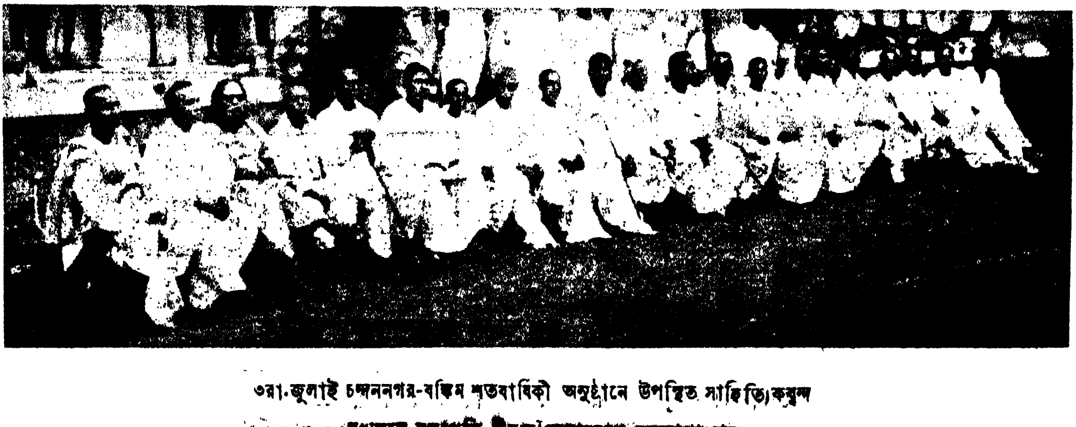
১লা জুলাই চন্দননগর-বঙ্কিম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দ: সভার উদ্বোধন করেন রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন (দক্ষিণ হইতে অষ্টম) এবং পৌরহিত্য করেন মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ (বাম হইতে সপ্তম)।



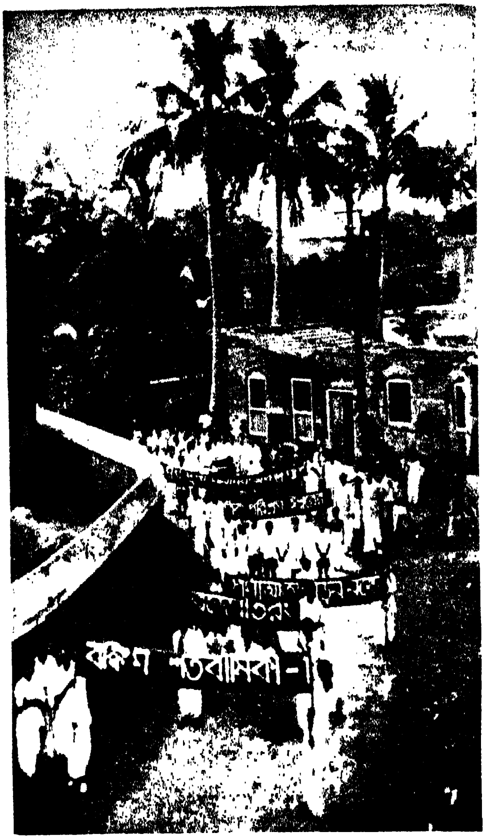
রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র চট্টল প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বিভিন্ন কর্ম্ম-কেন্দ্র পরিদর্শন করিতেছেন

চট্টল প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে রাষ্ট্রপতি

গত ১১ই জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক মৌলভি আসরফ্ উদ্দীন চৌধুরী সাহেব সমভিব্যাহারে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র চট্টল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বিভিন্ন শিক্ষা ও কর্ম্মকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। সঙ্ঘ-সভ্যবৃন্দের প্রদত্ত অভিভাষণের উত্তরে রাষ্ট্রপতি বলেন, আপনারা ত্যাগ, চরিত্রবল এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারাই আপনাদের মহান্ উদ্দেশ্যের সিদ্ধিপথে এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন এবং জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আপনারা খদ্দর-প্রচার, জাতীয় শিক্ষাদান প্রভৃতি কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতিকে নিজেদের চেষ্টা ও ত্যাগের দ্বারা যে ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছেন তাহাতে দেশের কংগ্রেসকর্ম্মী ও জনসাধারণের সহানুভূতি আপনারা পাইবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।



৩রা জুলাই চন্দননগর-বঙ্কিম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দ
মধ্যস্থলে সভাপতি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



চন্দননগর বঙ্কিম শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা



প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রী৺রাধারাণী দেবী—৬ই আষাঢ় নিখিল বাংলার বিভিন্ন সঙ্ঘ-কেন্দ্রে ইঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৺নরেন্দ্রকিশোর—

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ মৈমনসিংহ কেন্দ্রের প্রাণ-স্বরূপ ৺যোগেন্দ্রকিশোর লোহের কনিষ্ঠ সন্তান নরেন্দ্রকিশোর অকালে পরলোকগমন করে। চন্দননগর প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনে সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত। স্বভাব-সুন্দর, অমায়িক, মেধাবী ছাত্র হিসাবে সে সকলেরই প্রিয় ছিল। শোকসন্তপ্তা বিধবা জননীকে বিধাতা সান্ত্বনা-প্রদান করুন।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

পরিচালক ও প্রকাশক : শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায়, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



২৩শ বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা

প্রবর্ত্তক

ভাদ্র—১৩৪৫



নবদীক্ষা

দেহেন্দ্রিয়ের শোধনে আত্মার বিকাশ। সাধন—দেহের, আত্মার নয়। সাধনার প্রথম সোপান—শুদ্ধি। দেহেন্দ্রিয় শুদ্ধ হইলে, মহৎ-তত্ত্বের প্রকাশ হয়। এই মহৎই বিজ্ঞানময় কোষ। ইহা শুদ্ধ জ্ঞানঘন, অবিকৃত কর্ম্মযন্ত্র। মূল প্রকৃতি বা মহামায়ারই ইহা নিত্য সৃষ্টি। অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রা—বিজ্ঞান হইতেই সৃষ্ট হয়। এই অহং—পাকা আমি বা বিজ্ঞানময় আত্মচৈতন্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই জ্ঞেয়-স্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চ বিষয় চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি। এই পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিত্য সৃষ্টি পৌঁছিয়াছে—যাহাকে সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইহার পরেই বিকৃতি বা বৈকারিক সৃষ্টির আরম্ভ। ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি প্রকৃতির ষোড়শ বিকার। চক্ষুঃ, কর্ণ, জিহ্বা, নাসা ও ত্বক্ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; জ্ঞান-কর্ম্ম উভাত্মক মন—এবং ক্ষিত্যপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম্, এই পঞ্চভূত—ইহা লইয়া বিকারের জগৎ।

আসক্তিই দেহের মূল। যখন বৈকারিক মন ও দেহেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ইহা প্রকাশিত হয়, তখন আসক্তিও বিকৃতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু মহৎ, অহং ও তন্মাত্রার জগতে আসক্তির স্বরূপ বা প্রকৃতি অবিকৃতই থাকে। দেহেন্দ্রিয়ের শোধনে সাধনে আসক্তিরই শোধন ও সাধন হয়। বিকৃত আসক্তি—যাহা দেহেন্দ্রিয়মূলক কাম নামে সচরাচর পরিচিত, তাহাই আত্মসমর্পণযোগে বিশুদ্ধ সম্বন্ধ-মূলক নির্ব্বিকার প্রেম ও আনন্দে পরিণত হয়। প্রেমের যে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার, তাহা মহদাদি অষ্ট প্রকৃতিরই মহাভাব ও নিগূঢ় রস-লীলা।

ইন্দ্রিয়ের একাদশ আসক্তি ইষ্টে উৎসর্গ করিয়া নবজন্ম লাভ কর—ইহাই আত্মসমর্পণযোগের নবদীক্ষা।

যুগ-সাধনা

কলিকাতায় যেদিন "ব্ল্যাক-আউট" ঘোষিত হইল, সেদিন নিথর শান্তিপূর্ণ নরনারীর প্রাণে এক অনাগত আতঙ্কের শিহরণ অনুভূত হইয়াছিল। বিদ্যুন্মালা-পরিশোভিতা রাজনগরী অকস্মাৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হইলে, বিস্ময় ও আনন্দে অস্পষ্ট পল্লীচূড়ে অসংখ্য মানুষের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ ও কলহাস্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলেও, অতর্কিতে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় অনেকে অভিভূত হইয়াছিল। কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে সুখের সংসার বিমানপোতের নিক্ষিপ্ত অগ্নি-গোলকে ছারখার হইবে, কত প্রাণ অকস্মাৎ বিনষ্ট হইবে—এমন কত দুঃখ-কল্পনায় অনেকে দুর্ভাবনা-মগ্ন হইয়াছিল। ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত নাগরিকদের বিপদের দিনে সতর্ক করার এই প্রথম আয়োজন অনেকের মনে মন্দ ভাগ্যের কারণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

আমরা "বন্দেমাতরম্" বলিয়া লাঠীবাজির ভয় পরিপাক করিয়াছি। কারা-যন্ত্রণার আতঙ্কও রাষ্ট্র-সাধনায় কাটিয়াছে। রাজপথে সাম্প্রদায়িক বিরোধে সৈনিকের গুলিচালনার আশঙ্কাও বতকটা গা-সহা করিয়া লইয়াছি। ধরাধরি, মার-পিট, রক্তারক্তি, শাসকের সক্রোধ রক্তাক্ত ভ্রূ-ভঙ্গীতে আর আমাদের ভয় নাই। কিন্তু পর-শত্রুর আক্রমণাশঙ্কা এতাবৎ বৃটেনের রাজ্য-শাসন-যুগে না থাকায় এই নূতন ভয়ে চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়ে। ভারতের সীমান্তে ইংরাজের সুরক্ষিত দুর্গরাজী—ভারতের পদপ্রান্তে জলধিবক্ষে ইংরাজের দুর্জ্জয় রণতরী—আমরা তাই এতদিন নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে বাস করিয়াছি। কিন্তু আজ দেখি—জল-পথ ও স্থল-পথ উত্তমরূপে সুরক্ষিত হইলেও, শূন্য-পথ নিরাপদ্ নহে। অনন্ত অন্তরীক্ষে দুর্গ-নির্ম্মাণ হয় না। রণ-বিমান শূন্যে ঘাঁটি করিয়া থাকিতে পারে না। মুক্ত গগন-তলে কোন দিক্ দিয়া যে কোন সময়ে শত্রুবাহিনী রাজ্য আক্রমণ করিবে, তাহার স্থিরতা কি? তাই এইরূপ সম্ভাবনাকাল উপস্থিত দেখিয়া আমরা যেন নিরুপায় মনে করিতেছি। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য রাজশক্তি এক মুহূর্ত্তে আমাদের আলো নিভাইয়া দিতে শিক্ষা দিতেছেন—ভূগর্ভ খনন করিয়া সত্বর গহ্বরপ্রবিষ্ট হইতে যাহাতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন অথবা সৌধপৃষ্ঠে বালুকাপূর্ণ বস্তা থাকে থাকে সাজাইয়া রাখার নির্দ্দেশ দিতেছেন। প্রগতির যুগে রাজ্যাক্রমণ-কালে আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অপূর্ব্ব বিধানেই করিতে হইবে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে স্থল-যুদ্ধে মুক্ত অসি ও ভীম অগ্নি-নালিকা ব্যতীত লোক বিধ্বংসী অস্ত্রসহ স্থল-পথে ট্যাঙ্কের ছুটাছুটির কথা শুনিয়াছি। জল-পথে ডুবোজাহাজের দুঃসাহসিক রণ-কৌশলের বিবরণ পড়িয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। বিমানে রণপোতের ছুটাছুটির সংবাদেও চমৎকৃত হইয়াছি। কিন্তু সেদিনও জলপথ, স্থল-পথ এবং শূন্যপথে নবযুগের বৈজ্ঞানিক রণনৈপুণ্য এমন বীভৎস, এমন ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয় নাই। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে ও প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহদমনে বিমানপোতের নৃশংস কৃতিত্বের কথায় আমরা বিচলিত হইয়াছিলাম! তারপর কি দেখিলাম, আবিসিনীয়ায় ইটালীর উড়োজাহাজ হইতে নির্দ্দয় বোমা-বর্ষণ—চক্ষে অন্ধকার লেপিয়া দিল। সুবিশাল চীনরাজ্যে জাপানের পৈশাচিক দৌরাত্ম্য জগৎকে বিচলিত করিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের লেলিহান দুরাকাঙ্ক্ষায় পৃথিবী আজ প্রেতভূমি। নরহত্যার আয়োজনে মনুষ্যত্ব হারাইয়া যায়—কেহ খেয়াল রাখে না। জল-পথে, স্থল-পথে শত্রু ধ্বংসের বিপুল ব্যবস্থার উপর আকাশে আকাশে রণপোতের হুড়াহুড়ি। ঘুমন্ত পৃথিবীর ধন-কড়ি কাড়িয়া লওয়ার নির্ব্বিবাদ সুযোগ একদিন ছিল—আজ নাই। তাই পশুবল বিস্তার করিয়া একজন অন্যের উপর হানা দেয়—অস্ত্রহীন নিরীহ ভারতের ভাগ্যে কি আছে কে জানে? এতদিন বৃটন ছিল জলে স্থলে অজেয়, এক্ষণে ইটালীর অভ্যুত্থানে ভূমধ্যসাগরে তাহার আধিপত্য কতক খর্ব্ব হইয়াছে। তবুও জল-পথে ও স্থল-পথে ভারত-রক্ষার উপায় যদিও হয়, ভারতের ঊর্দ্ধে অসীম নীলের সীমা

ঘিরিয়া ভারত-রক্ষার ব্যবস্থা সহজ হইবে না। রাজ-শক্তির দুর্ভাবনা শুধু নহে, প্রজার চিত্তও আতঙ্কে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। বিশ্বে শান্তিরক্ষা ও শান্তিস্থাপনের জন্য ইউরোপীয় জাতিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৃটেন ছিল ইহার সর্ব্ব-প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু ইটালী আবিসিনীয়া জয় করিয়া যখন অষ্টরম্ভা দেখাইল, স্পেনের বিদ্রোহী বীর ফ্রাঙ্কো জাতি-সঙ্ঘের তোয়াক্কা রাখিল না, জার্ম্মানী রোষ-কষায়িত লোচনে তাহার নষ্ট উপনিবেশসমূহ ফিরিয়া পাওয়ার দাবী জ্ঞাপন করিতে করিতে অষ্ট্রিয়া দখল করিয়া বসিল, জাপান বিশাল চীনের অর্দ্ধাংশ কুক্ষিগত করিয়া লইল, বৃটেনের উপদেশ ও মানা কেহই গ্রাহ্য করিল না—তখন এই শান্তি-সঙ্ঘের অসারত্ব আর ঢাকা রহিল না। উপহাসের ভাগী বৃটনই অধিক হইল। কিন্তু তবুও ধীর, শান্ত, সমাহিত চিত্তে বৃটন শান্তিরক্ষণে চিন্তারত। তাহার এইরূপ নিশ্চেষ্টতায় পরিহাসের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। শান্তিস্থাপনের আদর্শবাদ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাহার দুঃখ ছিল না; কিন্তু আজ তাহার সাম্রাজ্যবাদে ঘা পড়ার উপক্রম হইয়াছে। ধীর মস্তিষ্কে বৃটন অতঃপর আত্মরক্ষায় উদ্যত। সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টি লইয়া সে প্রস্তুত হইয়া উঠে ভবিষ্যতের জন্য। সে দুর্দ্দিন একদিন আসিবে, তাহা কিরূপ হইবে, কল্পনা করা যায় না। কিন্তু শক্তি সঞ্চয়ের মাত্রা যেমন বাড়িতেছে, তাহারই সহিত তাল রাখিয়া ইংরাজের গায়ের রক্ত তাতিয়া উঠিতেছে।

স্পেনের উপেক্ষা, জার্ম্মাণীর রক্ত-কটাক্ষ, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর হঠকারিতা বৃকোদরের ন্যায় এতদিন বৃটন পরি-পাক করিয়াছে। জাপানের চপেটাঘাতেও তাহার মুখে কথা বাহির হয় নাই। বিগত তিন মাসের মধ্যে স্পেনের বন্দরে বৃটনের ২২খানি অর্ণবপোত জেনারেল ফ্রাঙ্কোর উড়ো-জাহাজের বোঁমায় কতক ডুবিয়াছে, কতক অকেজো হইয়া গিয়াছে। একটা ক্ষুদ্র বিদ্রোহী সেনার অধিনায়ক পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতির প্রতি এইরূপ ব্যবহার করার ভরসা করে—বৃটনের অতিমাত্রায় শান্তি-রক্ষার আকাঙ্ক্ষা দেখিয়াই। বিশ বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশসিংহ এইরূপ অত্যাচার সহিত না। কিন্তু বিশ্বজাতির দুর্জ্জয় সাম্রাজ্য-পিপাসায় তাহার নিজ সাম্রাজ্যবাদ ক্ষুণ্ণ হওয়ার যখন সমূহ সম্ভাবনা, তখনই সে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। তাই আমরা দেখি—ইংরাজ এইবার বাহ্যতঃ কিল খাইয়া কিল চুরি করিতেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপুল শক্তি-সঞ্চয়ে তার প্রাণ উদাত্ত। এই বীরজাতি বালুরাশির ন্যায় উত্তপ্ত হয় না বটে, কিন্তু ভিতর হইতে উত্তাপ যখন বাহির হইবে, এই ভীম আগ্নেয়গিরি-বিদীর্ণ বিস্ফোরণে জগৎ পুড়িয়া ছাই হইবে। সেই আয়োজন অতঃপর ইংরাজ করিতেছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের কুরুক্ষেত্রে ইংলণ্ডের কৃতিত্ব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। অনাগত ঘোর সংগ্রামে তাহার রোষানল কি অনর্থ সৃষ্টি করিবে, আজ তাহা বলা যায় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমতুলা বৃটনের রণতরীসংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। সম্প্রতি ১৭খানি নূতন রণপোত, ৮৩খানি ক্রুইজার, ১১খানি উড়ো-জাহাজ-বহনের জলযান, ১৯৭টি ডেষ্ট্রয়ার এবং ৭৬টী সাবমেরিণ তাহার সংগ্রাম-শক্তিকে প্রবৃদ্ধ করিয়াছে। গত মার্চ্চ মাসের মধ্যে ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টনেজ জল-যুদ্ধের জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টনেজ রণতরী কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে বলিয়া ইংরাজ আশা রাখে। এই বৎসরেই ১৬ ইঞ্চ কামানবাহী ৪০ হাজার টনের রণপোত ইংলিশ চ্যানেলে ইংরাজের ইউনিয়ন জ্যাক্ মাস্তুলে উড়াইয়া দিয়াছে। এই সকল কিসের আয়োজন ?

সর্ব্বোপরি, ইংরাজের উড়োজাহাজের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা বিমানপোতের সংখ্যা অন্যান্য জাতিকে ছাড়াইয়া যাইবে, এমন আশা আছে। নূতন নূতন উড়োজাহাজের শিক্ষা-কেন্দ্র চতুর্দ্দিকে স্থাপিত হইতেছে। স্থলযুদ্ধের জন্য 'রঙ-রুট' চলিয়াছে। দুই লক্ষ সেনার উপর পুনরায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার সৈন্যবৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১ লক্ষ বিশ হাজার নৌ-সৈন্য এবং ৭০ হাজার উড়ো-জাহাজের রণ-কুশল যোদ্ধা সংগৃহীত হইয়াছে। আরও ৩০ হাজার শীঘ্রই হইবে। প্রয়োজন হইলে, ইংলণ্ড আজ যে কোন মুহূর্ত্তে রণ-সজ্জায় সুসজ্জিত ৫ লক্ষ ৭০ হাজার 'টেরিটোরিয়াল' সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিবে। ইহার উপর ইংরাজের ডোমিনিয়নগুলি আছে। ভারত আছে, মিশর আছে;

উপনিবেশসমূহ আছে। অক্ষম বলিয়া বৃটেন বসিয়া নাই। হিমাদ্রির ন্যায় তাহার এই স্থৈর্য্য শান্তিকামীর লক্ষণ নয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

ইহা একদিক্, অন্য দিকের কথা। উহা এক বিপরীত দৃশ্য। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা বলিতেছি। সমগ্র জগতে রণ-ভেরী বাজাইয়া যখন দুর্দ্ধর্ষ জাতিসঙ্ঘ রক্ত-পিপাসায় উন্মত্ত, তখন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান নায়ক ভারতের একপ্রান্তে পর্ণ কুটীরে বসিয়া বলিতেছেন "আমি সংখ্যার উপর বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি অমিশ্র তত্ত্বের উপর।" অসংখ্য রণসম্ভারে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি প্রতিপত্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া যখন উদ্বুদ্ধ, ভারতের সেনাপতি স্বাধীনতা-সংগ্রামে চাহিতেছেন "জীবনের পবিত্রতা।" সুদূরপ্রসারিত অন্তর্দৃষ্টি এবং নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাত্ম-শক্তির প্রয়োগেই তিনি স্বকার্য্য সিদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প। পুণ্যভূমি ভারতের এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আজ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ভারতের যোদ্ধা চাহিতেছেন "ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যাত্ম-প্রাণ"—ইহাতেই নাকি ভারতের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী হইবে। এই আত্মবিশ্বাস অলস স্বপ্নকল্পনা যে নহে—তাঁহার কার্য্যই প্রমাণ করে। এই শক্তি অর্থে ও সামর্থ্যে অর্জ্জিত হয় নাই, ঈশ্বরবিশ্বাসে এবং উপাসনায় তিনি ইহা লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রসাদ ভারত-সেনাপতির একমাত্র সহায়। কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রেই এই সহায় অবতরণ করে। এইরূপ মানুষের সাহায্যই তিনি প্রার্থনা করেন। ভারতের জাতীয় সেনাপতি অকম্পিত কণ্ঠে এখনও বলিতেছেন "মুক্তিসংগ্রামের যাবতীয় প্রয়োজন অহিংসা-মন্ত্রে নিহিত আছে। ইহা শুধু ভারতেরই অমৃত নহে, সমগ্র জগতের। পাশ্চাত্যের বীভৎস রক্তপিপাসাকে এই অহিংসার শক্তিই প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে। কিন্তু সে শক্তি ভগবান আমায় দেন নাই। ভারতের সঙ্কট-ত্রাণের জন্য ঈশ্বর আমায় চিহ্নিত যন্ত্র করিয়াছেন।" এই আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় বেদীর উপর দাঁড়াইয়া, বিগত অর্দ্ধশতাব্দীকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি মুক্তিসংগ্রাম করিয়াছেন। আজ তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছেন, "এখনও আমার কাজ আছে। আমার সম্মুখে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আছে, তাহার জন্য হয় তো আর একটা দাণ্ডি-রণ-যাত্রার আলোকোজ্জ্বল সংগ্রামে আমায় রত হইতে হইবে। তাহা নাও হইতে পারে। কিন্তু অস্ত্র আমার অহিংসা।" মহাত্মা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে তথাকথিত লোকবল চাহেন না। অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ব্রহ্মাস্ত্র। এই চরিত্রের লোকেরই তিনি 'রঙ্-রুট্' চাহেন। বিচিত্র নহে কি?

ভারতের ভাগ্যবিধাতা ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অমিশ্র জয়টীকা মহাত্মা গান্ধীর ললাটে সম্ভবতঃ আঁকিয়া দিয়াছেন। জগতের এই দুর্দ্দিনে ভারতের মহিমা-ঘোষণার জয়-নিশান হাতে লইয়া তিনি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। মুক্তিকামী ভারত তাঁহার এই পূত সঙ্কেত নতশিরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিবে। ভারতের যে সকল নরনারী তাঁহার অধিনায়কত্বে দলে দলে চলিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা নমস্কার করি, বলি "জয়স্তু"। এ অভিযান অমোঘ অব্যর্থ হউক।

এইবার বাংলার কথা বলি। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীও ভারতের অপূর্ব্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিগ্রহ-রচনায় উন্মাদ, উদ্বুদ্ধ। বাংলার উত্তর প্রান্তে শাক্যসিংহের সিদ্ধ মন্ত্র আজিকার নহে—সহস্র সহস্র বৎসরের। সমগ্র জগৎ দীক্ষা লইয়াছিল এই মন্ত্রে। তাঁহার অনবদ্য নীতি ও ধর্ম্মের ঋক্‌মন্ত্রে বাংলাদেশ মুখরিত হইয়াছিল, জাতিভেদ ভুলিয়াছিল, হিংসা ক্রোধ ত্যাগ করিয়াছিল। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা বাংলার পলিমাটীতে জন্মিয়াছিল অসংখ্য ধর্ম্মবীর, ত্যাগবীর। অন্ত্যজ জাতির মধ্যেও ধর্ম্মপ্রাণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু প্রতিক্রিয়ার ভৈরব প্লাবনে বাংলার বৌদ্ধধর্ম্ম আবর্ত্তিত হইয়া নানা মূর্ত্তিতে দেখা দিল। বুদ্ধের নীতি-ধর্ম্মের উপর কত মসী প্রকৃতি ঢালিয়া দিল। পরিণামে কিন্তু কষিত কাঞ্চনের ন্যায় অহিংসা ও প্রেমের মূর্ত্তিই বিগ্রহান্বিত হইল, বাংলার আচণ্ডাল তাহাতে অভিষিক্ত হইয়াছে। বিগত ৪০০ শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী পাইয়াছে এই জীবন-সাধনার পরিচয়। বন্ধন হইতে মুক্তির আহ্বানে বাংলার প্রাণ তাই নাচিয়া উঠে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কণ্ঠধ্বনি শুধু নহে, সুখ-দুঃখের উপরতিতে এ জাতির আত্মনিষ্ঠার হেতু

দীর্ঘ ইতিহাসে বিজড়িত। হালিসহরের মাতৃপ্রেমসুরায় এ জাতি মাতাল হইয়াই আপনহারা হয় নাই, মুক্তিব্রতী হওয়ার দীর্ঘ সাধনা তার মজ্জায় মজ্জায়। দক্ষিণেশ্বরের রজে গড়াগড়ি দিয়া এ জাতি ধন্য হইয়াছে বটে; কিন্তু বিষয়াসক্তি ছাড়িয়া অনন্তের পথে চলার অধিকার সে পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিরবচ্ছিন্ন রক্তধারার সঙ্গেই লাভ করিয়াছে। এ দেশের ঝোপ-ঝাঁপে, নদীর কিনারায়, সুশ্যাম তরুতলে, ভগ্নমন্দিরে কত বাউলের একতারা যে বাজিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙালার পল্লীকোণে কত আউল-চাঁদের যে উদয় হইয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান জানে না। কত হাড়িপোর কণ্ঠে নব বেদ উচ্চারিত হইয়াছে, কত ময়নামতীর গানে এ জাতি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, কত গোবিন্দচন্দ্র মাথা মুড়াইয়া মুক্তির সন্ধানে গিয়াছে, তাহার সব ইতিহাস লেখা নাই। বাংলার পথে, ঘাটে, বনে, নদীর কূলে কত জ্ঞান বৈরাগ্যের বাঁশী বাজিয়াছে, বিষয়ের পাষাণপ্রাচীরে রুদ্ধ আসক্তিকে মুক্তি দিবার কত আকুতির অনাহত মুরলী যে ধ্বনি তুলিয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না। বাঙ্গালী ঘরে বসিয়া আজ পায় ভাগবতী ভক্তি; ইহা অপার্থিব পাথেয়। ইহাতে ঐহিক যন্ত্রণার সীমাই শুধু দূর হয় না, সমগ্র জাতির ঐহিক এবং পারত্রিক জীবনের স্থায়ী সুখ বিধান করে। অষ্টপাশ মোচন করিয়া তাহাই মুক্তির অমৃতস্বাদ দেয়। আজকার বাঙ্গালী সে মুরলী কাণ পাতিয়া শুনে না, মর্ম্ম বোধ করে না বলিয়াই তো বিনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ দিন বেদনার গান গাহিয়া যাই; শুনিবার কাণ যদি হয়, তবে এখনও বলিব —যে দ্বার দিয়া বিষয় বহিয়া আনে আসক্তি, সেই দ্বার দিয়াই আসক্তি মাথায় করিয়া বহিয়া আনিবে শ্রীভগবানকে। এই পরম বিষয়ের আগমনে জীবনের যে সুখ-সম্পত্তি, তাহাই ভাগবত শ্রী। স্বর্গাদি ভোগের ন্যায় এই সম্পদ্ অস্থায়ী নহে। সৃজনের এই রাগিণী ইহবিমুখ কাল্পনিক ধর্ম্মতত্ত্ব নহে। ভারতীয় ভাবসিদ্ধির উপর জাতির চৈতন্য বিধৃত হইলে, যদি পরাধীনতাই সকল দুঃখের হেতু হয়, সে ব্যথা ইহাতেই নিরাকৃত হইবে। এই বিশ্বাস বাঙ্গালীর আজ যেন নাই। মহাত্মার আছে, মহাত্মা তাই দুর্জ্জয়। বাঙ্গালীও বিশ্বাস করিলে দুর্জ্জয় হইবে। বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাংলায় নানাভাবে অন্তঃসাধনাই চলিয়াছে। এই নূতন মুক্তিকামী জাতির সহায়—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি। এই তিন মহাশক্তি ভগবানের বিভূতি। জ্ঞান একের; একের জন্যই বাঙ্গালী বৈরাগী! আর এই বৈরাগীর সমষ্টিই নূতন গোষ্ঠী। চণ্ডীদাসের পীরিতি-নগর, বৈষ্ণব সিদ্ধাচার্য্যগণের নব বৃন্দাবন, গীতার ধর্ম্মরাজ্য ইহাদেরই জীবনবেদীর উপর গড়িয়া উঠিতে পারে। জ্ঞান শ্রদ্ধারূপে বীর্য্য দান করে। বৈরাগ্য দেয় রতি। ভক্তিতে অমৃত। ইন্দ্রিয়-সুখ-বিরতি তবেই সহজ হয়। বাঙ্গালী সহজ ব্রহ্মচারী। এইরূপে বাঙ্গালী পাইতে পারে সিদ্ধ দেহ। ধর্ম্ম যদি মুক্তির কারণ না হয়, সকল পাশ ছিন্ন না করে, তবে কেন আমরা ধর্ম্মের ভিত্তির উপর জীবন চাই?

ঈশ্বরে আসক্তি ধর্ম্ম। ধর্ম্মের সকল উদ্যম ঈশ্বরপ্রীতির জন্য। ধর্ম্মের বিগ্রহ এই ভাগবত গোষ্ঠী। ইহার কণ্ঠে মুক্তিমন্ত্র শুনি, তাহা ঈশ্বরেচ্ছা—অন্য কিছু নহে। কেমন করিয়া তাহা ব্যর্থ হইবে? এই অবস্থায় চাওয়া কিছু না থাকিলেও, মুক্তি বারণ না মানিয়া সোণার তাজ এই সমষ্টির মাথায় পরাইয়া দিবে। মুক্তি মানুষের প্রার্থনীয় নহে। ঈশ্বরপ্রার্থিত যাহা, তাহা অমোঘ অব্যর্থ না হইবে কেন?

বাঙ্গালী চলিয়াছে সার্ব্বাঙ্গীন মুক্তির পথে। বিগত পঞ্চাশ বৎসর স্বার্থে তার চিত্ত কলুষিত নহে। চেষ্টায় সে ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে নাই। ব্রহ্মচর্য্য সাধনার নয়, আসক্তির উৎসর্গে ইহা উপজাত। সহায় ঐকান্তিক প্রার্থনা। ঈশ্বরপ্রসাদই এই পথের পরম সহায়। নিষ্কাম-চিত্ত, ভক্তের সমষ্টি, নব জাতির অগ্রদূত। মুক্তিদাতা স্বয়ং শ্রীভগবান। তাই এই ক্ষেত্রে কিছু বলার নাই। সেই একজনই এ জাতির আত্মবৎ প্রিয়। পুত্রবৎ স্নেহের দাবী এই একের কাছেই তাহারা করে। সখার মত সে ছাড়া বিশ্বাসের পাত্র অন্য নহে। গুরুর ন্যায় সেই উপদেষ্টা। সেই সুহৃদের ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, আবার ইষ্টের ন্যায় পূজনীয়। ভাগবতী ভক্তির ভাগবতচক্রই বাংলায় নব যুগ আনিবে। ইহা ঈশ্বরবিধান। নিশ্চিন্ত চিত্তে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথীপ্লাবিত বাংলায় এই সঙ্গীত যাহাদের

কর্ণে প্রবেশ করে, তাহাদের সমষ্টিচক্রই ভবিষ্যতের আশা ও ভরসার সিদ্ধকেন্দ্র। এই বিশ্বাস ব্যর্থতায় ম্লান হইবে না। সাফল্যের স্বর্ণরশ্মিতেও দৃষ্টি ঝলসিয়া যাইবে না। এই প্রত্যয়, এই ঋষিমন্ত্র লোকের মনে যদি স্থান পায়, মর্ম্ম স্পর্শ করে, ইউরোপের ঘনঘটার পর ভারতের জয়যাত্রায় বাঙ্গালীও এক বিশেষ স্থান অধিকার করিবে। এই সনাতন ঈশ্বরবিশ্বাস সর্ব্বজয়ী হইবে। বাংলার নূতন সঙ্ঘের এই হেতু স্থৈর্য্য কামনা করি। ইউরোপ—ইউরোপ হইয়া বাঁচিতে চায়, বাঁচুক; ভারত—ভারত হইয়াই বাঁচিবে।

— চিন্তা-বীথি

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন মুক্তি লক্ষ্য করিয়া আরব্ধ হইয়াছে। মুক্তি-সাধনার হিংস, অহিংস দুইপ্রকার নীতি ও পন্থা লইয়া যে মতভেদ ও দলভেদ, তাহার মধ্যে উদ্দেশ্যগত ভেদ নাই—যেটুকু পার্থক্য তাহা উপায় লইয়া। তাই বাঙালার ভূতপূর্ব্ব বিপ্লবপন্থিগণও যে রক্তবিপ্লবের নীতি ও পথ ইতিপূর্ব্বে পরীক্ষিত ও সিদ্ধিপ্রদ হয় নাই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, মহাত্মাজীর অহিংসা-পতাকার ছত্রতলে রাষ্ট্রসাধনায় অনেকেই যোগ দিতে পারিতেছেন। লক্ষ্য যখন ভারতের মুক্তি বা স্বাধীনতা, তখন উপায় পরিবর্ত্তন করিতে খুব বেশী আন্তরিক বাধা দেখা যায় না। এই কারণেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে রক্তবিপ্লবের পরিবর্ত্তে কংগ্রেসের অহিংস ও শান্তিময় রাষ্ট্রসাধনা আজ মুক্তিপিপাসু সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর অন্তরে ধীরে ধীরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে। কিন্তু মুক্তি-সাধনার মাঝপথে যে সাম্যবাদী বামপন্থা দেখা দিয়াছে, ইহার আদর্শবাদ ও পূর্ব্বোক্ত স্বাধীনতাকামী উভয় দলের লক্ষ্যে কতকাংশে মিল থাকিলেও, তাহা সর্ব্বাংশে এক বলা যায় না। ভারতের জাতীয়তা অন্ততঃ রাষ্ট্রনৈতিক সাধনক্ষেত্রে এইখানে একটা আদর্শগত প্রবল সংঘর্ষের ধীরে ধীরে সম্মুখীন হইয়া পড়িতেছে, আমাদের এই আশঙ্কা অমূলক নহে। যে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিতেছে, তাহা আজ আভাষে, সঙ্কেতে অর্দ্ধস্ফুট হইলেও, ক্রমশঃ যে তীক্ষ্ণ ও উগ্র হইয়াই দেখা দিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। চিন্তাশীলগণ দূর হইতে ইহার পূর্ব্বচ্ছায়া এখনই লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলালজীর বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সাভারকরের সতর্কতা-ভাষণে এই আদর্শগত ভেদ ও ঘনায়মান সংঘর্ষেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

*　　　*　　　*

শ্রীযুক্ত সাভারকর রাজনীতিক আদর্শবাদের ভিত্তির উপর ভারতের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ইহার কারণ, তিনি মনে করেন, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন আদর্শবাদে শক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে বিশিষ্ট আদর্শবাদে কোন বিশেষ জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাই অপর জাতির অনুপ্রেরণার কারণ নাও হইতে পারে। ফলে দেখা যায়—সোভিয়েট রুষ যে আদর্শে প্রাণ পাইল, মুসোলিনীর ইতালী তাহাতে প্রাণ পায় নাই; তদ্রূপ জার্ম্মানীর জাগরণ ঠিক ইংলণ্ডের কিম্বা জাপানের আদর্শবাদ অনুসরণ করিয়া ঘটে নাই। কিন্তু এই রাষ্ট্রনীতিক আদর্শ-বিশেষকে কোনও জাতিই তাহার বৈদেশিক সখ্য ও চুক্তির একমাত্র নিরিখ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। পণ্ডিত জহরলাল এই রাজনৈতিক আদর্শবাদের উপর তাঁহার বৈদেশিক প্রচার প্রতিষ্ঠিত

করিয়া, ভারতের যথার্থ জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ও বিঘ্নিত করিতে পারেন—এইরূপ সংশয় ও আতঙ্কই হিন্দু মহাসভার সভাপতির মনে ক্রিয়া করিতেছে। তাই তিনি এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছেন। ভারতের বৈদেশিক নীতি ভারতের নিজস্ব স্বার্থ ও কল্যাণ লক্ষ্যে রাখিয়াই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত—রাজনীতিক আদর্শবাদকে অনুসরণ করিয়া নহে।

* * *

অন্যদিকে, আর একজন ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালও আধুনিক সাম্যবাদ সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষ্টির দিক্ হইতে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও আমরা এই সঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। শচীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি সাম্যতন্ত্রে বিশ্বাসী হইলেও, সাম্যবাদ যে বস্তুতান্ত্রিকতা প্রচার করে, তাহা তিনি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কারণ, উহা মানুষের অধ্যাত্মবোধের পরিপন্থী—বিশেষতঃ ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, সমগ্র মানবজাতির অধ্যাত্মবাণীর বিশেষ প্রয়োজন, তাঁহারা কখনও সাম্যবাদীদের যে জীবনদর্শন ভারতীয় আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে, তাহা সমর্থন করিতে পারেন না। এইখানে আর একদিক্ দিয়া, বামপন্থী সাম্যবাদিগণ ভারতের জাতীয়তাপ্রবাহে যে প্রতিকূল স্রোতঃ উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন, তাহা প্রতীয়মান হইবে। কি রাষ্ট্রনীতি, কি অধ্যাত্মনীতি—জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি—এই সব দিক্ দিয়াই ভারতের জাতীয়তা যে সাম্যবাদের সংঘর্ষে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, এই প্রকার ভাবনা ইতিমধ্যেই জাগিতেছে, ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বিপন্নবোধ প্রতিক্রিয়াপন্থী স্বার্থপর লোকের মনোবৃত্তিপ্রসূত নহে, ইহা এখানে বলা আমরা আবশ্যক মনে করিতেছি। কেন না, সাম্যতান্ত্রিকদের এক সহজ সুলভ যুক্তি সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হয় এই যে, কায়েমী স্বার্থের ঘুঁটিগুলি বিত্ত-তদুচ্ছিষ্টভোজী অনুগতের দল যে সাম্যতন্ত্রের বিরোধিতা করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু সাভারকর বা সান্ন্যালের ন্যায় অগ্নিপরীক্ষিত ত্যাগবীরগণ যে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত কখনও নহেন, ইহা তাঁহাদের ঘোরতম শত্রুপক্ষও নিশ্চয়ই স্বীকার করেন। অতএব তাঁহাদের প্রতিবাদের মূল্য চিন্তাশীল মাত্রেই মর্ম্ম দিয়া অবধারণ করিবেন, ইহা আশা করি।

* * *

ভারতের জাতীয়তা কোন্ ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইব, সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ লাভ করিব—ইহাই চিন্তনীয়। মুক্তি-সাধনা আসলে শক্তিরই সাধনা। শক্তিমান্ই মুক্তি অর্জ্জন করে এবং অর্জ্জন করিয়া তাহা রক্ষা করিতেও পারে। সাভারকর এই শক্তিসাধনার উপরেই দৃষ্টি রাখিয়া জাতীয় জীবন ও তাহার পররাষ্ট্রনীতি সুনিয়ন্ত্রিত করিতে বলিয়াছেন। তর্কের চলেই জিজ্ঞাসা করিতেছি—ভারত যদি তাহার স্বাধীনতার্জ্জনের শক্তি লাভ করে কোনও বৈদেশিক জাতির সৌহৃদ্য ও সহযোগিতা পাইয়া, ভারত কি সেখানে রাজনৈতিক আদর্শ-বিচার করিবে? অবশ্য সাভারকর জানেন এবং সে কথা তিনি খুলিয়াও বলিয়াছেন—মহাযুদ্ধে বিপন্ন হইলে স্বয়ং ইংলণ্ডই ভারতকে মুক্তি দিতে উদ্যত হইবে, তখন ভারতকে নিজ স্বাধীনতার জন্য অন্য কোনও শক্তির সহায়তা লইতে হইবে না—এই ইঙ্গিতও সাভারকরের উক্তির মধ্যেই আছে। সে কথা স্বীকার করিলেও, ইংলণ্ডের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী জাতির সহিত আমাদের চুক্তি ও মৈত্রীবন্ধন করিতে হয়। অতএব সাভারকরের কথা এদিক্ দিয়া সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় যে, মুক্তিসাধনায় রাজনৈতিক আদর্শবাদের গণ্ডী আমাদের মানিলে চলে না। শক্তির নিরিখেই স্বাধীনতার তথা জাতীয়তার গতি ও সম্বন্ধ-সমূহ নিরূপণ করাই বাঞ্ছনীয়। পণ্ডিত জহরলালজীর বৈদেশিক প্রচারে এই কারণেই অনেকেই সাভারকরেরই ন্যায় আশ্বস্তি অনুভব করিতে পারিবেন না। পণ্ডিতজীর দরদের অভাব নাই, তাঁহার ত্যাগ ও আন্তরিকতা সংশয়াতীত; কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয়প্রতিভার কষ্টিপাথরে তাঁহার অবলম্বিত নীতি যদি জাতীয়-স্বাধীনতার অনুকূল না হয় ও সেদিক্ হইতে ভারত এখন হইতে সতর্ক হইতে যদি চাহে, তাহা শুভ বুদ্ধির পরিচয় বলিয়াই আমরা মনে করিব। কেন না, এখনও ভারত বৃটিশের দৃঢ় পক্ষপুটে নিরাপদ্ বলিয়া, পণ্ডিত জহরলালের ন্যায় ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস-রাষ্ট্রপতির মুখে এইরূপ

অভিব্যক্তি ক্ষতিজনক নাও হইতে পারে, কিন্তু ...র পরে এরূপ প্রত্যেক বাণী ও প্রতি পদক্ষেপ যথেষ্ট দায়িত্বের সহিত চালিত না হইলে যে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের যোগ্য স্থান পাওয়া ও তাহা রক্ষা করা দুরূহ হইবে, ইহা রাজনীতিবিৎ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ভারতের উদীয়মান জাতি খুব স্থির, ধীর ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুদূরচারী প্রতিভা লইয়াই আত্মগঠন করিবে ও এইরূপেই মুক্তি সিদ্ধির অনুকূলে রাষ্ট্রজীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে—ইহাই আমাদের কামনা।

*　　*　　*

তার পর, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কথা। সাম্যবাদের জয়ডঙ্কা যখন ফ্রান্স হইতে রুশিয়ায় পুষ্টতর রূপ লইয়া গুরুগর্জ্জনে বিস্ফোরিত হইল ও সারা বিশ্ব কম্পিত করিয়া তুলিল, তাহার বহুপূর্ব্বে এক বাঙালী মনীষী মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব্ব মনীষাবলে এ সম্বন্ধে যে গভীর চিন্তা, আলোচনা, এমন কি সমাধানেরও সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ অসমীচিন হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের দূর দৃষ্টি সেই সাম্যবাদের আদিযুগেই ঐতিহাসিক, দার্শনিক, উভয়দিক্ দিয়াই সাম্যনীতির প্রকৃত তত্ত্ব প্রণিধান করিতে পারিয়াছিল ও এ বিষয়ে তন্নস্পর্শী বিশ্লেষণে কতকগুলি মোটামুটি মূল সত্য ও সিদ্ধান্তও নিরূপণ করিয়াছিল। তিনি সাম্য আন্দোলনের গোড়ার কথা জানিয়াই লিখিয়াছিলেন—"রুসো যে মহাবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। কম্যুনিজম্ সেই বৃক্ষের ফল। ইন্টারন্যাশনাল সেই বৃক্ষের ফল।" পরে তিনি ওয়েন, লুই, ব্লং, কাবে, মিল বা ফুরীরিজম প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাম্যমতবাদগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিয়া এবং ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের পরিস্থিতিতে সেইগুলির প্রয়োগযোগ্যতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচারপূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন —"উপসংহারে আমরা কেবল ইহাই বুঝাইতে চাই যে, সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখনও হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক। কাহারও শক্তি থাকিলে, অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির মুক্ত পথ চাই।"

*　　*

বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ্র স্বচ্ছ চিন্তার আলোকে সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য বুঝিলে, ভারতীয় তরুণ সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সকল সমস্যার নূতন ভাবে সমাধান খুঁজিয়া পাইতে পারেন। চিন্তাধারার অনুসরণে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ভিত্তির উপরেই পাশ্চাত্য মতবাদগুলি আমরা সংশুদ্ধ ও পূর্ণতর করিয়া লইতে পারি। তরুণ জাতিকে এইজন্য ভাবগুরু বঙ্কিমচন্দ্রেরই ধ্যানমূর্ত্তিমূলে নূতন ও মৌলিক চিন্তা ও গবেষণায় নিয়োজিত হইতে বলি। সেই ঋষি শুধু পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে আমাদের বারম্বার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন—জীবনদর্শনের উত্তম পথ ও নীতিই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাধিকারী মানস বংশধর যাহারা, তাঁহাদের আবিষ্কার করিতে হইবে। তরুণ জাতির অন্যতম অগ্রণী সাভারকর ও শচীন্দ্রনাথের ন্যায় কর্ম্মবীরদের হিন্দুভারতের পক্ষ হইতে তাই সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। অতঃপর নবীন ভারতের যৌবনশক্তি ভারতীয় ভাব ও চরিত্রের উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া, শুধু স্বদেশ ও স্বজাতির নহে, বিশ্বের অসমাহিত সর্ব্ব সমস্যার মীমাংসায় উদ্যুক্ত হইবে—আমরা এই দৃশ্যই আশানেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিশেষতঃ, বাঙালীই নূতন যুগ-দর্শন রচনা ও নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা উদ্গ্রীব হইয়া রহিব।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি, ভাগবতরত্ন

গীতিকবিতায় নব-যুগের রামপ্রসাদ

সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন বাঙ্গালার গীতিকবিতার ক্রমবিবর্ত্তনে এক নবযুগের সূত্রপাত করেন। বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতৃগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনাকালে নিজেকে অন্তরালে রাখিতেন; তাঁহারা পদের শেষে ভণিতার মধ্যে কখনও কদাচিৎ তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতামত, সুখদুঃখ বা প্রার্থনা নিবেদন জানাইতেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে, কি বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের, কি ধর্ম্ম-মঙ্গল, মনসামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা কালিকামঙ্গলের লেখকদের বিষয়-নির্ব্বাচনে ও ঘটনা-সংযোজনায় বিশেষ মৌলিকতা অথবা স্বাধীনতা ছিল না। গতানুগতিকভাবে, ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে, তাঁহাদিগকে নায়কনায়িকার জীবনের ঘটনা বর্ণনা করিতে হইত। এই গতানুগতিকতার মধ্যেও যাঁহারা কবিপ্রতিভা লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাষার মাধুর্য্যে ও চরিত্র-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন প্রথমে যুগধর্ম্মের প্রভাবে এইরূপ প্রথানুযায়ী রচনায় মনোনিবেশ করিয়া 'বিদ্যাসুন্দর' লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এ রচনা যে উচ্চশ্রেণীর হয় নাই, তাহা তিনি নিজেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতিভার গতি পদ বা গীতিকবিতার রচনার দিকে। তাই তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দর কর্ত্তৃক দক্ষিণা-কালিকা-মূর্ত্তি-সংস্থাপন বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিলেন—

> বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
> গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি, গানে হব ব্যস্ত॥

পদরচনা করিতে যাইয়াও তিনি প্রথমে বৈষ্ণব কবিদের রীতিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু সাধনার রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে একদিকে যেমন সকল প্রকার শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন, অপর দিকে তেমনি প্রচলিত সাহিত্যিক রীতিকে পরিহার করিয়া নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী খুঁজিয়া পাইলেন। তাহার ফলেই আমরা এমন কতকগুলি পদ পাইলাম, যাহার মধ্যে কবি কেবলমাত্র তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিলেন। গীতিকবিতায় কবির এই যে নিজস্ব ভাবের প্রকাশ, ইহাই রামপ্রসাদকে যুগপ্রবর্ত্তক কবি করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে একজন মাত্র কবি এইরূপে নিজের মনের কথা কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। তিনিও রামপ্রসাদের ন্যায় সাধক। তাঁহার নাম নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। ঠাকুরমহাশয় তাঁহার "প্রার্থনা"য় এবং "প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকায়" রূপ-সনাতনাদি শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিকরের এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি সঙ্গিগণের তিরোধানে মুহ্যমান হইয়া নিজের অন্তর-ব্যথা প্রকাশ করিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের কৃপা ও মহিমার কথা লিখিলেন এবং নিজের সাধকোচিত অভিলাষসমূহকে গীতিকবিতার মধ্যে রূপ দিলেন। তাঁহার রচনার সহিত প্রসাদী সঙ্গীতের তুলনামূলক বিচার করিয়া পরে দেখাইব যে, রামপ্রসাদ প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতার বাঁধাধরা রীতিকে অবহেলা করিয়া যতটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণব-জনসুলভ দৈন্যবোধ হেতু ততটা আত্মপ্রকাশ করেন নাই। সেইজন্য ঠাকুর মহাশয়ের প্রকাশভঙ্গী বাঙ্গালার গীতিকবিতায় নবযুগের প্রবর্ত্তন করিতে পারিল না; অথচ রামপ্রসাদের পদাবলী তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণকে নিজ নিজ মনোভাব অসঙ্কোচে প্রকাশ করিবার মত সাহস জোগাইল। রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী যুগের কবিগণ কেবল যে আধ্যাত্মিক বিষয়েই নিজনিজ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহা নহে; রাধাকৃষ্ণ, বিদ্যা-সুন্দর প্রভৃতির অন্তরালে আত্মগোপন না করিয়া স্পষ্টভাবে মিলন-বিরহের, সুখ-দুঃখের গান গাহিতে লাগিলেন।

আমি যে ভাবে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া রামপ্রসাদকে নবযুগের প্রবর্ত্তক বলিলাম, সে ভাবে বিচার না করিয়াও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বাঁকীপুর অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—"রামপ্রসাদের পর বাঙ্গালা আবার কিছুদিন গানে ভরিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানে বাঙ্গালার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। এই যুগকে বাঙ্গালার 'গানের যুগ' বলা যাইতে পারে।" তিনি অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন—"মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালার গীতিকবিতার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল—তাহারই শেষ ফল ভারতচন্দ্রের গীতিকবিতা। প্রসাদের গানে নবজাগরণ এবং সেইজন্যেই একটা নবযুগের বারতা পাওয়া যায়" (অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রামপ্রসাদ', পৃঃ ১৬৯ পাদটীকা)।

রামপ্রসাদের পদাবলীর সংগ্রহ ও আলোচনার ইতিহাস

রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী বঙ্গসাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে এরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিলেও, তাঁহার রচনাবলী সুরক্ষিত হয় নাই। কবির তিরোধানের পর তিন পুরুষের জীবনকাল অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার অধিকাংশ পদাবলী লোকসমাজে অপ্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালার রাষ্ট্র, সমাজ ও সাহিত্যের যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একদিকে রাম-প্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির লুপ্তপ্রায় রচনা উদ্ধার করিলেন, অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি নবযুগের স্রষ্টাদের বাল্যরচনা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে সাহিত্যসংসারে পরিচিত করাইয়া দিলেন। গুপ্তকবি ১২৬০ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে "সংবাদ-প্রভাকরে" রামপ্রসাদের সাতটী পদ প্রকাশ করেন। তৎপরে বহু অনুসন্ধান করিয়া ঐ বৎসরের ১লা পৌষের "সংবাদপ্রভাকরে" কবির জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ সহ আর ১৪টী পদ বাহির করেন এবং ঐ গুলির রস বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচনা করেন। ঐ চৌদ্দটী পদের মধ্যে একটি তিনি আশ্বিন মাসেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকবি রাম-প্রসাদের মাত্র ২০টী পদ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। লুপ্তরত্ন উদ্ধার করিলে সেই যত্নের প্রতি মমতা বোধ হওয়া স্বাভাবিক। গুপ্তকবি কতকটা এই মমতা-বোধ হেতু এবং কতকটা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ-দাস প্রভৃতির পদাবলীর সহিত যৎসামান্য পরিচয়মাত্র থাকার জন্য রামপ্রসাদের পদাবলী সম্বন্ধে লিখিলেন—"ইহার তুল্য বঙ্গভাষাভাষিত অমূল্য গীতরত্ন এ পর্য্যন্ত কোন কবি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাম-প্রসাদ সেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে; কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন।" গুপ্তকবির এই মূল্য-নির্দ্ধারণের মধ্যে কিছু অতিশয়োক্তি থাকিলেও, তাঁহার সমালোচনা পাঠ করিয়া রামপ্রসাদের পদাবলীর উদ্ধারের জন্য সাধারণের আগ্রহ জন্মে। আজ যে আমরা প্রসাদ পদা-বলীর মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতেছি, তাহার মূল অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছেন গুপ্তকবি।

গুপ্তকবি রামপ্রসাদের কুড়িটি পদ সংগ্রহ করিয়া তদানীন্তন সাহিত্যরসিকগণের যে কিরূপ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন, তাহা ১২৬০ সালের ১লা মাঘের "প্রভাকরে" প্রকাশিত রামপ্রদাদের স্বগ্রামবাসী একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির পত্র হইতে জানা যায়। তিনি রামপ্রসাদের কথা বলিতে যাইয়া ঈশ্বর গুপ্তকে লিখিয়াছেন—"ইদানীন্তন ঐ মহাপুরুষ কেবল কতিপয় প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞ ও মর্ম্মগ্রাহী মনুষ্যের নিকট পরিচিত ছিলেন মাত্র, নব্যসম্প্রদায় মধ্যে তিনি অপরিচিত ছিলেন, যদিও ঐ দলাক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার দুই একটী গান জানিতেন, কিন্তু তাহার ভাব ও প্রকৃতার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত তাহার সমাদর করিতেন না। যাহা হউক আপনি যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া যে মহতী বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে আপনার সমীপে আমরা চিরবাধিত হইলাম এবং ইহাও একপ্রকার আপনার কীর্ত্তি, যেহেতুক আপনি সেন কবির গ্রন্থচয়ে পুনর্জীবন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

রামপ্রসাদের পদাবলী কি কি কারণে লোপ পাইতে

বসিয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন যে, ধনীদের শিক্ষার অভাব ও রুচির বিকৃতি তাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। "যে দেশের লোকেরা বস্ত্র পরিধান করে না, সে দেশে রজকের অন্ন কখনই হইতে পারে না, গুণগ্রাহী না থাকিলে গুণের বিচার কে করে?" দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা প্রসাদ পদাবলীকে সাধনার অঙ্গস্বরূপ আস্বাদন করিতেন, তাঁহারা এগুলি যথাসাধ্য গোপন করিয়া রাখিতেন। তৃতীয়তঃ, সাধারণ লোকে শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে পদাবলীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত না। চতুর্থতঃ, "গায়কের অভাবে ইদানীং কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার রাগ সুরের উপদেশ করে, এমন লোক কেহই নাই।" আমার মনে হয় প্রসাদ-পদাবলী কবি স্বয়ং এক স্থানে সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি ভাবের মানুষ। যখন যে ভাব মনে উদয় হইয়াছে, সেই ভাবের গান বাঁধিয়া গাহিয়াছেন, অথবা যেখানে সেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে লিখিয়াছেন। তাঁহার অনুরাগী ভক্তদের মধ্যে যাহার যেমন ক্ষমতা, সে সেইরূপ কতকগুলি গান অভ্যাস করিলেন। কোন একজন ভক্ত সারাজীবন রামপ্রসাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার গানগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া যান নাই। পরে সাধক ও গায়কেরা নিজ নিজ রুচি ও ক্ষমতানুসারে তাঁহার কয়েকটী করিয়া গান শিখিয়া গাহিয়াছেন। ঐ সময়ে যদি দেশের মধ্যে বিশুদ্ধ কাব্যরসাস্বাদনের আগ্রহ প্রবল থাকিত, তাহা হইলে কেহ কেহ ঐ সকল গান বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পদাবলীকে পূর্ণ আকারে সংরক্ষণ করিতে পারিত। ক্লাইভ হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব চলিয়াছিল তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ কাব্যরসাস্বাদনের প্রবৃত্তি থাকে কয় জনের? লর্ড হেষ্টিংসের পর ক্রমে ক্রমে শান্তি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারকার্য্য এবং ইংরাজী শিক্ষা দেশের বুদ্ধিজীবী লোকদের মনকে প্রাচীন-গৌরব-সংরক্ষণে বিমুখ করিয়া তুলিল। বহুদিন পরে যখন স্বাজাত্যবোধ উদ্বুদ্ধ হইল এবং কেশবচন্দ্র, পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা জাগিল, তখন রামপ্রসাদের পদাবলী-সংগ্রহের জন্য আবার চেষ্টা হইল।

এই সময়ে দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় রামপ্রসাদের পদ-সংগ্রহের জন্য বহুবর্ষ ধরিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার ফলে অধুনা-প্রচলিত রামপ্রসাদের অধিকাংশ পদ আমরা পাইয়াছি। ১২৮২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তিনি 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' নাম দিয়া ঐ সকল পদ, তাহার মর্ম্মার্থ ও সমালোচনা এবং রামপ্রসাদের জীবনী প্রকাশ করেন। দয়ালবাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া রামপ্রসাদকে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার অগ্রদূতরূপে স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, রামপ্রসাদ প্রথমে জড়োপাসক ছিলেন, পরে নিরাকারের উপাসনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে কৈলাসচন্দ্র সিংহও তাঁহার "সাধক-সঙ্গীত" গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রচার করিয়াছিলেন।

"প্রসাদ-প্রসঙ্গের" প্রকাশের দশ বৎসর পরে, ১২৯২ বঙ্গাব্দে যোগেন্দ্রনাথ বসু কবিরঞ্জন-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে ১৩০১ সালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ "প্রসাদ-পদাবলী" নাম দিয়া রামপ্রসাদের সমস্ত রচনা যত দূর তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, প্রকাশ করেন। কাব্যবিশারদের প্রথম সংস্করণে 'কালীকীর্ত্তন', 'কৃষ্ণকীর্ত্তন,' 'সীতাবিলাপ', 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' ও 'বিদ্যাসুন্দর' ছাড়া ২৩১টী পদ ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি আরও ১৯টী অতিরিক্ত পদ সংযোজনা করেন। তৎপরে 'বসুমতী' কার্য্যালয় হইতে প্রসাদের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। সর্ব্বশেষে অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অশেষ পরিশ্রম করিয়া ৩০৫টী পদ তাঁহার 'রামপ্রসাদ' গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৮টী পদ পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। কাব্যবিশারদ এবং অতুলবাবু উভয়েই স্ব স্ব সংগ্রহে 'দ্বিজ রামপ্রসাদের' ভণিতাযুক্ত কয়েকটী পদ গ্রহণ করিয়া, সেগুলি রামপ্রসাদ সেনের রচনা কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেনের পদাবলীর আলোচনা ১৩৩০ সাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহা অতুলবাবু অনুসন্ধানপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া নিজের বইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সেজন্য

তাঁহাকে প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা ব্যয় করিতে হইয়াছে। * তাঁহার গ্রন্থ-প্রকাশের পর রামপ্রসাদ সেন সম্বন্ধে একমাত্র উল্লেখ-যোগ্য আলোচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়, ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসের "ভারতবর্ষে"র একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত আলোচনা-সমূহ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কাব্য ও পদাবলীকে সাহিত্যিক রীতিতে পরীক্ষা করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। অধিকাংশ সমালোচকই রামপ্রসাদের সাধনপন্থা ও আধ্যাত্মিকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি তাঁহার সাধকভাব শিরোধার্য্য করিয়া, মুখ্যতঃ তাঁহাকে রসস্রষ্টা কবিরূপেই দেখিব।

রামপ্রসাদের রচনা হইতে তাঁহার জীবনীর উপাদান

রামপ্রসাদ সেন কোন সালে জন্মিয়াছিলেন, কখন কোন গ্রন্থ রচনা করেন বা কবে তিরোহিত হন, সে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা যায় না। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'কবিচরিত' গ্রন্থে লেখেন—"রামপ্রসাদ কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার ঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না; ১৬৪৪ বা ১৬৪৫ শকে তাঁহার জন্ম হওয়া সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয়।" তাহার চারি বৎসর পরে রামগতি ন্যায়রত্ন লেখেন—"অনুমান ১৬৪০—১৬৪৫ শকের মধ্যে প্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।" এই সময়কেই খৃষ্টীয় শতাব্দীতে রূপান্তরিত করিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রামপ্রসাদের জন্ম ১৭১৮ হইতে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। পরবর্ত্তী কোন আলোচনায় ইহার অপেক্ষা নিশ্চিততর কোন তারিখ পাওয়া যায় নাই। ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকে, ১১১৯ সালে বা ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। অনুমান হয়, রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে আট দশ বৎসরের ছোট ছিলেন।

রামপ্রসাদের তিরোধান-কাল সম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত আছে। W. H. Carey বলেন যে, রামপ্রসাদ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া লেখেন যে, ১৭৫৮ হইতে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রামপ্রসাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ রামপ্রসাদের মৃত্যুকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রামপ্রসাদের বংশধরদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পান। ক্যারী প্রভৃতির মত সত্য হইলে, এবং ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে রামপ্রসাদের জন্ম হইলে, তাঁহার জীবনকাল মাত্র ৪৪ বৎসর হয়। অথচ রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত পদাংশগুলি হইতে মনে হয়, তাঁহার বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের উপর হইয়াছিল।

(১) প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্ত কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল॥

(১৪৫ সং পদ) *

---

* রামপ্রসাদ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনার তালিকা।—খৃষ্টাব্দানুসারে সময় লিখিত হইল।

(১) ১৮৫২, হরিমোহন সেন, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক পত্রিকায়।

(২) ১৮৫৩, ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদপ্রভাকর' ১লা আশ্বিন, ১লা পৌষ, ১লা মাঘ ও ঐ সালে প্রকাশিত "প্রসাদগ্রন্থাবলী"।

(৩) ১৮৬৯, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কৃত "কবিচরিত"।

(৪) ১৮৭৩ রামগতি ন্যায়রত্ন, ''বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব''।

(৫) ১৮৭৫ দয়ালচন্দ্র ঘোষ, 'প্রসাদ প্রসঙ্গ'।

(৬) ১৮৮০ যোগেন্দ্রনাথ বসু, 'কবিরঞ্জন গ্রন্থাবলী'।

(৭) ১৮৮৬, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নব্য ভারত" ফাল্গুন, ১২৯২।

(৮) ১৮৯৪ কাব্যবিশারদ, 'প্রসাদপদাবলী'।

(৯) দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

(১০) হারাণচন্দ্র রক্ষিত, 'ভিক্টোরিয়া যুগে বঙ্গ-সাহিত্য'।

(১১) বিশ্বকোষ।

(১২) ১৮৯৯ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ১৩০৬, তৃতীয় সংখ্যা, আনন্দনাথ রায়ের প্রবন্ধ।

(১৩) ১৯০৬ কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, 'বঙ্গীয় কবি'।

(১৪) ১৯১৩ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩২০ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।

(১৫) ১৯১৬ চিত্তরঞ্জন দাশ, ১৩২৩ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।

(১৬) ১৯১৭ সরলা দেবী, ১৩২৪ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।

(১৭) মতিলাল রায়, 'প্রবর্ত্তক' ১৩৩২, আশ্বিন।

* অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রামপ্রসাদ' গ্রন্থে সংগৃহীত পদের সংখ্যা এখানে দেওয়া হইল ও পরে দেওয়া হইবে।

(২) এবার যে খেলা খেলালে মাগো
আশা না পুরিলো ॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়
যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে
ঘরে নিয়ে চলো ॥ (১১ সং পদ)

(৩) (আমার) এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥
(১২ সং পদ)

পঞ্চাশ বৎসরের বেশী বয়স না হইলে, আমাদের দেশে কেহ নিজের সম্বন্ধে বৃদ্ধকাল, জীবনসন্ধ্যা বা শেষের দশা শব্দ প্রয়োগ করেন না। এইজন্য মনে হয়, রামপ্রসাদ সেন ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া, পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বৎসর, অর্থাৎ প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমান কাল জীবিত থাকিয়া ১৭৭৪ বা ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন।

এত অনুমান করিয়া যাঁহার জীবিতকাল নির্ণয় করিতে হয়, তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদগুলি কত দূর নির্ভর-যোগ্য, বলা কঠিন। গুপ্তকবি প্রভৃতির দ্বারা সংগৃহীত প্রবাদগুলির মধ্যে কিছু সত্য থাকা সম্ভব, কেননা ঐ সমস্ত প্রবাদের সমর্থক উক্তি আমরা রামপ্রসাদের রচনা হইতে বাহির করিতে পারি। প্রবাদের মূল্য যাহাই হউক না কেন, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে তাঁহার রচনার সাক্ষ্য যারপর নাই মূল্যবান্। সেইজন্য আমি অন্যান্য লেখকদের ন্যায় প্রবাদগুলির পুনরাবৃত্তি না করিয়া, তাঁহার রচনা হইতে জীবনী বাহির করিবার চেষ্টা করিব।

রামপ্রসাদ তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে 'সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তির' শেষে লিখিয়াছেন—

ধন হেতু মহাকুল পুর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণবন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥
সেই বংশ-সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনতির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয় ॥
তদঙ্গজ রাম রাম মহাকবি গুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

কবির এই বংশপরিচয় হইতে বুঝা যায় যে, তিনি এক সম্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ শক্তির উপাসক ছিলেন। কবির কালীভক্তি তাঁহার পারিবারিক আবেষ্টনীর ফল। ১৩০৬ সালের 'সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার' তৃতীয় সংখ্যায় আনন্দনাথ রায় ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা হইতে শ্লোকাদি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, যে চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কবির পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীহর্ষ সেন নবাব ফকিরুদ্দীনের নিকট হইতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত সেনভূম পরগণা ও রাজা উপাধি পান। কবি কর্ত্তৃক উল্লিখিত কৃত্তিবাস শ্রীহর্ষ সেনের অষ্টম অধস্তন পুরুষ। কৃত্তিবাস হইতে রামেশ্বর নবম অধস্তন পুরুষ। কবির পিতা রামরাম সেনও কবিত্ব প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, নতুবা কবি তাঁহার প্রতি 'মহাকবি গুণধাম' বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন না। কাব্য আলোচনার আব্‌হাওয়ার মধ্যে রামপ্রসাদের বাল্যকাল অতীত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে।

কিন্তু কবি লিখিয়াছেন—

"আমার কপালে গো তারা!
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোনকালে ॥
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে। *
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে ॥
স্রোতের সেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবে না অগাধ জলে ॥
(২২ সং পদ)

প্রবাদ,—কবির ষোল বছর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়; ঐ সময়কেও শিশুকাল বলা যাইতে পারে। উদ্ধৃত কবিতায় রাজ্য শব্দে জমিদারী বুঝিতে হইবে। আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে একজনের জমীদারী ছলে বলে

* ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই পাঠস্থলে 'শিশুকালে মাতা মল' পাঠ ধরিয়াছেন; কিন্তু অন্য সকল সংগ্রহকারই 'পিতা' শব্দ লিখিয়াছেন। পরের পক্ষে রাজ্য লওয়া সম্ভব হয় পিতা মরিলে, মাতা মরিলে নহে।

অন্যের পক্ষে অধিকার করা অসাধারণ ঘটনা ছিল না। কবি শৈশবকালে স্বচ্ছলতার মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ভাবপ্রকাশের মধ্যে একটি অসামান্য তেজস্বিতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি পিতৃবিয়োগের পর দুঃখ-দুর্দ্দশায় পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কখনও বড়লোকের তোষামোদ করিয়া আর্থিক সুবিধা-লাভের চেষ্টা করেন নাই। তিনি বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছেন—"ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে"। রামপ্রসাদ এমন এক যুগে জন্মিয়াছিলেন, যখন বাঙ্গালা দেশে রাষ্ট্রশক্তি শিথিল হওয়ায় ধনী ও মধ্যবিত্তদের অবস্থার বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। যাঁহারা স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ, তাঁহাদের মনে এমন যুগে বৈরাগ্যের উদয় হওয়া বিচিত্র নহে। তাহার উপর আবার কবি স্বয়ং ভাগ্য-বিপর্য্যয় ভোগ করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত পদে প্রকাশ, তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহই তাঁহার দুঃখের দিনে সাহায্য করেন নাই। ইহার ফলেও কবির মনে সংসারের প্রতি অনাস্থা জন্মিবার কথা।

কবির জন্মভূমি 'কুমারহট্ট' গ্রাম প্রসিদ্ধ সাধকের স্থান। কবি নিম্নলিখিত পদাংশে তাঁহার জন্মস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন—

> হালিসহর পরগণায় বসত, কুমারহট্ট গ্রামবাসী।
> সে যে রামপ্রসাদ কিঙ্কর, ভদ্রকালী-পদ-অভিলাষী॥
>
> (২৬৫ সং পদ)

নিজের গ্রাম যে পুণ্যস্থান, তাহা কবি 'বিদ্যাসুন্দরে' বলিয়াছেন—

> "ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
> তার মধ্যে সিদ্ধ পীঠ রামকৃষ্ণ-ধাম॥"
> শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।

কুমারহট্ট গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানে শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সঙ্গী শ্রীবাসাদি চার ভাইয়ের বাড়ী ছিল। ইহার নিকটবর্ত্তী কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেন ও তৎপুত্র কবি কর্ণপুর বাস করিতেন। এই অঞ্চলে বৈষ্ণব প্রভাব এককালে খুবই প্রবল ছিল। রামপ্রসাদের উক্তি হইতে জানা যায় যে, কুমারহট্ট সিদ্ধপীঠ বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কবির বংশ কালীর ভক্ত, তাঁহার জন্মভূমি কালীর পীঠস্থান। এ ক্ষেত্রে কবির পক্ষে কালীর প্রতি অনুরাগ জন্মান স্বাভাবিক। কিন্তু জন্মভূমিতে বৈষ্ণবীয় সংস্কার প্রচুর ছিল বলিয়া তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাবও সংক্রামিত হইয়াছিল।

কবি পিতৃ-সম্পত্তিচ্যুত হইয়া জমীদারী সেরেস্তায় চাকুরী করিয়াছিলেন। গুপ্তকবি লিখিয়াছেন "কেহ কেহ কহেন রামপ্রসাদ খিদিরপুরস্থ ৺দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন কলিকাতাস্থ নবরাজ কুলপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরিগিরি কার্য্য করিতেন।" কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-বিনোদ মহাশয় ১৩০২ সালের 'সজ্জনতোষিণী-পত্রিকা'য় লিখিয়াছেন যে, রামপ্রসাদ চুঁচুড়ার শীলবাবুদের বাড়ীতে চাকুরী করিতেন। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শুনিয়াছিলেন, যে প্রসাদ কিছুদিন বাগবাজারের মদনমোহনপ্রতিষ্ঠাতা গোকুল মিত্রের বাড়ীতে চাকুরী করেন। আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি হুগলিতে গোকুল সরকারের বাড়ীতে এবং সামান্য কয়েকদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কণ্ট্রাক্টর কৃষ্ণ মল্লিকের বাড়ীতে কাজ করেন। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রসাদের খিদিরপুরে ঘোষাল বাড়ীতে এবং কলিকাতায় দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতে এই দুই স্থানে চাকুরীর কথা মানিয়া লইয়াছেন। রামপ্রসাদ নিজে লিখিয়াছেন—

> (তারা) যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।
> তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে॥
>
> (১২ সং পদ)

এই পদ্যাংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কবি অনেক জায়গায় চাকুরী করিয়াছিলেন, নতুবা 'দেশ বিদেশে' পদ প্রয়োগ করিতেন না।

রামপ্রসাদ যে দীর্ঘকাল জমীদারী সেরেস্তায় চাকুরী করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পদগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। সামান্য দু'চার বছর চাকুরী করিলে তাঁহার পদাবলীর মধ্যে জমীদারী-সংক্রান্ত এত উপমা পাওয়া যাইত না। আমার মনে হয়, জমীদারী সেরেস্তায় কাজ করিতে করিতে উহাতে ব্যবহৃত কথাবার্ত্তার ধরণধারণ

তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। নিম্নে তাঁহার পদাবলী হইতে ধরণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলাম :—

(ক) জমী বা ধন বাজেয়াপ্ত হওয়ার উপমা—

সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজেয়াপ্ত হবে জান না॥ (পদ-সংখ্যা ৬)

(খ) দেবোত্তর সম্পত্তির দলিল লইয়া উপমা—

প্রসাদ বলে, হৃদিভূমির বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণা কালীর, দেবোত্তর দাগাচিটা॥
(পদ-সংখ্যা ৫৬)

(গ) লোকসানি মহালের ও অনাবাদী জমীর জন্য খাজনা মাপ হওয়ার উপমা—

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমি।
তাই বারে বারে নালিশ করি দিতে হবে কমী॥
(পদ-সংখ্যা ৬৭)

(ঘ) দলিল লইয়া মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত উপমা—

(১) শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নায়েব আগে,
ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
(৬৮ সং পদ)

'ডিক্রী' শব্দ রামপ্রসাদের সময়ে, সুপ্রীম-কোর্ট-স্থাপনের পূর্ব্বে, এত বেশী প্রচলিত হইয়াছিল কি? না হইবার বেশী সম্ভাবনা হইলে, এই পদ রামপ্রসাদের লেখা নহে বলিতে হইবে।

(২) আমার হাজির জামিন ষড়ানন
সাক্ষী আছে নন্দীবরে॥
সনদ আমার উরস পাটে, যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে,
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ করেছেন দিগম্বরে।
(পদ-সংখ্যা ৭০)

(ঙ) খাস তালুক লইয়া উপমা—

কেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুখা হাজা,
দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা।

(চ) জমী ইজারা দেওয়া লইয়া উপমা—

ইজারার পাট্টা পেয়ে।
এত কি গৌরব বেড়েছে॥ (পদ-সংখ্যা ৭৪)

(ছ) জমীদারী দরবার লইয়া উপমা—

(ক) জানিলাম বিষম বড় শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে॥
আরজ বেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাগ্য কিয়ে।
দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথার রে॥
(৭৮ সং পদ)

(খ) হুজুরেতে আরজী দিয়ে মা
দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা,
নিস্তার পাব এ সঙ্কটে॥ (১০৬ সংখ্যক পদ)

(জ) বাকী খাজনার উপমা—

মহেশ্বরী আমার রাজা আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকিরে॥ (১২৪ সংখ্যক পদ)

(ঝ) বাজে জমার উপমা—

বাজে জমা পাওনি যে মা ছাঁটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা, কবচ রাখি সালতামামি॥
(১৩০ সংখ্যক পদ)

(ঞ) জমা ওয়াশীল, বকেয়া বাকী সংক্রান্ত উপমা—

মা! আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে।
* * *
জন্ম জন্মান্তরের যত, বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমায় কমি খরচ বেশী, তলব কিসে রাজার কাছে॥
(১৩৫ সংখ্যক পদ)

(ট) কিস্তিবন্দী খাজনা দেওয়ার উপমা—

এ যে বড় বিষম লেটা।
যেটা কবুলতি সেই সত্য হল, মিথ্যে করে দিলি পাটা॥
এক জনাকে জমী দিলি মা, ভাগ করিয়ে দিলি ছটা।
এবার ভবেতে ভূমিষ্ঠ হয়ে, আমায় সইতে হল খোঁটা॥
জমী জরিপ করে দিলি মা, কোণে কোণে মেপে কাঠা।
এবার কিস্তির সময় বুঝবে শম্ভু, আমি কেমন কালীর বেটা॥
প্রসাদ বলে ওমা তারা, এবার কেমন উল্টা লেটা।
আমি কিস্তিমত খাজনা দিলাম, তবু টাকার সিকি বাটা॥
(২৬৯ সংখ্যক পদ)

বাঙ্গালাদেশে প্রাচীনকালে যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই কিছু না কিছু জমীজমা ছিল, মালাধরবাবু, জয়নারায়ণ ঘোষাল, রাজচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি জমীদার ছিলেন, কিন্তু কাহারও লেখায় জমীদারী-সংক্রান্ত এত কথা দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রও রাজসভার আওতায় বসিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, কিন্তু জমীজমা, বিচার আচার লইয়া এত উপমা তিনি দেন নাই। রামপ্রসাদ দীর্ঘ দিন জমীদারী সেরেস্তায় জমা-ওয়াশীল, বাকী খাজনা আদায়, জরীপ, খাজনা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি নানাবিধ কাজে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়াই ঐ সব ব্যাপারের সংস্কার তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং পারমার্থিক চিন্তাতেও তিনি উহার উপমা টানিয়াছেন। আমার এই অনুমান যদি যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কবি যে সামান্য দিন মাত্র চাকুরী করিয়া প্রভুর নিকট হইতে ত্রিশ টাকা করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়া স্বগৃহে চলিয়া আসেন, এই প্রচলিত কাহিনী বিশ্বাস করা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবির চাকুরী-জীবন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "বিষয়-বাসনা-বিহীনতা জন্য তৎকর্ম্মে তাঁহার মনের অভিনিবেশ মাত্র ছিল না।" কিন্তু প্রশ্ন এই যে, অভিনিবেশ না থাকিলে জমীদারী ব্যাপারের এত উপমা তিনি পদাবলীতে দিলেন কিরূপে?

সাধনরাজ্যে অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পর যে রামপ্রসাদ চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহার প্রচুর সাক্ষ্য তাঁহার পদাবলীতে পাওয়া যায়। উপরে লিখিত বিচারের দ্বারা আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, তিনি অল্পদিন চাকুরী না করিয়া বেশীদিন করিয়াছিলেন। যদি এরূপ বলা যায় যে, তিনি চাকুরীর অল্পকালের মধ্যে যে কয়টি পদ লিখিয়াছিলেন, তাহাই আমি বাছিয়া বাছিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও সঙ্গত হইবে না। কেননা উদ্ধৃত পদসমূহে কবির সাধনার বিভিন্ন স্তরের ইঙ্গিত রহিয়াছে—যথা ভবভীতি, তাহা হইতে ত্রাণ করার প্রার্থনা, গভীর আত্মসমর্পণ, মায়ের উপর দাবী এবং অভিমান।

চাকুরী করার সময়েই বোধ হয় কবি 'বিদ্যাসুন্দর' লিখিয়াছিলেন, কেননা যে বৈরাগ্যবোধের তীব্রতাহেতু তাঁহার পক্ষে চাকুরী করা সম্ভব হয় নাই, সেই বৈরাগ্য অবস্থার সঙ্গে আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর রচনা খাপ খায় না। চাকুরী করিলেও, কবির অবস্থা যে স্বচ্ছল হয় নাই, তাহার আভাষ 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠ করিলে পাওয়া যায়। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবদেবীর স্তব করিতে যাইয়া লক্ষ্মীবন্দনায় লিখিয়াছেন—

> সর্ব্বগুণহীন যদি ধনবান্ হয়।
> তৃণ তুল্য ধারে তার কত গুণালয়॥
> তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য।
> সত্ত্ব দানে বিত্তগুণে সে লভে সাযুজ্য॥
> * * *
> বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।
> থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে॥
> কি আর কহিব বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ।
> বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ॥

এই বর্ণনার মধ্যে কবির নিজের অবস্থার প্রতি আক্ষেপ ব্যক্ত হয় নাই কি? অবশ্য লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কবি ধনের সার্থকতা দেখিয়াছেন সাত্ত্বিক দানে। তিনি যে অর্থাভাবে ইচ্ছামত দান করিতে পারিলেন না, এ দুঃখ জীবনে কখনও ভুলেন নাই। তিনি পদাবলীর বিভিন্ন স্থানে বলিয়াছেন—

> "এমা! দিতিস্ দিতাম, নিতাম খেতাম, মজুরি বাড়িয়ে তোর" (৫৩ সং পদ)
>
> "জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দানধর্ম্ম তদুপরি।" (৪৮ সং পদ)

চাকুরী ছাড়ার পর কবির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছিল। পদাবলীর নানাস্থানে এই দারিদ্র্য-দুঃখের কথা আছে। কখনও বা তিনি দুঃখে কাতর হইতেন, মায়ের উপর অভিমান করিতেন, আবার কখনও ভাবিতেন এ তো মায়ের কৃপা। তিনি দুঃখের জ্বালায় মায়ের উপর অভিমান করিয়া বলিয়াছেন—

> একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বলবে লোকে।
> ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥
> সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখলে যারে পরম সুখে।
> ওমা আমি কত অপরাধী, নুন মেলে না আমার শাকে।
>
> (১৫২ সং পদ)

মায়ের উপর অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টাও এখানে আছে। কবি ভাবিতেছেন —আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি বলিয়াই আমার এত দারিদ্র্য।

কবি চাকুরী ছাড়ার পর বোধ হয় চাষবাস করিয়া জীবনধারণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

অন্নত্রাসে প্রাণে মরি
নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে,
কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি॥ (৮২ সং পদ)

পদাবলীর বহু স্থানে আবাদী জমির ও কৃষি-কর্ম্মের উপমা দেখিতে পাই। বাহুল্য-ভয়ে আর দৃষ্টান্ত দিলাম না।

কবির হৃদয় অত্যন্ত স্নেহ-প্রবণ ছিল। তিনি স্ত্রীকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন; এমন কি নিজের চেয়েও তাঁহাকে মা তারার অধিকতর কৃপাপাত্রী বিবেচনা করিতেন। সেইজন্য বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থলে ভণিতায় বলিয়াছেন—

ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে?

উক্ত গ্রন্থে তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনের নামাদি উল্লেখ করিয়া কালীর নিকট তাঁহাদের মঙ্গলকামনা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ না থাকিলে, এরূপ করিতেন না। তিনি শাক্ত হইলেও, বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত পয়ার উদ্ধার করিতেছি—

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী।
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥

তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অম্বিকা দেবী। কিন্তু তাঁহার নাম আগে না করিয়া ভবানী দেবীর, তাঁহার স্বামীর এবং জগন্নাথ ও কৃপারাম ভাগিনেয়দ্বয়ের কথা আগে বলায়, মনে হয় কবি যখন কলিকাতায় চাকুরী করিতেন, তখন বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ লিখিত হয়। কলিকাতায় ভবানী দেবীর বাড়ীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন বলিয়া তাঁহার পরিবারের কথাই আগে লিখিয়াছেন। তারপর অম্বিকা দেবীর, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরামের, কন্যা জগদীশ্বরীও ছোট ভাই বিশ্বনাথের কথা বলিয়াছেন। কবি তাঁহার বড় মেয়েটীকে বড়ই ভালবাসিতেন। বিদ্যাসুন্দরের কয়েক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥

বিদ্যাসুন্দর-রচনার সময় তাঁহার বড় ছেলে রামদুলাল জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে রামপ্রসাদের যে পুত্রের বংশধরগণ জীবিত আছেন, সেই পুত্র রামমোহন সেন তখনও জন্মেন নাই। যাহা হউক, জানা যাইতেছে যে, কবির দুই পুত্র ও দুই কন্যা হইয়াছিল।

কবি সম্ভবতঃ সামান্য কাঁচা বাড়ীতে বাস করিতেন। রূপকচ্ছলে তিনি বলিয়াছেন—

থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥
(১৫৪ সং-পদ)

এটী অবশ্য দেহঘরের কথা, কিন্তু ইহার মধ্যে কবির বাসস্থানের কিছু ইঙ্গিত থাকিলেও থাকিতে পারে।

কবি শেষ বয়সে ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

"(আমার) এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে॥"

ভাবরাজ্যে তখন কবি সর্ব্বদাই বাস করিতেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। তিনি গাহিয়াছেন—

"বিষয়বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি"
(পদ সং ১০২)

শেষ জীবনে তিনি পুত্র-পরিবার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে তাঁহার নিজের লেখা পদ হইতে বুঝা যায় যে, তিনি এই সময়ে বস্তুতঃ সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি জাতি, ধর্ম্ম ও লোকাচারের আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে হয়তো তাঁহাকে একঘরেও করিয়াছিল—

"আমায় ছুঁওনারে শমন, আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোন্ রে শমন, বলি আমার জাত কিসে গিয়াছে।
আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে॥"
(৯৫ সং পদ)

কবির মনে কাশীতে যাইবার ইচ্ছা বহুবার উদিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমে অর্থাভাবে যাইতে পারেন নাই। "আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারাণসী," ব্যর্থকাম হইয়া তিনি মনকে বুঝাইতেন—

কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্য-রাশি॥

প্রবোধ দিলেও মন বুঝিত না। তাই তিনি গাহিয়াছেন—

"তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।"

তারপর অন্নপূর্ণা কবির মনোগত অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। কবি কাশী দর্শন করিয়া কয়েকটী সুন্দর পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

কবির গুরু কে ছিলেন, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। অনেকে শ্রীনাথকে কবির গুরু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে প্রসাদের পদাবলী প্রভৃতিতে উক্ত "শ্রীনাথ কোন ব্যক্তির নাম বলিয়া মনে হয় না। কারণ কোথাও লৌকিক গুরুর নামোল্লেখ করিতে শিষ্যকে দেখা যায় না।" তিনি পূর্ণানন্দ স্বামীর "ষট্‌চক্র-নিরূপণ" হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তন্ত্রে 'শ্রীনাথ' শব্দের অর্থ 'গুরু'। এই মত দুইটী কারণে আমি মানিয়া লইতে পারিলাম না। প্রথমতঃ, 'শ্রীনাথ' শব্দের অর্থ 'গুরু' হইতে পারে, কিন্তু 'শ্রীনাথ দত্ত' যে ব্যক্তি-বিশেষের উপাধিযুক্ত নাম, তাহা অস্বীকার করা যায় কিরূপে? রামপ্রসাদ কয়েক স্থানে শুধু শ্রীনাথ, এবং কয়েক স্থানে দত্ত উপাধিযুক্ত শ্রীনাথের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা

"মনরে ওরে, শ্রীনাথ দত্ত, ধর তত্ত্ব কালের কপাট খোল না।"
"আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত্ব, মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা॥"

দ্বিতীয়তঃ, শিষ্য যে গুরুর নাম উল্লেখ করেন নাই এরূপ নহে। কবি কর্ণপুর তাঁহার 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' এবং 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে', এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার স্তবমালা এবং 'দানকেলিচিন্তামণি' গ্রন্থে গুরুর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কবির জীবনী সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি বিদ্যাসুন্দর লিখিবার পূর্ব্বেই গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় লৌকিকভাবে পূর্ণ নহে। এই তত্ত্ব পরে ব্যাখ্যা করিব। রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দরে'র কালীবন্দনায় লিখিয়াছেন—

ভয় নাহি, ভয় নাহি, ভয় নাহি আর।
শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার॥

স্থিতি-পূর্ণতা

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

মায়ের পানে ছুটে শিশুর অফুরন্ত প্রাণ—
তোমার পানে হৃদয় মম তেমনি লীয়মান।
হাত রয়েছে তোমার হাতে,
নিত্য রাখা দিবস রাতে
সকল বিপদ মাঝে আন অসীম আবসান।

অভয় তব স্নেহ-হাসি চির উজল আলো,
সেই হাসিতেই ভেসে গেছে মলিন তমঃ কালো!
নিত্য-সুধা মহোৎসবে—
স্নিগ্ধ তোমার অনুভবে
ধন্য আমি, পূর্ণ আমি, অমর, মহীয়ান।

বেদের দেশের রাজপুত্র

(গল্প)

শ্রীসরোজকুমার নন্দী

অনেকদিন পর ক'লকাতায় এলাম। বিভূতি কি ক'রে জানতে পেরে নেমন্তন্ন ক'রে গেল। বিভূতিদের বাড়ীতে গেলাম তারপর দিন। অনেকদিন পর আমাকে কিছুক্ষণের জন্য পেয়ে ওরা সবাই বেশ আমোদ পাচ্ছিল। বিভূতির স্ত্রী হঠাৎ 'আপনি' বলেই পরে সংশোধন ক'রে নিল, 'আপনি—তুমি সত্যিই এতদিন পর এলে! মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমাদের বুঝি তুমি ভুলে গেছ।'

পূর্ণিমা ছিল সেই ধরণের মেয়ে, যারা যার সঙ্গেই কথা বলে তাকেই আপন ক'রে টেনে নেয়, বন্ধু বলে অন্তরঙ্গতায় এগিয়ে আসে, আত্মীয় বলে' সেবায় অনর্গল হ'য়ে উঠে।

ওদের ছেলেটা হয়েছে খুব সুন্দর। বয়স বেশী নয়। পূর্ণিমা শিখিয়ে দিলে আমাকে 'কাকাবাবু' বলে' ডাকতে। মার কাছ থেকে সুকু স্বচ্ছন্দ ছন্দটুকু চুরি করেছিল। অজস্র কথার বন্যায় আমাকে ভাসিয়ে দিতে ওর একটুও দ্বিধা হ'ল না।

দুপুরে একটু গড়াচ্ছি বিছানায়, একটু ঝিমুটি ঘুমের আশায়। নইলে সারাটা দিন গা' ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করবে। ইতিমধ্যে ভুঁড়ি দেখা গেছে। বিশ্রামেরও একটা মাত্রা, সময়ও আছে।

সুকু চঞ্চল উত্তরে হাওয়ার মত ঘরে ঢুকে আমাকে একেবারে এলোমেলো ক'রে দিল। চুলগুলো টেনে এনে কপালের ওপর জড়ো করল, গেঞ্জিটা বুকের ওপর তুলে ভুঁড়িতে একটু হাত বুলিয়ে দিল, দু'হাতে ধরে আমাকে ঝট্‌কা দিয়ে বসিয়ে দিল।

—'এই কাকু, দিনে ঘুমোও কেন? বাবা মাঝে মাঝে ঘুমোয়, আর ঘুম ভাঙ্গলে পর বিকেলে সে যা বকুনি! ওকী চোখ বন্ধ করছ কেন? বসে বসে ঘুমোতে ঘুমোতে পড়ে গিয়ে শানে মাথা ঠুকে যাবে না!' দু'হাতে টেনে আমার চোখের পাতা খুলে দিল সুকু।

আমি একটু হেসে বললাম, 'কার কাছে বকুনি খায় তোর বাবা'!

—'আবার কে, মা! উঃ, এমনিতে লোক খুব ভাল, কিন্তু রাগলে আর রক্ষে নেই।'

—'তোর মা কি করছে রে! তোর বাবা অফিস থেকে আসবে কখন!'

—'চারটের সময় বাবার ছুটী, আমাদের ইস্কুল কিন্তু তিনটেয়। আজ তুমি এলে কিনা, তাই আর ইস্কুল গেলাম না। গেলে একা একা তুমি থাকতে কি ক'রে?'

—'কেন, তোর মা ত' থাকত, তার সঙ্গে বসে বসে গল্প করতাম।'

সুকু এক ফুঁ দিয়ে আমার কথাগুলো উড়িয়ে দিল। —'হ্যাঁ, মা আসছে তোমার সঙ্গে গল্প করতে। মার ত' আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! মার কত কাজ জান তুমি! এখন মা বিকেলের জন্য খাবার করছে। যাও রান্নাঘরে, দেখে এস, মা কোমরে কাপড় জড়িয়ে পরোটা ভাজছে। জুতো পায়ে ঢুকো না যেন!'

আমি সুকুকে কোলের কাছে টেনে নিলাম। কিন্তু ও সরে' বসল। বোধ হয় ওর মনে গর্ব্ব আছে—ও যথেষ্ট বড় হয়েছে। কারও কোলে বসে গল্প করার বা শোনার ছেলেমানুষী অনেকদিন আগেই ও কাটিয়ে এসেছে। আমি অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠলাম ওর এই সুন্দর মুখের ছোট ছোট কথায়। সরল মনের আয়নায় যা দেখেছে, তারই প্রতিচ্ছবি রয়েছে স্পষ্ট। সতেজ স্মৃতি ওর দেখা কোন একটা দৃশ্যকে মুছে ফেলতে পারে না। ও যা দেখে, তা ভোলে না।

শিশুর সঙ্গ আমার ভাল লাগে। পৃথিবীর ধুলো, ধোঁয়ার আবিলতা এখনও ওকে স্পর্শ করেনি। কিছুক্ষণের জন্যেও অন্ততঃ এমন একটা মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যে মন' পেতে আমি আমার এতগুলো রোদে পোড়া, জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধ অন্ধকারে কালো দিনগুলিকে,—আমার বয়সকে তুচ্ছ করতে পারি।

সুকু চুপ ক'রে থাকার ছেলে নয়। বলল, কি ভাবছ! বাবা না থাকাতে তোমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না কাকু! আমার সঙ্গে গল্প কর না! দেখবে আমার ছবির এলবাম্। খুব ভাল ছবি। দাঁড়াও আনি।

আমি খুব যেন উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছি ওর ছবি দেখবার জন্য, এমনিভাবে বললাম, 'আন ত তাড়াতাড়ি,

তোর মা আসবার আগে। সে এলে আর তোর সঙ্গে গল্প করা হবে না। সে একাই বলবে, কাউকে বলতেও দেবে না।'

স্বকু একখানা সুদৃশ্য এলবাম আনল। আমার পাশে চেপে বসে' খুলল প্রথম পৃষ্ঠা।—'চেন একে? চেন না। এমনিতে চেহারা দেখছ, বেশ ভদ্রলোকের মত; কিন্তু সাজলে এমন ছেলে নেই, যে ভয় পেয়ে না চীৎকার করে ওঠে।'

আমি স্বকুর বর্ণিত ভদ্রলোককে দেখলাম। ভয় পাবার এমনিতে কিছুই নেই, কারণ সাজে নি। আমি বললাম, 'স্বকু, ইনি কে?'

স্বকু এমন চোখ করল, যেন কলম্বস জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করছে। আমার মত লোক নাকি জীবনে ও আর দেখেনি, একথা অবিশ্যি পরে জানতে পারলাম।—'কি আশ্চর্য্য, কাকু, তুমি চ্যানিকে চেন না! তুমি বায়োস্কোপ দেখেছ, টকী, টকী! এরা তাতে পার্ট করে। কিন্তু শুনলে তোমার কষ্ট হবে—'। স্বকু কাতরভাবে চোখ নামাল ছবির ওপর।

আমি হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে সচেতন হলাম। এর মধ্যে আমার বিপদের কি কারণ ঘটল। বললাম, 'বল না, আমার কোন কষ্ট হবে না, কী হয়েছে?'

স্বকু ধীরে চোখ তুলে' আমার চোখে তাকাল।—'ইনি আর নেই, মরে গেছেন। শুনেছি কতকগুলো আমার মত ছেলে ওর ছবি দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তারপর থেকে ওকে আর দেখা গেল না। সত্যিই ভয় পাবার কি আছে, বলত কাকু!'

'সত্যিই ত,' আমি বললাম, 'ভয় পাবার কি আছে! কিন্তু স্বকু, তুই এসব খবর যোগাড় করলি কি করে'? আর এসব ছবি তোকে কে এনে দিল? আমার দুঃখ হচ্ছে তোর কথা শুনে,—হায়, চ্যানি আর বেঁচে নেই!' স্বকুর থেকেও আমার কাতরতা বেশী পরিস্ফুট হল। আমার কপটতা স্বকুর সরলতা ছাপিয়ে এমনি করে' জয়ী হল।

স্বকু সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল আমার দিকে। আমার দুঃখ হ'লে ওর একটু আনন্দ হয়। কারণ, মানুষ চায় তার নিজের ভাবের আয়নায় অপরকে প্রতিফলিত দেখতে। হতাশ হবার কোন কারণ না পেয়ে বলল, 'তুমি ভারি বোকা! বাংলাতে এদের কথা সব লেখা নেই আমার বইতে! আমার পড়ার বই নয়, ছবির বই। আর এই ছবি কোথায় পেলাম জান? দাঁড়াও দেখাচ্ছি।' এলবামটা আমার কোলের ওপর রেখে ও নেমে গেল। আমি অন্য ভাবনায় তলিয়ে গেলাম। ভাবছিলাম—বেশ আছে এরা। বিভূতি, পূর্ণিমা আর ওদের মাঝখানে স্বকু দু'জনকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিভূতি এলে বলতে হবে এক খানা ফটো তুলিয়ে রাখতে এখুনিই, পরে কি হবে জানা যায় না। বিভূতির মনে যদি কালি ধরে, পূর্ণিমার চুড়ি যদি সংসারের ছুটো-ছাটা কাজে আর তেমনি স্বরে না বাজে, ধুলো-ধোঁয়ায় স্বকুর চোখ যদি ঘোলাটে হ'য়ে আসে।

—'হ্যাঁ, কোথায় ছবি পেলাম, দেখ!' স্বকু একটা চকোলেটের চক্চকে কাগজ ছিঁড়ে বার করল একখানা ছবি, কোন মেয়ের।—'দেখলে ত, এই ছবি কার, নীচের নাম না পড়ে' আমি বলে' দিতে পারি। এই ছবি আমার আরও তিনখানা আছে। এগুলো নিয়ে আমার ছবির এলবামে আঠা দিয়ে এঁটে রাখি।'

—'ও, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। কিন্তু মেয়েটা কে, বেঁচে আছে ত?'

—'কি আশ্চর্য্য কাকু, তুমি ওকে পর্য্যন্ত চেন না! ও যে শার্লি—'। স্বকু এমনি স্বরে নামটা উচ্চারণ করল, যেন ওর সঙ্গে ও রোজ খেলা করে। এত ঘনিষ্ঠ ওর পরিচয়।

স্বকু বিস্ময়ের চমক কাটিয়ে উঠে বলল, 'শার্লির কত ছবি যে আমি দেখেছি। সেই একখানা দেখলাম, শুনবে কাকু?'

—'বল'।

—'শার্লিকে ত ধরতে এসেছে কা'রা। কতকগুলো সৈন্য, বন্দুক হাতে, ইয়া সঙ্গীন! শার্লি টের না পেয়ে কোথায় কোন খাটের তলায় লুকিয়ে রইল। সৈন্যরা খুব তোলপাড় ক'রে খোঁজাখুঁজি সুরু করল। কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকবে বল, টেনে বার করল খাটের তলা থেকে। কিন্তু ওরা অবাক্, এত শার্লি নয়। কোন একটা নিগ্রো মেয়ে। বাবা বললেন সেদিন, নিগ্রোরা নাকি কালো

হয়। তারপর সেই বাড়ীতে অনেকগুলো নিগ্রো ছিল, কালো কালো। তাদের সঙ্গে ওকেও ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ সে এক ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সৈন্যের হাতটা লেগেছিল বুঝি ওর গালে। একটুখানি জায়গা সাদা হয়ে রয়েছে। তখন রগড়াতেই বোঝা গেল শার্লির চালাকি। জুতোর কালি বুঝি ছিল খাটের তলায়, তাই মেখেছে সারা মুখে।

শার্লির দুষ্টুমি বুদ্ধিতে আমায় হাসতে হল, আর স্বকুর গল্প বলার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হতে হ'ল। এমন সময়ে আমরা দু'জনে যখন হাসছি, আমি যখন শিশুর নগ্ন, লঘুপায়ে নেমে এসেছি কোন শিশুর সমানাবস্থায়, তখন একটা মেয়ে ঢুকল ঘরে।

আমার দিকে তাকিয়ে স্বকু বলল, 'ও বিনু কাকার মেয়ে, খুকী।' তারপর খাট থেকে নেমে এগিয়ে গেল। খুকীর একখানা হাত ধরে চুপিচুপি বলল, 'ভয় কি রে, আমার কাকাবাবু। আয়, কাকুর সঙ্গে গল্প করবি না? নতুন একটা চকোলেট খুলেছি, বলত কা'র ছবি ছিল? পারলি না ত'? আচ্ছা, তোকে দেখাব, চল!'

বুক দিয়ে ঝুলে পড়ে' স্বকু আর খুকী খাটে উঠল, দু'জনে আমার দু'পাশে বসল। আমি চকোলেটটা ভেঙে খুকীকে দিলাম। স্বকু বলে' উঠল, 'না, না, কাকু, গোটাটাই দাও। আমি খাব না। ও খুব ভালবাসে যে, তাই না রে?' তারপর খুকী যখন চকোলেটটা জিভ্ দিয়ে টেনে টেনে চুষছে, তখন স্বকু বলল, 'তোমায় চকোলেট খাওয়ালাম, আমাকে বিকেলে জলপাই এনে দিতে হবে কিন্তু! জান কাকু, জলপাই খেলে মা বড্ড বকে, বলে জ্বর হবে। খুকীদের বাড়ীর সিঁড়ি-খুপরীতে বসে' বসে' আমরা খাই লবণ দিয়ে।' স্বকুর জিভে প্রায় জল এসে পড়ল।

আমার বলার কিছু নেই, শুধু শুনতে হবে। স্বকু একাই বলছে, এখন খুকীটি মুখ খুললেই হয়।

'জলপাই নেই.' খুকী বলল, আঙুল দিয়ে চকোলেটটা মুখ থেকে বার ক'রে।

-'না থাকল। চাই না, জলপাই। যা তুই, আমার কাকুর কাছে বসেছিস্ কেন রে?'

আমি অন্য কিছুর সূত্রপাত দেখে সচকিত হ'লাম।—'স্বকু, তুমি খুকীর সঙ্গে ঝগড়া কর নাকি? আচ্ছা স্বকু, খুকী দেখতে কার মতন বল দেখি?'

স্বকু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল 'কার মতন আবার, একটা পেত্নীর মত।'

—'ধ্যেৎ পাগল, ভাল করে দেখ্‌ত', শার্লির মত নয়?'

স্বকু একটুক্ষণ লক্ষ্য করল। ছবির দিকে একটু তাকিয়ে খুকীর কাণের পাশের চুলগুলোকে একটু ফাঁপিয়ে দিল।—'তাইত কাকু,' ও বলল, 'ঠিক ত! শার্লি, শার্লি, এই শার্লি!' হেসে গড়াগড়ি, স্বকুর হাসি আর থামে না।

'এই শার্লি" স্বকু হাসতে হাসতে কোন রকমে বলতে পারল, 'এই শার্লি! বা রে, বেশ তোর নতুন নাম হ'ল। চল, মার কাছে যাই।' ভীষণ চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগল, 'মা, ওমা—'ধ্যেৎ।' খুকীকে টেনে নামাল।

আমি বললাম, 'খুকীর ত' নতুন নাম হ'ল। তুই কী চ্যান নাকি?'

—'তুমি কিছু জান না কাকু। আমাকে একটা টাকা দিলেও আমি চ্যান্ হব না, আমি ডগলাস্।' খুকীর হাত ধরে' দু'পা বীরের মত এগিয়ে গেল।—'ডগলাস হাঁটে এমনি ক'রে, চড়ে ঘোড়ায়, আমার ত ঘোড়া নেই।' দরজার কাছে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমার এলবামে, ডগলাসের চেহারা আছে, দেখ।'

হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আর হবে না। অলস ভাবনায় জড়িয়ে পড়তেও ইচ্ছে করে না। সাহস হয় না, কারণ কিছু ভাবতে গেলেই তলিয়ে যাই অন্ধকারে। দলে দলে চিন্তার কালো ভূত আমাকে ঘিরে ধরে, সামনে কিছুই আর দেখতে পাই না। এরা অতীতের, পিছনে ফেলে আসা যে দিনগুলো ভোলা যায় না, বর্ত্তমানকে যে সময়ে সময়ে হঠিয়ে দেয়, তারাই শেষে কালো হ'য়ে গেল! অন্ধকারের যবনিকায় সব একাকার,—এমনি মন নিয়ে কোন কোন সময়ে আমার মনে হয়েছে, যখন কোন নদীর ধার দিয়ে হেঁটে গিয়েছি, ঝাঁপিয়ে পড়ি; যখনই কোন চিতার আগুনের দিকে অপলকে চেয়েছি, আমার মনে হয়েছে ঐ শীতল

টকটকে রঙের ফাগে নিজেকে ছুঁড়ে দিই, স্নান করি আলোর বন্যায়।

'কি ভাবছ, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে', পূর্ণিমা তার স্বভাবস্নিগ্ধ গলায় বলল, 'তোমার ভাবনার কি থাকতে পারে! বে' করনি, ছেলেপুলে নেই, চাকরী কর না, বড়বাবুর কাছে বাজে অজুহাত দেখাবার ওজর নেই; অগাধ অর্থ নেই, ফাঁকি দিয়ে আরও বাড়াবার চেষ্টাও নেই। কি ভাবছ, বল' দিকি!"

উঠে বসলাম। পূর্ণিমা বিছানার একপ্রান্তে বস্‌ল। ছোট সংসারের খুঁটিনাটী সেরে' ওর এখন সময় হয়েছে আমার সঙ্গে দু'টো কথা বলবার। সমস্ত বাড়ীতে ছিল এলোমেলো অকরুণতা। পারিপাট্য নেই, শৃঙ্খলা আছে। উঠতে বসতে, ব্যস্তভাবে ও যখন এটা করছে, ওটা নামাচ্ছে, তখন ও গিয়েছিল নিজেকে ভুলে। তাই ওর সজ্জায় ছিল দৈনন্দিনতার কালিমা আর রুচির শোভনতা।

ও ভাল ক'রে এঁটে বস্‌ল বিছানায়। —'এত কাজ, একা হাতে কি ক'রে করি বলত'? তাইত' কিছুতেই সময় ক'রে উঠতে পারলাম না—'

আমি বললাম, 'তাতে আর কি হয়েছে। আমি ত' আর পালিয়ে যাইনি! এখন যত খুসী কথা বলতে পারবে, কিন্তু কি কথা বলবে?'

—'ঐ ত' বললাম। কি ভাবছিলে বল!'

—'ও ভাবছিলাম, বিভূতির মত বে' থা' করে, ছোটখাট একটা চাকরী যেমন ক'রে হ'ক যোগাড় ক'রে, নিরিবিলি সংসারে নিজেকে লুপ্ত ক'রে জীবনটা কাটালে কেমন হ'ত?'

—'বাজে কথা বল কেন, ও তোমাকে মানায় না। আমি ভাবতেই পারি না—কোন মেয়ে তোমাকে ঠিক বুঝে তোমার কাজে লাগতে পারবে, যার সেবা নিতে তুমি একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হবে না।'

—'কোন মেয়েই ত' তার স্বামীকে আগে থাকতে জানে না। কিন্তু জানতেও একমাসের বেশী সময় বোধহয় লাগে না, অন্ততঃ আমি ত' দেখিনি। তবে তোমাদের কথা আলাদা। তোমাদের দু'জনারই মন-রূপ জমি নিতান্ত উর্ব্বর, তাতে প্রেমের ফসল ফলতে খুব বেশী দেরী হয়নি।'

—'তুমি কিছু জান না!' লজ্জায় অরুণ হ'য়ে পূর্ণিমা বলল, 'একমাস এক বছরে স্বামীর কিছুই জানা যায় না। যারা জানে, তারা তাদের স্বামীকে ভালবাসে না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'রীতিমত ভাববার কথা।'

বিভূতি এসে পড়ল এই সময়ে। সুন্দর হাসিখুসী মানুষটী। জীবনে কখনও ওকে মুখভার করতে দেখিনি। এমন কি পূর্ণিমার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে না, দেনাপাওনার কি এক বিশ্রী গণ্ডগোলে, এ খবর শুনেও ও হেসেছিল। একটু যে বিচলিত হয়েছিল, তা বুঝতে পেরেছিলাম—কারণ, সেদিন ও উনিশ কাপ চা আর দেড় টিন সিগ্রেট খেয়েছিল। সে অনেক দিন আগের কথা। ভাল মনেও নেই, মনে করবার সাহসও নেই।

বিভূতির সঙ্গ ভুলে' যাবার নয়। সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যা, গল্পে হাসিতে আমরা চলে গিয়েছিলাম সেই দিনগুলিতে, যখন সময়ের মূল্য সম্বন্ধে আমরা খুব সচেতন ছিলাম না, আর যে 'সময়' শুধু ছিল একান্ত আমাদেরই।

যাবার আগে পূর্ণিমাকে বললাম, 'সুকু কই!'

'ঘুমুচ্ছে, দাঁড়াও একটু, তুলে' আনছি।'

সুকু ঘুম জড়ান চোখে আমার দিকে চেয়ে হাসল।

আমি বললাম, 'কাকু, আমি যে চলে' যাচ্ছি। তোমার সব গল্প ত' শোনা হ'ল না।'

অস্পষ্ট গলায় সুকু বলল, 'আর একদিন এস, সব বলব।'

সুকুর হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, 'ডগ্‌লাস, এই টাকা দিয়ে তোমার যা খুসী কিন'। তুমি ডগলাসই, তোমাকে চ্যান্ হতে হবে না।'

সুকু ঠোঁট কুঁচকে একটুখানি হেসে, মুঠির মধ্যে টাকাটা নিয়ে নিজের শোবার ঘরের দিকে ছুটে গেল।

পূর্ণিমা আর বিভূতি আমার দিকে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে ছিল। আমি হেসে বললাম, 'ও কিচ্ছু না। ছোটদের সঙ্গে কথা বলতে হ'লে ছোট সাজতে হয়।'

পূর্ণিমা জলজলে চোখে আমার দিকে তাকাল। 'আবার কবে আসবে? এখন কদ্দুর যাচ্ছ, কোথাও না গেলেও ত' চলে।' পূর্ণিমা আমাকে খুব ভালবাসে। এ ভালবাসা শুধু সম্ভব হ'ল, বিভূতির জন্য। বিভূতিকে ভালবাসে পূর্ণিমা। পুঁজি আমার বেড়েই যাচ্ছে।

কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। এবার আর বেশী দূর যাব না। দেশের বাড়ীটা বিক্রী করার ব্যবস্থা ক'রে এবার এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে আমার কোন আত্মীয় নেই। পাহাড়ের ওপর দিয়ে যেখানে সন্ধ্যা নামে, সমুদ্রের বুক থেকে যেখানে সূর্য্য ওঠে। কিন্তু মাঝে মাঝে মাঝে আসতে হবে বৈকি?'

বিভূতি অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছিল। অভিমান-ভরা গলায় বলল, 'যা খুসী তোর কর গে'! ভাল লাগে না তোর এই বেদুইন স্বভাব। মরবি শেষে কোন বিদেশ-বিভূঁয়ে। এখানে থাকতে তোর কষ্টটা কিসের!'

প্রবল অভিমানের বিরুদ্ধে কথা দিয়ে লড়া যায় না, তাই শুধু হাসলাম।

পূর্ণিমা দোর পর্য্যন্ত আসল, বিভূতিও। হঠাৎ পিছনে ফিরে পূর্ণিমাকে বললাম, 'তখন কি ভাবছিলাম, এবার এসে বলব। এবার যখন আসব, মনে ক'রে রেখ! তোমাদের এখানে আসলেই আমি এমন জড়িয়ে পড়ি যে, আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। খুব কষ্ট হচ্ছে তোমাদের ছেড়ে যেতে, এর জন্য তোমরাই দায়ী।

* * *

কতকগুলো বছর কেটে গেল। সময় সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হবার আগেই আমি টের পেলাম—অনেকখানি সময় সরে গেছে। নির্দ্ধারিত কালের অপব্যয় আমার রগের কয়েকটা চুল সাদা রঙে রাঙিয়ে দিল। এখান থেকে ওখানে, পাহাড়ের বন্ধুরতা থেকে ভূমির সমলতায়, প্রকৃতির তাণ্ডবতা থেকে নিজের শান্ত, অপমোহিত পরিবেষ্টনীতে অনেক ঘুরলাম, কখনও বিচলিত হইনি। কখনও আমার মন পীড়িত হয়নি নিঃসঙ্গতার বেদনায়। কতকগুলো লোক এমনিই বটে, এমনিই তারা সুখে থাকে, নিজের সম্বন্ধে তারা কখনও খুব সচেতন নয় বোধ হয়। পকেটটা ফাঁকা হয়ে এসেছে। ঈশ্বরের কি অভিপ্রেত, আমার জানা নেই। যদি তাঁকে সর্ব্বশক্তিমান্ ধরে' নেওয়া যায়, তবে আমাকেও দিয়ে ঘানি ঘুরিয়ে নিতে পারবেন। আমার মত লোককেও কিছু করতে হবে। ভাবনার বিলাস নয়। কিছু করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়! নিজেকে বয়ে বেড়াবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি।

কলকাতায় এলাম। বন্ধুবান্ধব, আর কারও নাম বিশেষ মনে পড়ে না, যাদের সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন এখন। নিস্তব্ধ দুপুরে, নিজের কুড়ে জড় মনের সঙ্গে খেলা করছিলাম।

কে একজন ঘরে ঢুকল! আমি তাকে চিনবার আগেই সে আমাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখখানা যেন পরিচিত, তবু নিঃসন্দেহ হ'তে পারলাম না।

'আমাকে চিনতে পারছেন না কাকাবাবু', ছেলেটী বলল।

হ্যাঁ, এতক্ষণে চিনতে পারলাম। 'তুমি সুকুমার। খুব বড় হয়েছ, যথেষ্ট বড়, তুমি যে এত বড় হবে এ ত' আমি আশা করিনি কিনা—এত শীগ্‌গির! তুমি আমার খোঁজ পেলে কি ক'রে?'

—'আপনাকে এই হোটেলে ঢুকতে দেখেছিলাম কাল। আসতে পারিনি তখন, আমার অন্য কাজ ছিল।'

—'ও, তুমি তা'লে সত্যিই বড় হয়েছ! তোমার এখন অনেক কাজ। সময় পাও না বুঝি?'

—'তা আর কই পাই! এই ত' ধরুন না, এতখানি বেলা হয়েছে, এখনও আমি খাইনি। বাবা মারা গেছেন প্রায় দু'বছর হ'ল।'

—'তাই নাকি।' এ সংবাদ আমার যেন বিচলিত হবার কিছুই নেই। আমি যেন আগেই জানতাম।

সুকুমারের গলায় কথা আটকে এল। 'আর সেই থেকে, বাবা মারা যাবার পর থেকে, মাকে কি যে অসুখে ধরেছে, এখন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। মাকে দেশের বাড়ীতে রেখে এসেছি, আর খুকীকে—আমার বোন। এখানে বাসা ক'রে থাকবার মত আয় ত' আমার নয়!'

—'তুমি আবার আয় করছ নাকি সুকু?'

—'না করলে কি করে' চলবে বলুন! বাবা ত কিছুই রেখে যাননি। কাদের সঙ্গে মিশে শেষকালটায় আবার মদ ধরেছিলেন।'

—'তোমার বাবা তোমার মাকে খুব ভালবাসতেন কিনা।'

—'বুঝলাম না, কি বলছেন।'

—'ও তুমি বুঝবে না, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা বলবে, বস! আচ্ছা, তুমি আমাকে চিনলে কি ক'রে? তোমাদের বাড়ীতে শেষবার আমি যখন যাই, তখন ত তুমি এতটুকু।' আমি হাত দিয়ে সুকুমারের তখনকার দৈর্ঘ্যের একটা মাপ আঁকলাম। আমার স্বরে বিস্ময়।

সুকুমার একটু হাস্‌ল। 'আমার ছোটকালের কথা মনে আছে। আপনি আমাকে ডগলাস বলেছিলেন, যাবার সময়ে আমার হাতে একটা টাকা দিয়েছেলেন, সে সব আমার মনে আছে।'

আমি একটু কেশে' গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলাম। 'শালির খবর কি, ভাল আছে ত' সে।'

—'তার বিয়ে আসছে মাসে। তারা নতুন বাড়ীতে উঠে গেছে। তার সঙ্গে ত আর আমার দেখা হয় না।'

—'ও, তা তুমি বস! আমার কথা, তোমার মনে আছে। আমাকে ভোলনি?' আমি যেন একটা অবলম্বন আঁকড়ে ধরছি, নতুবা ভেসে যাব।

—'আপনাকে ভুলিনি কাকাবাবু! আপন্যার কাছে তাই ত' এলাম! আমি এক দোকানে চাকরী করি। খাটুনীর তুলনায় যা দেয়, তা এত কম যে, মাকে বিশেষ কিছু পাঠানো হ'য়ে ওঠে না। অথচ ওষুধ পথ্যের এখন বিশেষ দরকার। খুকী গোটা গোটা হাতের লেখা চিঠিতে আমাকে তাই লিখেছে, ভারি বুদ্ধি মেয়েটার।'

—'সে ত তোমারই বোন। কিন্তু আমি কি করতে পারি!" আমি এতটুকু আশ্বাসও দিতে পারলাম না।

সুকুমার চোখ তুলে বলল, 'আপনি কিছু টাকা যদি দেন, তবে আমি নিজেই যেমন তেমন একটা দোকান আরম্ভ করতে পারি। কাজকর্ম্ম সবই আমার জানা আছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমার কাছে ত' কিছুই নেই। সব ফুরিয়ে গেছে। বিভূতির মতই আমি নিঃস্ব। বিভূতি ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই তোমাদের রেখে এত শীগ্‌গিরই সরে পড়ল। সত্যি বলছি সুকু, আমার কাছে কিছুই নেই, আমি কিন্তু মদ খাই না। একটা চাকরীবাকরীর যোগাড়ে এসেছিলাম। কিন্তু আমি নিতান্ত কাঁচা, কে চাকরী দেবে বল? তাই যা সামান্য আছে, তাই দিয়ে যদ্দুর যাওয়া যায়, যে কোন জায়গায়; কোন জায়গায় ঠিক করিনি, টিকিট কাটব। পরে যা ঘটবার ঘটবে। সে তুমিও বল্‌তে পার না, আমিও না। তুমি নিরাশ হ'য়ে পড়লে ত? তোমাকে ত' আমি খুব বুদ্ধিমান বলে'ই জানি।'

সুকুমারের মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কয়েকটী রেখা। বলল, 'না, নিরাশ হইনি। যেমন ক'রে হ'ক, আমাকে টাকা যোগাড় করতেই হবে, মাকে আমার বাঁচানো চাই-ই। কিন্তু কাকাবাবু, আপনি আমাদের ভালবাসতেন, মার মুখে শুনেছি।'

—'হ্যাঁ, তোমাদের আমি ভালবাসি, সে কথা আমার মুখ থেকে শুনে তোমার কি লাভ হ'ল? চল, সময় নষ্ট ক'র না, আমাকে আবার বিছানাটা জড়িয়ে নিতে হবে।'

—'লেখাপড়া করব; কত বড় একটা লোক হব, আমার দু'খানা মোটর গাড়ী থাকবে, বাবা বুড়ো বয়সে, ঝোলাবারাণ্ডায় ডেক চেয়ারে বসে কড়া পাইপ টানবে, খুকীর সে গন্ধ মোটেই সহ্য হবে না, কত কিই ভেবেছিলাম। কাকু, আমার এখন বড্ড ক্লান্ত লাগে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে বসে' থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়ি।'

—'ক্লান্ত হ'লে চলবে কেন ডগলাস! পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে তোমার ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে যাও টগবগ্‌ ক'রে। সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার শিশু-কালের সুকুকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কর, সব হবে। তোমার এ বয়সটা এমন কিছু গর্ব্বের নয়, যার মায়া তুমি ছাড়তে পার না।'

সুকুমার তৃপ্ত গলায় বলল, 'কাকু, আর একবার ডাক না 'ডগলাস' বলে'। তুমি চলে' আসার পর থেকে বাবা আমাকে ডগলাস বলে' ডাকত।'

—'তুই যা কাকু, আমার সময় বড্ড কম!'

খাজরাহো

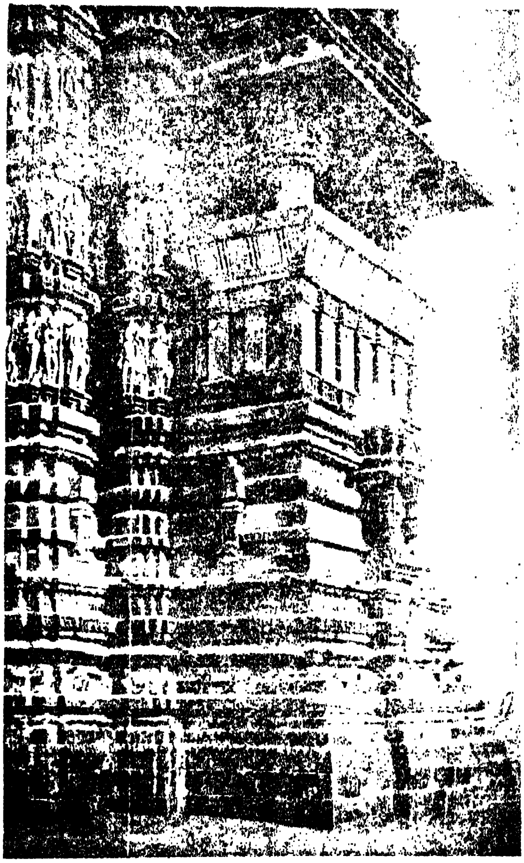
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

অজন্তা, এলোরা, তাজ, বাঘ, সিকরী, মাদুরা, ভুবনেশ্বর, কোণারক ভারত-শিল্পের এই মহিমাময় মহাতীর্থগুলির সহিত খাজরাহোর নামও এক সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মধ্য ভারতের অন্তর্গত ছত্তরপুর ষ্টেটে এক অতি দুর্গম প্রদেশে ইহা অবস্থিত—দূর বনচ্ছায়ে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ইহা যেন এক প্রকার আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পরসজ্ঞ সুধীগণের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ইহা এড়ায় নাই। যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন—বিস্ময়-পুলকিত কণ্ঠে এই কালজয়ী অক্ষয় পাষাণ-কীর্ত্তির প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। সে উচ্ছ্বসিত স্তুতিগান ভারত-কলার প্রত্যেক ভক্ত ও পূজারীর চিত্ত গৌরব ও আনন্দে অভিষিক্ত করে।

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে যখন মধ্যভারতে চান্দেলা-বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন, তখন খাজরাহোতে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চান্দেলা রাজ্য উত্তরে যমুনা নদী হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধঙ্গ রাজার রাজত্বকালে খাজরাহোর শৈব, বৈষ্ণব ও জৈন মন্দিরগুলির শিল্প-সৌন্দর্য্য চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি ৯৫০ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল।

১০২১ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদ চান্দেলা রাজধানী কলিঞ্জর নগর লুণ্ঠন ও দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঐতিহাসিক আবু রেহাণ আসিয়াছিলেন। আবু রেহাণ লিখিয়াছেন—এই সময়ে খাজরাহো জিজোতীয় রাজপুতগণের সমৃদ্ধিশালী রাজনগরী ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেদিন মামুদের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলায় খাজরাহো বিনষ্ট হয় নাই। ইহার পরেও, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে যখন পুনরায় মুসলমানাক্রমণে চান্দেলা-রাজ্য সম্পূর্ণ হৃতগৌরব ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সে বারেও খাজরাহোর স্থাপত্য-কীর্ত্তি এই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জিয়ারের পরিব্রাজক ইবেন বাতুন খাজরাহোর শিল্পচাতুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া অজস্র প্রশংসা করেন। তখনও খাজরাহো এক সুসমৃদ্ধ নগর ছিল।

জি. আই. পি. রেলপথের ঝান্সী মাণিকপুর শাখার হরপালপুর অথবা মহাব্বা ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া চৌষট্টি মাইল মোটর-বাসে যাইতে হয়। হরপালপুর হইতে নওগাঁর বার মাইল পথটী পরিষ্কার ও সুন্দর। নওগাঁ অতি মনোরম ক্ষুদ্র সহর। বুন্দেলখণ্ড এলেকার এজেণ্ট সাহেব এখানে

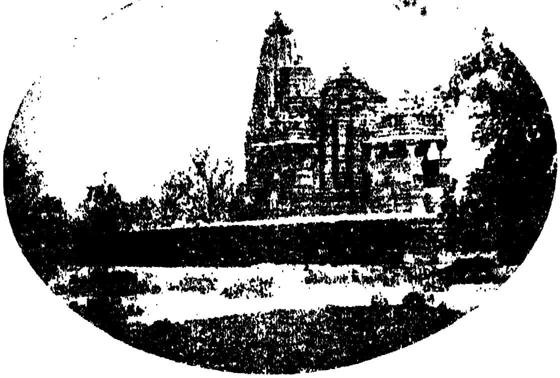


খাণ্ডারিহো (Kanariya) মহাদেও মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ভিত্তিগাত্রের কারুকার্য্য : খাজরাহো

বাস করেন। এই নওগাঁয়েই ফৌজদারদের শিক্ষা দিবার কিচেনার কলেজ বিখ্যাত। তথা হইতে ছত্তরপুর চব্বিশ মাইল অর্থাৎ রেল লাইন হইতে ছত্রিশ মাইল। ছত্তরপুরে রাত্রিতে ডাক বাঙ্গলায় থাকিয়া, তারপর দিন পান্না যাইবার রাস্তায় একুশ মাইল আসিয়া বোমভাটা তহসীলে 'বাস'

হইতে নামিয়া রাজনগরের 'বাসে' সাত মাইল যাইলে খাজরাহো।

খাজরাহোর মন্দিরগুলিতে শিব, বিষ্ণু, বৌদ্ধ, জৈন বিভিন্ন শিল্প-সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। একটী উচ্চ টীলার উপর এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ রহিয়াছে, চৌষট্টিটি ছোট ছোট দেউলের মধ্যে চৌষট্টি দেবীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার বহু দেবী মূর্ত্তির ভগ্নাংশ সংগ্রহালয়ে সুরক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের গঠন-ভঙ্গিমা, বস্ত্র ও অলঙ্কার শিল্পীর সুক্ষ্ম কলাশক্তির পরিচয় প্রদান করে। এই মন্দিরই খাজরাহোর সর্ব্ব-প্রাচীন মন্দির ; ফার্গুসন সাহেব মনে

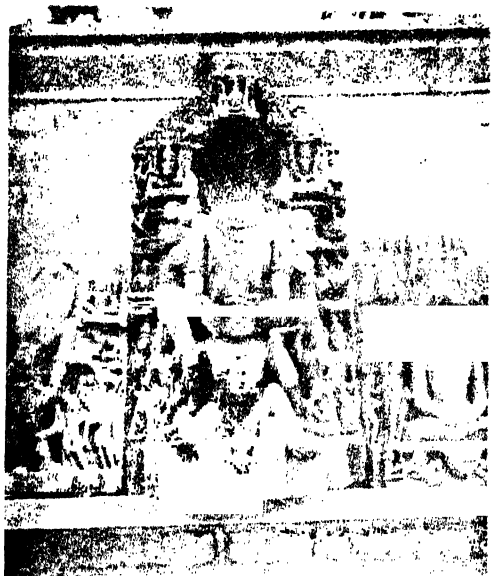


বিশ্বনাথ মন্দির : খাজরাহো

করেন—আবিষ্কৃত জৈন মন্দিরসমূহের মধ্যে এই মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

পূর্ব্ব মণ্ডলের 'ঘণ্টাই' মন্দিরটী ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। একটী দেউলের সমুখস্থ গর্ভ-মন্দিরের ছাদ দশটী কারুকার্য্যময় স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। স্তম্ভগুলির সমুদয় গাত্রে বহু ঘণ্টা খোদিত আছে, তাই ইহার নাম 'ঘণ্টাই' মন্দির বলিয়া খ্যাত। ক্যানিংহাম সাহেব 'ঘণ্টাই' মন্দিরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন "So dignified, so elegant, its slender Bell sculptured columns are, that even at Kajraho—the Temple builders' Elysium—the structure known as 'Ghantai' occupies a nichepart."

খাজরাহো যে এক সময়ে বৌদ্ধ-শাস্ত্র শিক্ষাদানের প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা ভ্রমণকারী সুপণ্ডিত হিউয়েন সিয়াং বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ৬২৯ খৃঃ তাঁহার ভারত ভ্রমণ-কাহিনীতে পাওয়া যায়—"The monasteries and temples in the country of 'Ch-ki-to, which has been identified as Jijhotia, of which Khajraho or Khajuraha was the capital, are a number of huge edifices. The king was a Brahimin by caste and was Buddhist by creed. He encouraged men of merits and learned scholars of other lands, collected grants by erecting monasteries and giving grants, he



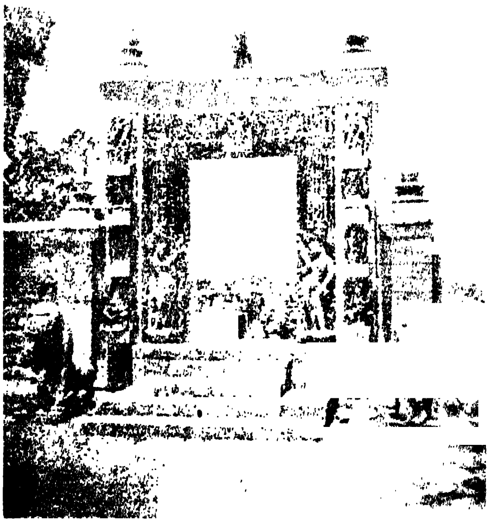
খাজরাহো মন্দিরসমূহের উৎকীর্ণ গাত্রচিত্র—সংগ্রহশালা

tried to make his capital as a seat of learning."

দক্ষিণ মণ্ডলের জৈন মন্দিরও প্রাচীন, বৃহৎ, সুন্দর কারুকার্য্যময়। ইহার মধ্যে নেমিনাথের মন্দিরের পরিকল্পনা ও স্থাপত্য-কৌশল অন্যান্য মন্দিরগুলি অপেক্ষা নানা বৈশিষ্ট্যতপূর্ণ। এই মন্দির ৯২৪ খৃঃ চান্দেলা-রাজদের সময়ে নির্ম্মিত হয়। রামচন্দ্র মন্দিরটীও এই সময়ে নির্ম্মিত হয়। সারা ভারতে এই জৈন মন্দিরটীর তুলনা নাই।

খাজরাহোর মন্দির মধ্যে খাণ্ডারিহো মহাদেবের মন্দিরটী সব চেয়ে বৃহৎ ও সুন্দর। এই মন্দিরটী খাজরাহোর গৌরব। দূর হইতে ইহা মহাদেবের আবাস

কৈলাস পর্ব্বতশিখর-তুল্য মনে হয়। প্রধান চূড়া বেষ্টন করিয়া স্তরে স্তরে পর্ব্বতশিখর-সাদৃশ্যে বহু মন্দিরাকারের চূড়া সজ্জিত হইয়া আছে। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল যেমন বিস্ময়কর, তেমনই সৌন্দর্য্য মণ্ডিত। পৃথক্ পৃথক্ বৃহৎ প্রস্তর খোদিত করিয়া একটার উপর আর একটী অতি কৌশলে সজ্জিত, কোন প্রকার চূণ বা অন্য কোন মসলা ব্যবহৃত হয় নাই। সহস্র বৎসরের কালের পীড়নেও বিরাট্, পর্ব্বত-সদৃশ সুউচ্চ মন্দির অম্লান ও অটুট



প্রবেশ দ্বার—সংগ্রহশালা : খাজরাহো

রহিয়াছে। তাই জগতের অন্যান্য শিল্প-সাধনা ও নিপুণতার মধ্যে খাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দিরের স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। মন্দিরগাত্রের প্রতি ইঞ্চি স্থান কারুকার্য্যময়। কাগজ ও কাঠে এত সূক্ষ্ম ও ভাবব্যঞ্জক কারুকার্য্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বিশেষভাবে মন্দিরগাত্রে খোদিত মূর্ত্তিগুলির ভিতরে যেন স্বর্গীয় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহাদের চক্ষুর দৃষ্টি-ভঙ্গিমা এত সুন্দর ও ভাবব্যঞ্জক, যে তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকা যায় না। ভারতের শিল্পীরা একাধারে স্রষ্টা ও ধর্ম্মপ্রচারক। এই মূর্ত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সত্যই হৃদয় কোন এক রাজ্যে লীন হইয়া অনন্ত লীলাময়ের চরণতলে উপনীত হয়।

খাণ্ডারিহো মহাদেবের মন্দির ৯৫৪ খৃঃ নির্ম্মিত হয়, তাহা এক শিলালিপি-পাঠে উদ্ধৃত হইয়াছে। মন্দিরটী এক শত এক ফুট উচ্চ, দৈর্ঘ্যে ১০২ ফুট ৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ৬৬ ফুট দশ ইঞ্চি। বিস্তৃত উচ্চ চত্বারের চারি কোণে চারিটী ছোট ছোট বার ফুট উচ্চ মন্দির ছিল। অর্দ্ধ-মণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ ও গর্ভমণ্ডপ—উপরে মন্দিরের আকারে স্তরে স্তরে চারিটী চূড়া যেন পর্ব্বত সৃষ্টি করিয়া আছে। প্রত্যেকটীর শিরে বৃহৎ আমলকী-ফল-সদৃশ কলস শোভিত।

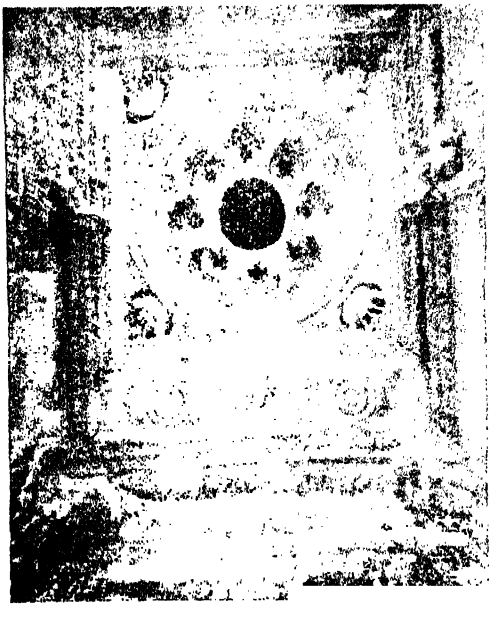


খান্দরীয় মন্দিরের অভ্যন্তর : খাজরাহো

জেনারাল ক্যানিংহাম সাহেব মন্দিরের অন্তর ও বাহিরের গাত্রে ৮৭২টী ২".৬" করিয়া মূর্ত্তি খোদিত আছে লিখিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক মূর্ত্তির ভঙ্গিমা, গঠন-প্রণালী ও ভাব-ব্যঞ্জকতা বৈশিষ্ট্যময়, দেখিলে দর্শক মাত্রেরই মন মুগ্ধ হয়। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, সূর্য্য, দশভুজা, নরসিংহ, দশাবতার প্রত্যেক মূর্ত্তিতেই দেবভাব ও শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গর্ভগৃহে পরিবেষ্টিত অষ্ট দিক্‌পাল, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋৎ, বায়ু, কুবের ও ঈশান বিরাজিত। দশভুজ-প্রসারিতা বিশাল চামুণ্ডামূর্ত্তি—ইন্দ্রাণী, মহেশ্বরী—দেবীশক্তির সজীব প্রভাব যেন দর্শকের দেহ-মন যুগপৎ সংক্রামিত ও ভক্তিরসাপ্লুত করিয়া তুলে।

কানিসের, দরজার চৌকাঠের, ভিত্তিতলের হস্তীর ফৌজ, উটের সার, বৃষের পাল, অশ্বারোহী বাহিনী—খোদিত মূর্ত্তিগুলি যেমন শিল্পীর জন্তু-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তেমনি সেই যুগের সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য-প্রিয়তা প্রকাশ পায়।

মন্দির-দ্বারের চৌকাঠের উপর দুই ইঞ্চি লম্বা মানব-সৈন্য-মূর্ত্তি ও শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মে শোভিত মূর্ত্তি যেমন ভাবব্যঞ্জক, তেমনি শিল্পীর নিপুণ অঙ্গুলীসঞ্চালনক্ষমতার সাক্ষ্য দিতেছে।



খাণ্ডারিয়া মন্দিরের ছাদের নিম্নভাগ (ceiling) : খাজরাহো

মন্দির-প্রবেশের প্রথম দ্বার—মকর-তোরণ। তাহার গঠনপদ্ধতি, স্থাপত্য, কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্ম, নিপুণ, মনোরম। তিনটী মণ্ডপের ছাদের সজ্জার সৌন্দর্য্য ও নিপুণতা স্বচক্ষে না দেখিলে উপলব্ধি করা যায় না। পঞ্চ, সপ্তম, নবম, দশম থাকে লতাপাতার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-মণ্ডিত, এত পাতলা পাথর কাটিয়া একটীর উপর একটী ন্যস্ত হইয়াছে, যেন জাপানী কাগজের ফুলের মত দেখিতে। কি অপূর্ব্ব কৌশল, কি অপার ধৈর্য্য, কি মহা সাধনা সেই শিল্পীদের!

আবার এই ভিতরের ছাদের মধ্যভাগে যে পদ্মপুষ্পগুচ্ছ শোভিত আছে, তাহার মধ্য হইতে যেন আকাশ হইতে এক অপ্সরা অবতরণ করিয়া আসিতেছে। অবশ্য খাণ্ডারিহো মহাদেবের মন্দিরে তাহা পূর্ণভাবে দেখা যায় না, কিন্তু জৈনদের নেমিনাথের মন্দিরে এখনও এই প্রকার পরিকল্পনা অটুট আছে।

মহামণ্ডপের ছাদ চারিটী অষ্টকোণ-বিশিষ্ট স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভের শিরোদেশ নানা পুষ্পগুচ্ছ ও কীচক-মূর্ত্তির দ্বারা শোভিত। তাহার উপর ন্যস্ত আটটী সুদৃশ্য পরী—ছাদের চারিটী পাড় ধরিয়া আছে। আবার এই পাড় হইতে চারিটী উড্ডীয়মান অপ্সরী ছাদের অবলম্বন-স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। ইহা শিল্পীর নিপুণ শক্তির পরিচয় যেমন দেয়, তেমনি স্ত্রী-শক্তিরও মহিমা বিকাশ করে।

শিল্পী ও চিত্রকরের বিচিত্র আদর্শ, রূপদক্ষদের বহু ভাবের প্রবাহ খাণ্ডারিহো মহাদেবের মন্দিরের রমণী-মূর্ত্তিগুলিতে উৎসরিত। নৃত্যের তাল, ছন্দঃ ও দেহের কান্তি, সৌন্দর্য্য, গঠন মূর্ত্তিতে নানা ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতি রেখায় অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা প্রকাশ করিতেছে—যেন জীবন্ত মানবী দর্শকের কাছে সেই পাথরের চক্ষে ইঙ্গিতের দ্বারা নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে। এই সব মূর্ত্তি সকল যুগের, সকল জাতির শিল্পীকে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করে।

খাজরাহো ভারত-শিল্পীর অমর সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন—প্রতিভার জয়স্তম্ভ। পাশ্চাত্য মনীষী ও সমঝদার স্যার জন মার্শ্যালের ভাষা উদ্ধৃত করিয়াই বলি—"Khajraho temples are the most delightful architectural demonstration-lesson in the world."

বিশ্বসিংহ

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টশালী

(তৃতীয় খণ্ড)

ত্রয়োদশ অধ্যায়—গোবর্দ্ধন দাস

গোবর্দ্ধন দাস পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়া কি করিল, তাহা প্রকাশ করিতেছি। সে ছদ্মবেশে আহম্ রাজধানীতে গিয়া সপ্তাহকাল নগরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া, আহম-রাজের চরিত্র, তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় জানিয়া লইল। কামতারাজের প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা বা ঘনিষ্ঠতা, তৎসংবাদ অবগত হইতে গিয়া তাহার আশা-ভরসা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। আহমরাজ যে পাঠানদ্বেষী ও কামতারাজের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্, ইহা গোবর্দ্ধন দাস জানিত না। যদুনন্দনও কিছু বলিয়া দেন নাই। যখন সে অবগত হইল যে, রাজকুমার পীতাম্বরের অকালমৃত্যুসংবাদ শ্রুত হইয়া আহম্ রাজ এতদূর শোকান্বিত হইয়াছিলেন যে, তিনি সপ্তাহকাল রাজকার্য্য স্থগিত রাখিয়াছিলেন, এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র শোকচিহ্নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন সে বেশ বুঝিল, এখানে কামতারাজের বিরুদ্ধে কোন কৌশলই টিকিবে না। তখন সে ভগ্নমনোরথ হইয়া কিরূপে আত্মোদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, সে চিন্তা করিতে লাগিল এবং আরও এক সপ্তাহকাল তথায় অবস্থান করিল। এই সময়ে একটা সামান্য সুযোগের সূত্র ফুটিয়া উঠিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইল।

কাহার-রাজ সুবল সিংহের কন্যা প্রভাবতীর রূপগুণের প্রভা তৎকালে ঐ অঞ্চলে বেশ প্রকাশ পাইয়াছিল। মণিপুর রাজকুমারের সহিত তাঁহার পরিণয়-প্রস্তাব চলিয়াছিল। আহমরাজ সুহংমং এই প্রথিত-নাম্নী কুমারীর পাণিগ্রহণে উৎসুক হইলেন। কিন্তু সামাজিক হিসাবে বিচার করিলে, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। কারণ আহমগণ পূর্ব্বদেশ হইতে নবাগত, তখনও সে অঞ্চলের ক্ষত্রিয়-সমাজের সহিত তাহারা মিলিতে মিশিতে পারে নাই। কোন নৃপতির সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধেরও সুযোগ ঘটে নাই। ক্ষত্রিয়সমাজ তাহাদিগকে গ্রহণ করিবে কিনা, তদ্বিষয়েও তাহারা সন্দেহযুক্ত ছিল। তাহারা সকলে সমবেত হইয়া স্থির করিল—যে ভাবেই হউক, কাহার-রাজকে বশীভূত করিয়া, তাঁহার কন্যার সহিত তাহাদের রাজার বিবাহ দিয়া সেই সাহায্যে ক্ষত্রিয়-সমাজভুক্ত হইতে হইবে। এই পরামর্শানুযায়ী তাহাদের পক্ষ হইতে জনৈক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে দূতরূপে কাহার-রাজের নিকট প্রেরণ করা হইল। গোবর্দ্ধন দাস এই সংবাদ অবগত হইয়া, অবিলম্বে কাহার-রাজ্যাভিমুখে রওয়ানা হইল।

কাহার কামতা রাজ্যের অধীনে সামন্ত রাজ্য। গোবর্দ্ধন ইহা জানিত। সে কতিপয় অনুচরের সহিত সাক্ষাৎ করিল। কাহার-রাজ গোবর্দ্ধনকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কি উদ্দেশ্যে কামতারাজ তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, জানিতে চাহিলেন। গোবর্দ্ধন উত্তরে বলিল "আহমরাজ সুহংমং দূত পাঠাইয়া কামতারাজের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, 'কাহার-রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণ করিয়া তিনি অত্রাঞ্চলের নৃপতিবর্গের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন; কামতা-রাজ অনুমতি প্রদান করিলে তিনি কাহার-রাজের নিকট দূত প্রেরণ করিবেন।' কামতা-রাজ সেই অসভ্য বর্ব্বরকে উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়া কাহার-রাজকে সতর্ক করিয়া দিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়া দিয়াছেন— 'আহমরাজ বীরপুরুষ হইলেও, তিনি অসভ্য জাতি বই কিছু নহেন। আর কাহার-রাজ সুবল সিংহ কামতা-রাজের স্বজাতীয় ক্ষত্রিয় নৃপতি। কাহার-রাজ সেই অসভ্য আহমরাজের ভয়ে বা অনুরোধে আত্মসম্মান ভুলিয়া না যান।' কামতা-রাজের নিকট আহম-রাজ একটা সামান্য ভূম্যধিকারী ব্যতীত আর কিছুই নহেন।

তিনি যতই বল-দর্পিত হউন না কেন, কামতা-রাজের নিকট তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। আহম-রাজ কাহার-রাজ্যের প্রতি অবৈধ বল-প্রকাশের চেষ্টা করিলে, কামতা-রাজ তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ক্রটি করিবেন না। অসভ্য জাতি বলিয়া তাঁহাকে আংশিক স্বাধীনতা প্রদান করায়, তাঁহার যে গর্ব্ব হইয়াছে, কামতা-রাজ সে গর্ব্ব চূর্ণ করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন।"

সুবল সিংহ গোবর্দ্ধনের বাক্য যথার্থ জ্ঞান করিয়া কামতা-রাজের অযাচিত অনুগ্রহে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের জন্য বিস্তর উপহার-দ্রব্য গোবর্দ্ধনের সহিত প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল উপহার-দ্রব্য কিছুই কামতা-রাজ-দরবারে পৌঁছে নাই। গোবর্দ্ধন এইরূপে কৌশল-জাল বিস্তার পূর্ব্বক কামতাপুর যদুনন্দনের নিকট রওয়ানা হইল।

গোবর্দ্ধনের এই কৌশল-জাল প্রভাবে কাহারে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহার পরিণাম অতি ভয়াবহ হইয়াছিল। সে অনলে কাহার-রাজধানী দীমাপুর ভস্মীভূত ও কাহার-রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—বিপন্ন ও বিপদ্

বর্ষাকাল—শ্রাবণ মাস। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন-অবিরত বারিধারা সমভাবে ও প্রবলবেগে পতিত হইতেছে। তবু মেঘের গাঢ়তা কিছুমাত্র হ্রাস পাইতেছে না। এই বারি-ধারার মধ্যে জনৈক অশ্বারোহী যুবক রাজপথের উপর দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। রাজপথ পাকা নহে—কাঁচা, আর বড়ই কর্দ্দমাক্ত, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোথাও গর্ত্ত হইয়াছে—কোথাও বা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর ন্যায় জল-নির্গম পথ হইয়াছে। অশ্বারোহী পথের এরূপ দুর্গতি দেখিয়া এত ভিজিয়াও ধীরে ধীরে যাইতে বাধ্য হইতেছেন। পথের উভয় পার্শ্বেই অরণ্য—আবার কোথায়ও বা বিস্তীর্ণ শ্যামল-শস্যক্ষেত্র। পথিপার্শ্বে গ্রাম অথবা গৃহাদির চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে না। ক্রমে দিবাবসান হইয়া আসিল, প্রকৃতি দেবী মলিন হইতেও মলিনতর হইয়া প্রায় মসীরূপ ধারণ করিলেন। তখন অশ্বের গতি আরও মন্দ হইল। অশ্বারোহী আশ্রয়-লাভেচ্ছায় চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সহসা অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র দীপালোক দৃষ্ট হইল। তিনি বুঝিলেন, নিকটে কোন লোকালয় আছে। একটু আশার সঞ্চার হইল। তিনি ঐ দীপালোক লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে অশ্বচালনা করিলেন। বৃষ্টি তখনও সমভাবে পতিত হইতেছিল—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছিল। সেই বিদ্যুতালোকে একটী সরু রাস্তার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি ঐ সরু রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ক্রমে একটী ভগ্ন-গৃহ প্রাচীর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে দীপালোক লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এই ভগ্নগৃহের জীর্ণ-বাতায়ন-রন্ধ্রপথে নির্গত হইতেছিল। তিনি বিদ্যুতালোকে দেখিলেন—গৃহটী অত্যুচ্চ প্রাসাদ-সদৃশ। উহার উপরি-তলের একটী প্রকোষ্ঠ হইতে ঐ আলোক-রশ্মি বাহির হইতেছিল। গৃহের সম্মুখভাগে জীর্ণ বৃহৎ ফটক; ফটকের দুই পার্শ্বে লতাগুল্মপরিবেষ্টিত ইষ্টকনির্ম্মিত ভগ্ন-প্রাচীর—তাহা স্থানে স্থানে পড়িয়া গিয়া ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ফটকের উপর ছাদ ছিল, কিন্তু দ্বার ছিল না। মুক্ত দ্বার পাইয়া অশ্বারোহী অশ্বসহ ঐ ফটক মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া উষ্ণীষ বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গের বারিধারা যত দূর পারিলেন মুছিলেন; পরে উহা দ্বারাই অশ্বটীর সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার বিদ্যুতালোকে গৃহের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—গৃহের নিম্ন-তলেই সম্মুখে বৃহৎ বারান্দা। তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া, ভিজিয়া দৌড়িয়া গিয়া ঐ বারান্দায় প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে অত্যুচ্চৈঃস্বরে গৃহ-স্বামীকে ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি উপরে উঠিবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যুতালোকে ঐ বারান্দার ভিতরেই উপরে যাইবার একটী সিঁড়ি পথ দেখিতে পাইয়া তিনি সেই পথে উপরে উঠিতে লাগিলেন। অন্ধকারে ধীরে ধীরে দেয়াল-গাত্র স্পর্শ করিয়া তিনি অতি কষ্টে উপরে উঠিতে লাগিলেন। সহসা একটী অবরুদ্ধ দ্বারে করস্পর্শ হওয়ায়, দ্বারে ঈষৎ শব্দ হইল; তিনি সেই দ্বারে পুনঃ করাঘাত করিয়া মৃদু কোমল

কণ্ঠে কহিলেন "এ ঘরে কে আছেন, আমি বড়ই বিপন্ন, একটু আশ্রয় পাইতে পারি কি?"

গৃহাভ্যন্তর হইতে কোন উত্তর আসিল না। তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যখন গৃহে আলোক রহিয়াছে, তখন লোক নিশ্চয়ই আছে; তবে উত্তর না দিবার কারণ কি? তিনি এবার একটু সবলে দ্বারে করাঘাত করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি মুক্ত দ্বার-পথে কক্ষ মধ্যে যে শোচনীয় দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে যুগপৎ বিস্মিত ও ব্যথিত হইলেন। তিনি দেখিলেন একখানি শয্যোপরি একটী মৃতা রমণী,—তৎপদপ্রান্তে একটী অশ্রুসিক্তা মলিন-বদনা, আলুলায়িতকুন্তলা, অনিন্দ্য-সুন্দরী কিশোরী-মূর্ত্তি! সহসা দ্বারোদ্ঘাটন-শব্দে বালিকা সেদিকে দৃষ্টিপাত করিল—সিক্ত-কলেবর আগন্তুককে দেখিয়া ভাবিল "ইনি কে? ইনি কি ভগবৎ প্রেরিত? আমার সাহায্যার্থ এই সময়ে এখানে আগমন করিয়াছেন?" বালিকা বাষ্পজড়িত কোমল কণ্ঠে কহিল, "আপনি ভিতরে আসুন, এ দুর্দ্দিনে অযাচিতভাবে আপনার যখন আগমন হইয়াছে, তখন আপনি নিশ্চয়ই ভগবৎপ্রেরিত—এ অভাগিনীর দুঃসময়ে সহায়-স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছেন। আপনার দেহ সিক্ত দেখা যাইতেছে—পরার্থে ঝঞ্জাবারিও আপনার উপেক্ষণীয় হইয়াছে; ঐ শুষ্ক বস্ত্র রহিয়াছে, আপনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করুন।"

বালিকার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে আগন্তুকের কর্ণে যেন অমৃত-বর্ষণ হইল। তিনি রমণী-কণ্ঠস্বর অনেক শুনিয়াছেন, কিন্তু এরূপ মধুর স্বর জীবনে আর কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। কিয়ৎক্ষণ কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি অপ্রতিভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঈষৎ চিন্তার পর বালিকার অনুরোধানুসারে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "নিকটে আর কোন গৃহস্থ আছে কি?"

বালিকা। এ পল্লীতে বহুলোকের বাস, কিন্তু একটু দূরে। প্রকৃতির অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে, কোন উপায়ের সম্ভাবনা নাই। আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী, নচেৎ এ দুর্দ্দিনে মাতৃহারা হইব কেন?"

আগন্তুক একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। আপনার সামান্য পরিচয় পাইলে একবার বহির্গমন করিয়া কোন উপায় করা যায় কিনা—সে চেষ্টা করা যাইত।"

বালিকা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনি ভগবৎ-প্রেরিত। আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত আমার উপস্থিত বিপদুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান বালিকার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন—সম্ভ্রমার্থ বাক্য ব্যতীত স্নেহজনক বাক্যই বাঞ্ছনীয়। আপনার পরিচ্ছদে আপনাকে রাজ-পুরুষ বলিয়াই বিবেচিত হয়। আপনি বোধ হয় মহারাজাধিরাজ নীলধ্বজের অন্যতম সেনাপতি সুজন সিংহের নাম শুনিয়া থাকিবেন—অভাগিনী সেই সুজন সিংহের পৌত্রী, মদন সিংহের কন্যা, নাম কল্যাণী। এ হতভাগিনীর নাম কেন যে কল্যাণী রাখা হইয়াছিল, বুঝিনা। আমি যদি কল্যাণী হই, অকল্যাণী যে কিরূপ জানি না। আমার কল্যাণ তো এইরূপ:—অতি শৈশবে পিতৃহারা হইয়া পিতামহের স্নেহে প্রতিপালিত হইতে-ছিলাম। দশ বৎসর যাবৎ সে স্নেহেও বঞ্চিতা হইয়াছি। পুত্রশোকাতুরা পিতামহী পিতামহের পূর্ব্বেই গতাসু হন। শেষ যে অবলম্বনটুকু লইয়া ছিলাম, সেই একমাত্র আশ্রয়, গর্ভধারিণী জননীও ঐ দেখুন চিরতরে বিদায় হইলেন। এ সংসারে এক্ষণে আমার বলিতে কেহ রহিল না।

এই বলিয়া বালিকা রোদন করিতে লাগিল।

আসন্ন বিপদে ও শোকে সে এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়াছিল; যেই দ্বিতীয় ব্যক্তির সহানুভূতি প্রাপ্ত হইল, অমনি সঞ্চিত শোকাবেগ প্রবাহিত হইল। আগন্তুক কল্যাণীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তাহাকে উপযুক্ত সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ প্রদান করিয়া কহিলেন, "তোমাকে এতক্ষণ যেরূপ ধৈর্য্যশীলা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা দেখিয়াছি, তাহাতে প্রবোধ কিম্বা সান্ত্বনার প্রয়োজন কিছু নাই। তুমি রোদন সম্বরণ করিয়া চিত্ত স্থির কর। আমাকে তোমাদের স্বজাতি বলিয়াই জানিবে। আমাদ্বারা তোমার যত দূর সাহায্য-সম্ভাবনা, তৎপক্ষে কোন ত্রুটি হইবে না। একে অপরিচিত স্থান, তাহাতে রাত্রিকাল ও দৈব দুর্য্যোগ; নচেৎ উপস্থিত ব্যাপারে বিশ্বসিংহ পরপ্রত্যাশী হইত না। যাহা হউক,

একটী আলো পাইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম, কোন উপায় করা যায় কিনা?"

কোমল ও কাতর কণ্ঠে কল্যাণী কহিল, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না, ঘোরতর দৈব-দুর্য্যোগ বলিয়া দিবাভাগে যখন কোন উপায় হয় নাই, তখন দুর্য্যোগ না কমিলে কোন উপায়ের আশা করি না। দুর্য্যোগ কমিলেও, এ রাত্রিতে আর যে কিছু উপায় হইবে, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। গ্রামস্থ প্রায় সকলেই আমার অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছে, আমার দুরদৃষ্ট বলিয়া তাহারা দুর্ভোগ ভুগিবে কেন?"

বিশ্বসিংহ কল্যাণীর সরলতাময় উদার চরিত্রমাধুর্য্যে যেমন হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলেন, গ্রামবাসীদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞানে তেমনই বিরক্ত ও দুঃখিত হইলেন। তিনি কল্যাণীকে কহিলেন, "তুমি যেমন সম্রান্তবংশীয়া, তোমার চিত্তও তেমনি মহৎ; কিন্তু গ্রামবাসীদিগের তো একটা কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা উচিত। দিনের মৃতা, রাত্রিতেও সৎকার হইবে না? ইহা কি লোকসমাজের কাজ? ছিঃ—ছিঃ এ পল্লীতে মানুষ আছে বলিয়া মনে হয় না। মানুষ থাকিলে, তোমাকে কদাচ এইরূপ অবস্থায় রাখিতে পারিত না। দৈব-দুর্য্যোগ দেখিয়া এ পল্লীর লোক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, বিশ্বসিংহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি বহির্গমনের জন্য অস্থির হইলেন। কল্যাণী বিনম্র বচনে কহিল, "আপনার সহানুভূতি ও আশ্বাসবাক্যে আমার হৃদয়ে সাহস ও ভরসা হইয়াছে, কিন্তু আপনার অস্থিরতায় আমি অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হইতেছি। বৃষ্টি বন্ধ না হইলে আপনি শত চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিবেন না; বরং আপনার চেষ্টা বিফল হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। তাহাতে ভবিষ্যতে আপনা হইতে যে বিবিধ রূপ উপকারপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করিতেছি, তাহারও বিঘ্ন হইতে পারে। কারণ দৈবের প্রতিকূলে মানুষের চেষ্টার ফলে আত্মশক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে। আপনি যখন দৈবপ্রেরিত হইয়া আমার উপকারার্থ আগমন করিয়াছেন, তখন আপনি স্থিরভাবে ভগবদনুকম্পায় নির্ভর করিয়া থাকুন, আপনার হৃদয় যেরূপ উদার, উদ্দেশ্য যেমন মহৎ, তাহাতে ভগবান আপনার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখিতে পারেন না।"

বস্তুতঃ অনেক সময়ে দেখা যায়, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সাধু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বিঘ্ন বড় হয় না। বরং যে সকল বিঘ্ন সেই সাধু উদ্দেশ্যের সম্মুখভাগে থাকে, তাহা অপসারিত হইয়াই যায়। এক্ষেত্রে সেরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল। যখন বিশ্বসিংহ কল্যাণীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন বৃষ্টি বড়ই প্রবল ছিল, সেই ভীষণ বর্ষণে বোধ হইতেছিল—বুঝি বা জগৎ জলপ্লাবিত হইয়া যায়। উহার ফল এই হইল—আকাশের মেঘরাশি কাটিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল। সেদিন শুক্লপক্ষের রজনী, আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় চন্দ্রমা স্বীয় প্রভায় মুহূর্ত্ত মধ্যে জগৎকে যেন নবভাবে উদ্ভাসিত ও জাগরিত করিল।

অনন্তর বিশ্বসিংহের উদ্যোগে সেই রাত্রিতেই কল্যাণীর মাতার যথাবিধি সৎকার-কার্য্য সম্পন্ন হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়
অসহায়ের সহায় শ্রীভগবান

যে গ্রামে কল্যাণীর বাস, তাহার নাম বারুয়া। বারুয়া ধরণা নদীর তীরে কামতাপুর হইতে প্রায় ১৫।১৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। গ্রামখানির আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, এবং ইহাতে প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকের বসতি। ইহার মধ্যে কোচ বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যাই অধিক। কল্যাণী ও বিশ্বসিংহের আলাপে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহারা উভয়েই এক জাতীয়। কল্যাণীর পিতামহ সুজনসিংহ কামতা-রাজ্যস্থাপক বিখ্যাত নীলধ্বজের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি নীলধ্বজের সহিত যুদ্ধোপলক্ষে সমগ্র কামতা-রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলধ্বজের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ থাকিয়া তিনি নিজ প্রতিভাবলে যেমন যশস্বী ও প্রভূত ধনের অধিপতি হইয়াছিলেন, তেমনি স্বজাতি-প্রতিপালনেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার উন্নতি দেখিয়া স্বগ্রামবাসী স্বজাতিগণের অনেকেই তাঁহার অনুগ্রহে কামতারাজদরবারে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদিও আপন যোগ্যতার অভাবে আর কেহই তেমন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি রাজ-সরকারে চাকুরী পাইয়া তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান

করিত। কিন্তু ঐ আনন্দ স্থায়ী রহিল না, বরং উহার পরিণাম বিষময়ই হইয়াছিল। যে সকল গ্রামবাসী রাজদরবারে কর্ম্ম করিত, তাহারা তাহাদের পারিশ্রমিক রূপে রাজার নিকট হইতে জমির পরিবর্ত্তে নগদ মুদ্রা গ্রহণ করিতে লাগিল এবং নগদ মুদ্রার প্রভাবে একদিকে যেমন বিলাসী, অন্যদিকে তেমনি অলস হইতে লাগিল। তাহার ফলে, তাহারা আপন জাতীয় বৃত্তি কৃষি-কার্য্যাদির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের দীর্ঘকাল চলিল না। বৃদ্ধকালে রাজার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে অর্থাভাব ঘুচিল না। চাষি-জমি যাহা ছিল, অনাবাদে তাহার অধিকাংশই আগাছায় পূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। অনভ্যাস ও অভিমানবশতঃ ঐ জমিতে কেহ কোনরূপ হস্তক্ষেপও করিল না। ফলে তাহাদের কষ্টের সীমা রহিল না। সংসার-প্রতিপালন অসাধ্য হওয়ায়, তাঁহারা ঋণজালে আবদ্ধ হইতে লাগিল। কেহ কেহ বা ঐ ঋণ-দায়ে বাধ্য হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাবর সম্পত্তিগুলি হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইল। তখন তাহারা আপন ভ্রম—স্বাধীন বৈশ্যবৃত্তির (কৃষি-কর্ম্মাদি) পরিবর্ত্তে শূদ্রবৃত্তি চাকুরীর নগদ-মুদ্রা-গ্রহণের ফল বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল।

যাহারা সুজন সিংহের অনুগ্রহে রাজদরবারে চাকুরী প্রাপ্ত হইয়াছিল, তৎকালে তাহারা সুজন সিংহকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিত। তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিতও ছিল। পরে অভাবের তাড়নায় তাহারা যখন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিল, তখন সুজন সিংহের অনুগ্রহই তাহাদের সর্ব্বনাশের মূল মনে করিয়া তাঁহার প্রতি সকলে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তাঁহার নিকট তাহারা অবিরত অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই আপন যোগ্যতার অভাব স্বীকার করিল না।

সুজন সিংহের পুত্র মদন সিংহ রাজকীয় সৈনিক-বিভাগে সেনানীর পদে কার্য্য করিতেন এবং রাজসেবায় পাঠান-সমরে অকালে নিধনপ্রাপ্ত হন। একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে মাতার মনে নিদারুণ শোক উপস্থিত হয়, সেই শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মদন সিংহের মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরেই তিনিও ইহলোক ত্যাগ করেন।

সুজন সিংহ বীরপুরুষ, যতদিন শরীরে শক্তি ছিল, ততদিন রাজসেবায়ই তিনি নিযুক্ত ছিলেন; যখন বার্দ্ধক্যে শরীরে জড়তা প্রবেশ করিল, তিনি শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন, তখন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাড়ীতে তিনি শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বিপুল ধনের উত্তরাধিকারী একমাত্র বালিকা পৌত্রী কল্যাণী, আর গ্রামবাসী অনেকেরই অর্থাভাব। তাঁহাদের সেই অর্থাভাবের মুখ্য কারণ তাহারা সুজন সিংহকেই স্থির করিয়াছিল। কিন্তু উহা তাহারা প্রকাশ না করিলেও, কার্য্যতঃ কেহ সাহায্য কেহ বা কর্জ্জরূপে অর্থ গ্রহণ করিয়া আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে লাগিল। যে যাহা গ্রহণ করিল, সে তাহা আর প্রত্যর্পণ করিল না; আর যে কখনও প্রত্যর্পণ করিবে, সেরূপ লক্ষণও দেখাইল না। বুঝিয়া সুজন সিংহ হস্ত সঙ্কুচিত করিলেন। ইহাতে গ্রামবাসিগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। তিনি তজ্জন্য ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তিনি দেশ জয় করিয়াছেন, স্বীয় চিত্ত বশীভূত করিলেন। তিনি কখনও কাহারও প্রত্যাশা করেন নাই; শেষ জীবনেও স্বাধীন-ভাবেই যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার পুত্রবধূ কিছু বিপন্না হইলেন। তিনি নিজে বিধবা, তাঁহার সংসার-বন্ধন একমাত্র বালিকা কন্যা কল্যাণী। বিষয়-বিত্তের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন পুরুষের সাহায্য দরকার মনে করিয়া তিনি একজন হিতৈষী আত্মীয়কে আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীদের উহা সহ্য হইল না। তাহারা ভাবিল—আমরা জ্ঞাতিবর্গ এতগুলি থাকিতে, গ্রামান্তর হইতে একটা লোক আসিয়া আমাদেরই স্বজাতীয়ের বাড়ীতে প্রভুত্ব করিবে? আমরা দেখিয়া শুনিয়া সহ্য করিব? কিছুতেই ইহা আমরা সহ্য করিব না। ইহা ভাবিয়া গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া এই নিরীহ ভদ্রলোককে নানারূপে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত এবং তাঁহার প্রতি কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে তাড়াইল। কল্যাণীর মাতার দৃঢ়তা ছিল; শ্বশুরের ন্যায় অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তিনি গ্রামবাসীদের নিকট কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার একটী গুরুতর ভ্রম

হইয়াছিল, তিনি কল্যাণীকে ছেলেমানুষ জ্ঞান করিয়া, তাহার নিকট বিষয়-সম্পত্তির বিষয় কিছুই প্রকাশ করেন নাই। কারণ, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, কল্যাণী বিষয়-সম্পত্তির বিষয় জানিলে, গ্রামবাসীরা তাহাকে ভুলাইয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইবে। মানুষ জীবনের মায়া সহজে ছাড়িতে পারে না; তিনি এবার রুগ্নশয্যায় শায়িত হইলেও, মনে করেন নাই, ইহাই তাঁহার শেষ শয়ন। কিন্তু যখন বুঝিলেন, তখন আর সময় নাই, কিছুই বলিবার সুযোগ পাইলেন না। কারণ, তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। কল্যাণী ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তখন আর গ্রামবাসিদের শরণাপন্ন না হইয়া পারিলেন না। গ্রামবাসিগণ তাঁহার আহ্বানে মৌখিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ যথেষ্টই করিল বটে, কিন্তু বিনা স্বার্থে কেহ কোন কার্য্যে অগ্রসর হইল না। তিনি আশাপথে চাহিয়া রহিলেন। কোমলমতি বালিকা গ্রামবাসীদের কুটিল চরিত্রের পরিচয় কিছুই বুঝিল না। এই সময়ে দৈব-দুর্য্যোগে ভৃত্য ও পরিচারিকাটী পর্য্যন্ত স্থানান্তরে গিয়া আটক পড়িল। অসহায়া বালিকার তাৎকালীন অবস্থা অবর্ণনীয়। অসহায়ের সহায়—নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি, এই সময়ে তিনিই উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন—সময়-মত বিশ্বসিংহকে তাঁহার সহায়রূপে উপনীত করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়
বিশ্বসিংহ—জাতীয়দল-গঠনে

বিশ্বসিংহ প্রিয় সুহৃৎ সুমেরুসিংহের চেষ্টায় জন্মভূমি মায়াপুর হইতে নবশক্তিগঠনের নিমিত্ত মাত্র একশত সহচর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই যুবক—বিশ্বসিংহের সমবয়স্ক। তিনি বাণিজ্যোপলক্ষে বহু জনপদ ও নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কোথায় কোথায় তাঁহার স্বজাতীয়গণের বসতি ছিল, তাহা তাঁর অনেকটা জানা ছিল। এতদ্ভিন্ন কোথায় জাতীয়দল-গঠনের কেন্দ্র করিবেন, তাহাও নির্ব্বাচন করিয়া মায়াপুরে গিয়াছিলেন। হিমালয়ের সানুদেশে, (বর্ত্তমান জয়ন্তীর কিছু পূর্ব্বদিকে) "বেণাগড়" নামে বিস্তৃত ভূখণ্ডে "মিরাগহ্বর" নামে একটী বৃহৎ গিরিগহ্বর আছে; উহা নিবিড় অরণ্যে পরিবেষ্টিত ও অতি দুর্গম। বিশ্বসিংহ বাল্যকাল হইতেই পীতাম্বরের সঙ্গে বহু রণক্ষেত্রে যুদ্ধে যোগদান করায় ও বহু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় রণনৈপুণ্য-শিক্ষা ও রণনীতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং কখন কখন নিজ প্রতিভাবিকাশের সুযোগও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তিনি অল্পকাল মধ্যে একজন সাহসী বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিতও হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ দৈহিক শক্তি থাকায়, তাঁহার বীরত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছিল। এক্ষণে স্বাধীনভাবে সেই রণবিদ্যার অনুশীলনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তিনি একজন আদর্শ বীরপুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কিরূপ প্রতিভাসম্পন্ন বীরপুরুষ, তাহা তাঁহার কার্য্যে অতঃপর প্রকাশ পাইবে।

তিনি মায়াপুর হইতে প্রাপ্ত শত সহচর সহ মিরাগহ্বরে আসিলেন এবং তিন মাস কাল, তাহাদিগকে রণবিদ্যা শিক্ষাপ্রদান করিলেন। এই সময়ে সুমেরুসিংহের প্রেরিত আর একদল যুবক আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ইহাদিগকে শিক্ষাপ্রদানের জন্য রাখিয়া, প্রথমদলের অধিকাংশকেই স্বজাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-সংগ্রহের জন্য তিনি নানাস্থানে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ কুড়ি, কেহ বা পঁচিশ জন করিয়া সাহসী যুবক সঙ্গে লইয়া আসিতে লাগিলেন। সুমেরুসিংহ নিজেও আর একদল যুবক সঙ্গে করিয়া আনিলেন। এইরূপে ছয়মাস মধ্যে প্রায় পনর শত যুবক রণশিক্ষার্থীরূপে সংগৃহীত হইল। তৎপরে প্রায়শঃই নূতন নূতন শিক্ষার্থী আসিয়া ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে লাগিল। তখন বিশ্বসিংহ রীতিমত রণশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। রণশিক্ষার্থিগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। এই শিক্ষার আরম্ভ মল্লযুদ্ধ বা কুস্তি প্রভৃতি দ্বারা শারীরিক শক্তির স্ফুরণ, পরে দেশীয় প্রাচীন প্রথামত অসি, বর্শা-চালনার সহিত সাধারণ রণকৌশল-শিক্ষা। তৎপর সেই প্রাচীন প্রথামত শরচালনা ও ধনুর্ব্বেদের শিক্ষা। পরিশেষে, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্রপ্রয়োগ ও ব্যূহরচনা শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা হইল।

এক বৎসর পরে বিশ্বসিংহের কেন্দ্রে দশ সহস্র যুবক

রণ-শিক্ষার্থী সংগৃহীত হইয়া একত্র হইয়াছিল। তখন তিনি আর একটী নূতন নিয়ম করিলেন—যাহারা সর্ব্ব-প্রকার শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিল, তাহারা আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের অনুমতি পাইল; তাহাদিগকে কেবল প্রতি তিন মাস অন্তর কেন্দ্রস্থানে আসিয়া সপ্তাহকাল রণ-চর্চ্চা করিতে হইত। সুমেরুসিংহকে কেন্দ্রের অধ্যক্ষ করিয়া বিশ্বসিংহ নিজেও এই নিয়মাধীনে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তবে অন্যান্যের অপেক্ষা তাঁহার সম্বন্ধে একটু বিশেষ নিয়ম এই হইল যে, তিনি প্রয়োজন-মতে যখন তখন কেন্দ্রে আসিতে পারিতেন।

তিনি এক বৎসর পরে চাঁপাদৈয়ে গিয়া পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে সাধারণ লোক তাঁহার জাতীয়দলগঠনরূপ নূতন কার্য্য সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিল না এবং কেহ কোনরূপ সন্দেহও করিল না। তিনি জাতীয়দল-গঠন কাজ গুপ্তভাবে এবং বাণিজ্যের কাজ প্রকাশ্যভাবে—সমানভাবে উভয় কাজই চালাইতে লাগিলেন। বাণিজ্যে তাঁহার দুইটী কাজ হইতে লাগিল। পণ্যের খরিদ-বিক্রয়ে অর্থোপার্জ্জন, আর গুপ্তভাবে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ। কেন্দ্রে খরচ-নির্ব্বাহের অর্থপ্রদান ও সংগৃহীত যুদ্ধোপকরণ কেন্দ্রে পৌছান, এই দুইটী কাজের জন্য তাঁহাকে যখন-তখন কেন্দ্রে যাইতে হইত। এইরূপ একদিন কেন্দ্র হইতে চাঁপাদৈয়ে ফিরিবার পথে দৈব-যোগবশতঃ তিনি কল্যাণীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বারুয়াগ্রাম বেণাগড় ও চাঁপাদৈয়ের পথে অবস্থিত।

সপ্তদশ অধ্যায়—বিশ্বসিংহ ও কল্যাণী

বিশ্বসিংহ কল্যাণীর মাতার সৎকারের সাহায্যপ্রার্থী হইতে গিয়া, সেই রাত্রিতেই অধিকাংশ গ্রামবাসীর চরিত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুজনসিংহের অথবা কল্যাণীর মাতার যতই অপরাধ থাকুক না কেন, কল্যাণীর বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ সকল বিবাদ মনে রাখিয়া কল্যাণীকে সাহায্য করিতে বিরত থাকা কিম্বা কৌশলপূর্ণ বাক্যে বিদ্রূপ করা মানুষের কাজ বলিয়া বিশ্বসিংহ মনে করিতে পারিলেন না। এরূপ ঘৃণিতচরিত্র লোকের সংসর্গে অতঃপর কল্যাণী কিরূপে অবস্থান করিবেন, তিনি মনে মনে সেই চিন্তায় অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, গ্রামবাসীদের বিবাদের মূলে কল্যাণীর অর্থের প্রতি প্রবল লিপ্সা রহিয়াছে। তাই তিনি উপস্থিত কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত তাহাদের বাসনার তৃপ্তি-সাধন করিয়া তাহাদিগের সাহচর্য্যে কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলেন। সেই চেষ্টার ফলে বিশ্বসিংহকে কল্যাণীর একজন সম্পত্তিসম্পন্ন আত্মীয় বলিয়া গ্রামবাসীরা মনে করিয়া লইল এবং তাঁহার বিনম্র বচনে ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহার প্রতি সকলেই বিশেষ প্রীত হইল।

মায়ের মুখাগ্নি সম্পন্ন করার পর বিশ্বসিংহ কল্যাণীকে বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। কল্যাণী বাড়ী ফিরিয়া শূন্য গৃহে ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এতক্ষণ কর্ত্তব্যানুরোধে যে শোক তিনি হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে হৃদয়দ্বার খুলিয়া তাহার উৎস ছুটিল। তিনি 'মা, মা' রবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সে রোদনের বিরাম নাই। রোদনের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ চিন্তার উদ্রেক হইল—তাহাতে শোকাবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। ক্ষণেক চিন্তা—ক্ষণেক রোদন, এইরূপে আত্মহারা হইয়া কতক্ষণ যে কাটিল, সে জ্ঞান তাঁহার ছিল না। এদিকে সৎকার-কার্য্য শেষ করিয়া বিশ্বসিংহ কখন যে কল্যাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন, কল্যাণী তাহাও জানিতে পারিলেন না। তখন রজনী প্রায় শেষ—পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ রক্তাভ।

বিশ্বসিংহ কল্যাণীর অবস্থা চিন্তা করিয়া ও তাঁহার মর্ম্মভেদী বিলাপ শ্রুত হইয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার সম্মুখভাগে উপস্থিত হইয়া স্নেহ-করুণ-স্বরে ডাকিলেন "কল্যাণী—!"

কল্যাণী চমকিত হইলেন—তাঁহার কর্ণে যেন অমৃত-বর্ষণ হইল। এইরূপ মধুময় আহ্বান তাঁহার জীবনে এই যেন প্রথম শ্রুত হইল। তিনি কটাক্ষে একবার বিশ্বসিংহের দিকে চাহিলেন এবং চিত্ত সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন। ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং এক-মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীর বিনম্র বচনে করুণ স্বরে কহিলেন, "আপনি আমার জন্য যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন, আরও যে

কত অনুগ্রহ করিতে হইবে, তাহার সীমা নাই। আপনি সারাদিন জলে ভিজিয়াছেন, পরে আমার জন্য সমস্ত রজনী জাগিয়া বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। এখন কিছুকাল বিশ্রাম করুন, পরে আপনার সহিত আলাপ করিব।"

বিশ্বসিংহ কোমল কণ্ঠে কহিলেন "আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নাই, এরূপ পরিশ্রম আমার অনভ্যস্ত নহে। তোমার অসুবিধা না হইলে, তোমার বক্তব্য এখনই বলিতে পার। আমার বিলম্ব করিবার অবকাশ নাই, প্রভাতেই আমাকে যাত্রা করিতে হইবে।"

কল্যাণী। আপনি বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক; আপনাকে অধিক কিছু বলিবার নাই। আমার অবস্থা যাহা দেখিয়াছেন অথবা বুঝিয়াছেন, তারপর অতি সামান্যই আমার বলিবার আছে। এ অবস্থায় এ হতভাগিনীকে রাখিয়া যাওয়া আপনার সঙ্গত কিনা?

বিশ্বসিংহ। তোমার বিষয় চিন্তা করিয়া আমার কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়াছি, তবে তোমাকে দু' একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।

কল্যাণী। কি, বলুন?

বিশ্ব। তুমি রমণী, তাহাতে বালিকা। গ্রামে তোমার বিস্তর জ্ঞাতি রহিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও তোমার বাড়ীতে আনিয়া না রাখিলে চলিবে না। গ্রামের কাহার সহিত তোমাদের অধিকতর ঘনিষ্ঠতা অথবা কে কে তোমাদের হিতৈষী, তাহা তুমি অবশ্যই জান।

কল্যাণী। আপনাকে আমি কি বুঝাইব? আজিকার দিনটী এখানে থাকিয়া গ্রামবাসীদের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের চরিত্র বুঝুন, তারপর আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, আমি তাহাই করিব।

বিশ্ব। আমি গত রজনীতেই গ্রামবাসীদের চরিত্র বুঝিয়াছি—বুঝিয়াও, আপাততঃ তাহাদের সাহায্য ভিন্ন উপায় দেখিতেছি না। তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, তোমার ধন ও সম্ভ্রম, উভয়ই রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আমি কার্য্যানুরোধে বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কৃষককুলে এরূপ অনুদার ও হীন চরিত্রের লোক কুত্রাপি দেখি নাই।

কল্যাণী। সত্য কথা বলিতে গেলে, ইহাদের হীন চরিত্রের মুখ্য কারণ আমার পিতামহ।

বিশ্বসিংহ সবিস্ময়ে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিলেন। কল্যাণী কহিলেন, "আপনি বিস্মিত হইবেন না; মা বলিতেন, আমার পিতামহ যদি ইহাদিগকে রাজদরবারে প্রবেশ না করাইতেন অথবা রাজদরবারে প্রবেশাধিকার করাইয়াও যথানিয়মে স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বিরত হইতে না দিতেন, তবে ইহারা অধঃপতিত হইত না। স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রত্বগ্রহণে বৃত্তানুসারে চরিত্রহীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর উহাদিগকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করায়, উহাদের আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। নচেৎ যথাকালে অর্থাভাবে ঠেকিয়া তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই আত্মভ্রম বুঝিতে পারিত ও সংশোধনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইত। সেই আত্মম্ভরিতার ফলে বিবিধরূপ অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তদুপযুক্ত অর্থসংগ্রহে সমর্থ না হওয়ায় চিত্তে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা প্রবেশ করিয়াছে। পিতামহ শেষকালে আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া সাহায্য বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুক্তহস্ত বন্ধ হওয়ায় গ্রামবাসিগণ আমার মাতাকেই দোষী স্থির করিল। এই জন্য তাঁহাব প্রতিই ইহাদের জাতক্রোধ চিরবিদ্যমান ছিল।

বিশ্ব। গ্রামান্তরে অপর কোন স্থানে তোমাদের হিতৈষী আত্মীয় নাই?

কল্যাণী। তাহা আমি বড় জানি না; তবে আমার মৃত্যুর পর, মা আমার মাতুলকে আনাইয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে নানাবিধরূপে অপদস্থ করিয়া—শেষ ঔষধিপ্রয়োগে তাঁহাকে উন্মত্ত করাইয়া তাড়াইয়া দেয়। ইহা অবগত হইয়া আর কোন আত্মীয়ই এখানে আসিতে স্বীকৃত হয় নাই। আমি তখন ছোট ছিলাম; মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছি, আপনাকে কহিলাম।

বিশ্বসিংহ একটু চিন্তিত হইলেন, পরে বলিলেন "তোমার গ্রামবাসিগণ বড়ই অর্থলোভী, তাহাদিগকে অর্থে আয়ত্ত করা যাইবে, কিন্তু তোমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। তোমার মাতার পারলৌকিক কার্য্যোপলক্ষে যাহাতে ইহাদের সহিত তোমার সদ্ভাব হয়, সেই চেষ্টাই আপাততঃ করিব স্থির করিয়াছি। গত রজনীতেই আমি আলাপ করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা সকলে আমাকে তোমার আত্মীয় বলিয়া বুঝিয়াছে; তাহা ভালই হইয়াছে।

আর আমি যে এখানে নিয়ত অবস্থান করিতে পারিব না, তাহাও প্রকাশ করিতে হইয়াছে। বোধ হয় তাহাতেই আমার অনুরোধে গ্রামের কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রাতে এখানে আসিয়া, তোমার মাতার পারলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ করার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহারা আসিলেই, আমি তাহাদিগকে বলিয়া প্রস্থান করিব এবং যাহাতে আগামী কল্য ফিরিতে পারি, সে চেষ্টা অবশ্যই করিব।

কল্যাণীর মলিন মুখখানি আরও মলিনতর হইল, তিনি কাতর কণ্ঠে কহিলেন "না না, তাহা হইবে না; তাহাদের বিবেচনার প্রতি আমার মাতৃকার্য্য অর্পণ করিবেন না। যাহা সঙ্গত বোধ করেন—আপনিই করিবেন। আমি আপনারই উপদেশ-মত কার্য্য করিব।

বিশ্ব। ছিঃ কল্যাণী! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, আমি মুহূর্ত্তের পরিচিত, আমার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া তোমার বিধেয় নহে। শত শত্রু হইলেও, ইহাদের সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারিবে না। ইহারা তোমার স্বজাতীয় ও জ্ঞাতি; তোমার মানাপমান ইহাদের সঙ্গে জড়িত; সুতরাং তোমাকে ইহাদের প্রত্যাশা করিতে হইবেই।

কল্যাণী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তিনি চিত্ত দৃঢ় করিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন "আপনি অপরিচিত হইলেও ভগবৎ-প্রেরিত, আমার আশ্রয়স্বরূপ উপস্থিত। ভগবানের এ অনুগ্রহের দান আমার গ্রহণ করিতে হইবে। আমি আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না—বোধ হয় তাহা পারিব না।" এই বলিয়া তিনি অবনতমুখী হইলেন।

বিশ্বসিংহ অবাক্ হইলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি ললাটে কর স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন "কল্যাণী, তুমি যদি দরিদ্র কন্যা হইতে, সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া যাইতাম। এক মা হারাইয়াছ, আর এক মা পাইতে; তোমার ইচ্ছা হইলে, সে মাতৃসেবায়ও বঞ্চিত হইতে না। তারপর সময়মত রাজার আদেশ গ্রহণ করিয়া তোমাকে লইয়া সংসারাশ্রমী হইতে পারিতাম। কিন্তু—"

কল্যাণীর অবনত বদন আরও অবনত হইল, তাঁহার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। কিয়ৎক্ষণ অনন্য মনে চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন, "আমাকে দরিদ্র কন্যা বলিয়াই জানিবেন। পিতামহের বিত্ত-বিষয় কি আছে জানি না, জানা প্রয়োজনও মনে করিনা। আমার ধন, ঐশ্বর্য্য, ভোগস্পৃহাও তাদৃশ নাই; সজ্জনসংসর্গই বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বসিংহ আবার চিন্তিত হইলেন, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কল্যাণী, তুমি জান না, আমার শিরে কিরূপ গুরুতর বোঝা চাপিয়া রহিয়াছে। দৈবই আমাকে এখানে আনিয়াছে। আমাকে চিন্তা করিতে একটু সময় দাও, এই বোঝার উপর তোমার বোঝা বহনে সমর্থ হইব কিনা? তুমি রমণীরত্ন; তোমার সরলতায় ও উদারতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। যদি কখনও সংসার-ধর্ম্ম করিতে হয়, তবে এইরূপ সঙ্গিনী লইয়াই করিব। কিন্তু সে সময় কখন হইবে অথবা হইবে কিনা, বিধাতাই জানেন।"

এই সময়ে কল্যাণীর পরিচারক দিবাকর আসিয়া বিশ্বসিংহকে জানাইল, "গ্রামবাসিগণ আগমন করিয়াছে।"

বিশ্বসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কল্যাণী তাঁহার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন, তিনি ঐ কটাক্ষের মর্ম্ম বুঝিলেন, বলিলেন "আমি তোমার সহিত পুনরায় দেখা না করিয়া প্রস্থান করিব না।"

বিশ্বসিংহ দিবাকরের সহিত বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)



ঋগ্বেদে ইন্দ্রদেবতা

শ্রীসত্যহরি দাস

অনেকে বেদ ও পুরাণের দেবগণকে মনুষ্য বলিতে চাহেন না। আমরা কিন্তু দেবগণকে মনুষ্য না বলিয়া স্বর্গবাসী জনন-মরণশীল নর বলিয়া আখ্যাত করিতেছি। কেন না, এক কশ্যপ হইতেই দেব-দৈত্য, দানব-গন্ধর্ব্ব-অপ্সরা-নাগ-সুপর্ণ আখ্যাধারী নরগণের জন্ম হইয়াছে।

ইন্দ্র ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা, তিনি দেবরাজ। ইন্দ্রের স্তুতিপূর্ণ ২৭৫টী সূক্ত দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ সূক্তই স্বয়ং ইন্দ্রের স্তুতিপূর্ণ; কোন কোন সূক্তে অন্যান্য দেবগণ সহ ইন্দ্রের স্তুতি করা হইয়াছে। ইন্দ্র যজ্ঞের প্রধান দেবতা, যেখানেই যজ্ঞ হইত, সেখানেই সোমরস পান করার জন্য ধন-জন-অন্ন-গো প্রভৃতি প্রদানের জন্য, শত্রু দমনের জন্য, চোর-দস্যু তাড়নের জন্য, গৃহ-সুখ-আরোগ্যপ্রদানের জন্য, ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনাসূচক স্তুতি করা হইত। ইন্দ্র সোমরস পান করিতে ভালবাসিতেন। ইন্দ্র দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অদিতির গর্ভসম্ভূত দেবতা; "পুরাণে" দেবগণের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্র অতিশয় বলশালী এবং বজ্র বা শুষ্মী (কামান) অস্ত্রধারী। তিনি বজ্র দ্বারা প্রবল পরাক্রান্ত বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন; বল ও তদনুচর বণি নামক অসুরগণকে নির্য্যাতন করিয়া অঙ্গিরাবংশীয়দিগের গোধন উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি পিপ্রু, মৃগয়, শুণ্ড বংশ, ঋজিশ্বিন্ প্রভৃতি কৃষ্ণত্বচ্ দস্যুরাজগণকে পঞ্চ সহস্র সৈন্যসহ বধ করিয়া, দৈত্যাসুরগণবিতাড়িত স্বর্গভ্রষ্ট বৈবস্বত মনু প্রভৃতি দেবগণকে সরস্বতীতটপ্রান্তবর্ত্তী প্রদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। (৪র্থ মণ্ডল ঋগ্বেদ)

বেদ সকল ইন্দ্রের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ভারতবাসী মনুষ্যেরা, দেবতা সকল এবং অন্তরীক্ষবাসিগণ ইন্দ্রের বলের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। ইন্দ্র বৃত্র ও বলাসুর প্রভৃতির হন্তা, তাঁহার বল বীর্য্য অসীম, নিখিল শাস্ত্রে ইন্দ্রের মহত্ব বিঘোষিত হইয়াছে। অন্যদিকে বেদের বিভাগকর্ত্তা মহর্ষি দ্বৈপায়ন যে মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর দেবরাজ ইন্দ্রের বহু বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণ ইন্দ্রের নিকট যাইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সকল লাভ করিয়াছিলেন, মহাধনুর্ধর অর্জ্জুন ইন্দ্রের নিকট দিব্য অস্ত্র সকল লাভ করিয়াছিলেন। চারি বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র ইন্দ্রের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ইন্দ্র সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, আর্য্য ঋষিগণ জীবনোপায়ের জন্য গো, অন্ন, ধন, জন, যাহা কিছু প্রয়োজন হইত—অসুর, দৈত্য, রাক্ষস, দস্যু, তস্কর কিম্বা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক যখন যে কোন উপদ্রব হইত—সুখ-শান্তিতে বাস করার সময়ে যে কোন আপদ্, বিপদ্ ঘটিত, তাহা হইতে মুক্তিলাভে ও তাবৎ অভিলষিত দ্রব্যাদিলাভার্থে সর্ব্বগুণাধার ইন্দ্রের নামে যজ্ঞ ও প্রার্থনা করিতেন্। পুত্র যেমন পিতার নিকট অসঙ্কুচিত ভাবে যথেচ্ছা যাচ্ঞা করে, আর্য্যগণও ইন্দ্রের নিকট তদ্রূপ করিতেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন "ইন্দ্র ধাতুবর্ষণে", এই অর্থে ইন্দ্রকে বৃষ্টিদাতা আকাশ দেবতা বলিয়া, ঋষিগণ উপাসনা করিতেন; প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্র নামে কোন জীবিত দেবতা ছিলেন না। ইন্দ্র ভারতীয় কৃষকগণের কল্পনা-সম্ভূত মেঘের দেবতা। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, প্রাচীন আর্য্যগণের "দ্যু ও বরুণ" শব্দে আকাশকেই বুঝাইত। আর্য্যগণ আকাশকেই নানাবিধ নামে স্তুতি করিতেন। এতৎসম্বন্ধে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের বঙ্গানুবাদের টীকায় পাশ্চাত্য মতাবলম্বনে যে সকল বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসরণ করিতে হইলে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি-লিখিত ত্রিলোকস্থিত দেবগণের অস্তিত্বই লোপ পাইয়া যায়, এবং শূন্যের উপর পৃথিবীর আদিম সভ্য আর্য্যগণের ধর্ম্মভিত্তি স্থাপন করিতে হয়। তাঁহারা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া বেদের দেবতা-সকলকে কাল্পনিক উপাখ্যান ও কৃষকের গান প্রমাণ করিতে সচেষ্ট আছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যের অনুবৃত্তি-

পূর্ব্বক ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে বেদের অর্থ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা প্রকৃত হয় নাই বলিয়াই ভারতের অনেক পণ্ডিতের মত। বেদের আলোকে বৈদিক মন্ত্রাদির অর্থ নিষ্কাশন করাই সঙ্গত। যাঁহারা বৈদিক ঋষির আত্মার ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি-গুণে ঋষিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর কি? চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বক্কু মহারাজার অর্থপুষ্ট আচার্য্য সায়ণ পুরাণাদির আলোকে বেদের ব্যাখ্যা করিয়া দেশ, কাল, পাত্র ও ভাবের ব্যত্যয়জনিত হেত্বাভাস-দোষমুক্ত নহেন। মহাত্মা যাস্কের নিরুক্ত খৃষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের হইলেও বেদের তুলনায় আধুনিক; সুতরাং উহাও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় যখন সমস্ত ভারত প্লাবিত হইয়াছিল, তখন বৈদিক শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছিল; কাজেই বেদের মন্ত্রাদির অর্থ করিতে পণ্ডিতগণ যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ইন্দ্র সম্বন্ধে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের বর্ণিত বিবরণ ও অপর কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রের বিষয় সুধী-পাঠকগণ পাশ্চাত্য মতের সহিত আলোচনা করিবেন।

১। "হে মনুষ্যগণ! যিনি সমৃদ্ধ ধন প্রদান করেন, অশ্বসমূহ, গোসমূহ, গ্রামসমূহ যাঁহার আজ্ঞাধীন, যিনি বজ্র দ্বারা বহুসংখ্যক মহাপাপী অপূজককে (অনার্য্য) বিনাশ করিয়াছিলেন; যিনি দৃঢ়াঙ্গ, বজ্রবাহু ও বজ্রযুক্ত সৌম্যমূর্ত্তি, যিনি সোমাভিভবকারী যজমানকে রক্ষা করেন, যিনি জল ও অন্ন প্রদান করেন, তিনিই ইন্দ্র।"

২। "হে মনুষ্যগণ! যিনি দ্যোতমান, যিনি জন্ম-গ্রহণ মাত্রই দেবগণের প্রধান ও মানবগণের অগ্রগণ্য হইয়া **বীর-কর্ম্ম দ্বারা** সমস্ত দেবগণকে ভূষিত করিয়াছিলেন, যাঁহার শারীরিক বলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়াছিল, যিনি মহতী সেনার অধিনায়ক, তিনিই ইন্দ্র।"

"অপাদহস্তো অপৃতন্য দিংদ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জমান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিষ্ঠানং বভূষন্ পুরুত্রাবৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ।"
(৭-৩২-১ম)

অর্থাৎ—"হস্তপদশূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে ইন্দ্র তাহার সানুতুল্য প্রৌঢ় স্কন্ধে বজ্রাঘাত করিলেন; যে রূপ অপুরুষ ব্যক্তি পৌরুষলাভে বৃথা যত্ন করে, বৃত্রও সেইরূপ বৃথা যত্ন করিল; বহু স্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল।"

"সপ্ত যৎপুরঃ শর্ম্ম শারদীর্দর্দ্ধন্ দাসীঃ পুরুকুৎসায় দর্দঃ।" (৭-৬৩-১ম)

অর্থাৎ—"হে বজ্রিন্! তুমি পুরু-কুৎসের (ঋষি-বিশেষ) সহায় হইয়া যুদ্ধ করিয়া সেই সপ্ত নগর ধ্বংস করিয়াছে।"

"স বৃত্রহেন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনীঃ পুরংদরো দাসী বৈরয়দ্বি।
অজনয়ন্ মনবে ক্ষমপশ্চ সত্রা শংসংযজমানস্য তুতোৎ।"

অর্থাৎ—বৃত্রহন্তা শম্বরপুর-বিদারী ইন্দ্র ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী কৃষ্ণবর্ণ দস্যুদিগকে বিনষ্ট ও দূরীভূত করিয়া ভারতবর্ষে বৈবস্বত মনুর আধিপত্য বিস্তার করিলেন। তাঁহার স্তোতৃগণের যজ্ঞ সকল সম্পূর্ণরূপে সফল করিয়াছিলেন।

নরদেবতা ইন্দ্র ও জড় দেবতা ইন্দ্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইল, এখন ঋগ্বেদের ইন্দ্র শব্দ স্থানে যে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর বলিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহারও উদাহরণ কিঞ্চিৎ পাঠকগণ সমক্ষে উপস্থিত করিতেছে।

"ত্বং ন ইন্দ্রাসি প্রমতিঃ পিতেব।" (৪-২৯-৭ম)

অর্থাৎ—"হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের পিতার ন্যায়।"

"ত্বং বর্ম্মাসি ন তে বিব্যক মহিমানং বজাংসি।"
(৬-২১-৭ম)

অর্থাৎ—"তুমি আমাদের রক্ষাকবচ বা বর্ম্ম-স্বরূপ। হে ইন্দ্র! লোক সকল তোমার মহিমার অন্ত করিতে পারে না, অর্থাৎ তুমি অনন্ত অসীম।"

"অভিত্বা নোনুমঃঈশানমস্য জগতঃ স্বদৃশং-
ঈশানমিন্দ্রতস্থুষঃ।" (২২-৩২-৭ম)

অর্থাৎ—"হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বদর্শী, তুমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, তোমাকে নমস্কার।"

"এতো ন ইন্দ্র এনসোমহশ্চিৎ।" (১-২০-৭ম)

অর্থাৎ, "ইন্দ্র আমাদিগকে মহৎ পাপ হইতে উদ্ধার করেন।"

"অভ্রাত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।" (১৩-৩১-৪র্থ)

অর্থাৎ—"হে ইন্দ্র! তোমার কোন মিত্র নাই, কোন নেতা নাই, তুমি অনন্ত, তুমি নিত্য।"

"ইন্দ্র! ক্রতুং ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা নো অস্মিন্ পুরুহূত যামনিজীরাজ্যোতি-
রশীমহি।" (১-৩ ২-২-৭ সামবেদ)

অর্থাৎ—"হে ইন্দ্র! সর্ব্বভূতপ্রকাশক পরমাত্মন্, পিতা যেমন পুত্রদিগকে বিদ্যা বা ধন প্রদান করেন, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে আত্মবিষয়ক জ্ঞান দান কর। হে পুরুহূত! আমরা জনগণ যেন সকলের পাইবার যোগ্য পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া পরজ্যোতিঃ সেবা করি।"

"যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ইন্দ্রো মা তত্র নয়তু বলমিন্দ্রো দধাতু নঃ
ইন্দ্রায় স্বাহা।" (১৯-৪৪-৬ষ্ঠ ঋক)

অর্থাৎ—"দীক্ষা ও তপস্যাসহ ব্রহ্মবিদ্গণ যেখানে যান, সেইখানে ইন্দ্র আমাদের লইয়া যাউন। ইন্দ্র আমাদিগকে বল দান করুন।"

এইরূপ বহু মন্ত্রে ইন্দ্র শব্দ ঈশ্বর-বোধে প্রযুক্ত হইয়াছে। সপ্তম মণ্ডলের ঋষি বশিষ্ঠদেবের বহু স্তোত্রে ইন্দ্র ঈশ্বর-রূপে উপাসিত হইয়াছেন। (১৫ ৮০-১ম ও ১৬৯ সূক্তের ৮ম মন্ত্রে) ইন্দ্র সর্ব্বব্যাপী ও ইন্দ্র হইতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হওয়ার কথা আছে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, বেদে ইন্দ্র ত্রিবিধরূপে পূজিত হইয়াছেন। প্রথম—নরদেবতা ইন্দ্র অশেষ গুণ-সম্পন্ন মহাবলশালী সম্রাট্রূপ, দ্বিতীয়—জড়-দেবতা ইন্দ্র বৃষ্টির অধিপতি দেবতারূপ, তৃতীয়—সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর রূপে নিখিল শাস্ত্রে পরমাত্মা রূপে যে ইন্দ্রের মহত্ত্ব বিঘোষিত হইয়াছে, ঋগ্বেদের "নেম" ঋষি সেই ইন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। অষ্টম মণ্ডলের একশত সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রের 'নেম' ঋষি বলিতেছেন

"নেম উত্ব আহক ইংদদর্শকমভিষ্ঠবাম।"

অর্থাৎ—"ইন্দ্র নাই; কে তাঁহাকে দেখিয়াছে, আমরা স্তব করিব?"

"যঃ স্মা পৃজান্তি কুহ সেতি ঘোরম্ভ অস্তিত্যেনং।"
(৫-১২-১ম)

অর্থাৎ—"হে মনুষ্যগণ! যে ভীষণ (ইন্দ্র) সম্বন্ধে লোক জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়, কেহ বা বলে তিনি নাই, ইত্যাদি।"

এই সকল মন্ত্র উপলক্ষ্য করিয়া আচার্য্য মোক্ষমূলার বেদে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু আমরা বলি, ইহা একেশ্বরবাদ। পরমাত্মার যখন স্থূল, সূক্ষ্ম বা দৃশ্য কোনরূপ নাই, তখন কে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন? যিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই ইন্দ্রদর্শনকারী। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ বলিতেছেন :—

"ঋষয়োবৈইন্দ্র প্রত্যক্ষং ন অপশ্যন্ তং বশিষ্ঠং
প্রত্যক্ষং অপশ্যৎ।"

অর্থাৎ—"অন্যান্য ঋষিগণ ইন্দ্রকে নিজ চক্ষে দেখেন নাই, কিন্তু বশিষ্ঠ দেখিয়াছেন।"

গান

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

আমার চামেলী বনে কে তুমি পাগলপারা
আসিলে চাঁদিনী রাতে জীবন-দয়িত হারা?
কোকিল-কুহু-তানে,
মধুপ-মধু-গানে,
আজি ওগো কে গোপনে আসিয়া দিলে সাড়া?

দখিনা পবন নিতি যাহারে স্মরিয়া বয়,
রবি শশী যার লাগি' দিবারাতি জেগে রয়,
ধরণী চরণে যার
সাজায় কুসুমহার,
তুমি কি সে অভাবিতা ফুলশাখে দিলে নাড়া?

ঝিঙোল

(গল্প)

শ্রীতারাকুমার সান্যাল

সেটা পূজা-পার্ব্বণের দিন। অফিস বন্ধ হল তাড়াতাড়ি। মনটা ভরে ওঠে অপরিসীম আনন্দে। কেরাণীর ছুটি...তাও আবার 'মার্চ্চেন্ট' অফিসের। বৃথা যেতে দেবার ইচ্ছা মনে এলও না আদৌ। উপরন্তু গৃহিণীর সঙ্গে ছুটিটা কাটাবার ইচ্ছে হয়ে উঠ্‌লো দুর্দ্দমনীয়। প্রায় ছুটেই চলি গৃহাভিমুখে। ভাবি,—অপ্রত্যাশিতভাবে দেখ্‌তে পেয়ে সে হয়ত অভিভূত হবে চরম বিস্ময়ে,—কিংবা আনন্দে হয়ে উঠ্‌বে আত্মহারা। বলবে হয়ত—বড় ভাল লোক তোমাদের নতুন-সাহেব, নয় গো? নইলে ছুটি দেয় এত সকাল সকাল? কিন্তু আর বেরিও না আজকে লক্ষ্মীটি, দুপুরে'ত কোনও দিন পাই না, এক রবিবার ছাড়া···

কল্পনার রঙীন ছবি দোলা দেয় মনকে। বেশী পয়সা থাক্‌লে ট্যাক্সি করেই বাড়ী ফির্‌তুম হয়ত।

কিন্তু বড় ক্ষণভঙ্গুর মানুষের এই কল্পনা। আধুনিক তরুণ-তরুণীদের প্রণয়-লীলা হতেও।···

নিঃশব্দে প্রবেশ করি। মধ্যাহ্নের শান্তি-নিঝ্‌ঝুম সে বাড়ীটা। কক্ষের মধ্যস্থলেই পালঙ্ক। উত্তরের উন্মুক্ত বাতায়নে খেলা করে অগ্রহায়ণের বাতাস। অশ্বত্থের মসৃণ পাতাগুলো দুলে উঠে মৃদুল বাতাসে। সম্মুখের জনহীন পথ রৌদ্রে ঝিমোয়। মধ্যে মধ্যে দুই-একটা ফেরিওয়ালার তীব্র-কর্কশ কণ্ঠধ্বনি সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

পালঙ্কে এলায়িত গৃহিণীর দেহ। নিদ্রা-নিমীল নয়ন-পল্লব। কৃষ্ণ-কুন্তল আলুলায়িত। আমার উপস্থিতি জান্‌তেই পারে না সে। বিস্মিত করবার লোভে ডাকি—ওগো শুন্‌ছো···

সে উন্মিলন করে তন্দ্রালস চক্ষু। বিস্ময়ের কোনও চিহ্ন পরিস্ফুট হয় না সেথায়। সে পাশ ফেরে। বরং বিরক্তি ভরা কণ্ঠেই বলে ওঠে—কী বিপদ বাপু, সারাদিন খেটে খুটে শোব একটু, তারও উপায় নেই! মুখ পোড়া সাহেবগুলো কথায়-কথায় ছুটি দেয় আজকাল; মরণ হয় না!

অভিমান হবার কথাই। না-হওয়াটাই বিচিত্র। গল্প-উপন্যাস-পড়া দাম্পত্য-কলহের স্মৃতি-গুলো ভিড় করে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে। কোনও উপন্যাস লেখকের মতে নাকি,—"দাম্পত্য-কলহে স্ত্রী হতেও স্বামীর দুঃখ বেশী,—হৃদয়-বিদারক। 'খড়ম' পায়ে সারা পথ রৌদ্রে রৌদ্রে পরিভ্রমণ—তারপর 'রেস্তোরা'য় বা 'সিনেমা'য়, অর্থাভাবে বন্ধু-মজলিসে সময় অতিবাহন"...

'খড়ম' অবশ্য ছিল না; অগত্যা 'চটি' পায়ে দিয়েই নিষ্ক্রান্ত হই। পথে দুই হাতে ললাট স্পর্শ করে প্রণতি জানাই ভগবানকে। —এ দুর্দ্দিনে 'ট্যাক্সি'-ভাড়াটা বাঁচিয়েছ প্রভু!

পাশ দিয়েই পথাতিক্রম করে তরুণ-তরুণী। চোখের ভাষাতেই বুঝি প্রকাশ পায় পরস্পরের নিবিড় ভালবাসা। ভাবপ্রবণ মন আমার অলক্ষ্যেই শ্রদ্ধা জানিয়ে বসে কখন তাদের উদ্দেশ্যে।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে 'সার্কুলার রোডে' গিয়ে পড়ি...

হঠাৎ কে যেন পিছন হতে ডাকে—'বিনোদ, ও বিনোদ'—

চকিতে পিছন ফিরি। চিন্‌তে বিলম্ব হয় না মোটে—সহপাঠী হীরালাল। এখন ডাক্তারী করে বোধহয়। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসে। বলে—অফিস পালিয়ে নাকি? ছুটি ত তোমাদের নেই বল্লেই হয়, নতুন বিয়ে কিনা, বড্ড টান ধরে প্রথমটায়।

বিরক্ত হয়েই আদ্যন্ত খুলে বলি।

সে হেসে ওঠে। বলে—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং, শিবের বাবাও···বুঝলে না। কিন্তু অভিমান করে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি? বিশেষতঃ ছুটি পেয়েছ যখন। চল না, কাশীপুরের দিকটায়। এক নতুন সেতারী এসেছে, ভাল

লাগ্‌বে তোমার। সঙ্গীত-চর্চ্চায় অনেকগুলো দিন ত কাটিয়েছ। তার ওপর সে বাজায় না কি অতি চমৎকার। এ তল্লাটে জুড়ি মেলে না।

জিজ্ঞাসা করি—কিন্তু তোমার সঙ্গে চেনা হল কী করে? এসব দিকে ত আগ্রহ নেই তোমার বেশী।

—তা' নেই, তবে চেনা হয়েছে 'ডিস্‌পেন্সারীতে। ওষুধ নিতে এসেছিল, আমারই রোগী। মাথার পীড়া, শরীর অস্বাভাবিক দুর্ব্বল। আরও অনেক উপসর্গ। কিন্তু সে বলে, এসব নাকি সেতার বাজিয়েই হয়েছে। সে 'হিণ্ডোল' না কি-সব বাজাতে পারে। ঐ রাগ-সিদ্ধ না কি সে। হাঃ হাঃ, যত ইলুউসান্‌!

হিণ্ডোল রাগ! বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে যাই। সেই সর্ব্বনেশে, অদ্ভুত, করুণ-গম্ভীর রাগ! আমার মাথাটা ঘুরে ওঠে। শুনেছি, এ 'রাগ-সিদ্ধ' হতে অনেকে তাদের অতি-বড় প্রিয়জনেরও সর্ব্বনাশ করেছে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। সাধারণ কেউ এ-সব অলক্ষুণে রাগ-রাগিণী বাজায় না তাই। কী সর্ব্বনাশ! তবে কী সেতারী... নাঃ, ভাব্‌তেও পারা যায় না আর!

চলন্ত 'বাসে' উঠে পড়ি দুজনায়।...

সরু একটা গলি। অনতিপ্রশস্ত। কর্দ্দমাক্ত। দু'পাশে জঞ্জাল স্তূপীকৃত করা। দিনের আলোও প্রবেশ করে না সে গলিতে। জঞ্জালের পাশেই শুয়ে থাকে দেশী কুকুর বাচ্ছাগুলো।

গলির অপর প্রান্তেই একটা বাড়ী। সশব্দে হীরালাল শিকল বাজাতে থাকে।—

কে একজন নেমে আসে। স্পষ্টই শোনা যায় তার পদ-শব্দ। তারপর দরজাটা খোলে।...

সুন্দর, সুশ্রী তার চেহারা। গৌরবর্ণ দেহ। উন্নত নাসিকা। প্রশস্ত ললাট। ঔজ্জ্বল্যে ভরা তার চক্ষু। তবু সারা মুখে কেমন এক ক্লান্তির ছাপ। শ্রান্তির সুপরিস্ফুট চিহ্ন। বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি।

সে হাঁপাতে থাকে।

বলে—ডাক্তার সাব্‌, আইয়ে, আইয়ে! তারপর চেয়ে থাকে আমার পানে। দৃষ্টিতে তার কি কৌতূহল।

ও আমার 'দোস্ত' খাঁ সাহেব, আপনার বাজ্‌না শোনাতে এনেছি। তারপর আছেন কেমন এখন?—হীরালাল বলে ওঠে।

আচ্ছা আছি ডাক্তার সাব্‌! দরদ বহুত কমতি আছে, দাওয়াই কাজ করেছে। আসুন বাবুজী, বাজনা শুনবেন হামার? এই ঘর ডাক্তার সাব্‌!

তিন জনেই প্রবেশ করি একটা কক্ষে। নিপুণভাবে সুশোভিত। 'শেজ' পাতা। 'জাজিমে'র অনিন্দ্য কারুকার্য্য। প্রাচীর-সংলগ্ন চিত্র ঝুলতে থাকে। স্ত্রীলোকের মুখ অঙ্কিত। কী শ্রী সে মুখের! আধ-বিধুবর শুভ্র-ললাট। আকর্ণায়ত নয়ন। কুঞ্চিত কেশদাম। তিল-চিহ্ন কপোলে। অনাবিল স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-ধারা।...

সেতারী বলে ওঠে—বাবুজি, কোন্‌ সুর ভাল লাগে? ইয়ামন, কুমারী, কল্যাণ, সাঁঝ-পুরিয়া—

না, খাঁ সাহেব, ভাল লাগে বসন্ত,...মালকোষ...

কেয়া বাবুজী? বসন্ত...মালকোষ, পঞ্চম বিবাদী! বহুৎ ভারী রাগ। পঞ্চম-বিবাদী-রাগ আচ্ছা লাগতা বাবুজী? কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!

আনন্দে দুটো চোখ জ্বলে ওঠে তার।...

কী জানি কেন সে আমায় পরীক্ষা করে।

—বাবুজী, মালকোষকা জান্‌ কাঁহা?

—মধ্যমে

—আউর ইয়ামন্‌কা?

—গান্ধারে,—বলে উঠি।—কিন্তু খাঁ সাহেব, যদি আপত্তি না থাকে, তবে আপনি হিণ্ডোল...

ঠিক্‌ হ্যায়, ঠিক্‌ হ্যায়। পঞ্চম-বিবাদী-রাগ আচ্ছা লাগ্‌তা বাবুজি, হিণ্ডোলভি আচ্ছা লাগে গা......রেখাব আউর পঞ্চম বর্জ্জিত্‌। কাহে নেহি শুনায় গা বাবুজি? ডাক্তার সাব্‌কা দোস্ত, সমঝ্‌দার আদমী!......লেকিন বে-সমঝ্‌দার কো আচ্ছা নেহি লাগেগা।

—আমিনা......আমিনা......সেতারঠো লেয়াও মেরা। বাবুজী, ডাক্তারবাবু কুছ খানা-পিনা......

—না, না, খাঁ-সাহেব, ওসবের দরকার নেই কিছু। আমরা শেষ করেই বেরিয়েছি—প্রায় সমস্বরে বলে উঠি দুজনে।

সেতারী হাসে অস্তগমনোন্মুখ সবিতার মতই ম্লান করুণ সে হাসি।...

আমিনা প্রবেশ করে হাতে তার সেতার।

কিন্তু এ কী; কী অদ্ভুত!...এ কী মানবী, না দানবী! কী বীভৎস! মুখ তার নেই। শুধু সেথায় বিকৃত মাংস-পিণ্ড। শপথ করে বলতে পারি, অন্ধকারে তোমরা কেউ তাকে দেখলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। শুধু মাংসপিণ্ড। অধরোষ্ঠের পরিবর্ত্তে গহ্বর। দন্তপংক্তি দেখা যায় তারি মধ্য হতে। মাংসের কুঞ্চনে চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে নিম্নদিকে। সমস্ত মাংস একাকার হয়ে যায় সে মুখমণ্ডলে। মানুষ বলে চেনা যায় না, মুখমণ্ডলের দগ্ধ মাংস কী কুৎসিত, কী বিকৃত! কে এই আমিনা?.........

সুরু হোক্ বাবুজি—সেতারী বলে ওঠে।

রৌপ্যময় সেতারের 'সারিকা' ঝল্‌মল্ করে। অঙ্গুলী-সঞ্চালনের সাথে সাথেই বেজে ওঠে সেতার। কী অপূর্ব্ব! কী সুন্দর! মীড়ের কী বৈচিত্র্য! সুরের কী অভিনবত্ব! ভাষা মূক হয়ে যায় সেথায়। ভাষা যেথায় দুর্ব্বোধ্য,—ভাষার বিভিন্নতা যেথায় প্রবল, এই বিচিত্র ধ্বনির সাহায্যে সেথায় শুধু জানানো যায় করুণ মনের মিনতি, অন্তরের অরুন্তুদ প্রচ্ছন্ন-গোপন বেদনা! সেতারীর সে কী মৌন মূক আবেদন! প্রাণের সে কী করুণ উচ্ছ্বাস! যন্ত্র যেন ডুকরে ডুকরে কাঁদে। তার সাথে সাথে যেন যন্ত্রী কাঁদে, পৃথিবীর পশু-পক্ষী জীব-জন্তু সকলেই কাঁদে! বিশ্ব-বীণার তারও যেন সেই একই চিরন্তনী কাঁদনের সুরে বাঁধা! এ কাঁদনের শেষ নেই, সীমা নেই, অন্ত নেই! মৌন মূক পৃথিবী বুঝি বিশ্বনিয়ন্তার চরণতলে জানায় তার মর্ম্মন্তুদ ব্যথার ইতিবৃত্ত, দুর্ব্বিসহ বেদনার গুরুভার। ধ্বনিই তার ভাষা। যন্ত্র, যন্ত্রী সবই উপলক্ষ্য যেন। সুরের স্বপ্ন-জালে জড়িয়ে যাই। ভুলে যাই বাস্তব জীবনের ব্যথা-বেদনা......নিধনের দৈনন্দিন দুঃখ-জ্বালা।......ধূলিময় ধরণীর দুঃখ-সুখ, ..দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। ভুলে যাই 'মার্চ্চেন্ট'-অফিসের উদরান্ন-সংস্থান-ব্যগ্র সামান্য কেরাণী আমি···

কতক্ষণ যে সেতার বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদেছে জানি না। চমক ভাঙ্গে সেতারীর কথায়—কেমন লাগ্‌লো বাবুজি?

—জীবনে কখনও শুনিনি খাঁ-সাহেব!—বলে উঠি।

যথার্থই হীরালালের কথা। এ তল্লাটে কেন, সারা ভারতবর্ষেও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তার।.....

চেয়ে দেখি সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় কখন। দিনান্তের স্বর্ণবর্ণ শেষ আভাটুকুও মুছে যায়। নারকেল গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে প্রেতাত্মার মত। উত্তরের দমকা বাতাস সে কক্ষে প্রবেশ করে। কী ভাবে সময় গড়িয়ে যায় বুঝি না কিছুই। আকাশের গায়ে গোটাকত তারা চেয়ে থাকে কৌতূহলীর মত।

—খাঁ সাহেব, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? যদি কিছু মনে না করেন—হীরালাল বলে ওঠে। তার কণ্ঠস্বর বাজ্‌তে থাকে আমার কাণের চারপাশে। কৌতূহলে মন ভরে যায়।

—কী কথা ডাক্তার সাব?

—মন্দ ভব্‌বেন না আমাকে, খাঁ সাহেব, শুধু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই·

—বলুন ডাক্তার বাবু—

—মনে করবেন না কিছু খাঁ-সাহেব। আমিনা আপনার কে? কোন অসুখ বিসুখ তার......

—না, বাবুজি, অসুখ বিসুখ কিছু নয়। আমিনা আমার 'জরু', আমার স্ত্রী।

—স্ত্রী! সহসা মাথায় বজ্রাঘাত হয় যেন। ছিঃ, ছিঃ, এমন সুপুরুষের, এমন গুণীর এই স্ত্রী······এ যেন অসম্ভব, অবিশ্বাস্য......

ম্লান হেসে সেতারী বলে ওঠে:—

—তবে শুনুন বাবুজি......

সে এক অদ্ভুত কথা! বল্‌লে আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি জানি প্রতিটি কথাই এর সত্য। এই দুনিয়ায় সূর্য্য-চন্দ্রের আলোর মতই সত্য।

অনেক আগের কথা—

অন্ধ্রদেশে ছিল দুই 'দোস্ত'। মীরজান আলি আর হাফিজ খাঁ। দু'জনের বন্ধুত্ব খুব গাঢ়। অবস্থা ভালই। সারা অন্ধ্রদেশে চিন্‌তো সবাই। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ দু'খানা বাড়ী তৈরী করলে তা'রা একেবারে পাশাপাশি। একটা পাঁচিলের ব্যবধান মাত্র। দু'জনেই বসবাস করতে

লাগলো সেই বাড়ী দু'টোয়। কিন্তু কেউ তা'রা বেঁচে নেই আজ। বেঁচে থাকলে!......না যাক্ সে কথা।

হাফিজ খাঁ আগেই মরে যায়, তার একমাত্র মেয়েকে রেখে। 'বেহেস্তের-হুরী' সে। রূপের 'জৌলসে' চোখ ঝল্‌সে যায়। সবাই তাকে বলতো 'বসোরার গুল'। সবাই চেয়ে থাকতো সে মুখের দিকে। হাঁা, সত্যই রূপ বটে। দেওয়ালে ঐ যে ছবিটা ঝুলছে—ওটা তারই বাবুজি।

মীরজান আলির ছেলে সিরাজের 'নসীব' ছিল ভালই। কেন না এই সুন্দরী তারই হবে কিছুদিন পরে। হাফেজ খাঁ মরবার আগেও সে কথা জানিয়েছিল। মীরজানেরও এই ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু বাবুজি, আল্লা কাউকে তাদের সে বিয়ে দেখবার সুযোগ দেন্‌নি। এক বছরের মধ্যেই মারা গেল মীরজান। হাফিজ 'বেহেস্তে' গিয়েও একলা থাক্‌তে পারেনি। তাই ডেকে নিল তার 'দোস্ত'কে।

মৃত্যুর পর হাফিজের বড় ভাই আর ভায়ের ছেলে এল সেই বাড়ীতে। ছেলের নাম নিয়ামত্ খাঁ। তারাই হাফিজের মেয়ের দেখা শোনা করতো।

হাফিজের মেয়ে সুকণ্ঠী। সিরাজের সাথে তার বড় ভাব। কতদিন সিরাজকে গান শুনিয়েছে চাঁদনি রাতে। বাঁরোয়া, জিল্‌হা, কাফি, ইমন! তবু সিরাজের মত গাইতে পার্‌তো না সে। সিরাজ গাইতো বাহার, পরজ, বসন্ত, হিণ্ডোল। উজীর খাঁ ছিল গুরু। এমন শুদ্ধভাবে কেউ গাইতে পারতো না সিরাজের মত। এইজন্যই উজীর খাঁ তাকে একটা আংটি দিয়েছিলো। তাতে লেখা ছিলো 'হিণ্ডোল'। সেটা সে তার ভাবী দয়িতার কাছেই রেখে দিত। কোথাও গাইতে যাবার সময় চেয়ে নিত। সে বলতো, এই আংটি পরলে তার বুকের বল বেড়ে যায়।

গুরুভাইদের হিংসের অন্ত ছিল না সিরাজের উপর। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল মহম্মদ খাঁ।

হাফিজের মেয়ে সিরাজকে ভালবাসে। এ কথা সকলেই জান্‌তো। সিরাজ সঙ্গীতে অপ্রতিদ্বন্দী। এইটাই ছিল হাফিজের মেয়ের গর্ব্ব। তার ভালবাসার কারণ। মেয়েরা যার কাছে হার মানে তাকেই ভালবাস্‌তে পারে। নীচু লোকের কাছে শির নোয়াবার প্রবৃত্তি, বন্ধুত্ব ও প্রেমের ভাব প্রায়ই আসে না তাদের। অন্ততঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। এজন্য পুরুষকে শ্রেষ্ঠ হতে হয় তাদের চেয়েও। সিরাজের গলা যেমন চড়তো খুব উঁচু পর্দ্দায়, আবার নামতোও তেমন খাদে।

সিরাজ জুয়া ধর্‌লে। মহম্মদের উৎসাহ ছিল তার হতেও অনেক বেশী। রক্তের জোর ছিল সিরাজের তখন। ভয় করেনি কিছুই। খেয়াল ভরে খুসী মত নষ্ট করতো টাকাগুলোকে। হাফিজের মেয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো, কিন্তু নিষেধ করেনি কোনও দিন। আর নিষেধ করলেও হয়ত সিরাজ শুনতো না। জুয়ার নেশায় সে তখন পাগল।

নিয়ামত খাঁ কিন্তু দেখতে পার্‌ত না সিরাজকে। হয়ত এই উচ্ছৃঙ্খল যুবককে ভাল লাগেনি তার। তা বলে সে হাফেজের মেয়েকে কোনও বাধা দিত না।

প্রায়ই দেখা হয় দু'জনায়। কত কথাবার্ত্তা ক'য়। প্রেমের কথা একঘেঁয়ে হয়ে এসেছিল ক্রমে। তবু শুন্‌তে চাইতো সিরাজ। কিন্তু বঞ্চিত হয়নি। ঈদের চাঁদকে সাক্ষ্য রেখে কত কথাই বলেছে তা'রা। ফাগুনের হাওয়া হাফিজের মেয়ের মুখের 'নেকাব' সরিয়ে দিত। অপলক চোখে চেয়ে থাকতো সিরাজ। তারপর হেসে উঠ্‌তো দু'জনেই। এমনি করে কতদিন কেটেছে তাদের।

তারপর এল সর্ব্বনাশের দিন ঘনিয়ে।...

সেটা বোধ হয় ফাগুন মাস। বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে সুরু করে। গাছে গাছে পাতা গজায়। দুনিয়ার রং ফিরে যায় যেন। মহম্মদ সিরাজকে জানালে যে, জয়পুরে গান বাজনা হবে, তার যাওয়া চাই। সিরাজ সহজেই রাজী হল। সে মহম্মদের কূট ষড়যন্ত্র বুঝতে পারেনি তখনও।

দুটোদিন গড়িয়ে যায়।

সিরাজ হাফিজের মেয়ের কাছে আংটি চাইলে যাবার দিনে। কিন্তু আংটি সে পায়নি আর। দয়িতা জানালে যে, আংটিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার বাক্সের মধ্যেই আছে নিশ্চয়। সে খুঁজে রেখে দেবে। জয়পুর থেকে ফিরে এসেই পাবে সে। তাড়াতাড়িতে খুঁজে পাচ্ছে না সে এখন।

সিরাজ তাকে তিরস্কার করতেও পারেনি। যাবে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে, তাকে তিরস্কার করতে থেমে যায় যেন। স্বর ম্লান হয়ে যায়।

হাফিজের মেয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুয়ারের ধারে। চোখের জল ছলছল করে তার। সিরাজ সহ্য করতে পারলো না আর। তাকে আদর করে বিদায় নিল। সান্ত্বনা দিল যে, দুই একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে সে।

তারপর যাত্রা সুরু করে।......

ভয়ে, আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠে তার। বারে বারে মনে পড়ে যায় গুরুজীর আংটি। ভাবলে, দূর হোক ছাই; ওটা কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়।

বাবুজি, বলতে পারেন, মানুষের মনে আঘাত লাগে কখন বেশী? যখন সে তার গর্ব্বের জিনিষ খুইয়ে বসে। দুঃখের অন্ত থাকে না, ব্যথার শেষ থাকে না। পাগলও হয়ে যায় অনেক সময়ে।

কেন যে সিরাজ পাগল হয়ে যায়নি, তাই ভাবি...

নানা গুণীর ভীড়। সভায় লোক ধরে না আর। কিন্তু আশ্চর্য্য, একটিও কথা নেই কারুর মুখে। সবাই স্তব্ধ। সিরাজ উঠে এল ধীরে ধীরে। পা তার কাঁপে সরাবের নেশায়। মাথা টলে ওঠে। তবু গাইতে যায় সে। কত শ্রোতা অপেক্ষা করে তারই গান শোনবার জন্যে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, গলায় স্বর ফোটে না। এত চেষ্টাতেও নয়। তার বুক কেঁপে ওঠে। একী! এত অল্প সময়ে গলা নষ্ট হল কী করে? কিছুক্ষণ আগেও ত সে ভাল ছিল। সরাবের নেশা? নাঃ, নাঃ, নেশায় বিহ্বল করতে পারেনি কোনও দিন তাকে। সিরাজ ঢলে পড়ল সভার মধ্যেই? কণ্ঠস্বর ফুটলো না মোটেই। শুধু কাণে আসতে লাগল শ্রোতাদের কটু গালাগালি আর ব্যঙ্গের হাসি মহম্মদের। মূর্চ্ছার আগেও স্পষ্ট শুনেছিল সে।

বাবুজি, তার সুন্দর গলা চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেল। কথা বলতে স্বর ভাঙ্গা হয়ে বেরোতো। সর্ব্ব গর্ব্বের শেষ হল তার। সে বিকৃত স্বরে কথাই বলা যায় না—গানতো দূরের কথা! ষড়যন্ত্র করে মহম্মদ সিঁদুর খাইয়েছে তাকে শরাবের সাথে। সে রাতে মহম্মদ গাইল ভালই। সবাই তার প্রসংশায় পঞ্চমুখ। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর সিরাজের কাণে বাজতে লাগলো মহম্মদের কথাগুলো—

"মন্দ মন্দ বহতি পবন, বিরহিণী আজি হৃদয় দহন
পিয়া কি কারণ ও বিধুবদন......"

বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে হীরালাল বলে—তবে, তবে কি খাঁ সাহেব...

—শুনুন ডাক্তারবাবু, আরও আছে। এখানেই শেষ নয়, 'বদ্-নসীবের' ফের, বাবুজি 'বদ্নসীবের' ফের সবই!

সিরাজ পাগল হয়নি বাবু, তার ধৈর্য্য ছিল। কণ্ঠস্বর হারিয়ে সে কেঁদে বেড়াত। পাগল হওয়াই ভাল ছিল তার। কোনও দুঃখ থাকতো না। সে আর ফিরলো না। জয়পুরেই দিন 'গুজরান' করতে লাগলো। হাফিজের মেয়ে হয়ত বসেছিল তারই অপেক্ষায়। মহম্মদ ফিরে গিয়ে হয়ত সবই জানিয়েছে তাকে।

আগ্রহভরে প্রশ্ন করি—খাঁ-সাহেব, সিরাজ ফিরে গেল না কেন? সেখানে ত তার···

হ্যাঁ বাবুজি, শুধু ফেরবার জন্যেই রয়ে গেল সে। ফেরবার ইচ্ছে তার খুবই ছিল। কিন্তু ভাঙ্গা গলায় ফিরবে কী করে। নিজেরই কেমন 'সরম' লাগলো তার, জুয়ায় সবই গিয়েছে—কী করে দাঁড়াবে! সেই হাফেজের মেয়ে হয়ত হাসবে, হয়ত ঘৃণাভরে চাইবে। নাঃ, নাঃ, সে অসহ্য! কেমন হিংসে জাগলো তার। আচ্ছা, বাবুজি, বলতে পারেন প্রেমে হিংসা জাগে কেন? যাকে ভালবাসি, তাকে হিংসা করবো কেন? সত্যই হাফেজের মেয়ের উপর তার হিংসায় মন ভরে গেল। দু'চোখ ফেটে কান্না ছুটলো তার। সে নিজের মান-গৌরব ফিরিয়ে আনবার প্রতিজ্ঞা করলে...

অনেক লোকের অনুরোধে সে যন্ত্র ধরলে। ঘরের দরজা বন্ধ করে সাধনা সুরু করলে সে। দিনের মধ্যে একবারের বেশী সে দরজা খুলতে কেউ দেখেনি তাকে। এমনি তার পরিশ্রম, এমনি তার সাধনা।

অতবড় গাইয়ে যে, যন্ত্র শিখতে কী আর লাগে তার কাছে। হাত খুব মিষ্টি। যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে এল তার। গলায় সূক্ষ্ম কাজ যন্ত্রে শোনাতে লাগল। এবার

খুশীতে হেসে উঠলো সে। মিষ্ট কণ্ঠস্বরের অভাব পূর্ণ করেছে যন্ত্র।

ফেরবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল সে।.....

কিন্তু সংবাদ পেল হাফিজের মেয়ে সেখানে নেই আর। কোথায় চলে গিয়েছে জানে না কেউ।

আবার তার বুক ভেঙ্গে গেল নিরাশায়।...

তিনটে বৎসর গড়িয়ে যায়, তারপর।

কপর্দ্দকহীন সিরাজ। যন্ত্র বাজিয়ে যা উপায় করে — তাতেই দিনগুলো কাটিয়ে দেয়। কোনও কিছুর প্রতি টান নেই তার। যেন কোন ভাবে কাটিয়ে যাওয়া দিনগুলো। এমন সময়ে সংবাদ এল "বখোরার" রাজ-দরবারে বাজাতে হবে তাকে। সেখানেই তার 'রুটির' ব্যবস্থা হবে।

যন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে। দুইদিন পরেই পৌছলো 'বখোরা'য়। 'ফরমায়েস' হল সেই বেলা বিশ্রাম করে রাত্রে বাজাতে হবে তাকে। অনেক লোক থাকবে সেখানে। তার "হিণ্ডোল রাগ" শুন্‌বে।

পথশ্রম কাটিয়ে রাত্রিবেলা সে যন্ত্র নিয়ে পৌছল দরবারে। তারপর বাজাতে সুরু করলো। সবে হিণ্ডোলের আলাপ ধরেছে, এমন সময়ে তার দৃষ্টি পড়ল দরবারে। সেখানে বসে নিয়ামত শুন্‌ছে তার যন্ত্র। মৃদু মৃদু হাসছে। তার মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। কলের পুতুলের মত বাজিয়ে চললো সে। কিন্তু এর পর যে ঘটনা ঘট্‌লো—তা যেমন করুণ, তেমনি ইতরের মত কাজ বাবুজি।

সিরাজের সাম্‌নেই একটা পাতলা চিকের পর্দ্দা। তার মধ্যে মেয়েরা শুনছে বসে। সিরাজের মনে হল, কে যেন সে পরদা সরিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। বিস্ময়ে তার মন ভরে ওঠে। কিন্তু একী! এ যে হাফেজের মেয়ে! উত্তেজনায় তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে! শিরায় শিরায় রক্ত বইতে থাকে। যন্ত্র ফেলে সেই দিকে ছুটে যায় সে পাগলের মত। সভায় সবাই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাকে ধরে ফেলে। তারপর নিয়ামত খাঁ নেমে এসে পায়ের 'পয়জার' ছুড়ে মারে তাকে। সে পড়ে যায়, শির কেটে 'খুন' বেরোয়। হাফিজের মেয়ে হাস্‌তে থাকে। লোকলো বেদরদীর মত মারে সিরাজকে। বাবুজি, বাবুজি... সে উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই ম্লান হয়ে যায় সেই উত্তেজনা। কী আশ্চর্য্য! তার চোখ অশ্রুধারায় ভরে ওঠে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আমি সেই সিরাজ বাবুজী, এই দেখুন সেই কাটার দাগ। হাফিজের মেয়ের নাম আমিনা। সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী—আমার 'জরু'—যাকে আপনারা এই ঘরেই দেখতে পেয়েছিলেন।

বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে যেন! স্পন্দিত অন্তরে আমরা সিরাজের কাহিনী শুনি।

আবার সে বলে ওঠে—শুনুন বাবুজি, নিয়ামত খাঁ মারলে বটে কিন্তু দয়া করেই সেখানে আমার 'রুটি' 'বরাদ্দ' করে দিলে। এ দয়ায় মন খুসী হয় না, বরং দুঃখ লাগে। কিন্তু কি করবো, পেটের যে বড় জ্বালা। ছুটে কোথাও পালাবার ইচ্ছে হতো, কিন্তু পালাই নি বাবুজি, তার কারণও বলছি পরে।

সেদিন বোধ হয় অমাবস্যার রাত্রি, চারিদিকে আঁধার আর আঁধার। 'আস্‌মানে' এক ফোঁটাও আলো নেই, সে আঁধার ভেদ করে নজর পৌছয় না বেশী দূর।

এইটাই ছিল মস্ত সুযোগ আমার।

পথে লোকজন কেউ নেই। কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। শুধু মাঝে মাঝে দু একটা কুকুর চেঁচিয়ে ওঠে। বুক কেঁপে ওঠে, কিন্তু পেছ-পা হইনি তবু। একা চল্‌তে সুরু করি।

ধীরে ধীরে আমিনার মহালে পৌছই। অতি সাবধানে।...

সে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, জান্‌তে পারলে না কিছুই। বাবুজি, তখনও বিয়ে হয় নি আমিনার। মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাই নি সেদিন। কিন্তু বড় মায়া হতে লাগল। তবু মন শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইলাম শেষ বারের মত সে রূপ দেখবার জন্য। আমার 'জেবে' ছিল একটা শিশি। তার মধ্যে 'শুয়াগুল' পাতার আর 'কুরকি'র রস মেশান। শিশির মধ্যের পদার্থটা নিমিষে ঢেলে দিই তার মুখের 'পরে। আমিনা জেগে উঠ্‌লো, কিন্তু আমি তখন অনেক —অনেক দূরে। সে বুঝতেও পারেনি কিছুই।

তার কিছুদিন পরের কথা।...

আমিনাকে চিন্তে পারা যায় না আর। সারা মুখ 'ঘা'। পোড়া চামড়ার মত দাগ। কোথায় সেই নিটোল নাক, সুন্দর চোখ, দেখলেও ভয় করে এখন। বেহেস্তের হুরী এখন দোজখের শয়তানী! বিকৃত মুখ! মানুষ বলেই চেনা যায় না! নিয়ামত ঘৃণায় তাকালে না সেদিকে। দাসীবাঁদীরা কেউ কাছে যেত না। সবাই পরিত্যাগ করলে।

বাবুজি, প্রতিহিংসার জন্যে এসব করিনি। তাকে পাবার জন্যেই শুধু তার রূপ নষ্ট করে দিয়েছি। রূপ থাকলে নিয়ামতই 'সাদী' করত তাকে। সত্যই সে ভালবাসে কী না আজও জানতে পারিনি। তবে আমি তাকে ভালবাসি। তাকে পাবার জন্যেই রূপ নষ্ট করেছি। কোনও ক্ষোভ নেই বাবুজি আমার, বরং ভালই হয়েছে। তার রূপের গর্ব্ব আর আমার কণ্ঠের গর্ব্ব ভেঙ্গে দিয়েছেন আল্লাহ্‌তালা। আজও আমি ভালবাসি আমিনাকে—

সিরাজের কণ্ঠস্বর শুরু হয়।

* * * *

রাতের তারাগুলো ঝিক্‌মিক্ করে, তাদের মঞ্জুল স্নিগ্ধ-দ্যুতি ঝরে পড়ে ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে। বিধাতার আশীর্ব্বচনের মত। সিরাজের বাড়ী হতে বেরিয়ে অপেক্ষা করি 'বাসে'র জন্য।

ভাবি—সত্যই কী এমন অলক্ষুণে রাগ-রাগিণী আজও আছে!

—দেখো বিনোদ, অভিমান করে' ত বেরিয়েছ' বাড়ী হ'তে। নাইট্রিক এ্যাসিড্ ঢেলে বসো না যেন! হাঃ-হাঃ! হীরালালের কথাগুলো বাজতে থাকে কাণের চারপাশে।

কিন্তু এ পরিহাসে যোগ দেয় না আমার মন।

ফেরার পথে শুধু একটা ছবি ভাসতে থাকে আমার চোখের সম্মুখে—কুৎসিৎ, কদাকার, বিকৃত একখানা মুখ! সে মুখখানা কেঁদে ওঠে, স্পষ্টই দেখেছি আমিনাকে কাঁদতে; দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সবই শোনে সে। অশ্রু ঝিক্‌মিক্ করে সেই বিকৃত মুখখানার 'পরে।

সহসা 'বাসে'র তীব্র শব্দ আমার চমক্ ভাঙ্গিয়ে দেয়…

পরিচয়

শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

ত্যাজি লোকালয় সাধু নিরঞ্জন
দূর বনানীর কোলে,
ডাকে কোথা প্রভু দীনদয়াময়,
থেকো না এ দাসে ভুলে।

ছেড়েছি সংসার কামিনী কাঞ্চন,
মায়ার বাঁধন ডোর
স্নেহ-দয়া-প্রীতি দিছি বিসর্জ্জন,
তোমাতেই চিত ভোর।

হেসে প্রভু কন শোন নিরঞ্জন
ভুল করিয়াছ ভারি
হেরিবারে চাহ সৃজন মাধুরী
ফুলদল নখে ছিঁড়ি।

সবার মাঝারে বসাও আমায়
সব লয়ে করি ঘর;
ঘর ছেড়ে তুমি বাহিরে আসিয়া
আপন করেছ পর।

নত আঁখি সাধু ফিরি গেলা ঘর
রচিল সেবার নীড়—
বাঁধে সবাকারে পূত-প্রেমডোরে
অবনত করি শির।

মুঘল ইতিহাসের এক অধ্যায়

শ্রীনিখিল বসু

'আইবাদ্‌বখৎ'! 'আইবাদ্‌বখৎ'! আলমগীরের বিকৃত নীরস কণ্ঠ হতে বারে বারে এই দুটী কথাই বেরিয়ে এসেছিল। দু'হাতে তিনি চোখ চেপে ধরেছিলেন। আতঙ্কে ভরে উঠেছিল সর্ব্বশরীর! তিনি দেখবেন কি করে। দারার ছিন্নশির স্বর্ণপাত্রে নিয়ে এসেছে জহলাদ, তাঁকে উপহার দিতে। তাঁরই নিষ্ঠুর আজ্ঞায় দারার প্রাণহীন দেহ ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছে, তপ্ত রক্তে ভেসে গেছে চারিদিক্। অপরাধ? অপরাধ, দারা পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র—সিংহাসনের অধিকারী। স্বার্থান্ধ নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাছে এই অপরাধই যথেষ্ট। তিনি ছিলেন ধর্ম্মদ্রোহী। ধর্ম্মদ্রোহীকে কোন দিন আইন বাঁচায়নি, আদালত আশ্রয় দেয়নি। তার জন্য ছিল না সুবিচার আর দয়া। তাই সেদিন বন্দী লাঞ্ছিত দারাকে কেউ বাঁচাতে চেষ্টা করেনি! যারা তাকে ভালবেসেছিল, তারা নীরবে করেছিল অশ্রু-বিসর্জ্জন। সে অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ কেউ করেনি, তবু যখন দারার ছিন্নমুণ্ড আলমগীরের কাছে নিয়ে এলো, সম্রাট্ তখন সে দৃশ্য সহ্য করতে পারেননি। Bernier লিখছেন—"Aurangzeb shed tears and said, 'Ai Bad bakht! Ah wretched man! let this shocking sight no more offend my eyes, but take away the head and let it be buried in Houmayon's tomb"—ঔরংজেব সেদিন চোখের জল ফেলেছিলেন একথা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। যদি তাই সত্যি হয়, তবে সে কান্না ব্যথিত অনুতপ্ত হৃদয় থেকে ঠেলে উঠে আসেনি। তাতে ছিল না শোক, ছিল না মায়া, তাতে ছিল আতঙ্কের জলন্ত শিখা; পাপের অন্ধকার কদর্য্যতা থেকে তা ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল।

রূপকার সাজাহানের স্বপ্ন ছিল দারার চোখে, সর্ব্বাঙ্গে ছিল মমতার লাবণ্য আর পিতামহ ও প্রপিতামহের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন হৃদয়ের বিশালতা, সাগরের ঔদার্য্য। এই রকম মানসিক বৃত্তির অধিকারী হয়ে যখন তাঁর প্রতিভা ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে উন্মুখ, তখন হঠাৎ কোথা হতে এল অন্ধকার, আশাহীন দিশাহীন অন্ধকার! রুদ্ধ বাতাস দিলে বিষ ছড়িয়ে! দারার প্রতিভার স্থান হ'ল ঝরাপাতা আর বিবর্ণ পাপড়ির মৃত্যুশয্যায়।

সেই সময়ে হিন্দুস্থানের ধর্ম্মের অবস্থা সঙ্গীন। ধর্ম্মের নামে চলছে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, অর্থহীন, যুক্তিহীন অসহ্য অবিচার। পূজা নেই, পাঠ নেই, নেমাজ পড়া নেই, গির্জ্জেয় যাওয়া নেই; অথচ সেখানে বেজে উঠেছে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি ধর্ম্মেরই নামে। নালিশ কারা করবে? যারা এর প্রতিবাদ করতে যায়, তাদের মরতে হয় হাতীর পায়ের চাপে, ডালকুত্তার কামড়ে তাদের চোখ উপড়ে ফেলে, ছাল ছিঁড়ে ফেলে তাদের ছিন্নমুণ্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয় রাজপথের স্তম্ভের গায়ে আর তার তলায় লেখা থাকে—'ধর্ম্মদ্রোহীদের ভাগ্য এই—সাবধান'।

কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে তাদের মনে—যারা মানুষের মঙ্গলসাধনের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে! আকাশের লক্ষ বিদ্যুৎ তাদের দরাজ প্রাণে জ্বালিয়ে দেয় আশার বাতি। তারা বোঝে বেশী, দেখে বেশী, শুধু করবার সময়ের প্রতীক্ষায় থাকে। যখন ধর্ম্মের এই অবস্থা—তখন দারা ধর্ম্মান্ধ জনতার বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন। চোখে তাঁর স্বপ্নের রঙীন আলো কেঁপে উঠেছে, এক বিশাল আদর্শে তাঁর বুক ভরে তুলেছে। তিনি ভাবছেন—এদের বেঁধে দিলে হয় না এক ধর্ম্ম-পাশে? এমন একটা হিন্দুস্থানের সৃষ্টি করা যায় না—যেখানে থাক্‌বে এক ধর্ম্ম, এক আদর্শ, যেখানে লোকে বাঁচার মত বাঁচবে, নীরন্ধ্র অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে সেখানে নিয়ে আসবে আশার আলো, কর্ম্মের উদ্দীপনা, শঠতা হীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি? তার আদর্শের দিকে চেয়ে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা, ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা বিন্দুমাত্র ছিল না। বেদ আর উপনিষদে তাঁর ছিল

প্রগাঢ় ভক্তি। সন্ন্যাসী আর যোগীদের কাছ থেকে তিনি শুনতেন গীতার অধ্যাত্ম মর্ম্ম, পাদরীদের কাছ থেকে তিনি শুনতেন যীশুর বাণী — Old Testament আর New Testament-এর উদাত্ত সুর। কতদিন যে মুঘল রাজপুত্র হিন্দু যোগী লালদাসের পদতলে বসে ধর্ম্মালোচনা করতে করতে বিভোর হয়ে উঠতেন তার ঠিক নেই। যে প্রেরণায় তিনি লালদাসের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তেন, ঠিক সেই প্রেরণায় প্রদীপ্ত হ'য়ে তিনি ছুটে গেছেন মুসলিম ফকির সরমদের (Sarmad) কাছে। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম্মের মধ্যে এক বিরাট্ সেতু গড়ে তুলতে। সকল ধর্ম্মের সারটুকু তিনি নিয়েছিলেন ছেঁকে। তাঁর এই বিরাট্ প্রচেষ্টা থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'ল মজমুয়া-উল্-বাহারিণ্ (Mazmua-ul-Bahrin) 'the mingling of two oceans.' তিনি যেমন বারাণসীর হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে উপনিষদের উর্দ্দু অনুবাদ করেছিলেন, ঠিক তেমন করে লিখেছিলেন মুসলমান ফকিরের আত্মকথা। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর আদর্শ কেউ বোঝেনি। তাঁকে লোকে দেখেছে ধর্ম্মদ্রোহী কাফেরের রূপে। ভয় পেয়েছিল তারা, ভেবেছিল দারা যখন সিংহাসনে বসবেন, তখন মুসলিম ধর্ম্মের অস্তিত্ব আর থাকবে না। তাই মীরজা মুহম্মদ কাকীম (Mirza-Muhammad Kakim) তাঁর 'আলমগীর-নামা'তে এক জায়গায় লিখছেন—"Dara Shuko was constantly in the society of Bramhins, Yogis and Sannaysis, and he used to regard these worthless teachers of delusions as learned and true masters of wisdom. He considered their books which they call Veda as being the word of God, and revealed from heaven and he called them ancient and excellent books. He spent all his time in this unholy work and devoted all his attention to the content of this wretched book. Instead of the sacred name of God he adopted the Hindu name Prabhu (Lord) which the Hindus consider Holy, and he had this name engraved in Hindi letters upon the rings of diamonds, ruby, emerald etc....Through these perverted opinions he had given up the prayers, fasting and other obligations imposed by law...It became manifest that if Dara Shuko obtained the throne and established his power, the foundation of the faith would be in danger and the precepts of Islam would be changed for the rout of infidelity and Judaism."......দারাকে লোকে ভুল বুঝেছিল, ভুল ভেবেছিল। আর এই ভুল বোঝার ফল কি হয়েছিল, তা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁর হৃদয়ের ঔদার্য্য তাঁকে করেছিল সর্ব্বহারা, নিঃস্ব ভিখারী। হৃতসর্ব্বস্ব দারাকে উদ্ধত অবিচারের যূপকাষ্ঠে মানসম্ভ্রম, আত্মীয়-বন্ধু সবাইকে হারিয়ে পাষাণ-বধ্যভূমিতে দ্বিখণ্ডিত শির লোটাতে হয়েছিল।

ভগ্নস্বাস্থ্য, বৃদ্ধ সম্রাট্ সাজাহান ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন মরণ-পানে। ভাবনা-চিন্তায় তিনি জর্জ্জরিত, কোন মতে যেন এই জরাজীর্ণ দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছেন। মমতাজের পর, দারার কাছে তিনি সব বিকিয়ে দিয়েছেন, উজাড় করে' দিয়েছেন তাঁর বুক ভরা ভালবাসা। দিল্লীর কোন রাজপুত্রের দারার মত অর্থ, যশ, মান, ভোগ করবার সৌভাগ্য মেলেনি। কিন্তু সাজাহানের স্নেহান্ধ হৃদয় আশঙ্কায় ভরে ওঠে, কোথায় যেন অনিবার্য্য অমঙ্গল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। সম্রাট্ জানতেন যে, দারাকে ধর্ম্মান্ধ প্রজারা চাইবে না। কনিষ্ঠ পুত্র ঔরংজীবের শ্যেনদৃষ্টি ছিল সিংহাসনের উপর। দারার ঔদার্য্য তাঁকে যথেষ্ট সুবিধা করে' দিয়েছিল।

কিন্তু দুর্ভাগার বরাতে দুঃস্বপ্নই যায় ফলে। সাজাহান সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হলেন। তাঁর দরবারে আসা বন্ধ হল। ঝরোকা বাতায়নে দাঁড়িয়ে সমবেত প্রজাদের অভিনন্দন গ্রহণ করার মত শক্তি তাঁর আর ছিল না। চারিধারে রটে গেল যে, সাজাহান মৃত। আমীরদের কাছে সাজাহান চিঠি পাঠালেন। কিন্তু তারা কেউ বিশ্বাস করলে না। সাজাহানের জাল চিঠি বলে' সেগুলো পুড়িয়ে ফেললে। দেখতে দেখতে সুবিধাবাদীর দল ভীড় করে' দাঁড়াল দিল্লীর দরজায়। তাদের চোখেমুখে

প্রকাশ পেল অসংযত বর্দর্য্য কামনা, জঘন্য হিংসাবৃত্তি, কুশ্রী লালসা। দক্ষিণাপথ থেকে এল ঔরংজীব, গুজরাট থেকে এল মুরাদ বখস্, বাংলাদেশের শাসনকর্ত্তা সুজা তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ঔরংজীবের কপট বুদ্ধির সমকক্ষ কেউ ছিল না, তার মস্তিষ্কে শয়তানের আধিপত্য পূর্ণ মাত্রায়। সে রটিয়ে দিল যে 'ধর্ম্মের জন্য, ইস্‌লামের জন্য, কোটী কোটী নরনারীকে নেমাজ পড়তে সাহায্য করার জন্য তিনি বিধর্ম্মী দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর এই অভিযান দিল্লীর রাজমুকুটের জন্য নয়, অর্থের জন্য নয়, যশের জন্য নয়—এ তাঁর ধর্ম্মযুদ্ধ, একটা Crusade!…তিনি ফকীর, তাঁর কর্ত্তব্য করতে হবে জীবনভোর।' মুরাদ তার কপট প্রেমে মুগ্ধ হ'ল। তাঁর সৈন্যসামন্ত ঔরংজীবের সাহায্যার্থে নিয়োজিত হ'ল। তিনি যেন Cincinnetus—তরবারি গ্রহণ করেছেন দেশের জন্য, দশের জন্য, প্রয়োজনের দাবীতে। প্রয়োজন যখন হবে শেষ, তখন আবার তিনি ধরবেন হাল, চরাবেন গরু। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঘোষণাপত্রে—"All my pious aim is to uproot the bramble of idolatry and infidelity from the realm of Islam and to overwhelm and crush the idolatrous chief with his followers and strongholds, so that the dust of disturbance may be allayed in Hindusthan. As previously settled, I shall leave to him the Punjab, Atganisthan, Kashmir and Sind……As soon as the idolator has been rooted out and the bramble of his tumult weeded out of the garden of the Empire… I shall without the least delay give him leave to go to this territory. As to the truth of this desire, I take God and the Prophet as witness." (Sir J. N. Sircar's translation.)

অস্ত্রে অস্ত্রে মরণোৎসব জেগে ওঠে। চারিধারে সাজ-সাজ রব। একধারে সম্রাটের ফৌজ আর রাজপুত-বাহিনী আর একধারে ঔরংজীব আর মুরাদের সম্মিলিত বিরাট্ শক্তি। যুদ্ধ সুরু হ'ল, বুক ছিঁড়ে পাগলা ঝোরার মত রক্ত ছুটে চলে, রক্তাক্ত উষ্ণীষ লুটিয়ে পড়ে ভূমিতে, মুণ্ডের ছিন্নশির বীভৎস আকার ধারণ করে। ধরমতের (Dharamat) প্রাঙ্গণ সেদিন ভরে' ওঠে লক্ষ লক্ষ মৃতদেহে, আকাশ বাতাস ভরে' যায় যন্ত্রণাজর্জ্জর মরণোন্মুখ যোদ্ধার তীব্র আর্ত্তনাদে, তাদের শেষ নালিশ রেখে যায় পথধূলিকায়। কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, সেদিন রাজপুতেরা এসেছিল মরতে, যুদ্ধ করতে নয়। বিজয়ী ঔরংজীব দিল্লীর দিকে এগিয়ে চলেন।

কিন্তু ভাগ্য যখন থাকে বিরূপ, তখন অমঙ্গলের আকর্ষণকে কি করে' এড়ান যায়! দারাকে ঘিরে ফেলেছে অলক্ষণের কৃষ্ণছায়ায়, নিষ্ঠুর নিষ্ফলতায়। তিনি স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন, শেষবারের মত—দেখলেন দূরে বিশাল চল্লিশটী স্তম্ভের প্রকোষ্ঠে (Hall of forty pillars) হিন্দুস্থানের সম্রাট্ দাঁড়িয়ে রয়েছেন একাকী, নিষ্করুণ নির্জ্জনতায়। তাঁকে দেখায় যেন প্রেতের মত, গত গৌরবের কঙ্কাল যেন তিনি। তাঁর মুখ মক্কার দিকে ফেরান, প্রাণ ভরে' আল্লার কাছে প্রিয়পুত্রের বিজয় প্রার্থনা করছেন। সেদিনকার সে বিদায়-ব্যথা সাজাহানের বক্ষে কি নিদারুণ আঘাত করেছিল, তা সহৃদয় পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারবেন।

রক্তের বন্যা বইল। কোন ঐতিহাসিক বলেন,—"The blood mounted waist high, and ten thousand of Dara Shuka's soldiers lay dead or dying"—পরাজিত দারা প্রমাদ গণলেন। তারপর সুরু হল ছুটে চলা আশ্রয়ের খোঁজে। কোথায় পালাবেন? ঔরংজীব তাঁর শির নিতে ব্যস্ত। দারার প্রাণভিক্ষার জন্য জাহান-আরার কাতর প্রার্থনা বিফলে গেল। উদ্ধত অবিচারের লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে শিকারীর দল ছুটল দারার পেছনে, ক্রোধোন্মত্ত হিংস্র বর্ব্বরের মত। তাদের পাশবিক অট্টহাসি বেজে উঠ্ল চারিদিকে। দারা পালিয়ে চলেছেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে। পার হল দিল্লী, পার হল পানিপথ, পার হল লাহোর—তাঁরা চলেছেন ছুটে। শতদ্রুর ধার ঘেঁসে, পাঞ্জাবের স্রোতস্বিনী নদীনদ ডিঙিয়ে পালিয়ে চলেছেন। মাথায় বর্ষা ভেঙে পড়েছে, কড়-কড় করে' আকাশ ডেকে উঠেছে লক্ষ কণ্ঠে, শরীর মন ক্লান্তিতে, ব্যথায়, যন্ত্রণায় ভরে' উঠেছে; তবু রাজপুত্রের

খেয়াল নাই কোনদিকে। তাঁকে যে বাঁচতেই হবে! কিন্তু কোথায়—আশ্রয় কোথায়? পেছনে রইল মুলতান, রইল পড়ে সিন্ধুনদীর উপত্যকা, এগিয়ে এল রাজস্থান। একবার যেন মনে হল রাঠোরের সাহায্য তিনি পাবেন, কিন্তু সে জয়ের আশা, বাঁচবার আশা মুহূর্ত্তেই ধূলিসাৎ হল। সামনে ধূ ধূ করছে বিশাল সিন্দের (Sind) মরুভূমি। ধূসর দিগন্ত বালুর সমুদ্রে গেছে মিলিয়ে। ঘর নেই, বাড়ী নেই, লোকালয় নেই, গাছ নেই, ছায়া নেই, জল নেই,—শুধু পড়ে' আছে বালু আর বালু—বালুর স্বপ্নপুরী। পড়ে' আছে মরা প্রকৃতির বিশাল দেহ—ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত তার নিঃশ্বাসে অগ্নিবৃষ্টি, তার বুকের লক্ষ ফাটল দিয়ে আগুনের হল্কা। তবু চলেছেন সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে, অসহ্য গরমে। কোমর ভেঙে গেছে, শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ব্যথা জমে' জমে' উঠেছে, গলা শুকিয়ে এসেছে, তালু শুকিয়ে এসেছে, চোখে নেচে উঠেছে মৃত্যু—তবু ছুটে চলেছেন মরুভূমির মাঝে।

এই রকমই হয়, যখন মানুষ চায় জোর করে' বাঁচতে, যখন তাকে জীবনের নেশা জড়িয়ে ধরে, যখন সুন্দর পৃথিবীর আলো বাতাসের মায়া সে পারে না কাটাতে। কিন্তু সে কি করবে, যার বিষ হয় পানীয়, দুঃখ হয় পাথেয়, আলেয়া হয় আশ্রয়, শয়তান হয় বন্ধু, আর যার নিয়তি হয় গতি, শক্তি, সব কিছু! তাঁর মাথার উপর ঝুলছে (Damocles) ডেমক্লেসের-এর নিষ্ঠুর খড়্গ, দুঃখ আর ব্যর্থতা জমে' উঠেছে তার কর্ম্মের স্তরে স্তরে। বোলান (Bolan) গিরিপথের ন' মাইল দূরে এক বেলুচী সর্দ্দারের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। জীয়ান্ খাঁ সেই বেলুচী সর্দ্দার, বহুকাল আগে সাজাহানের কোপানলে পড়ে। সম্রাট্ তাকে পাগলা হাতীর পায়ের তলায় মেরে ফেলতে আদেশ দেন। কিন্তু দারাই সম্রাটের কাছে তার প্রাণভিক্ষা করে' তাকে বাঁচান। আজ দারা দিল্লীর বাদশাহ নয়, পথের ভিখারী। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁকে আজ জীয়ান খাঁ কি আশ্রয় দেবে না? দারার পরিজনবর্গ তাঁকে কত বোঝালেন, বেলুচী সর্দ্দারকে বিশ্বাস করতে বারণ করলেন, চোখের জল আর অনুনয়ে সেদিন কোন কাজ হল না। দারা যেন পাগল। কোন ঐতিহাসিক তাঁর অবস্থা বর্ণনা করেছেন—"Death was painted in his eyes... Everywhere he saw only destruction, and losing his senses, became utterly heedless of his own affairs"......কোন বাধা না মেনে বেলুচী সর্দ্দারের কাছে, তিনি আত্মসমর্পণ করেলেন। ভগবান যাকে মারেন, তাকে মারবার আগে বুদ্ধি কেড়ে নেন—'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'।

এই বিশ্বাসের ফল ফল্‌ল। জীয়ান খাঁ হঠাৎ কোন এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে তাঁদের করলেন বন্দী। Tavernier বলেন, সে রাত্রে দারার দ্বিতীয় পুত্র বালক সেফার স্থকো যখন টের পেলেন যে, তাঁরা বন্দী হতে চলেছেন, তিনি ধনুর্বাণ নিয়ে শেষ আত্মরক্ষার পথ খুঁজলেন। অন্ধকার রাত্রি কিছু দেখা যায় না, তবু তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্যে তিনজন আফ্‌গান ধরাশায়ী হল। কিন্তু তিনি একলা কি করবেন? তাঁকে ঘিরে ফেল্‌ল শত্রুর দল। হাত পেছনে বেঁধে ফেলে তাঁকে বন্দী করল। নিঝুম রাতে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিতে নিদ্রোত্থিত দারা চোখ মেলে দেখলেন তিনি বন্দী, তাঁর পুত্র বন্দী, কন্যা বন্দী, পরিজনবর্গ সকলে বন্দী। দুঃখে, রাগে তিনি জলে' উঠলেন—জীয়ান খাঁকে তিনি বাঁচিয়ে ছিলেন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হাত হতে—এই কি তার ফল? Tavernier লিখ্‌ছেন—দারার কণ্ঠ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল এক মর্ম্মভেদী অভিযোগ—"Finish, finish", said he, "Ungrateful and infamous wretch that thou art, finish that which thou hast commenced; we are the victims of evil fortune and the unjust passion of Aurangzeb, but remember I do not merit death except for having saved thy life and remember that a prince of the royal blood never had his hand tied behind his back."

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ। দিল্লীর পথের দু'ধারে জনতার সারি চারিদিকে একটা আসন্ন বিপদের রুদ্ধ মৌনতা। আলমগীর আজ দেখাবেন তাঁর প্রতাপ, প্রজাদের দেখাবেন তিনি দিল্লীর সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। বন্দী দারাকে আজ লোক সমাজে বার করা হবে, তাঁকে লাঞ্ছিত করা হবে। ফরাসী চিকিৎসক Bernier লিখছেন—"আমি

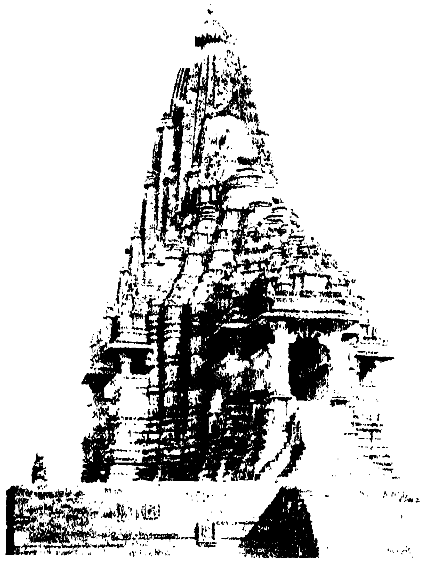
সেদিন বেশ একটা ভাল ঘোড়ায় চেপে সহরের মধ্যে এক বড় বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম, সেখান থেকে সব দেখা যায়। আমার সঙ্গে ছিল আমার দুটী অন্তরঙ্গ বন্ধু আর দু'জন চাকর। বুঝলুম সেদিন যে, ভারতীয়দের মন ভারী নরম—চারিদিক থেকে আমি কান্নার করুণ শব্দ শুনতে পেলুম—চাপা কান্না আর দীর্ঘশ্বাস। সবাই কাঁদছে, ছেলে-মেয়ে বুড়ো সবাই। যেন তাদের কি ভীষণ বিপদ্ হয়েছে। প্রথমে চলেছেন দারা আর তাঁর চৌদ্দ বছরের ছেলে—একটা নোংরা, কুৎসিত, অসুস্থ হস্তিনীর পিঠে। তাঁর গলায় নেই আজ মণির মালা, মাথায় নেই বহুমূল্য উষ্ণীষ। তাঁকে দেখায় যেন ভিখারীর মত, গায়ে পুরু মলিন বস্ত্র, মাথায় একটা ময়লা কাশ্মীরী শাল জড়ান। সেগুলো সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পরে' থাকে।... জীয়ান খাঁ দারার পাশেই ঘোড়ায় চেপে চলেছেন। সেই বিশ্বাসঘাতককে দু'পাশের জনতা উচ্চকণ্ঠে অভিশাপ দিচ্ছে। জীয়ানের উদ্দেশ্যে কদর্য্য ভাষায় ভরিয়ে তুলছে তাদের কণ্ঠ। উঃ, তাদের চীৎকারে যেন কাণে তালা লেগে যায়। দেখলুম, কয়েক জন ফকীর, গরীব দুঃখী সেই বিশ্বাসঘাতক পাঠানের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারল; কিন্তু বন্দী দারাকে, দুঃখী দারাকে বাঁচাবার জন্য কোন চেষ্টাই হল না, কেউ কৃপাণ ধরল না তাঁকে মুক্তি দিতে। Manucci বলেন যে, এক ফকীর দারাকে দেখে কেঁদে বলে উঠল 'শাহান-শা, যখন তুমি ছিলে সবার বড়, সবার প্রভু, তুমি আমাকে অনেক ভিক্ষা দিয়েছ, কিন্তু আজ বুঝি তোমার দেবার কিছু নেই'! দারা কোন সাড়া দিলেন না, নীরবে তাঁর মাথা থেকে শাল খুলে' ফেলে ফকীরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ঐতিহাসিক কাফী খাঁ বলেন যে, একদল লোক ক্ষেপে গিয়ে জীয়ান খাঁকে আক্রমণ করে, তার দিকে রাস্তার কাদা ছুঁড়ে দেয়। রাস্তার দু'ধারের বাড়ীর ওপর থেকে পর্দ্দানশীন মেয়েরা তার দিকে মদের কলসী ছুঁড়ে মারে। জীয়ানের দু'একজন সহচর খুন হয়। প্রহরীর দল ছুটে আসে, ভীড় সরিয়ে জীয়ানকে সে যাত্রা রক্ষা করে।

সেই সন্ধ্যায় দেওয়ানী খাসে এক সভা বসে—আলমগীর সে সভার গুরু—দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। কয়েক জন দারার প্রাণভিক্ষা করে; কিন্তু দারার কনিষ্ঠা ভগ্নী রোশন রাই (রৌশনারা) ভীষণ ভাবে দারার মৃত্যু কামনা করে। বিচারে সিদ্ধান্ত হয় দারা কাফের, ধর্ম্মবিদ্বেষী, ইস্লামের শত্রু। তার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়।......গভীর রাত—হঠাৎ পাষাণ কারাগারের লৌহদ্বার ঝনঝনিয়ে খুলে যায়, লোহার শেকল বেজে ওঠে। বন্দী দারা আর তাঁর বালক-পুত্র সেকার শুকো এক শয্যায় নিদ্রিত। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। সেকার শুকো ভয় পেয়ে কুঁকিয়ে কেঁদে উঠে দারাকে জড়িয়ে ধরে, যেন তাঁর মধ্যে আশ্রয় খোঁজে। দারার চোখ জলে ভরে ওঠে। জহ্লাদ ছুটে আসে তার অনুচববর্গ নিয়ে, চোখে তাদের বিভীষিকা, ঠোঁটে তাদের পাশবিক হাসি। জোর করে, পিতার বক্ষ হতে পুত্রকে ছাড়িয়ে নেয়। অন্ধকারের বুক চিরে একটা শাণিত অস্ত্র শূন্যে তুলে ওঠে—তার পরেই কি রকম শব্দ⋯বুকভাঙা আর্ত্তনাদ। দারা লুটিয়ে পড়ে মাটীতে, রক্তে ভেসে যায় চারিদিক্। তাঁর ছেলের কান্না তখনও তাঁর কাণে ভেসে আসে দূর থেকে বেয়ে-আসা শঙ্খধ্বনির মত!

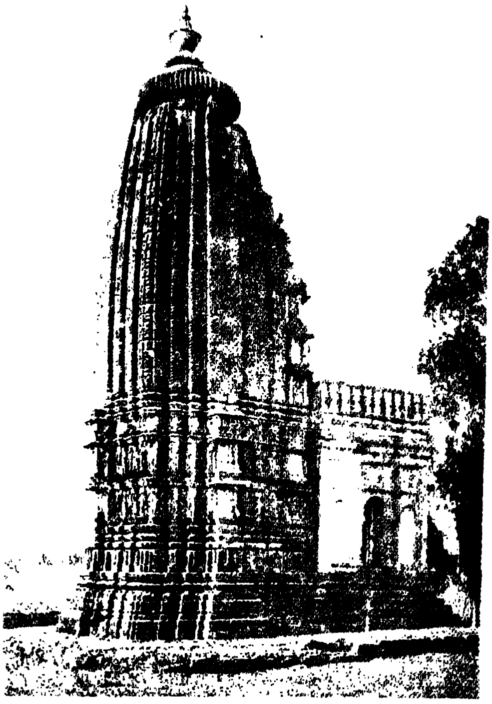
মন-ফুল

শ্রীসুধীর বসু

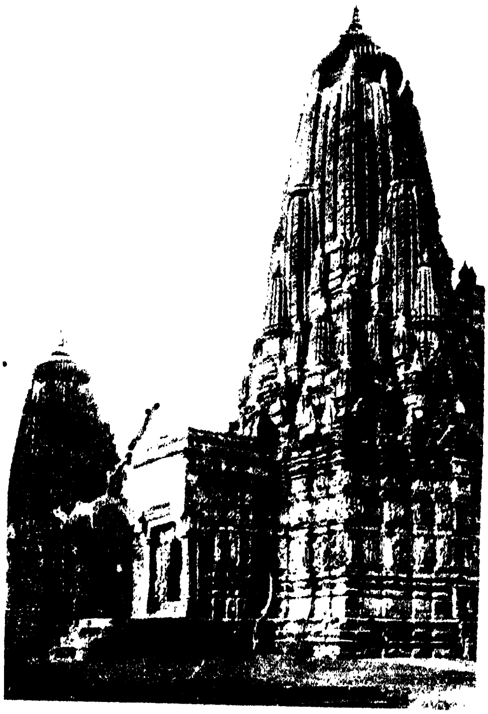
বকুলের মত, শেফালীর মত,
নীরবে ঝরিয়া ভকতি প্রণত,
জীবন-স্মৃতিটী রেখে যাব শুধু-
সত্যের ফুল-গন্ধে!



কাণ্ডারিয়া মহাদেব মন্দিরের পূর্বদিকের দৃশ্য : খাজুরাহো



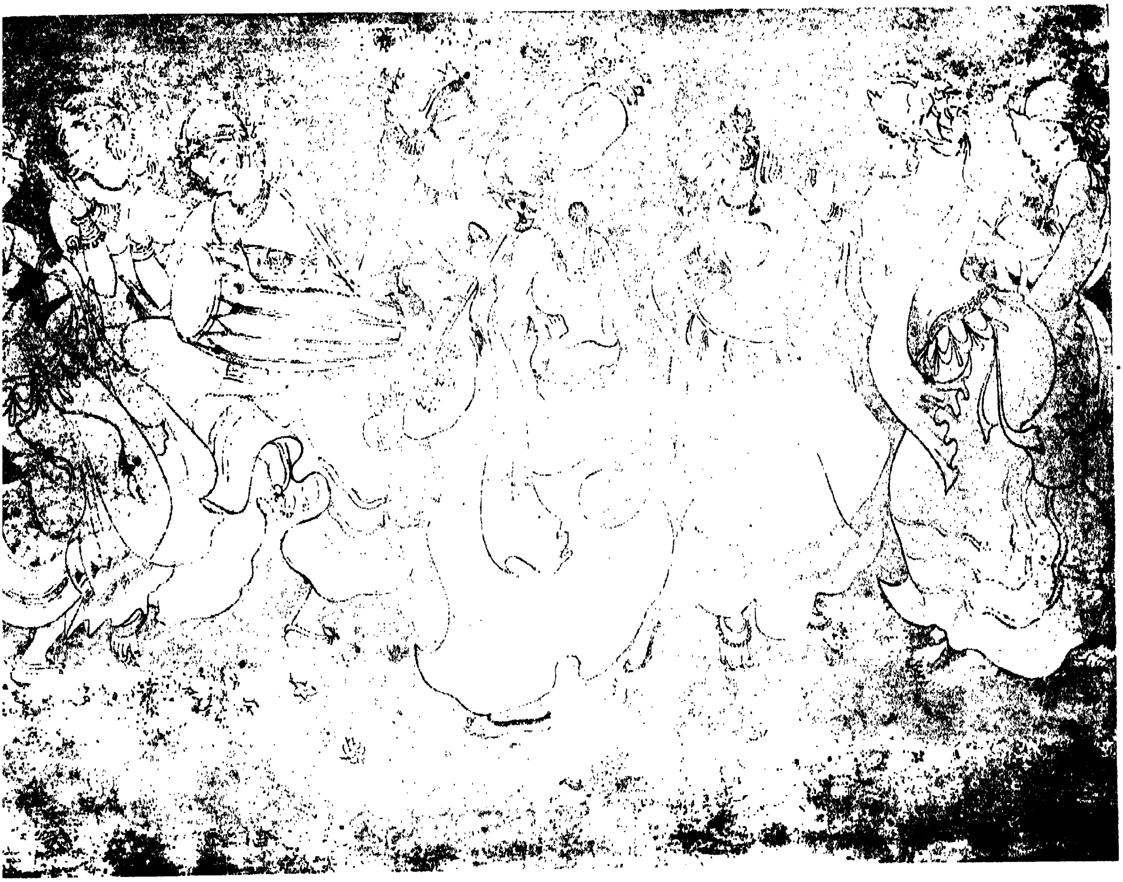
পার্শ্বনাথ মন্দির : খাজুরাহো



পশ্চিম হইতে নেমিনাথ মন্দির : খাজুরাহো



ভারতীয়-নৃত্যছন্দ



শিল্পী— শ্রীকালিকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার



শিব মন্দির : পাণ্ডুরঙ্গ (চম্পা, বর্ত্তমান আনাম্)

স্বামী সদানন্দ গিরির সৌজন্যে

নার্স

(গল্প)

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

১

"পনর নম্বর, ও পনর নম্বর, শুনতে পাচ্ছেন? —এই ওষুধটা খান দেখি।"

চক্ষু মেলিয়াই দেখিলাম যে একখানি কোমল সুন্দর মুখ আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমাকেই উদ্দেশ করিয়া কথাগুলি বলিতেছে।

অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী। প্রসাধনের পারিপাট্য নাই, বেশভূষার আড়ম্বর নাই, তথাপি অপূর্ব্ব সুন্দরী। পরিধানে ধবধবে শাদা কালো পাড়ের একখানি শাড়ি, গায়ে তেমনই শুভ্র আঁটাসাঁটা ব্লাউজ, মাথার কেশ তদপেক্ষাও শুভ্র রুমাল দিয়া আঁটিয়া বাঁধা। অনাবৃত বাহু, অলঙ্কারহীন প্রকোষ্ঠ। তথাপি তাহার রূপের যেন তুলনা হয় না। হঠাৎ চাহিয়া আমার মনে হইল যে, কৈশোরে উপকথার পুস্তকে যে পরীদের কথা পড়িয়াছিলাম—তাহাদেরই কেহ কোন্ সে, দুর্ব্বাসার যেন অভিশাপে ডানা হারাইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

আনন্দ ও বিস্ময়ে আমার অর্দ্ধসচেতনবুদ্ধি কেমন যেন বিহ্বল হইয়া গেল।

ইহাই প্রথম অনুভূতি।

দ্বিতীয় অনুভূতি জাগিল যন্ত্রণার। সর্ব্বদেহে ও বিশেষ করিয়া মাথায় দুঃসহ যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল এবং ক্ষণকাল পর উহাই যেন আমার বুদ্ধির বিচরণের জন্য সেতু হইয়া বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের একটা যোগসূত্র রচনা করিয়া দিল।

কতদিন পূর্ব্বে ঠিক মনে করিতে পারিলাম না, তবে মনে পড়িল—যে, একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া, নবাবপুরের পুল পার হইতেই পিছনদিক হইতে বেশ জবরদস্ত ধাক্কা খাইয়া অসহায়ের মত পথের উপরেই পড়িয়া গিয়াছিলাম। তাহার পর আমার ইন্দ্রিয়গুলি এই

বিহ্বলের মত অস্ফুট জড়িতকণ্ঠে কহিলাম, "আমি কোথায়?"

সেই পরীর মত মেয়েটি সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হাসপাতালে।"

মনে হইল যে হাসপাতাল কথাটার সঙ্গে নবাবপুরের সেই ধাক্কাটার একটা তর্কশাস্ত্রসম্মত নিবিড় সম্বন্ধ আছে। উহা যে কি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য পুনরায় চক্ষু মুদিলাম।

কিন্তু আমার চিন্তাধারায় বাধা দিয়া মেয়েটি কহিল, "এই ওষুধটা আগে খান দেখি।" সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধের গ্লাসটি আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করিল।

কতকটা কলের মত হা করিলাম। মেয়েটি আমার মুখের মধ্যে ঔষধটুকু ঢালিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পর ডাক্তার আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, দিন তিনেক পূর্ব্বে মোটর গাড়ীর নীচে পড়িয়া মরিতে মরিতে বোধ করি বা পূর্ব্ব-পুরুষগণের পুণ্যফলেই বাঁচিয়া গিয়াছি। বাহিরের আঘাত তেমন গুরুতর নয়; সুতরাং জ্ঞান যখন ফিরে এসেছে এবং স্মৃতির কোন গোলমাল নেই, তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে খুব বেশী বিলম্ব হবে না। ডাক্তারবাবু উপসংহারে কহিলেন, "চলাফেরা করবার চেষ্টা করবেন না, ওষুধটা নিয়মমত খাবেন আর নার্সের উপদেশ মেনে চলবেন। তাহলে সেরে উঠতে খুব বেশী দিন লাগবে না।"

আমি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। নিজের রোগ ও ক্ষতের বর্ণনা শুনিয়া যতটা হউক আর না হউক, চারিদিকের দৃশ্য দেখিয়া মাথার মধ্যে কেমন যেন করিতে লাগিল।

হাসপাতালের সার্জ্জিক্যাল ওয়ার্ড। এ যেন আসুরিক-প্রক্রিয়ায় যমের সঙ্গে মানুষের মরণপণ সংগ্রামের

যেমন সব রোগ, তেমনই তাহাদের চিকিৎসা। মানুষের সহজ সাবলীল সুন্দর রূপকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রচেষ্টায় বিকৃতি ও বীভৎসতার প্রয়োগের দুর্বোধ্য পরিকল্পনা। প্রাকৃত জগতেরই এক সঙ্কীর্ণ কোন অতিপ্রাকৃতকে লইয়া গবেষণা করিবার জন্য মানুষের সযত্নরচিত পরীক্ষাগার।

কোন না কোন অঙ্গে হয় গভীর ক্ষত, না হয় ভগ্ন বা বিকল অস্থি লইয়া যন্ত্রণাকাতর মুখে অনির্দ্দিষ্ট প্রতীক্ষা, বিভিন্ন অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কুঞ্চিত বা প্রসারিত করিয়া আরামের প্রত্যাশায় পলক গণনা, কাষ্ঠের পিঞ্জরের মধ্যে সচল দেহকে বন্দী করিয়া নিষ্প্রাণ জড়তার দুঃসহ ভার বহন, উর্দ্ধবাহু বা উর্দ্ধপদ হইয়া সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্র সাধনার অবাঞ্ছিত অনুকরণ,-- তুলা ও বস্ত্রের বন্ধনের মধ্যে বদ্ধ দেহগুলি যেন মানবদেহের ক্রমবিবর্ত্তনের এক একটি রক্ষিত নিদর্শন।

রোগের যন্ত্রণাকেও বোধ করি বা অতিক্রম করিয়া চিকিৎসার যন্ত্রণা। লৌহের ছোট-বড় অস্ত্র ও কাষ্ঠের বিভিন্ন আকৃতির সরঞ্জামের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের মধ্যে মানবদেহের সহনশীলতার চরম পরীক্ষা।

মানবকণ্ঠে সুরের যত রকমের অভিব্যক্তি হইতে পারে--তাহার সব কয়টির ভিতর দিয়া পীড়িত যন্ত্রণাকাতর মানবাত্মার বিরামহীন আর্ত্তনাদ।

যেন বাঁচিয়া থাকিবার উন্মাদ চেষ্টায় মৃত্যুর পাণপাত্র হইতে তিক্ত হলাহল কাড়িয়া লইয়া, থাকিয়া থাকিয়া আকণ্ঠ পান করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে ক্ষিপ্ত প্রতিযোগিতা।

ঔষধের তীব্র গন্ধের সঙ্গে গলিত ক্ষতের দুর্গন্ধের সংমিশ্রণে ভিতরের বাতাসে বোধ করি বা নরকেরই ক্ষীণ আভাস।

কেবল সেই মেয়েটি যেন নরকের মধ্যে স্বর্গের ছোট একটি প্রক্ষিপ্ত খণ্ড।

বাঙ্গালীর মেয়ে। ফিরিঙ্গী মেয়েদের গাউন ও হাইহিল জুতার তুলনায় তাহার শাড়ি ও স্লিপার আমার কাছে যেমন মধুর তেমনই শোভময়। প্রথম দৃষ্টিতে যে মুখ আমার মনে মোহ জন্মাইয়াছিল, তাহার আকর্ষণ আমার কাছে ক্রমেই যেন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

বাহিরে থাকিতে হাসপাতালের নার্সদের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম; আজ তাহাদেরই একজনের সম্মুখীন হইয়া যতই সেই সব কাহিনী স্মরণ করিতে লাগিলাম ততই মনের জিহ্বায় জল আসিতে লাগিল, মাথায় ক্ষত ও দেহে যন্ত্রণা লইয়া রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও রক্তের মধ্যে যেন বেশ একটু সুড়সুড়ি বোধ করিতে লাগিলাম।

আলাপ করিবার উপলক্ষ ভালই জুটিয়া গেল। পরদিন অপরাহ্নের দিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া শয্যায় পড়িয়া ছিলাম, সেই মেয়েটির সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কাণে পশিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল, "পনর নম্বর, ও পনর নম্বর,--এই ওষুধটা।"

ঘুম ভাঙ্গিলেও ইচ্ছা করিয়াই চক্ষু চাহিলাম না। মেয়েটি পুনরায় ডাকিল, "পনর নম্বর।"

"আমি নম্বর নই, মানুষ" বলিতে বলিতে চক্ষু খুলিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার চোখের দিকে চাহিলাম; হাসিয়া কহিলাম, "আমার মা বাবা আমার একটা নাম রেখেছিলেন।"

মেয়েটি কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইল না, বরং ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তাই নাকি? তবে সেটা আপাতত তোলাই থাক। এখন এই ওষুধটা চট্ করে' খেয়ে ফেলুন দেখি।" বলিতে বলিতে একরকম জোর করিয়াই ঔষধটুকু সে আমার কণ্ঠে ঢালিয়া দিল।

দিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, আমি ডাকিয়া কহিলাম, "আচ্ছা শুনুন।"

মেয়েটি ফিরিয়া আসিয়া আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল, আমি কহিলাম, "আচ্ছা আমার নাম ধরে' না ডেকে আমায় নম্বরে পরিণত ক'রছেন কেন?"

মেয়েটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপর কহিল, "অত নাম কি আমাদের মনে থাকে?"

ঠিক্ তাহার চোখের দিকে চাহিয়া আমি হাসিয়া কহিলাম, "অত নাম মনে না থাকুক, একটা নাম ত মনে থাকতে পারে।"

মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "সেই একটা নাম বুঝি আপনার?"

আমি হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, উত্তর দিলাম না।

বিশেষ এক ভঙ্গীতে গ্রীবা বাঁকাইয়া মেয়েটি সকৌতুক কণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, চেষ্টা করব আপনার নাম মনে রাখতে।"

সাহস বাড়িয়া গেল, আবদারের স্বরে কহিলাম, "না, চেষ্টা নয়, মনে রাখতেই হবে। আর তা ছাড়া, আপনার নামটাও আমি জানতে চাই। বলুন, বলবেন না?"

মেয়েটির মুখ দেখিতে দেখিতে গম্ভীর হইয়া গেল। সে শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "এখন ঘুমোন। রোগীদের বেশী কথা বলতে নেই।"

বলিয়া সেই যে সে নিজের কাজে চলিয়া গেল, তাহার পর সেদিন আর সে আমার কাছে আসিল না। কাজ শেষ করিয়া কখন যে সে বাসায় ফিরিয়া গেল, তাহাও আমি জানিতে পারিলাম না! দুঃখিত হইলাম, বিস্মিত হইলাম, মনে মনে একটু আশঙ্কাও বোধ করিতে লাগিলাম। বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া গোড়াতেই সব সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া ফেলিলাম কিনা, তাহাই ভাবিয়া সে-রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না।

কিন্তু পরদিন যথাসময়ে ঔষধ খাওয়াইতে আসিয়া সে যখন আমার নাম ধরিয়া ডাকিল, তখন কেবল যে আমার সকল আশঙ্কাই দূর হইয়া গেল তাহাই নহে, নূতন আশায় আমার বুকের রক্ত আবার টগবগ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সবটুকু ঔষধ গলাধঃকরণ করিবার পর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম, "আঃ বাঁচলাম। আমার উপর রাগ ক'রেছেন ভেবে কাল আমার যা ভাবনা হ'য়েছিল।"

মেয়েটি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "রাগ করব? কেন?"

আমি থতমত খাইয়া কহিলাম, "মানে,—কাল আমার কথা শুনে",—বাক্যটি সম্পূর্ণ করিতে পারিলাম না, ঢোক গিলিতে লাগিলাম।

মেয়েটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, "ও, ঐ নামের কথার জন্য! তার জন্য রাগ করব কেন? কত লোকেই ত আমাদের নাম জানতে চায়। সেজন্য রাগ করতে গেলে এ কাজ আর করা চলে না।"

আমি কহিলাম, "আমার বড্ড ভাবনা হয়েছিল।"

মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "অত বেশী এগিয়ে ভাববেন না। হাসপাতালে রোগ ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবতে নেই।"

আমার সাহস আরও বাড়িয়া গেল, কহিলাম, "আপনার নাম যতক্ষণ আমায় না বলছেন, ততক্ষণ আমার ভাবনা ঘুচবে না।"

"আমার নাম?" মেয়েটি তেমনই ভাবে কহিল, "লোকে যা বলে ডাকে তাই নাম হয় ত? তা ডাক্তার আর ছাত্র বাবুদের কাছে আমি 'মেম সাহেব', আর চাষা-ভূষা অসভ্য রোগীরা আমায় ডাকে 'মা'। এ দুটির মধ্যে আপনার যা খুসী, তাই বলে ডাকবেন। হয় 'মেম সাহেব', না হয় 'মা'। কেমন?"

আমি আবার থতমত খাইয়া গেলাম, ঢোক গিলিয়া কহিলাম, "না,—মানে—আপনার আসল নামটা—"

"আমার আসল নাম?" মেয়েটির চক্ষু দুইটি চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—"আমার আসল নাম আশা। কিন্তু সাবধান, ও নামে আমায় ডাকবেন না যেন! ওটা কেবল মনে রাখবেন, বুঝলেন? কেবল মনে।" বলিয়াই সে চঞ্চল লঘু পদক্ষেপে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

মেয়েটি সত্য কথা কহিল, না তামাসা করিয়া গেল—তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল। ঘণ্টাখানিক পর থার্মোমিটার লইয়া আমার দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিবার জন্য আবার যখন সে আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন কিছুতেই যেন তাহার চোখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না।

বোধ করি আমার সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়াই মেয়েটি ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল, "কি? এবার বুঝি মশায়ের রাগ করবার পালা?"

আমি অপ্রস্তুত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, ঢোক গিলিয়া কহিলাম, "বাঃ রে, আমি রাগ করব কেন?"

"তবে প্যাঁচার মত মুখ করে' আছেন যে বড়?" মেয়েটি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল।

ঐ ফুটফুটে মেয়েটির মনের মধ্যে কি যে রহিয়াছে—তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; দৃষ্টি নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম, "বড্ড মাথা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে?" বলিয়া মেয়েটি হাতের তালু দিয়া আমার ললাট স্পর্শ করিল।

ঐ স্পর্শ আমার রক্তের মধ্যে হঠাৎ যেন আগুন ধরাইয়া দিল। আমি খপ্‌ করিয়া তাহার হাতখানি ললাটের উপরেই চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম, "আঃ, কি আরাম! আপনি আমার মাথাটা একটু টিপে দিন।"

উত্তেজনার মুখে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম, কথা কয়টিও যেন আমার নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিলাম। পাছে অপমান বোধ করিয়া বা চটিয়া গিয়া মেয়েটি অতগুলি লোকের মধ্যে কোন কাণ্ড করিয়া বসে, এই আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়া হাত টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মেয়েটির ব্যবহারে কোন উত্তেজনাই প্রকাশ পাইল না। সে ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "আমাকে দিয়ে মাথা টেপাবার সাধ হয়েছে আপনার? তবে সেটা এবার সুবিধা হবে না। আসচে বার টাইফয়েড্‌ বা নিওমোনিয়া এই রকম কোন একটা রোগ নিয়ে আসবেন; তখন মাথা টিপে দেব। কেমন?" বলিয়া মেয়েটি আমার ললাটের উপর মৃদু একটু চাপ দিয়া হাত তুলিয়া লইল, তারপর ধীর মন্থর গতিতে পাশের রোগীটির কাছে চলিয়া গেল।

লজ্জায় চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া ছিলাম, মেয়েটীর সরল সকৌতুক, তীক্ষ্ণ কণ্ঠ কানে আসিল, "ও বুড়ো ছেলে, আজ যদি জ্বর এসে থাকে তবে খাটশুদ্ধ তোমায় টেনে বাইরে ফেলে দেব।"

২

অদ্ভুত এই মেয়েটি। বাঙ্গালীর মেয়ে, অথচ একদিকে অনেকগুলি তরুণ ছাত্র ও অপর দিকে বিভিন্ন বয়স, বিভিন্ন শিক্ষা ও বিভিন্ন কৃষ্টির রোগীদের মধ্যে দিনের পর দিন নিজের কাজ করিয়া যাইতে না আছে তাহার কোন সঙ্কোচ, না আছে কুণ্ঠা। সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশিবার ক্ষমতা তাহার অপরিসীম, অথচ কাহারও সঙ্গেই সে বেশী করিয়া মিশে বলিয়া মনে হয় না। সহজ সম্বন্ধের মধ্যেও সে যে একটা সীমারেখা টানিতে জানে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু সে যে কোথায়—তাহা সে ভিন্ন অপর কেহ বুঝিতে পারে না। চারিদিকে পর্দা দিয়া ঘিরিয়া আমার মত রোগীকেও প্রায় উলঙ্গ করিয়া সাবানের জল দিয়া প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিষ্কার করিতে বা বাম বাহু দিয়া মাথাটি তুলিয়া স্বীয় উন্নত বক্ষের প্রায় কাছাকাছি আনিয়া উহারই উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া নীচের উপাধানগুলি সুবিন্যস্ত করিতে একদিকে যেমন তাহার হাত কাঁপে না, অপরদিকে আবার তেমনই তাহার নিঃশ্বাসও ঘন হইয়া উঠে না। অতি সাধারণ রহস্যের কথায় সে হাসিতে ফাটিয়া পড়িতে পারে, আবার চক্ষুর পলকে সে এতই গম্ভীর হইয়া যায় যে, তাহার মুখের দিকে চাহিতেও ভয় হয়। একই জোড়া চক্ষুর মধ্যে শরৎচন্দ্রের সুধা ও কালবৈশাখীর বজ্র যে এত কাছাকাছি লুকাইয়া থাকিতে পারে, তাহা এই মেয়েটিকে দেখিবার পূর্ব্বে আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। আগ্রহের মধ্যে ঔদাসীন্য মিশাইয়া ও ঔদাসীন্যকে আগ্রহের রূপ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব যেন আলেয়ার মতই চঞ্চল, দুর্ব্বোধ্য, অবাস্তব।

সত্যই সে অদ্ভুত। বুকের মধ্যে বাসনার আগুন লইয়া দিনের পর দিন এই অদ্ভুত মেয়েটির সুদক্ষ অকুণ্ঠিত হস্তের সেবা গ্রহণ করিলাম, তাহার হাসি দেখিলাম, ভ্রূভঙ্গী দেখিলাম, বিষমাখা তীক্ষ্ণ বাণের মত বিদ্রূপের আঘাত সহ্য করিলাম; তথাপি মেয়েটি আমার কাছে আলেয়ার মতই রহস্যময়ী রহিয়া গেল আর বোধ করি বা সেইজন্যই আলেয়ার মতই সে নিরন্তর আমাকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

তাই দিন দশেক পর সার্জ্জন যেদিন স্বীয় সার্থকতার গর্ব্বে আমার পিঠ ঠুকিয়া আমাকে হাসপাতাল ছাড়িয়া বাড়ী যাইবার অনুমতি দিয়া গেলেন, সেদিন আসন্ন মুক্তির আনন্দে হৃদয় আমার নাচিয়া উঠিল না, বরং ঐ না-পাওয়া

মেয়েটিকে ছাড়িয়া যাইবার চিন্তা শূল হইয়া আমার হৃদয়ে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। স্থির করিলাম যে আমার ভাগ্য ও ক্ষমতাকে একবার শেষ পরীক্ষা না করিয়া হাসপাতাল পরিত্যাগ করিব না।

তাই ঘণ্টাখানিক পর সেই মেয়েটি যখন আমার পার্শ্বের রোগীটির গাত্রমার্জ্জনা শেষ করিয়া পর্দ্দার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি কহিলাম, "সত্যি, বড্ড বেশী খাটিতে হয় আপনাকে।"

বোধ করি কথাটীর অপ্রাসঙ্গিকতার জন্যই হইবে, মেয়েটি তাহার হীরকের মত কঠিন তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি মৃদু হাসিয়া কহিলাম, "সত্যি বলছি, ঐ মাখনের মত নরম হাত বিধাতা নিশ্চয়ই দশটা চাষাভুষার নোংরা শরীর মাজবার জন্য সৃষ্টি করেন নি।"

মেয়েটির ওষ্ঠপ্রান্তে সেই দুর্ব্বোধ্য একটুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে আমার দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "বিধাতা একেবারে নিষ্করুণ নন। তাই যাদের কোমল দেহ মাজবার জন্য এই কোমল হাত দুটি তিনি গড়েছিলেন, সেই বাবুদের দু'একজনকে মাঝে মাঝে তিনি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। নইলে এই হাত দু'খানির সৃষ্টি বোধ করি একেবারেই ব্যর্থ হত।"

মনে হইল যে মেয়েটি যেন আমার মুখের উপর এক ঘা চাবুক বসাইয়া দিল। কিন্তু সেদিন আমি মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাই ঐ আঘাতকে উপেক্ষা করিয়াই আমি কহিলাম, "বিশ্বাস করুন, আপনাকে এই কঠিন পরিশ্রম করতে দেখে আমার দুঃখ হয়। মনে হয়, যদি আপনাকে একটু সাহায্য করে' আপনার শ্রম একটুও লাঘব করতে পারতাম!"

মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "সে সদিচ্ছা যদি থাকে তবে তা পূর্ণ করেন না কেন? ঐ যে সাত নম্বরের রোগীটি দেখছেন—ওর গ্যাংগ্রীন রয়েছে। ওর গায়ে এত দুর্গন্ধ যে ওর কাছে যেতে আমার ন্যাকার আসে। অথচ ওকে রোজ স্পঞ্জিং করা চাইই। তা আজকের কাজটা আপনিই করে দিন না কেন?"

আমার মুখে কথা ফুটিল না, অপ্রস্তুত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মেয়েটি কহিল, "উঠুন, চলুন।"

চট্ করিয়া মাথায় একটা ভাব আসিল; কহিলাম, "এ সব আপনার একটু বাড়াবাড়ি। নোংরা রোগীদের গা মাথা ধুইয়ে দেওয়া মেথরদের কাজ। ও কাজ আপনি করতে যান কেন?"

মেয়েটির মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ছদ্ম না আসল ঠিক বুঝিতে পরিলাম না, সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সিষ্টার আর ডাক্তারেরা যদি আপনার মত আমাদের দুঃখ বুঝতেন, তবে আর আমাদের ভাবনা কি ছিল!"

আমি কহিলাম, "ও কাজ আপনি মেথরকে করতে বলুন। আর আপনার নিজের আর যা কিছু কাজ আছে তা আমায় দিন। আমার চোখের সামনে আপনি এত পরিশ্রম করেন তা আমি সইতে পারি না।"

মেয়েটি আবার ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিলাম চাহিতে চাহিতে তাহার চোখের কোণ চাপা হাসিতে চিক্ চিক্ করিতে লাগিল। একটু পরে সে কহিল, "আচ্ছা, আর এক কাজ করবেন? সন্ধ্যার দিকে কাচা পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজগুলি আমাকে ভাঁজ করে' জড়িয়ে রাখতে হয়। আর একজন লোক ওর একপ্রান্ত না ধরলে ঠিক জড়ান যায় না। ধরবেন আপনি?"

আমি যেন লাফাইয়া উঠিলাম, কহিলাম, "নিশ্চয়ই! কখন? কোথায়?"

মেয়েটি কহিল, "ঐ ডিউটি-রুমে। সন্ধ্যার একটু পরে।"

আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ ঘরের মধ্যে? সেখানে আর কেউ থাকবে না?"

মেয়েটির চক্ষু দুইটি হীরার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "না, আর কেউ থাকবে না। খালি আপনি আর আমি।" বলিয়াই দ্রুতপদে সাত নম্বর রোগীর দিকে চলিয়া গেল।

সত্যই সন্ধ্যার পর আমি তাহার ডিউটি-রুমে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আশা ছিল যে গোধূলির রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে কপোত-কপোতীর মত মুখোমুখি বসিয়া আমি আমার দুর্নিবার বাসনার পরিতৃপ্তি-সাধন করিতে পারিব। কিন্তু তিন তিনটি মুক্ত দ্বার, তেমনই উন্মুক্ত দুইটি বড় বড় জানালা ও দেয়ালের গায়ের বিজলী বাতিতে চল্লিশ মোম বাতির আলো দেখিয়া, আমার উৎসাহ অনেকটা দমিয়া গেল। তবে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার সঙ্কল্প আমি ছাড়িলাম না। ঠিক্ তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ না হইলেও, অদূর ভবিষ্যতে হয় বায়স্কোপে, না হয় রেস্তরাঁয়, এমন কি বিধি প্রসন্ন থাকিলে আমার নারীহীন গৃহের নির্জ্জনতার মধ্যেই এই মেয়েটিকে যাহাতে আমি আমার নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে লাভ করিতে পারি—তাহারই পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিতে আমি মরিয়ার মত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সত্যই এক-ঝুড়ি সাবানকাচা বিভিন্ন আকৃতির ব্যাণ্ডেজ গুছাইয়া, মুড়িয়া, ভাঁজ করিয়া রাখিবার কাজ লইয়া মেয়েটি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই সে হাসিমুখে একটি লম্বা ব্যাণ্ডেজের একপ্রান্ত আমার গায়ের উপর ছুড়িয়া দিয়া, কহিল, "নিন, ধরুন দেখি; চটপট কাজগুলি শেষ করে' ফেলি।"

কাজে আমার মন ছিল না, তাই দ্বিতীয় ব্যাণ্ডেজটি সুরু করিবার পূর্ব্বেই আমি আমার বসিবার টুলটি মেয়েটির কাছাকাছি টানিয়া আনিয়া কহিলাম, "কাজ এখন থাক্। তার চাইতে আসুন, একটু গল্প করি।"

মেয়েটি আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "আপনি ত গল্প ক'রেই সরে পড়বেন। কিন্তু কাজ না করলে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, বকুনী খেতে হবে। আমি ত সরে পড়তে পারব না।"

"কেন পারবেন না?" আমি বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া কহিলাম, "এখান থেকে আপনার সরে যাওয়াই উচিৎ।"

ছদ্ম কি সত্য বলিতে পারি না, সেই আর একদিনের মত মেয়েটি দেখিতে দেখিতে গম্ভীর হইয়া গেল। সেই দিনেরই মত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "অদৃষ্টে দুঃখ রয়েছে, কি করে' তাকে ঠেকাব?"

"মিছে কথা," আমি তাহার আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিলাম, "এ কখনই আপনার অদৃষ্ট হতে পারে না। আপনি এ কাজ ছেড়ে দিন।"

"কাজ ছেড়ে দিলে কি খাব? কোথায় যাব?"

"আপনার আবার যাবার ভাবনা।" আমি আমার সমস্ত ভয়, সমস্ত সঙ্কোচ ঠেলিয়া ফেলিয়া কহিলাম, "আপনি একবার মুখের কথা বললে কত লোক আপনাকে মাথায় তুলে ঘরে নিয়ে যেতে চাইবে।"

"যথা?" বলিয়া মেয়েটি সহাস্য কটাক্ষে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে কহিলাম, "আমায় অনুমতি দিলে আমিই নিজেকে ধন্য মনে করব। এত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি আপনার, আপনি কি বুঝতে পারছেন না, আমি আপনাকে কত ভালবেসে ফেলেছি?"

"বলেন কি?" মেয়েটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। —"এরই মধ্যে আপনি আমায় ভালবেসে ফেলেছেন? ধন্য আপনি যাহোক, আর তার চাইতেও ধন্য আমি নিজে। তারপর? অনুমতি পেলে কি করতে চান বলুন দেখি? আমায় বিয়ে করবেন? না বিয়ের চাইতেও যা বড় সেই রকম কিছু—" বাক্যটি সম্পূর্ণ হইল না, মেয়েটি মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

আমি ঘামিয়া উঠিতেছিলাম! কিন্তু এ সুযোগ একবার হারাইলে আর পাইব না মনে করিয়া, আমি মরিয়ার মত কহিলাম, "না, হেসে আপনি আমার মুখ বন্ধ করতে পারবেন না। কোন্ দুঃখে, কিসের অভাবে আপনি নার্স হয়েছেন? আপনার এত রূপ থাকতে আপনার কিসের অভাব?"

"রূপ?" বলিয়া মেয়েটি গ্রীবা বাঁকাইয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখের হাসি কুঞ্চিত ভ্রূর নীচে কখন কেমন করিয়া যে দেখিতে দেখিতে মিলিয়া গেল, তাহা ঠাহর করিতে পারিলাম না।

ভাব দেখিয়া আশঙ্কায় আমার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল।

মেয়েটি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু একটু থামিয়া সে কহিল, "এত রূপ থাকতেও কেন আমি নার্স হ'য়েছি তাই জানতে চাইছেন? শুনবেন সে কথা?"

আমি ঢোক গিলিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলাম।

ঠিক্ সেই সময়ে কে একজন রোগী কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "মা, একটু জল দিয়ে যাবে মা!"

মেয়েটি মাথা হেলাইয়া একবার রোগীর ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "বলব। আপনি আমার রূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়েছেন,—আপনাকে সে কাহিনী আমি আগাগোড়া বলব। তবে একটু বসুন, আমি ঐ রোগীটিকে আগে একটু জল দিয়ে আসি।"

ফিরিয়া আসিয়া সে নিজের বসিবার চৌকিখানি আমার চৌকি হইতে বেশ একটু দূরে কোণের দিকে সরাইয়া লইয়া, বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "আমার রূপ দেখে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু শুনেছি যে আমার মা আমার চাইতেও বেশী সুন্দরী ছিলেন। আমার বয়সে তাঁর রূপের নাকি তুলনা ছিলনা। আর সেই অতুলনীয় রূপ দেখেই আমার বাবা আমার গরীব দাদামশায়ের কাছ থেকে একটি পয়সাও না নিয়েই আমার মাকে মাথায় তুলে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন,—এই যেমন একটু আগেই আপনি আমায় মাথায় তুলে নিয়ে যেতে চাইছিলেন!" বলিতে বলিতে মেয়েটির ওষ্ঠ ও চক্ষুর কোণে আবার সেই হীরার মত একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আমি অপ্রতিভ হইয়া নিজের স্বপক্ষে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলাম, সে হস্তসঙ্কেতে বাধা দিয়া কহিল, "সে কথা যাক্। যা বলছিলাম—। মায়ের রূপের পূজা বাবা কতদিন করেছিলেন বলতে পারি না, সে পূজা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। মায়ের সুখদুঃখ বুঝবার বয়স যখন আমার হল, তখন আমি কেবল এই কথাই বুঝলাম যে, যে রূপ মায়ের মধ্যে দেখে বাবা তাঁকে ভালবেসেছিলেন—তা মা আমার দেহে ঢেলে দিয়ে নিঃস্ব হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার ভালবাসারও শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। তিনি তখন রূপের সন্ধানে অন্য জায়গায় যাতায়াত সুরু ক'রেছিলেন।"

মেয়েটির কণ্ঠস্বর মৃদু হইতে হইতে সহসা থামিয়া গেল। আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই আমার মনে হইল যে সে যেন জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে,—তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি হাসপাতাল ছাড়িয়া, বর্ত্তমান ছাড়িয়া কোন্ সুদূর অতীতের মধ্যে কাহার যেন একখানি পরিচিত সুন্দর মুখের সন্ধান করিতেছে।

আমি মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিয়া কহিলাম, "থাক্, এসব কথা।"

মেয়েটি আমার কথা যেন শুনিতেই পাইল না। একবার ঢোক গিলিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "আমার মা ছিলেন, সেই যে লোকে যাকে বলে লক্ষ্মীর প্রতিমা। তাঁর বুকের ভিতরটা আগুনের তাপে জ্ব'লে অঙ্গার হয়ে যেতে থাকলেও, মুখে তাঁর একটা আর্ত্তনাদও বের হত না। অবিচার, অনাচার, অত্যাচার মা বিনা প্রতিবাদে সয়ে যেতেন। মদ, মেয়েমানুষ ও অসচ্চরিত্র বন্ধুবান্ধবের পিছনে বাবা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব জলের মত ঢেলে দিতেন, অথচ একটা প্রতিবাদের কথাও মায়ের মুখে ফুটত না। কেন, তা বুঝতে আমার সময় লেগেছিল।"

মেয়েটি আবার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, "মাঝে মাঝে বাবা তাঁর মেয়েমানুষটিকে বাড়ীতে নিয়ে আসতেন। সঙ্গে আসত তাঁর বন্ধুবান্ধব সব আর গাইয়ে বাজিয়ের দল। অসুস্থ দেহ নিয়েও মাকে এদের জন্য রাঁধতে হত, নিজের হাতে তাদের পরিবেশন করতে হত। আপত্তি করলে বাবা সকলের সামনেই তাঁকে বলতেন—বাড়াবাড়ি করলে পরণের কাপড়টুকুও কেড়ে নিয়ে পথে বের করে' দেব, সাবধান!"

প্রায়ই বাবা রাত্রে বাড়ীতে থাকতেন না। যেদিন ফিরতেন—সেদিন গভীর রাত্রে মাতাল হয়ে ঘরে আসতেন। দেখে দেখে একদিন আমার বসুন্ধরার মত সহনশীলা মাও ক্ষেপে গিয়ে কেঁদে বলেছিলেন, "এরকমভাবে আমার ঘরে

আসতে তোমার লজ্জা করে না? যাও, বাইরের ঘরে গিয়ে শোওগে।"

বাবার উত্তর, পাশের ঘরে আমার কাণে এসে পশেছিল, "খবরদার! তুমি আমার স্ত্রী। তোমাকে নিয়ে আমি যা খুসী তাই করব। যদি আপত্তি কর, তবে জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দেব,—মনে থাকে যেন।"

পরদিন আমি মাকে বলেছিলাম, "এত অপমান সয়েও এ বাড়ীতে তুমি কিসের আশায় পড়ে আছ মা? চল, আমরা দু'জনে এখান থেকে চলে যাই।"

"শুনে মা আমার মাথাটা তাঁর বুকের মধ্যে চেপে ধরে' চোখের জলে আমার চুল ভিজিয়ে দিতে দিতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'কোথায় যাব মা? আমি একা হলে গলায় দড়ি দিয়ে, না হয় মা-গঙ্গার কোলে সব জ্বালা জুড়াতাম। কিন্তু তোকে নিয়ে আমি কোথায় যাব মা? আমি যে মেয়েমানুষ, দুমুঠো পেটের ভাতের সংস্থান করবার ক্ষমতাও যে আমার নেই!' সেদিন মায়ের মুখে আর কোন কথা ফোটেনি। কেবল তাঁর বুকের ভিতরকার ঢেউ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনবরত এসে আছড়ে পড়েছিল।"

মেয়েটি আবার চুপ করিল, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। পরমুহূর্ত্তেই সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "জানেন পনর নম্বর! সেই ঢেউ আজও আমি মাথার মধ্যে অনুভব করি। মায়ের সেই স্বর, সেই কথা, 'আমি যে মেয়েমানুষ, দু'মুঠো পেটের ভাতের সংস্থান করবার ক্ষমতাও যে আমার নেই',— আজও আমার অবসর সময়ে আমার কাণের মধ্যে নিরন্তর বাজতে থাকে; ঘুমের মধ্যেও ও-কথা আমাকে পাগল করে' তোলে।"

বলিতে বলিতে মেয়েটির চক্ষু দুইটি যেন জ্বলিতে লাগিল। আমি ঘামিয়া উঠিতেছিলাম, এবার আর সহ্য করিতে পারিলাম না। আসন ছাড়িয়া উঠিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিলাম, "এ কথা এখন থাক্, আমি যাই।"

পাগলের মত হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সে সজোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "যাবেন কি? আপনি বাবার মত পুরুষ মানুষ, আমার রূপ দেখে আমাকে আপনি ভালবেসেছেন, আমাকে মাথায় তুলে ঘরে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন,—আমার সব কথা না শুনেই আপনি যাবেন?"

এবার রীতিমত ভয় পাইলাম। দুই পার্শ্বের ঘরভরা রোগী, দেয়ালের অপর পার্শ্বেই ডাক্তার ও ছাত্রদের বসিবার ঘর, বারান্দায় কুলি মেথরদের অবিরাম আনা-গোনা—পাছে ইহাদের মধ্যে কেহ আমাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া ফেলে বা মেয়েটিই উত্তেজনার মুখে আরও বেশী কিছু করিয়া বসে, এই আশঙ্কায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিবাদ না করিয়াই পুনরায় আসন গ্রহণ করিলাম। তখন মেয়েটিও যেন অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া নিজের আসনে গিয়া বসিল।

ক্ষণকাল পর সে পুনরায় কহিল, "আমার আর খুব বেশী কথা বলবার নেই। কেবল একটি দিনের কথা না বললে আমার নার্স হওয়ার ইতিহাস আপনি বুঝতে পারবেন না। সেদিন স্কুলে একটু অসুস্থ বোধ হওয়াতে দুপুর বেলায়ই আমি বাড়ীতে ফিরে এসে নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ ক'রে শুয়েছিলাম। ক'দিন থেকেই মায়ের শরীর ভাল ছিল না জানতাম, তাই তাঁকে আর ডাকিনি। আমি আমার বিছানায় শুয়ে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করছিলাম। বোধ করি একটু তন্দ্রাও এসেছিল। হঠাৎ মায়ের ঘরের ভিতর থেকে বাবার স্বর কাণে আসতেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ হয়ে উঠল। বাবা এ সময়ে বাড়ীতে থাকেন না, থাকলেও মায়ের ঘরে আসেন না। আজ প্রাত্যহিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে কি যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। আমি কাণ খাড়া করে' ও-ঘরের কথাবার্ত্তা শুনবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"বাবা প্রথমে কি বলেছিলেন শুনতে পাইনি, তবে মায়ের ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর কাণে এল, 'আমাকে পথের কাঙাল করেছ তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু মেয়েটাকেও কি তাই করবে? সবই ত গেছে, এখন ওর থাকবার মধ্যে আমার এই ক'খানা গয়না। তা আমি প্রাণ থাকতে দিতে পারব না।"

"এ অনুনয়ের উত্তরে বাবা গর্জ্জন করে' উঠলেন, 'খবরদার বলছি, আমায় বাধা দিও না। তোমার গয়না

তুমি তোমার বাবার ঘর থেকে নিয়ে আসনি, নিজে উপার্জ্জন করে'ও গড়াওনি। ও-সব আমি তোমায় দিয়েছিলাম। ও আমার জিনিষ।"

"মা অধিকতর কাতরকণ্ঠে বলেছিলেন, 'তা জানি। তোমার জিনিষই আমাদের মেয়ের জন্য তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। তোমার পায়ে পড়ি, তোমার মেয়ের কথা ভেবেই ও জিনিষ তুমি আমার কাছে থাকতে দাও।"

"বাবা কণ্ঠস্বর আরও এক গ্রাম উপরে তুলে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমার ন্যাকামি রাখ। ও গয়না আমার চাই—এখনই চাই। চাবি দাও শীগ্‌গির।"

"এর পর আমার মায়ের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠেছিল। মা বলেছিলেন, 'না আমি দেব না।"

"স্বামীত্বের বিরুদ্ধে স্ত্রীর এই বিদ্রোহ আমার বাবা সহ্য করতে পারেননি। তাই পরক্ষণেই সুরু হয়েছিল কাজ। চোখে আমি কিছু দেখতে পাইনি, কিন্তু কাণে এসে পশেছিল' একটা ধ্বস্তাধস্তির শব্দ, মায়ের দুর্ব্বল ক্ষীণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ, একটা পদাঘাতের শব্দ, তারপর পতনের। শুনে তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে মাঝের দ্বার খুলে মায়ের ঘরে যখন আমি এসে পৌঁছলাম তখন বাবা সেখান থেকে চলে গেছেন, আর মা তাঁর নিজেরই মাথার ফিন্‌কি দিয়ে ছোটা রক্তস্রোতের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে স্নান করছেন।"

মেয়েটি আবার চুপ করিল। শুনিতে শুনিতে কখন যে আমার ভয় কৌতূহল ও কৌতূহল অনুকম্পায় পরিণত হইয়াছিল—তাহা এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। এখন মেয়েটি চুপ করিতেই আমি হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আমার চোখের পাতা নিজের অজ্ঞাতসারেই জলে ভিজিয়া গিয়াছে। আমি ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করিলাম "তারপর?"

মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিল না। অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া নতদৃষ্টিতেই মৃদুস্বরে কহিল, "তারপর আর কিছু নেই। মা আর চোখ খোলেননি। তাঁর শেষ কাজ আমাকেই করতে হয়েছিল। সেই শ্মশানঘাটে প্রজ্জলিত চিতার পাশে কত লোক কত কথা বলেছিলেন, সে সব আমার কাণে আসেনি। আমার কেবলই মনে হয়েছিল যে, আগুন ও বাতাসের ঐক্যতান বাদ্যের ভিতর দিয়ে আমার মা যেন চিতার ভিতর থেকে করুণ স্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে আমায় বলছেন, 'আমি যে মেয়েমানুষ মা, দু'মুঠো পেটের ভাতের সংস্থান করবার ক্ষমতাও যে আমার নেই।"

মেয়েটি আবার চুপ করিল। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর?"

মেয়েটি একবার একটু কাশিয়া, এতক্ষণ পর আমার মুখের দিকে চাহিল, কহিল, "তারপর আর আমি পুরুষের ঘরে ফিরে যাইনি। মেয়েমানুষের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে মা যা বলেছিলেন—সেইটাই এ জগতে ঐ বিষয়ের চরম সত্য কি না তারই পরীক্ষা করছি।"

বলিতে বলিতে তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে আবার সেই হীরার মত কঠিন দুর্ব্বোধ্য একটুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আমার মুখে আর কথা ফুটিল না।

নষ্টোদ্ধার

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আসে দুর্জ্জেয় দুর্দ্দিন দুঃসহ দুঃখেরি অন্তে!
কেন বর্দ্ধিছ সঙ্কট ঝগড়ার ঝঞ্ঝাটে পন্থে!
হের' সাক্ষাতে নর্ত্তিত মৃত্যুর বিস্ময়-দৃশ্য!
জন- রক্তের কর্দ্দমে দুর্দ্দম পিচ্ছিল বিশ্ব!
এবে মুক্তিরে বঞ্চিবে স্বার্থের নিন্দিত শক্তি?
তবে আর কেন হয় হেন লাঞ্ছিত দেশ-অনুরক্তি!

মাখে ক্রন্দসী, মুখ মসী, নাই অসি বর্ম্ম!
কে রে তুই বিনে এই দিনে রক্ষিবে ধর্ম্ম!
যত বেইমান্ সম্মান নিক্ষেপে' গঙ্গে!
সুখে বাস করে তার ঘরে ছেলে মেয়ে রঙ্গে!
আজি কই সেই মোছ্‌লেম, কই সেই হিন্দু?
এবে দ্যাখ্ চাহি, সুখ নাহি, শোক যেন সিন্ধু!



গীতলেখা

কথা ও সুর—শ্রীনৃপেন বসু

স্বরলিপি—কুমারী মৃদুলা ভট্টাচার্য্য

তুমি কি গিয়াছ ভুলে ?
ওগো প্রিয়, বন্ধু ব'লে ডেকেছিলে মোরে
এই মাধবীর মূলে !

তখনো কুলায় জাগে কপোত কূজন,
কাণ পেতে ছিনু আমরা দুজন,
তোমারি হাতে ভীরু হাতখানি মোর
পলে পলে উঠেছিল দুলে,
এই মাধবীর মূলে !

মনে কি পড়ে না প্রিয়
রাতের শিয়রে চাঁদ জাগে,
বারে বারে কোয়েছো আমারে—
'এ নিশি জাগিতে ভাল লাগে' !

এই সে মাধবী ছায়ে
নীরবে রহিনু দাঁড়ায়ে
শিথিল কবরী হ'তে একটি কুসুম
(যবে) বিদায় বেলায় নিলে তুলে ।
এই মাধবীর মূলে ! *

II সা	গা	মা	পা |	পধা	পা	মপা	-জ্ঞমা I	মপা	-া	-া	-া |	পধা	-ণর্সা	ণা	ধা I
তু	মি	কি	গি	য়া০	ছ	ভু০	০ ০	লে০	০	০	০	ও০	০ ০	গো	প্রি
পা	-া	-া	-া |	পা	-ণা	ণা	ধা I	ণা	-া	-া	-া |	ধা	ধর্সা	ণা	ণা I
য়	০	০	০	ব	ন্	ধু	ব	লে	০	০	০	ডে	কে০	ছি	লে
ণধা	-পধা	পা	-া |	পা	ণা	পা	মা I	জ্ঞা	-রা	ন্সা	-রজ্ঞা |	রা	-া	-া	-া II
মো০	০০	রে	০	এ	ই	মা	ধ	বী	র্	মূ০	০০	লে	০	০	০

---

* আধুনিক গান । আধুনিক গানে কথার সমৃদ্ধি ও সুরের সাবলীলতায় এত প্রাধান্য যে, তাল এখানে অত্যন্ত পরাধীন হ'য়ে পড়ায় কোন ক্রমেই বিকাশ লাভ করতে পারে না ; তবু ছন্দছাড়া গীত হয় না এবং স্বরলিপির সুবিধার জন্য লয় বিভাগ দরকার, তাই আটমাত্রা' হিসাবে এখানে ভাগ ক'রে দেখানো হ'য়েছে ।

গানখানা চারি মাত্রা 'কাহারবা' তালের সঙ্গেও গাওয়া যেতে পারে ।

II পা পর্সা -া র্সর্রা | র্সণা -া ধণা -পধা I ধর্সা -া -া -া | ধা ণা র্সা -ধণা I
ত থ০ নো কূ ০ | লা ০ য়্ জা০ ০০ গে০ ০ ০ ০ | ক পো ত কূ০

ণর্রা -া -া -া | ধা -ণা র্সা র্রা I র্রজ্ঞা -র্সর্রা র্রমা -া | র্রা র্রা জ্ঞা র্রা I
জ০ ০ ন্ ০ | কা ণ্ পে তে ছি০ ০০ মু০ ০ | আ ম রা দু

র্সা -া -া -া | না র্সা -পা দা: I পা -া দা পা | মা -জ্ঞা রজ্ঞা সরা I
জ ন্ ০ ০ | তো মা রি হা তে ০ ভী রু | হা ত থা০ নি০

রা -পা -া -া | পা ক্ষা পা -দা I পা -া -া -া | পা না র্সা র্রর্সা I
মো র্ ০ ০ | প লে প ০ লে ০ ০ ০ | প লে প লে০

র্সর্গা র্রর্সা ণা ণা | ধনা -পধা ধর্সা -া I -া -া -া -া | ধা ণা -পা মা I
উ০ ঠে০ ছি লো | ফু০ ০০ লে০ ০ ০ ০ ০ ০ | এ ই মা ধ

জ্ঞা -রা ন্সা -রজ্ঞা | রা -া -া -া II
বী র্ মু০ ০০ | লে ০ ০ ০

II রা জ্ঞা সা রা | ধ্ সা রজ্ঞা -সরা I রমা জ্ঞা -া -া | রা জ্ঞা -পা ধা I
ম নে কি প | ড়ে না প্রি০ ০০ য়০ ০ ০ ০ | রা তে র্ শি

ণা র্সা -ধা -পা | গমা -পদা পা -া I -া -া -া -া | পা পনা নর্সা -ধনা I
য় রে চাঁ দ্ | জা০ ০০ গে ০ ০ ০ ০ ০ | বা রে০ বা০ ০০

নর্সা -া -া -া | পা না র্সা র্রর্সা I র্সর্গা র্রর্সা ণা ণা | ধণা -পধা ধর্সা -া I
রে০ ০ ০ ০ | বা রে বা রে০ কো০ য়ে০ ছো আ | মা০ ০০ রে০ ০

না র্সা -পা দা | পা মা জ্ঞা রা I না -রজ্ঞা রা -া | -া -া -া -া I
এ নি শি জ্ঞা | গি তে ভা লো লা০ ০০ গে ০ | ০ ০ ০ ০

রা -ণা ধা পা | -মধা পা-জ্ঞা -সরা I রপা -া -া -া | পা ধা র্সা র্সজ্ঞা I
এ ই সে মা | ধ০ বী ছা ০০ য়ে০ ০ ০ ০ | নী র বে র ০

র্রা র্সা ধণা- পধা | ধর্সা -া -া -া I না র্সা -পা দা | পা মা জ্ঞা রা I
হি মু দাঁ০ ড়া০ | য়ে০ ০ ০ ০ শি থি ল ক | ব রী হ' তে

রা -জ্ঞা রজ্ঞা সরা | রা -া -পা -া I পা ক্ষা -পা দা | পা -া জ্ঞা মা I
এ ক টী০ কু০ | সু ০ ম ০ বি দা য়্ বে | লা য়্ য বে

পা দা -র্সা র্রা | র্রর্মা -র্জ্ঞা র্রা -র্সা I র্সর্রা -না র্সা -া | ধা ণা -পা মা I
বি দা য়্ বে | লা০ য়্ নি লে তু০ ০ লে ০ | এ ই মা ধ

জ্ঞা -রা ন্সা -রজ্ঞা | রা -া -া -া II II
বী র্ মু০ ০০ | লে ০ ০ ০

রাতের পথিক

কুমারী শান্তা বসু

নীরব নিশীথে কে পথিক তুমি
এলে আজি মোর আঙ্গিনা মাঝে !
কাণ পেতে শুনি রুণুঝুনি যেন
তোমার চরণ নূপুর বাজে।

জানিনা কি সুরে বাজালে বাঁশী
কি চাহিলে মোর কুটীরে আসি'
ছিনু আনমনে মম বাতায়নে
কে আসিলে ওগো নবীন সাজে !

গাঁথি নাই আমি বনফুল মালা,
নিভান প্রদীপ হয়নিকো জ্বালা,
শূন্য আসন রয়েছে পড়িয়া
আমার হৃদয় মাঝে।

পাটার ছবির পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পুথির আকারে মুদ্রিত একখানি শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ দুইখানি সচিত্র পাটায় বাঁধা আছে। পাটা দুইখানিতে চারিখানি ছবি আঁকা আছে। তাহার মধ্যে ক্রমাগত পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করার ফলে একখানি ছবি কিছু অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর তিনখানি উজ্জ্বল আছে। ছবি তিনখানি দেখিয়া আমি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হই এবং 'প্রবর্ত্তকে'



প্রথম চিত্র

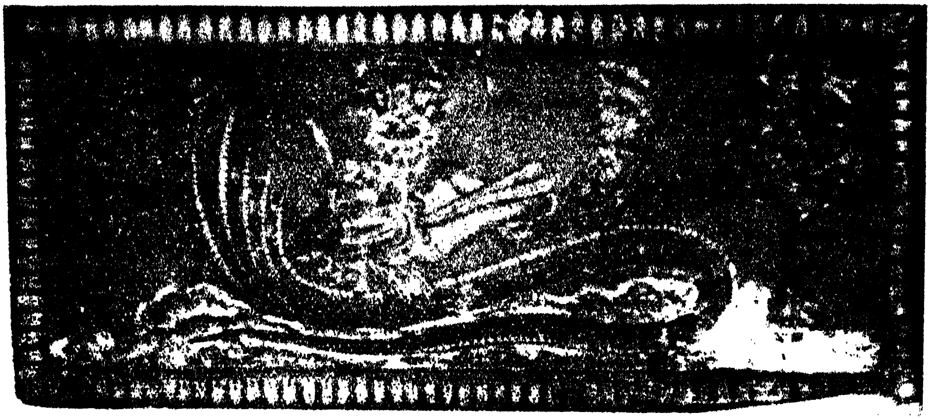
উহা প্রকাশ করিবার জন্য পরিষদের মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দেওয়ায় ছবি কয়খানি এক রঙে প্রকাশ করা হইল—যদিও পাটায় এগুলি বহু বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

প্রথম চিত্রখানি কালীয় দমনের। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ লীলাভরে অকুতোভয়ে অবনতফণি সর্পের মস্তকে পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শিল্পী শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভাব এমন করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন যে, দেখিলেই মনে হয়, এত বড় যে বিষধর সর্পের উপর শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। শত্রু দমনে বিজয়ীর যে গর্ব্ব, তাহাও নাই। নাগপত্নীগণ সর্পের জীবন রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে নাগপত্নীরা বলিতেছেন :—

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিং
স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টে-
র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥
অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো
দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এবসম্মতঃ ॥১০।১৬,৩৩-৩৪

—নাগপত্নীরা স্বামীর প্রতি এই দণ্ডকে ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা দণ্ডকেও শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের চিহ্ন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। চিত্রকর নাগপত্নীদের মুখে বিপন্নজনোচিত গাম্ভীর্য্য ও আত্মসমর্পণের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত পটভূমিকাটীও সুন্দর—ইহাতে হ্রদের ফেনরাশি, প্রস্ফুটিত পুষ্পযুক্ত কদম্ব বৃক্ষ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় চিত্রটী বিষ্ণুর অনন্তশয্যার। এখানে বিষ্ণু গোপবেশ, বেণুকররূপে অঙ্কিত হইয়াছেন, কেননা বৈষ্ণবের নিকট এই রূপই তাঁহার শ্রেষ্ঠরূপ। তবে গোপবেশ বেণুকর বিষ্ণুর পদসেবা করিবার অধিকারী গোপবধূগণ—লক্ষ্মী তাহা কামনামাত্র করেন। এ স্থলে লক্ষ্মীই পদসেবা করিতেছেন দেখা যায়। বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়,



দ্বিতীয় চিত্র

বিশ্বের কর্ত্তা হইয়াও, বিশ্বব্যাপারে কোন দায়িত্ব যেন তাঁহার উপর নাই—তিনি শুধু লীলাচ্ছলে সৃজন-পালন করিতেছেন। লক্ষ্মীর মূর্ত্তিতে সেবার মধ্যে চরম সার্থকতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনন্ত নাগ এমন ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, যেন সে শ্রীকৃষ্ণের শয্যা হইবার গৌরবে সহস্র ফণা তুলিয়া নৃত্য করিতেছে।

অনেকটা যাত্রার দলের রাজার মতন। মূর্ত্তি কয়টী বেঁটে করিয়া আঁকায় চিত্রখানির সৌন্দর্য্য তেমন ফোটে নাই।

চতুর্থ চিত্রটী রাধাকৃষ্ণের গোষ্ঠে মিলন বিষয়ক। ইহাতে বুকে কাঁচুলি আঁটা চারিটি সখী এবং হাতে শিঙ্গা চারিটি সখা রহিয়াছেন। মাঝখানে রাধাকৃষ্ণ বসিয়া পরস্পরের মিলনসুখে নিমগ্ন রহিয়াছেন। বোধহয় কোন



তৃতীয় চিত্র

তৃতীয় চিত্রটী মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তির। পুষ্পবনে, মন্দিরের পাশে শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্রকে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দেখাইতেছেন। প্রতাপরুদ্র ভীতচকিত হইয়া স্তব করিতেছেন, আর রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া দর্শন করিতেছেন। রাজার বেশ

গান হইতেছে, সখীরা যেন তান ধরিয়া আছেন। চিত্রখানিতে রাধিকার সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয় নাই, যদিও শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি মনোরমরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। *

* চতুর্থ চিত্রটীর ফটো সুস্পষ্ট না উঠায় উহার প্রতিচিত্র দেওয়া সম্ভবপর হইল না।

বঙ্কিম-সাহিত্যে নারীর প্রসাধন

শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম-এ

যে যুগে নারী অন্তঃপুরিকা হয় নাই, সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতেই সে তাহার দেহকে পুরুষের নিকট দর্শনীয় ও লোভনীয় করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছে। নারীর রূপ আছে সত্য, পুরুষেরও রূপ আছে। পুরুষ নারী অপেক্ষা অধিক সুন্দর, সেইজন্যই বোধহয় নারীর প্রসাধনের এত পারিপাট্য। যে সৌন্দর্য্য হয়ত কাহারও চোখে না লাগিতে পারিত, প্রসাধনের পারিপাট্যে তাহার মোহিনীশক্তি বহুগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। ভগবান রূপ দেন বটে, কিন্তু সকলে সে রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না বা ফুটাইতে পারে না। প্রসাধনের এমনি গুণ যে, কুরূপাও প্রসাধনের পারিপাট্যে সুরূপা হয়, প্রৌঢ়াও যুবতী হয়। প্রাচীন ভারতে এই প্রসাধন ও অঙ্গরাগের যথেষ্ট আদর ছিল। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরিপাটি করিয়া প্রসাধন করিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিত। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের কাব্যাদিতে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে এই প্রসাধনের বহু দৃষ্টান্ত আমরা পাই। প্রাচীন যুগের পর মুসলমান যুগেও প্রসাধনের পারিপাট্য বাড়িয়াছিল বই কমে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে জন্মিয়াছিলেন, তখন ভারতে দরিদ্র পল্লীবাসীর অন্তঃপুরে প্রসাধন কেবলমাত্র কেশরঞ্জন, রঞ্জিত বসন, সামান্য অলঙ্কার, পান, অলক্তক, সিন্দূর ও কজ্জলেই নিবদ্ধ ছিল। সে যুগে রমণীগণ ক্ষার খৈল দিয়া অঙ্গ পরিষ্কার করিত, কারণ সুগন্ধি সাবানের তখন তাদৃশ প্রচলন হয় নাই। দরিদ্র পরিবারে তরুণীগণ ফুলের মালায় গন্ধের সখ মিটাইত, আতর গোলাপ সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য তাহাদের ছিল না। এখন অবশ্য অল্পমূল্য কেশতৈল ও সস্তা এসেন্সের আবির্ভাবে পল্লীবাসীর সে সখ কতকটা মিটিয়াছে। সুচিক্কণ বস্ত্রের অভাব তেমন না থাকিলেও, সাধারণতঃ দরিদ্র পল্লীকামিনী মোটা তাঁতের কাপড় পরিয়াই লজ্জা নিবারণ করিত। পূজা-পার্ব্বণে দেশী শান্তিপুরে ডুরে বা ফরাসডাঙ্গার শাড়ী একটা বিলাসের বস্তু ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকাগণের প্রায় সকলেই রূপবতী ও ঐশ্বর্য্যশালিনী, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে নারীর প্রসাধনে ধনীর প্রসাধনেরই ইঙ্গিত আমরা বেশী পাই। তবে যে সকল স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র পল্লীচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সেখানে পল্লীবাসিনীর যৎসামান্য প্রসাধনের ছিটেফোঁটা দেখিতে পাই।

প্রাচীন কামশাস্ত্রকারগণ প্রসাধনক অঙ্গরাগের তিনটী ভাগ করিয়াছেন, যথা—দশনরাগ, বসনরাগ ও অঙ্গরাগ। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে নারীর দশনরাগের উপাদান মিশির ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া প্রসাধনের বিবর্ত্তনের কিছু পরিচয় দিব। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন "প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্ব্বকালে যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা-শাড়ী-সিন্দুর-কৌটা মনে পড়িবে; বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গাপাড় আসিয়া পড়িয়াছে,—হাতে পৈছা, কঙ্কণ এবং শঙ্খ (যাহার জুটিল, তাহার বাউটি নামে সোণার শঙ্খ) মুষ্টি মধ্যে দৃঢ়তর সম্মার্জ্জনী বা বন্ধনের বেড়ী, কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দুর-রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ; দাঁতে অমাবস্যার মত মিশি এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরী-শিখর......এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বলা করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্নপ্রকৃতি। সে শাঁখা, শাড়ী, সিন্দুর, মিশি, মল, মাদুলী, কিছুই নাই,...যেখানে আগে মোটা মনসাপেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গণি ক্লথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুরে ডুরে রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ-বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতাবেড়া ঝাঁটা কলসীর পরিবর্ত্তে, সুচ-সুতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আঁটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত

হইয়াছে। ধূলি-কর্দ্দম-রঙ্গিণীগণ সাবান সুগন্ধির মহিমা বুঝিয়াছেন।" জানিনা বঙ্কিমচন্দ্র ইহা পরিহাসচ্ছলে লিখিয়াছেন কিনা, আমার মনে হয় প্রাচীনকালের প্রসাধন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে এইরূপই একটা ধারণা ছিল। তখন বাৎস্যায়নাদি কামশাস্ত্রকারগণের গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই ও তাহা দুর্লভ ছিল এবং সম্ভবতঃ সংস্কৃতকাব্যের বর্ণনাকে তিনি নিছক কবির কল্পনা মনে করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে প্রাচীনকালের নারীর প্রসাধনের সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ বিরুদ্ধ ধারণা কেন হইল!

অঙ্গরাগের মধ্যে অলক্তক চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য ধূপাদি, সাবান প্রভৃতি, তাম্বূল, কজ্জল, সুগন্ধি কেশতৈল, কেশরঞ্জন ও অবশেষে ভূষণ। দেখা যাউক বঙ্কিম সাহিত্যে এই সকলের কিরূপ বর্ণনা আমরা পাই।

আল্‌তাপরা পায়ে মল পরিয়া বঙ্কিম সাহিত্যের পল্লী-তরুণীগণ পাড়া সরগরম করিত। ইন্দিরায় অমলা গাহিতেছে—

"গহনা গায়ে, আল্‌তা পায়ে,
কল্কাদার আঁচল
চিমে চালে তালে তালে
বাজিয়ে যাব মল।"

চন্দ্রশেখরে সুন্দরী নাপিতানী বেশে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিতে আসিয়া বিফলমনোরথ হইয়া তাহার আল্‌তার চুপড়ী গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীগৃহে ফিরিল। দেবীচৌধুরাণীর পাঁচকড়ি ওরফে সাগর "তবে একবার টেপনা' বলিয়া অমনি আল্‌তাপরা রাঙ্গা পাখানি ব্রজেশ্বরের উরুর উপর তুলিয়া দিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ তাঁহার সমসাময়িক কালের চিত্র; নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে লইয়া সহোদরা কমলমণির গৃহে রাখিলেন। কমল স্বহস্তে "স্নিগ্ধ সৌরভ সোপ" দিয়া কুন্দনন্দিনীর গাত্র মার্জ্জনা করিয়াছিল। "হীরা ঝি আতর গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।" ইন্দিরার মেয়েদের মজলিস বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন "কত মেয়ে আসিল, তার সংখ্যা নাই। কত বড় বড় পটলচেরা ভ্রমর-তারা চোখ, সারি বাঁধিয়া, স্বচ্ছ সরোবরে সফরীর মত খেলিতে লাগিল, কত কালো কালো কুণ্ডলীকরা ফণাধরা অলকরাশি বর্ষাকালের বনের লতার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল,--যেন কালিয়দমনে কালনাগিনীর দল, বিস্রস্ত হইয়া যমুনার জলে ঘুরিতে ফিরিতেছে—কত কাণ, কাণ্‌বালা, চৌদান, মাকড়ি, ঝুম্‌কা, ইয়ারিং, দুল—মেঘ মধ্যে বিদ্যুতের মত, কত মেঘের মত চুলের রাশির ভিতর হইতে খেলিতে লাগিল, কত রাঙ্গা ঠোঁটের ভিতর হইতে কত মুক্তা পংক্তির মত দন্তশ্রেণীতে কত সুগন্ধি তাম্বূল চর্ব্বণে কত রকম অধর লীলার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল;—কত প্রৌঢ়ার ফাঁদি নথের ফাঁদে কন্দর্পঠাকুর ধরা পড়িয়া, তীরন্দাজিতে জবাব দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন—কত অলঙ্কাররাশি ভূষিত সুগোল বাহুর উৎক্ষেপ নিক্ষেপে বায়ুসন্তাড়িত পুষ্পিত লতাপূর্ণ উদ্যানের মত সেই কক্ষ একটা অলৌকিক চঞ্চল শোভায় শোভিত হইতে লাগিল, রুণুরুণু ঝুনুঝুনু শিঞ্জিত ভ্রমরগুঞ্জন অনুকৃত হইতে লাগিল; কত চিকে চিক চিক; হারে বাহার; চন্দ্রহারে চন্দ্রের হার; মলের ঝলমলে চরণ টলমল্‌। কত বানারসী, বালুচরী, মৃজাপুরী, ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিম্‌লা, ফরাসডাঙ্গা—চেলি গরদ, সুতা রঙ্গকরা, রঙ্গভরা, ডুরে ফুরফুরে, বাঁঠুরে—তাতে কারও ঘোমটা, কারও আড়ঘোম্‌টা, কারও আধঘোমটা।" বঙ্কিমচন্দ্র এই মেয়ে মজলিসে বিচিত্র অলঙ্কার বসনশোভিতা তাঁহার সমসাময়িক নারীর প্রসাধনের একটী চিত্র দিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাগ্‌ মুসলমান যুগের উপন্যাস মৃণালিনী; তাহাতে গিরিজায়া ভিখারিণীর "অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জ্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট।" আমরা এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য হইতে দুই একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া মুসলমান যুগের প্রসাধনের নমুনা দিব। বিমলা জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্ব্বে বেশবিন্যাশ করিতেছে—"কে বিমলার সে তাম্বূলরাগ রক্ত ওষ্ঠাধর দেখিয়া বলিবে সে যুবতী নয়? তাহার কজ্জল নিবিড় প্রশস্ত লোচনের চকিতকটাক্ষ দেখিয়া কে বলিবে যে এ চতুর্ব্বিংশতির পরপারে পড়িয়াছে…পাঠক! মনশ্চক্ষু উন্মীলন কর; যেখানে বসিয়া দর্পণ সম্মুখে বিমলা কেশবিন্যাস করিতেছে, তাহা দেখ; বিপুল কেশগুচ্ছ করকরে লইয়া সম্মুখে রাখিয়া যে প্রকারে তাহাতে চিরুণী দিতেছে দেখ;…

বিমলা কেশ বিন্যস্ত করিয়া কবরী বন্ধন করিলেন না; পৃষ্ঠদেশ বেণীলম্বিত করিলেন। গন্ধবারিসিক্ত রুমালে মুখ পরিষ্কার করিলেন; গোলাপ পুষ্প কর্পূর পূতা তাম্বুলে পুনর্ব্বার ওষ্ঠাধর রঞ্জন করিলেন; মুক্তাভূষিত কাঁচলি লইয়া বক্ষে দিলেন; সর্ব্বাঙ্গে কনকরত্নভূষা পরিধান করিলেন; আবার কি ভাবিয়া তাহার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলেন; বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বসন পরিলেন; মুক্তাশোভিত পাদুকা গ্রহণ করিলেন এবং সুবিন্যস্ত চিকুরে যুবরাজ দত্ত বহুমূল্য মুক্তাহার রোপিত করিলেন।"

কতলু খাঁর জন্মোৎসবে তাঁহার অন্তঃপুর বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র যেন প্রাচীনকালের বাসগৃহের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে "জলজ্জলপ্রদীপৈঃ কালাগুরুধূপধূসরালোকৈঃ। বাসগৃহং রচয়েদিহরুচিরং কর্পূরপুষ্পাদ্যৈঃ॥ (কন্দর্পচূড়ামণি—১।৪।১১) অথবা "অনেক বাদ্যং বিবিধাস্ত্র পঙ্‌ক্তিকং সুপুষ্পধূপোজ্জলরাশিবাসিতম্।" প্রাচীন কামশাস্ত্রকারগণের এই সকল উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন "কক্ষে কক্ষে রজত দীপ, স্ফটিক দীপ, গন্ধদীপ, স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে; সুগন্ধি কুসুমদাম পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, শয্যায়, আসনে আর পুরকামিনীদিগের অঙ্গে বিরাজ করিতেছে; বায়ু আর গোলাপের গন্ধের ভার বহন করিতে পারে না, অগণিত দাসীবর্গ কেহ বা হৈমকার্য্যখচিত বসন, কেহ বা ইচ্ছা মত নীল, লোহিত, শ্যামল, পাটলাদি বর্ণের চীনবাস পরিধান করিয়া অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কার প্রতিদীপের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা যাঁহাদিগের দাসী, সে সুন্দরীরা কক্ষে কক্ষে বসিয়া মহাযত্নে বেশবিন্যাস করিতেছিলেন। আজ নবাব প্রমোদমন্দিরে আসিয়া সকলকেই লইয়া প্রমোদ করিবেন; নৃত্যগীত হইবে। যাহার যাহা অভীষ্ট সে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবেক। কেহ আজ ভ্রাতার চাকরি করিয়া দিবেন আশায় মাথায় চিরুণী জোরে দিতেছিলেন। অপরা দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইবেন ভাবিয়া অলকগুচ্ছ বক্ষ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিলেন। কাহারও নবপ্রসূত পুত্রের দানস্বরূপ কিছু সম্পত্তি হস্তগত করা অভিলাষ, এজন্য গণ্ডে রক্তিমা বিকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঘর্ষণ করিতে করিতে রুধির বাহির করিলেন। (হায়রে রূপ, তোমার মহিমা যদি ইহারা জানিত) কেহ বা নবাবের কোন প্রেয়সী ললনার নবপ্রাপ্ত রত্নালঙ্কারের অনুরূপ অলঙ্কার কামনায় চক্ষুর নীচে আকর্ণ কজ্জল লেপন করিলেন। কোন চণ্ডীকে বসন পরাইতে দাসী পেশোয়াজ মাড়াইয়া ফেলিল; চণ্ডী তাহার গালে একটা চাপড় মারিলেন। কোন প্রগল্‌ভার বয়োমাহাত্ম্যে কেশরাশির ভার ক্রমে শিথিলমূল হইয়া আসিতেছিল, কেশবিন্যাসকালে দাসী চিরুণী দিতে কতকটা চুল চিরুণীর সঙ্গে উঠিয়া আসিল, দেখিয়া কেশাধিকারিণী দরবিগলিতচক্ষুতে উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলির বহুস্থলে কেশবিন্যাসের বর্ণনা দিয়াছেন, সুবিন্যস্ত কেশে ফুলের মালা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় চিত্র।

কপালকুণ্ডলায় শ্যামাসুন্দরী মৃন্ময়ীকে বলিতেছে—

বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কাণে তোর দিব যোড়া দুল॥
কুঙ্কুম, চন্দন, চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হবে রাগে।
সোণার পুত্তলী ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে॥

বিষবৃক্ষের "কমলমণি বাড়িতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী কেশ রচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব?" সূর্য্যমুখী তাহার গাল টিপিয়া ধরিলেন! "না! না!" বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুইটা ফুল দিলেন।" বিষবৃক্ষের হরিদাসী বৈষ্ণবী গাহিতেছে—

কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল
গো সখি কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পরলেম মালা গেঁথে, কাণে পরলেম দুল
সখি কলঙ্কেরি ফুল॥

বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা বলিতেছে "(সুভাষিণী) তখন আমার মুখ পরিষ্কার করিয়া মুছাইয়া দিল। চুলে সুগন্ধ তৈল মাখাইয়া, যত্নে খোঁপা বাঁধিয়া দিল। বলিল "এ খোঁপার হাজার টাকা মূল্য।" মৃণালিনীর ভিখারিণী গিরিজায়াও

খোঁপায় ফুলের মালা পরে, তাহার "কেশগুলি সূক্ষ্ম, গ্রীবার উপর মোহিনী কবরী তাহাতে যূথিকার মালা বেষ্টিত।"

বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাস পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মনে মেঘদূতের—

"হস্তে লীলাকমলমলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতালোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তেঽপিত্বদুপগমজং যত্রনীপং বধূনাম্॥

অথবা ঋতু-সংহারের—

কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং
স্তনেষু হারা অলকেষ্বশোকঃ।
শিখাসু মালা নব মল্লিকায়াঃ
প্রয়ান্তি শোভা প্রমদাজনস্য॥"

এইরূপ বর্ণনা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল, তাই তিনি কুসুমদামে সকল নায়িকারই কেশরঞ্জন করিয়াছেন।

অধর রঞ্জনের "লিপষ্টিক" তখন আবিষ্কৃত হয় নাই। তাম্বুলরাগে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করার প্রথা বহু প্রাচীন সুতরাং বঙ্কিম-সাহিত্যে তাহার অভাব নাই, এই তাম্বুলরাগ প্রৌঢ়াকে যুবতী করে; বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন "কে বিমলার সে তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর দেখিয়া বলিবে সে যুবতী নয়?" বঙ্কিমচন্দ্রের হরিদাসী বৈষ্ণবী গাহিতেছে—"আতর দিব শিশি ভ'রে, গোলাপ দিব কার্ব্বা করে, আর আপনি সেজে বাটা ভরে দিব পানের দোনা।"

এইরূপে বঙ্কিম সাহিত্যে রমণীর নখশির বর্ণনা তো হইল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে কোন নারীচরিত্রই কুরূপা করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ছিলেন সৌন্দর্য্যের পূজারী সেইজন্য তাঁহার সাহিত্যে ভিখারিণী হইতে রাজরাণী সকলেই সুন্দরী, সকলেই সুসজ্জিতা। লেখক যে ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও অভাব ফুটাইতে চাহিয়াছেন সেখানে কেবল ছিন্ন ও মলিন বসন দিয়াই দারিদ্র্যের বিকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নায়িকাগণ শান্তিপুরে বা ঢাকাই শাড়ী; বীনাংশুক বা বেনারসী বা জরিদার পেশোয়াজ পরিয়া থাকে, কদাচিৎ দু একজন অস্বচ্ছলতাবশতঃ মোটা শাড়ী পরিয়া থাকে। বঙ্কিম-সাহিত্যে নারীর প্রসাধনের পারিপাট্য দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমযুগের পল্লীরমণীর প্রসাধনের সম্পূর্ণ চিত্র আমরা আমাদের বাল্যকালে দেখিয়াছি। এখন অবশ্য মল পরার প্রথা নাই, মিশি তো দেখাই যায় না, শান্তিপুরে ফরাসডাঙ্গার শাড়ীর পরিবর্ত্তে জাপানী জর্জ্জেট, মুর্শিদাবাদ সিল্কের ছাপা শাড়ী ও মিলের বাহারে পাড়ের শাড়ী সহর ও পল্লীর তরুণীদের অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সে যুগের স্বর্ণালঙ্কার এই Economic যুগে চলিয়া যাইতেছে, তাহার স্থানে রূপার তারের গহনা দরিদ্র বঙ্গকামিনীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছে। অলক্তক-রাগরঞ্জিত নগ্নপদে স্যাণ্ডাল উঠিয়াছে, বাঙ্গলার পল্লী এখন জনশূন্য তাই এখন অধিকাংশ পল্লীবাসিনী নগরবাসিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের মলশোভিত ঝম্‌ঝম্ পদধ্বনির পরিবর্ত্তে স্যাণ্ডালশোভিত চঞ্চল পদের চট্‌পটা ধ্বনিই নগরের অলিতে গলিতে শ্রুত হয়। সেই ভীমা পুষ্করিণী বা বারুণী পুষ্করিণীতে কেহ কলসী কাঁকে জল আনিতে যায় না। দিঘিকার জল পচা পাতায় ও শৈবালে আবৃত দুর্গন্ধময় ও মশকের জন্মভূমি হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যদি এযুগে বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন এই পঞ্চাশ বৎসরে বাঙ্গলার কৃষ্টির উন্নতি হইলেও স্বাস্থ্য গিয়াছে, সৌন্দর্য্য গিয়াছে, পল্লী গিয়াছে, সুখ গিয়াছে। বাঙ্গালী এখন নিয়ত দারিদ্র্য ও অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্লান্ত ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলে বর্ণিত সুখসম্পদ পরিপূর্ণ বাঙ্গলার জমিদারবাড়ীও নাই আর সে গানও নাই—

"ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে,
বাঁশতলাতে জল—
আয় আয় সই জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥" *

* এই প্রবন্ধের আংশিক চন্দননগর বঙ্কিম-জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবে পঠিত হয়।

সাহিত্য-সেবার সার্থকতা

শ্রীস্বর্ণপ্রভা ভাদুড়ী

এই নশ্বর জগতে কিছুই অবিনশ্বর নয়।—সংস্কৃত কবি বলেছেন, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তিরা মরণের পরও জগতের বুকে চিরবিরাজ করেন। মৃত্যু তাঁদের মৃত্যু নয়। মরণ শুধু তাঁদের আত্মাকে এক মহামূল্য সম্পদে ভূষিত করে দিয়ে যায়। যার জন্য তাঁদের কীর্ত্তি পৃথিবীর বুক থেকে কোনও দিনই বিলুপ্ত হয় না। এ জগতে সার্থকজীবন যশস্বী হয়েছেন অনেকেই। তাঁদের সকলেরই বিভিন্ন প্রতিভার দীপ্ত আলোকসম্পাতে আলোকিত হয়েছে সমগ্র বিশ্ব। বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে নিখিল মানবের চিত্ত। সকলেই মাথা পেতে গ্রহণ করেছে সেই আলোর দান। কণ্ঠ ভরে দিকে দিকে প্রচারিত করেছে সেই মহামানবের যশোগাথা।

ঋষি বঙ্কিম যেমন প্রাচীনতম বঙ্গ-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব নূতন ভাব-মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত করে এই জগতে চির অমরতা লাভ করে গেছেন। সম্রাট সাজাহান যেমন তাজমহল গড়ে এক অপূর্ব্ব পত্নী-প্রেমের নিদর্শন রেখে পৃথিবীতে চির অমর হয়ে আছেন, সেই রকম মহা কবি টেনিসন বলেছেন—

"Mortal goes dust to dust
ashes to ashes :
He that was great in him is gone,
Gone for ever but nothing can
Bereave him of the force he
Makes his own living here."

আমার এ প্রবন্ধের বিষয় হচ্ছে সাহিত্য-সেবার সার্থকতা কি এবং কোথায়? অর্থাৎ আবহমানকাল থেকে সাহিত্যকারগণ সাহিত্য-সেবায় জীবনোৎসর্গ করে বিশ্বমানবকে কি দিয়ে এবং তার প্রতিদানস্বরূপ কি নিয়ে তথাকথিত সাহিত্য-সেবার চরম সার্থকতা লাভ করেছেন ও আজও করছেন।

সাহিত্য শব্দের অর্থ—যা হিতের সঙ্গে বর্ত্তমান তা সংহিত তদ্ভাব—সাহিত্য। এই সাহিত্য-সেবায় বাণী-মন্দিরে কোনও ভেদ বৈষম্য নেই। এখানে সকলেই বাঙ্গালী, বঙ্গবাণীর মানস সন্তান। যাদের প্রথম কথা ফোটে বাংলাতে, শেষ ভাবনা নীরব বাংলাতেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ক্ষীণ সুরে ধ্বনিত হয়, তাদের রক্ত মাংসের এবং বংশ পরিচয় যাই হোক না কেন, তারা শিক্ষায়, সাধনার ক্ষেত্রে সকলেই এক। সেই স্মরণাতীত আদি-যুগের কথা। যে যুগের কথা ইতিহাসেও লেখা নেই—সেই যুগ হতে এই সব সেবকগণ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য এবং সাধন সম্পত্তি দিয়ে জননী বাগ্দেবীর চরণপদ্মে সাজিয়ে আসছেন। তাঁদের এই সেবার মধ্যে কতটা যে আত্মসুখের বাসনা প্রচ্ছন্ন থাকে সে বিষয় কিছু বলা কঠিন। তবে সকল সাহিত্যিকেরই মর্ম্মগত অভিলাষ এক। যেমন তাঁদের এই সৃষ্টি পুরাতনকে ভেঙ্গে নূতনের মাঝে যেন নিজের আসনখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। দেশের জাতির ও সমাজের যেন কিছু কিছুও কল্যাণ সাধন করতে পারে।

সাহিত্য হচ্ছে যুগ যুগান্তরের মানব-জীবনের অতীত ও বর্ত্তমানের ছবি এক সাথে দেখার একটী অভগ্ন মুকুর। সাহিত্যিকদের কল্যাণে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের ছোট ও বড় সকল প্রকার চিত্রই এর বুকে প্রতিফলিত হয়, এবং আমরা তা বিনাক্লেশে দেখতে সমর্থ হই। এইজন্য এই সকল স্রষ্টার কাছে জগৎ চিরদিন কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকে এবং এইখানেই তাঁদের সাহিত্য-সেবা সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

বাণীর কমলবনে কুসুম চয়ন করতে গিয়ে কারো হাতে যে কাঁটা ফোটেনা, একথা বলা যায় না। কেহ কেহ আবার এই কাঁটার ভয়ে অর্দ্ধেক পথ হতে ফিরেও আসেন। কিন্তু জগতে তাঁরাই ধন্য, যাঁরা এই কাঁটার আঘাত নীরবে সহ্য করে বীরের মত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন। এই যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম, জগদ্বিশ্রুত যাঁর খ্যাতি, তাঁকেও একদিন কাগজের মারফতে গালাগালি শুনতে হয়েছিল, "শবপোড়া মড়াদাহের দল" প্রভৃতি বলে। কিন্তু তাতে তিনি

অপমানিত বোধ করে লেখনী ত্যাগ করেন নি। সুতরাং এইখানেই বোঝা যাচ্ছে যে সাহিত্য-সেবা অর্থে নিজের নাম ও যশ খোঁজা নয়। পাপীদের পাপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, মূর্খের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দেওয়া, এবং বিশ্বস্রষ্টার সার্থক সৃষ্টি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা প্রকৃতি-রাণীকে বন্দনা করা।

আজকাল প্রায় লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমানের তরুণ লেখকরা নাকি শুধু নাম ও যশের আশায় সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন, এবং অত্যধিক আকাঙ্খার ফলে সে সকল রচনা হয় অশ্লীল রুচির এক একটী জলন্ত নিদর্শন স্বরূপ। অবিশ্যি আজকাল নিত্য নূতন যে সমস্ত কাগজ বেরোচ্ছে ও তাতে নিত্য নূতন যে সকল লেখক-লেখিকার আবির্ভাব হচ্ছে আমি তাদের কথা বলছিনে। আমি বলছি তাদের কথা, যাদের কলমে ফুলও ফোটে, কাঁটাও ছড়ায়। অনেক সময়ে রচনায় সত্য কথা কিছু বলতে গেলে সেটা কিছু নগ্ন হয়েই লোক সমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে মিথ্যার আবরণে সত্যকে গোপন করা ত ন্যায়সঙ্গত কথা নয়। অন্তরে যখন দুর্দ্দমনীয় সৃষ্টির আকাঙ্খা জেগে ওঠে, তখন তাকে রোধ করার শক্তি কারও থাকে না। আর সাহিত্য হচ্ছে সুন্দর, নিত্য কালের মঙ্গলময়। যা অসুন্দর তা সাহিত্যের অঙ্গের আভরণ না হয়ে আবরণ হয়, দু'দিনেই তা খসে পড়ে।

সমগ্র বিশ্বে আজ চলচ্চিত্র যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তার মূলেও রয়েছে সেই সাহিত্য। উপযুক্ত নাটক না হলে শিল্পীদের সমস্ত কারুকলা, প্রতিভা হয় ব্যর্থ। এই যে মনীষী শরৎচন্দ্র, যাঁর তিরোধানে আজ সমগ্র ভারত শোকাচ্ছন্ন, সকলের চোখে অশ্রু। কিন্তু এমন দিনও আসবে যখন এই শোকোচ্ছ্বাস আসবে কমে, অশ্রু যাবে শুকিয়ে, তথাপি তার মধ্য দিয়ে হবে বাণী-মন্দিরের একনিষ্ঠ পূজারী সার্থক শিল্পী শরৎচন্দ্রের নূতন আবির্ভাব। এ জন্ম হবে শাশ্বত, চির কালের, চির যুগের।

যুগে যুগে কালে কালে এই সকল সাহিত্যকারগণ সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করে সমগ্র মানবকে দিয়ে যাচ্ছেন জাতি-গঠনের সুপরামর্শ, সমাজকে তার দোষ গুণের মূল্য, তরুণকে তার ভবিষ্যৎ পথের ইঙ্গিত এবং বিশ্বমানবের অন্তরে জাগিয়ে তুলছেন দেশাত্মবোধ ও কর্ত্তব্য ও রাষ্ট্রের মধ্যে তার স্থান কোথায় এবং কতটুকু তারই প্রেরণা। এবং তার ফলে প্রভূত যশ ও খ্যাতির ভারে অনেকেরই জীবন ওঠে ভরে, এবং মরণে তাঁরা তাই দিয়ে যান জগতের বুকে দুহাত ভরে ছড়িয়ে।

দুঃখ-জয়ের উপায়

শ্রীমতী স্বর্ণলতা গাঙ্গুলী

দুঃখ যদি ঘেরে তোকে
ও ভাই মানুষ! ভয় কিসের?
অমৃত ত জানিস্ মিঠে
দেখ্ না কেমন স্বাদ বিষের?
সুখটী যেমন সৃষ্টি বিধির
দুখ্‌ও তেমন তাঁর সৃজন।
ডরাস্ কেন দুঃখে তবে?
কর্‌রে দৃঢ় আপন মন।

উচ্চশিরে, খাড়া হয়ে
জীবনপথে এগিয়ে চল,
রাখিস্ মনে—দুঃখ দিয়ে
জগৎপিতা করেন ছল;
চল্‌বি যখন দৃঢ় পদে,
ডর্‌বি না আর 'দুখ্' দেখে,
ভাব্‌বি যখন 'দুখ্' কিছু নয়
ডর্‌বে তখন 'দুখ্' 'তোকে'।

ভারতীয় ভেষজে গবেষণা

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন, এল্‌-এ-এম্‌-এস্‌

আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত ভেষজের বর্ণনা আছে, তাহার প্রত্যেকটীর দ্বারাই যে বহুবিধ রোগের চিকিৎসা করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। আমার তো মনে হয়, যদি সকল অধিকারের সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত নাও থাকে এবং চিকিৎসক যদি দ্রব্য-বিজ্ঞানে পারদর্শী হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কোন প্রকার চিকিৎসা করাই বিশেষ কঠিন হয় না। আয়ুর্ব্বেদের সকল ঔষধই অধিকার ক্রমে বর্ণিত হইলেও, একই ঔষধে যেমন বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য করা যাইতে পারে, সেইরূপ তরু, গুল্ম, লতা, পত্র, পুষ্প ও ফলাদির প্রত্যেকটীর ব্যবহারে নানাবিধ ব্যাধিও অবশ্যই আরোগ্য করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে এইরূপ চিকিৎসারই সমধিক প্রচলন ছিল। তখন আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ডিস্‌পেন্সারীর প্রচলন ছিল না। ছাপার পুস্তকেরও বড় একটা চলন হয় নাই। তালপাতা বা তুলট কাগজে, চিকিৎসকগণের চিকিৎসার বিষয়গুলি লিখিয়া রাখা হইত। চিকিৎসকগণও চিকিৎসিতব্য বিষয়গুলি পুঁথির ভিতর লিখিয়া রাখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। সেই সমস্ত বিষয় তাঁহাদের হৃদয়মধ্যে এরূপভাবে নিহিত রাখিতেন—এমন কণ্ঠস্থ থাকিত যে, তাহার জন্য ঔষধ প্রস্তুত থাকুক আর নাই থাকুক, কোন রোগীর চিকিৎসাতেই তাঁহাদের কিছু মাত্র আটকাইত না। ইহার প্রধান কারণ ছিল—তাঁহাদের দ্রব্য-বিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান।

আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্য-বিজ্ঞান এক সময়ে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দ্রব্য মাত্রেরই গুণ বিশ্লেষণ এমনই সুন্দর-ভাবে করা হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শল্য, শালক্য প্রভৃতি চিকিৎসা শিক্ষার অভাবে যে সময়ে আর্য্যচিকিৎসার অবনতি আরম্ভ হইল, দ্রব্য-বিজ্ঞানের চর্চ্চাও সেই সময় হইতে ভারতীয় চিকিৎসক-দিগের মধ্য হইতে হ্রাস পাইতে লাগিল। ফলে দেশের অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, অনেকে অনেক তরু, গুল্ম, লতা চিনিতে পারেন না। যে সমস্ত দ্রব্যের গুণ পুস্তকে পড়া যায়, তাহার সবগুলি গুণের পরীক্ষা করিয়া দেখারও যে আবশ্যক আছে, তাহাও অনেকে সম্যক্‌ উপলব্ধি করেন না। অনুসন্ধিৎসা না থাকায় দ্রব্য-বিজ্ঞানের গবেষণাও বিশেষ কিছু হইতেছে না। একে গবেষণার বিশেষ অভাব; তাহার উপর দ্রব্যগুণ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত পুস্তক বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহাতেও সকল দ্রব্যের সকল প্রকার গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ, আয়ুর্ব্বেদের বহু পুস্তক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে, তাহারও বহু অংশ নষ্ট হইয়াছে। তাই, বর্ত্তমান সময়ে এমন অনেক দ্রব্যের রোগ-নাশিনী শক্তির কথা জানিতে পারা যাইতেছে যে রোগনাশিনী শক্তির কথা আয়ুর্ব্বেদীয় কোনও দ্রব্যগুণ-পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যেঃ—

(১) **অপরাজিতা লতা**—আপনাদের সুপরিচিত। শ্বেত অপরাজিতা গলক্ষতের পক্ষে উপকারী। ইহার লতা-পাতার ক্বাথের কবল (Gurgle) করিলে গলক্ষত ভাল হইয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদে অপরাজিতার বহু রোগনাশিনী শক্তির কথা থাকিলেও, গলক্ষতে প্রয়োগের কথা উল্লিখিত হয় নাই।

(২) **ওলটকম্বলের মূল**—বাধক রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার পাতার ব্যবহারের উল্লেখ নাই। অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বহুমূত্র রোগে ওলটকম্বলের পাতার রস বিশেষ উপকারী।

(৩) **দেশী আমড়া**—(আম্রাতক) সকলেই খাইয়া থাকেন। কিন্তু বহুমূত্র রোগে ইহার প্রয়োগের কথা অনেকের হয়তো জানা নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ-পুস্তকেও ইহা যে বহুমূত্র রোগে উপকারী, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দেশী আমড়ার আঁটির শাঁস বহুমূত্র রোগে পরম উপকারী।

(৪) **আস্‌শেওড়া**—ইহার ডাল দিয়া অনেকে দাঁতন করিয়া থাকেন। গলার ক্যানসারে ইহার প্রয়োগের কথা অনেকের হয় তো জানা নাই। দ্রব্যগুণ-পুস্তকে গলার ক্যানসারে ইহার উপকারিতার কথা উল্লিখিত হয় নাই। অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গলার ক্যানসারে আসশেওড়ার (ফলের) চুরুটের ধূমপান বিশেষ উপকারী।

(৫) **বকফুল**—আপনাদের সকলেরই সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদে ইহার বহু রোগনাশিনী শক্তির কথা লিখিত থাকিলেও, শ্লেষ্মা রোগে ইহার প্রয়োগের কথা উল্লিখিত হয় নাই। ইহার শ্লেষ্মানাশক শক্তির কথা—'চরক', 'সুশ্রুত' প্রভৃতি গ্রন্থেও উল্লিখিত নাই। কেবল মাত্র 'ভাব-প্রকাশ'কার উল্লেখ করিয়াছেন যে, বকফুলের পাতা প্রতিশ্যায় অর্থাৎ তরুণ সর্দ্দিনিবারক। অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বকফুলের রসসেবনে ও বুকে মালিশ করিলে অতি সহজে শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠিয়া গিয়া থাকে।

(৬) **পাথরকুচি**—প্রস্রাব-পরিষ্কারের জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার পাতার আমাশয় রোগ-নাশিনী শক্তি ও ফোঁড়া ফাটাইবার শক্তির কথা দ্রব্যগুণে উল্লেখ নাই। অথচ পাথরকুচি পাতা ও গোলমরিচ একত্র বাঁটিয়া খাইলে আমাশয় ও রক্তামাশয়ে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। পাথরকুচির পাতায় একটু রেড়ির তৈল মাখাইয়া প্রদীপে সেঁকিয়া ফোঁড়ার উপর (এমন কি কার্ব্বাঙ্কলেও) বসাইয়া দিলে সহজে ফোঁড়া ফাটিয়া থাকে এবং ফোঁড়া ফাটিয়া যাওয়ার পরও ঐরূপভাবে পাথরকুচির পাতায় রেড়ির তেল মাখাইয়া প্রদীপে সেঁকিয়া প্রয়োগ করিলে পুঁষ বাহির হইয়া ক্ষতস্থান শুকাইয়া যায়—ইহা বিশেষভাবেই পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।

(৭) **নাটাকরঞ্জ**—এর বহু রোগনাশিনী শক্তির কথা আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইলেও, উহার জ্বরনাশক শক্তির কথা আয়ুর্ব্বেদের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। অথচ নাটাকরঞ্জের বীজ, শস্য ও পত্র উত্তম জ্বরঘ্ন। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নাটার বীজের শস্য বিষম জ্বর বা ম্যালেরিয়া জ্বরের অমোঘ ঔষধ।

(৮) **দাড়িম**—এর ব্যবহার চিকিৎসকেরা বহুভাবে করিলেও ক্রিমিতে, বিশেষ করিয়া ফিতা ক্রিমিতে (Tape-worms) ইহার মূলের ছাল যে বিশেষ উপকারী—তাহা হয়তো অনেকেরই জানা নাই। আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণ পুস্তকে ইহার ক্রিমিনাশিনী শক্তির উল্লেখ দেখা যাইতেছে না, অথচ ফিতা ক্রিমিতে ইহা বিশেষ উপকারী।

(৯) **বৃদ্ধদারক বীজ**—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ-পুস্তকে ইহার পাতা বাঁধিয়া দিলে যে কাটা স্থান সুন্দরভাবে জোড়া লাগিয়া থাকে, তাহার উল্লেখ নাই। অথচ কাটা স্থান জোড়া লাগাইতে ইহার পাতা বিশেষ কার্য্যকরী।

(১০) **যজ্ঞ ডুমুরের ফল**—ইহাই এতকাল বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। ইহার পাতার বহু রোগনাশিনী শক্তি আছে, ইহা আমাদের প্রথম জানাইয়া দিলেন চম্পারণ জেলার রত্নমালাগ্রামনিবাসী পণ্ডিত চন্দ্রশেখর ধর মিশ্র মহাশয়। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হিসাবে ইহার পাতার সার যে কিরূপ ফলদায়ক, তাহা আজ আর কবিরাজসম্প্রদায়ের অজ্ঞাত নাই। ইহার পাতা হইতে সার প্রস্তুত করিয়া যে সমস্ত রোগে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার উল্লেখ দ্রব্যগুণ-পুস্তকে নাই।

(১১) **তেঁতুল**—আপনারা সকলে খাইয়া থাকেন। ইহার বহু রোগনাশিনী শক্তির কথা আয়ুর্ব্বেদে থাকিলেও, ইহার বীজের পুষ্টিবর্দ্ধক শক্তির উল্লেখ নাই। অথচ দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সবল করিতে ও তরল শুক্র গাঢ় করিতে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী।

(১২) উন্মাদ রোগে ও ব্লাড-প্রেশারে **ছোট চাঁদরের** মূল যে কিরূপ উপকারী, তাহা এখন কবিরাজ মাত্রেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। অথচ দ্রব্যগুণ-পুস্তকে এই গাছটীর উল্লেখও নাই। এইরূপ এত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তদ্দ্বারা একখানি পুস্তক রচিত হইতে পারে।

ক্ষার—ইহার পর উল্লেখ করা যাইতে পারে ক্ষার-বর্গের কথা। আয়ুর্ব্বেদের বনৌষধি হইতে সে সমস্ত ক্ষার-প্রস্তুতির বিধি আছে, তদ্দ্বারা কত উৎকট উৎকট রোগের যে চিকিৎসা হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঋষিযুগের এই ক্ষার-কল্পনা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ক্ষারের প্রয়োগও চিকিৎসকদিগের

মধ্যে হইতে হ্রাস পাইতে বসিয়াছে। অথচ এক একটী ক্ষার ও ভস্মের প্রয়োগে কিরূপ কঠিন ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে—তাহা চিকিৎসক সমাজের অজ্ঞাত নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—যেমন **'যবক্ষার'**। যবক্ষার এখন আর বড় একটা কেহ প্রস্তুত করার আবশ্যক বোধ করেন না। দোকান হইতে ক্রীত 'নাইট্রিক এসিডের' গাদই এখন যবক্ষারের স্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ চরক ও সুশ্রুতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার যবাগ্রজ, যবলাস, যবশূক, যবনালজ, যবজ, যবাপত্য প্রভৃতি পর্য্যায় শব্দের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যবভস্ম করিয়া যে ক্ষার পদার্থ পাওয়া যায় তাহারই নাম যবক্ষার। ইহার প্রস্তুত-বিধি এইরূপ—

প্রথমে যবের শূক বা শীষ—একটী মাটীর হাঁড়িতে পুরিয়া হাঁড়ির মুখে সরা ঢাকা দিয়া উভয়ের জোড়ের স্থানে কাদার প্রলেপ দিয়া উনানে বসাইয়া এক ঘণ্টা জ্বাল দিবে। তৎপর ঐ ভস্ম একসের পরিমাণ লইবে ও তাহা ৬৪ সের জলে গুলিবে। তৎপরে ক্ষারমিশ্রিত জলকে মোটা কাপড়ে উপর্য্যুপরি একবিংশতি বার ছাঁকিয়া লইবে। সেই পরিস্রুত জল লৌহকটাহে রাখিয়া তীব্র অগ্নিতাপে জ্বাল দিবে, জল মরিয়া গেলে পাত্রে দানাদার একপ্রকার যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাই যবক্ষার।

যবক্ষারের যখন এই অবস্থা, তখন **কুলেখাড়ার ক্ষার** এখন আর কেহ করেন কিনা জানি না। অথচ এই কুলেখাড়ার ক্ষার পিত্তশূলের (Galstone) অমোঘ ঔষধ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দুই বেলা আহারের পর অর্দ্ধ আনা হইতে একআনা মাত্রায় শীতল জলসহ কুলেখাড়ার ক্ষার সেবন করিলে, গলষ্টোনের যন্ত্রণা ও পিত্তকোষের প্রদাহ সুন্দরভাবে আরোগ্য হইয়া থাকে। যে রোগীর দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, চক্ষু, মূত্র প্রভৃতি পীতবর্ণ হইয়াছে, সে রোগী ১৫।২০ দিন এই ক্ষার সেবন করিলে তাহার দেহের ও ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই ক্ষারের এমনই অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, কিছুদিন এই ক্ষার নিয়মিত সেবন করিলে গলষ্টোন বা পিত্তশিলা গলিয়া যায়। যবক্ষারের ন্যায় শুষ্ক কুলেখাড়া গাছ হইতে ঐরূপ প্রক্রিয়ায় কুলেখাড়ার ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয়। সুশ্রুতে এইরূপভাবে ঘণ্টাপারুল, কুড়চী, পারিভদ্র, বহেড়া, সোঁদাল, আকন্দ, মনসাসিজ, অপামার্গ, পারুল, ডহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, বাসক, কদলী, কুঁচ, রক্তচিতা, গণিয়ারী, ছাতিম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল হইতে ক্ষার প্রস্তুতের বিধি আছে।

বনৌষধি হইতে প্রস্তুত ভস্মাদির দ্বারাও বহু রোগের সুন্দর চিকিৎসা হইতে পারে। পরিণাম শূলে তেঁতুল চটা ভস্ম প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে আশু যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়।

আয়ুর্ব্বেদের ক্ষার ও ভস্মাদি ভেষজ-ভাণ্ডারের রত্ন-বিশেষ। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে উহার পুনঃ প্রচলন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দ্রব্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে মূত্র-পরীক্ষা-প্রণালী—বর্ত্তমান সময়ে মূত্রপরীক্ষা প্রণালীও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের এক প্রকার অজ্ঞাত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মূত্রপরীক্ষার জন্য এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের শরণ লইতে হয়। অথচ এক সময় ছিল, যখন দ্রব্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে তখনকার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা মূত্র পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন। বৌদ্ধযুগে মূত্র-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। আচার্য্য জতুকর্ণের 'মূত্র-বিজ্ঞান' নামক অপ্রকাশিত, অপূর্ব্ব পুস্তকের ২১ খানি মাত্র পুঁথির পাতা সংগ্রহ করিয়া কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় মহাশয় দেখাইয়াছিলেন যে, দ্রব্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপভাবে মূত্র পরীক্ষা করা হইত। উক্ত প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা শুনুন—

(১) "মূত্রৈঃ পয়স্তুল্যমিতং বিমিশ্রং
মূলস্য চূর্ণং খলু পুষ্করস্য।
প্রক্ষিপ্য পক্কং মৃদুনাগ্নিনা তৎ
মেদঃ প্রদুষ্টং যদি লোহিতং স্যাৎ॥"

অর্থাৎ রোগীর মূত্র লইয়া তাহাতে তুল্য পরিমাণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে পুষ্করমূলের চূর্ণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া যদি দেখ, ঐ মূত্র লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিবে, রোগীর দেহের মেদোধাতু বিকৃত হইয়াছে।

(২) মূত্রসিক্তং হি বসনং মূলস্য পুষ্করস্য চ।
আর্দ্রয়িত্বা রসেনৈব শুষ্কং তৎ বর্ত্তিকাসমং ॥
কৃতং তত্নুজ্জ্বলং নূনং তৈলাক্তসমমেবহি।
জ্বলতীতি বিজানীয়াম্মজ্জদোষং ধ্রুবং সুধীঃ ॥

অর্থাৎ একখণ্ড বস্ত্র রোগীর মূত্রে সিক্ত করিবে, পরে ঐ বস্ত্রখণ্ড আবার পুষ্কর মূলের রসে ভিজাইবে। শুষ্ক হইলে ঐ বস্ত্রখণ্ড সলিতার মত পাকাইয়া উহা জ্বালিবে। যদি তৈলাক্ত বর্ত্তিকার মত বেশ উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে, তাহা হইলে জানিবে ঐ রোগীর মজ্জা ক্ষয় হইতেছে।

(৩) দিনত্রয়ং স্ত্রিয়া মূত্রেসিক্তং গোধূমমাদরাৎ।
শুষ্কীকৃতং ছায়য়াঽগ্নৌ বা স্ফুটতি ভর্জ্জিতং।
ততোদুষ্টং বিজানীয়াদার্ত্তবং খলু যোষিতাং ॥

অর্থাৎ কতকগুলি গম লইয়া স্ত্রী মূত্রে ভাল করিয়া তিন দিবস ভিজাইবে। পরে তাহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ভাজিলে যদি ফুটিয়া না উঠে, তাহা হইলে জানিবে যে ঐ রমণীর আর্ত্তব দূষিত হইয়াছে। স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইয়াছে কিনা তাহাও বলিতে পারা যাইত।

মূত্রে নার্য্যাঃ ক্ষিপেৎ শ্বেতশাল্মলীপুষ্পং চূর্ণকং।
তত্রৈব স্নেহবদ্দৃশ্যং দৃশ্যতে চেৎ পরেঽহনি।
ততো গর্ভং বিজানীয়াৎ স্ত্রিয়া ইত্থং বিশেষতঃ ॥

অর্থাৎ—নারীর মূত্রে শ্বেত শিমুলের ফুলের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরদিন যদি দেখ ঐ মূত্রের উপরিভাগে তৈলের মত পদার্থ ভাসিতেছে তাহা হইলে জানিবে যে সে নারী গর্ভবতী হইয়াছে।

(৫) এমন কি মূত্র-পরীক্ষা করিয়াই বলিতে পারা যাইত—উহা স্ত্রীলোকের কি পুরুষের।

মূত্রেস্তুল্যমিতে তৈলে মিশ্রয়েৎ মূলজং রসং
করকস্য ততো বিদ্যাৎ পীতাভং যদি তদ্ভবেৎ।
পুরুষস্যেতি তন্মূত্রং নীলাভং চেদ্ ধ্রুবং স্ত্রিয়াঃ ॥

অর্থাৎ—মূত্রের সহিত তুল্য পরিমাণে তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে করক মূলের রস দিবে। যদি মূত্রের বর্ণ পীতাভ হয়, তাহা হইলে সে মূত্র পুরুষের, আর যদি নীলবর্ণ হয় তাহা হইলে সে মূত্র স্ত্রীলোকের বলিয়া জানিবে।

(৬) স্ত্রীলোক বন্ধ্যা কিনা ও পুরুষের শুক্রজ দোষে সন্তান হইতেছে না কিনা তাহাও মূত্র-পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারা যায়। প্রণালীটী এইরূপ :—

স্থানদ্বয়েঽলাবুবীজং কৃত্বা চ প্রোথিতং পৃথক্
একত্র পুরুষোঽন্যস্মিন্ নারীমূত্রং পরিত্যজেৎ
যস্য নো জায়তেঽঙ্কুরো মূত্রসিক্তে তু বীজকে।
তস্য দোষং বিজানীয়াৎ শুক্রজং সত্যমেব হি।

অর্থাৎ—পৃথক্ পৃথক্ দুইটী স্থানে লাউ বীজ রোপণ করিবে। উহার একটী স্থানে পুরুষ এবং অপর স্থানটীতে রমণী প্রস্রাব করিবে। যাহার মূত্রসিক্ত বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইবে না, রমণীর হইলে সে বন্ধ্যা ও পুরুষের হইলে তাহার শুক্রজ-দোষে সন্তান হইতেছে না বুঝিতে হইবে।

দ্রব্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে রাসায়নিক পরীক্ষা—ভুক্ত বস্তুতে অথবা কোন ঔষধে, প্রস্রাবে বা জলে ক্ষার পদার্থ আছে কিনা তাহাও দ্রব্য-বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন হলুদ। হলুদের রস সাদা কাগজে মাখাইয়া উহা বাতাসে শুকাইয়া লইয়া ঐ রঞ্জিত কাগজ কোন দ্রব্যের মধ্যে দিলে যদি ঐ দ্রব্য লাল বা কটা রঙের মত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উহাতে ক্ষার পদার্থ আছে।

আয়ুর্ব্বেদে দ্রব্যের গুণ বিশ্লেষণ—দ্রব্য-বিজ্ঞান যে কিরূপভাবে বিশ্লিষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছিল তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, দ্রব্যে রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি—এই পাঁচটী পদার্থ অবস্থান করে, ইহারা দ্রব্যে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহাদিগের মধ্যে রস-বিশ্লেষণে মূল রসের সংখ্যা—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় ভেদে ছয়টী এবং ঐ ছয়টীর সহিত দুইটী করিয়া মিলিত হইলে একটী সংখ্যা কম হইয়া পাঁচটী সংখ্যা হয়। যথা—মধুরাম্ল, মধুর-লবণ, মধুর-তিক্ত, মধুর-কটু ও মধুর-কষায়। এইরূপ অম্ল রসও পাঁচটী, যথা—অম্ল-মধুর, অম্ল-লবণ অম্ল-তিক্ত, অম্ল-কটু ও অম্ল-কষায়। কিন্তু মধুর ও অম্ল দুইবার করিয়া হইতেছে বলিয়া একটী বাদ দিয়া প্রকৃতপক্ষে অম্লরস

চারিটী। এই নিয়মে লবণ-রস তিনটী, তিক্ত রস দুইটী ও কটু রস একটী। অতএব দুই দুইটীর সংযোগে সর্ব্বশুদ্ধ রসের সংখ্যা পনেরটী পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আবার তিন তিনটীর সংযোগে মধুর রস দশটী, অম্ল রস ছয়টী, লবণ রস তিনটী ও তিক্ত রস একটী নির্ণয় করিতে পারা যায়। এইরূপ মধুরাদির চারি চারিটী করিয়া সংযোগে মধুর রস দশটী, অম্ল রস চারিটী, লবণ রস একটী অর্থাৎ পনেরটী পাওয়া যায়। এই হিসাবে পাঁচটী করিয়া সংযোগ করিলে মধুর রস পাঁচটী ও অম্ল রস একটী মোট ছয়টী হয়। আর চার চারটী একত্র যোগে একটী রস হয়। অতএব যৌগিক রস সর্ব্বশুদ্ধ ১০+২০+১৫+৬+১=মোট ৫২ এবং মূল রস ৬টী অতএব রস বিশ্লেষণে ৫২+৬=৫৮টী রস বা অনুরস এবং রস বা অনুরসের তারতম্য ভেদে অসংখ্য হইয়া থাকে। চিকিৎসক দোষ ও ঔষধাদির বিচার করিয়া কোথাও এক রস কোথাও বা বহু রসযুক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিবেন। উল্লিখিত রসগুলির মধ্যে প্রথম তিনটী অর্থাৎ মধুর, অম্ল ও লবণ রস—বায়ুনাশক, তিক্ত, কটু ও কষায় রস কফনাশক, কষায়, তিক্ত ও মধুর রস পিত্তনাশক এবং তিক্ত কটু ও কষায় রস—বায়ু বর্দ্ধক, মধুর, অম্ল ও লবণ রস কফকারক এবং অম্ল, লবণ ও কটু রস পিত্তবর্দ্ধক। রস-বিচারে কেবল উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদকারগণ নিবৃত্ত হন নাই, উহাদের মধ্যে যে রস বায়ুর প্রশমক, সেই রসে রুক্ষতা, লঘুতা ও শীতলতা থাকিলে তদ্দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয় না, যে রস পিত্ত প্রশমক, সেই রসে তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লঘু গুণ থাকিলে পিত্ত প্রশমন হয় না, যে রস কফ নাশক সেই রসে স্নিগ্ধতা, গুরুতা ও শীতলতা থাকিলে ঐ রস শ্লেষ্মা নষ্ট করিতে পারে না। এই সকল বিষয়ের বিচার এত সূক্ষ্মভাবে করা হইয়াছে যে তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে চিকিৎসা কার্য্যে আর কিছুরই অভাব থাকে না। দ্রব্যের গুণ শব্দের অর্থও ইহাই। দেহের মধ্যস্থ যে অংশের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে অন্য দ্রব্যের দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া যে ক্রিয়া সাধিত হয় তাহারই নাম—দ্রব্যগুণ। বীর্য্য শব্দের অর্থ এক কথায়—শক্তি। ভুক্ত বস্তুর সহিত জঠরাগ্নির যোগে পরিপাক অন্তে ভুক্তদ্রব্য যে রসান্তরিত হয়,—সেই রস হইতে পৃথক যে রস বিশেষের উৎপত্তি—তাহার নাম বিপাক। আর রস, বীর্য্য, বিপাকের অতীত দ্রব্যগত শক্তিকেই প্রভাব বলে।

এইরূপ ভাবে দ্রব্যে রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব বুঝাইয়া তাহার পর আরও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, দেহস্থ ধাতুর প্রতিকূল দ্রব্য সকল দেহস্থ ধাতুর বিরোধ উপস্থিত করে ও কতকগুলি ধাতু পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া সংযোগ ও সংস্কার বশতঃ বিরোধ সাধন করে। ইহা ভিন্ন কতকগুলি স্বভাববশতঃই বিরুদ্ধ। দুগ্ধের সহিত যে মৎস্য খাইতে নাই—তাহার কারণ মৎস্য ও দুগ্ধ উভয়ই মধুর এবং উভয়ের মধুরতায় বিপাকবশতঃ অত্যন্ত অভিষ্যন্দী হইয়া থাকে, আবার দুগ্ধ শীতল ও মৎস্য উষ্ণ বলিয়া বিরুদ্ধ বীর্য্য হয়, এই বিরুদ্ধ বীর্য্যের জন্য রক্ত দূষিত হয় এবং সাতিশয় অভিষ্যন্দী বলিয়া স্রোতঃ সমূহের অবরোধ ঘটে। এই সংযোগ-বিরুদ্ধ ভোজনে দেহীদিগের নানা প্রকার রোগ হইতে পারে। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ বিচার বিবেচনা করিয়া তৎপ্রশমনের জন্য বমন, বিরেচন ও বিরুদ্ধ আহার পরিপাক করাইবার জন্য সংশমন যোগসমূহের যে সকল ব্যবস্থা বলিয়া গিয়াছেন, সংক্ষেপতঃ তাহাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা। আমাদের দেশে আহারের যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহাতে ভোজনে বসিয়া, প্রথমে সুমিষ্ট ফলাদি সেব্য, কারণ মধুর রসে পূর্ব্ব সঞ্চিত বাত পিত্ত প্রশমিত হয়। তৎপরে লবণ ও অম্লরস সেব্য, কারণ তাহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হইত। অতঃপর কটু, তিক্ত, কষায় রস সেবন করিলে কফের নাশ হইত এবং পরিশেষে উষ্ণ দ্রব্যাদি ভোজনের জন্য যে পিত্তের উৎপত্তি হইত, তাহা মিষ্টান্নাদির মধুর দ্রব্য সেবনে প্রশমিত হইত। সেই জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ক্রম নির্দ্দেশ শুধু বায়ু, পিত্ত, কফের ঔষধ লইয়াই নহে, পথ্য-বিধিও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূলভিত্তি। সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তিদিগের জন্য যে সকল পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা আছে, তাহা দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়াই লিখিত হইয়াছে। মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন, হিতাহার সেবনই পুরুষের একমাত্র সুখ বৃদ্ধির কারণ ও অহিতাহার সেবনই রোগের কারণ। এই হিতাহার ও অহিতাহারের বিচার নির্ণয়ের জন্য দ্রব্য-বিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দ্রব্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। সব কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং আর দু' একটা বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যেক বনৌষধির দ্বারা বহুবিধ রোগের চিকিৎসা করা যাইতে পারে। দ্রব্যের যথাযথ প্রয়োগ প্রণালী জানা থাকিলে অনেক সময় বড় বড় ঔষধ অপেক্ষা এক একটী দ্রব্যের দ্বারাই শুভ ফল দৃষ্ট হয়। গর্ভিণী চিকিৎসায়, শিশু চিকিৎসায় তো এইরূপ এক একটী দ্রব্য প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফলই পাওয়া যায়। নানাবিধ ঔষধের ব্যবস্থা করিলেও স্ত্রীরোগে অশোক, পাণ্ডু-কামলা প্রভৃতিতে গুলঞ্চ, কাসরোগে বাসক, হৃদ্‌রোগে অর্জ্জুন, ব্লাড প্রেসারে জটামাংসী, রক্তদুষ্টিতে অনন্তমূল বা তজ্জাতীয় কোন একটী দ্রব্যের অনুপান ব্যবস্থা করিতে হয়। এই শ্রেণীর অনুপানে মূল ঔষধ অপেক্ষাও অনেক সময় অনুপানের দ্রব্যে অধিক ফল হইয়া থাকে।

পাচন-চিকিৎসা—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আর একটী ভেষজ-সম্পদ পাচন চিকিৎসা। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বৌষধেষু পাচনমৃষিভিঃ শ্রেষ্ঠ মুচ্যতে।
যতো ব্যাধি প্রপীড়িতং স্বস্থং করোতি সত্বরম্॥"

অর্থাৎ—রোগীরা পাচন সেবন করিলে যেমন সত্বর স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে, অন্যান্য ঔষধে তত শীঘ্র ফল প্রাপ্ত হয় না, তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মুনিগণ বটিকাদি সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা পাচনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার কারণ—প্রত্যেকটী পাচন দ্রব্য-বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পাচন সেবনে রোগীরা যে সত্বর দ্রুত স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিয়া থাকে, ইহা চিকিৎসকমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আগেকার চিকিৎসকদের মধ্যে এই পাচনের প্রচলন যেমন বিশেষ ভাবেই ছিল, এখনকার চিকিৎসকদের মধ্যে উহার ব্যবহার তেমনই হ্রাস পাইতে বসিয়াছে। অনেক গৃহস্থ এখন পাচন প্রস্তুতের ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে চাহেন না, ফলে বাধ্য হইয়া চিকিৎসকেরাও আর পাচনের ব্যবস্থা করেন না। অথচ দরিদ্র বাঙ্গালা দেশে পাচন চিকিৎসার অধিক প্রচলন হইলে সর্ব্বরোগে অতি শীঘ্র সুফল পাওয়া তো যায়ই, স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসাও করা যাইতে পারে। পূর্ব্বের মত পাচন চিকিৎসার যাহাতে বহুলভাবে প্রবর্ত্তন হয় চিকিৎসকেরা যদি তৎপ্রতি আগ্রহান্বিত হন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উৎকর্ষ হইবে—দরিদ্র দেশবাসীরও যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে।

ভেষজ-মীমাংসা এখানে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'অষ্টবর্গ' প্রভৃতি যে সকল বনৌষধির নাম পাওয়া যায় তাহা চিনিবার কি উপায় নাই? যে পুষ্কর মূল ও করক মূলের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, দুঃখের বিষয় তাহাও আমরা চিনি না। এই সকল বনৌষধির পরিচয় না জানা থাকায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ভারতের নিজস্ব সম্পদ এই সকল বনৌষধি সংগ্রহের আমরা কোনরূপ চেষ্টাই করি না। অথচ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া কত লোক ভারত হইতে ভেষজ সংগ্রহ করিয়া ও তাহার গুণাগুণের সন্ধান লইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া ঐ সকল সংগৃহীত দ্রব্য হইতে তাঁহাদের ভেষজ ভাণ্ডারই যে কেবল পূর্ণ করিতেছেন তাহা নহে, মানবকল্যাণে তাহা নিয়োজিত করিয়া জগতের শ্রদ্ধাও অর্জ্জন করিতেছেন।

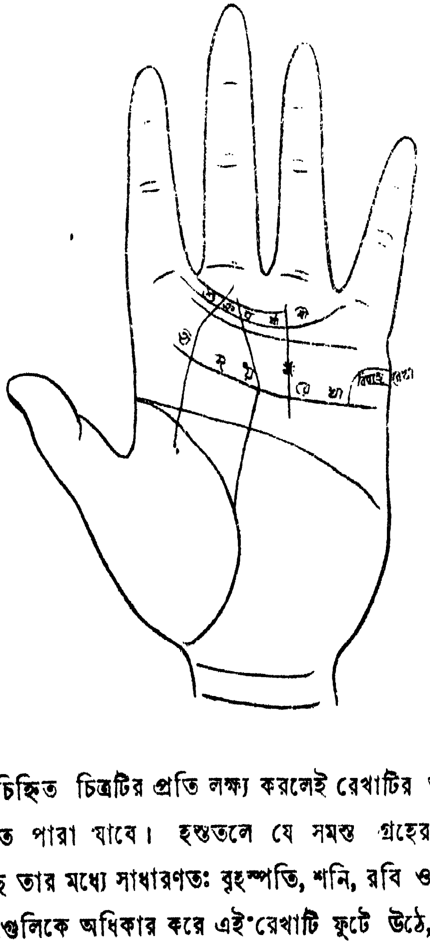
যাক্, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখনও সময় আছে। আয়ুর্ব্বেদের এই দ্রব্য বিজ্ঞানকে তাহার পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তিনটী জিনিষের প্রয়োজন। প্রথম হইতেছে—একটী আদর্শ ভৈষজ্যোদ্যান স্থাপন, দ্বিতীয় হইতেছে—একটী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ও তৃতীয় হইতেছে—দ্রব্য-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য চাই, কতিপয় অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসক ও ছাত্র। ইঁহারা মহর্ষি আত্রেয়ের এই মহামূল্য উপদেশ—

"চিকিৎসা বিষয়ে আমি যাহা বলিলাম তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে, উহা ভিন্ন যেখানে যাহা নূতন উপদেশ পাইবে—তাহাই গ্রহণ করিবে"—এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রয়োজন হইলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তা লইয়া যদি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে দ্রব্য-বিজ্ঞানের যথার্থ উন্নতি সম্ভব হইতে পারে।

শুক্রবন্ধনী

শ্রীতিলক

হস্ততলের মধ্যে প্রধান তিন চারটি রেখা ছাড়া যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা থাকে "শুক্রবন্ধনী" তাহাদের মধ্যে একটি রেখা। এই রেখাটি সকল লোকের হাতে দেখতে পাওয়া যায় না—হাতের তালুতে এই রেখাটি থাকলে, সামুদ্রিক শাস্ত্র লিখিত এব অর্থগুলি মানুষের জীবনে প্রকাশ পায় না।



চিহ্নিত চিত্রটির প্রতি লক্ষ্য করলেই রেখাটির আকার বুঝতে পারা যাবে। হস্ততলে যে সমস্ত গ্রহের ক্ষেত্র আছে তার মধ্যে সাধারণতঃ বৃহস্পতি, শনি, রবি ও বুধের ক্ষেত্রগুলিকে অধিকার করে এই রেখাটি ফুটে উঠে, কিন্তু তাই ব'লে যে এই রেখাটি থেকে ঐ সমস্ত গ্রহগুলির অর্থ মানুষের জীবনে বিশেষ করে প্রকাশ পাবে তা নয়। ইহারই নীচে যে অপেক্ষাকৃত লম্বা একটি রেখা আছে 'শুক্রবন্ধনী" ঐ রেখাটির বাহ্যিক গুণাগুণ প্রকাশ করে। নীচের দীর্ঘ রেখাটিকে "হৃদয়-রেখা' বলা হয়েছে। এবং তারই উপরে চাপের মত বক্র শুক্রবন্ধনী রেখা হৃদয়ের কতকগুলি বিচিত্র ভাবকে প্রকাশ করে, উক্ত স্থান অধিকার করেছে।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য হস্তরেখাবিদ্‌গণ 'শুক্রবন্ধনী'র নানারকম অর্থ করেছেন কিন্তু ইহার যে আর একটা অর্থ আছে তা কেউ বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই।

St. Germain, Cheiro, প্রভৃতি পাশ্চাত্য কর-জ্যোতির্বিদগণের একই মত। কেউ বলেছেন যে এই রেখাটি হাতে কার্ব্ব আঁকা থাকলে মানুষ অতিরিক্ত চিন্তাশীল, কবি, শিল্পী মূর্চ্ছারোগ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত হয়, কেহ বলেছেন এরূপ রেখা থাকলে চারিত্রিক পতন অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু সামুদ্রিক শাস্ত্রবিদ্‌গণের লিখিত বইএর একটি মাত্র বইএ পড়েছি—যদি এই রেখা অভগ্ন ও সুস্পষ্ট হয়, তবে মানুষের জীবনে উপর আত্মার দৃষ্টি থাকে। শুধু এই অর্থই আছে তা নয়, আরো অনেক প্রকার দোষ গুণ প্রকাশ করেছেন।

হাতের রেখা বিচার করবার সময় অনেক সময় শুক্র-বন্ধনীর অর্থও প্রকাশ করতে হয় কিন্তু এই রেখা যে চারিত্রিক পতন ও কোন একটা রোগের নির্দ্দেশকারক তা বোঝায় না। হয়ত তা হ'তে পারে, অথবা অন্যান্য রেখার ফলাফলের সামঞ্জস্যে ইহার প্রকৃত অর্থ ফলে না।

রেখাটির ফলে জাতকের মধ্যে, চিন্তাশীলতা, শিল্পবিদ্যা, কবিত্ব, কামনা প্রভৃতি লক্ষণগুলি বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত কারণগুলি কারো বাহ্যিক জীবনে প্রকাশ হয়, কারো ভিতরেই থেকে যায়। তাছাড়া এর থেকে জাতক স্নেহপ্রবণ, কাল্পনিকী চিন্তাশীল, স্পষ্টবাদী প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত হয়। কবিত্বশক্তি হয়ত এই রেখার একটা বিশেষ গুণ না হতেও পারে কারণ, আরো এমন কতকগুলি চিহ্ন হস্ততলে থাকে, যা'র থেকে কবি প্রতিভা জেগে উঠে।

শুক্রবন্ধনী রেখার আর একটা বিশেষ অর্থ আছে যা অনেকের হাত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। যার হাতে ইহা থাকে, তার জীবনে এমন একটা ঘটনা হয়ে থাকে — যার প্রভাবে হয় নিজেকে সমাজ চক্ষে বড় করে ফেলে অথবা একেবারে হীন হয়ে যায়। সচরাচর কোন একটা গভীর প্রেমের কারণই হয়, সে-প্রেম থেকে জাতক ভগবৎ প্রেম লাভ করতে পারে। রেখাটি যদি ভগ্ন হয় তবে কোন না কোন কারণ থেকে বাধা প্রাপ্তি বুঝতে হবে—অবশ্য তা ঐ রেখার প্রভাবের পথে। ঐ রেখা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখার দ্বারা কাটা যায়, তবে জানতে হবে যে—জাতক-জীবনে এমন কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকবে যার থেকে প্রেমের পথে বিলম্ব বা বিঘ্ন আসবে। ঐ রেখা যদি সম্পূর্ণ আঁকা না থাকে তবে জাতক-জীবন রেখাটির আয়ুকাল পর্য্যন্ত প্রভাবিত হবে ইত্যাদি নানারূপ অর্থও করতে পারা যায়।

উপরে যে গভীর প্রেমের কথা বলা হোল, তার প্রমাণও কিছু কিছু আছে শুক্র বন্ধনীর নীচে 'হৃদয় রেখা'র থেকে জাতকের হৃদয় বা মনের সুখ-দুঃখের পরিচয় পাওয়া যায়; প্রকৃত বিচার করতে গেলে দেখছি যে শুক্র বন্ধনী ঠিক্ হৃদয়-রেখার উপরে ধনুর আকারে হৃদয়ের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল এবং বুধের স্থানে বিবাহ-রেখার অব্যবহিত পরেই তার আরম্ভ; সুতরাং ইহা হৃদয়-রেখার অংশ বা দ্বিতীয় হৃদয়-রেখা হবে না কেন? সামুদ্রিক শাস্ত্রকারেরা হৃদয়-রেখা ও অন্যান্য দরকারী রেখাগুলির একার্থবোধক রেখার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু প্রায়ই তা কোন জাতকের হাতে দেখতে পাওয়া যায় না যখন, তখন শুক্র বন্ধনীকে সম-হৃদয়-রেখা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ জাতকের হৃদয়ের সঙ্গে যে-হৃদয় প্রেমের দ্বারা মিলিত হয়, তারই চিহ্ন উক্ত 'শুক্রবন্ধনী' রেখাকে বলা যেতে পারে।

আশার ভেলায়

শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

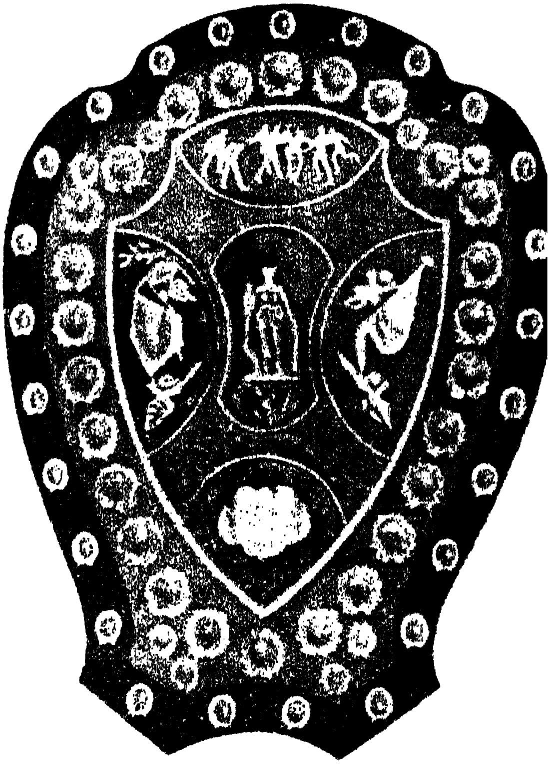
উষার আলোক-যানে
আমার দুয়ারে নিতি বিরহ আসে,
রাতের প্রদীপ কাঁদে
নয়ন মুদিয়া ভোরে শিয়র-পাশে!
রবির ব্যাকুল দিঠি
তোমারি খোঁজেতে হেথা ঘুরিয়া মরে!
কেতকী জাগিয়া দেখে
ভ্রমর নাহি যে তা'র সাজানো ঘরে!

উদাসী ঘুঘুর ডাকে
কোথায় চলিয়া যায় এ-মন ভেসে!
একটী দিনের কথা
স্মরণ-দুয়ারে করে আঘাত এসে!
মোরে যা কহিয়াছিলে
প্রথম পরশ-ভীরু-চাহনি দেখে—
সাগর পারেতে গিয়া
কেমনে মুছিলে তাহা স্মরণ থেকে?

হয় তো সেথায় আছো
হরিণ-নয়না ল'য়ে সুখ-বিলাসে,
একটী কিশোরী হেথা
আশার ভেলায় দুখ-সাগরে ভাসে!



শীল্ড্-কথা — ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয় আই-এফ্-এ। শীল্ড-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে। এই বৎসর লইয়া প্রতিযোগিতা হইয়া গেল ৩৬ বৎসর। ইহার মধ্যে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের শেষ গণ্ডীর খেলায় রেফরীগিরির দোষ ধরিয়া খেলায় নিযুক্ত দুই দলই খেলিতে অস্বীকৃত হয়। সেই গণ্ডগোলের কারণে সে বৎসরে কর্ম্মকর্ত্তারা অনন্যোপায় হইয়া, "খেলা হইল না" বলিয়া ইস্তাহার জারি করেন। অতএব মোট ৪৫ বারের মধ্যে সামরিক দল জয়ী হইয়াছে ৩২ বার। অসামরিক দল জয়লাভ করিয়াছে মাত্র ১৩ বার। শিল্ডে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব সর্ব্ব-প্রথমে দেখায় চিনসুরা সংযুক্ত হেয়ার স্পোর্টিং, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। সে যুগ 'বাঘা-ভাল্লুকে'র যুগ। কলিকাতার ফুট্‌বল খেলার ধরণে তখন ইংলণ্ডও চমৎকৃত। হেয়ার স্পোর্টিংয়ের অমিততেজে অদম্য ইয়োরোপীয় দল সন্ত্রস্ত — বিশেষ সাবধানতার সহিত এই হেয়ার-স্পোর্টিংকে দাবাইয়া রাখিবার উপায় উদ্ভাবনে তাহারা নিযুক্ত। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লীগ প্রতিযোগিতা আপনাদের মধ্যে আরম্ভ করাইয়া দিয়া হেয়ার স্পোর্টিংয়ের অগ্রগতি রুদ্ধকরণের উপায় হইয়া যায়। হেয়ার স্পোর্টিংয়ের গতির পথে এই ভীষণ বাধার সৃষ্টি হইলেও 'শেষ কামড়' হেয়ার স্পোর্টিং দেয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে—শীল্ডে শ্রেষ্ঠ দলগুলিকে একে একে পরাজিত করিয়া। সে বৎসরের শীল্ড-জয়ী ডাল্‌হাউসী শেষ-পূর্ব্ব গণ্ডীতে কোনও প্রকারে 'হাত ফস্কাইয়া' যায়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মোহনবাগান পূর্ণাহুতি দান করিয়া সর্ব্বজয়ী হয়। বাঙালীর ভয়ে ইয়োরোপীয় ফুট্‌বলের দুরবস্থা আরম্ভ হয় সঙ্গে সঙ্গে। আট বৎসর পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কুমারটুলি 'ঝাঁকানি' দেয় আবার ভীষণভাবে। শেষ গণ্ডীর খেলায় 'বিদেশী' ব্ল্যাক্‌ওয়াচ্ কর্ত্তৃক তাহারা পরাজিত হয় ২-১ গোলে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মোহনবাগান ধাওয়া করে আবার সতেজে—শেষ গণ্ডীর খেলায় পরাজিত হয় কিন্তু ক্যালকাটার হাতে। ইহার পরে দেশীয়ের সাফল্য অর্জ্জিত হয় মোহামেডনের দৌলতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। ৪৫ বৎসরের মধ্যে অসামরিক দলের মাত্র ১৩ বার 'বাজি মারার' কথা মনে রাখিয়া শীল্ডে



আই-এফ্-এ শীল্ড্

সামরিকদলের জয় হইয়াছে ৩২ বার, অসামরিকদলের মাত্র ১৩ বার

বাঙালীর এই কৃতিত্ব অল্প বলা বোধ হয় যায় না। না যাইলেও ১৮৯২ ও ১৯৩৮এর ফুট্‌বল্ খেলার উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে

পাওয়া যায় কত উচ্চ হইতে কত নিম্নে খেলা পড়িয়া গিয়াছে।

দায়ী কে ? — খেলার এই ভীষণ অবনতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী, 'ক্যালকাটা ফুটবল্ লীগ্'—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়া দিয়াছি। বিলাতের অনুকরণে পরিচালিত এই লীগ-খেলা, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খেলোয়াড়দের পক্ষে যে কত অনিষ্টকর, খেলার অতিরিক্ত পরিশ্রমে খেলোয়াড়েরা কত শীঘ্র কি ভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'লীগের বাহিরে বসিয়া থাকা' হেয়ার স্পোর্টিং তাহা 'চ'খে আঙ্গুল' দিয়া দেখাইয়া দেয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লীগের বাহিরের মোহনবাগানের অভূতপূর্ব্ব জয়ের ভিতরের কথাও ওই। আর বাহিরের সামরিক শক্তি কাহারও নাই। এ অবস্থায় আমাদিগকে 'নীল বানাইয়া', 'ব্লু রিবাণ্ড' অপরে কাড়িয়া ত' লইবেই। কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে না! এ দুরবস্থা ঘুচাইতে হইলে ঢালিয়া সাজিতে হইবে আই-এফ্ একে। খেলাধূলায় অভিজ্ঞ পাকা লোক লইয়া কাউন্সিল্ গড়িতে হইবে, লীগ্ খেলার রকম বদলাইয়া দিতে হইবে, ভাড়াটিয়া খেলোয়াড় দূর করিয়া দিতে হইবে আর উঠ্তি খেলোয়াড় সম্বন্ধে চলিতে হইবে, রাশ টানিয়া। দুই দিনে 'মুরুব্বি বনিয়া' আখের সে না খোয়ায়—দৃষ্টি রাখিতে হইবে সেইদিকে। পাকা লোক রাখিয়া খেলাধূলার কায়দা-করণ নূতন খেলোয়াড়কে শিখাইবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে যথোচিতভাবে।



গত বৎসরের শীল্ড বিজয়ী—'ফিল্ডব্রিগেড্'

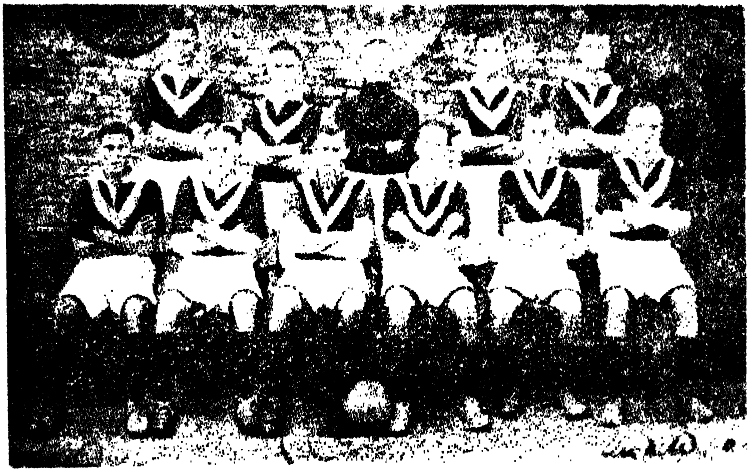
আরও কথা—ইয়োরোপীয়ন্ ফুট্বলের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে লীগ-তালিকায় ক্যাল্কাটা ও স্থানীয় দুইটী সামরিক দল অধিকৃত স্থান হইতে সকলেরই তাহা বোধগম্য হইয়াছে। মহাযুদ্ধের সময়ে খেলা-ধূলায় সামরিক দলের শক্তি হ্রাস হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু এতদিনে তাহাদিগের তাহা হইতে সামলাইয়া উঠাও খুব স্বাভাবিক। তাহা কিন্তু হয় নাই, কেন তাহাদের লম্বা চওড়া বোড আছে বুঝুক। ইয়োরোপীয় অসামরিক দলের অবস্থা কিন্তু এত শোচনীয় হইল কি করিয়া! লীগে দাপাদাপিকরা একটা কারণ বটে। খেলিতে খেলিতে, খেলার দোষ-ঘাট যাহা ধরা পড়ে, 'নেট্ প্র্যাক্টিসে' তাহা শোধ্রাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা না থাকাও আর একটা মোক্ষম কারণ। 'ক্যাল্কাটা'র দৌলতে 'ইণ্টার - ন্যাশানাল'ও ভার্সিটি' খেলোয়াড় আমদানি করানর রেওয়াজ পূর্ব্বে ছিল। কয়েক বৎসর হইতে তাহা আর হইতেছে না—'দমে ভারী' হওয়ার সুযোগ এদিক হইতেও সুতরাং নাই। এত কথা বলার কারণ ইয়োরোপীয় খেলার উন্নতি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যে খুবই। শক্তিমান প্রতিপক্ষ না থাকিলে অপর পক্ষের 'ধাতে' থাকা কঠিন যে! এত কথা বলিবার পরেও কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের যুগ

দলের শীল্ডে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখাইবারও সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহাতে। 'গোদের উপর বিষফোড়া' উঠিয়াছে, আই-এফ্-এর নিত্য নানাবিধ হুজুগে। তাহার উপর আছে দলে ভাড়াটিয়া খেলোয়াড় নিযুক্ত করার 'আহাম্মকি' এবং কতকগুলি 'স্পোর্টস্' পত্রিকা বা 'সুভেনার' বলিয়া প্রকাশিত 'ছবি ছাপা'র তাহা লইয়া দালালী। দুই একবার বল লইয়া 'চোঁ চাঁ' দৌড় কেহ দিতে পারিলেই সে হইয়া যায় ইহাদের দৌলতে 'ষ্টার'। আবার কতকগুলা লাইন সাজাইয়া তাহা ছাপাইয়া তাহার নাম দেওয়া হয় ইতিহাস। এ দুয়েরই অনিষ্টকারিতা কত অধিক—বলিয়া শেষ করা যায় না। চলিবার মধ্যে চলিতেছে হৈ-হৈ—আসলের দিকে দৃষ্টি দিবার মতি বা

বুঝি আসিতেছে। কাষ্টমস্, পুলিশ ও ই, বি, আরের এ বৎসরের লীগে ক্রীড়া-কুশলতা তাহার আভাষ।

শীল্ডের খেলা—খেলা যে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা নরম হইবে, খেলার পূর্ব্বে বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে নাই। তাহার উপর 'যা-তা' দল প্রতিযোগীরূপে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ভাল খেলা হওয়ার আশা আরও কমিয়া যায়। এই অবস্থাতেও চক্ষুষ্মান্ কিন্তু দেখিতে পাইবেন 'ভাড়া করা' খেলোয়াড় অপেক্ষা দলের নিজস্ব খেলোয়াড় অনেক বেশী কার্য্যকরী। শিল্ড-অভিযানে জর্জ্জ টেলিগ্রাফ্ ও হাওড়া ইউনিয়নের ব্যাপার তাহা ভাল করিয়াই দেখাইয়া দিয়াছে। অবুঝের বুঝ হইবে নাকি ইহাতেও! আর এক কথা 'সিনিয়র' দল বলিয়া যে সকল দল খ্যাত তাহাদের অনেকের অপেক্ষা কোনও কোনও 'জুনিয়র' দল অনেক অধিক শক্তিশালী শীল্ড-খেলার দৌলতে তাহাও অনেকে দেখিতে পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগ লীগ্ হইতে প্রথম বিভাগে আসিয়াই মোহামেডনের লীগ্-চ্যাম্পিয়ন্ হওয়া, গত বৎসরে ভবানীপুরের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করা এবং এ বৎসরে পুলিসের রৈ-রৈ করিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করা, ভাল করিয়াই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে একটা আবরণ ঢাকা থাকায় অনেকেরই 'সিনিয়রত্ব' বজায় আছে। জায়েণ্ট কিলার (Giant Killer) বলিয়া কথাটা কাগজে চাপা দিলেও—হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে—জায়েণ্ট কে? এ বারের শিল্ড-খেলার সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার শ্যামশায়ার কর্ত্তৃক পুলিশের ৫-১ গোলে পরাজিত হওয়া। শেষ-পূর্ব্ব-গণ্ডীতে মোহামেডনের কাষ্টমস্‌কে ৪ গোলে পরাজিত করাও আশ্চর্য্যজনক। কাষ্টম্‌সের পুরা দল না থাকাতেও, জয়াঙ্ক খুব বেশী—দুই দলের মধ্যে পার্থক্য এমন নহে যে এমনটা ঘটে। মোহামেডনের প্রথম গোল আগ্‌সাজ (offside) দোষে দূষিত অনেকের অভিমত। দ্বিতীয় গোল হয় ফাঁক মারে (penalty) তাহার পরে কাষ্টমসের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রেবেলোর সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্তি ও খেলায় কাষ্টম্‌সের হাল ছাড়িয়া দেওয়া। এ খেলাও সুতরাং ১৯৩৮-এর শিল্ডের অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইবে।

শীল্ড-বিজয়ী—শেষ-গণ্ডীর খেলায় মোহামেডন সহজেই 'ইষ্টইয়র্ককে মারিয়া দিবে' অনেকের মনে হইয়াছিল। সে মনে হওয়ার অপরাধও বিশেষ ছিল না। শেষ-পূর্ব্ব-গণ্ডী পর্য্যন্ত ইষ্টইয়র্ক শীল্ড-বিজয়ী হইবার মত খেলা কিছু দেখাইতে পারে নাই। তাহারাই মোহামেডনের বিরুদ্ধে দুই দিন যুঝিয়া অবশেষে তৃতীয় দিনে ২ গোলে জয়ী হইয়াছে—কেবল জয়ী হয় নাই, এই মোহামেডন যে পাঁচবার লীগ-বিজয়ী শেষ দিনের খেলায় তাহার কোন আভাষই পাওয়া যায় নাই, এমনভাবে তাহাদিগকে বিজয়ী দল খেলাইয়াছে। কলিকাতা হইতে শীল্ড আর একবার বাহিরে চলিয়া যাওয়া আফ্‌শোষের কথা হইলেও অপেক্ষাকৃত ভাল খেলা খেলিয়া তাহারা যে শীল্ড-জয়ী হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।



ইষ্ট ইয়র্কস্—১৯৩৮-এর শীল্ড বিজয়ী

খয়রাতি খেলা—শীল্ড প্রতিযোগীদিগের মধ্য হইতে বাছা দুই দলের—'স্থানীয়' ও 'সমাগত'—বার্ষিক খয়রাতী খেলায় স্থানীয় দল ২-১ গোলে জয়ী হইয়াছে। খেলা খুবই নিম্নস্তরের হইয়াছিল। খেলোয়াড় বাছাই

খামখেয়ালীভাবে হওয়াতেই এইরূপ হয়। 'খয়রাত'ও সুবিধাজনক হয় নাই, কর্ত্তাদের এই দোষে।

অষ্ট্রেলিয়ায় আই-এফ-এ—এই অভিযান আই-এফ-এর হুজুগপ্রিয়তার আর একটি নিদর্শন ভিন্ন আর কিছু নহে। খড়িকা পরিমাণ উপকারও এখানকার ফুটবলের ইহাতে হইবে না। 'ভাড়া করা' খেলোয়াড় যাহাদের আনাইতে হয়, স্থানীয় খেলোয়াড় তৈয়ারী করাইতে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে যাহারা কুণ্ঠিত, দশের সম্মুখে তাহারা এ প্রকার কার্য্য ক'রে কেমন করিয়া! দুই কাণকাটা বা ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্ধ ভিন্ন অন্যের দ্বারা ত' ইহা সম্ভবে না! লজ্জাহীনতা বা অন্ধত্ব বাড়িয়া যাইতেছে যে ভাবে তাহাতে সাধারণের পক্ষ হইতে ইহার ঘোর প্রতিবাদ হওয়া উচিৎ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ব্যাপারের পরে এ সম্বন্ধে নীরব থাকা সমীচিন নহে কাহারও পক্ষে কিছুতেই। আই-এফ-এর অন্তর্ভুক্ত দলগুলি যেন একথা ভাবিয়া দেখেন।



নেতা—আব্বাস

শীল্ডে মোহামেডানের



বড় রসীদ

ট্রেড্‌স্ কাপ—এই প্রতিযোগিতা শীল্ড প্রতিযোগিতা অপেক্ষা অধিক পুরাতন এবং এই প্রতিযোগিতাই কলিকাতার, কলিকাতার কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আদি প্রতিযোগিতা। পূর্ব্বে ট্রেড্‌স্ কাপ জয়ীর সমাদরের অবধি থাকিত না। তখনকার ট্রেড্‌স্ কাপে যে ধরণের খেলা হইয়া গিয়াছে, ১৯১১র পর হইতে শীল্ডে সে ভাবের খেলার ধারেও পৌঁছাইতে কেহ পারে নাই এবং এখনও পারিতেছে না। ট্রেড্‌স্-বিজয়ী ন্যাশন্যাল বা মোহনবাগানের তুল্য শক্তিশালী দল এখনকার শীল্ডে আছে কিনা সন্দেহ—দুই যুগের খেলা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, একবাক্যে বলিবেন। এখন পা নাড়িতে শিখিয়াই সকলের 'আস্থা' শীল্ডে পা ছুঁড়িতে। আমাদের মনে হয়, কলিকাতার জর্জ্জ টেলিগ্রাফের ন্যায় পুরা দল এবং মফঃস্বলের শক্তিশালী দলগুলির ট্রেড্‌স্-কাপ প্রতিযোগিতার প্রতিই লক্ষ্য থাকা উচিৎ। এমন কি শীল্ডে গোরার দল ভরিয়া না দিয়া আই-এফ-এর উচিৎ কতক দল ট্রেডস্-কাপে 'চারাইয়া' দেওয়া। ইহা করিলে কলিকাতার 'পড়িয়া যাওয়া' খেলার সমস্যা সাধনে বিশেষ সাহায্য করা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কোচবেহার কাপ—দেশীয় দলের শক্তি-পরীক্ষার জন্যই এই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। দেশীয় শীল্ড খেলোয়াড়েরাও এই প্রতিযোগিতায় খেলিয়া প্রতিযোগিতার শক্তি বৃদ্ধি পূর্ব্বে করিয়াছে সুতরাং ট্রেড্‌স্-কাপ অপেক্ষাও 'কোচবেহারের' খেলা তখন হইত অনেক ভাল। 'কোচবেহারে' হেয়ার স্পোর্টিং ও ন্যাশন্যালের খেলা দেখিতে সহর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—দুই দলের মধ্যে খেলার মীমাংসা হইতে একবার লাগে চারিদিন। ভাদুড়ী পঞ্চ সহোদরের আগারীর সাজে মোহনবাগানের পক্ষে একবার খেলাও উত্তেজনার সৃষ্টি অল্প করে নাই। বাঙালী যত বড় খেলোয়াড়ই হউক না কেন কোচবেহারে শক্তির পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে দর্শকের চক্ষে ভাল খেলোয়াড়ের পূর্ণ সম্মান সে পায় নাই। লীগ ও শীল্ড 'ধুরন্ধরদের' অনেকেই এখন 'ভাড়া করা', কোচবেহারে সুতরাং তাহাদের দর্শন পাওয়া কঠিন। অনেকে আবার এ প্রতিযোগিতায় 'পাশ কাটায়' ধরা পড়িবার ভয়ে 'সিনিয়রত্ব' বজায় রাখিবার ফিকিরে। কোচবেহার-কাপ প্রতিযোগিতা এখন সুতরাং আর সে উচ্চাঙ্গের প্রতিযোগিতা নহে। হইবেই যদি সমস্যা কি এত ঘোরাল হইতে পায়! 'পড়িয়া যাওয়া' খেলা 'তুলিতে' হইলে পূর্ব্বভাব আনিতে হইবে, উপরন্তু মফঃস্বলের বাছাই দলগুলিকে ইহাতে যোগদান করাইতে হইবে।

ইলিয়ট শীল্ড—ইয়োরোপের বড় দলের খেলোয়াড় যোগান দেয়, ইউনিভার্সিটী, স্কুল ও কলেজ। ইলিয়ট শীল্ডও এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় সেই উদ্দেশ্যে। আমাদের 'গোদা' দলপতিদের কিন্তু স্কুল কলেজের দিকে দৃষ্টি নাই। 'পরদেশী' প্রেমবন্যায় তাহারা ভাসমান। 'ঘরের ছেলের' কদর ত' তাহারা করিবে না—এ অবস্থায় সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হওয়াই স্বাভাবিক, হইতেছেও।

চতুর্থ টেষ্ট—চতুর্থ টেষ্টে জয়ী হইয়াছে অষ্ট্রেলিয়া, দ্বিতীয় দফার খেলায় পাঁচজনকে না খেলাইয়া। অষ্ট্রেলিয়ার এই জয় প্রধানতঃ বলন্দাজদের দৌলতেই। ইংলণ্ডের পক্ষে বলন্দাজী প্রথম দফায় 'সারেমাতে' হইলেও দ্বিতীয় দফায় উৎকর্ষতা লাভ করে এবং ইংলণ্ড নামিয়া যায় মাত্র ১২৩ মার দৌড় দিয়া। প্রথম দফার ব্যাটস্‌ম্যানীতে ইংলণ্ডের নেতা হ্যামণ্ডের ৭৬ ব্যতীত অন্য কেহ দুই দফার এক দফাতেও অষ্ট্রেলিয়ার বলন্দাজীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে



ফ্লিট্‌উড স্মিথ
(চতুর্থ টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়ার সেরা বলন্দাজ)



'এ্যাসেজ' (Ashes)—ইহারই জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে



চিপারফিল্ড—
(অষ্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত খেলোয়াড়)

ততটাও হয় নাই। অন্য পক্ষে প্রথম দফায় অষ্ট্রেলিয়ার বলন্দাজী অপেক্ষা তাহাদের দ্বিতীয় দফার বলন্দাজী



(ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান (অষ্ট্রেলিয়ার নেতা) চতুর্থ টেষ্ট-জয়ে আনন্দ-অভিবাদন)

নাই। অন্য পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার নেতা ব্র্যাডম্যান এবং তাঁহার দলের বার্ণেট প্রথম দফায় করে যথাক্রমে ১০৩ ও ৫৭। দ্বিতীয় দফায় তাহাদের পাঁচজন খেলিয়াই বাজিমাত করে। দ্বিতীয় দফার বলন্দাজীতে অষ্ট্রেলিয়ার ও-র‍্যালী ও ফ্লিট্‌উড স্মিথের কৃতিত্বই বাজিমাতে সাহায্য করে বিশেষ ভাবে। দুই দলের মার দৌড়ের সংখ্যা এইরূপ :—

ইংলণ্ড—২২৩, ১২৩
অষ্ট্রেলিয়া—২৪২, ১০৭ (৫ জনে)

পঞ্চম টেষ্টের জয় পরাজয়ের অপেক্ষা না করিয়াই অষ্ট্রেলিয়া 'এ্যাসেজ' রক্ষাকারী বলিয়া পরিগণিত। পঞ্চম টেষ্টে ইংলণ্ড জয়ী হইলেও অন্য কারণে অষ্ট্রেলিয়া ১৯৩৮-এর 'টেষ্ট চ্যাম্পিয়ন' হওয়া উচিৎ কিনা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বৃষ্টির জন্য তৃতীয় টেষ্ট বন্ধ থাকায় এভাবে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী সাব্যস্ত হওয়া ইংলণ্ডের পক্ষে কঠোর ব্যবস্থা, স্বীকার করিতেই হইবে।

মানভাদার হকিদল — নিউজিল্যাণ্ডে 'টেষ্টের' পূর্ব্বে নয়টী খেলাতেই মানভাদার জয়ী হইয়াছে। এই সকল খেলায় তাহাদের স্বপক্ষে হয় ৫৭টী গোল,

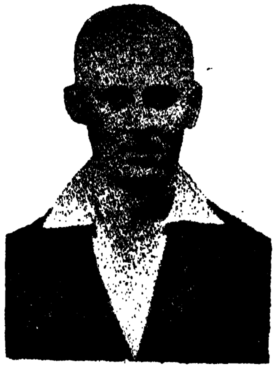


হ্যামণ্ড

(ইংলণ্ডের নেতা)



ভেরিটি

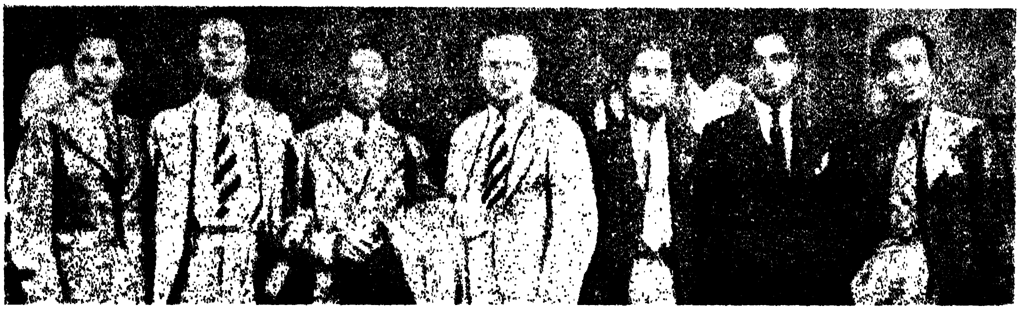


এমিস্

(ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত খেলোয়াড়দ্বয়)

বিপক্ষে হয় মাত্র চারিটী গোল। এ পর্য্যন্ত খেলা, দুইটী 'টেষ্টে'ও তাহারা স্বচ্ছন্দে জয়লাভ করিয়াছে।

ডেভিস্ কাপে ভারতবর্ষ—ভারত টেনিস-বাহিনী প্রথম ধাপেই পরাজিত হইয়াছে বেলজিয়মের কাছে। সিঙ্গল্‌সে গৌস মহম্মদ অবশ্য পরাজিত করে নেয়ার্টকে। শোনি কিন্তু পরাজিত হয় ল্যাক্রয়েক্সের



ডেভিস্ কাপে পরাজিত ভারতীয় টেনিস্‌বাহিনী

হস্তে। 'ডবল্‌সে' গৌস্ মহম্মদ ও শোনি পরাজিত হয় বোর্‌মান ও ল্যাক্রয়েক্স কর্ত্তৃক। 'সিঙ্গল্‌সের' খেলা উভয় পক্ষের ১—১ হইলেও 'ডবল্‌সে' ভারতবর্ষের পরাজয়ে মোটের উপর জয়ী হয় বেলজিয়ম্। টেনিসে ভারতবর্ষের এই প্রথম অভিযানের ফল একেবারে নৈরাশ্যজনক বলিতে পারা যায় না।

খেলায় 'চোরাগোপ্তা'—কলিকাতার ফুটবল খেলা নীরেস হইতেছে যত, খেলোয়াড়েরা চোরাগোপ্তায় (Foul) পোক্ত হইতেছে তত। চোরাগোপ্তার দৃষ্টান্ত এ বৎসরে পাওয়া গিয়াছে অনেক। 'বিপজ্জনক' খেলার ধরণও আরম্ভ হইয়াছে বেশ। আই-এফ্-এ ইহা নিবারণে সচেষ্ট যদি না হয় বা চেষ্টা করিয়াও ইহা নিবারণ করিতে যদি না পারে, সাধারণের পক্ষ হইতে ধর্ম্মাধিকরণে এ সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত যদি কেহ পরে করে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। এই সূত্রে আর্গাইলের টমসনের শোচনীয় মৃত্যুর কথা উল্লেখ না করিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না। কাহারও অবৈধ খেলার জন্য অবশ্য এ দুর্ঘটনা ঘটে নাই, ইহাই সৌভাগ্যের কথা। 'বিপজ্জনক' খেলার ধরণে যে ইহা ঘটিয়াছে তাহারও কোন প্রমাণ-নাই। তবে আঘাত পাইয়াছিল যে হতভাগ্য ভীষণ ভাবে সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নাই। ইহাও যাহাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে সে বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। উপযুক্ত 'কড়া' নির্দ্দেশক (Referee) নিযুক্ত করিয়া তাহার বিচারের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ কেহ না করে তাহার ব্যবস্থা হইলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

জার্ম্মানীর "ন্যাপোলা" বিদ্যালয়—

জার্ম্মানীতে 'ন্যাপোলা' বোর্ডিং স্কুলের সংখ্যা এখন পনের। ষ্টেটের ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত শিক্ষাসংসদ কর্ত্তৃক এই সকল বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। প্রথম 'ন্যাপোলা' স্থাপিত হয় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে—ফারারের জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া পরবর্ত্তী দুই বৎসরে আরও নয়টী বিদ্যালয় বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাইবার উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নিয়মানুবর্ত্তী করিবার কর্ত্তৃপক্ষের এই চেষ্টা। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে খেলা-ধূলা বিদ্যাশিক্ষার যেমন প্রধান অঙ্গ এই সকল বিদ্যালয়ে সামরিক কায়দা-কানুনের চর্চ্চা ও বিদ্যাশিক্ষার অন্তর্গত হইয়াছে সেইভাবে।



১৯৪২ সালের প্রস্তাবিত মহামেলার পরিকল্পনা পর্য্যবেক্ষণরত সিনর মুসোলিনী

স্থাপিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রাসিয়ার বাহিরে স্থাপিত হয় অনুরূপ আরও তিনটী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলি বালকদিগের জন্য।

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা 'একসাজে' (uniform) সজ্জিত। সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা তাহাদের অস্থিমজ্জাগত করিয়া দেওয়ার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি নিহিত। ছাত্রদিগকে যুদ্ধবিজ্ঞানে পোক্ত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে অবশ্য ইহা করা হয় না। সামরিক ভাবে চলাফেরা, সামরিক সঙ্গীতে অনুরক্তি ও সামরিক কায়দাকরণ জার্ম্মানবাসীর জাতীয়তার

ছাত্রদিগকে স্কুল-ড্রিল্ করান ব্যতীত সামরিক অস্ত্র কোনো বিশেষ শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া হয় না। প্যারেডে বন্দুক ঘাড়ে করানও হয় না। খেলার মাঠে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক ছাত্র মোটা তাগার মত একটা করিয়া রঙীন 'ব্যাণ্ড' হাতে পরে। প্রতিযোগিতায় পরস্পরের হারজিত হয় তাগার অবস্থা হইতে। তাগা অটুট রাখিতে পারিলে জিত আর প্রতিপক্ষ তাহা ছিঁড়িয়া দিতে পারিলেই হার। উত্তেজনা ও জয়োল্লাস ইহাতে যথেষ্ট—ফুটবল্ প্রভৃতি খেলা অপেক্ষা কোনও অংশে কম

নহে। খেলার সময় অপরাহ্ন ২টা হইতে ৪।৩০টা পর্য্যন্ত। প্রয়োজনানুযায়ী সময় বাড়াইয়া দেওয়া হয়। জিম্‌নাসিয়ম্‌ সাঁতারের স্থান আছে প্রত্যেক স্কুলেই। ছয়টী ঘোড়া, একখানি লরি, ২খানি চারি সিটার খোলা মোটর ও ৩ খানি মোটর সাইকেল প্রত্যেক স্কুলে রাখা হয়। কোনও স্কুল ক্যাম্পিং-এ যখন যায় এগুলি তখন সঙ্গে যায়—ক্যাম্প-স্পোর্টসের সরঞ্জাম রূপে। ক্যাম্প স্পোর্টস্‌-এ বক্সিং, ফেন্সিং, ফুট্‌বল্‌ প্রভৃতি খেলার চলন নাই।

মাধ্যমিক স্কুলের উপযোগী পাঠ্যতালিকা এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ছাত্রেরা রাজনীতি সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষালাভও এইখানে করে। 'বায়োলজি' শিক্ষাদান সম্বন্ধে এই সকল স্কুল্‌ বিশেষ মনোযোগী। স্কুল গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা নানাস্থানে যাইয়া ছাত্রেরা অভিজ্ঞতা লাভ যাহাতে করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও যথেষ্ট করা আছে। কৃষিক্ষেত্র, খনি বা ফ্যাক্টরী প্রভৃতি যে সকল স্থানে আছে তাহার কাছাকাছি তাহাদিগকে লইয়া ক্যাম্প করান হয়। ছাত্রদিগকে এই ভাবে শিক্ষাদান গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ বলাই বাহুল্য।

ন্যাপোলা ধরণের বিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা ইহারই মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যাওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষ ইহার খুবই পক্ষপাতী হইয়াছেন।

—সু-প্র-স

মাঞ্চুকো সীমান্তে রুষ-জাপান—

মাঞ্চুকো রাজ্যের সীমান্তে চ্যাং কু-ফেং একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের এক দিকে জাপ-প্রতিষ্ঠিত নবরাজ্য মাঞ্চুকো, অপর দিকে সোভিয়েট সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত। এই পাহাড়টী লইয়া রুষ-জাপানে সংঘর্ষ বাধিয়াছে, বড় রকমের একটা যুদ্ধের আব্‌হাওয়া এখনও সৃষ্টি হয় নাই। এমনি একটা তুচ্ছ সীমানা লইয়া পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ ঘটিয়াছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধ সহজে বাধিয়া উঠে না। ইতালী আবিসিনিয়া দখল করে, জার্ম্মানী সার ও অষ্ট্রিয়া অধিকার করিয়া লয়, জাপান চীন সাম্রাজ্যে অভিযান চালনা করে, পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিগুলি নিরুপায় হইয়া চাহিয়া দেখে, কেহ অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হয়না। এই অবস্থায় রুষ-জাপানে এ চ্যাং কু-ফেং লইয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা অল্পই। তথাপি ধ্যাপারটী সামান্য নয়। এই পাহাড়টীর আশেপাশে ছোটখাট অনেক সংঘর্ষ হইয়া গেল। জাপবাহিনী নিজেদের জয়গান গাহিয়াছে; রুষ-জাপানের পরাজয় ঘোষণা করিয়াছে। অবস্থার জটিলতা নিরাকরণ হয় না। জাপানের মতে তাহারা ১১টী ট্যাঙ্ক, কয়েকটী মেশিনগান দখল করিয়াছে এবং শত্রুপক্ষের ২০০ সেনা হতাহত করিয়াছে। রুষ দাবী করে—তাহারা ৪০০ জাপসেনা হত বা আহত করিয়াছে। আধুনিক যুদ্ধে জয় পরাজয়ের খবর মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু জাপানে যে ইহাতে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়। বিমান আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ৫ই আগষ্ট হইতে জাপানের সহরগুলিতে প্রয়োজন হইলে আলো স্তিমিত করিয়া দেওয়া বা নিবাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জাপান তবুও বলে, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ গত ৭ বৎসরে অন্ততঃ ৩০।৪০ বার হইয়া গিয়াছে এবং ইহা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে।

রয়টার বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছে, রুষ ও জাপানের মধ্যে মিটমাটের একটা কথা উঠিয়াছে। মিঃ শিগেমিৎসু রুষের পররাষ্ট্র সচিব লিট্‌ভিনফের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উভয় পক্ষই চ্যাং কু-ফেং পাহাড় হইতে সরিয়া যাইবেন। একটী কমিশন উভয় রাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত কেহই পুনরাক্রমণ করিবেন না। এ সকল প্রস্তাব সত্ত্বেও যুদ্ধের নিবৃত্তি হয় নাই। রুষের হাউট্‌জার কামান মাঞ্চুকোর কোজো জেলায় এখনও গোলাবর্ষণ করিতেছে। সংবাদ হইতে অনুমান হয়, এই কয়দিনের মধ্যে পাহাড়টী কখনও রুষ, কখনও জাপানের অধিকার রহিয়াছে।

বিলাতের বিশেষজ্ঞদের মতে চ্যাং কু-ফেং রুষ সীমানারই অন্তর্গত। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ বলেন—রুষ ও চীনের চুক্তি দ্বারা বহু পূর্ব্বেই পাহাড়টী তাহাদের অধিকারে বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং চুক্তির সাথে তদনুযায়ী একটী মানচিত্রও তৈয়ারী হইয়াছিল। তাহা হইতেও রুষের অধিকারই স্বীকৃত হয়।

জাপান এ দাবী মানিতে রাজী নয়। চীন-অভিযানে ব্যাপৃত থাকায় জাপানের সুর অনেক পরিমাণে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, রুষের মত একটী শক্তির সহিত বর্ত্তমান অবস্থায় সে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে চাহে না। রুষেরও যুদ্ধের ইচ্ছা প্রবল নহে। সুতরাং মিটমাটের আশা করা যায়।

লর্ড রান্‌ফিম্যানের দৌত্য—

চেকোশ্লোভেকিয়ার সুদেতেন জার্ম্মানদের দাবী সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের দৌত্য লইয়া লর্ড রান্‌ফিম্যান্ প্রাগে গিয়াছেন। এই দৌত্য সফল হইলে জার্ম্মানী এবং চেক রাজ্যের একটা জটিল সমস্যার নিরাকরণ হইবে। সুদেতেন জার্ম্মানগণ ও চেক কর্ত্তৃপক্ষ এই মধ্যস্থতায় রাজী হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট লর্ড রান্‌ফিম্যানকে পাঠান নাই। অন্ততঃ প্রকাশ্যে তাহাই ঘোষিত হইয়াছে। বিবদমান পক্ষ দুইটী এ কথা মানিয়া লইলে মধ্যস্থতার কোন অর্থই হয়না। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায়, উভয় পক্ষই জানেন যে, বৃটেনের ঘোষণা সত্ত্বেও তাহারই ভবিষ্যৎ-নীতি ইহার ভিতরে লুপ্ত আছে। সম্ভবতঃ, প্রয়োজন হইলে, বৃটেন এই মধ্যস্থতা সমর্থন করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলী নির্দ্ধারণেও বিমুখ হইবে না।

সুদেতেন জার্ম্মানদের সমস্যা মিটমাট না হওয়া পর্য্যন্ত ইউরোপের কেন্দ্র হইতে একটা আকস্মিক বিপদ্‌পাতের সম্ভাবনা দূরীভূত হইবে না। বৃটেন ভার্সেলিস্ চুক্তি সমর্থন করিলেও, দেখা যাইতেছে এখন সে সুদেতেন্ প্রদেশ জার্ম্মানীতে ফিরাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী নতুবা হিট্‌লারের অষ্ট্রিয়া অভিযানের পুনরভিনয় চোকো-শ্লোভেকিয়ায় সংঘটিত হইতে পারে। এদিকে ফ্রান্স, জার্ম্মানীর আক্রমণ হইতে চেক্‌রাজ্য রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। বৃটনকে শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ একটা ঘটনায় জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইতে পারে—এ আশঙ্কা তার আছে। তাই বৃটেনের দৌত্য, রাজনীতির অন্তরালে রান্‌ফিম্যান্ ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন — এরূপ ভাবিবার কারণ রহিয়াছে। কিন্তু চেকদের ভাগ্যাকাশ সুপ্রসন্ন বলিয়া মনে হয়না। একদিকে হিট্‌লারের শুরু আয়োজন ; সুদেতেন জার্ম্মানীর অধিকারে না আসিলে, হিট্‌লার নিরস্ত হইবে না। অপর দিকে বৃটেন প্রয়োজন হইলে ক্ষুদ্র চেকোশ্লোভেকিয়াকে বলি দিয়াও হিট্‌লারের অস্ত্রধারণের চেষ্টাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। হয়ত ফ্রান্স ও রুষের প্রভাবে বৃটেন সম্পূর্ণ সুদেতেন জার্ম্মানীকে ভাগ করিয়া দিবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে হিট্‌লার বিনা বাধায় এই প্রদেশ দখল করিতে পারে। এরূপ ব্যবস্থার সূত্রপাত হইবে অনুমান করা যায়।

ডল্‌ফাস্ মৃত্যুবার্ষিকী—

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সব ঘটনা ঘটে যা মানুষ একদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। ডাঃ এঙ্গেলবার্ট ডল্‌ফাসের ভাগ্য-লিপি এরূপ একটী অচিন্তনীয় ঘটনার পরিচয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অষ্ট্রিয়ার ডিক্টেটররূপে নাৎসী দৌরাত্ম্য হইতে অষ্ট্রিয়াকে রক্ষা করার চেষ্টা করায় নাৎসী ষড়যন্ত্রে হত হন। তারপর তিন বৎসর ধরিয়া তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়া অগণ্য নরনারী তাহাদের এই অসামান্য নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। কিন্তু এবার জার্ম্মানী কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর এই স্বদেশপ্রেমিকের স্মৃতি দেশ হইতে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। যে তেরজন নাৎসী হত্যাকারীর ডাঃ ডল্‌ফাস্‌কে নৃশংসভাবে বিনাশ করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল, ডল্‌ফাসের স্মৃতি মুছিয়া তাহাদের জয়গান এবার অষ্ট্রিয়ায় গীত হইয়াছে। গির্জ্জায় তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা হইয়াছে। ডল্‌ফাসের মৃতাত্মার প্রতি জার্ম্মানী এখনও প্রতিশোধ লইতে ভোলে নাই!

ফ্রান্সে ষষ্ঠ জর্জ্জ—

সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ্জ এবং কুইন এলিজাবেথ গত ১৯শে জুলাই নিমন্ত্রিত হইয়া ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। প্যারিসে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। ফ্রান্স ও বৃটেনে এই ঘটনা রাজনৈতিক কারণঘটিত নহে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই দুইটী রাজ্যের ভিতর যে

মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য। ফ্রান্সের প্রতিনিধিও আগামী বর্ষে ইংলণ্ডে 'অভ্যথিত অতিথি' হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

সম্রাটের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল নয়। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার ফরাসী ভ্রমণে যাওয়া, শুধু যে সৌহৃদ্যের খাতিরে ঘটিয়াছে, তাহা রাজনৈতিজ্ঞদের নিকট গ্রাহ্য হয় নাই। বিশেষতঃ, ইতালী ঘটনাটী একরূপ "বয়কট" করিয়াছে। জার্ম্মানীও ইহা ভাল চক্ষে দেখে নাই, যদিও বাহ্যিক আচরণে তাহার অন্তরের কথা গোপন রহিয়া গেল। ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। ইহাই হয়ত দুইটী রাজ্যকে ঘনিষ্ঠতা দৃঢ় করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

চীনে মেডিক্যাল মিশন—

ডাঃ মদনমোহন অটল কংগ্রেসের সহায়তায় ভারতীয় মেডিক্যাল্ মিশন লইয়া বোম্বে পৌছিয়াছেন। আগামী ১৫ই আগষ্ট তাঁহারা চীনে রওনা হইবেন। এই মিশনটীতে দুইজন বাঙালী ডাক্তার আছেন। আন্তর্জ্জাতিক নিয়মানুযায়ী আহতের সেবায় নিযুক্ত বাহিনীদিগকে আক্রমণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নীতির প্রতি শক্তিশালী যুযুধান জাতিগুলি শ্রদ্ধা দেখায় নাই সুতরাং এই বিপদের মধ্যে যাঁহারা আহতের সেবায় যাইতেছেন, তাঁহারা ভারতের নাম জগতের চক্ষে সম্মানিত করিলেন।

গৃহচ্যুত ইহুদী—

ফ্রান্সের ইভিয়ান কন্‌ফারেন্সে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া হইতে বিতাড়িত বা পলায়িত ইহুদিদিগের মুখ চাহিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে সমস্যা নিবারণের জন্য যে কমিটি স্থাপিত হয়, সম্প্রতি লণ্ডনের 'ফরেন্ অফিসে'র লোকার্ণ কক্ষে সেই কমিটির এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বৈঠকের উদ্দেশ্য গৃহচ্যুত হতভাগ্যদিগের জন্য নূতন দেশে বসবাস করান। আর্ল উইনষ্টারটন্ হইয়াছেন এই কমিটির সভাপতি। ফ্রান্স, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্, ব্রেজিল ও হলাণ্ডের চারিজন হইয়াছেন সহকারী সভাপতি। নূতন উদ্যমে ইঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আশা করা যায়, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে।

—শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

স্রোতের মুখে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম, এ,

সময়ের স্রোতে ছোটে জীবনের ধারা,
শতেক বাঁধন ঠেলি সে যে চলে যায় ;
পিতা, মাতা, ভাই, বোন, প্রিয়ার ক্রন্দন-
কিছুতেই কারো পানে ফিরে না তাকায়।

কাল-সমুদ্রের বুকে দিতেছে রে পাড়ি,
তরঙ্গে তরঙ্গে সদা লাগিছে আঘাত ;
এপারে ওপারে যেন নিত্য টানাটানি,
সময় যে কারো নাই মিলাইতে হাত।

চলিতে চলিতে পথ আসে অবসাদ,
শ্রান্ত ক্লান্ত তনু তব পড়ে এলাইয়া ;
উঠিতে বসিতে আর নাহি লয় মন,
ধরণীর তুচ্ছ মায়া কাঁদে ফুকারিয়া।

গীতার যোগ

(তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীমতিলাল রায়

নবম পরিচ্ছেদ

"অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু"—গীতাকার ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই কথা বলিয়াছেন—কেননা, বস্তুর সমগ্রতাকে না জানিলে, জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ হয় না। এই সমগ্রতাকে জানিবার জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানসঙ্গত করিয়া তাঁহাকে জানিতে হয়। যে ভাবে জানিলে অন্য কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না, ঈশ্বর সম্বন্ধে সেইরূপ সম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানযোগ, অক্ষর-ব্রহ্মযোগ, রাজ-যোগ, বিভূতি যোগ এবং একাদশ অধ্যায়ে ক্ষরাক্ষর-পুরুষোত্তম-তত্ত্বের বিশ্লেষণের পর পঞ্চদশ অধ্যায়ে সম্যক্ ঈশ্বর-জ্ঞানের সমাহার হইতেছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

ঊর্দ্ধমূল, অধঃশাখা-বিশিষ্ট অশ্বত্থ এই সংসারকে বলা হয়। ইহা অব্যয়। ইহার পত্র বেদাদি। এই সংসার-রূপী অশ্বত্থকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ।

একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ—যাহার মূল ঊর্দ্ধে, বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা নিম্নে। এতৎ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন "ন শ্বোঽপি স্থাস্যতে" অর্থাৎ যাহা কল্য পর্য্যন্ত থাকিবে না, এমনই ক্ষণবিধ্বংসী এই সৃষ্টি, এইজন্য অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত ইহার তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু কঠোপনিষৎ বলিতেছেন—

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥

এই অশ্বত্থরূপ বৃক্ষ, যাহার মূল ঊর্দ্ধে, নিম্নে শাখা-সমূহ, ইহা চিরন্তন। যিনি ইহার মূল, তিনি বীর্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম এবং অমৃতরূপী। ছন্দাংসি অর্থে বেদ। বেদ নিত্য, অপৌরুষেয়। বেদ বৃক্ষের পত্র-স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। বৃক্ষকে রক্ষা করে পত্র। সৃষ্টিও সুরক্ষিত বেদে। অতএব অনিত্য অর্থে অশ্বত্থ-শব্দ এখানে প্রযুক্ত হয় নাই। "অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাম্।" দশম অধ্যায়ে অশ্বত্থকে বৃক্ষদিগের মধ্যে উত্তম বলা হইয়াছে। শ্রুতিতেও এই দৃষ্টান্ত আছে। এই ক্ষেত্রে জীবদেহ ও দেহী, ক্ষর ও অক্ষর এবং এই উভয়ের উৎকৃষ্ট পুরুষোত্তম—এই সমগ্র অখণ্ড তত্ত্বের ইহা দৃষ্টান্তস্বরূপ। ইহার পরিণত রূপের বিশদ বিবরণ পরবর্ত্তী শ্লোকে পাওয়া যায়।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়-প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥

তাহার গুণপ্রবৃদ্ধ বিষয়-রূপ-পল্লবযুক্ত শাখাসমূহ অধোদিকে এবং ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত। মনুষ্যলোকে কর্ম্ম-বন্ধনে মূল সকল অধঃ এবং ঊর্দ্ধে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

মূল ঊর্দ্ধে। গুণ-প্রবৃদ্ধ বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত শাখা অধঃদিকে ও ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। মর্ত্ত্য মধ্যলোক। ইহার ঊর্দ্ধে আরও জগৎ আছে। 'ভূ-ভুর্বঃ-স্ব মর্হ-জন-তপঃ-সত্যঃ' এই ও তলাতলাদি লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের কথা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। এই সংসার-বৃক্ষের মূল সমূর্দ্ধে। কিন্তু পৃথিবীর ঊর্দ্ধেও যে সকল জগৎ আছে, তাহাতেও এই অখণ্ড সৃষ্টিপ্রবাহ বিদ্যমান। এই নিখিল সৃষ্টি গুণ-প্রবৃদ্ধ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ। এইগুলির সহযোগে বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, ক্ষিতি—এই সকলের সমগ্র গুণ আহরণ করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ অক্ষর আত্মা শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। গুণত্রয়ের কথা গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হইবে। গুণপ্রবৃদ্ধ, বিষয়-পল্লব-সংযুক্ত সৃষ্টি-তরুর শাখা-প্রশাখা ঊর্দ্ধ এবং অধঃ প্রদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। মহামতি মনুও বলেন—সৃষ্টির আদি অব্যক্ত, সনাতন, ভূতময়, অচিন্ত্য পুরুষ। সৃষ্টি-মানসে জলরাশি সৃজন করিয়া তিনি শক্তি-বীর্য্যরূপে তাহাতে আপনাকে সমাহিত করেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এই মুখ্য বীর্য্যের সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি। ইঁহার মনঃস্ফুরণের পূর্ব্বে সৃষ্টি-প্রবর্ত্তক অহঙ্কার-তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছিল। অহঙ্কার-তত্ত্বের পূর্ব্বে যে মহাভাব, তাহাই আত্মার প্রথম অভিব্যক্তি। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা মূল প্রকৃতি হইতেই এই মহৎ-তত্ত্ব অনুস্যূত হয়। অনন্তর তন্মাত্রা, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত, এই সকলের যোজনায় অনন্ত ভুবন গড়িয়া উঠিয়াছে। অমূর্ত্তাত্মা হইতে এই মূর্ত্তিমান্ বিশ্ব—দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতি জীবলোকের উৎপত্তি। সৃষ্টির মুখ্য মূল পুরুষোত্তম বটে, কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবলোক, মর্ত্ত্যলোক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার শাখা-পল্লব প্রসারিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণসংযুক্ত অসংখ্য প্রকার বিষয়-বাহুল্যে এই অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার শিকড় সঞ্চারিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। মূল শ্লোকের 'অধশ্চ মূলানি' - এখানে 'চ' শব্দের দ্বারা সংসার-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কেবল অধোদেশেই শিকড় গজায় নাই, ঊর্দ্ধে সমুচ্চ ভুবন-সমূহেও মূল-সঞ্চারের কথা ব্যক্ত করিতেছে। গীতার নবম অধ্যায়ে এই হেতু দেখি—

> তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক—
> মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
> তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
> ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥

ঊর্দ্ধলোকেও কর্ম্মানুযায়ী ভোগ-সুখাদি চরিতার্থ হয় এবং পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় জীব মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্র বলেন—কর্ম্ম মর্ত্ত্যলোকেরই জীবন-ধর্ম্ম। ইহ-লোকের কর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মফলভোগ ভিন্নলোকে হইয়া থাকে। আচার্য্য শ্রীধরের বাণী ইহা সমর্থন করে—"কর্ম্মাধিকারঃ নান্যেষু লোকেষু অতো মনুষ্যলোকঃ"। অতএব কর্ম্মভোগ অথবা ফলভোগ জগৎ-ভেদে বিচিত্র হইলেও, সর্ব্বলোকেই জীবনবন্ধন ঘটিয়াছে। এই শ্লোকে তাই বলা হইতেছে, "অধশ্চ মূলানি অনুসন্ততানি"। সৃষ্টির মুখ্য মূল অক্ষয় অমৃততীর্থে হইলেও, ইহার গুণ-প্রবৃদ্ধ শাখা-প্রশাখা অন্যত্র শিকড় সঞ্চার করিয়া রস-সঞ্চয় করে। ঈশ্বর ভিন্ন রস নাই। কিন্তু সৃষ্টিলীলায় এমন ইন্দ্রজাল ঘটে যে, একই মূল হইতে জীবনের উৎপত্তি ও তাহাতেই স্থিতি চিরন্তন হইলেও, বিচ্ছিন্ন বোধে অস্থায়ী অলীক ক্ষেত্রে কাল্পনিক শিকড় গাড়িয়া দেব, যক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নর, মর্ত্ত্যলোক স্ব-স্ব ক্ষেত্র হইতে যেন রস-সঞ্চয় করিয়া বাঁচিয়া আছে, এমনই কল্পনা হইয়া থাকে। ইহাই মায়া। সৃষ্টি-নীতির এই অলৌকিক রহস্য মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। এই গৌণ শিকড় যখন যে কোন কারণে উপাড়িয়া আসে, তখন সুখ দুঃখ দুইই ভোগ হয়। এই সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব বিষয়-সংযোগ-হেতু উপস্থিত হয়। এই সকল বিষয় নিত্য নহে। কিন্তু সৃষ্টির স্ব স্ব কাল্পনিক বিষয়ে এই যে গ্রন্থি, ইহা কথায় অস্বীকার করা যায় না। আমরাই তাহার সাক্ষী। মনে হয়, আসক্তির বাঁধন আছে বলিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। এই আসক্তির শিকড় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যখন টুটে, হৃদয় তখন কেমন ব্যথায় আকুল হয়, তাহা আমরা প্রতি দিনের ঘটনায় অনুভব করি। এক বিষয় হইতে জীবনের রস-সঞ্চয় যদি রুদ্ধ হয়, তৎক্ষণাৎ জলৌকার ন্যায় অন্য বিষয়ে শিকড়-সঞ্চারের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করা যায় না। এই অনিত্য বিষয়-রস বর্জ্জন করিলেও আমাদের যে মরণ-সম্ভাবনা নাই, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আমাদের মূল যে ঊর্দ্ধে অক্ষয় অমৃতে, সে চেতনা গুণ-বন্ধনে ম্লান, অস্পষ্ট। এই ক্ষেত্রে আমরা খুবই অসহায়। এই অবস্থা হইতে মুক্তির উপায় শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে দিয়াছেন "তাং তিতিক্ষস্ব" বলিয়া। "সংস্পর্শজ" যে ভোগ, তাহা সুখই হউক আর দুঃখই হউক, নির্ব্বিকার হইয়া সহিতে হয়। কেননা, গৌণ-বন্ধনযুক্ত আমাদের এই জীবন আত্মজ্ঞানোন্মেষে অথবা প্রকৃতির খেয়ালে যখন ছিন্ন হয়, তখন শোকে, দুঃখে, ভয়ে আমরা বিহ্বল হই। কত প্রকার মনোবেগ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য আমাদের কাণে বাজে "শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং······সংযুক্ত স সুখী নরঃ।"

মুখ্য মূল হইতে বিস্তৃত হইয়া এই সংসার অশ্বত্থের ন্যায় শাখা-প্রশাখায় বিষয়-সংস্পর্শে শিকড় গাড়িয়াছে। তাই "অনুসন্ততানি" এই শব্দের প্রয়োগ। অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ ও বীপ্সা অর্থাৎ ব্যাপ্তির ইচ্ছা। মূল হইতে উৎপত্তি-লাভের পর, পশ্চাৎ বিষয়াদিতে এইরূপ শিকড় গাড়ার সংস্কার। ইহা যুগপৎ মূলের ব্যাপ্তির ইচ্ছারই অনুকৃতি। কিন্তু ইহা অজ্ঞানমূলক আত্মবিস্মৃতি। গৌণ-ক্ষেত্রাদিতে

এই যে শিকড় গাড়া, ইহাও ঈশ্বর-লীলা। পুনঃ এই শিকড় শিথিল করিয়া মুখ্য মূলে প্রত্যক্ষ চৈতন্যে সংযুক্ত করার যে আকূতি, তাহাও ঈশ্বরেচ্ছা বলিতে হইবে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মানুষের চেষ্টা। মন তার নিয়ামক। কার্য্যতঃ মুক্তি নাই। কিন্তু ঈশ্বর-বিধানেই বন্ধন ও মুক্তি। পুরুষোত্তমেরই ইহা সনাতন লীলা। ইহা স্বভাব-প্রকৃতিতে লীলায়ত হয়—এখানে আমাদের ভাষা নাই।

তবুও বিষয়াসক্তি হইতে বন্ধন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—মানবাত্মার সনাতন ধর্ম্ম। মোক্ষই জীবের লক্ষ্য। তাই পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে বলা হইতেছে :—

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

—এই সংসার-বৃক্ষের রূপ উপলব্ধ হয় না। আবার ইহার আদি, অন্ত এবং স্থিতিও স্থির করা যায় না। এই দৃঢ় বদ্ধ মূল অশ্বত্থকে শাণিত অনাসক্তির অস্ত্রে ছেদন করিতে হয়—তবেই সেই পরম পদের সন্ধান পাওয়া যায়। এই পদে সংস্থিত হইলে, জীবের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

এই পদ হইতেই অনাদি প্রবৃত্তি কিন্তু বিস্তৃত হইয়াছে। এই রহস্য উপলব্ধির জন্য আদি কারণ পুরুষের শরণ লওয়ার সঙ্কেতই দেওয়া হইয়াছে। যে কথা পূর্ব্বে স্পষ্ট হয় নাই, এই শ্লোকে তাহা হইল। "নান্তো ন চাদিঃ" ইত্যাদি কথায় এই সংসার-বৃক্ষ যে অনাদি, তাহাই বুঝা গেল। এই বৃক্ষের মূল অনন্ত শ্রীপুরুষোত্তম। আবার এই অশ্বত্থকে ছেদন করার কথা উত্থাপিত হওয়ায়, সমস্যা জটিল হয়। কিন্তু পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা মনোযোগের সহিত যাঁহারা অনুধাবন করিবেন, এই কথায় তাঁহাদের বুদ্ধিভ্রম হইবে না। এই অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় যে আসক্তির শিকড় গজাইয়া গিয়াছে এবং ইহা সুবিরূঢ়-মূল হইয়া মুখ্য ক্ষেত্রের অমৃত-রস শুণ ও বিষয়-মিশ্রণে বিকৃত করিয়া দিতেছে, সেই অশ্বত্থের সুদৃঢ় মূল "অসঙ্গ শস্ত্রেণ" অর্থাৎ নিরাসক্তির তীক্ষ্ণ কুঠারে ছেদন করার কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় একাধিক বার বলিয়াছেন "এ জগৎ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত ও তাঁহাতেই অবস্থিত এবং তাঁহাতেই লয় পাইবে।" এই সৃষ্টি ইন্দ্রজাল বটে, কিন্তু ইহা লৌকিক ভোজবিদ্যার সহিত তুলনীয় নহে। গীতার ভাষায় বলি—"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া।" এই ভোজবাজী ঋতময় নিত্য-পুরুষের। কাজেই ইহার আদি, অন্ত, স্থিতির বিজ্ঞান মনুষ্যবুদ্ধির অতীত—ইহাতে আর সংশয় কি? উপনিষদের ঋষি তাই তো বলিয়াছেন "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নো বাক্ নো মনঃ"। এই অলৌকিক সৃষ্টি-রহস্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া উদাত্তকণ্ঠে প্রাচীনেরা এই জন্যই গাহিয়াছেন "পূষন্নেকর্ষে যমসূর্য্যব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ"—বিশ্ব-স্রষ্টার সম্যক্ জ্ঞান মানুষের মধ্যে সম্ভব নহে। তাই দশম অধ্যায়ে অমোঘ পথের সন্ধান দেখি—"দদামি বুদ্ধিযোগং তান্ যেন মামুপযান্তি তে।" আর যে মূর্ত্তি "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্", সেই বিশ্বভুবন বিরাট্‌রূপ মানুষের দর্শন-সামর্থ্যে সম্ভব নহে; তাই একাদশ অধ্যায়ে তিনি ভক্তিমান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্"। শরণাগত না হইলে, ঈশ্বরের সমগ্রত্ব অবধারণ করার দ্বিতীয় পথ যে আর নাই। গীতার ছত্রে ছত্রে এই অব্যর্থ পথ-নির্দ্দেশই আছে। যাহা জানিলে আর কিছুই জানার থাকে না, সেই "পরিমার্গিতব্যম্" শ্রীভগবানের পথ-যাত্রীদের এই একই সঙ্কেত বর্ত্তমান অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সাধন ও সাধ্যের কথা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে পাওয়া যায়। সংসার-লীলা অনাদি অনন্ত স্বপ্ন বা মায়াচিত্র মনে হয়। ইহার বস্তুতন্ত্র রূপ অনুভূত হয় না। এই উত্তম রহস্য সম্যক্‌রূপে জানিবার জন্য অনাসক্তির অস্ত্রই এক মাত্র সহায়। চিত্ত অনাসক্ত হইলে, 'তৎপদম্ পরিমার্গিতব্যম্' বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা নানা বিষয়-ক্ষেত্রে মমতার শিকড় সঞ্চারিত করিয়া, মুখ্য মূল বিষয় বিস্মৃত হইয়াছি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মনে হইতেছে প্রতীয়মান বস্তুতন্ত্র বিষয়ক্ষেত্রের আসক্তি ছাড়িলে জীবন-কুসুম শুখাইয়া যাইবে, মৃত্যু অনিবার্য্য

হইবে। এই আতঙ্কে ক্রমেই আমরা মৌলিক রস-সঞ্চারের ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ হইয়া সঙ্কীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছি। পরম পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ভীকচিত্ত হওয়া চাই—মরণ পণ না করিলে—দৃঢ় অসঙ্গ-শস্ত্র ধারণ করা সম্ভব নয়। আচার্য্য শ্রীধর বলেন "সম্যগ্বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্কৃত্য" অর্থাৎ অশ্বত্থের গৌণ মূল হইতে জীবনকে স্বতন্ত্র করিয়া 'ততস্তস্য মূলভূতম্' যে মুখ্য উৎসক্ষেত্র, তাহারই অন্বেষণ-তৎপর হও। মরণের পর জীবন, আবার জীবনের পর মরণ, এই জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব তবেই দূর হইবে। চিরন্তনী জীবনপ্রবৃত্তির উৎসমূলে চেতনাকে সংযুক্ত করিতে পারিলে, আমরাও সমুচ্চ কণ্ঠে শ্রীভগবানের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারিব "আত্মমায়য়া সম্ভবাম্যহম্"। এই অবস্থা জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় নহে, জন্মমৃত্যু তখন অবস্থান্তর বলিয়া উপলব্ধি হইবে মাত্র। গীতায় অখণ্ড অনন্ত চেতনার পুনরাবৃত্তির অন্ধ কল্পনা হইতে মুক্তির পথও দেখান হইয়াছে। ঈশ্বর চৈতন্যে সংযুক্ত চেতনা যাহার, তাহার জন্ম ও মৃত্যু লীলাচ্ছন্দ, দ্বন্দ্ব নহে। যে পুরুষ হইতে "যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী" জীবের জন্ম-কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত, সেই পুরুষের সহিত যুক্তির অপরোক্ষানুভূতিই পরম পুরুষার্থ। চেতনা যতক্ষণ সমুচ্চের অনন্ত উৎস-মূল হইতে অমৃত-সঞ্চয়ে বাধা পাইতেছে, ততক্ষণ ইহা অধঃ ও ঊর্দ্ধের ক্ষেত্রে আসক্তির শিকড় গাড়িয়া থাকে, ইহাই ছিন্ন করিতে হইবে। ইহার জন্য চেষ্টা অথবা আকাঙ্ক্ষা কার্য্যকরী নহে।

গীতা বলেন "আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে"—শরণাগত হও। শরণাগতের মার নাই, পরম শ্রেয়োলাভের একমাত্র ইহাই উপায়। এইরূপ হইলে যে সিদ্ধদশা-লাভ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী শ্লোকে পরিলক্ষিত হয়।

নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখ-দুঃখ-সংজ্ঞৈ—
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

মান ও মোহশূন্য, সঙ্গ-দোষ-ত্যক্ত, অধ্যাত্মজ্ঞান-নিরত, কামনা-বর্জ্জিত, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত বিবেকিরাই সেই অব্যয় পদ পাইয়া থাকেন।

এই পথের যাত্রী যে, তাহার মান নাই। মান অর্থে চিত্তবৃত্তির এমন এক উন্নত সৌধচূড়, যাহার উপর দাঁড়াইয়া মানুষ সগৌরবে ঘোষণা করে 'মৎসমো নাস্তি'—আমার সমান আর কেহ নাই। আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিব। আমার ভোগ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে; আমার পদানত সকলে থাকিবে। মনের এই স্বভাব-ধর্ম্মকেই অহঙ্কার বলে। অহঙ্কার থাকিতে শরণাগত হওয়া যায় না। মোহ মনের ছলনা। ঈশ্বর-বিশ্বাস ইহাতে থাকে না, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ মোহ ঈশ্বর-প্রসাদ স্বীকার করে না। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু—দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে এ ধারণা জন্মে না। অহঙ্কার ও মোহ ঈশ্বর-পথের অন্তরায়। তারপর "জিতসঙ্গ-দোষ"। আমার আর কেহ নাই, কিছু নাই। অমৃত ভিন্ন অন্য রসে আমার রুচি নাই। কর্ত্তৃত্ব, ধনাকাঙ্ক্ষা, পারিবারিক সুখ, কোন বিষয়েই স্পৃহা নাই। এই অবস্থাই নিরাসক্তির লক্ষণ। এইরূপ লক্ষণযুক্ত যাহারা, তাঁহারা 'অধ্যাত্ম-চেতসা' আপনার নিত্যত্বে, অমরত্বে আস্থাবান্। পৃথিবীর কোন বিষয়-কামনা তাঁহাদের নাই। ঈশ্বর ভিন্ন আর যাহার আশ্রয় নাই, তাহার সুখ-দুঃখ সবই প্রিয়তমের স্পর্শ। দ্বন্দ্ব আস্বাদ-ভেদ মাত্র। ঈশ্বর যে আলো ও শান্তির ক্ষেত্র। সেখানে মুক্তির আনন্দই লীলায়িত। এই পরম তীর্থ লক্ষ্যে যে যাত্রা সুরু করে, ঈশ্বর-প্রসাদ তাহার একমাত্র সহায়। মান, মোহ, আসক্তি, কামনা, সুখ, দুঃখের দ্বন্দ্ব কিছুই তাহার থাকিবে না। শাশ্বত চিরন্তনের প্রতি অনন্তরুচি হইয়া সে চলিবে শনৈঃ শনৈঃ ঊর্দ্ধ-পথে। জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যত আসক্তির শিকড় বিষয়াদিতে জড়াইয়া ছিল, সবই ছিঁড়িয়া যাইবে এই শরণাগতির প্রভাবে। আসক্তির মূল মুখ্যতঃ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুতে নহে। আত্মসমর্পণের সাধনায় ইহা অনুভূত হয়। একে আসক্তি বশতঃ অন্য সব কিছুতে নিরাসক্তি স্বভাব হইয়া যায়। সেখানে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যই শুধু ভূমা নহে, পরন্তু সেখানে—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। ৬

'সেই পদকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না। চন্দ্র ও

অগ্নিও নহে। যে স্থান লাভ করিলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম।'

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই পরম ধামের কথার সূত্রপাত। 'জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তা পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্'—পাছে এই পদ স্বপ্ন বা তুরীয় বলিয়া কেহ মনে করে, চতুর্থ অধ্যায়ে তাই তিনি বলিয়াছেন 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি'। কাজেই এই পরম ধাম একান্ত শূন্যময় নহে; কেননা, এই ধামের সহিত অচ্ছেদ্য সংযোগ রাখিয়া শ্রীভগবানেরও জন্ম আছে, কর্ম্ম আছে। আর এইজন্য উর্দ্ধমূল, অধঃশাখ নিখিল সংসাররূপ অশ্বত্থ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও, নশ্বর নহে। যাহা অবিনশ্বর, তাহার অবস্থান্তর হইলেও, আসলে কিছু নাশের আশঙ্কা নাই। জগতের কোন বস্তুই তাই ধ্বংসশীল নহে; এই চেতনা ম্লান হয় মূল চেতনার সহিত জীবের বিযুক্তিতে। যে জন্য এই বিযুক্ত চেতনা, তাহার প্রতিকার করিতে পারিলে, পুনরাবর্ত্তনের মিথ্যা বৃত্তিটী মুছিয়া যায়। পরম ধামের সহিত যুক্তি "জ্ঞান-তপসা পূতা" হইলে সুকৃতিশালিগণ "মদ্ভাবমাগতাঃ" অর্থাৎ কাম-তনু ছাড়িয়া শ্রীভগবানে নব-জন্ম গ্রহণ করে, দিব্য-কায়া পায়। গীতায় জীবনের এই দিব্য ভবিষ্যৎ গতির কথা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবানে যাঁহার জন্ম, "মত্তঃপরতরং নাস্তি" এই বাক্যের মর্ম্মার্থ তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়। এই অলৌকিক অনুভূতির চেতনায় সূর্য্য, শশাঙ্ক, পাবক কিছুই নাই। যাঁহার অধিক আর কিছু নাই, তাঁহাকে পাইলে আর কিছু যে চক্ষে পড়ে না। এই কথা বুঝাইবার জন্য উক্ত শ্লোকের অবতারণা করা হইয়াছে। কোন এক বস্তুতে সমাহিত-চিত্ত হইলে, তাহা ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না, ইহা কিছু অযুক্তিকর কথা নহে। আমরা মহাভারতে কুরু ও পাণ্ডবগণকে দ্রোণের অস্ত্রশিক্ষা দিবার কালে ইহার একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত পাইয়া থাকি। এক বনস্পতি-কাণ্ডে একটী কৃত্রিম পক্ষী স্থাপন করিয়া আচার্য্য দ্রোণ রাজপুত্র-গণকে লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দিতেছিলেন। শরনিক্ষেপের পূর্ব্বে লক্ষ্য স্থির হইয়াছে কিনা, জানিবার জন্য একে একে তিনি কুমারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তাহারা কি দেখিতেছে? কেহ বলিল, সে দেখিতেছে পক্ষীসংযুক্ত আমূল বৃক্ষ; কেহ কাণ্ডস্থিত পক্ষী, কেহ পক্ষীর সর্ব্বাঙ্গ; কিন্তু পার্থ দেখিলেন—বৃক্ষও নাই, কাণ্ডও নাই; পত্রপুঞ্জ বা বিহঙ্গের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুই নাই, সম্মুখে ভাসিতেছে পক্ষীর একটী উজ্জ্বল চক্ষু। লক্ষ্য-সিদ্ধির ইহাই অমোঘ লক্ষণ। এই দিক্ দিয়া সত্যই সেই "অনাময়ং পদম্" যাহার ভাগ্যে ঘটে, সর্ব্বেশ্বর ব্যতীত আর কিছুই তাহার চক্ষে পড়ে না। ইহা ব্যতীত এই ক্ষেত্রে শ্রুতিও বলেন, এই অবস্থার "চন্দ্র-তারকা জ্যোতিঃ প্রকাশ করে না। বিদ্যুতের তেজঃ স্ফুরিত হয় না, অগ্নির আর কথা কি?" জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের দীপ্তিতেই তো ইহাদের প্রকাশ। বিশ্বভুবন তাঁহার জ্যোতিতেই তো জ্যোতির্ম্ময়। এমন অদ্বয় পরম ধাম প্রাপ্ত না হইলে, সেই অনন্তবাহু শশি-সূর্য্য-নেত্রের দর্শন সম্ভব হয় কি? এই অধ্যাত্ম-চেতনার বিবরণ দেওয়ার পর, কালাতীত নিত্য-ধামের কথা বলিয়া অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ-জ্ঞানের কথা বলিতেছেন—আমরা তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

কবি ও শিল্পী

শ্রীসনাতনশেখর ভদ্র কাব্যবিনোদ

শিল্পী কহে, "কবি ভাই, কি গুণটী ধর,
রূপের মাধুরী আঁকি' আমি শিল্পী বড়।"

মৃদু ভাবে কবি বলে, "শোন শিল্পী ভাই,
প্রাণের ভাষার রূপ আমি যে ফোটাই।
প্রাণরাজ্যে বিশ্ব মাঝে আমার বিকাশ,
বাহ্যিক লালিমা-মদে তোমার প্রকাশ।"

সমালোচনা

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। রস-চক্র-সাহিত্য-সংসদ্, ৯নং সাহানগর রোড হইতে প্রকাশিত। দাম দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বা দানীবাবুর জীবনী ও তাঁহার সহিত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক নিরূপণ করিয়া রচিত হইয়াছে। রচনা করিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস ও অভিনয়-কলা সম্বন্ধে যে কয়টি লোক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, হেমেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থখানিতে হেমেন্দ্রবাবু দানীবাবুর জীবন উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গরঙ্গমঞ্চের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। সেই সঙ্গে এদেশীয় ও বিদেশীয় নাটকীয় উন্নতির ধারা এবং বঙ্গরঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্য প্রভাবের আলোচনা করিয়া পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন।

কিন্তু দুই একটি ব্যক্তিগত মতভেদের কথা এখানে উল্লেখ করিব। হেমেন্দ্রবাবু নুতন ও পুরাতন দলের অভিনেতাদের সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সব জায়গায় সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। শিশিরবাবু ও দানীবাবুর অভিনয় সমালোচনা করিয়া হেমেন্দ্রবাবু দানীবাবুর জয় ঘোষণা করিয়াছেন। শিশিরবাবু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'আমরা নুতন কিছু পাইলাম না।' দানীবাবু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'বস্তুতঃ সাধনবলে এ-যুগের কোনও অভিনেতাই আর তাঁহার (দানীবাবুর) নাগাল পাইল না।' ইহা হেমেন্দ্রবাবুর ব্যক্তিগত মত হইতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ দর্শক ও সমালোচক ইহা সমর্থন করেন কিনা সন্দেহ! শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন খুবই উচিত, কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে অযথা প্রশংসার দ্বারা প্রশংসেয় ব্যক্তির যেন সম্মানহানি না হয়। দানীবাবু প্রতিভাবান্ অভিনেতা, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে অকারণে আকাশে তুলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

এদেশে অভিনয়-কলার দৈন্য দেখিয়া হেমেন্দ্রবাবু সোভিয়েট রাশিয়ার থিয়েটারের উন্নতির সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'সেখানকার রঙ্গমঞ্চ দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোকশিক্ষার রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং নানাবিধ শিল্পকলার প্রসার হইয়াছে।' বাংলাদেশের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন,—'নাট্যশালা সম্পর্কেও কেন যাহা জীর্ণ তাহা ধ্বংস পাইয়া নব রূপ সঞ্জীবিত করিল না তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না; বোধ হয় আমাদের দুর্ভাগ্য।' দুর্ভাগ্য তো বটেই, কিন্তু হেমেন্দ্রবাবু যে তাহার কারণ একেবারেই খুঁজেন নাই তাহা নয়। তিনি লিখিয়াছেন—'প্রতি পদে অবস্থার সহিত তাহাদিগকে (থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষকে) সংগ্রাম করিতে হয়। রাজানুগ্রহ ব্যতীত থিয়েটার চিরস্থায়ী হয় না, এদেশে রাজপৃষ্ঠপোষকতা দুরাশার স্বপ্ন। একখানি নাটক মঞ্জুর করাইতে কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ বায়োস্কোপ এবং টকীর প্রভাবে থিয়েটার অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় দর্শকের সহানুভূতি সম্ভব নয়।'

এই সামান্য মতানৈক্য থাকিলেও, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে পুস্তকখানি বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ করিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই খুব সুন্দর। ছবিগুলি আরও একটু ভাল হইলে মন্দ হইত না।

—অধ্যাপক শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী

একলব্য—একাঙ্ক নাটকীয় কাব্যগ্রন্থ। শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রাপ্তব্য। দাম ॥৹ আনা।

নিষাদ-পুত্র একলব্যের একনিষ্ঠ শস্ত্র-সাধনার অভিনব উদ্যম এবং অপূর্ব্ব গুরু-নিষ্ঠা ও অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কাহিনী যে সত্য সত্যই বিশেষ আদর্শস্থানীয়—তাহা সুবিদিত। এইরূপ একটি সর্ব্বজনবিদিত বিস্ময়কর চরিত্র নাটকের উপাখ্যান-ভাগ হিসাবে গ্রহণ করিয়া ছাত্রদের অভিনয়োপযোগী করিয়া তুলিতে মতিবাবু যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন—তাহা প্রশংসনীয়। তাঁহার উদ্যম সফল হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

—শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

ফলদীপিকা—শ্রীমন্ত্রেশ্বর পণ্ডিত বিরচিত।

দক্ষিণভারতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীমন্ত্রেশ্বর প্রণীত ও শ্রীগণপতি সরকার কর্ত্তৃক সংশোধিত "ফলদীপিকা" নামক জাতক পুস্তিকার ন্যায় শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া জ্যোতিষের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রহ ও রাশি সমূহের বিবরণ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের বিষয়, বর্গ বিভাগ, গ্রহবল, কর্ম্মজীবন, যোগভাব, রাজযোগ, কলত্রভাব, স্ত্রীজাতক, পুত্রভাব, আয়ু, রোগ, দ্বাদশ ভাব ফল, নির্বাণ, দশা, অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা, কালচক্র, আধানদশা, অষ্টকবর্গ, গুলিক, উপগ্রহ ও গোচর ফলাদির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। এই পুস্তকখানি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে যেরূপ উপাদেয়, সংস্কৃত অনভিজ্ঞদিগের পক্ষে তেমনি নিরর্থক। সাধারণের উপযোগী করিতে হইলে উহার একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ পুস্তক প্রচার করা আবশ্যক।

—শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত

বন্দিপুরের হীরালাল — শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ দেবশর্ম্মা প্রণীত।

বন্দিপুরের জমিদার স্বর্গীয় হীরালাল ঘোষ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-চিত্র। স্থানীয় অঞ্চলে নিরক্ষরতানিরসন, জলকষ্টনিবারণ ও নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্য আচরণের দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠা ও কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পল্লীর উন্নতিকল্পে যে সমস্ত কাজ তিনি করিয়াছেন তাহার বিশদ বিবরণও পুস্তকখানিতে আছে। এইরূপ একজন নীরব ও নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মীর জীবন দশের সামনে ধরিয়া লেখক প্রশংসার কাজই করিয়াছেন। ইহা নীরব কর্ম্মে মানুষের প্রাণে অনুপ্রেরণা জোগাইবে।

—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

কচি-কথা — সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণনগর—নদীয়া।

'কচিকথা'র জন্ম গত বছরের আশ্বিন মাসে—উদ্দেশ্য কচিমনের খোরাক জোগান। গত কয়েক সংখ্যা দৃষ্টে ইহার ক্রমোন্নতি লক্ষ্যে পড়ে। উদ্দেশ্য ভাল বলিয়াই কাজ কঠিন। এই ধরণের পত্রিকা এই দেশে চালাইবার চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে বিশেষ হয় নাই। তাই সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু-পত্রিকার প্রতি শুভেচ্ছা থাকিলেও, যেদিন এই কঠিনতা বিদীর্ণ করিয়া বর্ণে, বৈচিত্র্যে ইহাকে কচিদের সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে দেখিব, সেইদিনই হইবে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি। সেই আশায়ই রহিলাম।

বেঁটে বক্কেশ্বর—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

সচিত্র ছেলেমেয়েদের গল্পের বই। বেঁটে বক্কেশ্বর, বামন সর্দ্দার, দৈব সূচ, অতিলোভে তাঁতি নষ্ট, আমা বৈতরণী' কঙ্কাবতী, অবাক্ নাচন, শ্বেত সরোজ ও নীলনলিনী, গ্রহের ফের, তিতু সিং, সজ্ঞানে স্বর্গলাভ, যেমন পাপ তার তেমনি শাস্তি, সোণার হরিণ—এই কয়টী গল্প বইখানিতে আছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, ছেলেমেয়েরা গল্পগুলি পড়িয়া প্রাণ ভরিয়া আনন্দ উপভোগ করিবে; বিশেষ বেঁটে বক্কেশ্বর তাহাদিগের মুখে প্রচুর হাসি ছুটাইবে। ছেলেদের গল্প লেখায় সাবিত্রীবাবুর মুন্সিয়ানার পরিচয় বইখানিতে মিলে। চিত্তাকর্ষক ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট ঝরঝরে ছাপা বাঁধাইয়ের জন্য পুস্তকখানি হাতে করিলেই ছেলেমেয়েদের মন উল্লসিত হইয়া উঠিবে।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

অশ্রু—কবিতার বই, শ্রীকুলদাচরণ সরকার প্রণীত, রাজসাহী।

অশ্রু পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। কবিতাগুলির সহজ, সরল, চিরপুরাতন সুর, আন্তরিক তীব্র অনুভূতি চিত্ত স্পর্শ করে। জীবনের দুঃখপূর্ণ সমস্যা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ ও গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে এবং তাঁহার এই মানস উত্তেজনা তিনি সরল ওজস্বিতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইঁহার কবিতার বাস্তবতার তীক্ষ্ণ অনুভূতি কোন ব্যবধানের দ্বারা অস্পষ্ট না হইয়া সরল রেখায় পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করে। আধুনিক রুচির মাপ-কাঠিতে জনপ্রিয়তালাভে যদি ইনি বঞ্চিতও হন, তবুও আশা করা যায়, ভাষা ও ছন্দের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভাবের আন্তরিকতা যদি কখনও সমাদরণীয় হয়, তাহা হইলে ইঁহার কবিতা যথার্থ প্রাপ্য গৌরবলাভে সমর্থ হইবে।

—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাই-বোন—ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, ৭নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিশুচিত্তের উপযোগী করিয়া সুলেখক প্রভাতকিরণবাবু ইহার সম্পাদনা করিয়াছেন। কি করিলে সরলমতি শিশুদের মনোগ্রাহিতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহার কোনরূপ ঈপ্সিত চেষ্টা করিতেই তিনি ছাড়েন নাই।—উপযুক্ত লেখার দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ছাপা পর্য্যন্ত। অনেক প্রথিতযশা লেখকবৃন্দ ইহাতে লিখিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি লেখাই চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রাঞ্জল। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর। প্রতি সংখ্যা ৵০ বার্ষিক ২৲।

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

A short History of English Literature—by Ashutosh Sanyal M. A. Published by U. N. Dhar & Co. Price Rupee one and annas eight only.

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস যেরূপ বিশাল, সেইরূপ দুরূহ। ছাত্রদের নিকট এইজন্য ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ। আলোচ্য গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ অনার্স ছাত্রদের জন্য লিখিত হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরদান প্রসঙ্গে লেখক ইহাতে সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ও ক্রমবিবর্ত্তন সুকৌশলে বিবৃত করিয়াছেন। এরূপ একখানি পুস্তক রচনা করিতে হইলে কিরূপ বিস্তৃত অধ্যয়ন ও লিপিকুশলতার প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়। লেখকের ভাষা সুন্দর, স্বচ্ছ ও সাবলীল এবং তাঁহার বিষয়বিন্যাস দক্ষতা, গভীর রসবোধ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি সত্যই প্রশংসাই। পুস্তকখানি যে প্রত্যেক ইংরেজী সাহিত্যামোদীর ভাল লাগিবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। ইহার ছাপা ভাল, প্রচ্ছদপট মনোরম এবং মূল্যও যথাসম্ভব কম। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন-পথে

শ্রীমতিলাল রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যোগেশ ও দত্তাদেবী দেখিতে দেখিতে চক্ষের বাহির হইয়া গেল। কাহারও মুখে বাক্য নাই। মহাপুরুষ বলিলেন—"দূরে জেলেদের আড্ডা যত শীঘ্র পার, উহাদের জলে ডিঙি ভাসিয়ে অন্বেষণ করার ব্যবস্থা কর। দত্তার এখন মরণ নাই। দত্তা বাঁচ্‌বে, যোগেশও নিরাপদ্‌।"

সকলে ছুটাছুটী করিয়া জেলে-ডিঙিতে দূর-সমুদ্র পর্য্যন্ত খোঁজাখুঁজি করিল, দত্তাকে পাওয়া গেল না। নিরাশ হইয়া সকলেই আশ্রমে ফিরিল। মহাপুরুষ সকলকে অভয় দিলেন, নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলেন; দত্তা যে মরিবে না, ইহাই তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয়।

বাংলার এই সীমান্তে অসীম জলধিবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ কুমুদকহ্লারের ন্যায় শোভা পায়। কোন কোন দ্বীপের বুক ফুঁড়িয়া অনুচ্চ গিরিশির পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন দ্বীপ ভীষণ অরণ্য, শ্বাপদ জন্তুর আবাসস্থান। কত বন্য পক্ষী সারস ও বকের বিচরণ-ভূমি। দূরে দূরে দীপমালা বাংলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবাধ জলধি-বক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়। ইহারই মধ্যে একটী নাতি-বৃহৎ উপদ্বীপে জঙ্গল কাটিয়া অল্লাধিক এক শত মগের বাস। বিশাল শস্যক্ষেত্রের এক প্রান্তে তাহাদের পর্ণকুটীর। পল্লীর পশ্চাদ্ভাগে একটী সঙ্কীর্ণ খাল, জোয়ারে সমুদ্রজলে দুই কুল থৈ থৈ করে, ভাঁটায় জল সরিয়া যায়। উভয়-কূলে শরবন, অসংখ্য বক বাসা করিয়া থাকে।

এই মগেরা বন্য মধু আহরণ করে; মাঠে চাষ আবাদ করিয়া শস্য সঞ্চয় করে। তরিতরকারী যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, সপ্তাহে দুইবার বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নিকটবর্ত্তী সহরের হাটে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসে। কৃষি ব্যতীত সমুদ্রে ডিঙ্গি ভাসাইয়া মৎস্য ধরে, এবং এক বিস্তৃত মাঠে উহা শুষ্ক করিয়া হাটে লইয়া যায়। ইহা ব্যতীত রমণীরা তাঁত চালায়, হাট হইতে পুরুষেরা কার্পাস ও রেশমী সূতা কিনিয়া আনে, মেয়েরা বিচিত্র বসন বয়ন করিয়া সহরে পাঠায়। প্রত্যেক সংসার শ্রীমণ্ডিত, সকলেই প্রফুল্ল। স্বাস্থ্যহীন কেহ নহে। বেশ আনন্দে দিন চলিয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে পাগ্‌শালী নামক এক মগ্‌ সম্পৎশালী এবং এই মগপল্লীর প্রধান নেতা। সেদিন ভোরে মাছ ধরিতে গিয়া যখন সে ফিরিতেছিল, সে তখন সমুদ্রবক্ষে যোগেশ ও দত্তাকে ভাসিতে দেখে। তাড়াতাড়ি উহাদের উঠাইয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া আসে। পাগ্‌শালী বেশ সহৃদয় ব্যক্তি ও ধর্ম্মপ্রাণ। তাহারই চেষ্টায় এই মগ্‌-পল্লীতে একটী ক্ষুদ্র প্যাগোডা নির্ম্মিত হইয়াছে, প্যাগোডাকে ইহারা কেয়াং বলে দুইজন ফুঙি এইখানে থাকিয়া এই ক্ষুদ্র পল্লীটাকে ধর্ম্মানুশাসনে রক্ষা করিয়া থাকে। পাগ্‌শালীর যত্নে দত্তা ও যোগেশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুস্থ ও সচেতন হইয়া উঠিল। পাগ্‌শালী মগের ভাষায় কথা বলে, দত্তা ও যোগেশ তাহার কিছুই বুঝে না। অবশেষে সে তাহাদের কেয়াং লইয়া গেল। সেখানে দুইজন ফুঙ্গির মধ্যে এক জন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দী বলিতে পারে, কিন্তু বুঝিতে পারে না একবিন্দু। যোগেশের সহিত সে অনেক অঙ্গভঙ্গী সহকারে কথা কহিয়া পাগ্‌শালীকে বুঝাইয়া দিল—এরা হিন্দু, নিজেদের ধর্ম্ম ভাল নয় বলায়, হিন্দুরা এদের জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। পাগ্‌শালী যেন ইহাদের সযত্নে প্রতিপালন করে। আর আগামী পূর্ণিমায় ইহাদের বৌদ্ধ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ফুঙ্গি যে কি বলিল, আর পাগশালী কি বুঝিল, যোগেশ ও দত্তা তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিল না। পাগশালী হাতযোড় করিয়া ফুঙ্গিকে নমস্কার ঠুকিয়া দত্তা ও যোগেশকে লইয়া বাড়ী ফিরিল। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভাত আর শুষ্ক মৎস্যের ব্যঞ্জন এবং নাপ্পি মগেদের

অতি প্রিয়। যোগেশ চেষ্টা চরিত্র করিয়া কোন গতিকে তাহা উদরস্থ করে। কিন্তু দত্তার মহা বিপদ্, সে চিরদিন নিরামিষভোজী, জলবিন্দু স্পর্শ করে না। মগ-গৃহিণী কিছু কিছু তাহাকে দুগ্ধ দেয়। এমন করিয়া দুই চারি দিন পাগ্‌শালীর গৃহে তাহাদের অতিবাহিত হইল।

চাঁদ উঠিয়াছে। খালও জলে ভর্ত্তি। কূলে ঘন বাঁশ বন। খালে নামিবার জন্য বনজ কাষ্ঠের পৈঁঠা। দত্তাদেবীর এক্ষণে আর আশ্রমের ন্যায় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা সম্ভব নহে। এই নিরিবিলি জায়গায় যোগেশকে সে ডাকিয়া আনিয়া পরামর্শ করিতে বসিয়াছে। দত্তা বলিল "আপনি তো নাপ্পি ও শুট্‌কী মাছের ভক্ত হয়ে পড়েছেন। এদের হাত থেকে মুক্তির চেষ্টা আদৌ দেখি না। কোন দুর্ভাবনাই তো আপনার নাই দেখছি!"

যোগেশ দত্তাদেবীকে এত সহজ করিয়া পাওয়া যায়, কল্পনা করে নাই; খুসী হইয়া বলিল, "একটু একটু আছে। নাপ্পিকে যদি আপনি দোরস্ত করে নিতে পারতেন—সেটুকুও থাকতো না। না খেয়ে এমন করে' কদিন বাঁচবেন?"

বিপদের দিনে এই পরিস্থিতির মধ্যে যেন ভিতর থেকেই ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটে—দত্তাদেবী নিঃসঙ্কোচে বলিল, "এরকম অভ্যাস আমার কিছু কিছু আছে। আমার জীবন তপস্যার; বাঁচার ভাবনা আপনার না করলেও চলবে। মুক্তির উপায় কিছু ভাব্‌ছেন কি?"

যোগেশ—এই সুযোগে দত্তাকে ছাড়িয়া কথা চাহে না—ঘুরাইয়া বলিল—"সেটাও আপনার জন্য যদি হয় ভাব্‌তে পারি।"

"কেন, আপনি কি মুক্তি চান না?"

"আমার বন্ধন আর মুক্তি, দুইই তুল্য। না আছে আশা, না আছে কোন আদর্শ। স্রোতের শৈবাল ভেসে চলেছি নিশ্চিন্তে—আজ এইখানে ঠেকা খেয়েছি, আবার কোথায় গিয়ে পৌছাব কে জানে! আপনার জন্য ভাবতে যদি বলেন, রাজী আছি।"

—"দয়া করে' তাই না হয় করুন—আর উদাসীন থাকবেন না।" যোগেশ এ কথায় যেন দত্তার অন্তরের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া পাইল—কিন্তু ঠিক এই সময়ে পাগ্‌-শালীর পত্নী উমাচিং-এর গলা পাওয়া গেল। দত্তা নিঃশব্দে সভয়ে প্রস্থান করিল। যোগেশ উঠিল না। আনন্দে ও বিস্ময়ে বসিয়া বসিয়া নানা চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

কল-কল-নাদে জলরাশি ছুটিয়া চলে, চাঁদের আলোয় এই নূতন ভুবন ভাসিয়া যায়। শর-বনে শকুনী-শিশু কচি ছেলের ন্যায় ককাইয়া কাঁদে—বকের পাখার ঝাপটায় শব্দ উঠে। ঘণ্টাপোকা ডাকে, যেন দেবমন্দিরে আরতির বাদ্য বাজে। বাতাসে বাঁশপাতা নড়ে। যোগেশের জীবন-রঙ্গ এই অকল্পিত প্রকৃতির তালে দুলিয়া উঠে, কণ্ঠে উঠে গুন্ গুন্ সঙ্গীত, তবে তাহা ছন্দোহীন বেসুরা।

আগাগোড়া জীবনটা আজ যেন ব্যর্থ বলিয়া মনে হইল। কোথাও সে চিত্তের দৃঢ়তা খুঁজিয়া পাইল না। পিতৃভক্তির শিকড় দৃঢ় ছিল না, তুচ্ছ কারণে উপাড়িয়া আসিল। সে আজ নিরাশ্রয়, গৃহহারা। শাস্তির প্রগল্‌ভতা সে ক্ষমা করে নাই, অস্থির চিত্তের ক্ষণিক উত্তেজনায়। হরি-সাধনের ধর্ম্ম দত্তার কটাক্ষে ভাসিয়া গেল—আরও কি হয় কে জানে! উমার পলকহীন স্নেহদৃষ্টি তাহাকে পাগল করিয়াছে। সত্য কি? কিছুই না—মর্ম্ম কোথাও সে খুঁজিয়া পায় না। দত্তাদেবীর কাছে যে প্রতিশ্রুতি, তাহাও সে রক্ষা করিল না। দেশ-সাধনার ব্রতও ভাঙ্গিল। মহাপুরুষের ইন্দ্রজাল তাহাকে বিমূঢ় করিল। একে একে জীবনের সমস্ত অতীতটা আজ অত্যন্ত লঘু মনে হইল। উচ্চ-শিক্ষিত বলিয়া তাহার আর গর্ব্ব নাই। এইজন্য এই বন্য জাতির মধ্যে উদ্দেশ্যহীন জীবনটা তার অনায়াসেই কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু দত্তা দেবী? লক্ষ্যহীন অসার জীবনে যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক্ দেয়—তখনই সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। ছাত্রজীবনের গুরুত্বের মূল্য শাস্তির প্রতি বিজাতীয় বিরক্তিতে লঘু হইয়া গেলেও উমার স্মৃতি কি হৃদয়ে দুরপনেয় রেখা সৃষ্টি করে নাই? কৈ কিছুই তো তাহার চিত্তে দৃঢ় সংস্কার সৃষ্টি করে না। মহাপুরুষের প্রভাবও না, দত্তাও না; উমাও নহে। সে উদাসীন, হিমাদ্রির ন্যায় সে বিশাল দুর্ব্বোধ্য। দুশ্চিন্তায় সমস্ত হৃদয় ভরিয়া যায়। কখনও দম্ভ করে, কখনও বা নৈরাশ্যক্ষুব্ধ হইয়া সে ভাবে—জীবনটা শুষ্ক-বক্ষ বালুময় নদীর ন্যায় অসার অকিঞ্চিৎকর। জ্যোৎস্নার

প্রাখর্য্য মলিনমূর্ত্তি ধরিল, যোগেশের হৃদয় বেদনায় মুষ্‌ড়িয়া পড়ে। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি বোধ হয় গভীর হইয়াছিল। কীট-পতঙ্গের শব্দ আর তেমন জাঁকাল নহে। পক্ষিগণের পাখার ঝাপটা আর বড় শুনা যায় না। আপনার কথা ভাবিতে ভাবিতে যোগেশের সবখানি অবসন্ন হইয়া পড়িল।

দত্তা আবার আসিল। যোগেশের মলিন দৃষ্টি। দত্তা বলিল "ভাব্‌তে সুরু করেছেন বুঝি?"

—"না। নিজের কথা ভাবছি।"

—"এই যে বল্‌লেন আমার কথা ভাব্‌বেন!"

যোগেশ ঘটনার সংঘাতে যেন অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, কাতরকণ্ঠে বলিল "তবে বসুন দত্তা দেবি। কাছে কাছে থাকুন, যদি ভাবান তবেই, নতুবা আমি কিছু নয়।"

দত্তা করুণার্দ্র হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। যোগেশ দত্তার দিকে চাহিল। চাঁদটা সম্মুখেই ছিল, অনিন্দ্য মুখশ্রী। অপূর্ব্ব কান্তি। এমন রূপ সে কোথাও দেখে নাই। যুগপৎ উমাকে মনে হইল। এমনই তাহার অনাবরণ শ্রী দেখিয়া সে কি একদিন মুগ্ধ হয় নাই? সকল ইন্দ্রিয় মুক্ত অবাধ রাখিয়া, সে যে উমাকে দেখিয়াও এই তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল। যাহা কিছু সুন্দর, শোভন, কেন সে সেইখানেই নিজেকে এমন করিয়া হারাইয়া ফেলে—রূপের পূজারী সে কেমন করিয়া হইল? কিন্তু শান্তিকে সে এমন করিয়া দেখিল না কেন? সেও রূপসী; কিন্তু তাহার রূপ যেন একটা জলন্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় তীব্র এবং কঠিন। উমার কান্তি স্নিগ্ধ শিরীষ-কুসুমের ন্যায় কমনীয়, কোমল। হৃদয়টারও তুলনা নাই। আর এই দত্তা প্রখর বিদ্যুদ্বর্ণা, হৈমপ্রতিমার ন্যায় চিত্ত জুড়িয়া বসে, জ্যোতিচ্ছটায় অন্ধকার হৃদয় উদ্ভাসিত করে। এত রূপ, কিন্তু প্রাখর্য্য নাই। সিতাভ জ্যোৎস্নার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ তাপহীন হয়। কিন্তু জীবন যার অর্থহীন, তার এই মোহ মৃত্যু। যোগেশ চক্ষু বুঝিল। বুকে কিন্তু আসক্তির প্লাবন। নয়নের দুয়ার পুনরায় খুলিয়া গেল—সম্মুখে দত্তা। সে আজ রূপের উপাসনায় বিভোর—দত্তা কি করিবে, হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যোগেশের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল "শুনবেন আমার কথা। আমি এক যুবতীর হঠকারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে, পিতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে' গৃহহারা হয়েছি। এক মানুষের প্রভাবে আপনার কাছে এসে একদিকে আপনি, অন্যদিকে মহাপুরুষের ইন্দ্রজালে বন্দী হলুম। আড়ষ্ট জীবনে উমার স্নেহ প্রলেপ ভুলে' যাওয়ার বস্তু নয়; অদৃষ্টের পরিহাসে কিন্তু কিছুই স্থায়ী নয়। দেশব্রত গেল, ধর্ম্ম গেল, উমাও গেল—ভাস্‌তে ভাস্‌তে এখানে শুধু আমি আর আপনি—।" যোগেশ আবার কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ দত্তা বলিল "আমার কথাটা ভাবতে বলে' গিয়েছিলুম, কিন্তু আপনি ভাবছেন নিজের কথাই"—যোগেশ চুপ করিল।

দত্তাদেবী স্থির; দৃষ্টি তার নদীর অপর পারে।

"আপনি বেশ স্বার্থপর লোক, আমার কথাটা আর একটু শুনুন—"

"সময় নেই, যোগেশবাবু—গৃহস্বামী ঘুমিয়েছেন। গৃহিণীও নিদ্রাভিভূতা। রাত্রি অনেক হয়েছে, কথা আমাদের সেরে' নিতে হবে—এমন সুযোগ কাল নাও পেতে পারি।"

"কেন কে আমাদের আলাপ বারণ করে!"

"তা' বুঝি আপনি জানেন না! মগেদের বাড়ীতে অবিবাহিত কোন পুরুষ রাত্রিতে থাকার হুকুম নেই।"

"কেন পাগশালীর পুত্রেরা—রাত্রে তারা যায় কোথা? বাদুড়ের মত গাছের ডালে ঝোলে না কি?"

"আপনি এ সবের কিছু খবর রাখেন নি?"

"প্রয়োজন কি আমার! তা' ছাড়া আমিও তো অবিবাহিত?"

"আপনার ঠাঁই এ বাড়ীতে নাই—"

"কে বল্‌লে!"

সে হাসিয়া বলিল, "রাত্রিভোজনের পর আপনি বাড়ীর বাহিরেই রাত কাটান। সে হুঁস্ আপনি রাখেন না।"

যোগেশ নিজের অবস্থাটা এইবার বুঝিয়া লইল। সত্যই তো রাত্রের ভোজনের পর সে এই বন্য কাষ্ঠে, খড় ও তৃণের মগ-ভবনের বাহিরেই রাত্রিযাপন করে। পল্লী-

পথের ধারে দিবসে একটা বাঁশের মাচানের উপর পাড়ার ছেলেরা বসিয়া হৈ চৈ করে। সেইখানেই তাহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। দত্তা থাকে বাড়ীর ভিতরে। যোগেশের রাত্রি কাটে বাহিরে বাহিরে। সে অবাক্ হইয়া বলিল "এদের ছেলে ছুটো তবে থাকে কোথায় ?"

"চেরাঙে।"

"চেরাঙটা কি ?"

"তাও বুঝি জানেন না? চেরাঙ্ হচ্ছে, ছেলেদের আড্ডা। তারা বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে, কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় বাড়ীতে থাকার তাদের অধিকার নেই। আপনি যেখানে থাকেন, ওটা ছোট চেরাঙ্। প্যাগোডায় যাওয়ার সময়ে মধ্যপথে একটা আটচালার মত ঘর দেখে' থাকবেন। সেইখানেই এই মগ-পল্লীর যত অবিবাহিত পুরুষ আড্ডা দেয়, রাত্রি-যাপন করে।"

"কেন বলুন তো ?"

"মগ্ সমাজের পবিত্রতা-রক্ষার জন্যই এই অনুশাসন।"

"আপনাদের আশ্রমের চেয়েও কড়া শাসন দেখছি !"

"বিদ্রূপ করবেন না। চরিত্র-রক্ষা সব জাতিরই পরম ধর্ম্ম। যে জাতির নৈতিক চরিত্র যায়, সে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। মগেরা এই দিকে খুব সতর্ক।"

"কিন্তু আপনি কি মনে করেন, মগেরা আমাদের চেয়ে চরিত্রবান্ ?"

"সেটা নির্ভর করে শিক্ষা ও সাধনার উপর। আমি এদের সমাজব্যবস্থার কথাই বলছি। অবিবাহিত নারী-পুরুষের একত্র থাকায় সর্ব্বক্ষেত্রেই পাপের ফল্গু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়, এই ব্যবস্থায় তাহার কিছু লাঘব হওয়া অসম্ভব কথা নহে। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন না ?"

বিগত তিন দিন তাহারা এই মগ-গৃহে বন্দী। দিবাভাগে এইরূপ মুক্তভাবে কথা কহিবার অবকাশ তাহাদের হয় নাই। মগেদের ছেলেরা সংসারে আহারাদি করিতে আসে, খানিকক্ষণ হৈ চৈ করিয়া তাহারা চলিয়া যায়। মেয়েদের সহিত বিবাহিত পুরুষ ব্যতীত অন্যের পক্ষে নিবিড় আলাপের সুবিধা নাই। বিশেষতঃ, পাগ্‌শালী এই দিকে খুব সতর্ক। গৃহস্থের আভিজাত্যানুসারে এই নীতির কড়াকড়ি হয়। পাগশালী নিজেকে এই শ্রেণীর লোক মনে করে। উমাচিং খুব সুশীলা। পুত্রদের স্নেহ-যত্নের সীমা নাই। কিন্তু ফুঙ্গির অনুশাসনে সে ছেলেদেরও বাড়ীতে রাখে না, চেরাঙে পাঠাইয়া দেয়। নবাগত অতিথি যোগেশের উপর সে অত্যন্ত স্নেহশীলা।

কিন্তু পাগ্‌শালী তাহাকে বাড়ীর বাহিরে ঐ ক্ষুদ্র চেরাঙে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। আজ যোগেশকে দত্তা দেবী খালের ধারে সঙ্কেতে ডাকিয়া লইয়া কথা সুরু করিয়াছিল; কিন্তু গৃহস্থ না ঘুমাইলে নিশ্চিন্ত আলাপের সুবিধা নাই, তাই গভীর রাত্রে দত্তা যোগেশের সহিত মুক্তির পরামর্শ করিতে আসিয়াছে।

পুরুষের সহিত নারীর এই নির্জ্জন আলাপ নিরাপদ্ নহে, যোগেশের সহিত আলাপ সুরু করিয়া দত্তা তাহা বুঝিয়াছিল। যোগেশ দত্তাকে নিরিবিলি পাইয়া হৃদয়ের দুয়ার খুলিবার যেন উপক্রম করিতেছে, এইরূপ আভাষ যখন পাইল, দত্তা তখন সতর্ক হইয়া মগপল্লীর পরিস্থিতির কথা পাড়িল। যোগেশের প্রকৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া নৈতিক চরিত্ররক্ষার যে সনাতন প্রাচীর, তাহা লঙ্ঘন করা দোষের নহে—এইরূপ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলে, দত্তা দেবী তাহাকে একটু তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। যোগেশ তাহার উত্তরেই বলিল "আমি বিশ্বাস করি না সেই নৈতিক ধর্ম্ম, যাহা মানুষের শাসনের অনুযায়ী গড়ে' উঠে। স্ব-স্ব রুচির উপরই ইহা নির্ভর করে। সেখানে পীড়ন, সমাজ সেইখানেই পঙ্গু। হিন্দু জাতির উৎসন্নের পথ তাই এমন সুপ্রসারিত। অর্থের সদ্ব্যবহার আছে, চরিত্রেরও তাহাই। কিন্তু একের ব্যবহার, অন্যের চক্ষে বিচারবিভ্রাট স্বাভাবিক। এইরূপ স্থলে মানুষের প্রতি অবিচারই করা হয়।"

দত্তার কথা বাড়াইবার ইচ্ছা ছিল না। সে যত শীঘ্র পারে, এই বন্দিজীবন হইতে মুক্তি চায়। তাহার আগাগোড়া জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অণু-পরমাণু সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার প্রভাব সে এক্ষণে অতি তীব্রভাবেই অনুভব করিয়াছিল। যোগেশ হরিসাধন নহে। হরিসাধন যোগেশের ন্যায় অর্ব্বাচীন যুগের শিক্ষায় সংস্কৃত-বুদ্ধি হইলেও, আপনাকে মহাপুরুষের কাজে সে উৎসর্গ করিয়াছে। মহাপুরুষের স্বপ্নে ও আদর্শে তাহার সবখানি, এই সঙ্কল্প জীবনে সিদ্ধ করার জন্য

হরিসাধন সততই ধ্যাননিরত থাকে। যে দ্বার দিয়া সে দীক্ষার বীর্য্য অন্তরে লইয়াছে, তাহা সে রুদ্ধ করিয়াই রাখে। তাহার দৃষ্টি ও শ্রুতি তন্ময় আত্মধ্যানে। কিন্তু যোগেশের এ অবস্থা নহে। মহাপুরুষের প্রভাবে সে বিমোহিত বটে, কিন্তু চিত্তের আসক্তি মহাপুরুষের দানকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করে নাই; বরং তাহা সুযোগ পাইলে বিস্তীর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে চাহে। দত্তা অনাঘ্রাত ফুলের মত মহাপুরুষের বক্ষপুটে শিশুকাল হইতে যৌবনান্ত পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিয়াছে। সে পাইয়াছে নূতন প্রাণ, নূতন প্রকৃতি। আজিকার মত এমন পরীক্ষায় সে কোন দিন পড়ে নাই; এমন সম্ভাবনাও যে হইতে পারে, এ কল্পনাও সে করে নাই।

মহাপুরুষ চাহিয়াছেন দত্তার নিষ্কলঙ্ক জীবন, অসাধারণ চরিত্র। কৈশোরে তাহার এই দাবী বিরক্তির সহিত উপেক্ষা করিতে তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়াছে, কিন্তু তখন কোন উপায় ছিল না যে, এই অস্বাভাবিক বন্ধন হইতে সে মুক্তি লাভ করে। তারপর উচ্ছ্বসিত যৌবন-তরঙ্গে প্রাণের একূল ওকূল উপচিয়া পড়িল। কত অজানা সুখের সন্ধানে হিয়া আকুল হইল; মহাপুরুষ সম্মুখে ধরিলেন মানবপ্রেমের পূর্ণ অমৃত-ঘট। কত জন্ম সেই মঙ্গলপ্রতিমার পূজায় দেওয়া যায়, তাহার সংখ্যা-নিরূপণ হয় না। বুঝি এইখানে দাঁড়াইয়া মানুষ যৌবন যাচিয়া দেয়—আর এই মহামানবতার কল্প-বিগ্রহের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কণ্ঠে স্বতঃই বাণী স্ফুরিত হয়, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল"। দত্তার সমস্ত জীবন ছাইয়া মহাপুরুষের বাণী ও ভাব ঘনীভূত হইয়া যেন তাহাকে বন্দী করিয়াছে, কি এক লোকাতীত দেবতার মন্দিরে। সেখানে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, অগ্নি তারকা নাই। সমীরণ সেখানে অচঞ্চল স্থির। মধুগন্ধে চিত্ত বিমোহিত হয়। নয়ন বহিয়া আনে অলৌকিক জগতের অভাবনীয় স্বপ্নসৃষ্টি, শ্রুতি ভরিয়া উঠে অনাহত মুরলীধ্বনিতে। দত্তা নির্ব্বাক্ হইয়া দেখিয়াছে, শুনিয়াছে অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য, নব ঋক্। বিশ্ব-ভুবনে যদি অন্তরের সেই অপূর্ব্ব অনুভূতিকে রূপে রূপে ছাইয়া দিতে পারে, তবেই তাহার জীবন সার্থক হয়। তাহার শিক্ষা, সাধনা, তপস্যা সবই বিশ্বমানবের প্রয়োজনে। এই চিন্তায় দীর্ঘ দিন একাগ্রচিত্তে একই ক্ষেত্রে অবস্থান-কালে এই আদর্শ তাহার চিত্তে দৃঢ় শিকড় গাড়িয়াছিল। তাহার অন্তরবীণার গান উঠিতেছিল বিশ্বে ইহারই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সৃজনের। অন্তরে শতদল বিকশিত হইতেছিল মকরন্দে বিশ্ব ভরাইতে। যেন গিরিশিরে ঘনীভূত হিম-রাশি সূর্য্যকিরণে দ্রবীভূত হইয়া নির্ঝরিণীর মত তাহার অন্তরের মণিকোঠার সঞ্চিত জ্ঞানরাশি জাতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে উপচিয়া প্লাবনসৃষ্টির পথ খুঁজিতেছিল—এমনই সময়ে জীবনের এই কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা। যোগেশ দয়িতের ন্যায় তাহার প্রণয়প্রার্থী। এ প্রার্থনা তাহার কাছে নহে, যেখানে রূপ, যেখানে যৌবন সেইখানেই তাহার চাওয়া। যোগেশ উপলক্ষ্য, পুরুষেরই এই প্রকৃতি।

কিন্তু হরিসাধন এরূপ নহে। তাহার মনে পড়িল—যোগেশের ন্যায় হরিসাধনও একদিন আসিয়াছিল এমনই কি এক অব্যক্ত আকর্ষণে মহাপুরুষের সন্নিধানে। সেদিনও সে চাহিয়াছিল যৌবনের দিকে এমনই আকৃষ্ট নয়নে; কিন্তু সে যেন কি পাইয়া সেই যে দৃষ্টি নত করিয়াছে, নয়নপল্লব আর ঊর্দ্ধে উঠে না। যাহা সে পাইয়াছে, ধ্যান-মগ্ন যোগীর ন্যায় সে যেন তাহারই পুষ্টি চায় একেন্দ্রিয় হইয়া। দত্তা নির্ভয়ে তাহার দিকে চাহিতে পারে, প্রত্যা-ঘাতের লেশমাত্র সম্ভাবনা সেখানে নাই। হরিসাধনের শীর্ণ কমনীয় মূর্ত্তি অতর্কিতে যেন তার মাঝে স্থান করিয়া লইয়াছে। এইখানে সে পাইয়াছে অলৌকিক যুক্তি। প্রয়োজনের তাগিদ থাকিলে, এইখানেই সে নিঃসঙ্কোচ সহযোগিতা পাইবে এমন প্রত্যয় করে। কিন্তু যোগেশ প্রতিহত করে তার দৃষ্টি। থিতাইতে দেয় না তাহাকে দত্তার মধ্যে। দত্তার দিকে চাহিতে গিয়া সে নিজেকেই সন্তাড়িত করে। নিজেই হিন্দোলিত হইয়া হিজিবিজি হইয়া যায়। যোগেশের যে একটা রূপ আছে, একটা পূর্ণাঙ্গ ছন্দোবদ্ধ জীবন আছে, তাহা ধরা পড়ে না দত্তার চক্ষে। কি নারী, কি পুরুষ, তাহাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করার এক অপূর্ব্ব বিজ্ঞান দত্তা আয়ত্ত করিয়াছে। ধ্যান-সমাহিত, নিষ্কামচিত্ত, স্থির-মূর্ত্তি সে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু দর্শনীয় বিষয়ের চাঞ্চল্য ও আকাঙ্ক্ষা পীড়িত

চঞ্চল মূর্ত্তি তাহার গ্রহণযোগ্য হয় না। যোগেশকে তাহার এইরূপই মনে হইয়াছে গোড়া হইতে। তারপর যোগেশের ইতিহাস আশ্রমকর্ত্রীরূপে সে যাহা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে তাহার এই ধারণা হইয়াছে যে, যোগেশ কাহারও হইতে চাহে না, সব কিছুকে তাহার করিয়া লইতে চাহে। তাহাই তাহার প্রিয়, যাহাতে তাহার চিত্ত সুখ পায়, তৃপ্তি পায়। দত্তা এই ক্ষুধিতের ভোজ্য হইতে চাহে না, এমন শিক্ষা তাহার আছে। কিন্তু এই বিপদ্ হইতে আজ তাহার মুক্তি চাই। নৈতিক চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে যোগেশের মনের লক্ষ্য কোথায়, সে তাহা বুঝে না এমন নহে। অনেক দর্শন, অনেক মনোবিজ্ঞান সে অধ্যয়ন করিয়াছে, অনুভব করিয়াছে। তাহার সাধন শুধু ভাব ও কথা নহে। অনুভূতির ভিতর দিয়া তাহা রূপ লইয়াছে জীবনে। তাই সে কথা বাড়াইল না। একেবারেই বলিল, "আপনার সহিত পরিচয় হ'ল। আশ্রমে ফিরে' এই প্রসঙ্গের আলোচনা হবে। এখন আমার কথা শুনুন, চেরাঙে গিয়ে খুঁজে দেখুন, এমন মগ যুবক আছে কিনা, যারা হিন্দী বুঝে, বাংলা বুঝে। পাগশালী প্রাচীন লোক আর তার বাড়ী আভিজাত্যপূর্ণ; কিন্তু সবাই তাহা নয়। একটু বাহিরে ঘোরা-ফেরা করে' এমন লোক বার করুন, যাদের ভিতর দিয়ে আশ্রমে আমাদের সংবাদটা পৌছায়।"

যোগেশের নেশা ভাঙ্গিয়া গেল। একটা কিছু না পাইলে যোগেশ নিজেকে চিরদিনই নিঃস্ব মনে করে। এই ক্ষেত্রে দত্তা প্রার্থী বটে, কিন্তু যেন ছোঁয়া দিতে চাহে না। একটা কিছুর উপর ভর করিয়া দত্তার সে যে প্রার্থনা পূর্ণ করিবে, এখানে এমন কিছু মিলে না। তাই সে উদাসীনের মত বলিল "আপনার মুক্তির জন্য এই কাজটা শক্ত নয়। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর সেদিনও আপনি দেননি, আজও আমার অনুনয় আপনার কাণে পৌছে না।"

দত্তা বলিয়া ফেলিল "কি বলুন তো?"

"মানুষ বাঁচে কি নিয়ে? আপনাকে ঘিরে' জগৎ-পরিক্রমণ স্বপ্নেই সম্ভব। জীবনে তাহা ঘটে না। আমায় বল্‌তে পারেন কি কেন্দ্র করে' জীবন লীলায়ত হয়?"

"ইহার উত্তর আজ দিতে পারব' না যোগেশবাবু, সে সময় আজ নহে। আর সত্যই আমি কাতর অনুনয় জানাই, মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আমি এখানে একদিনও থাক্‌তে চাই না।"

"এমন করে' আপনাকে হয় তো আর পাব না, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আমি যেন অন্ধকারে পথ হারিয়ে চলেছি। একটু আলো দিতে পারেন না কি?"

দত্তা আবার বলিল "বলুন।"

"কি আপনি! মানুষের যে অধিকার, যে প্রকাশ, সমাজের মরিচা-ধরা শৃঙ্খলে একে তা' রুদ্ধ, সমাজের এই বন্ধন-দশার বাহিরে জাতিকে আনার জন্য জগতে আজ রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থ-বিজ্ঞান নিয়ে কত আলোচনা, কত আন্দোলন! আর আপনারা চলেছেন ইহাকে উপেক্ষা করে' অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। নৈতিক ও ধর্ম্মাচারের আবেষ্টনে কেমন করে' মানুষ এখানে প্রাণ পাবে, আলো পাবে, আনন্দ পাবে, আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন?"

দত্তা প্রমাদ গণিল। বুঝি ভোর হইয়া আসে। যে অভিসন্ধি লইয়া যোগেশকে অতি সহজে এইখানে ডাকিয়া আনা, আজ তাহার সম্ভাবনা নাই। সত্যই তাহারা সচকিত হইয়া শুনিল ভুম্ ভুম্ করিয়া এক বিকট শব্দ। দত্তা বলিল "আজ আপনার দার্শনিক সংশয় নিয়েই রাত্রি শেষ হ'ল। চেরাঙে ফুঙ্গিরা 'ভুম্' বাজায়—গৃহস্থদের শয্যাত্যাগের ডাক। উমাচিং এখনই উঠে পড়বে, কাল এইখানেই দেখা হবে। কথা আপনাকে বেশী কইতে দেব না; আগে মুক্তি, তারপর আপনার সঙ্গে যুক্তি ও বিচার।"

দত্তা ত্রস্ত-চরণে অন্তর্হিত হইল। যোগেশ ভাবিল—কথাই বড় হইয়া যায়, হৃদয়-প্রকাশ হয় না। কিন্তু অন্তরসমস্যার সমাধান এইখানেই শেষ করিতে হইবে। নতুবা আশ্রমজীবন নিরর্থক কপটতা।

(ক্রমশঃ)

ভ্রম-সংশোধন—'ভারতীয় ভেষজে গবেষণা' শীর্ষক প্রবন্ধের ৫২৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের একাদশ লাইনে ১০+২০+১৫+৬+১=৫২ স্থলে ১৫+২০+১৫+৬+১=৫৭ হইবে এবং দ্বাদশ লাইনে ৫২+৬=৫৮ স্থলে ৫৭+৬=৬৩ হইবে।

মত ও পথ

সি-পির শিক্ষা

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গোড়া হইতেই যেন অভিশপ্ত—একটা ধারাবাহিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের স্রোতঃ তাহার উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। ইহার মূলে যে ভেদ-মূলক মনোবৃত্তি ও মনোমালিন্য, তাহাই ঘটনার মধ্য দিয়া ব্যক্ত না হইয়া পারে নাই। ফলে হিন্দীভাষী ও মারাঠীভাষী দুই বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসী লইয়া যে মধ্যপ্রদেশের রাষ্ট্র-গঠন, তাহার মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য না ঘটায়, সেই ভেদ-বিবাদের বিষাক্ত আব্‌হাওয়া ধীরে ধীরে মন্ত্রি-মণ্ডলকেও জর্জ্জরিত করিয়া তুলে ও ইহাই পরিণামে অতি কদর্য্য আকারে অভিব্যক্ত হইয়া কংগ্রেসের উচ্চ নীতি ও মর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করার সুযোগ দান করিয়াছে।

মন্ত্রিমণ্ডলীর এই অন্তর্বিবাদে পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণে যে আলোচনা, তাহার অনেকখানিই মনোবৃত্তি-মূলক—কারণ বিবাদের মূল কারণ কোনও পক্ষই সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন নাই, করিতে পারেন না। সুতরাং পদচ্যুতি ব্যাপারে ডাঃ খারে ও বিদ্রোহী মন্ত্রিত্রয়ের মধ্যে দোষ-বণ্টন লইয়া কোন পক্ষের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ করা স্বাভাবিক হইলেও, উহার মূল্য কখনই অধিক নহে। এই ঘটনা উপলক্ষে কংগ্রেসের যুদ্ধযন্ত্ররূপে যে শক্তি-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয়। সংবাদপত্রে সমালোচনার প্রত্যুত্তরে ৬ই আগষ্টের "হরিজন" পত্রে মহাত্মাজী নিজে ইহাই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

কংগ্রেস যদিও গণ-তান্ত্রিক মণ্ডলী, তত্রাপি ইহা আজ রণক্ষেত্রে সামরিক নীতি অনুসারেই পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য-তন্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, সামরিক শৃঙ্খলা ও কার্য্যপদ্ধতি দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করাই কংগ্রেসের পক্ষে কর্ত্তব্য ও একমাত্র উপায়। এই সামরিক বিধানেই ডাঃ খারের কর্ম্ম ও আচরণের উপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী দণ্ডবিধান করিয়াছেন। এই দণ্ড সামরিক দণ্ডের মতই যদি গুরু ও কঠোর হইয়া থাকে, তাহা অনিবার্য্য কারণেই ঘটিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী তাই লিখিয়াছেন—ডাঃ খারের কার্য্যের নিন্দা ও তাঁহার অযোগ্যতা বিষয়ে রায় না দিলে ওয়ার্কিং কমিটী গুরুতর কর্ত্তব্য-ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইতেন। তবে ডাঃ খারের ন্যায় প্রবীণ রাষ্ট্র-কর্ম্মী যদি তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের একপ্রকার মৃত্যুদণ্ড-স্বরূপ এই চরম দণ্ডাদেশ স্বেচ্ছায় মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতে না পারিয়া থাকেন, তাহাও সাধারণ মানব-চরিত্রের দিক্ দিয়া কেহই অস্বাভাবিক মনে করিবেন না।

ওয়ার্কিং কমিটী গভর্ণরের কার্য্যেও দোষারোপ করিয়াছেন—"H. E. the Governor of C. P. has shown by the ugly haste with which he turned night into day and forced the crisis that has overtaken the province, that he was eager to weaken and discredit the Congress in so far as it lay in him to do so." ডাঃ খারের মতে, গভর্ণর বাহাদুর সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—তিনি আইনসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাঁহার দিক্ দিয়া কংগ্রেসকে সুযোগ বুঝিয়া আঘাত দেওয়ার কোনই গূঢ় অভিসন্ধি থাকে নাই। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই কথা স্বীকার করেন না। তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত—"the Governor's action conformed to the letter of the law, but it killed the tacit compact between the British Government and the Congress." এইখানেও রাজনৈতিক ও সমরনৈতিক উভয় দিক্ দিয়া মহাত্মার মতে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে যে "Gentleman's

agreement" হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সেই জন্য তিনি রণকুশল সেনাপতির ভাষায় ওয়ার্কিং কমিটীর এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি একটী বন্ধুজনোচিত সতর্কতার সঙ্কেত বলিয়া বর্ণনা করিতে কুণ্ঠা করেন নাই—গভর্ণমেণ্ট যদি কংগ্রেসের সহিত খোলাখুলি বিরোধ বাধাইতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে উক্ত প্রকার ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর বাঞ্ছনীয় নহে।

আমাদের মনে হয়, মধ্য প্রদেশের এই ঘটনায় ডাঃ খারের প্রতি দণ্ড-বিধানের জন্য তাঁহার বন্ধুমহলে ও অনুরাগী মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হইলেও, এ বিক্ষোভ সাময়িক—কংগ্রেসের সামরিক ভাব ও সাধনা স্পষ্টতর হওয়ায়, তাহাতে তাহার গরিমা-বৃদ্ধিই হইয়াছে। গণতন্ত্রের সাধনা আজ গৌণ, ভারতে মহাত্মাজীর তপস্যায় একটা এমন দৃপ্ত, আত্ম-বিশ্বাসী, সুদৃঢ় রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছে, যাহা সামরিক বিধানে সংহতি-গঠন ও কর্ম্মচালনা করিয়া ধীরে ধীরে ইংরাজের হাত হইতে ভারতের শাসন-বীর্য্য-গ্রহণের দাবী ও স্পর্দ্ধা রাখে। আমরা দেখিতেছি—মহাত্মার ব্রহ্মণ্য-বীর্য্যেই এই ক্ষাত্র শক্তির অভ্যুদয়। ভারতের ইহাই সনাতন ঐতিহাসিক বিধান। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মোহ কাটাইয়া ভারত ধীরে ধীরে যদি আত্মস্থ হইতে পারে, এ জাতি জগজ্জয়ী হইবে।

অনাস্থা-প্রস্তাব

বাঙালার হক-মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি অনাস্থাসূচক দশটী প্রস্তাবের মধ্যে তিনটী সংখ্যা-বাহুল্যে নাকচ হইয়াছে। অন্যগুলি আর উঠে নাই। ইহাতে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল অটল রহিল। তবে যখন গণনায় দেখা যাইতেছে, ২৪খানি ইউরোপীয়ান ভোটই এই আস্থানাস্থার পাল্লায় নিষ্পত্তির কার্য্য করিয়াছে, তখন ভোট-সংখ্যার অনুপাতে এই মন্ত্রিমণ্ডলের ভিত্তি জনসাধারণের হৃদয়ে তত দৃঢ়মূল মনে হয় না। অবশ্য সংবাদপত্র ও জনসভায় আন্দোলন ও সমর্থন দেখিয়া কোনও পক্ষের যথার্থ শক্তি-বিচার ঠিক হয় না। যাঁহারা এই মন্ত্রিমণ্ডলের সপক্ষে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্যের অভিজ্ঞতায় এক্ষণে আর তাহার উপর সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহাদের অনাস্থার অভিব্যক্তি এতদিন পরে আজ মুখর হইয়া উঠিয়াছে, এইটুকু স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বাঙালার রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ অন্যান্য কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের ন্যায় জনসাধারণ যে কংগ্রেসের পশ্চাতে ব্যূহবদ্ধ হইতে পারে নাই, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই দৌর্ব্বল্যের একাধিক কারণ আছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীই এই সকল কারণের জন্য অনেকাংশে দায়ী, ইহা নেতৃমণ্ডলীর মনে রাখা উচিত। কেন না, কমিউন্যাল এওয়ার্ড বাঙালার জনসাধারণের ঐক্যভঙ্গে মৃত্যুশেলের কার্য্য করিয়াছে, ইহা বর্ত্তমানে বাঙালার কংগ্রেসের পক্ষে কোনদিন শক্তিশালী হওয়া সম্ভব নহে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এই বিষয়ে বাঙালার প্রতি বরাবর ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া অবিচারের প্রশ্রয় দিয়াই আসিয়াছেন। কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল এই কারণে আজ ইউরোপীয়ান ব্লকের সহায়তায় প্রতিপক্ষের আঘাতেও অটল থাকিল—বরং ইহাতে তাহার দৃঢ়তর হওয়ারই সুযোগ ঘটিল।

যাঁহারা অনাস্থা-প্রস্তাব আনয়ন করেন, তাঁহারা হয়ত জয়ের আশা না রাখিয়াই শুধু রাজনীতিক চাল হিসাবে আত্মশক্তির পরিমাপের জন্যই এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন অথবা নিরপেক্ষ ইউরোপীয়ান ব্লক কিম্বা মুসলমান সদস্যদের কিয়দংশকে স্বদলে পাইবার তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের পরাজয় ঘটিয়াছে। ইউরোপীয় দলের প্রধান নেতা স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেলের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দৃঢ় গভর্ণমেণ্টের আশা পাইলে এবং কংগ্রেস পার্ল্যামেণ্টারী বোর্ডের শাসন-মুষ্টি তাহার উপর না থাকিলে, তাঁহাদের নূতন মন্ত্রিমণ্ডল সমর্থনে বিশেষ বাধা নাই। এইরূপ অবস্থায় কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল আজ ইঁহাদের সহায়তায় জয়ী হইলেও, বরাবর এই সহায়তা তাঁহারা পাইবেন, এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। সংখ্যার অনুপাতে এবার জয়ী ও বিজিত পক্ষে বিশেষ তারতম্য নাই; ইহার উপর দিন দিন প্রতিপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিলে, অতঃপর বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলকে জনমত-সমর্থন-লাভের জন্য খুব সতর্ক হইয়াই চলিতে হইবে—নতুবা পদে পদে শাসন-কার্য্যে বাধা ঘটিবারই সম্ভাবনা। আমরা আশা করি, প্রজার যথার্থ কল্যাণের মধ্য দিয়াই সেই সমর্থনলাভের জন্য অতঃপর তাঁহারা অবহিত হইবেন।

জাতি-রক্ষা

বিলাতের বৃষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্রাজ্যেতিহাসের রীডার স্নিঃ ম্যাক্ ইনস্ ইংরাজ জাতিকে উদ্দেশ্য করিয়া, সম্প্রতি এই সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—"গত কয়েক বৎসরের অবনতির হারের উপর ভিত্তি করিয়া, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এখন হইতে এক শতাব্দী কাল মধ্যে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ৪,৬২৬,০০০ ইহার অর্থ এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ ও জগতে বৃটিশ জাতিই নিশ্চিহ্ন হইবে।"

তাই তার স্বরে তাঁর এই উপদেশ—"Beget more children to fill up the unoccupied expanses of territory in the Dominions."

আর একজন রসিক ইংরাজ হয়ত এই কারণেই এক গ্রন্থ লিখিয়া ইউরোপের বিষাক্ত আব্‌হাওয়া হইতে সরিয়া আসিয়া বৃটিশ জাতিকে কানাডার বিস্তীর্ণ উপত্যকায় সবান্ধবে নূতন বসতি নির্ম্মাণ করিতে পরামর্শ দিতে কুণ্ঠা করেন নাই।

বৃটিশ জাতি ইংলণ্ডের বাস্তভিটা ছাড়িয়া নব উপনিবেশে উঠিয়া আসুক বা না আসুক, ইংরাজ জাতির এই ক্রমিক লোক-সংখ্যাহ্রাসের আসল কারণ কি, তাহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল স্বাভাবিক। সে সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক পণ্ডিতই বলিতেছেন—

"জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবসা ফাঁদিয়া এক শ্রেণীর ব্যবসাদার ইংরাজ জাতিকে জাহান্নামে দিয়া পকেট ভরিতেছে।"

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের স্বাস্থ্যবিভাগের সর্ব্বপ্রধান নিয়ামক স্যার জেম্‌স্ মার্চ্চাণ্ট বহু গবেষণা ও আলোচনার পর বৈজ্ঞানিক জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করেন ও সেই বিষয়ে সুচিন্তিত পুস্তক প্রচার করেন। কিন্তু ইংলণ্ডে তাঁর সে গ্রন্থের বড় বিশেষ সমাদর হয় নাই।

এদিকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টও এই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বা গর্ভনিরোধ ব্যাপারটিকে জাতি ধ্বংসের (race-suicide) নামান্তর বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন ও স্বজাতিকে ইহার বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ সাবধান করেন। জার্ম্মানী ও ইটালী গর্ভ-নিয়ন্ত্রণ কঠোর আইন করিয়া নিষেধ করিয়াছেন ও পক্ষান্তরে জন্মবৃদ্ধির জন্য ভাতা দিয়া ও অন্যান্য নানা প্রকারে উৎসাহ দিতে কসুর করিতেছেন না। এক বিখ্যাত জাপানী পণ্ডিত নিসিনৈরীর সুপ্রমাণিত সিদ্ধান্ত এই—"সন্তান ভগবানের দান। নারী সন্তানবতী হইলে স্বাস্থ্যবতীই হয়, বহু স্ত্রীরোগের হস্ত হইতে মুক্তি পায়। ঘন ঘন গর্ভ হইলে, সে গর্ভের শিশুর যে অকাল মৃত্যু ঘটে, এমন কোন প্রমাণই কোন দেশের আদম সুমারিতে মিলে না।"

ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ইতালী, জার্ম্মানীর ন্যায় অগ্রণী জাতির দূরদর্শী মনীষিগণ যে পদ্ধতির নিন্দা ও যাহারা কুফল হইতে স্ব স্ব জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য ঘন ঘন সতর্কতা ও যেখানে সম্ভব সুব্যবস্থাও করিতেছেন, সেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সপক্ষে কোনও কোনও ভারতীয় মনীষির সমর্থনকারী উক্তি মাঝে মাঝে পড়িয়া আমরা তাই দুঃখে ও বেদনায় ব্যথিত হইয়াই উঠি। এ জাতির আত্মরক্ষায় সনাতন বিধান উপেক্ষা করিয়া, খাল কাটিয়া ঘরে কুমীর ঢুকাইবার এ দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের ঘুচিবে কবে? সহজ ভোগের দায়ে আত্ম-সংযমের শক্তি হারাইয়া যদি পাশ্চাত্য জাতি মরিতে চাহে মরুক, কিন্তু ভারতের অর্ব্বাচীন তরুণ এই আত্মহত্যা ও জাতি-ধ্বংসের পথ হইতে যাহাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইদিকেই এ দেশের মনীষিগণ নিজেদের সত্য দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া অবহিত হউন—ব্যবসাদারের মোহে পড়িয়া তাঁহারা যেন হীন উঞ্ছবৃত্তি আর প্রশ্রয় না দেন, আমরা সেই জন্যই তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দুষ্ট বিজ্ঞানের কবল হইতে ভারতবাসীকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা ও তদ্বিষয়ে আইনযোগে নিষেধ করা আমাদের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ইহা বাল্যবিবাহ ও বহু-বিবাহ নিষেধ বা বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের চেয়েও জাতি-রক্ষার পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর বিধান বলিয়াই আমরা মনে করি।

স্ত্রীদের চরম পত্র

ধর্ম্মঘট যুগের আব্‌হাওয়া, তাই সিন্ধু-হায়দ্রাবাদের কয়েক জন বিবাহিতা পত্নী কোন আধ্যাত্মিক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-সাধনে উপদিষ্ট হইয়া, তাহাদের স্বামীদের স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছেন—তাঁহারা ইচ্ছামত পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন, উহাতে স্ত্রীদের কোনই আপত্তি থাকিবে না। এই সকল বিবাহ-ধর্ম্মঘটকারিণী নারীর মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন-বিবাহিতা ও কতিপয় সন্তানবতী জননীও আছেন—কিন্তু অতঃপর তাঁহারা আর সংসারধর্ম্ম-পালনে উৎসুক নহেন, ইহাতে স্বয়ং ইস্তফা দিয়া তাঁহারা পতিদের নব সংসার পাতিতে ঢালা হুকুম জারি করিয়াছেন।

এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও নিয়ম আমরা অবগত নহি। প্রাকৃত জীবন বিশুদ্ধ করিয়া অভিনব অসাধারণ জীবন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস ভারতে নূতন নহে; সুতরাং উক্ত সঙ্ঘ যদি সেই সমুচ্চ আদর্শে পরিচালিত হইয়া, দাম্পত্যে ব্রহ্মচর্য্য-বিধান প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই—বরং আমরা বলিব, ভারতের গার্হস্থ্য-জীবনকে শুদ্ধ, সিদ্ধ করার সাময়িক বিধান হিসাবে ইহা অতি কল্যাণকর, অবশ্য পালনীয় সামাজিক নীতিরূপে সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তনীয় হইতে পারে। কিন্তু এই কল্যাণকর সমাজনীতি তো তাহা হইলে পতি-পত্নী উভয়ের পক্ষে সমানভাবেই প্রয়োগ-যোগ্য হইবে। সিন্ধু-সঙ্ঘের প্রকাশিত সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা শুধু পত্নীগণকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা দিয়া

স্বামিগণের পুনর্বিবাহে কোন আপত্তি রাখেন নাই। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে, সেই সঙ্ঘের অধ্যাত্ম-গুরু নারীগণকে তাঁহার উচ্চাদর্শে যত সহজে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, নারীদের স্বামীদের তত সহজে পারেন নাই। ইহাতে গার্হস্থ্য-জীবনে ভেদবুদ্ধিই সঞ্চারিত হইবে—সংসার ভাঙ্গিবে। হয়ত, অনিচ্ছুক স্বামিগণকে একটু সায়েস্তা করিবার জন্যই এই আংশিক ব্যবস্থা—সময় পূর্ণ হইলে পুরুষের সুবুদ্ধির উদয় হইবে, তখন আংশিক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে।

যাহাই হউক, সিন্ধু-দেশীয়া নারীদের এই ব্যাপারে সমাজ-সংস্কারকগণের কৌতূহল-দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার পরিণামের বার্ত্তা জানিতে আমরা স্বভাবতঃই উৎসুক থাকিব।

বস্ত্রশিল্প ও তুলার চাষ

ভারতের বস্ত্রশিল্পে জাপানের প্রতিযোগিতা বর্ত্তমানে কিছু হ্রাস পাইয়াছে। চীন-যুদ্ধে জাপানের ব্যস্ততাই তার কারণ। ভারতের পক্ষে তাহার বস্ত্রশিল্পকে আরও বিস্তৃত করিয়া গড়িয়া তুলিবার ইহা সুযোগ দান করিয়াছে। এ সুযোগ কি ভাবে গ্রহণ করা যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-গণের দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতে এই বস্ত্রশিল্প-প্রসারের এখনও যথেষ্ট স্থান ও পরিসর আছে। এখনও বৎসরে ৬০ কোটী গজ কাপড় ভারতে আমদানী হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ২৩ কোটী গজ কাপড় ইংলণ্ড হইতে আমদানী হয়, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ঐ বৎসর ৪২ কোটী গজ বেশী কাপড় ভারতে প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলে, ৬০ কোটী গজ কাপড় এদেশেই প্রস্তুত করিয়া ভারত স্বাবলম্বী হইতে পারে।

কিন্তু অন্য দিকে চীন-যুদ্ধের ফলেই উত্তর চীন জয় করিয়া, জাপান ইতিমধ্যে যে প্রকার ব্যাপকভাবে তুলার চাষ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহা ভারতের পক্ষে শুভকর নহে। কারণ, ভারতীয় তুলার প্রধান ক্রেতা জাপান। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে মোট ২৯ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকার তুলা রপ্তানী হয়, উহার মধ্যে জাপানের অংশ ১৪ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকার। তৎপূর্ব্ব বর্ষে তাহার ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২৫ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা। উত্তর চীনের তুলা বুনিয়া জাপান চাহে স্বাবলম্বী হইতে—ইহা যেদিন সম্ভব হইবে, সেদিন ভারত তাহার তুলার প্রধান খরিদ্দার হারাইয়া বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন, জাপানের স্থানে পূর্ব্ব আফ্রিকায় তুলার বাজার সৃষ্টি করিয়া আমরা রপ্তানীর ঘাট্‌তি পূরণ করিয়া লইতে পারি। এদিকে চেষ্টা করা অন্যায় বলি না। কিন্তু শুধু রপ্তানী করিয়াই বাঁচিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ্ পন্থা নহে; কেননা, ভারতীয় বস্ত্রশিল্প যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে এদেশীয় তুলার বাজার এদেশেই সৃষ্টি করা অসম্ভব নহে। যে বাজার সুনিশ্চিত ও হাতের কাছে, তাহা ছাড়িয়া অনিশ্চিত বিদেশীয় বাজারের অপেক্ষায় থাকা কোন মতেই সমীচিন নহে। বর্ত্তমান জাপানের ন্যায় আন্তর্জাতিক বিবর্ত্তনে এইরূপ রপ্তানীর ক্ষেত্র যে কোনও সময়ে ভারতের পক্ষে রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু আমরা দেখি—বর্ত্তমানে ভারতীয় তুলা ভারতের কলসমূহে খুব কমই ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, ৩০ কোটী টাকার ভারতীয় তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে; পক্ষান্তরে ভারতীয় কলসমূহ বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছে ১২ কোটী ১৩ লক্ষ টাকার তুলা। এইরূপ ঘটিবার কারণ, ভারতীয় কলগুলি ভারতে উৎপন্ন মোটা আঁশযুক্ত তুলা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত নহে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বঙ্গীয় কারখানা মালিক সঙ্ঘের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস, এন মিত্র বাঙালায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদনে মনোযোগী হইয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে প্রাথমিক পরীক্ষাও আরম্ভ করিয়াছেন। পরীক্ষা সুসিদ্ধ হইলে, এদেশে উৎপন্ন তুলায় এতদ্দেশীয় কলগুলি কাজ চালাইতে সমর্থ হইবে।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের কর্ত্তৃপক্ষের মতে, বাঙালা-দেশের প্রতি বিঘা জমিতে ৪॥০ মণ কার্পাস অথবা ৪০।০ মণ শোণ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাতে চাষীদের প্রতি বিঘায় ৩৩॥০ টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা। চাষের বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ২১।০ আনা, সুতরাং বিঘা প্রতি লাভ দাঁড়াইবে ১২।০ আনা। বাঙলায় পাট-চাষে প্রতি বিঘায় ৪৸০ আনার বেশী লাভ হয় না। সুতরাং উদ্যোগী হইলে, বাঙালীর পক্ষে পাটের চেয়ে লাভকর আর একটী প্রধান অর্থশিল্প এই দেশেই গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

বাঙালার বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞমণ্ডলী এইদিকে সময়োচিত মনোযোগ দিবেন, আশা করি।

সাময়িকী

পরলোকে প্রতাপচন্দ্র শেঠ

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীর মুখোজ্জ্বলকারী এবং লিলি বিস্কুট কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী প্রতাপচন্দ্র শেঠের মৃত্যুতে বাঙালী একজন খুব বড় কর্ম্মী হারাইল। প্রতাপচন্দ্র সহোদর বিনয়কৃষ্ণকে সহায় করিয়া এবং ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া প্রথমে সামান্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। সামান্যভাবে প্রিন্টিং এবং কাঠের ব্লক তৈয়ারী করাই ছিল তাঁহাদের প্রথম ব্যবসায়ের সূচনা। জ্যেষ্ঠ প্রতাপচন্দ্র কাজ সংগ্রহ করিয়া আনেন, কনিষ্ঠ বিনয়কৃষ্ণ খাটিয়া খুটিয়া তাহা তুলিয়া দেন। মূলধন দুই সহোদরের সততা ও



৺প্রতাপচন্দ্র শেঠ

কায়িক পরিশ্রম। এই দুইটী লইয়াই ক্রমে তাঁহারা বড় বড় কাজ পাইতে আরম্ভ করেন। এক সময়ে হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর মত ফার্ম্মের সমস্ত ব্লক করিয়াছে 'পি, শেঠ কোং'। কোম্পানীর এ কাজের সঙ্গে 'সুষমা' তৈলের কাজও আরম্ভ হয়। তিনটী কাজেরই উন্নতি উত্তরোত্তর হইতে থাকে। শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সততা, স্বাবলম্বনে দৃঢ়তা, শ্রমনিষ্ঠা ও সর্ব্বোপরি মনের বল তাঁহাদের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দেয়। তখনও কলিকাতার দর্জ্জিপাড়াতেই শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের বাসাবাটী ও কর্ম্মস্থল। দর্জ্জিপাড়ার শরচ্চন্দ্র সিংহ, ডাঃ সতীশচন্দ্র বরাট, বঙ্গবাসীর বিহারীলাল সরকার (সকলেই এখন স্বর্গত) এবং তাহার পরে উল্টাডাঙ্গার প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (তখন ইণ্ডিয়া আফিসে নিযুক্ত, এখন স্বর্গতঃ) ও ব্যারিষ্টার সুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতিকে এই সময়ে তাঁহারা শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হন। ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয়ও দেখিলেন দেশী বিস্কুটের ব্যবসায় সময়োপযোগী। বঙ্গভঙ্গের ঘোর আন্দোলনে 'দেশীর' প্রতি দেশবাসীর ঝোঁক দেখিয়া বিস্কুটের ব্যবসায় চালাইতে শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় উঠিয়া পড়িয়া লাগেন এবং বরাহনগরে নূতন খরিদ করা তাঁহাদের বাগানবাটীতে বিস্কুটের কারখানা খুলিয়া বসেন। তাঁহাদের কারখানাজাত লিলি জেম বিস্কুটের কাট্‌তি হইতে লাগিল ভারতের সর্ব্বত্র। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর প্রদর্শনীতে 'লিলি বিস্কুট' উচ্চ পারিতোষিক ও সার্টিফিকেট লাভ করিল—লিলি বিস্কুটের নাম দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহারাও উন্নত উপায়ে বিস্কুট তৈয়ারী করাইবার জন্য নূতন কল আনাইয়া নূতন কারখানা বসাইবার আয়োজন করিলেন। সেই আয়োজনের ফলই উল্টাডাঙ্গাস্থিত লিলি বিস্কুট কোংর বর্ত্তমান কারখানা—যাহা ভারতে দেশীয় কারখানার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। বালি, টর্চ্চ, জুতার কালি প্রভৃতির ব্যবসা পি, শেঠ্ কোম্পানীর হালের করা। বিনা মূলধনে সততা ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই পি, শেঠ কোম্পানীর এই অপূর্ব্ব সাফল্য। বাঙালীর ইহা বুঝিবার, শিখিবার ও গৌরব করিবার। অনন্যকর্ম্মী প্রতাপচন্দ্রের তিরোধানে বাঙালী মর্ম্মাহত। আমরা কায়মনোবাক্যে স্বর্গত আত্মার শুভকামনা করি। প্রতাপচন্দ্রের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতায় ভিক্ষুক সমস্যা

ভিক্ষুক সমস্যা কলিকাতার একটি প্রধান সমস্যা। এই বিষয় লইয়া কাগজপত্রে অনেকদিন হইতে লেখালেখি চলিলেও কাজে বিশেষ কিছু হয় নাই। সম্প্রতি কলিকাতার পৌরসভার এ সম্বন্ধে টনক নড়ায় বিষয়টি আলোচিত হওয়ার ফলে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। একমাত্র প্রতিষ্ঠান কলিকাতা রেফিউজ ৭৫০ ভিক্ষুকের (কুষ্ঠ বা যক্ষাগ্রস্ত নহে) ভার লইতে সম্মত হইয়াছে এই সর্ত্তে যে, ইহার জন্য পৌরসভাকে এককালীন ৪০,০০০৲ টাকা এবং বাৎসরিক ২৪,০০০ টাকা হিসাবে রেফিউজে দিতে হইবে। মিঃ এন, কে, বসু কর্ত্তৃক ভিক্ষুক-সমস্যা নিবারণের জন্য যে বিল উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা যদি সরকার কর্ত্তৃক আইনে পরিণত হয় তবেই কমিটি রেফিউজের

এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভিক্ষুকদের সহরে যথেচ্ছা অবাধে ঘুরিয়া বেড়ানয় বিপদাশঙ্কা খুবই বেশী। কিন্তু নিরুপায় অক্ষম যারা—তারা যাইবে কোথায়, কি করিবে ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচ্য। ভিক্ষুকদের মানুষ এবং মানুষের মত খাইয়া থাকিতে না পারিলেও কোন রকমে তাহাদের জীবনধারণের সাহায্য করাটাও মনুষ্যধর্ম্ম। যেখানে তাহা হয় না, সেখানে সক্ষম সবল সঙ্গতিসম্পন্নদের মনুষ্যত্বাভাবই সূচিত করে। শুধু আইন করিয়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশবাসীকে এদিকে সচেতন হইতে হইবে।

কংগ্রেস-গৃহ

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আবেদনে কংগ্রেস-গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন নিরানব্বই বৎসরের মিয়াদে বাৎসরিক এক টাকা খাজনায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের উপর এক বিঘা আঠার কাঠা পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত দিয়াছেন। এই 'কংগ্রেস গৃহ' নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য উক্ত হইয়াছে যে, দেশবাসীকে বিশেষতঃ কলিকাতনগরবাসীকে সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা-সমূহ সম্বন্ধে সচেতন এবং সতর্ক করিতে, তাহাদের মানসিক, শারীরিক এবং সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে যে বক্তৃতাদি এবং সভাসমিতির প্রয়োজন হইবে, সেইজন্যই ঐ কংগ্রেস গৃহ ব্যবহৃত হইবে। এই গৃহের একাংশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিতও হইতে পারিবে এবং শরীর-চর্চ্চার জন্য উপযুক্ত সমিতিও থাকিতে পারিবে।

'কংগ্রেস-গৃহ'টী কলিকাতাবাসী তথা দেশবাসীর বহুদিনের একটি অভাব দূরীভূত করিবে। এইজন্য কলিকাতা কর্পোরেশন ও রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

'বাঙ্‌লা' বনাম 'হিন্দী'

'হিন্দুস্থান রিভিউ'তে প্রকাশ, পৃথিবীতে কথিত ভাষা যত আছে, তন্মধ্যে সাতটী ভাষার প্রত্যেকটী ব্যবহৃত হয় পাঁচ কোটি বা তদধিক লোকের দ্বারা। এই সাতটী ভাষার তালিকায় ইংরাজী ভাষার স্থান সর্ব্বপ্রথম এবং বাঙালা ভাষার স্থান সপ্তম। বঙ্গদেশেরই পাঁচ কোটীর উপর লোকে এই ভাষা ব্যবহার করে। হিন্দী, উর্দ্দু, হিন্দুস্থানী বা হিন্দি-হিন্দুস্থানীর উল্লেখ এ-তালিকায় স্থান পাইবার যোগ্য নয়। ক্যানেডা হইতে কালিফোর্ণিয়া এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধ ধরিয়া প্রায় ৫৪ কোটি লোক ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষে হিন্দী প্রচলন করাইবার জন্য যাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তালিকাটীর ইঙ্গিত যেন তাঁহারা বুঝিবার চেষ্টা করেন।

সাঁতারের রেকর্ড প্রতিষ্ঠা

সন্তরণবীর সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত গত বৎসর বালিগঞ্জ মরিয়াম পার্কে হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় দীর্ঘ ৪৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সন্তরণ করিয়া এলাহাবাদের সাঁতারু রবীন চট্টোপাধ্যায়ের 'রেকর্ড' ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এই বৎসর ২২শে জুলাই শুক্রবার ভোর ৭—২৫ মিনিটে



শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত

কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীতে নামিয়া রবিবার রাত্রি ৮—৩৫ মিনিট পর্য্যন্ত মোট ৬১ ঘণ্টা ১০ মিনিট হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ পূর্ব্বক পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করিয়া তিনি বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সন্তোষকুমারের বয়স মাত্র ২১ বৎসর। শ্রীমান সন্তোষ কুমারের আরও উন্নতি কামনা করি।

বাঙালী-বিহারী সমস্যা প্রসঙ্গে ডাঃ মেঘনাদ সাহা

প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তনের ফলে, প্রদেশগুলির মধ্যে পরস্পর যে মন কষাকষি চলিয়াছে তাহারই একটা উৎকট মূর্ত্তি—বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যা।

ডাঃ সাহা আশঙ্কা করেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে অখণ্ড ভারতের সংহতি শোচনীয়ভাবেই ব্যাহত হইবে। তিনি বলেন, ভারতের নেতৃবর্গের সম্মুখে প্রধান সমস্যা এই যে, ভারতে একটা অখণ্ড জাতি প্রতিষ্ঠিত হইবে, না, বিশটী স্ব-স্ব প্রধান জাতি থাকিবে?—কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষকে অবশ্য এই সমস্যারই প্রথমে সমাধান করিতে হইবে,

তাহা হইলে অন্যান্য আন্তঃপ্রাদেশিক বুঝা-পড়া আপনিই মিটিয়া যাইবে। ডাঃ সাহার এই বিবৃতি অখণ্ড ভারত-রাষ্ট্র-রচনার স্বপ্ন যাঁরা দেখেন তাঁহাদের বিশেষ অনুধাবণযোগ্য।

পরলোকে শ্রীমতী রেণুকা রায়

টাইফয়েড রোগে ১৪ দিন শয্যাশায়ী থাকিয়া, বিগত ২৭এ আষাঢ় পূর্ণিমার দিন সকাল ৭ ঘটিকার সময়ে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের পুত্রবধূ ও তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। উদার ও



অন্তিমশয্যায় রেণুকা রায়

নম্র স্বভাব, সেবায় ও ধর্ম্মে নিষ্ঠা, সর্ব্বোপরি অমায়িক ব্যবহারের গুণে হিন্দু ঘরের আদর্শ নারী হিসাবে সহজেই অল্পদিনে ইনি পারিপার্শ্বিকের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আমরা বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের ও তদীয় পুত্রের এই আকস্মিক স্বজন-বিয়োগ-ব্যথায় আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবৎসমীপে সর্ব্বান্তঃকরণে বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

ইতালীতে বিদেশী শিক্ষার্থী ও ভ্রমণার্থিদিগের সুযোগ-সুবিধা

কলিকাতাস্থ ইতালীর রয়েল কনসল জেনারেলের নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইতালীর প্রাচীন-সংগ্রহালয় ও কলাভবনাদি দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে ব্যক্তি অথবা সমষ্টিগতভাবে পাঁচ, দশ অথবা পনর দিনের জন্য টিকিট দিবার ব্যবস্থা আছে। এই সকল টিকিট ইতালীর যে কোন কলাভবন অথবা সংগ্রহালয় হইতে প্রাপ্তব্য। কোন অধিকারসম্পন্ন ভ্রমণ ব্যবস্থাপক সমিতির (authorised traval agency) অনুমোদিত সমষ্টিগত যাত্রীগণকেই মাত্র অর্দ্ধমূল্যে সহর-বিশেষের সরকারী কলাভবন ও সংগ্রহালয় দর্শন করিতে দিবার ব্যবস্থা আছে। ইতালিতে শিক্ষালাভেচ্ছু বিদেশীয় অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে বিনা দক্ষিণায় "রয়েল মিউজিয়াম" "গেলারী" প্রভৃতিতে প্রবেশ-পত্র দিবার সরকারী ব্যবস্থা আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে ইতালির বিদেশস্থ প্রতিনিধির নিকট দরখাস্ত করিতে ও সুপারিশ লইতে হইবে।

পরলোকে কালীকৃষ্ণ সেন

শ্রদ্ধেয় কালীকৃষ্ণ সেনের মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন সুযোগ্য সম্পাদক ও সাংবাদিক হারাইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি 'এড্ভান্সের' সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। "বেঙ্গলী" "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ" প্রভৃতি সে-যুগের শক্তিশালী দৈনিকের সম্পাদনা-কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত তিনি চালাইয়াছেন। সম্পাদনা-কার্য্যে তাঁহার সৎসাহস ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বাঙালী পাইয়াছে। জীবনের পেশা হিসাবে তিনি সংবাদপত্রের সেবাকার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারশিপ্

বিগত চারি বৎসর বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের কার্য্য করিবার পর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করেন এবং তৎস্থলে মৌলভী আজিজুল হক সাহেব নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞ ও অনন্যনিষ্ঠ সেবার ফলে বিভিন্ন দিক দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, মৌলভী আজিজুল হক সাহেবও উদার নিরপেক্ষ শিক্ষা-নীতির অনুবর্ত্তন করিয়া বাংলার তথা নিখিল ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

এই সংখ্যায় অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত "পাটার পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধান্তর্গত ছবিগুলির ফটো আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত রমেশ আচার্য্য কর্ত্তৃক গৃহীত। এ জন্য এবং আরও কয়েকবার 'প্রবর্ত্তকে' ফটো দিবার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শিল্প-সদন

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ৮৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বাসন্তী বিদ্যাবিথী ভবনে খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত অখিল নীয়োগীর পরিচালনায় শিল্প-সদন নামে একটি চিত্র-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আপাততঃ সকাল ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে ছাত্র ও ছাত্রিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে উত্তর কলিকাতার শিক্ষার্থিগণের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। এইরূপ বিদ্যালয়ের বাহুল্য বাঞ্ছনীয় এইজন্য যে, সহজ শিল্পানুরাগ যাহাদের আছে—তাহারা জীবিকা হিসাবে অথবা বিলাস হিসাবে ইচ্ছামত সর্ব্বসময়ে অথবা অবসরমত এই চিত্র-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইবেন।

সঙ্গীত-পরিষৎ

রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটস্থ "অনুরূপা বালিকা বিদ্যালয় ভবনে" অভিজ্ঞ সঙ্গীতকুশলিগণের অধ্যাপনায় সর্ব্ববিধ যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আপাততঃ বালিকাগণের জন্য এই সঙ্গীত পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় এই পরিষদের সম্পাদক। পরিষদ-কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা, শীঘ্রই ইহার ছাত্র-বিভাগটিও স্বতন্ত্রভাবে খুলিবেন। আগামী ১৯৪০ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সঙ্গীতে ছাত্রিদিগের জন্য যে স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে—উহার পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীগণও এই পরিষদে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতিপূজা

জাতির স্বাতন্ত্র্য সাধনার অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ সাধক বিদ্যাসাগরের স্বদেশ বাংসল্য, বঙ্গবাণীর সেবানিষ্ঠা, চরিত্রের বজ্র-কুসুম মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে দেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলির সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি একত্র অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তের কৃতিত্ব

"বৌদ্ধধর্ম্মে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব ও সহজ জ্ঞান" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই বৎসর 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। শশীবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু



শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত

লাহিড়ী রিসার্চ্চ স্কলারদের অন্যতম। এম, এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। বরিশাল-চন্দ্রহার গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়ের তিনি পুত্র। সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা শশীবাবুর সুপ্রতিষ্ঠা কামনা করি।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতি-পূজা

মুক্তি-সংগ্রামরত ভারতবাসী গতাসু প্রিয় সেনাপতিকে স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করায়, জাতির রাষ্ট্র-চেতনারই লক্ষণ সূচিত হয়। দেশবাসীর সহিত আমরাও স্বদেশ-সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ দেশপ্রিয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করি।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু-স্মৃতিবার্ষিকী

রাষ্ট্রচেতনার নাচিকেত ৺সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি-বার্ষিকী জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিবে, জাতির অসাড় আত্ম-বিস্মৃতির কথা আর সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ করাইয়া দিবে আত্ম-সমাহিত স্বদেশৈকপ্রাণ ৺সুরেন্দ্রনাথকে — যিনি প্রদীপ্ত জাতীয়তার উত্তাপে জাতির অসাড় সুপ্তি-প্রবণতাকে ভস্মীভূত করিয়া, জাতির প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া, শতধন্য হইলাম। আজ স্মৃতি-প্রবুদ্ধ মুক্তি-কামী আত্মা এই কথাই বলিতে চায়—সুরেন্দ্রনাথের সিংহবীর্য্য লইয়া সমগ্র বাঙালী মুক্তি-যজ্ঞে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত হউক।

চট্টল মিউনিসিপ্যালিটির সাধু-চেষ্টা

চট্টল মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থানসমূহে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কা বালিকাদিগের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের যে শুভ পরিকল্পনা মিউনিসিপ্যালিটি করিয়াছিলেন তাহা বাংলা গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়াছেন এবং উহার ব্যয়-ভারের অর্দ্ধেক বহন করিবার জন্যও স্বীকৃত হইয়াছেন। বাংলা দেশের মধ্যে এইরূপ পরিকল্পনা ইহাই সর্ব্বপ্রথম। আমরা আশা করি, অন্যান্য স্থানেও চট্টলের এই আদর্শ অনুবর্ত্তিত হইবে।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

ভাদ্রের তৃতীয় সপ্তাহের শেষাশেষি আশ্বিন মাসের এবং আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে কার্ত্তিক সংখ্যা (পূজা) প্রবর্ত্তক প্রকাশিত হইবে। অতএব আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের জন্য বিজ্ঞাপনের কপি যথাক্রমে ভাদ্রের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের অফিসে প্রেরিতব্য।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

পরিচালক ও প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫২।৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রবর্তক

২৩শ বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৪৫



যুক্ত-জীবন

ইন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়ে মানুষ। তাহা ছাড়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বও আছে। সবখানি দিয়া যুক্ত জীবনই পূর্ণ যোগের উদ্দেশ্য।

এই শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—মেদ, মাংস, অস্থি, রক্ত প্রভৃতি অষ্টধাতুযোগে ইহা নির্ম্মিত। শরীরশুদ্ধির উপায় নিষ্কাম কর্ম্ম ও ক্রিয়াযোগ।

কর্ম্মফল, কর্ম্ম ও কর্ত্তৃত্ব ইষ্টে সমর্পণ করিলেই কর্ম্ম যথার্থ নিষ্কাম হয়। সেই কর্ম্ম ইষ্টেরই কর্ম্ম, ইষ্টেরই ইচ্ছাসিদ্ধি ও আনন্দ-বিধানের জন্য। নিষ্কাম-কর্ম্মে দেহেন্দ্রিয়ের শোধন হয়। তপস্যা, স্বাধ্যায় বা উপাসনা-রূপ ক্রিয়াযোগেও মূলতঃ স্নায়ুকোষ ও পঞ্চবায়ু বিশুদ্ধ হইয়া অতীন্দ্রিয় চিৎ বা মনঃশক্তির উন্মেষ হয়। তখন আমরা অন্তঃকরণ দিয়া সূক্ষ্ম তান্মাত্রিক বা চিন্ময় অবস্থার উপলব্ধি করিতে পারি। তাহাই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি বা অন্তরঙ্গ অনুভূতি।

অন্তঃকরণের জন্য বুদ্ধিযোগ—যাহা জ্ঞান, ভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত। ভক্তি হৃদয়ের শোধন ও সাধন করে; জ্ঞানে বুদ্ধির জাগরণ ঘটে। তখন শুদ্ধ সাত্ত্বিক চৈতন্যের উন্মীলনে জীব ও পুরুষোত্তমে রসঘন সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহারই চরম সিদ্ধি—ব্রাহ্মীস্থিতি বা শ্রীভগবানের সহিত সম্পূর্ণ যুক্ত ও অমৃতময় জীবন।

বুদ্ধিযোগে সিদ্ধি-চতুষ্টয় প্রকাশ পায়। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যই বুদ্ধির চতুর্সিদ্ধি। বুদ্ধিই মহৎ-তত্ত্ব। আত্ম-সমর্পণ সিদ্ধ হইলেই মহতের প্রকাশ। তখন এই চতুরঙ্গ সিদ্ধিপ্রকাশে ব্যষ্টি ও জাতির জীবনে অভ্যুদয় সর্ব্ব-লক্ষণে ঝলমল করিয়া ফুটিয়া উঠে।

জাতীয় সমস্যা

বর্ত্তমান ভারত রাষ্ট্র-সাধনায় যতটা উদ্বুদ্ধ, ধর্ম্মে ততটা নহে। ধর্ম্ম অধুনা ফল্গুধারার ন্যায় লোকচক্ষুর অগোচরে মানুষের অন্তরে অন্তরে বহিয়া চলে; তাহার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ চক্ষে পড়ে না। বাংলার রাষ্ট্রসাধনার গোড়ায় একটা ধর্ম্ম-প্লাবন ছিল। বিশেষতঃ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ও এই শতাব্দীর অঙ্কপাতে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব, বিগত শত বর্ষ ধর্ম্মান্দোলনের যুগ বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালীজাতি যড়দর্শনের ধর্ম্ম স্বভাবজীবনের সহিত মিলাইয়া যে পথ ধরিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের পর এবং যে ধর্ম্ম আচার-বিচারের নামগন্ধহীন অবস্থায় মহাত্মা রামমোহনের জীবনে অভিব্যক্ত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ ও পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবের জীবনে অনুস্যূত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় পাক খাইয়া দক্ষিণেশ্বরে শাস্ত্র-সঙ্গত আচার-বিচারের অনুশাসনে নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া বাঙ্গালী জাতিকে নূতন করিয়া দীক্ষা দিল। রামমোহন চাহিয়াছিলেন বেদকীর্ত্তিত হিন্দুধর্ম্মের নব সংস্কার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই তন্ত্রই বজায় রাখার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি উপড়াইয়া ধর্ম্ম-সমন্বয়ের নববিধানের প্রবর্ত্তন করেন। বেদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত ভারতে অসাধারণ ক্ষমতাশালী শাক্যসিংহ বেদ-বিমুখ ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া কালে যেমন ব্যর্থ হইয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের নববিধানও এই কারণে মাথা তুলিতে পারিল না। দক্ষিণেশ্বরে হিন্দু-ভারতের প্রাচীন ভিত্তির উপর ধর্ম্ম-সমন্বয়ের কীর্ত্তি-মন্দির গগন স্পর্শ করিল। তারপর বিগত ৩০ বৎসরের অধিক কাল ধর্ম্ম আমাদের পশ্চাতে। আমরা রাষ্ট্র-সাধনায় বেগবান্ অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছি। বিগত শতাব্দীর ধর্ম্মপ্রাণের উপর ভর করিয়াই আমাদের এই লক্ষ্য ও গতি নির্ভর করিয়াছে। কিন্তু আজ কি মনে হয় না—ক্ষীণ-পুণ্য হইয়া স্বর্গলোক হইতে দেবতাগণের মর্ত্ত্যে পতনের ন্যায় আমাদের রাষ্ট্রপ্রাণ অবনমিত হইতেছে ?

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যাঁহাদের কণ্ঠে শক্তিমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই রামমোহনের জাতি, রামকৃষ্ণের জাতি। সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-বিষাণ বাজিয়া উঠিলে অশ্বিনীকুমার, বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি জাতীয় নেতৃগণের যে অভ্যুত্থান আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য প্রকৃষ্টরূপেই সমর্থিত হয়। ইহার পরও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাষ্ট্র-সাধনায় জ্ঞান-বৈরাগ্যের মূলে পূর্ব্বোক্ত জাতির তপস্যাই যে নিহিত, এ কথা কে অস্বীকার করিবে ?

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ — আর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরের গৌরীশৃঙ্গ খসিয়া পড়ে। ইহার পর হইতে বিগত ৫০ বৎসরকাল বাঙ্গালীর রাষ্ট্র-সাধনার যুগ। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে প্রাণশক্তির যে ক্ষয় ও অপচয় হয়, ধর্ম্ম-সাধনায় তাহার পূর্ত্তি। জাতির অতীত ধর্ম্ম-জীবনে যে শক্তি-সঞ্চয় হইয়াছিল, বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী তাহারই ব্যয়ে রাষ্ট্রক্ষেত্রে অপরাজেয় জাতি বলিয়া নিখিল ভারতে, সর্ব্বজগতে গণ্য হইয়াছিল। আজ বাংলায় রাষ্ট্র-সাধনা প্রভাবহীন, তাহা শুধু অনুমান নহে, বাঙ্গালীর রাষ্ট্রবুদ্ধির মালিন্যে নিখিল ভারত-রাষ্ট্রের নিকট সে হতমান—বাংলার রাষ্ট্র-পরিষদেও সে ম্রিয়মাণ, ইহা দিবালোকের ন্যায় সত্য।

বাঙ্গালী রাষ্ট্রক্ষেত্রে যেদিন যাত্রা সুরু করে, সেদিন এই পথ ছিল বন্ধুর ও ক্ষুরধার। বর্ত্তমান যুগে এই পথ ততটা ভয়ঙ্কর নহে। বাংলার রাষ্ট্র-সাধনায় দেশের প্রাণ জাগিয়াছে, জাতি সচেতন হইয়া প্রাদেশিক স্বার্থ বুঝিতে শিখিয়াছে। জাতিবিশেষ সাম্প্রদায়িক পুষ্টি ও উন্নতির প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। ব্যক্তিপ্রাধান্য ও স্বাধীনতার মূল্য-নিরূপণ হইয়াছে। রাষ্ট্রের মূল প্রাণ স্বার্থ, জাতির সর্ব্বাঙ্গে তাহা সঞ্চারিত, তাই সর্ব্বত্র তুমুল গণ্ডগোল। ধর্ম্ম-সমন্বয়ের মহতী প্রচেষ্টার অপেক্ষা স্বার্থ-সমন্বয়ের প্রয়াস অতিশয় শ্রমসাধ্য। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধি-চাতুর্য্যের সহিত কূটনীতির প্রয়োজন—কিন্তু বাঙ্গালী জাতি তাহাতে

পটু নহে। এই হিসাব-বুদ্ধি বাঙ্গালীর নাই বলিয়া বর্ত্তমান যুগে সে মাথা গুঁজিয়া ভাবিতে বসিয়াছে—এই ভাবনাই তাহার একদিকে শ্রেয়ঃ দেয়, অন্য দিকে সর্ব্বনাশ করে। বাঙ্গালী বড় ভাব-প্রবণ জাতি। শ্রীগৌরাঙ্গের মৃদঙ্গের আহ্বানে সে উলঙ্গ হইয়া নাচে, তন্ত্র-গুরুর সহিত করতালি দিয়া কারণ-সলিলে ডুব দেয়—আবার এক অদ্বৈত ব্রহ্ম-নামে দীক্ষা লইয়া জগৎসংসার এক কথায় হারায়। যুগে যুগে বাঙ্গালী ভাবপ্লাবনে মাতাল হইয়া তৃপ্তি পাইয়াছে; জগৎকে তৃপ্তি দিয়াছে। কিন্তু ক্রমেই তার কৌপীন সার হয়। এই ভাবপ্রবণতার মাধুর্য্যে বাঙ্গালী স্বদেশীযুগে চৌর্য্য অপরাধে নয়, হত্যাকারী বলিয়া নয়, দেশপ্রেমে আত্মহারা হইয়া কারাবরণ করিয়াছে, দ্বীপান্তরিত হইয়াছে, ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়াছে। এমনই স্বভাব বাঙ্গালীর। আজ ভাবের অভাবেই তার দৈন্য—হিসাব সে চাহে না। আত্মদানেই বাঙ্গালীর আনন্দ। তাই আবার তাহার মাথা মাটীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মাটীর বুকে কি ভাবাঙ্কুর পুনর্ব্বিকশিত হয়, এইদিকেই তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় সমাহিত। বাহিরের অসংখ্য প্রকার স্বার্থ খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। হিসাবী তাহাই কুড়াইয়া লয়; স্বার্থ লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। নাম, যশঃ, কীর্ত্তি, অযশঃ, কুৎসা, অখ্যাতি এই সবের মূলে একবিন্দু সত্য নাই। স্বার্থের কষাঘাতে এই বিচিত্র সৃষ্টি। এইদিক্ দিয়া বাংলার বড় দুর্দ্দিন; কিন্তু অন্যদিকে ভবিষ্যের আশা আরও অঙ্কুরিত হয়। উদীয়মান বাংলার নবতান্ত্রিক সেই তরুমূলে নীরবে শ্রদ্ধার্ঘ্য ঢালিয়া যায়।

বাঙ্গালী সারা ভারতকে রাষ্ট্রদীক্ষা দিয়াছে। তাহার এই কাজ এইখানেই শেষ হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা আজিকার বাংলা রাষ্ট্রক্ষেত্রে এমন নিষ্প্রভ এই কারণেই। বাঙ্গালী বড় উদার। বিশ্বমানবজাতির হিত-সাধনের স্বপ্নই তার বড় হইয়া উঠে। বাঙ্গালী এই কারণেই সাধনক্ষেত্রে সমন্বয়ের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়—জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম ত্যাগ করে। বাঙ্গালীর এই মহাজনোচিত স্বার্থত্যাগ, এই নিঃস্ব অবস্থা অন্য প্রদেশবাসী ভাল চক্ষে দেখে না। বাঙ্গালীকে বুদ্ধিহীন মনে করে। বাঙ্গালীর হৃদয় সঙ্কীর্ণ বলিয়া অবিচার করে। বিধাতাও বাংলার ত্যাগ-তপস্যার মূল্য-স্বরূপ তাহার ললাটে শ্মশান-ভস্ম লেপিয়া দেন। বাঙ্গালী হতবুদ্ধি হইয়া অশ্রুপাত করে। ক্ষোভে আত্মবিস্মৃত হইয়া সেও পরকে গালি পাড়ে—ইহার পর সান্ত্বনার অভাবে আত্মঘাতী হয়। আপনার জনকে লোকচক্ষে খাটো করিতে গিয়া সে নিজেও খাটো হয়। এক দিকে বাঙ্গালীর এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি চক্ষু-পীড়ার কারণ; কিন্তু আর একটা দিক্ আছে, যেদিকে নূতন সূর্য্যের নবারুণ-রাগ ঝলসিয়া উঠে। আমরা সেই দিকের কথাই অতঃপর বলিতেছি।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রসাধনার লক্ষ্য ছিল—জাতীয় দাবী রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিতে দিব না, জাতির সম্মান ও মর্য্যাদা প্রাণপণে রক্ষা করিব। জাতীয় সম্মান-বোধের আতিশয্যে বাধার সহিত সংঘর্ষে বাঙালী জাতি উন্মাদ হইয়া বিপ্লব ডাকিয়া আনিল। জাতির দাবী যেদিন পূর্ণ হইল, সেদিন তরুণ বাঙালী ভাবাবেগে জিদ ধরিল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পর বাংলার রাষ্ট্রান্দোলন রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। সংবাদ-পত্রের ঢাকে বাঙালীর প্রাণের বার্ত্তা জোর কাঠিতে বাজিতে লাগিল। পঞ্চনদ জাগিল, মহারাষ্ট্র জাগিল। কে জানে গুর্জ্জরসিংহের ইরম্মদ গর্জ্জন বাঙালীর মুক্তি-মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি কি না? বাঙ্গালী যতটা ভাবপ্রবণ, নিষ্ঠার সাধন-বিজ্ঞানে ততটা পটু নহে। এইক্ষেত্রে ঔদাসীন্যবশতঃ অতি নিষ্ঠুর পরিণাম তাহারা ডাকিয়া আনিল। এই সময়েই গুর্জ্জরের বীরেন্দ্রকেশরী ভারতের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাষ্ট্র সাধনার নেতৃত্ব বাংলা হইতে গুর্জ্জরে স্থানান্তরিত হইল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসে বাঙালীর কণ্ঠে পূর্ণ স্বাধীনতার জিদ্ পুনঃ প্রতিধ্বনি তুলিল। লাহোরে আর তাহা বারণ মানিল না। রাষ্ট্রনেতা মহাত্মা যুগধর্ম্ম বুঝিয়া, রাষ্ট্র স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রধান সেনাপতির টীকা ললাটে আঁকিলেন, রিক্ত হস্তে নিরস্ত্র হইয়া ডাণ্ডি অভিযান করিলেন। বাংলার রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন—"পশুবল বড় বল নহে। জাতির ব্রহ্মণ্যশক্তিকে জাগাইতে হইবে।" মহাত্মা গান্ধী তাহাই কার্য্যে পরিণত করিলেন। সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, শৌচ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। দম্ভ, দর্প,

হিংসা, ক্রোধ, ব্রাহ্মণেতর জাতির ধর্ম্ম। ভারত চাহিয়াছে দিব্যজন্ম, দেবতার আয়ুঃ। মহাত্মাজী বিধাতার ঈপ্সিত সুপথ আশ্রয় করিয়া ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে নবযুগ আনয়ন করিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প-সিদ্ধির পথে আজিকার শাসন-সংস্কার অযাভাস মাত্র। পূর্ণস্বাধীনতার্জ্জনের দীর্ঘ পথ আজিও সমাপ্ত হয় নাই। ভারতের নবশাসনপরিষদে তাঁর সেনাবাহিনী সহযোগীর ছদ্মবেশে দুর্গদ্বার রক্ষা করে মাত্র। সমর-কুশলী মহাত্মাজীর অভিনব রণসঙ্কেত অনেকের ধারণায় নাই, তাই মধ্য প্রদেশের মন্ত্রিবিভ্রাটে লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল বলিয়া এক দল জাতীয়পন্থীর বুদ্ধিতে দণ্ডিতের প্রতি সহানুভূতির স্রোতঃ বহিয়া গেল। কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামে যে বীরবৃন্দ বৃটনের অতি কূট শাসনসংস্কারের দুর্গদ্বারে জাতীয় শক্তিকে প্রবুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত করিয়া রাখার জন্য গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের অতি সামান্য ত্রুটি ও দৌর্ব্বল্য জাতীয় সাধনার পথ দুর্গম ও দুঃসাধ্য করিয়া দিবে। এইজন্যই জাতীয় কেন্দ্রের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগ করিয়া কতখানি সুবুদ্ধি ও সুযুক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখার অবকাশ পূর্ণ স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত জাগ্রত-বুদ্ধি ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে বুঝিবেন না। এই পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিখিল ভারতের। এই ভারতে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, শিখ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসীক আছে। পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ভারতের সর্ব্ব জাতি, সর্ব্ব সম্প্রদায়কে দায়ী করার আগ্রহ মহাত্মার প্রশংসনীয়। বাংলা ও পঞ্জাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশার সীমা নাই, ইহা দেখিয়া হিন্দুমাত্রেই বিচলিত হইবেন—কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাপন্থীর যে বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি, তাহার সহিত যদি আমাদের সংযোগ অক্ষুণ্ণ হয়, আমরা আজ প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিখিল ভারতজাতিকে এই পথে আনিবার সুযোগ বড় করিয়া ধরিব। রাষ্ট্রনেতার এই বিচার, এই বুদ্ধি আছে বলিয়াই তিনি ভারতে অস্পৃশ্য ও ইস্‌লামধর্ম্মীদের সকল অধিকার ছাড়িয়া দিয়াও এই স্বাধীনতার চেতনায় সর্ব্ব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহেন। পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প যদি কোনদিন সিদ্ধ হয়, তবেই নিখিল ভারতের দুর্দ্দশা দূর হওয়ার সঙ্গে পঞ্চনদ ও বাংলার দুর্দ্দশা দূর হইবে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার দুর্গতির যদিও ভাষায় বর্ণনা হয় না, কিন্তু তবুও এ দুর্ভাগ্য বিধি-লিপি বলিয়া আমাদের আজ মাথা পাতিয়া সহিতে হইবে। পূর্ণ স্বাধীনতার মন্ত্র সিদ্ধ করার ব্রতে বাঙালী নিখিল ভারত জাতির সহিত একত্র হইয়া দীক্ষা লইয়াছে, তাহাকে ভাগ্যবশতঃই সংগ্রামকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ইহার আর অন্য প্রতিকার নাই।

রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের এই অবস্থা সম্বন্ধে অনেকে অজাগ্রত, কথাগুলি তাই যতটা সম্ভব বিশদ করিয়া বলা হইল। ভারতের রাষ্ট্র-সংগ্রামে যাঁহারা যোগ দিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান শুধু এদেশের লোকই করিবে না। নিখিল ভারতজাতির কণ্ঠে এই প্রশংসার ধ্বনি প্রতিধ্বনি উঠিবে। ভারত আজ পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। এই স্বাধীনতার পথ নিখিল জগতে অশান্তি উপদ্রবের পথ; কিন্তু ভারত অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগের মন্ত্রে পূত হইয়া এই পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। শুধু ভারতের মানুষ নয়, এই অপার্থিব অভাবনীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিতে মানবতার প্রাণ যেখানে উদ্বুদ্ধ, সেই মানব মাত্রেই ইহাতে কালে যোগদান করিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু এই পবিত্র ধর্ম্মযুদ্ধের প্রকৃতি ও ভাব-রক্ষার জন্য যে অনবদ্য চরিত্রের প্রয়োজন, তাহা যদি সিদ্ধ না হয়, এই সংগ্রাম অর্দ্ধপথে অতি শোচনীয় অবস্থা সৃজন করিয়া শেষ হইয়া যাইবে। এই সংগ্রামের উপযোগী চরিত্র, আমরা মনে করি, গৌরাঙ্গের দেশে, রামমোহনের দেশে, রামকৃষ্ণের দেশেই অধিক সংখ্যায় মিলিতে পারে। কিন্তু বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্রে মন্ত্রিবিরোধ লইয়া যখন আমরা গালাগালির তীক্ষ্ণ শরবর্ষণ দেখি, একের স্বার্থ উচ্ছেদ করিয়া অন্যের স্বার্থসিদ্ধির কূট বুদ্ধির চাতুরীজাল বিস্তার করার প্রয়াস দেখি, তখন আমাদের মনে হয়, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূলে মানবতার যে সুমহান্ আদর্শ মণিমুক্তাখচিত হিরণ্ময় মুকুট মাথায় পরিয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। যখন আমরা দেখি, বিশ্বব্যাপী তুমুল সংগ্রামে স্বার্থপরতন্ত্র আন্তর্জাতিক

মহাহবের সূচনা আর তাহাতে বৃটনের বিপর্য্যস্ত হওয়ার প্রতীক্ষা রাখিয়া ভারতের মুক্তি কামনার সুযোগান্বেষণ, তখন এই অন্তর্দৈন্য দেখিয়া মনে হয়—পবিত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের তপোবন হইতে প্রাচীন ঋষিদিগের মন্ত্রধ্বনি মূর্ত্ত হইয়া আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে দিব্য নীতির প্রবর্ত্তন, তাহার রহস্য আমরা সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠিতে এখনও পারি নাই। যখন আমরা দেখি ধনিক, শ্রমিক, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির 'শ্লোগান' উচ্চারণ করিয়া, রুশের শ্রেণী-স্বার্থবাদের অনুকরণে আমরা ভারতে অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্বেষ ও ঘৃণার দাবানল জ্বালিতে চাহি, তখন আমরা বর্ত্তমান ভারতের দিব্য প্রেরণার মর্ম্মকথা যে আত্মবিস্মৃতি বশতঃ বুঝিতে পারিতেছি না—একথা অনুভব করিয়া পরিতপ্ত হই।

আজ সেবাগ্রামের পর্ণকুটীরে জীর্ণ-দেহ গান্ধিজীর দিকে চাহিয়া বাংলার এক উদীয়মান জাতি ভাবিতেছে—ভারতের মুক্তিসংগ্রামে যে দেবতার আয়ুঃ লাভ করিয়া নূতন জাতির অভ্যুদয় হইবে, তাহার বাণীমন্ত্র এই বাংলা দেশে বিগত হাজার বৎসর ধরিয়া ধ্বনির পর ধ্বনি তুলিয়াছে। এই ধর্ম্মযুদ্ধ ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নহে। বিধর্ম্মীর প্রতি রাগ দ্বেষ ইহার মধ্যে নাই। ভারতে মানব-মুক্তির সিদ্ধ ঋক্ উচ্চারিত হইয়াছে। নিখিল বিশ্বের মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে বর্ত্তমান যুগান্তের পর বাংলায় এক নব জাতির অভ্যুত্থান আমরা নিরীক্ষণ করিতেছি। যে জাতির মুখে কটূক্তি নাই, আচরণে হিংসা নাই, ব্যবহারে স্বার্থ নাই, আলাপে কাপট্য নাই, পরিচয়ে বিশ্বাসঘাতকতা নাই। আত্ম-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ উন্নত করিয়া, ভূমার আনন্দে জীবন লীলায়িত করার যুক্তি ভারতের যোগ-শাস্ত্রে যদি অভ্রান্ত হয়, তবে আজিকার যুগের দিশারী পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে দধীচির মত স্বীয় অস্থি প্রদান করিলেও, বাংলার প্রেম ও ঐক্যের সাধন-সিদ্ধ এক প্রবল জাতি মানব-মুক্তির এই পবিত্র ধর্ম্মযুদ্ধ আরও পূত সংস্কৃত করিয়া, আরও অভিনবরূপে বিদ্যুচ্ছক্তির স্ফুরণে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইবে। বিগত ৫০ বৎসরের রাষ্ট্র-সাধনায় সূত্র রাষ্ট্রনেতা মহাত্মার করামলকবৎ। ৫০ বৎসর পরে রাষ্ট্রের বাহিরে চণ্ডীদাসের জাতি, গৌরাঙ্গের জাতি, রামপ্রসাদ-রামমোহনের জাতি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জাতি, বাংলার যোগ ও ধর্ম্ম-সাধনায় একনিষ্ঠ হওয়া জাতির নব অভ্যুদয় সম্ভব করিয়া তুলিবে। বাংলায় বিগত ৫০ বৎসরের বিগলিত রাষ্ট্র-জীবন বিদীর্ণ করিয়াই নূতন প্রাণের উৎস-সৃষ্টি হইবে। আমরা এইজন্য নিপীড়িত, অবনমিত, উপেক্ষিত বাংলার দিকে চাহিয়া এই শোচনীয় দুর্দ্দশার ভিতরেও নব যুগের শঙ্খধ্বনি করিতেছি। নূতন জাতির দিকে চাহিয়া বলিতেছি—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" এই দিকে আশা ও আলো—অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের যে সিদ্ধ পথ, তাহা এ জাতির সর্ব্বনাশের কারণ হইবে না, জাতির জীবনকেই ধন্য করিবে—জাতির মহিমা-ধ্বজা উড়াইবে। এই দিক্ ক্রমেই স্বচ্ছ ও আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। তাই আমাদের আলোর প্রদীপ নৈরাশ্যের ঝটিকায় শুষ্ক নহে।



— চিন্তা-বীথি —

দেশে নানা 'বাদ' আসিয়া তরুণ মনে শিকড় গাড়িতেছে। এই সকল 'বাদ' অধিকাংশতঃ বৈদেশিক মনীষিগণের চিন্তাপ্রসূত। বিদেশীয় মনীষী হইলেও, চিন্তার সাধনায় তাঁহারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, সত্যই তাঁহারা গভীর ভাবে এক একটী বিষয়ে দৃঢ় অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও প্রণিধানসহকারে চিন্তা করিয়াছেন; তাঁহাদের গবেষণা ও সিদ্ধান্তগুলি তাই মূল্যবান্। এই সকল চিন্তায়, সিদ্ধান্তে সাধারণসূত্র যাহা, তাহা যদি সত্যই প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা সাধারণভাবে সর্ব্বদেশ, সর্ব্বজাতির পক্ষেই প্রযুজ্য হইতে পারে। কিন্তু সেই সকল সিদ্ধান্ত যদি সঙ্কীর্ণ তথ্য ভ্রান্ত চিন্তাপদ্ধতি বা অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উহার বৈজ্ঞানিকতা অপ্রামাণ্য হয় এবং ঐ সকল হয়ত কোন দেশে সাময়িক কিছু প্রয়োজন সাধন করিলেও করিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালের জন্য মানবজাতির হিতসাধনে তাহা সক্ষম হয় না। এইজন্য কোনও 'বাদ' সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শুদ্ধা চিন্তাশক্তির সহায়ে উহাকে যুক্তি ও চৈতন্যের কষ্টি-পাথরে কষিয়া যাচাই করিয়া লইতে হয়; 'বাদ' যদি প্রমাণসিদ্ধ হয়, তবেই তাহা প্রবর্ত্তন ও প্রচলনের উপযোগী হয়—নতুবা হিতে বিপরীত ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

* * * *

আবার সাধারণ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত, হইলেও, তাহার প্রয়োগকালেও দূরদৃষ্টি, পরিপ্রেক্ষা ও সূক্ষ্মবিচারশক্তির প্রয়োজন আছে। কেন না, একই সত্য ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কালে, বিভিন্ন প্রকার আবেষ্টনী ও ঐতিহাসিক ছন্দের অনুবর্ত্তী করিয়া সম্প্রযুক্ত না হইলে, তাহা মানবপ্রকৃতি অনুকূলবোধে গ্রহণ করে না। এইরূপ প্রতিকূল বাদ প্রকৃতির উপর জোর-জবরদস্তি করিয়া আরোপিত হইলে, তাহার ফল কখনও শুভপ্রদ হয় না। ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া, অনর্থক জাতির শক্তিক্ষয় হয়—এমন বিক্ষোভ ও অশান্তি দেখা দেয়, যাহা দুরারোগ্য ক্ষতরূপে সমাজদেহে থাকিয়া গিয়া তাহার সহজ স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের পথ চিরদিনের জন্য বিঘ্নিত করিয়া তুলে। এইজন্য সত্য-সূত্রেরও যেমন চাই বিজ্ঞানী দ্রষ্টা ঋষি, তেমনি উহার প্রয়োগেরও চাই সিদ্ধ তান্ত্রিক, কর্ম্ম-শিল্পী—যিনি দেশ-কাল-পাত্র-অবস্থা সম্যক্ পরিদর্শন করিয়া, যে ব্যাধির যে ঔষধ প্রয়োজনীয়, তাহাই ঠিক বিহিত করিতে পারেন; নতুবা হেতুড়ের হাতে সুচিকিৎসার আশায় আত্মনির্ভর করিলে যেমন তাহার পরিণাম শুভাবহ হয় না, তেমনি 'বাদে'র অপপ্রয়োগেও নূতন অনর্থেরই সৃষ্টি হয়—হয়ত রোগ সারে, কিন্তু রোগীর জীবনান্ত ঘটে। আগন্তুক বাদগুলি বিচারান্তে যদি গ্রহণযোগ্যও বিবেচিত হয়, তবু তাঁহাদের বস্তুতন্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে আবার আর এক প্রস্থ চিন্তা ও বিচারের প্রয়োজন আছে। তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে দেশ ও জাতির দেহ, মন, ঐতিহাসিক প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক ও মানসিক কৃষ্টি এবং ব্যবহারিক পরিস্থিতি—এই সকলের মর্ম্মপরিচয় লইয়া, কতটুকু তত্ত্ব সত্যই প্রয়োগযোগ্য বা আদৌ তাহার প্রয়োগ এক্ষেত্রে হিতকর কি না, তাহা গভীরভাবেই দেখিয়া, ভাবিয়া, তবে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। আমরা বৈদেশিক বাদগুলির আমদানী করিতে গিয়া এই চিন্তা-সাধনায় কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হইতে না চাই বা না পারি, তবে সে বাদের আমদানী ও প্রচলনে আমাদের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টেরই সম্ভাবনা, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন?

* * * *

এদেশে একদিন 'বেদ-বাদ' প্রভৃতির প্রচলন হইয়াছিল। গীতাকার 'বেদ-বাদরতাঃ' যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও তীব্র-কণ্ঠে নিন্দা করিতে কুণ্ঠা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে 'প্রজ্ঞাবাদে'র জন্য কঠোর তিরস্কার করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞাবাদ বা Intellectual theoryগুলি সম্বন্ধে ভারতীয় মনীষিবৃন্দের প্রবল সতর্কতা চিরদিন দেখা গিয়াছে—ইহা

ভুয়োদর্শনজনিত, কোন প্রকার ভয় বা সঙ্কীর্ণতা বশতঃ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, ভারতের ন্যায় চিন্তার স্বাধীনতা আর কোনও দেশের ইতিহাসেই ছিল বা আছে বলিয়া প্রমাণ নাই। তত্ত্বজ্ঞান বা দর্শনের জন্য শোধন চাই। শুদ্ধ বুদ্ধিই শুদ্ধ-চিন্তা করিতে পারে, অবিকৃত সত্যকে অবধারণ করা তবেই সম্ভব হয়। অশুদ্ধ-বুদ্ধি তাহার ভ্রান্ত, বিকৃত, খণ্ড ধারণাগুলিকেই চরম ও পূর্ণ সত্য বলিয়া বরণ করিয়া আপনাকে ও জাতিকে বিভ্রান্ত, বিপথে ও কুপথে পরিচালনায় বিপর্য্যস্ত করে। এই বুদ্ধির শোধন সাধন-সাপেক্ষ। তাই তত্ত্বদর্শনের সাধনাই এদেশে চিরদিন প্রচলিত। ইহাই বেদ-বিধান। বলা বাহুল্য, বেদ-বাদ বা তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ 'প্রজ্ঞাবাদ' যেমন ইহা নহে, তেমনি ইহা বেদাতিরিক্ত অন্য কোনও অপ্রামাণিক Intellectual 'theory' বা 'ism'ও নহে। বুদ্ধির শোধনে, সাধনে যে নিশ্চয়াত্মিকা মর্ম্মদৃষ্টি পরিস্ফুট হয়, তাহাই সকল সত্যের খাঁটি কষ্টিপাথর বা চিন্তার নিকষ-মণি। গীতায় যে বুদ্ধিযোগের উল্লেখ আছে বা পতঞ্জলের যে সমাধি-সাধন, এ সকল ভারতীয় চিন্তা-সাধনারই সুপরীক্ষিত ক্রম ও প্রণালী। আমরা আজ এই পরীক্ষাসিদ্ধ পথ বর্জ্জন অথবা উপেক্ষা করিয়া, যেখানেই খুঁটি বাঁধিতে যাইতেছি, চোরাবালির ন্যায় তাহা ধ্বসিয়া গিয়া আমাদিগকে অনর্থ-সাগরে নিমজ্জিত করিতেছে। আজ আমরা যে 'ism'-এর শরণাপন্ন, কাল তাহা হইতে ব্যর্থ-বোধে মুখ ফিরাইয়া, আবার নূতন তত্ত্বের ধ্বনি তুলিয়া অগ্রসর হইতে প্রলুব্ধ হইতেছি—দেশের তরুণ এই সব প্রজ্ঞাবাদের আন্দোলনে যাইয়া, হাবুডুবু খাইয়া, একদিকে যেমন নিজেদের জীবন বিপন্ন ও ত্যাগ-বীর্য্য অপচিত করিতেছে, তেমনি বাদে-বাদে সংঘর্ষের ফলে দলাদলি ও তজ্জনিত ঘোরতর রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি ঘটিয়া, জাতির সর্ব্বাঙ্গ বিষ-জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থার প্রতিকার না হইলে, এ দেশের স্থায়ী কল্যাণ আর যেন দেখা যায় না। অন্ধ অন্ধকে চালাইয়া এমন সর্ব্বনাশই ডাকিয়া আনিবে, যাহাতে চালক ও চালিত উভয়েরই শেষ পরিণাম—একই অপমৃত্যু।

* * * *

বাঙালার বিপ্লব-বাদের কথাই ধরা যাক। এই 'বাদ' আজ বাঙালী তরুণ ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিতেছে। কেহ কেহ বলিবেন—ইহা রাজনৈতিক পলিসী—মর্ম্মগত পরিবর্ত্তন নহে। বাঙালার যৌবন যে কাপট্যাশ্রয়ী, ইহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিব না। আমরা বৈপ্লবিক তরুণদের হিংসা-নীতি-বর্জ্জনের যে ঘোষণা, তাহা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিব। গভর্ণমেণ্টও তাহা অন্ততঃ অংশতঃ বিশ্বাস করিয়াছেন বলিয়াই, বিশেষ পরীক্ষান্তে অন্তরীণ রাজবন্দী সকলকেই আজ মুক্তি দিয়াছেন। দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির জন্যও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করিতেছেন। সুতরাং কি দেশবাসী, কি গভর্ণমেণ্ট বৈপ্লবিক আবহাওয়া সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে করা যাইতে পারে। হিংসামূলক বিপ্লবনীতি চলিয়া যাইতেছে, সুখের কথা; কিন্তু বাঙালার তরুণ তৎপরিবর্ত্তে আবার যে 'বাদে' ধীরে ধীরে আপনাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছে, তাহা কাহারও অলক্ষ্য নহে। এই বাদ—সাম্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের জন্য আজ রাশিয়ান সাম্যবাদের জয়ধ্বনিই তাহাদের অনেকেরই কণ্ঠে শুনা যাইতেছে। এই সাম্যবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সব আলাপ-আলোচনা চলিয়াছে, যে সব প্রবন্ধাদি লিখিত হইতেছে, যে সব গ্রন্থাদি পঠিত ও বিতরিত হইতেছে, তাহা হইতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে আশঙ্কা হয়, বাঙালার যুবক সম্প্রদায় আর একটা 'ism'-এর আবর্ত্তে ঝম্প দিতে ধীরে ধীরে আগুয়ান হইয়াছে—গত যুগের বিপ্লববাদের চেয়ে এই যুগের সাম্যবাদের ভিত্তি খুব বেশী দৃঢ় ও পাকা নহে—কেন না, মার্কস্, এঞ্জেল, বুকানন, লেনিন প্রমুখ পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক বা কর্ম্মনেতার চিন্তা ও সাধনাই এই আন্দোলনের একমাত্র ভিত্তি, যেমন ম্যাজ্জিনী, গ্যারিবল্ডী, ওয়াশিংটন প্রভৃতি ছিলেন গত আন্দোলনের আদর্শ ও বিশ্বাসদাতা। তত্ত্বকে মর্ম্ম দিয়া আবিষ্কার বা গ্রহণ করার যে ভারতীয় বিধান, তাহার শোচনীয় দৈন্যই সর্ব্বত্র পরিলক্ষ্য করিতেছি। বাঙালী যুবক আজও বুদ্ধির স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠা যেন খুঁজিয়া পায় নাই—তাই মৌলিক প্রতিভার অভাব ধারকরা শব্দে ও অর্থে পূর্ণ করিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার কলঙ্ক কালন করিতে আমরা আজও

সক্ষম হইলাম না। শ্রীঅরবিন্দ যে সুগভীর চিন্তা, সাধনা, ভূয়োদর্শন-জাত ভারতীয় মস্তিষ্কের তত্ত্ব-সূত্র ও তাহার সংগঠন-সঙ্কেত দিয়া গেলেন, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি পড়িল না। বাঙালার যৌবন আরও একবার অনুকরণে, চর্ব্বিত-চর্ব্বণে শক্তিক্ষয় না করিলে অভিজ্ঞতার পাত্র বুঝি পূর্ণ হইবার নহে—তাই সেই জাতীয় ঋষির বিদায়কালীন সতর্ক-বাণী আজও অরণ্যে রোদনেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হইবে, ইহা বিচিত্র নয়;—"It has been driven home to us by experience after experie: ce, that not in the strength of a raw unmoralised European enthusiasm shall we conquer. Indians, it is the spirituatily of India, the sadhana of India, tapasya, jnanam, shakti, that must make us free and great. It is the East that must conquer in° Indian's uprising. It is the Yogin who must stand behined the political leader or manifest within him; Ramdas must be born in the body with Shivaji, Mazzini mingle with Cavour."

* * * *

কিন্তু বাঙালার তরুণ সম্প্রদায়ে এমন মানুষও আছেন আমরা বিশ্বাস করি, যাঁহারা এই অভিজ্ঞতার পথ বরণ করিবেন না—পরন্তু গোড়া হইতেই ভারতীয় সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে আপনার মস্তিষ্কটী ভারতীয় ভাবে পুনর্গঠন করিয়া লইবেন। বাঙালী নূতন মেধা, মস্তিষ্কের সঙ্গে নূতন চরিত্র লাভ করিবে। এক কথায়, ইহা একটা নূতন জন্মেরই সাধনা। এই নবজন্ম সিদ্ধ হইলেই আমরা এই সকল আলো-আঁধারী প্রজ্ঞাবাদ অতিক্রম করিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যপথই খুঁজিয়া পাইব—যাহা অবধারিত আমাদিগকে লইয়া চলিবে মুক্তি ও কল্যাণে। তরুণ জাতিকে আমরা সেইপথেই বারম্বার আহ্বান করিতেছি।

জীবন চলে

শ্রীসমীরকুমার ঘোষ

জীবন চলে—অথৈ জলে শেহালা ভেসে যায়,
কলমীলতা পাড় বুনিছে দীঘির কিনারায়।
সকালবেলা বুনো হাঁসের
ফুরিয়ে গেছে রাত্রি-বাসের
সকল কিছু প্রয়োজন ঃ—সে ভাস্‌ল দরিয়ায়।

জীবন চলে—বুকের তলে কান্না জাগে কার?
তরঙ্গেতে উঠ্‌ছে মেতে শোকের পারাবার?
সিন্ধু-শকুন ডানা মেলে
চল্‌ছে উড়ে বাতাস ঠেলে—
মুক্ত-সাগর বুকের তলে, ভাবনা কিসের তার?

জীবন চলে—তুল্‌সীমূলে প্রদীপ জ্বলে ওই-
বিশ্বদেবের চরণতলে প্রণত হয়ে রই।
শঙ্খধ্বনি গগন ছেয়ে ঃ
মাঙ্গলিকে পবন ধেয়ে
বল্‌ছে, জগত দুঃখভরা কেমন করে' কই?

জীবন চলে—মরণ-ছলে ঘুমায়ে পড়ি যেই,
পদ্মাচরে লাগ্‌ল এসে জলের ভাঙ্গন সেই;
ছোট্ট আমার ভেলাখানি
ঝড়ের সাথে মিলিয়ে পাণি
দিচ্ছে পাড়ি, কেমন করে' বল্‌ব জীবন নেই!

আরতির অভিমান

(গল্প)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

সকালে সংবাদ-পত্র ও চায়ের বাটি লইয়া বসিয়া আছি—এমন সময়ে পৌত্রী নীলিমা আসিয়া বলিল, "দাদু, আজ যেন আর দুপুরবেলা ঘুমুবেন না, বেলা দু'টর সময় আপনি ঠিক যাবেন কিন্তু।"

আমি বলিলাম—"চেষ্টা করে দেখব, না পারি দুঃখিত হব।"

নীলিমা বলিল—"দুঃখিত টুঃখিত আমি শুনব না, আপনাকে যেতেই হবে।"

আমি বলিলাম—"দেখা যাবে। তোমাকে কখন যেতে হবে?"

"ঠিক দশটার সময় আমাদের বাস্ আসবে। শান্তা দিদি বলে দিয়েছেন, আমাদের সকাল করে যেতে হবে।" নীলিমা চলিয়া গেল।

আমার বড় ছেলে ব্রজেন্দ্র ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক; নীলিমা তার বড় মেয়ে। সেখানে বাঙ্গালীর মেয়েদের পড়বার ভাল স্কুল না থাকাতে নীলিমা কলিকাতায় আমার ছোট ছেলে হরেন্দ্রের বাসাতে থাকে আর সরস্বতী বিদ্যা-মন্দিরে ক্লাস এইটে অর্থাৎ সেকালের থার্ড ক্লাসে পড়ে। আমি প্রায় ত্রিশ বৎসর, প্রথমে মুন্সেফ, পরে সবজজ মূর্ত্তিতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় সকল জেলার জল খাইয়া কয়েক বৎসর হইল পেন্সন্ লইয়া বাড়ীতে বসিয়া আছি। বাড়ীতে বসিয়া আছি ঠিক বলিতে পারি না, কারণ কখনও ভাগলপুরে, কখনও কলিকাতায় আর কখনও বা শ্রীরামপুরে পৈতৃক বাটীতে থাকি। ছোট ছেলে হরেন্দ্র কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট অফিসে কাজ করে। লর্ড কার্জ্জন কৃত বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের অনেক পূর্ব্বে মুন্সেফী গ্রহণ করিয়াছিলাম, সুতরাং এখন আমার বয়স যে সত্তরের কাছাকাছি, একথা না বলিলেও চলে।

নীলিমা যেদিন আমার দিবানিদ্রায় আপত্তি করিল, সেদিন তাহাদের স্কুলে পারিতোষিক বিতরণ উৎসব। আমার এবং হরেনের নিমন্ত্রণ ছিল; হরেন্দ্রের আফিস আছে, সে যাইতে পারিবে না, আমি যাইব পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম। উৎসব উপলক্ষে স্কুলে মেয়েরা নাটক অভিনয় করিবে, নীলিমারও একটা পার্ট ছিল, তাই আমাকে যাইবার জন্য তাহার অত জেদ।

যথা সময়ে সভাতে উপস্থিত হইলাম। একটু পরেই অভিনয় আরম্ভ হইল। নীলিমা রাজা উত্তানপাদ সাজিয়াছিল। আর দুইটি মেয়ে—পরে নীলিমার মুখে শুনিলাম তাহারা দুই সহোদরা—বড়টি সুনীতি এবং ছোটটি সুরুচি সাজিয়াছিল। দুইটিই অসাধারণ সুন্দরী, যেমন রঙ, তেমনই লাবণ্য আর তেমনই কণ্ঠস্বর। তাহাদিগকে মনে করিলাম, যদি উহারা আমাদের স্বশ্রেণী ও স্ব-ঘর হয়, তাহা হইলে একটিকে—তা' যেটিকেই হউক, আমার পৌত্রবধূ করিব। রাত্রিতে নীলিমা বলিল, "বড় অঞ্জলী আমাদের ক্লাসে পড়ে, তার বয়স পনর বৎসর, আর ছোটর নাম আরতি, সে দু'বছরের ছোট—ক্লাস সিক্সে পড়ে। ওরা চ্যাটার্জ্জি।"

আমরা মুখুয্যে ওরা চাটুয্যে, সুতরাং এক বিষয়ে আপত্তি হইবে না। তারপর অন্যান্য বিষয় পরে দেখা যাইবে।

দুই তিন মাস পরে, একদিন নীলিমা স্কুল হইতে আসিয়া বলিল "দাদু, কাল আমাদের স্কুলের চারপাঁচজন বন্ধুকে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসবার নিমন্ত্রণ করেছি। তাদের কি খাওয়াব বলুন দিকি?"

আমি বলিলাম "সে পরামর্শ তোর ছোটমার সঙ্গে করিস্। আমাদের সে-কালের খাবার ত তোদের একালে বন্ধুদের মুখে রুচবে না, আমি কি বলব বল? তোর ছোটমা যা বলবেন, তাই হবে।"

নীলিমা বলিল "ঠাকুরমাও ত বলতে পারবেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করব।"

"তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও বলতে পারবেন না, তিনিও সেকালের লোক। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলবেন, সুক্তো, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, মাছের ঝোল—"

বাধা দিয়া নীলিমা বলিল—"দূর! বন্ধুদের বুঝি ঐ সব খাওয়ায়? তারা বুঝি আমাদের বাড়ী পেসাদ পেতে আসবে?"

"আমিও ত তাই বলছিরে পাগ্‌লী, বন্ধুদের খাওয়াতে গেলে এ কালের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়।"

পরদিন, ছোট বউমার ফর্দ্দ অনুযায়ী বাজার করিয়া আনিলাম। বেলা দুইটার সময়, অঞ্জলী, পারুল, রেবা, মীরা, শেফালী প্রভৃতি সাতটি আটটি কিশোরী আমাদের বাড়ীতে আসিল। অঞ্জলীকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম, তাহাদের দলে তাহার মত সুন্দরী কাহাকেও দেখিলাম না। তাহারা আমার পরিচয় পাইয়া একে একে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। বলা বাহুল্য যে আমি সকলেরই "দাদু" হইলাম।

অঞ্জলীর ভগিনী আরতিকে দেখিতে না পাইয়া নীলিমাকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলাম "হাঁরে নীলি, অঞ্জলীর বোন আরতি আসেনি?"

নীলিমা বলিল "সেত আমাদের ক্লাসে পড়ে না, সে যে আমাদের চেয়ে ছোট। এরা সব আমার সমবয়সী, আর ক্লাস-ফ্রেণ্ড।"

"তা' হলেও যখন দিদিকে নেমন্তন্ন করলি, তখন তাকেও আসতে বল্লে ভাল হত।"

"এদের অনেকেরই ত ছোট বোন আমাদের স্কুলে পড়ে, তা' হলে তাদেরও বলতে হ'ত—তা' হলে যে অনেক বেড়ে যেত।"

"বেড়ে গেলেই বা! আট জনের জায়গায় না হয় পনর জন কি কুড়ি জন হত? না বলাটা ভাল হয়নি।"

নীলিমা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না, সে তাহার বন্ধুদের কাছে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদের কলহাস্যে, গানে ও ছুটাছুটিতে বাড়ী মুখরিত হইয়া রহিল। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া সকলে চলিয়া গেল।

তিন চার মাস পরের কথা। একদিন নীলিমাকে লইয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথম অঙ্ক শেষ হইবার পর নীলিমা বলিল "দাদু, চলুন একটু ঘুরে আসি, বড় গরম।"

আমারও গরম বোধ হইতেছিল, নীলিমার কথায় তাহাকে লইয়া বাহিরে যাইবামাত্র, নীলিমা ছুটিয়া আমার কাছ হইতে চলিয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে দুইটি কিশোরীকে টানিয়া আমার কাছে আনিয়া বলিল "দাদু, কে এসেছে দেখুন।"

আমি তখন চুরুট অগ্নি-সংযোগে ব্যস্ত ছিলাম, চুরুট ধরান হইলে মুখ তুলিয়া দেখি, নীলিমা অঞ্জলী ও আরতিকে পাকড়াও করিয়া আমার কাছে আনিয়াছে। আমি মুখ তুলিবামাত্র অঞ্জলী আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল "দাদু, কেমন আছেন? আমাকে চিনতে পারেন?" অঞ্জলীকে প্রণাম করিতে দেখিয়া আরতিও আমাকে প্রণাম করিল। বলা বাহুল্য যে, দর্শন মাত্রেই আমি তাহাদিগকে চিনিয়াছিলাম। তথাপি রহস্য করিয়া বলিলাম "তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে' মনে হচ্ছে। তোমাকে বোধহয় এই ষ্টেজের উপরেই দেখেছি, তুমিইত রাণী সেজেছিলে?"

নীলিমা আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল "নারে, দাদু ঠাট্টা করছেন, তোকে আবার চেনেন্ না?"

এমন সময়ে একজন সুন্দর প্রৌঢ় ভদ্রলোক সহাস্যবদনে আমাদের কাছে আসিবামাত্র অঞ্জলী বলিল "বাবা, ইনি নীলিমার দাদু।"

তিনি আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন "অঞ্জলীর মুখে আপনার সুখ্যাতি আর ধরে না, আপনাকে যে কি চক্ষেই দেখেছে—!"

তাঁহার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল। শুনিলাম তাঁহার নাম ভুবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলিপুরে ওকালতী করেন,

মানিকতলার সার্কুলার রোডে তিনি বাড়ী করিয়াছেন, পৈত্রিক বাস খড়দহে।

থিয়েটারের যবনিকা উঠিবার সঙ্কেত-ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া আমরা প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিলাম, এবারে অঞ্জলী ও আরতি আমার কাছে, নীলিমার পাশে বসিল, ভুবনবাবুও আমার অন্য পাশে বসিলেন। গভীর রাত্রে অভিনয় শেষ হইলে আমরা একত্রে বাহিরে আসিলাম। নীলিমা বলিল "দাদু, আমি অঞ্জলীদের সঙ্গে ওদের গাড়ীতে যাই, আপনি অঞ্জলীর বাবার সঙ্গে আমাদের গাড়ীতে আসুন।" তাহাই হইল। নীলিমা ও আরতি ভুবনবাবুর গাড়ীতে গিয়া উঠিল, আমি ভুবনবাবুকে লইয়া আমার গাড়ীতে উঠিলাম। আমার গাড়ী অগ্রে গিয়া ভুবনবাবুর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলে, ভুবনবাবু বলিলেন—"আমার বাড়ীতে একবার পায়ের ধূলো দেবেন না?"

আমি বলিলাম "আজ নয়, রাত্রি প্রায় বারটা হয়েছে, আর একদিন আসব।"

ভুবনবাবুর গাড়ী আসিলে নীলিমা সে গাড়ী হইতে নামিয়া আমার গাড়ীতে উঠিল। আমি আরতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "আরতি দিদি, তুমি আমার সঙ্গে একটীও কথা কইলে না, আমার উপর অভিমান করেছ?"

আরতি মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল "না।" কি সুন্দর হাসি! ভুবনবাবু কন্যাদিগকে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমরাও আমাদের বাসা বাদুড়বাগান অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আরও চার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল। নীলিমা ও অঞ্জলী দুইজনেই প্রবেশিকা শ্রেণীতে উঠিয়াছে, এই বৎসর তাহারা পরীক্ষা দিবে। দুইজনেই মন দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল, পাছে পড়ার ব্যাঘাত হয়, সেইজন্য, কাহারও বাটীতে বেড়াইতে যাওয়া বা থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদে যোগদান করা বন্ধ করিল। আমি নিষ্কর্ম্মা লোক, মধ্যে মধ্যে এক এক দিন প্রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়া ভুবনবাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতাম। অঞ্জলী ও আরতির সঙ্গেও দুই একদিন দেখা হইয়াছিল।

চৈত্র মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা হইল, জ্যৈষ্ঠ মাসে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল। নীলিমা প্রথম বিভাগে এবং অঞ্জলী দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইল এবং কলেজ খুলিলে, দুইজনেই বেথুন কলেজে প্রবেশ করিল।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি অঞ্জলীর বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম। অঞ্জলীর ভাবী শ্বশুর ভুবনবাবুর সহকর্ম্মী অর্থাৎ আলিপুরের উকীল, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুত্র অমৃতকুমার ল-কলেজের ছাত্র। বাড়ী ভবানীপুর।

আমি প্রথম যেদিন স্কুলের পারিতোষিক বিতরণী সভাতে অঞ্জলী ও তাহার ভগিনীকে দেখিয়াছিলাম, সেইদিনই তাহাদের একজনকে আমার পৌত্রবধূ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নীলিমার দাদা যতীন্দ্র নীলিমা অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়, অঞ্জলী নীলিমার সমবয়সী। সুতরাং যতীনের সঙ্গে অঞ্জলীর বিবাহ পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্য তিন বৎসর মাত্র হওয়াতে "সাজন্ত" হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, যদি উহাদের একটিকে যতীনের বধূ করিতে হয়, তাহা হইলে আরতিকেই পৌত্র-বধূ করিব। অঞ্জলী অপেক্ষা আরতি ধীর, শান্ত, অল্পভাষিণী। সৌন্দর্য্যে দুইটি ভগিনী সমান হইলেও, ধীরতার জন্য আরতিকে অধিকতর সুন্দর বলিয়া মনে হইত। সেইজন্য আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, অঞ্জলীর বিবাহ হইয়া গেলে, আমি ভুবনবাবুর নিকটে যতীনের সঙ্গে আরতির বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিব। অঞ্জলীর বিবাহ উপলক্ষে ভুবনবাবুর স্ত্রী আমার ছোট পুত্র-বধূকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন এবং ছোট বৌমাও যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ভুবনবাবুর বাটীতে যাইবার পূর্ব্বে, আমি ছোট বৌমাকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলাম "বৌমা, তুমি অঞ্জলীকে দেখেছ, তার ছোটবোন আরতিকে দেখনি; সে আরও সুন্দর। আমার ইচ্ছা আছে, সেটিকে যতীনের বউ করব। কিন্তু সে কথা আমি কারও কাছে প্রকাশ করিনি। অঞ্জলী আমাদের বাড়ীতে দু'তিন দিন এসেছে, কিন্তু আমি আরতিকে একদিনও আসবার কথা বলিনি, কারণ যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে আরতি নাৎবউ হয়, তবে, বিয়ের আগে, অদিনে অক্ষণে তাকে বাড়ীতে আনা ঠিক নয়। তুমি গিয়ে আজ

আরতিকে ভাল করে' দেখো, কিন্তু সাবধান, আমার এই সঙ্কল্পের কথা যেন ঘুণাক্ষরে কেউ না জান্‌তে পারে। নীলিমাকেও কোন কথা বলো না।"

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পর আমি, হরেন্দ্র, ছোটবৌমা ও নীলিমাকে লইয়া ভুবনবাবুর বাড়ীতে গমন করিলাম। সন্ধ্যার পরই বিবাহ, তাই গিয়া দেখিলাম যে, বিবাহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বর অমৃতকুমার বেশ সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান্ যুবা। বরকর্ত্তা অমিয়বাবুর সঙ্গে ভুবনবাবু আমার আলাপ পরিচয় করাইয়া দিলেন। অমিয়বাবু বলিলেন "আমি যখন প্রথম ওকালতী আরম্ভ করি, তখন আপনি আলিপুরে সবজজ ছিলেন। আপনার কোর্টে আমি দুই চারিবার মামলা করিতে গিয়াছি। সে বোধহয় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।"

দেখিলাম অমিয়বাবু বেশ ভদ্র, বিনয়ী ও সজ্জন। আমি এককালে হাকিম ছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে খাতির করিলেন। শুনিলাম, তিনি বিনা পণে পুত্রের বিবাহ দিতেছেন।

পরদিন ছোট বউমা বিরলে আমাকে বলিলেন "আরতি মেয়েটি কি সুন্দর! আমাকে "কাকীমা" বলে' কত আদর যত্ন করলে, যেন কত দিনের চেনা। যেমন করে হ'ক বাবা উটিকে যতীনের বউ করতেই হবে।"

আরও প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এই তিন বৎসরের মধ্যে আমাদের পরিবারে প্রধান স্মরণীয় ঘটনা নীলিমার বিবাহ। আমি যখন বর্দ্ধমানে সবজজ ছিলাম, তখন উমানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বর্দ্ধমানে মুন্সেফ ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর হইবে। উমানাথ বাবু আমা অপেক্ষা পনর ষোল বৎসরের ছোট ছিলেন। বর্দ্ধমানে আমাদের বাসা কাছাকাছি ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার বাসাতে স্থানীয় কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী এবং উকীল ও ডাক্তার প্রভৃতি বেড়াইতে আসিতেন এবং রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি খেলা চলিত। সে সময় উমানাথ বাবু প্রায় প্রত্যহই আমার কাছে আসিতেন। আমি যখন বর্দ্ধমান হইতে রঙ্গপুরে বদলি হই, উমানাথ বাবু তখন বর্দ্ধমানেই ছিলেন। তার পর তিনিও আমার মত বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলা ঘুরিয়া ইদানীং সবজজরূপে আবার বর্দ্ধমানেই আসিয়াছিলেন এবং বর্দ্ধমানে আমি যে বাড়ীটা ভাড়া লইয়াছিলাম, সেই বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। সেই উমানাথ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র রমানাথের সঙ্গে নীলিমার বিবাহ হইল। আমার বর্দ্ধমান-ত্যাগের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে রমানাথ বর্দ্ধমানেই জন্মগ্রহণ করে। এখন রমানাথ ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর বয়স্ক যুবা। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আমাকে একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমানে যাইতে হয়। সেই সময়ে আমি সেখানে গিয়া সংবাদ পাই যে, উমানাথ বাবু সবজজ হইয়া বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন এবং আমি যে বাসাতে ছিলাম, সেই বাসাতেই বাস করিতেছেন। সংবাদ পাইয়া সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম।

আমাকে দেখিয়া উমানাথবাবু যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং যতদিন আমি বর্দ্ধমানে থাকিব, তাঁহার অতিথি হইয়া থাকিতে হইবে বলিয়া একান্ত জেদ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না, তাঁহার বাসাতেই থাকিতে হইল। তাঁহার পারিবারিক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উষানাথ এখান হইতে বি, এ পাশ করিয়া বিলাত গিয়াছিল, সেখানে তিন বৎসর থাকিয়া, ভারতগভর্ণমেণ্টের অধীনে একটা চাকরী লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। বড়লাটের সঙ্গে তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। আমি যখন উমানাথ বাবুর অতিথি হই, তখন উষানাথ সস্ত্রীক সিমলাতে ছিল, বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। উমানাথ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র রমানাথ এম, এ, বি, এল, মুন্সেফীপদের জন্য দরখাস্ত করিয়া আপাততঃ বর্দ্ধমানেই ওকালতী করিতেছে, উমানাথ বাবু হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের আফিসে সংবাদ লইয়া জানিয়াছেন যে, তিন চারি মাসের মধ্যেই রমানাথের মুন্সেফ হইবার আশা আছে। তখনও রমানাথের বিবাহ হয় নাই।

আমি এ সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না, রমানাথের সহিত নীলিমার বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপন করিলাম, তিনি

আনন্দসহকারে সম্মতি দান করিলেন। তারপর একটা রবিবারে কলিকাতায় গিয়া নীলিমাকে দেখিয়া আসিলেন। নীলিমা তখন বি, এ, পড়িতেছিল। নীলিমাকে দেখিয়াই তাঁহার পছন্দ হইল। সেইদিনই কথাবার্ত্তা, এমন কি বিবাহের মাস ও তারিখ পর্য্যন্ত স্থির হইল। তিনি দেনা পাওনা সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিলেন না, তথাপি আমি তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম যে, নীলার বিবাহে আমরা সাত হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি। আমি সেই দিনই ভাগলপুরে ব্রজেন্দ্রকে পত্র দ্বারা সমস্ত বিবরণ জানাইলাম।

বিবাহটা শ্রীরামপুরে আমাদের পৈত্রিক আবাসেই হইল। আমাদের বাটীর বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি সকল কার্য্যই পৈত্রিক বাটীতেই হইত। বিবাহের প্রায় একমাস পূর্ব্বে আমি শ্রীরামপুরে গিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলাম। বিবাহ উপলক্ষে ব্রজেন্দ্র তিন সপ্তাহের ছুটী লইয়া বাড়ীতে আসিল। আমার বড় পৌত্র, ব্রজেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্র পাটনা মেডিকেল কলেজে পড়িতেছিল, তাহার শেষ পরীক্ষা আসন্ন বলিয়া সে বিবাহের দিন প্রাতে বাটীতে আসিল এবং মাত্র দুই দিন থাকিয়াই পাটনায় চলিয়া গেল।

নীলিমার সঙ্গে অঞ্জলীর পত্র ব্যবহার হইত। নীলিমা বলিল যে, তাহার বিবাহে অঞ্জলী বোধ হয় আসিতে পারিবে না, কারণ, খুব সম্ভবতঃ সে সময়ে সে সূতিকাগারে থাকিবে। যদি দুই তিন মাস পরে বিবাহ হয়, তাহা হইলে অঞ্জলী আসিতে পারে। কিন্তু তখন আর বিবাহ স্থগিত রাখিবার কোন উপায় ছিল না, সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হইয়া গিয়াছিল।

ভুবনবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, ছোট বউমা গিয়া ভুবন বাবুর স্ত্রীকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ভুবন বাবুর স্ত্রী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলে, আরতিও তাহার জননীর সঙ্গে আসিবে জানিয়া আমি একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম। কারণ, আরতিকে পৌত্রবধূ করিব স্থির করিয়া তাহাকে "অদিনে অক্ষণে" আমার কলিকাতার বাসাতেই আমি এক দিনও লইয়া যাই নাই। তাহার উপর আরতি যদি নীলিমার বিবাহ উপলক্ষে আমাদের শ্রীরামপুরের বাটীতে আসে তাহা হইলে যতীনের সহিত তাহার নিশ্চিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবে। বিবাহরাত্রিতে, "শুভদৃষ্টির" পূর্ব্বে যে পাত্র পাত্রীর দৃষ্টি-বিনিময় হয়, তাহার পূর্ব্বে, পাত্র পাত্রীর দৃষ্টি-বিনিময়টা আমি পছন্দ করি না। আমার এই অভিমতকে যদি কেহ কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিতে চাহেন করুন, কিন্তু আমি সেকালের বৃদ্ধ, একালের এই পাত্র পাত্রীকে পরস্পরে দেখিয়া পছন্দ করাটাকে আমি ফিরিঙ্গীয়ানা বলিয়াই মনে করি। পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পরম শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজন যে পাত্র বা পাত্রী স্থির করেন, তাহাকে বিবাহের পূর্ব্বে একবার নিজের চ'খে দেখা আমার মতে গুরুজনকে অবিশ্বাস করা। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত, আধুনিক সমাজে আমি এই "সেকেলে" অভিমত প্রচার করিয়া সামাজিক প্রগতির পথে বিঘ্ন হইব না। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে ভুবন বাবুর দুই তিনজন ভৃত্য "আইবুড় ভাতের" উপহার লইয়া আসিল। তাহারা বলিল যে, ভুবনবাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া, সন্ধ্যার সময়ে পত্নী ও কন্যাকে লইয়া আসিবেন। আমি ভাবিলাম বিবাহের পূর্ব্বে যতীনের সঙ্গে আরতির দেখা বিধাতার নির্ব্বন্ধ, আমি বাধা দিব কি করিয়া? যাহা হইবার হউক, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আটটার পর বিবাহ আরম্ভ হইল এবং যথা সময়ে শেষ হইল। বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী প্রভৃতি সকলের আহারাদি হইয়া গেল, অধিকাংশ বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলারা আহারাদি করিয়া চলিয়া যাইলেন; ভুবন বাবু আসিলেন না। রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে আমি উমানাথ বাবুকে লইয়া আহার করিতে যাইব, এমন সময়ে ভুবন বাবু একাকী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "বেলা চারিটার সময়ে, অঞ্জলীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হওয়াতে আমার স্ত্রী আরতিকে লইয়া অঞ্জলীর কাছে যান। আমি কোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিয়া ঐ সংবাদ শুনিবা মাত্র অঞ্জলীর শ্বশুরবাটীতে গমন করি। রাত্রি নয়টার সময়ে অঞ্জলীর একটী পুত্র হইয়াছে। বেয়ান আমার স্ত্রীকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, অঞ্জলীও আরতিকে ছাড়িল না। তাই আমি একাই আসিলাম।"

অঞ্জলীর পুত্র হইয়াছে শুনিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিলাম, এ আনন্দ-প্রকাশ মৌখিক নহে, আন্তরিক, কারণ এই ঘটনাতে আরতির আগমনে বাধা পড়িল। ইহাকেই বলে বিধাতার নির্ব্বন্ধ!

ভুবন বাবু সেই দিনই আহারাদির পর কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন, কিন্তু আমি ছাড়িলাম না; বিশেষ গুরুতর একটা পরামর্শ আছে, কাল সকালে যাইবেন বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি ভুবন বাবুকে উপরে আমার শয়ন-কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বসাইলাম এবং যতীনকে ডাকিয়া তাহার পিতাকে ও কাকাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিতে বলিলাম। যতীন প্রস্থান করিলে, ভুবন বাবু বলিলেন —"এই যতীন ছেলেটি কে?" আমি বলিলাম "আমার পৌত্র, ব্রজেনের বড় ছেলে, নীলিমার দাদা।"

ভুবন বাবু বলিলেন "কি সুন্দর ছেলে, দেখলে চোখ জুড়োয়? যতীন কি করছে?"

"এম, এস্‌সি, দিয়ে মেডিকেল লাইনে গেছে। পাটনা মেডিকেল কলেজে পড়ে, এই বৎসর শেষ পরীক্ষা দেবে। যতীন লেখাপড়ায় মন্দ নয়, স্কুলে বরাবর প্রাইজ পেয়েছে, কলেজেও স্কলারশিপ পেয়েছে, কতকগুলি মেডেল আছে।"

এমন সময়ে ব্রজেন্দ্র ও হরেন্দ্র আসিয়া বলিল "বাবা আমাদের ডাকছেন?"

"হাঁ বাবা বস, একটা পরামর্শ আছে। হরেন ভুবন বাবুকে জান, ব্রজেন জান না। ইনি আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, আলিপুরের উকীল। ওঁর বড় মেয়ে অঞ্জলী নীলির ক্লাস-ফ্রেণ্ড। ওঁর আরতি বলে আর একটি মেয়ে আছে, আমার বড় ইচ্ছা সেটিকে আমার নাৎবৌ করি। ছোট বউমা তাকে দেখেছেন, তাঁরও ইচ্ছা যে, যতীনের সঙ্গে আরতির বিবাহ হয়। তাই আমি ভুবন বাবুকে অনুরোধ করছি, আরতিটিকে আমায় ভিক্ষা দিন।"

আমার কথা শুনিয়া ভুবন বাবু করযোড়ে বলিলেন "এযে আশার অতীত, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন দেখা। আপনারা যদি দয়া করে' আমার আরতিকে পায়ে রাখেন, তা'হলে ত আমি ধন্য হই। কাল রাত্রেই আপনার পৌত্রকে দেখে আমার লোভ হয়েছিল, কিন্তু তখন ওঁর পরিচয় পাইনি বলে' কোন কথা উত্থাপন করিনি। আপনি যদি পূর্ব্বে আমাকে ঘুণাক্ষরে জানাতেন, তা'হলে আমি আরতিকে আপনার চরণে ফেলে দিয়ে যেতেম।"

আমি ব্রজেনকে বলিলাম "তুমি আরতিকে দেখ নাই? বাঙ্গালীর ঘরে লক্ষের মধ্যে বোধ হয় অমন সুন্দরী একটিও পাওয়া যায় না। শুধু কি রূপ? সর্ব্বসুলক্ষণা মেয়ে, আই-এ পড়ছে, গান বাজনা, শিল্পকাজ সব দিক্ দিয়ে সুন্দর। অমন মিষ্ট স্বভাব আমি ত কারও দেখিনি।"

ব্রজেন বলিল—"আপনি আর বৌমা যখন দেখে পছন্দ করেছেন, তখন আর কথা কি আছে?"

আমি বলিলাম—"ভুবনবাবুর কাছে আমি ভয়ে ভয়ে আরতি দিদিকে ভিক্ষা চেয়েছিলাম, তা' দেখছি ওঁর অমত নেই। আমার কথাও পূর্ব্বেই বলেছি। আমার মনে মনে এই ইচ্ছা ছিল বলে' আমি একদিনও আরতিকে আমাদের বাড়ীতে যাবার কথা বলিনি, কি জানি কোন একটা অশুভক্ষণে বাড়ীতে পাছে প্রবেশ করে। অঞ্জলী কতবার আমাদের বাসাতে গিয়েছে, প্রথম দিন কেবল তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'আরতিকে আনলে না কেন?' কিন্তু তারপর যেদিন থেকে আরতিকে নাৎবউ করবার ইচ্ছে হয়েছে, সেইদিন থেকে আরতিকে একদিনও আনবার কথা বলিনি। আমার বড় ভয় হয়েছিল যে, কাল বউমা অর্থাৎ ভুবনবাবুর স্ত্রী এখানে এলে আরতিও তাঁর সঙ্গে আসবে, হয়ত বিয়ের শুভ দৃষ্টির পূর্ব্বেই যতীনের সঙ্গে তার দৃষ্টি-বিনিময় হবে। যখন ভুবনবাবু বল্লেন যে, বউমা ও আরতির আসা হল না, তখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে' বাঁচলেম। যা' হ'ক, এইবার তা' হলে বিয়ের দিনটা স্থির করা যাক।"

ব্রজেন বলিল—"যতীনের পরীক্ষার পর যেদিন হয় একটা স্থির করলেই হবে। একটা কথা, যতীনের ইচ্ছে, এবং আমারও ইচ্ছে যে, সে এখান থেকে পাশ করে' বিলেত গিয়ে সেখান থেকে একটা ডিগ্রী নিয়ে আসে।"

আমি বলিলাম—"সে ইচ্ছে আমারও আছে, কিন্তু ঐ ছোঁয়াচে রোগের দেশে ছেলেপিলে সোঁদা পাঠাতে নেই, পাঠাবার পূর্ব্বে ভ্যাকসিনেট করা উচিত। বেশ ত যতীন বিয়ে করে' বিলেত যাক্, আর আরতি দিদি এখানে পড়াশুনা করতে থাকুক। কি বলেন ভুবনবাবু?"

ভুবনবাবু বলিলেন—"এ বিষয়ে আপনাদের ব্যবস্থাই আমার শিরোধার্য্য। আমারও ইচ্ছে আরতি আই-এটা পাশ করে।"

ব্রজেনও বলিল—"আই-এ, কেন? বি-এ, পর্য্যন্ত পড়ান না। তার লেখাপড়া এখন বন্ধ করা হবে না।"

"নূতন পঞ্জিকায়" দিন দেখা হইল—আগামী বৎসর বৈশাখ মাসে অনেকগুলা বিবাহের দিন আছে। স্থির হইল—২৭শে বৈশাখ শুক্রবার বিবাহ হইবে। হরেন বলিল—"ঐদিন হলেই ভাল হয়। দাদারও কলেজ সামার ভেকেশনে বন্ধ থাকবে। শুক্রবার বিয়ে রবিবারে পাকস্পর্শ—সেই বেশ হবে।"

কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেলে, আমি ভুবনবাবুকে বলিলাম—"এখনও তিন মাস বিলম্ব আছে; ততদিনে অঞ্জলীও বেশ সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে। এখন এই বিয়েতে আমার একটা সর্ত্ত আছে।"

ভুবনবাবু বলিলেন—"কি সর্ত্ত?"

"সর্ত্তটা এই যে, বিবাহের পূর্ব্বে আরতি যেন ঘুণাক্ষরেও না জানিতে পারে যে, আমার পৌত্র অর্থাৎ নীলিমার দাদার সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হয়েছে। শ্রীরামপুরে লাহিড়ীপাড়ার ব্রজেন মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, আরতি এই পর্য্যন্তই জানুক। আরতি আমার নাম জানে, সুতরাং আপনি যে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাবেন, তা'তে ঐ পাত্রের পিতার নাম পর্য্যন্তই দেবেন, পাত্রের বুড় পিতামহকে নিয়ে আর টানাটানি করবেন না। অবশ্য আমরা যে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাব, তাতে আমার নাম থাকবে, সে পত্র আরতির হাতে পড়বে না।

হরেন বলিল—"কিন্তু আপনি বিদ্যমান থাকতে উনি আপনার নাম উল্লেখ না করে' শুধু দাদার নাম উল্লেখ করবেন কি করে'?"

আমি বলিলাম—"তাতে কোন বাধা নাই। আমি ত রিটায়ার করেছি, আমার এখন "বনং ব্রজেৎ" অবস্থা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত থাকতেই তাঁর জমিদারীর কাজকর্ম্ম, পারিবারিক উৎসবে নিমন্ত্রণ-পত্র সমস্তই তাঁর বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রবাবুর নামে হ'ত। আমি যখন বলছি, তখন আর ভুবনবাবুর কি আপত্তি?"

ভুবনবাবু বলিলেন—"আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু লুকোচুরির কারণ ত কিছু বুঝতে পারছি না।"

"আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি আরতি দিদিকে নিয়ে একটু রঙ্গ করতে চাই। বৃদ্ধ বয়সে নাতিনাৎনীদের নিয়ে একটু রঙ্গ রস ঠাট্টা বিদ্রূপ করবার ইচ্ছে হয়, তাই আর কি? আর একটা কথা, অঞ্জলীর কাছেও একথা কিছু বলবেন না। ছেলে মানুষ, সে গোপন রাখতে পারবে না, সব গোলমাল করে' ফেলবে।"

সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া যাইলে, ভুবনবাবু করযোড়ে বলিলেন—এখন আমার একটা ভিক্ষা আছে। আপনি যখন আমাকে, আজ থেকে ব্রজেন্দ্রবাবু ও হরেন্দ্রবাবুকে বৈবাহিক বলে সম্বোধন করবার অধিকার দিলেন, তখন আমাকেও আপনার ছেলে বলে' মনে করবেন, আমাকে 'আপনা-আপনি' করে আর আমার অকল্যাণ করবেন না, এই আমার ভিক্ষা।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"অনেক দিনের অভ্যাস সহজে কি ছাড়তে পারব? আচ্ছা, চেষ্টা করব।"

৫

যতীন মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায়, আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করাতে গভর্ণমেণ্ট হইতে বিলাতে যাইবার জন্য বৃত্তি পাইল। ব্রজেন্দ্র, বঙ্গব্যবচ্ছেদের পূর্ব্ব হইতেই ভাগলপুরে ছিল, সেখানে বাড়ী-ঘরও করিয়াছিল, সেইজন্য বিহারে পৃথক্ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেও, "ডোমিসাইল্ড্" বলিয়া যতীনের বৃত্তি পাইতে কোন বাধা হইল না।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ব্রজেন্দ্রের গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইল। যতীন পরীক্ষা দিয়াই পাটনা হইতে ভাগলপুরে গিয়াছিল। ছুটী হইলে, ব্রজেন্দ্র সপরিবারে

শ্রীরামপুরে আসিল। আমার জামাতা নবীনকৃষ্ণ শ্রীরামপুরে ওকালতী করিতেন, তিনিই সপরিবারে শ্রীরামপুরে আমাদের বাড়ীতে বাস করিতেন। বাড়ীটাও ছিল খুব বড়; আমরা সকলে সেখানে থাকিলেও, স্থানাভাব হইত না। বাড়ীতে আমার জামাতা থাকিতেন বলিয়া বাড়ীটা হতশ্রী হয় নাই। নবীনকৃষ্ণ বেশ সৌখীন ছিলেন বলিয়া বাড়ী, বাগান, পুকুর প্রভৃতি খুব পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। তিনিও শ্রীরামপুরে একটা বাড়ী করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অনুরোধে নিজের বাড়ী ভাড়া দিয়া আমার বাড়ীতেই বাস করিতেন।

২০শে বৈশাখ শুক্রবার, ভুবনবাবু শ্রীরামপুরে আসিয়া যতীনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। ২২শে রবিবার ব্রজেনকে পাত্রী আশীর্ব্বাদ করিতে পাঠাইলাম; আমি গেলাম না, পাছে আরতির সম্মুখে আমাকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া ব্রজেন বা হরেন আমার ষড়যন্ত্র মাটী করিয়া দেয়। তাহাদিগকে বলিয়া দিলাম যে, ভুবনবাবু যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, বলিও, আমার শরীরটাই আজ ভাল নাই।

নীলিমার বিবাহের পর হইতে ভুবনবাবু আমাদের সঙ্গে খুব আত্মীয়তা আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। আমি ভুবনবাবুকে বলিলাম "আরতির বিবাহের পূর্ব্বে আমি আরতিকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইব না। সুতরাং আরতি ও তাহার জননীকে আমরা একদিনও নিমন্ত্রণ করি নাই; তবে আরতির মা, কন্যাকে কলেজে পাঠাইয়া মধ্যাহ্ন কালে, চার পাঁচ দিন আমাদের বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি একদিন আরতিকে বলিলাম—"আরতি দিদি, তুমি একদিনও আমাদের বাড়ী গেলে না, তোমার দিদি কতদিন গেছে!"

আরতি বলিল—"নীলিমাদি দিদিকে নিয়ে যে আমাকে ত নিয়ে যেত না।"

"আমি যদি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি, তা' হ'লে যাবে ত?"

"আপনি নিজে এসে যদি নিয়ে যান, তাহ'লে যাব'; তা' নইলে যাব না।"

"আমার পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে তোমাকে কার্ড দিব, তাতে যাবে ত?"

"না। আপনি যখন নিজে এসে আমাকে সঙ্গে করে' নিয়ে যাবেন, তখন যাব।"

"আচ্ছা, তাই নিয়ে যাব।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে শুভ লগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ-রাত্রিতে বরযাত্রী কন্যাযাত্রী, স্ত্রী পুরুষ অন্যূন পাঁচ শত লোক খাওয়ান হইল। আমাকে যাহারা পূর্ব্বে ভুবনবাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাকে কন্যাযাত্রী বলিয়াই মনে করিলেন। বিবাহের সময়ে অন্তঃপুরে অঞ্জলীর সঙ্গে দেখা হইল, সে আমাকে প্রণাম করিয়া নীলিমার সংবাদ করিল; সে কোথায় আছে, তার বর কেমন হইয়াছে ইত্যাদি প্রশ্নে আমি "অশ্বত্থমা হত ইতি গজ" গোছ উত্তর দিয়া তাহার কৌতূহল নিবারণ করিলাম। নীলিমার বর রমানাথও বিবাহ দিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত আমি অঞ্জলী বা তাহার স্বামীর সেদিন পরিচয় করাইয়া দিলাম না। রমানাথ রাত্রে আহারাদির পর শ্রীরামপুরে চলিয়া গেল। আমি যতীনকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে, আমি যে তাহার পিতামহ, নীলিমা তাহার ভগিনী বা হরেনও তাহার কাকা, একথা শ্রীরামপুরে বাটীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে আরতিকে যেন না বলে। সে তাহাতে সম্মত হইয়াছিল।

বরকন্যা-বিদায়ের সময়ে, ভুবনবাবুর স্ত্রী সাশ্রু-লোচনে আসিয়া তাঁহাদের মোটারগাড়ীতে বর ও কন্যাকে বসাইয়া দিলেন। গাড়ীর নিকটে আমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া আমাকে বলিলেন—"বাবা, আমার মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করুন।" বউমা ইদানীং আমাকে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আরতি গাড়ীতে উঠিবার সময়ে সম্মুখে আমাকে দেখিতে পাইয়া প্রণাম করিল। আমি বলিলাম—"আরতি দিদি, মনে ক'র না যে তোমার ঐ যুব বর এত ক্ষমতা রাখে যে, আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এতদিন ওর প্রক্সিতে তোমার সঙ্গে কোর্টশিপ চালিয়ে এসেছি, তাই আজ স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে তোমাকে যেতে

দিচ্ছি। কিন্তু তা' বলে তোমাকে আমি ছাড়ছি না, আমি তোমার পিছু পিছু ধাওয়া করব। Good-bye, till we meet again."

এই বলিয়া যতীন ও আরতির সঙ্গে শেক হ্যাণ্ড করিয়া, মোটার ড্রাইভারকে বলিলাম, "খুব সাবধানে গাড়ী নিয়ে যেও।" ব্রজেন্দ্র বরকন্যার সহিত সেই গাড়ীতে যাত্রা করিল।

বরকন্যা বিদায় হইলে, আমি হরেনকে বলিলাম—"ঐ গাড়ীর পূর্ব্বে আমাদিগকে বাড়ীতে পঁহুছিতে হইবে। আমরা বালী ব্রিজ দিয়া যাইব।"

বরের গাড়ী হাওড়া ব্রিজ ঘুরিয়া বালীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই আমার গাড়ী ভদ্রকালী পার হইয়া কোন্নগরে প্রবেশ করিল এবং বরের গাড়ী পঁহুছিবার প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে আমি বাটীতে উপস্থিত হইয়া বরবধূর অভ্যার্থনার জন্য সদর দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বরের গাড়ীর হর্ণের শব্দ পাইবামাত্র নীলিমা এবং বাড়ীর যাবতীয় স্ত্রীলোক জলপূর্ণ ঘড়া, শাঁখ প্রভৃতি লইয়া দ্বারের নিকট আসিবামাত্র আমি অগ্রসর হইয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া আরতির হাত ধরিয়া বলিলাম, "আরতিদিদি, তুমি এ বুড়োকে ছাড়লে কি হবে, 'এ বুড্‌ঢা নেহি ছোড়্‌তা'। দেখ, তোমার পিছু পিছু শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত ধাওয়া করে', তোমার অপেক্ষায় পথ-পানে চেয়ে বসে' আছি। তুমি আমার উপর অভিমান করে বলেছিলে, আমি তোমাকে সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে তুমি আমাদের বাড়ীতে যাবে না। আমি তোমার জেদই বজায় রাখলেম। এস আমি সঙ্গে করে' আমার বাড়ীতে নিয়ে যাই। আজ থেকে এ আর আমার বাড়ী নয়, তোমার বাড়ী।"

আমি তাহার হাত ধরিয়া নামাইবামাত্র নীলিমা ভিড় ঠেলিয়া আরতির কাছে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "ভাই, এতদিন আমি তোমার নীলিমা দিদি ছিলেম, এখন থেকে তুমি আমার বৌদিদি হ'লে।"

আরতি অবাক্ হইয়া একবার আমার দিকে, একবার নীলিমার দিকে চাহিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া নীলিমা হাসিয়া বলিল—"বুঝ্‌তে পারছ না? দাদু ধরে বেঁধে আমার দাদাকেই তোমার বর করে' দিয়েছেন।"

বড় বউমা যতীন ও আরতিকে লইয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নহবতের সানাই শঙ্খধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া পল্লী-নিনাদিত করিতে লাগিল।

সর্ব্বহারা

শ্রীগোপাল বটব্যাল

কাদের শীর্ণ পঞ্জর ভাঙি উঠেছে অট্টালিকা?
প্রতি ইষ্টক-বুকে সেই নাম গোপনে রয়েছে লিখা
সকলের হীন্ অতি নীচজাতি তাহারা সর্ব্বহারা!
মরণ-পথের পথিক সেজেছে অনাহারে আজি তারা।
রূপার চামচে দুধ খেতে খেতে তাহারা ওঠেনি বাড়ি',
ঝঞ্ঝার সাথে লড়াই করিয়া আয়ুরে রেখেছে কাড়ি'।
দিনে দিনে হায়, তিল তিল করি' সহি' দুখ পলে পল
যে সব সৌধ তৈরী করিল সর্ব্বহারার দল,
সে প্রাসাদ 'পরে সুখে ঘুম যায় টাকার কুমীর যত;
স্রষ্টা রহিল ফুটপাতে পড়ে ভেড়া আর গরু মত।
ওরা মেষ নয়, ওরাও মানুষ, একথা আমরা ভুলি,
পরশের ভয়ে দূরে সরে যাই, নিই নাকো বুকে তুলি'।

সর্ব্বহারার মাঝে বিরাজিছে আত্মা সে ভগবান,
ঠেলিলে ওদের ঘৃণা করি' হবে বিধাতার অপমান।

"সোণার-তরী"

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম্-এ

রবীন্দ্রনাথের "সোণার-তরী" একটি মহা সত্যের আবিষ্কার করা বাণী। কবির জীবনের প্রাণস্পর্শী অনুভূতি দিয়ে এই বাণী গড়া; এর তত্ত্ব অতি গভীর, অতি দুরূহ। মনে হয়, মানব জীবনের চিরন্তন সত্যরূপ সোণার-তরীতে স্বর্ণ হয়ে ফুটে বের হয়েছে। মেঘমুক্ত নির্ম্মল প্রভাত গগন হ'তে অরুণের রক্তরাগশিখা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে যখন ঝলসিয়া পড়ে ধরণীর বুকে এবং সেই জ্যোতিঃর পরশে অন্ধকার ধরণী যখন আলোতে আবিষ্কৃত হয়ে পূর্ণরূপে বা আসল চেহারায় আমাদের কাছে ফুটে বের হয়, তখন আমরা এ পৃথিবীর সত্য রূপটি বুঝতে পারি; তখন আমরা জানতে পারি ধরণীর সার্থকতা কোথায়। অন্ধকার মিশান নিশীথ ধরা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য; শুধু তার আঁধার ঢাকা চেহারা দেখে ক্ষান্ত হয়ে বলি, সব শূন্য, সব অন্ধকার। কিন্তু যখনি প্রভাত আলো নেমে এল, অমনি আমরা দেখতে পাই—ধরিত্রী জননী কি সুন্দর; কি মাধুরীতে তার সর্ব্ব অঙ্গ উৎফুল্ল! শ্যামল তৃণের কোমল কম্পন; পুষ্পিত বৃক্ষের সুরচিত আহ্বান; তরঙ্গিণী-বুকের জলকণার মৃদু শিহরণ; পর্ব্বতকন্যা নির্ঝরিণীর কলতান; বনানীর বক্ষে বিজন বিহঙ্গের বিভোর কূজন; আর সুদূর মাঠের শস্যশ্যামল ঢেউ—এ সকলি যেন এক অলৌকিক রূপ-মাধুরীতে ভরা। ধরিত্রীর এ সব সোণার ভাণ্ডার দেখে বুক আশায় ভরে উঠে—মনে মনে ভাবি—আমরা এই ধরণী-মায়ের সন্তান; নমস্কারে নত হয়ে আসে সমস্ত পরাণ তার চরণতলে।

ধরণীর এই যে বহিপ্র্রকাশ বা আত্মপ্রকাশ ফুলে ফলে, তৃণে পত্রে, বৃক্ষে শাখায়, পর্ব্বতে পাহাড়ে, বনে উপবনে, নদে নদীতে, জলে স্থলে, ইহাই ধরণীর আসল রূপ, তার নিখুঁৎ সত্য ছবি। এই রূপেতেই তার সার্থকতা, তার পূর্ণতা। তরুহীন মরু সদা অগ্নিদাহন ভরা; তার স্থান কোথা? সে শুধু জড়তার লীলাভূমি; অনুর্ব্বরতার প্রলয়নিকেতন; নিষ্ফলতার ব্যথায় তার জীবন পুড়ানো; নাই তার আপন পরিচয় বা আত্মপ্রকাশ। শুধু নিত্যকালের হয়ে পড়ে আছে একখণ্ড নিশ্চল ভূমি; শবদেহের মত প্রাণ-স্পন্দহীন।

এখন দেখা যায়, আত্মপ্রকাশই সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য বা সম্পূর্ণতার মহাবাণী। সৃষ্টি তখনই সুন্দর ও সুশ্রী—যখন তার আত্মপ্রকাশ হয়েছে। বৃক্ষের আত্মপ্রকাশ ফুলে ফলে; ফুল ফলহীন বৃক্ষ ঐ মরুর মতই অচেতন, জড়-পদার্থ। সৃষ্টির রহস্যপুরে কলঙ্কের রেখা।

কাজেই দেখা যায়, এই আত্মপ্রকাশই জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য। বৃক্ষের আত্মপ্রকাশ যেমন ফুলে ফলে, জগতের শ্রেষ্ঠজীব—মানুষের আত্মপ্রকাশও সেইপ্রকার তার কর্ম্মে; তার দৈনিক কর্ম্মময় জীবনে; মানুষ তার কর্ম্মদ্বারাই পরিচিত; প্রকাশিত, প্রস্ফুটিত। আর কিছুতে নয়। কাজেই কিছু না কিছু কর্ম্ম তাকে করতেই হয়। কর্ম্মহীন মানুষ ঐ মরুর মতই পরিচয়হীন, শুধু মরীচিকায় ভরা, আসল বস্তু তার মধ্যে শত খুঁজলেও মিলেনা এক কণা। ঠিক ঐ নিশিথিনী-বুকে ধরণীর [illegible] আবরণে ঢাকা, তার দৃশ্য অতি ভয়াবহ। বৃক্ষ যেমন ফুল ফল প্রসব করেই ক্ষান্ত, এর বাহিরে সে সারহীন কাষ্ঠখণ্ড মাত্র; মানুষও সেইপ্রকার কর্ম্ম করেই ক্ষান্ত, তার বাহিরে সে শুধু নিষ্ফল দেহভার বহন করে। বৃক্ষের ফল ফুল যেমন বৃক্ষের সার্থকতা বহন ক'রে পূজার মন্দিরে দেবতার আসনের তলে যেয়ে ক্ষান্ত হয়, মানুষের কর্ম্ম-ফলও সেই প্রকার তার পরিচয় বহন ক'রে বিশ্বপিতার চরণতলে যেয়ে ক্ষান্ত হয়; তার [illegible]তে মানুষের বলবার বা করবার কিছু থাকে না; ঐখানেই তার এ জীবনের মীমাংসা হয়; ঐখানেই তার সমাপ্তি; মানুষ ধরায় আসে কর্ম্মের ভার নিয়ে, এই কর্ম্ম সমাপ্ত হলেই তার ছুটী। প্রভু যেমন ভৃত্যকে মাহিনা দিয়ে প্রভুর নিজের কাজ করিয়ে নেয় এবং কাজ শেষ হ'লেই ভৃত্যকে তার আর দরকার হয় না; মানুষও সে প্রকার সেই অসীম প্রভুর কাজ করতে ধরায় আসে, মাহিনা পায় মুক্ত আলো, মুক্ত বাতাস; আর এই বিশাল উন্মুক্ত ধরণী—তার গৃহস্বরূপ। কিন্তু যখনি তার কাজ, মানে বিশ্বপিতার কাজ, শেষ হয়ে যায়—অমনি হয় তার ছুটি। তখন আর তাকে দরকার হয়না। কাজেই মানুষ ধরায় আসে শুধু সেই অসীম পুরুষের আজ্ঞা বহন করতে। কিন্তু এতে তার একটি

মস্ত কাজ সাধিত হয়। তার আত্মশুদ্ধি হয়; তার আত্মা এক নির্ম্মল জ্যোতিঃতে ভরে উঠে; সেই জ্যোতিঃর উজ্জ্বল প্রভায় সে তার প্রভুকে চিনতে পারে। ভৃত্য যেমন প্রভুর কাজ করতে করতে প্রভুর প্রিয় হয় এবং ক্রমে তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করে, মানুষও সেই প্রকার বিশ্ব-প্রভুর কাজ করতে করতে তার প্রিয় হয়, তার প্রিয় হলেই নিজের আত্মার জ্যোতিরও ক্রমবিকাশ হয় এবং সেই বিকশিত আত্মার আলোকে প্রভুকে ভালরূপ চিনতে বা জানতে সমর্থ হয়, এ সকলিই কর্ম্মে নিযুক্ততার ফল, কিন্তু যতদিন না এই কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, ততদিন তার কাছে সকলই অন্ধকার বলে মনে হয়; কারণ সে আত্মার জ্যোতির পরশ তখনও পায় না। এখান থেকেই রবীন্দ্র-নাথের "সোণার তরী" আরম্ভ।

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

মানুষ মাত্র [illegible] কৃষক বেশে, কর্ম্মক্ষেত্র তার সম্মুখে। তখন দেখা গেল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিকে অন্ধকার। তারপর সে ভয়ে ভয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে কম্পিত হস্তে কর্ম্মরূপ ধান কাটতে আরম্ভ করেছে—মাত্র সে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছে। এমন সময় কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা। তার যেন আর কোন ভরসা নাই; কালপ্রবাহ তার চারিদিকে খরতর হয়ে ছুটেছে।

ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা,
* * *
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।

আমাদের দৈনিক জীবনেও ঠিক একই রূপ দেখিতে পাই। যখন আমরা নূতন কোন কাজ করতে যাই, তখন দেখি চারিদিকেই যেন কত বাধা-বিঘ্ন ছড়িয়ে আছে, সর্ব্বদা শঙ্কাজড়িত বুক; চোখে যেন আর কোন পথ দেখিনা; ঠিক শিক্ষানবিশী অবস্থায় যা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায়, সেই আগের কাজ এখন যেন তত শক্ত বলে মনে হয়না; মেঘ যেন কেটে গেছে।

পরপারে দেখি আঁকা,
তরুছায়া মসীমাখা।

এখন আর সেই দিগন্তব্যাপী মেঘের কালো ছায়া ঘনিয়ে নেই। এখন শুধু ওপারের তরুশ্রেণীর উপর শুধু একটু পাতলা অন্ধকার দাঁড়িয়ে রয়েছে; আর সব পরিষ্কার হয়ে আসছে। মানে, সে যতই কর্ম্ম করে আসছে, অন্ধকারও ততই কেটে যাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে তার আত্মশুদ্ধিও হতে লাগল—এই কর্ম্মের ভিতর দিয়ে; সে এখন লোক চিনে,—

"দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে"

কোন আদি জনমের পরিচিত বন্ধু যেন তীরে এসে তার তরী বাঁধল। কবে সে কোন প্রভাতে যেন তার নৌকাতেই পার হয়ে এসেছে; তাই তাকে আজ আবার দেখে সহজেই চিনে ফেলল এবং বলল—

"ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে,
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।"

তারপর যখন সে দেখল—এ তার পুরাতন পরিচিত বন্ধুই বটে, এখন—

"শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে,
আমার সোণার ধান কূলেতে এসে।"

তার আত্মা এখন বিশেষ শুচিতা লাভ করেছে; সে এখন বুঝতে পেরেছে যে তৎকৃত কর্ম্মফলের একমাত্র অধিকারী তার এই পুরাতন বন্ধু-মাঝিটা। কাজেই সে এখন কর্ম্ম-উদাসীন হয়ে, কর্ম্মফল তার তরীতে নিবেদন করছে। সে মাঝিটাও এক আঁটি এক আঁটি ক'রে তার সমস্ত কর্ম্ম-ফল-রূপ পাকা ধান তার তরীতে বোঝাই করে নিচ্ছে।

তীরের মানব-কৃষকের তখন একটু দুর্ব্বলতা আসল—বলে উঠল—ওগো বন্ধু, আমার সকলি ত তোমাকে দিলাম, এখন আমারে লহ করুণা ক'রে।

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই"—এ বাণী উচ্চারণ ক'রে তার মাঝি-বন্ধু তাকে নদীর পাড়ে ফেলে রেখে, তরী ভাসিয়ে দিল। কারণ তার কর্ম্মের ভিতর দিয়েই তাকে চিনে লওয়া হয়েছে। এখন তাকে আর বহন ক'রে শুধু শুধু নৌকা বোঝাই করে লাভ নাই। তার যা কিছু পূর্ণতা—সকলি সেই কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সমাপ্তি লাভ করেছে; তাকে এখন বহন করে কোন লাভ নাই।

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোণার-তরী।

ইচ্ছাশক্তির প্রভাব

শ্রীপরমেশচন্দ্র ঠাকুরতা বি-এ

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের মনে নানা বিচিত্র ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই ভাবের শক্তিও অতি বিচিত্র। আমাদের সকল প্রকার কার্য্যের মূলে এই ভাবশক্তিই একমাত্র ক্রিয়াশীল। ইহা যেন আমাদের অন্তরের অতি গোপন স্থানে অতি সূক্ষ্ম অপরিস্ফুট অবস্থায় লুক্কায়িত থাকিয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিতেছে।

চিত্রকর ছবি আঁকে, শিল্পকার মূর্ত্তি গঠন করে, গ্রন্থকার বই লেখে—সকলেই কোন একটা বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব পন্থানুযায়ী তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পায় মাত্র। মনের একাগ্রতা যাহার যত বেশী, সফলতা লাভ করাও তাহার পক্ষে তত বেশী সহজ। শিল্পীর নিপুণতা মনের একাগ্রতার উপরেই বেশী নির্ভর করে। নিপুণ শিল্পীর হাতে এইজন্যই এক একটী ভাব যেন মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। এইরূপ বিভিন্ন ভাবকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে রূপ দেওয়ার ইচ্ছাই আমাদের যাবতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল। সকলের লক্ষ্যবস্তু এক নয়—সকলের ভাবও এক নয়, কাজেই আমাদের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবন এত বৈচিত্র্যময়।

সদসৎ নির্ব্বিশেষে আমাদের মনে নানাপ্রকার ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক ইচ্ছারই কিছু না কিছু শক্তি আছে, কিন্তু এই শক্তি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বড় বেশী অনুভূত হয় না। সূর্য্যকিরণে দাহিকাশক্তি আছে সন্দেহ নাই এবং উহা আমরা অনায়াসেই সহ্য করিয়া থাকি, কিন্তু magnifying glass-এর সাহায্যে সূর্য্যকিরণ ঘনীভূত করতঃ কেন্দ্রমুখে পরিচালিত করিলে উহার প্রকৃত দাহিকা শক্তি অনুভব করিতে পারা যায়। সেইরূপ ইচ্ছামাত্রেরই শক্তি আছে সত্য, কিন্তু তাহার প্রকৃত শক্তি উপলব্ধি করিতে হইলে মনের একাগ্রতার সাহায্যে আমাদের বিভিন্নমুখী ইচ্ছাকে সংযত করিয়া একদিকে পরিচালিত করতঃ বিশেষ কোন একটী ইচ্ছাতে পর্য্যবসিত করিতে হয়। নিজের শক্তির উপরে পূর্ণবিশ্বাস রাখিয়া সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে উহা প্রয়োগ করিলে ইচ্ছাশক্তির সমধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস না থাকিলে উহার প্রয়োগ বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিৎ প্রফেসার আর্, এন্, রুদ্র বলেন—

"ইচ্ছাশক্তিকে হৃদয়ের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, যে আকাঙ্ক্ষার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে কিছুমাত্র মনে অবিশ্বাস বা সন্দেহ নাই, অর্থাৎ যাহা নিশ্চিতরূপে পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রাণে স্থির বিশ্বাস আছে, তাহাই ইচ্ছাশক্তি।"

আমরা যখনই যাহা কিছু [illegible] সেই চাওয়া যদি ঠিক চাওয়ার মত হয় অর্থাৎ তাহাই যদি হৃদয়ের গভীরতম কামনা হইয়া দাঁড়ায়, তবে সেই চাওয়া আর তাহা পাওয়ার—কামনা ও সিদ্ধির মধ্যে কোন পার্থক্যই বোধ হয় থাকে না।

"স্থূল দৃষ্টিতে প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতরেই দুইটী বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ লক্ষিত হয়;—একটী দৈহিক শক্তি, অপরটী তাহার মনঃশক্তি। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আমাদের সকল কার্য্য করিবার শক্তিই মন হইতে উৎপন্ন হয়। উভয় শক্তিরই উৎস আমাদের মন। মন অনন্ত শক্তির আধার। ইচ্ছাশক্তি এই মনঃশক্তিরই একটি বিশেষ রূপ। মানব হৃদয়ের যাবতীয় শক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বপ্রধান।" এই শক্তির প্রেরণা ব্যতীত অন্য কোন শক্তিই সম্যক স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না এবং তাহাদের স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার শক্তিও বোধ হয় থাকে না। এই মহাশক্তির প্রভাবেই মানুষ ইচ্ছামত সকল কার্য্য করিতে সমর্থ,—এইখানেই অন্যান্য জীবজন্তু হইতে মনুষ্য-জীবনের বিশেষত্ব এবং ইহাই বোধ হয় তাহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক্। প্রখর ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির অসাধ্য কর্ম্ম এই জগতে বোধ হয় কিছুই নাই। সাধারণের

চোখে যাহা অসাধ্য, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়, প্রখর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অবলীলাক্রমে তাহা সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা মহাপুরুষ পদবাচ্য হইয়া থাকেন। এই পৃথিবীতে মহামানব বলিয়া যাঁহারা আমাদের পূজা পাইয়া থাকেন, সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ব্যক্তিগত জীবনের উপর এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে কতখানি—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি যাবতীয় উন্নতির মূলেই এই ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান।

"মনুষ্যজীবনের উন্নতি বিশেষরূপে তাহার ইচ্ছা-শক্তির বলাবলের উপরেই নির্ভর করে। যাহার ইচ্ছাশক্তি যত প্রখর, সিদ্ধিলাভে সে তত বেশী সমর্থ। আর যাহার ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল অথবা যে উহা উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে জানে না, সে তাহার অভীপ্সীত অধিকাংশ কার্য্যেই বিফল মনোরথ হইয়া থাকে।" উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

"এই জগতে যাঁহারা স্বীয় চেষ্টার ফলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের ব্যক্তিগত সাফল্যের মূলেও এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবই লক্ষিত হইয়া থাকে।" মানুষের সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে নিজের ও অপরের শরীর ও মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া জগতের অশেষবিধ কল্যাণসাধন করিতে পারা যায়। প্রখর ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যোগিগণের জড়-প্রকৃতির উপর অসাধারণ আধিপত্য দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। এই শক্তির সাহায্যেই তাঁহারা নানা-প্রকার অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের একটুও ইচ্ছাশক্তি নাই —তাঁহাদের কথা যথার্থ নহে। সকলের হৃদয়েই এই মহাশক্তির বীজ নিহিত আছে, কিন্তু উপযুক্ত সাধনার অভাবে উহা আমাদের হৃদয়ে সুপ্তাবস্থায় অবস্থান করে বলিয়া আমরা সচরাচর উহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না। এই মহাশক্তি আমাদের সকলের হৃদয়েই অন্তর্নিহিত থাকিলেও উপযুক্ত সাধনা দ্বারা উহা জাগ্রত ও বর্দ্ধিত না করা পর্য্যন্ত উহার কার্য্যকারিতা সম্যকরূপে অনুভব করা যায় না। মনুষ্যের পক্ষে এই শক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও, উপযুক্ত সাধনা দ্বারা সকলেই যে উহাকে অল্পাধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে পারেন—সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের একটুও ইচ্ছাশক্তি নাই—এই কথা বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকিয়া, উহা যাহাতে জাগ্রত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে সেইজন্য চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। কর্ম্মই সংসিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়; কর্ম্মহীন জীবন বিড়ম্বনা বিশেষ। কর্ম্ম না করিয়া সিদ্ধিলাভের আশা করা বাতুলতা মাত্র। এই নিশ্চেষ্ট জীবন-যাপনের দরুণই আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া জগতের চোখে আজ নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

এই বিরাট্ সৃষ্টির মূলে এক মহান্ ইচ্ছাশক্তিই কেবল মাত্র বর্ত্তমান—এই জগৎ সেই ইচ্ছাশক্তিরই ব্যঞ্জনা বা অভিব্যক্তি মাত্র। বিশ্বের স্তরে স্তরে, সর্ব্ব-ক্ষেত্রে এবং সকল কর্ম্মপ্রেরণার মূলে এই ইচ্ছাশক্তিই একমাত্র ক্রিয়াশীল। আমাদের জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, এই ইচ্ছাশক্তির বলেই আমরা সুপথে বা কুপথে চালিত হইয়া কেহ স্বর্গের দেবতা, কেহ বা নরকের কীট হইয়া জীবন যাপন করিতেছি।

ইচ্ছাশক্তি বিকাশের মূল মনঃসংযম। মনকে সংযত করিতে পারিলে দেহও আপনিই সংযত হইয়া আসে। দেহ ও মন সংযত হইলে এই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনঃসংযম বহু শ্রম ও কষ্টসাধ্য। উপযুক্ত সাধনা ভিন্ন কখনও তাহা হয় না। যোগীঋষিগণ যোগবলে মনঃসংযম করিয়া 'অণিমালঘিমাদি' অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া প্রকৃতির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই সকল 'মহাসিদ্ধির' অপর নাম 'ঐশ্বর্য্য'। পর পর আটটী ঐশ্বর্য্য লাভ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব হইলেও উহাদের মধ্যে দুই চারিটা ঐশ্বর্য্যলাভ যে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নয়, তাহার দৃষ্টান্ত

সুদুর্লভ হইলেও একেবারে বিরল নয়। প্রকৃত যোগী-ঋষি বা সন্ন্যাসীর সহিত সচরাচর আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় না, হইলেও তাঁহারা এই সব ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি দেখাইতে ব্যাকুল হন না। এইজন্য ইচ্ছাশক্তির বলে মানুষ যে প্রকৃতির উপরে কতখানি আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে প্রত্যক্ষবাদিগণের পক্ষে তাহা ধারণা করা সুকঠিন।

আবার এই শ্রেণীর লোকও জগতে বিরল নহে, যাহারা নিজেদের অপ্রত্যক্ষীভূত বিষয়কে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বিশেষ বাহাদুরী হইল বলিয়া মনে করেন।

"যাহা না দেখিব নিজের নয়নে
বিশ্বাস না করিব তাহা ব্রহ্মার বচনে"—

এই মতের পরিপোষকতা করিয়া "চার্ব্বাকে"র মন্ত্র-শিষ্যগণ বিশেষ এক প্রকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকেন। তাহারা মনে করেন যে, যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহা বিশ্বাস করিলে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু মনুষ্যের ব্যক্তিগত জ্ঞানের সীমা কতটুকু—এই নিখিল বিশ্বের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত অনন্ত রহস্যের সন্ধান মানুষ কতখানি পাইয়াছে এবং তাহার কতটুকুই বা মনুষ্যের ব্যক্তিগত ধারণা ও অভিজ্ঞতার আয়ত্তাধীন করা সম্ভব—এই সম্বন্ধে স্থির চিত্তে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ সকল সঙ্কীর্ণমনা কূপমণ্ডুকদের যুক্তির অসারতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। নিজেদের জ্ঞানের বহির্ভূত জিনিষকে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলে যে ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। কিন্তু ইহাও আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, সকল জিনিষই অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়া যাওয়াটা সুস্থ মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে—বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া না লইলে বিশ্বাসের দৃঢ়তা কখনও আসে না। বিশ্বাসের ভিত্তি যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ় না হইলে প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে কোন মুহূর্ত্তেই উহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কিন্তু শুধু মুখের কথায় উহা হয় না—উহার জন্য চাই উপযুক্ত সাধনা, এবং কেবল মাত্র ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধিরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আবার সকল জিনিষকেই পূর্ব্বে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া, পরে বিশ্বাস করিতে হইলে—আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই কথা সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যে সকল মনীষীর আজীবন সাধনার ফলে এই মহাসত্যের প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে এবং যাঁহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচারের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং বিচারশক্তিতে আমাদের অপেক্ষা হীন নহেন। একজনের আবিষ্কৃত সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া নূতনভাবে গবেষণা করিলে আরও যে কত নূতন সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একজনে পথ প্রদর্শন করিলেন, অন্য সকলে তাঁহার প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী চলিয়া নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার করিলেন—এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে Hypnotism বা সম্মোহন-বিদ্যার আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সম্মোহন-নিদ্রায় নিদ্রিত অবস্থায় স্মৃতিশক্তি (Remembrance) তীব্রতর (keener) হয়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ডি রোসা, (Colonel de Rochas) কোন একটী রমণীকে mesmerise করিয়া নিদ্রাচ্ছন্ন করতঃ তাহার স্মৃতিশক্তিকে ক্রমশঃ অতীত কালের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া একেবারে তাহার জন্মক্ষণে উপনীত করাইয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ডুরভিল তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থানুসরণ করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হন এবং কতকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে বিখ্যাত ফরাসী মনস্তত্ত্ববিৎ অধ্যাপক লান্‌সেলিন্ (Charles Lanselin) এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং ডি রোসা ও ডুরভিলের পরীক্ষার ফল স্মরণ করিয়া নবতর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সম্মোহন নিদ্রায় নিদ্রিত অবস্থায় কেহ কেহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিয়াছে। তাঁহার এই নূতন গবেষণার ফলে জন্মান্তরবাদের স্বপক্ষে অনায়াসলভ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধারণের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে।

ইহা আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রথম দৃষ্টিতে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য আমাদের চোখে পড়ে, তাহা মূল জিনিষের একমাত্র স্বরূপ নহে এবং প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ঐ সকল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আরও গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

"Errors, like straws, upon the surface flow;
He who would search for pearls must dive below."—
Dryden.

Hypnotism ও Mesmerism-এর আদর আজকাল অনেকেই করিয়া থাকেন এবং অনেকের মধ্যেই এই সকল গুপ্ত বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে Hypnotism ও Mesmerism-এর অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের মূলে একমাত্র ইচ্ছাশক্তিই বিদ্যমান। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে hypnotise করিয়া তাহাকে বশীভূত করতঃ আপন আয়ত্তাধীনে আনিয়া তাহার দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পারেন—নিজের স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার শক্তি তাহার মোটেই থাকে না। সম্মোহকের (Hypnotist-এর) আদেশ (suggestion) মত নির্ব্বিচারে সকল কার্য্য করিতে সে বাধ্য হইয়া থাকে। একজন সাধারণ লোক যদি অনায়াসলভ্য সম্মোহন শক্তির প্রভাবে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন অপর এক ব্যক্তির উপরে এতখানি কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, তাহা হইলে প্রকৃত সংযমী যোগী-ঋষিগণ যোগৈশ্বর্য্য বা বিভূতি লাভ করিয়া ভৌতিক পদার্থের উপর ইচ্ছামত আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন—ইহা বিচিত্র নয়।

আজকাল শিক্ষিত সমাজে Magnetic Treatment-এর আদর দিন দিন বাড়িতেছে। এই Magnetic Treatment-এর মধ্যে ইচ্ছাশক্তির অতি সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনেক কঠিন কঠিন রোগ অল্প দিনের মধ্যে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া অনেক হতাশ রোগী এই চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে শত সহস্র রোগী এই প্রণালীর চিকিৎসায় সুফল পাইয়াছে ও পাইতেছে। অনেক খ্যাতনামা জড়বাদী বৈজ্ঞানিকও ইহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া ইহার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অনেকেরই এই প্রণালীর চিকিৎসার উপরে বিশেষ আস্থা নাই। এই চিকিৎসায় সুফল পাইয়াও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাকে পূর্ব্বের অন্যান্য চিকিৎসার "after effect" বলিয়া মনে করিয়া উচ্চ শিক্ষার মর্য্যাদা বাড়াইয়া থাকেন। যিনি যাহাই বলুন না কেন—আমার মনে হয় যে, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রতারিত হইলেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এই মহদুপকারী বিদ্যাকে অবিশ্বাস করা অথবা উহার বিরুদ্ধে মত প্রচার করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

বৎসরের পর বৎসর অন্য প্রণালীর চিকিৎসাধীন থাকিয়া অনেকেই এই প্রণালীর চিকিৎসায় দুই একদিনের মধ্যেই আশ্চর্য্যরকম ফল পাইতে আশা করেন। ক্ষেত্র-বিশেষে উহা নিতান্ত অসম্ভব না হইলেও, সকল ক্ষেত্রে ও সকল সময়ে উহার আশা করা বাতুলতা মাত্র। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কথা বাদ দিলে জগতে এমন কোন চিকিৎসক আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সকল সময়ে, সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারিয়াছেন। দুশ্চিকিৎস্য কঠিন ও পুরাতন রোগে সাধারণতঃ সময় বেশী লাগে বলিয়া অনেকেই শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাখিতে পারেন না—ইহা কখনও সঙ্গত নহে। বিশ্বাস ও ধৈর্য্য রাখিতে পারিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গিয়া থাকে। এই চিকিৎসাতে এমন সব রোগ আরোগ্য করা যায়, যাহা কোন ঔষধে—কোন প্রণালীর চিকিৎসাতেই আরোগ্য হয় নাই। মানুষের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক এমন বহু রোগ আছে, যাহা ঔষধে আরাম হয় না অথচ এই প্রণালীর চিকিৎসাতে সহজেই নিরাময় হইয়াছে এবং হইতেছে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় উচ্চ-উপাধিধারী বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক এই চিকিৎসায় বিশেষ সুফল পাইয়া, ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে, যাহারা সম্মোহন নিদ্রায়

নিদ্রিত (hypnotised) হন না—এই প্রণালীর চিকিৎসা তাঁহাদের উপর কখনও কার্যকরী হয় না। দুঃখের বিষয় এক শ্রেণীর অজ্ঞ চিকিৎসকও এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা জানি মানসিক সংবেদনার (Mental susceptibility) অভাবে সকল লোক সম্মোহিত হয় না, কিন্তু তাহার সঙ্গে Magnetic treatment-এর কি সম্পর্ক তাহা বোঝা দুষ্কর। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সংবেদ্য (susceptible) রোগীর চিকিৎসা খুবই সহজসাধ্য, কিন্তু সংবেদনার অভাবে তাহার কোন রোগ আরোগ্য হইবে না—ইহার মত হাস্যকর যুক্তি আর কি হইতে পারে! ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই মতের সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে অধিকাংশ দুশ্চিকিৎস্য কঠিন ও পুরাতন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিই—বিশেষতঃ যাঁহারা পূর্ব্বে অন্যান্য চিকিৎসার অধীন থাকিয়া বিশেষ কোন ফল না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন—মানসিক সংবেদনার অভাবে সম্মোহিত হন না, অথচ তাঁহারা এই প্রণালীর চিকিৎসায় অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন ও হইতেছেন

ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে দূরস্থিত ব্যক্তিগণকে তাহাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বশীভূত করিয়া তাহাদের দ্বারা নানাপ্রকার কাজ করান এবং তাহাদের নানাপ্রকার রোগারোগ্য করা যাইতে পারে। ইহাকে Absent treatment বা Distant healing বলে। Magnetic treatment করাইতে যেখানে নানা প্রকার অসুবিধা আছে, এই প্রণালীর চিকিৎসায় চিকিৎসিত হইতে স্বয়ং রোগী যেখানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে অথবা সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্য যেখানে ব্যক্তি-বিশেষকে তাহার অজ্ঞাতসারে এবং তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও স্বীয় আয়ত্তাধীনে আনিবার প্রয়োজন হয়—সেই সব ক্ষেত্রে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়া থাকে।

ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে ইচ্ছামত দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। একই ব্যক্তিকে একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়াছে। আবার কাহারও কাহারও ইচ্ছাশক্তি এতদূর বর্দ্ধিত হইতে শুনা গিয়াছে যে, তাঁহারা এই স্থূল শরীর নিয়াও জলে, স্থলে ও শূন্যমার্গে ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়ম বা শৃঙ্খলা কিছুই তাঁহাদিগকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে নাই। এই সকল সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট প্রকৃতি খেলার পুতুল মাত্র। যোগবিদ্যার উৎপত্তিস্থান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এইরূপ দৃষ্টান্ত দুর্ল্লভ নয়। এতদ্দেশীয় কতিপয় হঠযোগীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিয়া বৈজ্ঞানিক জগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল অলৌকিক ব্যাপারের কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। একমাত্র ইচ্ছাশক্তিই যে এই সকল শক্তির উৎস বা প্রাণ ইহা বলাই বাহুল্য। অনেক খ্যাতনামা নাস্তিকও নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া পরিশেষে ইচ্ছাশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মানুষকে মোহিত করিয়া নানাপ্রকার ক্রীড়াপ্রদর্শন ব্যতীত সম্মোহন বিদ্যার অন্য কোন উপকারিতা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই শক্তির সাহায্যে নিজের ও অপরের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক (চরিত্র ও অভ্যাস দোষ প্রভৃতি) এমন স্বল্পায়াসে আরোগ্য ও দূরীভূত করা যায়, যাহা একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপরের নিকট অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরোপকারী ব্যক্তিগণের এই বিদ্যার চর্চ্চা তাঁহাদের মহদুদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকে, কারণ এই শক্তি-সাহায্যে সময় সময় লোকের এমন উপকার করিতে পারা যায়—যাহা বহু অর্থব্যয়েও সম্পন্ন হয় না। এই শক্তির সাহায্যে নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগারোগ্য ও যাবতীয় মন্দ অভ্যাস চিরতরে দূর করিয়া প্রভূত পরিমাণে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই বিজ্ঞান চর্চ্চা করিলে যে জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধন করা যায় তাহা সহজেই অনুমেয়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে এই সকল গুপ্ত বিজ্ঞান চর্চ্চা করা হইত, কিন্তু আলোচনার অভাবে উহা আজকাল একরূপ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বিদেশ

হইতে আগত নূতন কোন তথ্য সংগ্রহ করা ত দূরের কথা, আমাদের মজ্জাগত ঔদাসীন্যের ফলে আমরা আমাদের বহু অমূল্য রত্ন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। নানাজাতীয় পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া যেরূপ মধুমক্ষিকাগণ মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ নানাদেশ হইতে নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেছেন। নিজেদের দোষে আমরা যে-সব অমূল্য রত্ন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন আর আমরা এখনও 'আমাদের অনেক আছে'—এই সান্ত্বনার বুলি আওড়াইয়া ঘরের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিয়া আমাদের রক্ষণশীলতার পরিচয় দিতেছি। যদি কোন হতভাগ্য একবার এই সব লুপ্ত বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, অমনি অজস্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া সঙ্কীর্ণ ও অনুদার চিত্তের পরিচয় দিতেছি। ইহার ফলে ঘরে ঘরে কূপমণ্ডুকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। যাহা ছিল আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং যাহা বুদ্ধির দোষে হারাইয়া আজ আমরা পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, তাহার পুনরুদ্ধারের কল্পনাতেও পুণ্য আছে বলিয়া মনে হয়,—ইহাতে ধর্ম্মহানি হয় না, বরঞ্চ দেশের ও দশের মঙ্গলের পথ প্রশস্ত হয়।

মজ্জাগত সঙ্কীর্ণতা, দুর্ব্বলতা ও নীচতার দরুণ এই বিশাল কর্ম্মজগতে আমরা মানুষ হইয়াও অমানুষের মত হইয়া রহিয়াছি। ঘরে বসিয়া কলিকালের দোহাই দিয়া বৈদেশিক প্রাধান্যকে আমরা যতই গালি দেই না কেন, আমরাই যে আমাদের অবনতির মূল কারণ—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মনুষ্যত্বের দরবারে আমাদের স্থান যে কত নিম্নে, তাহা ধারণা করিবার শক্তিও বোধহয় আজ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ব্যক্তিগত অথবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পায়ে জাতীয় স্বার্থ বলি দিয়া জগতের চোখে আমরা যে কতদূর হেয় প্রতিপন্ন হইতেছি, তাহা ধারণা করাও আজ আমাদের পক্ষে কঠিন। স্বার্থের কুটিল জালে গুটীপোকার মত আমরা যতই আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, অন্য সকলে ততই হাততালি দিয়া মজা দেখিতেছে—জানিয়া শুনিয়াও তাহার প্রতিকার করিবার ইচ্ছা আমাদের মনে উদয় হয়না—ইহার চেয়ে দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে?

দেশের ও জাতির এই দুর্দ্দিনে এই মহদুপকারী বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া আমরা যাহাতে মানুষ বলিয়া জগতের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারি এবং শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া যাহাতে শাশ্বত কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারি, তাহার জন্য চেষ্টা করা বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

মিলন-ব্যবধান

শ্রীঅমলা গঙ্গোপাধ্যায়

আমার গোপন হৃদি-নন্দনের মাঝে
চঞ্চল বসন্ত-বনে রাগ-রক্ত লাজে
ফোটে কত পারিজাত প্রতি পলে পলে
অপূর্ব্ব সুগন্ধে, বর্ণে। সে মানস ফুলে
সব দিই সমর্পিয়া নম্র-নত মনে
সম্পূর্ণ প্রেমের অর্ঘ্যে তোমার চরণে।
কিন্তু সেথা বন্দী আমি নাম-গোত্র লয়ে
দেশ কাল-গৃহ-ঘেরা সসীম আলয়ে।
সেথায় কত না বাধা, মান-অপমান
লাজ-শঙ্কা-বিজড়িত কত ব্যবধান।

কোরিয়ার কথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

কোথায় এসিয়ার দক্ষিণ-প্রান্তবর্ত্তী বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ আর কোথায় সুদূর উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত জাপান-বিজিত কোরিয়া? মধ্যে বিরাট ব্যবধানরূপে বিরাজিত রহিয়াছে পৃথিবীর প্রকাণ্ডতম পর্ব্বত এবং মহাদেশের মতই মহান্ চীন-সাম্রাজ্য। কিন্তু তবুও ভারতবর্ষের সহিত কোরিয়ার সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। বৃটিশ-শাসনে ভারতের যে অবস্থা, জাপান-শাসিত কোরিয়ার প্রায়ই সেই দশা। হইতে পারে কোন কোন বিষয়ে আমাদের বা তাহাদের অধিকতর দুর্দ্দশা। প্রাচীন সভ্যতার প্রভায় উভয়েই উদ্ভাসিত। কোরিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে ভারতের শিষ্য সুতরাং উভয়ের কৃষ্টিগত সাদৃশ্য আমাদিগকে বিস্মিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে বিস্ময়ের বিষয় নহে। ভারতের এক নৃপনন্দন সংসারের সকল সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে মহা-সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়া সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, কোরিয়া সেই সত্যেরই সাধক বা উপাসক। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে বুদ্ধবাদ কোরিয়ায় প্রবল প্রচার প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমরা কোরিয়ায় বুদ্ধবাদের অপেক্ষাকৃত শুদ্ধমূর্ত্তিই দেখিতে পাই। কোরিয়াবাসীর ভাবপ্রবণ উর্ব্বর অন্তরক্ষেত্রে বুদ্ধবাদের বীজ পতিত হইয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। যেমন ধর্ম্ম-বিষয়ে কোরিয়া ভারতের শিষ্য, তেমনই কোরিয়ার শিষ্য জাপান। কোরিয়াই জাপানকে বুদ্ধবাদের মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিল। এই দীক্ষা ও শিক্ষার জন্য জাপানের উচিত ছিল কোরিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। কিন্তু জাপান তাহা না করিয়া কোরিয়ার বুকে কঠিন আঘাত করিয়াছে। ইহার কারণ পরে জাপান সাম্রাজ্যলালসালোলুপ স্বার্থসর্ব্বস্ব দম্ভদৃপ্ত প্রতীচীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কেরিয়ার মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত বুদ্ধবাদের সার সত্যগুলি বিস্মৃত হইয়াছে। সাম্রাজ্য বিস্তারবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া জাপান আজ চীনের বুকে যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে তাহাতে কোরিয়ার কথা মনে জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। আমরা কোরিয়ার প্রাকৃতিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিষয় প্রথমে বলিয়া উপসংহারে তাহার রাষ্ট্রনীতিক অবস্থার কথা কহিব।

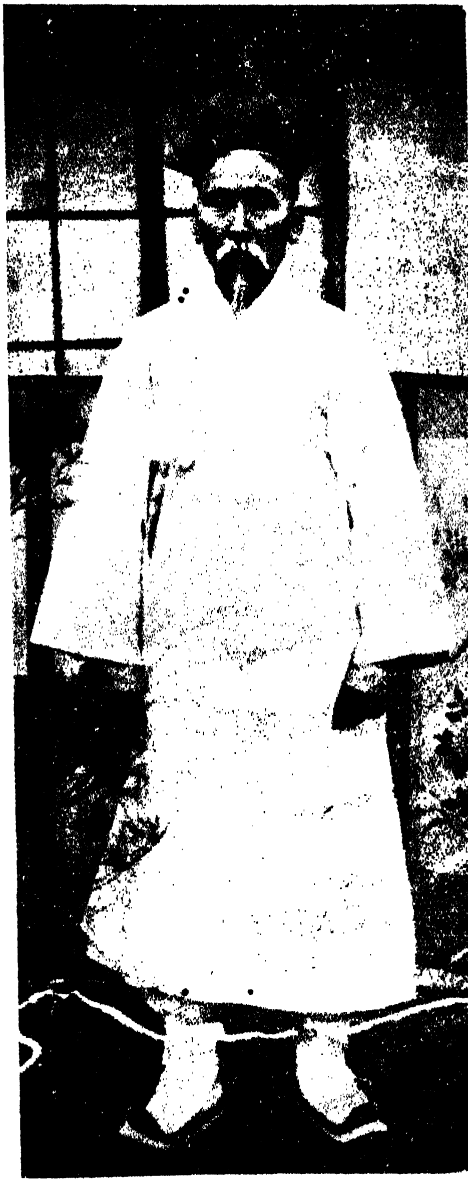
পর্ব্বতপুঞ্জ পরিবৃত কোরিয়াকে জাপানের পানে প্রসারিত এসিয়ার একখানি বাহু বলা চলে। চীন সাম্রাজ্য বা মহাচীনের উত্তরস্থ অঞ্চল স্বরূপ মাঞ্চুরিয়ার প্রান্ত হইতে এই বাহুখানি বারিধি-বক্ষে বিরাজিত জাপানের পানে প্রসারিত। কোরিয়ার আয়তন ৮০ হাজার বর্গ মাইলের কম হইবে না। লোক-সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ ও ১ কোটি ৮০ লক্ষের মাঝামাঝি। অবশ্য আমরা কোরিয়ানদের কথাই কহিতেছি। ইহা ছাড়া কয়েক লক্ষ জাপানী এবং অন্যান্য দেশের লোক এখানে বাস করে। বিজেতা জাপানীদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রায় দশ লক্ষ কোরিয়ান স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। ইহার দ্বারাই বুঝা যায় জাপান কোরিয়ানদিগকে ভালবাসার দ্বারা বশীভূত করিতে প্রয়াস না করিয়া অসির দ্বারা শাসিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বর্ত্তমানে কোরিয়ার লোকসংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষের কিছু বেশী।

কোরিয়ার মেরুদণ্ডের মত মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৮ হাজার ফিটের অধিক উচ্চ হইবে না। পূর্ব্বপার্শ্বে ইহারা খাড়া হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে কিন্তু পশ্চিমে শান্ত ভাবে কান্ত-মূর্ত্তিতে ক্রমশঃ নামিয়া পদতলে প্রসারিত উর্ব্বর ও সুন্দর প্রান্তর এবং উপত্যকাসমূহের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। বহু জলপূর্ণ নদ-নদী কলকলনাদে বহিয়া গিয়া এই সকল প্রান্তর ও উপত্যকাকে শস্য-সম্পদে শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে।

কোরিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলের নিকটে বহু-সংখ্যক পর্ব্বতাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বিদ্যমান। কেহ কেহ কহেন এই সকল দ্বীপের সংখ্যা দশ হাজারের কম নহে। বারিধি-বক্ষে বিন্দুবৎ বিরাজিত কতকগুলি দ্বীপ সম্পূর্ণ বিজন। কতিপয় দ্বীপে মানুষ বাস করে এবং চাষ-আবাদ চলে। এই অসংখ্য দ্বীপের মধ্যে পোর্ট হ্যামিল্টন

আখ্যায় অভিহিত একটি দ্বীপপুঞ্জ বিদ্যমান। এই দ্বীপগুলি কিছুকালের জন্য বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ সমূহের অবস্থান-স্থান ছিল। এই দ্বীপমালা হইতে আরও দক্ষিণে কুয়েলপার্ট নামক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি দ্বীপ দৃষ্ট হয়। মৎস্য-জীবী ধীবর-দলের আবাস-স্থল এই দ্বীপটির বৈশিষ্ট্য—মৎস্য সংগ্রহ-ব্যাপারে নারীরাই নেতৃত্ব করে। এই পর্ব্বতপূর্ণ দ্বীপটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৬ হাজার ৭ শত ফিট ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া অতি চমৎকার চিত্র রচনা করিয়াছে। এই দ্বীপের শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে দুইশত [illegible] প্রণালীটির সমস্তই দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া বিস্ময়কর উদার দৃশ্য প্রকাশিত করে। এই প্রণালীটি জাপান ও কোরিয়াকে পৃথক করিতেছে। একদিকে জাপান, অন্যদিকে কোরিয়া, মাঝখানে মধ্যবর্ত্তী সোপানের মত তুসুশিমা নামক দ্বীপ দণ্ডায়মান।

পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া কোরিয়ার জল বাতাস স্বাস্থ্যকর এবং আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। এইজন্যই কোরিয়াবাসীর শরীর স্বভাবতঃই সুস্থ, সবল এবং আকৃতি চিত্তাকর্ষক। ইহাদের আকার দেখিয়া মনে হয়, মোঙ্গোলীয় রক্তের সহিত ককেশীয় বা আর্য্য শোণিতের সম্মেলন এই জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছে। দুঃখের বিষয় প্রকৃতি-প্রদত্ত এই স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য—এই চিত্তাকর্ষক আকৃতি সত্ত্বেও এই জাতি পরাধীনতার পেষণে কর্ম্ম-বিষয়ে ক্রমশঃ উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।



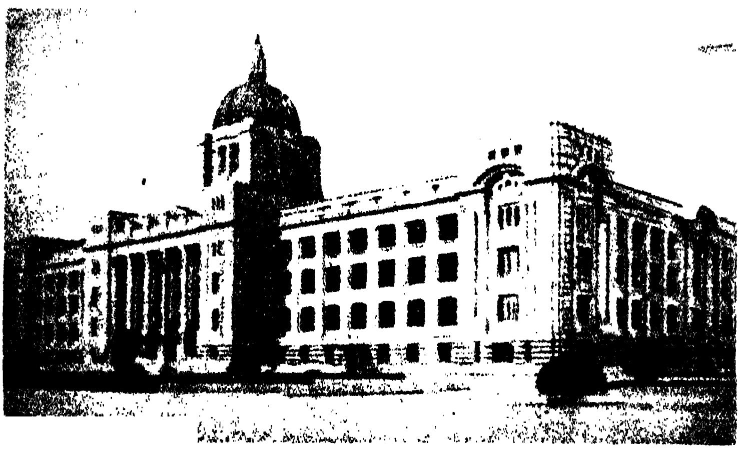
কোরিয়ার পণ্ডিত

কোরিয়া একদিক্ ছাড়া সকল দিক্ দিয়াই বারিধির চির-গম্ভীর অম্বুরাশির দ্বারা সাদরে চুম্বিত। এই বিষয়েও বিশাল ভারতের সহিত এই উপদ্বীপাকার ক্ষুদ্র দেশের সাদৃশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই দেশের উত্তরে মাঞ্চুরিয়া, পশ্চিমে পীত সাগর, দক্ষিণে তসুশিমা প্রণালী (কোরিয়া ও জাপানের মধ্যস্থলে) এবং পূর্ব্বে জাপান-সাগর। প্রায় এক হাজার দ্বীপ ইহার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত।

হ্যান নদের তীরে দণ্ডায়মান রাজধানী সিউল প্রায় কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত। পশ্চিম উপকূল হইতে যাত্রা করিয়া এই নগরে পৌঁছিতে এক ঘণ্টা বা তাহার কিছু অধিক সময় লাগে। সিউল শব্দটির অর্থ রাজধানী। এই নগরের প্রকৃত নাম হ্যান-ইয়াং। কিন্তু বর্ত্তমানে জাপানীদের দ্বারা ইহা কিইজো নামে অভিহিত। ইহার সম্পূর্ণ নাম কিইজো ফু। ফু বলিতে নগর বুঝায়। যে নগর প্রাচীনকালে রাজধানী ছিল তাহার নাম হিইজো-ফু। কিইজোর লোক-সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। এই সংখ্যার ষষ্ঠাংশ জাপানী। চারিদিক্ দিয়া এই নগরের

আয়তন বারো মাইলেরও বেশী হইবে। পাহাড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই নগরের পারিপার্শ্বিক অতিশয় মনোহর বা প্রীতিকর। প্রাচীর অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরের ন্যায় ইহাও উচ্চ চূড়া ও তোরণাদিমণ্ডিত প্রাচীরের দ্বারা ঘেরা। ইহা দূর প্রাচীর একান্ত চিত্তাকর্ষক বিচিত্রতম সহর সমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য। বাহির হইতে দেখিলে ইহা অধিকতর মনোহর।

ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তি সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দীর অন্তকাল পর্য্যন্ত কোরিয়া চীনের অধীনে ছিল, সুতরাং জাপানের শাসন সত্ত্বেও চীনের প্রভাব প্রসারিত দেখিলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। অনেক বিষয়ে



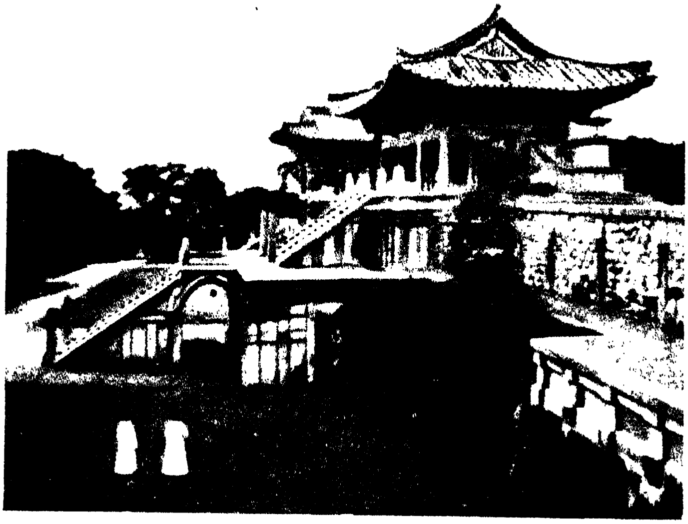
কিইজো সিউল: প্রধান শাসনকর্ত্তার প্রাসাদ

চীনা সহর সমূহের সহিত সিউলের সাদৃশ্য আছে। প্রধান রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত। দুইদিকে সারি সারি একতলা বাড়ী। বাড়ীর ছাদগুলি টালির। ছাঁইচগুলি ঊর্দ্ধমুখ। সম্মুখে খোলা নর্দ্দমা। এই প্রধান প্রশস্ত পথের পশ্চাতে ধূলি-ধূসর ধূম-মলিন পঙ্ক-কলঙ্কিত ছোট ছোট গলি। সেই জন্যই বলিতেছিলাম বাহির হইতে দেখিলে এই নগর অধিকতর সুন্দর। সেই অবস্থায় ইহাকে ঐন্দ্রজালিক-সৌন্দর্য্যমণ্ডিত কোন মায়াপুরীর মত মনে হয়। অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিলে চীনা-সহরসুলভ আবর্জ্জনাধিক্য এখানেও দেখা যায়। তবে ইহার অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণের পর প্রীতিপ্রদ পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী দর্শন করিলে, এই নগরের প্রতি পুনরায় সম্ভ্রম-গম্ভীর মনোভাব সঞ্চারিত হয়।

বিজয়ী জাপান কোরিয়ার প্রতি অন্যান্য বিষয়ে যতই কঠোর ব্যবহার করুক—সত্যের খাতিরে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নগরের পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিকদের স্বাস্থ্যের দিকে জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য রহিয়াছে। যেমন প্রতীচীর অনুকরণে জাপানে বড় বড় বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, তেমনই জাপানের অনুকরণে কোরিয়ার বক্ষে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর গৃহাবলী গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনও চীনের প্রভাব সম্পূর্ণ অপগত হয় নাই বটে, কিন্তু লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, কোরিয়ার বুকে স্থাপত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে জাপানের প্রভাব দিন দিন প্রবলতর ও পরিস্ফুটতর হইয়া পড়িতেছে। যেমন গৃহগুলি চীনা-প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিতেছে, তেমনই নব-নির্ম্মিত সৌধসমূহ জাপানী-প্রণালীতে প্রস্তুত। নূতন ভবনগুলির মধ্যে বিদেশীয় লিগেশন গৃহগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন প্রাসাদ ও প্যাগোডাগুলি চৈনিক রচনারীতির স্মৃতি জাগাইয়া তুলে।

নগরের তোরণগুলি অনেকটা সুরঙ্গের মত। বর্ত্তমানে এই সুরঙ্গসম তোরণগুলির তলদেশ দিয়া তাড়িত-ট্রাম যাতায়াত করিতেছে। কিইজোর বুকে বৈদ্যুতিক ট্রাম প্রথম প্রবর্ত্তিত হইবার কালে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসিগণ ঐ ব্যাপারকে অস্বাভাবিক ও অকল্যাণকর ভাবিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। প্রত্যেক তোরণের ঊর্দ্ধাংশে অদ্ভুত আকৃতি-ধারী মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিসমূহ নগররক্ষকরূপে রক্ষিত রহিয়াছে। অনিষ্টকারী প্রেত-পিশাচ প্রভৃতি এই সকল মূর্ত্তির প্রভাবে পলায়ন করিবে বলিয়া কোরিয়াবাসীর বিশ্বাস।

সিউল নগরের প্রাচীন স্থাপত্য কীর্ত্তিসমূহের মধ্যে একটি বিচিত্রাকার অত্যুচ্চ প্যাগোডা বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড প্যাগোডাটি দশতলা। ইহার প্রান্তগুলি কাটা কাটা। এই মহান মন্দিরটি মর্ম্মর নির্ম্মিত। গ্রানিট-প্রস্তরকে উৎকীর্ণ করিয়া প্রস্তুত একটি কূর্ম্ম-মূর্ত্তি এই নগরের আর একটি বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।



বুকোকুজি মন্দির (কিইস্থ): কোরিয়া

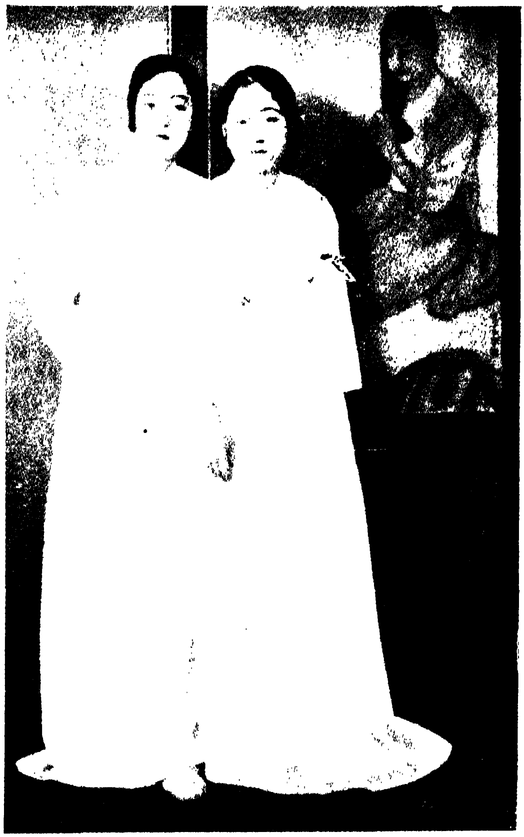


কিইকাইরো— কিইফুকু-প্রাসাদ কিইজো : কোরিয়া



কোরিয়ার পল্লী-গায়িকা একপ্রকার ঢোল বাজাইয়া গান করিতেছে





নগরোদ্যানের বক্ষে স্থাপিত একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টাও অন্যতম দর্শনীয়। এই ঘণ্টাটির মুখের আকার আট ফিটের কম নয়। দিবা দ্বিপ্রহর এবং নিস্তব্ধ নিশীথে ইহা বাজাইবার ব্যবস্থা আছে। কোরিয়ার বর্ত্তমান কর্ত্তাগণের দ্বারা এই উদ্যান নির্ম্মিত, ঘণ্টা স্থাপিত এবং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরেজরা যেমন ভারতে করিয়াছেন, তেমনই শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ, শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্কুল জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা সিউলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর জল-সরবরাহ ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। রেল, টেলিগ্রাম, ট্রাম, বৃটিশ-শাসিত ভারতের মত আছে সবই—নাই শুধু সেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রূপ সোণার কাঠি, যাঁহার সঞ্জীবন স্পর্শে সকল সৌন্দর্য্য, সকল ঐশ্বর্য্য সার্থক হয়। কবির করুণ কণ্ঠ হইতে একদিন যে ক্রন্দন-কম্পিত আক্ষেপপূর্ণ দুঃখ-গীতি ভারতমাতাকে লক্ষ্য করিয়া উত্থিত হইয়াছিল, কোরিয়ার অবস্থা দেখিয়া আমাদের অন্তরে তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছিল। কোরিয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—

পরদীপ-মালা নগরে-নগরে
তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

সিউলে একটি ক্যাথলিক-গীর্জ্জা-গৃহ ও আমেরিকান প্রোটেষ্টান্ট-প্রচার প্রতিষ্ঠান দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন প্রণালীতে প্রস্তুত প্রাসাদ ও প্যাগোডাগুলির পার্শ্বে অভিনব-ভঙ্গীতে নির্ম্মিত হোটেল ও হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক ও ব্যারাকগুলি দণ্ডায়মান রহিয়া সিউলের বুকে চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্যের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে—সন্দেহ নাই।

নগরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত উচ্চস্থানগুলির উপর দণ্ডায়মান সুন্দর মন্দির, দুর্গ ও প্রাসাদগুলির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে সম্ভ্রম-সঞ্চারক চিত্ত-চমৎকারী দৃশ্যাবলী দৃষ্টি-পথে প্রকাশিত হয়। সমগ্র নগর ও হ্যান-নদের পার্শ্ববর্ত্তী প্রান্তরকে দক্ষতম চিত্রকরের অঙ্কিত আলেখ্য বলিয়া মনে হয়। এই হ্যান-নদের জল শীতের সময় সম্পূর্ণরূপে জমিয়া যায়। গ্রীষ্মাগমে কঠিন তুষার-রাশি গলিয়া গেলে চঞ্চল জল পুনরায় কল-কলতানে বহিয়া চলে। বর্ষায় ইহা হর্ষাবেগে কূলপ্লাবী হইয়া পড়ে। শীতে যে সমাধি-মগ্ন সাধকের মত স্থির, বর্ষায় সে ভাব-বিবশ ভক্তের মত বীচি-বাহু বিস্তার করিয়া নৃত্য করে।

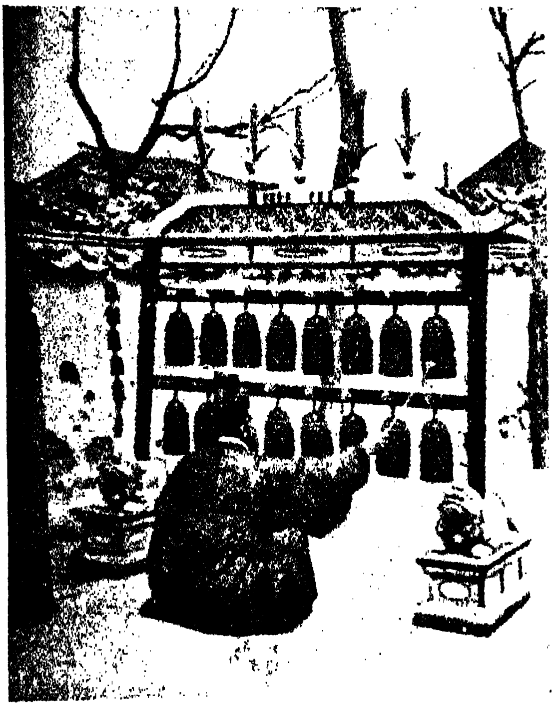
সিউল পরিত্যাগ করিয়া হ্যান-নদের বুকের উপর দিয়া জলযানযোগে বা তীরবর্ত্তী পথে অগ্রসর হইলেও, নানাপ্রকার নয়ন-রঞ্জন দৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রানিট-গঠিত শান্ত গম্ভীর গিরিশ্রেণী পথে পাওয়া যায়। ইহারা হীরক-পর্ব্বত-পুঞ্জ আখ্যায় অভিহিত। এই সুদৃশ্য শৈলমালার মধ্যে কতিপয় অতিশয় চিত্তাকর্ষক বৌদ্ধ মঠ-মন্দির বিদ্যমান বলিয়া ইহারা দর্শকদলের অন্তরকে



কোরিয়ার কৃষক

অধিকতর আকৃষ্ট করে। এই সকল প্রাচীন মঠ-মন্দির বুদ্ধবাদের প্রতি কোরিয়ার প্রবল অনুরাগের পরিচায়ক। বুদ্ধবাদ ভারতে ও তিব্বতে, ব্রহ্মে ও চীনে যেরূপ আশ্চর্য্য ভাস্কর্য্য-সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, এই সকল মঠ-মন্দির জানাইয়া দিতেছে কোরিয়ার বুকেও তাহার অভাব নাই। গ্রানিট-গঠিত গুরুগম্ভীর গিরিগুলির বক্ষে বিরাজিত এই মহান্ মঠ-মন্দির ভারতীয় ভাব-ধারার বিশ্ব-বিজয়-বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। কোথায় সুদূর দক্ষিণস্থ যবদ্বীপ, আর কোথায় সাইবেরিয়ার অদূরবর্ত্তী কোরিয়া। অথচ যবদ্বীপের বরবুদরে যে ভাবের অভিব্যক্তি, কোরিয়ায়

এই সকল বৌদ্ধ মঠ-মন্দির সেই ভাবের প্রভাবের কথাই প্রচার করিতেছে। কঠিন গিরি-গাত্র কাটিয়া একটি ৯০ ফিট উচ্চ বুদ্ধ-মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এই বুদ্ধ-বিগ্রহের বয়স সহস্রাধিক বৎসর। এই প্রদেশের সকল অংশেই এইরূপ নানাপ্রকার প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তি সমূহ বিদ্যমান রহিয়া ভ্রমণকারীর মনকে অপূর্ব্ব ভাবধারায় অভিসিক্ত করিতেছে। কত অর্দ্ধ-পরিত্যক্ত প্রাচীর-পরিবেষ্টিত পুরাতন নগর ধ্বংসোন্মুখ জরাজীর্ণ



কোরিয়ার প্রাচীন বাদ্য-যন্ত্র

মঠ-মন্দির বক্ষে বহিয়া তন্দ্রা-স্তিমিত-নয়নে অতীতের সুখ-সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেছে।

সিউলের বন্দর চেমালফোকে জাপানীরা জিনসান আখ্যায় অভিহিত করে। এখানকার অম্বরচুম্বী ধূম্রোদ্গারী কল কারখানা সমূহ আধুনিক প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আধুনিক ধরণের পথগুলির উপর দিয়া অগ্রসর হইলে প্রস্তর-প্রস্তুত ভিলা-সমূহের সম্মুখে পৌছান যায়। এই সকল ভিলার ছাদ পাথরের টালি বা প্লেটের দ্বারা গঠিত। য়ুরোপীয়ান এবং জাপানী বণিকগণ এই ভিলাগুলির অধিকারী। সিউল হইতে চেমালফো পর্য্যন্ত একটি রেলপথ বিস্তৃত আছে।

প্রধান রেলপথটি সিউল হইতে ফুসান পর্য্যন্ত প্রসারিত। ফুসানকে জাপানী সহর বলা চলে। যখন কোরিয়ায় চীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তখনও এই সহরে জাপানী দুর্গ স্থাপিত ছিল এবং ইহাই এই উপদ্বীপের মধ্যে জাপানী প্রভাবের একমাত্র প্রতিষ্ঠাভূমি ছিল। ফুসানের বিপরীত দিকে আর একটি রেল-রাস্তা বিস্তৃত আছে। এই রেল-পথটি জাপানী উপনিবেশ উয়োনসান বা জেনসান পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহা পোর্ট লাজারেফ নামক বন্দরের পার্শ্বে অবস্থিত। দক্ষিণ প্রান্তে মাসাম্পো এবং মোকপো নামক লোকালয়দ্বয় দেখা যায়। ইহারা সুন্দর বন্দরও বটে। তবে এই অংশের বারিধি-বক্ষে অসংখ্য দ্বীপমালা বিরাজিত বলিয়া জলযান-চালন সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। এই বন্দর-গুলিতে বহু শ্রমশীল জাপানী মৎস্যজীবী ধীবর বাস করিতেছে। এই স্থানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, নীতির দিক দিয়া অবাঞ্ছনীয় বহু ব্যক্তি স্বদেশ জাপান পরিত্যাগ করিয়া কোরিয়ার বন্দর-গুলিতে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা এখানে আসিয়া নানা অন্যায় উপায়ে আর্থিক উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের দ্বারা নানা দুর্নীতির বীজ কোরিয়ার বুকে উপ্ত হইতেছে সন্দেহ নাই। অন্যদিকে অনেক দেশানুরাগী কোরিয়ান জাপানীদের উদ্ধত ও অনুদার ব্যবহার বরদাস্ত করিতে না পারিয়া স্বদেশ ছাড়িয়া কোরিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী চীন এবং রুশ-অধিকৃত প্রদেশ সমূহে পলায়ন করিয়াছে।

প্রধান রেলপথটি সিউল হইতে উত্তর দিকে প্রাচীন রাজধানী পিং-ইয়াং-এর পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। যেমন আধুনিক রাজধানী সিউল বা হান-ইয়াং-এর জাপানী নাম কিইজো, তেমনই প্রাচীন রাজধানী পিং-ইয়াং-এর জাপানী আখ্যা হিইজো। উত্তর কোরিয়ার বৃহত্তম নগর ইহা। অধিকতর প্রাচীনকালে যে নগর রাজধানী ছিল তাহার নাম সং-দো বা কাইজো। অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত এই ধ্বংসপ্রায় অতি প্রাচীন নগরের বিষয়ে আমরা

বিশেষ কিছুই জানি না। প্রধান রেলপথটি উত্তরে ইয়ালু নদের মোহনায় বিরাজিত উইজু নগরে গিয়া সমাপ্তিলাভ করিয়াছে। এই স্থানটি একটি সেতুর জন্য বিখ্যাত। এই সেতুটি কোরিয়ার রেলপথকে জাপানী দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ান রেলরাস্তার সহিত সম্মিলিত করিতেছে।

কোরিয়া একদিকে যেমন পর্ব্বত-পরিবৃতা তেমনই অন্যদিকে কান্তার-কুন্তলা। স্থানে স্থানে ঊষর ও ধূসর গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থলে নয়নাভিরাম শস্য শ্যাম উপত্যকা। ক্ষেত্রগুলিও নেত্র-রঞ্জন। নানাপ্রকার ছিমির গাছ ও তৈল-বীজ উৎপন্নকারী উদ্ভিদও দৃষ্ট হয়। বারো বা তের ফিট উচ্চ আর একপ্রকার বৃক্ষ প্রায় প্রত্যেক পল্লী পথের পার্শ্বে দেখা যায়। ইহার নাম কাউ-লিয়াং।

একটি দোতলা গৃহ শস্যক্ষেত্র সমূহের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত হয়। শস্য-শত্রু পশু-পক্ষী প্রভৃতিকে নিবারণ করিবার জন্যই এই গৃহগুলি গঠিত করা হয়। এই ঘরগুলি প্রধানতঃ খড় দিয়া প্রস্তুত। ঘরের চারিদিকে উচ্চ করিয়া দড়ি বাঁধা



ক্রীড়ারতা কোরিয়ার বালিকাবৃন্দ

...-অঞ্চলে গমন করিয়া লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় কোরিয়াবাসীরা অন্য কিছু না হোক কৃষিকার্য্যে দক্ষ বটে। শস্যের মধ্যে ধান্য ও যবের ক্ষেত্রই নেত্রপথে পতিত হয়। চীনা ও জাপানীদের মত কোরিয়ানরাও ভাতভোজী। ধান্যজাত অন্নই ইহাদের প্রধান আহার্য্য। আমাদের মতই নানা রকম ডালও ইহারা প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে। কার্পাস-ক্ষেত্র প্রায়ই দেখা যায়। যখন ফল ফাটিয়া তুষার-শুভ্র তুলাগুলি বাহির হইয়া পড়ে তখন সেই দৃশ্য বিশেষ মনোহর হয়। পল্লিপথ-পার্শ্বে বিরাজিত লাল লঙ্কার থাকে। দ্বিতল হইতে এই দড়িগুলি চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষেত্রের দিকে প্রসারিত। বস্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড দড়ির গাত্রে ঝুলাইয়া রাখা হয়। এই গৃহগুলির দ্বিতলে দুইটি করিয়া বালক বসিয়া থাকে। ইহারা কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারিত নানাপ্রকার শব্দ সহকারে যতই দড়িগুলি ধরিয়া টানে ততই বস্ত্রখণ্ডগুলি উড়িতে থাকে। শস্যভক্ষণকারী পক্ষীকুল উড়িয়া পলাইবে বলিয়াই এইরূপ অদ্ভুত প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া হয়।

কোরিয়ার বৃক্ষবল্লী বা উচ্চ বেড়া ঘেরা পল্লীগ্রামগুলি পটের গায়ে আঁকা ছবির মতই মনোজ্ঞ। কোন কোন

গ্রাম সুদূর বঙ্গ-পল্লীর স্মৃতি জাগ্রত করে। প্রত্যেক পল্লীর প্রবেশ-পথে গ্রাম্য দেবতার বিগ্রহ বিদ্যমান। এই বিচিত্র বিগ্রহগুলিকে অতি প্রাচীন জড়-পূজার যুগের নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। ছয় হইতে আট ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ কাষ্ঠখণ্ড বা কাঠের মোটা খোঁটা এবং সেই খোঁটার ঊর্দ্ধাংশ কদর্য্য-মনুষ্য মুখাকৃতি—ইহাই সেই গ্রাম্য দেবতার বিগ্রহ। সিন্দুর এবং সবুজ বর্ণের দ্বারা এই মূর্ত্তি মণ্ডিত। পল্লীবাসীর বিশ্বাস, এই মূর্ত্তির প্রভাবে অনিষ্টকারী ভূত প্রেত ভীত হইয়া পলাইবে।

গ্রাম্য গৃহগুলি অনুচ্চ। কাদার দ্বারা প্রাচীরচয় প্রস্তুত। ঘরের চালগুলিতে খড়ের ছাউনি। গৃহের চারিদিকে ফুলের বাগান। জাপানীদের ন্যায় কোরিয়ানরাও পুষ্প-প্রিয়। ফলভারাবনত কাঁকুর ও লাউ-জাতীয় বৃক্ষের লতায় প্রাচীর-গুলি আচ্ছন্ন। প্রায় প্রত্যেক ঘরের চালে লাল লঙ্কাগুলি শুকান হইতেছে। গৃহের সম্মুখে কাষ্ঠনির্ম্মিত আধারে লাউ প্রভৃতির খণ্ডগুলি রৌদ্রে রক্ষিত। শীতে ব্যবহারের জন্য ইহাদিগকে শুকাইয়া রাখা হইতেছে। কারণ তুষারশীতল সুতীব্র শীতে কিছুই জন্মে না। প্রত্যেক গৃহের অঙ্গনে বার হইতে ছয় ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ কৃষ্ণকায় মৃণ্ময় কলসগুলি সারি সারি সজ্জিত। এই সকল কলসে আচার ও মোরব্বা জাতীয় নানাপ্রকার খাদ্য রক্ষিত রহে। বারান্তরে এখানকার আভ্যন্তরীন জীবন-কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পল্লীর ডাক

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

মোর পল্লীর তন্দ্রা-জড়িমা লতায়ে লতায়ে হয়েছে বড়,
রক্ত-ঝরা ঘোলাটে এ দীঘিতে বেদনা-উর্ম্মি কতনা জড়ো।
মৌন স্তব্ধ বাঁধঘাটখানা কাঁদ্‌ছে পাঁজর বাহির করি',
কিঙ্কিনীরব বাজে না সেথায়, শুক্‌নো পাতায় গিয়েছে ভরি'!

বেণু বাজা মাঠে গোধূলি লগনে ওঠে না'ক আর বেণুর রব—
নেই কোলাহল, হর্ষ, আবেগ, থেমে গেছে যত মহোৎসব।
সোণার ক্ষেতেতে ফলে না ফসল ওঠে না লহরী শ্যামল ধানে,
স্নেহ-বিজড়িত মৃত্তিকা-টানে আয় তোরা ফিরে পল্লী পানে!

গাঁয়ের পথের জংলা বাঁকেতে পানকৌরির শাবকদল
ডাক্‌ছে তোদের—'আয়, ওরে আয়, মুছাতে মায়ের নয়ন-জল'।
ফুল-বাগিচায় বেদনার বেণু ভীরু-সমীরণে মুরছি ঝরে;
তুলসীর মূলে ক্ষীণ-দীপ-শিখা কেহত তুলিয়া নাহিক ধরে!

দুখ-ইতিহাস শুন্‌বে কি কেউ? ধুঁক্‌ছে চালায় কৃষক-মুটে,
নূতন যুগের পাপড়ি-পাতায় রক্ত ডোবায় উঠ্‌ছে ফুটে;
যুগান্তরের নবালোকরাশি পল্লীর বুকে আসিছে ভাসি',
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দিতেছে বাড়ায়ে নবগীতি সুরে বাজায়ে বাঁশী!

ঝুম্‌কো লতার কুঞ্জে বসিয়া চন্দনা ওই দিতেছে শিষ—
কণ্ঠে যে তার বেজে ওঠে ব্যথা পল্লবছায় অহর্নিশ;
ঝাউগাছগুলি ডাক্‌ছে তোদের মাথা তুলি আজ হাজারো বার,
আয় তোরা ফিরে ঘুচাতে মুছাতে বেদনা ও ক্ষত দুঃস্থা মা'র!

বিশ্বসিংহ

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টশালী

(তৃতীয় খণ্ড)

অষ্টাদশ অধ্যায়—স্বগৃহে যাত্রা

দুর্লভ সিংহ এই গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি স্বজন-সিংহের জ্ঞাতি ভ্রাতা। বিশ্বসিংহ তাঁহাকে মুরুব্বি স্থির করিয়া অপরাপর গ্রামবাসীর অনুমতিক্রমে তাঁহার হস্তে শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বিনম্র বচনে কহিলেন, "নিঃসহায়া কল্যাণীর আপনারাই সহায়, অভিভাবক ও আশ্রয়। উপস্থিত কল্যাণীর মাতার পারলৌকিক কার্য্য আপনাদিগকেই নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইহার পর, ইহার বিষয়-বিত্তের তত্ত্বাবধানও আপনাদেরই করিতে হইবে। আমি ইহার যেরূপ আত্মীয়ই হই না কেন, নিজ কার্য্যানুরোধে সকল সময়ে ইহার তত্ত্বানুসন্ধান লইতে সমর্থ হইব না। আমাকে এখনই একবার আপন গৃহে না গেলে চলিবে না। সুতরাং আমার প্রতি আপনারা কিছুই নির্ভর করিবেন না। যে সামান্য কয়টী মুদ্রা প্রদান করা হইল, আপনাদের অভিরুচিমত ইহা দ্বারা কার্য্যের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হউন; ইহার পর যখন যেরূপ অর্থের প্রয়োজন হইবে, আপনাদের আদেশমত প্রদান করা যাইবে। সম্ভবপর হইলে আমি অপরাহ্ণে ফিরিতে চেষ্টা করিব। কল্যাণীর কাজ আপনাদেরই নিজ কাজ মনে করিবেন।"

দুর্লভ সিংহ বহুদিন পরে একসঙ্গে শতমুদ্রা হস্তে প্রাপ্ত হইয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ইহার পর আরও অর্থ হাতে আসিবে, সে আশাও পাইলেন। তা' ছাড়া কল্যাণীর বিষয়-বিত্তের তদ্বিরের ভার পাইলে, গ্রামের রাজা একরূপ তিনিই হইবেন, ইহা চিন্তা করিয়া বিশ্ব-সিংহের প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাঁহার প্রচুর প্রশংসাবাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনায় আমরা সকলেই পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমরা আর কল্যাণীর পর নহি—সপিণ্ড-জ্ঞাতি। কি করিব, সেনাপতিদাদা শেষ কালে আমাদিগকে বড়ই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন; প্রত্যেকেরই তো ব্যক্তিগত একটা আত্মসম্মান-বোধ আছে। তা যাহা হউক, এক্ষণে তোমার বুদ্ধির গুণে বহুকালের বিবাদ মিটিতে চলিল, ইহাই সুখের বিষয়। তুমি বাছা অপরাহ্ণে ফিরিতে ত্রুটি করিও না; আহা, কল্যাণী নিতান্ত বালিকা, নিদারুণ শোকে শোকাতুরা, এ বিরাট্ পুরীতে একাকী কিরূপে থাকিবে? আমি এখনই বাড়ী গিয়া কল্যাণীর দিদিকে পাঠাইয়া দিতেছি। যতক্ষণ তুমি না ফিরিবে, ততক্ষণ তিনি কল্যাণীর নিকট থাকিবেন।"

হায়রে অর্থ, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! আজ দুর্লভ সিংহ শত মুদ্রা হাতে পাইয়া কল্যাণীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইলেন, এ ঘনিষ্ঠতা পূর্ব্বে কোথায় ছিল?

অনন্তর বিশ্বসিংহ কল্যাণীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে অনেকরূপ বুঝাইয়া অপরাহ্ণে ফিরিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়—পুনরাগমন

বিশ্বসিংহের জাতীয়দল গঠনের কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। নানা দিগ্দেশ হইতে বিবিধরূপ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়া মিরাগহ্বরকে বিরাট্ দুর্গে পরিণত করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার প্রায় ষষ্ঠী সহস্র স্বদেশপ্রাণ বীর যুবক সঙ্গী হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র যুবক নিয়ত দুর্গের ভিতরে অবস্থান করিয়া রণচর্চ্চা করিয়া থাকে। এক্ষণে তথায় অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিরাগহ্বরের দুই ক্রোশ দূরে আরও গভীরতম অরণ্যের অভ্যন্তরে 'বিটাম্বা' নামক গহ্বরে অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে শত শত শিল্পী কাজ করিতেছে। তৎকালে ঝাড়খণ্ডের

(বর্ত্তমান বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার কিয়দংশ সহ ছোটনাগপুর প্রদেশ) শিল্পীগণ আগ্নেয় অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। বিশ্বসিংহ ঝাড়খণ্ড হইতে কতিপয় সুনিপুণ শিল্পী আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাদের এই সময়ে চাঁপাদৈয়ে পৌছিবার কথা ছিল। বিশ্বসিংহ এই জন্যই চাঁপাদৈয়ে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি পৌছিবার পূর্ব্বেই শিল্পীগণ তথায় পৌছিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

তিনি শিল্পীগণকে সঙ্গে করিয়া বেলাগড়ে রওয়ানা হইলেন। বারুয়াতে কল্যাণীর সহিত পুনর্সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন, তথায় প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য না যাইয়া পারেন না। কাজেই শিল্পীদিগকে সমভিব্যাহারে বারুয়ায় যাওয়াই স্থির করিলেন। অন্য লোক দ্বারা ইহাদিগকে বেলাগড়ে পাঠান সঙ্গত মনে করিলেন না।

তিনি যখন বারুয়ায় পৌছিলেন, তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। তিনি কল্যাণীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সরল ব্যবহারে অনেক কাজ হইয়াছে। গত রজনীতে যে বাড়ীখানা একটী অরণ্যালয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, আজ একদিনে, তাহার শ্রী ফিরিয়াছে। দুর্ল্লভ সিংহের যত্নে বাড়ীর অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কৃত হওয়ায় বাড়ীখানির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বসিংহ ব্যস্ততা বশতঃ ও কর্ত্তব্যানুরোধে আজ প্রাতেও বাড়ীখানি ভালরূপে দেখিবার সুযোগ পান নাই। এক্ষণে দুর্ল্লভ সিংহের সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ীখানি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বাড়ীখানি পশ্চিমদ্বারী; পশ্চিমদিকে বৃহৎ ফটক; ফটকের দুই পার্শ্বে প্রাচীর-সংলগ্ন অশ্বশালা ও গোশালা; এখন তাহাতে গো, অশ্ব কিছুই নাই। সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, তারপর সুপ্রশস্ত রাজপথ—উত্তর দক্ষিণে লম্বা। রাজপথ হইতে একটী শাখাপথ পশ্চিমদিকে ধরলার তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। শাখা পথের উভয় পার্শ্বে সুবিস্তৃত চাষি জমি। দুর্ল্লভসিংহের সহিত আলাপে বুঝিলেন, ঐ জমি সকলই সুজনসিংহের। সুজনসিংহের মৃত্যুর পর পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থেরা চাষ আবাদ করিয়া ঐ জমি ভোগ করিতেছে। ফটকের অভ্যন্তরভাগে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, তাহার পর সৌধতুল্য সুবৃহৎ অট্টালিকা। সেই অট্টালিকার উভয় দিকে ও পশ্চাতে, সম্মুখভাগের ন্যায় অত্যুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বৃহৎ প্রাঙ্গণ। উহার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রাচীর-সংলগ্ন অনেকগুলি ছোট-বড় ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ। ঐ গৃহগুলির দ্বার বাহিরের দিকে। পূর্ব্বদিকের প্রাচীরেও কয়েকটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, উহার দ্বারগুলি ভিতর দিকে। পূর্ব্বদিকে প্রাচীরবেষ্টিত ফলের বৃহৎ উদ্যান; উহা এখন নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। গৃহপ্রাচীর অপেক্ষা উদ্যান-প্রাচীরের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাড়ীর প্রাচীর স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়া কেবল কতকগুলি আগাছার উৎপত্তি হইয়াছে; আর উদ্যান প্রাচীরের অনেক অংশ পড়িয়া গিয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং উহাতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। এই প্রাচীরের পুনঃসংস্কার বহু ব্যয়সাধ্য হইলেও, উহার সংস্কার করা বিশ্বসিংহ কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

অনন্তর সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া দুর্ল্লভসিংহ গৃহে গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলেন, বিশ্বসিংহ তাহাকে বিদায় দিয়া কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

বিংশ অধ্যায়—ধনাগার অন্বেষণ

বিশ্বসিংহ কল্যাণীর মাতার সৎকারোপলক্ষে গ্রামবাসীদের প্রীতি সম্পাদনার্থ যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, এবং গৃহে গমন কালে দুর্ল্লভসিংহের হস্তে যে শত মুদ্রা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ দুর্ল্লভ-পত্নীর নিকট কল্যাণী অবগত হইলেন। ইহাতে তিনি আপন ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া যেমন লজ্জিতা হইলেন, বিশ্বসিংহের উদারতায় তেমনি তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইল। ঐ সকল অর্থ বিশ্বসিংহ নিজ হইতে দিয়াছেন, দুর্ল্লভপত্নী কল্যাণীর সহিত আলাপে ইহা বুঝিলেন। পরে ইহা গ্রামবাসীদিগের নিকটও প্রচারিত হইয়া পড়িল। সুতরাং বিশ্বসিংহের যে অর্থাভাব নাই, এবং তিনি কল্যাণীর ধনের আকাঙ্ক্ষী নহেন, গ্রামবাসীরা এ কথা ভালরূপেই বুঝিল। তাহারা ইহাও বুঝিল যে,

বিশ্বসিংহ বিষয়ী লোক; কেবল উপস্থিত বিপদে কর্ত্তব্যানুরোধে এখানে আসিয়াছেন।

বিশ্বসিংহের পুনরাগমন সংবাদ কল্যাণী যথাসময়েই অবগত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এক রাত্রির পরিচিত মাত্র, তবু মনে হইত যেন কতকালের পরিচিত ও কতই যেন আপন! এমন আপন বুঝি এ জগতে তাঁহার আর কেহ নাই। তাঁহার দর্শনে—তাঁহার বাক্য শ্রবণে মনে যেমন আনন্দ হয়, তেমন আনন্দ আর কিছুতেই হয় না। তিনি আসিয়াছেন—কতক্ষণে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইবে—কতক্ষণে তাঁহার সুধামাখা কথা শুনিবেন, সেই আশায় তাঁহার প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।

বিশ্বসিংহ কল্যাণীর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি দেখিলেন—এত শোকেও তাঁহার মুখখানি নীরাম্বুমধ্যস্থ প্রস্ফুটিত কমলিনীর ন্যায় প্রফুল্ল। তাঁহার সেই সদ্য প্রফুল্ল মুখখানি দেখিয়া তিনিও পুলকিত হইলেন। মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কল্যাণি, বোধ হয় আর বিশ্বসিংহকে অবিশ্বাস করিবে না?"

কল্যাণী লজ্জিতা হইলেন, কোমল কণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন—"আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিয়াছি, কিরূপে বুঝিলেন?"

বিশ্ব। আমার গৃহগমনে আপত্তি করিয়াছিলে কেন?

কল্যাণী। কেন আপত্তি করিয়াছিলাম? ইহা কিরূপে বুঝাইব? অনন্ত সমুদ্রে নিমজ্জমান্ জীব আশ্রয় পাইয়া সে আশ্রয় ত্যাগ করিতে চাহে কি?

বিশ্ব। যে আশ্রয়ের স্থিতির নিশ্চয়তা নাই, সে আশ্রয় পাওয়া আর না পাওয়া উভয়ই সমান। কল্যাণি, তুমি দুঃখিত হইও না, আমি পরাধীন—কর্ত্তব্যের দাস। আমাকে আজ রাত্রেই কর্ত্তব্যানুরোধে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।

কল্যাণীর বদন আবার মলিন হইল—তিনি শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন—"তা' হইবে না, আজ রাত্রে কিছুতেই আপনি স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন না। রাত্রি-জাগরণে আপনার শরীর ক্লান্ত; রাত্রিটুকু অন্ততঃ আপনার বিশ্রাম আবশ্যক। তা'ছাড়া আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আপনার সহিত আমার পরামর্শের প্রয়োজন আছে। আর সে পরামর্শ অদ্য রাত্রেই হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক মনে করিতেছি।"

বিশ্ব। আমার কার্য্য বড়ই গুরুতর। তোমার প্রয়োজনীয় বক্তব্য বরং আগামী কল্য শ্রবণ করিব এবং আমার সাধ্যানুসারে পরামর্শ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। আমি আজ রাত্রে এখান হইতে প্রস্থান করিতে পারিলে আগামী রাত্রে ফিরিতে পারিব। অন্যথায় আমার কাজের বিশেষ ক্ষতি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে পারে।

কল্যাণী অবনতমুখী ছিলেন, গ্রীবা ঈষৎ বক্র করিয়া বিশ্বসিংহের দিকে একটী বিলোল-কটাক্ষপাত করিলেন। সে কটাক্ষ অতি মাধুর্য্যময়—তাহাতে কোমলতা, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা, অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ও সম্মোহিনী শক্তি ছিল। বিশ্বসিংহ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনে রমণী-কটাক্ষ আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি নির্ব্বাক্-বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে কল্যাণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কল্যাণী মৃদুস্বরে কহিলেন, "আপনার কাজের ক্ষতি কিম্বা বিশৃঙ্খলা করি, সে ইচ্ছা আমার নাই। আমার বক্তব্য শ্রবণ করাও আপনার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বলিয়া আমি দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ করিতেছি, আজ রাত্রে আমি আপনাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।

পাঠান-বিজয়ী বিশ্বসিংহ একটী কিশোরী বালিকার নিকট দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। কল্যাণীর এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক উক্তির প্রত্যুত্তরে কি বলিবেন, তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না; তাই নীরব থাকিতেই বাধ্য হইলেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কল্যাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরপদবিক্ষেপে সম্মুখস্থ দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বিস্মিত বিশ্বসিংহ কল্যাণীর কার্য্য দেখিতে উৎসুক হইলেন। তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে ঘন ঘন স্পন্দনধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, কল্যাণী একটী আলোকহস্তে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং কিছুকাল পরে এক তোড়া চাবী আনিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিয়া কহিলেন, "এইগুলি লইয়া আমার সঙ্গে চলুন।"

বিশ্বসিংহ শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে?"

কণ্ঠস্বরে কল্যাণী চমকিত হইলেন, বলিলেন, "বীরবর, এ আবার কি কপটতা?"

বিশ্বসিংহ পূর্ব্ববৎ কণ্ঠে কহিলেন, "কপটতা নহে কল্যাণি, আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছি না।"

কল্যাণী। আমার সঙ্গে আসুন, ক্রমে সকলই বুঝিতে পারিবেন। কল্যাণী অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বিশ্বসিংহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি দেখিলেন, কল্যাণী একে একে পাঁচটী কক্ষ পার হইলেন। কক্ষগুলি শ্রেণীবদ্ধ অথবা সমতল নহে; কোনটী নিম্নতলে, কোনটী সমতলে, কোনটী উপরিতলে অবস্থিত। অনন্তর ষষ্ঠ কক্ষের নিকটে আসিয়া কল্যাণী দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, "এই কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া ইহার ভিতর প্রবেশ করুন।"

বিশ্বসিংহ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার ভিতর কি আছে?"

কল্যাণী। তা আমি জানি না, ইহার ভিতরে কখনও প্রবেশ করি নাই। মা'র সঙ্গে এই পর্য্যন্তই আসিতাম, আমাকে বাহিরে রাখিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিতেন। আমার মনে হয়, ইহাই আমার পিতামহের ধনাগার। মা যখন নিতান্ত অর্থাভাবে পড়িতেন, অথবা বিক্রীত শস্যমূল্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইত, তখনই মা এ কক্ষে আসিতেন। রাত্রি ব্যতীত দিবাভাগে তিনি কখনও এখানে আসিতেন না।

এতক্ষণে বিশ্বসিংহ কল্যাণীর মনোভাব বুঝিলেন, কেন কল্যাণী আজ রাত্রে স্থানান্তর গমনে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি কল্যাণীর অনুরোধে গৃহদ্বার মুক্ত করিলেন, কিন্তু প্রবেশ না করিয়া কহিলেন, "এ তোমার অন্যায় অনুরোধ কল্যাণি, তোমার ধন-সম্পত্তি তুমি ভিতরে গিয়া দেখ।"

কল্যাণী। আমি যাঁহাকে বিশ্বাস করি, তাঁহাকে কি আমার ধনসম্পদ দেখাইতে পারি না? তাঁহাকে কি আমি আমার ধনসম্পত্তির প্রভুত্ব প্রদান করিতে পারি না?

বিশ্বসিংহ এবারেও কল্যাণীর নিকট অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, "তা' পার, তবে অগ্রে তোমারই গৃহে প্রবেশ করা উচিত।"

বিশ্বসিংহ ও কল্যাণী উভয়েই সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটী ক্ষুদ্র কিন্তু বড়ই সুন্দর। কক্ষতল বিবিধ বর্ণের মর্ম্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত। তাহাতে নানাবিধ চিত্র যেন একখানি মূল্যবান গালিচা। দেওয়ালগাত্রও সুন্দর সুন্দর মনোমুগ্ধকর কারুকার্য্যে খচিত। কক্ষের একদিকে একটী প্রবেশদ্বার, অপর তিনদিকের দেওয়ালগাত্রেই তিনটী আলমারী। বিশ্বসিংহ কল্যাণীর অনুরোধে আলমারি তিনটী খুলিলেন। উহার একটীতে দেখিলেন দুইটী হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বাক্স, এক বাক্সে সতেরখানি সুবর্ণপদক ও কতকগুলি রত্নালঙ্কার; সুবর্ণপদকে সুজনসিংহের নাম সহ তাঁহার কীর্ত্তিমালা খোদিত রহিয়াছে। অপর বাক্সে মাত্র তিনখানি সুবর্ণপদক ও কতকগুলি রত্নালঙ্কার। সুবর্ণ-পদকে মদনসিংহের কীর্ত্তিমালা ও নাম খোদিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় আলমারীতে রৌপ্যনির্ম্মিত একটী পেটিকা, তাহার ভিতরে দুইটী সুবর্ণ নির্ম্মিত বাক্স। উহার একটীতে নূতন অব্যবহৃত কতকগুলি অলঙ্কার; আর অপরটীতে একটী সুবর্ণ কোষে একখানি ক্ষুদ্র কৃপাণ ও একাধিক পঞ্চাশৎখানি সুবর্ণমুদ্রা। তৃতীয় আলমারীতে দেখিলেন —দুই ধাপে দুইটী কলসী। একটী সুবর্ণ ও অপরটী রৌপ্যনির্ম্মিত এবং উহা যথাক্রমে সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রায় পরিপূর্ণ। ঐ আলমারীর তৃতীয় ধাপে দেখিলেন, কাঁঠাল কাষ্ঠের নির্ম্মিত একটী বাক্স। উহাতে কতকগুলি কাগজপত্র ও কয়েকটী মুদ্রা রহিয়াছে। বিশ্বসিংহ সবিস্ময়ে কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাই কি তোমার পিতামহের ধনাগার? ইহারই লোভে কি তোমার জ্ঞাতিবর্গ ও গ্রামবাসিগণ প্রলুব্ধ?"

কল্যাণী মৃদু কণ্ঠে কহিলেন "আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমি কি দিব?"

বিশ্বসিংহ কল্যাণীর হস্ত হইতে আলোকটী গ্রহণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের সর্ব্বত্র উত্তমরূপে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, প্রবেশ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে দেয়ালগাত্রে কোষবদ্ধাবস্থায় দুইখানি কৃপাণ ছাদ হইতে নিম্নদিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ঐ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কালে বিশ্বসিংহ অথবা কল্যাণী কেহই সেদিকে দৃষ্টি করে নাই, আর দৃষ্টি করিলেও দেখিতে পাইতেন না। কারণ দ্বার বন্ধ করিয়া না দেখিলে উহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইত না।

ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বসিংহ কৃপাণ দুইখানি একে একে গ্রহণ করিলেন। একখানি কৃপাণ কোষমুক্ত করিয়া দেখিলেন, উহার গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে

"সুজনসিংহ।" অপর কৃপাণখানি কোষমুক্ত করিতেই সহসা উহার কোষের দিকে দৃষ্টি পতিত হইল, দেখিলেন কোষের সহিত স্বর্ণ সূত্রে সংযোজিত একটী ক্ষুদ্র সোণার কৌটা। বিস্ময়াপন্ন হইয়া তিনি কৌটাটী খুলিলেন—দেখিলেন তাহাতে ভূর্জ্জ পত্রে দেবভাষায় লিখিত রহিয়াছে "যিনি আপন বুদ্ধিবলে মদীয় গুপ্ত ধন আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন, তিনিই আমার অজেয় অসি ও কক্ষস্থ যাবতীয় ধনরত্নের সহিত আমার একমাত্র পৌত্রী কল্যাণীকে গ্রহণের সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি।" বিশ্বসিংহের বিস্ময় শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"সুজনসিংহের সঞ্চিত গুপ্ত ধনরাশি কোথায়? কিরূপে তাহার আবিষ্কার করা যায়? কল্যাণী তো কিছুই জানে না, সে ধনরাশি নিশ্চয় প্রচুর ও বিশেষ বুদ্ধিকৌশলে অতি সংগোপনে কার্য্যবিশেষের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। সে ধনের আবিষ্কার করিতে না পারিলে সকল চেষ্টা—সকল আশা বৃথা। অধিক কি স্বেচ্ছাকৃত কল্যাণীর আত্মসমর্পণেও তাহাকে গ্রহণ করা চলে না—গ্রহণ করাও পাপ।

বিশ্বসিংহকে চিন্তিতচিত্ত দেখিয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি চিন্তা করিতেছেন?"

বিশ্বসিংহ উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন "কি চিন্তা করিতেছি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমার পিতামহের ধনাগার কোথায়? কিরূপে উহা আবিষ্কার করিব? এই দেখ, তিনি কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন?" এই বলিয়া সেই কৌটাসহ পত্রখানি কল্যাণীর হস্তে অর্পণ করিলেন। কল্যাণী উহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া কহিলেন "চলুন, সমস্ত কক্ষগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখা যাউক। অনেক কক্ষ রহিয়াছে, উহা সকলই তালাবদ্ধ। আমি কখনও সে সকল কক্ষে প্রবেশ করি নাই—মা'কেও প্রবেশ করিতে দেখি নাই।"

বিশ্বসিংহ মৃদু হাসিয়া কহিলেন "যেখানে তোমার মাতা কখনও যান নাই, সেখানে সঞ্চিত ধনরাশি থাকিতে পারে না; এই কক্ষের নিকটেই কোথায়ও রহিয়াছে।" এই বলিয়া আবার কক্ষটীর সর্ব্বস্থান উত্তমরূপে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন। কক্ষতল অনুসন্ধানে একস্থানে একটী ক্ষুদ্র রেখা দেখিয়া তাঁহার মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল হইল; তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে তন্ন তন্ন করিয়া কক্ষতল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐরূপ রেখা, ঐ কক্ষতলে আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি হস্তস্থিত অসিখানি কোষমুক্ত করতঃ উহার অগ্রভাগ ঐ রেখার ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার চেষ্টা সফল হইল, অসিখানি প্রায় চারি ইঞ্চি ভিতরে প্রবেশ করিল। তিনি উহার সাহায্যে একখানি প্রস্তর উত্তোলন করিয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটী সিঁড়িপথ নিম্নদিকে নামিয়া গিয়াছে। তিনি পুলকিতচিত্তে উৎসাহের সহিত কল্যাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "এই দেখ কল্যাণি, তোমার পিতামহের ধনাগারের পথ।"

কল্যাণী ইহা দেখিয়া যারপর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কহিলেন "এ যে ঘোর অন্ধকার—পথও দুর্গম বোধ হইতেছে। দিবালোক ব্যতীত ইহাতে প্রবেশ করা অসম্ভব। আজ চলুন, কাল প্রত্যূষে পুনরায় আসিব।"

বিশ্বসিংহ মৃদু হাসিয়া কহিলেন "এ তিমির দিবাভাগেও ঘুচিবে না, এখানে দিবালোক প্রবেশ করিবে না। দিনেই হউক আর রাত্রেই হউক, আলোক সাহায্যেই এ পথে যাইতে হইবে। যখন পথ পাইয়াছি, তখন না দেখিয়া ফিরিতে পারি না, ফিরিলেও মনে শান্তি পাইব না। তোমার ভয় হইতেছে কি?"

কল্যাণী। শুনিয়াছি, ধন দীর্ঘকাল অব্যবহার্য্য থাকিলে, উহা যক্ষের অধিকারে যায়। এ কথা সত্য কিনা ঠিক জানি না। কালভুজঙ্গগণ তখন উহার প্রহরী হয়। তাই অজ্ঞাত স্থলে অন্ধকারে যাওয়া বিধেয় নহে।

বিশ্ব। সঙ্গে আলোক রহিয়াছে, আর সুজনসিংহের অজেয় অসি হাতে করিয়া যাইতেছি, তোমার শ্রুত বাক্য সত্য হইলেও, অজেয় অসির সদ্ব্যবহারের সুযোগ হইবে; ভুজঙ্গম আমাদের কি করিবে?

এই বলিয়া বিশ্বসিংহ রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিলেন, কল্যাণী নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা ধীরে ধীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক সিঁড়ি পার হইলেন, তাঁহাদের

মনে হইতে লাগিল যেন পাতালে প্রবেশ করিতেছেন! বিশ্বসিংহ অগ্রে আর কল্যাণী পশ্চাতে—সুতরাং কল্যাণী বিশ্বসিংহের এক সিঁড়ি পাছে পাছে যাইতেছিলেন। অনেক দূর নামিয়া—তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, নিম্নদিক হইতে একটা আলোক রশ্মি উপরের দিকে আসিতেছে; ক্রমে সেই আলোক-রশ্মি আলোকে পরিণত হইল—সে আলোক স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল। সহসা নিম্নদিকে তাঁহারা ভীষণ গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। আর ঐ আলোকের দিকে নিম্নে চাহিতেই দেখিলেন—নিম্নের কক্ষতলের দুই দিক্ হইতে দুইটী ভীষণাকৃতি সর্প ফণা বিস্তারপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদিগকে দংশন করিবার অভিপ্রায়ে তীব্রগতিতে অগ্রসর হইতেছে! তাঁহারা তখন প্রায় শেষ সিঁড়িতে—বিশ্বসিংহের এক সিঁড়ি ও কল্যাণীর দুই সিঁড়ি পার হইতে বাকী আছে। কল্যাণী নিতান্ত ভয়-বিহ্বলা হইয়া বিশ্বসিংহকে পশ্চাৎ হইতে সজোরে আকর্ষণ করিয়া লম্ফপ্রদানে উপরে উঠিয়া পড়িলেন। কল্যাণীর আকস্মিক আকর্ষণে বিশ্বসিংহও পশ্চাৎদিকে পড়িয়া গেলেন। কল্যাণী ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "শীঘ্র উপরে চলুন, আমার উক্তি সত্য কিনা, এখনই প্রমাণ পাইলেন। ঐ ধনে আর আমাদের অধিকার নাই, বলিয়াছি তো উহা যক্ষের অধিকারে গিয়াছে।"

"স্থির হও কল্যাণী, সন্দেহভঞ্জন অথবা সুজনসিংহের অজেয় অসির পরীক্ষা না করিয়া ফিরিতে পারি না।" বলিয়া বিশ্বসিংহ উঠিয়া পুনরায় নিম্নে গমনোদ্যত হইলেন।

কল্যাণী তাঁহাকে সজোরে পুনরায় আকর্ষণ করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "বিষধর সর্পের সহিত সংগ্রাম করা বুদ্ধিমান মানবের কর্ত্তব্য কিনা, আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন; আপনি সশস্ত্র হইলেও একাকী, আর দুইটী সর্পই এক সময়ে আক্রমণে উদ্যত, আপনি একের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার সঙ্গেই অপরে আপনাকে নিশ্চয়ই দংশন করিবে।"

বিশ্বসিংহ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তোমার এ উক্তি সত্য বটে, কিন্তু যাঁহারা অস্ত্রচালনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁহারা একই সময়ে দুইটী কেন, ততোধিক শত্রু নিপাতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ এই দুইটীর প্রতি আমার সন্দেহ আছে,—ইহারা প্রকৃতই বিষধর কিনা? ঐ দেখ, উহারা আমা-দিগকে আক্রমণে অগ্রসর হইয়া, পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া যাইয়া কেবলই গর্জ্জন করিতেছে। ইহার কারণ কি?"

কল্যাণী। আপনি বুঝিতেছেন না, ইহারা যক্ষের প্রহরী, বিনা কারণে কাহাকেও দংশন করে না। আমরা পশ্চাদ্গামী হওয়ায়, ইহারা আপন স্থানে ফিরিয়া কেবল গর্জ্জনে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। যখন আমরা ঐ ধনের প্রত্যাশা করি না, তখন বৃথা শঙ্কটস্থলে না যাওয়াই ভাল।

বিশ্ব। তুমি ঐ ধনের প্রত্যাশা করিতে না পার; ইহাতে তোমার প্রয়োজন না হইতে পারে; আমার এরূপ ধনের বড়ই প্রয়োজন,—মহৎ উপকার হইবে। তোমার পিতামহ ব্যক্তি বিশেষের ভোগের জন্য এ ধন কখনই সঞ্চিত করিয়া যান নাই, কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য উহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার লিখিত পত্রের উহাই মর্ম্ম।

কল্যাণী। আমি জানি, আপনার অর্থাভাব নাই। যাঁহার অর্থাভাব থাকে, তিনি নিষ্প্রয়োজনে পরার্থে মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না।

বিশ্বসিংহ কল্যাণীর উক্তির মর্ম্ম বুঝিলেন; মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমার অর্থের প্রয়োজন আছে কিনা সময়মত বুঝিতে পারিবে। তুমি যাহাদিগকে যক্ষের প্রহরী বলিতেছ,—উহারা যক্ষের প্রহরী নহে, উহারা যে কি, এখনই দেখাইতেছি; তুমি শান্তচিত্তে উপবেশন করিয়া দেখ, আমি কি করি! আপন সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া আমি কিছুতেই ফিরিব না।" বলিয়া তিনি দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে নিম্নগামী হইলেন। ভুজঙ্গমদ্বয় পূর্ব্ববৎ গর্জ্জন করিতে করিতে ফণা বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। তিনি উল্লম্ফনে উভয় বিষধরের ফণা অতিক্রম করিয়া কক্ষতলে পতিত হইলেন। ভুজঙ্গমদ্বয় তাঁহাকে পুনরাক্রমণার্থ যেমন ফিরিল,—কল্যাণী তাহা দেখিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং কম্পিত কলেবরে পতিত হইয়া হতচেতন হইলেন। বিশ্বসিংহের সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, তিনি একাগ্রমনে সর্পদ্বয়ের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। সর্পগণ ভীত হইয়াই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ দেয়াল-

গাত্রে যাইয়া স্থির হইল। তদ্দৃষ্টে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কল্যাণীকে ডাকিতে লাগিলেন। কল্যাণী কোথায়?

একবিংশ অধ্যায়—ধনাগার

কল্যাণীর কোন উত্তর না পাওয়ায়, বিশ্বসিংহ লম্ফ-প্রদানে সিঁড়িতে উঠিলেন, এবং কল্যাণীকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিয়া বিস্ময়বিক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন।

অনেক সময় দেখা যায়, চিত্তের দৌর্ব্বল্য বশতঃ মোহাচ্ছন্ন হইলে সম্পূর্ণ জ্ঞান লুপ্ত হয় না। কল্যাণীর অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল। তিনি বিশ্বসিংহের আহ্বান শুনিতেছিলেন, কিন্তু হৃদয় এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, উত্তর প্রদান করিতে পারিতেছিলেন না;—চক্ষু মেলিয়া চাহিতেও সাহস হইতেছিল না। যখন মোহ ঈষৎ কাটিয়া গেল, বিশ্বসিংহের স্বর তাঁহার কর্ণে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইল, ক্রমে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জে উঠিয়া বসিলেন এবং বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বিশ্বসিংহের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্প দুইটাই নিহত হইয়াছে কি?"

বিশ্বসিংহ সহাস্যে কহিলেন, "সর্প কোথায়? উহা তোমার পিতামহের বুদ্ধি-কৌশল! তুমি নির্ভয়ে আমার সহিত নীচে চল, তাঁহার আরও কত বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দেখিতে পাইবে।"

কল্যাণী। (সবিস্ময়ে) ও দুটা সর্প নহে—তবে কি?

বিশ্ব। হাঁ, ও দুটা সর্পই বটে, কিন্তু রবারের।

কল্যাণী। গর্জ্জন কিসের?

বিশ্ব। ও গর্জ্জন নির্ম্মাণ ও স্থাপন-কৌশলের।

কল্যাণী। বটে?

বিশ্ব। হাঁ, আমার সঙ্গে নীচে চল, সকলই দেখিতে পাইবে। বলিয়া তিনি নীচে নামিতে লাগিলেন। এবার কল্যাণীও তাঁহার সঙ্গে চলিল। তিনি একটু সতর্কতার সহিত কল্যাণীকে লইয়া চলিলেন—পাছে কল্যাণী ভীত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কোন একটা কাণ্ড করিয়া বসেন, এ জন্য তাঁহার হাত ধরিয়া দ্রুত গমনে নামিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেমন নীচের এক সিঁড়িতে—অর্থাৎ কক্ষতল হইতে উপরের দিকে তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়াছেন, অমনি ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনি আরম্ভ হইল এবং পরের সিঁড়িতে নামা মাত্রই উহারা গর্জ্জন করিতে করিতে আক্রমণ করিতে আসিল; শেষ সিঁড়িতে পা দেওয়া মাত্রেই তাঁহাদিগকে দংশনে উদ্যত হইল। কল্যাণী এবারেও ভীত হইয়া সন্ত্রস্ত হইতেছিলেন, সহসা বিশ্বসিংহের সজোর আকর্ষণে কক্ষতলে নামিতে বাধ্য হইলেন। কল্যাণী চারিদিক চাহিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ স্বরে বিশ্বসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেওয়ালগাত্রে সাপ্ দুটা ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে কেন? আর উহাদের মাথার উপরে 'মণির' ন্যায় ঐ দুটী কি?"

বিশ্ব। ও দুটী বোধ হয় কোন মূল্যবান্ প্রস্তর। উহার উজ্জ্বল কিরণে গৃহটী আলোকিত হইয়াছে! সর্প দুটী দেয়ালগাত্রে কেন রহিয়াছে, অনুসন্ধান করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। আমার মনে হয় উহাতেও কোনরূপ কৌশল নিহিত আছে। আমরা যে জন্য এখানে আসিয়াছি, এ কক্ষে তো তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। কক্ষে আর কোন দ্বারও দেখা যাইতেছে না—যে কক্ষান্তরে গিয়া ধনরাশির অনুসন্ধান করিব। কক্ষতল সর্প দুইটার কুণ্ডলীকৃত বিরাট দেহে আচ্ছাদিত। বলিয়া তিনি একটু চিন্তিত হইলেন।

কল্যাণীর মনোমধ্যে অনুরূপ ভাব খেলাইতেছিল, তিনি কেবল সেই অহিযুগলের আশ্চর্য্য কার্য্য চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আমার ইচ্ছা হয় সাপ্ দুটার কাণ্ড আর একবার ভাল করিয়া দেখি, ইহা হইতে কোনরূপ কৌশল আবিষ্কার করা যায় কি না?"

কল্যাণীর এই প্রস্তাবে বিশ্বসিংহও মুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিলেন "আচ্ছা তাহাই হউক; তুমি তবে পুনরায় সিঁড়িতে গিয়া উঠ, আমি এখান হইতে ইহাদের নির্ম্মাণ ও স্থাপন-কৌশলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখি।"

কল্যাণী তাহাই করিলেন—দৌড়িয়া ৪।৫ ধাপ্ উপরে উঠিলেন—তাঁহার গমনকালে যেমন তৃতীয় ধাপে পা পড়িল, অমনি একটা ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইল; তার পরই

নীরব। বিশ্বসিংহ কল্যাণীকে সেই তৃতীয় ধাপে নামিয়া দাঁড়াইতে কহিলেন। কল্যাণী তাহাই করিলেন। তখন কক্ষতল হইতে ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি কল্যাণীকে আর এক সিঁড়ি নামিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। কল্যাণী তাহাই করিলেন। তখন তাহারা দেখিলেন—সর্প দুটা দেয়ালগাত্র হইতে মধ্যস্থানে ছুটিয়া আসিয়া ফণা বিস্তার করিয়া উন্নত মস্তকে স্থির ভাবে রহিল। বিশ্বসিংহ কল্যাণীকে একেবারে নিম্নের সিঁড়িতে নামিয়া দাঁড়াইতে কহিলেন। কল্যাণীও নীচে নামিয়া দাঁড়াইলেন। তখন কক্ষতলে গর্জ্জন ধ্বনি অতি ভয়ঙ্কর হইল এবং সর্প দুটা ক্ষিপ্রগতিতে গিয়া কল্যাণীর পাদমূলে দংশন করিল। ঐ দংশনের সঙ্গে সঙ্গে সর্প দুটার জিহ্বা খসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গতিশক্তির লোপ হইল।

বিশ্বসিংহ দেখিলেন যে দেয়াল গাত্রে কৃত্রিম অহিযুগল মস্তক স্থাপন করিয়া থাকিত, তথায় উভয় দেয়ালে দুইটী ক্ষুদ্র রন্ধ্র আছে। তিনি হস্তস্থিত চাবির তাড়া হইতে একে একে সকল চাবিগুলি ঐ রন্ধ্রপথে প্রবেশের চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। কল্যাণী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিলেন, তিনি বিশ্বসিংহকে কহিলেন "এখানে সাপ দুইটির জিহ্বা খসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—ইহা লৌহ নির্ম্মিত, ইহার সহিত তো ঐ রন্ধ্রপথের কোন সম্বন্ধ নাই?"

বিশ্বসিংহ আগ্রহের সহিত কহিলেন "দেখি, উহা কিরূপ?" বলিয়া তিনি কল্যাণীর পদপ্রান্তে পতিত জিহ্বা দুইটী তুলিয়া, উহার একটা রন্ধ্র পথে প্রবেশের চেষ্টা মাত্রেই উহা সহজে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। তিনি আরও দেখিলেন, ঐ সর্পজিহ্বারূপী চাবি রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশের পরক্ষণেই দেয়াল গাত্রে ঐ রন্ধ্রপথের নীচে ও উপরে প্রায় দুই ফুট ব্যবধানে দুইটী সূক্ষ্ম রেখা দৃষ্ট হইতেছে। ঐ রেখা দুইটীর দৈর্ঘ্য প্রায় তিনফুট হইবে। উহাতে সামান্য আঘাত করা মাত্রই উহা ভিতরের দিকে সরিতে লাগিল। তখন তিনি তাহাতে আস্তে আস্তে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে করিতে উহাও প্রায় দুই ফুট পর্য্যন্ত পশ্চাতে সরাইলেন। তার পর আর সরে না, কিন্তু তাহাতে বারংবার আঘাত করায় সহসা উহা দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া বিভক্ত খণ্ডদ্বয় দুই দিকে সরিয়া গেল। ফলে একটী সমশ্চতুষ্কোণ নাতিবৃহৎ রন্ধ্রপথ আবিষ্কৃত হইল। বিশ্বসিংহ সেই পথে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন সম্মুখেই একটী গহ্বর সম্পূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ। উহার আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান ২৫ বর্গ ফুট কিন্তু গভীরতা অনিশ্চিত। মুদ্রাগুলির উপরিভাগে এক হাত দৈর্ঘ্যে ও এক হাত প্রস্থে একখানি স্বর্ণ ফলক, তাহাতে দেবভাষায় লিখিত রহিয়াছে—"দেশ ও দশের সেবার্থ উৎসর্গীকৃত—ব্যক্তি বিশেষের ভোগার্থে নহে।"

বিশ্বসিংহ স্তম্ভিত হইলেন। অসম্ভাব্য, অভাবনীয় ও অসংখ্য মুদ্রার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, উপলব্ধি ব্যতীত তাহা প্রকাশযোগ্য নহে। তিনি সুজনসিংহের বুদ্ধি কৌশলে, দূরদর্শিতায় ও স্বদেশভক্তিতে মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিলেন "হে দয়াময়, তুমি যে বাঞ্ছাকল্পতরু ইহাই তাহার প্রমাণ। করুণাময়, হৃদয়ে বল—চিত্তে দৃঢ়তা—মনে স্থিরতা দিও, যেন তোমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি-বিশ্বাস রাখিয়া তোমার নির্ব্বাচিত কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম হই।"

এই সময় বিশ্বসিংহের নেত্রযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে কল্যাণী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি! আপনার চক্ষে জল কেন?"

বিশ্বসিংহ বাষ্পজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলেন "এ রোদনের নেত্রবারি নহে কল্যাণী—উদ্দেশ্য সফলতার আনন্দাশ্রু!"

বিশ্বসিংহ পূর্ব্ব প্রণালীতে কক্ষস্থ অপর দেয়াল গাত্রে যথায় অন্যতম সর্পটী উন্নত শিরে বিরাজিত ছিল, অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব্ববৎ আর একটী স্বর্ণ ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি দুই দিকের স্বর্ণ ভাণ্ডার দুইটী পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করিয়া পূর্ব্ব নিয়মে সর্প দুইটীর মুখগহ্বরে জিহ্বা দুইটী সংলগ্ন করিয়া কল্যাণীর সহিত গুপ্ত গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

'জ্ঞান-বিজ্ঞান'

বিজ্ঞানের ক্রম-বিকাশ (আদিযুগ)

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মিত্র এম্. এস্‌সি

পূর্ব্ব-প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিজ্ঞানের স্বরূপ, সংজ্ঞা ও বিভাগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ থাকৃতে পারে যে, সেখানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কথাই বলা হয়েছিল। একথা সত্য যে, 'বিজ্ঞান' কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকেই নির্দ্দেশ করে না; ব্যাপক অর্থে 'বিজ্ঞান' বলতে আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ব্যতীত আরও অনেক-গুলি শাখা বুঝি; উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই বিভাগগুলি আমাদের আলোচনার গণ্ডীতে আসে না, কারণ এই বিভাগগুলি সবেমাত্র বিজ্ঞানের কোঠায় পা দিয়েছে—এখনও এদের আলোচনা এতদূর অগ্রসর হয়নি যে, এদের পূরাদস্তুর বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

গত কয়েক শতাব্দীতে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য-জগতে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ক্রমবর্দ্ধিত হয়েছে ও আধুনিক যুগে জগতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তারই ক্রমবিকাশের একটা সংক্ষিপ্ত ধারা[illegible]তিহাস বর্ণনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এস্থলে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে, বিজ্ঞান কি পাশ্চাত্য-জগতের একান্ত নিজস্ব জিনিষ, বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রাচ্যের কি কোন দাবী নাই? আমরা আজ প্রাচ্যে বিজ্ঞান বল্‌তে যা' বুঝি, তার জন্ম ও বিকাশ প্রধানতঃ পাশ্চাত্যেই হয়েছে—এ বিষয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নিকট ঋণী। অবশ্য বর্ত্তমান যুগে প্রাচ্য পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করেছে অনেক প্রকারে। কিন্তু পাশ্চাত্য-জগতে বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করবার বহু পূর্ব্বে প্রাচ্যেও যে বিজ্ঞানের যুগোচিত চর্চ্চা হয়েছিল, এ কথায় সন্দেহ করবার খুব বেশী অবকাশ আজ নাই। কিন্তু সে বিজ্ঞান অধিকাংশ স্থলেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন, আর তার আলোচনা গবেষণাসাপেক্ষ। এই কারণে প্রাচ্যোদ্ভূত বিজ্ঞান আমাদের প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু নয়।

একথা বল্‌লে বোধহয় অত্যুক্তি দোষ হয় না যে, বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগে—যখন মানুষ সভ্যতার ধাপে আরোহণ করেনি, আর তার মনোবৃত্তিও বিশেষ বিকশিত হয়নি। বিজ্ঞানের যথাযথ আলোচনার সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নয়—বরং কতকটা গতানুগতিকতার অনুবর্ত্তী হয়ে সে যুগের মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল। প্রকৃতি তার নিজের সৌন্দর্য্য ও রহস্য মানুষের দৃষ্টির সামনে তরঙ্গায়িত করলেন; মানুষ সে তরঙ্গে ভেসে চল্‌ল, তাকে রোধ করবার ইচ্ছা তার ছিল না। এই ভাবে আদিযুগে পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হ'ল, এই ভাবে মানুষের সঙ্গে প্রাকৃতিক রহস্যের পরিচয় সুরু হ'ল। আদিতে মানুষ জৈব-জগতের যে স্তরে ছিল, তাতে বোধ হয় সে প্রাকৃতিক রহস্য দেখেই সন্তুষ্ট থাকৃত। কিন্তু ক্রমে তার মধ্যে মনুষ্যোচিত মনোবৃত্তির বিকাশ হ'ল; সেই সময় হতে প্রাকৃতিক রহস্য তার মনে নানা প্রশ্ন জাগরিত করল। এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে সে বিজ্ঞানের জন্ম দিল, আর সে নিজে হয়ে পড়ল বৈজ্ঞানিক।

ক্রমে মনুষ্য-সমাজ বুঝতে পারল যে, এই সমাজকে বর্দ্ধিষ্ণু হ'তে হলে, কতকগুলি বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে' তাকে বেঁচে থাকৃতে ও বর্দ্ধিত হ'তে হ'বে। বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্য নিজস্ব-শক্তির প্রয়োজন; সুতরাং প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার জন্য সে তার শক্তি অপচয় করা যুক্তিযুক্ত মনে করল না। বিরুদ্ধশক্তিকে পরাজিত করবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক মানুষ নানাজাতীয় অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার করল, আর প্রাত্যহিক জীবনের সুখযাত্রার জন্য আবিষ্কার করল নানা শ্রেণীর সাংসারিক আবশ্যকীয় সামগ্রী। এই সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করতে মানুষকে পর্য্যবেক্ষণজনিত অভিজ্ঞতার সহায়তা

নিতে হ'ল। এই রকম ভাবেই খুব সম্ভবতঃ বিজ্ঞানের ব্যবহার সুরু হয়েছিল। আবার অন্য দিকে সেই আদি-কাল হ'তেই রোগ-প্রতিকারের ঔষধরূপে নানা প্রকার গাছ-গাছড়ার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে, আর অনেক গ্রাম্য জীবজন্তু ও পক্ষীর লালন-পালন মনুষ্য-জীবনে অপরিহার্য্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত পশুপক্ষী ও উদ্ভিদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর পর্য্যবেক্ষণ হতেই যে প্রাণি-বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে, একথাও খুব সম্ভবতঃ অসত্য নয়। এ যুগে মানুষ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে প্রধানতঃ অনুসন্ধিৎসার অনুবর্ত্তী হয়ে, কিন্তু আদিতে সে এ কাজে হাত দিয়েছিল গতানুগতিকতার বশবর্ত্তী হয়ে; অবশ্য প্রয়োজনীয়তাও যে একটি কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরবর্ত্তী যুগে মানব-মনোবৃত্তির ক্রমবিকাশ হ'তে লাগ্‌ল; ফলে তার মনে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্য্য-কারণ বিষয়ে কৌতূহল জাগ্‌ল, একথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। মানুষের মনে প্রতীতি জন্মাল যে, এই দৃশ্যমান অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই মূল সূত্রে গ্রথিত; সেই মূল সূত্রের সন্ধান তখনই আরম্ভ হ'ল; আজও সে সন্ধান শেষ হয়নি; কোন দিন হ'বে কি না কে জানে?

সেকালের কার্য্যকারণের সম্বন্ধ-নির্ণয়-প্রচেষ্টার ইতিহাস অল্প-বিকশিত মনোবৃত্তির পরিচায়ক। এই প্রচেষ্টার ফল বর্ত্তমান যুগে জনসাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ; তার কারণ বর্ত্তমান যুগের মনোবৃত্তি প্রায় পূর্ণবিকশিত। কিন্তু আমাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে উপ-হাসের কোন কারণ নাই। যে ব্যক্তি কোন অপরিচিত স্থানে একবার গমন করেছে, তার কাছে সে স্থানের পথ পরিচিত ও অনায়াসগম্য হ'তে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি সে সে স্থানে কখনও পদার্পণ করেনি, তার পক্ষে ক্ষণে ক্ষণে পথ ভুল হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নয়। সে যুগের বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর যে সকল ব্যাখ্যা ক্রমান্বয়ে দিয়েছিলেন, বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব ও অচল হ'লেও, সে ব্যাখ্যা আদি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার পরিচায়ক, সুতরাং প্রশংসনীয়।

আদি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

প্রকৃতির যে রহস্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ও সর্ব্বপ্রথম বিস্ময় উদ্রেক করে, তার মধ্যে আকাশের দৃশ্যরূপ ও বৈচিত্র্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অগণিত নক্ষত্র-খচিত মহাব্যোম মানুষের চিন্তাশক্তিকে অভিভূত করল। সূর্য্যের জ্বলন্ত প্রতিকৃতি, চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, অসংখ্য তারকা-রাজির উদয়াস্ত, গ্রহগণের বিচিত্র গতি মানুষের চিন্তা-জগৎকে আলোড়িত করে' তুল্‌ল; কিন্তু যথোচিত বিকাশের অভাবে চিন্তাশক্তি পরাভূত হল, আর সেই সঙ্গে কল্পনা করল এক অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট বিরাট্ শক্তিকে, যার ইঙ্গিতে নিখিল বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। এই অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট শক্তিকে সে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিল; এই অর্ঘ্য মানুষ বর্ত্তমান যুগেও দেয়, কারণ তার বিকশিত জ্ঞানবুদ্ধি কতখানি রহস্যই বা উদ্ঘাটিত করেছে! প্রাকৃতিক রহস্য যেখানে মানুষের বুদ্ধির অনতিক্রম্য, সেইখানেই তাকে এই বিরাট্ শক্তির কল্পনা করতে হয়। মানুষের আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মভাব এই শক্তির সহিত জড়িত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ও তৎপরবর্ত্তী সভ্যতার আদি যুগে এই ধর্ম্মভাব মানুষের জীবনে এতখানি স্থান অধিকার করেছিল যে, সে সব বিষয়েই একটা ধর্ম্ম-ঘেঁষা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করত। এই উক্তির উদাহরণ নিম্নে পাওয়া যা'বে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক স্তম্ভের নির্ম্মাণ-প্রণালী হ'তে এ কথা বেশ প্রমাণিত হয় যে, তখন হতেই মানুষ শূন্যচারী জ্যোতিষ্করাজির পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করেছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে Thales of Miletus নামক এক গ্রীসদেশীয় দার্শনিকের লিপির মধ্যে আমরা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার সন্ধান পাই। রাত্রিতে আকাশে তারকারাজির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের পরস্পরের দূরত্বের পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু এই দূরত্ব সমান রেখে ও ক্রমাগত গতিশীল হয়ে এরা উদিত ও অস্তমিত হয়। এই গতি প্রাচীনদিগের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল ও সমস্যার বিষয় হয়ে পড়েছিল। প্রথমে অবশ্য তাঁরা মনে করতেন যে, আমাদের এই পৃথিবী এক অতলস্পর্শী গহ্বর হ'তে উত্থিত

হয়ে সমতলভাবে দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, আর তারকাগুলি গতিশীল হয়ে শূন্যে ভ্রমণ করছে। Anaximander নামক অপর এক গ্রীক্ দার্শনিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর হ'তে দেখ্‌লে মহাব্যোমের যে অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা' একটি পূর্ণ গোলকের অর্দ্ধাংশ মাত্র এবং তারকাগুলি এই গোলকের অধঃস্থলে নিজ নিজ স্থান অধিকার করে' রয়েছে। তিনি আরও প্রচার করেন যে, এই গোলকরূপী মহাশূন্যের কেন্দ্র-স্থলে আমাদের এই পৃথিবী স্থিরভাবে ভাস্‌ছে, এবং মহাশূন্য-গোলকটি ক্রমাগত চারিদিকে আবর্ত্তিত হচ্ছে; এই আবর্ত্তনের জন্য তারকাগুলির গতি দৃষ্টিগোচর হয়। পৃথিবীর আকারও যে গোলকের ন্যায়, সে কথা Anaximander-এর জানা ছিল না।

কিছুকাল পর Pythagoras নামক একজন গ্রীক্ দার্শনিক ও তাঁর শিষ্যবর্গ প্রচার কর্‌লেন যে, Anaximander-এর সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। তাঁরা বল্‌লেন যে, মহাশূন্যের গোলকটি আবর্ত্তনশীল নয়;—প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীই এই গোলককেন্দ্র হ'তে কিছু দূরে অবস্থিত হয়ে ক্রমাগত সেই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ কর্‌ছে। এই ঘূর্ণনের জন্য আমরা তারকাগণের গতি ও উদয়াস্ত দেখি। এই দার্শনিকের মতে পৃথিবীর যে অংশ কেন্দ্রের অপর দিকে অবস্থিত, সেই অংশেই মানুষের বাস, অপর অংশে জন-মনুষ্যের চিহ্ন নাই। Pythagoras-এর মতাবলম্বিগণ পুরাকালীন ধর্ম্ম-ঘেঁষা ব্যাখ্যার মোহ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেননি; তাঁরা বলতেন যে, সূর্য্য-গোলকের কেন্দ্রে অগ্নিদেব অধিষ্ঠিত আছেন ও পৃথিবী তাঁকে প্রদক্ষিণ করে' অর্ঘ্য দিচ্ছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই শিষ্যবর্গের মতবাদের অবসান হয়। আরও কিছুদিন পর খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে Aristarchus নামক অপর একজন গ্রীক্ দার্শনিক যে মত প্রচার করেন, তা' আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে সত্য বলে' প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর কল্পনা ও বিশ্বরূপ বর্ণনা যুগোপযোগী হয়নি, কারণ সেই কল্পনা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম কর্‌বার জন্য বুদ্ধিবৃত্তি যতখানি বিকশিত হওয়ার প্রয়োজন, ততখানি সে যুগে হয়নি। পণ্ডিতসমাজ তাঁর কল্পনাসূত্র ধর্‌তে পার্‌লেন না; তাঁর মতবাদ অগ্রাহ্য হল। তিনি বলেছিলেন যে, সূর্য্য আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড় এবং এই সূর্য্যকে পৃথিবী অনবরত প্রদক্ষিণ কর্‌ছে। সুধীসমাজ এই মত অগ্রাহ্য করে' গ্রহণ করলেন Aristarchus-এর প্রায় সমসাময়িক দার্শনিক Leucritius এর মত। আজ আমরা জানি যে, মহাব্যোমের যে রূপ তিনি বর্ণনা করেছিলেন, তা' ভ্রমাত্মক। তিনি প্রচার কর্‌লেন যে, ব্যোম-গোলকের কেন্দ্রে পৃথিবী স্থিরভাবে অবস্থিত, এবং গোলকটিই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হচ্ছে; এই আবর্ত্তনের জন্যই আমরা জ্যোতিষ্ক-দিগের গতি দেখ্‌তে পাই।

উপরে যে কথা বলা হ'ল, তা'তে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে, পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের আলোচনা সর্ব্বপ্রথম গ্রীসদেশে আরম্ভ হয়; সে যুগে ঐ দেশ সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। আদিযুগের জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান গ্রীকৃদের বিজ্ঞান বল্‌লে অত্যুক্তি বা অন্যায় হয় না। গ্রীকৃদের জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানচর্চ্চার পর বহুদিন পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞান উন্নতির একই সোপানে ছিল। মধ্যযুগে আবার জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সেই চর্চ্চা অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে; ফলে এই বিজ্ঞান রীতিমত বৈজ্ঞানিক স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে। মধ্য যুগে ও বর্ত্তমান যুগে এই বিজ্ঞানের গতি কোন দিকে চলেছে, তার আলোচনা আমরা পরে কর্‌ব, কারণ সে আলোচনা কর্‌বার আগে আরও কতকগুলি কথা বলা দরকার, বিশেষতঃ ইতিহাসের দিক্ থেকে।

পদার্থ-তত্ত্ব ও পরমাণুবাদ

পুরাকালে মহাব্যোমের রহস্য মানুষের মনে যেমন অনুসন্ধিৎসা জাগিয়েছিল, তেমনি ঔৎসুক্য এনে' দিয়েছিল আর একটি বিষয়ে, যা' নিয়ে মানুষকে অহরহঃ কারবার কর্‌তে হ'ত। এই বিষয়টি হচ্ছে পদার্থতত্ত্ব। একই পদার্থ যে নানাভাবে রূপান্তরিত হ'তে পারে, তা' মানুষ সেই সময় হতেই লক্ষ্য করেছিল। পদার্থের এই রূপান্তর দেখে' গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণ মনে করেছিলেন যে, বিশ্বের

যাবতীয় পদার্থ একই মূল উপাদানে গঠিত। কিন্তু এই মূল উপাদানের একত্ববাদ মানুষের মনে জাগরূক হ'লেও, সে যুগে বিশেষ কার্য্যকরী হয়নি; আজ দুই হাজার বৎসরের বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানি যে, এই মতবাদ অলীক নয়। অবশ্য যে সমস্ত পরীক্ষা ও চিন্তাসূত্র অবলম্বন করে' এই একত্ববাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, তা' গ্রীক্ পণ্ডিতগণের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। তা' হলেও একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এই একত্ববাদ গ্রীক্ পণ্ডিতগণের চিন্তার অগোচর ছিল না।

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে Empedocles চারিটি মূল পদার্থের (ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ, তেজঃ) প্রস্তাব করেন ও বলেন যে, সমস্ত পদার্থ ই এই চারি পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। পদার্থতত্ত্বের এই ধারণা বহু শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত ছিল; আধুনিক যুগে রাসায়নিক গবেষণার ফলে এই মতের ভ্রান্তি প্রতিপাদিত হয়েছে।

Empedocles-প্রস্তাবিত চারিটি মূল উপাদান আধুনিক যুগে ভ্রমাত্মক বলে' প্রতিপাদিত হ'লেও, সে যুগের চিন্তা পরমাণুবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই পরমাণুবাদ আমরা সর্ব্বপ্রথম Leucippus ও Democritus-এর নিকট হ'তে পাই। আধুনিক যুগে যে পরমাণুবাদ বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচলিত আছে, তা' আমরা পেয়েছি John Dalton ও Avogadro-র নিকট হ'তে। Leucippus ও Democritus-এর পরমাণুবাদ Dalton ও Avogadro র পরমাণুবাদের সহিত একার্থ-বোধক নয়। Dalton ও Avogadro পরমাণুবাদ প্রচার করেছিলেন যাবতীয় রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি যথাযথভাবে বুঝ্বার ও বোঝাবার জন্য; গ্রীক্ পণ্ডিতগণের উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক; তাঁরা পরমাণুবাদ দ্বারা বিশ্ব-রহস্য বুঝ্তে চেষ্টা করেছিলেন।

Democritus ও Leucippus-এর ও সমসাময়িক কালে পদার্থ ও তার গুণাবলীকে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করা হ'ত; আমরা এই ধরণের চিন্তাধারা হিন্দু দর্শনের মধ্যেও পাই। প্রাচীনদিগের নিকট দ্রব্য-গুণেরও বস্তুতান্ত্রিকতা ছিল; তাঁদের নিকট চিনির মিষ্টত্ব চিনির ন্যায়ই বস্তুতান্ত্রিক। দ্রব্যগুণের বস্তুতান্ত্রিকতা আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করে না। Democritus-এর পরমাণুবাদ এই দ্রব্যগুণের বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করে। Democritus ও তাঁর মতাবলম্বিগণ বল্লেন যে, পদার্থের গুণ স্থায়ী নয়,—স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এদের বিভিন্নতা হয়। কোনও এক বিশেষ পরিক্ষেপে অবস্থিত হ'লে চিনির মিষ্টত্ব অনুভূত হয়; আবার পরিক্ষেপান্তরে সেই চিনিরই মিষ্টত্ব লোপ হ'তে পারে। বিভিন্ন দ্রব্যের গুণাবলীর বিভিন্নতার কারণ, তাদের উপাদানের বিভিন্নতা। বিভিন্ন প্রকার উপাদানে গঠিত বলে' একটি পদার্থের গুণ অন্য পদার্থের গুণ হ'তে ভিন্ন হয়। এই উপাদানগুলি—যাদের বিভিন্নতা হ'তে দ্রব্যের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তারা পরমাণু নামে খ্যাত। পরমাণুর আকার, আয়তন, পরিস্থিতি ও গতির ভেদ আছে। গ্রীক্ দার্শনিকগণ এই পরমাণুবাদ প্রচার করে' তাৎকালীন চিন্তারাজ্যে এক মৌলিক পরিবর্ত্তন এনে' দিয়েছিলেন।

একটুখানি চিন্তা করলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, গ্রীক্দেশের পরমাণুবাদ দ্বারা পদার্থের গঠন-রহস্যের কোন হদিস পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় এই যে, পরমাণুদিগের গুণাবলীর বিভিন্নতার জন্য দ্রব্যগুণের বিভিন্নতা হয়। কিন্তু তৎপরেই প্রশ্ন উঠে এই যে, পরমাণুগুলির গুণের বিভিন্নতা হয় কেন? গ্রীসীয় পরমাণুবাদ এই প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। সুতরাং এই পরমাণুবাদ জটিল দ্রব্যগুণের ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য পরমাণুর গুণভেদ দ্বারা করলেও, প্রকৃতপক্ষে শেষ প্রশ্নের সমাধান করেনি। তা' হলেও এই পরমাণুবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে যে এক ধাপ অগ্রসর করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর একথাও স্মরণ রাখতে হ'বে যে, এই সোপানের উপরই Dalton ও Avogadro-র পরমাণুবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

Democritus ও Leucippus-এর পরমাণুবাদ গ্রীসীয় পণ্ডিত-সমাজ সর্ব্বপ্রথমে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই পরমাণুবাদের ভিত্তি খুব সুগঠিত ছিল না; এর মূলে ছিল এমন সমস্ত অনুমান, যার সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা যেতে

পারে না। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক Aristotle যে মতবাদ প্রচার করেন, তাতে পরমাণুবাদের দুর্ব্বল ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে এবং গ্রীসীয় সুধী-সমাজের উপর তার প্রভাব ক্রমশঃই কমতে থাকে। Aristotle যে মত প্রচার করেন, তার উৎপত্তি হয় Democritus-এর মতবাদ খণ্ডন কর্‌বার প্রবৃত্তি হ'তে। পরমাণুবাদের সঙ্গে Democritus আরও কতকগুলি তথ্য আবিষ্কার করেন;—এ যুগের বৈজ্ঞানিকগণ জানেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যগুলি ভ্রান্ত নয়। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, বায়ুশূন্য স্থানে সকল পদার্থই একই গতিতে নিম্নগামী হয়;—বায়ুপূর্ণ স্থানে যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ অধিক ওজনের পদার্থখণ্ড কম ওজনের পদার্থখণ্ড অপেক্ষা বেশী গতিতে পতিত হয়—তাহার কারণ বায়ুর রোধকশক্তি। কি কারণে পদার্থের এই ব্যবহার দেখা যায়, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান তখন না থাকলেও, Democritus-এর আবিষ্কার পরবর্ত্তী যুগে পরীক্ষা দ্বারা সত্য বলে' প্রমাণিত হয়েছে। সকল দ্রব্যই যে বায়ুশূন্য স্থানে একই গতিতে পতিত হয়—একথা Aristotle স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু তিনি বল্‌লেন যে, পরমাণুবাদ মতে যদি সমস্ত দ্রব্যই একই পরমাণুদ্বারা গঠিত হয়, তবে তাদের ভারও সমান হওয়া উচিত এবং সমভার দ্রব্যের একই গতিতে বায়ুশূন্য স্থানে পতিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, সকল দ্রব্য সমভার নয়; সুতরাং পরমাণুবাদ সত্য বলে' স্বীকার করা যায় না। এই হ'ল Aristotle-এর পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি। এ স্থলে এ কথা স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে যে, Aristotle পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বের কথা জান্‌তেন না; সেইজন্য পরমাণুবাদকে অস্বীকার করেছিলেন। Aristotle বিশ্বাস কর্‌তেন যে, ভার পদার্থের এমন একটি গুণ, যার আর বিশ্লেষণ করা চলে না। এই বিশ্বাস আদি যুগে পণ্ডিত-সমাজে এতটা আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে, Democritus-এর পরমাণুবাদ পরবর্ত্তী যুগে সত্য প্রমাণিত হলেও, সে যুগে অনাদৃত হয়েছিল এবং Aristotle-এর মতবাদের প্রাবল্য মধ্যযুগেও প্রথমে হ্রাস হয়নি। এই বিখ্যাত দার্শনিক পরমাণুবাদ অস্বীকার করায়, তাঁর মতবাদ বৈজ্ঞানিক জগতে সত্যানুসন্ধানের পথে অন্তরায় হয়েছিল; ফলে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেতে বিলম্ব হয়েছিল অনেক।

আদি প্রাণিবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞান বল্‌তে উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য প্রাণীর তথ্যালোচনা বোঝা যায়। আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলেছি যে, উদ্ভিদ্ ও গ্রাম্য জীবজন্তু আদি মানবের জীবন-যাত্রার উপকরণ হিসাবে অতি প্রয়োজনীয় ছিল; উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর পালন কর্‌তে গিয়ে মানুষ উদ্ভিদ্বিজ্ঞান ও প্রাণি-বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ করে।

উদ্ভিদ্ মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় হয়েছিল ভেষজরূপে। আদিতে মানুষ ভেষজের ব্যবহার জান্‌ত না। তখন মানুষ মনে কর্‌ত যে, ব্যাধির উৎপত্তি হয় ভৌতিক আক্রমণ ও প্রভাব হ'তে। সেই সময়ে এই ভৌতিক আক্রমণ-জনিত ব্যাধির প্রতিকার করা হ'ত নানাপ্রকার যাদুবিদ্যার দ্বারা; প্রতিকার বাস্তব পক্ষে হয়ত কিছুই হ'ত না, কিন্তু মানুষের ঐ যাদুবিদ্যায় সেকালে অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। গ্রীক সাহিত্যে এই ভৌতিক চিকিৎসা-প্রণালীর প্রভাবের হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। গ্রীসীয় চিকিৎসকবর্গের মধ্যে ভেষজের প্রচলন আরম্ভ হয় এবং এই চিকিৎসকশ্রেণীই উদ্ভিদ্বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। Leucritius-এর লিখিত বিবরণ হতে আমরা জান্‌তে পারি যে, গ্রীকগণ প্রাণি-বিজ্ঞানের কতগুলি নিয়মের সহিত পরিচিত ছিলেন; তাঁরা জান্‌তেন যে, এই বিশ্বে জীবের উৎপত্তি হয় অনুকূল পরিক্ষেপের ভিতর দিয়ে, আর জীবন-সংঘর্ষে জয়লাভ হয় তারই, যার জীবন-ধারণের উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

আদি গণিত-শাস্ত্র

খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে Euclid গণিতশাস্ত্রে যে বস্তু দান করে' যান, জগতে তার তুলনা বিরল। Euclid-এর এ দান পরবর্ত্তী যুগে জ্যামিতি নামে খ্যাত হয়েছে। যুক্তি দ্বারা তিনি যে সমস্ত তথ্যে উপনীত হন, ব্যবহারিক জীবনে তাদের সাফল্য দেখে সেকালে কিছুদিনের জন্য

'হাতে কলমে' বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আদর হ্রাস হয়েছিল। Euclid-এর যুক্তিপ্রসূত তথ্য এতই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যে, বহুদিন পর্য্যন্ত আর এ বিষয়ে নূতন তথ্য আবিষ্কারের কোন অবকাশ ছিল না।

Euclid-এর যুগে আর এক ব্যক্তি গ্রীসদেশে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁর দানও গণিতশাস্ত্রে কম নয়; এই ব্যক্তি Archimedes নামে বৈজ্ঞানিক জগতে খ্যাত। Archimedesই প্রথমে যান্ত্রবিজ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ করেন; তিনি যান্ত্রবিজ্ঞান ব্যতীত তরল পদার্থেরও কতকগুলি গুণ আবিষ্কার করেন।

উপরের আলোচনা হ'তে বুঝ্‌তে পারা যাবে যে আদিযুগে বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল প্রধানতঃ গ্রীসদেশে; সে যুগে ইউরোপের অন্যান্য দেশ সভ্যতার আলোক পায়নি; কিন্তু গ্রীসদেশ সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। বিজ্ঞান-চর্চ্চাই গ্রীসীয় সভ্যতার একমাত্র প্রমাণ নয়; কৃষ্টির অন্যান্য বিভাগেও গ্রীসদেশ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের আদি যুগের কথাই বলা হ'ল। তার পরের ইতিহাস বিবৃত কর্‌বার ইচ্ছা থাক্‌ল পরবর্ত্তী এক প্রবন্ধে।

"নিভে গেছে দীপ"

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মধু-যামিনী যে ফুরায়ে গিয়েছে আজ
কাল সন্ধ্যায় ছিল কত হৃদে আশা;
কত ব্যাকুলতা জেগেছিল হৃদয়েতে,
মুখরিত হয়ে উঠেছিল কত ভাষা।
পূজার অর্ঘ্য সাজানো যে হয়েছিল,
তাজা ফুলে মালা গাঁথা হয়েছিল কত,
মরণের বুকে জীবনের জয়গান—
প্রাণের প্রদীপ জ্বলেছিল শত শত।

নিঃশেষে মুছে গিয়েছে সকল আশা
মূক হয়ে গেছে মুখর সে মুখখানি—
স্তিমিত প্রদীপ প্রভাতে এখনও জ্বলে,
উজল করে না কেহ আর তৈল দানি'।
ফুরায়ে গিয়েছে গানখানি আজি হায়—
মনে হয় যেন সকলি হয়েছে ভুল,
ফুটেছিল যূঁই, প্রভাতে ঝরিয়া যায়—
ঝড়িয়া পড়েছে রাতের শেফালি ফুল।

দেবতা আসে নি সারা রাত আরাধনে
ধূপ-ধূনা পুড়ে, প্রদীপ নিভিয়া যায়—
হাসি গেছে আজ, নিঃশেষে ফুরাইয়া—
প্রিয় আসে নাই—রাত ফুরায়েছে হায়।
পথে পড়েছিল কত যে চরণরেখা,
ধূলায় সকলি ভরিয়া গিয়াছে আজি;
নবমীর নিশি কাঁদি' যে গিয়াছে চলে'—
বিজয়াবাদ্য তাই উঠিয়াছে বাজি'।

বসন্ত কাল সন্ধ্যায় এসেছিল,—
রজনীপ্রভাতে শ্রাবণের ধারা ঝরে,
কোকিল পাপিয়া কখন যে গেয়েছিল—
জেগেছিল যারা, আজ তারা গেছে মরে'।
কাল সন্ধ্যায় বেজেছিল যেই বাঁশী,
থেমে সে গিয়েছে—আর বাজিবে না জানি—
শ্মশান রহিল ভীষণতা লয়ে জাগি'—
নিভে গেছে দীপ কাল রাতে আলো দানি'।

ভারতবর্ষের আধুনিক গবেষণা

শ্রীপ্রমথনাথ পাল

আজকাল আমাদের দেশে নানাজনে নানা ভাবে রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। কিন্তু এই প্রকার গবেষণা পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ এই প্রকার গবেষণা-কার্য্যের সূত্রপাত করেন। জোন্‌স্ কেবলমাত্র আইনজ্ঞ ছিলেন না, তিনি বহুভাষাবিৎ ও প্রাচ্যদেশীয় বহু বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। জোন্‌স্ এদেশে আসিয়া সংস্কৃত ও অন্যান্য বিষয়ে অনুশীলন করিতে করিতে প্রথমে গবেষণা বিষয়ে এদেশীয় লোকের অনুরাগের অভাব লক্ষ্য করেন। তিনি কলিকাতার ইউরোপীয় পণ্ডিত ব্যক্তির সহিত এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেন এবং ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কলা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যাহাতে গবেষণা-কার্য্য আরব্ধ হয় তিনি সেজন্য সচেষ্ট হন, তাঁহার চেষ্টার ফলস্বরূপে 'এসিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপিত হয়।

তৎকালে এই 'এসিয়াটিক সোসাইটিই' ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের একমাত্র সমিতি ছিল। হেনরী টমাস্ কোলব্রুক এক সময়ে এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে "Asiatic Society of Great Britain and Ireland" নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতি পরে "The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland" নাম ধারণ করে। লণ্ডন নগরে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হইলে, কলিকাতার সোসাইটি Asiatic Society of Bengal নামে অভিহিত হয়। পরে লণ্ডনের সোসাইটির শাখারূপে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কলম্বো ও সিঙ্গাপুরে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "Agricultural Society of India" নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি "Agricultural and Horticultural Society of India" নাম ধারণ করে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে "Natural History Society" নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন Medical Society স্থাপিত হয় নাই, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে "Indian Medical Gazette" নামে একখানি কাগজ বাহির হইত, তাহাতেই কেবল চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রকাশিত হইত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কলিকাতার টাঁকশালে কয়েকজন মেডিক্যাল অফিসার, সারভেয়ার ও এসেসর নিযুক্ত হন, তাঁহারাই আধুনিক যুগের প্রথম রাসায়নিক।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ল্যাম্বটন যে Trigonometrical Survey আরম্ভ করেন তাহাই ভূতত্ত্ব বিষয়ে প্রথম গবেষণা। ইহা কেবলমাত্র ভূতত্ত্ব বিষয়ে নহে, বিজ্ঞানান্তর্গত বিষয়গুলির মধ্যে ইহাই বোধ হয় প্রথম গবেষণা।

উদ্ভিদ্ বিদ্যার চর্চ্চা আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হয়। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপিত হয়। আলেকজাণ্ডার কিড্ প্রথম এই গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য এত প্রসার লাভ করে যে, সেই সময়ে কাজের সুবিধার জন্য মিউজিয়ম এ্যাক্ট্ পাশ হয়। ফলে এক Board of Trustyর হস্তে ইহা সমর্পিত হয় এবং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম গঠিত হয়।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম আকাশ সম্বন্ধীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হয়। এই বৎসর প্রথম মান্দ্রাজে Astronomical Observatory (মানমন্দির) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী আলিপুরে মানমন্দির স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে আকাশতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ সার্ভে অফিসে সম্পন্ন হইত।

কৃষিবিভাগ, বনবিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ, পশু-চিকিৎসা বিভাগ অনেক পরে স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে শিলংএ, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ ও নাগপুরে এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বাংলায় কৃষিবিভাগ খোলা হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পুষায় কৃষিবিদ্যা বিষয়ে গবেষণাগার স্থাপিত হয়। পশুচিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পুণা সহরে "Imperial Bacteriological Laboratory" খোলা হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই পরীক্ষাগার মুক্তেশ্বরে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইহার

"Imperial Institute of Veterinary Research" নাম হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দেরাদুনে "Forest Research Institute" স্থাপিত হয়। চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য কসৌলিতে "Central Research Institute" এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মার্কিন ধনকুবের রকফেলার (Rockfeller) প্রদত্ত অর্থে "All India Institute of Hygiene and Public Health" স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল কলিকাতায় "School of Tropical Medicine" এবং বোম্বাইতে "Haffkine Institute" স্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় সবই সরকার প্রদত্ত অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ইহা ছাড়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জেমশেদজী টাটার দানের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালোরে "India Institute of Science" স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অনেক পূর্ব্বে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল সরকার "Indian Association for the Cultivation of Science" (ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা) স্থাপন করেন। এই বিজ্ঞান সভায় পদার্থ বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে গবেষণা হয়। এই বিজ্ঞান সভার গবেষকরূপে স্যার সি, ভি, রমণ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এই প্রকারের আরও একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আছে, তাহা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার নাম বসু বিজ্ঞান মন্দির।

উপরে যতগুলি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা গেল, তন্মধ্যে, প্রদেশ হিসাবে বাংলা প্রদেশেই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অধিক। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলা দেশেই প্রথম আধুনিক গবেষণার সূত্রপাত হয়।

বাঙ্গালার শিক্ষক

শ্রীসুধাংশুশেখর বাগ্‌চী

অতি ন্যায়-পথ মহান্ উচ্চ ভাবিয়া জীবন প্রাতে,
করিনু বরণ করিয়া তুচ্ছ, অর্থ আগম যাতে।
ভব-অর্ণবে ঘূর্ণি সৃজিয়া অভাব করিল দেখা,
যৌবন-বন-স্বপ্ন-সুষমা টুটে যেন জল-লেখা।
বিদ্যার ঝুলি করিয়া স্কন্ধে শিশুদেবতার তরে
চলি দশটায়—কলুর বলদ—বিদ্যাদেবীর ঘরে।
আসর জমাব বেদীর উপর বসিয়া মনেতে ভাবি,
সিকায় তোলা অন্নের স্থালী অন্ন করে যে দাবী।
কষাইতে আঁক শূন্য হেরিয়া শূন্য নয়নে চাই,
ইতিহাসে আঁকা গয়লার টাকা, রাজার নাহিত ঠাঁই।
শূন্য-উদর—মর্ম্ম-বেদনা শিশুদল জানে ভাল,
জীবনের সাথী পৃষ্ঠের দাগ গভীর নিকষ-কাল।
ঘণ্টার পরে ঘণ্টা বাজিতে ছুটি নিজ নিজ ক্লাসে,
বিদ্যা লুকায়, ছাত্রের দল দেখি কাঁপে ঘন ত্রাসে।
বাঁচে হাঁফ্ ছাড়ি বাজিলে চারিটি আমাদের পালা শেষ,
ন্যায়পথে চলি, শুধু গোঁজামিলে জীবন কাটিছে বেশ।
বাহিরে পাওনা-ওয়ালার দল, ঘরে ছেলে মেয়ে আরও,
বিদ্যা-আলয়ে উপরিওয়ালা, স্কুলের স্বামী—যারও
ধারিনা কখন স্বপ্নেও ধার,—শোনায় দু'চার কথা,
পকেটে হজম বিচারবিহীন্ করি মরমের ব্যথা।
রাখিতে বজায় চাকুরি সাধের করি জুয়াচুরি কত,
ন্যায়ের নামেতে উঠে জড় হয়ে অন্যায় স্তূপ শত।
অর্থ অভাব আনে অনর্থ, স্বার্থে খুঁজিয়া মরি,
শিখাইতে চাই, কি শিখাব ছাই, অভাবের কথা স্মরি।
বরিয়া দৈন্য দীন নগণ্য শিক্ষাতন্ত্রী নাহি
দিন গুজরান করি কোন মতে অনাগত পানে চাহি।
নাহিক স্ফূর্ত্তি দীনের মূর্ত্তি, কঙ্কাল ঢাকি সার্টে
দীনতার প্রাণে অভিশাপ ঘোর কোন মতে দিন কাটে।
তবুও গর্ব্ব—শিক্ষার ভার লয়েছি স্বেচ্ছাক্রমে
মহৎ উদার কর্ম্মের সেরা, দুষি নাক নিজ ভ্রমে।
খাওয়া আর শোওয়া পালা শেষ করা কোনমতে প্রতিদিন,
শিক্ষক মোরা দেশের গর্ব্ব স্বাস্থ্য-বিহীন।

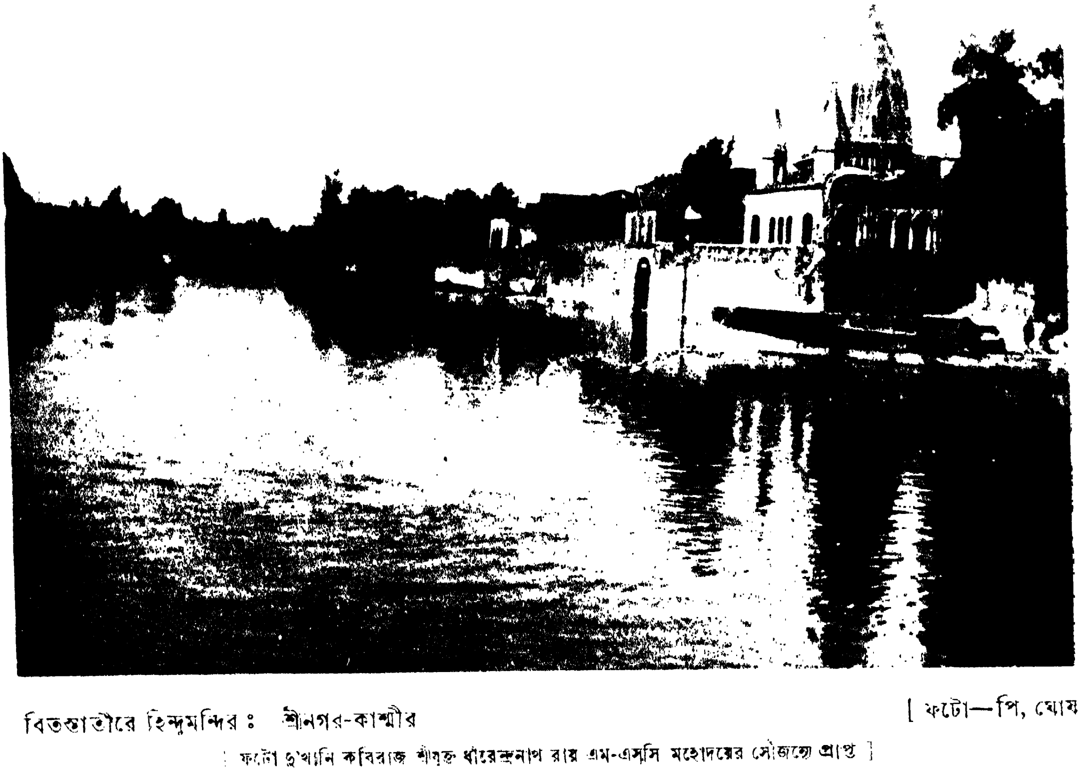








সমুদ্রে সন্ধ্যা : পুরী [ফটো—আর মিত্র



বিতস্তাতীরে হিন্দুমন্দির : শ্রীনগর-কাশ্মীর [ফটো—পি, ঘোষ

[ফটো দুখানি কবিরাজ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় এম-এসসি মহোদয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

পরিবর্ত্তন

(গল্প)

শ্রীচন্দ্রিমা দেবী (সান্ন্যাল)

রিক্তা বহুকাল বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান হিসেবে একচেটিয়া আদর-আবদার উপভোগ করবার পর, হঠাৎ অভাবনীয়রূপে জন্মগ্রহণ করল তার চার-পাঁচটি ভাই-বোন। সহসা মা ষষ্ঠীর এই অযাচিত দানের ফলে সংসারে দাঁড়াল অতি সাধারণ অবস্থা—অর্থাৎ মা ষষ্ঠীর এতগুলি পোষ্যের চ্যাঁ-ভ্যাঁ-তে চিরচঞ্চলা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বেশ খানিক বিরক্ত হয়ে, খুব অল্পদিনের মধ্যেই "বেআক্কেলে" ষষ্ঠীবুড়ীকে অকথা-কুকথা শুনোতে শুনোতে বৈকুণ্ঠের পথেই পা বাড়ালেন। যাবার সময়ে সবই তিনি বাড়ী ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেলেন, কিন্তু অবশিষ্ট যেটুকু ক্ষমতায় কুলাল না, সেটুকু হচ্ছে—রিক্তার মায়ের মুখের তৃপ্তিভরা হাসি। রিক্তা কিন্তু সবের আড়ালে নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বস্বান্ত দেখলে। যে মা রিক্তা বই কিছু জানতেন না, সেই মা এখন যেন কেমন হয়ে গেছেন! সর্ব্বক্ষণ রান্নাঘর আর একপাল ছেলেমেয়ে নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন। রিক্তা মরল, কী বাঁচল, সেটুকু দেখবার যেন কোনো প্রয়োজনই নেই। সুতরাং সে আজকাল মায়ের রাজ্যের সীমানার ধারেও যায় না। পাড়ায় ঘু'রে বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-চৈ ক'রে আর পড়ার বই নিয়ে দিনগুলো কাটিয়ে দেয়। বাড়ী ফি'রে গায়ের ঝালগুলো ছোট বোনদের ওপর ঝে'ড়ে একপেট খে'য়ে, পরম নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে বিছানায় গিয়ে পড়ে।

রিক্তার নীচে যে বোনটী, তার নাম টুনটুনী, বয়স বোধ হয় দশ পূর্ণ হয়ে এগারয় পড়েছে। তার পরেরটি বুলবুল, সাত বছরের। তারপর দুটি ছেলে।

টুনটুনী মায়ের কাজের সাহায্য করে। দিদির ক্ষুদ্র এলাকাটি যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখে। এর পুরস্কারস্বরূপ দিদির কাছ থেকে পাওনা হয় কতকগুলো অহেতুক গালমন্দ।

সংসারের অনটনটা যখন রিক্তার মায়ের চোখে নিতান্তই দৃষ্টিকটু ঠেকল একদিন; মা ভাবলেন, বড়খুকীর ইস্কুল যাওয়াটা এখন না হয় বন্ধ থাক। বড়খুকীর কানে সে কথাটা উঠতেই, তার হাবভাব দেখে মনে হ'ল—যেন এই বুঝি চল্ল সে আত্মহত্যা করতে! কিন্তু আত্মহত্যার সাজসরঞ্জাম হাতের কাছে না পে'য়েই বোধ হয় পা ছড়িয়ে দুই বছরের কচি খুকীর মত কান্না জু'ড়ে দিল।

দিদিকে অসহায়ের মত কাঁদতে দে'খে টুনটুনী বললে—"না হয় গেলই বাপু ও, কেন তুমি বারণ করছ ওকে? আহা ওর ইস্কুলের মাইনে কটিতে যেন সংসারের দেনা মিটিয়ে পয়সা উপচে পড়বে! তা ছাড়া ওরও ত সাধ হয়!"

টুনীর দেওয়া কথার খোঁচাটুকু রিক্তার বুদ্ধিতে প্রবেশ করল না। সে ভাবল, মাকেই সব বকুনিটা দেওয়া হল। কাজেই টুনীকে মনে মনে এ সময়ে প্রশংসা করতেও দ্বিধা বোধ করলে না সে। কিছু পরে চোখের জল মু'ছে বললে, "সে বুদ্ধি মা'র থাকলে ত? মা মনে করে, যত সাধ ওঁর একলার!"

মা এতক্ষণ চুপ ক'রে দুই মেয়ের চরিত্র পরখ করছিলেন। রিক্তার শেষের কথাটিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফে'লে ম্লান হে'সে বললেন, "আচ্ছা মা, তুই যাস্!"

ভেতরের অনলোচ্ছ্বাসকে বাইরে প্রকাশ না ক'রে রীতিমত গম্ভীর মুখে রিক্তা চ'লে যে'তেই, টুনী অবাক্ হ'য়ে গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ব'লে উঠল, "এম্নি করেই মাথাটি খেয়েচো মা তুমি ওর!"

মা আর একবার হে'সে বল্লেন, "ওমা! তুইই যে বল্লি, যেতে দাও, ওরও নাকি সাদ-আহ্লাদ আছে!"

মুখখানি গম্ভীর ক'রে, টুনী বল্ল, "বুঝলে না? আমি ভেবেছিলুম, তুমি আমার কথা শু'নে আবার বুঝিয়ে বলবে। তাতেও যদি না হয়, তখন আমি বেশ খানিক দু'চার কথা শুনিয়ে দিতুম আজ দিদিকে! তুমি যে আদর দিয়ে মাথা এমন খে'য়েরেখেছ—তা ত ছাই আমি জানতুম না! দাও বাপু আমায় এক খাবল তেল। ছানটা যদি এখন না সারি ত পরে আর কোন মতেই হবে না। দেখ

দিকিন ঐ কোলোঙ্গায় সেদিনকার সেই সাবানের টুকরো-টুকু আছে কিনা? খোকামণির ন্যাকড়া কে'চে শুকিয়ে রেখেছিলুম—"

মা মেয়ের একটা কথাও শুনতে পাননি বোধ করি। অন্যমনস্ক দৃষ্টিটাকে মেয়ের চোখের ওপর সস্নেহে নিবদ্ধ ক'রে বললেন, "হ্যাঁ মা টুনী, তোর কী পড়তে সাধ যায় না?"

টুনী পায়ের ওপর খানিক সরষের তেল ঢে'লে রগড়াতে রগড়াতে বললে, "আহা, তাই বুঝি! রেতের বেলায় রামায়ণখান সুর ক'রে কে পাঠ করে শুনি?"

মা বললেন, "দুর্, ওকে কী আবার পড়া বলে? যেমন ক'রে তোর দিদি জুতোমুজো এঁটে, ঘুরিয়ে কাপড় প'রে, গাড়ী চ'ড়ে পড়তে যায়, তেমনি?"

টুনী ফিক্ ক'রে হে'সে বললে, "দিদি যে ম্যাম্ সায়েব গো!"

মা অনেকক্ষণ টুনীর কোঁকড়া চুলের দিকে চে'য়ে চে'য়ে বললেন, "চ' আজ তোর চুল বেঁধে বড়খুকীর একটা কিলিপ এ'টে দি'।"

টুনী ত্রাসে দুই হাত মাথায় চে'পে বল্ল, "দিদি বুঝি আস্ত রাখবে আমায়! তোমাকেও দু'খান করবে—"

বড়খুকীর স্বার্থপরতা মায়ের অবিদিত নয়। তবু বল্লেন, "কেন? ওর ত চারটে আছে! চারটেই কী এক-সাথে আঁটে নাকি?"

টুনী বল্ল, "তোমার ইচ্ছে টের পে'লে চারটে একসঙ্গেই পরবে।"

মা বললেন, "না, তুই চ'।"

টুনটুনী তেলের বাটীটায় ঠেলা মে'রে দেয়ালের কাছে সরিয়ে রে'খে, মায়ের মুখের প্রতি চে'য়ে ম্লান হে'সে বললে, "নাঃ, থাক্! অত সখে কাজ নেই বাপু আমার!"

মেয়ের সরল মুখখানির দিকে চে'য়ে, মায়ের বুক থে'কে উ'ঠে এল একটা সুনিবিড় দীর্ঘশ্বাস। তাড়াতাড়ি তিনি রান্নাঘরে ঢু'কে পড়লেন। এমন সময়ে বুলবুল হাঁপাতে হাঁপাতে এ'সে উঠোনের মাঝখানে একটা তরকারীর ডালা নামিয়ে রে'খে বলল, "ওঃ মাঃ, বাবা বাজার পাঠিয়ে দিল আমার হাতে।"

মা রান্নার চালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "কেন, এলেন না যে?" বুলী একমুখ কড়াইশুঁটী চিবুতে চিবুতে উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ডালার ওপর কপির ফুলে মস্ত বড় একটা পোকার দিকে নজর পড়ায়, ডালারই একখানা কঞ্চি ভে'ঙে নিয়ে পোকাটার উচ্ছেদসাধন ক'রে, চিবুনো কড়াইশুঁটিটুকু গি'লে ফে'লে বল্ল, "বাবা বললে, আপিসের দেরী হবে।"

"দেখ দিকিন! এমন করলে শরীল কী টে'কবে? আজকেও দু'টি চাল মুখে পড়ল না!" বুলবুলের মায়ের চোখ দু'টি সজল হ'য়ে উঠল। বিমনাভাবে তিনি আঁচলে চোখ মুছলেন। কলতলা থেকে উঠোনে এ'সে ভিজে গামছা নিংড়াতে গিয়ে টুনটুনীর নজর পড়ে মায়ের চোখের ওপর। কাজ অসমাপ্ত রে'খেই সে উদ্বিগ্নচিত্তে মায়ের আঁচল চে'পে, একদৃষ্টে মায়ের মুখের প্রতি চে'য়ে রইল। চোখোচোখি হতেই, মা চোখ নামিয়ে নিলেন। টুনী বলল, "মাগো, তুমি কাঁদছ, না?"

মায়ের ব্যথাসিক্ত অন্তরে করুণাময়ী কন্যার বাণীগুলি যেন স্নেহপরশ বুলিয়ে দিল। বললেন, "না মা, কাঁদব কেন?"

টুনী বল্ল, "মা, বাবা আজকেও না খেয়ে আপিস গেল বুঝি?"

মা নিঃশ্বাস চে'পে উত্তর করলেন, "বুলী এ'সে তাই বললে।"

হঠাৎ মা ও মেয়ের কথোপকথনে বাধা প্রদান ক'রে জুতো খটখটিয়ে এ'সে রিক্তা দাঁড়ায় একেবারে রান্নাঘরের মধ্যে। মা বল্লেন, "হ্যাঁ মা বড়খুকী, এম্নি ক'রে কি হেঁসেলে জুতো পায়ে দাঁড়ায়?"

"তা, কোথায় দাঁড়াব? বাড়ীতে ঠাঁই নেই ত একরত্তি! যা কাণ্ড ক'রে রেখেছেন তোমার ছেলেমেয়েরা—এখানে জুতো, ওখানে তরকারী, ওদিকে ময়লা নেকড়া—" কথা অসমাপ্ত রে'খেই রিক্তা ঠোঁট বাঁকাল। বুলবুলী হাঁ ক'রে দিদির মুখ-ভঙ্গিমা দেখছিল। ছেঁড়া নেকড়ার উল্লেখে তারও নজর পড়ল সেদিকে; দু' আঙুলে সেটা তু'লে ধ'রে সে বল্ল, "মা, শুনলে, মেয়ের কথা? দিদির আবার সবই নবাবীয়ানা। এটা ন্যাকড়া? এটা ত খোকামণির ইজের!"

"হ্যাঁ, ইজের! চুপ করে থাক! আমার কথার ওপর জবাব দিলে মে'রে গাল ভে'ঙে দেব!"

বুলী এবারে বাস্তবিকই ভয় পে'লে এবং তার সেই ভয় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল উঠোনের মাঝখানে। বেশ খানিক ব্যবধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফাতে লাফাতে সে বল্ল, "মার দিকিনি? মার না! পালিয়ে যাব বুঁচীদের বাড়ী, হুঁ!" ব'লে সত্যিই সে এক লাফে দরজা পার হ'য়ে রাস্তার জনতার মধ্যে আত্ম-রক্ষা করলে। খোলা দরজার মধ্যে একটা তীব্র জলন্ত দৃষ্টিপাত ক'রে রিক্তা বল্লে, "সদ্য একটা জানোয়ার!" বোনের উদ্দেশ্যে মন্তব্য শেষ ক'রে, অবশেষে মাকে লক্ষ্য ক'রে রিক্তা এইবার খিঁচিয়ে ওঠে, "কই, আজ ভাতটাত দেবে, না, তাও টুনীর পরামর্শ চাই?"

টুনটুনী দিদির বাড়া ভাতে একছিটে ঘি দিতে দিতে বলল, "মা, কাল আর দিদির ঘি-আলুভাত খাওয়া হবে না, ঘি ওদিকে যে বাড়ন্ত! নাও, হয়েছে! আলু-ভাতটা চট্‌কে দাও! ঐ দেখ, দিদি কেমন চেঁচাচ্ছে!"

খাওয়া সমাপ্ত ক'রে রিক্তা বলে, "টুনী, দোরগোড়ায় জ্যাকেট, পেটিকোট রে'খে গেলাম, সাবান দিতে ভুলেছ কি ঝুঁটি ধ'রে নে'ড়ে দোব বাড়ী ফি'রে!" আর সে অপেক্ষা করে না।

"দোব গো, দোব!" ব'লে টুনী ঘটি থেকে আলগোছে এঁটো হাতে জল ঢে'লে দোর বন্ধ করবার জন্যে দিদির সঙ্গে আসে। পেছন পেছন মা'ও উঁকি মারেন। রিক্তা মোড়ের মাথায় মি'শে যায় ভীড়ের মধ্যে। মা ও মেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার ফি'রে যান সংসারের যাঁতাকলের মধ্যে।

পঞ্চাশ টাকা চার আনা আয়ের সংসার,—সাতজন অন্নগ্রাহী। কলকাতা সহরে বাড়ী ভাড়া, খাওয়া ও পরায় বেরিয়ে যায় আটচল্লিশ টাকা, বাকী থাকে দুটাকা চার আনা। এর ওপর খরচ রিক্তার ইস্কুলের মাইনে, বই, জুতো, ফিতে, কাঁলিপ, — সর্ব্বোপরি দিদিমণিদের (মাষ্টারণীদের) বারমেসে চাঁদা, সেটা নাকি না দিলেই নয়!—এতে মাস গেলে ধার হয় প্রায় গোটা দশেক টাকা। এমনি ধারা যাদের সংসার, তাদের বাড়ীতে এলেন মহামান্যা অতিথি; যদিও দূর সম্পর্কের, তবু উপস্থিত পরমাত্মীয়া। বরাবর তিনি কাশীতেই থাকতেন ভাইর কাছে, দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপর ধর্ম্মশালায়। সম্প্রতি পুত্রবিয়োগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়েরও "জ্ঞান গম্যি"র বিয়োগ ঘটল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই তিনি বোনকে একদিন বিল্লিপত্তর গুঁকিয়ে দিলেন। এখন একমাত্র সহায় রিক্তার বাবা—"বড় আদরের সোণার চাঁদ একমাত্তর বংশধর বাবা রামপদ!"

ইদানীং টুনটুনীর ঘাড়ে অনেক কাজ পড়েছে। ভোর চারটায় উ'ঠে ঠাকুমার গুলের ডিবে না পে'লে বড় কষ্ট হয়। খাওয়াটা দিনের বেলা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হ'লেই হয় ভালো। হরিনামের মালাটা প্রায় সময়েই হারিয়ে, টুনীর বকুনী খাওয়ার পথ পরিষ্কার ক'রে রাখে। বুলী ত আর টুনীর মত ধৈর্য্যশীলা নয়, বুদ্ধিও তার টুনীর মতে অনেক কম। তাই সে একদিন ব'লে ফেলেছিল, "ঠাকুমা, তোমার যখন মালার ঠিক্ থাকে না, তখন অমন মালা না জপলেই পার!"

টুনটুনী তাড়াতাড়ি চিমটি কে'টে বোনকে থামিয়ে দিয়েছিল। সেদিন বিকেল বেলা ঠাকুমা উঠোনে পা ছড়িয়ে বুলবুলীর রুক্ষ চুলের জট খুলছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা বুলীকে নানান্ উপদেশও দিচ্ছিলেন। একটা কথা তিনি বুলীকে ভালো ক'রে শিখিয়ে দিলেন, চাকর-বাকরকে বিশ্বাস ক'রে বাজারের পয়সা হাতে দিতে নেই; তা'রা যদি বলে বেগুন তিন পয়সা সের—তখুনি মনে বু'ঝে নিতে হবে, আসলে দেড় পয়সা সের। ভবিষ্যতে বুলী যেন বাজারের পয়সার অবশিষ্টাংশ জমা করে। বুলীর একটি মহৎ গুণ ছিল, সে কখন নির্ব্বিবাদে কোন কথা শু'নে যে'তে পারত না, তার জবাব যেন তাকে দিতে হবেই। ঠাকুমার কথায় সে বল্ল, "আহা, ঠাকুমা যে কী বলো? তুমি বল্‌ছিলে সেদিন, মা বাজারের পয়সা জমা করে না। আঃ, বাজারই

ত আসে মোট দশ পয়সার, আমি যেন জানি না! কী বাঁচে? বাবা বল্‌ছেলো, বাজারে ত আমাদের ধার হয়। আর আমারও ত বাবার মতন লোকের সঙ্গেই বে' হবে, মাস গেলে বাড়ীতে ধারই হবে, জমাব কী?" ঠাকুমা নাতনীর এই দীর্ঘ বক্তৃতায় স্তম্ভিত হ'য়ে বল্লেন, "ওঃ, ছিকো! হাঁলা তুই কী? নিজের বিয়ের কথা নিজে মুখে বলতে হয়?" বুলী আবার এক ছটাক গুণ প্রকাশ ক'রে ঠাকুমাকে থ' করলে, "নাঃ, নেই আবার—"

এমন সময়ে সান্ধ্যবেশে পাশের ঘর থেকে রিক্তাকে বেরোতে দে'খেই, ঠাকুমার নজর পড়ল তার প্রতি। তার রূপসজ্জা দে'খে বল্লেন, "উকি রে, চুল ক'টা যে গেল! সব সময় বেণী ক'রে থাকিস কেন র‍্যা? আর তাও বলি— এত সাজগোজ কিসের লেগে? কোথাও যাওয়া নেই, আসা নেই, মট মট ক'রে ভালো কাপড়গুলো ভাঙতে মায়া করে না? আচ্ছা তাও যেন গেল, কিন্তু সোমত্ত মেয়েকে এতটা 'ভাবন' করতে দেখলে পাড়ার সাতজন কী বলে জানিস্?"

এতগুলি প্রশ্নের মধ্যে মাত্র একটিরই উত্তর দেওয়া উচিত ভে'বে, রিক্তা নিরুত্তরে দোরের হুড়কোটি খু'লে ঠাকুমার দিকে ফি'রে বল্ল, "কে বলেছে যাওয়া নেই, আসা নেই? এই ত যাচ্ছি, ঘণ্টা দুই পরে আসব।"

ঠাকুমা বিষম অবাক্ হ'য়ে বল্লেন, "হাঁলো, তুই এমন ক্যানে? এতটুকু হায়া নেই? কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? রোস্—অঃ বউ, একখানি কাপড় জড়িয়ে তুমিও সঙ্গে যাও বাপু!" বুলবুলী বল্লে, "ও ঠাকুমা, এখানে সবাই অমন যায়—" ঠাকুমা বল্লেন, "হ্যাঃ, যায়! কারা যায় শুনি? অমন নয়! অঃ বউমা, বাপু তোমারও কী একটুক্ হুঁস হয় না! রও, রামা আজ বাড়ী আসুক!"

রিক্তার মা খুবই গ্রাম্য ভাবাপন্ন, অর্থাৎ পুরাকালের নিয়মগুলি অন্ততঃ নিজে কলকাতা সহরে থেকেও খুব বজায় রে'খে এসেছেন। এইবারে তিনি ঘোমটার আড়াল থেকে বল্লেন, "ওর বাবা মত দিয়েছেন জেঠিমা, আমি করব কী?"

ধন্যি বাপু একালের বাপ! আমাদের কাল হলে—" কী যে হ'ত সেটা আর বলা হয় না। ঠাকুমা ফট্ ক'রে মুখ ঘুরিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে খানিকটা গুলের পিক্ ফেলেন। রিক্তা শাড়ীর আঁচলটা পরিপাটী ভাবে গুছিয়ে বললে, "দেখ ঠাকুমা, এ তোমার শালুকপুর গাঁ নয়। আর বাবা একালের লোক, জানো?" ব'লে নির্ব্বিবাদে বেরিয়ে গেল।

ঠাকুমা অবাক্ হ'য়ে গালে হাত দিয়ে বল্লেন, "বোঁট্টার বাড়ি তোর একালের মাথায়! আমাদের মেয়ে হ'লে আঁশবটি পে'ড়ে কাটতুম! বলি পাড়ার নোকেই বা ছি-ছি দেবেনা কেন?" মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ঠাকুমা কার কাছে ছিছি-ক্কারটা শুনলেন—জানা গেল না।

বুলবুল বল্ল, "ঠাকুমা এতেই, দিদির বন্ধুদের দেখলে না জানি কী বলতে!"

ঠাকুমা বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে বল্লেন, 'চুপ কর। তোদের যা তা বক্‌বকানি সত্যি হয় না বাপু! যত সব আদিখ্যেতা—" বুলবুলের মাথায় যে ক'গাছি চুল ছিল, সবক'টি একসঙ্গে এঁটে মাথার ওপরে সযত্নে কাক-খোঁপা বেঁধে দিয়ে, পিঠে একটা ঠেলা মে'রে ঠাকুমা বল্লেন, "যা, শাঁখ বাজিয়ে পিরদীম ঘরে তোল্। ও আক্কেলখাগীর মত তোদের আর 'ভাবন' করতে হবে না।" ঠাকুমার বাঁধা চুল বুলবুলের পারত পক্ষে পছন্দ হয় না। সে দাঁড়িয়ে, মাথায় হাত দিয়ে দেখছিল, সেখানে সিঁথির কোন চিহ্ন আছে কি না। ঠাকুমার টিপ্পনী শু'নে বলল, "তা সিঁথি করতে দোষ কী?"

ঠাকুমা বল্লেন, "দোষ-গুণ তুই বুঝবি কী লা? যা বলি —ভাল মানুষের বিটির মত কর্। এখন হতে সিঁতি করলে চওড়া হয়ে যাবে। বে' হবে যখন, তখন কি টাকের মধ্যে সিঁদুর পরবি? নে এক ঘটি জল খো ওখেনে।"

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে রিক্তা বাড়ীর মধ্যে ঢু'কেই ডাকল, "মা, ওমা! শীগ্‌গির চাবী দাও! ওদের দেরী হচ্ছে। ওরা দাঁড়াবে না।" ঠাকুমা দন্ত প্রক্ষালন করছিলেন; বললেন, "কে দাঁড়াবে না লো?" জুতোর বোতাম খুলতে খুলতে ব্যস্ততা সহকারে রিক্তা বলল, "তুমি চিনবে না; মন্টুদা'রা—"

"সেডা আবার কে?"

"আঃ, চিনবে না বলছি, তবু 'সেডা কে'?"

"তা, এত তাঁড়া কিসের, যাবি কোথা ?"

"বাবা, বাবা! তোমার সঙ্গে বকতে পারিনা বাপু! তুমি উচ্চারণ করতে পারবে? সিনেমা, সি-নে-মা, কী বুঝলে ?"

"নাঃ, আমি উচ্চোরোণ পারব না! বলি সে কী ?"

"ওমা, যদি উচ্চোরোণই পারবে ত, সেটা কী বুঝতে পারছ না? পরদায় ছবি দেখায়—ছ বি, বুঝ্‌লে এবার ?"

"তা আর জানি না? শিবপুরে লালুদের বাড়ী মাথায় ব'য়ে নি'য়ে বেড়াত না, সেই ছবিওয়ালারা, লালুরা ফুটোর মধ্যে চোখ রে'খে দেখত সব! আমি আবার জানি না! যাবি কার সঙ্গে? যাবার আবার আছে কী? দোরগোড়ায় ডে'কে আন্‌ না,—চার পয়সা দিলে টুলী, বুলী, ঘ্যাণাও দেখবে 'খনি—"

"কাকে দোরগোড়ায় ডে'কে আনব? তোমার যেমন! দাঁত মাজ্‌ছ, দাঁতই মাজ না বাপু। মা! মা—এই টুনী!—এবারে কেনা লাল শাড়ীটা বে'র ক'রে দে শীগ্‌গীর!

ঠাকুমা ডাকলেন, "বউ, অঃ বউ! এখেনে আমার সুমুখে এ'সে দাঁড়াও তো একবার।"

বউ এ'সে দাঁড়ালে, তিনি স্বর নিম্ন ক'রে বললেন, "দেখ! ধিঙ্গী মেয়েটারে যেখেনে সেখেনে ছে'ড়ে দাও, বলি খবরের কাগজে নাম উঠ্‌বে যে! তখন আদালতে ছুটবা? বলি কী, ভুলিয়ে যদি অমন ক'রে নিয়েই যায়, যায় না কী? যে ছবি সবাই বাড়ীর দুয়োরে দেখে, সেই ছবি দেখতে উনি চলেছেন মন্তুদাদা, না ঘন্তুদাদা—কেনার সাথে? বলি ই-কী? বল্‌ছি, তাও গেরাহ্যিই নেই—"

বউ অতি কষ্টে তাঁকে যখন বোঝালেন, সে ছবি দোর-গোড়ায় দেখে না, পয়সা দিয়ে চেয়ার কি'নে, একটা বাড়ীর মধ্যে দেখতে হয়; তখন বললেন, "পোড়ার দশা! আটগণ্ডা পওসা খরচ ক'রে সেই ছবি দেখ্‌বা? কেনে! সেই পওসা ক'টি জমালে কাণের একটা দুল হয় না?"

বারুদ বিস্ফোরণের মত চীৎকার ক'রে রিক্তা বলল, "কী হয় না? দুল! আট আনায়? বাজে বোকো না ঠাকুমা, ও সব না-যে'তে দেবার ফন্দি!"

মা মেয়ের হাত টে'নে বললেন, "যখন বারণ করছেন, তখন না-ই গেলি আজ বড়খুকী? গুরুজনদের কথা অমান্যি করতে হয়? ছিঃ মা, কথা শোন্‌!"

রিক্তা একটানে বিনুনি খু'লে ফে'লে, বিড়বিড় করতে লাগল, "বাবাঃ, বুড়ী এ'সে থেকে স্বস্তি নেই! কার বাড়ীতে এমন বে-আক্কেলে মেয়েমানুষ আছে!" ছোট্ট ভাইটা দিদির হাঁটু বে'য়ে উঠছিল, পায়ের ঠেলা দিয়ে রিক্তা তাকে সরিয়ে দিলে!

ঠাকুমা রিক্তাকে সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দে'খে নিশ্চিন্ত মনে সদর দরজায় হুড়কো এঁটে দিয়ে বললেন, "বলি হাদে ত্যাখ্‌, মেয়েমানুষের জগদ্ ঐ হেঁসেল ঘরে। বাছা, বিয়ে হ'লে এদ্দিন সংসার সামলাতে হ'ত! তোমার বয়স ত কিছু কম নয় মা? বউ, কত হ'ল, বছর আঠার হবে না?"

রিক্তা চেঁচিয়ে বল্ল, "বাজে বকছ? জান আমার বয়স সবে পনের বছর?"

ঠাকুমা বেশ একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হে'সে বল্লেন, "তুই কী না জানিস? যেটের কোলে পা দিয়ে তা আঠার-উনিশ হবে বৈকি। ঐ দেখনা, বোশেখ মাসে হ'ল আমার পঞ্চুর ছেলে, আর ভাদ্দোরেই ত বউ তুমি আটকা পড়লে, বড়খুকী হ'ল। সেকি আর আজকের কথা,—"

রিক্তা মাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলল, "যেন শুনতে পা'চ্ছ না, আমার বয়স আঠার-উনিশ? আমার বয়েসের হিসেব করতে ওঁকে কে বল্লে?"

মা মেয়ের কাছে স'রে এ'সে বললেন, "তুই চুপ কর্‌ না মা বড়খুকী, উনি বললেই কি আর তোর বয়েস অত হয়ে যাবে?"

সেই সময়ে সদর দরজায় কে খুব জোরে জোরে আঘাত করতেই, ঠাকুমা তাড়াতাড়ি দোর খু'লে দাঁড়ালেন, "কে গা, রামপদ বুঝি?"

একটী ষোল-সতর বছরের ছেলে বলল, "আজ্ঞে না, আমি মনোজ; রিক্তাকে বলুন, বড্ড দেরী হচ্ছে।"

"সে যাবে না গা, তোমরা যাও।" ঠাকুমা বল্লেন।

"নিশ্চয় যাব, তোমার কথা শুনব না।" ব'লে রিক্তা সেই বেশেই দরজার কাছে এগিয়ে এ'ল।

ঠাকুমা দরজা আড়াল ক'রে বললেন, "যা দিকিন্ কেমন তুই যাস্! বেড়িয়ে পা ভেংগে দেব না?"

এমন ক'রে রিক্তাকে কড়া কথা বলবার সাহস, বাড়ীতে কারুর নেই। যুগপৎ অপমান ও অভিমানে ফে'টে প'ড়ে রিক্তা ছু'টে ঘরে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল! সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে টুনী, বুলী এই অভিনয় দেখছিল। দু'জনেই ঠাকুমার ওপর বিরক্ত হ'ল খুব। হাজার হোক, ঠাকুমা অপেক্ষা দিদিই তাদের বেশী আপন ও প্রিয়। বুলবুল টুনটুনীকে আড়ালে বললে, "ছোড়দি, দেখ, রাত্তির বেলায় লুকিয়ে ঠাকুমার ঝুঁটিটা কে'টে দোব?" বুলীর সেদিন ঠাকুমার ওপর রাগ ছিল। কিছু আগেই তিনি তার উঁচু ক'রে তু'লে চুল বেঁধে এক বক্তৃতা দিয়েছেন।

টুনী বল্ল, "চুপ কর্, ঠাকুমা শুনতে পাবে!"

দিন সাতেক পরের কথা। রিক্তা স্কুলে গিয়েছিল: শাশুড়ীর হাতে স্বামীর খাওয়ার ভার দিয়ে রিক্তার মা টুনী, বুলীকে নিয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গাস্নানে।

রামপদকে ভাতের থালা বে'ড়ে দিয়ে জ্যাঠাই হাত-পাখা নিয়ে ব'সেছিলেন মাছি তাড়াতে। পাখার বাতাস তাঁর মনের ভেতর ঝড় তুলছিল। অনেকবারই দমকা কথার স্রোত তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে এ'সেও ফি'রে যাচ্ছিল। আনুকূল্য যেন কিছুতেই পাওয়া যায় না। রামপদ খাওয়া শেষ ক'রে নুন-নেবু মুখের কাছে তুলতেই, তিনি বল্লেন, "হ্যাঁ র্যা, উ কি খাওয়ার ছিরি?" ব'লেই পা দুটি ছড়িয়ে হাতপাখাখান্ মাটিতে ফে'লে দিয়ে, সংক্ষেপে বল্লেন, "তা খাবিই বা কি ক'রে? গলায় বিয়ের যুগ্যি সোমত্ত মেয়ে ঢং ঢং ক'রে ঝুললে—বাপের গলা দিয়ে ভাতের দলা কি নামে?" গলায় বিবাহযোগ্যা কন্যা ঝোলা সত্ত্বেও রামপদর গলা দিয়ে 'ভাতের দলা' নামতে কোনদিনই আটকায় নি। কারণ তাদের স্বামী-স্ত্রীর কারুরই এ যাবৎ মনে হয় নি, যে, কতবড় দায় তাঁদের মাথার ওপর ঝুলছে, এবং সময় সন্নিকট। তাই তিনি একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতেই জ্যাঠাইর দিকে চে'য়ে রইলেন। জ্যাঠাইমা সেদিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। আপন মনেই মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলেন, "এইত আমার পঞ্চুর শালীর হ'ল। ভালো ঘরেই হ'ল; পঞ্চুর শ্বশুর হাজার চারেক খরচও ত কল্লে তেমন!" রামপদ নেবুর খোসা হাতে ঘসতে ঘসতে বল্লেন, "তা নয়ত হ'তই বা কেমন করে? পঞ্চুর শালীকে ত দেখেছি! আজকাল রং-আকৃতীর বাজারে ঐ-ছিরির ওপর ঐ রং-য়ে বিনি-পয়সায় পার হ'তই বা কেমন ক'রে!"

জ্যাঠাই সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লেন, "তা দেখ, তোকেও আর ভাবতে হবে না। এই কালই ত বামুন-গাছির মুখুজ্জেদের গিন্নীর সঙ্গে দেখা হ'ল। দেওরের বিয়ে দিতে চায়, একটি ডাগর মেয়ে হলে হয় ভালো। এক পওসাও নেবেনা। আমিও ঐ তক্কে বড়খুকীর কথাই বল্লুম। বল্লে, দেখে যাবে।"

রামপদ বল্লেন, "ছেলে কী করে?"

জ্যাঠাই বল্লেন, "ঐ শোন! কী আবার করে?"

রামপদ বললেন, হ্যাঁ, কী করে? চুরি-ডাকাতি করে, মারপিট করে, কী, কাজ-কম্ম করে?"

জ্যাঠাই বুঝলেন, ছেলে রহস্য করছে। বললেন, "মো-ক্তা-র। ঘরে ভাত-কাপড় আছে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নে পদা,—এক পওসা নেবেনা, জানিস্?"

রামপদ বল্লেন, "ভাল ঘর-বর হ'লে ত আমার আপত্তি নেই। তবে এখন ও হ্যাঙ্গামায় যাবার মতন অবসর কৈ?" জ্যাঠাই আশান্বিতা হয়ে বল্লেন, "তোকে ভাবতে হবেনা। তুই খালি গওনার টাকা ক'টি ফে'লে দিবি। একেবারে সেই সম্প্রদানের সময় তোকে ডাকব'খনি। দ্যাখ্, তোর জ্যাঠাইর সাড়ে তিনকাল পুইয়েছে। এই হাত দিয়ে কত মেয়ে পার করলাম! গওনার মধ্যে ভরি দশেকের চুড়ি হার,—বিছে হারই টেঁকসই; কাণে বেশ একটি বটফল দিবি; আর সেই যে কী বলে—সেপটিকিন না কি, তাও একটা না হয় দিস্। ঐ নাও, বউও ত এ'ল। বলি অঃ বউ-মা, শোন দিকিন্! বুলী টুনীকে নিয়ে তাদের মা সেইমাত্র দরজায় পা দিয়েছিলেন। গঙ্গাজলের ঘড়াটা টুনীর হাতে দিয়ে বল্লেন, "ধর ত মা, শু'নে আসি।"

তিনি কাছে এ'লে, ঠাকুমা বল্লেন, "বড়খুকীরে কাল আর পাঠশালায় পাঠায়ো না। মুখুজ্জে গিন্নীরে ব'লে আসব আজ সন্ধ্যে বেলায়। কাল এ'সে দে'খে যাবে। এই সুমুখের মাঘেই কাজটা সে'রে ফেলা ভালো।"

রিক্তার মা সবিস্ময়ে ঘোমটার আড়াল থেকে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জ্যাঠাই অবতারণা করেছিলেন, রামপদ শেষ করলেন, অবশ্য মেয়ের মাকে শুনিয়ে, "জেঠির ইচ্ছে—ঘর-বরও নাকি ভালো, আর বিয়ে যখন দিতেই হবে একদিন—তারা বুঝি পয়সা নেবে না" এবং ইত্যাদি।

জ্যাঠাই মনোযোগ সহকারে রামপদের কথাগুলি শুনছিলেন; বল্লেন, "হ্যাঁ রামু, তুই আমার কথা তো বুঝতে পেরেছিস্? আমার ত মুখে অন্ন রোচেনা! যাই বল, তোরা এখনও ছেলেমানুষ, সব জ্ঞান কি হয়েছে? মেয়েটোর মুখেও দেখি তেমন হাসি নেই! বুঝতে পারিনা কি আর? কিন্তু কি করব বল? আমার কি আর সে ক্ষ্যামতা আছে?—" তাঁর ক্ষমতার কী যে প্রয়োজন, রিক্তার মা অনেক চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারলেন না। নাম-ধাম-না-জানা ঘরে মেয়েকে দেবেনই বা কোন্ প্রাণে? চক্ষু-লজ্জার মাথা খে'য়ে তিনি বল্লেন, "কোথায়, কেমন ঘর, ছেলেটিকে না দেখলে—কী বলা যায় জেঠিমা! আগে খোঁজ নিতে হবে, সে কী করে—কী পড়ছে!—"

মুখের কথা কেড়ে জেঠিমা বল্লেন, "তুমি আর ঐ দেমাকী কথাগুলো ক'য়োনি বাপু আমার সাক্ষেতে! মেয়ে-মানুষের এয়োত্তি ভাগ্য সোজা কতা নয়!—কী করে, না-করে—ধরতে হলে—স্বোয়ামীর ঘর করা হয় না। জানো, কথায় বলে - 'কাঠ ঘর দে'খে দিলে ভাত-ঘর হয়, আর—ভাত-ঘর দেখে দি'লে কাঠ-ঘর হয়।' ভাগ্যের কথা তুমি কী বলতে পার?"

এই দীর্ঘ বক্তৃতার পরেও মন্তব্য প্রকাশের সাহস রিক্তার মা'র ছিল না। তাঁকে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকতে দে'খে, জেঠিমা বল্লেন, "বলি, মেয়েটার সঙ্গে আমারও ত কিছু সম্পর্ক আছে? তাকে জলে ফে'লে দেওয়ার মৎলব ত আর নয় আমার!" এর পর আর কোন কথা চলেনা।

দীর্ঘ চার বছর পরে রিক্তা এ'সে দাঁড়াল বাপের আঙ্গিনায়। বিয়ের পর আর সে একবারও আসেনি। সকলেই খুশী হয়ে উঠল তাকে দে'খে। রিক্তা ছোট ভাইটিকে কোলে তু'লে নিয়ে চুমায় চুমায় তার মুখখানি ভরিয়ে দিলে। মা বললেন, "বড়খুকী, জামাই এলেন না যে?"

বড়খুকী বল্লে, "কে জানে কেন? গোমস্তা মশাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।"

মা বল্লেন, "পুজোর সময়ে আসবেন হয়ত।"

সেদিন তাদের অনেক বেলায় খাওয়া-দাওয়া সারা হয়। বিয়ের পর মেয়ে প্রথম বাপের বাড়ী এসেছে। মা এতদিন বড়খুকীকে নিতান্তই খুকী ভাবতেন। আজ তার সিঁদুর-দেওয়া সিঁথির ওপর একটুখানি অবগুণ্ঠন—বার বার মাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল, বড়খুকী আজ বিবাহিতা নারী, আর সে স্বেচ্ছাচারী খুকী নেই। আশ্চর্য্য! বিয়ের পর তার স্বভাবে কেমন একটি মধুর পরিবর্ত্তন এসেছে! মায়ের প্রতিটি কথায় সে যেন কত মমতা ভরে উত্তর দিচ্ছিল। ভাইবোনের প্রতি তার সে স্নেহভরা চাউনি, মাকে মুগ্ধ করছিল।

দুপুরবেলা রিক্তা বোন দু'টিকে নিয়ে ঘরে খিল দেয়। টুনীকে রিক্তার বড় ভাল লাগল। টুনীর চোখে-মুখে শ্যাম-কৈশোরের নব-ছায়া। মুখখানি যথেষ্ট কচি হলেও, বেশ একটি স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের ভাবও ফু'টে উঠেছে। বুলীর যদিও বয়স বেড়েছে, তবু সেইরকম চঞ্চল ছেলেমানুষটিই আছে। রিক্তা নিজের গলা থেকে হারছড়া খু'লে বুলীর গলায় আর দুল দু'টি টুনীর কাণে পরাতেই, টুনী বল্ল, "ছিঃ দিদি, এয়োস্ত্রী মানুষের বিষ্যুৎবারের বারবেলায় অমন অঙ্গ থেকে সোণা খুলতে নেই!"

রিক্তা উদাস মনে উত্তর করে, "আহা, আমার আবার বিষ্যুৎ তার আবার বুধ!" দুই চোখ তার সজল।

টুনী একটু অবাক্ হয়ে বলে, "দিদি, তোর চোখে জল কেন ভাই?"

রিক্তা সজোরে মাথা নে'ড়ে জানাবার চেষ্টা করে—'কিছুই নয়।'

দিদির চোখে ব্যথিত দৃষ্টি, তাও আবার এমন নীরবতার অতলে ঢাকা—

টুনীর উদ্বেগ ক্রমশঃই বে'ড়ে চলে। সেও অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলে, "আমাকে বলবিনে দিদি ?"

রিক্তার ঠোঁট ছ'টি কেঁপে ওঠে ; বলে, "যাকে বলবিনে বল ?" টুনী বলে, "উহুঁ।"

রিক্তা জলভরা ছুই চোখ মাটির বুকে নিবদ্ধ ক'রে বলে, "টুনী, ওরা আর আমায় ঘরে নেবে না। ছেলের খুব বড়লোকের বাড়ী বিয়ে দেবে।"

সবিস্ময়ে টুনী বলে, "ওমা, কেন দিদি ?"

ঠোঁট উল্টে রিক্তা বলে, "কে জানে ?"

টুনী বল্লে, "তা হলে যখন তুই শ্বশুর বাড়ী যাবিনে, মা জিজ্ঞেস করবে না ? মা বলবে ত, কেন নিতে আসছেনা, তখন ?"

রিক্তা ক্লান্তস্বরে বল্ল, "সে তখনকার কথা তখন হবে—"

টুনীর মনখানি বিশেষ ভারাতুর হয়ে পড়ে ; বুলবুলী চুপ করে ব'সে থাকে ! আর রিক্তা সিক্ত চোখে মৃদু হাসতে চেষ্টা করে।

এই হঠাৎ-বিয়েটা রিক্তার জীবনে যে এমন পরিবর্ত্তন এনে দেবে, কেউ ভাবেনি, রিক্তা নিজেও নয়। এযে কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন, রিক্তা অন্তরে বেশ ভালো ক'রে বুঝতে পেরেছে। সময়ে সময়ে সে অবাক্ হয়ে যায়। যে রিক্তা ছিল মুখরা, স্বার্থপর—সেই রিক্তারই বাক্যধারায় কে যেন একখানি কঠিন বাঁধ বেঁধে দিয়েছে ! নিজের দুঃস্থ ভাই-বোনগুলির জন্যে আজ সে কত চিন্তান্বিত ! তাদের সুদূর ভবিষ্যতের ছবি তাকে অনেক সময়েই ভীষণ সমস্যায় ফে'লে মৌন ক'রে তোলে। ধনী শ্বশুরালয়ে ধব্‌ধবে বিছানায় শু'য়ে, চিরআত্মসুখী রিক্তাও প্রথম দিন, ময়লা-বিছানায়-শু'য়ে-থাকা দরিদ্র ভাইবোন, মা-বাপের কথা মনে ক'রে কত কেঁদেছিল। কেমন ক'রে, জানা যায় না—চিরসৌখীন রিক্তার মনেপ্রাণে এসেছে এক দারুণ বৈরাগ্য। অতি শিক্ষিতা না হ'লেও, সে লেখাপড়া শিখেছে। প্রাচীনপন্থী শ্বশুরবাড়ী—মূর্খ স্বামী—ততোধিক অশিক্ষিত পরিবারে তার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছিল ! আজ বহুদিন পরে বাপের বড়ী এ'সে সে সকল রকম ভয়-ভাবনা, নিগ্রহ ও অপমানের হাত থেকে যেন মুক্তি লাভ করলে !

সেদিন তিনটি বোনের আলোচনা সেখানেই সমাপ্তি লাভ করে। টুনী নিজের বয়সের অপেক্ষায় গম্ভীর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বুলবুলীর আগের সে সহজ চঞ্চলতা নেই। রিক্তা কারণে-অকারণে অনেক সময়ে মুখখানা যথাসম্ভব প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টায় হাসে ! অতি সহজ হ'লেও, মায়ের চোখে এ পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে। মেয়ে দুটির চেষ্টা-কর সহজতাকে মা লক্ষ্য করেন আর মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন।

একদিন বিকেলে ঠাকুমা বল্লেন, "ওলো বড়খুকী, পেল্লাদের ছবি দেখতে যাবি ?"

রিক্তার মনে পড়ে একদিনের ঘটনা। হেসে সে বলে, "দোরগোড়াতেই ডে'কে আননা ঠাকুমা, বেশ দেখব সবাই মিলে ?" চতুর ঠাকুমার স্মৃতিতেও সেদিনের কথা ভে'সে ওঠে। বলেন, "মুখ্‌খু-সুক্কু মানুষ দিদি, কত আর জানব বল ? তা চল্‌না, ও বাড়ীর গুষ্টিকে গুষ্টি চলেছে, সেই সাথেই চল্। আহা কী ছবিই দেখালে 'সীতেহরণ'টি ! সত্যি মানুষের মত সব পর্দ্দায় নাফানাফি করছেলো !"

রিক্তা বলে, "না ঠাকুমা, তুমিই যাও !"

ঠাকুমা সবিস্ময়ে চে'য়ে বল্লেন, "সেকি লো ! তোর এমন বৈরাগ্যি কেনে ? তা বটে, আমার সঙ্গে কেন যাবি ? আচ্ছা, আসুক আগে নাত্-জামাই !" ঠাকুমা রসিকতায় ফে'টে পড়লেন। নিরুপায় হয়ে রিক্তা নীরব দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়।

শেষ পর্য্যন্ত টুনীর কথাই ঠিক্ হয়। মায়ের মনে কদিন ধ'রে এতটুকুও শান্তি নেই। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর অনেক অবান্তর কথাই মনে হয়।

রিক্তার এই পরিবর্ত্তন প্রথমে তাঁকে খুবই আশান্বিত ও আনন্দিত ক'রে তুলেছিল। রিক্তাকে যেদিন দে'খতে এল, প্রথমে মায়ের মন ভয়ে, শঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠে'ছিল, না জানি মেয়ে কী কাণ্ড ক'রে বসে ! কিন্তু অবাক্ হলেন

তিনি তখন, যখন মেয়ে নির্ব্বাক্ গিয়ে বসল আগন্তুকদের সাম্‌নে! একটি আপত্তির কথাও তুলল না।

যতই পূজোর দিন এগিয়ে আসতে লাগল, মায়ের মনে কোন্ এক অমঙ্গল ছায়াপাত সুরু করলে।

পূজোর তখন মাত্র সাতদিন বাকি; মা বল্লেন, রিক্তাকে, "হ্যাঁ মা, বড়খুকী, জামাই ঠিক্ আসবেন ত? কই, চিঠি-পত্তর ত একখানিও দিলেন না; শরীর ভালো ত রে?"

রিক্তা মায়ের মুখের দিকে চে'য়ে রইল। তার উদাস দৃষ্টিতে মা আরও অধীর হয়ে উঠলেন।

রিক্তা অবশেষে বল্লে, "মা, ওরা আর আমায় নিয়ে যাবে না, ছেলের আবার বিয়ে দেবে।"

মায়ের মুখে কথা ফোটে না—নীরবে স'রে যান সেখান থেকে। ব্যাপারটা এক্ষণে তাঁ'র কাছে খুবই সরল হয়ে দাঁড়ায়। মনে মনে বলেন, "ঠাকুর, নাতির মুখ দেখবার সাধ ত আমারও হয়! তাই ব'লে কি মেয়েকে ফে'লে দেব?"

কিছুদুর ফি'রে যাওয়ার পর হঠাৎ হন্‌হন্ ক'রে রিক্তার কাছে স'রে এসে রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লেন, "হ্যাঁ, বড়খুকী, কত সময় ত কত জিদ্দি করেছিস্, বিয়ের আগে কই একবারও তো সে রকম করলিনা, সেকি এইজন্যে?"

রিক্তার উদাস ভাব গাম্ভীর্য্যে পরিণত হয়ে যায়। কিছু উত্তর দিতে গিয়েও পারে না। মা আবার বল্লেন, "তুই ত লেখাপড়া শিখেছিস, আজকাল লেখাপড়ার দিনেও এমন করবার আস্পর্দ্ধা হয়?"

রিক্তা বললে, "এখনো ত সবাই লেখাপড়া শি'খে উঠবার সুযোগ পায়নি মা?"

মা বল্লেন, "আজ যদি আদালতের সামনে দাঁড়াই, আক্কেলখাগী বেয়ানের চোখের চামড়া খুলিয়ে দিতে পারি! জানিস্?"

একটা সুনিবিড় লজ্জার ভারে রিক্তার মন নুয়ে পড়তে চাইল। সেই লজ্জা ঢাকবার উদ্দেশ্যেই একটু তিক্তস্বরে সে ব'লে ফেল্লে, "ছিঃ মা, ও কথা কি বলতে—"ব'লেই মায়ের বিস্মিত দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই চুপ ক'রে গেল। অন্তরে বুঝল, কত বড় ব্যথা নিয়ে চিরমৌনী মা কথাগুলি উচ্চারণ করলেন। সত্যিই ত! আজ যদি তারা রিক্তাকে না নেয়, সমাজে তার স্থান কোথায়,—ভাবতেও সে শিউরে উঠে! মায়ের শীতল হাত দুটি ধ'রে ফেলে কম্পিত সুরে এইবার সে বল্ল, "থাক্ মা, যেতে দাও। কেন মন খারাপ করছ?"

মেয়ের কাছ থেকে অতটা উদাসীনতা তিনি মোটেই আশা করেননি বোধহয়। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে পেছন ফিরলেন!

পরদিন সকাল হতেই রিক্তা শুনতে পেল, একটা মৃদুগুঞ্জনভরা আয়োজনের কাণাকাণি। টুনটুনী চাপা গলায় কী যেন বল্‌ছে। বুলী ভাঁড়ারের জিনিসপত্তর গুছিয়ে বন্দ করছে। মা একখানা বৃহৎ তোরঙ্গে কাপড় ঠাসাই করছেন। রিক্তার ইচ্ছে হ'ল, উঠে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে। কিন্তু কি ক্লান্তি যেন তার পা দুটো চে'পে যেখানে সে বসেছিল সেখানেই ধ'রে রে'খে দিল।

প্রাতঃকৃত্যাদি সে'রে রামপদ যখন ছোট ফালি বারান্দায় এ'সে দাঁড়ালেন, তখন টুনীদের গোছান বাক্স-বিছানা বাইরে রাখা হয়ে গেছে। তাদের মা একখানা ফরসা শাড়ী ও সেমিজ নিয়ে রিক্তার উদ্দেশ্যে সবে ঘর থেকে পা বাড়িয়েছেন। রামপদ অবাক্ হয়ে বল্লেন, "কী গো, বড়খুকী চল্‌ল নাকি? জামাই আসবেন বুঝি আজ?"

"হ্যাঁ, জামাই আসবেন, না জামাইয়ের বাপ চতুর্দ্দোলা নিয়ে আসবে! আসবার কথা কারুর নয়, আমাদেরই যেতে হবে।"

রামপদর বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর উচ্চ কণ্ঠস্বর এই প্রথম কাণে প্রবেশ করল। নিতান্ত অবোধ্য! কারণ শোনবার জন্যে তিনি ব্যস্ত সুরে বল্লেন, "কেন? কেন, ব্যাপারখানা কী? তোমরা কোথায় এবং কেনই বা যাবে? জামাই বা আসবেন না কেন?"

টুনীর মা বল্লেন, "ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি চল্লুম বাপের বাড়ী। আমারও বাপ-মা ছিল, আমার বিয়ে হলে তাদেরও ভাবনা ছিল, কিন্তু যার তার কথায় জলে ফেলে দেবার মত মতিচ্ছন্ন তাদের কোনকালেও হয় নি!"

টুনীর মাকে যে সত্যিই জলে ফে'লে দেওয়া হয়নি—সে কথাটা আজ তারই মুখে বিজয় গর্ব্বে ঘোষণা করতে শু'নে, রামপদর মন আত্মপ্রসাদে ভ'রে উঠল। কিন্তু তখনি, ঘোষণার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করতে গিয়ে মুখে বিরক্তি ও চিন্তার রেখা ফু'টে উঠল। বল্লেন, "ব্যাপারখানাই বলো না ছাই!"

রিক্তার মা আজ 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে প্রাঙ্গণে নেমেছিলেন যেন! বল্লেন, "তোমার ওপর অত দরদ যার—তাকে নিয়েই থাকো। আমার আরও দুটো মেয়ে আছে। তাদের বিয়ে দিতে হবে। বড়-খুকীকে তোমার জ্যাঠাইর দেওয়া বড়লোক কুটুমরা ঘরে নেবে না।"

রামপদর মাথায় বাজ ভে'ঙে পড়ল। চিৎকার ক'রে তিনি বল্লেন, "কেন? কারণ? রামপদর মেয়েকে এমন ক'রে অপমান করবে কেন? কিসের জন্যে!- জ্যাঠাই! এদিকে এসো—"

জ্যাঠাই সকালবেলার আয়োজন সর্ব্বাগ্রে দেখেছিলেন, কিন্তু কারণ অনুমান না করতে পে'রে সর্ব্বজালা নিবারণী গুল গালে টি'পে নিশ্চিন্তে ব'সে ছিলেন। রামপদর চিৎকারে ঘরের বাইরে এ'সে দাঁড়ালেন।

রামপদ বল্লেন, "বলো না গো, কারণটা? চুপ করলে কেন?"

টুনীর মা বল্লেন, "বড়খুকী ছ'বছরের মধ্যে বেটার মা হতে পারে নি। এই তার অপরাধ—"

আর কিছু শোনবার প্রয়োজন হ'লনা। এতক্ষণে রামপদর মাথায় যেন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠল! প্রিয়তমা কন্যার আসন্ন অপ্রিয় সংবাদে দিশাহারা তিনি, সংযমের বাঁধ ছু'টে গেল। সহসা বিকৃতমস্তিষ্কের মত বাড়ীর দরজা খু'লে তিনি বল্লেন—জ্যাঠাইকে, "নাও, নিজে হাতে দোর খু'লে দিয়েছি, তাই সোণার সংসারে এসেছিলে আগুন ধরাতে; আজও আবার সেই নিজে হাতেই দোর খু'লে দিচ্ছি—বেরোও, বেরো বল্‌ছি বদ্‌মাইস মেয়েমানুষ কোথাকার!"

অতর্কিতে দু'খানি কোমল হাত রামপদর পা জড়িয়ে বল্ল, "বাবা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, অমন কোরো না, শান্ত হও! ঠাকুমা ঘরে যাও তুমি। হ্যাঁ মা, তোমরাই ত বল অদৃষ্ট! সে কথা কি আজ ভুলে গেলে? কেন ভুলে যাচ্ছ, তোমার মেয়েও এই অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছিল? তা না হ'লে, অমন ঘরে পড়বই বা কেন? ঠাকুমা, বাবার অপরাধ নিয়োনা, চল, ভেতরে চল—"

তিনটী বিস্ময়ান্বিত প্রাণীর চোখই তখন বাষ্পভরা। সকলেই আজ চোখের জলের আড়াল দিয়ে, রিক্তার এই দারুণ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দে'খে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল!

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুমি প্রফুল্ল চন্দ্র মোদের তুলনা তোমার নাই,
ক্ষীণ দ্বিতীয়ার চাঁদের মতন শিবের ললাটে ঠাঁই
দেহ ত তোমার মাচার ঠেক্‌নো, দ্রাক্ষাকুঞ্জ মন,
অঞ্জলি ভরা তোমার দান যে এ ভারত রসায়ন।
বাহির দেখিয়া কে বুঝিবে তুমি কত বড় দরদিয়া
কে রেখেছে টুনটুনির খাঁচায় হেন আশ্রম টিয়া!

ভূর্জ্জপত্র ভিতরে রয়েছে একি বিদ্যুৎ-বাণী—
ভিখারী ঝুলিতে কি শিখা রয়েছে হয় না অনুমানই।
শীর্ণ দণ্ডে হেন গৈরিক-পতাকা রয়েছে থির,—
দয়ালের তুমি শ্রেষ্ঠ যে দান, গৌরব পৃথিবীর।
ঠুন্‌কা মোড়কে দিয়াছে স্বর্গ প্রসাদী এ মৃগনাভি—
বিলাসী বর্ত্তমানের উপর তুমি অতীতের দাবী।

মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছ তুমি নাগার্জ্জুনের সাধ—
ক্ষুদ্র সজীব আখরেতে বিধি পাঠালো "আশীর্ব্বাদ"।

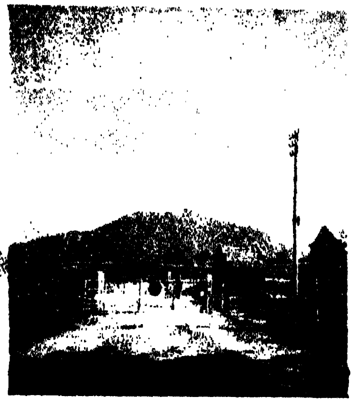
মোটরে আটদিন

দগেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

অনেকদিন ধরেই জল্পনা-কল্পনা চল্‌ছিল কোথাও মোটরে বেড়াতে যাবার। কিন্তু পাঁচজন মিলে কোথাও বেরোতে হলেই হয় পাঁচরকম মতের সৃষ্টি। তাই যাচ্ছি-যাব করতে করতে পূজা শেষ হয়ে গেল। নবেম্বর মাসেই যাওয়া ঠিক হলো; দলে আমরা ছয় জন। বাগবাজার থেকে বেলা ১॥০ টার সময় মোটর ছাড়া হল। আমাদের মোটরের মাইল্‌-মিটারে তখন রয়েছে ৫০৯১। বারাকপুর ট্রাঙ্ক-রোড্‌ ধরে বরাবর বালীর পুলের উপর উপস্থিত হয়েছি, এমন সময়ে মোটরের একখানা চাকা



শিকারের সন্ধানে



নোবিল ক্রসিং (পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে)



উশ্রী জলপ্রপাত (গিরিডি)

'পাংচার' হল। চাকা বদ্‌লে, বারাকপুর-ট্রাঙ্ক রোড্‌ ছেড়ে এবার ধরলুম গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্‌। অতীত দিনের কত স্মৃতির পসরা বুকে নিয়ে যে পথ যুগ-যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

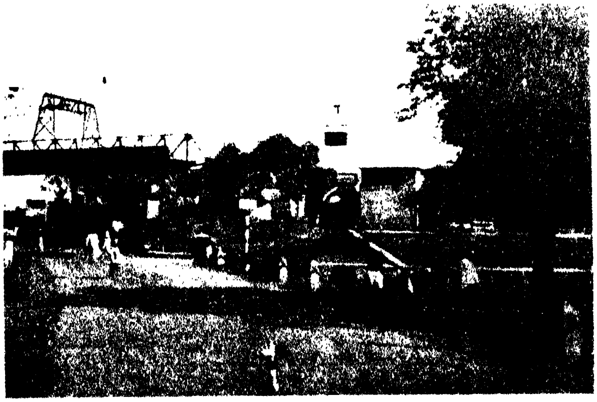
বর্দ্ধমানে সাড়ে পাঁচটা নাগাৎ পৌঁছানো গেল। কিছু খেয়ে নিয়ে বরাবর আসানসোলের দিকে গাড়ি দেওয়া হল। রাত্রি ৮।৪০ মিনিটের সময় আসানসোল পৌঁছানো গেল। কলিকাতা থেকে আসানসোল ১৩৭ মাইল। দেখা গেল বর্দ্ধমানের সেই ভুরিভোজনের পর বাঙলো ছেড়ে নড়বার লক্ষণ কারও নেই।

পরদিন সকালে ৮টার সময় আসানসোল ছাড়া হলো। —পথের পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি অপূর্ব্ব মনোরম। —প্রভাতের সেই নির্ম্মল-স্নিগ্ধ অরুণালোকে দেখা পেলুম কত অচেনা-অজানা নদ-নদীর......কত অচেনা পথচারী পাখীর।—এমনি গতির অবাধ আগ্রহে ছাড়িয়ে এলুম 'রাণিগঞ্জ'—, পথের পাশে ফেলে এলুম 'সীতারামপুর'... 'ধানবাদ', 'গোমো' আরো কত কী!......আমরা চল্‌ছি আর চল্‌ছি......, এই আমাদের আনন্দ—এই আমাদের উদ্যম।—চলার অপার-আনন্দে আজ আমরা সকলেই বিভোর। সাড়ে দশটার সময় 'বকোদর' পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটা টায়ার 'পাংচার' হল। টায়ার বদ্‌লে অত বেলায় অভুক্ত অবস্থায় এগোনো যুক্তিযুক্ত নয় জেনে—বকোদর ডাক বাঙ্‌লোয় ওঠা গেল। বকোদর পর্য্যন্ত আমরা এলুম ২১৫ মাইল।

বকোদর ডাক-বাঙ্‌লোয় আমাদের সাথে আলাপ হল কলিকাতা রঙ্গমহলের শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের সাথে।—তাঁরাও কলিকাতা থেকে মোটরে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন দেখলুম বাঙ্‌লার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।—আরও আলাপ হ'ল একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সাথে। মুসিঁয়ে কি যেন; নামটি ভুলে গেছি। তিনি চন্দননগর থেকে আসছেন একখানি 'ফিয়াট্‌' গাড়ী করে। গাড়ীর উপরকার অবস্থা দেখে কৌতূহল হ'ল জানবার—তিনি কতদূর যাবেন। শুনলুম

তিনি যাচ্ছেন পেশওয়ার। আমাদের এই প্রশ্নের নিহিত অর্থ তিনি ঠিক্ বুঝেছিলেন, তাই তিনি গাড়ীর কল-কব্জা কি সুন্দর অবস্থায় আছে আমাদের তা দেখালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এও বললেন যে, তিনি সম্প্রতি এই গাড়ী নিয়েই সুদূর শ্যামদেশ অবধি গেছেন।

যাই হোক্, তাঁর এই অসীম সাহসের জন্যে তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারলুম না। তিনি ও সঙ্গে তাঁর স্ত্রী; আর কেউ নেই। শুধু সাম্‌নে পড়ে আছে পেশওয়ার যাবার পথ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত।—পৌঁছাতে তাঁর দেরীই লাগবে, কিন্তু তবুও তো একদিন তিনি তাঁর লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাবেন।—ধন্য তাঁর সাহস…… ধন্য তাঁর ধৈর্য্য।



বরাকর

বিকাল বেলায় বকোদর থেকে ১৫ মাইল দূরে "সূর্য্য-কুণ্ড" দেখ্‌তে যাওয়া হল। খোলা উদার মাঠের বুকে একটা ছোট ইঁদারার মত জায়গা থেকে অনবরত গরম জল উঠ্‌ছে। জলে একটু গন্ধকের গন্ধও আছে। খুব গরম জল; এমন কি শোনা গেল, ওখানে নাকি চাল দিলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তা ভাতে পরিণত হয়ে যায়।—আর কত কী আশ্চর্য্য আশ্চয্য কথা শোনা গেল।—যাই হোক্, একটা নতুন জিনিষ দেখলুম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।—রাত্রে বকোদরেই থাকা সাব্যস্ত হল।

তৃতীয় দিন সকালে সাড়ে সাতটায় বকোদর থেকে বেরোনো হল। প্রায় দশ মাইল এসেছি, এমন সময়ে দেখি মোটরের 'কেরিয়ার' থেকে একটা ছোট বিছানা কি রকম ভাবে ছিট্‌কে পড়েছে। গাড়ী থামিয়ে নামা হল, কিন্তু কাছে কোথাও বিছানার খোঁজ মিল্‌ল না। একজন গাড়ী নিয়ে ফিরে' চল্‌ল হারানো বিছানার সন্ধানে, আর একদল সেইখানেই নাম্‌ল শীকারের খোঁজে। জায়গাটির নাম 'গর্‌হাড়'।—পথের পাশ দিয়ে একটি ছোট গ্রাম্য নদী ঝির্ ঝির্ করে বয়ে চলেছে। দলের মধ্যে সকলে যখন শীকারের খোঁজে এগিয়ে চল্‌ল, আমি তখন প্রভাতের সেই অলস-মুহূর্ত্তটিতে নদীর ধারটিতে বসলুম।—অতীত দিনের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি মনের মধ্যে বর্ণনার অতীত একটা অনুভূতির সৃষ্টি করলে।......সেইদিনকার সেই মোহময় অবস্থায় বার বার এই কথাটাই মনে হয়েছিল—

"যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না!
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।"

যে দলটি বিছানার খোঁজে গেছ্‌ল তারা ফিরে এল হতাশ হয়ে। কি আর করা যায়।—আমরা আবার এগিয়ে চললুম এই ভেবে যে, হোক্ উপকৃত সেই অভাগা যে তুলে নিলে আমাদের হারানো জিনিষ! তার উপর আমাদের কোন অভিযোগের কারণ নেই। আমরা তাকে ক্ষমা করলুম।—কিন্তু আজ কেবল এইটুকুই ভাবি, সেই হতভাগ্য সত্য-সত্যই কি নির্ম্মল আনন্দ পাবে? তার বিবেক কি এই হীন চৌর্য্যবৃত্তির জন্যে তাকে একটুও ধিক্কার দেবে না?...

পথে 'বর্‌হাই-চটীতে' নেমে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। তারপর কিছুদূর গিয়েই সেই 'দানুয়া-ভালুয়ার' প্রায় ২০ মাইল ব্যাপী ভীষণ গভীর অরণ্য।—এই জঙ্গলের বিষয়ে অনেক রোমাঞ্চকর ভয়াবহ কাহিনী শোনা আছে, তাই এই বনের মধ্যে গাড়ী ঢুকতেই একটু সতর্ক হয়ে রইলুম। সেদিনকার উজ্জ্বল প্রভাত কিরণে সেই অতি বৃদ্ধ উন্নতশির বৃক্ষগুলিকে এই বিরাট্ অরণ্যের গর্ব্বভরা প্রতিমূর্ত্তি বলেই মনে হ'ল।—এদিক্‌কার রাস্তা খুবই

ভাল। তার উপর আবার আমাদের আছে 'স্পিড্-ম্যানিয়া'। গাড়ীর বেগ ক্রমে ৭২।৮০ মাইল পর্য্যন্ত উঠ্‌ল। এই গতির বেগে ছোটার ফল আমরা টের পেলুম যখন শুন্‌লুম গয়ার পথ পিছনে ফেলে আমরা প্রায় ১০ মাইল এগিয়ে এসেছি।—যায়গাটির নাম 'সেরঘাটি'। গাড়ী ঘুরিয়ে নেওয়া হল। এই সমস্ত ছোট-খাট ভুল-চুক্ আমাদের বিরক্ত না করে বরং আরও আনন্দিত করছিল।……এই জন্যেই তো আমরা বেরিয়েছি। লক্ষ্যস্থানেই তো পৌছানো আমাদের কেবল মাত্র উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য গতানুগতিক জীবনযাত্রা থেকে কিছুদিন ছুটি নেওয়া, ভুলে থাকা।……এই ক'টা দিনের ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার ভিতর তার প্রবেশ নিষেধ।

……আজ সাথী আমাদের খেয়ালের-খেলা,
গতির বেগ হচ্ছে আমাদের 'ট্যুরের' প্রাণ!

বেলা ১টার সময় আমরা গয়ায় পৌছালুম।—রাত্রে এইখানেই থাকা হবে স্থির হল, পরদিন সকালে আমার স্বর্গগত পিতার আত্মার তর্পনার্থে প্রথমে ফল্গু-নদীর তীরে, তারপর শ্রীবিষ্ণু-পাদ-পদ্মে ও সর্ব্বশেষে অক্ষয়-বটের তলে পিণ্ডদান সম্পন্ন করে' ভারাক্রান্ত মনে ফিরলুম। ডাক্-বাঙ্‌লোয় ফিরে দেখা গেল আমাদের খাবার কোন ব্যবস্থা নেই। যাঁদের উপর ভার ছিল তাঁরা আমাদের দেরী দেখে সব ভুলে দিয়েছেন। সমস্ত দিন অভুক্ত অবস্থায় থাকলেও যে ক্লান্ত দেহের ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে কোন ক্ষুধাই রাখে নি। তাই সামান্য জলযোগেই পরিতৃপ্ত হলুম।

বিকালে 'বুদ্ধ-গয়া' অভিমুখে যাত্রা করা হল। ৭ মাইল পথ ফল্গু-নদীর ধার দিয়ে বরাবর সোজা চলে গেছে।—ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি-মন্দিরে যখন এসে দাঁড়ালুম, তখন সমস্ত প্রাণ মন সেই বিরাট্ অতীতের সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান সমস্ত স্মৃতিরাশির পায়ে অঞ্জলি দিয়ে পড়তে চেয়েছিল। সেদিন মনে হয়েছিল, ভগবান বুদ্ধের আগমনে যখন সমস্ত জগৎ জেগে উঠেছিল—গয়াতে যেদিন তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন—সেইদিনকার সেই পুণ্যদিনে কেন আমি জন্মগ্রহণ করিনি?……বোধিদ্রুম বৃক্ষের শান্ত-শীতল ছায়ে দাঁড়িয়ে একে একে মনে পড়্‌ল অনেক কথা!—মনে পড়ল তাঁর সময়ের বিরোধের কথা, নানান্ মতের কথা; এমন কি তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে হীন-কটাক্ষের কথা! আর কত কী……ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চারদিকের কারুকার্য্য দেখ্‌তে লাগলুম!—দেখলুম প্রায় সহস্রাধিক বছর পূর্ব্বের কি অদ্ভুত শিল্পী-প্রতিভা, কি অনিন্দনীয় কারুকার্য্য!

বুদ্ধ গয়ায় এক পারশ্যদেশীয়া সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি সমস্তদিন মৌন অবলম্বনে অনাহারে ভগবান বুদ্ধের ধ্যান করেন। সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যায় বোধিদ্রুমমূলে প্রদীপ দিয়ে তিনি কথা বলেন ও আহার করেন। কয়েক বছর তিনি এই ব্রত গ্রহণ করেছেন। সুদূর পারশ্যদেশ থেকে সকল আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে তাঁর এই কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর যে কী অনাদি-রহস্য নিহিত আছে—তা কে জানে।…



বরাকর সেতু

বুদ্ধ-গয়া থেকে ফিরে আমরা ৬-৩০ মিনিটের সময় বারাণসীর উদ্দেশে যাত্রা করলুম। পথের মধ্যে শোন-নদী পড়ে। পার হবার উপায় 'ট্রাক্' করে, অথচ রাত হবার দরুণ 'ট্রাক্' পাওয়া গেল না; তাই রাতটা কোনরকমে 'শোন-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক ওয়েটিং রুমে'ই কাটানো স্থির হল।

পাঁচদিনের দিন সকালে 'মোটর' ট্রাকে তুলে দিয়ে আমরা ট্রেণে শোন নদী পার হলুম। ডিহিরীতে পৌছে

দেখি গাড়ী তখনও আসে নি। চুপ করে বসে থেকে কোনও লাভ নেই জেনে সহরটা একটু ঘুরে এলুম। বেলা ১০টা নাগাৎ ডিহিরী ছাড়া হলো। শোন পার হয়ে আবার গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড্ ধরে চললুম। রাস্তা কোথাও চলেছে এঁকেবেঁকে, আবার কোথাও বা সোজাই। পথের ধারে কত মনোরম দৃশ্য!—কোথাও হাজার হাজার পুরাণো বছরের বটগাছ জট-পাকানো ঝুড়ি নামিয়ে অতীতের কত স্মৃতি বুকে করে' দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও আবার সেই "পল্লব-ঘন আম্রকানন" স্নিগ্ধছায়া বিস্তার করে' পথচারী পথিকদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।···ঐ সব গাছের তলায় হয়তো আমাদেরি কোন পূর্ব্বপুরুষ একদা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পথের ক্লান্তি দূর করতে,···হয়তো ওরই আশ্রয়ে তাঁরা কাটিয়েছেন তাঁদের ভ্রমণপথের কত নিদ্রা-বিহীন সংক্ষুব্ধ-রজনী।···তাই আজ এই সব প্রাচীনকালের অক্ষয় বৃক্ষগুলিকে কেবলমাত্র তুচ্ছ বৃক্ষই ভাবতে পারছি না—তাদের প্রত্যেককে মনে হয় যেন পল্লীর এক একটি গৃহ-দেবতা!···

সেই সহজ-সুন্দর পথ দিয়ে ছুটে চললুম। গতির বেগে ছুঁয়ে এলুম 'আওরঙ্গবাদ', ছুঁয়ে এলুম এই পথের নির্ম্মাণকর্ত্তা অপূর্ব্ব দূরদ্রষ্টা সম্রাট্ শের শার বাল্যের ক্রীড়াভূমি 'সাসেরম', 'মোগলসরাই' আরো কত কি! শেষে বেলা প্রায় ১২টার সময় আমরা বারাণসী ধামে পৌঁছালুম। মোটর থেকে নেমে সবাই মিলে পুণ্যধামের ধূলি মাথায় নিয়ে সমস্বরে গেয়ে উঠলুম—

"জয়! জয়! বারাণসী—
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী।"

এই সেই কাশীধাম! যেখানে সর্ব্বত্যাগী রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্য-পালনে পত্নী ও পুত্রকে হেলায় বিক্রয় করেছিলেন।··· এর পথের উপর চিরকুমার ভীষ্মের চরণপরশ একদিন পুষ্পবৃষ্টির মত পড়েছিল।...এই কাশীধামই বিশ্বামিত্রের সাধনার সিদ্ধক্ষেত্র, তুলসীদাস ও কবীরের রচনার ভূমি।...এ যে আমাদের চিরদিনের নমস্য।

বিকালে বজরায় করে পুণ্যবাহিনী জাহ্নবীর উপর দিয়ে কাশী রাজার প্রাসাদ 'রামনগর' উদ্দেশে যাত্রা করা হ'ল। বজরা ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে, এমন সময়ে সুকুমারবাবু একখানা ভাটিয়াল সুর ধরলেন। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলুম। আজ বুঝলুম, গোধূলির ম্লান আলোয়, বজরার নৃত্য-দোদুল ছন্দে ভাটিয়াল সুরের যে রূপ ফুটে ওঠে তা, বৈঠকখানায় আলোর নীচে, অর্গ্যানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাওয়া গানের চেয়ে কত তফাৎ··· কত আলাদা! কাশীরাজের প্রাসাদ ও বিশ্বনাথ দর্শন করে সেদিনের মত ফেরা গেল।

ষষ্ঠদিনের সকালে "সারনাথে"র পথে যাত্রা করা হল। কাশী থেকে ৭ মাইল পথ। সারনাথে পৌঁছে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূতের মত চেয়ে রইলুম সেই অনন্য-সাধারণ স্তূপগুলির দিকে। সেগুলি সবই ধ্বংসপ্রায়—তবুও সেই ভগ্নশিলার বুকে যে বাণী আজও জাগছে—তার তুলনা কোথায়!—নইলে কি কেউ এত উৎসাহিত হয়ে দেখতে আসত এই ভগ্ন, পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ!...

সারনাথের চারিদিক্ খুঁড়ে এখনও চলছে বিপুল চেষ্টা অতীতের স্মৃতি পুনর্জ্জীবিত করতে। আবার কত ভাস্কর, কত শিল্পী আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সেই বিগত গৌরবরাশি পুনরুদ্ধার করতে। হয়তো তারা সফল হবে—হয়তো হবে না; কিন্তু তবুও বলব যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাজে লেগেছে তাও তো তুচ্ছ নয়!—আবার হয় তো কয়েক বৎসর পরে এই জায়গায় গড়ে উঠবে এক নতুন অপরূপ সহর!—হয় তো তখন কত উৎসব-রাতে জ্বলবে কত উজ্জ্বলতম আলো,—কত হাসি, কত আনন্দ, আরো কত কী!.. তবু আমি শুধু এই কথাটাই ভাবি, আজকে আমরা ঠিক যে উদ্দেশ্য, যে আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহ নিয়ে সারনাথ দেখতে এলুম, সেদিনও কি কেউ ঠিক্ এই উদ্দেশ্য নিয়েই আসবে? সেই অনাগত দর্শকদের দর্শনের পিছনে কি থাকবে না নূতনত্বের আহ্বান?...

মূলগন্ধকুটী বিহারের ভিতর গিয়ে হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম। দেয়ালের গায়ে 'ফ্রেস্‌কো পেন্‌টিং' করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ভগবান বুদ্ধের জীবন-কাহিনী।—তুলির রেখায় জীবনলিপি যে এত সহজ সরল হতে পারে তা আজই বুঝলুম।—'ফ্রেস্‌কো'গুলি এঁকেছেন বিখ্যাত জাপানী চিত্রশিল্পী Kosetsu Nosu। সুখের বিষয় তিনি জাপান দেশের লোক হলেও তাঁর ছবির ভিতর

জাপানী ছাপ পড়ে নি। আরও সুন্দর তাঁর উৎসর্গটি— "I pray to Lord Buddha with folded hands as I fervently believe that the completion of this humble work depended absolutely on His unbounded mercy." সারনাথ থেকে সেদিন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরলুম এই ভেবে যে, তিনি শুধু অতীতেই ছিলেন না, বর্ত্তমানেও মানুষের চিত্তে জন্মাচ্ছেন। তাঁর বাণী আজও যেমন অক্ষুণ্ণ আছে, অনাগতকালেও ঠিক্ সেই মতই থাকবে।

সারনাথ থেকে ফেরার পথে বেনারস হিন্দু ইউনিভার-সিটির উদ্দেশে যাত্রা করা হল। ইউনিভারসিটির ফটকের মধ্যে যখন গাড়ী ঢুকল মন আনন্দে নেচে উঠ্ল। শিক্ষা বিস্তারের কি বিরাট্ আয়োজন! ইউনিভারসিটির সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠ্ল। মান্যবর, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ যাঁরা যাঁরা এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুল্‌তে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ও করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলুম।

কাশীতে সবই যখন দেখা হয়ে গেল, তখন ওখানে রাত-কাটানো বৃথা জেনে ৩।৩০ মিনিটে কাশী ছাড়া হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা ডিহরী পৌঁছে শুনলুম, মোটর পার করার 'ট্রাক্' আজ আর পাওয়া যাবে না, কাজেই গাড়ী রেখে আমরা ট্রেণ ধরে' 'শোন-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক'এ এসে নামলুম—রাতটা ওয়েটিং রুমে কাটানো হবে সাব্যস্ত করে।

সপ্তম দিনে সকাল ৮টার সময়ে শোন-ইষ্ট ব্যাঙ্ক ছাড়া হল। বরাবর একেবারে 'ডুম্‌রী'তে এসে পৌঁছালুম ১২টা নাগাৎ। ডিহরী থেকে ডুম্‌রী প্রায় ১৩০ মাইল পথ। ডুম্‌রীতে কিছু খেয়ে নিয়ে গিরিডির দিকে যাত্রা করা হল। গিরিডির পথ সুন্দর — বিশেষতঃ যখন গিরিডির 'ঘাট' পার হলুম, তখন মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব অনুভূতির সৃষ্টি হল। — যাই হোক্, গিরিডিতে ১টার সময় পৌঁছানো হল। — সেদিন ওখানে হাটবার। দেখলুম, কত দূর থেকে কত নরনারী তাদের জিনিষ নিয়ে এসেছে। — সকলের সব জিনিস সমান নয়, কার ভাল, কার মন্দ। কারো বেশী, কার বা কম; কিন্তু তবুও তাদের সকলের কি উৎসাহ…, কি উদ্যম। সকলের মনের সরল আনন্দ ঠিক্‌রে পড়ছে তাদের চোখে-মুখে… তাদের কথায়, তাদের হাসিতে…, তাদের সেই কালো কষ্টি-পাথরের মত সুন্দর মসৃণ তনুলতার সহজ ভঙ্গিমায়। হাট থেকে কিছু কিনে ৩টার সময় ডাক-বাঙ্‌লোয় ওঠা গেল। বিকালে গিরিডি সহর দেখে ঠিক হল পরদিন উস্রী প্রপাতের ধারে "পিক্‌নিক্" করা হবে।

অষ্টম দিনের দিন সকালে উস্রীর পথে যাত্রা করা হল। গিরিডি থেকে প্রায় ৭ মাইল পথ। মোটরে



উস্রীর ধারে বনভোজন (গিরিডি)

মাইল ছয়েক এসে থাম্‌তে হল, আর পথ নেই। পায়ে চলেই ও পথটুকু যেতে হল। — উস্রীর ধারে সেই বনভোজনের কথা অনেকদিন মনে থাকবে। স্নান এবং আহার সারা হলে বিদায় নিতে হল। উস্রীর উদ্দেশে সেদিন কবির কথায় বলে এলুম—

"মধ্যাহ্নে শোন যে বাণী অরণ্যের নির্জ্জন-মর্ম্মরে!
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে তব যে ক্রন্দন—,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন!…"

উস্রী থেকে ফিরে পরেশনাথ পাহাড়ের তলায় মধুবন উদ্দেশে যাত্রা করা হল। মধুবনে পৌঁছে দেখি চারদিকেই ছোট বড় অনেকগুলি শ্বেত-পাথরের মন্দির। মন্দিরগুলি জৈন সম্প্রদায়ের—সবগুলির ভিতর পরেশ-

নাথের মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের প্রায় সব দরজাগুলি রূপার পাতে মোড়া, নানারকম কারুকার্য্যে শোভিত। ধনরাশির বা ঐশ্বর্য্যের কোন কিছুই অভাব সেখানে নেই, প্রচুর অর্থব্যয়ে সেগুলি নির্ম্মিত, তবুও আমি বল্‌বো সেগুলি সুন্দর বা নয়ন-শোভন নয়।...গাম্ভীর্য্যের অভাব তাতে না থাকতে পারে, কিন্তু তাতে অভাব আছে প্রতিভার!...হায় শিল্পী-প্রতিভা সেখানে কোথায়?... আরও একটা জিনিষ দেখলুম, মন্দিরের প্রবেশ-পথে লেখা আছে—"None but the Jains and High-born Hindus are allowed to go in—" কিন্তু কেন?—দেবালয়ে ছোট-বড়র এ প্রভেদ কিসের?... উচ্চ বংশোদ্ভূত হিন্দু না হলে, কেন তার নেই মন্দিরে প্রবেশ অধিকার? হিন্দুর পরিচয় হিন্দুই কি যথেষ্ট নয়? ..আমি তো জানি—

"কর্ম্মে যাদের নাহি কলঙ্ক, জন্ম যেমনি হোক
পুণ্য তাঁদের চরণ পরশে ধন্য এ নরলোক।"—

তাই সেদিন যে আগ্রহ, যে উৎসাহ নিয়ে মধুবন দেখতে গেছলুম্ তার প্রথমেই ভেদাভেদের গণ্ডীর এই রূঢ় আঘাত মনটাকে বেশ একটু দমিয়ে দিলে।—সেদিন শুধু চীৎকার করে এই কথাটাই বল্‌তে চেয়েছিলুম—

"দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখোনা—খোল মন্দির দ্বার—
দেবতা কাহার নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার।"

বেলা ৩॥০টা নাগাৎ মধুবন পরিদর্শন সেরে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করা হল। যে পথ দিয়ে একদিন কত আশা-আকাঙ্ক্ষা···কত উৎসাহ-উদ্যম...কত কল্পনার জাল বুন্‌তে বুন্‌তে এগিয়ে গিয়েছিলুম, আজ আবার সেই নব পরিচিত পথ দিয়েই আজন্ম-পরিচিত কলিকাতা উদ্দেশে ফিরে চলেছি। পথের ধারে ধারে যে সব নদ-নদীর দেখা পেয়েছিলুম, যে সব গাছগুলির সাথে মিতালি পাতিয়েছিলুম, তারা যেন সকলে আমায় পিছন হতে টান্‌ছে কিন্তু আমি আজ উপায়হীন।

গাড়ী একেবারে এসে 'বরাকরে' থাম্‌ল।—আজ আমাদের ভ্রমণ পথের শেষ দিন। আজ খেয়ালের খেলার শেষ-সমাপ্তি। তাই ঠিক হল গিরিডি থেকে সঙ্গে আনা খাবারগুলি বরাকর নদীর ধারে নিয়ে ওইখানেই আহারাদি সম্পন্ন হবে। পায়ে-চলা পথ দিয়ে প্রায় মাইল খানেক হেঁটে নদীর ধারে পৌছানো গেল।... আজ বরাকর নদীর ধারে গোধূলির স্তিমিত-আলোয় কেন হঠাৎ আমার মনে হল যে উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতা ত্যাগ করেছিলুম সে উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ হল।—সেই রঙিন আলোয় মনে হল যেন আমি আমার প্রাণের একটি শ্রেষ্ঠ-সম্পদ হারিয়ে এসেছি প্রবাসের পথের ধুলোয়।

বরাকরে আহার শেষ করে গাড়ী ছাড়া হল সন্ধ্যার সময়।—গাড়ী ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসতে লাগল। রাত্রি ১টার সময় আমরা ফিরে এলুম কলিকাতায়। আমাদের ভ্রমণ পথের কোলাহলপূর্ণ দিনরাত্রিগুলির পরিসমাপ্তি ঘটল আজ কলিকাতা মহানগরীর নিশীথ-নিস্তব্ধ পথের মাঝে।—যে পথ দিয়ে একদিন এগিয়ে গেছলুম, আজ আবার সেই পথেই ফিরে এলুম।···

এখন বসে বসে ভাবি কোথায় এসে পৌছালুম।— কতটুকু সময়ের ব্যবধান, কিন্তু তবুও কত বেশী।···প্রবাসে পথের মাঝে মনের মধ্যে যে সুর বেজেছিল, তার সাথে কলিকাতা নগরীর সুরের যেন কোন মিল নেই।··· আমাদের এই ক'টা দিন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানো জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়ল।···তবুও অতীতের সেই ক'টা দিনের জন্যে মন কেমন কেমন করে...চোখের পাতাগুলিও হয়তো একটু একটু ভিজে আসে,—কিন্তু তবুও বেশ লাগে এই আবেশময় ধূসর-ঔদাস্যটি।...জীবনে আর কত দিন, কত মাস, কত বছর কেটে যাবে, কত জিনিষ মনে থাকবে, আবার কত ভুলে যাব, কিন্তু তবুও সেই অনাগত কালের মধ্যে আমাদের প্রবাসের এই ক'টা দিনের সুখের স্মৃতি একেবারে হারিয়ে যাবে না।



স্বাধীনতার উপাসক বঙ্কিমচন্দ্র

অধ্যাপক ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি, পি, আর, এস

যে জাতির কণ্ঠে 'সাম্য, সৌভ্রাত্র ও স্বাধীনতা'র বাণী সর্ব্বপ্রথমে ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই জাতির রাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে আমি সেই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষিকে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ উপাসকরূপে স্থাপনা করিয়া পূজার্ঘ্য প্রদান করিতে চাই। এই পূজার প্রারম্ভেই আপনাদিগকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি যে, অন্যান্য অনেক শব্দের ন্যায় স্বাধীনতা শব্দের অর্থও বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বুঝিতেন, আমরা তাহা বুঝি না। আজকাল আমরা যাহাকে স্বাধীনতা বলি, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার নাম দিয়াছিলেন স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্ত জাতির রাষ্ট্রীয় জীবন। আর স্বাধীনতা অর্থে তাহাই বুঝিতেন যাহাকে আমাদের বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহ 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' বা 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' বলিয়া অনুবাদ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র অষ্টম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, —"স্বাধীনতা দেশী কথা নয়, বিলাতী আমদানী ও 'লিবার্টি' শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময় স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময় স্বাধীনতার মিত্র।" বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ভারতবর্ষ যখন সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষীয়গণের দ্বারা শাসিত হইত, তখনও প্রজা-সাধারণের স্বাধীনতা বিশেষ ছিল না; কেননা তিনি বলেন—"আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণপীড়িত ছিল।" যদি প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হেতু সাধারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশপ্রাপ্ত না হইয়া থাকে এবং সেই কথা যদি আমরা ইংরাজী-শিক্ষা পাইয়া বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে স্বাধীনতার অভাব-বোধটী বিলাতী আমদানী বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। দায়ভাগ ব্যবহারবিধি এবং আর্থিক অস্বাচ্ছল্য বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা-বোধকে কিয়ৎপরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে এই বোধকে প্রচুর পরিমাণে জাগ্রত করিয়াছে বঙ্কিম-সাহিত্য। এই বিলাতী বস্তুটীর প্রধান আমদানীকারক বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং।

বঙ্কিমচন্দ্র হার্বার্ট স্পেন্সর, আগস্ত কোম্‌ৎ ও জন-ষ্টুয়ার্ট মিলের রচনাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া স্বাধীনতার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছিলেন ও দেশবাসীকে বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার তিনি যে যুগে সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত ছিলেন, সে যুগে ইংলণ্ডের রাজশক্তি মুখ্যতঃ গ্ল্যাডষ্টোনের নীতির দ্বারা পরিচালিত হইত। গ্ল্যাডষ্টোন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিয়া, রাজকর্ম্মচারী নিয়োগে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া এবং সামরিক বিভাগের উচ্চ পদসমূহে ধনিক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার লোপ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে অর্থ ও সম্মান লাভের সমান সুযোগ দিতেছেন বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রবন্ধের নাম 'সাম্য' দেখিয়াই আজকাল অনেকে তাঁহাকে কম্যুনিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন এবং 'কমরেড্' বলিয়া অভিনন্দন করিতেছেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য বলিতে স্বাধীনতাই বুঝাইয়াছেন—অন্য কিছু নহে। তাঁহার তথাকথিত সাম্য যে গ্ল্যাড্ষ্টোনীয় নীতির নামান্তর মাত্র, তাহা তাঁহার নিম্নউদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝা যাইবে। "সাম্য নীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখনই হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।" এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কম্যুনিজিমের মূলনীতিকে অস্বীকার করিয়াছেন।

যদি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ স্থির করিতেন যে লোকের বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা এবং বলের তারতম্য স্বাভাবিক, তাহা হইলে তাঁহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া শ্রেণী-বিহীন্ রাষ্ট্র স্থাপনে আত্ম-নিয়োগ করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা করিতে অগ্রসর হইয়াছি বলিয়াই যে, তিনি যাহা করেন নাই বা যাহা বলেন নাই—তাঁহাতে তাহা আরোপ করিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্কিম পূরাপুরি কম্যুনিষ্ট না হইলেও, রাষ্ট্রীক অবস্থার পরিবর্ত্তন যে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের উপর নির্ভর করে—তাহা স্বীয় প্রতিভাবলে সেই যুগেই বুঝিয়া ঐ মত প্রচার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কি স্বাতন্ত্র্য, কি স্বাধীনতা কিছুই লাভ করা যায় না, যতদিন না জনসাধারণের অবস্থা উন্নত হয়। রাজপুরুষ অত্যাচারী হইয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ কেন করে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন—"যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জ্জনে ব্যগ্র এবং সন্তুষ্ট স্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী।.........যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্ম্মতি দেখিলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। বিরোধেই উভয় পক্ষে উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার ইহা নহে। নিত্য মল্লযুদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানসিক গুণ সকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। নির্ব্বিরোধে তৎসমুদয়ের লোপ।"

'লকে'র নীতি অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমা এতদূর বাড়াইয়াছেন যে, আজ হিট্লার, মুসোলিনীর যুগে তাঁহার মত স্মরণ করার বিশেষ সার্থকতা আছে। তিনি বলেন যে "রাজা যখন প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেননা, রাজার স্বেচ্ছাচারিতায় সমাজের অমঙ্গল।......রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্ম্মতঃ সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহাবা সম্মানের পাত্র।" এই মতবাদের অন্তরালে রাষ্ট্রনীতির কয়েকটী গভীর সমস্যা লুক্কায়িত আছে। রাজা সুশাসন করিতেছেন কিনা, কিংবা রাজপুরুষণ ধর্ম্মতঃ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন কিনা—তাহা বিচার করিবে কে? প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ইহা বিচার করিবেন—ইহাই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বলিবার উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলেই যে স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া একমত হইবেন তাহার প্রমাণ কি? কতকগুলি লোকের মনে হইতে পারে যে, রাজা বা রাজকর্ম্মচারীরা অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন; আবার কতকগুলি লোক ভাবিতে পারেন যে, না, তাঁহারা ন্যায্য কাজই করিতেছেন। এরূপ মতভেদ উপস্থিত হইলে, কে তাহার নিষ্পত্তি করিবে? যদি বলা যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে সিদ্ধান্ত স্থির করা উচিত, তাহা হইলে সংখ্যালঘিষ্টদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকে কোথায়? পাঠককে রুসোর general willএর গোলক ধাঁধায় ফেলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন মনে হয়। তবে তিনি যে ব্যক্তির স্বাধীন মতামতকে কিরূপ উচ্চস্থান দিয়াছেন—তাহা উদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজ যে অধিকতর ব্যাপক, এবং ব্যক্তির উপর সমাজের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর—এই মত বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় দর্শনে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা এতই অসাধারণ ছিল যে, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই উহা উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি সমাজকে আত্মস্থ ও সচেতন করিয়া তাহার অন্তর হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভের

তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে ফুটাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আগে সমাজ, পরে রাষ্ট্র। সমাজ ব্যক্তি ছাড়া নহে বটে, কিন্তু ব্যক্তির সমষ্টির উপরে সমাজের সত্ত্বা। তাই তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশু-জীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজ-ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্ম ধ্বংস ও সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গল ধ্বংস। যদি তাহাই হইল, যদি সমাজ ধ্বংসে ধর্ম্ম ধ্বংস ও মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই কারণেই স্বজনরক্ষা অপেক্ষাও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।" স্বাধীনতার উপাসক বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে কারণপরম্পরা বিন্যাস করিয়া অল্পকে ভূমার জন্য, ব্যষ্টিকে সমষ্টির জন্য, ব্যক্তিকে সমাজের জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার মৌলিক প্রতিভার নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া আসে।

সমাজ রক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অনেক উপরে স্থান দিতেন বলিয়াই, তিনি কুন্দনন্দিনীর বিষপানে আত্মহত্যা অঙ্কন করিয়া বিষবৃক্ষ ছেদন করিয়াছেন, রোহিণীকে গুলি করিয়া মারিয়াছেন, এবং প্রতাপকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিতে বাধ্য করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সুখ খুঁজিলে যে জাতির স্বাতন্ত্র্যলাভের আশা মরীচিকার ন্যায় মিলাইয়া যাইবে, এই চিরন্তন সত্য "সীতারামে" ঘোষণা করিয়াছেন।

স্বাধীনতার উপাসকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখি আমরা তাঁহার সকল চিত্তবৃত্তি অনুশীলনের সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নব-ধর্ম্মস্থাপন প্রচেষ্টায়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রাণ হইতেছে র‍্যাশনালিজম্ (Rationalism) বা একমাত্র বিচার-বুদ্ধির উপর একান্ত প্রত্যয়। নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর বিশ্বাস না থাকিলে লোকে নিজের পথ নিজে বাছিয়া লইতে পারে না, স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার প্রেরণা পায় না। বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্বে", "কৃষ্ণচরিত্রে" এবং গৌণভাবে তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে আমাদের শাস্ত্র ও ধর্ম্মের সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কারসমূহকে বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের র‍্যাশনালিজম্। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তি সাধনায় আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা আমাদের হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি চিরকাল পূজা করিব। *

* চন্দননগর বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসবে পঠিত।

জীবন-মরণ

শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর

অসীম সাগর বুকে সমীর-লীলায়—
সসীম প্রবাহ উঠে ব্যাকুল মায়ায়।
পবন থামিয়া যায়, প্রবাহ মিশায়,
আপনারে সঁপে রূপ অরূপ কায়ায়

যে পথে তুমি প্রিয়

(গল্প)

শ্রীললিত চট্টোপাধ্যায়

১

টপ্‌ টপ্‌ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়টা পরীক্ষা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অনিল যখন এম-এ পড়িতে গেল, তখন অনিলের মা ধরিয়া বসিলেন—"এইবার একটা বিয়ে-থা' কর বাবা, আমি দেখে চোখ জুড়োই।"

স্মিতহাস্যে অনিল বলিল—"এখন নয় মা, এম এ, টা দিয়ে তারপর—"

ঈষৎ ঝাঁঝের সঙ্গে মা বলিলেন—"তুই তো কেবলই বলিস, এখন নয় তখন। দু'টো পাঁচটা নয়, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সেটের আমার একটী, তাও বৌয়ের মুখ দেখতে পাবো না?"

জামা গায়ে দিয়া অনিল আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে মা আবার কথাটা তুলিলেন। হাসিয়া অনিল বলিল—"এত তাড়া কিসের মা?" তাহার কথায় কাণ না দিয়া, কোথায় কোন্‌ মেয়ে দেখিয়া আসিয়াছেন, মা তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অনিল বলিল—"একটু আস্তে, এক নিঃশ্বাসে অতগুলো বলে গেলে, হিসাব রাখি কী করে?"

প্রসন্ন হইয়া মা বলিলেন—"বেশ তো, পছন্দ কর না কেন?"

—"পছন্দ আমি করবো? সে তুমি জান।"

আহ্লাদে গদগদ হইয়া মা বলিলেন—"তা'হলে কালই সব ঠিক ক'রে আসি? আসছে মাসেই—"

অনিল বলিল, "আমার কিন্তু সর্ত্ত আছে মা—বৌ চেয়েছো, বৌ-ই পাবে।"

মা তাহাই মানিয়া লইলেন। মনে মনে ভাবিলেন—"অমন সবাই ব'লে, তারপর সত্যিই কিছু আর তেমনি হবে না।"

অনিল তখন এলাহাবাদে মোটা বেতনের কোন এক সরকারী কর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত। মায়ের জেদে পড়িয়া নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় অনিল নমিতাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কন্যাপক্ষ বর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। রূপগুণে যেন কার্ত্তিক। নমিতা অনিলের সে সুদৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ-কান্তি দেখিয়া সত্যই অবনত হইতে চাহিল। এই তার স্বামী? কিন্তু আধুনিকতায় সে ভরপুর। ইঁহারই সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া ইঁহারই সেবায় নিজকে উৎসর্গ করিয়া চিরজীবন তাহাকে কাটাইতে হইবে? না সে কখনই তাহা পারিবে না। এতদিন সে এই শিক্ষাই পাইয়াছে নাকি?...হলেনই বা তিনি স্বামী—হলেনই বা তিনি পুরুষ। তাই বলিয়া এই একতরফা ভোগদখল সে সহ্য করিতে পারিবে না। মনে মনে সে মুক্তির ছিদ্র খুঁজিতে লাগিল।...

কিন্তু সে কী করিবে? তার কি মা-বাপ আছে, যে তাঁদের উপর সে জোর খাটাইবে? অনাদরে এরূপ দাদার গলগ্রহ হইয়া থাকা অপেক্ষা যদি সে একটু আদর, একটু স্নেহ পায় তো সারাজীবন সে হাসিমুখে ইঁহার সেবায় কাটাইতে পারিবে।...

জ্যোৎস্নার আলোকে পৃথিবী ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছের পাতায় পাতায় সে সুষমা আরও পরিব্যাপ্ত। দূরে দিগ্বলয়ে সে সৌন্দর্য্য অস্ফুট। স্থির, গভীর, নীল যমুনা-জলে দরবিগলিত জোছনাধারা যেন শ্যামসুন্দরে রাধার রূপ-জ্যোৎস্নার বিচিত্র বিকাশ!

এক মনে অনিল এই সৌন্দর্য্যসুধা যতই পান করিতে লাগিল—ততই তার মন বর্ত্তমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, যেখানে মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ আজও সে অনুভব করে নাই, সেখানে কোন্‌ নীতির আশ্রয়ে সে আর একজনকে জড়াইতে চায়?

এত মুক্ত, তবুও বন্ধন ? সে বুঝাইয়া বলিবে—কিন্তু নমিতা যদি রাজী না হয় ? সে পুষ্পকোরকের মত নির্ম্মল মুখকান্তি মনে পড়িতেই, অনিল নমিতার প্রতি মমতায় গলিয়া গেল।...নীচে তখনও বিবাহ-বাড়ীর ক্রম-স্তিমিত গোলযোগ শোনা যাইতেছিল।

দূর সম্পর্কীয়া এক ভগিনী নীলিমা আসিয়া ডাকিল—"দাদা শোবে চল, আজ যে একঘরে শুতে হয় :" বেদনায় অনিল ফুটিফাটা হইয়া গেল। যতই তাহাকে সে এড়াইতে চায়, ততই সে যেন আরও জটিল হইয়া আছে। মা আসিয়া ডাকিলেন ঃ অনিল ঘরে গেল—মায়ের আদেশ সে কখনও অমান্য করে নাই।

ঘরে ঢুকিয়াই অনিল দেখিল, অন্ধকারের মধ্যে উপ্‌চাইয়া পড়া খানিকটা চাঁদের আলোক মেঝের উপর গড়াগড়ি যাইতেছে। সুগন্ধি বাতাসে ঘর ভরপুর। শয্যার একধারে নববধূ। দ্বিতীয় উপকরণ না থাকায় বাধ্য হইয়া সে শয্যার একদিক্ গ্রহণ করিল। নমিতা তখন চাহিয়াছে। অদ্বিতীয় এতক্ষণ দ্বিতীয়ের সন্ধান পাওয়ায় উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। অনিল জিজ্ঞাসা করিল—"কতদূর পড়েছো ?"

নমিতার যেন কান্না পাইল। এই কি আজিকার সম্ভাষণ ? ত্রিভুবনে ইহা ছাড়া কি আর কথা ছিল না ? দুর্জ্জয় অভিমানে সে প্রায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। যথাসম্ভব সংযত হইয়া কহিল—"আই, এস্-সি।"

আবার চুপচাপ।

নমিতার কান্না পাইল। অনিলকে ঠেলা দিয়া কহিল—"ঘুমুলে না কি ?"

নড়িয়া চড়িয়া অনিল বলিল—"না, ঘুমুই নি"—তারপর একনিঃশ্বাসে যেন মুখস্থ বলার মত বলিয়া গেল—"তুমি জান বোধ হয়, যে আমার বিয়ে করবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না—তবে মায়ের বিশেষ জেদে পড়েই করেছি, তা' তোমার যদি বিশেষ অসুবিধা হয় তো—"

কে যেন নমিতাকে বিছানা হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। এই কী তার স্বামীর কথা ? যাহার সঙ্গে সারা জীবনের সম্বন্ধ, সে তুলিবে আজ সুবিধা-অসুবিধার কথা ? বহুদিনের সঞ্চিত ব্যথারাশি আবার জাগিয়া উঠিয়া ফোঁটায় গলিয়া পড়িল। বেশ ! সে-ই যদি তার অসুবিধার কারণ হইয়া থাকে—সে তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে। তাই সেও বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল—"তোমার যখন দরকার নেই, তখন আমিও আমার প্রয়োজনীয়তা পায়ে ধ'রে তোমাকে বোঝাতে যাব না।" তার পর মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

অনিলও বুঝিল, কথাটা বলিয়া সে ভাল করে নাই। কিন্তু আর তো ফিরাইয়া লওয়া যায় না ? সে ভাবিয়াছিল হয় তো এই লইয়া খুব একটা মান-অভিমানের পালা পড়িয়া যাইবে। কিন্তু হইল ঠিক বিপরীত। নমিতা নারী হইয়াও যদি এতটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে পারে, তবে সেও তাহাকে বুঝাইবে যে সেও পুরুষ !

তার পর প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কেউ কারও খবর রাখে না। তবে অনিল এইটুকু জানে যে, নমিতা তার দাদার কাছে থাকে না।

মা ভিতরের অত খবর রাখিতেন না। নমিতাকে আনিতে বলিলে সে আজ নয়, কাল ইত্যাদি নানা অজুহাতে ব্যাপারটা এড়াইয়া চলিত। শেষে একদিন মা যখন কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া তুলিলেন, তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া নমিতার খোঁজে তার দাদার নিকট খবর পাঠাইতে হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না।

অনিল তখন মুঙ্গেরে বদলি হইয়া আসিয়াছে। শীতের গোড়ার দিকেই অনিলের মা হঠাৎ একযোগে অনেকগুলি শক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারের খোঁজে যাইতে সেখানে খুব অপ্রত্যাশিতভাবে নমিতার সঙ্গে তার দেখা হইয়া গেল।

ট্যাক্সি হাঁকাইয়া লেডি-ডাক্তার আসিল অনিলের মাকে দেখিতে। অনিল দেখিল সে নমিতা। রোগীর তখন ঘোর 'ডিলিরিয়াম্' অবস্থা। সমস্ত পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন—"পেসেন্‌ট্ যে রকম 'রেস্‌ট্‌লেস্' হ'য়ে পড়েছেন, তাতে একজন নার্স রাখা দরকার।"

জড়াইয়া জড়াইয়া অনিল কোন রকমে বলিল—"যা ভাল বোঝ কর।"

......পাঁচ ছয় দিন পরে মা মারা গেলেন। অনিল দেখিল, মাকে বাঁচাইবার নমিতার সে কী অদম্য চেষ্টা! নার্সকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই, তাই নিজে আসিয়াছে—মায়ের সেবার ভার লইতে। এতদিন দিন-রাত পরিশ্রম করিয়া সে মাকে বাঁচাইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু চেষ্টার কোন ত্রুটি সে হইতে দেয় নাই। এ কয়দিন তাহাকে অনেকটা দুর্ব্বল দেখাইতেছিল। তারপর তার সান্ত্বনার বাণী! এমন স্ত্রীকেও সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে! এ কয়দিন নমিতা অনিলের বাড়ীতেই ছিল। সমস্ত শেষ হইয়া গেলে সে আবার চলিয়া যাইবে।

সেদিন রাত্রে অনিল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি সত্যই যাবে না কি?"

নমিতা বেশ শান্ত ভাবেই উত্তর দিল—"হাঁ, কালই যেতে হবে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"যদি যেতে না দিই।"

"সে জোর আপনার নেই মিঃ মুখাজ্জি, সে তো সেই রাত্রেই কাটিয়ে দিয়েছেন!"

"মিঃ মুখার্জ্জি?" দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অনিল ভাবিল, "স্বামিত্বের দাবীটুকুও স্বীকার করতে চায় না।"

সকালে নমিতার মোটর আসিয়া পৌছিল। নমিতা অনিলের নিকট বিদায় লইল।

কোন রকমে গলাটাকে একবার ঝাড়া দিয়া অনিল বলিল—"বুঝলে না নমিতা, একটা সামান্য ভুলের কি সংশোধন নেই?"

গম্ভীর ভাবে নমিতা উত্তর দিল—"না, তার আর সময় দিলেন কই—আপনার অসুবিধা—"

অনিলের পিঠে যেন সজোরে চাবুকের আঘাত পড়িল। এখনও ভোলে নাই। একখানা কার্ড দিয়া নমিতা বলিল —"যদি কখন দরকার হয়, খবর দেবেন।......মোটরে নমিতা চলিয়া গেল।......

অনিল ভাবিল, নমিতা তাহাকে চায় না। আঘাতের মাত্রাটা অবশ্য একটু বেশীই হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তার কি আর কোন উপায় নাই?—সেও চায় না। জীবনের বাকী কয়টা দিন সে এমনি করিয়াই কাটাইয়া দিবে। চিন্তা দূর করিবার জন্য সে খবরের কাগজে মনোযোগ দিল। মনের নিভৃত কোণে কেবলই সে কথাটা উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল—"সে জোর আপনার নেই মিঃ মুখাজ্জি?" একবারের জন্যও সে নমিতার প্রতি মমতায় গলিয়া গেল। মনে মনে বলিল—ওরে অবোধ বালিকা, অভিমানের আতিশয্যে তুমি যতই কেন না নিজেকে ছিনাইয়া নিয়া যাও—কিন্তু চিরন্তনের কাছে ইহা অচ্ছেদ্য। নিজেকে যতই কেন না তুমি স্বাধীন মনে কর, মনের প্রতি কণায় যে তুমি অধীন! আজ যে অভিমানের তীব্রতায় তুমি নিজেকে এমনি করিয়া ছিনাইয়া নিয়া গেলে—সেই অভিমানেরই গভীরতায় আবার তোমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। দারুণ বেদনায় অনিল টেবিলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল কেহ ঠিক করিতে পারিল না। সকালে যে সহর গগনচুম্বী বিবিধ হর্ম্ম্যমালায় সুশোভিত ছিল—দ্বিপ্রহরে তাহার চিহ্ন কোথায়? পৃথিবীর এক লহমার সঞ্চালনে সমস্ত মুঙ্গের সহর বিপর্য্যস্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত! কলহাস্যমুখরিত সহর ব্যথিতের বুকফাটা আর্ত্তনাদে সমাচ্ছন্ন। নমিতার বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল।—"রবিবার" বাড়ীতেই হয়তো ছিলেন; দারুণ উত্তেজনায় সে অনিলের বাড়ীর দিকে ছুটিল। চারিদিকেই ধ্বংসস্তূপ। তার মাঝে কে কার সন্ধান লয়! চারিদিকে আহতের আর্ত্তনাদ! একটা অজানিত আশঙ্কায় নমিতার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। "রক্ষা পেয়েছেন তো?" সে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সে কোন সন্ধান করিতে পারিল না, একা স্ত্রীলোক সে কী করিতে পারে? অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করিয়া সে বাসায় ফিরিল। আসিয়া দেখিল তাহার বাড়ীটাই হইয়াছে হাঁসপাতাল। তার বাড়ীর যে দিকটা পড়িয়া গিয়াছে—সেখানটা পরিষ্কার করিয়া সেখানে তাঁবু খোলা হইয়াছে।

সে রাত্রি আহতের শুশ্রূষাতেই কাটিয়া গেল। সকালে স্নানাদির পর একটু বিশ্রাম করিতেছে—হঠাৎ

কেন্দ্রিয় সেবাশ্রমের হাসপাতালে যাইবার জন্য তাহার ডাক আসিল। এখানকার চার্জ্জ—হাঁসপাতাল-প্রেরিত একজন সহকারীর উপর বুঝাইয়া দিয়া নমিতা চলিয়া গেল। সর্ব্বদাই একটা অজানিত আশঙ্কা তাহাকে ঘিরিয়া আছে। হাসপাতালে সে অনিলের খোঁজ করিল। প্রত্যেক ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরিয়াও যখন তাহার সন্ধান মিলিল না, তখন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। মনে মনে একবার নীরবে প্রার্থনা করিল—"ভগবান, তিনি যেন নিরাপদে থাকেন!" আসিবার সময় অনিলের সেদিনকার ব্যথাহত মুখ তাহার মনে পড়িল।

সন্ধ্যার সময়ে সে একখানি মাসিক পত্র পড়িতেছে, একজন রোগী আসিয়া "এমার্জ্জেন্সি" ওয়ার্ডে ভর্ত্তি হইল। নমিতার ডাক আসিল। ঔষধপত্র ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি নার্সের হাতে দিয়া সে রোগী পরীক্ষা করিতে গেল। রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান। ভলান্টিয়ারদের মুখে শুনিল যে, দুইদিন পরে তাহাকে ধ্বংসস্তূপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।

দেখিয়াই নমিতার মাথাটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিল সে নিজের ঘরে শুইয়া আছে। য়্যাটেন্ডিং অফিসার তাহাকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"৭নং এমারজেন্সি পেসেণ্ট" কেমন আছে স্যর্?"

"ভাল, তবে এখনও জ্ঞান হয়নি", বলিয়া অফিসার চলিয়া গেলেন। নার্সের নিষেধসত্বেও নমিতা উঠিয়া গেল। দেখিল, অনিলের ঘরে আরও রোগী আসিয়াছে। তাহার "বেড্"এর কাছে গিয়া সে তাহার আঘাত পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে অনিলের একটু জ্ঞান হইল। দু'একটা যন্ত্রনাসূচক মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। পরদিন সকালে নমিতা সরাসরি "রেসিডেণ্ট্ সার্জ্জেন"কে ধরিয়া বসিল: বলিল,—"৭নং এমারজেণ্ট্ পেসেণ্টকে ছেড়ে দিন, আমি বাঁড়ী নিয়ে যাই।"

তিনি নমিতাকে খুব ভালবাসিতেন: বলিলেন, "কেন, মিস্ রায় (নমিতাকে সবাই মিস্ রায় বলিয়াই জানে) উনি কী আপনার কোন আত্মীয়?—কিন্তু এখন তো ছাড়া যায় না?"

নমিতা কী বলিবে যে উনি তার কে? উনি যে তার সর্ব্বস্ব—কিন্তু বুঝিবার ভুলে সে আজ তাঁর কেউ নয়।—তারপর উদ্বেলিত কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল—"আপনার পায়ে পড়ি, ওঁকে ছেড়ে দিন, যা' হবার আমার সামনে হোক—নির্ব্বান্ধব হাসপাতালে আমি ওঁকে মরতে দিতে পারব না—।"

বিকাল বেলা নমিতা অনিলকে হাসপাতাল হইতে ডিস্চার্জ্জ করাইয়া, "অ্যাম্বুলেন্সে" করিয়া তাহার বাসায় লইয়া আসিল।

অনিলের বিছানার কাছে একটা চেয়ারে বসিয়া মাঝে মাঝে আহত স্থানে 'লোসন্' দিয়া প্রলেপ দিতেছে। তাহার আঘাত-পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল: ভাবিল অনিলের পা দু'খানিকে চোখের জলে ধোয়াইয়া সে তাহার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লয়। কিন্তু তাহাতে কী হইবে? সে অনিলের বুকে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ওগো, আমার উপর অভিমান ক'রে আমায় ছেড়ে যেও না। একটা দিনও তোমার সেবা করতে পারি নি। নিজের বিষে নিজেই জলছি—ফিরে এস—যেও না..."

সার্জ্জেন ক্যাপ্টেন দত্ত অনিলকে রোজ দেখিতে আসিতেন, ঘরে ঢুকিবার মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দিবারাত্র হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে কাটাইয়া এ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য—এ অনুরাগ দেখিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। তাই এ দৃশ্যে তাঁরও চোখের পাতা চক্চক্ করিয়া উঠিল। দরজা খোলার শব্দে নমিতা উঠিয়া বসিয়াছে

ডাক্তার বলিলেন, "মা, একটু স'রে ব'সো দেখি।"

নমিতা চমকাইয়া উঠিল—'মা'? 'কই মিস্ রায় ব'লে তো ডাকলেন না।' মা ডাক সে এতদিন শোনেই নাই। এ ঈপ্সিত ডাক সে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছে। তার মনে পড়িল সেই রাত্রির কথা। কেন সে অনিলের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চায় নাই! তাহা হইলে তো ব্যাপারটা এতদূর গড়াইত না। তারপর সে আছড়াইয়া ডাক্তারের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—"বাঁচান, ডাক্তারবাবু, আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান। আমারই জন্য আজ ওঁর এই

অবস্থা।" রাত্রে অনিলের অসংলগ্ন প্রলাপের মধ্যে সে এইটুকুই বুঝিয়াছে।

কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া ডাক্তার বলিলেন—"স্বামী? তবে তুমি—"

"আমি বিবাহিত, ইনিই আমার স্বামী! তীব্র অভিমানের বশে আমি আপনাদের প্রতারিত করেছি—তারই এই প্রায়শ্চিত্ত—বাঁচান, আপনি স্বামীকে বাঁচান।"

প্রথমে দেখিয়াই ডাক্তার অবশ্য অনুমান করিয়াছিলেন। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"অত অধৈর্য্য হ'য়ো না মা, তুমিও তো একজন ডাক্তার।"

ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। রাত্রে অনিলের জ্ঞান হইল। ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কোথায়?" নমিতা কী উত্তর দিবে? উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া বলিল—"আমার কাছে, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবো?"

"দাও" বলিয়া চুপ করিল। তারপর বলিল,—"আমি কী হাসপাতালে?"

"না, আমার কাছে।"

"কে তুমি, নমিতা?" তারপর ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিল—"কেন তুমি আমাকে কুড়িয়ে আনলে? বেশ তো মর্‌ছিলাম! মা তো গেছেনই—তুমিও চলে গেছলে—আবার কেন ছেঁড়া সুতা গ্রন্থি দেবার চেষ্টা?" অনিলের চোখের কোণ বহিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

নমিতার ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভাঙিয়া পড়িল। ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—"আমায় খুব বকো, এবারকার মত আমায় মাপ করো—আমি আর কিছু চাই না, চাই শুধু তোমাকে।"

নমিতার হাতখানি আস্তে আস্তে বুকের উপর রাখিয়া অনিল বলিল,—"বড় যন্ত্রণা—একটু জল।"

জলের বদলে নমিতা তাহাকে ঔষধ-মিশ্রিত খানিকটা গরম দুধ খাইতে দিল। সমস্ত অঙ্গে তাহার ছেঁচার দাগ। আস্তে আস্তে সে তাহার মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল।

৫

অনিল একটু সুস্থ হওয়ার পর নমিতা তাহাকে নার্সের যাইতেছে। সেদিন সন্ধ্যায় হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া নমিতা দেখিল, অনিল জানালার কাছে চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছে। সে স্নানাদি সারিয়া গরম এক কাপ দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিল।

"কতক্ষণ ব'সে আছ?"

"অনেকক্ষণ।"

"এখনও কি দুর্ব্বলতা খুবই আছে?"

"না, ততটা নেই—যেতে পারব।"

নমিতার চক্ষে জল আসিল। নমিতার দিকে চাহিয়া অনিল বলিল,—"মিস্ রায়, আমাকে দয়া করে একটু ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন। আপনার দয়ায় অনেকটা সেরেছি, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

নমিতার হাত হইতে দুধের বাটী মেঝেয় পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। কথার খোঁচাটা সে ঠিক ফিরাইয়া মারিয়াছে।

নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া সহজ কণ্ঠে নমিতা বলিল,—"যেতে অবশ্য পারেন—তবে আমি একজন মেডিক্যাল-ম্যান হ'য়ে আপনাকে যেতে বল্‌তে পারি না—তার উপর আপনি এখনও অন্য একজনের চিকিৎসাধীন..." সে চুপ করিয়া রহিল......।

অনিলের এ নির্লিপ্তভাব তাহার সহ্য হইতেছিল না। নিজের উদ্ধতভাবকে দমন করিয়া এতদিন কোন রকমে চলিতেছিল—আর পারিল না।

সন্ধ্যার কিছু পরে অনিল বিছানার উপর বালিসে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। দুধ লইয়া নমিতা বলিল—"খাও"। সর্বেমাত্র স্নান সারিয়া আসিয়াছে। চুল বহিয়া তখনও দু' এক ফোঁটা জল ঝরিতেছে। অনিল দেখিল, তাহার সীমন্তে সিঁদুর।

নমিতা অনিলের চাহনির অর্থ বুঝিল: বলিল, "কী দেখছো চেয়ে—জুড়িয়ে গেল যে! খেয়ে নাও।"

ধীরকণ্ঠে উত্তর করিল—"রেখে যান চাপা দিয়ে—"

নমিতা গলিয়া থস্‌থসে হইয়া গেল। টেবিলে দুধের বাটী রাখিয়া অনিলের পায়ের উপর ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া পড়িল। অশ্রুনিরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"এমনি ক'রে তিল তিল ক'রে আমায় পুড়িয়ে তোমার কী হবে—আমায়

অনিলের পায়ের উপর পড়িয়া সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মান-অভিমানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া অনিলের চোখে তখন জল দাঁড়াইয়াছে। তার মাথাটাকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইয়া নির্ব্বাক্ অনিল চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া দিল। স্পর্শসুখে সে তখন বিভোর।

সোহাগে গলিয়া গিয়া নমিতা বলিল—"স্বামী, দেবতা, তোমার দেওয়া ভূষণকে ভস্ম মনে ক'রে ফেলে দিয়ে অনেক শান্তি পেয়েছি। হারাবার মুখে তোমাকে যখন আবার খুঁজে পেয়েছি, তখন আর ছেড়ে দেব না। যে পথে তুমি চলেছ, আমাকেও সেই পথে চালিয়ে নিয়ে চল।"

আবেগভরে অনিল তার মুখে একটী চুম্বনের চিহ্ন আঁকিয়া দিল।

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত নমিতা অনিলের আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে একেবারে এলাইয়া দিয়াছে।...মনে পড়িল সেই রাত্রির কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বঙ্কিমকে যাঁরা বড় ঔপন্যাসিক, বড় প্রবন্ধকার, বড় রসরচয়িতা, বড় ধর্ম্মোপদেষ্টা বা জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত বা ঐরূপ-কিছু বলিয়া থাকেন, তাঁরা অন্ধের হস্তিদর্শন-ন্যায়ের মতে একদেশদর্শী। বঙ্কিম একাধারে এই সমস্তই এবং এই সমস্তের অপেক্ষাও বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন, এক কথায় যাকে বলে—Apostle of Culture—সর্ব্বসংস্কৃতির অবতার। মনে হইতেছে এ নাম তাঁর প্রথম দিয়াছিলেন—বাগ্মিবর রেভাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা University Institute-এর এক সভার সভাপতিরূপে। তখন এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "Higher Training for Young Men"। সেদিনকার সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। অনেক দিনের কথা—প্রায় ৪৪।৪৫ বৎসর পূর্ব্বেকার, ঠিক সবটা মনে নাই। বঙ্কিম ১৩০০ সালের চৈত্রমাসে স্বর্গগত হ'ন,—তাহারই পরে, বোধহয়। ঐ সময়েই Town Hall-এ বঙ্কিম-শোকসভায় দেশমান্য সুরেন্দ্রনাথও ঐরূপ কথা তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, বঙ্কিম আত্মশক্তিবলেই চিরস্থায়ী। কীর্ত্তিই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ—অন্য memorial-এর প্রয়োজন নাই; তাঁহার বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, কপালকুণ্ডলা, তাঁহার আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, তাঁহার কমলাকান্ত, বিবিধপ্রবন্ধ, তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাঁহার memorial-এর কাজ করিবে। বক্তানির্দ্দিষ্ট এই চতুর্বিভাগই যেন বঙ্কিম-হিমালয়ের চতুশ্চূড়া। সেদিনও আমি উপস্থিত ছিলাম। রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "হিমালয়কে স্মরণ রাখিবার জন্য কি চাঁদা করিয়া তাহার একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করার প্রয়োজন আছে?" বঙ্কিমসম্বন্ধে ইহাই বোধ করি অল্পের মধ্যে চরম কথা।

বঙ্গসাহিত্যের প্রথম বিরাট্ শিল্পী ছিলেন এই বঙ্কিম। বঙ্গভাষার যে অবস্থা হইতে ও যে উপাদান লইয়া তিনি তাহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন, সে কথা ভাবিতে বাস্তবিকই বিস্ময় বোধ হয়। ভিখারিণীকে পথের ধূলা হইতে কুড়াইয়া এ যেন যাদুমন্ত্রবলে রাজরাণী করিয়া তোলা! আজ যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যকে অপূর্ব্ব কাব্যশ্রীমণ্ডিত করিয়া নানা রত্নালঙ্কার সাহায্যে সাহিত্য-রাজসূয়ের রাজরাজেন্দ্রাণীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, বঙ্কিমের হাত যে তাহাতে কতখানি, ভাবিয়া দেখিবার কথা। রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরসাধক হইলেও এবং শরৎচন্দ্র তাহার তন্ত্রধারক হইলেও, বঙ্কিমই যে বঙ্গসাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক, একথা অস্বীকার করিবার কারণ নাই এবং আজ ৮০ বৎসর ধরিয়া সেই বঙ্কিমযুগই চলিতেছে, এমন কথাও বলা যায়। কেন

বলিতেছি, তাহার কারণ—এ পর্য্যন্ত অন্য কেহ সাহিত্যে উচ্চতর বা ভিন্নতর আদর্শ দেখাইতে পারেন নাই। রবির আলোকে ও শরৎচন্দ্রের কিরণে তাহা অনেকাংশে উদ্ভাসিত ও সৌন্দর্য্যশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিলেও, আদর্শের ব্যত্যয় হয় নাই, যুগান্তর ঘটে নাই। ভাব ও ভাষার আধুনিক বিপর্য্যয়কে আমি আদর্শের অন্যথা বলিতে চাহি না। নদীর বাঁক মাত্র। তরঙ্গভঙ্গে সাময়িক বিক্ষোভ ঘটিলেও, ধারা পরিবর্ত্তনের কারণ আজিও দৃষ্টিগোচর নহে। 'যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে' বলিয়া যে প্রচলন আছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য বাদে বঙ্কিমকেও বোধ করি, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালা-সম্পর্কে সেইরূপ উচ্চাসনের অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। যাহা বঙ্কিমে নাই, তাহা বাঙ্গালায় নাই।

রসসাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হইয়াও বঙ্কিম মানুষের মনুষ্যত্ববোধের আদর্শকে অপরূপ রূপদান করিয়াছেন। এ মণিকাঞ্চনযোগ বড় সহজে ঘটে না। এ দেশের যাহা কিছু ভাল ও শ্রেষ্ঠ, তাহার সহিত বিদেশের যাহা কিছু ভাল ও শ্রেষ্ঠ মিলাইয়া প্রথমেই তিনি মাতৃভাষার মন্দির গাঁথিতে বসিলেন। পুরাতনের প্রাণহীন পরিবর্জ্জনীয় পন্থা পরিত্যাগ করিতে দ্বিধামাত্র করিলেন না। আজন্ম সৌন্দর্য্যের উপাসক তিনি—সকল স্থান হইতেই তিল তিল সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে সৌন্দর্য্যের তিলোত্তমা গড়িতে লাগিলেন। পুস্তকে পুস্তকে তাঁহার এই সুন্দর-পূজার পরিচয় পাই। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পিপাসা মিটে না! নিজনির্ম্মিত মন্দিরে কাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, স্থির করিতে পারেন না! বিশ্বারাধ্যা বাণী-মূর্ত্তিতেও তাঁহার চিত্ত ভরিল না। তাই, সুন্দর হইতেও যা' সুন্দর, তাহার উপর দেশের পক্ষে যাহা শুভ, যাহা সত্য, সেই সর্ব্বরূপগুণান্বিতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্না মহামহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি বহু সাধনায় সন্ধান করিয়া তাহাকেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী করিয়া রত্নসিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। তাহাই কমলাকান্ত-কল্পিত দুর্গামূর্ত্তি। দেশের এই মাতৃমূর্ত্তি তাঁহার অপূর্ব্ব কল্পনা। শুধু বাণী নহে, শুধু লক্ষ্মী নহে, শুধু সিদ্ধি নহে, শুধু শক্তি নহে, একাধারে সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত মাতৃমূর্ত্তি। তাঁহারই পূজার জন্য দশভুজার সন্তান দশহাতে ষোড়শোপচার সেবায় মন দিলেন এবং আপামরসাধারণকে সেই মাতৃপূজায় দীক্ষিত করিলেন। শুভসঙ্গত সত্যসুন্দরকে একত্র মিলাইয়া, যাহা abstract তাহাকে concrete করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সাহিত্যের সঙ্গে মনুষ্যত্ব ও দেশসেবা মিলিয়া বাঙ্গালীর সেদিন আত্মবোধের প্রতিষ্ঠা হইল। বাঙ্গলায় শুভযুগের সূচনা হইল।

অনেকে বঙ্কিমকে আভিজাত্যগর্ব্বিত অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করেন। অহঙ্কার তাঁহার ছিল, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণের আভিজাত্যের অহঙ্কার নহে, সংস্কৃতির আভিজাত্যের। বাজে কাজে, বাজে লোকের সহিত বাজে কথায় তিনি কদাচ সময় নষ্ট করিতেন না। ইহাকে অহঙ্কার বলা যায় না। যিনি প্রীতিকেই ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যিনি দেশাত্মবোধের মন্ত্রদ্রষ্টা, তিনি কি কখনও দেশকে তথা দেশের লোককে উপেক্ষা করিতে পারেন? তবে তাঁহার ব্যক্তিত্বের তেজে ও গাম্ভীর্য্যে অনেকে প্রতিহত হইত, একথা হয় ত সত্য; কিন্তু তাহা অহঙ্কার নহে, একথাও নিশ্চিত। দেশের প্রতি বা দশের প্রতি তাঁহার যে মমত্ববোধ ছিল, তাহা কেবল দুর্ল্লভ নহে, অলভ। নতুবা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে ও নবাগত বিলাতী সভ্যতার বাহ্যিক মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া তিনি ছাড়া দেশ সম্বন্ধে কে বলিতে পারিত—"তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের (দেশের লোকের) কি মঙ্গল সাধিতেছ? আর তুমি ইংরাজ বাহাদুর, তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে হাসিম সেখ ও রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে? আমি বলি, অণুমাত্রও না, কণামাত্রও না।...তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? হিসাব করিলে, তাহারাই দেশ। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে, আমা হইতে কোন্ কাজ হইতে পারে; কিন্তু সকল কৃষিজীবি ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গলও নাই।"—ইহা কি আভিজাত্যের অহঙ্কারের কথা? এ সম্বন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতার একটি গল্প বলিব। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। আমার এক দাদা মেডিক্যাল কলেজে

পড়িতেন। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ী আসিয়া কহিলেন,—'তোমাদের বঙ্কিম তো বড় অহঙ্কারী হে! তাঁর বেদের বক্তৃতা শুনে' ভাল লেগেছিল বলে' আমরা ১০।১২ জন কলেজের বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। খবর পেয়ে তিনি এলেন বটে, কিন্তু আমাদের না বস্‌তে বলে'ই জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা সব কি কর, কি চাও, কি জন্যে এসেছ? আমরা বল্‌লাম, আমরা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, সেদিন আপনার বক্তৃতা ভারী ভাল লেগেছিল, তাই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি। তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে বল্‌লেন, দেখা তো হ'ল, এবার বাড়ী যাও। বাড়ী গিয়ে খুব ভালো করে' মন দিয়ে সব পড়ো গিয়ে। তোমাদের অনেকেরই বাপ, মা কি কষ্টে টাকা যোগাড় করে' তোমাদের পড়াচ্ছেন, আমি জানি। মন দিয়ে পড়ে' ও পাশ করে' তাঁদের কষ্টের লাঘব কর আর নিজেরাও মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াও। এখন পড়াই তোমাদের ধর্ম্ম, অন্য কাজে সময় নষ্ট করো না। এই ব'লে যেমন এসেছিলেন, তেমনি ধীরে ধীরে ফিরে' গেলেন।' আলাপ কিঞ্চিৎ রূঢ় হইয়াছিল, স্বীকার করিব; কিন্তু পাঠার্থী যুবকদের প্রতি এই মহামনীষীর মর্ম্মকথাকে আমরা অহঙ্কার বলিব, না, শুভার্থীর সত্যকার স্নেহোপদেশ মনে করিব?

চিন্তাশীলতার সহজ গাম্ভীর্য্যের জন্যও অনেকে তাঁহার কার্য্যকলাপে অহঙ্কারের আরোপ করিয়া থাকেন। রামমোহন রায়ের পরে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ ব্যতীত এরূপ বলিষ্ঠ পুরুষকার ও পৌরুষ আর দেখা যায় না। তাই, দুর্ব্বল বাঙ্গালী অনেক সময় তাঁহার স্বরূপ চিনিতে না পারিয়া তাঁহার অনন্যসুলভ দৃঢ়তাকে অহমিকা বলিয়া ভুল করিত। তাঁহার চিন্তায়, রচনায়, বাক্যালাপে, এমন কি, তাঁহার সরকারী কর্ম্মজীবনেও যে বিপুল পৌরুষশক্তি ছিল, তাহা ক্রমে লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাঁহার অহঙ্কার অহঙ্কার নহে, অহংজ্ঞান; বিরাট্ ব্যক্তিত্বের তেজে ভরা গাম্ভীর্য্য ও পুরুষকারের অজেয় পৌরুষ। এই পৌরুষের তিনি অবতার ছিলেন। সেদিনও শান্তিনিকেতনে বঙ্কিম-শত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "খুব রাশভারি লোক ছিলেন তিনি।...সেই শুদ্ধ মহান্ সাধক ছিলেন—হিমালয়ের মহাশিখরের মতো নিঃসঙ্গ গম্ভীর। কেউ তাঁর কাছে ঘেঁস্‌তে পারতেন না। ...তাঁর মধ্যে এমন একটা কি ছিল যে, কেউ তাঁর কাছে ঘেঁস্‌তে সাহস করত না। তা'তে হিংসা হয়। আমরা কখন এই সৌভাগ্যের আস্বাদ জানি না।"

নানা প্রবন্ধে ও নানা সভায় তাঁহার বিবিধ পুস্তকের সমালোচনা হইয়াছে। পুস্তকের বিশদ সমালোচনার স্থান বা সময় ইহা নহে। সুতরাং সে চেষ্টা করিব না। কেবল এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, নানা বিভিন্ন চরিত্রের কলাসঙ্গত সৃষ্টিতে তাঁহার তুলনা নাই। এমনই অসাধারণ শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন যে, ছোট বা বড় যে কোন চিত্রই তিনি আঁকিয়াছেন, প্রত্যেকটিতে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। প্রত্যেক চরিত্র নিজ ব্যক্তিত্ব লইয়া যেন কথা কয়। বিভিন্ন মেরুদণ্ড ও স্বাতন্ত্র্য লইয়া এমনিভাবে তাহারা চলাফেরা করে যে, কাহারও সহিত কাহারও ভুল হইতে পারে না। একের কথা বা ভঙ্গী অন্যের কথা বা ভঙ্গীর ধারও ধারে না। অনেক শক্তিমান্ লেখকেও এ গুণ দেখা যায় না। অনেকের অনেক চরিত্রেরই রসের পাক এক, ভিয়ান এক, ছাচ আলাদামাত্র। একই স্বাদ, নামের ও আকৃতির বিভিন্নতায় তার বদলাইতে পারে না। আবার কাহারও কাহারও চরিত্রসৃষ্টিতে গ্রন্থকারই যেন সর্ব্বত্র কথা কহিতেছেন; ভাষা, ধরণ বা ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য নাই, এমন কি স্ত্রীপুরুষের মধ্যেও রীতির তারতম্য নাই। বঙ্কিম হইতে একটী মাত্র উদাহরণ লইব। যে নায়িকাচরিত্র ও প্রেমচিত্র-রচনায় তিনি অদ্বিতীয়, সেই প্রেম লইয়া এক বিষবৃক্ষেই তিনটি চরিত্র। সূর্য্যমুখী, কমলমণি ও কুন্দ। তিনজনেরই মূলকথা বা অভিব্যক্তি প্রণয়ে; কিন্তু তিনটিরই অপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য। কেহ কাহারও তুল্য নহে। তিনটিই স্বতন্ত্র Type. সূর্য্যমুখী গম্ভীর, ভার্য্যার মর্য্যাদা-গুণে গম্ভীর; কমলমণি মুখর, রসিকতার মাধুর্য্যে মুখর; কুন্দ নীরব, ভীরুতায় ও লজ্জায় নীরব। অথচ প্রণয়ে কেহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। একবার পড়িলেই তিনটি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি যেন মনের মধ্যে এমনি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় যে, সে বৈশিষ্ট্য কখনও ভুলিবার উপায় থাকে না।

দেশে মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র রচনা এবং দেশাত্মবোধ জাগাইবার অভিলাষে আনন্দমঠ ও কমলাকান্তের দপ্তর রচনা—এই দুইটি বড় কথার উল্লেখমাত্র না করিলে বঙ্কিম-মাহাত্ম্যের অপলাপ ঘটিবে। মনুষ্যত্বের অভাব ও পরাধীনতার দৈন্য যে তিনি কিরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন ও 'সর্ব্বম্ পরবশং দুঃখং সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখম্' যে কিরূপ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেন, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি গ্রন্থে তাহা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। অতি-বিস্তারের প্রয়োজন নাই। আজ কংগ্রেস যে উচ্চ আদর্শ লইয়া দেশের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, সেই আদর্শসৃষ্টিতে বঙ্কিমের কৃতিত্ব যে কতখানি, তাহা সকলেই জানেন। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি ঐ প্রকার স্বদেশী সভা-সমিতিতে বড় যোগ দিতেন না। অন্তরাল হইতে রচনায় ও সমালোচনায় দেশাত্মবোধ সৃষ্টি ও জনমতগঠনে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন। সাহিত্যপথে লোক-শিক্ষাবিধানে ও সমাজশৃঙ্খলারক্ষাকল্পে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। সার্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনাতেই তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের সার্থকতা; পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া জাতির প্রাণে সঞ্জীবনী সঞ্চার করিতে ও আত্ম-কলহ ভুলিয়া ঐক্যচিন্তা ও মমত্ববোধে বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তুলিতে তাঁহার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। দেশের লোক, দেশের ধর্ম্ম, দেশের শক্তি, দেশের আদর্শ, এমন কি, দেশের বাঁশের লাঠিগাছটি পর্য্যন্ত তাঁহার পরমাদরের বস্তু ছিল। তাঁহার রচিত দেশমাতৃকার বন্দনা 'বন্দেমাতরম' জগতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যের সব্যসাচী অর্জ্জুনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি এক হাতে অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে সৎসাহিত্য রচনা করিয়াছেন, অন্য হাতে ক্ষেত্র হইতে অসৎ ও অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যের কাঁটাগাছ মারিয়াছেন। অশ্রদ্ধাবহুল আজিকার এই যুগসন্ধিক্ষণে যুগস্রষ্টা বঙ্কিমের কথা বারম্বার মনে পড়িতেছে।

পাঠ্যাবস্থায় স্কুলে আমি তাঁহার এক দৌহিত্রের সহপাঠী বন্ধু ছিলাম। সেই সূত্রে এই মহাপুরুষের গৃহে আমার গতায়ত ছিল। একদিন তিনি আমাকে গাড়ী করিয়া গড়ের মাঠে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং কথাসূত্রে আমার সাহিত্যপ্রীতি জানিয়া প্রসন্নচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"বেশ, স্কুলের পাঠ সারিয়া অতিরিক্ত সময়ে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে পার, কিন্তু পাঠ শেষ না করিয়া কদাচ ওকাজে সময় নষ্ট করিও না",—সে কথা আজিও আমার যেন কাণে বাজিতেছে। সেই পূর্ব্বলিখিত পুরাতন কথা, শুভার্থীর অমৃত উপদেশ। বন্ধুটির বিবাহ উপলক্ষ্যে আরও একদিন তিনি আমাকে নিজহাতে আদর করিয়া মিষ্টান্ন খাওয়াইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তিগত পরম সৌভাগ্যের কথাটি জানাইয়া আমার অতি ক্ষুদ্র এই বঙ্কিমপ্রসঙ্গ শেষ করিলাম। বন্দেমাতরম্।

বন্দী

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

প্রভু, তুমি আস্‌তে নারো
আজ যে তাহা বুঝতে পারি
জগদ্বাসি দুঃখ দিয়া
কর্‌লো তোমার চরণ ভারী।
বোধন ছলে চরণ তলে—
পিছিল এ পথ নয়ন জলে
তাই তো তুমি উর্দ্ধগামী
হও অদেখা মৌনচারী।

সবাই তোমায় আট্‌কাতে চায়
যে যার আপন ইচ্ছামত,
আট্‌তে গিয়ে খুঁজে না পায়
তুমি যে রও ওতঃপ্রোত।
তাই মানবের ক্ষুণ্ণ হিয়া
ছেড়ে তোমায় রয় ঘিরিয়া
তাই তো চির বন্দী তুমি
মাটির ধরায় মর্ম্মগত।

জমিদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

কুমার শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ইতিপূর্ব্বে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—(১) উপযুক্ত ভাবে বিবিধ শিক্ষার বিস্তার ও চরিত্র গঠন দ্বারা, (২) একতা-সূত্রে বদ্ধতার দ্বারা এবং (৩) বিশেষ পুরুষকার বা কর্ম্মপরায়ণতার দ্বারা আমাদের শক্তি জাগ্রত করিয়া ও উপযোগিতা লাভ করিয়া সমগ্র হিন্দু জাতিকে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিতে হইবে; নচেৎ আমাদিগকে নিজ দেশেই কতকটা কোণঠাসা ও অবহেলিত হইয়া থাকিতে হইবে। যাহাতে এই জাতি উপযোগিতা লাভ করে ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহাই এখন চেষ্টা করিয়া করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে উপযোগিতা-লাভেরই বিশেষ প্রয়োজন। উপযুক্তভাবে শিক্ষালাভ, চরিত্রগঠন ও কর্ম্মপরায়ণতার দ্বারাই আমরা উপযোগিতা লাভ করিতে পারি; কর্ম্মদক্ষ, উপার্জ্জনশীল ও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারি, এবং সমাজের যোগ্য কর্ম্মী (useful member) হইতে পারি। চরিত্রগঠন ব্যতীত উচ্চ কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয় না এবং উচ্চ কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত না হইলে, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, বা তাহা দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। যাহাতে এই জাতি শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং বিবিধ শিক্ষালাভ ও চরিত্রগুণে উন্নত হয়, তাহাই এখন করা প্রয়োজন।

কিসে জাতি শ্রেষ্ঠ ও উন্নতিশীল হয়, তাহা আলোচনা করিতে যাইয়া Bacon এইরূপ বলিয়াছেন—

"What are wanted for real greatness are :—(1) Real courage, (2) well-disciplined and organised army or sufficient man-power, (3) necessary and up-to-date war-equipments, (4) the great enthusiasm or the strong determined wish to grow, increase in strength and spread rapidly and (5) to work hard with great energy for this purpose. Besides these five necessary things, three more essential qualities needed are :—(6) Intense patriotism. (7) high sense of duty and (8) unity. Deep patriotism is the spring of all actions. From it wil grow the strong deter[illegible] to be great or to grow in strength and power."

"Disciplined army" ও "Necessary war-equipments" ব্যতীত, অন্যান্য আবশ্যকীয় মহদ্‌গুণগুলি আমরা চেষ্টা করিয়া লাভ করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিণত হইতে পারি। (১) দেশকে ও জাতিকে উন্নত করিবার জন্য প্রবল দৃঢ় ইচ্ছা, (২) তজ্জন্য অক্লান্ত উদ্যম ও স্বার্থশূন্য অদম্য কর্ম্মপরায়ণতা, (৩) গভীর স্বদেশপ্রেম, (৪) সৎসাহস, (৫) উচ্চ কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং (৬) দৃঢ়বদ্ধ একতা—এই মহদ্‌গুণগুলি লাভ করিতে পারিলে আমরা অবশ্যই শক্তিশালী জাতিরূপে পরিণত হইতে পারি।

দৃঢ়বদ্ধ একতা ব্যতীত কোন জাতিই শক্তিশালী হয় না। পরস্পরের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ না থাকিলেই অল্প চেষ্টায় একতা লাভ হইতে পারে। কিন্তু আধুনিক কতিপয় সমাজতান্ত্রিক নেতা তাঁহাদের যথেষ্ট দূরদর্শিতার অভাব-বশতঃ শ্রেণীসংগ্রাম (class war) সৃষ্টি করিয়া, এই একতালাভের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি পূর্ব্বের বড় বড় জাতীয় নেতৃগণ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখনকার সমাজতন্ত্রী নেতারা জমিদার ও প্রজা, ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিরোধ-ভাব সৃষ্টি করিতেছেন। এই ভাব ইউরোপে থাকিলেও এ দেশে তাদৃশ ছিল না। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অপ্রীতি পূর্ব্বে সামান্যই ছিল। নেতাদের উচিত, এই বিরোধ-বহ্নি উত্তেজনারূপ বায়ুসঞ্চালন দ্বারা বৃদ্ধি না করিয়া, উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গত অভিযোগ দূরীভূত করিয়া ও পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি বাড়াইয়া, এই বিরোধ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করা। এই বিরোধ ও কলহ না থাকিলেই অনেকটা সহজে একতা-লাভ হইতে পারে। কোন

কোন কোন সমাজতন্ত্রী কংগ্রেস-নেতাও বলিতেছেন—"Landlordism must go"—জমিদার সম্প্রদায় উঠিয়া যাক। "Permanent Settlement" উঠিয়া যাক। রুষিয়ার মত এদেশেও সাম্য আনয়ন কর; সকলকে এক শ্রেণীতে পরিণত কর। এই সাম্য-মন্ত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী-বিপ্লবে উচ্চারিত হইয়াছিল—এবং যত ধনী সম্প্রদায় আছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, অথবা guillotine করিয়া বা হত্যা করিয়া এইরূপ সাম্য আনয়ন করা হইয়াছিল; ফরাসীজাতি এইভাবে জাগ্রত হইয়া বহু নির্দ্দোষ লোকের হত্যা বা রক্তপাতেও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই মহাবিপ্লব করে ও দেশের সকল সম্প্রদায়কে কতকটা এক শ্রেণীতে পরিণত করে। কিন্তু ইহা কতদিন টিকিল? বোধ হয় ২০ বৎসরও নহে। নেপোলিয়ন যখন সম্রাট্ হইলেন, তখন তাঁহার বড় বড় মার্শ্যালরা সাবেক সম্ভ্রান্তবর্গের ন্যায় মহাধুমধাম করিয়া থাকিতে লাগিলেন; ফ্রান্সে ক্রমে আবার ধনি-সম্প্রদায় হইল। যে সব দেশে Republic বা Democracy আছে, সে সকল দেশেই ধনি-সম্প্রদায়ও আছে। সকল দেশেই ধনী ও দরিদ্র থাকিবেই। ঠিকমত স্থায়ী 'equality' সম্ভবপর নহে। কারণ 'স্বকর্ম্ম-সূত্রে গ্রথিতা হি লোকাঃ'। মনুষ্যগণ তাহাদের কর্ম্মফল-সূত্রে গ্রথিত বা আবদ্ধ আছে। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে অবশ্যই সেইরূপ ফল পাইবে। যে কর্ম্মদক্ষ ও পুরুষকারপরায়ণ লোক, সে নিজে বহু চেষ্টা করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়া ধনী হয় এবং ধনীর পুত্রও ধনী হয়। আমেরিকায় কত দরিদ্র লোক নিজ কর্ম্মপরায়ণতার দ্বারা কোটীপতি হইতেছে। কর্ম্মপরায়ণতা ও উপযুক্ত investment দ্বারা সকল দেশের লোকই অর্থবৃদ্ধি করিতেছে; এবং জমিদারীও একপ্রকার investment মাত্র। ওকালতি বা অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া, পরে সেই অর্থ জমিদারীতে invest করিয়া এদেশে অনেক জমিদার হইয়াছেন। এই বঙ্গদেশে জমিদারী একটা ভালরূপ investment-এর পন্থা বা অর্থোপার্জ্জনের উপায় মাত্র; এবং এই পন্থা সকলের পক্ষেই খোলা আছে। এই জমিদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন করিয়া তুলিয়া দিয়া দেশের কি লাভ হইবে? এই উপার্জ্জন-পন্থা উঠিয়া গেলে, বঙ্গদেশের বহু লোকের বিশেষ ক্ষতিই হইবে। বিশেষতঃ, এই জমিদারী প্রথা বহু প্রাচীন, ইহা মোগল যুগে পাঠান যুগে, হিন্দু যুগেও ছিল। এই সুপ্রাচীন প্রথা যাঁহারা জমিদারী প্রথা ও তাহার বিবর্ত্তনের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন নাই, এরূপ নেতাদের দ্বারা তুলিয়া দিলে দেশের কখনও কল্যাণ হইবে না।

"Whatever Russian is good", এ ভাবও ঠিক নয়। এইরূপ বুদ্ধিতে কাজ করিলে, দেশের মহৎ অকল্যাণ হইবে, এবং ভারতের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য, মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক অনুরাগ নষ্ট হইবে। বিশেষতঃ রুষিয়ায় অনেক theoryই ক্রমে exploded হইতেছে, ও তথায় অন্তর-বিপ্লব ও ষড়যন্ত্রাদি অনেক সময়ে লাগিয়াই আছে। রুষিয়াতেও Dictatorship হইতে পারে। রুষিয়ায় অনেক জঘন্য প্রথাও আছে। সুতরাং বিবেচনাশূন্য হইয়া রুষিয়াকে নকল করিতে গেলে, একরূপ আত্মহত্যা করা হইবে।

পূর্ব্বোক্ত সমাজ-তন্ত্রী কংগ্রেসনেতৃদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা চুক্তি (contract) মাত্র, যাহাতে জমিদারদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং ইহা পুনরায় আইন করিয়া বদলান যাইতে পারে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনেক রকম চেষ্টা করিয়া কোন সঙ্গত সুবন্দোবস্ত দ্বারা বাঙ্গালা দেশের রাজস্ব ভালভাবে আদায় করিতে অপারগ হওয়ায়, তাঁহাদের রাজকোষ শূন্য হইবার উপক্রম হয়, তখন তাঁহারা বহু বিবেচনা করিয়া এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন; সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশের জমিদারদের যত টাকা খাজনা ও আবোয়াবাদি হইতে মোট আদায় হইত, তাহার ৯০% স্থায়ী জমির খাজনা (Land Tax) রূপে নির্দ্ধারিত করেন ও সূর্য্যাস্ত বিধি (Sunset law) করিয়া ৪ কিস্তিতে আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। অর্থাৎ যতটা বেশী করিয়া খাজনা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব, তাহাই তাঁহারা করিয়া লন। ইহার ফলে তদানীন্তন কালের বহু জমিদারী ঐ অত্যধিক খাজনা না দিতে পারায় উৎসন্ন হইয়া যায়; সেই সকল জমিদারী অন্যে কিনিয়া লয়। এইরূপে অনেক হাত-ফেরী হয়। এখনও জমিদারেরা অধিক খাজনা পায় না—বিঘা

প্রতি ১৲, ১।০, ১॥০ টাকা মাত্র পান। অথচ খাস মহালে গভর্ণমেণ্ট অনেক অধিক নিরিখে খাজনা আদায় করিয়া লন। জমিদারেরাও সহজে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারে না। এইজন্য অনেক জমিদার আবোয়াব বলিয়া কিছু লন বটে, কিন্তু তাহাও অধিক নহে। আবার এমন অনেক জমিদার আছেন, যাঁহারা আবোয়াব বলিয়া কিছু লন না। এদেশে জমিদারের খাজনাদি কম বলিয়াই এই টাকা সর্ব্ব সম্প্রদায় মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া, দেশের লোকদের কতকটা স্বচ্ছল করিয়াছিল; এই কারণেই বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষ প্রায় হয় নাই; তবে এখন অত্যধিক সেস (Cess)-বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ও সর্ব্বদেশব্যাপী সাধারণ অর্থকৃচ্ছ্রতার ফলে, দেশে এখন অর্থাভাব হইয়া হাহাকার হইয়াছে। এই দৈন্যের কারণ জমিদার নহে। তাঁহারা অত্যধিক সেস বৃদ্ধির জন্য ও "No rent campaign"এর জন্য এখন বিশেষ অর্থকৃচ্ছ্রতা অনুভব করেন। তাঁহাদের বহু খাজনা ও সেস বাকী থাকে, অথচ এই বাকী খাজনা ও সেস আদায়ের কোন সহজ পন্থা বা সহজ আইন নাই। ঋণ-সালিশী বোর্ড দ্বারা জমিদারের ন্যায্য খাজনা সুদীর্ঘকাল কিস্তিবন্দী করিয়া প্রজাগণকে উহা অনির্দ্দিষ্ট কালে দিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য খাজনা ও সেস অনেক আদায় হয় না; অথচ গভর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা জমিদারের নিকট তাহা পূর্ণমাত্রাই প্রতি কিস্তিতে আদায় করিয়া লন। প্রজার ন্যায্য দেয় খাজনা আদায় যাহাতে সম্পূর্ণরূপ বন্ধ হইয়া যায়, তজ্জন্য এক দল লোক সভা-সমিতি করিয়া গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিতেছে; এবং নূতন নূতন আইন প্রণয়ন-ফলে, অশিক্ষিত প্রজাদের ক্রমে ধারণা হইতেছে যে, জমিদারদের নিকট আর খাজনা দিবার প্রয়োজন নাই। এই সব কারণে জমিদারেরাও এখন বিশেষ বিপন্ন। ইহার উপর শিক্ষা-কর (Education Cess) বসিলে তাঁহারা অত্যন্ত বিপন্ন হইবেন। অনেক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেস-নেতা এসব দেখা আবশ্যক বোধ করেন না—হয়ত শতকরা ৫ জন জমিদার কলিকাতায় থাকিয়া অমিতব্যয়িতা করিয়া কাটান, তাঁহাদিগকে দেখিয়া জমিদারেরা "rolling in wealth" মনে করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বাঙ্গালা দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকেই জমিদার আছেন; "atleast 60% of the population of Bengal are landed gentry;" অনেকেরই জমিজমা আছে; অনেক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র আছে। এই "landed gentry" সম্প্রদায়ই বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিলে সমাজের এই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে ও বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ সম্প্রদায়ই বিশেষ বিপন্ন ও দরিদ্র হইবে। দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র হইলে, তখন অর্থাভাবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যাদির আর তাদৃশ উন্নতি হইবে না।

"It is a narrow and contracted view to suppose that the Permanent Settlement consists in nothing more than the obligation on the part of the Zeminder to pay certain amount of revenue annually to the Government. This settlement is a compact by which the Zeminder engages on his part to pay a fixed amount of revenue to the State; and the State on its part guarantees to the Zeminder by means of its judical and fiscal administration, the integrity of the assets from which that revenue is derived and which in fact, constitutes its own security for the realisation of its revenue."—Sadar Dewani Decisions of 1848.

"In a measure conceived and matured by Pitt, the greatest statesman of the age, it was intended to save the East India Company from financial ruin, to bring the country (more than one third of which was filled with jungle then) into a state of cultivation and to increase the wealth and prosperity of the people, by recognising their just rights and thereby stimulate them to improve their estates."—(Proceedings of the Bengal Council, Dated 24th. April, 1807).

"In 1793 Lord Cornwallis proclaimed the existing rates of land revenue to be fixed for ever; that no lands should be sold

by auction, so long as a Zeminder paid his yearly revenue; that under these conditions, Bengal Zemin'ors would hold their lands in full proprietorship like English Landlords." J. T. Wheeler.

সুতরাং এই "Permanent Settlement"কে একটা সাধারণ চুক্তি মনে করা উচিত নহে। পূর্ব্বে কংগ্রেস-নেতারাই বলিয়াছেন—যে প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সে প্রদেশেও উহা হইলে ভাল হয়।

কোন কোন সমাজতন্ত্রী নেতা প্রকৃত কৃষিজীবিদের সুবিধা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে এই বন্দোবস্ত তুলিয়া দিয়া, জমিদারের পরিবর্ত্তে, দেশের সমুদয় জমি জোতদারের বা প্রজাপার্টির হাতে, অর্থাৎ middle-manদের হাতে তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কৃষিজীবিদের কোন কল্যাণই হইবে না, বরং জোতদারদের জুলুম ও অত্যাচার তাহাদের উপরে বাড়িবে। বড় বড় জোতদারেরা তাহাদের অধীনস্থ প্রজাদের নিকট হইতে যে হারে জমির উপস্বত্ব ভোগ করেন, তার ৵০ পরিমাণ অংশও জমিদারেরা পান না। অর্থাৎ অনেক স্থলে এই জোতদার middle-manরাই ৸৵০ মুনাফা লন; এজন্য ইহাদের অবস্থা স্বচ্ছল। এই প্রজাপার্টির প্রায় অধিকাংশই মুসলমান জোতদার। কতকটা তাহাদেরই সুবিধা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই মুসলমান মন্ত্রীরা Permanent Settlement তুলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং কংগ্রেস-নেতারা তত্তটা তলাইয়া না দেখিয়া এই কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন।

বাঙ্গালা দেশে জমির নিরিখ যত কম, বিহার, যুক্তপ্রদেশে তাহা নহে; সে সব প্রদেশে অনেক বেশী। এদেশে অধিকাংশ জমিদারেরাই প্রজাপীড়ক নহেন; এবং জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে কোন গুরুতর বিরোধও নাই। এইজন্য অন্য প্রদেশের নেতারা বা "landless" নেতারা বাঙ্গালার জমিদারদের অবস্থা ভালরূপ জানেন না, অথচ না জানিয়াই বদলাইতে চান।

জমিদারেরা সত্যই অত্যাচারী হইলে, আইন করিয়া সেই সব নিবারণের উপায় করা যাইতে পারে; কিন্তু জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিলে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ না হইয়া বিশেষ অনিষ্টই হইবে; এবং কংগ্রেস যে তরু আশ্রয় করিয়া আছেন, তার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ধ্বংস করা হইবে। অধিকাংশ হিন্দুরা দরিদ্র হইয়া যাইবে। ইহাতে কতকটা আত্মদ্রোহিতাই করা হইবে।

এই জমিদার-সম্প্রদায় দ্বারা এদেশের অনেক কল্যাণ-কার্য্য হইয়াছে ও হইতেছে। প্রতি জেলায় জেলায় যে সকল স্কুল, কলেজ, জলের কল, চিকিৎসালয় ও দেবালয়াদি আছে, তাহার অধিকাংশই জমিদারদের দ্বারা বা তাঁহাদের অর্থ-সাহায্যে কৃত। এমন কি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সেনেট হল, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস্ আদি জমিদারদের অর্থে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হইয়াছে। কংগ্রেসও বহুকাল পর্য্যন্ত জমিদারদের অর্থে ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় পুষ্ট হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার স্বর্গীয় মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর কংগ্রেসকে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহের স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে কংগ্রেসের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। অনেক জমিদারই কংগ্রেসকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখনও নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর কংগ্রেস আন্দোলনের জন্য বহু অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকেন। এ বিষয় কংগ্রেসনেতাদের বিস্মরণ হওয়া উচিত নহে। এই সব বিশেষ বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসনেতাদের জমিদার-বিরোধী-মনোবৃত্তি ত্যাগ করা উচিত হইবে; এবং সকল রকম একদেশদর্শিতা ত্যাগ করিয়া, সকল সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও কল্যাণসাধন করাই উচিত হইবে। খাঁটী জাতীয়ভাবে কাজ করা উচিত হইবে। মহাত্মা গান্ধীও জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিতে নিষেধ করিয়াছেন।



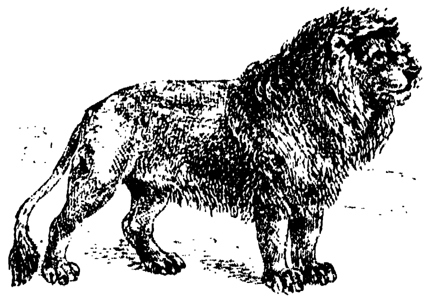
পঞ্চম টেষ্ট্—'অন্ধবিশ্বাসের' বিরুদ্ধে 'বুলি' সভ্যজগতে জোর গলায় চলিলেও, ক্ষেত্র বিশেষে সকলেই অল্পবিস্তর ভাবে ইহার প্রভাবাধীন—এই পঞ্চম 'টেষ্টে' ইহার প্রমাণ ভাল করিয়াই পাওয়া গেল। 'ওভাল', ইংলণ্ডের 'পয়মন্ত' মাঠ, এ ধারণা ইংলণ্ডের অস্থি-মজ্জাগত।



১৯৩৭—অষ্ট্রেলিয়ার পরাভূত হইবার পরে নিউজিল্যাণ্ডে

প্রকৃত পক্ষে এই মাঠে টেষ্ট্ খেলায় ইংলণ্ডের জয়সংখ্যা অধিক। এখানে খেলিতে অষ্ট্রেলিয়াও তাই 'থতমত' খায়। ১৯৩৮-এর ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পঞ্চম টেষ্টের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খেলার তোড়ে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে জেরবার করিয়া দিলেও, ওভালে খেলার সুরুতেই ইংলণ্ডের ব্যাটমদারীর বহরে তাহারা স্তম্ভিত হইল; কেবল তাহারা নহে—সমগ্র ক্রীড়া-জগত চমকিত হইল—ইংলণ্ডের এ ক্রীড়া-কুশলতা এতদিন কোথায় ছিল! ও-র‍্যালী, ফ্লীট্‌উড স্মিথের বলন্দাজী চূরমার! বালককে যেমন খেলায় —ব্যাটমদার হাটন্ সেইভাবে খেলাইতে লাগিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুইজন বলন্দাজকে; বলন্দাজের পর বলন্দাজ বদলেও তাহার 'রদ বদল' হইল না। সমান তেজে তিনদিন খেলিয়া হাটন্ মারদৌড় দিল ৩৬৪বার — অভূতপূর্ব্ব এ কৃতিত্ব, ক্রিকেটের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা—ব্র্যাডমানের একবার ৩৩৪ করার 'সেরা ওস্তাদী' হাটন্ তলাইয়া দিল। তাহার কি ব্যাটম্‌দারীর—আগমার, পেছ্‌মার, কাটামার, চাপামার, ঘুরণমার, তাড়ু, যখন যেমন তখন তেমন ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট চলিল। বিপক্ষের বিপুল বলন্দাজী ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'ছাতু' করিয়া দিয়া অবশেষে ধরা সে পড়িল কিন্তু সহজে, একটা 'কাছ-তোলা' মারিয়া।

ইংলণ্ড



১৯৩৮—'ওভালে' পঞ্চম টেষ্টে

জুড়িদারদের মধ্যে লেলাণ্ড করিল ১৮৭। তাহার পরে সে মার খাইল বেহিসাবী দৌড়মার দিতে গিয়া। হাটন্



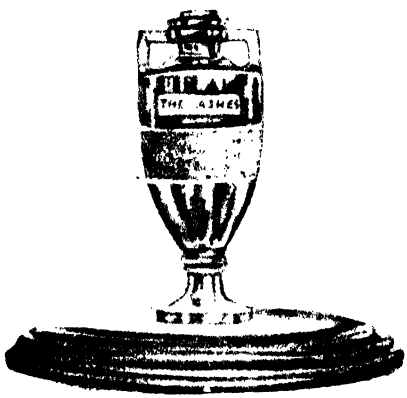
হ্যামণ্ড—ইংলণ্ডের নেতা

মোড় হইবার পরে অন্য জুড়িদার হাডষ্টাফ্ ১৬৯ করিয়া খাড়া রহিল। তৃতীয় দিনে চা-পানের সময়ে ইংলণ্ডের জয়াঙ্ক হইল ৯০৩। তখনও কিন্তু দলের তিনজন খেলিতে বাকি—ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াকে খেলা ছাড়িয়া দিল। মোট মারদৌড়ের সংখ্যা ইংলণ্ড যাহা করিল, টেষ্টে তাহা আর কেহ কখনও করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে একবার ৭২৯ করিয়াছিল অষ্ট্রেলিয়া। এ পর্য্যন্ত তাহাই ছিল সর্ব্বোচ্চ জয়াঙ্ক, ইংলণ্ডের কৃতিত্বে তাহা ম্লান হইয়া গেল। ইংলণ্ডের প্রথম দানের খেলা শেষ হইল এইভাবে বড় গৌরবের সহিত।

খেলা হইল আরও শোচনীয়—১২৩ মাত্র করিয়া আটজন মোড় হইল। ইংলণ্ড জয়ী হইল একদান ও ৫৭৯ মার-দৌড়ে। 'ভাঙ্গাহাটে' এবং অপূর্ব্ব জয়ের উল্লাসে ইংলণ্ডের ফার্ণেস্ ও বাইসের বলন্দাজী খুলিয়া গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। যে কৃতিত্ব দুইজন বলন্দাজ দেখাইল, অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, পূর্ব্বে একবারও তাহারা তাহার কিছুও দেখাইতে পারে নাই। 'পয়মন্ত ওভাল'-এর কদর ইহার পরে ইংলণ্ডের কাছে শতগুণ বাড়িয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা। এক খেলায় হাটন্ হইল অপরিসীম যশবান—ইংলণ্ডের, কেবল ইংলণ্ডের কেন সমগ্র ক্রিকেট্ জগতের চক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটম্‌দার।


ও-র‍্যালীর বলন্দাজী


'ত্রিশত' দৌড়ে হাটন্



"এ্যাসেজ্"

অষ্ট্রেলিয়ার পালা—ইংলণ্ডকে খেলা দিবার সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার দুর্দ্ধর্ষ ব্যাটম্‌দার আহত হয় এবং দিনের প্রায় শেষাশেষি ব্র্যাড্‌ম্যানও আহত হয়। এই দুই সেরা খেলোয়াড়কে বাদ দিয়া ব্যাটম্‌দারী করিতে নামে অষ্ট্রেলিয়া। ইংলণ্ডের অভাবনীয় জয়াঙ্ক, স্বদলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুইজন খেলিতে না পারা এবং 'কোল আঁধারে' ব্যাট্ ধরার ফলে খেলার 'জুত' করা অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে সুদূরপরাহত মনে হওয়াই স্বাভাবিক। খেলার ধরণেই তাহা প্রকাশ পাইল। ব্যাট্ ধরিয়াই ব্যাডকক্ হইল মোড়, ম্যাকেব চৌদ্দ মারদৌড়ের পরে 'খতম্' হইল। ব্রাউনের ৬৯, হ্যাসেটের ৪২ ও বার্ণেটের ৪১ ব্যতীত আর কেহ কস্‌রত করিতে পারিল না কিছু। আটজন খেলিয়া মারদৌড়ের মোট সংখ্যা হইল ২০১। দ্বিতীয় দফার

"এ্যাসেজ্" — ১৯৩৮ এর টেষ্ট পর্য্যায়ের পাঁচটী খেলার মধ্যে দুইটী খেলার ফল সমান সমান, একটী পরিত্যক্ত, একটীতে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী এবং আর একটীতে ইংলণ্ড জয়ী হওয়ায়, পূর্ব্ববারের 'এ্যাসেজ্'-জয়ী অষ্ট্রেলিয়ার কাছেই 'এ্যাসেজ্' রহিয়া গেল। এবারের টেষ্টের ফল হইল সমান সমান।

আই-এফ্-এ বনাম অষ্ট্রেলিয়া—অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম খেলায় আই-এফ্-এ পরাজিত করিয়াছে সাউথ্ অষ্ট্রেলিয়াকে ৬—২ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় তাহারা পরাজিত হইয়াছে ভিক্টোরিয়ার হস্তে ২—৪ গোলে। তৃতীয় খেলায় আই-এফ্-এ নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে ৬—৪ গোলে। চতুর্থ খেলাতেও

তাহারা পরাজিত (২-১)—নর্দান ডিষ্ট্রিক্ট কর্ত্তৃক 'দোষযুক্ত উঠানে'র গাহনা সুরু হইল বলিয়া—ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং।

কলিকাতায় ফুটবল্-ত্রিশ বৎসর পরে মোহনবাগান ট্রেডস্ কাপ্ জয়ী হইয়াছে। কুচবেহার কাপের শেষ-গণ্ডী শেষ হয় নাই। ইলিয়ট্ শিল্ড বিজয়ী এবার রিপন কলেজ। লেডি হার্ডিঞ্জ শিল্ড ঘরে উঠিয়াছে মোহামেডান্ স্পোর্টিংয়ের। রাজা-শিল্ড জয়ী হইয়াছে রেঞ্জার্স। ইয়ুংঙ্গার কাপ জয়ীও রেঞ্জার্স।



লেল্যাণ্ড—পঞ্চম টেষ্টে ইংলণ্ডের শতাধিক মারদৌড়দার

মফঃস্বলে ফুটবল্—কুমিল্লার 'আর্, এল্, ব্যানার্জ্জী কাপ' জয়ী হইয়াছে 'ইয়ংমেন্ স্পোর্টিং'। কটকের ফুটবল লীগে 'ইয়ং উৎকল' র‍্যাভেন্স কলেজের কাছে পরাজিত হইয়া অল্প পিছাইয়া পড়িয়াছে। মালদার 'কুমার এস্ কে শিল্ড', কুড়িগ্রামের ফুটবল্ লীগ, বোগ্‌রা 'জে, এন্ কাপ্', বালুরঘাটের 'বরদা শিল্ড' ও 'রামেশ্বর কাপ', কাল্‌নার ফুটবল্ প্রতিযোগিতা, চুঁচুড়ার 'বার্ণাড্ কাপ্', বামনমুড়ার 'দুর্গাপ্রসন্ন কাপ', বাগ্‌নানের 'ভদ্রকালী কাপ' প্রভৃতি উৎসাহের সহিত চলিতেছে। মজঃফরপুরের কেম্প ফুটবল্ লীগে গত বৎসরের লীগ্ জয়ী ওরিয়েণ্ট্ ক্লাবের এ বৎসরে শেষরক্ষা করা সম্ভবপর হইতেও পারে।

রোভর্স কাপে কলিকাতা—কলিকাতার তিনটী দলের মধ্যে 'সিটি' কাত হইয়াছে প্রথম মোহড়াতে। হাওড়া ইউনিয়ন্ ও এরিয়ন জোর পাল্লায় খেলিতেছে।

পুরাতন কথা—লেখক কর্ত্তৃক বাঙালীর ফুটবল্ খেলার ইতিহাস ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ ও মাসিক পত্রিকাদিতে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার আর একটা দিক্ না দেখাইলে ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। লেখকের দিন-লিপিতে চলিত ভাষায় এই অংশ লিখিত থাকায় এখন আর তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করা হইল না।

পূর্ব্বাবস্থা—খেলা-ধূলা সুরু ক'রে আমরা যখন ময়দানে যেতে আরম্ভ করি, তখন ত' 'রামরাজত্ব'—দু'পাঁচজন একসঙ্গে হ'য়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা তখনও রয়েছে বটে, কিন্তু আগের তুলনায় সে কিছুই নয়।

ঠন্‌ঠনের জুতোপটি (এখন যেখানে কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট্) থেকে বরাবর দক্ষিণ মুখো কলেজ ষ্ট্রীট (ডাহিনে বহুবাজার ষ্ট্রীট্) ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্, মলঙ্গা খালাসীটোলা, ধর্ম্মতলা, সর্ব্বত্র—দিন দুপুরে মাতাল সেলর্, গোরা, হাবসী আর দেশী গুণ্ডার সে কি নারকীয় হুল্লোড়—ছুরি, ছোরার সে কি উলঙ্গ, উদ্দাম নৃত্যলীলা! সারা রাজপথ যেন এদেরই ইজারা করা—এদের পৈশাচিক লীলার অবতারণা ক'রতে। কি কষ্টে, কত অসুবিধার মধ্যে পুরবাসীর এই সকল রাজপথে চলাচল করা ঘটেছে—তা ব'লবার নয়। পুলিস প্রহরীর সংখ্যা তখন মুষ্টিমেয়—পুরবাসীকে উপযুক্ত সাহায্য দানে অসমর্থ। এ অবস্থায় আপনারা আপনাদের বাঁচবার উপায় না ক'রলে চলে না। উপায় কি ক'রে হ'ল, কে ক'রলে—সেই কথাই ব'লব।

আত্মরক্ষা ও পুলিশ—মাতাল লাঠি-সোঁটা দেখলেই গা ঢাকা দেবে—ধরা কথা। তার ওপর দু' এক ঘা যদি পড়ে—ব্যস্ 'তোম্ ভি মিলিটারী, হাম্ ভি মিলিটারী'। পুলিশ-কর্ত্তা ল্যাম্বার্ট বা হ্যারিসন্ আপনার লোকজন নিয়ে দুর্জ্জন শাসন যতটা সম্ভব ত' ক'রতেনই, অপরে আত্মরক্ষা বা শান্তিরক্ষার জন্য অগ্রসর হ'লে—তাঁদের কাছে সে প্রশংসাভাজনই হয়েছে—পুলিশ তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। পুলিশ আর জনসাধারণের মধ্যে এই রকমের সহযোগিতা তখন বেশ দেখতে পাওয়া গেছে।

বাঙালীর বাঙলা—ক'লকাতায় তখন বাঙালীর দবদবা খুবই। বাঙালী মুদি, বাঙালী ময়রা, বাঙালী ফিরিওয়ালা, বাঙালী কচুয়ান, বাঙালী গাড়োয়ান, বাঙালী চাকর, বাঙালী ঝি, বাঙালী পাচক-পাচিকা—বাঙালীর ঘরকন্না তখন বাঙালী নিয়েই। পাল্কী বেহারা, গঙ্গাজলের ভারী, কলের মিস্ত্রী আর গঙ্গার ঘাটের বামুনগিরি তখন উড়িয়্যার 'দাস'দের একচেটে। এরা 'দাস' নামেই তখন বাঙলায় পরিচিত। তাতে তারা অভিযোগ করেনি কখনও। ভিস্তি, রাজমিস্ত্রী আর দপ্তরীগিরিতে মুসলমান পাকা ওস্তাদ। বড়মানুষের বাড়ী জুড়ী, চৌঘোড়া হাঁকানতেও মুসলমান চাই। হোটেলে, সাহেববাড়ীতে মুসলমান খানসামা, 'বয়'। আর আতর, গোলাপজল ফেরিওয়ালাও—মুসলমান। আরা জেলার লোকজন তখন করছে বাবুদের বাড়ী দরোয়ানী। খোট্টা চাকর মাত্র এক-আধ জনের বাড়ীতে ঢুকেছে।



হাডষ্টাফ—(ইংলণ্ড) পঞ্চম টেষ্টে শতাধিক মারদৌড় দিয়া অমোড়

বাঙালীর ঘরে তখনও ভাত রয়েছে—ঘি, দুধ, তেল যেটুকু খায়, খায় খাঁটিই। এর ওপর সওদাগরী আফিসের মুচ্ছুদিগিরি, দেওয়ানী আদালতের দোভাষীগিরি, আপনার হিস্তেয় ব্যবসাদারী, ক্ষেত-খামারী—সহরে ডাক্তারী, উকিলী—বাঙালীর হাতের পাঁচ—মন-মেজাজ সুতরাং দরাজ হবেই। 'বাপ্‌কো বেটা'র পরিচয় তাদের কাছে সহজেই পাওয়া যাবে—আশ্চর্য্য কি? মাতাল শাসনে, দুর্জ্জন-দমনে একজোটে সবাই কাজ করেছে। করবে না! আপনার মা-বোনের ইজ্জৎ-রক্ষা হ'বে পুলিশ এলে—না আসা পর্য্যন্ত 'ঠুঁঠো জগন্নাথ'! সে বাঙালী তখন ছিল না—ছিল জিতেন বাঁড়ুজ্যে আর তাঁর দল, ছিল বহুবাজারের দাসেরা, ছিল নগেন্দ্রপ্রসাদ আর তাঁর খেলুড়েরা। ১৮৮০র মধ্যে 'মারের চোটে ভূত পালায়'; 'গুঁড়োগাঁড়া' কিন্তু তবু রইল।

গুণ্ডামী বন্ধ—মাঠে খেলা-ধূলার পত্তন বাঙালী যখন ক'রলে—মলঙ্গা, খালাসীটোলার দাপট তখন কমেছে, বৌবাজার বা পটলডাঙ্গায়ও সেলর বা গোরার মাতলামী একরকম বন্ধ হ'য়ে গেছে। তবে ধর্ম্মতলার 'টেম্পল্ বার' বা মতিলাল ষ্ট্রীটের ভাঁটিখানায় তখনও 'দশবাই চণ্ডী'। সেখানকার রাস্তা পেরোয় কে! এতখানি বুকের ছাতি, কব্জীর জোর, বাপ্‌রে—এই ঘাড়ে গদ্দানে — এতখানি ঘোরাল মুখ, টক্‌টক্ ক'রছে রং—ভাঁটার মত চ'খ—মদে চুর—ধ'রে রাখে কার সাধ্য—সেলরে সেলরে বা গোরায় সেলরে বা গোরায় গোরায় ঘুষোঘুষি লেগেই আছে—তার মাঝে এগুবে কে! তাদের কাপড়-চোপড়ও হয়ত অসামাল। তবে ছোরা-ছুরি নেই। সামলাতে ওই মলঙ্গা বা খালাসীটোলার তারাই—লাগাতেও তারা, সামলাতেও তারা—একটা ব্যবসায়ে এটা তারা পরিণত ক'রে। ভদ্রলোকের পথ নির্ব্বিঘ্ন করিয়ে দিয়ে তাদের কাছে 'উপরির'ও যোগাড় হয়, আবার সেলরদের বদ্ধ মাতাল ক'রে দিয়ে টাকার 'হরির লুঠ'ও কুড়োয়। এই সব কাটিয়ে যেতে হবে বাঙালীর ছেলেকে মাঠে খে'লতে। আর খেলা শেষ ক'রে বাড়ী ফি'রতে হ'বে তাদের এই পথেই।— তা তারা করেছে অকুতোভয়ে—এক এক গাছা মোটা লাঠি সম্বল ক'রে। এক একটা শেকড়ের গন্ধ পেলে সাপ যেমন নেতিয়ে প'ড়ে—লাঠি চ'খে প'ড়লেই এরাও তেমনি হয়েছে। আমাদের তাঁবুতে দেখতুম সদাসর্ব্বদা ২০।২৫ খানা লাঠি মজুত। কাশী মালি ব'লত, 'হুজুর, ওরই জোরে মাঠে মাতাল গোরাদের হাতে টিকে আছি।' কোথায় গেল বাঙলার সেই লাঠি!

গোরার অন্য রূপ—গোরা বা সেলররা ছেলেদের খেলার মাঠেও মাঝে মাঝে হানা দিয়েছে। তখন কিন্তু তাদের অন্য মূর্ত্তি—কত 'সমীহ' হ'য়ে ছেলেদের কাছে এগিয়েছে—অনুমতি নিয়ে তবে খে'লতে নেমেছে। মলঙ্গা বা 'খালাসীটোলা'র ওরা এ না দেখে বাবুদের খাতির ক'রতে পথ পায়নি। তার পরে খোদ কেল্লা থেকে

আন্‌কোরা গোরার দল 'বাবু'দের প্যাঁচে চিং' হ'য়ে যখন পড়েছে — জয়ীকে সশ্রদ্ধ সেলাম না জানিয়ে মলঙ্গা, খালাসীটোলার উপায় থাকে নি। তার পরে আউদের বংশধরেরা, টালীগঞ্জের নবাব-বংশধরেরা, আগা সাহেবেরা, হাজি কারবালার প্রধানেরা এবং অন্যান্য ভদ্র মুসলমান একে একে, দুয়ে দুয়ে, ছেলেদের সঙ্গে মিশে, একজোট হ'য়ে খেলা-ধূলায় যখন মেতে গেল—পথের গোরা আর সেলরদের দালালরা কোণঠেশা হ'য়ে গেল মারও—মাতলামীর দৃশ্যও সংঘটিত হ'তে লাগল সংখ্যায় অনেক কম। ছেলেদের খেলা-ধূলার প্রভাবেই এ ঘটে—'হ্যাঁ' ব'লতে হবে সকলকেই। ছেলেদের দাপটে ধর্ম্মতলার পথ ক্রমে 'নির্ঝঞ্ঝাট' হ'ল বটে কিন্তু ঝঞ্ঝাট বেড়ে গেল জান-বাজার আর ওই সব অঞ্চলে — তবে তা আগেকার ধর্ম্মতলার কাছে কিছুই নয়। আমাদের কালে 'রামরাজত্বে' মাঠে আমরা 'বসবাস' করেছি ব'লতে হবে বৈকি!

মাঠে জুলুম—কিছু আগেই কিন্তু একটা কাণ্ড বেধে যায়। একদিন সকালে উঠে 'ইংলিশম্যান্' কাগজে দেখা গেল—"Babus vs. Syces"—ব্যাপার কি, না খেলার মাঠের ছেলেরা 'কুক্ কোম্পানীর' সহিসদের 'গো-বেড়েন' দিয়েছে, মাঠে। তাই নিয়ে ইংলিশম্যানে কলম-ভর্ত্তি সম্পাদকীয় মন্তব্য! সত্যি ব্যাপারটা কি সংক্ষেপে বলি।

ঘটনার কথা—ছেলেদের খেলার নানা বিঘ্নকারী-দের মধ্যে আড়গোড়ার মালিকেরা খুব বেশী বিঘ্ন ঘটাত। কোনওরকমে টাকাটা, সিকিটা যোগাড় ক'রে ছেলেরা মাঠ মেরামত, 'লেভেল্' আদি করায় — কত সময়ে নিজেরাই রোলার টেনে মাঠ লেভেল্ ক'রতে লেগে যায়— সেই মাঠ আড়গোড়াওয়ালারা সার সার ঘোড়া টহল দিইয়ে তছনছ ক'রে ফেলে। ব'লে, চিঠি লিখে কিছুতেই কিছু যখন হ'ল না, পুলিশকে একটু জানান দিইয়ে ছেলেরা তাঁবুর কাশী মালিকে হুকুম ক'রলে 'তোরা বাঁশ-টাশ নিয়ে তৈরী থাকিস্, ঘোড়া টহল দিতে যখন ওরা আ'সবে, তার আগেই আমরা এসে পৌছুব—তারপর যা হবার হবে'।

ঘটনার দিনে—ছেলেরা কথামত ঠিক সময়েই মাঠে হাজির—মাঠে পড়ল ৩।৪টে ফুট্‌বল্ — দুম্‌দাম। বেলা তখন প্রায় ২॥ টা। কিছু পরেই ৩০।৪০ টা ঘোড়া আড়গোড়ার নীল জামাপরা সহিস সমেত সেখানে উপস্থিত। সেদিন আবার ৫।৬ জন জকি ঘোড়ায় চ'ড়ে এসেছে। তারা যাই আসা আর ছেলেদের বল মারার ধূমও তত বাড়া—বল মারার ধমকে ঘোড়া গেল সব চম্‌কে —মাঠে ঘোড়ার নাচ সুরু হ'ল আর কি! রেগে জকি-গুলো ঘোড়ায় চড়ে'ই ছেলেদের করলে তাড়া আর জকির বেঁটে চাবুক তাদের ওপর সপাসপ্। ছেলেরাও ছাড়বার পাত্র নয়—সেই চাবুক না ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরই মার— ওদিকে কাশী মালীর দল বাঁশ নিয়ে সহিসদের ক'রলে তাড়া। ঘোড়া সমেত সহিস দে ছুট্, দে ছুট্, জকিরাও গা-ঢাকা দিলে।



কে, ভট্টাচার্য্য—অষ্ট্রেলিয়ায় আই-এফ-এর নেতা।



কে, দত্ত—আই-এফ এর দুর্গরক্ষক (অষ্ট্রেলিয়ায়) প্রথম পাঁচটী খেলায় ইহার বিরুদ্ধে হইয়াছে ১৩টী গোল।

ফৌজদারী আদালতে—ল্যাঠা কিন্তু চু'কল না। ছেলেদের নামে হ'ল ফৌজদারী। বিচারের দিন ছেলেরা আসামী-কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। ফরিয়াদী সাক্ষ্য-সাবুদ দিয়ে ব্যারিষ্টারের মারফতে প্রমাণ ক'রে একরকম দিলে—ছেলেগুলো গুণ্ডার সেরা, গায়ে পড়ে ঘোড়া ক্ষেপিয়ে তার ওপর সহিস আর জকিদের মার—সে কি মার! হাকিম ছেলেদের ব'ললেন, "তোমাদের ব'লবার কিছু আছে, সাক্ষী, সাবুদ আছে?"

অঘটন—হাকিমের এজ্‌লাসের সাম্‌নে বারান্দায় ছেলেদের বিরুদ্ধে মামলার বিষয়ে কাণ-খাড়া ক'রে পুলিশ কমিশনর হ্যারিসন্ সাহেব পায়চারী ক'রছিলেন। এজলাসে ঢুকে সসম্ভ্রমে হাকিমকে তিনি ব'ললেন, "হুজুর আমি আর আমার এই লোকজন ছেলেদের পক্ষে সাক্ষী—সাক্ষ্য নিতে

হুকুম হউক”। আদালত স্তম্ভিত — হাকিম ব’ললেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় আপনি উঠুন। হ্যারিসন সাহেব কোর্টকে জানালেন, আড়গোড়াওয়ালারা যথেচ্ছাচারিতা ক’রে ছেলেদের খেলার মাঠের দুর্দ্দশা কি ভাবে করে। পুলিশকে ছেলেদের এ সম্বন্ধে চিঠি লেখার কথাও তিনি উল্লেখ ক’রলেন। সেই চিঠির কথা আড়গোড়াওয়ালাদের তিনি জানান, তাও বললেন। ছেলেদের মাঠে আসা, বল্ নিয়ে খে’লতে নামা, ঘোড়ার পাল নিয়ে আড়গোড়ার লোকজনের ছেলেদের ওপর চড়োয়া হওয়া, তাদের মার-ধোর সুরু করা আর তার ‘উত্তরে’ ছেলেদের ঘুরে দাঁড়ান আর আক্রমণকারীর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে মেরে তাদের মাঠ থেকে তাড়ান—সবই তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন ব’ললেন।

কোর্ট—আপনি কোনও বাধা দিলেন না!

পুঃ কমিশনর—দেওয়ার দরকার হ’ল না, তাল সামলালে ছেলেরাই।

কোর্ট—হুঁ, তার ফলে এই মামলা, কমিশনর সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ—আমি সব বুঝতে পেরেছি।

কোর্টের হুকুম হ’ল—সহিস, জকি সেদিন যত লোক উপস্থিত ছিল, মাথাগুণতি ক’রে সকলের ১৫৲ টাকা ক’রে জরিমানা, নইলে ৫ মাস ক’রে সশ্রম কারাদণ্ড। টাকা আদায় হ’লে সমস্ত টাকা মাঠ মেরামতের জন্য ছেলেরা পাবে। ঘোড়া টহল, খেলার মাঠের ত্রিসীমার মধ্যেও যেন না হয়—পুলিশ কর্ত্তা নজর রা’খবে—দরকার হ’লে অপরাধীকে চালান দেবে।

রামরাজত্ব—বিচার-ফলের খবরটা সংক্ষেপেই বেরুল ইংলিশম্যানে। ছেলেরা মাথা খাড়া ক’রে চলাতেই—‘খেলার মাঠের শত্রু’ নিপাত হয়। ছেলেদের শক্তি ও সম্ভ্রমের কদর উত্তরোত্তর বা’ড়তে থাকে—খালাসীটোলা, জানবাজার, মলঙ্গা, গেঁড়াতলার কাছে। পরে এদেরই সহযোগিতায় বাঙালী দর্শককে গোরার ছিপ্‌টি মারা ছেলেরা একেবারে বন্ধ করিয়ে দেয়। ‘গেট মণি’ নেই, রুই কাৎলা গোছের বড় কাপ্তেন নেই—মাল-কোঁচা বাঁধা জোয়ান বাঙালী খেলোয়াড় এই সব অঘটন ঘটিয়ে কলকাতার শ্রী ফিরিয়ে দেয়—মাঠে অবাধ যাওয়া আসার পথ ক’রে দেয়। তাদেরই গুঁড়োগাঁড়াদের ১৯১১তে শিল্ড-বিজয়।

সহযোগিতা—ফৌজদারী মামলার কয়েক দিনের মধ্যেই আর একটা ঘটনা। লর্ড উইলিয়ম্ ব্রেষ্টফোর্ড তখন বড়লাট সাহেব……হাউস্‌হোল্ডের কর্ত্তা। ভাইসরয়ের বডিগার্ড আলিপুর থেকে সারা পথটা এসে, পথ ছেড়ে বাঁক ফিরিয়ে মাঠ ধ’রে ছেলেদের খেলার মাঠ (শোভা-বাজার গ্রাউণ্ড) মাড়িয়ে ঢু’কবে গভর্ণমেণ্ট হাউসে। স্বয়ং ভাইসরয় একদিন এটা লক্ষ্য করেন এবং লর্ড উইলিয়মকে কথাটা জানিয়ে রাখেন। তারপরেই সাজ সমেত বডিগার্ড আসছে খবর পেয়ে লর্ড উইলিয়ম নিজে হন্তদন্ত হ’য়ে মাঠে গেলেন এবং শোভাবাজারের মাঠে বডিগার্ড পা দেবার আগেই তাদের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ালেন। সেই দিন থেকে মাঠ মাড়িয়ে যাওয়া তাদের বন্ধ হ’ল। এ সহানুভূতি বাঙালীকে যাচিঞা করে নিতে হয়নি—আপনা হ’তে এসেছে। বাঙালী খালাসীটোলা, মলঙ্গাকে উ’ঠতে ব’ললে উঠেছ, ব’সতে ব’ললে বসেছে—দু’জনার ‘প্যাক্ট’ হয়ে যায় যে মনে-প্রাণে—উ’ঠবে না, ব’সবে না!

ব্রত-প্রতিষ্ঠা—বাঙালীর কথায় হ্যারিসন সাহেব ক্রিকেট্ প্রতিযোগিতার জন্য দেন হ্যারিসন্ শিল্ড। টেনিস্ দক্ষতা দেখাতে বেলভেডিয়রে বাঙালী বিনয়প্রসাদের প্রতি বৎসরে সাদর নিমন্ত্রণ, ইষ্টসারে বিজয়ী বাঙালীর গর্ব্বে ইংলণ্ডের বুক দশ হাত হওয়া—খেলাধূলায় বাঙালীর প্রতি সাহেবের প্রীতিভাবের বিশিষ্ট উদাহরণ। কি অবস্থা থেকে বাঙালীর ছেলে বাঙালীকে কোথায় টেনে তোলে—এসব না জানলে বোঝা যাবে না। ভারতবর্ষে ফুট্‌বলের গুরু বাঙালী। একে ‘রামরাজত্ব’, তার ওপর “গুরু”—গর্ব্ব অল্পবিস্তর আমাদের হবারই কথা। খেলাধূলার সম্পর্কে জীবনের ব্রত সমাপ্ত আমরা করেছি। এ সন্তোষ লাভ অনেকের ভাগ্যে ঘটে না।

বঙ্কিম-বন্দনা

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

কলঙ্ক-কালিমা লেপি' মুহু মুহু শিরে কর হানি'
'আমরা প্রমত্ত হই অতীতের বৃথা অহঙ্কারে,
বর্ত্তমানে ডালি দিয়া, শ্বেতাঙ্গিনী গণিকার বাণী
বহন করিয়া চলি ভবিষ্যের দুর্গ-অধিকারে!

সে দুর্গ-অন্তরে আছে স্বপ্ন-বিলাসের ছড়াছড়ি—
দুঃশাসন আসি' টানে বাণী-দ্রৌপদীর বস্ত্রখানি,
ধর্ষিতা ভারতী হায় রাজপথে যায় গড়াগড়ি—'
শৃগাল, শকুনি আসি' লুব্ধ-প্রেমে করে টানাটানি।

নিশীথে জঘন্য পল্লী মুখরিয়া ওঠে তিক্ত রব—
তন্দ্রালু পেচক বসি' সঙ্গীতের স-ঋ-গ-ম সাধে,
উলঙ্গ রাক্ষসী নাচে তালে তালে বাড়ায়ে গরব—
সে রসে উন্মাদ হয়ে চামচিকা তানপুরা বাঁধে।

খোলেতে মারিয়া চাঁটি পরম বৈষ্ণব ওই কাঁদে—
প্রেমিকের কান্না ও যে, বাঙালীর কান্না ও তো নয়!
টিকি-তিলকের দ্বন্দ্ব মুগ্ধ চোখে রসকলি ফাঁদে—
রসময়ী রাধিকার বক্ষে এসে স্তব্ধ রসময়!

ধন্য হ'ল কৃষ্ণলীলা মূর্ত্ত হয়ে মানুষের মাঝে—
ধর্ম্মের প্লাবনে শুধু নদে কেন?—দেশ ভে'সে যায়!
ঘরে ঘরে ধার্ম্মিকের ধ্বজা ধ'রে যারা আজো আছে—
'নদের নিমাই' আহা, শান্তিপুরে শান্তি পে'তে চায়!

কিন্তু তবু কোথা শান্তি—কোথা স্বর্গ—ইহা কত দূর?
নিস্তেজ আত্মার সুরে ভগবান একি ভ্রান্ত হয়!
চিত্ত-ব্যাভিচারী ধর্ম্ম দিগ্‌ভ্রান্তি রচে 'মায়াপুর'—
নারী ও সুরার মর্ম্মে মর্ম্মী নর মিছে বন্দী রয়!

ধর্ম্ম-চেতনার পুষ্প শুষ্ক হয় মূর্খতার চাপে—
সাহিত্যের শুদ্ধ সত্ত্ব রুদ্ধ রহে রুদ্র বেদনায়!
হে ঋষি! পৌরুষকণ্ঠ আজি কোন্ দূরদেশে কাঁপে—
তোমার অমোঘ মন্ত্র শুদ্ধ কেন ক্ষুব্ধ চেতনায়?

বুঝি আজো অরবিন্দ এই দুঃখে নির্ব্বাসনে বসি'
তোমারি অমর মন্ত্র নিরালায় নিত্য করে জপ,
প্রকৃতি-জয়ের বার্ত্তা বিঘোষিতে চাহে কোন্ অসি—
অথবা মসীর রক্ত শিরাতন্ত্রী করে দপ্ দপ্!

ছিন্ন ভিন্ন লতিকার খিন্ন কণ্ঠ ঢের শোনা হ'ল—
'কাঁদুনে বাঙালী' নাম ধন্য হ'ল সহস্র ভাষায়,
বজ্রদৃঢ় মুক্তস্বর চাবি দিয়ে ফের আজ খোলো—
হে সাধক, ওই দেখ বীর্য্যলক্ষ্মী রূপসী আশায়!

শতাব্দীর শেষে এসে আর বার ওঠ তুমি জে'গে—
শোনাও পুরানো মন্ত্র নূতন ভাষার দৃপ্ত রোলে,
তারুণ্যের তরলতা গাঢ় হোক গূঢ় ছোঁয়া লে'গে—
বলিষ্ঠ ভূমিষ্ঠ হোক পুনঃ এই জননীর কোলে!

আবার সদম্ভ রে'ষে অবসন্ন হোক বে'জে বে'জে
মহাভারতের শঙ্খ পাঞ্চজন্য পাণ্ডবের দুখে,
সাহিত্য-শ্রীকৃষ্ণ এস বিষ-বাঁশী নিয়ে ফের সে'জে—
'বঙ্কিম' কটাক্ষ তব ছুরি হে'নে যাক বুকে বুকে!

প্রেমিকে দুর্জ্জন কর; প্রেম? ওযে পচা হয়ে গেছে!
ক্রন্দন ভুলিয়া যায়—হেন শক্তি জাতিরে দেখাও!
প্রতিটি তরুণ আজি প্রেম-স্বপ্নে মরে বেঁ'চে বেঁ'চে—
বীরমন্ত্রে ফের সেই বীরতার মহিমা শেখাও!

কুমারের মৃত্যু*

শ্রীরমেন্দ্রনাথ সেন

রাজকুমার অতিশয় পীড়িত ;—মৃত্যু তার যেন শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে ! রাজ্যের সমুদয় গির্জ্জায় বেদীর সাম্‌নে সারি সারি প্রদীপ জল্‌ছে ; সেখানে কুমারের মঙ্গল-কামনায় অবিরাম প্রার্থনা ক'দিন থেকে সুরু হয়েছে। প্রাচীন রাজধানীর রাস্তাগুলি নিস্তব্ধ ও শোকাবহ ; গাড়ীগুলি তথায় নিঃশব্দে চলাফেরা করছে ! সমগ্র নগরী যেন আজ দুঃখে সমাচ্ছন্ন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে ধার্ম্মিক ও সাধু ব্যক্তিরা মিলিত হয়েছেন ! আঁচল ঢাকা দিয়ে চাক্‌রাণীরা কাঁদ্‌ছে। বহু চিকিৎসক এসে রাজপ্রাসাদে ভিড় করেছেন। কুমারের শিক্ষক এবং যিনি কুমারকে অশ্বচালনা শিক্ষা দেন উভয়েই প্রাসাদের সিঁড়ির উপরে, নীচে ওঠানামা করছেন। তাঁরা দু'জনে ফিস্ ফিস্ করে কি কথাবার্ত্তা বল্‌ছেন। এমন সময়ে আস্তাবল থেকে একটি ঘোড়া নিয়ে সহিস সেখানে উপস্থিত হ'ল। এটি কুমারের অতিশয় প্রিয় ঘোড়া।

রাজা কোথায় ? তিনি প্রাসাদের একপ্রান্তে একটি নির্জ্জন কক্ষে ব'সে নীরবে অশ্রুমোচন কর্‌ছেন।

রাণী কুমারের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা। তাঁর সুন্দর আনন বেয়ে ঝর্‌ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। তাঁর ক্রন্দন ক্রমশঃই বেড়ে চল্‌ছে।

রোগশয্যায় কুমার চক্ষু মুদিত করে শুয়ে আছে, মনে হয় নিদ্রিত, কিন্তু কুমার ঘুমায়নি। চোখ মেলে কুমার মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

মায়ের দিকে ফিরে কুমার বল্‌ল,—কেন তুমি কাঁদছো মা ? তুমি কি ভাব্‌ছো, মৃত্যু আমার সত্যি ঘনিয়ে এসেছে ? অসম্ভব ! চল্লিশজন সশস্ত্র সৈন্য আমার শয্যার চার পাশে দাঁড়িয়ে থাক। দেখি, মৃত্যু কি ভাবে আমার কাছে উপস্থিত হয়।

কুমারের আব্‌দার রক্ষার জন্য রাণীর নির্দ্দেশ মত চল্লিশজন সশস্ত্র সৈন্য কুমারের শয্যার চারিপাশে সার বেঁধে দাঁড়ালো। একশ' কামান চারিদিকে সাজিয়ে রাখা হ'ল।

কুমার সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে ডাক্‌লেন,—কর্ণেল ! কর্ণেল !

কর্ণেল তালে তালে পা ফেলে কুমারের শয্যার পার্শ্বে এসে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়াল।

কুমার বল্‌লো—হে বিশ্বাসী কর্ণেল, তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। তোমার তীক্ষ্ণ তরবারি-খানাতো সঙ্গেই আছে ? মৃত্যু যদি আমার কাছে আস্‌তে চায়, ঐ তরবারি আঘাতে তাকে হত্যা করো। কেমন পারবে তো ?

তীক্ষ্ণ তরবারিখানা উন্মুক্ত করে কর্ণেল বল্‌ল, হাঁ, নিশ্চয়ই পার্‌ব। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেলের চোখ বেয়ে অশ্রু মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময়ে ধর্ম্মযাজক কুমারের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হ'লেন এবং দীর্ঘকাল ধ'রে ফিস্ ফিস্ করে কুমারের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বল্‌লেন।

কুমার খুব আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে তাঁর কথাগুলি শুন্‌তে লাগলো।

হঠাৎ কুমার ব'লে উঠ্‌ল,—ধর্ম্মযাজক মশায়, আপনি যা বল্‌ছেন, তার কিছুই আমি বুঝালুম না। আমার বন্ধু সহিসকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দিলে সে কি আমার পরিবর্ত্তে মর্‌তে পারে না ?

ধর্ম্মযাজক ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লেই যেতে লাগ্‌লেন।

কুমার ক্রমে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল। ধর্ম্মযাজকের কথা শেষ হ'তেই কুমার বল্‌ল,—আপনি এতক্ষণ আমাকে যা কিছু বল্‌লেন, সমস্তই দুঃখের। আকাশের নক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে আমি কুমার হয়েই বিরাজ কর্‌ব। আমি জানি, যিনি ঈশ্বর, তিনি আমার কাকা।

কুমার মা'র দিকে তাকিয়ে বল্‌ল,—আমার সুন্দর পোষাক, শিরস্ত্রাণ ও ভেল্‌ভেটের জুতাজোড়া এনে দেও। আমি কুমার রূপেই স্বর্গে যেতে চাই ;

তারপর ধর্ম্মযাজক ফিস্ ফিস্ ক'রে কুমারকে আরও অনেক কিছু বল্‌লেন।

অবশেষে কুমার নিরাশভাবে হতাশের সুরে বল্‌ল,—তা' হ'লে কুমার হওয়ার আমার কি প্রয়োজন ছিল ধর্ম্মযাজক মশায় ?

তারপর দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কুমার তাকিয়ে রইল, চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

* ফরাসী হইতে।

ভারত-সমস্যায় আধুনিক দৃষ্টি

"ভারতের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা" শীর্ষক একটি সময়োপযোগী ও সারগর্ভ প্রবন্ধে (Modern Review—August, 1938) বৈজ্ঞানিক চিন্তা-নায়ক ডাক্তার মেঘনাদ সাহা যে সকল যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন—আশা করা যায়। কৃষি-প্রধান ভারতে পল্লী সংগঠন ও কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং শিল্পসমূহের উন্নতির ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যে গতানুগতিক চিন্তা, তাহার ঊর্দ্ধে হইতে ডাঃ সাহা বলিতেছেন ঃ—

"উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালন করা খুবই বাঞ্ছনীয় এবং ইহার ফলে আমরা সস্তায় উপযুক্ত খাদ্য ও কৃষি-উৎপন্ন অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যেমন তুলা পাইতে পারি। কিন্তু ইহার ফলে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সমাধানের কিছুই হইবে না।......এই আশা মিটাইতে হইলে, বর্ত্তমানের শিল্পোৎপাদনের ১০ হইতে ২০ গুণ পর্য্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। ফলতঃ শিল্পের ভিত্তিতে আরও অনেক গ্রামকে সহরে পরিণত করাই গ্রামোন্নতির একমাত্র পন্থা। ইহাই বড় শিল্প-গঠনের মূল কথা।......শিল্পোৎপাদন যে কেবল নূতন পন্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছে—তাহা নহে, ইহা মানব-জীবনের এক নূতন দর্শনও প্রচার করিতেছে।......'নবযুগ' সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে, আমাদের বর্ত্তমান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড অথবা জার্ম্মানীর জীবন-ধারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।"

"কুটীর-শিল্পের পুনর্গঠন করিয়া জাপান আংশিকভাবে তাহার প্রাচীন জীবন-যাত্রা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। সস্তায় বিদ্যুৎ-সরবরাহ ও তাহা আধুনিক যন্ত্রযোগে নিজগৃহে শিল্পোৎপাদনের জন্য সংহত করার ফলেই জাপানে উহা সম্ভব হইয়াছে।......জাপানের তাঁতী হাতের তাঁত কিম্বা চরকা ব্যবহার করে না। বিদ্যুৎ চালিত 'টয়ডা' তাঁতেই সে কাপড় তৈয়ারী করে। ভারতীয় শ্রমিক অপেক্ষা সে ১০।১২ গুণ অধিক মাল উৎপন্ন করে। অনুমিত হয় যে, জাপানী শিল্পদ্রব্যের অর্দ্ধেকেরও বেশী কুটীরশিল্পজাত।"

ইহার পর ডাঃ সাহা কালোপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা কি কুটীর-শিল্প, কি বৃহত্তর শিল্প-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে ভারতের আশাজনক উন্নতির সম্ভাবনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই, দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন—

"উৎপাদনের নূতন প্রণালীতে দেশের শিল্প-গঠন করাই বর্ত্তমানে ভারতের সমস্যা। পৃথিবীর অপর দুইটী দেশের ন্যায় (রুশিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) সমগ্র ভারতেরও খনিজদ্রব্য, কৃষির উপযোগী ভূমি ইত্যাদি শিল্পের নব প্রণালী প্রবর্ত্তনের সকল সামগ্রীই আছে। এই কার্য্য না করা পর্য্যন্ত ভারতের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা দূর হইবে না এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশাও কম।"

"...দৃঢ় বিশ্বাস হইতেই মানুষের কার্য্যের সূচনা হয়। আমরা যদি বাতুল নয়নে অতীতের জীবন-যাত্রার মোহের প্রতি চাহিয়া থাকি, তবে কখনই আমরা কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারিব না। কিন্তু জাতীয় আকাঙ্খা পরিপূরণের নিমিত্ত এই স্পষ্ট ধারণাই একান্ত প্রয়োজন।"

আমরা চিন্তাশীল ও কর্ম্মশীল নির্বিশেষে প্রত্যেক দেশ-সাধককে ডাঃ সাহার উক্তিগুলির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যথোচিত কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

বিশ্ব-কল্যাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণ—

বিশ্ব-শান্তির তথাকথিত দরবার জেনেভার রাষ্ট্র সঙ্ঘের সংস্পর্শে প্রত্যক্ষভাবে আসিয়া এবং বিশিষ্ট বিদেশীয় ভারত-প্রসিদ্ধ রোমাঁ রোলাঁর সান্নিধ্যলাভে পরিতুষ্ট হইয়া, তাহার অভিজ্ঞতা হইতে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার একদা যে পত্র-প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি শ্রাবণের "ভারতবর্ষে" (১৩৪৫) তাহা পাঠ করিয়া ভারতীয় দর্শনের স্বকীয়তার প্রতি ইউরোপীয় মনীষিদিগের ক্রম উন্নত দৃষ্টি ও আস্থার আভাষ পাওয়া যায়। লীগ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনোভাবকে লক্ষ্য করিয়া ডাঃ সরকার বলিতেছেন—

"...কেউ কেউ বড় কিছু আশা করেন না—কারণ League এর পেছনে কোন sanction নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রের লক্ষ্য তার নিজেরই

অভ্যুদয়ের দিকে। মানব সভ্যতার এখনও এমন কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি, যাতে মানুষ তার রাষ্ট্রগত অধিকারের চেয়ে বিশ্বমানবের হিতের দিকে হবে তৎপর। বিশ্ব-মানব বোধ এখনও মানুষের চিন্তায় ও কর্ম্মে স্ফুট হয়নি। রাষ্ট্রসংঘের সার্থকতা সেদিন বোঝা যাবে—যেদিন দেখা যাবে কোন প্রতাপশালী রাষ্ট্রের অত্যাচার হতে এ কোন জাতিকে মুক্তি দিতে পেরেছে। তবে রচনা হিসাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটা বিশেষ রচনা। হয়ত একদিন একে অবলম্বন ক'রে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সবই নির্ভর করে মানুষের মুক্ত চেতনার উপর। রাষ্ট্রবোধ—এ মুক্তির বোধ হতে অনেক দূরে। যেদিন মানুষের অভ্যুদয়ের বিকাশে বিশ্বাত্মা-বোধ হবে পূর্ণ, সেদিনই এ স্বপ্ন হবে প্রকৃত সত্য। মানুষ যত পরিমাণ মুক্তির জন্য হবে তৎপর, ততই তার সমষ্টির রূপকে ভাল করে বুঝতে হবে। সমষ্টির মুক্তি না হলে, ব্যষ্টির বা জাতিরও মুক্তি হয়না। ইউরোপে এই সমষ্টি-বোধ এখনও বেশ জাগ্রত নয়। ইউরোপের মানস দৃষ্টি এখনও জাতিতেই বদ্ধ। বিশ্বের মুক্তাত্মার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় অল্প বলেই মনে হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি এক হলেও, জাতিগত বৈষম্যের ও অহংকারের সঙ্কীর্ণতা এখনও ইউরোপ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে, যদি সেই অভ্যুদয়ের ভিত্তি রচিত না হয় কোন গভীর অনুভূতির উপর। বিজয় ও সম্পদশ্রী অনেক সময়ে দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে' তোলে।"

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া ডাঃ সরকার যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, চিন্তা-নায়ক রোমাঁ রোলাঁর সান্নিধ্যে আসিয়াও তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা সমর্থিত হইয়াছে। তাই রোমাঁ রোঁলার সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে তিনি অকপটে বলিতে সাহসী হইয়াছেন—

"তত্ত্বানুসন্ধান ভারতবর্ষে শুধু বুদ্ধির বিলাস নয়—তত্ত্বকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে ভারতের আচার্য্যেরা, বিশেষতঃ ঋষিরা সন্তুষ্ট হ'তেন না। তত্ত্ব তাঁহাদের কাছে শুধু বিচারেই ধৃত হয়নি, বিচার পর্য্যবসিত হয়েছে অনুভূতিতে। অনুভূতিতে তত্ত্বটী দীপ্ত হলেই তা আমাদের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে—তা' জীবনের ভিতর দিয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সত্যানুভূতি মানুষের অন্তরকে বিরাট্ বোধে ও ভাবে পূর্ণ করে। ভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যেরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা ঋষি। এজন্যই তাঁদের জীবন এক স্বচ্ছ শান্তিপূর্ণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ত। কালিক দেশিক ধারণা হ'তে তাঁরা হতেন সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত। উদার সত্যের অনুভূতিতে জীবনের কল্যাণ ছন্দ তাঁরা বিশ্বময় দেখতে পেতেন। ভারতের দৃষ্টি বিশ্ব-দৃষ্টি। ভারতের ব্রহ্মবাদ ভারতবর্ষের জীবনকে গঠিত করেছে—এই সুর আজও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের, গান্ধীজীর, শ্রীঅরবিন্দের ভেতর দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে ব'লেই এঁরা কর্ম্ম-জগতে, ধ্যান-জগতে, জ্ঞান-জগতে নেতৃত্ব কচ্ছেন। এজন্যেই বিবেকানন্দের বাণীকে পাশ্চাত্যদেশ বুঝতে চেষ্টা কচ্ছে। ভারতে সাধনার জীবন এমন স্তরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে শক্তির সঞ্চারকে ভুলে' মানুষ হয় বিশ্ব-ছন্দের সঙ্গে পরিচিত।"

ইহার উত্তরে রোমাঁ রোলাঁও বলিতেছেন—

"তোমার উত্তর শুনে আমার খুব আনন্দ হল। এদেশে জাতীয়তা হয়েছে ব্যষ্টি—যত বড় জ্ঞানী হন, তাঁদের কর্ম্মের পরিধি জাতির গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারে না। ভারতবর্ষের বড় বড় মনস্বীদের ভেতর এ বিশ্বসুর আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই সেদিন গান্ধীজী এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। কোথাও যেন এত বড় জাতির পরিচালকের ভেতর জাতীয়তার গন্ধ এতটুকুও নাই। কি উদার। কি প্রশান্ত। বিশ্বহিতে জীবন আহুতি দিয়েছেন। ভারতের কল্যাণে তিনি যতটা উদ্বুদ্ধ, বিশ্ব-কল্যাণেও তিনি তার চেয়ে কিছু কম নন্। যে অহিংসনীতির সেবা কচ্ছেন, তাতেই বোঝা যাবে তাঁর কর্ম্মপ্রণালী রচিত হয়েছে বিশ্ব-প্রেমের বেদিকার মূলে। বস্তুতঃ সত্যের সম্যক্ দৃষ্টি হলে, কর্ম্ম কখনও শুধু জাতীয়তাকে নিয়ে থাকতে পারে না। গান্ধীজির কাজ দেখে আপাততঃ মনে হয় তিনি শুধু ভারতেরই সেবা কচ্ছেন; কিন্তু একটু অনুধাবন করলে বোঝা যাবে—তিনি যে প্রণালীতে কর্ম্ম কচ্ছেন, তা' কর্ম্মের বিশ্ব-নীতি। জগত হতে হিংসাকে দূরীভূত করবার কথা এসিয়া হতেই এসেছে। শাক্যসিংহ ও যীশুর এই একই কথা। এরূপ সার্ব্বভৌমিকতায় ভারতবর্ষ কত শ্রেষ্ঠ।"

বিদেশীয় সত্যদ্রষ্টার মুখে এইরূপে ভারতীয় তত্ত্বের বিশ্বজনীনতাকে, অকপটে স্বীকার করিবার আগ্রহ নূতন না হইলেও, স্বদেশীয় তত্ত্বদর্শিগণের মধ্যে ভারতীয় সত্যের সমগ্রতার প্রতি নূতন করিয়া দৃষ্টি-আকর্ষণের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

গীতার যোগ

(তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীমতিলাল রায়

দশম পরিচ্ছেদ

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥" ৭

—আমারই এই সনাতন অংশ জীবরূপে জীবলোকে ষষ্ঠ মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে কর্ষণ করিয়া থাকে।

পরমাত্মার অংশ সংসারে জীবরূপ ধারণ করিয়া প্রকৃতির দ্বারা মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে কর্ষণ করিতেছে। রূপে দৃষ্টি, গন্ধে নাসিকা, শব্দে শ্রুতি, রসে রসনা এবং স্পর্শে ত্বক্। এইরূপ বিষয়াদির সহিত ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর সংযুক্ত। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ভোগের কারণ। প্রকৃতিকে মধ্যস্থ রাখিয়া আত্মা সূক্ষ্মরূপে দর্শন-শ্রবণাদি করিয়া থাকেন। আত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, এইগুলি তৃণকাষ্ঠের ন্যায় জড়তা লাভ করে। নিদ্রিত ব্যক্তির আত্মা ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া যথাবৎ বিষয় সকলের স্মরণে, দর্শন-শ্রবণাদিরই অনুরূপ স্বপ্ন-সুখ অনুভব করে। ইন্দ্রিয়গণ কিন্তু স্ব-স্ব স্থানে নির্বিষ সর্পের মত পড়িয়া থাকে। জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে, পরমাত্মার এই অংশ বিদ্যমান থাকিয়া, সৃষ্টি-চাতুর্য্য রক্ষা করে। কোন কোন ভাষ্যকার এই 'কর্ষতি' শব্দের অর্থ 'পুনর্জীবলোকে সংসারোপভোগিমাকর্ষতি' বলিয়াছেন। পুনঃ শব্দ-প্রয়োগে পূর্ব্বে এইরূপে ভোগ হইয়াছিল, আবার হইবে, এইরূপ বুঝায়। পূর্ব্বে ভোগ না হইলে অথবা বর্ত্তমানে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে আর এইরূপ ভোগ না হইতে পারে, এই অর্থ ধরিলে বোধের ভিত্তিও অনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা আচার্য্য হনুমানের সহজ অর্থই এই ক্ষেত্রে প্রযুজ্য মনে করি। জীবলোকে জীবভূত যে সনাতন অংশরূপে অবস্থান করিতেছেন—"মায়ারূপে তিষ্ঠতি"—তার "শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি" 'শব্দাদিভিঃ' বিষয়ে "কর্ষন্তি"। এই সৃষ্টিনীতি আজ আছে, কাল থাকিবে না, এমন কথা মূল শ্লোকেও নাই। এক অদ্বয় ব্রহ্ম অংশরূপে স্থান, কাল ও ঘটনার আবর্ত্তে বহু হইয়াছেন। দৃশ্যতঃ রূপস্বাতন্ত্র্য, বস্তুতঃ সেই এক অখণ্ডই অংশরূপে বিকীর্ণ। এই জন্যই জীবভূত অংশেও অনাহত 'অহং ব্রহ্ম' ঋক্ উচ্চারিত হয়। বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য-দর্শনে জীবলোকে অপূর্ব্ব অদ্বৈতবাদের শাস্ত্র গীতায় রচিত হইয়াছে। যতক্ষণ অনন্তের অংশ ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত প্রাণিদেহে অথবা জড়জগতে বিদ্যমান, ততক্ষণ এই অদ্ভুত সৃষ্টি মায়াচিত্র বটে; কিন্তু ইহাকে পশ্চাতে রাখিয়া অংশের যে অন্তর্দ্ধান-কল্পনা মায়াবাদীরা করেন, গীতা তাহা স্বীকার করেন না। আমরা যখন সৃষ্টি-রহস্যের জ্ঞান অর্জ্জন করি, এই জীবলোক সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয় না। জ্ঞানাভাবে সৃষ্টির যে রসাস্বাদ, জ্ঞানাবির্ভাবে আস্বাদের তারতম্য হয় মাত্র। ভোগ বিরতি হয় না।

শাস্ত্র বলেন সকল পদার্থের ক্ষয় আছে। সকল ঊর্দ্ধগতি পতনে পর্য্যবসিত হয়; পদার্থপুঞ্জের যে সংযোগ, বিয়োগ তাহার পরিণাম। জীবনের অন্ত মরণে। ইহা ঘটে দৃশ্যমান জগতে, অধিষ্ঠিত অংশে নহে। সেই অংশে "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ"। এই অনুভূতিই "যদ্জ্ঞাত্বা চ নিবর্ত্তন্তে" শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানীর জীবন-মরণ নাই—এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। চেতনার অবস্থান প্রস্থান নাই। তাহাই বুঝাইবার জন্য পর পর কয়েকটী শ্লোক রচিত হইয়াছে, আমরা পাঠকদের তাহা অবধান করিতে বলি।

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" ৮

—ঈশ্বর যখন শরীর গ্রহণ করেন, আবার যখন তাহা ত্যাগ করেন, বায়ুর পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া প্রস্থানের ন্যায় তিনি এই সকল গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করেন।

পুষ্পকোষে বায়ু প্রবেশ করিয়া গন্ধ লইয়া চলিয়া যাওয়ার ন্যায় দেহাতীত শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ ঈশ্বর প্রবেশ করিয়া জীবদেহের ইন্দ্রিয়াদি মনোবৃত্তি লইয়া

প্রস্থান করেন। অনেকে মনে করেন—ঈশ্বরের (ঈশ্বর অর্থে এইস্থানে দেহী বুঝিতে হইবে) এই আগমন ও প্রস্থান অব্যয়পদপ্রাপ্তির পর আর ঘটে না। ষষ্ঠ শ্লোকে "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" এই শ্লোকার্থ এই ভাবেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাষ্যকারগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতের কৃষ্টি ও সাধনা বহুদিন যাবৎ এইরূপ অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। গীতার ধর্ম্ম "সর্ব্বেষু কালেষু" যোগযুক্ত থাকা। এই যুক্ত আত্মলয় অর্থে ব্যাখ্যাত হওয়ায়, যুগের পর যুগ ভারতের সিদ্ধগণ সংসারকে নশ্বর ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। জীবনের গতি দুই প্রকার। "শুক্লকৃষ্ণে" অর্থাৎ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গে। গীতায় বলা হইয়াছে "একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ"। অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গে অনাবৃত্তি, আর প্রবৃত্তিমার্গে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শ্রুত্যাদির মতও এইরূপ—অরণ্যবাসে অগ্নিহোত্রী অর্চ্চির আরাধনা করেন। আর প্রবৃত্তিমার্গী গৃহিগণ ধূমলোকের অনুগামী হন। এই অনাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি কথাটী লইয়া দেহাভিমান-প্রযুক্ত আমরা একে জন্ম-মৃত্যু হইতে মুক্তি, অন্যে জন্মগ্রহণযুক্ত জীবন স্থির করিয়াছি। এই সমস্যার সমাধানে স্পষ্ট করিয়াই গীতায় আছে—

"নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।"

অর্থাৎ "মোক্ষ ও সংসারপ্রাপক উভয় মার্গ জানিয়া যোগী কিছুতে বিমূঢ় হইবেন না।" কেন না, জীবলোক অব্যয়। জীবভূত ঈশ্বর অনন্ত। এক প্রপঞ্চময় ভৌতিক আশ্রয়; আর এক ইহাতে সংস্থিত অভৌতিক "মমৈবাংশ"। ভৌতিক শরীর আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরের অংশ অষ্টধা প্রকৃতি সহ লীলা করিতেছেন। এই প্রকৃতি কোথাও শুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ। উহাও জগৎপ্রপঞ্চের ক্রমবিকাশে ছন্দিত। কিন্তু এই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত অবিনশ্বর আত্মা যাঁহাকে জীব-চৈতন্য বলা যায়, তিনি এক অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহেন। জীবলোকে জীবভূত পরাৎপর পুরুষের এই চৈতন্য অংশ-মাত্র প্রতীয়মান হইলেও, ইনিই ব্রহ্ম, আদ্যন্তহীন পরম তত্ত্ব—এ কথা দর্শনশাস্ত্রে সুপ্রমাণিত হইয়াছে। অধ্যাত্মজীবচৈতন্য আবার ভূতাদি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ; তাঁহাকে চিদচিদাত্মক বলা হয়। চিৎ ও অচিতে জড়াইয়া ভূমার চৈতন্য হারায়। সাধক রামপ্রসাদ ইহা দেখিয়াই গাহিয়াছিলেন—"মায়াময়ীর ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে' কাঁদে।" এই অংশস্বরূপ অনুভূতি আর অন্য কিছু নহে, ভূতাদি শরীরে চৈতন্যের সসীম আত্মবোধ। গীতায় তাই "ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতী মামেতি" মন্ত্রের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। দেহাত্মবোধ পরিত্যক্ত হইলে, পুরুষোত্তমের সহিত জীবচৈতন্যের যুক্তি সম্ভব হয়। এই যে আমি ও আমার বোধ, ইহা অন্য কিছু নহে—"পরিচ্ছিন্নত্বমাত্রবোধশ্চ মোহঃ"। এই জন্য পূর্ব্বেই অব্যয়-পদ-প্রাপ্তির জন্য "নির্ম্মাণমোহ" হওয়ার সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। যে চৈতন্য মোহবদ্ধ, উহাই মোহমুক্ত হইলে অসীম চৈতন্যে পরিণত হয়। অজ্ঞান-নাশে দ্বন্দ্বমুক্তি হয়; তখন সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগের মর্ম্ম বুঝা যায়, সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগ হইয়া থাকে। আত্মার এই নৈষ্কর্ম্ম্যের অনুভূতি মানুষ বুঝিয়াছে—জন্ম-মৃত্যু-রহিত অনাবৃত্তি। কিন্তু যাঁহার সহিত চৈতন্যের যুক্তি, তিনি যে যুগপৎ চিৎ ও অচিৎ। চিৎ কিন্তু অচিৎ নয়, অচিৎও চিৎ নয়। অচিৎ তমোময় শিব। চিৎ জ্যোতির্ম্ময় শক্তি। শক্তি সংসারের কুরুক্ষেত্রে রণোন্মত্তা, উন্মাদিনী, খেটকখর্পরধারিণী, অতি ভীষণা। এই চৈতন্যময়ী শক্তি অনন্তের সহিত যুক্তি যদি পায়, আবৃত্তি অনাবৃত্তির সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগ নিরাময় হইলে জিহ্বা খসিয়া পড়ে না, আহার্য্য দ্রব্যের প্রকৃত আস্বাদ মিলে। এই যে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি যায়ন্তে"—এই আনন্দের জগতে জন্ম মৃত্যু, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব থাকে না। অনাবৃত্তি-পুনরাবৃত্তির বাঁধন খসিয়া পড়ে। এই তথ্য আমরা ভুলিয়াছি। পরমেশ্বরের চেতনায় এই বিস্মৃতির স্তর জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলার কথাই গীতার নূতন বেদের ঝঙ্কার তুলিয়াছে। আমরা ক্ষরাক্ষর পুরুষোত্তমের শ্লোকের ব্যাখ্যা-কালে এই সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

বায়ুর ন্যায় আত্মা বিকশিত জীবদেহে প্রবেশ করে, আবার প্রস্থান করে। ভৌতিক দেহ ফুলের ন্যায় ফুটে, আবার শুকাইয়া যায়। চিৎ সর্ব্বব্যাপী 'সর্ব্বত্রগ'। এইখানে উৎক্রামণনীতির রহস্য পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ

করার জন্য বায়ু ও পুষ্পসৌরভের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে। যাহা নিত্যের অংশ তাহা আশ্রয়চ্যুত হইলে, নিত্যেই সংযুক্ত হইবে; ইহার জন্য স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকাই তো শ্রেয়ঃ। ঘট আজ আছে, কাল নাই। ঘটাকাশ তো অনন্ত আকাশে মিশিয়া যাইবে, ইহার জন্য এত হাঙ্গামা করা কেন? বিষয়টা এইরূপ নহে। সাংখ্য-প্রমাণিত এই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব-সমন্বিত জীবদেহে পরমেশ্বরেরই অংশ অনুস্যূত হইয়া প্রকৃতির সহবাসে ইন্দ্রিয়াদির সহিত নানাবিধ ভোগরত। এই লীলার হেতু কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন না। কেন যে মোহ, আবার কেন যে বিবেকোদয়ে ক্ষেত্রবিশেষে লীলাবৈচিত্র্য—সে তত্ত্ব বীজাঙ্কুর-সমস্যার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য। অগ্রে বীজ, কি অগ্রে অঙ্কুর—এ কথার মীমাংসা নাই বলিয়াই তো সৃষ্টির অনাদিত্ব প্রমাণিত হয়। কোথাও বদ্ধাত্মা, কোথাও মুক্তাত্মা—ইহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার এক সনাতন উত্তর আছে, ঈশ্বরেচ্ছা। যেখানে তাঁহার ডাক পৌঁছায়, সেইখানেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। কেন যমুনা পুলিনে শ্যামের মুরলী বাজে? কেন নদীয়ার জাহ্নবীতটে শ্রীগৌরাঙ্গের সোণার নূপুর বাজে? কেন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে অমিয়-শীতল কণ্ঠ ফুকারিয়া উঠে? ইহার উত্তর নাই। এমনই হয়, এমনই হইয়া থাকে। আমরা অধ্যাত্মরহস্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছি মাত্র।

কথা হইতেছে—দেহ হইতে আত্মার উৎক্রামণে অনন্তের অংশ অনন্তে মিশায় না কেন? মিশায় না বলিয়াই তো প্রকৃতিগত আত্মার কাণে কাণে পুরুষোত্তমের বাঁশী বাজে "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়" —বুদ্ধ্যাদি মনোবৃত্তি সময় থাকিতে থাকিতে আমায় তুলিয়া দাও। কিছুই তো যাইবার নহে—পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, পরিশোধনের ভিতর দিয়া ভূত-জগতের রূপান্তর হইতেছে মাত্র। সকলই অনন্তের শ্রী ও বিভূতি। আমি ও আমার ব্যবধানে উহা যদি ক্ষুদ্র খণ্ডিত হইয়া থাকে, ঐগুলির সহিত চৈতন্যের একাত্মতা-বোধ-হেতু দুঃস্বপ্ন দেখারই পথ করা হইবে। জন্ম, শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাদি, সুখ-দুঃখ, মানাপমান, জরা-ব্যাধি-মৃত্যু প্রভৃতি সমস্যা—তুমি স্বয়ংমুক্ত নির্দ্বন্দ্ব হইয়াও ঐ সকল আবর্ত্তে মুহ্যমান হইয়া থাকিবে। শ্যাম তরুপল্লব রৌদ্রকরে ঝলসিয়া হরিদ্রাভা ধারণ করে, তারপর বিশীর্ণ শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। উহাতে শোক-দুঃখের কোন রেখা তরুগাত্রে অথবা স্খলিত পত্রে আঁকিয়া উঠে না। ব্যাধি-প্রপীড়িত নর কলেবর কালের কষাঘাতে শীর্ণ মলিন মূর্ত্তি ধরিয়া মৃত্যু বরণ করে। দুঃখ শরীরের নয়। কাঁদিয়া মরে বিষয়-বিশেষের সহিত আসক্তিযুক্ত চৈতন্য। জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব ভূতধর্ম্ম। অভৌতিকের উহা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম-বিরহিত পথে যন্ত্রণা-সম্ভোগ। ভূত-শরীর জন্মিবে ও মরিবে। ভূতাত্মা শাশ্বত, অবিনশ্বর। উহা কেন ভূতের সহিত একান্ত একাত্ম হইয়া জন্ম-মরণের কষাঘাত সহিবে? পরমেশ্বরের অংশ আনন্দেরই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, উহা ভাস্বর জ্যোতির্ম্ময় হইয়াই থাকিবে। এই অংশ সনাতন। এই জন্য ইহার তৈজস সম্পত্তি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সবই ঊর্দ্ধমুখে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে, দেহের ঈশ্বর-স্বরূপ জীবের প্রস্থান-কালে অবর স্তরে বিচরণশীল মন ও ইন্দ্রিয় তাহারই অনুসরণ করিবে। অংশের পুনরাবর্ত্তন-কালে এই অতীতের কর্ম্মসংস্কারযুক্ত অন্তর্বৃত্তি সঙ্গী থাকায় জীবাত্মার অভ্যুত্থান ও নিঃশ্রেয়স সম্ভব হয় না। উৎক্রামণনীতি ঈশ্বর-যুক্ত ও অযুক্ত পুরুষের তুল্যই হইয়া থাকে। যে সময়ে আত্মা দেহ ছাড়িয়া যায়, তখন হৃদয়পুণ্ডরীক প্রদ্যোতিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকল তখন হৃদয়-দেশস্থ নাড়ীমুখে উপস্থিত হইয়া এই অগ্নিকাণ্ডে আপনাদের ইন্ধন-স্বরূপ প্রদান করে। ইন্দ্রিয়গণের সহিত অসংখ্য প্রকার প্রবৃত্তি সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবাত্মার সহিত সম্মিলিত হয়। আত্মা স্থূল ভূতের আশ্রয় ছাড়িয়া ভাবনাময় শরীর গ্রহণ করেন। এই সময়ে মানবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলিতে যেরূপ ভাবনা প্রবল হয়, আত্মা তদনুযায়ী ভবিষ্যদ্গতি নিরূপণ করিয়া থাকে। মানব, দেবতা, পশু কর্ম্মগুণে আপনাকে এইরূপ কল্পনা করিয়া নবদ্বারের যে কোন দ্বার দিয়া প্রস্থান করে। যাবজ্জীবনের অনুশীলনে যে ভাব ও ফল, তাহাই ভবিষ্যৎ জন্মের প্রাপক। শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে, জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মা মূর্দ্ধা-স্থান দিয়া বহির্গত হয়। হৃদয়প্রদেশে যে শত নাড়ী আছে, উহার মধ্যে

একটী নাড়ী মূর্দ্ধাগ্রভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানী এই পথে ব্রহ্মভাবনাময় সূক্ষ্মদেহে বাহির হইয়া উর্দ্ধপথে যাত্রা করে। তার পর পুরুষোত্তমের ইচ্ছায় আত্ম-মায়ার দ্বারা দিব্য দেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বোত্তম যে নর লীলা, যুগে যুগে তাহাই অভিনয় করিয়া চলেন। এই নবজন্ম, এই দিব্য জীবনের পথেই শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র গীতার ছন্দে মানব জাতিকে আহ্বান দিয়াছেন। অতএব

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

জীব শ্রোত্র, চক্ষুঃ, ত্বক্‌, রসনা ও ঘ্রাণ এবং মনকে আশ্রয় করিয়া বিষয় উপভোগ করে।

'ঘ্রাণমেব চ' ও 'মনশ্চ' এই দুই স্থলে 'চ'-কার থাকায় প্রথম 'চ'-কারের দ্বারা পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং শেষোক্ত 'চ'-কারের দ্বারা মনের সহিত বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে বুঝাইতেছে।

আত্মা বিষয়ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। কিন্তু "প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ"—অহঙ্কারী "কর্ত্তাহম্‌ ইতি মন্যতে"। এই ব্যাধি দূর করারই যোগ গীতায় আছে—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভোগ বিরতি নহে। "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য'—আত্মসমর্পণ-যোগের মন্ত্র। খণ্ড আমির চেতনা দূর হয় অধ্যাত্মচেতনার প্রকৃতি হইতে বিযুক্তিতে। প্রকৃতি গুণময়ী, তাই 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হওয়ার উপদেশ গীতায় পাওয়া যায়। "স্বধর্ম্মে নিধনম্‌ শ্রেয়ঃ" জোর করিয়া বলার কারণই হইতেছে—আত্মার যাহা ধর্ম্ম নহে, প্রকৃতির সংস্পর্শে সে তাহাই হইয়াছে। মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে"। ভূতদেহে চৈতন্য অধিষ্ঠিত সাক্ষিরূপে। এই নির্লিপ্ত দর্শন তখনই সম্ভব হয়, যখন মানুষ ঈশ্বরের ডাকে আত্মবিৎ হয়। আত্মবিৎ এই রহস্য জানে, বিমূঢ়াত্মা জানে না।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্‌।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

—উৎক্রামণকারী অথবা দেহে অবস্থিত বা বিষয়ভোগরত গুণসংযুক্ত এই চৈতন্যকে অজ্ঞেরা দেখিতে পায় না, জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা দেখেন।

প্রযত্নমান যোগিগণ এই আত্মাকে দেহে অবস্থিত দর্শন করেন। যত্নমান হইলেও, অনাত্মবাদী অবিবেকী এই আত্মাকে দর্শন করিতে পারে না।

এই আত্মাকে যত্নশীল ব্যক্তিই যে দর্শন করিতে পারিবে, এইরূপ কোন মানে নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬০ শ্লোকে "যততোহপি" ব্যক্তির প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক মনকে হরণ করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়েরও শ্লোকে আছে—

'যততামপি সিদ্ধানং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ'—অতএব শুধু যত্নশীল হইলে চলিবে না। অশোধিত চিত্ত এই রহস্য উপলব্ধি করে না। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে বিচরণ করিয়া বিষয়াধীন হইয়া পড়ে। মনকে তদনুগামী হইতে হয়, যদি মন আত্মরতি লাভ না করে। আত্মশোধনের উপকরণ মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। এই অন্তঃকরণগুলি বিষয়গুণযুক্ত না হইয়া যদি আত্মগুণযুক্ত হয়, তবেই যত্নমানকে যোগী বলা যায়। যোগী সতত 'অধ্যাত্ম-চেতসা' অবস্থিত ইহাই জ্ঞান। আত্মার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞানেরই দান, যত্নের নহে, অধ্যবসায়ের নহে। জ্ঞান হইলে, বিষয়-বৈরাগ্য স্বাভাবিক। বৈরাগ্য অন্য কিছু নহে—এক বিষয় হইতে বিরতি, অন্য বিষয়ে রতি। আত্মরতি ব্যক্তির মনই বৈরাগ্যপরায়ণ হয়। জ্ঞান ও বৈরাগ্য মন প্রভৃতির শোধনে ও সাধনে সিদ্ধ হয়। এই-রূপ শুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট ক্ষেত্রে ভক্তির অমৃত উৎস্রুত হয়। কাজেই গণিতের অব্যর্থ অঙ্কপাতের ন্যায় এই ধ্রুব বাণী সেইখানেই প্রতিধ্বনি তুলে—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥

'অকৃতাত্মনঃ যতন্তোঽপি' আত্মদর্শনে সমর্থ হয় না। এইখানে বিশ্বাসের কথা আসিয়া পড়ে। যতন্ত যোগী আত্ম-বিশ্বাসী। বিশ্বাস আশ্রয় করিয়া তাহার সাধন। অন্যপক্ষে বিশ্বাসের অভাবে মন বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক প্রয়াস। হিন্দু শাস্ত্র বলেন—বিশ্বাসেই "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" অর্থাৎ জ্ঞান-

বলভাবেন বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ।' "অন্য কোন বল না থাকায় বালকের রোদন যেমন সম্বল, আত্মজ্ঞানী এইরূপ করুণ প্রার্থনা পথের সহায় করে। কেন না, পরমাত্মা, 'অসাধন'-ফলরূপত্বাৎ"—ইহা এক অভিনব বিজ্ঞান, ইহার সাধন নাই। কাজেই সর্ব্বপ্রকার সাধনাশ্রয় আত্মসমর্পণযোগীকে পরিহার করিয়াই চলিতে হয়। গীতার যোগ "মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।" অতএব ইহার জন্য চেষ্টা ও সাধনার মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর। হিন্দু শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান করুণাসাপেক্ষই বলা হইয়াছে। করুণা বালকের ন্যায় বিনা ক্রন্দনে পাওয়া যায় না। অনেক তত্ত্বদর্শী বলেন—আত্মদর্শনেচ্ছুর শিশুসুলভ এই ক্রন্দন আবার বিনা করুণায় লাভ করা হয় না। এখানে এই ন্যায়-বচনই উদ্ধৃত করিতে হয়। 'অন্যোন্যাশ্রয়' অর্থাৎ এক হইলেই আর এক হয়। এই দুইটাই যুগপৎ ঈশ্বরেচ্ছায় সংসাধিত হয়। এইবার পরবর্ত্তী ৪টী শ্লোকে "মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"—ঈশ্বর-চৈতন্যের অসীম মহিমার কথাই উক্ত হইতেছে।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥১২-১৪

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥১৫।

সূর্য্যে, চন্দ্রে, অগ্নিতে যে তেজঃ নিখিল জগৎ প্রকাশ করে, সে তেজঃ আমারই জানিবে।

আমি বলের দ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূতগণকে ধারণ করিতেছি। রসাত্মক চন্দ্র হইয়া সমস্ত ওষধিকে সম্বর্দ্ধিত করিতেছি।

আমি বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া, প্রাণ ও আপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি।

আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। আমা হইতেই স্মৃতি-জ্ঞান, আবার তাহার নাশও হয়, সকল বেদের দ্বারা আমিই জ্ঞেয়। আমিই বেদান্তের প্রবর্ত্তক এবং বেদজ্ঞ।

যাঁহার অংশ জীবলোকে জীবভূত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়ভোগরত, আবার প্রাণিদেহ ছাড়িয়া উৎক্রান্ত হন, তিনি যে সমগ্র। সপ্তম অধ্যায়ের "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" বলিয়া যিনি পার্থকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান অধ্যায়ে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি যে ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয় না বলিয়া আপনার স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই কয়টী শ্লোকে পুনরায় তিনিই বলিতেছেন—"আমি শুধু জীবভূত নহি! আমাতে উপনীত হইলে, কোথায় চন্দ্র, সূর্য্য? কোথায় মর্ত্ত্য-স্বর্গ, জীবন-মরণ? আমি শুধু গ্রহ-নক্ষত্র, জগতের জ্যোতির্ম্ময় পদার্থেই তেজোরূপে অবস্থিত নহি, আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বভূতকেই ধারণ করিয়াছি। যে ব্রীহি-যবাদি শস্যে প্রাণিগণের পুষ্টি, তাহাতে সোমরূপে আমিই রস সঞ্চার করি। আমি ক্ষুধা, আমি প্রাণ, সকলের হৃদয়ে আমিই বাস করি। স্মৃতি, জ্ঞান আমারই দান। এবং আমিই ইহা অপহরণ করি। বেদে আমিই জ্ঞেয় হই। শ্রুতি-রচনা আমারই কীর্ত্তি। আমি সর্ব্বজ্ঞ। অতএব এই কথার পর 'সর্বৈতদ্' যে ব্রহ্ম, তাহা আর সাধনার ধন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে 'অসাধনফলরূপত্বাৎ' বলিয়া যতমান যোগী বালকের ন্যায় নির্ভরশীল হইয়া প্রার্থনায় রোদন সম্বল করে। যিনি দাতা, যাঁহার করুণায় পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, বেদ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ বিদ্যার উদ্ভব তিনিই আবার এই সকলের অপহরণকর্ত্তা তখন অকৃতাত্মগণের তপস্যার মূল্য কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই কথাগুলির মধ্য দিয়া তত্ত্বের সমগ্রতাকে বুঝিবার পক্ষে সহায়রূপে পাওয়া যায় জগতের দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় বস্তু; আর পাওয়া যায় আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, প্রেত, পিশাচ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পৃথিবীর কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপতি-রূপে অংশে অংশে বিরাজ করিয়া আত্মাভীষ্ট যিনি চরিতার্থ করেন, তাঁহাকে। চেতন অচেতন,

অণু পরমাণু, সর্ব্বত্র তিনিই বিদ্যমান। তিনিই সব ধারণ করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যতীত ভেদাতীত অচিন্ত্য আর এক যে বিরাট্ অখণ্ড রূপ, তাহা আর কল্পনা করা যায় না। ভূতজ্ঞান হইতে ভূতাতীত ক্ষেত্র—তাহার উপর এক অনন্ত অসীম ঘনীভূত বর্ণনাতীত রূপের সন্ধান কে দিবে? তিনি অংশ-রূপী চৈতন্য। তিনি আশ্রয়-স্বরূপ ভূতলোক। তাঁর সম্বুদ্ধ চৈতন্যে অন্য এক পরম তত্ত্ব যেখানে অবধৃত হয়, অধ্যবসায় বা প্রয়াস সেখানে ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহতের গবেষণা করে। স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি, ভ্রান্তি সেই একজন ছাড়া দ্বিতীয় নহে। 'সর্ব্বেষু কালেষু' তাঁহাতে নিখিল ভুবন সংযুক্ত করিয়া তিনি যেন বিশ্বের কণ্ঠে নিজেই হাঁকিতেছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। এইখানেই সব শেষ হইয়া যায়। তবুও আত্মবিশ্লেষণে আনন্দ আছে। তাই শ্লোকের পর শ্লোক-রচনা। বক্তা, শ্রোতা তিনি ভিন্ন অন্য কে হইবে? এমন অদ্বয় ব্রহ্মবাদ বেদান্তেও প্রকাশ পায় নাই। গীতায় তাঁহার এই প্রকাশ-লীলা সার্থক হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

(স্মৃতি)

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

ইংরাজী ১৮৮০ সালে আমার বয়স মাত্র দশ বৎসর হইয়াছিল। বহুবাজারের চৌমাথার সন্নিকট বাজারের ঠিক পূর্ব্ব দিকে যে প্রকাণ্ড দ্বিতল পুরাতন বাটী ছিল—সেই বাটীতে বহুবাজার বাঙ্গালা বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল ছিল, আমি ছিলাম সেই স্কুলের তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময়েই আমি সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনকে দেখি। সে যুগে স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা ছিল না। ভদ্র গৃহস্থের ঘরের ছেলেরা পারিবারিক পাঠশালায় এখনও যেমন নীতি-শিক্ষা করিয়া থাকে, তখনও সেইরূপই করিত। ইহাতে নীতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহারা যতটুকু জ্ঞানলাভ করিত, তাহাতেই তাহাদের নৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিত। এ দেশে ইংরাজীশিক্ষার বিস্তারের সহিত সমাজের তলে তলে এমন সব নূতন ভাবধারা জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, যাহার ক্রিয়া জাতীয় জীবনে তখন পর্য্যন্ত একটা প্রেরণার সৃষ্টি করে নাই। বাস্তবিক, সমাজের সেই অবস্থায় একজন সংস্কারকের নির্দ্দেশ পাইলেই যেন বারুদখানায় আগুন জ্বলিয়া উঠিত। ইতিপূর্ব্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঊষার আলোক-আঁধারে রামমোহন রায় উপনিষদের যে তীব্র আলোক হিন্দু-সমাজের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে সত্যের পথ চিনিয়া লইবার পূর্ব্বেই সমগ্র দেশ সিপাহী যুদ্ধের বিভীষিকাময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সেই যুদ্ধের প্রতিধ্বনি যতদিন না বিস্মৃতির অঙ্কে মিশিয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালার হিন্দু সম্প্রদায় ততদিন দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিয়া শান্তভাবে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই। রামমোহন রায়ের দেশবাসী এতদিনে তাঁহার বাণী ভুলিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার নিজের আত্মীয়স্বজন কোনও কালেই ত মূর্ত্তি-পূজা বন্ধ করিয়া দেন নাই। বঙ্গদেশের অন্যান্য বিখ্যাত জমিদারগণের ন্যায় তাঁহারাও খুব ঘটা করিয়া মূর্ত্তি-পূজা করিতেছিলেন। ইংরাজ রাজত্বে চারিদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলার মাঝে আবার যখন ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুদের হৃদয় সুপ্ত ভাবধারার প্রবুদ্ধাবস্থায় আলোড়িত হইয়া উঠিল, তখন রামমোহন রায়ের বাণী পুনরায় প্রচারিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। সেই সুযোগ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্ম সমাজের

বেদী হইতে উপনিষদ সম্বন্ধে আচার্য্যের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া আসিবার কথা বটে, কিন্তু সব নিষ্ঠাই সঙ্কীর্ণ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের অন্তর্জ্জগতে সাড়া পড়িল না। সিপাহী যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে "ভ্রান্তি ও আস্ফালনের" যুগ ইংরাজী শিক্ষার সহিত এদেশে প্রবর্ত্তিত হওয়াতে তাহার প্রভাব বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছিল। মুষ্টিমেয় প্রতিভাবান্ উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতার মদিরার আস্বাদ পাইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এদেশের প্রাচীন ধর্ম্মের মূলে তাঁহারা কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, কেহ বা নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়িলেন! হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই শক্তিশালী বিপ্লবীদের আক্রমণে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাহিরের কোলাহল জেনানার ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার বাণী সেখানে প্রচার করিতেছিল। বঙ্গীয় সমাজধ্বংসকারী বিপ্লবের সম্মুখীন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে এমন একজনও নেতা ছিলেন না—যিনি সমাজ-সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়া স্থায়ী উন্নতির পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কেশবচন্দ্র সেন চারিদিকের উচ্ছৃঙ্খল শক্তিকে সংযমের পথে আনয়ন করিয়া, নব্য সম্প্রদায় ও প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইলেন।

প্রথম দর্শনেই কেশবচন্দ্র সেনের মূর্ত্তি আমার মানসপটে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহার একটিও রেখা আটান্ন বৎসর পরে আজও মুছিয়া যায় নাই। আমার পিতামহীর বৃদ্ধা মাতুলানী অন্তঃপুরবাসিনী হইলেও, সে সময়কার বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁহার খুব বেশী অনুরাগ ছিল। এই বর্ষীয়সী মহিলা, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে যে মন্দিরের বেদীতে বসিয়া কেশবচন্দ্র প্রতি রবিবার ধর্ম্মোপদেশ দিতেন—সেখানে আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। মন্দির-গৃহের উত্তরদিকে পর্দ্দার আড়ালে মহিলাদের বসিবার স্থান ছিল। হলের পূর্ব্বদিকে বেদী ও বেদীর সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে পুরুষ শ্রোতাদের বসিবার স্থান ছিল। সেদিন কেশবচন্দ্র যে বিষয়ে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই, কিন্তু যে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কাণের ভিতর দিয়া আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল, সে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভঙ্গীতে বাধাহীন্ ভাষার উৎস-প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছিল ও সর্ব্বোপরি উপদেষ্টার সুন্দর মুখখানি আমাকে এখন পর্য্যন্ত স্মৃতিময় করিয়া রাখিয়াছে। কেশব সেনের মন্দিরে বালক-যাত্রীর অভাব ছিলনা। আমাদের পাড়ার ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর মহিলারাও তাঁহাদের বাটীর বালক-বালিকাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রতি রবিবার মন্দিরে যাইতেন। আমার চেয়ে বয়সে দুই বৎসর বড় ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর একটি ছেলে আমার সহযাত্রী ছিল। আমরা একই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। সেই ছেলেটী উত্তরকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে জীবন-উৎসর্গ করিয়াছিল। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখনও অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য জীবিত আছেন। অধ্যাপনায় তাঁহার যেমন খ্যাতি, নির্ম্মল চরিত্রের জন্য সেইরূপ ছাত্র-জগতে তিনি শ্রদ্ধাস্পদ। আমার বিশ্বাস যে, অ্যাধপক ভট্টাচার্য্যের চরিত্র তাঁহার সেই অপরিণত বয়স হইতেই কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মোপদেশের ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের অসংখ্য ছাত্রদের মধ্যে আমার পরিচিত যাঁহারা—তাঁহাদের সকলের মুখেই শুনিয়াছি যে, তাহাদের গুরুর ন্যায় চরিত্রবান্, শান্ত-স্বভাব, সুকণ্ঠ, সদ্বক্তা ও সুপুরুষ আর একজন শিক্ষক সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের ন্যায় আদর্শবাদী শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন কিরূপে সেই বিপ্লবময় ভাবধারার নবযুগে কেশবচন্দ্র সেনের পাঠশালায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

চোখের সামনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি যে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার মূলে ছিল কেশবচন্দ্র সেনের অসাম্প্রদায়িকতা। এস্থলে সেইজন্য আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। ভট্টাচার্য্যেরা তাঁহাদের দৈনন্দিন ধর্ম্মজীবনে নিষ্ঠাবান্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ না হইলেও, তাঁহাদের পাড়াগ্রামের বাটীতে কয়েক বৎসর দুর্গা-প্রতিমা পূজা করিয়াছিলেন। কলিকাতার বাটীতে তাঁহারা প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজা

ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করিতেন। এইসব সাময়িক পূজা সত্বেও তাঁহারা ধর্ম্মের দিক্ হইতে মূর্ত্তি-পূজার প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না। কেশব সেনের মন্দিরে যেমন তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ শুনিতে যাইতেন ও উপাসনায় যোগদান করিতেন, সেইরূপ কলিকাতার বাটীতেও তাঁহারা বারো মাস সপরিবারে ব্রাহ্মদের ন্যায় উপাসনা করিতেন, ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাহিতেন ও নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের বাটীর ছেলেমেয়েদের সহিত আমিও প্রায়ই এই সব ব্যাপারে যোগদান করিতাম। তাঁহাদের ও আমাদের বাটীর মহিলারা অবরোধ প্রথা মানিয়া চলিলেও, কেশব সেনের মন্দিরে ও বহুবাজার ষ্ট্রীটে মিস্ পিগটের জেনানা হোমে মাঝে মাঝে যাইতেন। ভট্টাচার্য্যদের ন্যায় আমরাও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিতাম না, অ-হিন্দুদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেও আপত্তি করিতাম না। তাঁহাদের ও আমাদের ন্যায় পাড়ার বহু হিন্দু গৃহস্থরাও প্রকাশ্যভাবে প্রাচীন ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হইলেও, সমসাময়িক ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবের ঘূর্ণিতে পড়িয়া যে একই পথের পথিক হইয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত। জাতির মন খুব খানিকটা বেশী আলোর জন্য কাতর হইয়াছিল। জাতির হৃদয় খুব খানিকটা বেশী স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালী জাতির অন্তর্জগতের এই শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কেশবচন্দ্র অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য কোনও ব্যবস্থা সে সময়কার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কল্পনা করিতে পারেন নাই। কেশবচন্দ্র তাঁহার মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিয়া সাকারবাদী ও নিরাকার-বাদীকে, বিলাত-ফেরৎা বিদ্রোহী ও সংশয়-চিত্ত গোঁড়া হিন্দুকে ভিতরে আনিয়া তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিলেন। সংস্কারকের ব্যক্তিত্ব ও সাহস, প্রতিভা ও আন্তরিকতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার উদারতায় মুগ্ধ হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করিল। ঝটিকা-সঙ্কুল সমুদ্রে যাঁহারা দিক্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া তীরভূমি হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল, তাঁহারা বন্দরের সন্ধান পাইয়া আশান্বিত হইল।

আমি যেদিন সর্ব্বপ্রথমে কেশব সেনের মন্দিরে মাঘোৎসব দেখিয়াছিলাম, সেদিনকার দৃশ্যও আমি এখনও পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই নাই। মন্দিরের বহির্দ্বারে দুই পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ, বৃক্ষের মূলে পূর্ণকুম্ভের মুখে নারিকেল, দ্বারের চারিদিক্ আম্রশাখা ও পতাকায় পরিশোভিত; এইসব ও অন্যান্য সাজসজ্জা দেখিলেই হিন্দুর উৎসব-গৃহের দৃশ্যই মনে পড়ে। আমার অন্তরে আনন্দানুভূতি জাগিয়া উঠিতেছিল। মন্দির-গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে আমার তরুণ হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল। ধূপ-ধূনার গন্ধে আমোদিত উপাসনালয়ে মহিলাগণের শঙ্খধ্বনি আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের আগমন-বার্ত্তা বিঘোষিত করিলে, চারিদিকে রুদ্ধ উৎসাহ যেন সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই উৎসব উপলক্ষে রচিত ধর্ম্মসঙ্গীত যখন গীত হইয়াছিল, খোল-করতালের বাদ্যে হিন্দু শ্রোতাদের হৃদয় তখন ভরিয়া উঠিয়াছিল। উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে সকলেই ইংরাজি-শিক্ষিত নব্য-পন্থী বাঙ্গালী ভদ্রলোক। সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহারা আগ্রহান্বিত। শ্রোতাদের মধ্যে এমন সব প্রতিভাবান্ বাঙ্গালী ছিলেন, যাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে সমাজের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেদিনকার সেই মাঘোৎসবের দৃশ্য সেইজন্য আমার ছাত্র-জীবনের পথে যে রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা আজও মলিন হয় নাই। প্রৌঢ়াবস্থায় আমার বিচার-শক্তি যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন পারিপার্শ্বিক সমাজের অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী মিলাইয়া দেখিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম যে, কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার অভ্রান্ত যুক্তির সাহায্যে এমন এক অত্যাশ্চর্য্য মিলন-ক্ষেত্র সৃজন করিয়াছিলেন—যেখান হইতে সাকারবাদী সংশয়চিত্ত হিন্দু অক্লেশে প্রাচীনপন্থীর রক্ষণশীল অধিকারের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু মূর্ত্তি-পূজার সম্পূর্ণ বিরোধী নব্য সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতার মদিরা-আস্বাদ-মত্ততার বশীভূত হইলেও, সেই মিলনক্ষেত্রে একবার পদার্পণ করিবার পর পুনরায় বিপ্লবময় উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে,

কেশবচন্দ্র সেনের এই মিলন-ক্ষেত্র সংশয়-চিত্ত সাকারবাদী এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন নিরাকারবাদীর জনতায় ভরিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তি-পূজা, বর্ণধর্ম্ম ও অবরোধের বিরোধী যাঁহারা, তাঁহারা কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিলেও, সেই মিলন-ক্ষেত্রের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িলে—শক্তিশালী বিদ্রোহীরা কেশব সেনের জনতাবহুল ও পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মমতাবলম্বীগণের মিলন-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া নিজেদের উপযোগী নূতন একটি উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিলেন।

এইরূপে এদেশের ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন উদ্যমশীল ও সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাঙ্গালীর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। মিঃ আনন্দমোহন বসু, বারিষ্টার-এ্যাট্-ল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্ত ও কালীশঙ্কর সুকুল, বাগ্মী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বহু উচ্চশিক্ষিত ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের পক্ষপাতী বাঙ্গালী উক্ত নূতন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। জাতিকে উন্নতি ও সংস্কারের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার যোগ্যতা তাঁহাদের খুবই ছিল ও তাঁহারা সুপ্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সৌধকে ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য ছিল কেশবচন্দ্রের দলকে ধ্বংস করা। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট যেদিন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের হল্-গৃহ সর্ব্বপ্রথম খোলা হয়, সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। নব-নির্ম্মিত হল-গৃহের দরজার সম্মুখে রোয়াকের উপর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের তখনকার নেতাগণ দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত শ্রোতাগণকে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, (১) এই সমাজভুক্ত যাঁহারা তাঁহারা যে কোনও প্রকার মূর্ত্তি-পূজার সম্পূর্ণ বিরোধী, (২) তাঁহারা জাতিভেদের সম্পূর্ণ বিরোধী, (৩) ও এখানে মূর্ত্তি-পূজার যোগ্য অনুষ্ঠানও, যথা—শঙ্খধ্বনি, ধূপধুনা প্রভৃতির ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। এই শেষোক্ত বিধির উল্লেখ যে কেশবচন্দ্র সেনের দলের বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কেশবচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁহাকে এই শক্তিশালী নূতন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সাধারণীদের ভিতর অধিকাংশ ব্রাহ্মই পূর্ব্বে কেশব সেনের দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহারাও বহু নূতন নাম-লেখান ব্রাহ্ম সাধারণীদের সহিত যোগদান করিলেন। ইহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। কেশব সেনের দলের পূর্ব্বের ন্যায় যদিও পরিপুষ্ট আকার রহিল না, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার মন্দিরে শ্রোতার অভাব হইল না। আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা কেশব সেনের গির্জ্জাতেও যাইতাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরেও যাইতাম। তাহা হইলেও, আমরা ব্রাহ্মদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম।

ব্রাহ্মদের মধ্যে এই দলাদলির ফলে হিন্দুদের ক্ষতি হওয়া দূরের কথা, বরং তাহারা সেই সুযোগে ইংরাজী শিক্ষালাভ করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। কেশব সেনের দলের কর্ম্মপন্থা ছিল (১) নব-বিধান মন্দির, (২) আলবার্ট স্কুল ও (৩) "সুলভ সমাচার" সংবাদ পত্রের ভিতর দিয়া। সাধারণীদের দলের কর্ম্মপন্থা ছিল (১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, (২) সিটি স্কুল ও (৩) সংবাদ পত্রের ভিতর দিয়া। ভট্টাচার্য্যরা ও আমি বহুবাজার বাঙ্গালা স্কুল হইতে চলিয়া আসিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত সিটি স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। ইহাতে ব্রাহ্মদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের আমাদের খুব সুবিধা হইয়াছিল। কেশব সেনের দল ধ্বংস হইয়া যায়, এই মনোভাব আমরা কখনও আমাদের অন্তরে স্থান দিই নাই। আমরা কেশব সেনের গির্জ্জায় যেমন যাইতাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরেও সেইরূপ যাইতাম। কেশব সেনের বক্তৃতা ছিল যাদুকরের মন্ত্রের ন্যায় মোহিনীশক্তি-সম্পন্ন—যাহার অনুরূপ কোনও কিছু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মোপদেষ্টাদের বক্তৃতায় ছিলনা। কেশব সেনের বক্তৃতার ভঙ্গীতে চাঞ্চল্যকর কায়দার লেশমাত্র ছিলনা। রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার ন্যায় নাটকীয় প্রথায় অঙ্গচালনা কেশব সেন জানিতেন না। বয়স্থা হিন্দু মহিলাগণ—যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয়ে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অল্পদিন পরেই সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া পূর্ব্বেকার

ন্যায় কেবলমাত্র কেশব সেনের মন্দিরে উপাসনার দিনে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই এক বৎসরের মধ্যে মাঘোৎসবের সপ্তাহের ভিতর এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহাতে কেশবচন্দ্র সেনকে বিজয়ী বীরের ন্যায় তাঁহার দলের সহিত কলিকাতার রাস্তায় দেখা গিয়াছিল। দুইটী মন্দিরেই উৎসব চলিতেছিল। একদিন বিকালের দিকে কেশবচন্দ্র তাঁহার দলবল লইয়া বিডন্ গার্ডেনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি ব্রাহ্ম ও হিন্দু শ্রোতাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার একটি কথাও আমার মনে নাই। তবে বক্তা যে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিয়াছিলেন, ইহা মনে পড়ে। বক্তৃতা শুনিতে চারিদিক্ হইতে লোক আসাতে জনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইহাও মনে পড়ে। তারপরে বক্তৃতার শেষে কেশবচন্দ্রের দল যখন নগর-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বিডন্ ষ্ট্রীট হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আসিলেন, তখন দেবতারা বোধ হয় আকাশ হইতে সেই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ভারতের সর্ব্বপ্রধান বাগ্মী নগ্নপদে ভগবানের নাম গাহিতে গাহিতে সহরের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন, এই দৃশ্যে রাস্তার দুইধারের বাটীর হিন্দু বাসিন্দারা পথে বাহির হইয়া আসিল। নগর-সংকীর্ত্তন বিরাট্ আকার ধারণ করিল। আমার মত সিটি স্কুলের যে কয়জন হিন্দু ছাত্র কীর্ত্তনের দলের পার্শ্ব দিয়া চলিতেছিলাম, তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরের সামনে রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া নগর-সংকীর্ত্তনের দলের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মন্দিরের সামনে তখন খোলা জায়গা পড়িয়া ছিল। সেই উন্মুক্ত স্থানে যখন কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার দলের সহিত গাহিতে গাহিতে আসিলেন, তখন হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল। হলগৃহের ভিতরে সাধারণীরা ছিল। উপাসনা বা সাম্মন্ তখনও আরম্ভ হয় নাই। এমন সময়ে অকস্মাৎ ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চার পাঁচ মিনিট পরে কেশবচন্দ্র তাঁহার দলবলের সহিত গাহিতে গাহিতে সেখান হইতে পুনরায় রাস্তায় আসিলেন ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে আসিলেন। সাধারণীরা যখন মন্দিরের দরজা বন্ধ করিতেছিলেন, তখন অনেকে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "দরজা খুলিয়া রাখ", "দরজা খুলিয়া দাও", "বাহিরে এসে ভগবানের নাম গানে যোগ দাও।" কেহ কেহ বলিতেছিল, "ওঁরা এসেছিল ভগবানের মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধার টানে, দরজা খুলে রাখা উচিত।" মন্দিরের দরজা কিন্তু কেহ খুলিয়া দিল না। অস্পৃশ্যের ন্যায় অসাধারণীদের মন্দিরে প্রবেশ রোধ করিবার জন্য ভগবানের গৃহের দরজা চিরকালের তরে বন্ধ হইয়া গেল। এই ঘটনায় কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনের মত লোককেও যদি অস্পৃশ্যের ন্যায় ভজনালয়ের দরজা হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাম্যের অধিকার হইতে কত লক্ষ যোজন দূরে—তাহা সহজেই বুঝা যায়। সেইদিন হইতে মৌখিক ধর্ম্মটা যে কপটতার নামান্তর—এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী-লেখক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বঙ্গের এই বিখ্যাত স্বদেশ-প্রেমিক সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা জানিতে চাহিলে, আমি ইংরাজি ভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম। জ্ঞানেন্দ্র বাবু স্যার সুরেন্দ্রনাথের জীবনীতে আমার সেই লেখা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কতকটা ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। সেই লেখাটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"As a social reformer Keshub Chunder Sen wanted to put his finger on the plague-spot of our society by condemning in no uncertain language the evil habit of drinking, which was destroying the morality of our people. I and many other students joined his "Band of Hope" and we used to go in procession through the streets of Calcutta with flags in our hands and singing songs, the burden of which was that the

country was being ruined by spirituous poison." সেই গানের কয়েক ছত্র এখনও আমার মনে আছে—

সুরার অনলে
দেশ গেল জ্বলে,
সুরা বিষ পানে
কত শত জনে,
অকালে চলিয়ে
গেল শমন ভবন;
তাদের পরিবার
করিছে হাহাকার, ইত্যাদি

"The Sadharanis looked askence at this temperance movement of Mr. Sen and they then attached a moral training class to the City School—they could not come out into the open to fight the demon of immorality. Keshub Chunder did not believe in a social warfare in which the reformers protected themselves by hiding in holes. To be led by the greatest reformer of the age in a frontal attack on the enemy of social life is calculated to make even the weakest unknown soldier proud of his humble achievement. We had to realise that our lives were consecrated by the ennobling personality of a leader, who walked along with us so as to instal some of his own spirit into us.

"I had not much attraction for Keshub Chunder Sen's Nava Brindaban, a drama in which he himself was an actor. It drew crowded houses, but never left an abiding impression on my youthful mind. A leader of thought is remembered in the hero and not in the actor. We worship the hero and not the actor, appearing in the role of a hero.

"If Surendea Nath Banerjei inspired awe, Keshub Chunder Sen inspired faith in me—faith in a good cause."

দ্বন্দ্ব

শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, পুরাণরত্ন, সাহিত্যরত্ন

নয়ন কহিয়া গেল—তুমি নাই, নাই, তুমি নাই!
মন বলে—আছ, আছ, প্রকৃতির শ্যামশোভা মাঝে!
রবি, শশী, গ্রহ, তারা, নদী, বন, উপবনে তাই
তোমার প্রকাশ বুঝি যুগে যুগে অপরূপ সাজে।

কল্পনা-বিলাসী-মন ফুলের হাসিতে আত্মহারা,
চোখ বলে—বন্ধু, মিছে ভুলিওনা, ভুলায়োনা আর!
বাদল মাদল বাজে, অবিরল নামে জল-ধারা,
মন কহে—ওগো সখা, দেখ দেখ দেবতা আমার!

চোখ বলে মর তুমি, ভাবের ফানুষে নেই কিছু।
পৃথিবীর ইতিহাসে নাই তার কোন কথা লেখা।
মন বলে—জাননাকো বহুরূপে সে যে দেয় দেখা।
ক্ষমা কর, ফিরে চাও, উঠে এস, আলোকের পিছু!
রহস্যের এই দ্বন্দ্ব—আনন্দের অনন্ত বিস্ময়—
মন আর চোখ, মিলে কালে কালে দেবে পরিচয়।

সমালোচনা

শ্যামল ও কজ্জল—রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম দুই টাকা মাত্র।

এই উপন্যাসখানি বর্ত্তমান বাংলার একখানি আদর্শ গল্পের বই। পূর্ব্ববঙ্গের সাভার, ভাওয়াল, ধামরাই, নান্না, টাঙ্গাইল, রউয়া প্রভৃতি পল্লীর প্রাচীন ইতিহাসের একখানি নিখুঁত জীবন্ত চিত্র গল্পচ্ছলে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সাভারের যুবরাজপত্নী স্বর্ণমঞ্জরীর যে করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পড়িয়া কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না। শ্যামল ও কজ্জলের প্রেম গ্রন্থের শেষভাগে একটি নির্ম্মল ও অনাবিল নির্ঝর-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে। প্রাচীন তান্ত্রিকগণের ব্যাভিচার ও সহজিয়াদের কাণ্ডকারখানার যে উলঙ্গ চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—তাহা রোমহর্ষণ। মৃত-চণ্ডালের দেহের উপর বসিয়া উৎকট তপস্যা যে কি ভীষণ—তাহা এই পুস্তক পড়িবার পূর্ব্বে কেহ ধারণা করিতে পারিবেন না। পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যা-গরিষ্ঠ হরিজনেরা যে কেন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তাহার কারণগুলি এরূপ নিপুনতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহা একটা ঐতিহাসিক দিগ্‌দর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দীনেশবাবুর অপূর্ব্ব লিপি-কুশলতার ফলে প্রত্যেক দৃশ্য, প্রত্যেক চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে; বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের নিকট এই নানা তত্ত্ববহুল উপন্যাসখানি অতীব হিতগর্ভ ও কৌতূহলোদ্দীপক হইবে; সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজার অন্তঃপুরের কথা ও বাজাসনের চীনা পরিব্রাজক অধ্যক্ষের বিবরণ পাঠ করিলে পাঠক ইতিহাসের এক নূতন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবেন। ভাওয়াল, সাভার ও সিঙ্গুরের যে দৃশ্যাবলী লেখক আঁকিয়াছেন—তাহা পাঠককে অলক্ষিতে এক স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়। ধলেশ্বরীর দুর্জ্জয়প্রবাহ ও সেকেলে জল-যুদ্ধের এবং বঙ্গের নানারূপ অর্ণবযানের যে চমকপ্রদ বর্ণনা আছে, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন নৌবল এবং নদনদীর রূপ যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে পরস্পরের নিকট অজ্ঞাত শ্যামল ও কজ্জলের প্রেম-কাহিনী উপাখ্যানভাগটি মধুর করিয়া তুলিয়াছে, এই প্রেমের ভীষণ পরিণতি পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। আজকালকার একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন উপন্যাসগুলির মধ্যে যে এই পুস্তক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ধনকুবের, ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এই পুস্তকের মুদ্রণ-ব্যয় বহন করিয়াছেন এবং গ্রন্থকার কয়েকটি অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত সংস্কৃত শ্লোকে পুস্তকখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছেন।

পুস্তকের সমগ্র প্রচ্ছদপটে এমন সুন্দর চিত্রে গ্রন্থবর্ণিত কয়েকটি ঘটনা অঙ্কিত হইয়াছে যে, বইখানি হাতে লইলে অলঙ্কারে বিন্যাসে যেন তাহা ঝলমল করিয়া উঠে।

পুস্তকের প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদ জটিল ঐতিহাসিক ঘটনায় ততটা সুখপাঠ্য হয় নাই। কিন্তু সেই কয়টি পরিচ্ছেদ অতিক্রম করিলে পাঠককে যেন ঝরণার স্রোতের মত কৌতূহল ও রসধারায় শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবে।

রোগ ও পথ্য—কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় কবি-শেখর, এম্, এস্‌সি প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

পুস্তকের নাম হইতেই পুস্তকান্তর্গত বিষয়ের আভাষ পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকখানি পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। গ্রন্থকারের ভূমিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রচারের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়াও, ইহার প্রথম সংস্করণ শীঘ্র নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ইহা পুস্তকখানি সম্বন্ধে খুবই প্রশংসার কথা।

প্রথম সংস্করণে 'ব্লাড প্রেশার', 'পাণ্ডু কমলা', 'যকৃতের দোষ', 'দন্ত রোগ', 'জরা নিবারণের উপায়' প্রভৃতি কয়েকটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। রোগে ঔষধ অপেক্ষা সুপথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক অধিক। কবিরাজ মহাশয় সেই পথ্য লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছেন এবং তাহার ফলে পুস্তকখানিতে যাহা আমরা পাইয়াছি তাহার মূল্য খুবই, নিঃসন্দেহে বলা যায়। পথ্য সম্বন্ধে পুস্তকের সংখ্যা খুবই অল্প। 'রোগ ও পথ্য' প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণের লাভ তাই যথেষ্ট। পরিশিষ্টে রোগের তালিকা, পথ্যের গুণাবলী, ভাইটামিন বা খাদ্য-প্রাণের কথা সন্নিবদ্ধ হওয়ায়, চিকিৎসক এমন কি সাধারণেও এই সকল সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা সহজেই দেখিয়া লইতে পারিবেন। পুস্তকখানির উপকারিতা এত অধিক যে, আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থকারের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিবার আয়োজন শীঘ্রই করিতে হইবে।

শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বার্-এট্-ল

ও-পারের দাবী. (উপন্যাস)—শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি, এল, প্রণীত। প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। মূল্য ১৷৷০।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে আধুনিক নর-নারীর বিচিত্র মনোভাবের সুসংযত বিশ্লেষণ বেশ নিপুণ হস্তেই করা হইয়াছে। লেখক বাংলা সাহিত্যে নূতন হইলেও, নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন চরিত্র-চিত্রণে ও ঘটনা-বিন্যাসে। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও পুস্তকখানি সুখপাঠ্য। আধুনিক উপন্যাসের মধ্যে ভাল হউক মন্দ হউক একটা নূতন ধরণ আছে, সেই বৈশিষ্ট্যটুকুই লেখককে গৌরবান্বিত করিবে।

ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়।

—শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

জুজু—কুমারী শোভনা দাশ প্রণীত। চ্যাটার্জ্জি ব্রাদার্স, ৬।১ একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। আটটী ছোট গল্পের সমষ্টি। মূল্য দশ আনা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থটী শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত। প্রথম উদ্যম হলেও গল্পগুলি যাদের উদ্দেশ্যে লেখা, আশা করা যায় তাদের ভালই লাগবে। ভারতের পুরাতন সংস্কৃতির প্রতি যাতে আমাদের শিশু-মনের অনুরাগ জন্মে—সেইভাবেই গল্পগুলি কথিত। গতানুগতিক অলীক জুজুর ভয় দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের আমোদ দানের চেষ্টা না করে লেখিকা ভালই করেছেন। সুন্দর প্রচ্ছদপট ও ছবিগুলি বইখানিকে খুবই শোভনীয় করেছে। এই রকম একখানি বই নিশ্চিন্তমনে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে এবং আশা করা যায় তারা পড়ে খুশীই হবে।

—শ্রীঅজিত ঘোষ

অসমাপ্ত—আধুনিক উপন্যাস। শ্রীসান্ত্বনা গুহ প্রণীত এবং যুগবাণী সাহিত্য চক্র, ১৪, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। সুন্দর ছাপাসহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই, সর্ব্বসমেত ১২৮ পৃষ্ঠা; দাম ১॥০।

যুবক-যুবতীর মধ্যে ক্রমাগত সান্নিধ্যের ফলে প্রেমের পরস্পরের অগোচরেই পরস্পরের হৃদয়ে ফুলেফলে পরিশোভিত হইয়া অকস্মাৎ একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। এই হঠাৎ-আবির্ভাবের হেতু বশতঃই হউক, আর আনন্দের আতিশয্যেই হউক—দু'জনের মধ্যে জানাজানির প্রথম অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে সহসা 'তৃতীয় জন'-এর লিপ্তিহীন্ প্রতিপক্ষতা অনুভূত হইলে, উভয়পক্ষই যদি অহেতুক অভিমান ও অবাঞ্ছিত 'ভুল-বোঝা' লইয়া পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া গিয়া তিলে তিলে মরণকেই বরণ করিয়া লয়—সে অভিমান ভাঙিতে বা 'ভুল-বোঝা' অপসারিত হইতে যুগ কাটিয়া যায়, জীবনও শেষ হইয়া আসে! প্রেমিক তাই বুঝি ভাঙিয়াও মচ্‌কাইতে চাহে না।

সরিত এবং মীনার মধ্যে নিতান্তই অকারণে যে প্রাচীর ব্যবধান গড়িয়া উঠিল, তাহা স্নেহময়ী চিত্রাদি'র করুণ আহ্বানে না পারিল সরিতকে প্রবাস হইতে টানিয়া আনিতে, আর না পারিল মীনাকে পোষ মানাইতে। মুহূর্ত্তের এতটুকু একটা ফুল্‌কিকে কেন্দ্র করিয়া যে অগ্নিকুণ্ড পরিণামে 'হুহু' জ্বলিয়া উঠিল—তাহা 'রাবণের চিতা' হইয়াই জাগিয়া রহিল, আর নিভিল না। প্রেমের অভিধানে চিরকাল যাহা লিখিত হইয়া আসিতেছে—হয়তো তাহার ব্যতিক্রম হইতে নাই?

চরিত্র-চিত্রণে এবং ঘটনার পারম্পর্য্য-রক্ষায় যে সজাগ দৃষ্টি ও লিপিকুশলতার প্রয়োজন—লেখিকা প্রশংসনীয় ভাবে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাহার উপর বর্ণনাভঙ্গীর সাবলীল শক্তিও সামান্যকে উপলক্ষ করিয়া অসামান্য রসানুভূতির আবেশে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বইখানির আগাগোড়া ভাষার প্রাঞ্জল গাঁথুনি তাই যেন কবিতার মতই একটা স্বপ্নমধুর পরিবেশ গঠন করিয়াছে। রসপিপাসু পাঠক-মাত্রেই যে বইখানি পড়িয়া সবিশেষ চমৎকৃত হইবেন—এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

মাছরাঙা—

ছেলেদের মাসিক, সবে আষাঢ় মাস থেকে সুরু হয়েছে। বার্ষিক চাঁদা দেড় টাকা মাত্র। সম্পাদক—শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা)। নূতন হলেও সম্পাদনার মধ্যে সতর্কতা আছে। ছেলেমেয়েদের মনোহারী পাঁচ ফুলের সাজি; গল্প, কবিতা, উপন্যাস, গান, স্বরলিপি, খেলা, ধাঁধা, ছবির বর্ণ-বৈচিত্র্য সবই 'মাছরাঙা'র ছোট কলেবরে আছে। উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

মানুষের মন (উপন্যাস)—শ্রীজীবনময় রায়। ভারতী ভবন, ২৪।৫ বি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা। পৃষ্ঠা ৪১০।

লেখক বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাস-রচনায় এই পুস্তকই তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা। আলোচ্য পুস্তকখানির নাম "মানুষের মন"। মনের স্বভাব ও গতিবিধি দুজ্ঞের্য়, রহস্যময়। লেখক এই রহস্যময় ব্যাপারটিকে আমাদের সমক্ষে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। দুইটি নারীর মন তাঁহার উপন্যাসে অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা পার্ব্বতী ও সীমা। সেবাপরায়ণা, পরার্থব্রতধারিণী, কর্ম্মশীলা পার্ব্বতীর মনের মধ্যে গোপনে যে প্রেমধারা প্রবাহিত ছিল, তাহা বহু ক্ষেত্রে, বহু ঘটনায় সংযত ছন্দে লীলায়িত হইয়াছে, কিন্তু দুর্দ্দম উচ্ছ্বাসে পরিব্যক্ত হয় নাই। শচীন্দ্রের মধ্যেও এই একই স্ফুরণ। সেখানেও প্রেমের আবেগ প্রচ্ছন্ন। ঘটনাচক্রে, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের আলোড়নে উচ্ছ্বাসের যেখানে অবকাশ ঘটিল, লেখক সেখানে অসাধারণ কৌশলে এই উচ্ছ্বাসকে ত্যাগে, সংযমে মহিমান্বিত করিয়াছেন। নন্দলালের উচ্ছৃঙ্খলতাও প্রবলভাবে দমিত হইয়াছে। নিখিলনাথের প্রেমাবেগও মনের মধ্যেই লীলায়িত, মহীয়সী সীমাকে তাহা বিপর্য্যস্ত করে নাই।

মনে হয়, মানসিক এই প্রেমলীলার চিত্র অঙ্কনের দ্বারা যেন অতি আধুনিক লেখকদের বীভৎস, উচ্ছৃঙ্খল প্রেমলীলার একটা পাল্টা জবাব দিয়াছেন। কামনার কদর্য্য বিকাশে প্রেমের মহত্ত্ব নয়, সংযমের মহিমাতেই তাহা মহীয়ান্—এই সুতীব্র ইঙ্গিত উপন্যাসখানির মধ্য হইতে বাস্তবতাপ্রিয় লেখকদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি।

তারপর সীমা ও তাহার গুরু অক্লান্তকর্ম্মী সত্যবানের চরিত্রের মধ্য দিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, বোমাসর্ব্বস্ব ও ছলনাময় স্বদেশপ্রেমের পথ প্রকৃষ্ট পথ নহে। সীমার অসীম সাহস, নারীদুর্ল্লভ হিংসাবৃত্তি বিশেষ অনুধাবনের জিনিস হইয়াছে। আধুনিক বাংলায় লেখকের মতের পোষণকারী ব্যক্তির অভাব হইবে না। তবে তাঁহার মতের বিরোধী ব্যক্তিরও অভাব নাই। যাহা হউক, লেখক আপন মত বেশ বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

উপন্যাসখানির চরিত্রচিত্রণের জটিল ও বৈচিত্র্যময় ঘটনার মধ্যে লেখকের কৃতিত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। পার্ব্বতী ও সীমার পরিণতি তাহাদের স্বভাবের সহিত সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস হইয়াছে।

বইখানির ছাপা ও বাঁধন সুশোভন—প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মত ও পথ

কবির চিঠি

জাপ-কবি নোগুচি সেদিন যখন ভারত পরিভ্রমণ করিয়া গেলেন, আমাদের মনে কেমন একটা আশঙ্কার ছায়াপাত হইয়াছিল যে, তাঁর সেই ভ্রমণ নিছক সাহিত্যিক বা ব্যক্তিগত নয়, ইহার মূলে কিছু রাজনৈতিক কারণ আছে। অবশ্য ইহার জন্য ভারতের চিরসিদ্ধ সরল আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি ঘটে, এমন কিছুই আমরা চাহি নাই; কিন্তু রাজনৈতিক সংশয়টুকু মন হইতে নির্ম্মূল করিতেও পারি নাই। আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে দেখিতেছি।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কিম্বা মহাত্মা গান্ধীজিকে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া, জাপ-কবি যে সুদীর্ঘ চিঠি দুইখানি লেখেন, তাহাতে জাপানের অন্ধ জাতীয়তার উলঙ্গ মর্ম্মটুকুই পরিস্ফুট হইয়াছে। পত্র দুইখানি পত্রপ্রেরক নিজেই প্রকাশ করিয়া দেওয়ায়, তাহা বিশ্ববাসীর গোচরীভূত হইয়াছে। ইহা 'প্রপোগ্যাণ্ডারই' নীতিসিদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আশ্চর্য্য এইটুকু যে, জাপানের শ্রেষ্ঠ মনীষীও ভাবিতে পারেন—এই প্রপোগ্যাণ্ডায় জগৎ ভুলিবে, জাপানের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্ববাসী নিঃসংশয় হইয়া উঠিবে। আজ শক্তির সাধনায় অবশ্য সকল জাতিই সমাহিত—প্রাণের দিগ্বিজয়ে উদ্যোগী সকলেই, তাই একে অপরের দিকে ক্ষুদ্র স্বার্থের বাহিরে অন্য চক্ষে চাহিয়া দেখে, এমন অবকাশই কারও নাই; তাহা ছাড়া শক্তিশালী সকল জাতিই আজ অল্পাধিক একই পাপের অংশীদার হওয়ায়, কেহ কাহারও পাপ-বিচারের নৈতিক ভরসাও সঞ্চয় করিতে সত্যই পারে না। ভীরু সভ্যতা তাই আজ রুদ্ধবাক্, নিস্তব্ধ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও আজ যে কোনও কারণে হউক, এই মৌন ব্রত অথবা কণ্ঠরোধ আইনকে বরণীয় করিয়া লইয়াছেন। এই অবস্থায়, পতিত, পরাধীন, দুর্ব্বল ভারতের প্রতিভূ, মহাকবির কণ্ঠে নোগুচির পত্রোত্তরে যে ক্ষুরধার মর্ম্মবাণী, তাহা শুনিয়া জাপান স্তম্ভিত হইবে, সভ্যজগৎ লজ্জায় মাথা নত করিবে, উপেক্ষিত, নিপীড়িত, নিষ্পিষ্ট মানবাত্মার মর্ম্মে মর্ম্মে একটা উল্লাসের ও সহানুভূতির শিহরণ খেলিয়া যাইবে, ইহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। মহাকবির দৃষ্টি যে দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়া সত্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারে, ইহাতে আমরা সত্যই আনন্দ অনুভব করিতেছি।

কারুণ্যের শাশ্বত রাগিণীই কবির কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়াছে—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ", জাপানের নিষাদ-বৃত্তি যে তাহাকে চরমে শ্রেয়ঃ দিবে না, শান্তি দিবে না, ইহাই তিনি উচ্চগ্রামে খুব স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন। জাপান নিজের রক্ত-ব্যয়ে চীনেরই মহত্ত্ব প্রমাণিত করিতেছে। তাহার এশিয়ার ভবিষ্যৎ-রচনার স্বপ্ন নৃমুণ্ড-স্তম্ভের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কবি মানবাত্মার প্রতিভূরূপেই বলিতেছেন—"I speak with utter sorrow for your people; your letter, has hurt me to the depths of my being." তিনি অন্তর দিয়া বিশ্বাস করেন—জাপানের এ মোহ একদিন দূর হইবে—তাহার বিশুদ্ধ শৌর্য্যের আজ যে ব্যভিচার চলিয়াছে, তাহা হইতে জাপানের অন্তরাত্মা একদিন মুক্তি পাইবে। কিন্তু তাহার জন্য শতাব্দীব্যাপী কঠোর প্রায়শ্চিত্তেও বুঝি কুলাইবে না।

এই সকল কথাই মর্ম্মান্তিক সত্য। মহাচীনের এই দুর্দ্দিনে ভারতের মহাকবির এই সহানুভূতির বাণী বড় ফলপ্রদ আশীর্ব্বাদ-রূপে ঐ দুর্গত জাতির অন্তরে কার্য্য করিবে। ভারত ইহার অধিক আজ বড় বেশী কিছু দিতে পারে না—কিন্তু এই হৃদয়দানও মহামূল্য, সন্দেহ নাই।

শক্তির বরপুত্র জাপানের কিন্তু এই বাণীকে মর্য্যাদা দিবার আজ অবস্থা নাই, সময় নাই। তাহার দিগ্বিজয়ী

প্রাণ কাল-ভৈরবের আহ্বানে ছুটিয়াছে; নৃমুণ্ডমালিনী মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যে আজ শিব পদদলিত হইলেও, নৃত্য সহজে বন্ধ হইবে না। এ অবস্থায় চীন পড়িল কেন, তাহা যখন ভাবি, হতভাগ্য ভারত বা আবিসিনীয়ার সহিত একই কারণ লক্ষ্য করিয়া বলিতে হয়, আমরা কেহই কালের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারি নাই—উপেক্ষা করিয়াছি মানবতার এক দিকের মোহে তাহার অন্য দিক্‌কে, দারুণ ঔদাসীন্য বা অবহেলায় শক্তি-সাধনায় অত্যন্ত পিছাইয়া পড়িয়াছি। তাই শুধু হৃদয়-বীণায় সহানুভূতির মন্ত্র-ঝঙ্কার ছাড়া আর বেশী কিছু করিবার বা সাহায্য দিবার আমাদের সাধ্য নাই। ভারতের কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সপ্ত অক্ষৌহিণী চমূ উপস্থাপিত করিয়া ধর্ম্মের জয় দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনি উঠিয়াছিল "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ"—সেদিন বীর পার্থ সে মহাহবে নিমিত্ত-মাত্র হইতে পারিয়াছিলেন। আজ আমরা পঙ্গু, ক্লীব—আমরা নিজেরাই করুণার্থী। এ সময়ে বীরাচারীর দম্ভ চূর্ণ করিতে যে শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা আমাদের কোথায়?

ভারতের জনসংখ্যা

ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধি প্রসঙ্গে আমরা ইতঃপূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি জন-স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনার ১৯৩৬ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়, বৃদ্ধির হার বর্ত্তমান অনুপাতে চলিলে ১৯৪১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ৪০ কোটী।

এই রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরে জন্মসংখ্যা বাড়িয়াছে ২৮০,০০০; পক্ষান্তরে, মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে প্রায় ২০০,০০০; ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৬.১ জন। অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় ২৯ লক্ষ।

গত এক বৎসরে এক কোটী নবজাত শিশুর মধ্যে পুরুষ শিশুর সংখ্যা অর্দ্ধকোটীরও অধিক। ভারতের সকল প্রদেশেই এই পুরুষের জন্মাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। এই বর্ষে ৬০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃটিশ ভারতে মাইল প্রতি শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ১৬২,—তন্মধ্যে পুরুষের মৃত্যুহার শতকরা ১৭.৯ ও স্ত্রী-শিশুর ১৫৩.১। এই অনুপাত নারীজাতির দিক্ দিয়া ভয়াবহ, সন্দেহ নাই। মোট শিশুমৃত্যুও জগতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা গুরুতর। বৃটিশ ভারতে যাহাদের দশ বৎসরের চেয়ে বয়ঃক্রম কম, তাহাদের মৃত্যুহারই সবচেয়ে অধিক দেখা যায়—ইহা মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৪৯। ইংলণ্ডে এই বয়সের বালক-বালিকার মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ১২টী মাত্র। বৃটিশ-সাম্রাজ্যে হাজার প্রতি হিসাব ধরিলে, ইংলণ্ডে শিশুমৃত্যু যদি হয় ৫৯, অষ্ট্রেলিয়ায় ৪১, কানাডায় ৬৬, নিউজিল্যাণ্ডে ২৩, ভারতের সেখানে আমরা দেখিতেছি ১৬২টীর কম নহে।

জনবৃদ্ধির কারণ কি, তৎসম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৩১ সাল হইতে, যখন শেষ আদমসুমারী গ্রহণ করা হয়, আজ পর্য্যন্ত ভারতে কোনও ব্যাপক মহামারী ঘটে নাই। তাহা ছাড়া, পূর্ব্বোক্ত জন্মমৃত্যুর বার্ষিক হার—জনবৃদ্ধিরই অনুকূলে। এই সম্পর্কে অন্যান্য যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহাও রিপোর্টে একে একে আলোচিত হইয়াছে।

কমিশনর হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন—১৯৩৬-৩৭ সালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে মোট ২৩ কোটী ২০ লক্ষ একর জমীতে খাদ্য-শস্যের চাষ হয়। তন্মধ্যে ২০ কোটী ৪ লক্ষ একরে ধান, কলাই প্রভৃতি এবং অবশিষ্ট জমিতে অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হয়। ১৯৩৫ সালের তুলনায় প্রত্যেক প্রদেশেই কৃষি-জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে, দেখা যায়।

লোক-বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া চলিবার মত খাদ্যোৎপাদনের জমীর অভাব ঘটিবার কোনও কারণ নাই। কেন না, হিসাবেই পাওয়া যায়, এখনও ৪ কোটী ৯০ লক্ষ একর পতিত জমী দেশে আছে। যে জমী কর্ষিত হয় নাই, তন্মধ্যে ১৫ কোটী ৪০ লক্ষ একর জঙ্গলা হইলেও, কর্ষণযোগ্য। তাহা ছাড়া আরও ১৫ কোটী ৫ লক্ষ একর ভূমি এখনও কৃষকদের হাতেই যায় নাই। এই দিক্ দিয়া দেখা যাইতেছে, ভারতের উৎপাদন-ক্ষেত্র এখনও নিঃশেষ হয় নাই। ক্ষেত্র আছে, তাহা ফলপ্রসূ করিতে যদি বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসৃত হয়, ভারতের মাটী

এখনও বহু কোটী জনবৃদ্ধি ঘটিলেও, তাহাদের অন্নদানে কাতর হইবে না।

কিন্তু ইহার জন্য চেষ্টা চাই, সুচিন্তিত ছক ও উদ্যমের আবশ্যক। রিপোর্টে অবশ্য আছে বটে, কৃষি, সেচ ও পশুচিকিৎসা বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি করিয়াছেন ও তাহাতে কিছু কিছু সুফলও পাওয়া গিয়াছে—কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা এখনও আশ্বস্ত হইতে পারি না। তুলনার জন্য যখন রুষিয়ার দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করি, তখন এই সব চেষ্টা সত্যই সমুদ্রের পার্শ্বে গোষ্পদ তুল্যই নগণ্য মনে হয়। এখনও এ বিষয়ে অনেক কিছু করিবার আছে। দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণকে এই দিকে অবহিত হইতে হইবে। ভারতের ৭টা প্রদেশে আজ কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা এবং অকংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট উভয়েই আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও যদি এইদিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন, আমরা আগামী সেন্সাসে ভারতের উন্নতিকর বিবৃতি সমধিক আশাপ্রদরূপেই দেখিতে পাইব।

পুষ্টিকর খাদ্য

উক্ত জনস্বাস্থ্যবিভাগীয় রিপোর্টেই প্রসঙ্গক্রমে খাদ্য বিষয়ক গবেষণার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, গভর্ণমেণ্ট গড় ২.৩ বৎসর যাবৎ পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু গবেষণা-কার্য্য করিতেছেন। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের যথার্থ অবস্থা, তাহারা যে খাদ্য খায়, তাহা কতটুকু পুষ্টিকর, উহার পুষ্টিদায়িনশক্তি বৃদ্ধির সহজ উপায় আছে কি না, এতদ্বিষয়ক জ্ঞানে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার উপায়—এই সকল বিষয়েই গবেষণা হইয়াছে। কুন্নুরের রিসার্চ্চ লেবরেটরীতে গবেষণার ফলে জানা যায় যে, মান্দ্রাজ প্রদেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহা ঐ প্রদেশের জনসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিপ্রদ। তবে গবেষকদের মতে, গড়ে প্রত্যেক প্রকারের খাদ্য সমপরিমাণে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা উচিত।

শস্যবহুল খাদ্যে জান্তব অম্লসার, খনিজ লবণ এবং ভাইটাইমিনের অভাব; দুগ্ধ, ডিম্ব, মৎস্য ও মাংস প্রভৃতিতে জান্তব অম্লসার বর্ত্তমান। কাঁচা সব্জী, শাক প্রভৃতি তরীতরকারীর মধ্যেও যথেষ্ট খনিজ লবণ ও ভাইটামিন আছে। এই সমস্তই পুষ্টির উপাদান। এক্ষণে প্রয়োজন—এই সকল খাদ্যবস্তু কি উপায়ে সহজে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যাইতে পারে এবং জনসাধারণকে এই খাদ্য কি ভাবে গৃহীত হইলে সর্ব্বাধিক পুষ্টিপ্রদ হয়, তাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, ইহারই পন্থার আবিষ্কার ও প্রয়োগ।

উক্ত কুন্নুর রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের গবেষণাফলে আরও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই দরিদ্র দেশে শিশুদের জীবনরক্ষার জন্য গো-দুগ্ধের পরিবর্ত্তে অনায়াসেই ক্যালসিয়ম ল্যাক্টেট ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার মূল্য খুব কম—মাসে অর্দ্ধ আনা খরচ করিলেই একজন শিশুর পক্ষে যথেষ্ট। ইহা সর্ব্বশ্রেণীর দরিদ্র গৃহস্থই ব্যবহার করিতে পারে। অর্দ্ধ আনায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাসিক খোরাকের সুব্যবস্থা হইতে পারে, এই সংবাদটীই নূতন এবং অনেকেরই পক্ষে বিস্ময়কর লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আরও আলোক দিলে জনসাধারণ উপকৃত হইবে।

বৈজ্ঞানিক শিল্প

ডাঃ মেঘনাদ সাহার সহিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের আলাপে কয়েকটী গুরু প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়—তন্মধ্যে বর্ত্তমান-যুগে এদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পসাধনার প্রবর্ত্তন-সমস্যা অন্যতম। এ সম্বন্ধে ডাঃ সাহার প্রশ্নোত্তরে রাষ্ট্রপতি জানাইয়াছেন—তাঁহারও বিশ্বাস, কুটীর-শিল্প ও গরুর গাড়ীর যুগ ফিরাইয়া আনিলেই ভারতে আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর নহে এবং যুগের প্রতিযোগিতামূলক জীবনসংগ্রামে ভারত আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে না। তিনিও মনে করেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানানুমত প্রণালীতেই এদেশে শিল্পের সংগঠন ও প্রসারণ প্রয়োজনীয়। ইহার জন্য চাই শিল্পক্ষেত্রে একটা যুগান্তর। কংগ্রেসও এই দিকে উদাসীন নহেন। তাঁহারা ইতিমধ্যেই শিল্প-বিষয়ে একটী বিশেষজ্ঞ-কমিটী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলির শিল্প-গঠন ও প্রসার ব্যাপারে যাহাতে একই নীতি অনুসৃত হয়, তজ্জন্য এই সকল প্রদেশের শিল্প-সচিবদের লইয়া একটী সম্মিলনও অচিরে

আহুত হইবে। রাষ্ট্রপতি আশা করেন—কংগ্রেস পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব পাইলে এ বিষয়ে আরও সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মধারাবলম্বনে নিশ্চয়ই উদ্যোগী হইবেন ও প্রথমেই একটা "ন্যাশানাল প্ল্যানিং কমিশন" নিয়োগ করিতে পারেন। ইতঃপূর্ব্বে, কংগ্রেস-সভাপতিরূপে তাঁহার প্রথম অধিবেশনেও এইরূপ পরিকল্পনার আমরা আভাষ পাইয়াছিলাম। অতএব, দেশের আর্থিক উন্নতি ও শিল্পবিষয়ে যুগের সহিত সমতালে অগ্রগতির জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি ও বৈজ্ঞানিক সাহা, উভয়েই একমত হইতে পারিয়াছেন, ইহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

কিন্তু এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীজী স্বয়ং একমত নহেন, ইহা আমরা অবগত আছি। তিনি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পের বিরোধী—ভারতের ন্যায় বিরাট্ জনবহুল দেশে কুটীর-শিল্পই কল্যাণজনক বলিয়া তিনি মনে করেন, সেইজন্য তাঁত-চরকার ন্যায় সর্ব্ববিধ কুটীরশিল্পগুলিকেই তিনি মৃত বা মুমূর্ষু দশা হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া, অর্থসাধনায় নূতন প্রাণসঞ্চার করিতেই সচেষ্ট হইয়াছেন। মহাত্মার এই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই 'নিখিল-ভারত চরকাসঙ্ঘ ও নিখিল-ভারত গ্রাম-উদ্যোগ-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার ভক্ত ও অনুগত কর্ম্মিগণ তাই ডাঃ সাহার এই মত বা সুভাষচন্দ্রের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে পারিবেন না।

ভারত আজ যে সন্ধিযুগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাহার শিল্প-জীবনের এই কঠিন সমস্যার একটা সুচিন্তিত সমাধান করিতেই হইবে। অন্যান্য সকল সভ্য দেশই বিজ্ঞানের আলোকে স্ব-স্ব শিল্প-জীবন পুনর্গঠিত করিয়া লইয়াছে অথবা লইতেছে। যে যে দেশ তাহা পারে নাই, তাহারা অগ্রণী জাতির নিকট পরাভূত ও উহাদের পণ্য-সামগ্রী কাটতির বাজারেই পরিণত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। যুগ-প্রতিযোগিতায় বাঁচিতে হইলে, বিজ্ঞানের সাহায্য চাই। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবল ব্যতীত শুধু জনবল বা পশুবল দিয়া সভ্য জাতিদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে আমরা পারিব না—ইহা নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, কিন্তু অমোঘ সত্য। অবশ্য জাপানের ন্যায় আমরা কুটীরশিল্পগুলিকে একেবারেই উচ্ছিন্ন না করিয়া, তড়িৎ-শক্তির সাহায্যে কুটীরে কুটীরেই খণ্ড খণ্ড আকারে যন্ত্রশিল্প প্রবর্ত্তন করিয়া, অতীত ও বর্ত্তমানে একটা সামঞ্জস্যের যোগ-সূত্র বাঁধিয়া দিতেও পারি। কিন্তু ইহার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তদ্বিষয়ে ডাঃ সাহা আমাদের পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি সময়ের উপযোগী তত্ত্বই চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন—এই দরদী বৈজ্ঞানিককে সেইজন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই সঙ্গে একটা কথা আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প সবখানি শুভপ্রদ নহে। যন্ত্রের চাপে মানুষ যেখানে অমানুষ হইয়া পড়ে, সেখানে প্রতিক্রিয়া আজ না হউক, সুদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী। একদিন প্রাচীন ভারতেও হয়ত যন্ত্রশিল্পের সমুচ্চ উন্নতিকালেই তাহার অশুভ পরিণাম দেখিয়া সমাজপতিগণ মহাযন্ত্র নিষিদ্ধ করেন। আজ বিজ্ঞানের উন্নতি-স্রোতের সে চরম জোয়ার সম্ভবতঃ এখনও আসে নাই যে, এখনই ভাঁটার আশা করা যাইতে পারে। অন্ততঃ ভারতের সে সুদিন এখনও আসে নাই। ভারতকে আজ বাঁচিবার জন্যই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমরা প্রাচ্যের যে মূলপ্রাণ অধ্যাত্ম ও নৈতিক শিক্ষায় জাতির ভিত্তি রক্ষা চিরদিন করিয়া আসিতেছে, আজও যদি তাহা হইতে বিমুক্ত না হইয়া পড়ি, সেই অন্তরের শাশ্বত সত্য ও দৃষ্টির মর্ম্ম রক্ষা করিয়াই যুগের সত্য ও কৃষ্টিকে শুদ্ধ প্রতিভায় সংহত ও আপন কুক্ষিগত করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমরা বৈজ্ঞানিক শিল্প-প্রবর্ত্তনের ফলে যে অনর্থ, তাহা অতিক্রম করিয়াও অমিশ্র শুভ ও কল্যাণ, শিব ও সুন্দরকেই যুগপৎ জীবনে আবাহন ও বস্তুতন্ত্র করিতে পারিব। আমরা সেই শিক্ষাই তরুণদের দিতে চাই, যাহাতে ভারতীয় চরিত্রগঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বিজ্ঞানের শিক্ষাগ্রহণ ও শিল্পসাধনায় তাহারই সংযত প্রয়োগে অগ্রণী হইয়া, জাতীয় জীবনে সত্যই যুগান্তর আনিতে সফলকাম হয়। দেশের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরগণ এই নূতন পথের দিক্‌নির্দ্দেশে অবহিত হইলে, আমরা সুখী হইব।

নূতন পথে

শ্রীমতিলাল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, দত্তা এবং যোগেশের কোন খবরই আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিল না। আশ্রমবাসীদের সকলেই নিরাশ ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু হরিসাধনের কাজ বাড়িল। তাহার অগোচরে এত কর্ম্ম এই আশ্রমে হইয়া চলে, তাহা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। মহাপুরুষ একমাত্র দত্তাদেবীর সহায়ে এত বড় কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ইহা বাহির হইতে কিছুই বুঝা যায় না। পোষ্ট অফিসের পিয়ন কাগজ-পত্রাদি দিয়া যায়; কোন পত্রই কাহারও খুলিয়া দেখার অধিকার নাই; মহাপুরুষ সব দেখিয়া শুনিয়া যথাযথ স্থানে পাঠাইয়া দেন। প্রয়োজনীয় পত্রাদির উত্তর দত্তাদেবীই লিখিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত দত্তার শয়ন-কক্ষের পার্শ্বে যে বৃহৎ ঘরখানি, তাহা একটী নাতিবৃহৎ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মিউজিয়ম্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অসংখ্য প্রকার সংবাদাদি, নানা দেশের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতিক সমস্যার সমাধানকল্পে নানা দেশের মনীষিদের অভিমতগুলির সারাংশ যথারীতি সুরক্ষিত। একটা নারীর জীবন লইয়া মহাপুরুষের যে পরিশ্রম, হরিসাধন তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল।

দত্তার অবর্ত্তমানে হরিসাধনকে মহাপুরুষ তাঁহার দৈনিক কার্য্য ব্যপদেশে নিযুক্ত করিলেন। এই জনহীন বাংলার সীমাপ্রান্তে দুর্গম অরণ্যসঙ্কুল গিরিদুর্গে অবস্থান করিয়া মহাপুরুষ দেশ ও জাতির জন্য শুধু চিন্তা নহে, কি বিপুল কর্ম্ম সূচনা করিয়াছেন—তাহা অপূর্ব্ব অভাবনীয়। হরিসাধন দেবলগাঁয়ের একখানি পত্রের সহিত আশ্রমের অভিনব মানচিত্র দেখিয়া উৎসাহে ও পুলকে আত্মহারা হইল। মহাপুরুষ বলিলেন "যোগেশ চলিয়া আসার পর দেবলগাঁয়ে একটী আদর্শ সংগঠন-কর্ম্ম সুরু করেছি। এই তিন বৎসরে ইহা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। দেবল গাঁয়ের আশ্রমের মানচিত্র দেখলেই বুঝতে পারবে, একটী গ্রামকে কেন্দ্র করে' যতখানি কর্ম্ম সম্পাদন হয়, এই ক্ষেত্রে তার ত্রুটি হয়নি।"

হরিসাধন বলিল "আমাদের আশ্রমের যায়গাটীতে এই প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানটী ছাড়া থানার নিকটে বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে আর একটী আশ্রম-ভবন চিহ্নিত দেখছি। এ সকলের খবর আমরা কিছুই পাইনি।"

"প্রয়োজন মনে হয়নি। তোমরা যে কয় জন এখানে আছ, কর্ম্মপ্রেরণায় তোমাদের মেধা ও মস্তিষ্ক চঞ্চল করার ইচ্ছা ছিল না। পূর্ব্বাশ্রমে যে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানটী, উহা মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আমি পুরুষদের সংসর্গে থেকে সম্পূর্ণভাবেই মেয়েদের স্বতন্ত্র রেখেছি। এইখানে এক্ষণে ৫০টী মহিলা সভ্য বাস করে। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের সহিত একজন পাশ্চাত্য মহিলাও নিয়োজিত হয়েছে।"

"মহিলাদের কি আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন?"

"একেবারেই না। এই মহিলাদের সমাজ-জীবন নাই। ইহারা নূতন সমাজ-গঠনের অগ্রণী হবে। পাঁচ বৎসর শিক্ষাকাল। যাদের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হওয়ার মত যোগ্য মনে করব, তাদের নিয়ে কাজ সুরু হবে।"

"এই পঞ্চাশ জনের মধ্যে কয় জন এইরূপ কর্ম্মে অধিকার লাভ করবে, আপনি মনে করেন?"

"অন্ততঃ দশজন।"

"মাত্র দশজন?'

"তুমি কি ইহা কম মনে কর?"

"কাজের তুলনায় কম বৈকি!"

"অর্থের ও শক্তির বৃথা অপব্যয় না হয়, তাই আমি ছোট করে'ই কাজ সুরু করেছি। এই দশজন নিষ্কাম নিঃস্বার্থ, ঈশ্বরবিশ্বাসে অভিষিক্ত, মোহমুক্ত নারী, যেদিন

সংযুক্ত প্রাণে সমাজ-সেবায় মুক্তচিত্তে কর্ম্ম সুরু করবে, কর্ম্মের ব্যাপক মূর্ত্তি স্বতঃই প্রকাশ পাবে। সংগঠনে প্রচুর অর্থ, প্রচুর লোকের চেয়ে চরিত্রবলের প্রভাব কত বেশী, পরে জান্‌তে পারবে।"

হরিসাধন আর কোন কথা বলিল না। মানচিত্রের অন্য স্থানটীর দিকে চাহিয়া মহাপুরুষ বলিলেন "আমার এক বাল্যবন্ধু তাঁর জীবনের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ দেবলগাঁয়ের এই কীর্ত্তিমন্দির রচনায় ব্যয় করেছেন। এই স্থানটীতে তিনি নিজেও থাকেন। এইখানে নীরোদও থাকে। আর ইহার পাশে এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভবনগুলি দেখছ, এগুলি গ্রামবাসীদের বিদ্যালয়, শিল্পশালা আর এই সুদীর্ঘ ভবনটী বর্ত্তমান যুগোপযোগী চিকিৎসালয়। দেবলগাঁ দত্তাদেবীর মহিমায় একটী আদর্শ গ্রামে পরিণত হয়েছে।"

হরিসাধন যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এত নিকটে থাকিয়াও মহাপুরুষ এই সকল কর্ম্মের কথা তাহাদের কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। হরিসাধন বুঝিল—কি রস ও আনন্দ সম্মুখে থাকিলে বাল্যকাল হইতে কৈশোর এবং যৌবনান্তে এক মহিলা পৃথিবীর সব কিছু হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারে। ভাগ্যবতী দত্তা। কিন্তু হরিসাধনের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তা দত্তার চেয়ে কম নয়। এই বিপুল কর্ম্মের তুলনায় হয় তো তাহার সম্পদ্ তুচ্ছ হইতে পারে। কিন্তু একটা ব্যক্তির জীবনের পক্ষে তাহা অল্প ছিল না। হরিসাধন তাহা অকাতরে মহাপুরুষের কাজে অর্ঘ্য দিয়াছে। কিন্তু তবুও সে পরের মতই এইখানে অবস্থান করে। আরও তার মনে হইল 'আশ্রমে বসিয়া মহাপুরুষ শুধু ধর্ম্ম করেন না, প্রচুর কর্ম্মও করিয়া থাকেন। হরিসাধন নিজের সার্থকতার কথা ছাড়িয়া অন্য সকলের জন্য ভাবিল—কৈ ইহাদের কাহাকেও তো ঘুণাক্ষরে কোন কথা বলা হয় নাই। মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া ইহারাও তো সমস্ত জীবন বলি দিতে অকুণ্ঠ। ইহাদের নিকট এই কর্ম্ম গোপন করা মহাপুরুষের দিক্ দিয়া কি সঙ্গত হইয়াছে? দত্তা নারী—মহাপুরুষের শিক্ষায় তাহার প্রতিভার উন্মেষ হইতে পারে, কিন্তু পুরুষের প্রতিভা তাহার অপেক্ষা কম নয়। এই সকল কর্ম্মপ্রতিষ্ঠার নীতি ও বিজ্ঞান যাহারা আশ্রমে আত্মদান করিয়াছে, তাহাদের নিকট অজ্ঞাত রাখায় সকলের প্রতি উপেক্ষাই মনে হয়। হরিসাধন চাপা বুকে মহাপুরুষের নির্দ্দেশ মত পত্রগুলি সংরক্ষিত করিল, যথাযথ উত্তর দিল, সংবাদপত্রের মতামত পড়িয়া শুনাইল; কিন্তু তাহার ললাট দুঃখে দুশ্চিন্তায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। মহাপুরুষ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপ বল, আমেরিকা বল, আজ যেমন তাদের প্রাণের সাড়া দেখছ, তেমনটী ছিল না। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানও আজিকার মত মাথা তুলতে পারে নাই। এই কয়েক শত বৎসরেই এরা সবাই এত বড় হয়ে উঠল। আজ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলে' পরিচয় দিতে প্রত্যেকে উপস্থিত। উন্নত জাতি-সঙ্ঘের কঠোর সংঘর্ষকাল সম্মুখে। পঙ্গু যারা, তারা ভাবছে—এইবার এরা উৎসন্ন যাবে। দারুণ অন্ধতা! বল পরীক্ষায় যে জাতি আজ মাথা তুলে' দাঁড়াবে, বিধাতা তার কপালে জয়পত্র বেঁধে দেবেন, আর সেই হবে দিগ্বিজয়ী জাতি। ভারত স্বধর্ম্ম হারিয়ে এই শত বৎসর পরানুকরণের মোহে এত অবনত, তার পুনরুত্থান অসম্ভব বলেই মনে হয়। তুমি কি মনে কর?"

হরিসাধন একটা ফাইলে নানা দেশের সংবাদপত্র হইতে কর্ত্তিত অংশগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেখিতেছিল, কোনটীতে রুশের নব গণতন্ত্রের সমর্থনসূচক যুক্তিপূর্ণ অভিমত, কোনটীতে ফ্যাসিষ্ট ইটালীর তীব্র সমালোচনা; আবার কোনটিতে বা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিন্দাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা। এমন কত কি! দত্তার আবাল্য জীবনটা যেন এই ঘরের সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট চিত্রিত। হরিসাধনের চিত্ত ঈর্ষ্যায় ভরিয়া উঠিতেছিল। সে অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল "আপনিই বলুন, আমি কিছু বুঝতে পারি না।"

মহাপুরুষ বলিলেন "ঈশ্বর-বিধান। নিত্যনিরঞ্জন হরি মঙ্গলময়। আর যে জাতি পর-পদানত হয়, সে জাতির স্থান-কাল-পাত্রের সীমার দৃষ্টিতে দয়াময়কে নিরপেক্ষ বলে' মনে হয় না। কিন্তু ভূমার দৃষ্টি দিয়ে সর্ব্বত্র তাঁর মঙ্গল রচনাই অনুভূত হয়। বিগত শত বৎসর ভারত তথা বাংলার প্রতিভা দিন দিন ম্লান হয়; বিশ্ববিদ্যালয় ইহার জন্য দায়ী বটে, কিন্তু ইহা উপলক্ষ্য। শতবর্ষ ধরে' যাঁরা বিজ্ঞানে, যন্ত্রশালায় রাষ্ট্রে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় গগনস্পর্শী মস্তক তুলে'

দাঁড়িয়েছে, আজ তাদের কোলে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আন্দোলন উপহাস মনে হয়। তাই আমি স্থির জেনেছি যে পথ দিয়ে এরা আজ বড় হয়ে উঠেছে, সে পথ আমাদের নয়। শত বৎসর আমরা অচল শুব্ধ হয়েই আছি। কিন্তু এইবার আমাদের যাত্রা সুরু করতে হবে।"

"সে কোন্ পথে?"

"সে এক নূতন পথে। সেই কথাই বল্‌ছি, আজ তার প্রয়োজন হয়েছে।"

হঠাৎ হরিসাধন দেখিল—মহাপুরুষের চক্ষু দুটী যেন জলসিক্ত হইয়া পড়িয়েছে। কণ্ঠও করুণার্দ্র। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "আমার কথা শোন। বাংলার ইতিহাসে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যচ্যুতির পর আর আলোর রেখা দেখতে পাবে না। আলিবর্দ্দী খাঁর আমলে দিল্লীর রাজশক্তি হতবল দেখা যায়। মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থানে ভারতের যে আশা, তাও শেষ হয় বাজীরাওএর মৃত্যুতে। আর এই রাষ্ট্রশক্তি বর্গীর অত্যাচার বাংলায় বহিয়া আনে, বাঙ্গালীও ধনে প্রাণে মরে। তারপর ইংরাজের দেওয়ানী-লাভের পর বাংলার সমাজ-জীবন দারিদ্র্যের কষাঘাতে ভাঙ্গিতে থাকে। ১৭৭৬ সালের মন্বন্তরে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে' গেল। ধীরে ধীরে ইংরাজ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হৃতসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী কৃতাঞ্জলীপুটে রাজসেবা করে'ও মেকলের কল্পিত যে শিক্ষা মাথায় তুলে' নিল, তাতে জাতি-হিসাবে বাঁচার যেটুকু আশা ছিল তাহা একেবারেই শেষ হয়ে গেল। ইহার পরে জাতি যে বাঁচার চেষ্টা করেছে, সে শত বৎসরের ইতিহাস যদি আলোচনা করে' দেখ, দেখবে জাতির সে জাগরণের মূলে ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি আছে। হিগেল, এঞ্জেন, টিণ্ডেলের বোঝা ঠেলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী স্বধর্ম্মের অমৃত আস্বাদ করে। সে অমৃত এক যুগ মাত্র কণ্ঠস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের উত্তেজনায় বাংলার রাষ্ট্র-সাধনা বড় হয়ে উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মামৃত যেটুকু নূতন প্রাণসঞ্চার করেছিল, সেই প্রাণ বিগত ২৫।৩০ বৎসরের রাজনীতিক আন্দোলনে প্রায় শেষ হয়ে আসে। যে জাতির যন্ত্রশালার পূর্ণ যৌবন কেশরীগর্জ্জন তোলে, বিজ্ঞানাগারে মধ্যাহ্নসূর্য্য কিরণ বিকিরণ করে, যে জাতির অস্ত্রবল বাহুবল হিমাদ্রির ন্যায় সমুচ্চ, উন্নত, সে জাতির কাছে এই বিষয়ে আমরা আজ শিক্ষার্থী, কিন্তু এক দিকে বীর্য্য আমাদের অপরাজেয়।"

হরিসাধন মন দিয়া কথাগুলি শুনিতেছিল — এই সময়ে মনটা তাহার কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে লঘু চিত্তে বলিল "সে বীর্য্য ভারতের ধর্ম্ম, এই তো!"

মহাপুরুষ তাহার দিকে মৃদু কটাক্ষ করিয়া স্থির কণ্ঠেই বলিলেন "কথা তাই বটে; কিন্তু যে লঘু চক্ষে আমরা ইহার রূপ দেখেছি, আমি তাহা বল্‌ছি না। আমি বলছি একটা নূতন কথা।"

হরিসাধনের মন চঞ্চল হইয়াই ছিল। সেও উচ্চ-শিক্ষিত একজন তরুণ। তাহার কাণেও পৌঁছায় দেশের শ্রমিক আন্দোলনের জিন্দাবাদ, সমাজতন্ত্রী দলের ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধার বাণী, ভারতের রাষ্ট্র-সাধনায় ধর্ম্মের স্থান যে নাই, এ বোধটা আজিও তাহার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। সে অন্তরে যেন অনুভব করিল—নূতন জীবনের শিক্ষায় দীক্ষায় ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অতীতের প্রতি আসক্তি কিছুই নিঃশেষে মুছে নাই। অন্তরে ও বাহিরে নিঃসঙ্গ জীবনসাধনা বুঝি বা ব্যর্থ হইয়াছে! সে করুণ দৃষ্টিতে মহাপুরুষের দিকে চাহিল। মহাপুরুষ বলিলেন, "ভারতের মানুষ বিধাতার আয়ুর উপর অঙ্কপাত করার সাহস করেছে যে অস্ত্র সজ্জায়, সেই অস্ত্র-সহায়ে যদি জীবনের জয়ে শক্তি প্রয়োগ করা যায়, এই শক্তি সাধনকেই আমি ধর্ম্ম বলছি। ইহা ব্যতীত এ জাতির অন্য পথ নাই।"

হরিসাধন কুণ্ঠার সহিত উত্তর করিল, "এ কথা স্বীকার করেই এখানে সর্ব্বহারা হয়ে আছি। কিন্তু তবুও প্রত্যয় আজ দৃঢ় নয়, মনে হয়, যে জাতির সুবিপুল লোকসংখ্যা, যে তাদের থুৎকারেই সমুদ্র সৃজন করে' বিপক্ষকে নিমজ্জিত করা যায়—এই প্রচেষ্টা তাদের কাছে যত আসন্ন, ধর্ম্ম তেমন নয়। মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করতে হলে, যে শক্তি জাতির করায়ত্ত, তাহার সুব্যবহারই সুসঙ্গত।"

মহাপুরুষ বলিলেন, "এইজন্যই তোমাদের আজও ছেড়ে যেতে পারি না। নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, নিষ্কলুষ জীবন যে চায়, জীবন থেকে মুক্তিলাভের চেয়ে তার কর্ম্ম কম দুঃসাধ্য নয়। জীবনের জয় সেই পূর্ব্বোক্ত গুণ প্রকৃতির এক সহস্র

মানুষ বাংলায় যদি মাথা তুলে, জাতির অভীষ্ট সিদ্ধ হবে এক নিমিষে।"

কথা শেষ হয় নাই। যুগল শশব্যস্তে আসিয়া বলিল "এক মগ্ এই পত্রখানা এনেছে। মহাপুরুষের হাতে পত্র দেওয়ার তার তাগিদ।"

মহাপুরুষ পত্রখানি লইয়া খুলিলেন, হাসিয়া হরিসাধনের হাতে দিলেন। হরিসাধন ও যুগল দুইজনেই যুগপৎ দেখিল "সমুদ্রগর্ভে উৎপল দ্বীপে যোগেশ দত্তা দেবীর সহিত অবস্থান করিতেছে। মুক্তির জন্য গভীর রাত্রে এই দ্বীপে সমুদ্র হইতে যে খাল বহিয়া গিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়া নৌকা লইয়া যাইলেই দত্তাদেবীর সন্ধান পাওয়া যাইবে।" উভয়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মহাপুরুষ স্থির হইয়া বলিলেন, "পত্রবাহককে সযত্নে আশ্রমে রাখ। কাল উহার সঙ্গেই হরিসাধন, সুবোধ এবং কয়েক জন জালিয়া যথাসময়ে ডিঙ্গি করে' যাবে।" তিনি যুগলকে প্রস্থান করিতে বলিলেন।

সংবাদ পাইয়া হরিসাধন খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহাপুরুষ বলিলেন, "আমার আর একটু কথা আছে। মন্ত্রার্থ দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পায় না। আমার নূতন পথের সঙ্কেত মন্ত্রের মতই গ্রহণ কর, যথাকালে ফল পাবে। এই ভারতজাতি বিপক্ষ বলে', শত্রু বলে', প্রতিদ্বন্দ্বী বলে' যদি কিছু দেখে, হয়তো শক্তির আতিশয্যে তা' দূর হবে—কিন্তু কাল তা' আবার অন্যরূপে দেখা দেবে। যখন অন্য কেহ বিরুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকবে না, বিরুদ্ধ ভাব নিজের মধ্যেই মূর্ত্তি নিয়ে জাতির শান্তি ও আনন্দ নষ্ট করবে। তরুণের সম্মুখে যে রাষ্ট্র-স্বাধীনতা, আমি তার বিরুদ্ধ নই। এই স্বাধীনতার জন্যই আমি গৃহ-সুখ ছেড়ে আজ সন্ন্যাসী। আমার পথ স্বতন্ত্র হ'তে পারে, লক্ষ্য আমার ভিন্ন নয়।"

হরিসাধন দেখিল — মহাপুরুষের চক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তিনি পুনরায় বলিয়া চলিলেন, "কেহ শত্রু নয়। কাহারও অহিত-কামনায় ভারতের মুক্তি সিদ্ধ হবে না। ভারতের চেতনাকে মুক্তি-তীর্থে তুলতে হবে। এইজন্য আমি তোমাদের পূর্ব্ব সংস্কার ও অভ্যাস থেকে মুক্তি দিতে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করছি। আজ কথায় কথায় ধন-সাম্যের আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমর-ঘোষণা, গণতন্ত্রের আদর্শবাদের কথা শুনি। এ সবই ভুয়া, যদি মানুষকে নিঃস্বার্থ করতে না পারে। স্বার্থ রেখে মানুষের শান্তি নাই। স্বার্থবাদের সাম্রাজ্যবাদ নিন্দার্হ। কিন্তু ভারতে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ জাতিসঙ্ঘ যদি গড়ে' উঠে, তারও রাজ্যবিস্তার জগদ্ব্যাপী হবে। স্বার্থ রেখে যে গণতন্ত্র, সে কথা মাত্র। ফলপ্রসূ নহে। জাতির মুক্তি-যুগ জাতি-গঠনের পর আসে। আজ জাতি-গঠনের যুগ। প্রতিবাদী মনোবৃত্তি নিয়ে নয়, আপনার সত্য ও বৈরাগ্য প্রকাশ করে'ই ভারতের স্বরাজ্য গঠন করতে হবে।"

তারপর মহাপুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হরিসাধনের হাত ধরিয়া বাহুবিস্তারে তাহাকে বক্ষে ধরিয়া বলিলেন "দেবলগাঁয়ে যে মহিলা-মিশনরী গড়ে' উঠছে, তারা যেন শত শত নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম চরিত্রের নারীকে সংহতিবদ্ধ করে। আর এই অষ্টাদশ জন আশ্রমবাসী তরুণ যেন জনে জনে সহস্র নিষ্কাম, নিরহঙ্কার তরুণকে মাথা তুলে' দাঁড়াতে শেখায়। নূতন পথের এই নারী ও পুরুষ যতদিন জাতি না স্বাধীন হয়, ততদিন পরস্পর নিঃসঙ্গ থাকবে—"

'কিন্তু এই বিপুল দেশ, বিপুল জাতি, আমরা মুষ্টিমেয়—আমাদের দৈন্য—।"

—"মিথ্যা কথা। জনবল বড় নয়, অর্থবল বড় নয়। এই অষ্টাদশ জন আত্মবিশ্বাসী পুরুষও ও দশজন দিব্য চরিত্রের নারী, আপনাদের ত্যাগ ও চরিত্রবলে সহস্র নারী পুরুষের নবজন্ম দিতে সক্ষম হবে। আর এই সহস্র নিঃসঙ্গ নিষ্কাম-চিত্ত নারী-পুরুষ জাতির মুক্তি অসাধারণ জীবন প্রভাবেই সম্ভব করে' তুলবে। ভারতের আকাশে জাতির মুক্তি দেবী শ্রীভগবানের চরণচ্যুত হয়ে প্রতীক্ষারতা। এই গঙ্গোত্রীধারা সহস্র-শীর্ষ ধূর্জ্জটিকে আশ্রয় করে' নিখিল বিশ্ব ভাসিয়ে দিবে। উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের পশ্চাতে দিব্য সৃষ্টির এই মন্দাকিনী আমার ভাব-কমণ্ডলু থেকে নির্গত—ইহা ব্যর্থ হবে না।"

হরিসাধন আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া মহাপুরুষের চরণ চুম্বন করিল।

(ক্রমশঃ)

সাময়িকী

পরলোকে রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

"মরণ সে যে প্রিয়ার চুমা, এলিয়ে পরে আলিঙ্গনে" দুঃখদৈন্যপীড়িত কবির নিজেরই মর্ম্ম-সান্ত্বনা। বিগত ৩২শে শ্রাবণ অপ্রত্যাশিতভাবেই অকালে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে মরণকে আলিঙ্গন করিয়াই তিনি সকল জ্বালা জুড়াইলেন। জীবনে যে সুখ-সম্পদ্ থাকিলে এ সুন্দর ভুবনে মরিতে ইচ্ছা হয় না, তাহা এ হতভাগ্য দেশের পত্রিকার পৃষ্ঠায় অনেক ছাপা হইয়াছে। বড়-ছোটদের পত্রিকাসম্পাদনা কর্ম্মেও তাঁর কুশলতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। স্বনামী বেনামীতে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ-রচনাও করিয়াছেন। নিজের ও একটি ক্ষুদ্র পরিবারের কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার জন্য নাম মাত্র মূল্যে শুধু গ্রন্থস্বত্ব নয়, গ্রন্থকারত্বও তাঁকে অর্থবানের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। রাধাচরণবাবুর সহিত



অন্তিম শয়নে সুকবি ও সাহিত্যিক রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী : ভাগিরথীতট : নিমতলা শ্মশান-ঘাট

অনেক সাহিত্যসেবীর মতই তাঁহারও ছিল না। না থাকিবার প্রধান হেতু এই যে, তিনি জীবনের সুরু হইতেই সাহিত্যসেবা ব্রত ও পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়া মস্ত ভুল করিয়াছিলেন। এই সুজ্যাম বঙ্গদেশে এখনও (ক্বচিৎ দু'চার জন ভাগ্যবান্ ছাড়া) সাহিত্যসেবীর পেটের ক্ষুধা মিটে না। রাধাচরণবাবুর সত্যকার সাহিত্য, বিশেষ কবিপ্রতিভা ছিল; কিন্তু তাহা উপযুক্ত আনুকূল্য ও সুযোগাভাবে পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। উৎকট অর্থাভাব ও অতিরিক্ত নিরীহ স্বভাব হেতু এই হৈ-চৈ-এর যুগে তিনি তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য স্থানটুকুও পাইতে পারেন নাই। তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ মাসিক সার্দ্ধ যুগের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রের সংগোপিত যে নগ্নমূর্ত্তি উদঘাটিত করিয়াছে, তাহা বড়ই মর্ম্মান্তিক। আজ সান্ত্বনারও ভাষা নাই, নাই কোন প্রতিকার। তাই তাঁর জীবন সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ।

পূজায় ই-বি-আর

প্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্রাদি, পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য ও ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সন্দর্শনে যাঁহারা অভিলাষী পূজাবকাশকালে ই-বি-আর-এর ভাড়া হ্রাস করার সুযোগ তাঁহারা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারেন। এই সময়ে সুলভ ভাড়ায় যাতায়াত করা ব্যতীত কোম্পানীর "অবাধ ভ্রমণ

টিকিটে" যথেচ্ছ। ভ্রমণের স্বর্ণ সুযোগ। এমন সুবিধা ভ্রমণেচ্ছুক আর কোনও কোম্পানীতে পাইবেন না। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে অন্যূন ৬৬ মাইল দূরত্বের জন্য সুলভ ভাড়ায় ৪৫ দিনের মেয়াদী-যাতায়াতী টিকিট। তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াতী ভাড়ার হ্রাসও ই, বি, আর-এ এবার হইয়াছে। এই সকল সুবিধার জন্য ই-বি-আরএ যাত্রীর ভিড় এ বৎসরে খুবই হইবে বলিয়া মনে হয়।

বাংলায় বন্যা

এবার নদীমেখলা বাংলা দেশের বিভিন্ন জিলাতেই বন্যার প্লাবন দেখা দিয়াছে। এবং তাহার ফলে বাংলার ২৮টি জিলার মধ্যে ১৭টি জিলার অধিবাসী বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এবারকার বন্যার কারণ, বর্ষার প্রথমেই গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের জল অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, ইহাদের সহিত সংযুক্ত ছোট ছোট নদীগুলিও অপ্রত্যাশিতভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তাহাতে সন্নিহিত জনপদ ও শস্যক্ষেত্রসমূহ জলমগ্ন হয়। বন্যাবিপন্ন স্থানগুলির মধ্যে নদীয়া, মুরশিদাবাদ মালদহ, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, বহরমপুর প্রভৃতির অবস্থা শোচনীয়। পল্লী-বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন। তাহাদের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে বাংলা সরকার, কংগ্রেস, বিভিন্ন জনহিতকর সঙ্ঘ ও জনসেবক-কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য অপরিসীম। বাংলার দরিদ্র জনসাধারণের এই বিপদে যাঁরা ভোট-ভিক্ষার সময় লম্বা গলায় আশা ভরসা দিয়া থাকেন এবং দেশের স্বার্থাধিকারী ও রক্ষক বলিয়া মাতব্বর সাজেন তাঁদের কর্ত্তব্যপালনের নমুনা দেখিয়া নিরাশই হইতে হয়। অনিদ্রা, অনাহারে ও অখাদ্য খাইয়া যাদের দিন কাটিতেছে শূন্যগর্ভ শুভেচ্ছার বাগাড়ম্বরে তাদের ক্লিষ্ট মন সান্ত্বনা মানে না। না মানিলেও বাংলাদেশে জন্মগ্রহণেরই ইহা দুরদৃষ্ট! রেলপথ, রেল সেতু, জল নিকাশের রাস্তা, নদী নালা মজিয়া যাওয়ার ফলে এই দুরবস্থার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা ভাবীকালেও সমানই রহিয়া গেল। ইহার প্রতিরোধকল্পে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু

যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু সংখ্যা উত্তরোত্তর যাহা দাঁড়াইতেছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে—

	১৯৩৪	১৯৩৬
বোম্বাই	২৩,২০০	২৪,৬০০
বাঙলা	১৪,৮০০০	১৫,৩০০
সংযুক্তপ্রদেশ	৪১০০	৬২০০
মাদ্রাজ	২৩০০	২৪০০

মৃত্যুহার বৃদ্ধিরই দিকে। ইহার প্রতিকার করা সম্ভব, অন্ততঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রতিকারের চেষ্টার ফল খুবই আশাপ্রদ। লেডি লিন্‌লিথ্‌গো ভারতবর্ষে এই ব্যাধির প্রকোপ কমাইবার আয়োজন করাইবার জন্য সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার এই শুভপ্রচেষ্টা সাধারণের সহানুভূতিযুক্ত হইয়া সফল হউক।

নারী ধর্ষণ

বঙ্গীয় আইন পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায় ১৯৩৭ এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত হিন্দুনারী ধর্ষণ মামলার মোট সংখ্যা ১৪১। ইহার মধ্যে ৫৪টী মামলায় আসামী বা আসামীরা আদালত কর্ত্তৃক



দণ্ডিত হইয়াছে। ৫৩টী মামলায় আসামী বা আসামীরা অব্যাহতি পাইয়াছে। ৩৪টী মামলা অন্যান্যভাবে মিটিয়াছে বা এখনও বিচারাধীন। পূর্ব্বের তুলনায় ধর্ষণের সংখ্যা অল্প হওয়াতে কর্তৃপক্ষ বাহবা পাইবার যোগ্য কিনা বলা কঠিন। এজাতীয় মামলায় উপযুক্ত সাক্ষীসাবুদ পাওয়া দুষ্কর, তাই অব্যাহতি প্রাপ্তির সংখ্যা হইতে মিথ্যা মামলার ধুয়া তোলা সঙ্গত নহে।

ভারতীয়ের সুখ্যাতি

লর্ড উইলিংডন্ কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতবাসীর আচার ব্যবহারের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। তাঁহাকে সমর্থন করিয়া ষ্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকায় লণ্ডনের মিষ্টার টি এস্ ষ্টালিং সম্প্রতি লিখিয়াছেন, "বহুদেশ পর্য্যটন আমি করিয়াছি কিন্তু ভদ্র ব্যবহারে ভারতবাসীর বৈশিষ্ট্য অপরিসীম। সামান্য উপকার তাহাদের কেহ করিলে প্রতিদানে তাহারা দেয় অফুরন্ত আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা।"

আত্মহত্যায় হিন্দু

১৯২১ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত আত্মহত্যার তালিকা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে হিন্দু, মুসলমান ও ক্রিশ্চান প্রভৃতির মধ্যে কলিকাতায় হিন্দুর আত্মহত্যার সংখ্যা শতকরা ৮৭ এবং মুসলমানের সংখ্যা শত করা ৭.৫। ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ম্যাকলাউড্ দেখাইয়াছিলেন—প্রতি-দশ লক্ষে মুসলমানের আত্মহত্যার সংখ্যা ৪৫.৪ এবং হিন্দুর ৮৫.৪। মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর আত্মহত্যার সংখ্যা কত বাড়িয়া গিয়াছে এবং মুসলমানের সংখ্যা কত কমিয়া গিয়াছে, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। আত্মহত্যায় হিন্দুর সংখ্যাধিক্যের কারণ কি? অর্থ কৃচ্ছ তাই একটী প্রধান কারণ বিশেষজ্ঞের অভিমত। প্রেম-নৈরাশ্য আর একটী মহৎ কারণ। চাকুরী স্থলে সাম্প্রদায়িক দাবী রক্ষার অবাঞ্ছনীয় ব্যবস্থাও ক্রমশঃ এক উৎকট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ বিষয়ে হিন্দু যদি ঐক্যবদ্ধভাবে আশু অবহিত না হয় তবে তার মরণ আসন্নই বলিতে হইবে।

পাঠানুরক্তি

ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরীর ১৯৩৬-৩৭-এর রিপোর্টে প্রকাশ সাহিত্য, ইতিহাস ও আইন পুস্তকের চাহিদাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার পরে প্রথম পাঠকের দৃষ্টি সাধারণ বিজ্ঞানের উপর। ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থান অধিকৃত—শিক্ষাতত্ত্ব ও ভূগোল এবং ভ্রমণকাহিনী কর্ত্তৃক। অষ্টমস্থলাভিষিক্ত—ধর্মগ্রন্থাদি।

স্বার্থ-বৈষম্য

বঙ্গীয় পরিষদের বিগত অধিবেশনের শেষ দিনে মুসলমান সদস্যের ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সরকারী চাকুরীর শতকরা ৬০, ২০ ও ২০টি যথাক্রমে মুসলমান, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও 'অবশিষ্ট অন্যান্যে'র মধ্যে বণ্টিত হইবে। যাদের ত্যাগ তপস্যায় এই নবশাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইল তাহাদের বরাত জোর দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক, কোন্ পাপের ইহা প্রায়শ্চিত্ত? চাকুরীর জন্য লালায়িত "জাতি-হিন্দু" নয়, কিন্তু শাসন সৌকর্য্যার্থে যোগ্যাযোগ্যের বিচারে উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করাইবার সে পক্ষপাতী। স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়া মন-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন সুস্থ-মস্তিষ্ক দেশ-হিতৈষী মাত্রেই ইহা সমর্থন করিবেন।

আদর্শ পল্লী-জীবন

হাওড়া ডোমজুড় নিবাসী ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ৮১ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ইষ্টনাম জপিতে জপিতে সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। নীরোগ স্বাস্থ্য ও উদার মন লইয়া পল্লীর কোলে নীরবে ক্ষেত্রমোহন পাড়াপ্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। কবির ভাষায় সত্যই তাঁর জীবনাদর্শ ছিল: "Happy is he whose wish and care a few paternal acre bounds"

শুভেচ্ছা

লক্ষ্ণৌ প্রবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সান্যাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী চন্দ্রিমা সান্যালের শুভবিবাহ রায়পুরের (মধ্যপ্রদেশ) বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভাদুড়ীর সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নবদম্পতীর শুভ কামনা করি। উদীয়মানা সাহিত্যিক ও কবি শ্রীমতী চন্দ্রিমা সান্যালের নাম 'প্রবর্ত্তকে'র পাঠক পাঠিকার নিকট সুপরিচিত।

—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক

বৈশাখ—আশ্বিন

ষাণ্মাসিক বিষয় সূচী ঃ লেখকের নামানুক্রমিক

চিত্র-সূচী

মাসানুক্রমিক :

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

❀ কয়েকখানি বাছা বাছা বই ❀

স্বামী সদানন্দ প্রণীত

বৃহত্তর ভারতের পূজাপার্ব্বন—১৲

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর ভূমিকা সম্বলিত ও ২০ খানি হাফটোন ছবির প্লেট সংযুক্ত)

SUVARNADWIP (Sumatra) Re. 1/-

(With foreward by O. C. Ganguli)

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

উপহারোপযোগী কবিতার বই—

মধুচ্ছন্দা ১৷০ নীরাজন ১৲

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রাম-রাজত্ব—৷৹

(অভিনয়োপযোগী নাটক)

Rural Welfare—-/8/-

(English Edition)

সদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত

বালকের সাধুসঙ্গ ১ম ভাগ—।৹

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত

ভাববার কথা (ষষ্ঠ সংস্করণ)—৷৹

বর্ত্তমান ভারত (৭ম সংস্করণ) ।৶৹

রাজযোগ (৮ম ,,) ১৷৹

সরল রাজযোগ—।৹

জ্ঞানযোগ (১০ম সং)—১৷৹

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৯ম সং)—৷৹

শ্রীভবেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

ব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বর মীমাংসা—১৲

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

পরমহংসদেব—১৲

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত

গ্রহ শিক্ষা (২য় সং)—১।৹

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন প্রণীত

স্কট্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা—১৲

৺রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

চক্রপাক (গল্পের বই) ১৲

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা প্রণীত

পূর্ব্বোত্তরা (কবিতার বই)—৷৹

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত

পাতঞ্জল যোগসূত্র—৷৹

(সূত্র ও মর্ম্মানুবাদ সহ)

কঠোপনিষৎ—৶৹

ঈশোপনিষৎ—/১৹

কেনোপনিষৎ—/৹

(আবৃত্তির জন্য মূল শ্লোকগুলি বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত)

শ্রীশিশিরকুমার রাহা প্রণীত

ভক্ত-বাণী—/১৹

মহাত্মা গান্ধী লিখিত ও

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন অনুদিত

ব্রহ্মচর্য্য (৩য় সংস্করণ)—৷৹

দুর্নীতির পথে—।৶৹

এতদ্ব্যতীত অর্ডার অনুযায়ী যাবতীয় পুস্তক আমরা সযত্ন তৎপরতার সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস—৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রবর্ত্তক-সূচী

— কবিতা ও গান —

— নিবন্ধ —

—চিত্র—

— স্বতন্ত্র আর্ট প্লেট —

রামসীতা (ত্রিবর্ণ) : শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়

নবযুগের পথ (দ্বিবর্ণ) : শিল্পী—শ্রীক্ষেমদা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবিষ্যৎ (একবর্ণ) : শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণলাল রায়চৌধুরী

শিল্পী টাসেন ব্রয়েকের আটটি পুতুলের চিত্র :

(১) আলাদিন, (২) সুন্দরী, (৩) নর্ত্তক-যুগল, (৪) নৃত্যের সুর, (৫) প্রসাধন ও প্রসাধনীর, (৬) জুজু (৭) গ্রন্থকীট, (৮) দানব-চাহনী।

'যিশুর জন্মক্ষেত্রে' চিত্রাবলী— ১৪-২০

(১) পথ—নাজারেথ (২) কারাফাসের গৃহ—জেরুজালেম, (৩) টেম্পল-জেরুজালেম, (৪) জেরু সী, (৫) টাইবেরিয়াস, (৬) চার্চ অফ এনানসিয়েশন, নাজারেথ।

'শিল্পী টাসেন ব্রয়েক' চিত্রাবলী ৪২-৪৭

(১) রাক্ষসী, (২) প্রণায়াম, (৩) বিলাসী, (৪) মুখোস ও নৃত্য, (৫) কৃষক, (৬) মৃত্যুর স্পর্শ, (৭) মুখোস

শ্যাঙ্কো কোম্পানীর

খাঁটি সুবাসিত, মেডিকেটেড

নারিকেল তৈল

ও

ইভ্‌নিং ফ্লোরা (হেয়ার অয়েল)

ব্যবহার করিয়া দেখুন হাতে হাতে ফল পান কিনা। নিয়মিত ব্যবহারে মাস্তিষ্ক শীতল থাকে, মরা মাস উঠিয়া যায়, কেশ বৃদ্ধি হয়। পাকা চুল কাঁচা হয়, বহু প্রশংসা পত্র ও মেডেল প্রাপ্ত শ্যাঙ্কো কোম্পানীর তৈল ব্যবহার করিতে ভুলিবেন না।

নূতন আবিষ্কার—

কুইন মেরি (হেয়ার অয়েল)

সোনা ও ডোরা পাউডার

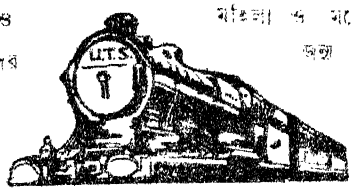
শ্যাঙ্কো কোম্পানী

২৬নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাশ্মীর এক্সকারসন

—৬ষ্ঠ অভিযান—

ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য



মহিলা ও মহোদয়ের জন্য

বাৎসরিক পরীক্ষার পর সাম্বাৎসরিক—পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত মনপ্রাণের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য আমাদের কাশ্মীর পৃথিবীর ভূস্বর্গ—ভারতের সুইটজারল্যাণ্ড— আরামে রেল ও বাসে অবাধ ভ্রমণ করিয়া আপনাকে চির নূতন করুন এবং পথে ১৭ই মে হাওড়া হইতে শুভযাত্রা করিয়া সাসারাম, চুণার, কানপুর, আগরা, দিল্লী, লাহোর, টাক্সিলা, পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি (১০ দিন কাশ্মীর) জম্মু, অমৃতসহর, হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ ও বেনারস পরিভ্রমণ এবং পরিদর্শন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করুন। উভয়াহার, ট্রেণবাস, কাশ্মীরে উপযুক্তাবাস, ডাক্তার পথ্যাদি ও ভৃত্য-সহ ভাড়া—২য় শ্রেণী ২৫০৲ তৃতীয় শ্রেণী ১২০৲ টাকা। ...ার পুস্তকাদি ও টিকেট ২০শে এপ্রিল হইতে প্রাপ্তব্য।

ইউনাইটেড ট্রাভেল সার্ভিস



দত্ত রহমান এণ্ড কোং

আর্ট প্রিন্টারস্ ও ব্লক মেকারস্

২৩-এ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পোঃ - বিডন ষ্ট্রীট

—চিত্র—

জি, ঘোষের

জগদ্বিখ্যাত

সুবাসিত কাঁচা তিল তৈল

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত। বায়ু ও কেশের মহোপকারী অদ্বিতীয় ও অকৃত্রিম কেশ তৈল।



ভারতের নানা শিল্প-প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাপত্র ও স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত। সর্ব্বপ্রকার বায়ু নাশ করে, হাত-পা ও চক্ষু জ্বালা, মাথা ঘোরা, শিররোগ, কেশপতন, কেশের অকালপক্কতা, মাথায় খুস্কী, মরামাস আদিতে বিশেষ উপকারী। স্নানে, প্রসাধনে ও ক্লেশ অপনোদনে শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ। নিত্য ব্যবহারে চিন্তাশক্তি প্রসার-লাভ করে।

জি, ঘোষের সুবাসিত ও ঔষধিযুক্ত নারিকেল তেল খাঁটি ও পরি-শোধিত কোচিন তৈল হইতে প্রস্তুত। কেশ প্রসাধনে অতুলনীয়। কেশগুচ্ছ ঘন কুঞ্চিত ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করিয়া কেশ কলাপের বৃদ্ধি করে। রমণীর কমনীয় সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনকারী অদ্বিতীয় কেশ তৈল।

ট্রাইকো সোডা ট্যাবলেট—অম্ল, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ।

জি, ঘোষের গণেশ মার্কা **বজ্রবাণ** ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরে ধন্বন্তরী। এক শিশিতেই জ্বর বন্ধ। প্রতি শিশি ॥০ আনা।



গভর্ণমেণ্টের সার্টিফাইড ও প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত জি, ঘোষের গণেশ মার্কা খাঁটি **সরিষার তৈল**। শিশু ও রোগীর ব্যবহার্য্য। /২॥০, /৫, ।০ ও ॥০ মণ গণেশ মার্কা টিনে পাওয়া যায়।

জি, ঘোষের গণেশ-মার্কা চর্ব্বিবর্জ্জিত **কাপড় কাচা ও গায়ে মাখা** সাবান। ইহা ব্যবহারে কুষ্ঠ ও অন্যান্য ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির ভয় থাকে না। কাপড় ধবধবে সাদা হয় ও শক্ত রাখে। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

জি, ঘোষ এণ্ড কোং—ঢাকা ও

২০ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শাখা:— শ্রীহট্ট, রংপুর, বেনারস, দিল্লী, বোম্বাই।